"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩৭

১ম সংখ্যা

সত্ত্ব রজঃ তমঃ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

কাচং মণিং কাঞ্চনমেক সূত্রে
গ্রথ্নন্তি মূঢ়াঃ কিমুত্র চিত্রম্
অশেষবিৎ পাণিনিরেক সূত্রে
শ্বানম্ যুবানম্ মঘবানমাহ।

মূঢ় ব্যক্তি কাচ, মণি ও কাঞ্চন একই সূত্রে গাঁথে—ইহা বিচিত্র কি? অশেষবিৎ পাণিনি একসূত্রে কুকুর যুবা ও ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্বন্ (কুকুর), যুবন্ (যুবা) ও মঘবন্ (ইন্দ্র) শব্দকে পাণিনি যে একবর্গে ফেলিয়াছেন তাহার কারণ অবশ্য এই যে ইহাদের শব্দরূপ একই নিয়মে নিষ্পন্ন হয়। কি উদ্দেশ্য লইয়া পদার্থের জাতি নির্ণীত হইয়াছে জানা না থাকিলে অনেক সময়েই শ্রেণীভুক্তি বিসদৃশ মনে হইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ বা জাতি নির্ণয়ের কতকগুলি লক্ষণ আছে। এই-সকল লক্ষণ পাওয়া না গেলে বুঝিতে হইবে যে জাতি-নির্ণয় ঠিক হয় নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া একই পদার্থ-সমষ্টির বিভিন্ন প্রকারের জাতি বিভাগ হইতে পারে। গহনা তৈয়ারি করা উদ্দেশ্য হইলে ধাতুর জাতি-বিভাগ একপ্রকার হইবে, আবার অস্ত্র নির্মাণ হিসাবে ধাতুর উপযোগিতা নির্ণয় করিতে হইলে বিভাগ অন্যরূপ হইবে। অমরকোষে যে-সমস্ত শব্দ এক পর্য্যায়ে আছে, পাণিনিতে তাহারা ভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। অতএব জাতি-নির্ণয় ঠিক হইল কি না বিচার করিতে হইলে জাতি-বিভাগের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। যে পদার্থ-সমষ্টির জাতি বিভাগ করা হইতেছে তাহার অন্তর্ভুক্ত একটি পদার্থও বাদ দেওয়া চলিবে না। অপরপক্ষে জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ব্যাপ্তির সীমা পরস্পর হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। যেমন ধাতুর জাতি বিভাগ করিতে বসিলে লৌহ বা অন্য কোন ধাতুকে বাদ দিলেও চলিবে না অথবা ধাতুকে বহুমূল্য অল্পমূল্য ও সুদৃশ্য—এইরূপ তিন পর্য্যায়ে ফেলাও চলিবে না। কারণ যে ধাতু বহুমূল্য বা অল্পমূল্য তাহা সুদৃশ্যও হইতে পারে। মূল্য ও সুদৃশ্যতার ব্যাপ্তি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। বিভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপ্তি মনে না রাখিলে জাতি-বিভাগ দুষ্ট হইবে।

জাতি বা শ্রেণী বিভাগের উপরি-উক্ত সূত্রগুলি মনে রাখিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিচার করা যাইতে পারে।

সত্ত্ব রজ তম কথাকয়টি সাধারণের মধ্যে এতই প্রচলিত যে অনেক সময়ে তাহাদের অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা সেগুলির প্রয়োগ করি। প্রকৃতির গুণের এই তিন বিভাগ কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা বিচার্য্য। এই বিভাগ দুষ্ট কিনা তাহাও আলোচ্য। প্রকৃতির সমস্ত গুণই কি এই তিন বিভাগে পড়ে, এবং সত্ত্ব রজ ও তমের ব্যাপ্তি কি পরস্পর হইতে বিভিন্ন? প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রকৃতির গুণরাজির এই ত্রিবর্গের বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল তাহা কি আমরা জানি? সত্ত্ব রজ ও তমের যে ব্যাখ্যাগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত দেখা যায়, তাহাদের লক্ষণ বিচার করিলে মনে সন্দেহ হয় যে, শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধিকাংশ ব্যাখ্যার মতে সত্ত্ব প্রকৃতির প্রকাশ-গুণ, রজ ক্রিয়া-গুণ এবং তম জড়তা মোহ বা অজ্ঞান। সত্ত্বের দ্বারা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়; ইহা নির্ম্মল লঘু ও অনাময়। রজ আমাদিগকে লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত করে এবং তম গুরু গুণবিশিষ্ট ও অত্যাধিক নিদ্রা বা আলস্যের কারণ। এখানে লঘু ও গুরু শব্দের অর্থ কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। পদার্থবিৎ (physicist), কিমিতিবিৎ (chemist), মনোবিৎ (psychologist) প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য গুণের বিচার করেন। এই সমস্ত গুণই কি সত্ত্ব রজ ও তমের অন্তর্গত? প্রকৃতির কোন্ গুণে জল বরফে পরিণত হয়? কুইনিন্-এর গুণ সত্ত্ব, রজ না তম? সত্ত্ব যদি জ্ঞানের প্রকাশক হয় ও তম যদি জ্ঞানের আবরক হয়, তবে গুণের জাতি বিভাগে রজের স্থান কোথা? কারণ প্রকাশত্ব ও অপ্রকাশত্ব—এই দুই বিভাগের মধ্যেই প্রকৃতির যাবতীয় গুণকে ফেলা যাইতে পারে। তদ্রূপ, রজকে কর্ম্মশীলতা ও তমকে জড়তা বলিলে শ্রেণী-বিভাগে সত্ত্বের স্থান থাকে না। আবার সত্ত্ব ও রজ, অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে একই বর্গে ফেলিবার উদ্দেশ্য কি? খুন্ ও যবখন্-এর ন্যায় এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক। সত্ত্ব রজ ও তমের সাধারণ প্রচলিত অর্থ ধরিলে শ্রেণী বিভাগে ব্যাপ্তিদোষ ঘটে।

শাস্ত্রকারগণের শ্রেণীবিভাগ যে দুষ্ট তাহা মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে। শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র তাঁহারা ভালরূপই জানিতেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই আমরা গোলে পড়িতেছি। এই প্রশ্নের সদুত্তর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না, অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াও সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারি নাই। ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন:—"আমি এই তিন গুণের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহাদের প্রকৃতি আমার নিকট মোটেই সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদের কাছে ইহাদের অর্থ এতই স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে তাঁহারা কোন ব্যাখ্যা দেওয়াই আবশ্যক বিবেচনা করেন না।"* আমার নিজের মনে যে ব্যাখ্যা জাগিয়াছে এখানে তাহাই বিবৃত করিব। শাস্ত্র অনন্ত এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিসরও নিতান্ত অল্প। হয়ত কোথাও এই প্রশ্নের সদ্ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু আমার তাহা জানা নাই।

প্রথমেই সত্ত্ব রজ তম—এই শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্য বিচার করিব। প্রকৃতির গুণাবলীর বিশ্লেষণের চেষ্টার ফলে সত্ত্ব রজ তমের কল্পনা। শাস্ত্রকারগণ পদার্থবিৎ বা কিমিতিবিৎ হিসাবে প্রকৃতিকে দেখেন নাই। প্রকৃতির লীলা তাঁহাদের কাছে দার্শনিক সমস্যা। কি করিয়া প্রকৃতির উদ্ভব হয় ও কি গুণে তাহা পুরুষকে অভিভূত করে তাহাই তাঁহাদের প্রশ্ন। মনে রাখিতে হইবে, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রকৃতির সমস্যা মনোরাজ্যের দিক দিয়াই বিচার করা হইয়াছে। বাহিরের প্রকৃতির অস্তিত্বের জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের অন্তঃকরণের সাহায্যেই বুঝিতে পারি।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎতদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।

গীতা ১৩।২৬

---

*"I have tried to explain the meaning of the three Gunas before, but I am bound to confess that their nature is by no means clear to me, while, unfortunately, to Indian Philosophers they seem to be so clear as to require no explanation at all."
—Collected Works of Max Muller—The Six Systems of Indian Philosophy, (1903), p. 357.

—হে ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সঞ্জাত হয়, তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে, ইহা জানিবে।

আত্মাই ভূমা। তাহাই সমগ্র প্রকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। প্রকৃতির ব্যাপ্তি সে তুলনায় সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শাস্ত্রকারদের আলোচ্য। এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।
গীতা ১৩।২৩

—যিনি এই প্রকারে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব্ব অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও (যে-কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়াও) পুনরায় জন্মান না।

আত্মসাক্ষাৎকারই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মাকেই জানিতে হইবে। আত্মানং বিদ্ধি। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সত্ত্ব রজ তমের বিচার করিতে হইবে।

মানুষের মন প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। আত্মা ভিন্ন পৃথিবীর সকল বস্তুই জড়পদার্থ। মনও সূক্ষ্ম জড় মাত্র। আত্মা বা চৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া মন উদ্ভাসিত হয়-ইহাই শাস্ত্র-মত। প্রকৃতি-জাত এই মনের সাহায্যেই বদ্ধ জীব আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে।

আত্মা শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ। বিশুদ্ধ না হইলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই মানুষকে আত্মদর্শনের পথে লইয়া যায়। প্রকৃতির গুণেই যেমন জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়, তেমনি আবার প্রকৃতিরই অন্যগুণ জ্ঞানলাভে বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। অতএব প্রকৃতির দুই গুণ আছে। এক গুণ হইতে জ্ঞান ও অপর গুণ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অজ্ঞানই তম। মানুষের জ্ঞান দুই প্রকার। এক বহির্মুখ ও অপর অন্তর্মুখ। তম এই দুই প্রকার জ্ঞানের বিরোধী। আমার মতে প্রকৃতির যে গুণের বশে মানুষের জ্ঞান বহির্মুখ হয় তাহাই রজোগুণ এবং যে গুণের বশে জ্ঞান অন্তর্মুখ হয় তাহাই সত্ত্বগুণ। গুণের শ্রেণী বিভাগ এখন নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইল :—
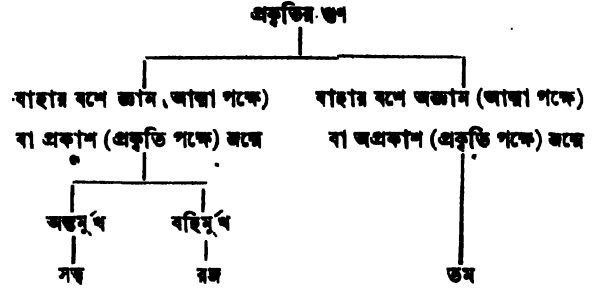
ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা উভয়ের সংযোগেই যখন প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপার প্রতিভাত হয়, তখন প্রকৃতির গুণ আত্মাপক্ষ বা প্রকৃতিপক্ষ যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। অজ্ঞান হইতে তমের উৎপত্তি বা তম হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি—দুই বলা চলে।

অন্তর্মুখ জ্ঞান ও বহির্মুখ জ্ঞান কাহাকে বলে এখন তাহা বিচার করিব। অন্তর্মুখ জ্ঞান আমাদের নিজের শুদ্ধ অনুভূতির জ্ঞান, এবং বহির্মুখ জ্ঞান বস্তুজ্ঞান। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যখন আমরা ঘণ্টার শব্দ ও বাঁশীর শব্দের পার্থক্য বিচার করি, অর্থাৎ যখন শব্দের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি, তখন মাত্র শব্দের শুদ্ধ অনুভূতি হয় ও তখন শব্দজ্ঞান অন্তর্মুখ হইয়াছে বলা যায়। যখন বহির্বস্তু হিসাবে ঘণ্টা ও বাঁশীর প্রভেদ বিচার করি তখন শব্দায়মান বস্তুর দিকেই মন যায় অর্থাৎ জ্ঞান বহির্মুখ হয়। বহির্বিষয় হইতে মনকে অন্তরের অনুভূতির দিকে লইয়া যাওয়াকে গীতাকার ইন্দ্রিয় সংহরণ বলিয়াছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ২।৫৮

কচ্ছপ যেমন সর্ব্বদিক হইতে নিজ অঙ্গ স্বীয় অভ্যন্তরে গুটাইয়া লয় সেইরূপ যিনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতেই ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করিয়া লইতে পারেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

শাস্ত্রমতে মন অন্তর্মুখ না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অন্তর্মুখ মনের দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের শুদ্ধ অনুভূতির জ্ঞান লাভ করি। এই অনুভূতিতে কোন বহির্বস্তুর বোধ নাই। শুদ্ধ অনুভূতি

হইতে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। কেবল অনুভূতির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের জ্ঞান শুদ্ধ হইলেও তাহাতে নানা গুণ আছে। রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিতে পৃথক পৃথক গুণ বর্ত্তমান। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে কোন নানাত্ব নাই। ইহ নানাস্তি কিঞ্চন। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই আত্মার স্বরূপ। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন অন্তর্মুখ করিতে হইবে। অন্তর্মুখ হইলে মন প্রথমে বহির্বস্তু হইতে সরিয়া আসিবে ও ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের শুদ্ধ অনুভূতি জাগিবে। ক্রমে ইন্দ্রিয়জ শুদ্ধ অনুভূতির নানাত্ব লোপ পাইয়া কেবল জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে। ইহাই ব্রহ্মদর্শন।

কঠোপনিষদে আছে, স্বয়ম্ভূবিধানে মানুষের ইন্দ্রিয়দ্বার বহির্মুখ হইয়াছে সেজন্য বহির্বিষয়ে আমাদের মন ধাবিত হয়। কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি অমৃত সন্ধানে চক্ষু আবৃত করিয়া প্রত্যক্ আত্মার দর্শন পান। বহির্বিষয়ে আসক্তি অন্তর্দর্শনের এক প্রধান বাধা। এক হিসাবে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতিও বিষয়ানুভূতি। মনের সমস্ত ব্যাপার শাস্ত্রমতে সূক্ষ্মজড়ের ক্রিয়া। এই সূক্ষ্ম বিষয়ানুভূতিতে আবদ্ধ থাকিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না। এই জন্যই সত্ত্ব গুণকে অতিক্রম না করিতে পারিলে আত্মদর্শন সম্ভবপর হয় না। কৌষিতকী উপনিষদ বলিতেছেন—

"বাক্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে না, বক্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আঘ্রাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; রূপকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, রূপবিৎকে জানিতে চেষ্টা করিবে; শব্দকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, শ্রোতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; অন্নরসকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; কর্ম্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, কর্ত্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; সুখদুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, সুখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; আনন্দ রতি বা প্রজাতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আনন্দ রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; গতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, গন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; মনকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, মন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।"---
শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ, ৩য় অ. ৮।

প্রকৃতির যে গুণের বশে জ্ঞান অন্তর্মুখ হইয়া জীবকে কৈবল্যের বা আত্মদর্শনের পথে লইয়া যায় তাহাই সত্ত্ব গুণ। বহির্মুখ জ্ঞান রজ হইতে উৎপন্ন। এই জ্ঞান বিষয়বস্তু উপলব্ধি করায়। যদিও বস্তুজ্ঞান জীবের মনেই প্রতিভাত হয় তথাপি এই জ্ঞানের বশে জীব নিজ হইতে ভিন্ন এক বহির্জগতের অস্তিত্ব জানিতে পারে। অন্তর্মুখ জ্ঞানে বস্তুবোধ-নিরপেক্ষ জ্ঞানমাত্র উপলব্ধ হয়, আর বহির্মুখ জ্ঞানে জ্ঞানের দিকটা প্রকাশ না পাইয়া জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তুবোধ জন্মে। প্রত্যেক বস্তুর উপলব্ধির সহিত তাহার বিশেষ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি জড়িত থাকে। চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি, হাতে ভিজা কঠিন ও ঠাণ্ডা স্পর্শ বোধ হইল। মনে ভাব আসিল বরফ ছুঁইয়াছি। বহির্বস্তুতেই মন গেল। বরফ-রূপ বস্তু আছে এই বোধ মনের বহির্মুখিতার ফলেই উৎপন্ন হইল, অতএব ইহা রজের ক্রিয়া। মনে হইল ঠাণ্ডা লাগিতেছে; নিজের অনুভূতির দিকেই মন ছুটিল। মনের এই অন্তর্মুখিতা সত্ত্বগুণ-জাত। রোগে হাত অসাড় হওয়ায় বরফ ঠেকিলেও বরফ ছুঁইয়াছি বা ঠাণ্ডা লাগিতেছে কিছুই মনে হইল না। এক্ষেত্রে উভয় প্রকার জ্ঞানই বাধা প্রাপ্ত হইল। অতএব তমের গুণ প্রকাশ পাইল।

বিষয়জ্ঞান বা বস্তুবোধ হইতেই আমাদের যাবতীয় কার্য্যের চেষ্টা জন্মে, এইজন্যই কর্ম্মচেষ্টার মূলে রজ আছে বুঝিতে হইবে। তম অজ্ঞানজ বলিয়া জ্ঞানগুণ-যুক্ত সত্ত্ব ও রজ উভয়েরই বিপরীত। এজন্য তমের ক্রিয়া দুই প্রকার। অনুভূতির উপলব্ধিতে বাধা দিয়া তম অপ্রকাশ জন্মায় এবং বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান নষ্ট করায় কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করে। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে :—

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১৪।১১

যখন এই দেহে সর্ব্বদ্বারে (সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে) যাথার্থ্য-নিরূপক জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন সত্ত্বই প্রবল, এই জানিবে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ। ১৪।১২

হে ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি (কর্ম্মপ্রবণতা activity। নানাকর্ম্মের উদ্যোগ, অশান্তি (সর্ব্বদা

অভাব বোধ), স্পৃহা (বিষয়-তৃষ্ণা) রজোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৪।১৩

হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশ (জ্ঞান-আবরণ), অপ্রবৃত্তি (আলস্য), প্রমাদ (অনবধানতা, কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্য বিভ্রম) এবং মোহ (ভ্রান্ত ধারণা), তমোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৪।১৭

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, এবং রজোগুণ হইতে লোভ; তমোগুণ হইতে প্রমাদ ও মোহ হয়, এবং অজ্ঞান।

রজোগুণ হইতে বস্তুজ্ঞান এবং বস্তুজ্ঞান হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মায়। অতএব সমস্ত কর্ম্মের মূলে রজোগুণ স্বীকার করা যায়। সমস্ত কর্ম্মই যদি রজ-উদ্ভূত হইল, তবে তামসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া কি কিছু নাই? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তম বিষয়জ্ঞানে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারে। এই দুষ্প্রবৃত্তিজাত সমস্ত কর্ম্মকেই তামসিক বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম ভিন্ন কেহ মুহূর্ত্ত-মাত্রও বাঁচিতে পারে না, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম্ম আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয় এইজন্যই এইরূপ কর্ম্মকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। সত্ত্ব রজ তম শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য মনে রাখিলে কোন্ কর্ম্ম সাত্ত্বিক, কোন্ কর্ম্ম রাজসিক, কোন্ কর্ম্মই বা তামসিক তাহা বিনা শাস্ত্রবিচারেও সহজে বোঝা যাইতে পারে।

আধুনিক যে-সকল বিদ্যার আলোচনা হয় তাহার মধ্যে যন্ত্রবিদ্যা স্থপতিবিদ্যা শিল্পকলা সমস্তই রাজসিক বলা যাইতে পারে। সমস্ত ব্যাবহারিক বিজ্ঞান রাজসিক। পদার্থবিদ্যা কিমিতিবিদ্যা প্রভৃতি শুদ্ধ বিজ্ঞান বহির্বস্তু লইয়া কারবার করে, এজন্য ইহারা মূলত রাজসিক। কিন্তু পদার্থবিৎ বা কিমিতিবিৎ পক্ষপাত ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাত্ত্বিক, জ্ঞানবৃদ্ধি তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। মনোবিৎ অন্তর্দর্শনের চেষ্টা করেন। মনোরাজ্যের ব্যাপারই তাঁহার আলোচ্য। এজন্য মনোবিদ্যাও সাত্ত্বিক, মনোবিদের কার্য্যও সাত্ত্বিক। মন-চিকিৎসকের কর্ম্ম রাজসিক কর্ম্ম।

শুদ্ধ সত্ত্ব রজ তম দেখা যায় না। সমস্ত ব্যাপারেই এই তিন গুণ অল্পবিস্তর সংমিশ্রিত হইয়া আছে। বিভিন্ন মানুষের স্বভাবে এই তিন গুণের প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে স্বভাবকে সাত্ত্বিক বলা হয়, সেইরূপ রাজসিক ও তামসিক স্বভাবও আছে। গীতায় এই বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তির কার্য্যাবলীর আলোচনা আছে। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের ব্যক্তিদের কি কি খাদ্য প্রিয়, গীতাকার তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। যোগীদের মতে বিশেষ বিশেষ খাদ্যে এই তিন গুণের পৃথকভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত কোন বিশেষ খাদ্য সাত্ত্বিক বা তামসিক নির্ণয় করিবার উপায় অজ্ঞাত ছিল। শাস্ত্রের ও যোগীদের কথাই বিনা বিচারে মানিতে হইত, কিন্তু সত্ত্ব রজ তমের আমি যে মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে খাদ্যের সাত্ত্বিক ইত্যাদি গুণ মনোবিদের পরীক্ষাগারে নির্ণীত হইতে পারিবে। পরীক্ষমান ব্যক্তিকে যদি বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়া দেখা যায় যে তাহার অন্তর্দর্শনের (introspection) ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে সেই সেই খাদ্য সাত্ত্বিক প্রমাণিত হইবে। তদ্রূপ রাজসিক ও তামসিক খাদ্যেরও পরীক্ষা হইতে পারে।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মোপলব্ধির পক্ষে প্রকৃতির তিন গুণই বাধা। তমের বাধা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; তার নীচে রজের, তার নীচে সত্ত্বের। পূর্ব্বে সত্ত্বগুণকে আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যদি আসক্তি জন্মায়, তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞানের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হয় না। সত্ত্বগুণই আত্মোপ-লব্ধির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পথের মায়া না কাটাইলে গন্তব্যস্থানে পৌছানো যায় না। গীতায় আছে,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪।২০

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া দেহী (দেহধারী আত্মা) জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোজন করেন (অমৃতত্ব লাভ করেন)।

কাশ্মীরের কথা

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর দিল্লী হ'তে কাশ্মীর আস্তেন হাতীতে চড়ে ছ'মাসে, কারণ পথের উপর কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হ'ত, পাছে তাঁর হাতীর পায়ে লাগে। আমরা এসেছি ট্রেনে ও মোটরে। শীঘ্রই সেদিন আসবে যখন হাওয়াই জাহাজের কৃপায় বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা-বাসী এই ভূস্বর্গ কাশ্মীরে পৌছে যাবেন কয়েক ঘণ্টায়।

বর্ত্তমান যুগে আমরা বিশেষ ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে উঠেছি। পথের শেষে পৌছানোর জন্য আমরা ব্যস্ত; কিন্তু পথে কি আনন্দ নেই? যে পথ আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছে দেয়, তারও দাবী আছে। যখন গরুর গাড়ী, একা, টাঙ্গা ও ঘোড়াই ছিল পথের সঙ্গী তখন পথের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হ'ত।

এখনও এ পথে টাঙ্গা চলে, গরুর গাড়ী মাল নিয়ে চলে রাত্রে, দিনে বিশ্রাম করে, প্রায় পনের দিন লাগে শ্রীনগর পৌছতে। ডমেলের নিকট দেখলাম দুজন ইংরেজ-মহিলা হাতে ক্যামেরা নিয়ে হেঁটে চলেছেন, পাশে টাঙ্গা চলেছে। বুঝলাম এঁদের সৌন্দর্য্যপিপাসু মন মোটরে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি, কাজেই এই দীর্ঘ পথ এঁরা পায়ে হেঁটে ও টাঙ্গায় অতিক্রম করতে চান।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগরের পথ ১৯৮ মাইল। এই পথটি অনেক দিনের; পথে অনেকগুলি ডাকবাংলো আছে। ব্যস্তবাগীশেরা একদিনেই মোটরে এই পথ অতিক্রম ক'রে গৌরব বোধ করেন।

পেশোয়ার এক্সপ্রেস রাওয়ালপিণ্ডি পৌছায় সকাল ছ'টায়। ষ্টেশনে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে তক্ষশীলা দেখতে যাওয়া উচিত। মোটরপথে পঁচিশ মাইল, ট্রেনেও যাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে নগর নির্ম্মাণ-কৌশল কেমন ছিল তার পরিচয় এখানে পাই। পাহাড়ের উপর সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হ'য়েছিল, তার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। ভাস্করেরা যে কত বড় সাধক ছিলেন তাঁদের খোদিত বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিতেই তার পরিচয় পাই।

তক্ষশীলা ম্যুজিয়মটি বড় সুন্দর। অতীতের এত
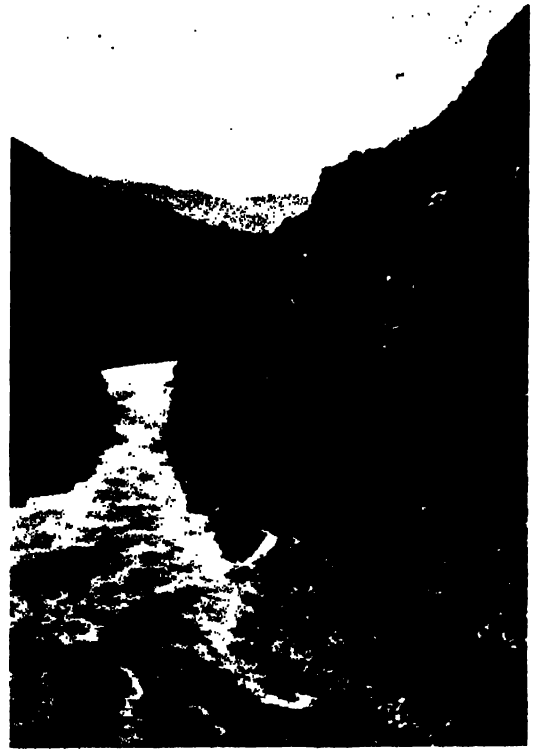
ঝিলমের গর্জ

অমূল্য সম্পদ এমন চমৎকার ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, তার জন্য মার্শাল সাহেবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকা যায় না। এখান থেকে বেলা ১১টায় রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে বেলা ২টা নাগাৎ শ্রীনগর যাত্রা করা যায়।

মোটরের ভাড়া সম্বন্ধে কিছু স্থির করা কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ মে ও সেপ্টেম্বরে ৮০৲ টাকায় ('টোল'

সমেত ব্রিটিশ সীমানায় ৩৬৮৹ও ডোমেলে ৯৲ এই ১২৬৮৹) পাওয়া যায়। মেলবাহী 'বসে' সিট ১৫, অন্যান্য 'বসে' সিট ৮ হতে ১২ এবং 12 seater পূরা 'বস্' ১০০ টাকায় পাওয়া যায়। জুলাইয়ে শ্রীনগর থেকে ফিরবার সময় পূরা

বারমুল্লা

মোটরকার ১৫ টাকায়, এমন কি পূরা বস্‌ও ১৫ টাকায় পাওয়া যায়। কাশ্মীরে দুইটি ভাল সময় মে ফুলের season, সেপ্টেম্বর ফলের season. ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিশেষতঃ পাঞ্জাব থেকে অনেকেই কাশ্মীরে যান এই সময়ে। মোটর-ওয়ালারা ভাড়া ঠিক করে যাতায়াতের। ফিরবার পথে যাত্রী পাওয়া কঠিন। কাজেই নাম মাত্র ভাড়ায় তারা যাত্রী নিয়ে ফেরে। সেই রকম জুনের শেষে বা অক্টোবরের শেষে যখন কাশ্মীর থেকে সকলে ফেরেন, তখন কাশ্মীরে যাওয়ার ভাড়া সেই অনুপাতে খুবই কম হয়।

পিণ্ডি হতে মরী ৩৭ মাইল, পথে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। এখান হতে পথ নীচে নামতে থাকে; কোহালা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সীমানা। দক্ষিণে দূরে ঝিলমের একটি অতি ক্ষীণ ধারা দেখা যায়; ক্রমেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোহালার কাছে ঝিলমের মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভয় হয়; পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাস্তা গিয়েছে; ১৫ ফিট নীচে ঝিলম যেন মদমত্তা মাতঙ্গিনীর মত উদ্দামবেগে ছুটে চলেছে। তারপরেই কোহালা ব্রীজ। কোহালায় ডাকবাংলো আছে, কোহালা-সেতু পার হ'লেই কাশ্মীর-রাজ্যের সীমানা, সেতু পার হ'য়ে একমাইল দূরে বরসালা ডাকবাংলো।

পরদিন প্রাতে সামান্য জলযোগ ক'রে যাত্রা করাই উচিত। প্রথমেই পড়ে দুলাই ডাকবাংলো; অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। তার পরেই ডমেল, এইখানে কাশ্মীর-রাজের "টোল" আপিস। এখানে কিশনগঙ্গা নদী ঝিলমে মিলিত হয়েছে। কিশনগঙ্গায় ব্রিটিশ-রাজত্বের সীমানা শেষ হ'য়ে গেল। ডমেল হ'তে ঝিলমের উভয় তীরই কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্গত। ডমেল থেকে উরি পর্য্যন্ত রাস্তা বড়ই বিপদজনক, ঘণ্টায় ১০।১৫ মাইল, এমন কি

ঝিলমের বাঁধ

অনেক জায়গায় ৪।৫ মাইলের বেশী জোরে যাওয়া যায় না। মোটরচালকের বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন, ষ্টিয়ারিং হুইলের সামান্য গোলমালে বিপদ ঘট্‌তে পারে।

রাস্তা বৃষ্টির জন্য প্রায়ই খারাপ হয়ে থাকে, অনেক জায়গায় ঝিলমের 'গর্জ' হাজার দেড়হাজার ফিট্ নীচে; সামান্য একটু ভুল হ'লেই ঝিলমে সমাধিস্থ হ'তে হয়। অনেক দুর্ঘটনায় মোটর বা মোটর-আরোহীদের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কিন্তু বিপদের ভয় যেখানে বেশী প্রকৃতি তাঁর সৌন্দর্য্যসম্ভার সেইখানেই সাজিয়েছেন বেশী করে।

হাউস বোট

রাস্তার এক একটা বাঁক যেই চোখে পড়ে মনে হয় যেন একখানা দৃশ্যপট বদলে গেল, কোন্‌টা বেশী সুন্দর বলা কঠিন হয়ে ওঠে। বরসালা থেকে উরি ডাকবাংলোয় চার-পাচ ঘণ্টায় পৌছানো যায়। এই রাস্তার বাংলোতে জন-পিছু তিন ঘণ্টার জন্য ।০, ২৪ ঘণ্টার জন্য এক টাকা ভাড়া দিতে হয়। তা ছাড়া ডিনার বা লাঞ্চ প্রভৃতির চার্জ্জ স্বতন্ত্র। উরি হতে ৯ মাইল দূরে মাহুরায় ইলেক্‌ট্রিক্যাল পাওয়ার হাউস, এইখানে কাঠের নলের (flume) মধ্যে দিয়ে ঝিলমের জল ছ' মাইল দূরে নিয়ে প্রপাতের সৃষ্টি করে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করা হয় এবং ৫৩ মাইল দূরে শ্রীনগর এই শক্তিতেই আলোকিত হয়। এর পর রাস্তা ঝিলমের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, একবার পাশে আসে আবার দূরে চলে যায়। দেড় ঘণ্টায়, বারমুল্লায় পৌছানো যায়। কাশ্মীর উপত্যকার আরম্ভ এইখানে, উন্মাদিনী ঝিলম এখানে শান্তমূর্ত্তি। তাই বারমুল্লা হ'তে খানেবল ১০২ মাইল ঝিলমে নৌকা চলে। অনেকে এইখানেই হাউস বোট নেন এবং উলার হ্রদের মধ্য দিয়ে শ্রীনগরে পৌছান। নৌকাপথে দুই-তিন দিনেই শ্রীনগর পৌছান যায়।

বারমুল্লা থেকে দেখা যায় ৩৫ মাইল দূরে হরমুখ পর্ব্বত ও ৭০ মাইল দূরে তুষারশীর্ষ বিরাট নাঙ্গা পর্ব্বত।

শ্রীনগরের ৫ মাইল দূর থেকে দেখা যায় চারিদিকে বাঁধা জলের মাঝে মাঝে উইলো গাছ।

শ্রীনগরের আয়তন দৈর্ঘ্যে, প্রায় ৫ মাইল। ঝিলমের বামে বসতি কম, দক্ষিণে বসতি খুব বেশী। এই যদি শ্রীনগর, তবে না জানি বিশ্রী নগর কি? শ্রীনগর দেখলেই মনটা দমে যায়। ইংরেজেরা অনুবাদ করেন City of the Sun। শ্রী কোথায় সূর্য্য হয়েছেন আমার জানা নেই। শ্রী হলেন তন্ত্রদেবী, যেমন শ্রীক্ষেত্র। এ নগরও যে এককালে তন্ত্রক্ষেত্র ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। চিত্রে ছাড়া শ্রীনগরের আর কোথাও সৌন্দর্য্য নেই। তবে নদীর উপর দু-একখানা বাড়ী মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাতে কাঠের উপর কারুশিল্পের কিছু নিদর্শন আছে। এখানকার বাড়ী অতি পলকা, ভিত পাথরের, কাঠের ফ্রেমে ইট বসান, ছোট ছোট দরজা ও জানালা; তিন-চার তলা বাড়ীই বেশী। এই শহরে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। জাপানের মত একটা ভূমিকম্পে শহরটা যদি ভূমিসাৎ হয়ে যায় তবেই শ্রীনগর সত্যিকার শ্রীনগরে পরিণত হইতে পারে। এমন আদর্শ নোংরা শহর পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

প্রশ্ন উঠ্‌বে তবে মানুষ এখানে আসে কেন? শ্রীনগর কাশ্মীর নয় ব'লে! শ্রীনগরকে বাদ দিয়ে "যে দিকে তাকাই আঁখি তোমার মহিমা দেখি।" কাশ্মীরের আকাশে বাতাসে, তৃণে-লতায়, জলে-স্থলে এমন সৌন্দর্য্য যে, বিশ্বে তার তুলনা নেই। ক্যামেরা সঙ্গে এনেছিলাম, দেখ্‌লাম একজন্মে ছবি তোলা শেষ হবে না, কারণ প্রকৃতি এখানে তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন। এদেশের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় মানুষের অত্যুক্তি অলঙ্কার পরাজিত, নতশির। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঋষিরা বলেছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," কাশ্মীর সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। এ দৃশ্য দেখলে আত্মা তৃপ্ত হয়, আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পদাবলীর ভাষায় বলা যায়, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।"

শ্রীনগরে সাতটি সেতু আছে। একটি পাকা, অন্যগুলি কাঠের তৈরি। প্রথম সেতু আমিরা কদল, কাশীর গোধুলিয়ার ন্যায়, তৃতীয় সেতু ফতে কদলের নিকট মহারাজ গঞ্জের বাণিজ্যের কেন্দ্র, সপ্তম সেতু সাফাকদল নিকটে একটি সরাই আছে তাতে ইয়ারখাণ্ড, বোখারা, লডক ও বালতিস্থান থেকে বণিকেরা আশ্রয় গ্রহণ করে।

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে গিলঘিট গিরিপথ, শ্রীনগর হতে ২৩০ মাইল। ঘোড়া বা ইয়াক ছাড়া এপথে অন্য যান অসম্ভব। গিলঘিট অতিক্রম করিলেই হাজারা ও আফগানিস্থানে যাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকে ইয়ারখাণ্ড শ্রীনগর হইতে ৭৭৭ মাইল। উত্তরে গুরাইস্ উপত্যকা (৭৩ মাইল)। কাশ্মীর সিন্ধু ঝিলম চিনাব ও রাভি দিয়ে ঘেরা, উত্তর-পূর্ব্বে মুস্তাক পাশ দিয়া চীনে পৌছান যায়। লে হইতে পিকিং ৪০০০ মাইল। কর্ণেল ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড এই পথ অতিক্রম ক'রেছেন।

কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরে নাঙ্গা পর্ব্বত, পূর্ব্বে হরমুখ, দক্ষিণে মহাদেও, অমরনাথ, দক্ষিণ-পশ্চিমে পিরপৈঞ্জল, তোষময়দান, উত্তর-পশ্চিমে কাজিনাগ (মার্থার-জাতীয় হরিণ শিকারের স্থান)।

এই সব স্থান অতি দুর্গম, অনেক স্থানে খাদ্য মেলে না, জ্বালানি কাঠও মেলে না। সামনে ছাগল ভেড়া চলে (দুধ ও মাংসের জন্য)। ঘোড়ার পিঠে ঘোড়ার খাদ্য মানুষের খাদ্য জ্বালানি কাঠ তাঁবু ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে তবে এ পথে চলা যায়। বদরী, কেদার ও কৈলাস, অমরনাথ ভ্রমণ করে মানুষ মুক্তির আশায়, এই সব স্থান ঘুরে বেড়াতে হবে কেবল প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত আনন্দে।

ইউরোপ থেকে মানুষ এসে গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর উঠতে চেষ্টা করছে, আর আমরা শিখা আন্দোলিত ক'রে উপদেশ দিচ্ছি, যবনের দ্বারা এ কাজ কি সম্ভবপর হতে পারে?—এ যে দেবাত্মা হিমালয়!

প্রকৃত কাশ্মীর শ্রীনগর শহরের বাইরে। প্রথম সেতু হ'তে মুন্সিবাগ ও সোনোয়ারবাগ পর্য্যন্ত

চীনার বাগ

ঝিলমের তীরে যে বাঁধ তাকে সিবিল লাইনস্ বা রেসিডেন্সি এরিয়া বলা হয়। সাহেবদের জীবনকে সুখময় করতে যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে পাওয়া যায়।

ডাল হ্রদের আয়তন দৈর্ঘ্যে চার মাইল, প্রস্থে আড়াই মাইল। পূর্ব্বে উত্থিয়ে পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে নাসিমবাগ ও হরিপর্ব্বত শ্রীনগর, দক্ষিণে নালা, চীনার বাগ ও রেসিডেন্সি। ডা., লরেন্স্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড ডাল্ হ্রদের বর্ণনায় সহস্রমুখ। সব সৌন্দর্য্যের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, তাঁদের মতে সুইস্ হ্রদের দৃশ্য ডালহ্রদের দৃশ্যের কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

ডাল্‌গেট প্রবেশ করে দুটি স্রোত পাওয়া যায়। দক্ষিণের স্রোতে অগ্রসর হ'লে প্রথমে পড়ে গাগরীবল্। শঙ্করাচার্য্য মন্দিরের পাহাড় বা তক্ত-ই-সুলেমান তার তীর থেকে উঠেছে। তার পরেই চশমাসাহি, হ্রদের

তীর হ'তে প্রায় এক মাইল দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর একটি প্রস্রবণ, তার জল সব চেয়ে হজ্‌মী। গাগরী-বলের পথ দিয়ে অগ্রসর হ'লে পাওয়া যায় নিষাৎ বাগ, (আনন্দ-কানন) মমতাজের পিতা আসফজার তৈরি। নিষাৎ বাগ সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। নিষাৎ বাগ থেকে ডাল হ্রদের বুকের উপর দিয়ে একটি রাস্তা আছে শ্রীনগর পর্য্যন্ত। এই রাস্তার দুটি পুল, তার নীচে দিয়ে ডানদিকে

শালামার বাগ

গেলে পৌঁছানো যায় শালামার (আনন্দ বাগ)। এটি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের হাতে তৈরি। শালামার সুন্দর কি নিষাৎ বাগ সুন্দর এ তর্কের মীমাংসা বড়ই কঠিন। রবিবারে এই দুই স্থানে প্রচুর লোক-সমাগম হয়। কারণ ফোয়ারাগুলি কেবল ঐদিনই খোলা হয়। শালামার থেকে তিন মাইল দূরে হারওয়ান হ্রদ। কাঠের পাইপ দিয়ে শ্রীনগরে বারো মাইল দূরে তার জল সরবরাহ হয়।

শালামার থেকে ডাল হ্রদের তীরে অগ্রসর হ'লে এক মাইল দূরে তেল্‌বল নালা, প্রায় দু-মাইল লম্বা, দু-পাশে উইলো গাছ। আমার এক ফরাসী বন্ধু বলেন, বুয়েনস্-য়্যারে ঠিক এমনই দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এখানে প্রচুর মাছ থাকায় অনেকেই, বিশেষতঃ সাহেব-বিবিদের, ছিপ-হাতে দেখা যায়। কাশ্মীরীরাও বর্শা দিয়ে মৎস্য শীকার করে। এমন স্থানে হত্যাক্রীড়া বড়ই অশোভন। তেলবল নালা ছেড়ে পশ্চিমের দিকে গেলেই পড়ে নাসিমবাগ—শ্রীনগরের আশেপাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান। চীনারের ঘন বন, তার পাশেই তাঁবু খাটিয়ে বাস করবার জন্য ষাটটি স্থান ভাগ করে দেওয়া। আকাশে নীল, পাহাড়ে নীল, পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফ, সাম্‌নে ডালের কালো জল. চীনারের বন সবুজ নীচে ঘাস সবুজ। সোনালী রোদের আলো, রুপালি জ্যোৎস্না—সব মিলিয়ে যেন মায়াকানন সৃষ্টি করেছে। সেই স্রোত ধরে দক্ষিণে শিকারা চালালে প্রথমেই চোখে পড়ে হরি পর্ব্বতের কেল্লা (এখানে কালীবাড়ী আছে) তারপর নগিনা বাগ (যেখানে সাহেবেরা স্নান করেন), তার পরেই রণওয়ারি, স্রোতস্বিনীর দুইতীরে—বসতি ভেনিসের বর্ণনা মনে পড়ে। ভেনিসের বিরাট প্রাসাদ এখানে নেই, কিন্তু জলে স্রোত আছে, লাজনম্র উইলো জলের উপর দাঁড়িয়ে জলকে ছুঁতে চাইছে।

ডাল হ্রদের একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখা যায়,—ভাসমান সবজী বাগ। হ্রদে জন্মায় উইলো, এর নীচে হাউস বোট বাঁধা হয়। তা' ছাড়া পদ্ম, শালুক, পানফল এবং এক রকম 'রীড' (শরের মত) জন্মায়। এই রীড একত্র জট্ পাকিয়ে জলে ভাসে। উপরের ভাগ কেটে নিয়ে হয় মাদুর তৈরি। নীচের অংশ জলে ভাসে, তার উপর হয় সবজী বাগ। জলের নীচে এক রকম শেওলা আছে, তা জট্ পাকিয়ে তোলা হয়, এই হ'ল গ্রীণ ম্যাণিওর। তাতে কিছু মাটি দিয়ে তাল পাকিয়ে তার উপর বীজ দিয়ে এই ভাসমান রীডে এ বসিয়ে দেওয়া হয়। দেখলাম এখানে সোনা ফলে। লাউ, কুমড়া শশা, টমেটো, তরমুজ, খর-মুজের গাছ বেশী বড় হয় না, কিন্তু তার গাঁটে গাঁটে ফল ধরে। শুনলাম এই ভাসমান্ 'রিড' মেপে বিক্রী হয় এবং কৃষকেরা এগুলি নিজেদের এলাকায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এ দেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। নবেম্বর থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এই সময় কাশ্মীরীরা কারুশিল্পে জীবিকা অর্জ্জন করে। এপ্রিলে হয় বসন্তের আরম্ভ, জীবনের উন্মেষ, বাদাম গাছে ফুল ফুটে

ওঠে। বাদাম গাছে যখন ফুল ফোটে তখন কাশ্মীরীরা উৎসব করে। সে ফুল যে কি সুন্দর, তা না দেখলে বোঝা যায় না।

কাশ্মীরে বাড়ী পাওয়া কঠিন। বাঁধের ধারে যে-সব দোকান আছে তার উপরের ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একা এলে বা অল্পদিনের জন্য এলে 'প্রতাপ ভবন', ধর্ম্মশালা, খালসা হোটেল, বা গ্র্যাণ্ড হিন্দু হোটেলই প্রশস্ত। সাধুদের জন্য বাঙ্গালীদের একটি মঠ আছে, নাম 'নারায়ণ মঠ।' কাজেই হাউস বোট ভাড়া নিতে হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে কিনার্ড নামে একজন ইংরেজ এই হাউস বোটের প্রচলন করেন। এখন এর সংখ্যা শুনতে পাই প্রায় দুই হাজার। এই বোটে থাকে একটি করে বসবার ও খাবার ঘর, ভাঁড়ার, দুখানি শোবার ঘর ও দুটি বাথ-রুম। তিনখানি বেড-রুম যে বোটে আছে, তাতে একটি ভিজিটর্স্ পর্চ্চ থাকে এবং জাহাজের কেবিনের মত শয়ন-ঘরগুলির সামনে একটি চেন থাকে। একটি শয়নঘর-ওয়ালা ছোট বোটও পাওয়া যায়। পাঁচটি ঘরের বোটের ভাড়া মাসিক ১০০৲ হ'তে ২০০৲। হাউস বোটের সঙ্গে থাকে একটি রান্নার নৌকা ও একখানি শিকারা এবং শিকারা চালাবার জন্য একজন লোক পাওয়া যায়।

এ ছাড়া ডুঙ্গা নৌকা আছে, মাদুর দিয়ে ঢাকা আসবাবপত্র সমেত ডুঙ্গা পাওয়া যায়। তাতে দুই বন্ধু বা স্বামী-স্ত্রী স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। ডুঙ্গার এক পাশে রাঁধবার স্থান। ভাড়া মাসিক ৩০৲ হ'তে ৫০৲।

বোট বা ডুঙ্গা নানাস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। যাঁরা বহু পরিবার এবং ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেন, তাঁদের উচিত বোট বাঁধা ঝিলমের তীরে আইবিগুজরে, সোনোয়ার বাগে, মুন্সী বাগে বা চীনার বাগে। এই সব স্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খুব সহজেই পাওয়া যায়। যাঁরা নির্জ্জনতা ও প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান তাঁরা ডাল হ্রদের গাগরী বলে, নিষাৎ বাগে, শালামার বাগে বা নাসিম বাগে বোট রাখতে পারেন। কাশ্মীর-রাজ বোট রাখবার জন্য ঘাট নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, পাশেই ইলেকট্রিক লাইন আছে, চার আনা

পাহালগামে লিদার নদী

জমা দিলেই আলো পাওয়া যায়। ঘাটে লাগালেই পাঁচ ছয় টাকা ট্যাক্স দিতে হয়, একদিন বা একমাসে কোন তফাৎ নাই। নির্দ্দিষ্ট ঘাট ছাড়াও বোট লাগান যায়, তাতে ট্যাক্স দিতে হয় না; তবে আঘাটায় বিজলি বাতি পাওয়া যায় না।

যাতায়াতে শিকারাই সব চেয়ে আরামের। টাঙ্গা বা মোটরে প্রচুর ধূলা খেতে হয়। শিকারাগুলি এমন সুন্দর সাজান যে, মনে হয় যেন কোন নবাবকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সাজান হ'য়েছে। শিকারা তৈরী 'যুগলের' জন্য, তবে চার-পাঁচজন যাওয়া যায়। শিকারার ভাড়া প্রতিদিন (আট ঘণ্টা) আট আনা এবং একজন মাঝির মজুরী প্রতিদিন বার আনা। সাধারণতঃ তিনজন হাঁজী প্রয়োজন হয়। এই সব নৌকাচালকদের মান্‌জি (মাঝি) বা হান্‌জী (হাঁজী) বলা হয়।

মে মাসের প্রথমে বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে কাশ্মীরে আসাই উচিত। মে'র প্রথমে কাশ্মীরের পথে বানিহালে

(৯০০০ ফিট্) বরফ জমে থাকে, এবং অক্টোবরের শেষে বানিহাল পাশে বরফ পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাশ্মীরে কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে লিখলে বা কোন এজেন্সি—যথা, কোবার্ণস্ এজেন্সী লিখলে হাউস বোট ঠিক ক'রে খানেবলে (শ্রীনগর হ'তে ৩১ মাইল) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জম্মু হ'তে খানেবল
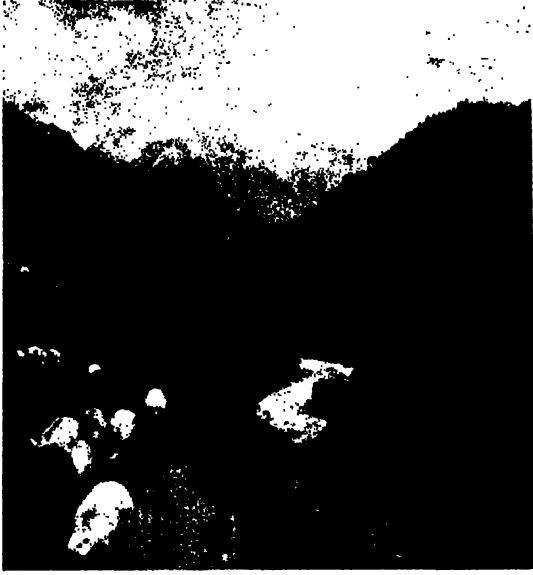
কোলাহাই গ্লেসিয়ারের পথে

১৭২ মাইল মোটরে এসে খানেবলে হাউস বোটে আশ্রয় গ্রহণ। হাউস বোট, রান্নার নৌকা শিকারা চালাইতে স্রোতের বিমুখে আট দশজন এবং স্রোতের মুখে ছ'জন হাঁজী দরকার। খানেবল থেকে শ্রীনগর তিনচার দিনে পৌছানো যায়। ঝিলমের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই নৌকাপথে না গেলে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

শ্রীনগরে জুন, জুলাই আগষ্ট অত্যন্ত খারাপ। ছারপোকা ও মশা প্রচুর পাওয়া যায়। উপত্যকার চারপাশেই উঁচু পাহাড়, কাজেই হাওয়া কম। গ্রীষ্মে রাত্রে বাইরে শুতে হয়। শ্রীনগরের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, জলও বেশ হজমী বলা চলে না। চশমায়সাহী হ'তে সপ্তাহে দু-দিন জল আনিয়ে নিতে পারলে খুবই ভাল হয়। কাশ্মীরে স্বাস্থ্যান্বেষী এবং শান্তিপ্রিয় সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষের আদর্শ স্থান পাহালগাম। শ্রীনগর হতে ৬১ মাইল, মোটরে যাওয়া যায়। পাহালগাম হতে অমরনাথ তীর্থ মাত্র ৩১ মাইল, পায়ে হেঁটে, ডাণ্ডি বা ঘোড়াতে তিন দিনে পৌছায়। অমরনাথের উচ্চতা ১৩,৫০০ ফিট্। সৌন্দর্য্যপিপাসু, রসিক, প্রেমিক ও ভগবদ্‌ভক্তের আদর্শ তীর্থ অমরনাথ। শ্রাবণী পূর্ণিমায় মেলা হয়। মনে হয় যিনি অমরনাথ দর্শন করেছেন, পৃথিবীতে তাঁর দেখবার আর কিছু নেই। সেইজন্য প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের জীবনের সাধনা হওয়া উচিত একবার এই পরম তীর্থ দর্শন। পাহালগাম হ'তে শেষনাগ নদীর (অন্য নাম পূর্ব্ব লিদার বা দুধগঙ্গা) তীরে চন্দনওয়ারীর পথের যে সৌন্দর্য্য তাহার বর্ণনা অসম্ভব। কোথাও বরফের সেতু দিয়ে পার হ'তে হয়। চন্দনওয়ারী হ'তে শেষনাগ হ্রদ ৪ মাইল, ওয়াজওয়ান ৯ মাইল। শেষনাগ ও ওয়াজওয়ান অঞ্চলে একরকম ফুল ফোটে তার গন্ধ এমন তীব্র যে, অনেকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন, সেইজন্য জনশ্রুতি যে, ঐ ফুল বিষাক্ত। ওয়াজওয়ানে ঝড় হাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ওয়াজওয়ান হ'তে পঞ্চতরণী ৮ মাইল, পঞ্চতরণী হ'তে অমরনাথ ৫ মাইল। অমরনাথের পথ খুবই বিপদসঙ্কুল, তবে শ্রাবণী পূর্ণিমাতে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য কাশ্মীর-রাজ যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করেন।

পাহালগাম হ'তে কোলাহাই-এর বরফ জমা নদী গ্ল্যাসিয়ার যাওয়া যায়। সঙ্গে তাঁবু নিতে হয়। পাহাল-গাম হ'তে আড়ু ৭ মাইল, আড়ু হ'তে লিদারভাট ৭ মাইল—এই ১৪ মাইল একদিনে পৌছানো যায়। লিদারভাটে তাঁবুতে রাত্রি যাপন। লিদারভাট হ'তে কোলাহাই ছ' মাইল, প্রাতে বা'র হ'লে সন্ধ্যায় লিদারভাটে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাত্রি যাপন। যাতায়াতে তিন দিন লাগে। লিদারভাটে প্রচুর ভালুক। রাত্রে তাঁবুর চারিপাশে আগুন জেলে রাখা প্রয়োজন। কোলাহাইকে তুষারের সমুদ্র বলে। এইখানেই লিদার নদীর উৎপত্তি, ৬০ মাইল দূরে ঝিলমে ইহার সমাপ্তি। শেষনাগ নদী পাহালগামে লিদারে মিশেছে। এই দুই নদীর যে কত রূপ এবং এর সৌন্দর্য্য যে কি মনোরম বর্ণনা করা যায় না।

পাহালগামের চারিপাশে পাইন, খরপ্রবাহিণী লিদার নদীর কলধ্বনি তুষার-কিরীটি গিরিশ্রেণীর গুরুগাম্ভীর্য্য মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এমন সুস্বাদু ও হজ্‌মী জল দুর্ল্লভ। পাহালগামের বিশেষত্ব বেলা ৯টা হ'তে ৫টা পর্য্যন্ত একটা হাওয়া চলে ঠিক সমুদ্রের তীরে হাওয়ার মত।

এখানে বলা উচিত যে, এই-সব ভ্রমণে ঘোড়াই প্রশস্ত। অবশ্য যাঁদের পায়ের ও বুকের জোর আছে তাঁরা পায়ে হেঁটেই আনন্দ পাবেন। যাঁদের সে সামর্থ্য নেই তাঁদের অশ্বারোহণ ছাড়া গতি নেই। অশ্বারোহণের নাম শুনে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। এই পার্ব্বত্য ঘোড়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দুর্গম পথে এই-সব ঘোড়া এত সাবধানে চলে যে, অবাক হ'য়ে যেতে হয়। এই-সব স্থানে দু-পেয়ে মানুষের চেয়ে চার-পেয়ে জানোয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হয়।

শ্রীনগর হ'তে পাহালগামের পথে কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ৫ মাইল দূরে পাণ্ড্রেথানের (প্রতিষ্ঠানপুর) মন্দির। আট মাইল দূরে পাম্পোর—এইখানে স্যাফ্রনের চাষ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পাম্পোরের কয়েক বিঘা জমি ছাড়া আর কোথাও জাফ্‌রানের চাষ হয় না। জমিগুলি 'বরফির' মত কাটা, অক্টোবর মাসে এক সপ্তাহ অন্তর দুইবার ফুল ফোটে। তখন কাশ্মীর উপত্যকা জাফ্‌রানের সুগন্ধে ভরপূর হ'য়ে ওঠে। এই জাফ্‌রান দেখ্‌তেই অনেকে কাশ্মীরে আসেন। ১৭ মাইল দূরে অবন্তীপুর। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীর-রাজ অবন্তীবর্ম্মন যে প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করেন তার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কাশ্মীর স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ২৮ মাইল দূরে বিজবিহারা (মনে হয় ব্রহ্মবিহারের অপভ্রংশ) অনেক মন্দির আছে। এখানে ঝিলম তীরে একটি চিনার গাছ আছে, তার পরিধি ৫৬ ফুট মাত্র। ৩৪ মাইল দূরে অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদ। কাশ্মীরী ভাষায় চশ্‌মা ও নাগ অর্থে প্রস্রবণ। নাগপূজার সহিত এই-সব প্রস্রবণ জড়িত; অনন্তনাগ তীর্থক্ষেত্র, পাণ্ডা আছেন এবং জলে অনেক মাছ আছে, পাশেই একটি গন্ধকের প্রস্রবণ আছে, কিন্তু এমন ময়লা করে রাখা যে জল ছুঁতে ঘৃণা হয়। তবুও ধর্ম্মপ্রাণ ও চর্ম্মরোগী মানুষ তাতে স্বচ্ছন্দে স্নান করে। ইস্‌লামাবাদ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে গব্বা নামক এক রকম পশমে তৈরি আসন ও গালিচা বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। এখান হ'তে ৬ মাইল দূরে আচ্ছেবল। চারিদিকে জলধারার কলস্বরে প্রাণ আকুল করে। ৩৮ মাইল দূরে মটন্‌কুণ্ড; তার ১ মাইল উপরে বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড-মন্দির। ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। কাশ্মীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ললিতাদিত্য ৭ম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য এমন মনোহর স্থান নির্ব্বাচন পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও হয়নি। আপনা হইতেই মনে পড়ে—

'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা' মাথা আপনা হতেই নত হয়ে পড়ে অনন্তের উদ্দেশে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

রাজমাতা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

জেলা কোর্টের নামজাদা মুহুরী হরিশবাবু যেদিন এ পৃথিবীর হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া উর্দ্ধ জগতে উচ্চতর পদের জন্য সহসা প্রয়াণ করিলেন, তখন তাঁহার বিধবা অনেকগুলি পুত্রকন্যা ও যৎসামান্য অর্থ লইয়া সত্যই জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। সাত পুত্র ও চার কন্যা। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স কুড়ি, এবং একমাত্র আশার বিষয় এই যে, সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ব্যতীত আর সকলেই বিবাহিত। বড়টি বিবাহ শেষ করিয়া বৈধব্য আশ্রয় করিয়াছে এবং মায়ের কাছেই বাস করিতেছে।

দূর এবং নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনেকেই আছেন; কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তির পূর্ব্বে যেরূপ উষ্ণ নিঃশ্বাস ও সজল সহানুভূতির অভিষেকে সহায়হীন বিধবার অন্তরে ক্ষীণ আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, কাজকর্ম্ম চুকিয়া গেলে তেমনি একযোগে অন্তর্দ্ধান করিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যথার্থই জ্ঞাতি তাঁহারা। সুখ-সম্পদের মধ্যে চিরকাল পাশে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেও, দুঃখ ঝঞ্ঝায় মাথা পাতিবার সহিষ্ণুতা তাঁহাদের নাই।

প্রতিবাসীরা সান্ত্বনা দিল, "ওপর পানে চেয়ে বুক বাঁধ মা, তিনিই এদের মানুষ করে দেবেন। ষেটের সাতটি ছেলে মানুষ-মুনুষ হয়ে উঠুক—তোমার ভাবনা কিসের? ছিলে রাজরাণী, হবে সাত রাজার মা"

যে তৈলবিন্দু সঞ্চয় করিয়া সংসার-চক্র নিঃশব্দে সুশৃঙ্খলে চলে—অভাব শুধু তাহারই। কর্ত্তা সুবিবেচনা করিয়া কয়েক বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছেন—তাহাতে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের দুঃখ নাই; কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহও ৮।১০ বৎসর পরে দিলেই চলিবে; কিন্তু ভাবী রাজমাতা হইতে হইলে সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সে অর্থ আসে কোথা হইতে? জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল মাকে বলিল, "বি-এ-টা আর দিতে পারলুম না, মা, চাক্‌রীর চেষ্টাই দেখি।"

মা একবারমাত্র ক্ষীণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আর দুদিন না-হয়—" পুত্র বলিল 'অবস্থা তুমিও জান—আমিও জানি। আর পাশ করেই বা লাভ কি? সেই তো চাকরী খুঁজে মরতে হবে।"—বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জননীও দীর্ঘনিঃশ্বাসে সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

মেজ শিশিরের পড়াশুনায় কোনকালেই মনোযোগ ছিল না। খাতা পেন্সিল বই বহিয়া, শুধু বাপের তাড়নায় স্কুলে হাজিরা দিত। এক্ষণে মাথার উপর শাসনের বেত্রখানি অন্তর্হিত হইতেই ঘরের একপ্রান্তে বইখাতা ফেলিয়া মাকে আসিয়া জানাইল,—ওসব কার্য্য তাহার দ্বারা হইবে না। সে বরং কোন দোকানে থাকিয়া ব্যবসার মূলসূত্র অনুসন্ধান করিবে।

জননী কোন উত্তর না দিয়া চৌদ্দ বৎসরের পুত্র অরুণের মুখের পানে হতাশাভরে চাহিলেন।

অরুণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বড়-দা ত চাক্‌রী করবে মা, আমি পড়বো। দোহাই তোমার, স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ো না।"

মা কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ললাটে স্নিগ্ধ চুম্বন আঁকিয়া দিলেন।

আর চারিটি নিতান্ত ছোট। কেহ পঞ্চম শ্রেণীতে, কেহ সপ্তম শ্রেণীতে, কেহ বা স্বরবর্ণের এবং সর্ব্বকনিষ্ঠটি মায়ের কোল পূর্ণ করিয়া আদর-আব্দারের,—পাঠ লইয়া থাকে। তাহাদের পানে চাহিয়া ভাবী রাজমাতা একটি ব্যথাভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমল অনেক চেষ্টা করিয়া, সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে, একটা মার্চ্চেন্ট আপিসে অল্প মাহিনার একটি চাকুরী পাইয়াছে। নিজের খরচ চালাইয়া মাসে মাসে সে পনেরটি টাকা বাটী পাঠাইয়া দেয়।

শিশির কিছুদিন দোকানে যাতায়াত করিয়া ব্যবসায়ের

মূলসূত্রানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া সখের থিয়েটারের দলে ঢুকিয়াছে। সংসারের পানে সে চাহিয়াও দেখে না। সময় বা অসময়ে হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া দু-বেলা আহার সারিয়া যায় এবং দীর্ঘ দিনমান ও রাত্রি বাহিরেই কাটাইয়া দেয়। উপার্জ্জনের অনুযোগ করিলে সাত ভাগের একভাগ জমি দেখাইয়া মাতাকে বুঝাইয়া দেয়—এই অন্নের গ্রাস তার ন্যায্য পাওনা।

অরুণ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করে। সংসারের দিকেও তার টান আছে। দশমীর রাত্রিতে নিজের জমানো দু-এক পয়সা দিয়া মায়ের জলখাবারের মিষ্টান্ন কিনিয়া আনে, একাদশীর দিন তাঁহাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেয় না। ভাইদের আদর করে, পড়া বলিয়া দেয়।

সকলেই বলে, "এই ছেলেই তোমার সকল দুঃখ দূর করবে।"

মা অন্তর্যামীকে ডাকিয়া মনে মনে বলেন, "রাজরাণী হতে চাই না, ঠাকুর! তুমি শুধু এদের বাঁচিয়ে রেখো।"

জ্যেষ্ঠকন্যা মেনকা সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। হাঁড়ি হেঁসেল ভাঁড়ার সমস্তই তার জিম্মায়। ভাই-বোনদের খাওয়ার পরিচর্য্যা অল্প খরচে নিত্যনূতন ব্যঞ্জনের আস্বাদন, রোগে সেবা, রোদনে সান্ত্বনা, সমস্তই তাহার নিপুণ করের স্পর্শে ও স্নেহ সুকোমল অন্তরের সান্নিধ্যে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়।

মধ্যমা উষা বিবাহের পর সেই যে শ্বশুরবাড়ী প্রস্থান করিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর পিত্রালয়ে আসে নাই। বিবাহের সময় দেনাপাওনার কি সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি না-কি ঘটিয়াছিল—তাহারই ফলে তাহার পরমাশ্রয়ের সকল পূজনীয় ব্যক্তিরাই এই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন কি পিতার মৃত্যুর পরও সে ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

তৃতীয়া রমার বিবাহ কিন্তু অনেক দেখিয়া-শুনিয়া সৎ গৃহস্থের ঘরেই দিয়াছিলেন। মাত্র দুই বৎসর হইল এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষই যথাসাধ্য সাধ-আহ্লাদ করিয়া সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে রমা বড় কান্নাটাই কাঁদিয়াছিল। রমার শ্বশুর নিজেই অভিভাবক হইয়া কাজ-কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দেন নাই। রমার স্বামী পশ্চিমে কোথায় চাকরী করে।

ছোট উমা খেলাঘর বাঁধিয়া—পুতুলের বিবাহ দিয়া, সই গঙ্গাজল, বকুলফুলের সঙ্গে হাসি-কান্না, কলহ-প্রীতির চর্চ্চা করিয়া এইভাবে তাহার ভাবী জীবনকে সত্যকার সংসারের জন্য তৈয়ারী করিতেছিল। তাহার খেলাঘরে পুতুলের বিবাহ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ভাইগুলি হইতে বড় দিদি পর্য্যন্ত সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া কাঁকরের চাউল, কাল-কাসুন্দা ফলের বীজের ডাউল ও নানাপ্রকার পাতার তরকারী পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। আহারান্তে দক্ষিণার ব্যবস্থা করিতে সে ভুলিত না। কয়েক খণ্ড খোলামকুচি ঘসিয়া ঘসিয়া পয়সার আকারে তৈয়ারী করিয়া রাখিত।

বৃহৎ সংসার কিন্তু দিনে দিনে অচল হইয়া উঠিতেছিল। শিশির বাড়ীতে শুধু যখন-তখন ভোজন করিয়া যাইত না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পয়সাও জোরজবর-দস্তি করিয়া আদায় করিত।

মেনকা বলিত, "হাঁ রে শিশির, সংসারের এই অবস্থা—তুই একবারও ভাবিস্ না। কমল সেই কোথায় না খেয়ে না প'রে দুঃখে কষ্টে রোজগার ক'রে ১৫টি টাকা পাঠায়, তাই না চলে?" শিশির উত্তর দিত,—"ইস্—তাতেই যেন চলে! জমির ধান হয় না? তা থেকে কিছু বেচে পয়সা জমালেই পার। দাও চার আনা আজ একজনকে দিতে হবে।"

তর্কবিতর্ক করিয়া কোন ফল নাই, দিতেই হইত। মেনকা রাগ করিয়া দু-এক দিন পয়সা দেয় নাই, ফলে ঘরের দু-একখানা বাসন বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য অন্তর্হিত হইয়াছে! ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের মত উহার নিত্য দৌরাত্ম্য এইভাবেই অভাবগ্রস্ত সংসারের সারা দেহে যন্ত্রণা ও দুঃখের সৃষ্টি করিত।

সেদিন এগারো বছরের বালক বিমলকে অরুণ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে করিতে বাড়ী লইয়া আসিল। বিমল উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে করিতে উঠানের

ধূলায় লুটাইয়া পড়িল; অরুণ তাহার পিঠের উপর সপাসপ্ বেত চালাইতে লাগিল। মা ভগ্ন গৃহের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া নীরবে এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। মেনকা ছুটিয়া আসিয়া অরুণের হাত হইতে বেতগাছা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "করছিস্ কি অরুণ? মেরে ফেলবি নাকি?"

অরুণ চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যাঁ,—খুন করব। দাও বেত।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন সে বেত লইতে যাইবে, অমনি দাওয়ায় দণ্ডায়মানা জননীর নীরব নিথর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। কি করুণ বেদনা ও অসহায় মমতা তাঁহার ছুটি আয়ত নয়নের সজলস্নিগ্ধ চাহনিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কি মর্ম্মস্পর্শী মৌন অনুযোগ তাঁহার মুখের প্রতি রেখাটিতে সুস্পষ্টরূপে আঁকা!

দ্রুতপদে সে মায়ের নিকটে আসিয়া দুই হাতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিল, "মা, বিমলের এমন মতিগতি কেন হ'ল? ক্লাসের ছেলেদের খাতা, পেন্‌সিল, বই, কলম রোজই সে চুরি ক'রতো। আজ হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। মাষ্টার-মশায় তাকে কিছু না ব'লে আমায় ডাকিয়ে এনে বললেন, "ছি! তোমার ভাই এমন! একে শাসন ক'রো! মা, আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল।"

মেনকা বলিল, "কই বাড়ীতে ত খাতা, পেন্‌সিল চুরি করে আন্‌তে দেখিনি!"

অরুণ বলিল, "রোজকে রোজ দোকানে বেচে ফেল্‌ত যে।"

মেনকা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "বটে! এরই মধ্যে চুরি বিদ্যে!"

—"তা পয়সায় ওর এত কি দরকার?"

অরুণ বলিল, "ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখ, বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখনও ছুটো সিগারেট রয়েছে।"

অসহ্য রোষে মেনকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া হাতের বেতগাছি আন্দোলিত করিল।

বিমল ছুটিয়া পলাইল।

মেনকা বলিল, "মেজটাই সবগুলোর মাথা খাবে দেখছি। এখনও বল্‌ছি মা, ওটাকে আর বাড়ী ঢুক্‌তে দিয়ো না।"

মা কোন উত্তর না দিয়া অরুণের হাত ধরিয়া নীরবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় শিশির বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল, "এই অরো, বিমলকে মেরেছিস্ কেন?"

পাঠ-নিরত অরুণ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই মেনকা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "বেশ করেছে, মেরেছে। গুণের নিধি ছেলে বই-খাতা চুরি ক'রে সিগ্‌রেট ধরেছেন!…বিদ্যে শিখছেন!"

শিশির উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তাই ব'লে এমনি ক'রে মারে? ছোঁড়াটাকে সারাদিন না খেতে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছে, যেন তাঁদেরই বাবার বাড়ী?"

দারুণ অপমানে মেনকার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে-ও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "বেরো বল্‌ছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা কোথাকার! যেমন গোল্লায় গেছিস আপনি, তেমনি গোল্লায় দিবি সব্বাইকে! মুখের আটঘাট নেই!"

শিশির উঠান হইতে একগাছা মোটা সজিনার ডাল তুলিয়া লইয়া কহিল, "বটে! আমি দূর হব? দেখি কে কাকে দূর করে?"

অরুণ বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন মা—স্থির-গম্ভীর প্রতিমার মত!"

এবার তিনি কথা কহিলেন, "শিশির চুপ কর্ বল্‌ছি, নইলে আমাকেই এর ব্যবস্থা ক'রতে হবে।"

স্বল্পভাষিণী জননীর মুখে এমন দৃঢ়শাসনের স্বর শিশির জন্মাবধি শোনে নাই। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে উত্তপ্ত স্বরে কহিল, "কি ব্যবস্থা ক'রবে শুনি? বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না?"

জননী দৃঢ়গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাই। তোমরা জান না বাড়ী আমার নামে, জমিও আমার নামে। আমি ইচ্ছে ক'রলে—" শিশির বলিল, "বেশ, তোমার জমি বাড়ী বুকে ক'রে তুমি প'ড়ে থাক। আর যদি ও-বাড়ীতে পা দিই ত আমার অতিবড়

দিব্যি রইল। একেও আমি নিয়ে চল্লুম। তোমাদের মার খেয়ে ও এখানে থাকতে পারবে না। যাত্রার দলে গেলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে। তুমি মা নও—রাক্ষসী। নৈলে, খাবার সময় ছেলেকে এতবড় কথাটা বলতে পারলে?”

বিমলকে লইয়া শিশির চলিয়া গেল।

অরুণ দেখিল মায়ের দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। নিষ্পলক নয়ন মেলিয়া তিনি পুত্রের গমন-পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

সে কহিল, “মা, মেজদাকে ডাকি।”

মা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন।

মেনকা বলিল, “কিন্তু মা, বিমলটার মাথাও যে খাবে, হতভাগা।”

মা বলিলেন, “অনেক দিনই ও নিজের মাথা নিজে খেয়েছে, যাক্। তোরা খেয়ে নিগে যা।”—বলিয়া তিনি আপন শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রিতে মেনকা ডাকিল, “মা, ওমা—, ওঠ। একটু জল খাও।”

মা বলিলেন, “তুই খেয়ে আয় বাছা, আমি আজ আর খাব না।”

মেনকা মায়ের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, “তবে আমিও খাব না। ওমা! একি, সব বালিশটা যে ভিজে গেছে! মা, তুমি কাঁদ্‌ছিলে!”

মেনকার হাত দু'খানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মা বলিলেন, “নাড়ীর যে ওষুধ নেই, মা। স্নেহ অন্ধ, ভাল মন্দ সে বিচার করে না।” বলিতে বলিতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

২

কলিকাতার এক অপরিসর সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলির একটা জীর্ণ পুরাতন বাড়ীতে কয়েকজন সমঅবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া মেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চুণ বালি খসা—খোয়া-ওঠা, দোর-জানালা ভাঙা বাড়ীটিকে দেখিলে বহুদিনকার পরিত্যক্ত জনহীন পুরী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া ফুটিতে-না-ফুটিতে ইহার ধূম্রমলিন কক্ষগুলিতে মৃদু দীপশিখা জলিয়া উঠিয়া অদূরবর্ত্তী অন্ধকারকে মুখ ভ্যাংচায়। তাসের আড্ডা বা গান-বাজনার চর্চ্চাও নিয়মিত বসিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে প্রবল অট্টহাস্যধ্বনি বায়ুপ্রবাহে পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলে। যেমন ধ্বংসের মধ্যে মৃত্যুর প্রবাহ কখনও অতি ক্ষীণ, কখনও বা উদ্দামবেগে অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া যায়, তেমনি ইহারাও অর্দ্ধমৃত দুঃখকষ্ট জর্জ্জরিত প্রাণে সাধ-আহ্লাদের স্রোত বহাইয়া পৃথিবীর হাসি আলো উপভোগ করিতে করিতে সেই মহান্ মৃত্যুর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে থাকে।

কমলের এ হাসি-উল্লাস—এ আনন্দ-উচ্ছ্বাস ভাল লাগে না। এ যেন জীবনকে লইয়া এক ব্যঙ্গময় কাহিনীর সৃষ্টি! যাহারা সত্যকার হাসিতে পৃথিবীর বুকে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিয়া, মোটরে চড়িয়া, বাগানে বেড়াইয়া, প্রমোদ-ভবনে করতালি দিয়া জীবনটাকে হাল্কা ফানুসের মত উড়াইয়া চলিতে থাকে, তাহাদের পার্শ্বে এ হাসিকে মনে হয় যেন রিক্ততার ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, অন্তরের অভাব দৈন্য উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া ধনীর দুয়ারে কৃপাভিক্ষারী কাঙালের মত সঙ্কুচিত কর মেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

কমল একটি মাদুর টানিয়া লইয়া আপনার ক্ষুদ্র কক্ষের খোলা জানালার ধারে শুইয়া পড়িয়া ভাবে, এ যাত্রার শেষ কোথায়? উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—রঙীন আশা পাঠ্যাবস্থায় কত ভাবেই না কল্পনার পাখায় ভর করিয়া কোন্ সুদূরে উড়িয়া বেড়াইত, আজ ত্রিশ টাকা মাহিনার কর্ম্মের চাপে সে তাসের সৌধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুচারু জীবন-যাত্রার আশাই হইয়াছে আকাশ-স্বপ্ন—জীবনের সাধ-আহ্লাদ ত দূরের কথা। তাহার এই সামান্য উপার্জ্জনের পানে চাহিয়া বাড়ীতে ততগুলি প্রাণী ভবিষ্যতের সৌভাগ্য-স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। হায়রে আশা! মানুষকে ভুলাইতে, ভুল ভাঙাইতে তোমার মত কুহকী বিশ্ব-সংসারে যে দ্বিতীয় নাই! চিরদিনই কি এই সমস্যার সঙ্কটে পড়িয়া গতিহীন জীবনের বোঝা ভারাক্রান্ত করিতে থাকিবে? যেমন ওই বৃদ্ধ সুরেশবাবু ষাট টাকায় সকল

আশার সমাপ্তি করিয়া পেন্‌সনের জন্ম বসিয়া আছেন! যেমন ওই কুমুদবাবু, আশুবাবু পঞ্চাশ টাকার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন! যেমন হরিশঙ্করবাবু ৫ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির জন্ম বাজার হইতে পটোল কুমড়া শসা বেগুন কিনিয়া দেশের বাগানের জিনিষ বলিয়া বড়বাবুর শ্রীচরণ-কমলে তৈল নিষেক করিতেছেন! তেমনি কঠিন মূল্য দিয়া কি তাহাকেও উন্নতি কিনিতে হইবে? হায় উন্নতি! পয়লা তারিখ আসিতে-না-আসিতে খাবারওয়ালা, পান-ওয়ালা, বিড়ি সিগারেটওয়ালা, চা-ওয়ালা আসিয়া পাওনার জন্ম হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। আর দাঁড়ায় মোটা লাঠি হাতে দীর্ঘকায় কাবুলের অধিবাসী, আপিসের দারবান বা আপিসেরই কোন সহকর্ম্মী, তখন ওই ষাট টাকা দেখিতে দেখিতে কর্পূরবিন্দুর মত কোথায় উবিয়া যায়। যে দীর্ঘ দিনগুলি, ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যা মাতাপত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের নীরব আবেদন লইয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে, তাহার মিনতি পুরাইতে আবার ওই সব যমদূতের দুয়ারেই হাত পাতিতে হয়। সারাজীবন সমস্যার জাল বুনিয়া তাহারা সংসারে যে শান্তিনীড় রচনা করিতে চাহে, মৃত্যুর পর বংশপরম্পরায় সেই জাল উর্ণনাভের মত সূক্ষ্ম তন্তুতে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া বংশধরদের জন্য সেই একই দুঃখদৈন্য ও বিভীষিকা বিস্তার করিয়া দিনের দিন শান্তিকে মরীচিকার মতই দূরে দূরে সরাইয়া লয়।

কিন্তু কমলের আশ্চর্য্য বোধ হয়—পরেশের পানে চাহিয়া। তাহারই সম্মুখে বসিয়া সে কাজ করে, মাহিনা পায় ওই ত্রিশটি টাকা। সংসারে মাতা, পত্নী ও এক শিশুকন্যা বিদ্যমান। তথাপি ফিটফাট জামা কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি কাটিয়া, এসেন্স মাখিয়া বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই দিন কাটাইয়া দেয়। অনেক দিন সে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিয়াছে, একি সত্যই তৃপ্তি না আর কিছু? এ আনন্দ, না দুঃখকে অবহেলা করিতে আনন্দের প্রকাশ?

পরেশ তাহাকে কতদিন ঠাট্টা করিয়াছে। বলিয়াছে, "জীবন শুধু উপভোগ করিয়া কাটাও, জগতে সুখই তাই।"

কমল তর্ক করিয়াছে, "বাড়ীতে তোমার মা বউ মেয়েকে উপোসী রেখেও স্ফূর্ত্তি আসে?"

পরেশ হাসিয়া বলিয়াছে, "সে যখন বাড়ী যাব তখন সেখানকার ভাবনা। তা বলে এখানে কেন দুঃখ করি?" একটু থামিয়া বলিয়াছিল, 'আর মা বউ থাকলেই কি খুব মস্ত একটা মায়ার শেকলে মন প্রাণ বাঁধা থাকে? ওই ভাঙা আরসীটার সামনে দাঁড়াও দেখি কমলবাবু, দেখবে, আদর করে ও তোমায় বুকে ফুটিয়ে তুলবে। আবার ওখান থেকে সরে এস দেখবে ওর বুকে এক তিলও ছায়া নেই। এমনি সংসার!"

কমল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়াছিল, "অকৃতজ্ঞেই এই কথা বলতে পারে; প্রকৃত মনুষ্যত্ব যার আছে, সে কখনো মায়ের স্নেহে—"

বাধা দিয়া পরেশ বলিয়াছিল, "অবিশ্বাস করে না, কেমন এই কথা ত? কিন্তু ঠিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের নিক্তি যে আজও জগতে তৈরি হয়ে ওঠেনি, কমলবাবু, তাহলে দেখাতাম কোন্‌খানে তার ব্যবহার কতটা অযৌক্তিক। অর্থের আশায় অনেকখানি স্নেহ ভালবাসা পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু ওই আরসীরই মত। যতক্ষণ সে হাতের মুঠোয় ততক্ষণ তার অনুভব। অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ভালবাসা যার অক্ষয় কবচ, এ সব নাস্তিকের তর্ক তার হৃদয়ভেদ নাও করতে পারে।"—বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছিল।

কমল বুঝিয়াছিল, সে উচ্চহাসির অন্তরালে একটি স্নেহবুভুক্ষু অন্তরের অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস লুকানো। প্রীতির সম্পর্ক তাহার ছায়া স্পর্শ করে নাই বলিয়া মমতাকে সে স্বীকার করিতে চাহে না। তাই জীবনের সঞ্চয়কে একান্ত অবিশ্বাসে মূর্খের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অপব্যয়ের আনন্দকে চরম জয়পত্র-স্বরূপ দুঃখময় ললাটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাই কারণে অকারণে ভগ্ন মুকুরে ম্লান হাসিটুকু ফুটাইতে তাহার আগ্রহ অধিক।

পাশের ঘরে হরিশবাবুদের পাশার আসর ততক্ষণে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। দান এবং আড়ির উচ্চ কলরবে মাঝে মাঝে ভগ্নগৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ কাহারও নাই।

পাশার দানে জিৎবাজীটাই যেন সব চেয়ে বেশী কাম্য। জীবনের ক্ষেত্রে যার যতখানি অসাফল্য, এক্ষেত্রে তার উৎসাহ তত বেশী। মানুষ আশা করে যতখানি, নিরাশ হয় সেই পরিমাণে অনেক বেশী, এবং ভুলিয়া থাকিবার জন্য নিতান্ত বাজে বিষয় লইয়া মাতিয়াও উঠে তত শীঘ্র।

পরেশ বেশবিন্যাস শেষ করিয়া কমলকে বলিল, "শুয়ে শুয়ে কি ভাবছ, কমলবাবু? বোধ হয় বুড়োদের খেলার কথা।"

কমল সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এত রাত্তিরে বেরুবে না কি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া পরেশ বলিল, "বেশ চাঁদনীরাত, একটু ঘুরে আস্যাই যাক্ না। হৈ হৈ হট্টগোল ভাল লাগে না। যাবে? চল না।"

কমল বলিল, "না।"

পরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কেন ঘৃণা হয়? কিন্তু সত্যি বল্‌ছি ভাই কমলবাবু, এ বড় ভাল নেশা। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রেহাই দেয়।"

কমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "যার যাতে তৃপ্তি! দেনা ক'রে স্ফূর্ত্তি করার চেয়ে বিষ কিনে খাওয়া ঢের ভাল।"

পরেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, "বাহবা বাঃ! খাসা বলেছ, দেনা ক'রে খাওয়ার চেয়ে বিষ কিনে খাওয়া ঢের ভাল। বাঃ বাঃ চমৎকার! তাই ভেবেই ত এ পথ ধরেছি। তবে ত স্লো পয়জন, একটু একটু ক'রে সেই মহাপথেই এগিয়ে দেয়। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে নয়, আমোদের মধ্যে দিয়ে।"

একটু থামিয়া বলিল, "জানি ভাই, আমাদের সব পথ বন্ধ। ভাল লেখাপড়া জানি না, মোটা মাইনের চাকরি মিল্‌বে না। বাবা পয়সা-কড়ি তালুক-মুলুকও কিছু রেখে যাননি, যাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারি, স্ফূর্ত্তি ক'রতে পারি, জীবনের সার্থকতা খুঁজতে পারি। তবু যখন চল্‌তে হবে, তখন ভারগ্রস্তের মত বুড়ো থুড়থুড়ো হয়ে মুখ ভার ক'রে দুঃখকষ্ট সয়ে কেন চল্‌বো? এমনি বেপরোয়া স্ফূর্ত্তিই ত চাই।—চল, যাবে? একবারটি চল, দেখবে সত্যি স্ফূর্ত্তি হয় কি না।"

কমল বলিল, "দুঃখের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা থাক্‌লে মানুষ মানুষের মত চল্‌তে পারে, তা তোমার নেই। অসংযত আনন্দকেই জীবনের সার লক্ষ্য করেছ, তাই বিষ গলায় ঢেলে ভাবছো সুধা খাচ্ছি। কিন্তু সংযমে যে আনন্দ—"

পরেশ বলিল, "রাখ বাজি। আমি হারতে প্রস্তুত আছি। সংযমে কি আনন্দ আমায় বুঝিয়ে দাও। বুঝিয়ে দাও মনুষ্যত্ব কোন্ পথে? আমি ভালছেলের মত তোমার হাতে মাসে মাসে ত্রিশটি টাকা এনে দেব। বুঝিয়ে দিতে পার?"

কমল প্রশ্ন করিল, "তোমার দেনা কত?"

হাসিয়া পরেশ বলিল, "সে আঙুলের পর্ব্বে গুণে উঠ্‌তে পারবে না। বুঝতেই ত পারচ—ত্রিশটি টাকা মাইনে। মেসের খরচ, বাবুগিরি স্ফূর্ত্তি; তবু বাড়ীতে আজও পর্য্যন্ত উপার্জ্জনের একটি পয়সাও দিইনি। মাসকাবারে লম্বা লাঠি ঠুকে কাবুলী সেলাম জানায়, দারোয়ান হাত পাতে, সুরেশবাবু, সুবলবাবু খুচরা দু-চার আনার জন্য কত-না মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে দেন। উড়ে বেহারাটা পর্য্যন্ত সেদিন উড়ুনিখানা ছিনিয়ে নিলে। তার ওপর পানওয়ালা, খাবারওয়ালা, বিড়ি-সিগারেটওয়ালা ত আছেই।"

সে পরম আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "পারবে বন্ধু, আমায় টেনে তুল্‌তে? বল ত বাজি রাখি। আজ থেকে মদ সিগারেট বাবুয়ানী, স্ফূর্ত্তি সব ছেড়ে দিচ্ছি।"

শুনিতে শুনিতে কমলের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। এ যে নিরন্ধ্র অন্ধকারে গভীর পঙ্কে আকণ্ঠনিমজ্জিত রসাতলের যাত্রী!

কোন্ পল্লীর কুটীরচ্ছায়ে প্রতি প্রভাতে, প্রতি সন্ধ্যায় বেদনাময় আশা বুকে বহিয়া বৃদ্ধা মা তরুণী ভার্য্যা ইহার উন্নতি শ্রী কামনা করিয়া ভগবানের চরণে ঐকান্তিকী প্রার্থনা জানান! প্রতি নিঃশ্বাসে কি গভীর বিশ্বাসেই

না মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন! কিন্তু হায়! মানুষের ক্ষুদ্র আশার বর্ত্তিকা কি অদৃষ্টের আকাশে চিরদিনই এমনি অনুজ্জ্বল! ভবিষ্যতের লেখা পাঠ করিবার আলোটুকুও তাহা হইতে নিঃসৃত হয় না।

কমলের চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া পরেশ কহিল, "জানি, জানি আমি, তা কেউ পারবে না। এস আমার সঙ্গে, দেখবে হাজার হাজার লোক এই আমোদ-টুকুকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে আছে। তারা দরিদ্র, তারা রিক্ত, তাই আমোদও তাদের এমন অপর্য্যাপ্ত। আরে ছ্যাঃ, তুমি যে ভাবতেই লাগলে? থাক তবে।" বলিয়া কোণ হইতে ছড়ি লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

পার্শ্বের ঘর হইতে হরিবাবু হাঁকিলেন, "কে যায়? পরেশ বুঝি? ছোঁড়া একেবারে গোল্লায় গেছে। চল্লেন রাত দুপুরে এখন নটীর বাড়ী! একটু লজ্জা-সরমও নেই গা?"

শঙ্কর বাবু হাঁকিলেন, "ছ তিন নয়, ছ তিন নয়? এই ছ তিন নয়।" তার পরেই উচ্চহাস্যের রোল উঠিল।

৩

দুঃখের মধ্য দিয়াই দুটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কমলের ভগ্ন মেসে পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল আছে। পুরাতন দু-একজন গিয়াছে, নূতন কেহ বা আসিয়াছে, কিন্তু সকলের অদৃষ্টই একসূত্রে গাঁথা। সেই অভাব-অনটন, দেনাবর্জ্জ, একঘেয়ে দুঃখ-ক্লেশের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মনে হয়, বাছিয়া বাছিয়া বিধাতা ভারতবর্ষের মাটিতেই ইহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন জীবনভোর যন্ত্রণা সহিবার জন্য!

পরেশ তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। মেসে নামমাত্র সিট আছে, কোথায় থাকে, কি করে, কোন ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে মায়ের মিনতিভরা পত্র আসে এবং ভাঙা টিনের তোরঙ্গটার এক পাশে শুধুই আবর্জ্জনার স্তূপে জমা হইয়া উঠে। পরেশ হয় ত জানে না তার সব কথাগুলির কথা। হাসিয়া বলে, "জানি সব। আমার সুখকেন্দ্রে খোঁচা দেবার জন্য ওতে দুঃখের বিষাক্ত তীর লুকিয়ে আছে, তাই পড়তে ভয় হয়।"

কমলের মাও চিঠি দেন। তাহাতে দুঃখকষ্টের নামমাত্রও থাকে না। থাকে শুধু প্রবাসী পুত্রের কুশল-কামনা, স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ, আর সাবধানে থাকিবার স্নেহ-সতর্ক উপদেশ।

বাড়ী গিয়া সে স্বচক্ষে সেখানকার অভাব দেখিয়া যদি অনুযোগ করে, 'হাঁ মা, তোমার কাপড় যে ছিঁড়ে গেছে, একথা লেখনি কেন? মা হাসিয়া বলেন, 'পাগল ছেলে! এখনও ছ মাস চল্‌বে ওতে। আরও একখানা তোলা আছে, "পরি না।'

কিন্তু সেই কাপড়খানি চিরকালই বাক্সবন্দী হইয়া থাকে এবং মাও পুত্রকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য হাসিমুখে প্রতিবারেই ওই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সেদিন কিন্তু একখানি পত্রে দিদি অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন—

তোমার বোধ হয় মনে আছে, অরুণ এবার ম্যাট্রিক দেবে। সেজন্য ফীয়ের টাকা জমা দিতে হবে। মা ভেবেছিলেন একথা তোমায় জানাবেন না, তাঁর একখানা গহনা বন্দক দিয়ে টাকাটার যোগাড় ক'রবেন। কিন্তু ভাই, এমনি অদৃষ্ট সিন্দুক খুলে দেখা গেল, চার-পাঁচখানা গহনার মধ্যে একখানাও নেই। মা বুঝ্‌তে পার্‌লেন—কার কাজ এ! কিন্তু উপায় ত নেই। কাজেই বল্‌লেন,—কমলকে আর লিখিস্ না কিছু, ঘটীবাটি বাঁধা দিয়ে টাকা কটার যোগাড় কর্। কিন্তু ভাই, তুমি আমাদের উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবক; তোমায় না জানানো আমার মতে ভাল নয়, তাই লিখ্‌লুম। যদি কোন রকমে যোগাড় কর্‌তে পার, ভালই, নইলে ঘটীবাটি ত আছেই।

তারপর কুশল প্রশ্নে ও আশীর্ব্বাদে পত্রের সমাপ্তি। কমল ভাবিতে ভাবিতে আপিস চলিয়া গেল।

মেসের সকলের অবস্থাই সমান। অফিসে টাকা কটা মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া আসল ঋণ ত কোনকালে শোধ করিতে পারিবে না? তবে উপায়?

একমাত্র উপায় বরানগরের মেজদি। তিনি যদি কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে আজ সর্ব্বপ্রথম সেখানে হাত পাতিতে যাওয়া তাহার বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। পিতার মৃত্যুতে সেই অপ্রীতিকর ব্যবহারটাও মনের মাঝে উঁকি মারিল।

আবার ভাবিল, তাঁরা যাই বলুন না কেন, দিদি ত আমার। ভায়ের দুঃখকষ্ট দেখিলে কোন্ বোন স্থির থাকিতে পারে? যদিও কুটুম্বের নিকট অপমানিত হইতে পারি; আর অপমানই বা কিসের? কন্যাদান করিলেই পদে পদে নতি স্বীকার করিতে হয়। ভাইটিকে মানুষ করিবার জন্য এটুকু তাহাকে অম্লানবদনে সহিতে হইবে।

আপিসের ফেরৎ সে বরানগর চলিল।

ঠিক বড়লোক বলা চলে না, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। দ্বিতল বাড়ীখানি অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে।

কমল একটু ইতস্তত করিয়া দ্বারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "কে আছেন?"

একটি তের চোদ্দ বছরের ছেলে দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে চান?'

কমল বলিল "আমার বাড়ী অভয়পুরে।"

ছেলেটি একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "কিন্তু চান কাকে?"

কমল মেজদিদির নাম করিতেই দুয়ার বন্ধ করিয়া ছেলেটি ভিতরে চলিয়া গেল এবং উচ্চকণ্ঠে কাহাকে বলিল, "ও দিদি অভয়পুর থেকে কে এসেছে, বৌদির নাম করছে। কিন্তু এমন ময়লা জামাকাপড়!"

স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "বোয়ের ভাই নয় ত? ডেকে বসা বাইরের ঘরে। এতকাল পরে আবার আদর কাড়াতে এলেন কেন,—কে জানে?"

কমলের ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া যায়, কিন্তু ভাইয়ের জন্য পারিল না; আবার দীর্ঘদিন পরে যদি দিদির আশ্রয়ে আসিয়াছে ত তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া কি করিয়াই বা ফিরিয়া যাইবে? ইহারা হাজার অপমান করুক, নিরপরাধিনী দিদি ত তাহার কোন দোষ করেন নাই।

উষা আসিতেই কমল তাহাকে প্রণাম করিল।

সে কোন আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ না করিয়া ভায়ের ছিন্ন-মলিন বেশ ও রুক্ষ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কুটুমবাড়ী একটু ফরসা জামা-কাপড় পরে আসতে হয়, তোর এ জ্ঞানটুকু আজও হ'ল না, কমল।"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে প্রথম দর্শনে স্নেহময়ী ভগ্নীর এ কি নীরস তিক্ত সম্বোধন!

কমল আপনাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া আরক্ত নতমুখে উত্তর দিল, "তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীর কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করা ভুল, মেজদি। আর কি বাবা আছেন!"—বলিয়া মলিন জামার প্রান্তটা তুলিয়া চোখে দিল।

দিদি বেশ সহজ প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝলুম অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে; কিন্তু হঠাৎ আজ কি মনে ক'রে এখানে?"

কমল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি কেবল ভাবছি, সত্যিই তুমি আমার সেই মেজদি, না আর কেউ?"

দেয়ালের পানে মুখ ফিরাইয়া কঠিন কণ্ঠে উষা বলিল, "সে সম্পর্ক ত তোমরাই চুকিয়ে দিয়েছ। সামান্য একখানা গহনার জন্য আজ সাত বছর ধরে এখানে পড়ে আছি। বাপ-মার যেন আরও ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু আমার—" আর সে বলিতে পারিল না। তেমনি মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কমল বুঝিল মেজদিদি কাঁদিতেছেন। সাত বৎসরের সঞ্চিত গোপন অশ্রু আজ সকল বাধা ঠেলিয়া মুক্ত অভিমানের সঙ্গে অবিরলধারে বহিতেছে। সে-ও কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে উষা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এদের দেওয়া জ্বালা-যন্ত্রণা ত আমার অঙ্গের আভরণ হয়েছে; কিন্তু তোরাও যদি এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে থাকবি ত যাই কোথায়? হাঁ রে কমল, মা কি আমার কথা একবারও বলেন না? ছোট ভাইগুলো—তাদের মেজদির কথা জিজ্ঞেস ক'রে না? রমা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কেমন আছে? বাবা নিশ্চয়ই আমার কথা—"

নেপথ্য হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের শব্দ আসিল, "উনুন যে খাঁ খাঁ ক'রে জ্বলে যাচ্ছে, গেল কোন্ চুলোয় ?"

উষা ত্রস্ত হইয়া কহিল, "শুন্‌লি ত কমল! আমার জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আছে কেবল কাজ—কাজ। তার পুরস্কার ওই গালমন্দ। হাঁ,—তা কি মনে ক'রে এসেছিস ?"

কমল আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শুনিতে শুনিতে উষা কতবার অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিল।

কথা শেষ করিয়া কমল বলিল, "এখন উপায় তুমি-গোটা-চল্লিশ টাকা আমায় জোগাড় করে দিতে পার না মেজদি ?"

উষা বিবর্ণ মুখে কহিল, "আমার ত এক পয়সাও নেই, ভাই। না,—না, আমি কোথায় পাব ?"

কমল বলিল, "জামাইবাবুকে ব'লে।"

ম্লান হাসিয়া উষা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ও পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইল। পরে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, "এ ছাড়া আর কিছু আমি তার কাছে পাই না, ভাই।"

কমল শিহরিয়া বিস্ময়রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সে তোমাকে মারে, মেজদি ? পশু কোথাকার——"

"চুপ চুপ...দোর-জান্‌লারও কান আছে। এক কথা কমল, আমার মাথার কাঁটা দুটো খুলে দিই, আমার পকেটে ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যা। বাড়ী গিয়ে বিক্রী করে টাকাটা নিস্।"—বলিয়া মাথা হইতে সোনার কাঁটা দুটি খুলিয়া কমলের হাতে দিতে গেল।

কমল হাত সরাইয়া বলিল, "তারপর, তোমার দশা—মেজদি ?"

উষা হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা তোর নয়। তুই নে শীগ্‌গির, কেউ দেখে ফেল্‌তে পারে!"

কমল নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইতে লইতে বলিল, "না মেজদি, ও তুমি রাখ। শুধু আশীর্ব্বাদ কর আমাদের, যেন একদিন চাকরিতে উন্নতি ক'রে তোমায় মীর কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

পরম আগ্রহে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে উষা বলিল, "পার্‌বি · পার্‌বি, কমল, একবার আমায় নিয়ে যেতে ? আঃ আমি সেই আশায় সব কষ্ট হাসি-মুখে সহ্য করবো, ভাই। কিন্তু যা শুনে গেলি—দেখে গেলি এসব কথা মাকে—জানাস্ নে ভাই।"

"না", বলিয়া কমল ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পথে যাইতে যাইতে সে শুনিল সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার,—আকেলখাগীর কি একটুও আকেল নেই মা। কুটুমের ছেলে এলো—জলটুকু না খাইয়ে বিদেয় কর্‌লি। এমনি ক'রেই কি লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করাতে হয়!' ইত্যাদি।

* * *

শনিবার দিন বাটী আসিয়া কমল সর্ব্বপ্রথম দিদিকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "টাকার ত কোন যোগাড় ক'রে উঠতে পারলুম না, দিদি! ঘটীবাটি বাঁধা দেওয়ার যোগাড় কর।"

মেনকা বলিল, "সেজন্যে তোর ভাবনা নেই, টাকা পাওয়া গেছে।"

কমল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পেলে ?"

মেনকা নিম্নকণ্ঠে কহিল, "রমার শ্বশুর সেদিন রমাকে এখানে রেখে গেছেন। তার আঁতুর খরচের জন্য ১০০৲ টাকা দিয়েছেন—তাই থেকে—"

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে হয় না, দিদি। তাঁদের টাকা থেকে না ব'লে ক'য়ে নেওয়া আমার ত মত নয়।"

মেনকা বলিল, "সে যা হয় আমি করবো, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। টাকার জন্যে বরানগর গিছ্‌লি না কি।"

কমল ঘাড় নাড়িল।

মেনকা আগ্রহভরে বলিল, "উষাকে কেমন দেখ্‌লি ? সে আমাদের কথা কি বল্‌লে ?"

"সে অনেক কথা দিদি! চুপি চুপি আর এক সময় বলবো। তবে এটুকু জেনে রেখো—বড় কষ্টেই তার দিন কাটছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মেনকা বলিল, "তা আমি জানি। বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো—শুধু দুঃখকষ্ট সইতে।"

রমা আসিয়া কমলকে প্রণাম করিল।

কমল তাহার মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছিস্ ত?"

রমা বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বিশ্রী রোগা আর ঢেঙা হ'য়ে গেছ বড়-দা! আপিসের খাটুনি খুব বেশী বুঝি?"

কমল হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ। আয় মার কাছে গিয়ে বসে বসে গল্প করিগে—চল্।"

৪

বর্ষার প্রারম্ভ। ম্যালেরিয়ায় সারা পল্লী ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতিবারই অল্পবিস্তর লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। লেপ-কাঁথা চাপা দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রবল জ্বরের পীড়ন সহ্য করে; জ্বর ছাড়িলে নাওয়া-খাওয়া করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ী গল্পগাছা করিতে যায়। নিত্য সহচরের মত বলিয়া জ্বরকে ততটা ভীষণ বোধ হয় না।

এবার ম্যালেরিয়া সারা পল্লী ব্যাপিয়া প্রবল প্লাবনের মত আসিয়াছিল। কে কাহার মুখে জল দেয়, কে কাহার তত্ত্ব লয়? বাটি বাটি শিউলি পাতার রস, ফাইল-ভর্ত্তি কুইনিন উপহার দিয়াও জ্বরকে দেশত্যাগী করা গেল না। সে যেন চায় আরও কিছু বেশী, কিছু তাজা রক্ত টাটকা প্রাণ!

মেনকা ছাড়া এ বাড়ীতে কেহই ম্যালেরিয়ার কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় নাই। সকলেই উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং উঠা-পড়ার ফাঁকে নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মও করিতেছে। সকলেই জানে, যেজন্য মশার অত্যাচার সহিতে হয়, দারিদ্র্যের দুঃখ বহিতে হয়, মৃত্যুর আতঙ্কে শিহরিতে হয়, ইহাও সেই অদেখা অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর খেলা মাত্র! ইহা নিয়তির একটা রূপ। জন্মের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যগ্রহে আশ্রয়লাভ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে অন্ধ নির্দ্দেশে তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট মহাপথের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। এ পথের যাত্রা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মানুষ প্রতিরোধ করিতে পারে না; রোগ আলস্য দৌর্ব্বল্য কিছুরই দোহাই মানে না, অর্থসম্পদেও ইহার স্রোত ফিরান যায় না। ইহা নিয়তি।

ছোট খুকী উমা বার-বার রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র প্রাণে আর কতই বা সহ্য হয়! একদিন প্রভাতে প্রবল জ্বরে কাঁথা মুড়ি দিয়া শয্যাশ্রয় করিল। মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ ও সারারাত্রি চলিয়া গিয়া আবার প্রভাত ফিরিয়া আসিল, প্রবল জ্বরের এতটুকু হ্রাস হইল না।

মেনকা ভীত হইয়া মাতাকে বলিল, "এ ত ম্যালেরিয়া নয় মা। চব্বিশ ঘণ্টা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, ভুল বকছে। একজন ডাক্তার ডাকি না হয়।"

মারও তখন সবেমাত্র শীত শীত করিয়া জ্বর আসিতেছে। একখানা কাঁথা টানিয়া লইয়া খুকীর পাশে শুইয়া পড়িয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার ডাকবার পয়সা কোথায় পাবি, মিনি? পারিস ত ডাক, আমার বাছার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দে। দেখিস্ যেন দুঃখিনী মার কাছে এসেছিল ব'লে মা আমার অভিমান ক'রে চলে না যায়! উমা, উমা, মা আমার—" বলিয়া তিনি অচৈতন্য কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মেনকা চক্ষু মুছিয়া অরুণকে বলিল, "ঈশানকে ডেকে নিয়ে আয়, অরু।"

ডাক্তার আসিলেন। বাহুমূল ফুঁড়িয়া ঔষধ দিলেন, বুকে মালিশ করিবার মলম দিলেন এবং ভয়-অভয় দুটি জিনিষেরই অস্তিত্ব জানাইয়া আসন্ন বিপদকে ঘনীভূত করিয়া বিদায় লইলেন।

নিয়তি।

গোধূলির পবিত্রলগ্নে অস্ফুট শুভ্র যূঁই ফুলটি ফুটিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। এখানকার খেলাঘরের সাজান সংসার রাখিয়া ছোট খুকী চিরদিনের জন্যই চলিয়া গেল।

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন না, আছাড়ি-পিছাড়িও করিলেন না, শুধু দুটি রোগতপ্ত বাহু দিয়া শিশুর শীর্ণ-শিথিল হিম দেহখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন, "ওরে না, না, আমার উমাকে আমি ছেড়ে দেব না, দেব না রে!"

মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "একটু চুপ কর

মা। ওই দেখ তোমায় কাঁদ্‌তে দেখে রমা কেমন কর্‌ছে।··অরুণ, অরুণ, শীগগির্‌ এদিকে আয়—রমার বোধ হয় ফিট হয়েছে।" মা অতি সন্তর্পণে উমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। পরে তাহাকে বুক হইতে নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

* * *

কমল এ সংবাদ পায় নাই। সে নিশ্চিন্তমনে নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া আপিসে ছুটিত ও প্রতিনিয়ত ভাবিত, কি করিলে কোন্‌ উপায়ে অপর্য্যাপ্ত অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে কত-না অসম্ভাবিত উপায়ে কপর্দ্দক-হীন ভিখারী অগাধ ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া সমাজের মধ্যে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। সে কৃতবিদ্য, কুহক বিদ্যা কিংবা সন্ন্যাসীর কৃপাদৃষ্টিকে বিশ্বাস করিত না। সে ভাবিত, অর্থের নিহিত তত্ত্ব শুধু ব্যবসায়েই আছে, তা সে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যাহাই হউক না কেন। চাকরিতে ভিক্ষা, কর্জ্জ, কষ্ট, এ ত পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু সে দেখিয়াছে এবং বইয়েও পড়িয়াছে—সামান্য সূত্র ধরিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মী কত হতভাগ্য নিরন্নকে অর্থ দিয়াছেন, অন্ন দিয়াছেন, ভাগ্যশ্রী দিয়াছেন। এই কলির শেষযুগে বুঝি আর তাহা সম্ভব নহে। কথায় কথায় বিশ্বাসের অপব্যবহার যেখানে, সেখানে কোন্‌ ধনবান সরল মুখশ্রী দেখিয়া বা কর্ম্মপটু অন্তর চিনিয়া জীবনযুদ্ধের সহায়তা করিবেন? অর্থ সামান্য মাত্রও নাই যে সম্বলে একখানা পানের দোকানও খোলা যায়। আছে শুধু চিন্তা!

শ্যামবাবু বলিল,"লটারীর টিকিট কেন, ভাগ্য ফিরলেও ফিরতে পারে।"

কমল মনে মনে হাসিয়া ভাবে, তাহাই যদি হইবে ত আপিসের গোলামীতে সামান্য মাহিনায় বহাল হইবে কেন? ভাগ্য যদি সুপ্রসন্নই হইত ত অন্য উচ্চতর পদও জুটিতে পারিত কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাও হয়ত হইত, কিন্তু সে কথা যাক্‌। ওই শ্যামবাবু আজ বিশ বছর ধরিয়া কত অর্থই না কত প্রকারের লটারীর টিকিটে অপব্যয় করিয়া আসিতেছেন, কোনদিন কাম্য ফল লাভ করিতে পারিয়াছেন কি? তবে কোন্‌ আশায়?

উত্তর তাঁহার হয়ত একটা ছিল, সে ওই ভাগ্য! আজীবনের ব্যর্থ চেষ্টা শেষ মুহূর্ত্তে সফল হইতে দেখা গিয়াছে। মানুষ আশার দাস। সুতরাং চেষ্টা হইতে বিরত হইও না। অনিলবাবু প্রভৃতি শনিবার রেসে যাইতেন। তিনিও কতকটা ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চার ভরণপোষণ করিতেন। বাক্সের টাকাকড়ি, স্ত্রীর অলঙ্কার, কলিকাতার ক্ষুদ্র বাস্তখানি পর্য্যন্ত এই হার-জিতের খেলায় বাজি ধরিয়াছেন, তবু তিনি আশা ছাড়েন নাই। ভাগ্য! কে জানে কোন্‌ মুহূর্ত্তে ইহার স্রোত ফিরিয়া যায়! তিনিও কমলকে রেস খেলিতে উপদেশ দেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, নিশ্চিত জয় তাহার ভাগ্যে আনিয়া দিবেন।

কমলের আশালুব্ধ অন্তর মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠে। একবার রেসের টিকিট কিনিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে ক্ষতি কি? কত লোকেই কত আশা বুকে বাঁধিয়া শনিবার দ্বিপ্রহরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ওই মাঠের উদ্দেশেই ছুটে! তাহাদের মধ্যে দীনতম ভিখারী হইতে ক্রোরপতি পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। ব্যর্থকাম হইলে কেহ কি ওখানে যাইত?

মনে হয় ভাগ্য বলিয়া একটা প্রবল সূত্র কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত রহিয়াছে, যাহার পলকের ইঙ্গিতে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার অভিনয় হয়। মনে হয়, জ্ঞানের অতীত, বিদ্যার অনায়ত্ত, বুদ্ধির অনধিগম্য সে ভাগ্য; উদ্যম ও কর্ম্মের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত। এই ভাগ্যই তাহাকে দুঃখের অনলপরীক্ষায় টানিয়া আনিয়াছে, চেষ্টা করিয়া ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

শনিবার দিন সে অনিলবাবুকে বলিল, "আমায় নিয়ে যাবেন রেস কোর্সে?"

অনিলবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি যাবে? হুর্‌রে—বেশ, বেশ! এতদিনে বুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌ছি। শিওর টিপ্‌, আজ যদি পকেট ভর্ত্তি না করিয়ে দিই, চল, চল।"

পকেট ভর্ত্তি না হউক বাড়ী ফিরিবার মুখে টাকা গণিয়া দেখা গেল, ত্রিশটি টাকা লাভ হইয়াছে। এক মাসের মাহিনা।

অনিলবাবু সোল্লাসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,

"ভারী লাকি চ্যাপ ত তুমি! বেশ বেশ—এমনি ত চাই। আবার আস্‌ছ ত শনিবারে?"

কমল বিষন্ন মুখে জবাব দিল, "না।"

—"কেন কেন?"

কমল বলিল, "যা দেখে গেলুম এখানে, সে শিক্ষা আমি জীবনে ভুলব না। এও একটা নেশা। অন্যান্য কু-নেশার মত মানুষের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দেয়। জোচ্চোরি!"

অনিলবাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোকরা, এই নিয়ে দুনিয়া চল্‌ছে। তোমার গলায় ছুরি চালিয়ে আমি পকেট ভর্ত্তি কর্‌ছি, আবার আমায় ঠকিয়ে তুমি সংসার চালাচ্ছ! যে বেশী নিরীহ, সংসারে ক্ষত বিক্ষত হয় সে-ই বেশী। ভেবে দেখ দেখি—জোচ্চোর কে নয়? পৃথিবী জুড়ে মারামারি, কাটাকাটি শুধু এই জোচ্চোরির খেলা। মনটাকে শক্ত কর, ছোকরা, শক্ত কর, নইলে কঠিন সংসার, এক তিলও টিকে থাকৃতে পারবে না।"

কমল বলিল, "আমরা জাত-হিসেবে এত ছোট কেন জানেন? শুধু গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলি ব'লে। আয়ের চেষ্টা এমনি ফাঁকি দিয়ে করি, রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে সব দুঃখ দূর করৃতে চাই, তাই এ অধঃপতন। এই ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধিমান্ হবার, লাভ করবার চেষ্টাই আমাদের অসাধু অবিশ্বাসী ক'রে তুলেছে, অনিলবাবু।"

সাম্‌নেই বাসওয়ালা হাঁকিতেছিল, "শ্যামবাজার, বাবু, শ্যামবাজার।"

অনিলবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, "গোটা-দুই টাকা দাও ত ধার, কালই দেব। রোগা ছেলের দুটো বেদানা, ময়দা, চিনিও বোধ হয় ফুরিয়েছে, কিনৃতে হবে। আর দেখ না বাসভাড়া এখান থেকে বরানগর—"

কমল তাঁহার হাতে দুটি টাকা দিয়া সাগ্রহে কহিল, "আপনি বরানগরে থাকেন? একটা খবর দিতে পারেন?"

অনিলবাবু ততক্ষণে বাসে উঠিয়া বসিয়াছেন। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,—"কিসের খবর?"

—"শশধর বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর সকলে কেমন আছেন?"

"সে আমাদের বাড়ী থেকে অনেকটা দূর। আচ্ছা, কাল সকালে জেনে এসে ব'লবো। গুড্‌নাইট।"

—"গুড্‌নাইট।"

পরদিন অনিলবাবু আপিসে আসিতেই কমল বরানগরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

অনিলবাবু বলিলেন, "তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। বাড়ীতে দেখ্‌লুম সামিয়ানা টাঙানো হ'য়েছে, শুনলুম—বে।"

কমল বলিল, "বিয়ে? কার বিয়ে?"

অনিলবাবু বলিল, "শুন্‌লুম ত বড়ছেলের। পরশু গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে। হাঁ, এবার দ্বিতীয় পক্ষ। তবে ওদের বাড়ীর একটা বিশেষ বদনাম শুনে এলুম।"

কমলের মুখে আর প্রশ্ন করিবার ভাষা যোগাইল না। সে চিত্রার্পিতের মত অনিলবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওরা বউকে না কি জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় খুব। প্রথম পক্ষেরটিকে বিয়ে ক'রে এনে অবধি বাপের বাড়ী পাঠায় নি। কর্ত্তা, গিন্নী এমন কি ছোট' ছেলেটা পর্য্যন্ত গাল দিয়ে বেত মেরে বৌটির সারা দেহে কালশিটে পাড়িয়ে দিয়েছিল। ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছেন, বৌটি মরে জুড়িয়েছে।"

কমলের চোখের সামনে দপ্ করিয়া মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আলো নিভিয়া গেল। পায়ের তলায় যেন ঘরের মেঝেটা কাঁপিয়া উঠিল এবং অবলুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে শুধু একটি করুণ ক্রন্দনের রেশ আসিয়া কানে বাজিতে লাগিল, "আমায় নিয়ে যাবি ত ভাই, নিয়ে যাবি ত?"

হায় অভাগিনী দরিদ্র বাংলার মেয়ে! তোমার লাঞ্ছনা—তোমার বেদনা কি পরপ্রত্যাশী অন্তরে একটুও বাজে না? তোমার ভীরু আশা—অতৃপ্ত ক্ষুদ্র কামনা কি অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এমনই মধ্যাহ্নের তীব্র রৌদ্রে শুকাইয়া যায়?……

তার পর, জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কমল একা। সেই ভগ্ন মেসের ক্ষুদ্র গৃহে মলিন শয্যায় শুইয়া আছে। শরীর অবসন্ন—মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা, সমস্ত অঙ্গ

যেন দুঃসহ বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে! পাশের ঘরে প্রতিদিনকার কলরব তেমনি উদ্দাম। পরেশ হয়ত নিত্যকার অভ্যাসমত দুঃখ ভুলিতে বাহির হইয়াছে।

অবহেলিত রোগজর্জ্জরিত সে পড়িয়া আছে সুস্থ জগতের বাহিরে, এই ক্ষুদ্র কক্ষই যেন তার সত্যকার বিশ্রামস্থল।

কে একজন কক্ষদ্বারে উঁকি মারিলেন এবং মোটা গলায় বলিলেন, "কেমন আছ কমলবাবু?"

কমল কি বলিতে গেল—স্বর বাহির হইল না।

লোকটি চৌকাঠের উপর এক পা রাখিয়া সন্তর্পণে একটু ঝুঁকিয়া বলিলেন, "মুখে যেন সব কি বেরিয়েছে? সব গায়ে কি খুব ব্যথা?"

কমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"হাঁ।"

লোকটি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে! মার অনুগ্রহ! আমি তখনই বলেছিলাম—" বলিয়া আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া অপরকক্ষে ক্রীড়ারত লোকগুলিকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"অ মশাই কালীবাবু, শুনছেন কুমুদবাবু, ওহে ক্ষেত্তর—আর ত এ মেসে থাকা চলে না। কমলবাবুর মার অনুগ্রহ হয়েছে—একেবারে স্থল পদ্ম। কই ম্যানেজার শঙ্করবাবু গেলেন কোথায়? তিনি এর বাহয় একটা বিহিত করুন।"

কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, শঙ্কিত অন্তরে সকলেই বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ফটাস্ ফটাস্ চটি জুতার শব্দ করিতে করিতে শঙ্করবাবু ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। কহিলেন, "ভূষণবাবু, এত চীৎকার করছেন কেন? হ'ল কি?"

ভূষণবাবু মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখুন গে, ওই ঘরে গিয়ে কমলের অবস্থা?"

শঙ্করবাবু কমলের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন, "কমলবাবু, কমলবাবু?"

আচ্ছন্নের মত কমল উত্তর দিল, "অ্যাঁ!"

শঙ্করবাবু বলিলেন, "শুনছেন,—আপনার পক্স হয়েছে দেখে মেসের সবাই ভয় খেয়ে গেছেন। কাল সকালেই এখান থেকে বাড়ী চলে যাবেন, বুঝলেন? আর এখন সেখানে যাওয়াই আপনার উচিত। সেখানে মা আছেন, বোন আছেন, তাঁরা দেখ্‌তে শুনতে পারবেন। আপনার পক্ষেই ভাল।"—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর চলিয়া গেলেন।

অনেক রাত্রিতে পরেশ মেসে ফিরিল।

পার্শ্বের কক্ষে সকলেই তখন নিদ্রিত, শুধু কমল শয্যায় শুইয়া—'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া কমলের অবস্থা দেখিয়া পরেশের নেশা কাটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি কলসী হইতে এক গ্লাস জল ঢালিয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকিল, "কমলবাবু?"

রক্তআঁখি মেলিয়া কমল হাঁ করিল ও একনিঃশ্বাসে অনেকখানি জল পান করিয়া ক্ষুদ্র একটি 'আঃ' বলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

পরেশ তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিল, "জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে? বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে?"

কমল ক্ষীণস্বরে বলিল, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখানে থেক না ভাই, বড় ছোঁয়াচে রোগ।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "সমুদ্রে যার শয্যা—শিশিরে তার কি ভয়! এ লক্ষীছাড়ার জীবন গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? কমল, সংসারে যে স্নেহবঞ্চিত তার জীবনের আসক্তি খুব কমই জেনো।"

কমল তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি জান না ভাই, এই স্নেহই মানুষের অভেদ্য বর্ম্ম। এরই আচ্ছাদনে শোক দুঃখ অগ্রাহ্য ক'রে সে মহান্ জীবন-পথের বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছাবার আশা করে। ভাই পরেশ, আমায় একবার বাড়ী নিয়ে যেতে পার? আমার মার কাছে, ভাই বোনেদের কাছে?"

পরেশ বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে।"

পরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ আগ্রহোত্তেজিত-কণ্ঠে কমল বলিল, "না—না ভাই, আমার বাড়ী নিয়ে চল—নিয়ে চল। মার কোলে গিয়ে যেন শেষ নিঃশ্বাস

ফেল্‌তে পারি। আমার মা, দুঃখিনী মা,—কমল. তাঁর পায়ের ধূলো মাখ্‌লে আমার গায়ের জ্বালা জুড়ুবে।”

পরেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “রাত্রি শেষ হোক্‌, তোমায় যেমন করে পারি আমি মার কাছে নিয়ে যাবই। স্থির হও ভাই।”

কমল শ্রান্তিভরে পরম তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিল।

৫

শ্মশানের চিতা তখনও নিবে নাই। রাত্রিশেষে প্রবল গর্জ্জন তুলিয়া বাতাস আসিয়াছিল, এখনও তাহার মন্দীভূত বেগ চিতার নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিরাশিকে উদ্দীপ্ত করিয়া রহিয়া রহিয়া মৃদু বিলাপধ্বনিতে শোঁ—শোঁ করিতেছিল। নদীতীরে বসিয়া সর্ব্বহারা অভাগিনী শূন্য দিগন্তের পানে চাহিয়া হয়ত শোকার্ত্ত প্রকৃতির ক্রন্দনই শুনিতেছিলেন। পায়ের তলায় অবিরাম কুলু ধ্বনিতে নদী এই বিলাপ গাথাই গাহিতেছে, আকাশে পাংশু সূর্য্য মেঘের আড়ালে শোকমলিন,—ওপারের ধূসর দিগন্তও যেন চিতাধূমের বাষ্পে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মাঠের পর মাঠ চলিয়াছে—তৃণশূন্য—শস্যশূন্য—বৃক্ষশূন্য। যেন আভরণহীনা বাংলার সর্ব্বহারা বিধবা!

শ্মশানের আশেপাশে খানিকটা জঙ্গল ও দুই চারিটা বাব্‌লা গাছ। তার চারিপাশে নরকঙ্কালের রাশি। ঝোপের মধ্যে দিনের বেলায় শৃগাল মাংসের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কুকুর একটু দূরে একখানা হাড় লইয়া পরম আরামে চিবাইতেছে, গাছে বসিয়া বিকট কা—কা স্বরে কাক ডাকিতেছে। মানব-জীবনের নশ্বরতা এখানে আসিলে যেমন উপলব্ধি হয় এমন আর কোথাও নহে।

নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার পানে চাহিয়া শোকস্তব্ধ জননী বসিয়াছিলেন। নয়নে অশ্রু নাই, হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, মুখে ব্যথার চিহ্ন নাই, যেন ধীর স্থির প্রশান্ত সিন্ধু। যেন শ্যামবৃক্ষ পুষ্পপল্লবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ বজ্র নামিয়া সব জ্বালাইয়া দিয়াছে। যেন কূলপ্লাবী নদীর স্রোত কে শুষিয়া লইয়াছে! ভূমিকম্পে নগর শ্মশান হইয়া গিয়াছে!

হায়রে সংসার! স্নেহের নীড় বাঁধিয়া কতই না যত্নে মানুষ সুখকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে, প্রতি নিঃশ্বাসে সে সুখ শিথিল বকুল ফুলের মতই পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়ে!

ওই পরপারের রাজ্যেও কি কোন নিয়ম নাই? মানুষের আয়ু কি কোন হিসাবদক্ষ মুহুরীর খাতায় নির্ভুল করিয়া লেখা থাকে না? মায়ের কোলে আসিয়া যে পুত্র একদিন জগতের পরিচয় লাভ করে, মায়ের স্নেহে যার দেহের প্রতি রক্তকণা বাড়িয়া উঠে, সে-ই আবার মায়ের বুকে শেল হানিয়া অকালে সেই মায়ের কোলেই নয়ন মুদে! বৃদ্ধ পড়িয়া থাকে, শিশু চলিয়া যায়। কেন এ অনিয়ম?

মেনকা ডাকিল,—“মা, ওঠ, বাড়ী চল।”

স্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির মতই মা একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া আছেন।

মেনকা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “ভগবানের কাছে আমরা কি অপরাধ করে-ছিলাম, মা, যে এত শাস্তি! ঊষা গেল, খুকী গেল, এক মাস যেতে-না-যেতে রমাও আমাদের ছেড়ে গেল। আবার কমল—”

মা কাঁদিলেন না, পূর্ব্বের মতই চিতার পানে চাহিয়া রহিলেন। মেনকা বলিল, “দোহাই মা, তুমি একবার কাঁদ, একবার চেঁচিয়ে কাঁদ। আমি জানি তোমার কি ব্যথা! বুক ফেটে যাচ্ছে, একবার কাঁদ।”

মা মেনকার পানে চাহিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কাঁদতে যে আমি পারি না, মা। যেন দম আটকে আসছে। খুকীর খেলাঘর তেমনি পাতান আছে, সোদকে চেয়ে চোখে জল আসে না। রমার ছেলের ছোট কাঁথা বালিশ জামা মোজা তাকের ওপর তোলা রয়েছে, সে সবও চেয়ে চেয়ে দেখি; ঊষা ত অনেকদিন আগেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেছে। আবার কমল—”

কথা শেষ না করিয়া তিনি চিতার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

পরেশ আসিয়া মাকে বলিল, “আমি জান্‌তাম সংসারে অর্থই সব, সে ভুল আমার ভেঙেছে। স্নেহ

যে কি অমূল্য জিনিষ, তা বুঝেছি। আমারও বাড়ীতে মা আছেন, তিনিও প্রতি শনিবার আমার আশাপথ চেয়ে থাকেন। হয়ত কত ব্যথা পান—কত কাঁদেন। আগে ভাবতাম সে-সব মৌখিক। একদিন রাগ করে বলেছিলেন, "অতবড় ধাড়ী ছেলে ঘরে বসে বসে খেতে লজ্জা করে না? সেই ঘা খেয়ে ঘর ছাড়ি—সেই অভিমানই বুকে পুষে রেখেছি। আজ বুঝেছি কতবড় ভুল করেছি। মা, কমল রোগশয্যায় শুয়ে কেবল বলেছিল, আমায় বাড়ী নিয়ে চল—বাড়ী নিয়েচল। আমি মাকে দেখবো।—সে অমৃত সিন্ধুর আস্বাদ পেয়েছিল বলেই—"

অকস্মাৎ মা আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির দ্রবস্রোত প্রচণ্ড আলোড়নে সহসা উর্দ্ধে উঠিবার মুক্তিপথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সে কি কান্না! নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, দিগন্ত প্লাবিত করিয়া, আকাশ-বাতাস খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া যুগযুগান্ত-সঞ্চিত সে কি মর্ম্মভেদী বুকফাটা হাহাকার!

বায়স কা-কা স্বর ভুলিয়া গেল, শৃগাল বনপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, সারমেয় চর্ব্বণরত হাড় ফেলিয়া মুখ তুলিল।

ক্রন্দনের তীব্র বেগ বাড়িতে লাগিল। যেন প্লাবনের মহাসিন্ধু কূলে অনন্ত মিশ্র রজনীতে লেলিহান চিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া স্নেহরূপা জননী ধরিত্রী সৃষ্টি বিয়োগ বেদনায় হাহাকারে দিগদিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছেন।......

* * * *

আবার সেই ভগ্নগৃহে ভগ্নসংসারে মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার দুটি বিধবা মিলিয়া তিনটি অপোগণ্ডের লালনপালনের ভার লইয়া পুরাতন শোক ভুলিতে বসিয়াছেন।

অরুণ দারিদ্র্যের প্রতিকার মানসে গৃহত্যাগ করিয়াছে। মাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিয়াছে, যদি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর স্নেহস্পর্শ তার ভাগ্যে ঘটে, তবেই সে ফিরিবে, নতুবা এই যাত্রাই তার শেষযাত্রা!

গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল সেই কয় বিঘা ধানের জমি,—তাহাও বুঝি আর থাকে না। দশ বার বছরের ছেলে দুটি সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। কোলেরটি কিছুই বোঝে না, তেমনি হাসিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরে, মুখে চুমা দেয়—খিল্ খিল্ করিয়া হাসে—কত দুষ্টামী করে। মাঝে মাঝে দাদা ও দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে ও দিদিকে কাঁদায়।

নিষ্ঠুর সংসার প্রাণপ্রিয়তম নাড়ী-ছেঁড়া ধন পুত্র-কন্যার শোকে কাঁদিবার অবসর দেয় না, প্রাণ ধারণের সমস্তা জাল পাতিয়া সব ভুলাইয়া দেয়। তাই দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহ যখন নিশীথের নিরালায় সর্ব্ব কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, তখনই পুরাতন শোক নতুন করিয়া জাগিয়া উঠে। তখনই মনে পড়ে তাহাদের স্নেহ ভালবাসা, চাহনি, চলন, কথাবার্ত্তা, যাহারা চিরদিনের তরেই নয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

একে একে ধানের জমি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ছেলেরা বড় হইতেছে, হয়ত মানুষ হইতেছে।

প্রতিবাসীরা পূর্ব্বের মতই দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া বলে, এরাই তোমার সাত রাজার ধন সাগর-ছেঁচা মাণিক। মানুষ হ'য়ে উঠুক, সব দুঃখ ঘুচবে।

মা ভগবানের কাছে মনে মনে কামনা করেন, আমার সাধআহ্লাদ সবই ত তুমি জান, প্রভু! অনেক আশা করেছিলাম, অনেক দাগা খেয়েছি। আর কোন আশা রাখি না, শুধু এদের দুঃখ দূর হোক্।

তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় ষাট বৎসরের বৃদ্ধা। চুল সব পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, গণ্ডের মাংস শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তেমন সোজা হইয়া চলিতেও পারেন না।

নদীতীরের ভগ্ন ঘাটের বহু পুরাতন ছিন্নশাখা দীর্ণকাণ্ড বট অশ্বত্থ যেমন শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া সহস্র কদর্য্য শিকড়ে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রতিদিনকার তরুণ সূর্য্যকে নিশান্তের নতি জানাইয়া বলে, আমি আছি,

তোমার প্রখর রৌদ্রের তাপে ক্লিষ্ট পথিককে যদিও আর পূর্ব্বের মত শীতল ছায়া বিলাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারি না, তবু জগতের মধ্যে নাম্নী হইয়া আছি।—মাও তেমনি আছেন। ছোট খোকাকে সাহস করিয়া আদর করিতে পারেন না, বড়দের রুক্ষ মলিন মুখের পানে ফিরিয়াও চান না। কি জানি, তাঁহার সর্ব্বনাশা স্নেহের পথ ধরিয়া আবার যদি দুরন্ত শোক ফিরিয়া আসে? যদি ইহারাও তাঁহার স্নেহের অমর্য্যাদা করিয়া পথপ্রান্তে ফেলিয়া চলিয়া যায়?

এমনি করিয়া বছর ঘুরিয়া গেল, অরুণের কোন সংবাদই নাই। মেনকা নিত্য উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কি হ'ল মা অরুণের? সে ত তেমন ছেলে নয়। আজ বছরাবধি কোন খবর দিলে না!" আশঙ্কায় মায়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠে। সেই ব্যগ্র প্রশ্নের চরম উত্তরই হয়ত ভগবান অন্তরীক্ষে বসিয়া তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। বুকের আর একখানি অস্থি হয়ত খসিয়া পড়িবে।

মা অন্য কথা পাড়েন, "আর কটা দিন এমনি ক'রে কাটবে, মিনি! ঘটীবাটি থালাবাসন জমিজমা সবই ত শেষ হয়ে এল,—তারপর?"

মেনকা ম্লানমুখে বলিল,—"রায়েদের ছোট গিন্নি পরশু ঘাটে বল্‌ছিলেন একজন রাঁধুনী চাই। বেশ বিশ্বাসী জানাশোনা লোক হ'লেই ভাল হয়। আমি ভাব্‌ছি—"

মা শান্তস্বরে বলিলেন, "ওদের বাড়ী রাঁধবি?"

তারপর কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম, এ ছাড়া আর পথ কি? দেখিস্ ত মা, আমারও যদি একটা—"

আর্ত্তস্বরে মেনকা বলিল, "মা, মা, চুপ কর।"

মা ধীরস্বরে বলিলেন, "চমকে উঠ্‌লি কেন মিনি? যে বাড়ীর বউ—যে লোকের স্ত্রী আমি, সবই জানি। মান-সম্ভ্রম কিছুই ভুলিনি, মা। কিন্তু টাকার সঙ্গে যে সে-সব গেছে, মা। নইলে আমার মেয়ে হ'য়ে তুই আমারই মুখের ওপর একথা বল্‌লি কি ক'রে? ওরে তুই বুঝ্‌বি না—কমলকে হারিয়ে আমি যত না দুঃখ পেয়েছি, তোর এই কথা শুনে তার শতগুণ দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? আমরা উপোস দিয়ে মরতে চাইলেও এ কাঁটাগুলো যে ছাড়ে না। এদের যে এখনও মানুষ করে তুলতে হবে।"

মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল।

৬

বহুদিন পরে অরুণের পত্র আসিয়াছে।

সে লিখিয়াছে—

মা! আপনাদের নিষ্ঠুরের মত ছাড়িয়া আসিয়াছি। বৎসরাবধি পত্র দিই নাই, আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—অর্থের জন্য মমতাকে বিসর্জ্জন দিব, দিয়াছিলামও তাই। এক বৎসর আপনাদের কোন সংবাদ লই নাই। আপনি হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন আমি আজ কোটিপতি, অর্থের সীমা পরিসীমা আমার নাই। কিন্তু, ভগবানের রাজ্যে যে অপরাধ করিয়াছি—তার শাস্তিও সেই সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছি।...এই দিল্লীর পথপ্রান্তে একদিন একবস্ত্রে রুক্ষমলিন মুখে অভুক্ত আমি, সারাদিন—সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কেহ ফিরিয়াও চাহে নাই—কেহ তত্ত্ব লয় নাই। বুঝিয়াছিলাম ভাগ্যকে সঙ্গে বহন করিয়া আনিয়াছি; সে-ও হয়ত নিয়তিকে অদৃশ্য শূন্যে সাথী করিয়া আমার পিছু পিছু ঘুরিতেছে, একদিন অনাহারেই উহার কোলে ঢলিয়া পড়িব। কিন্তু নিষ্ঠুরের মত যে কাজ করিয়াছি তাহার পুরস্কার তখনও বাকী ছিল, তাই মৃত্যু আমার হয় নাই।

এক ধনী আমায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় গৃহে লইয়া আসেন, তাঁহাদেরই সেবা-যত্নে সুস্থ হই। পরিচয়ে প্রকাশ পায়—তাঁরা বাংলারই অধিবাসী, কিন্তু এখানে পুরুষানুক্রমে বসতি করিতেছেন, এবং আমাদেরই স্বজাতি। লোকটি সহৃদয়, কিন্তু ব্যবসায়ী। কাপড়ের কল করিয়া হাজার হাজার কুলি খাটাইয়া যে অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রেই করিয়া থাকেন। আমার উপরও সেই পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় তিনি হইলেন জয়ী,—আর দুরাকাঙ্ক্ষ আশার তাড়নায় আমি হইলাম পরাজিত। ক্ষমা করিও মা, যদিও জানি আমি ক্ষমার

অযোগ্য, তবুও আমি ক্ষমা চাই। দিদিকে বলিও ক্ষমা করিতে।...তাঁর একমাত্র কন্যাকে আমি এই সর্ত্তে বিবাহ করিলাম যে, দিল্লী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না,—বাংলার নাম মুখে আনিব না,—পুরাতন সম্পর্কের কথা ভুলিব। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আমি, অর্থের জন্য এই সর্ত্তই মানিয়া লইলাম। ভাবিলাম,—আপনাদের গোপনে অর্থ-সাহায্য করিব, কেহই বুঝিবে না, জানিবে না।

তখন কি জানিতাম মোগল-রাজত্বে বাস করিয়া বাদশাহী আইন-কানুনে ইহারা কেতাদুরস্ত হইয়াছে; যাহাকে বন্দী করে তাহার চিন্তারাজ্য পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসে।

প্রথম দিন মণিঅর্ডার করিতে গিয়া ধরা পড়ি, তিরস্কৃত হই। আমি কলের ম্যানেজার, মাস মাস হাতখরচ লইতাম—দু-শ' তিন শ' টাকা। সেই হইতে বিশ পঁচিশ টাকা বরাদ্দ হইল। শুধু পানের খরচ! মা, শুধু তাই নহে, বনের পশুকে কেমন করিয়া বশে রাখিতে হয়, তাহা ইহারা ভাল'রকমেই জানে। আমার সঙ্গে সঙ্গে লোক ফেরে, অলক্ষ্যেও হয়ত ঘোরে এবং দিল্লী ষ্টেশন অভিমুখে আসিলে ইহাদের সর্ব্বপ্রধান আশঙ্কা হয়—পশু শিকল ছিঁড়িল বুঝি। হায় রে দাসত্ব! কিসের প্রলোভনে আজ জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে গিয়া স্নেহ শান্তি হারা হইলাম!

আমার বিবাহ! সেও ত বিধাতার অভিশাপ। অর্থও তাই। আজীবন এই অভিশপ্ত সুখের মধ্যে আমায় অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। যখনই রাজভোগ মুখে তুলি, মনে হয় ভগ্ন গৃহপ্রান্তে সেই মোটা চালের ভাত তোমার হস্তের অমৃত পরিবেশন। যখনই অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করি, মনে হয় যেন তীব্র আশীবিষ আমার প্রতি অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। মা, শান্তি আমি পাই নাই—হয়ত এ জীবনে পাইব না। জীবনভোর এই অগ্নিরাশির বোঝা বহিয়া সাধের লক্ষপতি সাজিয়া থাকিব এবং তুমিও ইহার খাতিরে রাজজননী আখ্যালাভ করিবে। কিন্তু আমাদের অন্তর ত এক মুহূর্ত্তের তরেও এ কথা ভুলিতে দিবে না, কত বড় মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি ও এই অন্তঃসারশূন্য খ্যাতির মূল্য কতখানি!

আমার হাতখরচের টাকা হইতে কিছু টাকা এক পরিচিত লোকের হাতে গোপনে পাঠাইলাম। মণিঅর্ডার করিতে সাহসী হইলাম না। জানি না, পাইবে কি না? যদি পাও অধম সন্তানের জিনিষ বলিয়া ঘৃণা করিও না, মা, সে উপেক্ষা আমায় মরণাধিক যন্ত্রণা দিবে।......

সমস্ত পড়িয়া মেনকা ডাকিল, "মা!"

মা একমনে পত্রের কথা শুনিতেছিলেন, নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। স্নেহ-বঞ্চিত কোটিপতি পুত্রের বেদনায়ও পুত্রসুখার্থিনী দুঃখিনী মায়ের ব্যথার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে!

সে বাঁচিয়া আছে এবং জগতের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্যে বিশ্বকাম্য সুখের সিংহাসনেই বসিয়া আছে। তথাপি যাহারা এ জগতের প্রান্ত হইতে চিরদিনের তরেই চলিয়া গিয়াছে—তাহাদের শোকের চেয়ে এ কি করুণ—মর্ম্মান্তিক! জগতের ভিতরে থাকিয়া দিনান্তে যে মাতৃস্নেহের এক বিন্দুও উপভোগ করিতে পারে না, মায়ের কুশল-আশীর্ব্বাদ স্নেহ যার চিরদিনের তরেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সে কোটিপতি হইলেও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যহীন ও সেই পুত্রবঞ্চিত জননীর বেদনাও পুত্রশোকের চেয়ে মর্ম্মন্তুদ।

বহুক্ষণ পরে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরস্বরে মা বলিলেন, "জগতে হয়ত এইটাই সম্ভব। কর্ম্মফল কি না—জানি না, ব্যথার উপর ঘায়ের সৃষ্টি বিধাতাই করেন। আমরা মানুষ, না স'য়ে কি ক'রবো, মা। মিনি, এক ছেলে রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে গেল,—এক ছেলে অভিমান ক'রে জগত ছেড়ে পালালো,—আমার সবচেয়ে দরদী ছেলে অরুণ—আমাদের কষ্ট ঘোচাবার জন্য নিজেকে এ কি ফাঁসে জড়িয়ে ফেল্‌লে?

ছোটখোকা কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আদরের স্বরে বলিল, "মা খিদে পেয়েছে, খাবার দে।"

মেনকা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "আয়, আমি খাবার দিচ্ছি। মা, কাপড় ছেড়ে ফেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, এখনই ওদের বাড়ী না গেলে কালকের মত বক্‌াবকি ক'রবে হয়ত। রান্নাও ত অনেক!"

মা ত্রস্তে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন ও কাপড় ছাড়িয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কন্যাকে ডাকিলেন,—"মিনি, তোর হ'ল?"

ছোট খোকাকে কোলে লইয়া মেনকা রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ,—চল।"

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লানমুখী মাতা ও কন্যা নিঃশব্দে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

শ্রীগোপাল হালদার

ভাষার দৈবজ্ঞ-বৃত্তি বড়ই হাস্যকর জিনিষ। বেকন ছিলেন তাঁহার সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তখনকার দিনের কথিত ভাষাগুলি বেশী দিন টিকিবে না, টিকিবে প্রাচীন ল্যাটিন বা ঐরূপ কোন দেব-ভাষা। কিন্তু দেবতারা আজ লোপ পাইয়াছেন, লুপ্ত দেবভাষাও অচল হইয়াছে; এবং সেদিনকার যে আভিজাত্যহীন ভাষায় বেকন গ্রন্থ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আজ তাহাই প্রায় দেবতাহীন পৃথিবীর দেবভাষা হইতে চলিল! ইহার পরে আর ছক্ পাতিয়া ভাষার করকোষ্ঠীর বিচার মূঢ়ের পক্ষেও শোভা পায় না।

ভাষার জীবন মানুষের জীবন অপেক্ষাও জটিল এবং নারীর চরিত্র অপেক্ষাও বিসর্পিত। তাই ভাবীকালের ভাষা লইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার। তবুও, বর্ত্তমানের ভাষা লইয়া আলোচনা করিলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার স্রোতে কোন ঢেউ উঠিবে-পড়িবে, তাহার কিছু আভাস যাওয়া যায় না কি? ভাষার প্রবাহ ত নিরবচ্ছিন্ন নয়, বর্ত্তমান বাংলা ভাষাও আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই। তাহার জন্য অনেক আয়োজন চলিয়াছিল। তাহার ফলেই সে তার বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছে। তেমনি, ভাবীকালে বাংলা ভাষা যে রূপ পরিগ্রহ করিবে, আজিকার দিনেই তাহার জন্য আয়োজন চলিয়াছে। সেই আয়োজন যত সম্পূর্ণ, যত পূর্ণাবয়ব হইবে, ভাবীকালের বাংলা ভাষাও ততই মহীয়ান্, ততই সুসমৃদ্ধ হইবে। এখন প্রশ্ন, তাহা কি হইতে চলিয়াছে?

বাংলা ভাষার বর্ত্তমানের যাহা পুঁজিপাটা—যাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাহাকে দুইটি দিক হইতে যাচাই করা চলে। এক, ইহার গঠনের দিক্—এদিক হইতে দেখা চলে, ইহা সত্যসত্যই জাতীয় ভাষা, না কয়েকটি উপভাষার সমষ্টিমাত্র; ইহা কতটা স্বতন্ত্র, কতটাই বা পরতন্ত্র; ইহা কি পরিমাণে অনড়, কি পরিমাণে বা নমনীয়, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, উপযোগীতা বা সার্থকতার দিক হইতেও ইহাকে যাচাই করা চলে—এদিক হইতে দেখিতে হইবে, ইহা কত লোকের ভাষা, কত লোকের একমাত্র আশ্রয়; তাহাদের মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষে ইহা কতটা সহায়ক; তাহাদের রসবোধ বা হৃদয়ের ধর্ম্মই বা ইহাতে কি পরিমাণে স্ফূর্ত্তিলাভ করে; তাহাদের সকল কথাকে, সকল ভাবকে ইহা প্রকাশ করিতে পারে কি না, না ইহাকে আশ্রয় করিলে তাহাদের কোন কোন কথা অকথিত থাকিয়া যায়।

এই দুইটি দিক হইতেই আমরা বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ গণনা করিবার চেষ্টা করিব।

বাংলা ভাষার ঐক্য

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই এই সন্দেহটা মনে জাগে—বাংলা বলিয়া কি একটা কেন্দ্রীয়, একীভূত, স্বাভাবিক ভাষা আছে, না উহা কেবলমাত্র চট্টগ্রামের উপভাষা, ঢাকার উপভাষা, বীরভূমের উপভাষা, দিনাজপুরের উপভাষা, নদীয়ার উপভাষা, এইরূপ অনেকগুলি উপভাষার সমষ্টি মাত্র? সকল দিক হইতে দেখিলে একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরেজী যে-অর্থে এক ভাষা, ফরাসী যে-অর্থে এক ভাষা, জার্ম্মাণ যে-অর্থে এক ভাষা, বাংলা সেই অর্থে এক ভাষা কোনদিনই ছিল না এবং আজ পর্য্যন্তও হইয়া উঠিয়াছে একথা বলা চলে না। ফরাসীভূমির মত, বা ইংলণ্ডের মত কোনও সর্ব্বনিয়ন্তা রাজশক্তি বাংলার অদৃষ্ট কোনও কালে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। তাই, একচ্ছত্র শাসনের দৃষ্টান্তপ্রভাবে ফরাসীর মত বাংলাভাষা অঞ্চলবিশেষের ভাষার ছত্রতলে একাকার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই; ইংরেজীভাষীর মত তত নিবিড় ঐক্যবোধও বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমাদের জীবন কোনদিনই কেন্দ্রানুগত ছিল না, কেন্দ্রীয় ভাষাও তাই আমাদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক নয়। কথ্য বাংলা আজ পর্য্যন্তও সেজন্যই "ফেডারেল" শাসনতন্ত্রের মত "ফেডারেল" ভাষা মাত্র।

কিন্তু এই অনুমানে আংশিক সত্য যতটুকুই থাকুক, উহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। বাংলা বলিয়া একটা কেন্দ্রীয় ভাষার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। মধ্যযুগ হইতে বাংলাভাষার—অন্তত লিখিত বাংলা পদ্যের ভাষার—একটি সাধারণ রূপ প্রায় সুস্থির হইয়া আসিতেছিল। ইহার বনিয়াদ পূর্ব্ব ও মধ্যরাঢ়ের কথিত ভাষা, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশেই তাহা প্রচলিত। এই মূল প্যান-বেঙ্গলী ভিত্তির উপর সেকালের লেখক যে-অঞ্চলের লোক সময় সময় সে-অঞ্চলের উপভাষার মালমশলা মিশানো চলিয়াছে। তাই, যে-সময় হইতে বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন সহজপ্রাপ্য ও বহুল হইয়া উঠিল, সেই সময় হইতেই দেখা যায়, মোটামুটি বাংলা ভাষার একটি রূপ প্রায় সকল বাঙালীই অন্ততঃ লিখিবার বেলায় মানিয়া লইয়াছে, কেহই উপভাষার উপর ভরসা রাখে নাই। দু-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই চলিবে,—পরাগলী মহাভারত ও ছুটিখানী অশ্বমেধপর্ব্ব দুইই বাংলা দেশের পূর্ব্ব সীমান্তে রচিত, ভাষাও বেশ প্রাচীন, কিন্তু সে-ভাষায় স্থানীয় উপভাষার স্পর্শমাত্র নাই। হয়ত রচয়িতা কবিদ্বয়েরু মাতৃভূমি গৌড়াঞ্চল, তাঁহারা গৌড়ের রাজসভা হইতেই লস্করের সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন ও গৌড়-রাজসভার সংস্কৃতিকেই সেখানেও প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। তথাপি, পরাগলের বা ছুটিখানের সভায় সকলে এই ভাষাকেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহ। সঞ্জয়ের দেশ, কাল, অস্তিত্ব, লইয়া গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও এই লিখিত পদ্যভাষার ব্যতিক্রম অতি সামান্য, দু-একটি বিভক্তির ছিটে-ফোঁটা মাত্র। নারায়ণদেবের মনসার গানে উপভাষার রং বেশী, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাষা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের ভাষা ও মালাধর বসুর ভাগবতের ভাষায় প্রভেদ আছে কি? হুসেন সাহের পূর্ব্ব হইতেই বাংলার এই পদ্যভাষা নিখিল বাংলার ভাষাগত মূলরূপগুলিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, হুসেন সাহের পর তাহার ভিত্তি পাকা হইয়া আসিল। রোসাঙ্গের রাজসভায় দৌলত কাজী লোর-চন্দ্রাণীর প্রণয়গাথা 'গোহারি' ভাষায় গাহিলে কেহ বুঝিতে পারে না, তাই আদেশ হইল—

"দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিআ যেন বুঝএ সানন্দ॥"

সেই 'দেশী ভাষা' খাটি গৌড় ভাষা, রোসাঙ্গের উপভাষা নয়।

বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও লিখিত বাংলা ভাষার ঐক্যসাধনের পথে উপভাষা একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, রাষ্ট্রশক্তি যদিও বাঙালীর জাতীয় জীবনের ঐক্য সাধন করিতে চেষ্টা করে নাই, তথাপি বিজেতা মুসলমান-গণের মধ্যে গৌড়ের ভাষা বাংলার রাষ্ট্রকেন্দ্রের ভাষা

বলিয়া সহজবোধ্য ও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। হুসেন সাহের রাজসভা তাহার প্রমাণ। আবার হুসেন সাহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুচরগণও ঐ ভাষায় রচনায় উৎসাহ দিতেন। এদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু, যাঁহারা সে যুগের সাহিত্য সৃষ্টি করিতেন তাঁহারা, বিশেষত ব্রাহ্মণগণ, প্রায় সকলেই রাঢ়ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া জানিতেন, এবং যত না পূর্ব্বাঞ্চলে বসবাস করুন, অন্তত লিখিবার কালে যথাসাধ্য রাঢ়ীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাহা ছাড়া একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির সূত্রে বাঙালী জাতি চিরদিন পরস্পর আত্মীয়তা বোধ করিয়াছে, আর সেই সংস্কৃতির ধারা যেখানে উৎসারিত হইয়াছিল, মধ্য রাঢ়ের ভাগীরথী তীরবর্ত্তী সেইস্থানটুকুর মাহাত্ম্য ও নেতৃত্ব মানিতে কোনও প্রত্যন্তবাসী বাঙালীর কোনও দিন দ্বিধা হয় নাই। তাই শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বাঙালদের উচ্চারণ হইয়া পরিহাস করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। আর তাহার পরে? দূর-দূরান্ত সীমায় নদীয়ার চাঁদের লীলারশ্মি যখন অতৃপ্ত বঙ্গবাসী চকোরের মত পান করিতেছিল, তখন নদীয়ার অমিয়মাখা ভাষা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আরও তিন শতাব্দী পরে এক নূতন সংস্কৃতি এই ঐক্যমুখীন বাংলা ভাষাকে এই দিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। তাহার আসনও ভাগীরথীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা ভাষার পুরাতন গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল না, বরং বলশালী হইল। যেমন করিয়া ইংরাজের ইস্পাতমণ্ডিত শাসনপদ্ধতি সমস্ত দেশকে একই শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার ঐক্যসাধন করিয়াছে, তেমনি ফোর্ট উইলিয়মের মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলনে ও নূতন শিক্ষার প্রসারে বাংলা উপভাষাগুলি একটি মাত্র ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আজিকার 'বাংলা ভাষায়' ঐক্য লাভ করিতে চলিয়াছে। কিন্তু সেই ঐক্য আজিও সম্পূর্ণ হয় নাই।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও বাঙলা ভাষা ঠিক জাতীয় ভাষা হইয়াছে, একথা বলা যায় না। কেন্দ্রীভূত ও একীভূত বাংলাভাষা আজও কৃত্রিম ভাষা। উহার প্রয়োগ আজও পুস্তকেই আবদ্ধ। সমগ্র বাঙালী জাতির চিন্তার ও ভাববিনিময়ের ভাষা এ যুগেও একীভূত হয় নাই। কবে হইবে তাহাও সুনিশ্চিত বলিবার উপায় নাই।

ভাষার একীকরণের দুইটি উপায় আছে। এক, তাহার বিচ্ছিন্নসূত্র উপভাষাগুলির উপর সংস্কৃতের মত একটা অর্দ্ধকৃত্রিম 'সিন্‌থেটিক' ভাষা চাপাইয়া দেওয়া; অপর, ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইবার যোগ্যতা অথবা শক্তি রাখে এরূপ একটি উপভাষার সাহায্যে অন্য সকল উপভাষাকে পরাভূত করা। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বড় বেশী সংস্কৃতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছিল। বাংলা ভাষার পক্ষে তাহা খুব মঙ্গলজনক হইত না। সৌভাগ্যক্রমে এযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে সে মোড়টা ঘুরিতে বসিয়াছে। সমস্ত বাংলাদেশের মুখ আজ কলিকাতার দিকে; তাহার ভদ্রভাষা সমস্ত বাংলা দেশের ভদ্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইতেছে। মুদ্রিত পুস্তকের প্রচারে সেই ভাষার রূপ প্রায় সুনির্দ্ধারিত হইয়া আসিতেছে; (কথ্য ও লিখিতভাষার প্রভেদ ভুলিবার নয়; কিন্তু তাহাকে বেশী বড় করিয়া লাভ নাই। এই প্রভেদ প্রধানত ক্রিয়াপদের রূপ লইয়া।) একই রূপ শিক্ষা সমস্ত বাংলা দেশে প্রসারিত হওয়ায় ভাষার এই কেন্দ্রমুখীনতা দিনে দিনে বাড়িতেছে। তাহা ছাড়া, একই শাসনপদ্ধতি ও এই যুগের যানবাহনাদি-বহুল সভ্যতা বাংলা দেশের মনের ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া বাংলা-ভাষার ঐক্যকেও দৃঢ়তর করিতে চাহিতেছে। এইগুলি কেন্দ্রমুখীন শক্তি; কিন্তু বাংলা ভাষার জীবনে আবার কতকগুলি বিপরীত শক্তিও জুটিয়াছে, যথা, লিখিত ও কথ্য ভাষার দ্বন্দ্ব, উপভাষা মুসলমানী বাংলা, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজীর আক্রমণ। তাহাদেরও গণনা করা উচিত।

ঐক্যে বাধা

ভাগিরথীতীরের কথ্য ভাষার প্রসার সর্ব্বত্র বাড়িতেছে। কিন্তু এই ভাষার ভিতর এমন একটা দুর্ব্বলতা আছে, যাহার জন্য উহা সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা লিখিত ভাষার স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার

করিতে পারে নাই। লিখিত ভাষা ধীরগতি ও গম্ভীর, কথ্যভাষা চপল ও নৃত্যপর; দু'এরই সময় বিশেষে প্রয়োজন আছে, অথচ, এ দুই কিছুতেই এক হইতে পারিতেছে না—যদিও ইহারা খুব নিকট আত্মীয়।

অন্য অন্য জায়গায় উপভাষাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয় কোনও দিন সাহিত্যের ভাষা হওয়ার গৌরব ইহারা দাবী করিবে না। কিন্তু অঞ্চল বিশেষের উপভাষা এখনও বেশ জীবন্ত, বাংলা ভাষার উপরে বহু শব্দ ও বাক্যভঙ্গী চাপাইতে সচেষ্ট। তাহা ছাড়া, সেই সকল অঞ্চলের কথ্য ভাষা হিসাবে ইহাদের জীবনীশক্তি এখনও কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নাই। ভাগিরথীতীরের কথ্যভাষা ইহাদের ভিত্তিকে যতটুকু নাড়া দিতে পারিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষা-গুলির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইতে চলিয়াছে উহার নিজের। বাঙ্গাল দেশ জয় করিতে গিয়া পশ্চিম বঙ্গের বাংলা তাহার নিজস্বতা হারাইতে বসিয়াছে। ভবিষ্যতেও উহার প্রসার যতই বাড়িবে, ততই উহার উপর উপভাষার প্রভাব বেশী হইবে। বাঙ্গাল শব্দ ও ইডিয়ম, উচ্চারণ-ভঙ্গী ও সুর হয়ত বাংলা ভাষাকে বিশেষ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিবে। এই পরিবর্ত্তন কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে আজ তাহা বলা সম্ভব না হইলেও ভবিষ্যতের একীভূত কথ্য বাংলা ভাষা যে পশ্চিমবঙ্গের আজিকার ষ্টাণ্ডার্ড কথ্য বাংলা ভাষা হইবে না, তাহা প্রায় সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান বাংলা ভাষার অভিধানের শব্দ বিচার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার শতকরা ৪৪টি শব্দ খাঁটি সংস্কৃত [তৎসম], ৫১'৪৫টি শব্দ সংস্কৃতজ (তৎভব বা দেশী) শব্দ, ৩'৩০টি শব্দ আরবী-ফারসী ও মাত্র ১'২৫টি শব্দ বিলাতী ইউরোপীয়। কিন্তু বাংলা দেশে এমন একটি সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা প্রতিকাজে নিজেদের সংখ্যানু-পাতে বা কোনও বিশেষ ব্যবস্থার বলে ক্ষমতা আয়ত্তের পক্ষপাতী। তাঁহাদের এই মনোভাব বেশী দিনের নহে, ইহার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিচার করিয়াও এই ক্ষেত্রে লাভ নাই। কিন্তু, এই মনোভাবকে ভুলিলে চলিবে না, ইহার দিকে চোখ রাখিয়াই ইহার ফলাফল গণনা করিতে হইবে।

পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ক্রমোন্নয়ের ফলে বাংলা ভাষা আজ যে মূর্ত্তি পাইয়াছে, বাঙালী মুসলমান এই পাঁচ শত বৎসর তাহার গঠনে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তখনও তাঁহারা মনে-প্রাণে বাঙালীত্বকে বড় বলিয়া জানিতেন, তাই আরবীয়-স্বরূপত্বের বা আরবী-ফারসী শব্দের প্রতি ভক্তির আড়ম্বর দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তাই কবি আলওয়াল সংস্কৃতের ভাণ্ডার উজাড় করিতে ছাড়েন নাই, দৌলত কাজীও সংস্কৃতজ শব্দের সঙ্গে "তরকে মাওলাত" করিতে চাহেন নাই। বিষয়ভেদে কোনও কোনও হিন্দু ও মুসলমান লেখক ফারসী-আরবীর বেশী করিয়া শরণ লইয়া নিজেদের সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। হুতোম পেঁচার নক্সার ফারসী শব্দ সংখ্যায় আনুমানিক শতকরা ৭'১, অভিধানের অনুপাত মত হওয়া উচিত ছিল ৩১। কিন্তু এ যুগে বাঙালী মুসলমান তাঁহার পার্সেণ্টেজ-কষা মনোভাবের বশে কতকটা অন্যরূপ ভাবিতে চেষ্টা করিতেছেন। যে-সব শব্দ বাংলা ভাষায় কায়েমী হইয়াছে, শুধু তাহাদের ব্যবহারেই তাঁহারা আর তৃপ্ত নহেন। মনে হয়, বাংলা ভাষায় শতকরা পঞ্চান্নটি আরবী-ফারসী শব্দ প্রবেশ না করাইলে তাঁহাদের সম্প্রদায়গত গৌরববোধ ক্ষুণ্ণ হইবে। অথচ এ নিতান্তই অশুভবুদ্ধি। বাঙালী মুসলমান সর্ব্বাংশে বাঙালী, বাংলা ভাষাও সর্ব্বাংশে বাংলা। ইহার বনিয়াদ সংস্কৃত আর্য্য ভাষার উপর, তাহা নষ্ট করিবার উপায় নাই—শ্যামলা বাংলা দেশ কিছুতেই আরবের বালুকা-পাণ্ডুর মরুভূমি হইবে না। এই গঙ্গামাটিতেই বাংলা ভাষার গাঁথুনি গাঁথা হইয়াছে, তাহাতে আরবের বালু ছড়াইয়া লাভ কি? এই গাঁথুনির গায়ে আরবী-ফারসীর নকাশী কাটা চলিতে পারে এবং চলুক, ইহাতে কোনও বাঙালীর আপত্তি নাই। তাহার বেশী কিছু সম্ভব নয়। বাঙালী মুসলমান যদি উত্তর ভারতের মুসলমানের অনুকরণে স্বভাষাতে যদৃচ্ছা ফারসী শব্দ চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইবে, তাঁহারা বাংলা উর্দ্দু সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। বাংলা আমির হাম-জা বা জঙ্গনামার ভাষা অচল,

কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার মুসলমানী গাথাগুলিও স্বচ্ছন্দ, প্রাণবান্। অপর পক্ষে চিরদিন যাহারা বাংলা ভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহারাও পঞ্চান্ন জনের আকস্মিক জবরদস্তিতে হটিয়া যাইবে, ইহাও মনে হয় না। তবে সেই পঞ্চান্ন জনের চিন্তা ও জীবন-যাত্রার সহিত সম্পর্কিত আরও কিছু কিছু কথা বাংলা কথাকে গ্রহণ করিতে হইবে—অনেক সংস্কৃত জবরদস্তির বদলে। কিন্তু জাতির শতকরা পঞ্চান্ন জন যদি আরবী-ফারসীতে বাংলা ভাষাকে প্রপীড়িত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে বাংলা ভাষার এই বর্ত্তমান ঐক্য টিকিবে না।

মুসলমানী বাংলার উপদ্রব অনেকাংশে গত শতাব্দীর পণ্ডিতী গোঁড়ামির পাল্টা জবাব। দুএরই মধ্যে সত্যাংশ কম। ইহার একটি প্রমাণ এই যে, মুসলমানী বাংলার অনেক শব্দ মোটেই মুসলমানী নয়, উহা হিন্দুস্থানী, যে হিন্দুস্থানী আর্য্যভাষার বংশধর। ইহাতে মুসলমানী বাংলার ফাঁকি ছাড়া অন্য একটি বড় লক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়—বাংলা ভাষার উপর হিন্দুস্থানীর ক্রম-বর্দ্ধমান প্রভাবের।

ইতিহাসে হিন্দুস্থানী ভাষার স্থান ভারতীয় ভাষার শীর্ষদেশে। উহা যে-অঞ্চলের ভাষার বনিয়াদ লইয়া গঠিত সেই দিল্লী মথুরা অঞ্চলের ভাষাই শৌরসেনী প্রাকৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ প্রভৃতি নামে যুগেযুগে সমস্ত আর্য্যবর্ত্তের ভদ্রভাষা ও পরস্পর আদান-প্রদানের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যযুগে রাজপুত রাজগোষ্ঠী যখন বিভিন্ন অঞ্চলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানীও সেই সব অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা ভাষার উপর ইহার প্রভাব চিরদিনকার, জন্মক্ষণ হইতে স্পষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সেই প্রভাব ভয়ঙ্কর রূপে বাড়িতেছে। বিহার প্রদেশ হিন্দুস্থানীর নিকট স্বেচ্ছায় মাথা লুটাইয়া দেওয়ায় হিন্দুস্থানী একেবারে বাংলা দেশের বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দী-ভাষী সহরের মধ্যে কলিকাতার স্থান আজ অগ্রে। পথেঘাটে সর্ব্বত্র ভাঙাহিন্দুস্থানীর সহায়তা আমরা লইতেছি। ইহার কারণ হিন্দুস্থানীদের জীবিকান্বেষণে উদ্যম। মুটে, মজুর, ব্যবসায়ী হিসাবে তাহারা কলিকাতাকে অতি সহজেই জয় করিয়াছে; চাষা এবং মজুর হিসাবেও তাহারা কলিকাতার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কাজেই তাহাদের ভাষাই কাজের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া এই যুগে আবার ভারতীয় ঐক্যবোধের ভিত্তি হিসাবে আমরা রাষ্ট্রভাষা চাহিতেছি। হয়ত হিন্দী ভাষা আমাদের এই অভাব পূরণ করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর আনুকুল্যে তাই হিন্দুস্থানীর প্রচার বাড়িতেছে। হিন্দীভাষীরাও অপরিসীম উদ্যম ও প্রচারকের নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বাহিরের সকল কাজে বাংলা দেশে হিন্দুস্থানীর প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। বাংলা ভাষা যে হিন্দুস্থানী ভাষার আক্রমণকে বিনা ক্ষতিতে নিবারণ করিতে পারিবে এইরূপ মনে হয় না।

কিন্তু স্বয়ং হিন্দীভাষাও তত সুদৃঢ় ও অনড় হইয়া নাই। এক বৃহত্তর বিপ্লবে হিন্দীও রূপ বদলাইতেছে এবং বাংলা ভাষার গতি এবং মূর্ত্তিও অভাবনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইংরেজী ভাষার আক্রমণে বাংলা ভাষার ঐক্য অটুট থাকিলেও মনে হয় বাংলা ভাষা আর এক নব কলেবর ধারণ করিবে।

যে-সব ইয়ুরোপীয় শব্দ বাঙালীত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অভিধান মতে প্রায় ১ হাজার, অর্থাৎ বাংলা শব্দের মধ্যে ইহারা শতকরা প্রায় ১·২৫টি। কিন্তু যে কোনও বাংলা লেখার উপর আজ চোখ বুলাইলেই তাহার বাংলা হরফের মধ্যে রোমান হরফের দুই একটি শ্বেতচন্দন টীকা চোখে পড়িবে। এগুলি যেন বাংলা ভাষার জগতে আই-সি-এস্—ইহাদের মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তাহারই রচনাটির স্টীল ফ্রেম্।

ইহা ছাড়াও বাংলা গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিলেই বাংলা বর্ণমালার পরিচ্ছদ-পরিহিত অনেক বিদেশী শব্দ চোখে পড়িবে। ইহারা যেন সালভেশন আর্ম্মির প্রচারক, নিজেদের মিশন ও নিজেদের অভিজাত্য হিদেনডমের সেবায় ছাড়িতে রাজী নহে। ইহার অধিকাংশ শব্দই বাঙালীত্ব স্বীকার করে নাই, দু-চার পুরুষ পরেও করিবে কিনা ঠিক নাই। এই দুই দলভুক্ত প্রকট বিদেশী শব্দ ও শব্দসমুচ্চয় ছাড়াও আমাদের লেখায়

আমরা অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহার করি যেগুলি মূলত বাংলা নয়, বাংলায় ইংরেজির অনুবাদ মাত্র। ইহাদিগকে প্রচ্ছন্ন বিদেশী শব্দ বলা যাইতে পারে। টাই-কলার পরা বাঙালী সাহেবের মত এই পর্য্যায়ের কোনও কোনও শব্দ মনে-প্রাণে বাংলা ভাষার ধর্ম্ম খোয়াইয়াছে, কিন্তু কোন কোনটি আবার খাঁটি বাংলা নাগরিক হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ক্ষুরে যিনি মাথা মুড়ান নাই তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলিতে কোনও বিদ্যালয়ই বুঝিবেন না। সাধারণ লোকে ইউনিভার্সিটি বলিলেও হয়ত বুঝিতে পারে, কিন্তু যাঁহার ওই শব্দটি জানা নাই, তিনি উহার ভাষান্তরিত শব্দটিকেও চিনিবেন না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় পাকা হইয়াছে। ইহার মত সুপ্রচলিত হইতে অধিকাংশ প্রচ্ছন্ন বিদেশী শব্দের অনেক দেরী হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর কোনও বাঙালী যদি তাঁহার চিতাশয্যা ছাড়িয়া আজ উঠিয়া আসেন, তবে তিনি অনেক বাংলা কথারই অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহার এক কারণ এই যে, ইতিমধ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, জাতির জীবনে, রূপে, মনে, ভাবে, ভাষায়। কাজেই রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলের মত তাঁহার বিস্ময়ে বিমূঢ় হইবার সম্ভাবনা। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা লেখায় যেমনি ছুঁৎমার্গী, কথায় তেমনি উদার, কস্‌মপলিটান। লেখায় আমরা যতদূর সম্ভব বিলাতীবর্জ্জন করি, কিন্তু কথায় আমরা অন্তত তাহার দশগুণ বিলাতী শব্দ ব্যবহার করিয়া শোধ তুলি। ইহা প্রায় আমাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। আজ অনেক খাঁটি বাংলার ভাবকেও আমাদের ইংরেজী পোষাক পরাইয়া প্রকাশ করিতে হয়। 'টেকো' অপেক্ষা 'ভকলি' ইংরেজী সংবাদ-পত্রের দৌলতে আজ বেশী প্রচলিত, 'একঘরে' অপেক্ষা 'বয়কট,' 'ধন্না দেওয়া'র অপেক্ষা 'পিকেটিং করা' আমাদের মনঃপূত। অপর পক্ষে যাহাদের ভাষান্তরিত করিয়াছি, এমন অনেক বাংলা শব্দের অপেক্ষা মূল ইংরেজী প্রতিশব্দ আমাদের সহজবোধ্য, এবং মনে মনে তর্জ্জমা না করিয়া বাংলা শব্দটি শুনিবামাত্র আমরা তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারি না। যে অভিধানখানা বাঙালী সমাজের একটি আদরণীয় জিনিষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়, সেই 'চলন্তিকার' যে-কোনও একটি পাতায় চোখ বুলাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পাতা উল্টাইতেই ১১৪ পৃষ্ঠা খুলিয়া গিয়াছে, ইহাতে নিম্নোক্ত বাংলা শব্দগুলিকে যথাক্রমে পরবর্ত্তী ইংরেজী শব্দের সহায়ে এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে! 'জনপ্রিয়—popular', 'জনসাধারণ—the public', 'জন্ম – birth,' 'জন্মগত—innate, congenital,' 'জন্মদিন—birthday', লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সত্যসত্যই ইংরেজী প্রতিশব্দগুলির সঙ্গে আমরা বেশী পরিচিত। বাংলা ভাষার এই ঝোঁক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ লবণকে শুধু নুন বলিলেই চলে না, অভিধানকার 'salt' বলিয়াও তাহার পরিচয় দিতে বাধ্য হন (চলন্তিকা —পৃঃ ৪৮৯)!

তথাপি এই কথা ঠিক যে, ভাষান্তরিত শব্দ, শব্দ-সমষ্টি, বা ইডিয়ম-গুলি বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। কোনও কোনওটি খাঁটি বাংলা হইতে পারে নাই বলিয়া নির্ব্বিচারে ইংরেজী শব্দগুলিকে মানিয়া লওয়া খুব সুস্থ অবস্থার পরিচায়ক নয়, ইহাতে বাংলা ভাষাভাষীর মানসিক আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং ভাষাও জড়তা-প্রাপ্ত হইবে। বাংলা ভাষা প্রতিদিন নব-নব বস্তু ও ভাবের সংস্পর্শে আসিবেই, সেই বস্তু ও ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য যতটা সে নিজে প্রয়াস করে ততই তাহার পক্ষে আশার কথা। এই কারণেই 'কাল্‌চার' অর্থে আমরা 'সংস্কৃতি'র মত অদ্ভুত শব্দকেও বরণ করিয়া লইয়াছি।

বাংলা ভাষার এই প্রয়াস দুই পথে অগ্রসর হইতে পারে—আত্মসম্প্রসারণ ও আত্মসাতের পথ।

আত্মসম্প্রসারণের উপায়—সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ উপসর্গের বা দু-একটি প্রত্যয়ের যোগে, কিম্বা নিজের দেশীয় দু-একটি উপসর্গ প্রত্যয়ের দ্বারা নূতন শব্দ চয়ন করা। সামান্যরূপে ফারসী শব্দ ও ফারসী উপসর্গাদির দ্বারাও মাঝে মাঝে কাজ চলে। ইহা ছাড়া সমাস একটি প্রধান যন্ত্র। কিন্তু নামধাতু বাংলায় প্রায় অচল। ইংরেজীর মত বিশেষ্যকে বিশেষণে বা ধাতুতে, উপসর্গকে ধাতুতে বা

প্রত্যয়-যোগে বিশেষণে পরিণত করার শক্তি বাংলা ভাষা কল্পনা করিতে পারে না। বাংলা এক মাত্রার শব্দেরও ইংরেজীর মত জোর নাই। বাংলা ভাষা শব্দ-সঙ্কোচও করিতে পারে না (যথা, ইংরেজীর bus, বাস্, ভ্যান্ প্রভৃতি) ; আবার বহু শব্দকে এক সংক্ষেপ সাঙ্কেতিক শব্দেও পরিণত করিতে পারে না (যথা ইংরেজীর 'ডোরা)।

বিদেশী বস্তুকে আত্মসাৎ করা বাংলা ভাষার পক্ষে সহজ নয়। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান হওয়াতে বড়ই ছুঁৎমার্গী, উহা প্রোসেলিটাইজিং ভাষা নয়, তাই ম্লেচ্ছ শব্দ তাহার উপর চাপিয়া বসে। উহা ঠিক হিন্দুসমাজের মত, এতটা দৃঢ়তা নাই যে বাহিরের বস্তুকে ঠেকাইয়া রাখিবে, এতটা নমনীয়তাও নাই যে বাহিরকে নিজের করিয়া লইবে। তাই বাংলা ভাষা লাঞ্ছিত হয়, পরিপুষ্ট হয় না। এইখানেই পৃথিবীর বড় বড় জীবন্ত ভাষার সঙ্গে তাহার প্রভেদ। তাহার নিজের ঘরে নিজের জাতিধর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারিলেই যেন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু এযুগে এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায়ও তাহার আর নাই।

বাংলা ভাষার সার্থকতা

বাংলাভাষার গাঁথুনির দিকটা দেখা গেল ; এইবার তাহার সার্থকতার দিকটি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষার সার্থকতা বাঙালী জাতির জীবন-যাত্রাকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করার মধ্যে। বাংলা ভাষা কি পরিমাণে বাঙালীর কাজকর্ম্মের, ব্যবসা-বাণিজ্যের, জীবন-যাত্রার, মনের চিন্তার, প্রাণের অনুভূতির ও আত্মার ঐশ্বর্য্যের বাহন হইয়াছে, বাঙালীর ভাবী জাতীয় জীবনের দাবীই বা এই ভাষা কি পরিমাণে মিটাইতে পারিবে,—তাহার উপর বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বা অষ্টম ভাষা ;—ইংরেজী, উত্তর চীনা, রুষ, জার্ম্মান্, স্পেনীয় ও জাপানীর নিম্নে, এবং ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতির ঊর্দ্ধে বাংলার স্থান। ৪ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের ইহা মাতৃভাষা, 'ঘরের ভাষা ;'—ইহা কম উপযোগিতার কথা নয়। কিন্তু, ইহা কি এই ৪ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের সকল কাজের ভাষা হইবার উপযোগী ?—বড় হইতে হইলে ইহাকে তাহাই হইতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশের জীবন দূর পল্লীগ্রামের বাঁশবনের আড়ালে, ছায়াবটের তলায়, নদীর তীরে, আন্দোলিত ধান ক্ষেতের মধ্যে শান্তিতে বহিয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষা চণ্ডীমণ্ডপে বর্দ্ধিতা, রাজপ্রাসাদের আদরিণী নন, নগর-সভ্যতার লীলা-সহচরীও নন। তাই বাংলা ভাষার যাহা আসল পুঁজিপাটা তাহা একটি প্রাচীন পল্লীজীবনের বস্তু-আড়ম্বর-হীন ও ভাববৈচিত্র্যহীন সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আজও বাংলার সেই নিজস্ব সহজ জীবন একেবারে লুপ্ত হয় নাই, বাংলা ভাষা তাহার একমাত্র বাহন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, বাঙালীর এই সহজ সরল জীবনের উপর মৃত্যু-ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষা যদি এই ঘর-ভাঙার দিনেও সেই ঘরকেই আশ্রয় করিয়া ঘরোয়া ভাষা থাকিয়া যাইতে চায়, তবে বাংলা ভাষার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়।

বাংলার বর্ত্তমান জীবন খুব সচল নয়। ইহাতে সবে মাত্র উর্ম্মিমুখর পশ্চিম মহাসমুদ্রের ক্ষীণ তরঙ্গাঘাত আসিয়া লাগিতেছে, কিন্তু তাহাতেই বাংলার জীবনে অকল্পিত আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে। যুগ-সভ্যতার এই ফেনায়িত বস্তুপুঞ্জ, ইহার নব-নব আবর্ত্তিত ভাব ও স্বপ্ন বাংলার পূর্ব্বতন জীবনের পক্ষে ধারণাতীত, বাংলার সরল ভাষায় প্রকাশের পক্ষেও সাধ্যাতীত। বাংলা ভাষা কি বাঙালী জীবনের এই প্রথম বিস্ময়, প্রথমে চেতনা, প্রথম জিজ্ঞাসাকেই সুস্পষ্ট করিয়া বাণী দিতে পারিতেছে ?

বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাসের যে একটি কথা বা একটি আইডিয়া সম্বন্ধে ভাবী কাল ভুল করিবে না—তাহা বাঙালীর জাতীয়তার উন্মেষ। সত্য বটে, আজও নিতান্ত নিকটের জিনিষ হওয়ায় উহার যেটুকু মিথ্যাচার, তাহা নিমেষে-নিমেষে আমাদের চোখে বড় হইয়া ঠেকিতেছে। কিন্তু একটু দূর হইতে দেখিলেই দেখিতে পাইব যে, বাঙালীর জীবনে ও সাধনায় যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু নিত্য, যাহা কিছু

স্থানকালাতীত, লাভ-ক্ষতির হিসাবের উপরকার, এই জাতীয়তার অভিযানেই তাহা ক্ষূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এ শুধু রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের মঙ্গলবোধন—কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহার সাড়া পাওয়া যায় কি? একমাত্র স্বদেশীযুগের সাহিত্যে ও প্রাক্‌-স্বদেশী সাহিত্যে এই বৃহৎ সত্য স্বীকৃত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সাহিত্য 'সাহিত্যিক' হইয়া উঠিয়াছে, 'বিশ্ব' ও 'নিত্যকালের' ধোঁয়া ছড়াইতেছে। এযুগের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এ ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ কোথায়?

সত্য বটে, সাময়িক সাহিত্যের—অর্থাৎ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের পাতায় বাংলার ও ভারতের এই জাতীয় জাগরণের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে,—এমন কি যতটা উগ্র তাহার অপেক্ষা বেশী চড়া সুরেই বাজিতেছে। কিন্তু যে-ভাষায় ইহা লিখিত তাহা কি বাংলা? সেখানেও ফাঁকি সুস্পষ্ট। ইংরেজী না জানিলে কি উহা বোধগম্য হয়? আর আজ কি আমরা আমাদের এই জীবনের ও প্রয়াসের কথা শুধুমাত্র বাংলা দৈনিক ও বাংলা সাময়িক পত্রের মারফতে বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে পারি? বাংলা ভাষা কি বাংলার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাটুকুও বলিয়া উঠিতে পারিতেছে? এই জন্যই বোধ হয়, সস্তা বাংলা দৈনিক-পত্র ছাড়িয়া বাঙালী এত ইংরেজী ভাষার জাতীয়-ভাবাপন্ন সংবাদপত্র কিনিতেছে। আসলে সংবাদ-সংগ্রহের দিক হইতেও বাংলা ভাষা যথেষ্ট নয়, জাতীয় ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যেও ইহাকে একমাত্র পুঁজি করা চলে না।

অবশ্য ইহার একটা কারণ আছে। জাতীয় আন্দোলন একান্ত করিয়া বাঙালীরই জিনিষ নয়, উহা সমগ্র ভারতবর্ষের সাধনা। বাঙালী যখন জাতীয়তার ভেরী নিনাদিত করিতে যায়, তখন সে সমগ্র ভারতের দিকে চাহিয়া সমগ্র ভারতকে আহ্বান করে। সেই আহ্বান-বাণী তাই বাংলায় হয় না,—ভবিষ্যতে হিন্দী হইবে কিনা জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানে এই 'স্বদেশী'র বাহন বিদেশী ভাষা।

মানুষের কর্ম্মজীবনের মূল কথা জীবিকা। বাঙালীর জীবিকার ভাষা কি বাংলা? প্রাচীন পদ্ধতির ব্যবসা-পত্রে বাংলা ভাষার অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের নূতন নূতন পথ প্রতিদিন খুলিতেছে, সেখানে বাংলা ঢুকিতে পায় না। টাইপ্‌-রাইটার, শর্টহ্যাণ্ড-এর সহায়তা না পাইলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ রাজ্য-বিস্তার ও ভাষা-বিস্তার অনেক সময়েই বণিক্‌-শ্রেণীর দ্বারা সাধিত হয়। বাঙালী বণিকই বা কয়জন আছেন?

চিরদিনের ঘরোয়া কথা ছাড়া অন্য কথা বাংলা ভাষা কতটা কহিয়া উঠিতে পারে, তাহার পরীক্ষা এখনও হয় নাই। তবে বাংলা ভাষা যে চিন্তা-জগতের বা জ্ঞান-জগতের প্রবেশ-দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাহা স্পষ্ট। কথাটা বিশদ করিবার প্রয়োজন নাই। বাংলাভাষার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা যাঁহাদের সাধনা হইয়াছিল, অন্তত তাঁহাদের বাংলা-প্রীতিতে সন্দেহ করা চলে না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ইংরেজীতে রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রায় এক ডজন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "Origin and Development of Bengali Language" নামক বাংলা ভাষার সুবৃহৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বাংলাভাষা ও বাঙালী জাতির গোড়ার কথা' নামক একটি বড় বাংলা প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৩৩) তিনি বাংলাভাষায় উহার সারকথা পূর্ব্বাহ্লে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 'বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের কথা' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্প্রতি ছাত্র-সাধারণের জন্য উহার সারমর্ম্ম পুনঃ-বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার ইতিহাস শুনিবার মত আগ্রহ কোথাও লক্ষিত হয় নাই। হয়ত এইরূপ গ্রন্থ বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়; কিন্তু বাঙালী কি নিজ ভাষা সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞানে তৃপ্ত রহিবে, বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চাহিবে না?

অবশ্য ইহারও একটা কারণ আছে—শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই ইংরেজী শিক্ষিত। চিন্তাপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে রচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু, ইহাঁদের মনের দুয়ারে আলোক পৌঁছায় ইংরেজী ভাষা। বাংলা ভাষা তাঁহাদের গৃহ-কর্ম্মের ও ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের সামগ্রী। তাই, বাংলা ভাষায় সুচিন্তিত বা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের জন্য দাবী নাই, তাহার পাঠকও নাই। যাঁহারা পাঠক হইতে পারিতেন, তাঁহাদের ইংরেজীতে উহা পাইলেও আপত্তি নাই।

বাংলা ভাষায় যে জ্ঞান-গভীর গ্রন্থ রচিত হইতেছে না, তাহার অন্য একটি কারণও আছে। পৃথিবীর সুধীসমাজের মাতৃভাষা যাহাই হোক্, স্বভাষা আজ ইংরেজী, কদাচিৎ ফরাসী বা জার্ম্মান। যিনি সভ্য-সমাজকে কথা শুনাইবেন, তিনি ইংরেজী বা ঐ শ্রেণীর প্রধান ভাষার আশ্রয় লইবেনই। বাঙালী সুধীও কহিবার মত কথা থাকিলে ইংরেজীতে কহেন। বাংলা ভাষায় সে কথা বলিতে হইলে তিনি তাহার সহিত অনেকটা জল মিশাইয়া তত্বটি বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত করিয়া দিতে ভুলেন না। বাঙালী পাঠকের প্রতিও তাঁহার যেমন শ্রদ্ধা নাই, বাংলা ভাষার প্রতিও তাঁহার তেমনি শ্রদ্ধার অভাব। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভিন্ন কোনও বাঙালী পৃথিবীকে শুনাইবার মত গবেষণা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ রাখিয়া কি তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন?

রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার ও নিজ প্রতিভার প্রতি আস্থার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষাকে জ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাশীল বাঙালীর বিদ্যার বা বুদ্ধির বাহন করিতে পারেন নাই, পারিবার কথাও নয়। আমাদের শিক্ষার বাহন যতদিন ইংরেজী থাকিবে, ততদিন আমাদের চিন্তার বা শিক্ষার খোরাক জোগাইবার জন্ত আমরা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করিব না। এই কারণেই এই ভাষার প্রাণে যে কতটা শক্তি আছে আজ পর্য্যন্ত তাহা যথেষ্ট রূপে যাচাই করিবারও সুযোগ হয় নাই। বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হইলে এদিকে তাহার একটা পরীক্ষা হইত, এবং সে পরীক্ষায় ডাক পড়িলে এই সদা-সঙ্কুচিতা ভাষা নিজের শক্তির পরিচয় দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইত। তখন বুঝা যাইত, বাহিরের কত ভাব ও বস্তুকে সে গ্রহণ করিতে পারে বা ঠেকাইতে পারে, নিজেকেই বা কতটা সে প্রসারিত করিতে পারে। কিন্তু বড় দেরী হইয়া যাইতেছে—ভাষা হিসাবে আমরা দ্বৈমাতুর হইয়া পড়িয়াছি, বিমাতার গৃহেই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, এমন কি সেখানেই আমাদের স্বমাতৃ-সেবা ও স্বমাতৃ-পরিচয়ের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা না জানিলেও ক্ষতি নাই, আর বাংলাভাষার উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে বাংলাভাষায় রচনা করিবার মত শক্তিটুকুরও দরকার নাই। Stepmother's hall-এ যদি মাতৃভাষার ঠাঁই হইয়া থাকে, তবে সে second language রূপে,—ইহাতে বিন্দুমাত্রও গৌরবের বা ভরসার কারণ নাই। বাংলা ভাষা বাঙালীর জীবনেরও সর্ব্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ভাষা হইয়া আছে।

ইংরেজী ভাষার বাহনত্ব বর্জ্জন করিবার সময় আসিয়াছে, কিন্তু তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। বাংলা ভাষাকে চণ্ডীমণ্ডপের ও চতুষ্পাঠীর গণ্ডী হইতে ইংরেজী ভাসাই টানিয়া বাহির করিয়াছে। তাহা না হইলে, পৃথিবীর আলো-বাতাস বঞ্চিত বাংলা ভাষা পাঞ্চালীর ছন্দে অনুস্বার বিসর্গের টঙ্কার ও সমাসের শরশয্যায় চিরশয়ন লাভ করিত, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে হইত না, কারণ এ ভাষার বর্ত্তমান বলিয়াও তেমন কিছু থাকিত না।

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা

বর্ত্তমান বাংলা ভাষার একটা বড় গর্ব্বের বস্তু আছে—তাহা বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষার অনুরাগী এক-জন ইংরেজ অধ্যাপক বলিয়াছেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটি মাত্র ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে—একটি ইংরেজী, অপরটি বাংলা।"

যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে সে ভাষা হয়ত নানা কারণে পৃথিবীর অন্যতম অগ্রগণ্য ভাষা বলিয়া

পরিগণিত না হইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের মত সাহিত্য যদি সৃষ্টি হয়, তবে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান থাকিবে। বুঝিতে হইবে তাহার অন্তরে অমৃতত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই; এই পৃথিবীর অমৃত-পিয়াসী অমৃত-সন্তানগণ যুগে যুগে তাহার সুধারস পান করিবার জন্য তাহার উপলাবরণ খুঁড়িবে। তেমনিতর ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত। এই সব dead language মরিয়াও অমর।

সাহিত্য তাই খুবই বড় জিনিষ। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এই দাবী করিবার অধিকার আমাদের নাই, একজন সদাশয় ইংরেজ অধ্যাপকের উদ্ধৃত উক্তিতে আমরা যেন এই সত্য বিস্মৃত না হই। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ঐ মত মানিয়া লইলে মনে হয় যে, বাংলা ভাষার বৈভব তাহার একশত বৎসরের ইতিহাস লইয়া। কারণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু নাই, যাহার তুলনায় তুলসীদাস, সুরদাসও কবীরের হিন্দুস্থানী, বা অসংখ্য আলোয়াড়-সেবিত তামিল, নরসিংহ মেহ্‌তা ও বহু বহু ভক্তের গুজরাতী সাহিত্য একেবারে সাহিত্য নামের অযোগ্য হইয়া যায়। বাংলা ভাষার সম্পদ এই একশত বৎসরের সাহিত্য।

এক শত বৎসর জাতির জীবনে বা ভাষার জীবনে খুব দীর্ঘকাল নয়। কিন্তু গত একশত বৎসর পৃথিবীর জীবন্ত ভাষাগুলির জীবনে এক কল্পান্ত সূচিত করিয়াছে। সেই তুলনায় এই একশত বৎসর পরেও বাংলা সাহিত্য নিতান্ত স্বল্প-পরিসর। যে বাংলা সাহিত্য লইয়া আমরা গর্ব্ব করি ও গৌরব বোধ করি তাহার প্রবাহ সঙ্কীর্ণ ও অপরিসর—এতই অপরিসর যে নিতান্ত সন্ধানী লোক না হইলে এই বিসর্পিত রজতরেখা কোনও বিদেশীর চোখে পড়িবার কথা নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে বাংলা সাহিত্যের পত্তন হয় তাহার ভাব উৎস ইংরেজী-সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ বাঙালীর কল্পনা-বৃত্তি। বাংলার যে সাহিত্য শ্রদ্ধেয় তাহা imaginative literature—কাব্য, বিশেষ করিয়া খণ্ড কবিতা, কথা-সাহিত্য ও কতকাংশে নাট্য-সাহিত্য। প্রায় শত বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু যে প্রতিভা নব-নব খাদ কাটিয়া বাংলা সাহিত্যের সেই প্রথম প্রবাহকে সুপরিসর করিয়া তুলিবার কথা, বাঙালী-জাতির মধ্যে তাহার আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। রস-সাহিত্যের বাহিরে বাংলা সাহিত্যে যাহা রচিত হয়, তাহাতে প্রাণরসের স্পর্শ নাই, তাহা অতি সামান্য ও নগণ্য।

দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে, বাংলায় সত্যকারের প্রবন্ধ-গ্রন্থ, আলোচনা, সমালোচনা, বাদ-প্রতিবাদ, জীবনী, জীবন-স্মৃতি, রোজনাম্‌চা, চিঠি-পত্র, ভ্রমণ-কাহিনী, দেশ-বিদেশের পরিচয়-কথা, প্রাচীন ইতিহাস, সমসাময়িক ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাণ, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, বিভিন্ন বিজ্ঞানের নব-নব জয়-লেখা, অর্থবিজ্ঞানের আলোচনা, শিল্প-জগতের উত্থান-পতনের সমস্যা, জীবন-যাত্রার পট-পরিবর্ত্তন, আধুনিক চির-পরিবর্ত্তমান রাষ্ট্র-নীতি, প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের পরিচয়, শিশু-সাহিত্য, শিক্ষা-সাহিত্য, সঙ্গীত-সাহিত্য, সমর-বিদ্যার সাহিত্য,—সাহিত্যের এই সব শত শত বিভিন্নরূপের কোন নিদর্শনই মিলে না। অথচ, এই সব বিষয় আমরা যে নিতান্ত গৌণ মনে করি, তাহাও নয়। যিনি ইংরেজীভাষার প্রসাদে বঞ্চিত ও বাংলা সাহিত্যই যাঁহার একমাত্র খোরাক, তাঁহার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা অপরিসীম। বাংলা সাহিত্য যে অবজ্ঞেয় আমাদের এই মনোভাবই কি তাহার প্রমাণ নয়?

সাহিত্যের সহস্রদ্বারী মন্দিরের কত দুয়ার যে আজও আমাদের নিকট রুদ্ধ রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতাম যদি ইংরেজীর চাবিকাঠি কেহ আমাদের হাত হইতে হঠাৎ ছিনাইয়া লইয়া যাইত। তাহা হইলে দেখিতাম আমাদের সাহিত্য-সরস্বতীর পাদপদ্ম মাসিকপত্রের যে পুষ্পদলের উপর স্থাপিত রহিয়াছে তাহাও শতদল নয়। বাংলা মাসিকপত্র আয়তনে অতিকায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যায়, বিষয়-নির্ব্বাচনে, বা ক্ষেত্রের পরিধিতে কোথাও ঐশ্বর্য্যের

পরিচয় নাই। অথচ, এই যুগের বাংলা সাহিত্যের ইহারাই বাহন। মনে রাখা উচিত, মাসিকপত্র ইংরেজী সাহিত্যের বা ঐরূপ কোনও বড় সাহিত্যের প্রধান বাহন নয়, এবং ইংরেজী ও ঐরূপ প্রধান-প্রধান ভাষার মাসিকপত্রের জীবন প্রথমতঃ পাঠকের শ্রেণীভেদে ও দ্বিতীয়ত লেখার বিষয়ভেদে নিয়মিত হয়। বিশেষ বিদ্যার জন্ম বিশেষজ্ঞদের লেখা ও সাধারণ পাঠকের জন্ম সাধারণ ধরণে লেখা বহু-বহু মাসিকপত্র রহিয়াছে। বাংলা একখানা মাসিকপত্রের সহায়ে আমরা ইংরেজীর অন্যূন চারিটি বিভিন্ন ধরণের মাসিকপত্রের কাজ চালাইতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থাৎ আমাদের মাসিক-পত্রের বিষয়-বৈচিত্র্য অনেকক্ষেত্রেই অনভিজ্ঞ ও অপটু লোকের কৃপায়, ইহা economy of efforts নয়। তাই, ইহাতে বাংলা মাসিকপত্রের দৈন্যই সূচিত হইতেছে।

বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ও দৈনিক পত্র দুইই প্রায় নগণ্য; অথচ বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য এই সংবাদপত্রের আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিবার কথা।

অবশ্য বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের এই সঙ্কীর্ণ স্রোতটুকু দেখিয়া হঠাৎ অবসন্ন হওয়া উচিত নয়। বাংলা সাহিত্য চিরদিনই বড় অপরিসর খাদে চলিয়াছে। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন:—"প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একঘেয়ে ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের শত শত বিভিন্ন অনুবাদ, সেই এক লাউ-সেনের কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে কবিদের একঘেয়ে কাব্যরচনা, সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা স্তোত্র ও বারমাস্যার একই ভাবে বর্ণনা।"

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য নূতন প্রেরণাবলে নূতন আয়োজন লইয়া খাদ বদলাইয়াছে, কিন্তু নিজের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছাড়িতে পারে নাই। ইহার তুলনায় হিন্দী ভাষাও বেশী সাহসী। তাহার সৃষ্টিতে নিপুণতার অভাব প্রত্যক্ষ; কিন্তু খাল কাটিয়া হিন্দী ভাষা দিবা-রাত্রি নিজেকে প্রসারিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সৃষ্টিতে সে পরাজিত হইলেও সাহসে হার মানিতে চাহিতেছে না।

বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আশ্রয় কল্পনা-সৃষ্ট সাহিত্য বা রস-সাহিত্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত, রস-বিচারও বাংলা সাহিত্যে সুলভ জিনিষ নয়। বাংলায় রস-বিচার মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মাসেকের আয়ু লইয়া জন্মায়, মাসান্তে তাহার শ্রাদ্ধও শেষ হইয়া যায়; গ্রন্থাগারে নিত্যবস্তু হওয়ার স্পর্দ্ধা বা দাবী এই সব প্রবন্ধ রাখে না।

রস-সৃষ্টিতেও বাঙালীর কল্পনা মাত্র তিনটি শ্রেণীতে আবদ্ধ—উহার বাহিরে উৎসারিত হয় না। হয় খণ্ড-কবিতা, নয় কথা-সাহিত্য, কদাচিৎ কথানাট্য,—ইহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ। ইহার মধ্যেও নাটকের কথা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কারণ উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক এখনও জন্মায় নাই। খণ্ড কবিতা এই 'কাব্যি রোগের' দেশে অসংখ্য, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কেহ বড়-একটা পড়ে না। গল্প ও উপন্যাসের সম্বন্ধে ধারণা এই যে, অন্তত বাংলা দেশে ও-বস্তুর অজন্মা হইবে না। কিন্তু, যাঁহারা মাসিকপত্রের সম্পাদকের দুশ্চিন্তার হেতুর খোঁজ রাখেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে গল্পের পরগাছা ও উপন্যাসের আগাছার জন্যও সম্পাদকের কত কাড়াকাড়ি।

অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য শুধু বৈচিত্র্যহীন রস-সাহিত্য নয়, এ ঐশ্বর্য্যহীন রস-সাহিত্য। সকল রসের বিকাশও ইহাতে নাই। ইহার রসসৃষ্টিতে রসিকতারই স্থান নাই—ইংরেজীর 'হিউমার' বাংলার প্রাণধর্ম্মের অগোচর, ফরাসীর 'আয়রনি'ও বাংলা-সাহিত্যিকের অমার্জ্জিত মনে ফুটিবার মত নয়। বাংলা সাহিত্যের আশ্রয় চোখের জল—আদিরসের, বীররসের বা করুণ রসের, যে কোনও রসেরই সমাবেশ-প্রয়াসে তাহার দ্যোতনা হোক্ না কেন। Pure spirit of comedy বা pure spirit of tragedy—দুইই বাঙালী সাহিত্যিক মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়।

কিন্তু পরিসরতাই একমাত্র কথা নয়। সঙ্কীর্ণজীবের বাধাকে মানিয়া লইয়াও জীবনে সার্থকতা লাভ সম্ভব হয় যদি জীবন-প্রবাহে গভীরতা থাকে। সৃষ্টিকর্ম্মে, রূপকর্ম্মে উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নাই, আছে গভীরতার—

গভীর দৃষ্টির, গভীর ধ্যানের ও গভীর উপলব্ধির। বাংলা সাহিত্যে তাহাও নাই।

সাহিত্যিক সত্যের নিকষ-পাষাণে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের দাগ কষিলেই বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে কতটা বিষয়-বস্তুর গভীরতা, কতটা দৃষ্টির গভীরতা, কতটা বা ভাবানুভূতির গভীরতার অভাব। গোড়াতেই একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার চোখে পড়ে—যে বাংলা দেশ বাংলা দেশ, বাংলা যে সমাজ সত্য-সত্য বাঙালী, বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে তাহাকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাহিত্যে গভীরতার মত আর একটি ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে—লিপিকুশলতা, আর্ট, বা যাহা নিছক রূপকর্ম্মের দিক্। এ ধর্ম্ম মানুষের শিক্ষা, সাধনা, অভ্যাস ও রসবোধের উপর নির্ভর করে। বাংলা সাহিত্যিক এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

বাংলা সাহিত্যই বাংলা ভাষার গৌরব—কিন্তু সে গৌরবের আশ্রয় কত সামান্য। এই সাহিত্য (১) সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ; ইহার সাহসও অল্প ; (২) ইহার গভীরতা, উদারতা ও গাম্ভীর্য্য নাই—তাই ইহাতে অনুকৃতি আছে, সৃষ্টি নাই, ইহা পরগাছা ও আগাছা মাত্র ; (৩) ইহা অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রদ্ধাহীন অনিপুণ সাহিত্যিকের রচনা, তেমনিতর অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রদ্ধাহীন অমার্জ্জিতমনাঃ পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত।

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ যাহার উপর নির্ভর করে, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎও তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে—সে বাঙালী জাতির উপর। বাঙালী যদি বড় জাত হইতে পারে, মুখ্য জাত হইতে পারে, বাঙালীর ভাষাও বড় হইবে, মুখ্য ভাষা হইবে। বাংলা ভাষা ও বাংলা জাতি অতীতে ও বর্ত্তমানে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার একবার সন্ধান লইলে এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার হইবে।

হাজার বৎসর হইতে চলিল বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষা জন্মিয়াছে—বয়সের দিক হইতে ইহা কম কথা নয়। বাঙালী জাতি বাংলা ভাষার সহজাত কবচ-কুণ্ডল লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। নেশানের জন্মকথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলিবেন, এই ভূমির পরিধি ও ও ভাষার পরিধাই নেশানত্ব সংরক্ষণের উপায়। তথাপি বাঙালী কেন নেশান হইতে পারে নাই ? সে যুগের বাংলা ভাষার অতি সামান্য নিদর্শন মিলে, কিন্তু তাহার অনেক বেশী নিদর্শন পাই অপর একটি ভাষার। কাহ্নু, সরোহ প্রভৃতি যে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ 'চর্য্যাপদে' দেশী গান গাহিতেছেন, তাঁহারাও জানেন যে, এ ভাষা নিতান্ত প্রাদেশিক। তাই, 'দোহাকোষে' দেখি, যাহা তৎকালীন উত্তরভারতের জানা ভাষা, সভ্য ভাষা, সেই পশ্চিমা অপভ্রংশে তাঁহারা গান রচনা করিতেছেন। আরও অনেক পরে বিদ্যাপতি মৈথিলীতে দেশী গান বাঁধিতেছেন, কিন্তু 'কীর্ত্তিলতা' প্রভৃতি সাহিত্য রচনা-কালে তিনি যে 'সব্‌সে মিট্‌ঠা' 'দেশী বুলির' আশ্রয় লইলেন তাহা সেই 'অবহট্‌ঠা'। স্মরণ রাখিতে হইবে এই 'অবহট্‌ঠা' প্রাচীন হিন্দুস্থানীর ঠিক পূর্ব্বতন সংস্করণ। যুগে যুগে এই শৌরসেনী অঞ্চল শিক্ষায়, সাধনায়, সংস্কৃতিতে, বলবীর্য্যে, সমগ্র আর্য্যভারতের হৃদ্‌কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে ; তাহার ভাষাই,—সে শৌরসেনী প্রাকৃতই হোক্ বা পরবর্ত্তী অপভ্রংশই হোক্—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের মূল ভাষা বা আদর্শ ভাষা বলিয়া আদৃত হইয়াছে। সেনরাজত্বে যখন বাঙালী জাতি উত্তর ভারতের মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া আসিল তখনও তাহার দৃষ্টি শৌরসেনী অঞ্চলে নিবদ্ধ। নিজের একটা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান সে পাইল কিন্তু ভাষার পরিখায় তাহাকে একান্ত করিয়া লইয়া সে আর্য্য-গোষ্ঠীর বাহিরে বড় হইতে চাহিল না, এমন কি হিন্দীভাষী অঞ্চলের ভাষার নেতৃত্বও অস্বীকার করিল না। অর্থাৎ বাঙালী স্বাতন্ত্র্য পাইল, বিচ্ছিন্নতা চাহিল না, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ লাভ করিল, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কামনা করিল না, নিজের বিকাশের পথ খুঁজিল, কিন্তু ভারতভূমির প্রতি যে greater loyalty আছে তাহা বিসর্জ্জন দিয়া নয়।

জন্মক্ষণেই বিধাতা বাঙালী জাতির ললাটে যে অদৃষ্ট-

লিপি লিখিলেন তাহার আভাস দোহাকোষেই পাওয়া গেল—বাঙালী জাতির স্থান চিরদিনই ভারতবর্ষের ছত্রছায়ায়, চিরদিনই তাহার স্থান গৌণ। আর্য্য সভ্যতার সীমান্তভূমি হওয়াতে সে যেমন নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তেমনি সে অপরদিকে আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমিকে বারবার নমস্কার করিয়াছে। বাংলায় নূতন স্মৃতিরচনা হইতেছে,বিশিষ্ট আচারপদ্ধতির উদ্ভব হইতেছে, আর্য্যেতর ভাব ও ভাষা ভিড় করিয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি ভারতের বৃহত্তর আর্য্যসমাজের সঙ্গে সে বিচ্ছিন্নতা কামনা করিতেছে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী গিয়াছে, কিন্তু এই মনোভাবের বা অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। হিন্দুর দৃষ্টি চিরপবিত্র উত্তরাপথের দিকে, তীর্থ-মেখলা ভারতভূমিকে সে মনে মনে পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। মুসলমানসমাজের দৃষ্টিও দিল্লীর তখ্‌তের দিকে, শাহান্ শাহ-এর মর্জ্জির খোঁজে।

একবারমাত্র ভাগ্য যেন বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পশ্চিমের বণিক্ তাঁহার মানদণ্ড ও রাজদণ্ড লইয়া এই পূর্ব্বদিগন্তেই প্রথম উদিত হইলেন, এবং তাঁহার সোনার জীয়নকাঠী বাঙালীর চোখেই প্রথম ছোঁয়াইলেন। সেই এক মুহূর্ত্তে মনে হইল যমুনার তীর-ভূমি হইতে বুঝি ভারতের জীবনকেন্দ্র ভাগীরথীর তীর-ভূমিতে সরিয়া আসিল। তাই, তখনকার বাঙালীর মনে ও দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের অপেক্ষাও বাংলা বড় হইয়া উঠিয়াছে—বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার আশা ও বাংলার ভাষা ধন্য হউক, সত্য হউক, এই প্রার্থনা 'বন্দেমাতরং' এর কবি হইতে রবীন্দ্রনাথে পর্য্যন্ত সমভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু বড় দেরী হইল—এই যুগ পৃথিবীকে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধিবার যুগ, দূরকে নিকট করিবার যুগ, পরকে আপন করিবার যুগ। নেশান হইতে হইলে জাতির যে কায়িক-মানসিক সর্ব্ব-বিচ্ছিন্ন উগ্রতার প্রয়োজন, তাহা ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে পাওয়া সম্ভব ছিল। এক রাষ্ট্রাধীন হইয়া বাঙালীর পক্ষে ভারতবর্ষের পর হওয়া এই ঐক্য-সাধনার যুগে আর হইয়া উঠিল না। এদিকে যে জীয়নকাঠীতে আমরা জাগিয়াছি তাহাতে ভারতের অপরাপর প্রদেশও জাগিয়া বসিয়াছে। ভারতবর্ষের ঐক্য আজ শুধুমাত্র cultureএর silken tie মাত্র না রহিয়া একই রূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষার, এমন কি একই শাসনপদ্ধতির সুদৃঢ় ইস্পাত-বন্ধনে দৃঢ়তর হইতে চাহিতেছে। খুব সম্ভব ভারতবর্ষের ভ্রাতৃজাতি-মণ্ডলীর মধ্যে বাঙালী কনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে না, কিন্তু বাঙালী এই গোষ্ঠীর একজন মাত্র, একক বা একান্ত হইবার সম্ভাবনা তাহার নাই। যে ভাবী রাষ্ট্রীয়মণ্ডলীর সে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে সেখানে তাহার ভাষার প্রভাব ও প্রসার অতি সামান্য। এই হিসাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের পটভূমিকায় স্থাপন করিলে প্রতীতি হয়, বাঙালী প্রাদেশিক জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষা হইয়া রহিবে। হিন্দুস্থানের মহাভাষা কি হইবে ঠিক নাই, কিন্তু বাংলা হইবে না নিঃসন্দেহ।

ভারতবর্ষের জাতিগোষ্ঠীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিলেও বাঙালী মুখ্যজাতি হইতে পারিত না। মহাজাতি হইতে হইলে পৃথিবীর মহাজাতিগুলির সমকক্ষ হওয়া চাই। এইরূপ সমকক্ষতা করিতে পারিলেই আমাদের ভাষা মুখ্যভাষা হইয়া উঠিবে। কিন্তু বাঙালী জাতি পৃথিবীর মুখ্যজাতি, ও আমাদের ভাষা এই জয়দৃপ্ত জাতিদের সমকক্ষ, ইহা করিতে হইলে, আমরা কোন্ স্থান হইতে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিব? সেই মহাহবে বাঙালী বলিয়া দাঁড়াইলে কি আমাদের দাঁড়াইবার মত ক্ষেত্র আছে? না। সেই বল-পরীক্ষায় বাঙালী বলিলে আমাদের দাঁড়াইবারও স্থান নাই। দাঁড়াইতে হইলে আমাদের ভারতবাসী বলিয়াই নিজেদের পরিচয় দিতে হইবে, আর সে পরিচয় যদি কোন নিজস্ব ভাষায় দিতে হয়, তবে সে ভাষাও বাংলা হইবে না।—

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ রাহুগ্রাস মুক্ত হইলে বাঙালীও মুক্ত হইবে, কিন্তু বাঙালীত্ব জয়যুক্ত হইবে না; যে-ভূমি যুগে যুগে ভারতের হৃদয়কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এবং যাহার ভাষাকে বাঙালীও বারে বারে নমস্কার করিয়াছে, তাহারই জয় হইবে।

উপসংহার

বাংলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা হিসাব লওয়া গেল। ইহা হইতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি আভাস পাওয়া যায়:—

(১) মধ্য যুগ হইতে বাংলা ভাষার যে-রূপ প্রায় স্থির হইয়া আসিতেছিল, উপভাষার বাধা হয়ত তাহাকে আর সহিতে হইবে না। উপভাষা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মুসলমানী অপভাষা বাংলা ভাষার ঐক্যকে ভাঙিয়া দিতে পারে। আর উপভাষা, হিন্দী ও ইংরেজীর আক্রমণে এ-ভাষার এমন রূপান্তর সম্ভব যে ইহাকে আর চেনা যাইবে না। হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী ও ইংরেজীর বিশ্ব-ভাষা হওয়ার দাবী স্বীকার করিলে বাংলা ভাষার নিজের প্রাণ ও নিজের দাবী সংরক্ষণ সম্ভব কি না, অস্বীকার করিবার মত শক্তিই বা তাহার আছে কি না—ইহাই বাংলা ভাষার বর্ত্তমান সমস্যা।

(২) বাংলা ভাষার প্রধান গৌরব তাহার সাহিত্য। সে সাহিত্য অপরিসর, অগভীর ও অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচায়ক—ইহা শিক্ষাভিমানী বাঙালী সাহিত্যিকের স্মরণ রাখা উচিত। তবে বাঙালীর রসবোধ আছে, যদি জীবন সম্বন্ধে সে serious হয়, তবে তাহার সাহিত্য আয়তনে না হোক্ গভীরতায় সমৃদ্ধ হইবে। তাহাতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর একটি অগ্রগণ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত না হইলেও শ্রদ্ধের ভাষা বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে।

(৩) বাংলা ভাষাকে মুখ্য ভাষা হইতে হইলে বাঙালী জাতিকে মুখ্য জাতি হইতে হয়। ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে বাঙালী আর তাহা হইতে পারিবে না। বাংলা ভাষা গৌণ প্রাদেশিক ভাষাই থাকিবে।

(৪) বাংলা ভাষা বাঙালী জাতির 'সব-কাজের' ভাষা নয়, তাহা হইবার মত শক্তিও তাহার নাই। বর্ত্তমান সভ্যতা ও বর্ত্তমান যুগের দাবী মিটাইবার মত তাহার নমনীয়তা বা ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই।

তাই মনে হয় বাংলা ভাষার অদৃষ্টলিপি এই যে—ইহা বড় জোর এক রসবেত্তা জাতির রস-রচনার ও গৃহকর্ম্মের ভাষা হইয়া থাকিবে, পৃথিবীর কোনও বড় ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে না।

এ গ্রহাচার্য্যের উক্তি নয়—এ নিতান্ত সহজ পুঁজি-পাটার হিসাব, stock-taking, forecast নয়। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বাঙালী জাতির ভবিষ্যতের উপর—অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান জীবনের উপর, সাধনার উপর, শক্তির উপর। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক তাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন :—

"এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর দায়িত্ব আছে তাহার নিজের প্রতি, তাহার পিতৃপুরুষের প্রতি এবং তাহার ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের প্রতি।" বাঙালী সে দায়িত্ব স্মরণ রাখিবে কি না, রাখিবার মত শক্তি তাহার আছে কি না, ইহাই আজ আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন।

চাঁদ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তোমার রূপের জ্যোতি খেলা করে পরাণে আমার,
ওগো চাঁদ, এত কাছে উজল এমন!
তোমার ওরূপ মোরে শিশু করে দিয়েছে আবার,
কাঁদিয়া বাড়াই হাত, ধরিবারে মন।
কচি মেয়ে আমি যেন দু-হাত বাড়ায়ে
তোমারে বাঁধিতে চাই বুকেতে জড়ায়ে॥

আজ রাতে কত পাখী গান গেয়ে জাগে বারে বারে,
তোমার আলোতে আঁকা কণ্ঠে মণি হার
মুখে মোর কথা নাই চলে গেছি শব্দের ওপারে,
অবাক্ বন্দনা মোর আজি উপহার।
বনানী মুখর হ'ল কোকিলের স্তবে,
আমার অন্তরে প্রেম জাগিছে নীরবে॥*

* W.H. Davies-এর ছায়া অবলম্বনে

শ্রীনিত্যানন্দ চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

পণ্ডিত-মূর্খ

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম-এ

১
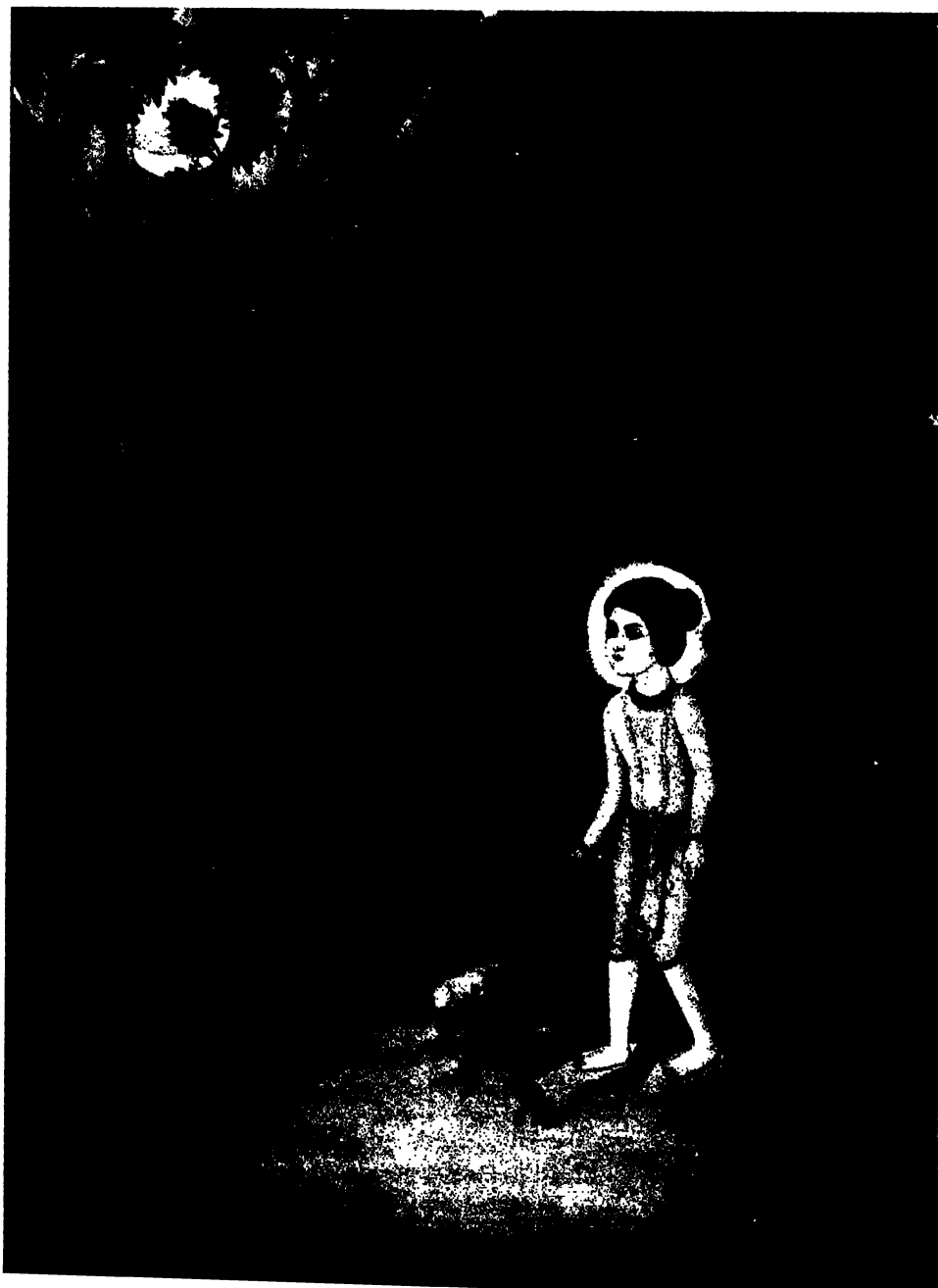
সেদিন রবিবার। জয়নগর স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্যামলাল কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ স্কুল বোর্ডিংয়ের একটি কক্ষে দিবা-নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। আহারাদির পর ভরপুর এক ছিলিম তামাক খাইয়া ছিন্ন সতরঞ্চি ঢাকা ক্ষুদ্র তক্তাপোষের উপর সছিদ্র বালিশে মাথা রাখিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গেই মুদিত হইয়া আসিতেছিল, তবু পার্শ্বস্থিত একখানি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন; এপাত-ওপাত উল্টাইতেই বড় বড় হরপের হেড্‌লাইন চোখে পড়িল—

শারদা বিল পাশ
ধর্ম্মধ্বজী গোঁড়াদের আস্ফালন
ভদ্রমহিলাগণের বাল্য-বিবাহ-নিরোধ
আইনের সমর্থন-সূচক প্রস্তাব

পণ্ডিত মহাশয়ের চোখের নিদ্রা ফিকা হইয়া আসিল। তিনি মনোযোগসহকারে সমস্ত সংবাদটি খুঁটাইয়া পড়িলেন, তারপর কাগজখানি রাখিয়া দিয়া নিজের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বছর তিনচার পূর্ব্বে এক ত্রয়োদশ-বর্ষের বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন—অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষে। ভাগ্যে এই বিল্‌টি তাহার পূর্ব্বে পাশ হয় নাই। নহিলে হাজারখানেক টাকা জরিমানা—এমন কি একমাস জেল পর্য্যন্ত হইতে পারিত! বয়স তাঁহার চল্লিশ পার অনেকদিন হইয়া গিয়াছে—এ বয়সে কি জেল খাটিতে পারিতেন। আর অতটাকা জরিমানা দেওয়া—সে তো ভিটামাটি বিক্রয় করিয়াও হইয়া উঠিত না। যাহোক, তাঁহার মস্ত একটা ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। তবু এই কথাটি চিন্তা করিতেও তাঁহার বুকটা কিছুক্ষণ টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল।

তাহার পর পণ্ডিত মহাশয় এই আইন লইয়াই আলোচনা করিতে লাগিলেন। চোদ্দ বছরের কম বয়সে মেয়ের বিবাহ হইতে পারিবে না—কি অদ্ভুত আইন বাপু! যে দেশে এগার বছরের মেয়ের সন্তান জন্মিতেছে—তাদের এত বাড়াবাড়ি কেন? কলিকাল, ঘোর কলিকাল—ধর্ম্ম আর থাকিবে না দেখিতেছি! হ্যাঁ, ছেলের বয়স বাঁড়াইয়া দাও, আপত্তি নাই। আঠার কেন, আট চল্লিশ কর—বেশ হইবে। তিনিও তো একচল্লিশ বৎসর বয়সে তের বছরের বাসন্তীকে বিবাহ করিয়াছেন—কই একটুও তো বেমানান হয় নাই। লোকে বলিয়াছিল—বেশ মানাইয়াছে, যেন হর-পার্ব্বতী। অবশ্য দুই একটা নব্য ডেঁপো ছোকরা তাঁহার সম্মুখেই টিটকারি দিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের কি চোখের দৃষ্টি আছে! আর বাসন্তীরও তো কোনও দিন মুখভার হইতে দেখা যায় নাই।

স্ত্রীর কথা মনে হইতেই তাঁহার মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। একা একা ছেলেমানুষ কতই না কষ্ট পাইতেছে। বাড়ীতে একটি বয়স্থ পুরুষ মানুষ নাই—মাত্র বার বছরের একটি ভাগ্‌নে অবলম্বন। কে-বা উহার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেয়। তবে আর বেশী দিন বিরহ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না—বড়দিনের ছুটিতেই লইয়া আসা ঠিক হইয়াছে। আড়তদার ভোলানাথ সা অমায়িক লোক সে-ই একখানি বাড়ী ছাড়িয়া দিবে কথা দিয়াছে। এইখানে তরুণী পত্নীকে আনিয়া কি ভাবে তাঁহারা কপোত কপোতীর জীবন অতিবাহিত করিবেন—ইহাই মানস নয়নে দেখিতে দেখিতে পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ দুটি মুদিত হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাধ্বনিও প্রখর হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। সহসা ধড়মড় করিয়া পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর চক্ষু রগড়াইয়া এদিক-

...দিক বিহ্বলভাবে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন—সময়টা সকাল কি সন্ধ্যা কিছুই ঠাওর করিতে পারিলেন না। অস্ফুট স্বরে তিনবার আওড়াইলেন—'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ।' এইবার তাঁহার মনে হইল মধ্যাহ্ন আহারের পর দিবানিদ্রা দিতেছিলেন—এখন সকাল নয়, সন্ধ্যা। উঃ, কি দুঃস্বপ্নই না দেখিয়াছেন—তাঁহারই চোখের সম্মুখে গুণ্ডারা বাসন্তীকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। এমন কি চীৎকার করিতে গেলেও গলা আটকাইয়া আসে। স্বপ্ন, তাই রক্ষা—যদি সত্যই হইত! তাহা হইলে বুক চাপড়াইয়া মরা ছাড়া এই বয়সে আর কি-ই বা করিতে পারিতেন।

তাঁহার সেই সংবাদপত্রের দিকে নজর পড়িল। এই কাগজগুলাই তো রোজ রোজ নারীর প্রতি অত্যাচারের কথা কত রকমে লিপিবদ্ধ করিয়া লোকের মাথা খারাপ করিয়া দেয়। কই আগে এত বাড়াবাড়ি দেখা যাইত না তো। এসব সম্পাদকের কারসাজি—কাগজের কাটতি বাড়াইবার ফিকির! রসাল গল্প ফাঁদিয়া হৈ চৈ করাটাই ইহাদের পেশা! তাঁহার দুঃস্বপ্ন দেখিবার হেতু এইবার তাঁহার উপলব্ধি হইল এবং যত রাগ গিয়া পড়িল ঐ কাগজখানার উপর। তিনি সেইটি হাতে তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। জানালার বাহিরে তাকাইয়া দেখিলেন—তখনও ছেলের দল সম্মুখের মাঠে হুটোপাটি করিতেছে, উল্লাসের যেন তাহাদের অন্ত নাই। কি জানি কেন তাঁহার রাগ ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়া পড়িল সেই ছেলের দলের উপর। মনে মনে ভাবিলেন—কি সব গুণ্ডা ছেলে বাবা! সারাদিন হৈ হৈ রৈ রৈ—এদিকে 'গজ' শব্দের রূপ করিতে গেলে মূর্চ্ছা যায়। দাঁড়াও কাল মজা দেখাচ্ছি তোমাদের—বেতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব। আর হেড্-মাষ্টারটিও তেম্নি। কড়া হুকুম—ছেলেদের বেত মারতে পারবেন না। মিষ্টি কথায় কি সায়েস্তা হয় ওরা।

হঠাৎ কি মনে করিয়া পাজি লইয়া পণ্ডিত মহাশয় জানালার নিকট ক্ষীণ আলোকে যাইয়া বসিলেন। পাজি খুলিয়া দেখিলেন—সেদিন পঞ্চমী। তারপর স্বপ্নফলের পৃষ্ঠাটি বাহির করিয়া দেখিলেন—শুক্লা পঞ্চমীর স্বপ্ন অতি সত্বর সিদ্ধ হয়। সর্ব্বনাশ! তাঁহার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল—হাত হইতে পাজিটা স্খলিত হইয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল।

হেড্মাষ্টার লাইব্রেরীর কক্ষে আলো জ্বালাইয়া বই লইয়া বসিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাশয় শুষ্কমুখে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হেড্মাষ্টার মুখ তুলিতেই পণ্ডিতের চেহারা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—বাঃ এ দশা কে করলে আপনার?

পণ্ডিত মহাশয় হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন—আজ্ঞে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল।

হেড্মাষ্টার নব্য যুবক, এখনও অবিবাহিত দুঃস্বপ্নের—কথা শুনিয়াই একটা আন্দাজ করিয়া লইলেন, কহিলেন,—দুঃস্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু সারা গায়ে মাথায় তুলো কেন?

পণ্ডিতের সেদিকে হুঁস ছিল না—এখন মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতেই ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন। হায়! এমন সময়ে তাঁহার সাধের বালিশটিও বাদ সাধিয়াছে। তিনি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিলেন—বালিশটি ছেঁড়া কি না। আর কেই-বা দেখাশোনা করে এখানে, ছিঁড়েছে তো ছিঁড়েই চলেছে।

হেড্মাষ্টার সহাস্যে কহিলেন—কিন্তু বালিশটি নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ না করলে তো এমন অবস্থা হতে পারে না। কোন ছেলের সাম্নে পড়েন নি তো?

এই বিদ্রূপে পণ্ডিতের ক্রোধের উদ্রেক হইল, কিন্তু উপায় নাই। তিনি নম্রস্বরে কহিলেন—স্বপ্নের ঘোরে কি করেছি খেয়াল নাই মশায়। তারপর কিন্তু কিন্তু করিয়া কহিলেন—চার দিনের ছুটি দিতে হচ্ছে মাষ্টার মশায়, একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

হেড্মাষ্টার কহিলেন—বলেন কি পণ্ডিত মশায়? এই তো মাসখানেক হ'ল পূজোর ছুটির পর বাড়ী থেকে এসেছেন, আবার কিছুদিন পরেই বড়দিনের ছুটি। এর মধ্যে আবার বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন হ'ল আপনার? না, আপনি হাসালেন দেখছি।

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—ছুটি দেওয়া-না-দেওয়া অবশ্য আপনার হাত। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি মনটা বড্ড উতলা হয়েচে।

হেডমাষ্টার মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তবু হাসিতে হাসিতেই কহিলেন—'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'—বিপদ ঐখানেই সে আমি বুঝেছি। আচ্ছা, ছুটি আপনি পাবেন, কিন্তু সস্ত্রীকই আসবেন এবার, বাসা ঠিক করে রেখে যান। কি জানি আবার কোন্ দিন দুঃস্বপ্ন-টপ্ন দেখলে ফ্যাসাদ হবে।

পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ধকার মুখে এইবার হাসির রেখা ফুটিল, তিনি এইবার একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিলেন যা—বলেছেন! ভোলা সা'র কাছে এখনই যাচ্ছি, ও একটা'ইল্লে করে দেবেই। দুঃস্বপ্নটা দেখে বুকটা এখনও ধড়াস্ ধড়াস করছে, পাঁজির ফলও সুবিধে নয়—তাতেই ভয়টা আরও বেড়ে গেল কি না!

হেডমাষ্টার এইবার বইয়ের দিকে ঝুঁকিলেন,—পণ্ডিত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

২

ট্রেনে যাইতে যাইতেও দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পণ্ডিতের এই কথাই মনে হয় বাড়ীতে গিয়া যদি বাসন্তীকে দেখিতে না পান, শুক্লা-পঞ্চমীর স্বপ্ন যদি সত্যে পরিণত হইয়া যায়!

দীর্ঘপথ কাটিতে চায় না। ট্রেন একটির পর একটি ষ্টেশন পার হয়, পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখেন আর কয়টি বাকী। দুই পাশে ক্ষেতের ওপারে গ্রামগুলি দেখা যায়, তাহার প্রতিঘরে স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতেছে—তবে কি বিধাতা তাঁহারই উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন!

আর একটি ষ্টেশন বাকী—পণ্ডিত মহাশয় গা ঝাড়িয়া বসিলেন। সঙ্গে একটি ক্যানভাসের ব্যাগে—সেইটি খুলিয়া দেখিলেন—স্ত্রীর জন্ম কেনা নতুন নীলাম্বরীখানি ঠিক আছে কি না। সেইখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে দুই/তিনবার তাহাতে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া সেখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ব্যাগটি বন্ধ করিলেন।

ট্রেন আসিয়া পরিচিত ষ্টেশনে থামিল, পণ্ডিত মহাশয় ব্যাগ হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন; ক্রোশ-দুয়েক পথ হাঁটিয়া তবে বাড়ী পৌছিতে হইবে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে দুই একটি করিয়া তারা ফুটিতেছে। মাঠের রাস্তা দিয়া পণ্ডিত মহাশয় হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন—আনন্দে ও শঙ্কায় তাঁহার মন দুলিতে লাগিল। গৃহে পৌছিয়া সব ভাল ভাবে দেখিতে পাইলে তিনি সওয়া-পাঁচ আনা হরির লুট দিবেন মানসিক করিলেন।

তিনি অন্ধকারে রাস্তার দিকে চাহিয়া চলিতেছিলেন, সহসা উপরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলেন—কক্ষচ্যুত একটি নক্ষত্র তীব্ররশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে ধরিত্রীর দিকে ধাবিত হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় সভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিলেন। একে তো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াই মনটি বিচলিত হইয়াছে, তাহার উপর এই অমঙ্গল দর্শন। এই অশুভ-দর্শনের ফল মিথ্যা অপবাদ। ভগবান ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। পণ্ডিত মহাশয় কোনও রকমে পাঁচটি ব্রাহ্মণ, নদী, ফুল ও বৈষ্ণবের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া এই অশুভের শান্তি কামনা করিলেন, তারপর দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিলেন।

গ্রামে পৌছিয়া তাঁহার দ্রুতপদ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল—কোনও রকমে পা টানিয়া টানিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে আলো জ্বলিতেছে, সেখানে পণ্ডিত মহাশয়ের ভাগিনেয় উচ্চস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিতেছে। বালকের কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চ স্বর তাঁহার কর্ণে যেন সুধার ধারা বর্ষণ করিল। না, তাহা হইলে কোনও অমঙ্গলই ঘটে নাই। বালক যখন নিয়মানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিতেছে, তখন এ গৃহে কোনওরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি আশ্বস্ত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া ব্যাগটি নামাইলেন। বালক মাতুলকে দেখিয়া পাঠ থামাইয়া বি[illegible] কহিল—মামা!

মাতুল মৃদু হাসিয়া কহিলেন—নিমাই, বেশ ভাল আছিস্ তো?

নিমাই মাতুলের পদধূলি লইয়া কহিল—হাঁ মামা। তুমি অসময়ে যে!

—অসময় আবার কি রে? তোদের জন্ত মনটা কেমন করছিল তাই দেখ্‌তে এলাম। তারপর ভালভাবে বসিয়া কহিলেন—একছিলিম তামাক খাওয়াতে পারিস বাবা? হাঁ, তোর মামীমা বেশ ভাল আছে তো?

বালক হাসিয়া বলিল—ভাল আছে বৈকি। আমি মামীমাকে খবর দি।

পণ্ডিত মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—দিলেই হবে, এত তাড়াতাড়ি কিসের। সে বোধ হয় রান্না-বান্না করছে, না রে? আচ্ছা, এবার যদি তোদের নিয়ে যাই—কেমন হয়? একা একা তোদের ভারী কষ্ট হয়, কি বলিস্? সেখানে তোরা বেশ থাক্‌বি—বড় ইস্কুলে তোকে ভর্ত্তি করে দেব—পড়াশোনা তোর ভালই হবে সেখানে। এখানে তো দেখবার শোনবার লোক নাই।

নিমাই আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—সে বেশ হয় মামা। তুমি এখানেই বস না হয়—আমি তামাক সেজে আনি।

পণ্ডিত উদারভাবে বলিলেন—থাক্ থাক্, তামাক একটু পরে খেলেও চল্‌বে—তোর সাথে একটু গল্পই করি। আচ্ছা, তোর মামীমা আমাকে দেখ্‌লে কি বলবে রে? বিরক্ত হবে না কি? আচ্ছা, আমার কথা তোকে কিছু বলতো না সে?

বালক একটু ভাবিয়া কহিল—কই মনে তো পড়ছে না।

পণ্ডিত মহাশয় বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন—হুঁ। তা বল্‌বারই বা কি আছে। মনে মনে নিশ্চয়ই—। তার পর কি মনে করিয়া নামিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন—এবার সবশুদ্ধ যাওয়াই যাক, কি বলিস্? একা একা তোদের এখানে ফেলে রাখা আমার ভাল বোধ হয় না।

নিমাই বুদ্ধি করিয়া কহিল—তাই কি আর হয় মামা। আমাদের নিয়েই চল।

পণ্ডিত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—তাই যাব। আর দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা আমার এম্‌নি বিগ্‌ড়ে গেল যে, দৌড়ে আসতে পথ পাইনে। এরকম বার-বার হ'লে কি আর ছুটি পাব। আচ্ছা, তোর মামীমা যেতে চাইবে তো?

বালক কহিল—তা আর চাইবে না—তুমি যে কি বল মামা! স্বপনের কথা কি বল্‌ছিলে যে!

দুঃস্বপ্নের কথাটি এই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের নিকট বলা যায় কি না পণ্ডিত মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় অদূরে বাসন্তীর গলার স্বর শোনা গেল—'কার সাথে বসে বসে গল্প হচ্ছে নিমাই' এবং সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া কহিল—ওমা, তুমি এমন অসময়ে যে!

পণ্ডিত মহাশয় একটু লজ্জিত হইলেন, তবু মুখে কহিলেন—বাড়ী আসবো তার আবার সময় অসময় কিসের। মন ভাল লাগছিল না—ছুটি নিয়ে এলাম চলে। হাঁ রে নিমাই, এইবার তামাক খাওয়া দেখি বাবা।

নিমাই উঠিয়া যাইতেই পণ্ডিত মৃদু হাসিয়া কহিলেন—মুখে বলতে লজ্জা হয় বটে, কিন্তু না বলেও পারিনে—তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার অসম্ভব। বুঝতে পারি একটু বয়স হয়েছে, উতলা ভাবও দেখানো যায় না, লোকে হাসবে, কিন্তু মনকে সুস্থির রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও তো মনকে বুঝিয়েই রেখেছিলাম—ফ্যাসাদ ঘটলো একটা স্বপ্ন দেখে। উঃ, কি স্বপ্ন বাবা, ভাবতে গেলেও গায়ে কাঁটা দেয়! তাই ছুটে এলাম তোমাকে দেখতে।

বাসন্তী ভাবিল—বুড়ো বয়সে কত ঢংই দেখবো। কিন্তু মুখে কহিল—বেশ তো।

পণ্ডিত উৎসাহিত হইয়া কহিল—এবার সঙ্গে করেই নিয়ে যাব তোমাদের। ভোলা-সা বাড়ী দিয়েছে একটা ঠিক করে। আর এই বয়সে কে-ই বা দেখা-শোনা করে আমার—একা একা ভারী কষ্ট হয়। সেদিন ছেঁড়া বালিশের তুলোয় সারা মাথা একাকার হয়ে গিয়েছিল দেখে হেডমাষ্টারের কি ঠাট্টা! আমার হয়েছে সবদিকে মুস্কিল কি না! আচ্ছা, সব কথা পরে শুনো। এইবার তোমার কাপড়খানা দেখ পছন্দ হয় কি না। এই বলিয়া তিনি ব্যাগ খুলিয়া নীলাম্বরীখানি বাহির করিলেন।

কাপড় হাতে লইয়া বাসন্তী সহাস্যে কহিল—আমার র রঙীন্ কাপড় পরার বয়স আছে এখনও ?

পণ্ডিত কহিলেন—শোন কথা ! এই তো ষোল বচ্ছর বে উত্তীর্ণ হয়েছে তোমার—এই তো রঙীন কাপড় রবার বয়স।

বাসন্তী কাপড়খানি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া য়া কহিল—তা বটে। কিন্তু তোমার স্ত্রী হয়ে এ াপড় পরা আমার আর সাজে না।

পণ্ডিত তাহার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, র মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—তার মানে ?

বাসন্তী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া কহিল—সব থারই কি মানে থাকে—ও আমি এম্নি বল্লুম। াচ্ছা, আমার জন্য তো কাপড় এনেছ, কিন্তু তোমার াগ্নের জন্য কি এনেছ দেখি।

পণ্ডিত লজ্জিত হইয়া কহিলেন—কিছুই আনা হয়নি বার, যে তাড়াতাড়ি আসা, সময় পেলাম কখন। ার জন্য ভাবনা কি—কাল না হয়—।

এমন সময় কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নিমাই আসিয়া পস্থিত হইল। বাসন্তী কহিল—তোর মামা তোর ন্য কি এনেছে দেখেছিস রে নিমাই ?

নিমাই মামার হাতে হুঁকাটি তুলিয়া দিয়া কহিল—ই না তো মামীমা।

বাসন্তী নিলাম্বরীটা তুলিয়া কহিল—এই দেখ্।

নিমাই লজ্জিত হইয়া কহিল—ধ্যেৎ ! আমি কি য়েমানুষ ?

বাসন্তী খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, ই না পরতে পারিস, তোর বৌয়ের জন্য তুলে রাখ্‌বো ি বলিস ?

পণ্ডিত হুঁকা হাতে করিয়া গুম হইয়া বসিয়া ছিলেন। বাসন্তী বলিল—তামাক খেয়ে হাত পা ধুয়ে স্ল, আমি খাবার জোগাড় দেখি। আয় রে, নিমাই াবি আয়।—এই বলিয়া বাসন্তী সেখান হইতে চলিয়া াগিল। পণ্ডিত মহাশয় নির্ব্বাক হইয়া সেইখানেই সিয়া রহিলেন, বাসন্তীর ভাব দেখিয়া হুঁকায় দম

৩

পরদিন প্রাতে মুখ গম্ভীর করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বহির্ব্বাটিতে বসিয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই, উপরন্তু বাসন্তীর ব্যবহারটিও কেমন হেঁয়ালীর মত বোধ হইয়াছে। সেই দুঃস্বপ্নটির কথা বাসন্তীকে তিনি সালঙ্কারে বলিয়াছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাসন্তী তাহা শুনিয়া শুধু উচ্চহাস্য করিয়াছে মাত্র। বিবাহের নতুন আইনটি লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াও তিনি বাসন্তীর সমর্থন পান নাই, উপরন্তু সে টিটকারি দিয়া বলিয়াছে—এ আইন যদি আর কিছুদিন আগে হইত! এই আইন আগে পাশ হইলে কি হইতে পারিত—পণ্ডিত মহাশয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তিনি স্ত্রীর কথার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিয়া মনে মনেই জ্বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস করেন নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া বসিয়া এই সব কথাই ভাবিতে-ছিলেন,—এমন সময় চাপরাস-আঁটা একটি লোক আসিয়া কহিল,—এখানে শ্যামলাল ভট্‌চাজ্ কেউ থাকেন ?

পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতভাবে কহিলেন—হ্যাঁ, আমারই নাম শ্যামলাল ভট্টাচার্য্য।

লোকটি আগাইয়া গিয়া একখানি ছাপা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল—আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

পণ্ডিত সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন—ওয়ারেণ্ট ! সে কি রে বাবা ! ওয়ারেণ্ট কিসের ? ওয়ারেণ্টখানি হাতে লইয়া তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তারপর কাগজখানি এদিক ওদিক উল্টাইয়া কহিলেন—ভুলতো হয়নি তোমার—আমি তো জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ কোনও অপরাধ করিনি।

—সে তো জানিনে মশায়। জামিন দেবার ব্যবস্থা না করলে যেতে হবে আমার সাথে।

পণ্ডিত ঘামিতে লাগিলেন, কোনও রকমে কহিলেন—এই তো কাল রাত্রে এসে পৌছেছি, এর মধ্যে এমন কোনও দূষণীয় কাজ তো করিনি বাপু ?

বিরক্ত হইয়া চাপরাশি কহিল—জবাব দেবেন

তাই তামিল করতে হবে তো। জামিন দেবেন, না যাবেন আমার সাথে?

পণ্ডিত কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল—জামিন হবে আমার কে? বাড়ীতে আছে আমার স্ত্রী আর এক ছোট্ট ভাগনে। এদের মধ্যে কেউ——

চাপরাশি হাসিয়া কহিল—আপনার মাথা খারাপ দেখতে পাই। লোক না থাকে চলুন আমার সঙ্গে।

—আচ্ছা দাঁড়াও দেখি বাপু। জ্ঞাতিদের মধ্যে যদি কেউ দাঁড়ায়, চেষ্টা দেখি।

পণ্ডিতকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া লোকটি কহিল—যাবেন কোথায়? আপনাকে কি ছাড়তে পারি? শেষকালটায় সরে পড়ে বিপদে ফেলুন আর কি!

পণ্ডিতের এইবার মর্য্যাদায় আঘাত পড়িল। তিনি উষ্ণ হইয়া কহিলেন—আমি ব্রাহ্মণ, পূজা-আহ্নিক না ক'রে জলস্পর্শ করিনে, আমার কথা বিশ্বাস কর না! একটা হাই ইস্কুলের হেডপণ্ডিত আমি, কাব্য-ব্যাকরণের উপাধি আমার আছে—ন্যায়ের পরীক্ষাটাও দিতে দিতে দিইনি। আমি পালিয়ে যাব—এই বিশ্বাস তোমার?

চাপরাশি হাসিয়া কহিল—একালে কাউকেও বিশ্বাস নেই মশায়।

পণ্ডিত এইবার ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং অগত্যা সেইখান হইতেই হাঁকাহাঁকি সুরু করিলেন। অনেকেই আসিল এবং তাহার মধ্যে একজন পণ্ডিতের জামিন হইল।

বাসন্তী সবকথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। হাসি দেখিয়া শ্যামলাল কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। কোনও সাধ্বী স্ত্রী কি স্বামীর বিপদে এমন উপহাসের হাসি হাসিতে পারে? পণ্ডিত মহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—এ আমি জানি, দুঃস্বপ্ন যখন দেখেছি বিপদ একটা হবেই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ তুমিও আমাকে উপহাস করচো!

বাসন্তী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—শুধু দুঃস্বপ্ন নয়, তারা-খসা দেখলে মিথ্যা অপবাদ তো হবেই।

পণ্ডিত মহাশয় মুখ ভার করিয়া কহিলেন—হুঁ। হও। কোথায় আমি ছুটতে ছুটতে এলাম তোমারই জন্য, আর তুমিই কি না—। দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বাসন্তী সহাস্যে কহিল—হাসি তোমার ব্যাপার দেখে। তুমি এতবড় পণ্ডিত—এই টুকুতেই অস্থির! সংস্কৃতের পণ্ডিত কি না! তার চেয়ে এক কাজ কর, আজই কাঁথি চলে যাও, দেখে এস কেন তোমার নামে ওয়ারেণ্ট হ'ল।

পণ্ডিত বুঝিলেন ইহাই সৎ যুক্তি। তিনি বিশেষ-কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে মহকুমার দিকে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়াও বিশেষ কিছু কাজ হইল না। দুইটি টাকা খরচ করিয়া মাত্র এই সংবাদ পাওয়া গেল—বিচার এখানে হইবে না। হইবে তমলুক কোর্টে। আসামীর বাড়ী কাঁথির অন্তর্গত বলিয়া ওয়ারেণ্ট এখান হইতে জারি হইয়াছে। আরও জানা গেল, ফৌজদারী মোকদ্দমা পাঁঠাচুরি-সংক্রান্ত। প্রথমে সমন জারী হইয়াছিল, আসামী হাজির না হওয়ায় ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁথির উকিল-মোক্তারদের সঙ্গে তবু আলাপ-পরিচয়ও আছে—তমলুকের তো কাহাকেও চেনেন না। কোথায় তমলুকে হইল পাঁঠাচুরি—তাহারই মধ্যে জড়িত হইলেন তিনি। কি বিপদেই না তিনি পড়িলেন!

বাড়ী ফিরিয়া সেইদিনই তিনি জয়নগর স্কুলের হেড মাষ্টারকে চিঠি লিখিলেন—'এক পাঁঠাচুরির মোকদ্দমায় তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, দয়া করিয়া আর পনরো দিনের ছুটি যেন মঞ্জুর করা হয়।'

রাত্রে শয্যায় শুইয়া পণ্ডিত মহাশয় ক্রমাগত সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন—বাসন্তী স্বামীর ভাব দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এই ব্যাপারের মধ্যে বেশ একটু রহস্য রহিয়াছে। কাহারও-না-কাহারও ভুলে তাহার স্বামী

পণ্ডিত-স্বামীর মনের বল উপলব্ধি করিয়া তাহার হাসিও পায়, আবার দুঃখও হয়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে বিশেষ কিছু বলে না, মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে গেলেও তাহার স্বামী বিপরীত বুঝিয়া ফোঁস করিয়া উঠে।

বাসন্তী কহিল—আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

পণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন,—হুঁ!

বাসন্তী কহিল—কথায় আছে, স্বপন নিজের সম্বন্ধে দেখলে পরের হয়। তুমি দেখেছিলে তোমার স্ত্রী চুরি গিয়েছে, কিন্তু গেল অন্যের পাঁঠা চুরি। আচ্ছা, আমি চুরি গেলেই কি তুমি এর চেয়ে শান্তি পেতে?

পণ্ডিত মহাশয় বিরক্তব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—ঢের হয়েছে, আর জালিও না। এ সময়ে তোমার বিদ্রূপ আমি সহ্য করতে পারছি নে।

বাসন্তী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া কহিল—ভাল কথা বল্‌লেও চ'টে যাও দেখছি। কিন্তু স্বপন দেখে ছুটে আসাটাই তোমার ঠিক হয়নি। লোকে তো হাসছেই, আমারও যখনই মনে হয়, হাসি পায়। তার উপর এই ছাগল চুরির কাণ্ড! এই বুড়ো বয়সে খুব হাসালে দেখছি।

এই বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। পণ্ডিত মহাশয় গুম্‌ হইয়া রহিলেন—একটি কথাও কহিলেন না।

৪

মোকদ্দমার দিন পণ্ডিত মহাশয় তমলুকে হাজির হইলেন। মোক্তার মিলিতেও বিলম্ব হইল না। মোক্তার সমস্ত শুনিয়া কহিল—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে স্নানাহার সেরে কোর্টে যাবেন, খালাস আপনাকে করে দেবই। তবে ফী আমাকে চারটি টাকাই দিতে হবে। আগাম দুটি টাকাই দিয়ে যান।

পণ্ডিত মহাশয় উপায়ান্তর না দেখিয়া দুইটি টাকা বাহির করিয়া মোক্তারের হাতে দিয়া কহিলেন—দেখবেন মোক্তারবাবু, শেষটায় বৃদ্ধ বয়সে মিথ্যা অপরাধে জেল না খাটি। কার্য্যস্থল থেকে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে বাড়ী এলাম—তার ফলও পেলাম খুব! দুঃস্বপ্ন দেখে কি করে চুপ করে থাকি বলুন। কিন্তু আমার স্ত্রীর টিট্‌কারি আর সহ্য হয় না মশায়। ঘরে বাইরে দুই দিকেই আমার মুস্কিল কি না! যাক্‌ এখন ভরসা আপনি—এখানে তো চেনাশোনা লোক কেউ নাই আমার।

মোক্তার সহাস্যে কহিল—কিছু ভাববেন না আপনি। আজই যাতে বাড়ী ফিরে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমি করবো। হাকিমকে বলে-কয়ে প্রথম কাছারীতেই আপনার কেসটি ধরাবো। আদিত্য মাইতির হাতে যখন কেস দিয়েছেন—আপনার আর ভয় নেই। যদি সত্যই পাঁঠাচুরিটা আপনিই করতেন, তবু আপনার চিন্তা ছিল না। এমন কত আসামীকে প্রতিদিন খালাস করছি—সে এখানকার কে না জানে। সাধে কি আর আট টাকা করে ফী চার্জ্জ করি—তবে আপনার কাছে চার টাকাই নেব।

প্রথম কোর্টেই আসামী শ্যামলালের ডাক পড়িল। গুম্ফশ্মশ্রু-বিহীন, শিখা উপবীতধারী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে আসামীর কাটগড়ায় উপস্থিত হইল। হাকিম বিস্মিত হইয়া সেইদিকে চাহিলেন, কোর্টের সমস্ত লোক পাঁঠাচুরির অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—তোম—আপনার নাম?

করজোড়ে ব্রাহ্মণ কহিল—শ্যামলাল ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

—আপনার বাড়ী?

—কাঁথি মহকুমার হরিহরপুর গ্রামে।

—এ মোকদ্দমায় কি আপনিই আসামী?

পণ্ডিত হাতজোড় করিয়া কহিলেন—হুজুর—আমি জয়নগর হাই ইস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত। এক দুঃস্বপ্ন দেখে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী আসি। পরদিনই আমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি হয়। শুনলাম, পাঁঠাচুরির মোকদ্দমায় আমি জড়িত। আমি শুদ্ধসাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ—মাছমাংস স্পর্শ করি না হুজুর। এর বিচার আপনি করুন।

হাকিম নথি উল্টাইয়া দেখিলেন—সত্যই ভুল হইয়াছে। আসামীর নাম শ্যামলাল ভট্ট, বাড়ী হরিপুর। চাপরাশি ভুল করিয়া হরিহরপুরের শ্যামলাল ভট্টাচার্য্যের নামে ওয়ারেণ্ট জারী করিয়াছে।

তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—আপনি বৃথাই হয়রাণ হয়েছেন। আসামী আপনি নন—আসামী হরিপুরের শ্যামলাল ভট্ট। চাপরাশির ভুলেই এ ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু আপনিও কি ওয়ারেণ্টখানা দেখেন নি—কি লেখা আছে?

পণ্ডিত মহাশয় অকূলে কূল পাইলেন, কহিলেন—হুজুর, সরকার বাহাদুরের আদেশের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। সরকারের কাগজে কোনও ভুল থাকতে পারে এ আমি ধারণা করতে পারিনি।

হাকিম মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন, বুঝিলেন—পণ্ডিত খোসামোদের কথা বেশ বলিতে জানে। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—আপনি নেমে আসুন ওখান থেকে, ঢের সহ্য করেছেন, আর কেন? হ্যাঁ, তারপর আপনি কি করতে চান—কোনও খেসারতের মামলা আনবেন কি? যে-লোক আপনার উপর ভুল করে ওয়ারেণ্ট জারী করেছে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করবেন?

পণ্ডিত মহাশয় কোনওরূপে এই ফাঁদ হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, তিনি উদারভাবে কহিলেন—না হুজুর, সে সরকার বাহাদুরের চাকর, ইচ্ছে করে তো কিছু করেনি। শাস্ত্রে আছে—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।

হাকিম সহাস্যে কহিলেন—বেশ, তাহলে আপনি যেতে পারেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের অন্তরের ভার লঘু হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাসন্তীরই কথা মনে হইল। সে তো ঠিকই বলিয়াছিল—কিছুই হয় নাই, অথচ তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া এই কয়দিনেই অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর প্রতি এ কয়দিন যে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়াছিলেন, এইবার তাহা একেবারে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

আদালতের কক্ষ হইতে বাহির হইতেই মোক্তারের সঙ্গে দেখা। পণ্ডিতকে দেখিয়াই সে কহিল—কি ঠাকুর, এখনও ডাক হয়নি তো? এই হলো আর কি!

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে কহিল—ডাক হয়েছিল—খালাস পেয়েছি।

মোক্তার সুর ঘুরাইয়া কহিল—সে তো জানি মশায়—আমি আগে থাকতেই হাকিমকে বলে রেখেছিলাম কি না, কেমন? যেমন কথা—সেই রকম কাজ কি না দেখুন। আদিত্য মোক্তারের কথা মিথ্যে হয় না—এ জানবেন। এখন দিন্ তো বাকী দুটি টাকা। খুব সস্তায় সারলেন যাহোক। কিন্তু ওদিককার মক্কেল যেন দুই একটা পাই, বুঝলেন।

পণ্ডিত অপ্রসন্নমুখে কহিলেন—কৈ কিছুই তো করলেন না মশায়—শুধু শুধু—

মোক্তার বাধা দিয়া কহিল—ও কথা বলবেন না মশায়, আপনার জন্য যা করেছি সে ভগবান জানেন। দেন দেন দুটি টাকা—তাড়াতাড়ি। আমার আবার ওঘরে একটা কেস্ আছে কি না।

হাঙ্গামা বাড়িয়া যাইবে দেখিয়া অগত্যা পণ্ডিতকে দুটি টাকা দিতেই হইল। টাকা দুইটি হস্তগত করিয়া মোক্তার কহিল—হ্যাঁ, তারপর ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছিল, বলুন তো?

পণ্ডিত মহাশয় সব খুলিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া মোক্তার কহিল—আসুন, আসুন—দিই এক নম্বর মানহানির মামলা ঠুকে। কম্‌সে কম—পাঁচশ টাকা খেসারৎ পাবেনই। আচ্ছা বের করুন দেখি সওয়া তিন টাকা। ধরুন দরখাস্তের কোর্টফী বার আনা, মুহুরির আট আনা, আর আমার আপাতত দুই টাকা—

পণ্ডিত মহাশয় পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কহিলেন—না মশায়, ওসবের মধ্যে আর যেতে চাইনে, আর হুজুরের কাছেও বলে এসেছি।

মোক্তার এইবার অপ্রসন্ন মুখে কহিল—বেশ তো। আপনার ভালোর জন্যই বলছিলুম—আমার আর এতে লাভ কি? এখনও একবার ভেবে দেখুন।

—বেশ ভেবে দেখেছি মশায়।—এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় দ্রুতবেগে সরিয়া পড়িলেন।

৫

অত্যন্ত লঘু হৃদয়ে পণ্ডিত মহাশয় বাড়ীর পথে যাত্রা করিলেন। মিথ্যা অপবাদের বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে তো! এই হাঙ্গামায় পড়িয়া টাকা দশ বারো খরচ হইয়া গেল—ইহাই যা দুঃখের কথা। তবু আর্থিক

ক্ষতির উপর দিয়া তাঁহার ফাঁড়াটি কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রীত হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, বাসন্তী দুঃস্বপ্নটির ব্যাখ্যা ঠিকই করিয়াছিল—নিজের বিষয় দেখিলে পরের হয়। তাঁহার স্ত্রী চুরি না গিয়া গেল অন্যের পাঁঠা চুরি। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু ভোগটা ভুগিতে হইল তাঁহাকেই। কর্ম্মের ফল আর কি! স্বপ্ন কি আর মিথ্যা হয়!

হাঙ্গামা তো মিটিল—এখন বাসন্তীকে লইয়া কর্ম্মস্থলে পৌছিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। বাসন্তী কি যাইতে চাহিবে না? এই কথা মনে করিতেই পণ্ডিতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। যাইতে আবার চাহিবে না—সে তো পা বাড়াইয়াই আছে। কিন্তু মুখে কিছু বলিতে চায় না। মেয়েমানুষের স্বভাবই তো ঐ। নারীর মনের কথা দেবতারাই বুঝিতে পারেন না—মানুষ তো কোন্ ছার!

মনে মনে এইরূপ নানা আলোচনা করিতে করিতে যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ধারণা জন্মিল—বাসন্তীর মত স্ত্রী পাইয়া তিনি ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এই বয়সে এমন পত্নীলাভ নেহাৎ ভাগ্যের ফল।

পণ্ডিত মহাশয় বাড়ী পৌছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে গ্রামের অনেকেই ব্যাপার কি শুনিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। পণ্ডিত সহাস্যে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া কহিলেন—হাকিম অতি অমায়িক লোক—আমাকে দেখেই তিনি অবাক। আসামীর কাঠগড়ায় উঠতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—নেমে আসুন, নেমে আসুন—গোল হয়েছে একটা। তারপর সমস্ত কাগজপত্র ঘেঁটে বল্‌লেন—আমি খেসারতের মামলা আনতে চাই কি না। কিন্তু ক্রোধ কি প্রতিহিংসা এসব নীচ প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি বল্‌লাম—না মশায়, ওসব আমি করবো না। কোর্টসুদ্ধ লোক অবাক! হাকিম থ' হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু মোক্তার একেবারে নাছোড়বান্দা, বলেন—দেব আদায় করে পাঁচশ টাকা, দিন এক নম্বর মামলা ঠুকে। আমি বলে এলাম—কলিকালেও ক্ষমাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। মামলা করলে লাভ হ'ত মন্দ নয়—হাকিম তো আমার দিকেই ছিল—পাঁচশো কেন হাজার টাকাই আদায় হ'ত নিশ্চয়। কিন্তু অর্থের দিকে লোভ আমার কোনও দিনই নাই কি না।

বাসন্তীও সমস্ত শুনিল, কিন্তু সে কিছুই কহিল না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। রাত্রের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে বাসন্তী দুইখানি চিঠি পণ্ডিতের হাতে দিল। একখানি হেড্‌মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তবে তিনি ব্যাপার জানিতে চাহিয়াছেন। আর একখানি ভোলা-দা লিখিয়াছে—এই চিঠিখানি পণ্ডিত মহাশয় বারংবার পড়িতে লাগিলেন এবং যতই তিনি পড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভোলা-দা লিখিয়াছে—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় — জয়নগর ২রা অগ্রহায়ণ

শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে নিবেদন,

পণ্ডিত মহাশয়, এখান হইতে যাইবার পর আপনার কুশল সংবাদ জ্ঞাত নহি। মাতাঠাকুরাণীসহ আপনি কেমন আছেন জানিবার ইচ্ছা। আপনাদের জন্য বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি—আপনার ও মা-জননীর শ্রীচরণের ধূলা পড়িলে ধন্য হই। পরে লিখি, এখানে অতি সত্বর আপনাদের শুভাগমনের পিতিক্ষা করিতেছি। কারণ, গ্রামে একেবারে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বিবাহ বিষয়ে সরকার বাহাদুর কি একটা নূতন আইন জারি করিতে মনস্থ করিয়াছেন—খুব সম্ভব আগত বৈশাখ মাসেই আইনটি জারি হইয়া যাইবে। ধম্ম আর কলিতে থাকিল না দেখিতেছি। যাহা হউক, রাজা যদি ধম্মনাশ করেন—আমাদের বলিবার কি আছে। শুনিতে পাই, দেশের লোকগুলাই সরকারকে খোঁচাইয়া এই 'আইন করাইতেছে। দেশের লোক দেশের শত্তুর হইয়া উঠিল। এখন কাজের কথা লিখি। আমরা ঠিক করিয়াছি—আইনটি পাশ হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই আমরা ছেলেমেয়ের বিবাহ দিয়া দিব। আপাততঃ ধম্মরক্ষা হউক তারপর যাহা হইবার হইবে। আমার নাত্‌নিটির বয়স ছয়

বচ্ছর, আর দুই বচ্ছর পর শুভবিবাহ দিয়া গৌরীদানের পুণ্য লাভ করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আর তো রাখা যায় না। এখন বিবাহ না দিলে আইনের প্যাঁচে আরও আট বচ্ছর অপেক্ষা করিতে হয়। বাপরে! চতুর্দ্দশ পুরুষ তাহা হইলে এখন হইতেই নরকে পচুক! পচিতে ত হইবেই একদিন না একদিন, কিন্তু আগে থাকতেই তাঁহারা কেন কষ্ট পাইবেন। আমরা বারোয়ারি তলায় সেদিন সভা করিয়াছিলাম—সভায় স্থির হয় ইহারই মধ্যে আমরা ছেলেমেয়েদের বিবাহ শেষ করিয়া ফেলিব। এ সৎ প্রস্তাবে গ্রামের অনেকেরই সহানুভূতি আছে। যে সব সন্তান এখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই, তাহাদের জন্য বড় দুঃখু হয়। কিন্তু উপায় কি? যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদেরই উদ্ধার করা আমাদের সব্বপ্রধান কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের দেশে পুরোহিতের বড় অভাব—আপনাকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রায় ঘরে ঘরে বিবাহ সমাধা করিতে হইলে আপনার মত পণ্ডিতের অনুকম্প্রা না হইলে আমাদের উপায় নাই। অবশ্য আপনার জন্ম আমরা বিশেষ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিব। আপনার শুভাগমনের পিতিক্ষায় উৎকণ্টকিত হইয়া আছি। আমাদের এখানে একপ্রকার মঙ্গল। শ্রিচরণের কুশল পার্থনীয়। নিবেদন ইতি।

শ্রিচরণের রজপার্থী সেবকাধম
শ্রি ভোলানাথ সাহা
আড়তদার
জয়নগর বাজার।

পণ্ডিত যতক্ষণ চিঠি পড়িতে ব্যস্ত ছিলেন বাসন্তী ততক্ষণ শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছে। চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া পণ্ডিত বলিলেন—ওগো শুন্‌ছো?

বাসন্তী কোন উত্তর দিল না।

—এর মধ্যেই ঘুমুলে না কি। এই বলিয়া পণ্ডিত চিঠিখানি হাতে লইয়া শয্যার উপর গিয়া বসিলেন। নিকটে আসিতেই বাসন্তী বলিল—আমাকে একটু ঘুমুতে দাও, বড্ড মাথা ধরেছে আমার। ভোলা-সার চিঠি আমি পড়েছি, আমাকে নতুন কিছু শোনাতে হবে না।

স্ত্রীর ভাব দেখিয়া পণ্ডিত বিরক্ত হইলেন, তবু হাসি মুখেই কহিলেন—যা হোক, একটা ভাবনা ঘুচলো। নতুন জায়গায় নতুন সংসার পাততে হবে, প্রথমটা খরচ-পত্তরের টানাটানিই চল্‌তো। কিন্তু সুবিধে হ'ল মন্দ নয়। ওদের যেমন ব্যাপার দেখছি, মাসে অন্ততঃ আট-দশটা বিয়ে হবেই। পাওনাও মন্দ হবে না। এক রকম ওতেই গুছিয়ে নেওয়া যাবে—কি বল?

বাসন্তী হাঁ-না কিছুই কহিল না।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—ভোলা সা ভারী বিচক্ষণ ব্যক্তি—ধর্ম্মেও মতি খুব। হ্যাঁ, তারপর যাওয়া ঠিক পরশুই তো?

বাসন্তী সহজভাবেই কহিল—তোমার যেদিন ইচ্ছে যেতে পার, আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই।

পণ্ডিত অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—ইচ্ছে নাই, তার মানে?

বাসন্তী বলিল—এত সোজা কথার মানে তোমার মত এতবড় পণ্ডিত বুঝতে পারে না—এইটাই আশ্চয্যি।

বাসন্তীর ধীর মৃদু কথার ঝঙ্কারে পণ্ডিত আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন—বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে দেখতে পাই যে! এত হতশ্রদ্ধা ভাল নয় বলে দিচ্ছি। আমার হুকুম—তোমাকে যেতেই হবে।

—বেশ তবে নিয়েই যেও, দেখা যাবে।

নিরুদ্বেগ শান্ত কণ্ঠস্বর! কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হইল এই কথাগুলির ভিতর শ্লেষ বিদ্রূপ, উপেক্ষার ভাব কানায় কানায় পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি রুষ্টকণ্ঠে কহিলেন—আচ্ছা দেখেই নিও তুমি।...এই বলিয়া তিনি সরিয়া গিয়া শয্যার অপর প্রান্তে সশব্দে শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতে চাহিল না। বাসন্তীর ব্যবহার, বাসন্তীর উপেক্ষা, বিদ্রূপ তাঁহাকে বড় মর্ম্মান্তিক বিঁধিতে লাগিল। আপন মনেই জলিয়া-পুড়িয়া কখন যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন জানেন না। ঘুম ভাঙিতেই দেখিলেন সূর্য্যের আলোকে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। তিনি একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিলেন, বাসন্তী শয্যায় নাই। দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিতেই তাঁহার নজরে পড়িল—নিকটেই একখানি কাগজ দোয়াতে চাপা দেওয়া রহিয়াছে। সেটি হাতে তুলিয়া চোখ

বুলাইতেই পণ্ডিতের মাথাটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। তিনি টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া শয্যার উপর ঘুরিয়া পড়িলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

ভোলা-সার পণ্ডিত বন্ধু!

আমি আমার নিজের পথ দেখিলাম। তুমি জয়নগর গিয়া একটি ছোট্ট বালিকাকে বিবাহ করিয়া বালিকার পিতার গৌরীদানের পুণ্যলাভ করিবার সহায় হইও। জয়নগর অঞ্চলে বিবাহের যেরূপ ধুম পড়িয়া যাইবে তাহাতে তোমার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমার সঙ্গে নিমাইকে লইয়া যাইতেছি; কারণ তোমার কাছে রাখিয়া তাহার পরকাল নষ্ট হইতে দিতে পারি না। আমার জন্য বৃথা খোঁজাখুঁজি করিয়া লোক হাসাইও না—তাহাতে কোনও ফল হইবে না।

'বাসন্তী'

* * *

প্রায় অপরাহ্ণ। পণ্ডিত মহাশয় একরূপ ছুটিতে ছুটিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। গ্রামের প্রতি গৃহে তিনি স্ত্রীর সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই, বরং লোকের বিদ্রূপ ও চাপাহাসিতে তিনি বিধ্বস্ত হইয়া অবশেষে শ্বশুরালয়ে শেষ চেষ্টা করিতে আসিয়াছেন।

উন্মাদের মত বিভ্রান্ত দৃষ্টি পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধী জয়নারায়ণ কহিল—এ কি! ভট্‌চাজ মশায় এমন অসময়ে যে! কবে আসা হ'ল জয়নগর থেকে?

পণ্ডিতের বুকটা সজোরে ধড়াস করিয়া উঠিল। তবে তো বাসন্তী এখানে আসে নাই! সে আসিলে কি জয়নগর হইতে আসিবার কথাটা অপ্রকাশিত থাকিত!

পণ্ডিত মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—এক গ্লাস জল খাওয়াও তো আগে ভাই!

জয়নারায়ণ কহিল—বিলক্ষণ! একটু বিশ্রাম করুন, সুস্থ হন। রোদের মধ্যে আস্‌তে বড়ই কষ্ট হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তারপর, বাসন্তী ভাল আছে তো?

তিনি উদ্গত অশ্রু নিরোধ করিতে করিতে ভগ্নস্বরে কহিলেন—সে নেই!

বিস্মিত জয়নারায়ণ কহিলেন—নেই? নেই কি ভট্‌চাজ মশায়। তবে কি বাসন্তী—। তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—না ভাই, সে বেঁচে আছে, কিন্তু আমার কাছ থেকে সে চলে গেছে।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া জয়নারায়ণ কহিল—তবু ভাল। তাই বুঝি নালিশ করতে ছুটে এসেছেন এখানে, বেশ, বেশ, কালই আপনার সাথে যেয়ে গোল মিটিয়ে দিয়ে আস্‌বো। বুঝলেন ভট্‌চাজ মশায়, বোন্‌টি আমার যেমন বুদ্ধিমতী তেম্‌নি একগুঁয়ে। ওকে একটু তোষামোদ করে না রাখলে—।

পণ্ডিতের আর সহ্য হইল না, তিনি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তবে কি সে এখানে আসেনি ভাই? আমি যে সকাল থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে বেড়াচ্ছি। এপর্য্যন্ত পেটে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত পড়েনি।

জয়নারায়ণ কহিল—আপনি অবাক করলেন ভটচাজ মশায়। বাসন্তী কেন হঠাৎ আসতে যাবে এখানে। আচ্ছা, ব্যাপারখানা কি বলুন তো?

—কথা বল্‌বার শক্তি নেই ভাই। এই দেখ। এই বলিয়া তিনি ভোলা-সা'র ও বাসন্তীর চিঠি তার হস্তে ফেলিয়া দিলেন।

চিঠিখানি পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জয়নারায়ণ কহিল—বুঝেছি। আপনার দোষেই বোন্‌কে হারাতে বসেছি। আপনার কি—এরই মধ্যে আর একটি মেয়ের—।

পণ্ডিত মহাশয় করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না ভাই। আর আমি সহ্য করতে পারছিনে যে। সে যদি একবার ভালভাবে বলতো তবে কি আর ভোলা-সার প্রলোভনে—। গলা যে শুকিয়ে আসছে ভাই।

—থাক্ থাক্ পণ্ডিত মশায়, সব কথা পরে শোনা যাবে। এখন আর ভেবেচিন্তে উপায় কি বলুন। চলুন

পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া জয়নারায়ণ বাহির হইয়া গেল...

এই বলিয়া জয়নারায়ণ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতরে আনিয়া উচ্চস্বরে কহিল—মা, তোমার পণ্ডিত মশাই এসেছে দেখে যাও। ওরে ও বাসন্তী, শীগ্‌গির এক গ্লাস জল আনতো দিদি, ভোলা-সা'র বন্ধু পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠতালু হয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে!

পণ্ডিতের মাথাটি যেন এইবার নূতন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে প্রায় মিনিটখানেক পর ব্যাপারটি সঠিক বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—ভোলা-সা'র বন্ধু! হা, হা, ভোলা-সা'র বন্ধুই বটে! যাক্, ভাই বোনে তোমরা খুব হাসালে দেখছি।

বীমাজগতে মহিলা

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, এফ-আর-ই-এস

বিগত মহাযুদ্ধের পরে মহিলারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে নানাস্থানে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। জাতীয় জীবনে স্ত্রীলোকেরও যে একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে তাহা ক্রমেই জনসমাজ উপলব্ধি করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের রমণীরা তাঁহাদের স্বাধিকার অনেকাংশে লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এখনও তাহা হয় নাই। কিন্তু সময় আসিয়াছে।

মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত দৈবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে হয়। মানুষ সর্ব্বদাই নানারূপ উপায় খুঁজিতেছে যাহাতে দৈব তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে। এইজন্যই ভাবিষ্যতের কথা ভাবিতে হয়। বার্দ্ধক্যে, আকস্মিক দুর্ঘটনায়, অকালমৃত্যুতে যাহাতে নিজের বা পরিবার-বর্গের বিশেষ বিপদ না হয়, তাহার জন্য সংস্থান করিতে হয়। এইজন্যই বীমার বা ইন্‌সিওরেন্সের প্রয়োজন।

মধ্যযুগে যখন প্রথম বীমার কাজ আরম্ভ হয়, তখন সে সময়ে শাসকগণ মনে করিতেন বীমা করা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ। মানুষের অকালমৃত্যু হইলে তাহার পরিবারবর্গ কষ্ট পাইবে, সংস্থান অভাবে বৃদ্ধবয়সে অনাহার, আকস্মিক দুর্ঘটনায় যাতনাভোগ এসবই ভগবানের শাস্তি। ইহার প্রতিকারের চেষ্টা মহাপাপ। কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মন হইতে ক্রমে দূর জগতে পাঠাইয়াছেন নানা বিপদ-আপদের মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা আমার মত বীর সন্তান, বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তোমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে; এই সংগ্রামে জয়লাভই তোমাদের গৌরব।" কাজেই দৈবের শাসন হইতে নিজেকে রক্ষা করা পাপ নয়, সেটা মানুষের কর্ত্তব্য।

দৈবের সঙ্গে সংগ্রামের অস্ত্র বীমা। বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন আর বেশী বুঝাইতে হয় না। তবে বীমা যে কেবল পুরুষদের জন্য নহে, স্ত্রীলোকের জন্যও ইহার আবশ্যকতা আছে, এ কথাটা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ গৃহস্থঘরে স্ত্রীলোকেরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনেন না। তবে তাঁহারা সংসারের যে-সমস্ত কাজ করেন অর্থনৈতিক হিসাবে তাহার মূল্য যথেষ্ট। আমাদের দেশে কত পরিবার যে গৃহিণীর মৃত্যুর পরে ছারখার হইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। গৃহিণীর মৃত্যুতে পরিবারের আয় কমে না, কিন্তু ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া যায়। যিনি লক্ষ্মীর মত সমস্ত সংসারকে সংবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই সংসারের শ্রী অটুট রাখা সম্ভব নয়। অর্থব্যয় করিয়া অবশ্য অনেকটা সুবিধা করা যায়; ছোট ছোট সন্তানের লালন-পালনের

তাহাদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের ভার চিকিৎসক বা নার্সের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে, যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য দাসদাসী রাখা যাইতে পারে। এ সবের জন্য অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণীর বর্ত্তমানে এ সবের কিছুই দরকার থাকে না। তিনি একাধারে শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসক ও দাসদাসী। তাঁহার মৃত্যুতে গৃহকর্ত্তা দুনিয়া অন্ধকার দেখেন। কাজেই দেশের প্রত্যেক গৃহিণী যদি জীবনবীমা করেন তবে তাঁহাদের অকস্মাৎ মৃত্যুতে জীবনবীমার টাকায় পরিবারের কষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব হয়। এ ছাড়া আর একটা বিষয় ভাবিবার আছে। জীবনবীমা (মেয়াদী বীমা বা Endowment Assurance) দ্বারা যে সঞ্চয়ের সুবিধা হয় একথা সকলেই জানেন। অনেক পরিবারেই গৃহিণীর হাতে খরচপত্রের ভার। তাঁহার নিজের জীবনবীমা থাকিলে তিনি খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু অবশ্যই সঞ্চয় করিবেন। দশ পনের বা বিশ বৎসর পরে একসঙ্গে কতকগুলি টাকা পাইলে পরিবারের যথেষ্ট মঙ্গল হয়, মেয়ের বিবাহ বা পুত্রের পড়ার খরচের সংস্থান হয়। অনেক স্থানে গৃহকর্ত্তা সঞ্চয় সম্বন্ধে উদাসীন; সেখানে গৃহিণীরই কর্ত্তব্য জীবনবীমা করিয়া সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।

জীবনবীমা ব্যতীত আরও নানারূপ বীমা আছে যাহাতে মহিলাদের স্বার্থ যথেষ্ট। যেমন অগ্নিবীমা—আগুনে বাড়ীঘর নষ্ট হইলে গৃহিণীরই সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। বার্ষিক সামান্য কিছু টাকা দিলেই বাড়ীঘর বীমা করা থাকে। আগুনে বাড়ীঘর নষ্ট হইলে বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করিবে। বিলাতে নানারূপ চুরি বীমা আছে। অর্থাৎ কোন জিনিষ চুরি হইলে কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করিবে। সেখানে অনেক গৃহিণীই নিজেদের গহনার জন্য এইরূপ বীমা করিয়া থাকেন। দৈবাৎ গহনাপত্র চুরি হইলে তাঁহাদের মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয় না। গত বৎসর আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন একটি ভদ্রলোকের স্ত্রী যমজ সন্তান বীমা করিয়াছিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, বীমা করিলেন যদি যমজ সন্তান হয় তবে তজ্জন্য অতিরিক্ত খরচের জন্য বীমাকোম্পানী এক হাজার পাউণ্ড দিবে। পরে সত্যই তাঁহার যমজ সন্তান হইল এবং তিনি একহাজার পাউণ্ড পাইলেন।

বিলাতে এক প্রকার সংবাদপত্র কুপন বীমা আছে। অনেক গৃহিণীই এইরূপ বীমা করিয়া থাকেন। একটি সংবাদপত্রের গ্রাহক হইলেই এরূপ বীমা করা যায়;

মিস্ এডিথ্ বীস্‌লী

সংবাদপত্রের মূল্য ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। এই বীমার ফলে নানারূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় সাহায্য পাওয়া যায়। রান্না করিতে যদি হাত পুড়িয়া যায়, সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যদি আঘাত লাগে অথবা যদি আকস্মিক মৃত্যু হয় তবে ক্ষতির পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। বিলাতে গৃহিণীরা দৈবের হাতে ভবিষ্যৎ ফেলিয়া রাখেন না। তাঁহারা বীমাদ্বারা ভবিষ্যতকে করায়ত্ত করিয়া রাখেন। আকস্মিক দুর্ঘটনা তাঁহাদিগকে সহজে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে না। দারিদ্র্যের কবল হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা তাঁহারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখেন।

বীমা-জগতে মহিলাদের আর একটি কাজ আছে। এখনকার দিনে অনেক মহিলাকে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। বিলাতে নানারূপ ব্যবসায়-কার্য্যে মহিলারা প্রবেশ করিয়াছেন। পোষ্টাপিসের কেরাণী, আপিসের টাইপিষ্ট, অধিকাংশই মহিলা। সেখানকার বীমা কোম্পানীগুলির আপিসে

বহু মহিলা কাজ করেন। আমার মনে হয় বীমার কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যদি মহিলারা বীমা কোম্পানীর এজেন্টরূপে কাজ করেন তবে তাঁহারা সহজেই অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এবং গৃহের কাজ করিয়াও বীমার কাজ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে মহিলারা নানারূপ কাজে যেরূপ কর্ম্মকুশলতা দেখাইতেছেন

মিস্ মেরিয়ন্ ফ্রেঞ্চ

তাহাতে মনে হয় বীমার কাজে তাঁহারা সহজেই সাফল্য লাভ করিবেন।

পাশ্চাত্য দেশে মহিলারা বীমার কাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে তিনটি মহিলা বীমাক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন মিস্ এডিথ্ বীস্লী, মিস্ মারিয়ন্ ফ্রেঞ্চ ও মিসেস্ বভিল্। প্রথমোক্ত দুইজনের সঙ্গে আমার লণ্ডনে বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে অনেক মহিলা বীমার কাজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মিস্ বীস্লী প্রথমে লণ্ডনে টাইপিষ্টরূপে কাজ আরম্ভ করেন। তারপরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শিক্ষয়িত্রী হইয়া যান; সেইখানে বীমার কাজ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় লণ্ডনে ফিরিয়া নরউইচ ইউনিয়ানে কাজ করেন। আরও কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিয়া বিশেষ যশোলাভ করেন। পরে ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী সাদার্ণ লাইফ এসোসিয়েশানের ওয়েষ্ট যেণ্ড ম্যানেজারের পদ লাভ করেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে এইরূপ উচ্চপদ বীমা-ক্ষেত্রে প্রথম। কাজেই তাঁহার নিয়োগে সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল।

মিসেস্ বভিলও প্রথমে টাইপিষ্টরূপে কাজ আরম্ভ করেন। সান্ লাইফ অফ কানাডা আপিসে বিশেষ দক্ষতালাভ করিয়া ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডের এজেন্সি অ্যাফ্রিক্যান লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটির ম্যানেজারের পদ লাভ করেন।

লিভারপুল লণ্ডন এণ্ড গ্লোব আপিসের মিস্ ফ্রেঞ্চও অতি সামান্যভাবে বীমার কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষমতা দ্বারা তিনি এখন উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছেন। মিস্ ফ্রেঞ্চের চেষ্টায় প্রায় পাঁচশত মহিলা বীমার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অবসর সময়ে তাঁহারা কাজ করেন এবং তাহারই ফলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন। সম্প্রতি মিস্ মেরী উইডন্স্ নামে একটি তরুণী মিস্ ফ্রেঞ্চের সহকারীরূপে কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু পাঠ ত্যাগ করিয়া তিনি বীমার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। মিস্ উইডন্স্-এর খুব উৎসাহ আছে এবং তিনি আশা করেন এ কাজে তিনি সাফল্যলাভ করিবেন।

আমেরিকাতে মহিলারা বীমার কাজে আরও বেশী পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। সেখানে অনেক মহিলা বীমার কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। একটি বীমা কোম্পানীর মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ আছে—তাহাতে ৬০ জন মহিলা এজেন্টরূপে কাজ করেন। এই কয়জন মহিলা ১৯২৯ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আটজন মহিলা

প্রত্যেকে প্রায় পৌনে তিনলক্ষ টাকার কাজ করিয়াছেন। মিসেস্ ফিথিয়ান নামে একটি মহিলা এই বিভাগের কর্ত্রী। মিসেস্ ফিথিয়ান বীমার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ছেলেকে মানুষ করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের ধারণা যে,মহিলারা যদি বাহিরের কাজে যান তবে তাঁহারা সংসার দেখিবেন না। আশা করি, মিসেস্ ফিথিয়ানের দৃষ্টান্ত এ ধারণা দূর করিবে। তাঁহার অধীনস্থ প্রায় সকল মহিলা-কর্ম্মীই পরিবারের সমস্ত কাজ করিয়া অবসর সময়ে বীমার কাজ করেন। তাহাতেই তাঁহাদের বেশ রোজগার হয়।

পাশ্চাত্য দেশের মহিলাদের এই সব দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের মহিলাদের অনুকরণীয়। এখন আমাদের দেশের অনেক মহিলার নিজেদের উপার্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের কাজের ক্ষেত্র অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ব্যতীত অনুরূপ কাজের সুযোগ তাঁহাদের পক্ষে কম। আমার মনে হয় বীমার কাজ মহিলাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরিবারের গৃহস্থালী কার্য্য করিয়াও অবসর সময়ে তাঁহারা এ কাজ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইবে, দেশেরও বিশেষ মঙ্গল হইবে।

ভারতচন্দ্রের কবিতায় 'প্রবচন'

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

রাজকবি ভারতচন্দ্র বাংলার প্রথিতনামা কবি। প্রায় দুইশত বৎসর হইল তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিযশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবে। শব্দের ঝঙ্কার এবং ছন্দের লীলায়িত নৃত্যগতিতে এই কবির কাব্যাবলী লোক-সমাজে এত বেশী আদৃত হইয়াছিল যে, রসপিপাসু বাঙালী তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। তাই আজও বাংলার ঘরে ঘরে, দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মধ্যে ভারতচন্দ্র এত সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করেন যে, বক্তা কিংবা শ্রোতা কেহই তাহা জানিতেও পারে না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কথায় কথায় তাঁহার ভাষা প্রবচন-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাঁহার প্রতি জনসাধারণের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জনসাধারণ ত ভারতচন্দ্রের কবিতা হইতে প্রবচন সংগ্রহ করে নাই; বরং দেশের পাঁচজন তাহাদের কথায় বার্ত্তায় যে সকল প্রবচন ব্যবহার করিত তিনি তাহাই প্রয়োজনমত নিজ কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল প্রবচন দ্বারা তাঁহার প্রতি জনানুরাগ প্রমাণিত হয় না। এই বিষয়টি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ভারতচন্দ্রের সময় কোন্ কোন্ কথা জনসাধারণ প্রবচন-স্বরূপ ব্যবহার করিত তাহা জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক সাহিত্য খুঁজিলে হয়ত দুই একটি কথার সন্ধান মিলিতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত কোন্ প্রবচনটি স্বকীয়, কোন্‌টাই বা পরকীয় তাহা বুঝিবার যো নাই। এরূপ অবস্থায় সমস্তই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা ধরিয়া লইলাম ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রবচনগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তদানীন্তন চলিত কথা হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার গৌরব বাড়ে বই কমে না।

এখানে একটি কথা বুঝিতে হইবে। কবি সকল সময়ই কিছু আর নূতন তথ্য আমাদের সম্মুখে ধরেন না। অনেক সময়ই তিনি অতি সাধারণ চলিত কথাগুলিকে স্বকীয় ভাষায় একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেন। সেই রূপ যদি হৃদয়গ্রাহী এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা হইলে জন-মনের উপর কবির প্রভাব অপরিসীম হইয়া দাঁড়ায়। জনসাধারণ তাঁহার ভাষাকে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আত্মস্থ করিয়া থাকে। ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র বাঙালীর চিত্তকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাঁহারা

তাঁহাদের চলিত প্রবচনগুলির প্রাচীন রূপ বিস্মৃত হইয়া কবির ভাষাকেই সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা দান করিয়া গেলেন। নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিগুলি আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আমরা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মধ্যে চালাইয়া থাকি।

১। যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই।
২। নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা।
৩। হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৪। মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।
৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
৬। গলে সাপ বান্ধি চাই, তবু অন্ন নাহি পাই।
৭। বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
৮। মাটি মুঠা ধর যদি সোনা মুঠা হবে।
৯। একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন
১০। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
১১। নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।
১২। আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
১৩। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
১৪। কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
১৫। লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়।
১৬। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ।
১৭। দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্ম মন্দ করে।
১৮। তিন কাল গেল মোর এক কাল আছে।
১৯। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।
২০। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।
২১। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
২২। যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া
সেই জন কহে চোর।
২২। পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
২৩। নিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে।
২৪। ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল
২৫। মুখে এক মনে আর।
২৬। উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে,
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে।
২৭। ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
২৮। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
২৯। শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।
৩০। পুরুষের ভার যাহা নারী নাকি পারে তাহা।
৩১। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
৩২। গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।
৩৩। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।
৩৪। দ্বারে ভাঁড়াইল মায়।
৩৫। যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।
৩৬। হাত ছোট আঁত বড় এ বড় প্রমাদ।
৩৭। ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়।
৩৮। যে জন আপন বুঝে পরদুঃখ তারে সুঝে।
৩৯। যার লাগি দুখভাগী সে অভাগী চায়।
৪০। ধায় রায়বাঘিনী……
৪১। নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখায়ে চূণ।
৪২। ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর।
৪৩। কুটিনী গণ্ডানী বড় যে মণ্ডানী।
৪৪। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।
৪৫। কাজের মাথায় বাজ বাঁচ ইতে দায়।
৪৬। নষ্ট হই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মলন
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন।
৪৭। অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
৪৮। দুঃখ বিনা নহে সুখ।
৪৯। ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।
৫০। একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
৫১। সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার।
৫২। পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে।
৫৩। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

এইগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি পঙ্‌ক্তি আছে যাহা মাঝে মাঝে লোকের মুখে শোনা যায়। যথা :—

১। কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।
২। কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা।
৩। যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
৪। ভারত কহিছে এ ত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতীনে হানাহানি গো॥

ইহারা ঠিক প্রবচন নহে। সুতরাং ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা এই কবি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমাজনীতির মাপকাঠিতে ইঁহার কাব্যাবলীর স্থান-বিশেষ শ্লীলতা-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে নাগরিক কবিতার বিস্তর প্রভাব ছিল। ইহাতে কাব্যামোদী পাঠকের রস উপভোগে কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। সুতরাং অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র দায়ী নহেন। তিনি ছন্দের যে অপূর্ব্ব 'তাজমহল' সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। বাঙালী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, এই কবিও ততদিন অমর হইয়া রহিবেন।

ঢেউ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ষ্টেশনটি ছোট, ষ্টেশনের ঘরটিও তাই।

মাষ্টারবাবু বাঙালী; রোগা, লম্বা চেহারা—বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গায়ের রঙের তীব্রতাটাই সকলের আগে চোখে পড়ে। বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু ললাটে এরই মধ্যে রেখা পড়েছে; চোখ দুটি ভীরু, শঙ্কিত। চোখে চশমা এবং মাথায় গোলাকার টুপী এঁটে দিবারাত্রি কাজেই ব্যস্ত।

কাজই তার জীবনের একমাত্র 'রোমান্স'!

বাংলার সীমানা বহুদূরে ফে'লে আসতে হয়েছে উড়িষ্যার এই প্রান্তে। ষ্টেশনের খানিকদূরে পাহাড়ের শ্রেণী আরম্ভ হ'য়ে কতদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে, কে তার হিসাব রাখে! গাছপালার আড়ালে চিক্কার চিকণ মূর্ত্তি চোখে পড়ে—বিস্তৃত, বিপুল! তীরের ঝাউগাছগুলি হাওয়ার দোলায় মর্ম্মরিয়ে ওঠে।

কিন্তু এর মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়?

রমেশ আজ সাত বৎসর এইখানেই প'ড়ে আছে—যদিও একা নয়।

ন' বছর আগে, দেশে থাক্‌তে সরযূর সঙ্গে রমেশের বিয়ে হয় এবং এই ন' বছরের মধ্যে তাদের সঙ্কীর্ণ সংসারে আরও তিনটি প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রত্যেক নব-দম্পতির মত ওরাও একদিন আকাশের শুক-তারার পানে চেয়ে রাত্রি জেগেছে, কল্পনা ও প্রেম-গুঞ্জনের মধ্যে রাতের আকাশ সেদিন অগোচরে ভোরের আলোয় ভ'রে উঠ্‌ত। তারপর ঠিক তেমনি অগোচরেই তাদের মিলন-সমারোহ এল ম্লান হ'য়ে, কথাবার্ত্তার মধ্যে একঘেয়েমী এবং পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু রইল না।

কিন্তু সরযূর মধ্যে কোন অভাব আবিষ্কার করা কঠিন। এই অপরিচিত দেশ ও মানুষের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মানিয়ে নিয়েছে। রেল-কোম্পানীর অপরিসর কোয়ার্টারের মধ্যেই আজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একটি শান্ত, সুশৃঙ্খল গৃহস্থালী।

পয়েণ্ট্‌স-ম্যান জগন্নাথের মা সকালে জল তুলে, বাটনা বে'টে, উনুন ধরিয়ে দেয়, তারপর চলে সরযূর রান্না। ছেলে-মেয়েগুলি পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে, কেউবা পাশে ব'সে পা ছড়িয়ে কান্না সুরু ক'রে দেয়। কিন্তু এসব ছোটখাট উৎপাত সরযূর সহ্য হ'য়ে গিয়েছে।

দুপুরে ট্রেন বড়-একটা থাকে না, রমেশ এই সময়টুকু ঘুমিয়ে নেয়। কাছে কোন ইস্কুল নেই—সরযূ নিজেই মাষ্টার-মশাই সেজে ছেলেদের পড়াতে বসে। নিজের সেলাইয়ের কাজও চলে ঐসঙ্গে।

সরযূর চারিদিকে কাজের পাহাড়। বিকেলে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ মনোমত করে সাজান, সযত্নে শয্যা রচনা, ছেলেদের হাজার রকমের বায়না মেটান, এ-সব ত আছেই। এই নিরবসর কাজের পাহাড়ের আড়ালে সরযূ আপনাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে খোঁজ কে রাখে?

রমেশ মাঝে মাঝে সরযূর প্রতি মনোনিবেশের চেষ্টা করে।

"আচ্ছা, উমাকে দু-চার দিনের জন্যে আস্‌তে লিখলে কেমন হয়?"

উমা সরযূর ছোট বোন—বছর-দুই আগে কলকাতার এক বনেদী ঘরে তার বিয়ে হয়েছে। উমার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে তাঁরা পয়সার দিকে খেয়াল করেন নি; নইলে অমন ঘরে পড়া উমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না।

সরযূ ক্ষণকাল তন্দ্রাগ্রস্তের মত চুপ করে ব'সে থেকে বললে, "কি করবে এসে?"

রমেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "নাও কথা, এসে আবার কি করবে? কতদিন তোমার সঙ্গে—"

"সে আমি জানি। তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

রমেশ রসিকতার চেষ্টা করে।

"কিন্তু ভয়ের কিছু সত্যিই নেই! যাই বল, ব্যোনের প্রতি তোমার এই সদ্ভাবটুকু ইতিহাসে লিখে রাখবার মত।"

সরযূ উত্তর দেয় না, কিন্তু চোখ দুটি হঠাৎ মেঘময় হয়ে আসে। রুগ্ন কালো মুখখানিতে ব্যথার আভাস ফোটে কিনা, সহজে তা বোঝবার উপায় নেই। ঘরের চতুর্দ্দিকে চেয়ে উমার বিলাস-বিকীর্ণ সংসার-শ্রীর কথা ভাবে। বাবাকে সরযূর মনে পড়ে না—মায়ের মুখে তাঁর গল্পই কেবল শুনেছে। মাও আজ নেই। উমার দিদি হিসেবে তাকে মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসাই হয়ত উচিত, কিন্তু জীবনের সমস্ত উচিতকে পালন করবার সৌভাগ্য হয় ক'জনের?

রমেশ কলের মানুষের মত খেটে চলে। খাটুনিতেই তার আনন্দ, ছুটি চাইলে পেতে পারে কিন্তু নেয় না। তাই ব'লে সরযূর প্রতি সে একেবারে উদাসীন নয়।

"চল না দিনকয়েক কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।"

"থাক্, কাজ কি?"

"তোমাদের দেশেও একবার ঘুরে আসা যাবে। কতদিন ত যাও নি।"

"তা বটে। কিন্তু গিয়েই-বা লাভ কি? লোকে হয়ত চিন্‌তেও পারবে না।"

"তাও সত্যি! অনেকদিন হ'য়ে গেল নয়? মনে আছে, একবার একরাত্রের জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। অন্ধকারে যাওয়া এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ফিরে আসা। —কিছুই মনে পড়ে না। তোমার কিছু মনে পড়ে না?"

"উঁহুঃ! সে কি আজকের কথা!"

রমেশ তা স্বীকার করে। বলে, "উপায়ই বা কি বল! সংসারে ত আর একটা লোক নেই যে দে'খে শু'নে—ক'টা দিন চালিয়ে নেবে। নইলে তুমিই না হয়—"

সরযূ ম্লান হাসি হেসে বললে, "আমি কি তোমায় বলেছি যে, তোমায় দেখলে আমার জ্বর আসে, এখান থেকে দিনকয়েক হাওয়া খেতে না গেলে আমি বাঁচব না?"

রমেশ গর্ব্ব অনুভব করে।—"আশ্চর্য্য তোমাদের মন! ছেলেবেলার দেশে ফিরে যেতে একবার ইচ্ছে করে না?

সন্ধ্যার সময় সরযূ কোনদিন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চিল্কার তীরে ঘু'রে আস্‌ত, অন্ধকার খুব বেশী গাঢ় হ'বার আগেই ফিরে আস্‌তে হ'ত। রাত্রে জগন্নাথের মা রুটি বেল্‌তে ব'সে তার জীবনের সহস্র কোটি ঘটনার ইতিহাস বর্ণনা করতে করতে অতিষ্ঠ করে তুল্‌ত। কিন্তু বলাই বা যায় কি! ওই এখানে সরযূর একমাত্র সঙ্গিনী, সরযূকে সে মেয়ের চেয়ে বেশী স্নেহ কর্‌ত। যে-কাহিনীগুলি বহুবার শুনে পুরান হ'য়ে গিয়েছে, তাও শুন্‌তে হ'ত। কত হাসি,কত কান্নায় মধুময় সেই দিনগুলি!

এমনি দীর্ঘকাল! বৈচিত্র্য নেই, উত্তেজনা নেই! বাহিরে যে প্রকাণ্ড পৃথিবীতে মানুষে মানুষে লড়াই বাধে, স্বার্থের সংঘাতে রক্তস্রোত ছোটে, যে-পৃথিবীতে দম্ভদৃপ্ত রাজশক্তি নিমেষে ধূলিচুম্বন করে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের প্রতিভার প্রতিযোগিতা চলে—তার সঙ্গে সরযূর পরিচয় অল্প।

রথযাত্রার সময় এই দিকটায় যাত্রীদের যাতায়াত একটু বাড়ে; কতলোক কতদূর থেকে আসে শ্রীক্ষেত্র দেখ্‌তে। বালুবেলার কূলে অকূল, নীল সমুদ্র! এখান থেকে মোটেই দূর নয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সরযূর আর সেখানে যাওয়া হয়নি। রমেশ অবশ্য অনেকবার বলেছে, জগ'র মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে; কিন্তু ছেলেদের ভারই বা নেয় কে, রমেশের খাওয়ার ব্যবস্থাই বা হয় কোত্থেকে? যাবে যাবে করেও কোনবারই যাওয়া হয় না।

এবারও হ'ল না।

যাত্রীদল ফিরে গেল, রমেশের কাজের ভিড় এল কমে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই ছোট্ট সংসারটিকে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতে হ'ল। সংবাদ এল উমা আর বিজন আসছে—উমা আর উমার বর।

একেবারে অপ্রত্যাশিত! কোত্থেকে আসছে, কেন আসছে সে-সব কিছুই ভাল জানা গেল না, কিন্তু সরযূ সে রাত্রে চোখের জল আর হঠাৎ ধরে রাখ্‌তে পারলে না।

কেন আসছে তারা—তাকে দেখ্‌তে? এতদিন পরে উমারই তাকে মনে পড়ল বুঝি!

জগর মায়ের খাটুনীও বেড়ে গেল। কোথায় ভাল ঘি হয়, সরযূ তাকে খুঁজে আন্‌তে পাঠালে; যে গয়লা ভাল দুধ দেয় তাকেও খপর দিতে হ'ল!

দু-দিন পরে ঠিক যথাসময়ে উমা আর বিজন ট্রেন থেকে নাম্‌ল।

উমার নখাগ্র থেকে মাথার কালো চুলের রাশি পর্য্যন্ত একটি প্রশান্ত, নিবিড় পরিতৃপ্তিতে ভরা। সমস্ত দেহ ভাদ্রের ভরানদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। পরনে জরিপাড় দিশি শাড়ী, দামের চেয়ে রুচির পরিচয়ই তাতে প্রচুর।

কিন্তু উমা আজও ঠিক তেমনি ছেলেমানুষটি আছে।

প্রণাম করে বল্‌লে, "এই দিদি, তোর ছেলেটা কি দুষ্টু দেখ্‌, আমায় দেখে জিভ্‌ বার করে হাসছে! এই পাজী ছেলে, আমি তোমার কে হই তা জান?"

সরযূ ছেলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বল্‌ মাসী।"

খোকা অনেক ভেবে এবং অনেক চেষ্টা ক'রে বল্‌লে, "তুমি মাচি।"

বিজনের সঙ্গে রমেশের কথাবার্ত্তা হ'ল।

"এসেছিলাম রথ দেখতে, হঠাৎ ওঁর খেয়াল গেল রথের সঙ্গে কলা-বিক্রীটাও সেরে আসতে। ভাব্‌লাম তাই ভাল, একসঙ্গে চিল্কা আর আপনাদের—"

রমেশ কি ক'রে তার সৌভাগ্য প্রকাশ করবে ঠিক করতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইল।

চমৎকার ছেলে বিজন, বিধাতা যেন তাকে ধ্যানে ব'সে গড়েছেন। রূপের সঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধির সঙ্গে ঐশ্বর্য্য এবং বিনয় মিশে তার অন্তর-বাহিরকে একটি অপূর্ব্ব শ্রী দান করেছে।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বল্‌লে, "আঃ, কি টেবিলে ব'সে ব'সে টিকিটের হিসেব মেলাচ্ছেন! ও চিরদিন থাক্‌বে, চলুন ভিতরে—"

রমেশ-চশমা জোড়া অকারণে চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "এই যে যাই, আর একটু—"

উমার সঙ্গে দেখা হবে সরযূ যেন ভাব্‌তেই পারেনি। কথায় বলে—রাস্তায় রাস্তায় দেখা হয়, কিন্তু বোনে বোনে—

জগ'র মা লুচি বেল্‌ছিল। উমা রান্নাঘরে ঢুকে এক-পাশে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "তুমি কি পাগল হ'লে দিদি—এই দু'পুরে লুচী খাবে কে? না, না, ও সব হবে না।"

কিন্তু সরযূর আগ্রহের কাছে উমার আপত্তি টিক্‌ল না। উমা জগর মাকে তুলে দিয়ে বসে গেল লুচি বেল্‌তে। সরযূ ভয়ে, আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লে, "ওসব হ'বে না উমা, তুমি ঘরে গিয়ে ব'স। ছি ছি অসুখ-বিসুখ হ'লে—"

উমা খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল—বাধাহীন নির্ঝরিণীর কলঝঙ্কার! বল্‌লে, "আমাকে কি মনে করছিস্‌ বল্‌ দেখি দিদি! লুচি বেল্‌লে মানুষ মারা যায়, না আমরা কখনও—"

এবার সরযূকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।

উমার কলরবে বাড়িটা যেন হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

"চল্‌ না দিদি, চিল্কা দেখে আসি।"

"এখন নয়, রোদ পড়্‌লে।"

"তবে পাহাড়ের তলা থেকে—"

"সে এখান থেকে অনেক দূর। যত কাছে মনে হচ্ছে ঠিক তা নয়।"

উমা যেন একটি লঘু-পক্ষ রঙীন প্রজাপতি!

রান্নাঘরের ধূমজালের মধ্যে ব'সে সরযূর আজ বাল্যের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছবিগুলি মনে পড়ছিল। উমা যেন তাদের সেই ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীভবনের উদাস গন্ধটি বহন করে এনেছে।

হ্যাঁ রে উমা, দেশে যাসনি একবারও?"

হ্যাঁ, দেশে উমা একবার গিয়েছিল বিজনের সঙ্গে। তাদের যে বাড়িটি বিক্রী হয়ে গেছে তা আর চেন্‌বার

উপায় নেই। ছিল জীর্ণ একতালা, হয়েচে তিন-মহলা ত্রিতল।

সরযূ তার ছেলে-বয়সের সাথীগুলির কথা জান্‌তে চাইল। শাঁখারীদের রাণু, বোষ্টমপাড়ার দুষ্টু কমলী, বাড়ুযোদের রাখালী?

উমা যথাসাধ্য সংবাদ দিলে;

"আসবার দিন কম্‌লীর সঙ্গে দেখা, তোর কথা জান্‌তে চাইলে। সেই হাড়-বেরকরা কম্‌লীটা কি ধুমশোই হয়েছে ভাই! ওইখানেই ওর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু মনে ওর এতটুকু সুখ নেই, দু'টি ছেলে হয়েছিল, কলেরায়—"

"দু'জনেই গেল বুঝি?"

"তাই। বল্‌লে হাসতে ভুলে গেছি ভাই, শাশুড়ীর মুখ-নাড়া আর সহ্য হয় না। ছেলে দুটো গেল সে যেন আমারই দোষ! উনিও আর ভাল ক'রে কথা ক'ন না। শুনছি আবার বিয়ে করবেন।"

"আর রাণু?"

"ওর সঙ্গে দেখা হয়নি—শ্বশুরবাড়ীতে আছে। একটা মাতালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, মাস-আষ্টেক পরেই বিধবা হয়েছে। ওর মার কাছে শুনলুম।"

সরযূর যেন শ্বাস রোধ হয়ে আস্‌ত! যে-পৃথিবীতে ওরা এককালে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে সে যেন আর নেই! কোথায় গেল সেই নিরুদ্বেগ দিন-রাত্রি; সংসার কেন এমন হয়?

বিকেলে চিল্কা দেখতে যাবার কথা।

বিজন এসে বল্‌লে, "দিদি আপনাকেও যেতে হ'বে।"

সরযূ হাস্‌লে, বল্‌লে, "ওর আর নতুনত্ব নেই, দেখে দেখে চোখ পচে গেল।"

"তা হোক্, আমাদের জন্যে না-হয় আরও একটু যাবে। উঠুন।"

সরযূ আপত্তি করতে পারলে না, উঠতে হ'ল হাতের কাজ ফেলে রেখে। এমন কি রমেশ পর্য্যন্ত আজ বেরিয়ে পড়ল, ছোট ছেলেমেয়েগুলিও।

সূর্য্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু রক্তরাগ আকাশ থেকে মুছে যায়নি; ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর তা'র আভা এসে পড়েছে। জলের মাঝে মাঝে উঠেছে ছোটখাট পাহাড়, তীরে সারি সারি মাছ-ধরা নৌকা বাঁধা। অনেক ব'লে-কয়ে তাদেরই একটা ভাড়া নেওয়া হ'ল। মাঝে মাঝে দুই একটি লঘু, শ্বেত-পক্ষ পাখী উড়ে যাচ্ছিল, খানিক দূরে অন্ধকার নামছে—সেদিকটা অস্পষ্ট, কুয়াসাময়। বিজন চতুর্দ্দিকে ভাল ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে নিয়ে ব'লে উঠলো, "আমার একটু বেয়াদপি করতে সাধ যাচ্ছে; দিদি যদি ক্ষমা করতে রাজী থাকেন—"

সরযূ হেসে জানাল, বে-আদপি যত গুরুতর হোক না কেন, ক্ষমা করতে সে প্রস্তুত।

অল্পকাল পরেই বোঝা গেল, অন্যায়টা আদৌ ক্ষমার অযোগ্য নয়। বিজন গান সুরু করে দিলে।

নৌকা চলেছে—অলস, একটানা গতি। তীর থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে—অস্তরবির আলো কখন মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার অনতি-নিবিড় অন্ধকার ছায়ার মধ্যে বিজনের গলার স্বর যেন শব্দময় প্রার্থনার মত শূন্যের উদ্দেশে ভেসে যাচ্ছিল। কেউ কথা বলছে না, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত কান্না-ভয় ভুলে গেছে। সরযূর চোখের কোলে যে অকারণে একটি ক্ষীণ অশ্রুরেখা জেগে উঠেছে, সে-কথা ও নিজেই জান্‌ত না! ওর সমস্ত মন যেন হ্রদের মত ব্যাপ্ত, গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিল।

গান থাম্‌তে রমেশ প্রায় চীৎকার করে বল্‌লে,—"চমৎকার, চমৎকার! এক কলকাতায় থাক্‌তে ইয়ের মুখে শুনেছিলাম—তারপর…হো'ক্, আর একটা হো'ক্—"

বিজন বল্‌লে, "একজনের ওপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিলে মাধুর্য্যের হানি হয়। এইখানেই আরও একজন রয়েছেন, তিনি বড় কম যান না।"

বিজন উমাকে ইঙ্গিত করলে। রমেশ প্রায় উঠে বসল।

"কে, উমার কথা বলচেন বুঝি? তা' বেশ ত—কিন্তু উনি কি আপনার সুমুখে—"

বিজন বল্‌লে, "তাতে বাধ্‌বে না ; আমি পাওয়ার-অফ-এটর্ণী দিলাম !"

বাড়ী ফির্‌তে প্রায় আটটা বেজে গেল—পাহাড়ের আড়ালে খণ্ডচাঁদ লুকিয়ে গেল। কিন্তু সময় যে এত অনায়াসে কাট্‌তে পারে তা' সরযূ রমেশ অনেকদিন ভাব্‌তে ভুলে গিয়েছিল। পথে আস্‌তে আস্‌তে সরযূ ভাবছিল—কেন সকল মানুষের জীবনযাত্রা এমনি সহজ, স্বচ্ছন্দ হয় না ! কেন এত সঙ্কীর্ণতা, এত বাধা, এত ব্যথা ?

এ তার অসূয়া নয়, যে অতৃপ্তির অজগর তার গোপন মর্ম্মে এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, সে যেন আজ অতি-অকস্মাৎ ফণা তুলে আকাশ স্পর্শ করতে চাইল। সরযূ নিজেই মনে মনে শিউরে উঠল।

রাত্রে দুই বোনে আবার কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। উমার বিরতির মধ্যে দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল সচ্ছল গৃহচ্ছবি সরযুর চোখের সাম্‌নে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল—ঠিক যেমন আজকের সন্ধ্যায় তাদের নৌকাখানা ভেসে চলেছিল ··

সরযূ এলোমেলো প্রশ্ন ক'রে চলল—"যে বুড়ো বট-গাছটার ঝুরি ধ'রে আমরা ঝুলতাম, সেটা আজও বেঁচে আছে ? তুই একদিন হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছিলি মনে পড়ে ?"

"হুঁ, সেই ত হাতের এইখানটা ছড়ে গিয়েছিল।"

"তোদের বাড়ীর ছাদ থেকে মনুমেণ্ট দেখা যায় ?"

"দূর পাগল ! কেন, তুই কি যাস্‌নি ? সব ভুলে গেছিস্ বুঝি !"

সরযূ হাস্‌বার চেষ্টা করল। রমেশ তখন ষ্টেশনের ঘরে হিসেব মেলাচ্ছিল।

রাত্রি।

পাশের ঘরে উমা আর বিজন ; এ ঘরে সরযূ রমেশ, তিনটি ছেলেমেয়ে। রমেশ ঘুমে অচৈতন্য, কানের কাছে তোপ গর্জ্জে উঠলেও তার নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা নেই। সরযূ ঠিক ঘুমোয় নি, একটু তন্দ্রা হয়ত এসেছিল, কিংবা আসেনি। ছোট ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠতেই ওকেও উঠে বসতে হ'ল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সরযূ দোল দিতে লাগল।

বিজন আর উমার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল পাশের ঘর থেকে, খোকার কান্নার শব্দে ওদের আলাপের তন্ময়তা দূর হয়নি এতটুকু, হয়ত কানেও পৌঁছায় নি !

আকাশ সাগরের জলের মত নীল স্বচ্ছ, চাঁদের আলোয় ভাসছে ; জানালা দিয়ে দেখা যায় পাহাড়গুলো অস্ফুট স্তব্ধতার মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সরযূ সেইদিকে চেয়ে ওদের কাথাবার্ত্তা শোনবার চেষ্টা করল ; কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। শুধু অনুভব করা যায়, একটি অপূর্ব্ব ভাবের নিবিড়তা তাদের কণ্ঠে সঙ্গীতধারার মত দুলে দুলে উঠছে।

খানিক এইভাবে লোভীর মত কান পেতে বসে থাকতে থাকতে সরযূর লজ্জাবোধ হচ্ছিল। ছিঃ, কত নীচ, কত ছোটই না হ'য়ে গেছে তার মন। কেন এমন হয় ! কি চায় সে ?

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে সরযূ স্বামীর শিয়রে এসে দাঁড়াল। একাগ্র দুই চোখ মেলে রমেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

ও তার ঘুম ভাঙাতে চায়, বাহিরের ঐ জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশের দিকে চেয়ে অতন্দ্র চোখে রমেশের সঙ্গে গল্প করতে চায়। কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দেয়, ঘুমন্ত ছেলেগুলির দিকে চোখ পড়ে।

পাশের ঘরে উমা ও বিজনের নিশীথ কলরোল তখনও অবিরাম ! সরযূর চোখের কোল বয়ে আবার একটি অস্পষ্ট অশ্রুধারা জ্যোৎস্নার আলোকে মুখের ওপর ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

ঘরে থাক্‌তে না পেরে নিঃশব্দ পায়ে সরযূ মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়াল !

বহুদূর বিস্তৃত শান্ত নিস্তব্ধতা সরযূর চমৎকার লাগ্‌ছিল। উতলা হাওয়ায় মস্তিষ্কের এলোমেলো চিন্তা-গুলি পথ হারিয়ে গেল।

মাত্র দুই-চারিটি দিন—সুদীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে কতটুকুই বা !

তবু এই স্বল্প কয়েকটি দিন-রাত্রির মধ্যেই ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্কীর্ণ কোয়ার্টারটির হাওয়া যেন বদলে গেল। আজ হ্রদের মাঝখানে পাহাড়ে চড়া, কাল পাহাড়ের কোলে পিক্‌নিক্ করা, হাসি গান, ছুটোছুটি··· একটি প্রাচুর্য্য ও পরিতৃপ্তির সুর সংসার-শ্রীকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে—

কিন্তু বিজন আর উমা বেশী দেরি করতে পারলে না। দু-দিন পরেই বিজনকে কলকাতায় একটা 'কেস' লড়্‌তে হ'বে; পৌছতে না পারলে মক্কেলের কাছে আক্কেল সেলামী দেবার প্রয়োজন হ'তে পারে।

তাই, ধীরে ধীরে বিদায়ের দিনটি—যাত্রার মুহূর্ত্তটি আসন্ন হয়ে এল।

সরযূ উমাকে আড়ালে ডেকে এনে বল্‌লে, "কম্‌লীর সঙ্গে দেখা হ'লে আমার কথা বলিস—রাখালীকেও। ওরা চিঠি দেয় না কেন, ওদের ঠিকানাই বা কি—জিজ্ঞেস করবি।"

প্রণাম আশীর্ব্বাদ, চোখের জলের মধ্যে হাসি আন্‌বার বৃথা চেষ্টা, আবার কবে দেখা হবে—এই সব মামুলী ব্যাপারগুলিও শেষ হয়ে গেল।

বিজন ও উমা সরযূ এবং রমেশকে ষ্টেশনে দাঁড় করিয়ে রেখে ট্রেনে উঠে ব'স্‌ল। জগর মা জগন্নাথ স্বয়ং চার টাকা করে বক্‌শিস পেলে। বিজন সরযূর হাতে দেবার জন্তে দু'খানা নোট বার ক'রে বললে, "খোকা-খুকীদের মিষ্টি কিনে দেবেন—ওদের জন্তে ত কিছুই আন্‌তে পারিনি।"

সরযূ বল্‌লে, "অত টাকার মিষ্টি ওরা খেতে পারবে কেন! আর খেলেও অসুখ হ'বে—ডাক্তারের খরচ জোগাবে কে! ওটা তোমারই কাছে থাক্ ভাই।"

* * * * *

—"ভারি বিশ্রী। ভাল লাগে না, ভাল লাগে না।"

দিন ও রাত্রিগুলি যেন অকারণ ও অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য্য!

উমা আর বিজন—ছোট দুটি প্রাণী, কিন্তু তারাই যেন এই সুশৃঙ্খল সংসারটিকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাদের অ-বারণ প্রাণের দুরন্ত খেয়াল দিয়ে তারা ঘটিয়ে দিয়ে গেছে বিরাট পরিবর্ত্তনের সুর। উমার মুখে সরযূ শুনেছে—বিস্ময়কর শহরের বিচিত্র পথঘাট, নব-নব ঐশ্বর্য্যের কথা—যা সে দেখে আসেনি! রাখালী, কম্‌লী, তাদের সেই পচা পুকুর আর বনঝোপে ভরা জন্মপল্লী সব যেন অকস্মাৎ ঘুম-ভেঙে সরযূকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—বৃহত্তর মুক্ত জীবনের দিকে।

রমেশ চিরকালের নিয়ম মেনে কলের ঘোড়ার মত খেটে চলেছে; ক'দিনের গোলযোগে যেটুকু অবহেলা দেখা গিয়েছিল, সেটুকু সে সুদসুদ্ধ ভরিয়ে তুল্‌ছে।

বিজন ভারি আমুদে লোক—এ'কথা সে এক এক-দিন স্বীকার করে সরযূর কাছে। উমা মেয়েটিও খাসা।

···এই পর্য্যন্তই, রমেশ আর কিছুই বলে না। ছেলে-মেয়েগুলো তেমনি করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে—বিশ্রী! দুধ পেতে এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দেবে আর অবিরাম চীৎকার! ছোটটার সর্দ্দি কাশি লেগেই আছে—মুখে কালী মাখ্‌ছে, চোখ দুটো যেন বুজে আসছে—যাবেও হয়ত কোন্ দিন!

কোন কোন রাত্রে সরযূর মনে হয়, এবার সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার ছুটি চাই—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। কিছুদিনের জন্তে সে চায় নিরুৎসাহ আলস্যটিকে প্রাণভরে উপভোগ করতে!—কিন্তু এ সব তাকে দেবে কে, পাবেই বা কোথায়?

না, মুক্তি নেই—ও একটা মায়া।

সেদিন সন্ধ্যার পর আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে—তিস্তার তীরে গাছগুলোয় ব্যাকুল মর্ম্মরধ্বনি জেগেছে! বৃষ্টি আসেনি বটে, কিন্তু দেরিও বড় বেশী নেই।

রমেশ দেয়ালগিরির আলোয় ব'সে ব'সে ষ্টেশন-রুমে হিসেব মিলাচ্ছিল। সরযূ এসে চেয়ারের পিছনটিতে দাঁড়াল। রমেশের কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে, "কি করচো?"

কণ্ঠস্বরে একটি মধুর স্নিগ্ধতা! রমেশ ঘাড় না তুলেই হাসবার চেষ্টা করে বল্‌লে, "ই কি! একেবারে অন্দর ছেড়ে সদরে! কি খবর বল শুনি!"

সরযূ বললে, "খবর এমন মারাত্মক কিছু নেই। চল না একটু চিল্কার ধারে ঘুরে আসি।—যাবে?"

রমেশ কলমটা আর একবার দোয়াতে ডুবিয়ে নিয়ে জবাব দিলে,—"পাগল হয়েচো, এই দুর্জ্জয় মেঘ মাথায় নিয়ে যাবে চিল্কার ধারে!"

একটু থেমে রমেশ আবার বললে, "হঠাৎ এ খেয়াল কেন?"

সরযূ উত্তর দিতে গিয়ে একটা কথাও খুঁজে পেল না—নির্ব্বোধের মত নিরর্থক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে তরু-পত্রের অবিরাম কাকুতি এবং ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে চিল্কা হয়ত উদ্দাম, চঞ্চল হয়ে উঠেছে—নৌকাগুলি তীরের বন্ধন ছিঁড়ে অনির্শ্চিতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে হয়ত! দ্বীপের মত পাহাড়গুলির পায়ে আছাড় খেয়ে অস্থির জল-স্রোত কি কাকুতি নিবেদন করে কে জানে?

হাওয়ার বেগে রমেশের আলোটা যেন খাবি খেতে লাগল।

তখনই বৃষ্টি এসে পড়ল।

সরযূ নীরবে অন্দরে ফিরে গেল।

ভারতে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনের প্রথম যুগ

শ্রীহরিহর শেঠ

ইউরোপের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ইংরেজ-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। খৃষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহুদি দেশ-সমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল বলিয়া পুরাতন লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোর্ত্তুগীজ বণিকগণের এদেশে আগমনের বহু পূর্ব্বে রুষ দেশীয় বণিকগণ এদেশ হইতে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্, শাল, মশলা ও ঔষধাদি লইয়া যাইত বলিয়া জানা যায়। তৎপরে মিশর ও আরব বণিকগণের দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমনের কথারও উল্লেখ আছে। এসব বাণিজ্যের পণ্যাদি জাহাজেই প্রেরিত হইত।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার জলপথে ভারতের মালাবার উপকূলে কালিকাটে আগমনের কথা সর্ব্বজন-জ্ঞাত। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে এদেশে এবং এদেশ হইতে অন্যত্র জাহাজ চলাচলের ও পূর্ব্বকালে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে জাহাজ নির্ম্মাণেরও বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৮৯—৯০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক গ্রাঁপ্রী (Grandpre) যখন ভারত-ভ্রমণে আইসেন, তখন তিনি কলিকাতায় সেগুন কাষ্ঠের জাহাজ নির্ম্মাণের অনেক কারখানা দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত জাহাজই বায়ুর সাহায্যে বা মনুষ্য-শক্তিতে পরিচালিত হইত।
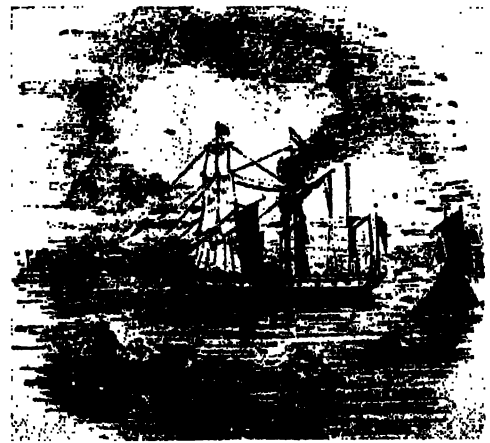
টেগাস্

ইংলণ্ড হইতে ভারতে বাষ্পীয়পোত পরিচালনার প্রথম পরিকল্পনাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই উভয় দেশের মধ্যে কি উপায়ে উহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে জনষ্টোন্ নামক এক ব্যক্তি তাহার একটি উপায় পরিকল্পনা করেন। পর বৎসর তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। তখন কলিকাতায় একটি সভায় স্থির হয়, প্রথম যে কোম্পানী বিলাত হইতে ভারতে বাষ্পীয়পোত পরিচালনা করিবেন, তাঁহাদের জন্য দশ সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হইবে।

সর্ব্বপ্রথম যে কলের জাহাজ বা ষ্টীমারখানি এদেশে আসে, তাহার নাম "এণ্টারপ্রাইজ"। উহা দুইখানি ষাট অশ্বশক্তির এঞ্জিন সংযোজিত একখানি
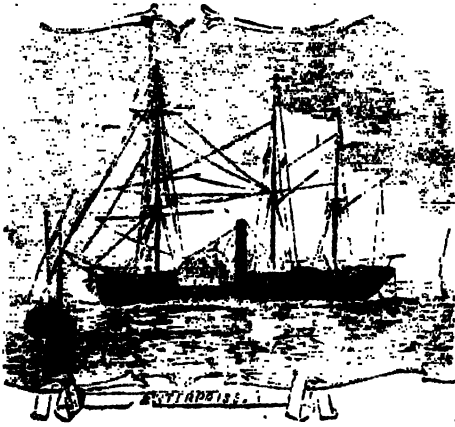
এণ্টারপ্রাইজ

৫০০ টন ভারবাহী জাহাজ। উল্লিখিত জনষ্টোন্ সাহেবের চেষ্টায় চাঁদা তুলিয়া ডেপ্টফোর্ড নগরে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ফল্‌মাউথ বন্দর হইতে ছাড়িয়া ঐ বৎসরের ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পৌছে। মার্শম্যান্ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—উহা আসিতে ১৩০ দিন লাগিয়াছিল। আবশ্যক হইলে যাহাতে বিনা বায়ু-সাহায্যে চালিত হইতে পারে এইজন্য এই পোতখানি প্রাচীন পাল দেওয়া জাহাজের আকারেই গঠিত হইয়াছিল।

এই প্রথম বাষ্পীয় চালিত জাহাজখানি আসিবার পথে যাত্রীদের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। সেকালে পথে কয়লা লইবার স্থান কম থাকায়, দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে ষ্টীমারে অধিক পরিমাণে কয়লা লইবার ব্যবস্থা থাকিত। এণ্টারপ্রাইজ তিনশত টন কয়লা লইয়া বন্দর ত্যাগ করে, কিন্তু উহাতে কয়লা রাখিবার স্থান যথেষ্ট না থাকায় কতকগুলি কয়লা বয়লারের পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছিল। পথে আসিতে উহাতে অগ্নি সংযোজিত হইয়া যাওয়াতেই এই উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

জাহাজখানি সেণ্টটোমে আসিয়া পৌছিলে তথায় কয়লার পরিবর্ত্তে জ্বালানি কাষ্ঠ লইতে বাধ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় জাহাজ গন্তব্য স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই কাষ্ঠগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়। সুতরাং অন্য উপায় না থাকায় শেষপথ পালের সাহায্যেই চলিতে হয়। এই প্রকারে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজখানি আসিয়া পৌছে। কিন্তু একখানি দ্রুতগামী পাল দেওয়া জাহাজের অপেক্ষা ইহাতে সময়ের স্বল্পতা কিছুমাত্র পরিলক্ষিত না হইয়া এবং ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছিল। এণ্টারপ্রাইজ জাহাজের এঞ্জিনও যথোপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল না, একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু সময়ের কিছু সুবিধা করিতে যে কল-কব্জার আবশ্যক তাহাতে ব্যয় তখন অত্যন্ত অধিক বিবেচিত হওয়ায় প্রথম ভারতাগত বাষ্পীয় পোতে উৎসাহ উদ্দীপনার পরিবর্ত্তে অসাফল্যের কথাই বেশী মনে হইয়াছিল।

এই সময় টমাস ওয়াগহর্ন মধ্যসাগর হইয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিবার নূতন পথে যাতায়াতের প্রস্তাব করেন এবং অচিরে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। এই কার্য্যের ওয়াগহর্ন সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে যে সুবিধা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যদি তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইতেন তাহা হইলে নিয়মিত বাষ্পীয়পোত পরিচালনার দ্বারা ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগাযোগ স্থাপিত হইতে আরও অন্ততঃ বিশ বৎসর দেরি হইত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজে এই কৃতি পুরুষের একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পি এণ্ড ও কোম্পানী নামে যে ষ্টীমার কোম্পানী আছে উহাই পেনিনসুলা ষ্টীম্‌শিপ্ কোম্পানী

নামে সেকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানী প্রথমে ইংলণ্ড হইতে আইবেরিয়া উপদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের জাহাজ পরিচালনা আরম্ভ করেন, পরে এলেকজেণ্ড্রীয়া পর্য্যন্ত লাইন খোলা হয়। কতিপয় বৎসর ধরিয়া সুয়েজ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত কোন কোম্পানী কোন নূতন লাইন না খোলায় পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'হিউ লিণ্ডসে' নামক ৪১১ টন ভারবাহী দুইখানি ৮০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এঞ্জিন সহ একখানি প্যাড্‌ল ষ্টীমার তাহাদের জন্য নির্ম্মিত হয়। ভারতীয় নৌ-বিভাগের উইলসন্ সাহেবের অধিনায়কত্বে উহা উক্ত সালেই প্রথম বোম্বাই হইতে এডেনে যাত্রা করে। এই ষ্টীমারখানিতে সাড়ে পাঁচ দিনের খরচের উপযোগী কয়লা লইবার স্থান ছিল। বোম্বাই হইতে আরবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বন্দরে পৌছিতে তৎকালে আট দিন সময় লাগিত। সুতরাং প্রথমবার জাহাজ ছাড়িবার সময় এগার দিনের প্রয়োজনের মত কয়লা বোঝাই লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটু আশঙ্কার কারণ ছিল, কিন্তু বাতাস প্রতিকূল না থাকায় কোন বিপদ ঘটে নাই। উহা মার্চ্চ মাসের ২১শে বোম্বাই ছাড়িয়া ৩১শে এডেন পৌছায়। তখন মাত্র ছয় ঘণ্টার উপযোগী কয়লা মজুত ছিল। ২২শে এপ্রেল জাহাজ সুয়েজ পৌছায়। সুতরাং মোট তেত্রিশ দিন সময় লাগে, ইহার মধ্যে লোহিত সাগরের বিভিন্ন স্থানে কয়লা লইতে বার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। জাহাজখানি বোম্বাইয়ে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ৩৭ দিন সময় লাগিয়াছিল। উহার গতি ছিল গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ছয় মাইল।

লিণ্ডসে ১৮৩১-৩২ ও ৩৩ সালে প্রতি বৎসর একবার হিসাবে আর তিনবার মাত্র সুয়েজ যাতায়াতের পর অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরদের আদেশে উহার পরিচালনা বন্ধ হইয়া যায়। তখন স্থির হয়, বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন উহা আর ব্যবহৃত হইবে না। প্রতিবার যাত্রায় গড়ে যে কয়লা খরচ হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৪৬,২৫০৲ টাকা, আর বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত আরোহী-প্রতি ৮০০ টাকা ভাড়া লইয়াও চিঠিপত্রের হিসাবে ও আরোহীর ভাড়ায় গড়ে আয় হইয়াছিল মাত্র ১৪,২২৫৲ টাকা।
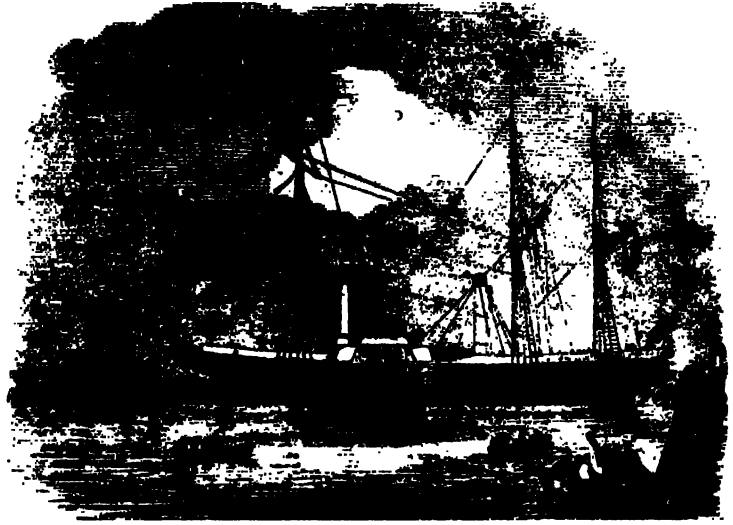
বেন্টিঙ্ক

এই ষ্টীমার সার্ভিস্ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর কলিকাতার ব্যবসাদারগণ—যদি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক সরকারী সাহায্য ও ডাক লইয়া যাতায়াতের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা পাওয়া যায়—তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বাষ্পীয় মেল সার্ভিস্ খুলিবার এক প্রস্তাব পাঠান। ইহা সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে, একখানি বহুজন-স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র কমন্স মহাসভায় ও আর একখানি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহার ফলে পরিশেষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত মাসিক একবার করিয়া ষ্টীমার যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় নৌ-বিভাগের

কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা রাখিবার স্থানযুক্ত প্রয়োজনানুরূপ তিন ষ্টীমার খরিদ হয়। ইহাদের নাম 'সেমিরেমিস', 'বেরিনিস' ও 'জেনোবিয়া'। উহাদের গতি ঘণ্টায় পৌনে নয় মাইল এবং উহারা প্রায় ৬৫০ টন ভারবাহী।

হিমালয়া

তৎকালে লোহিত-সাগর হইয়া যে-সকল আরোহী আসিত, তাহারা পি এণ্ড ও কোম্পানীর কোন জাহাজে ইংলণ্ড হইতে এলেকজেণ্ড্রীয়া পর্য্যন্ত আসিত সেকালের এই কোম্পানীর জাহাজ গুলির মধ্যে। 'টেগাস' অতি প্রাচীন। উহা ছিল ৯০০ টন ভারবাহী, এবং ৩০০ অশ্বশক্তিশালী এঞ্জিন দ্বারা উহা চালিত হইত। জেনোবিয়া নামক ষ্টীমারখানি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খরিদের পূর্ব্বে ওয়াটারফোর্ড হইতে বৃষ্টলে শূকর আনিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ফেন্ নামক এই জাহাজের এক জন যাত্রী লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশে এমন খারাপ ও মহার্ঘ কেবিন্ দেখেন নাই। তিনি প্রথম রাত্রি ভিন্ন আর নিদ্রা যাইতে সক্ষম না হওয়ায় ২০০৲ টাকা উপরি দিয়া ভোজনাগারের টেবিলের উপর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারই নিম্নে দেশীয় চাকরেরা নাসিকাধ্বনির সহিত নিদ্রা দিত। মিস্ এম্মা রবার্ট্‌স্-এর বর্ণনা হইতে বেরিনিসের দুরবস্থার কথাও জানা যায়। উহাতে নয়টি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল, প্রত্যেকটিতে অতি-কষ্টে দুইজন করিয়া শয়নের স্থান ছিল, তন্মধ্যে একজনকে মেজেয় শুইতে হইত।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা ইণ্ডিয়া ষ্টীম কোম্পানী কলিকাতা হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানি ১২০০ টনের ৩২০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট এঞ্জিনের জাহাজ ৩৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। উহাতে ২৯টি কেবিন ছিল, তাহাতে ৮২ জন যাত্রী যাইতে পারিত। উহা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী প্রথমবার কলিকাতা ছাড়িয়া ১১ই ফেব্রুয়ারী সুয়েজ পৌছায়।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পি এণ্ড ও কোম্পানী কলিকাতা-সুয়েজ নামক একটি শাখা ষ্টীমার লাইন খোলেন। উহার প্রথম চালিত ষ্টীমারখানির নাম 'হিন্দুস্থান'। উহা ৫২০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট ১৮০০ টনের জাহাজ। উহাতে ১৫০
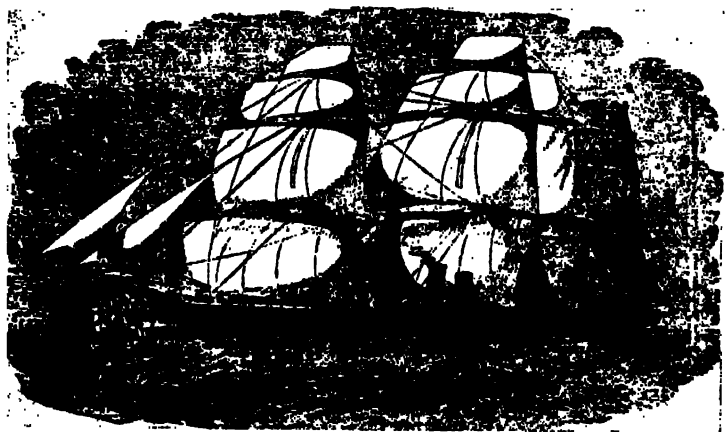
পেরা

জন আরোহীর স্থান ছিল। ১৮৪২, ২৬শে এপ্রিল লিভারপুল্ হইতে উহা প্রথম ছাড়ে। পর বৎসর 'বেন্টিক্' নামে আর একখানি ঠিক এইরূপ ষ্টীমার ছাড়িয়াছিল। উহা দুইটি চিমনি-বিশিষ্ট ছিল। এই জাহাজে একবারে ছাব্বিশ দিনের খরচের মত কয়লা লইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহাই বিলাতে প্রস্তুত দুই চিম্‌নি-বিশিষ্ট প্রথম জাহাজ।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় নৌ-বিভাগের জাহাজ বোম্বাই-সুয়েজ এবং পি এণ্ড ও কোম্পানীর কলিকাতা-সুয়েজ উভয়ই চলিতে থাকে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ব্বোক্ত সেমিরেমিস্ ও মেম্‌নন্ ভগ্ন হইয়া যায়। শেষোক্তখানি সুয়েজ যাইবার সময় প্রথম যাত্রাতেই বিনষ্ট হয়। এইখানিতেই কোম্পানীর অন্য সব কয়খানির অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। এই সময় পি এণ্ড ও কোম্পানীর কয়েকখানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। তাহাদের 'গ্রেট লিভারপুল্' নামক জাহাজখানি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জলমগ্ন হইয়া ইহাতে একজন ভিন্ন সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহাই ইংলণ্ডের প্রস্তুত দুই চিমনী-বিশিষ্ট ষ্টীমারের মধ্যে প্রথম। ইণ্ডাস্ নামক জাহাজখানি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পথিমধ্যে এল্‌জিরিয়া হইতে ১১০ মাইল দূরে বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু সুখের বিষয় কাহারও প্রাণনাশ ঘটে নাই।

পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রথম স্ক্রু ষ্টীমার যাহা এদেশে আসে তাহার নাম 'হিমালয়'। উহা ৩,৫৫০ টনের ষ্টীমার, দৈর্ঘ্যে ৩৭২ ফুট, উহাতে ২০০ জন লোকের উপযুক্ত স্থান ছিল। সে সময়ের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাষ্পীয় জাহাজ। উহাতে পালও ব্যবহার হইত। অনুকূল বায়ুতে উহার গতি ছিল ঘণ্টায় কুড়ি মাইল। এই জাহাজখানি পরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং পি এণ্ড ও কোম্পানী ১৮৫৬ সালে 'পেরা'(Pera) নামে আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ উহার পরিবর্ত্তে আনয়ন করেন। উহাও স্ক্রু ষ্টীমার। ইহার পর ১৮৫৭ ও ৫৮তে ভেলেটা ও ডেল্টা নামে কোম্পানির আর দুইখানি ষ্টীমার আসিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।*

---

* প্রথম যুগে বাষ্পীয় জাহাজের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৯২৪ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে The Times of Indiaতে প্রকাশিত ডেওয়ার (Douglas Dewar) ডগলস্‌এর প্রবন্ধ হইতে প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছে। মূল চিত্রগুলি ১৮৪৩-৫৮ এর Illustrated London Newsএ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে সে-রাত্রে একটা ট্যাক্‌সি আর কোনমতেই জোটান গেল না। বৃষ্টি হচ্ছিল টিপি টিপি—তবু তারই মধ্যে হেদোর দিকে পা চালান গেল; ভরসা—যদি শ্যামবাজার-ফেরৎ এক-আধটা মিলে যায়। ছ্যাকড়া গাড়ী—যত চাও—বেরিয়ে গেল সাম্‌নে দিয়ে, দু-চারখানা আটপৌরে ফিটনও। ফুটপাথের ধার থেকে দু-চারজন কোচ্‌ম্যান্ হাত নেড়ে ডাক্‌ল—নিতান্তই যেন নির্ব্বিকার—গরজের বোঝা সবটাই যেন আমাদের। কিন্তু ট্যাক্‌সি?—যত যায় সবই দেখি বোঝাই। না, আর ধৈর্য্য রাখা গেল না। শেষে একখানা থার্ড-ক্লাস গাড়ী ডেকে চেপে বসলাম—চলুক আস্তে আস্তে যতক্ষণে যায়। খোলা জানালাগুলো দিয়ে ঠাণ্ডা পশ্চিমে-হাওয়া গায়ে লাগ্‌তে লাগ্‌ল—ভারি মিষ্টি একটা পরিবর্ত্তনের গন্ধে ভরা—সেই ভিজে মাটির গন্ধ যা এই বিরাট নগরীর বুকের ভেতর থেকেও চুঁইয়ে আসে।…ক্রমে ঘোড়ার খুরের একঘেয়ে আওয়াজ, জানালার খট্‌খটানি ও চাকার গম্ভীর শব্দ—এই সব মিলে চমৎকার একটা তন্দ্রার আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। বাড়িতে এসে যখন গাড়ী থামল তখন আমরা

ঘুমের রাজ্যের মাধামাঝি। ল্যাম্প-পোষ্টের আলোতে একটা টাকা ও দুটো সিকি ঠিক উঠল কিনা দেখচি—হঠাৎ ওপরের দিকে নজর পড়্‌ল। কোচম্যানের বয়স হ'বে ষাটের কাছাকাছি—মুখটা লম্বা, শীর্ণ। ঝুলে-পড়া পাকা গোঁফ-জোড়া ও লম্বা দাড়ি তার জীর্ণ নীল কুর্ত্তার কলারের ওপর হেলে পড়েচে। সবচেয়ে চোখে পড়ে তার গালের দুটি গর্ত্ত—গভীর যেন অতল—মুখটায় যেন খালি হাড় আর হাড়—মাংস যেন সযত্নে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেচে। চোখদুটি যে কোথায় ঢুকে গেছে—মনে হয় একেবারে মৃত; জ্যান্ত মানুষের দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য কই ওখানে? তার জায়গাটিতে সে ব'সে আছে—চুপচাপ নিস্পন্দ। ঘোড়ার লেজের দিকে নিবদ্ধ ওর দৃষ্টি।...আর যা' খুচ্‌রো রেজকি ছিল সেই দেড় টাকার সঙ্গে তা' দিয়ে দিলাম—নিজের অজ্ঞাতেই যেন। হাত পেতে সে নিল—কথা বলল না কিছুই। তারপর যেই আমরা বাগানের গেটে পা দিয়েচি শুন্‌লাম সে বল্‌চে—"আমার জান্ বাঁচালেন, হুজুর!"

এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের উত্তর কি দেব? গেট বন্ধ ক'রে আবার গাড়ীটার কাছে ফিরতে হ'ল কাজেই—

"কেন, দিনকাল কি খুবই খারাপ?"

সে বললে, তা ছাড়া আর কি! তাদের রুটি উঠল এবারে—কেউই চায় না তাদের। চাবুকটা তুলে তারপর সে গাড়ী হাঁকাবার উদ্যোগ করলে।

"কতদিন ধ'রে তোমাদের এ দুরবস্থা?"

আবার সে হাত নামাল—ভারি একটা আরামের সঙ্গেই যেন। ভাঙা ভাঙা উত্তর দিল—গাড়ী হাঁকাচ্ছে সে কি আজ থেকে—পঁয়ত্রিশটি বছর ধরে তার এই কাজ—

তারপর হঠাৎ সেই ঘোড়ার লেজের দিকে তাকিয়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে গেল। 'ওর যে এ অভ্যাসটি আছে তা' ও জানে না দেখচি। অনেক প্রশ্নের পর আবার তার কথা জোগাল, না কারুকেই দুষছি না আমি—ট্যাক্‌সিকেও না কারুকেই না। আমাদের তকদিরেই করেছে সব।—সকালে বেরোলাম যখন পরিবারের হাত খালি একেবারে। এই কালই সে বল্‌ছিল আমাকে—'এই যে চার মাস গেল তার মধ্যে কামালে কত?''এই ধর হপ্তায় টাকা-চারেক'—"না, পাঁচ টাকাই হ'বে—আচ্ছা না হয় তাই-ই হ'ল'—

"তোমরা তা হ'লে পেট ভরে খেতেও পাও না?"

কোচ্‌ম্যান হাস্‌ল একটু—তার গণ্ডের দুই কোটরের মাঝখানে এই যে হাসি—তেমন বিচিত্র ভয়াবহ হাসি মানুষের মুখে বোধ হয় দেখেনি কেউ। ঘাড় নেড়ে বললে—"প্রায় তাই আর কি। এই দেখুন না—আপনাদের আগে মাত্র একটা বারো আনার ভাড়া খেটেচি—কালকের রোজগার মাত্র দেড়টি টাকা। এর অর্দ্ধেক আবার যাবে গাড়ীর মালিকের পকেটে—তবুও ত কম। অনেক মালিকের অবস্থাও এই আমাদেরই মত—অবিকল। কাজেই ছাড়্‌তে হয় সস্তায়—"

আবার সেই অদ্ভুত হাসি। বলে—কষ্ট হয় তাদের জন্যও—আর ঘোড়া বেচারীদের জন্যও—তবু তাদের মধ্যে বোধ হয় এই জানোয়ারগুলোই আছে ভাল সবচেয়ে।

আমার সঙ্গীটি পাবলিককে উদ্দেশ ক'রে কি-একট বললেন। শুনে কোচ্‌ম্যান্ মুখ ফেরাল—অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় যেন তার দৃষ্টি! "পাব্‌লিক?"—গলার স্বরে তার ক্ষীণ বিস্ময়ের রেশ "তারা ত সব চায় ট্যাক্‌সি। চাইবেই ত। জল্‌দি পৌঁছে দেবে—সময়ের দাম ত আছে। সাত ঘণ্টা বসে থেকে তবে আপনাদের ভাড়া পেলাম আর তাও ত আপনারা ট্যাক্‌সিই খুঁজছিলেন। আমাদের গাড়ীতে যারা আসে, তারা আসে উপায় নেই বলেই—কাজেই মেজাজ্‌ও তাদের খুশী থাকে না। আর আছে দু'চারজন সেকেলে লোক—যারা মোটর চাপ্‌তে ভয় পায়, কিন্তু তা'দের হাত দিয়ে পয়সা গলান কি সোজা কথা?"

আমরা বল্‌লাম তোমাদের দুরবস্থায় সবাই ভারি দুঃখিত...আমাদের উচ্ছ্বাসের ধারা বন্ধ হ'য়ে গেল তার কথায়—সে বললে, "কথায় ত চিঁড়ে ভিজ্‌বে না।...কেউ কিন্তু এ সব কথা জান্‌তে চায়নি আগে।"

শীর্ণ মুখটি ও-পাশে ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "কর্‌বেই বা কি লোকে? তারা ত আর বসিয়ে বসিয়ে তোমায় খাওয়াতে পারে না। শুধু জিজ্ঞেস ক'রেই বা লাভ কি? তা' জানে তারা—তাই করে না। আমার মত

এমন কত আছে—তবে ক্রমেই ক'মে আসচে এই যা ভালো।"

এই অবলুপ্তির জন্য বেদনা প্রকাশ করব কি না বুঝতে পারি নি। ঘোড়াদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যে মনে হল তাদের পাঁজরার হাড়গুলোর যেন অন্ত নেই-অগুন্তি। হঠাৎ আমার সঙ্গীটি ব'লে ওঠেন, "এই ঘোড়াদের চেহারা দেখেই লোকে চায় যে ট্যাক্‌সিতে ট্যাক্‌সিতেই রাস্তা ছেয়ে যাক্।"

কোচম্যান্ মাথা নাড়লে—এদের গায়ে না কি মাংস ছিল না কোনোদিনই। দানা পেয়েও তাজা হয় না-আজকাল—যদিও খেতে পায় পেট ভরেই—জিনিষ তত সুবিধে নয় অবিশ্যি।

"আর তোমার ভাগে বুঝি তাও জোটে না?"

আবার সে চাবুকটা তুল্‌ল, নিতান্তই উদাস ভাবে বল্‌লে—"এ কাজ ছেড়ে যে অন্য কিছু করব তারও উপায় নেই আর। শেষ পর্য্যন্ত ভিক্ষের ঝুলি!"

আবার সেই বিচিত্র হাসি—তিনবারের বার। হ্যাঁ, অবস্থা খুবই খারাপ বটে। তার নিজের ত কোন দোষ নেই, কিন্তু চল্‌বে এইভাবেই—একটা আসে আর একটাকে তাড়িয়ে দেয় ধাক্কা দিয়ে। দুনিয়া চলে। তাদের দিন ফুরিয়েচে তাই ব'লে নালিশ করবার ত কিছু নেই।

তিনবারের বার সে চাবুক তুললে।

"আচ্ছা, তোমার ভাড়ার ওপর যদি আর আট আনা তোমায় দেওয়া যায় তা হ'লে কি কর?"

থতমত খেয়ে সে নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, "কি আর করি—কিছুই না! করার আছেই বা কি?"

"তবে এই যে বল্‌লে, তোমার জান্ বেঁচে গেল?"

ধীরে ধীরে সে উত্তর দিল---"তা' বলেচি বটে, হুজুর। মনটা বড্ড যেন দ'মে গেচে; ভাবনা যেন জোর ক'রে ঘাড়ে চেপে ব'সে, নড়তে চায় না---যদিও চাই নিজের অবস্থার কথা ভুলে থাকতেই।"

এইবারে ছোট্ট একটি "সেলাম, হুজুর" বলে সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাল। হঠাৎ যেন ঘুম থেকে চম্‌কে জেগে উঠে তারা গাড়ী টান্‌তে সুরু করলে। গাছের ছায়া ও গ্যাসের আলোর ঝিলিমিলি-ভরা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী এগোতে থাক্‌ল। মাথার উপরে তমিস্র আকাশের বুকে পরিবর্ত্তনের গন্ধে ভরা বাতাসে পাল তুলে সাদা মেঘের ভেলা সারি সারি ভেসে চলেচে। গাড়ীটা চোখের আড়াল হ'য়ে গেচে, কিন্তু হাওয়ায় ব'য়ে আসচে ওর মন্থর-গতির মিশিয়ে যাওয়া আওয়াজ।*

* গল্‌সোয়ার্দি।

মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা

অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কুমার ছত্রসাল ২২ বৎসর বয়সে মাত্র ৩৫ জন অশ্বারোহী ও ৩০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। ১৬৭২—১৬৮০ পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেবের দম ফেলিবার অবকাশ ছিল না। দাক্ষিণাত্যে শিবাজী, পঞ্জাবে তেগ বাহাদুর, বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খুশ্‌হাল খাঁ খাটক, দিল্লীর দরজায় সৎনামী সম্প্রদায়—সকলেই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের তুলনায় ছত্রসাল ক্ষুদ্র শত্রু বলিয়া উপেক্ষিত রহিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার ভার বুন্দেলখণ্ড ও মালবের স্থানীয় মোগল ফৌজদারগণের উপর পড়িল। সিরোঞ্জের ফৌজদার হাশিম খাঁকে পরাজিত করিয়া ছত্রসাল সমস্ত জেলা লুঠ করিলেন। ছত্রসালকে দমন করিতে আসিয়া ধামোনীর ফৌজদার খালিখ নিজেই ধরা পড়িল। কেশো রায় বুন্দেলা ছত্রসালকে চৌথ দিতে অস্বীকার করায় প্রাণ হারাইল। প্রতি যুদ্ধের পর ছত্রসালের সৈন্যবল দশগুণ বাড়িয়া

চলিল। তাঁহার বড়ভাই রতন সাহ—যিনি এযাবৎ ছত্রসালকে "লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ" বলিয়া কৃপা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তিনি এবং আরও দু-একজন বাদশাহী মন্‌সব ছাড়িয়া এ দলে যোগ দিলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ধামোনীর ফৌজদার রণদৌলা খাঁ (রুহুল্লা?) এবং যশোবন্ত সিংহ বুন্দেলা ছত্রসালকে দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রাকার-বেষ্টিত শহর ও প্রধান দুর্গগুলি ছাড়া বুন্দেলখণ্ড ও মালবের কিয়দংশে মোগল-শাসন একেবারে লোপ পাইল।

এই বৎসর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব জিজিয়া-কর প্রবর্ত্তন করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। মন্দিরধ্বংস, হিন্দু ব্যবসায়ীর উপর দ্বিগুণ বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য্য (শতকরা ৫৲), হিন্দু দেওয়ান ও পেশকারদের শতকরা ৫০ জনের পদচ্যুতি ও তাহাদের স্থানে মুসলমান নিয়োগ ইত্যাদি ব্যবস্থার পর এই মুণ্ড-কর হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া দিল। মিবারের রাণা হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত কেহই এ কর দান হইতে অব্যাহতি পাইল না। বাদ্‌শা হিন্দুদিগকে "হাতে ও ভাতে" মারিবার জোগাড় করিতেছেন দেখিয়া তাহারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের সহায়তা করিতে লাগিল। যাহারা মুণ্ড-কর দিতে পারিল না তাহারা মুসলমান হইয়া গেল; যাহারা গোঁয়ার (যথা—মালবের রাজপুত ইত্যাদি) তাহারা জিজিয়া-আদায়কারী নিরপরাধ কাজীদের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হিন্দুস্থান হইতে শেষ বিদায় লইয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ে চলিলেন। চোরাবালিতে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে লোকের যে অবস্থা হয়, ঔরঙ্গজেবেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল। মারাঠা, আদিল শাহ ও কুতবা শাহের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি এতই ব্যস্ত রহিলেন যে, ছত্রসালের বিরুদ্ধে কোন বৃহৎ অভিযান পাঠাইবার সুবিধা পাইলেন না। পূর্ব্ববৎ মালবের ফৌজদার তাঁহাকে বাধা দিবার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে লাগিল। শের আফ্‌কন খাঁ নামক রানোডের ফৌজদার ছত্রসালকে ১৬৯৯ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে দুইবার সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং গাগরোণ পরগণা অধিকার করেন। গৃহভেদই বোধ হয় ছত্রসালের পরাজয়ের কারণ; এ সময় ছত্রমুকুট বুন্দেলা নামক সর্দ্দার তাঁহার দল ছাড়িয়া মোগলদের সঙ্গে যোগ দেন। ছত্রসাল সাময়িক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে নিরুৎসাহ হইলেন না। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ধামোনীর ফৌজদার খায়ের আন্দেশ খাঁ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। এই সময়ে গন্দোয়ানায় দেবগড়ের রাজা বখ্‌ত বুলন্দ গন্দ বিদ্রোহী হওয়ায় ছত্রসালের শক্তি আরও বাড়িয়া গেল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ছত্রসাল মারাঠা-সেনাপতি নীমা সিন্ধিয়াকে নর্ম্মদা পার হইয়া মালব আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব প্রসিদ্ধ তুরানী সেনাপতি ফিরোজ জঙ্গকে মালব ও বুন্দেলখণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ফিরোজ জঙ্গ নীমা সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন; কিন্তু ছত্রসালের ক্ষমতা সুদৃঢ় দেখিয়া তাঁহার সহিত একটা আপোষ করিবার জন্য বাদ্‌শাহকে অনুরোধ করিলেন। ৪-হাজারী মন্‌সবদার হইয়া ফিরোজ জঙ্গের মধ্যস্থতায় ঔরঙ্গজেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। মন্‌সবের লোভে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; ৩৩ বৎসর যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ছত্রসাল বুঝিয়াছিলেন, মোগল-সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে এবং সম্রাটের জীবন-প্রদীপও নির্ব্বাণোন্মুখ; সুতরাং ভাবী সঙ্ঘর্ষ ও বিপ্লবের জন্য বলসঞ্চয় আবশ্যক।

শিবাজী, শম্ভুজী, রাজারাম মরিলেন, শাহু ধৃত হইল, সাতারা পান্‌হালা সিংহগড়ে মোগলের বিজয় পতাকা উড়িল, মহারাষ্ট্রভূমি তৃণবৃক্ষশূন্য শবাস্থি-শুভ্র শ্মশানে পরিণত হইল; তবুও মারাঠা জাতি মরিল না। বরং তাহারা এখন বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে জগতের অন্নদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে লাগিল, এবং প্রতি সপ্তাহে বাদশাহী রাজ্য লুটের কিয়দংশ তাঁহার মঙ্গলার্থ মিষ্টান্ন বিতরণ ও কাঙ্গালী-ভোজনে ব্যয় করিত। কেন-না লুটের বাজার যখন একটু নরম পড়িয়াছিল, তখন তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করিয়া তাহাদের

বিচরণক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত ও নিরাপদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরোক্ষভাবে তিনি মারাঠা জাতির জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রের বাহিরে মালব ও গুজরাটে বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের সন্ধান দিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পরে পেশবা বাজীরাও মহারাষ্ট্র-স্বরাজের ভিত্তি প্রসার করিয়া আসমুদ্র হিমাচল হিন্দু-পদ-পাদশাহী স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা এ কার্য্যে বাজীরাওয়ের সহায়ক হইয়াছিলেন, মহারাজা ছত্রসাল তাঁহাদের অন্যতম।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ছত্রসাল দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মোগল দরবারের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। লালকবি লিখিয়াছেন, শিখদের লোহগড়-দুর্গ বিজয়ে সহায়তা করিবার পুরস্কার-স্বরূপ সম্রাট ছত্রসালকে মন্‌সব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায়, ছত্রসাল বলিয়াছিলেন---"জাহাঁপনা! আমি বার্ষিক দু-কোটি টাকা আয়ের ভূমির অধিকারী; ইহা ছাড়া গুরু প্রাণনাথজীর কৃপায় পান্নার খনি পাইয়াছি। যিনি দুনিয়ার মালিক আমি তাঁহার মন্‌সবদার; বাদশাহী মন্‌সবে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা কবি-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র, ঐতিহাসিক সত্য নয়। সম্রাট ফরুখশিয়ারের রাজত্বকালে ছত্রসাল সৈয়দভ্রাতাদের সপক্ষে যোগ দিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ৬-হাজারী মন্‌সবদারের পদে উন্নীত হইলেন। সেকালে হয় মোগল সম্রাটের কর্ম্মচারী, কিংবা মূর্দ্ধাভিষিক্ত স্বাধীন রাজা ব্যতীত অন্য কেহ ন্যায়ত প্রজাশাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। যে-কারণে কোম্পানী বাহাদুর সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও তাহাদের আশ্রিত দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে এলাহাবাদের চায়ের টেবিলের উপর বসাইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার হাত হইতে সুবাত্রয়ের দেওয়ানী সনন্দ লইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর কার্য্যত স্বাধীন রাজা, মহারাজা, নবাব, নিজাম ইত্যাদি---যাঁহারা তলোয়ারের জোরে ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন---মোগল সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা অপমানজনক মনে করিতেন না।

সম্রাট ফরুখশিয়ারের রাজত্বকালে সৈয়দভ্রাতাদ্বয়ের পরিচালনায় দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। স্ব স্ব প্রধান রাজা ও নবাবগণ প্রমাদ গণিলেন।

রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা, বুন্দীরাজ বুধসিংহ হাড়া, গোহডের জাট (ধোলপুর রাজবংশ), এবং মালবের ক্ষুদ্র জমীদারগণ এক মণ্ডলী গড়িয়া মুসলমান-প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মহম্মদ শাহের রাজ্যারোহণের পর ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের হিন্দু সুবেদার ছাবিলা রাম নাগরের ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধর বাহাদুর বিদ্রোহী হইলে এই হিন্দুমণ্ডলী তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে ছত্রসাল ৩০ হাজার সৈন্য সহ কাল্পী আক্রমণ করেন এবং এলাহাবাদের নূতন সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গশের প্রতিনিধি দিলীর খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সমস্ত বাঘেলখণ্ড এবং সুবা পাটনার প্রান্ত পর্য্যন্ত দখল করিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সুযোগ্য পাঠান সেনাপতি বহু রোহিলা সৈন্য লইয়া বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন।

মহম্মদ খাঁর পুত্র কায়েম খাঁ বান্দা জিলা এবং স্বয়ং মহম্মদ খাঁ মহোবার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিলেন।

মহোবার ২০ মাইল পশ্চিমে জৈতপুরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে ছত্রসাল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গোহদের জাটেরাও তাহাদের তোপখানা লইয়া ছত্রসালের সাহায্যার্থ আসিল। জৈতপুরের ৪০ মাইল দূরে প্রথম যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ছত্রসাল পরাজিত হইয়া জৈতগড়ের পাহাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল এখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ৪৫ হাজার সৈন্য ও তোপখানা লইয়া ছত্রসাল অতর্কিতভাবে পাঠান সৈন্যকে আক্রমণ করেন। বুন্দেলা সৈন্য পাঠান-ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষের তাঁবু ও আসবাব

লুটিয়া লইতে লাগিল। এদিকে মহম্মদ খাঁর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

আশী বৎসরেও বৃদ্ধ ছত্রসাল যৌবনের রণোন্মাদনায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হাতী দুইটি তীরবিদ্ধ হওয়ায় অসংযত হইয়া পলাইয়া গেল। মহম্মদ খাঁর পরাজয় জয়ে পরিণত হইল।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জৈতপুর দুর্গ পাঠানেরা অধিকার করিল। ছত্রসাল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া মহম্মদ খাঁকে ৪০ লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ দিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রহিল। দিল্লীতে গুজব উঠিল, ছত্রসালের সাহায্যে পাঠানেরা তৈমুর-বংশকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে। ছত্রসাল দিল্লীর দরবারের মহম্মদ খাঁর শত্রুপক্ষীয় মনোভাব জানিয়া যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইলেন। অযোধ্যার নবাব সাদত খাঁও বুন্দেলাদিগকে অনেক ভরসা দিলেন। ছত্রসাল এ সময়ে পেশবা বাজীরাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন; সন্ধির প্রস্তাব শত্রুকে প্রতারিত করিয়া সময়লাভের কৌশলমাত্র। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া জৈতপুরের নিকটবর্ত্তী পাঠান-শিবির অবরোধ করিলেন। মহম্মদ খাঁর পুত্র বান্দা জেলা হইতে জৈতপুরের ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সুপা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। মারাঠা ও বুন্দেলা সৈন্যের অধিকাংশই কায়েম খাঁকে বাধা দিবার জন্য চলিয়া গেল। এই সুযোগে পাঠানেরা শিবির হইতে বাহির হইয়া জৈতপুর দুর্গে আশ্রয় লইল। চারি মাস ধরিয়া মহম্মদ খাঁ অসীম বীরত্ব ও ধৈর্য্যের সহিত আত্মরক্ষা করিলেন। মনুষ্য ছাড়া অন্য প্রাণী সমস্তই নিঃশেষে ভক্ষিত হইল; দুর্গ-রক্ষীরা অন্নাভাবে মরিতে লাগিল। মহম্মদ খাঁ সাহায্যের জন্য ওমরাহগণ ও বাদশাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। খান্-দৌরাণ সম্সাম-উদ্দৌলা জৈতপুর যাইবেন বলিয়া মহা আড়ম্বরে দিল্লীর বাহিরে তাঁবু ফেলিলেন। অথচ গোপনে ছত্রসালকে লিখিলেন—মহম্মদ খাঁর মাথাটি বাদশাহের কাছে পাঠাইয়া দিলে বহু ইনাম মিলিবে; শত্রুকে হাতে পাইয়া ছাড়িলে ভাল হইবে না। তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহকেও বুঝাইয়া দিলেন, পাঠান সেনাপতি যুদ্ধে জিতিলে ভবিষ্যতে শাহী তখ্‌তের উপর নজর ফেলিবে। ছত্রসাল চাল-বাজীতে খান-দৌরাণ প্রমুখ দরবারীদিগকে মাৎ করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, মহম্মদ খাঁ বাঁচিয়া থাকিলে খান-দৌরাণের পাল্লা ভারী হইতে পারিবে না, রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শত্রুতাও নাই, বন্ধুত্বও নাই। মহম্মদ খাঁ কখনও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিবেন না কিংবা, কোন কর দাবী করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতিমাত্র লইয়া ছত্রসাল সসম্মানে তাঁহাকে জৈতপুর ত্যাগ করিতে দিলেন। কয়েক দিন পরে কায়েম খাঁ নূতন ফৌজ লইয়া যমুনা পার হইলেন; কিন্তু পাঠান সেনাপতি পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহারাজ ছত্রসাল পেশবা বাজীরাওকে নিজ রাজধানী পান্না নগরে আমন্ত্রিত করিয়া অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পেশবার হিন্দু-পদ-পাদ্‌শাহীর স্বপ্ন সফল হইল। আজীবন যুদ্ধ করিয়া ছত্রসাল যে বুন্দেলখণ্ডে মুসলমান-শাসন ধ্বংস করিয়াছিলেন, বাজীরাও সাহায্যার্থ না আসিলে কালে উহা রোহিলখণ্ডের ন্যায় পাঠান উপনিবেশে পরিণত হইত। দেশের ও ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি বাজীরাওকে জ্যেষ্ঠপুত্র-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ তাঁহার নামে লিখিয়া দিলেন। এরূপ ত্যাগ ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। অনেকে মনে করেন, ইহা "সর্ব্বনাশং সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতিমাত্র,—স্বেচ্ছায় না দিলে পেশবা বাজীরাও কাড়িয়া লইবার শক্তি রাখিতেন। পেশবা বলপূর্ব্বক ছত্রসালের রাজ্যগ্রহণ করিলে উহা উভয়ের পক্ষে অযশস্কর হইত।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী যেমন কর্ম্মজীবনে গুরু রামদাসকে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, মহারাজ ছত্রসালও তেমনি জীবন-সংগ্রামের সঙ্কটপূর্ণ সময়ে মহাত্মা প্রাণনাথজীকে একাধারে গুরু ও মন্ত্রীরূপে পাইয়াছিলেন। কৃতকার্য্যতার জন্য শিবাজী রামদাস স্বামীর কাছে যে পরিমাণ ঋণী, ছত্রসালও তদ্রূপ প্রাণনাথজীর কাছে ঋণী।
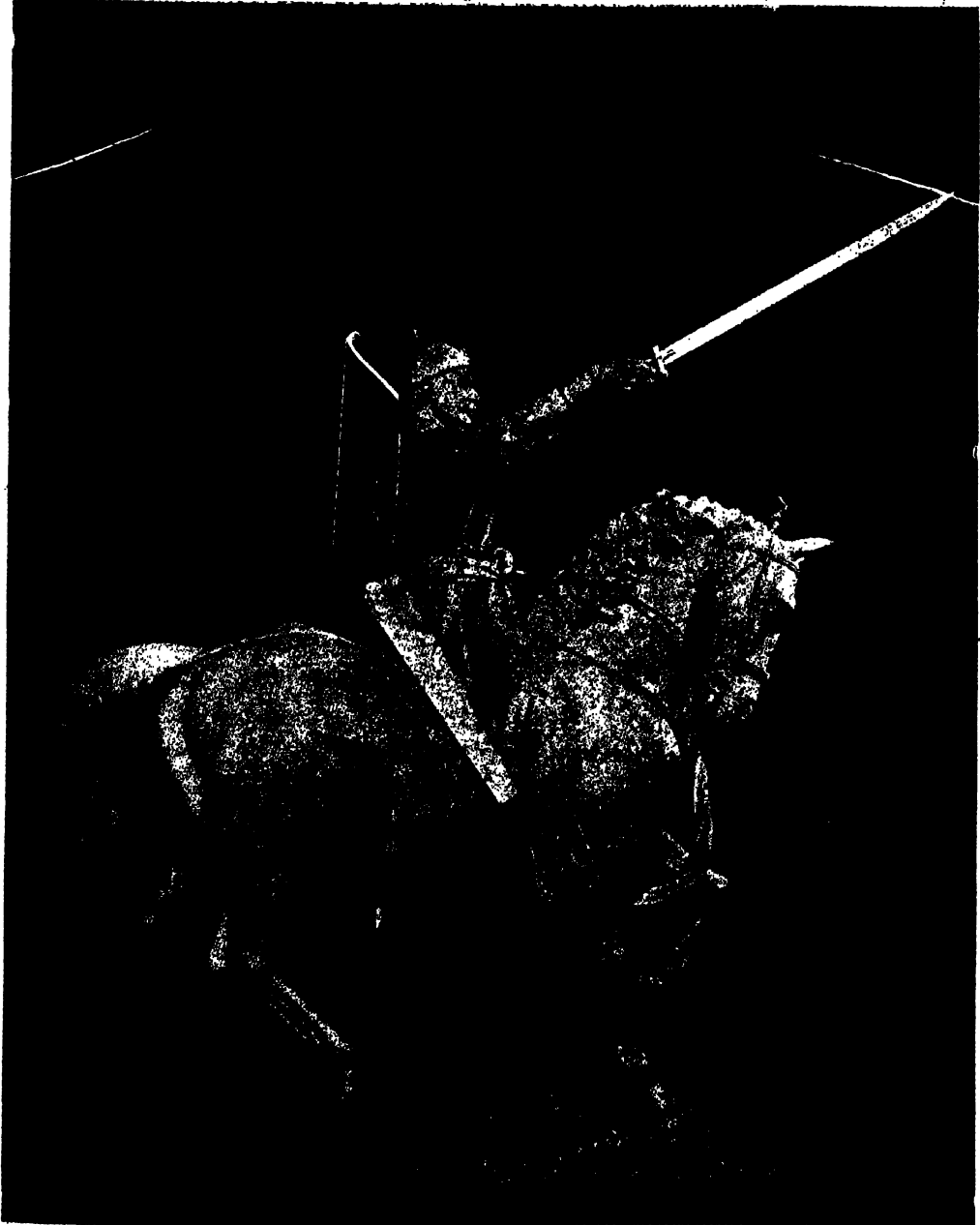
পান্নায় স্থাপিত মহারাজ ছত্রসালের প্রস্তর-মূর্ত্তি

প্রাণনাথজীর জন্মস্থান কাথিয়াবাড় প্রদেশের জামনগর। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম মেহরাজ বা মেবরাজ। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাথিয়াবাড় ও সিন্ধুদেশে কাটাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপদেশ-গ্রন্থের নাম "কুলজম স্বরূপ।" 'কুলজম' আরবী শব্দ—ইহার অর্থ সমুদ্র। এই গ্রন্থে আরবী ও সিন্ধী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। প্রাণনাথ নানক পন্থী না হইলেও গুরু নানকের মতের সহিত তাঁহার উপদেশ ও ভাবের অনেকটা মিল আছে। গুরু নানকের ন্যায় ইনিও আধ্যাত্মিক-রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য, এবং ব্যবহারিক জগতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণনাথজী নিজেকে কৃষ্ণ, মহম্মদ, ও যিশুখৃষ্টের সমন্বয় যুগাবতার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কখন বুন্দেলখণ্ডে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ সময় মহারাজ ছত্রসাল তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন তাহা সঠিক বলা যায় না। জনপ্রবাদ, পান্নার হীরকখনির সন্ধান প্রাণনাথজীই সর্ব্বপ্রথম ছত্রসালকে দিয়াছিলেন। কথিত আছে, পান্নার ধর্ম্মসাগর হ্রদের তীরে "মন্দারতুঙ্গ" নামক পাহাড়ের পাদভূমিতে এক শিলাখণ্ডের উপর বসাইয়া প্রাণনাথজী ছত্রসালের কপালে "রাজটিকা" পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং কোমরে তরবারি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ ছত্রসালের বংশধর পান্না-নরেশ বিজয়া দশমীর দিন এখানে আসিয়া সেই অস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন, সর্ব্বপ্রথমে এস্থানে প্রাণনাথজীর নামে পানের খিড়া উৎসর্গ করা হয়, এবং এইস্থান হইতেই বিজয়া দশমীর "সিন্দুর যাত্রা" আরম্ভ হয়।

মহারাজ ছত্রসাল প্রাণনাথজীর কাছে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতার একছত্রে নিজকে "ব্রহ্ম-রস-রত্তা, এক কায়েম ঠিকানে কা," অর্থাৎ ব্রহ্ম-রস-মগ্ন নিত্যধামবাসী বলিয়াছেন। প্রাণনাথজীর শিষ্যেরা নিজদের "ধামী" বলিয়া পরিচয় দেয়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা অনন্য জু ছত্রসালের জ্ঞান-পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তরে মহারাজ লিখিতেছেন :—

> হো অনন্ত, নহি অন্ত কোউ, অচ্ছর ছত্তা অনন্ত
> ইত রস মে বস মানিবী, আর কীজিবী ধন্ত ॥

—হে অনন্ত! "অন্ত" (সুফীদের 'বিগান্ত") কেহই নয়; অক্ষর (ওঁ), ছত্তা ও অনন্ত (অর্থাৎ আমি ও আপনি) এক। এই (একত্ব-জ্ঞান-জনিত) রসকেই প্রকৃত রস জ্ঞান করিয়া আমাকে দর্শন দিয়া ধন্য করিবেন।

ছত্রসালের এই একেশ্বরবাদ কবীর ও একনাথের একেশ্বরবাদের ন্যায় সাকার উপাসনা ও অবতারবাদ বিরোধী নহে।

ইতিহাস ও জাতীয়তার দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি, রামদাস ও প্রাণনাথজীর নিকট ভারতবর্ষ কত বেশী ঋণী। নির্য্যাতিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাকল্পে মোগল সাম্রাজ্যের কালাগ্নি-স্বরূপ যে অসি কোষমুক্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা মন্ত্রবলে সংযত করিয়া মহারাষ্ট্র ও বুন্দেলখণ্ডে কোরাণ ও মসজিদ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শক্রভীত পদদলিত ভারতের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন না। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্পেনের খৃষ্টান পাদরীর মত জিহাদের বিষ ঢালিয়া মুসলমানকে সমূলে ধ্বংস কিংবা নির্ব্বাসিত করিবার জন্য হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিতে পারিতেন। শিবাজী ও ছত্রসাল অবাধে বালকবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে নিরপরাধ স্বদেশবাসী মুসলমানের রক্তে তাঁহাদের তরবারি কলঙ্কিত করিয়া সাক্ষাৎ কল্কিঅবতার হইতে পারিতেন।

যেখানে ক্ষাত্রশক্তি এরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সুসংযত হয় নাই, সেখানে হিন্দুরা দানবলীলা প্রকট করিয়াছে। রাজারাম জাট আকবর বাদশাহের কবর খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, এবং তাজমহল ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল। ভরতপুর-রাজ সুরজমলের পুত্র জবাহির সিংহ আগ্রার জুম্মা মসজিদে বাজার বসাইয়াছিল। শিখেরা সরহিন্দ শহরে মুসলমানদের কতল আম করিয়াছিল। শিবাজী ও ছত্রসাল মুসলমান-শাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নাই বা মুসলমানমাত্রকে সবংশে নিধন করিবার সঙ্কল্প করেন নাই।

১৭৩১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে

ছত্রসালের দেহান্ত হয়। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা, চতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সুশাসক ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তিনি প্রজাদিগকে পালন করিতেন। ব্যক্তিগত বিরোধকে তিনি জাতিগত বিবাদ করিয়া তোলেন নাই। তিনি সেকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেতু-স্বরূপ হইয়া জাতীয় ভাবের পুষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা আজও পান্না প্রভৃতি বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন।

ছায়া-ছবি

উমা দেবী

১

সোনার তরী

শ্যামাকে সইতে হ'ত শাশুড়ীর শাসন, ননদের বাক্য-যন্ত্রণা আর স্বামীর ঔদাসীন্য। কিন্তু শ্যামাকে কাতর করে কার সাধ্য? তার মনটি অপূর্ব্ব ভাবরসে সদাই মগ্ন; সে ধোপার খাতায় হিসেব লিখ্‌তে লিখ্‌তে কবিতার পদ লিখে বসে থাকে, নয় তো রান্না-ঘরে রান্না চাপিয়ে বসে গুন্ গুন্ করে গান গায়। তার বালিশের নীচে থাকে একখণ্ড কাব্যগ্রন্থ,—বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় দাদার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে। তাদের সে বাড়ীর হাওয়া ছিল অন্যরকম; তার দাদা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তাকে ডেকে ডেকে শোনাতেন; তার ছোট দাদা লিখতেন কবিতা-সে কবিতা যেমনই হোক, শ্যামার কাছে তার আদরের অন্ত ছিল না।

শ্যামার স্বামী পণ্ডিত, তার জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদ-বেদান্তে পূর্ণ; কণ্ঠস্থ শাস্ত্রকথা তার রসনার আনন্দ। পণ্ডিতের মতই সে ব্যাখ্যা করে; রসিকের অন্তর তার নেই, আছে পাণ্ডিত্যের স্থূল অহঙ্কার। শ্যামা স্বামীকে ভক্তি করতে চায়, কিন্তু তার শুষ্ক নীরস জ্ঞানের পথে এগোতে পারে না, পিছনে পড়ে থাকে।

* * * *

একদিন শ্যামার ছোট ননদ তুলসী এসে তাকে মুখ-নাড়া দিয়ে কত অকথ্যই বলে গেল; ও নীরবে শুন্‌লে, তার পরে বল্‌লে, "তুলসী কবিতা শুন্‌বি?" ঝঙ্কার তুলে তুলসী বল্‌লে, "আ মরণ! আমার তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই শুনতে যাব কবিতা, ভারী পড়ুনী হয়েছিস্ যে! তবু যদি হতিস্ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে।" দাদার পাণ্ডিত্যে তুলসীর অগাধ ভক্তি।

শ্যামা তুলসীর হাত ধরে বল্‌লে, "কবিতা শুনেছিস কখনো? আমার মাথা খা, একটা শুন্‌বি চল্।"

কৌতূহলে তুলসী চল্‌লো শ্যামার সঙ্গে। মলিন ছিন্নপ্রায় কাব্যগ্রন্থখানি বের হ'ল শ্যামার বালিশের তলা হ'তে। গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্যামা বস্‌লো বই হাতে। একে একে অনেক কবিতা পড়লে, নীরবে তুলসী শুন্‌লে; সব শেষে সুরু করলে—

"কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল,
হে প্রিয় আমার,
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গা'ব গান
কোন্ সান্ত্বনার?"

তুলসী বাধা দিতে চাইলে, পারলে না; শ্যামার গলা কেঁপে উঠ্‌লো, তবু পড়লে,

"এক শয্যা রাজধানী
অধেক আঁচলখানি,
বক্ষ হতে লয়ে টানি
পাতিব শয়ন—"

তুলসী এগিয়ে এসে বইয়ের উপরে ঝুঁকে পড়লো, যেন মধুর সন্ধান পেয়েছে অলি!

শ্যামা পড়ে চল্‌লো—

"একটি চুম্বন গড়ি
দোঁহে লব ভাগ করি
এ রাজত্বে মরি মরি
কত আয়োজন।"

আর পড়া হ'ল না; তুলসী জোর ক'রে বই বন্ধ করে দিয়ে বল্‌লে, "দোহাই বৌদি, আর পড়িস্ নে।" ছুটে চলে গেল রান্নাঘরে—কিন্তু মায়ের কাছে নালিশ করতে পারলে না।

হরিহর পাশের ঘরে বসে সবই শুনলে।

*　　*　　*　　*

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, ক্লান্ত বধূ যখন স্বামীর পড়বার ঘরে ঢুকলো, তখন তীব্র দৃষ্টিতে হরিহর তার পানে চাইলে; আনমনা শ্যামা তা' লক্ষ্য করলে না; পিলসুজে আর একটু তেল ঢাল্‌লে, শাস্ত্রগ্রন্থগুলি গুছিয়ে রাখ্‌লে, স্বামীর পিঠের কাছে একটা তাকিয়া দিলে; তার পরে বল্‌লে, "পায়ে এবার তেল দিয়ে দিই ?"

রুক্ষস্বরে হরিহর বল্‌লে, "থাক্, থাক্—"

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "রাগ করছ কেন ? দেরি হয়ে গেছে আজ, মায়ের কোমরে ব্যথা বেড়েছে, সেক দিয়ে এলুম তাই"—

হরিহর বল্‌লে, "সেক দিয়ে এলে, না চাঁদের আলোয় কাব্য করে এলে ? যত-সব বাজে চিন্তা দিন-রাত মাথার ভেতর ঘুরচে, হিসেবের খাতায়, ধোপার খাতায় এখানে, সেখানে, কবিতা টোকা—ছিঁড়ে ফেলে দেব সব—"

শ্যামা গভীর ব্যথা পেলে, তবু বল্‌লে, "যদি বারণ কর আর করব না, কিন্তু আমায় একটা পথ বলে দাও—"

হরিহর ওর নম্রতায় খুশী হ'ল, বল্‌লে, "বেশ তোমাকে আমি জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দেব; কি শুনবে বল ? গীতার ভাষ্য না বেদান্তের ভাষ্য ?"

শ্যামা হরিহরের পায়ের কাছে বসে বল্‌লে, "শোনাও যা খুশী"—

গুরুগম্ভীর স্বরে, অসীম শুষ্কতার সঙ্গে সে তখন সুরু করলে আপন পাণ্ডিত্য প্রচার—সে তো ব্যাখ্যা নয়, সে সহজকে জটিল করে তোলা; শেষে নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে বল্‌লে,—"যাও, যাও, আজ শোওগে, কাল শোনাব আর এক অধ্যায়—"

মাথা নীচু করে শ্যামা উঠে গেল।

*　　*　　*

অনেক রাতে প্রদীপের অবশিষ্ট তেলটুকু পুড়ে নিবে গেল। তখন হরিহর বই বন্ধ করে উঠ্‌লো বিশ্রাম আশায়। শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দেখলে, পরিপূর্ণ শুভ্র চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার উপরে, শ্যামা মাথা নীচু করে বসে আছে, সেই আলোর দিকে মুখ ক'রে; যেন এই চন্দ্রালোকে, এই নিস্তব্ধ নিশীথে, সে একান্তে আপন পূজাটি নিবেদন করতে চায়।

হরিহর খুশী হ'ল, ভাব্‌লে, তার আজ্‌কের উপদেশ বৃথা যায়নি, শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্যামার মনকে ছুঁয়েচে।

ধীরে ধীরে পা টিপে সে ঘরে ঢুক্‌লো; কাছে এসে দেখলে সেই কাব্যগ্রন্থখানি শ্যামার কোলের 'পরে খোলা; তার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরছে; আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে সে পড়ছে—"সোনার তরী।"

— —

২

পাখী

মন্দাকিনী শিখিয়েছিল তার পাখীকে একটি মাত্র বুলি—"বন্ধু।" আর পাখী আপনা হ'তে শিখেছিল, মন্দার হাসির অনুকরণে তরল মধুর স্বরে হেসে উঠ্‌তে—কারণে অকারণে।

সে হাসি যে শোনে সেই চম্‌কে ওঠে। পাড়ার লোকে মান্‌তে চায় না—সে হাসি পাখীর। মন্দার স্বামী নিখিল রাগ করে বলে—"দূর করে দেব ওটাকে, ও কেন তোমার হাসি চুরি করে আমায় কেবলি ঠকায় ?"

শীতের দুপুরে ওদের চটে ঢাকা ছাদের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর বাঁকা হয়ে এসে পড়ে; মন্দা সেইখানে পা মেলে বসে, কাঁথা সেলাই করে, কপনো আচার শুকোতে দেয়, —কখনো বা বিদেশে মায়ের কাছে চিঠি লেখে। আল্‌নের গায়ে ঝোলে পাখীর খাঁচা; পাখী নিবিষ্টমনে ঘাড় বাঁকিয়ে মন্দাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার পর গলা ফুলিয়ে ডাকে - "বন্ধু !" মন্দা সাড়া দেয়—"কি বন্ধু ?" অম্‌নি দুজনে এক স্বরে হেসে ওঠে—যেন সুরে বাঁধা বীণার তারে তারে ঝঙ্কার পড়ছে।

রোগা বউকে ভোলাবার জন্যে ঐ পাখী এনে দিয়েছিল নিখিল, কিন্তু মন্দার রোগ তো সারবার নয়, বেড়ে চল্‌লো দিনে দিনে ; শেষে সে একেবারে বিছানা নিলে।

শেষ কপর্দ্দক খরচ করে স্বামী ওর চিকিৎসা করাতে চায় ; বাঁচবার অনন্ত ইচ্ছে নিয়ে মন্দা এগিয়ে চলে মৃত্যুর পথে।

পাখী আর দোলে না ছাদে, মন্দার ঘরের সাম্‌নে টুলের ওপর বসে বসে ঝিমোয়। কখনো খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে ডাকে—"বন্ধু !" কিন্তু সাড়া পায় না। মন্দার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে ; তার চোখের কোণ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ে।

শেষে একদিন মন্দা চোখ বুজ্‌লে নিখিলের কোলে মাথা রেখে ; পাখীটা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে। তারপর হেসে উঠ্‌লো, মন্দার সুরে, ঠিক তেম্‌নি করে। ঠিকে-ঝি গালাগালি ক'রে উঠানের এক পাশে তাকে ঝুলিয়ে রাখলে।

*　*　*　*

পাশের বাড়ীর ছাদের ঘরে বসে যে ছেলেটি দর্শনে এম্‌-এ পড়ে—আর আকাশের দিকে চেয়ে জগতের যত সমস্যার মীমাংসা করতে চায়—তার কানে এল মন্দার মৃত্যু-খবর—যাকে সে কোনোদিন চোখে দেখেনি, দেখ্‌তে ইচ্ছেও করেনি—কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে যার হাসির সুর কানে এসে তাকে আনমনা করে দিয়েছে—যার সেই পাখীকে "বন্ধু" বলে ডাকাটি বুকে মধুর করে বেজেছে। পড়ায় আর মন বস্‌লো না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে দেখলে, নিখিল নিলাম-দরে সব জিনিষপত্র বিক্রী করে ফেল্‌ছে। এতদিন যা' ছিল তার ঘর জুড়ে, লক্ষ্মীর আসন হয়ে—আজ তা শুধু বোঝা বাড়িয়ে তুলেছে।

ছেলেটি দুই চোখে সহানুভূতি নিয়ে নিখিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নিখিল বল্‌লে, "চল্‌লুম মেসে, কার জন্যেই বা বাড়ীতে থাকা ?"

ছেলেটি বল্‌লে, "কিন্তু ঐ পাখীটা ? ওটা তো বেচবেন না ?"

বোঝাই-করা জিনিষের স্তূপের মাঝখানে মন্দার পাখী বসে আছে খাঁচায় ; রাস্তার গোলমালে, ভয় পেয়ে হাসতে ভুলে গেছে !

নিখিল বল্‌লে—"না, না ওকে তো সবার আগে বিদায় করব ; যত্ন করতে পারে এমন কাউকে পেলেই দিয়ে দেব।"

পাখীটা নিখিলের শোক দ্বিগুণ করে তুলেছে ; ওর হাসি সে সইতে পারে না—অবিকল ঠিক তারি সুর। সে চলে গেল, কিন্তু তার হাসি কেন রেখে গেল পাখীর গলায় ?

ছেলেটি চুপ করে ভাবলে ; তার পর বল্‌লে, "আমায় দেবেন পাখীটা ? আমি কিনব······"

নিখিল অবাক হয়ে বল্‌লে, "কিন্তু আপনার পড়া-শুনোর মধ্যে—"

ছেলেটি বল্‌লে, "তা হোক্‌, ওকে আমার চাই।"

*　*　*　*

খাঁচা হাতে করে দর্শনের ছাত্র ঢুক্‌লো তার পড়ার ঘরে ; ঝুলিয়ে দিলে সেটা জানালার গায়······ডাক্‌লে—"বন্ধু !" পাখী চম্‌কে উঠে হেসে উঠ্‌লো—ঠিক সেই হাসি, মন্দার হাসি।

বন্ধ ঘরে যেন এক দম্‌কা দক্ষিণে বাতাস ঢুক্‌লো। দর্শন আর সেদিন পড়া হ'ল না।

৩

"ভুলো না"

অনন্তের ভাবী বধূকে যেদিন অশোক দেখ্‌তে গেল, সেদিন দেবর লক্ষ্মণের মত শুধু তার আল্‌তা-পরা পা-দুখানি দেখ্‌তে মনে রইল না ; সে চেয়ে চেয়ে দেখলে, বনলতার শান্ত শ্যাম শ্রী ; তার গলায় একটি সোনার হার চিক্‌চিক্‌ করছে।

সবাই বল্‌লে, "বৌদিদির সঙ্গে আলাপ কর, কথা কও" ; অশোক মাথা নীচু ক'রে হাস্‌লে। যদি বল্‌তে পারতো ওর কানে কানে—"তোমাকে ভাল লেগেছে খুব" তবে সে কইত কথা ; নইলে কোন্‌ কথাটাই বা ওর যোগ্য ?

যেদিন বনলতা বউ হ'য়ে এল, সেদিনকার সানায়ের সুর অশোকের মনে এক অভাবিত চেতনা জাগিয়ে তুললে। কেবলই সে মনে মনে বল্‌লে—এও কি সম্ভব? উনি এলেন আমাদের ঘরে গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে যিনি স্বয়ং নারায়ণের ঘরেও অচলা শ্রীতে বিরাজ করতে পারতেন।

বনলতা চায় ছোট দেওরটির সঙ্গে ভাব করতে। শ্বশুর-বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ার মাঝখানে ঐ সাদাসিদে ছেলেমানুষ ছেলেটিকে ওর বড় ভাল লাগে; ওর সঙ্গে কথা কইতে পেলে ও যেন মুক্তি পায়; ওর ভিতরকার বালিকা-মনটি খেলা ভুলে অসময়ে কাজের ঘরে এসে পৌঁছেচে, তাই অশোককে দেখেও সে চকিত হয়ে ওঠে কোন্ হারিয়ে-যাওয়া আনন্দের নেশায়। কিন্তু অশোককে বনলতা ডেকে ডেকেও পায় না। মুখ রাঙা করে অশোক দূর হ'তে চেয়ে দেখে; ঐ ডাকটুকু ওর মনে যে সুর জাগিয়ে তোলে তারি আনন্দে বিভোর হয়ে ও যেন আস্‌তে ভুলে যায়।

* * *

শেষে একদিন পরিচয় হ'ল।

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে—বাড়ীর দুয়ারে এক হাঁটু জল; সন্ধ্যা না হতে আঁধার নেমে এসেছে; সমস্ত বাড়ীটা শোকাচ্ছন্ন বিধবার মত থম্ থম্ করছে। বনলতার শাশুড়ী বেলাবেলি দুয়ার বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন; অনন্ত একখানা ইংরেজী নভেল নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ছে; বনলতা তার সঙ্গে কথা কইতে এসে জবাব পায়নি। তাই সে ঘুরতে ঘুরতে এল অশোকের ঘরে। সে তখন পড়ার বই খুলে বর্ষণমুখর বাইরের দিকে চেয়ে আছে—কি ভাব্‌ছে সে নিজেই জানে না। বনলতা কাছে এসে ডাক্‌লে, "এই শোনো!" অশোক চম্‌কে চাইলে; কতদিন ও মনে মনে ভেবেছে বনলতা এম্‌নি করে একদিন আস্‌বে তার ঘরে—সেদিন সে শুধু তার আসা হবে না, সে হবে আবির্ভাব। যা ওর কল্পনায় ছিল তাই হ'ল আজ সত্য। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "বস্‌বে না?"

বনলতা বল্‌লে—"মুড়ি খাবে বেগুনি দিয়ে?"

অশোক হেসে বল্‌লে, "কোথায় পাবে?"

কাপড়ের আঁচল তুলে বনলতা দেখালে অপরূপ মুখ-রোচক সেই পদার্থ।

তার পর কখন দুজনের সঙ্কোচ কেটে গেল, আলাপ সহজ হয়ে উঠ্‌লো।

অশোক বল্‌লে, "দেখি না তোমার গলার হার, ওর পদকে কি লেখা আছে—"

বনলতা হার খুলে দিলে, পদকে লেখা "ভুলো না।" অশোক আব্‌দার করে বল্‌লে, "আমায় হারটা দেবে বৌঠান—"

বনলতা হেসে বললে, "দূর্—"

* * *

এমনি সময় একদিন এল অনন্তের বদ্‌লির খবর—বনলতাকে নিয়ে সে চলে যাবে মীরাটে।

যাত্রার আয়োজনে বনলতার মন খুশী হয়ে উঠেছে; পশ্চিমে যাবার জন্যে তার মনে এতখানি ঘুমন্ত বাসনা ছিল তা' তো সে আগে জানে নি। কিন্তু সে চম্‌কে উঠ্‌লো হঠাৎ অশোকের মলিন মুখ দেখে। বনলতা যে যাবার কথায় এতখানি খুশী হয়ে উঠেছে—এ যেন অশোক সইতে পারছে না। তাই সে যখন বল্‌লে, "আবার গর্‌মির ছুটিতে আসব, ভাই—" তখন অশোক বলে উঠ্‌লো, "তুমি আসো-আর-না-আসো আমার তা'তে কি?"—

অনন্তের সঙ্গে বনলতাকে যেতেই হবে এ কথাটুকু অশোক বোঝে; তবু বনলতার উপর অভিমান হয়—কেন ও অত খুশী হয়ে চলে যাচ্ছে!

তাই যাত্রার দিনে সে এল না সাম্‌নে। বনলতার উৎসুক দুটি চোখ গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চারিদিক খুঁজ্‌লে, কিন্তু তার দেখা পেলে না।

মীরাটে গিয়েই বনলতা চিঠি লিখ্‌লে, অশোক জবাব দিলে না। সাত দিন পরে আবার এল চিঠি বড় বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরে; এবার শুধু লিখেছে "বড় মন কেমন করে, চিঠি দিও।" অশোক হাতের মুঠোয় চিঠিটা শক্ত করে চেপে রেখে চোখের জল আস্‌তে দিলে না,—ছুটে চলে গেল খেলার মাঠে ম্যাচ্ দেখতে।

* * * * *

তার পর একদিন হঠাৎ অনন্ত ফিরে এল একা। ঝোড়ো কাকের মত তার চেহারা, সর্ব্বহারা ভিখারীর

মত তার দশা; তিন দিনের জ্বরে বনলতা মারা গিয়েছে।

স্তব্ধ নীরব হয়ে সব শুনলে অশোক; তার পর জিজ্ঞাসা করলে—"দাদা, আমার কথা কি কিছু বলেছিল বৌদি?"

অনন্ত পকেট থেকে বের করে দিলে অশোকের হাতে এক গাছি সোনার হার, তার পদকে লেখা—"ভুলো না"।

—

৪

নিশা

এক দিনে এক লগ্নে দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল এক সঙ্গে; উষা বড়, নিশা ছোট।

উষা সকালবেলার আলোরই মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল; নিশা নিশীথ রাত্রির মত রহস্যময় আবরণে ঢাকা।

কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার আগে, দুই মেয়ের বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর মায়ের চোখের জল শুকোতে-না-শুকোতে, নিশা ঘরে ফিরে এল—সিঁথির সিঁদুর মুছে।

মা কেঁদে উঠলেন; নিজের ভাগ্যকে শতবার দোষ দিয়ে বললেন, "পোড়া-কপালি, আমার পেটে জন্মেই তোর এমন দশা", বাপ ওকে বুকে টেনে বললেন, "থাক্ থাক্, আমাদের ঘর জুড়ে ও বেঁচে থাক্, এ দুর্ভাগ্য ওকে স্পর্শ করতে দেব না।"

* * *

নিশা আপন গৃহকোণে তার আগেকার স্থানটুকু জুড়ে বসতে চায়, কিন্তু জায়গা পায় না।

মাঝের কটা দিন তাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে চলে গেছে—সে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।

স্বামীর সঙ্গে তার পরিচয় এতই অল্প যে, স্পষ্ট করে কিছু মনে করতে পারে না; স্বপ্নের মধ্যে সে ভেসে বেড়ায়—সে স্বপ্নে সুখ নেই, আনন্দ নেই। দুঃখ? তাও নেই। বিয়ের সময় পাওয়া তোরঙ্গ খুলে সাজানো কাপড় বের করে মাঝে মাঝে দেখে, আবার ভাঁজ করে রাখে। ফুলকাটা আরসি বের করে মুখ দেখে, কখনো বা খোপায় দুটো ফুল গুঁজে দেয়। মা যদি সাজিয়ে দিতে চায়—দৌড়ে চলে যায় ছাদে—পাচিলে মুখ লুকিয়ে কাঁদে।

* * *

বছর ঘুরে যায়, নিশার জীবনযাত্রা তেমনি একটানা করুণ ভৈরবী সুরে বাজে; সে সুর মন স্নিগ্ধ করে না, শুধু কাঁদায়।

এম্‌নি সময় একদিন নিশার বাবা এনে দিলেন তার হাতে এক টুক্‌রো কাগজ, উষার বর টেলিগ্রাম করেছে—সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় তারা এসে পৌঁছবে।

খুশীতে নিশার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো, বিয়ের পর আর সে দিদিকে দেখেনি, না জানি কেমন আছে সে; তার বর,সে-ই বা কেমন?

মা বল্‌লেন, "কি বসে বসে ভাবছিস নিশা, ওঠ্ না, এইবার, অনিমেষের জন্যে এই ঘরটা সাজিয়ে রাখ্, তার পর নারকোল কুরে পিষে দে, খানকতক চন্দর-পুলি গড়ে রাখি।"

নিশার স্বপ্ন ভেঙে যায়, দৌড়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কাজে লাগে; ওদের ভাঙা ঘরে উৎসবের আনন্দ জেগে ওঠে।

সন্ধ্যাবেলায় দরজায় গাড়ী এসে দাঁড়ালো। নিশা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—দিদিকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে গেল না। উষা নিজেই এল। ছোট বোনের নিরাভরণ সজ্জা দেখে, ওর চোখে জল ভরে এল; বল্‌লে, "নিশি নীচে চল্।"

নিশা সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না ও রোয়েছে যে।"

"ও কে?"

"তোর বর—"

উষা হেসে বল্‌লে, "ওকে লজ্জা? ওযে তোর জামাই-বাবু;" জোর ক'রে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বোনকে।

* * *

অনিমেষ তার জন্যে সাজানো ঘরটিতে যখন বিশ্রাম করছে, প্রদীপ-হাতে নিশা ঢুকলো ঘরে। পিলসুজটা

দেয়ালের এক পাশে রেখে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

অনিমেষ ভেবেছিলো ছোট শালী এসে পরিহাস করবে, নানা রকম উৎপাতে ওকে জ্বালাতন করে তুলবে; কিন্তু এ কি রকম এর ভাব? নিশার নম্র প্রণতিটুকু ওকে বিষম আঘাত দিলে। চম্‌কে উঠে তার মুখের পানে চাইলে। মনে পড়লো; একবার তাদের বাগানের গাছে একটা বাজ পড়েছিল,—বাইরে থেকে তার বিশেষ ক্ষতি দেখা যায়নি, কিন্তু ভিতরটা ঝলসিয়ে গিয়েছিল—সে গাছে আর পাতা ধরেনি, ফুল ফোটেনি।

নিশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অনিমেষ একটা কথাও বল্‌তে পারলে না।

* * *

পরদিন সকালে উষা ছুটে গেল—গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত মায়ের সাহায্য করতে; এই সুযোগে তার এতদিনকার সুখ-দুঃখের কথা বলে নেবে।

বাপ গেলেন বাজারে জামায়ের জন্যে মাছ তরকারী কিন্‌তে। অনিমেষ তার ঘরে বড় চৌকিটার উপর খবরের কাগজ নিয়ে বস্‌লো; নিশা এল সেই ঘর সংস্কার করতে।

আপন হাতে সে মেজেটা ঝাঁট দিলে, জিনিষপত্র ঝেড়ে ঝুড়ে রাখ্‌লে, ছাদের দিকে দরজা খুলে, পূর্ব্ব দিনের বাসি ফুল ফেলে দিয়ে, টব থেকে এক গোছা রজনীগন্ধা তুলে রাখ্‌লে,—এ গাছ ওর নিজের হাতের পোতা। কুঁজোতে জল ভরে আন্‌লে. পানের ডিবেতে নতুন-সাজা পান ভরে দিলে; তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল. অনিমেষের দিকে একবার চাইলে না পর্য্যন্ত।

অনিমেষ ওর এই নীরব সেবা বুকের মধ্যে অনুভব করলে, কাগজ আর পড়তে পারলে না।

* * *

বিদায়ের দিন এল।

বাইরে সেদিন মেঘ করেছে; থেকে থেকে বৃষ্টি আস্‌চে; একটা কন্‌কনে পূবে বাতাস মনের ভেতরটা অবধি সিক্ত করে তুলেছে। বিকেল থেকে নিশাকে ডেকে ডেকে কাজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা রাগ ক'রে বল্‌ছেন, "কোথায় গেল নিশিটা? এসে মোয়া কটা পাকাক না, গাড়ীর সময় হ'য়ে এল যে।" উষা চোখের জল মুছে বল্‌ছে,—"থাক্ মা, থাক্, ওর বোধ হয় মন ভাল নেই, আমি করে দিই।"

অনিমেষ তার ঘরের জান্‌লা দিয়ে গলি পেরিয়ে যে মাঠ, তারই ধারে ধারে ভিজে গাছগুলোর দিকে চেয়ে ভাবচে—এ কিসের ব্যথা তার বুক তোলপাড় করছে, এর মূল কোথায়?

তারই পাশের ঘরে জান্‌লার গরাদের গায়ে মাথা রেখে নিশা ভাবচে,—এ কোন্ বেদনা ওর মনকে এমন কাঙাল করে তুলেছে, এর শেষ কোথায়?

বাড়ীর সাম্‌নে আবার এসে গাড়ী দাঁড়ালো, মাল-পত্র ওঠানো হ'ল, ভাড়া নিয়ে বকাবকিও হ'ল, তবু নিশা নীচে এল না। উষা নিজেই এসে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে। অনিমেষ জোড়হাত করে দূর থেকে নমস্কার করলে—নিশা শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল—কথা কইলে না।

সঙ্কীর্ণ গলির কাদায়-ভরা রাস্তা দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চল্‌লো; নিঃশব্দ বৃষ্টির জমা জল ছাদের কার্নিশ বেয়ে জান্‌লার উপর পড়ে বিচিত্র বেদনাময় শব্দ সৃষ্টি করলে. নিশা শুষ্ক শ্রান্ত চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১০) বলিদ্বীপ—বাদুঙ্ ও উবুদ

বাদুঙ্ দক্ষিণ-বলির সব চেয়ে বড়ো শহর। সমগ্র বলিদ্বীপে ইউরোপীয়দের জন্য একমাত্র হোটেল এই বাদুঙ-এই খোলা হ'য়েছে। শহরটী আকারে বা লোক সংখ্যায় যে খুব বৃহৎ তা নয়। একটি প্রধান সড়ক, সাধারণ কতকগুলি দোকান, ফল-তরকারী-মাছের বাজার একটা, কতকগুলি সরকারী আফিস—এই নিয়েই শহর। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল এখানকার সহকারী কন্‌ট্রোলারের বাড়ীতে—তখন বাড়ীটা এই কর্ম্মচারীর দখলে আসেনি। ইউরোপীয় হোটেল থেকে আমাদের খাবার পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। বাড়ীটা বেশ, পাসাঙ্‌গ্রাহানের মতন, বেশ একটা বড়ো হাতার মধ্যে।

বাসায় নিজেরা তিন চার দিনের মতন গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে, শহর দেখ্‌তে বেরুলুম। চীনা দোকানী অনেক। মুদিখানার দোকান, মণিহারীর দোকান, শিল্পকাজের দোকান, সব চীনাদের। বিলিতী কাপড়ের দোকান হ'চ্ছে গুজরাটী খোজাদের। পথে এক চীনা ফটোগ্রাফওয়ালার দোকানে বলিদ্বীপের লোকজন আর জীবনযাত্রার বিস্তর ছবি দেখলুম। দু-তিন দিন এই লোকটার দোকানে গিয়ে আমরা বেছে বেছে কিছু ছবি কিনি। লোকটার সঙ্গে বেশ ভাব হয়। আধা-বয়সী, এই দেশেই বসবাস আরম্ভ ক'রেছে, একটী বলিদ্বীপীয় মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছে, ছেলেপুলে হ'য়েছে।—দেশের সঙ্গে আর সংস্পর্শ নেই।

উবুদে নারীগণের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

তারপরে বাজারের চত্বরে গেলুম। একটা বড়ো গোছের গুজরাটী খোজার কাপড়ের দোকানে উঠলুম। স্বদেশীয় ব'লে এরা অত্যন্ত খাতির ক'রলে, জোর ক'রে সোডা লেমনেড খাওয়ালে। বোম্বাইয়ে' খোজাদের খান পাঁচেক দোকান আছে বাতুঙ্-এ। রবীন্দ্রনাথের বলিদ্বীপের আগমনের কথা এদের মধ্যে কেউ কেউ শুনেছে। এতগুলি ভারতবাসীকে দেখে এরা ভারী খুশী হ'য়ে গেল। যে দোকানটিতে আমরা প্রথমে উঠি, তার মালিকের নাম ফিদা হোসেন। লোকটী বেশ। প্রায় বিশ বছর বলিদ্বীপে কাপড়ের কারবার ক'রছেন, এখন বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বাতুঙ শহরের একটু পূবে সমুদ্রের ধারে একটী বাগান বাড়ী কিনেছেন, তাঁর এই বাগান বাড়ীর কাছেই মাল নামাবার ছোটো একটী বন্দর আছে; নিজের মোটর ক'রে ফিদা হোসেন আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। একজন ভারতবাসী এতদূরে এসে কেমন ক'রে নিজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন তা দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। ফিদা হোসেন আর তাঁর সঙ্গেকার একটী গুজরাটী দোকানদারের কাছ থেকে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে দুচারটে টুকিটাকি খবর পাওয়া গেল। ১৯০৮ সালে ডচেরা মানোয়ারী জাহাজ থেকে বাতুং শহরে গোলাবর্ষণ ক'রেছিল, সে কথা আমাদের ব'ললেন। বলিদ্বীপের লোকেদের খুবই প্রশংসা ক'রলেন। ব'ল্লেন, 'ইয়ে লোগ অচ্ছে হৈঁ, কৌম বহুৎ বহাদুর হৈ, ঔর হিন্দু আদমী হৈঁ, ইস্ বাস্তে ইন্‌মে সব্‌র্ বহুত হৈ—বেশ লোক এরা, জা'ত হিসাবে খুব সাহসী, কিন্তু এরা হিন্দু তাই এদের মধ্যে ধৈর্য্য খুব।' এদের দেশে বরক'নে পরস্পরকে নির্ব্বাচন ক'রে নেয়। বিবাহের রীতি অতি সরল, আর বিবাহ ভঙ্গ সহজেই হয়। বাপ মার অমত হ'লে বিবাহেচ্ছু ছেলে আর মেয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে একত্র বসবাস করে, আর তাতেই তারা বিবাহিত ব'লে গণ্য হয়। বিয়ের সময়ে পদণ্ডরা আসে, মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। আমাদের একটী খুশী করবার জন্য ফিদা হোসেন আমাদের ব'ললেন, 'বাবুসাব, এরা হিন্দু বটে, কিন্তু এদের কতকগুলি আদৎ বড়ো খারাপ, ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতন এরা শুদ্ধাচারী নয়।' আমরা বলিদ্বীপে খালি 'সৈর' বা ভ্রমণ ক'রতেই আসি নি,—এদের রীতি নীতিও দেখতে এসেছি, এদেশের—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে কিনা, শাস্ত্র-টাস্ত্র কি আছে সে সব দেখাও উদ্দেশ্য, এই কথা শুনে ফিদা হোসেন ব'ল্লেন যে বছর কতক পূর্ব্বে ভারতের একজন সাধু বা পণ্ডিত বলিতে এসেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করা; তিনি অ চার-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, ফিদা হোসেন যত্ন ক'রে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি নিজে রেঁধে খেতেন। তবে যে-রকম সংস্কৃত বইয়ের খোঁজে তিনি বলিতে এসেছিলেন সে-রকম বই তিনি পাননি। তাঁর নামটী কি, আর কোন প্রদেশের লোক, ফিদা হোসেনের মনে নেই। তাঁর বাগান-বাড়ী মালের গুদাম সব দেখিয়ে ফিদা হোসেন আমাদের ফিরতী পথে 'সানোর' ব'লে একটী গ্রামের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন ওস্তাদ কাঠের খোদাই মিস্ত্রী আছে, সে চমৎকার মূর্ত্তি তৈরী ক'রে থাকে। ফিরতী পথে সমুদ্রের তীর আর বাতুঙ শহরের মাঝে বাঁ-হাতে একটা ছোটো রাস্তা ধ'রে সানোর গাঁয়ে আমাদের মোটর এল। কাঠের মিস্ত্রির বাড়ীতে ছোটো বড়ো অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখলুম,- সম্পূর্ণ তৈরী, আধা তৈরী, সবে হাত দেওয়া হ'য়েছে, নানা অবস্থায়। তিন চার জন সহকারী কাজ ক'রছে। শক্ত ভারী কাঠে তৈরী সব মূর্ত্তি। সুরেনবাবু বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্য গুটি তিনেক মূর্ত্তি কিনলেন। এই খোজারা আমাদের হ'য়ে ব'লে ক'য়ে দরটা ন্যায্য বা শস্তা ক'রে দিলেন; এঁরা তোমাদেরই সমধর্ম্মী, এঁদের মধ্যে আবার পদণ্ড আছেন, সাহেবদের কাছে যে দাম নাও সে দাম নিতে পারবে না, ইত্যাদি ব'লে। বাতুঙে ফিরে এরা আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। ড্রেউএস্ এঁদের সঙ্গে মালাই ভাষায় আলাপ ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও দুচারটে কথা ব'ললেন। এঁরা কবিকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন। পরে একদিন ফিদা হোসেন স্বয়ং আমাদের জন্য স্বদেশীয় খাদ্য, চাপাটি কোর্ম্মা হালুয়া প্রভৃতি এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে এসে এই

উবুদের উৎসব ক্ষেত্রে আগত জনগণ
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত

মুসলমান বণিকদের কাছে আমরা যে হৃদ্যতা যে সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছিলুম সে কথা মনে হ'লেই তার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করি।

সন্ধ্যার সময় কোপ্যারব্যার্গ তাঁর পরিচিত একজন প্রাচীন বলিদ্বীপীয় শিল্পদ্রব্য বিক্রেত্রীর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ছোটো শহরটীর সদর রাস্তা ছাড়িয়ে একটা গ্রাম্য পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে আমরা এই বাড়ীর কাছে এসে পৌছুলুম। কতকগুলি বাগান পেরিয়ে বাড়ীর সামনে আসা গেল। অন্ধকার পথ, দুপাশে কলাগাছের চওড়া পাতা, আমরা জন চারেক লোকে কথা কইতে কইতে চ'লেছি, রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে ডেকে পালাচ্ছে। বাড়ীর কাছে পৌছুতে গৃহস্বামিনী একটা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এসে আমাদের স্বাগত ক'রলে। আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসালে। বৈঠকখানা মানে একটি ঘরের সামনেকার দরদালান। একটা টেবিল পাতা, আর তার উপরে একটা কেরাসিনের টেবিল-আলো জ্ব'লছে। আশে পাশে কতকগুলি চেয়ার আর মোড়া; আর ইংরিজি বিস্কুট না কিসের বিজ্ঞাপনের ছবি একখানা দেয়ালে আঁটা। গৃহস্বামিনী আমাদের খাতির ক'রে এনে চেয়ারে বসালে। আর দু তিনটি লোক ছিল, ছোকরা, বাড়ীরই ছেলে। একটি ছোকরাকে বেশ শ্রীমান্ বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল। এরা দুজনে ব'সে যবদ্বীপীয় অক্ষরে মুদ্রিত কবি বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় কি একখানা বই প'ড়ছিল। আমাদের বসিয়ে দিয়ে বাড়ীর কর্ত্রী ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে আমাদের জন্য পানীয় আনাতে দিলেন। পরে পানীয় এল; কাছে-পিঠে কোনও দোকানে লিমনেড পাওয়া গেলনা, তাই তার বদলে কয় বোতল বিয়ার এনে হাজির ক'রলে—আমাদের ডচ বন্ধুরা তার সদ্ব্যবহার ক'রতে কুণ্ঠিত হ'লেন না। গৃহকর্ত্রী তার পরে ভিতরের ঘরে গিয়ে আমাদের দেখাবার জন্য তাঁর বিক্রীর জিনিস-পত্র সাজাতে লাগ্‌ল। গোরবর্ণ মোটা-সোটা প্রৌঢ়া রমণী, সুন্দরী বলা চলে; চওড়া লালপেড়ে সাড়ী প'রে দাঁড়ালে আমাদের দেশে যে কোন অভিজাত ঘরের গিন্নীমা ব'লে মনে হ'ত। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে চলা ফেলা ক'রতে লাগ্‌ল। কোপ্যারব্যার্গের আর ক্রেউএসের

শোভাযাত্রার নারীগণ—আংশিক দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত

মধ্যস্থতায় আমি ছোকরা দুজনের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। ছোকরাদের মধ্যে যেটাকে বেশী বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল, দেখলুম যে সেটা বলিদ্বীপের ভাষায় রচিত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বেশ প'ড়েছে। যে বইখানা প'ড়ছিল সেখানা হ'চ্ছে যবদ্বীপে ছাপা প্রাচীন কবি ভাষায় রচিত Broto Djoeda ('বরট' বা 'ব্রট জুড') অর্থাৎ 'ভারত-যুদ্ধ' বা মহাভারত কথা। রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত ঘটনা আর পাত্র পাত্রীদের সম্বন্ধে দেখলুম যে ছোকরা খুব খবর রাখে। 'সটিআকি' বা সাত্যকি, 'বুরিস্রাউঅ' বা ভূরিশ্রবাঃ, 'ক্রেপা' বা কৃপাচার্য্য, 'সুসার্ম্ম' বা সুশর্ম্মা, 'দ্রেস্তাডিউম্না' ধৃষ্টদ্যুম্ন, 'সালিঅ' বা শল্য, 'সলুঅ' বা শাল্ব প্রভৃতি মহাভারতের অপ্রধান পাত্রদের সম্বন্ধে এমনি সহজ ভাবে উল্লেখ ক'রে যেতে লাগ্‌ল, যেন এরা তার কতই পরিচিত ; দেখে আমি তো বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। ক'জন বাঙালী হিন্দুঘরের ছেলে সাত্যকি বা কৃপাচার্য্যের বা শাল্বের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু ব'লতে পারে? অথচ এত দূরে এরা এই মহাভারত থেকে কতটা না রস পেয়েছে, যে এমনি ক'রে তার খুঁটি-নাটি নানা কথা ধ'রে আছে। আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, ভারতবর্ষ থেকে মহাগুরু এসেছেন, এসব কথা শুনে ছোকরা ভারী আশ্চর্য্য আর প্রীত হ'ল। তাদের বাড়ীতে প্রাচীন পুঁথি কিছু আছে কিনা একথা শুধানোতে ছোকরা খানকতক তালপাতার পুঁথি আন্‌লে। একখানি বেশ বড়ো, অতি সুন্দর ছাঁদে ঝর ঝরে হাতে লেখা পুঁথি দেখলুম, সেখানি নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পুঁথি ; এটি প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায়। এ-ছাড়া দেখালে বলিদ্বীপীয় ভাষায় Ardjoena-wiwaha 'আর্জুনা উইহও' বা 'অর্জ্জুন-বিবাহ' —অর্জ্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জ্জুনীয়, ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের গমন, নিবাত-কবচ দৈত্যের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ, আর সুপ্রভা অপ্সরার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ, এই সব ব্যাপার নিয়ে। আর ছোটো ছোটো দু একখানি পুঁথি দেখলুম। নীতিশাস্ত্রের পুথিখানি কেনবার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রলুম। ছোকরা তখন বেচ্‌তে চাইলে না ; কিন্তু পরে এর সঙ্গে এক দিন পথে দেখা হয়, তখন নিজেই উপযাচক হ'য়ে পুঁথিখানি বিক্রী করার কথা

মেয়েদের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

উত্থাপন করে, আর তখন পনেরো গিলডারে—প্রায় টাকা চোদ্দয়—পুঁথিখানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য আমরা সংগ্রহ করি।

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি আমাদের তার জিনিসপত্রের পসরা দেখবার জন্য বাড়ীর অন্য অংশে ডেকে নিয়ে গেল। নানান্ রকমের শিল্প সম্ভার, ক্লুঙকুঙে যেমন সব দেখেছিলুম। কাপড়ে আঁকা পট দেখলুম কতকগুলি, কিন্তু আমার নিজের পছন্দ মতন কিছু পেলুম না। কোপ্যারব্যার্গ আর ত্রেউএস দু চারটী কাঠের জিনিস কিনলেন। একটা ঘরের তক্তাপোষে জিনিসগুলি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছিল। ঘরটা যেন একটা অব্যবহৃত ভাঁড়ার ঘর ব'লে মনে হ'ল ; দেয়ালের তাকে নানা হাঁড়ী-কুঁড়ি, বাক্স, আর খুব ধুলো আশে পাশে। এইরূপে সওদা ক'রে আর ছোকরাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশী হ'য়ে আমরা পানাঙ্গ্যাহানে ফিরলুম।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শুক্রবার।—

সকালে বাজার অঞ্চলটা আমরা একটু ঘুরে এলুম। ফিদা হোসেন আর কতকগুলি গুজরাটী দোকানদার কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ইতিমধ্যে একটা বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক কতকগুলি অতি সাধারণ কাপড় আর অন্য জিনিস নিয়ে আমাদের বেচতে এল। কেমন ক'রে প্রকাশ হ'য়ে গেল যে, ফিদা হোসেনই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজের জিনিস পত্র কিছু এইভাবে আমাদের কাছে বিক্রী হয় কিনা দেখবার জন্য। এতে একটু পাটোয়ারী বা বেনেতি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল---আমরা হাজার হোক্ ও দেশে দু পাঁচ টাকার জিনিস-ও তো কিনবো, তা যদি কিছুটা জিনিস অন্য লোকের কাছ থেকে না কিনে এদের কাছ থেকেই কিনি, তাতে তো আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই, আর সামান্য কিছু লাভও ওদের ঘরে আসে—ব্যবসায়ের দিক থেকে ধ'রলে এটা কিছু অন্যায় নয়।

দুপুরে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক স্থানীয় শিল্পদ্রব্য বেচতে এল। গতকল্য সন্ধ্যায় আমরা যার বাড়ীতে গিয়েছিলুম, দেখলুম সেই স্ত্রীলোকটীও এই দলে এসেছে। আমাদের বাসার বারান্দায় তাদের জিনিস পত্রের পসরা সাজিয়ে ব'সল। আমরা কিছু কিছু জিনিস নিলুম—কাঠের মূর্ত্তি, কাঠের মুখস, পুরাতন জরীর কাজ করা

কাপড়, ইত্যাদি। আমি নিজে দুখানা কাপড়ের উপরে আঁকা পট কিন্‌লুম। এরা যখন এদের জিনিস-পত্র আমাদের দেখাবার জন্য ভূঁইয়ের উপর সাজিয়ে রেখে ব'সেছিল, তখন একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম,—আমাদের ডচ বন্ধুরা কোনও কিছু জিনিস দেখিয়ে তার দর জিজ্ঞাসা করবার কালে পা দিয়ে জিনিসটা দেখাচ্ছিল—এটার দাম কত, ওটার দাম কত। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনে উপবিষ্ট এই পসারিণীদের সঙ্গে কথা কইছিলুম—মাটীতে রাখা কোন কিছু হাত দিয়ে দেখাতে গেলে ঝুঁকে নীচু হ'য়ে দেখাতে হয়, পা দিয়ে দেখানোতে আর ঝুঁকতে হ'চ্ছিল না। আমার কিন্তু এই ধরণটা মোটেই ভালো লাগ্‌ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। যারা বিক্রী ক'রতে এসেছে, এতে ক'রে তাদের প্রতি তো একটা অবজ্ঞা আর অশিষ্টতা প্রকাশ করা হ'চ্ছিল-ই; তবে তারা স্থানীয় অশিক্ষিত বা গরীব শ্রেণীর 'নেটিভ' স্ত্রীলোক মাত্র, তাদের সম্বন্ধে অতটা চিন্তা করার দরকার ছিল না; কিন্তু সুন্দর শিল্প দ্রব্যগুলি, যেগুলি পরম পদার্থ ব'লে কিনে নিয়ে যাবার জন্য সকলেই ব্যগ্র, সেইগুলির প্রতি; আর যে শিল্পী বা রূপকারেরা জিনিসগুলি বানিয়েছে, তারা সাক্ষাৎ উপস্থিত না থাক্‌লেও তাদের হাতের কাজ জিনিসগুলি যেন তাদের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের সামনে বিদ্যমান,—তাদেরও প্রতি যেন অশ্রদ্ধা আর অপমান প্রদর্শন করা হ'চ্ছিল, এইরূপে পা দিয়ে জিনিস দেখানোর দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আমার তখনি একটা ঘটনার কথা মনে হ'ল, তাতে এসব বিষয়ে একটা etiquette বা ভব্যতা শেখানোর যে দরকার আছে তা বেশ প্রতীয়মান হবে। বিলেতে অবস্থান কালে, লণ্ডনে আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত এইচ্ এম্ পার্সিভাল মহোদয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতুম। শ্রীযুক্ত পার্সিভাল সাহেব তখন অধ্যাপনা কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন বছর দশেক পূর্ব্বে, লণ্ডন প্রবাসী হ'য়ে আছেন। তাঁর শেষ ছাত্রদলের মধ্যে অন্যতম ছিলুম আমি, আর তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। পার্সিভাল সাহেব আমাদের বাঙলা দেশেরই লোক, ফিরিঙ্গি-জাতীয়। নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে এঁর কাছে প্রচুর শিক্ষা আর আনন্দ লাভ ক'রতুম। একদিন সাহেবের ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি। তাঁকে একখানি বই এগিয়ে দেওয়ার দরকার হ'ল। যেখানে আমি ব'সেছিলুম, সেখান থেকে তাঁকে বইখানি দিতে গেলে আমার বাঁ হাতে ক'রে বইখানি নিয়ে বাঁ হাতে ক'রেই দেওয়া সুবিধের ছিল, কিন্তু অভ্যাস-মতন বাঁ হাতে বই খানি তুলে নিয়ে, তাঁকে দেবার সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে ডান হাতে ক'রে ধ'রে বইখানি এগিয়ে দিলুম। তিনি এবিষয় চুপ ক'রে লক্ষ্য ক'রলেন; বলা বাহুল্য, আমার কিছুই মনে হয় নি। এর খানিক পরে একখানা বাজে কাগজ ফেলে দেবার দরকার ছিল, কাগজটা নিয়ে মুঠোয় ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঘরের ভিতরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্ব'লছিল সেই আগুনের দিকে তাগ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, কিন্তু কাগজের কুণ্ডলীটা ঠিক আগুনের মধ্যে গিয়ে প'ড়ল না, অগ্নিকুণ্ডের লোহার রেলিং-এ লেগে ঠিক্‌রে ফিরে এসে আমার পায়ে কাছে প'ড়ল। সেইখান থেকে পায়ের লাথি দিয়ে ছুঁড়ে দিলেই ওটা আগুনে গিয়ে প'ড়ত, তা না ক'রে অভ্যাস-মতন ডান হাতে ক'রে পাকানো কাগজটা তুলে নিয়ে তার পরে উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে হাতে ক'রেই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, এবার আগুনে ঠিক প'ড়ল। পার্সিভাল সাহেব এটাও লক্ষ্য ক'রলেন। তার পরে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমায় ব'ললেন—বেশ একটু বিচলিত না হ'লে তিনি এরকম দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেন না—'দেখ সুনীতি, আমাদের দেশের সভ্যতার প্রকৃতি অনুসারে অনেক পুরুষের শিক্ষা আর সদাচারের ফলে সাধারণ ভব্যতা বা শালীনতা সম্বন্ধে যে-সব ধারণা গ'ড়ে উঠেছে, সেগুলি অতি সুন্দর, যে কোনো দেশের etiquette বা ভদ্র রীতির চেয়ে সেগুলি খারাপ নয়—সেগুলিকে প্রাণপণে বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রবে; আমাদের সভ্যতার, দুনিয়ার আর মানুষের সম্বন্ধে আমাদের attitude বা মনোভাবের পরিচায়ক হচ্ছে আমাদের এই-সব বাহ্য চাল-চলন, ধরণ-ধারণ। এই যে তুমি বইখানি

আমায় বিশেষ ক'রে ডান হাতে ক'রে ধ'রে দিলে, এর পিছনে তোমার মনে আমি একজন মানুষ ব'লে আর আমি তোমার মাননীয় অধ্যাপক ব'লে আমার সম্বন্ধে তোমার যে সাধারণ আর বিশেষ সম্মান-বোধ আছে, সেটি কেমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হ'ল। আর কাগজের গুটিটা তুমি যে পা দিয়ে 'শুট্' না ক'রে হাতে ক'রে তুলে আগুনে ফেলে দিলে, কোনও ইংরেজ ছেলের মনে এরকম করার কথাই আসতে পারত না—এ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় নম্রভাব আর ভব্যতা—যাতে ক'রে তুচ্ছ প্রাণহীন মাটির ঢেলাটা খড় কুটাটা পর্য্যন্তও আমাদের হাতে ভদ্রতার অপেক্ষা করে ব'লে আমরা মনে করি,—যে ব্যক্তি এই প্রকারের জাতীয় সংস্কৃতিগত স্বাভাবিক ভদ্রতায় মণ্ডিত, সে instinctively অর্থাৎ আপন সহজাত বুদ্ধি থেকেই, কারুর দ্বারা বিশেষ বলা-কহার বা চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ফলে নয়, সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধে একটা tenderness অর্থাৎ কোমলভাব পোষণ করে। আমাদের দেশের সভ্যতা এই সব গুণ-কেই অবলম্বন ক'রে। এই যে বাপের বা অন্য গুরুজনের সামনে ছেলেরা তামাক খায় না, এটা আমার চোখে ভারী চমৎকার লাগে---গুরুজন ঘরে ঢুকলে তাঁদের সম্মাননার জন্য উঠে দাঁড়ানোর মতই এটা সুন্দর আর সার্থক। আমরা যেন আমাদের ভারতীয় culture-এর একটা প্রধান অঙ্গ এই রকম ভব্যতা যা অচেতন বস্তুর সম্বন্ধেও আমাদের ব্যবহারকে একটা tenderness-দ্বারায় মণ্ডিত ক'রে দেয়, সেটাকে যেন আমরা না ভুলি, সেকেলে ধরণ ব'লে যেন সেটাকে আমরা অবজ্ঞা না করি।'

পার্সিভাল সাহেবের এই সুদীর্ঘ উপদেশের যাথার্থ্য বলিদ্বীপে উপলব্ধি ক'রলুম। ডচ বন্ধুরা যে ইচ্ছা ক'রে তাচ্ছীল্য দেখানোরই মনোভাব নিয়ে পা দিয়ে জিনিসগুলি দেখাচ্ছিলেন, তা নয়; কিন্তু পার্সিভাল সাহেবের কথিত tenderness-টুকু এঁদের ছিল না। ছেলে বেলায় দেখেছি, ছোটো খাটো বিষয়ে আমাদের গুরুস্থানীয়েরা কতটা না লক্ষ্য রাখতেন। এখন আমরা আর সে-সব বিষয়ে অবহিত নই। Noblesse oblige; ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে কত বিষয়ে আমাদের সংযত হ'য়ে থাকতে আমার ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমা আমাদের উপদেশ দিতেন! আর আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে tradition বা গতানুগতিক রীতি হিসাবে আর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের অঙ্গ হ'য়ে কত না সুন্দর প্রথা আমাদের মধ্যে ছিল, এখনও আছে,—কিন্তু আমরা আলস্যের জন্য আর ফ্যাশানের ধাক্কায় প'ড়ে সেগুলিকে অনাবশ্যক আর superstitious অর্থাৎ কুসংস্কারাত্মক ব'লে মনে ক'রতে আরম্ভ ক'রেছি। এই রকম রীতির মধ্যে একটা রীতি আমার কাছে এখন চমৎকার লাগে —বইয়ে পা লাগ্‌লে বইখানিকে তুলে মাথায় ঠেকানো। মা সরস্বতী জ্ঞানের আধার বইয়ে অধিষ্ঠান করেন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা লাগালে বইয়ের অসম্মানে তাঁরই অসম্মান, বই মাথায় ঠেকিয়ে এই অসম্মানের প্রতীকার ক'রতে হয়—ছেলেবেলায় আর সকলকে দেখে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছিলুম। এখন এর অন্তর্নিহিত ভাবটার মাধুর্য্য আর ঔচিত্য, এই পা দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টিগুলির অসম্মান করা হ'চ্ছে দেখে পূর্ণভাবে আমার মনে প্রতিভাত হ'ল। আরও মনে হ'ল, মুসলমান তুর্কদেশে আর পারস্যে সেকালে একটা রীতি ছিল—লেখা কাগজের অসম্মান কেউ ক'রত না---কারণ কে জানে কোন্ কাগজে ভগবানের নাম বা কোনও সাধু কথা লেখা আছে; অনেকে এই রকম কাগজ পেলে তাকে অজ্ঞানপ্রসূত অবমাননা থেকে রক্ষা করবার জন্য আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌ত।

অবান্তর প্রসঙ্গ যাক্। উত্তরে উবুদের উৎসব দেখতে আমরা যাত্রা ক'রলুম, দুখানা গাড়ী ক'রে, বেলা তিনটেয়। আজকে সকালে কবি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ ক'রেছিলেন; পরে একটু ভাল থাকলেও, তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না। উবুদের পুঙ্গব শ্রীযুক্ত চকর্দে সুখবতীর গৃহে আমরা পঁউছুলুম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খোরিস আমাদের প্রদর্শক হ'লেন, শ্রীযুক্ত সুখবতী নিজে বড়ই ব্যস্ত। এঁদের বাড়ীটা মস্তবড়ো। তারই তিনটা মহলে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার আয়োজন চ'লেছে। নানা দৃশ্যের মধ্যে হট্টগোল ভীড় হৈ-চৈ-এর মধ্যে আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখতে হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটার পারম্পর্য্য ভালো ক'রে বুঝতে

পারা গেল না। দাহের পূর্ব্বে সাতদিন ধ'রে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়। তিন চার মাস আগেকার মৃতদেহ শবাধারে ক'রে বহির্ব্বাটীতে এনে এক বাঁশের মাচার উপরে সাদা মলমল আর নানা রঙীন কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখা হ'য়েছে। বৃহৎ এক বাঁশের নাগমূর্ত্তি,---নানা রকম রঙীন কাগজ কাপড় শল্‌মা চুমকী জগঝগা জরী দিয়ে সাজানো; এই নাগমূর্ত্তির ভিতরে শবাধার রক্ষিত। শবাধারের সামনে আশে পাশে মৃতের উদ্দেশ্যে অর্পিত দ্রব্যসম্ভার—খাদ্যদ্রব্য বসন আর তৈজসপত্রাদি। শবাধারের কাছে পরিবারস্থ মেয়েরা আর অন্য পুরুষ আত্মীয়েরা আর দু চার জন পদণ্ড র'য়েছেন। শবাধারের সামনে উঠোনে এক পাশে একটা উঁচু কাঁচা বাঁশের মাচা, সেটাতে উঠে ব'সে পদণ্ডরা তাঁদের পূজা পাঠ ক'রেছেন; আর একটা আটচালা, তাতে অন্য আত্মীয় স্বজন আর অভ্যাগত সকলে বসে আছেন। এই সব আছে একটা মহলে। তার সামনে দেওয়াল দিয়ে তফাৎ ক'রে দেওয়া আর একটা মহল---সেখানে মস্ত এক আঙিনা,
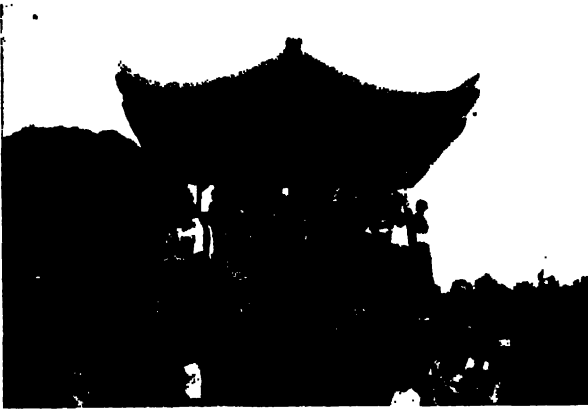
রাজবাটীর মণ্ডপ হইতে শোভাযাত্রা দর্শন
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

আর কতকগুলি আটচালা; যাত্রা-গানের আসর হয় সেই আঙিনায়, আর বিশিষ্ট অভ্যাগতদের বসবার স্থান সেই আটচালায়। এখানে আজকে ততটা ভীড় নেই। এই মহলের মধ্যেই বাড়ীর সদর দরজা বা তোরণদ্বার, যেটা রাস্তার উপরে প'ড়েছে। এই মহলের একটা কোণে, বাড়ীর সামনের আর বাড়ীর পাশের দুটা রাস্তা যেখানে মিলেছে সেখানে, একটা প্রশস্ত pavilion বা ছতরীযুক্ত বৈঠকখানা আছে, সিঁড়ি বেয়ে সেটাতে উঠতে হয়, সেখান থেকে ব'সে ব'সে আমরা রাস্তার নানা শোভা যাত্রা আর সঙ আর জীবন-প্রবাহ দেখি। মৃতদেহ বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র ক'রতে নেই, পাচীলের উপর দিয়ে বাঁশের মাচার মতন এক সিঁড়ি-পথ ক'রেছে, খুব উঁচু--- শবশুদ্ধ শবাধার এনে সেই মাচা বেয়ে দেয়ালের বহু উর্দ্ধে উঠবে, তারপরে দেয়ালের ওপারে রাস্তায় শব-বাহনের জন্য বাঁশের তৈরী যে বিরাট একটা মানুষের কাঁধে বহা মঞ্চ তৈরী হ'য়েছে, যাকে Wadah 'ওয়াদাঃ' বলে, তার উপরে রাখা হবে; তখন সেই ওয়াদাঃ-তে ক'রে দাহস্থানে শব শবাধার সমেত নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ মৃতদেহটাকে বিশেষ

শব বহনের জন্য বিরাট 'ওয়াদাঃ'
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

ক'রে তৈরী উঁচু সিঁড়িযুক্ত মাচার সাহায্যে পাচীল টপকে' বাড়ীর বা'র করা হবে। ওয়াদাঃ যেটা এই উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছে সেটা প্রায় আড়াই তালা উঁচু হবে; বিরাট ব্যাপার এটা—নানা রকমের ডাকের

দেবগণসহ গণেশ ও মহাদেব

বলিদ্বীপের পট (আধুনিক) — শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
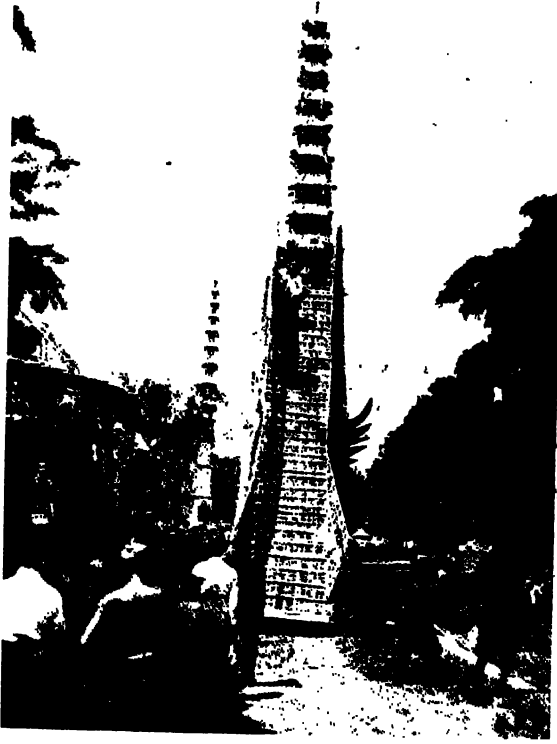
'ওয়াদাঃ'-তে উঠিবার সিঁড়ি

সাজে রঙীন সোনালী রূপালী কাগজে কাপড়ে অলঙ্কৃত, নানা কাঠে খোদা রঙ-করা রাক্ষসের মুখস চারি দিকে লাগানো; ওয়াদাঃ-টার প্রধান অলঙ্কার হ'চ্ছে, তার মাঝামাঝি পক্ষপুট বিস্তার ক'রে এক বিরাট গরুড় মূর্ত্তি। ওদিকে যে মহলটাতে শবাধার রক্ষিত হ'য়েছে, সে মহলে রাস্তার দিকে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের উপর দিয়ে বাঁশের সিঁড়ি আর মাচা ক'রে একটা পথ করা হ'য়েছে, এইভাবে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে রাস্তা থেকে শবাধারের মহলে আসবার জন্য। একটা অনুষ্ঠান আছে—রাজবাটীর মেয়েরা আর গ্রামের মেয়েরা রাস্তায় বিরাট এক মিছিল ক'রে মাথায় নানা দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে শবাধারের কাছে আসে, তারা তখন তোরণ বা অন্য কোনও দরজা দিয়ে ঢোকে না, এই সিঁড়ির মাচা দিয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে টপকে' তবে শবাধারের মহলে আসে। ডক্টর খোরিসের সঙ্গে এসব দেখলুম। তার পরে তোরণদ্বার দিয়ে ঢুকেই যে প্রথম মহলের কথা ব'লেছি, যে মহলের আঙিনায় যাত্রা-গান হবে, তাতে ঢুকে বাঁ হাতে আর একটা মহল দেখলুম। এটাকে কতকটা যেন অন্দর বা বসতের মহল ব'লে মনে হ'ল, বাইরের লোক এখানে বেশী কেউ

বাঁশের সিঁড়ি-পথে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

নেই, কিন্তু ডক্টর খোরিসের অবারিতদ্বার। এই মহলে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত ঘরে, মেয়েরা নানা কাজে ব্যাপৃত। কোথাও বা নৈবেদ্যের আকারে কাঠের থালায় ভাত তরকারী সাজানো হ'চ্ছে, কোথাও বা তালপাতা চিরে চিরে নানা রকমের ঝালর আর অন্য বিচিত্র পত্রময় অলঙ্কার তৈরী হ'চ্ছে, কোথাও কলাগাছ কেটে কেটে কলার বাসনার পাত্রে পূজার আর অন্য আচার-অনুষ্ঠানের জন্য নানা জিনিস সাজানো হ'চ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা এখানে একটা উগ্রগন্ধে ভরপূর—কাঁচা তালপাতার গন্ধ, আর কলাগাছের গন্ধ, আর নানা রকমের ফুলের গন্ধটাই তার মধ্যে প্রধান।

বিকাল ঘনিয়ে' এল, এক বিরাট শোভাযাত্রা যেটা আজকের দিনের প্রধান কার্য্য সেটা দেখবার জন্য আমরা পূর্ব্বকথিত pavilion বা ছতরীতে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমে রাক্ষস-সাজা ধূলো-কাদা চূন-কালী মাখা কতকগুলি লোক গেল; এরা আপসে হল্লা চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আর মারামারির অভিনয় ক'রছে; শেষে এদের মধ্যে থেকে গলায় দড়ি বাঁধা কতকগুলি লোক এই মারামারির ফলে যেন হেরে গিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন ক'রলে, আর বাকী রাক্ষস-সাজা মানুষগুলো তাদের তাড়া ক'রলে। মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই রকম রাক্ষস বা ভূত প্রেতেরা আসে, ইন্দ্রলোক বা বিষ্ণুলোক যা মৃতের কাম্য সেখানকার দেবতাদের সঙ্গে এই রাক্ষসদের যুদ্ধ বাধে, শেষে রাক্ষসেরা পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে' যায়—এই ব্যাপারটা হ'চ্ছে তার-ই অভিনয়। বলিদ্বীপের রেওয়াজ, এই দু দলে বস্ত্রাচ্ছাদিত গলিত শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রত; উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই বীভৎস অনুষ্ঠানটা বর্জ্জিত হ'য়েছিল। রাক্ষসদের পরে এল, লাল জামার উদ্দিপরা একদল ছত্র আব দণ্ডধারী; বড়ো বড়ো নানা রঙে রঙীন আর সাদা ছাতা এদের হাতে; ছাতাগুলি বেশীর ভাগই অতি সুন্দর দেখতে, সেকেলে ছাতা আমাদের 'দেশের টোকা বা বাঁশের ছাতার আকারে, – কতকগুলি হাল ফ্যাশানের সিকওয়ালা মোড়া ছাতাও ছিল, এগুলি কিন্তু মোটেই সুদৃশ্য নয়। ছত্র আর দণ্ডধরদের পিছনে মেয়েদের যেন অফুরন্ত সারি—সে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার—এত স্ত্রীলোক যে কোথা থেকে এল বুঝতে পারা যায় না, সংখ্যায় এরা পাঁচ সাত শ'র কম হবে না। সাধারণতঃ এদের বক্ষোদেশে একখণ্ড ক'রে উত্তরীয় জড়ানো, কাঁধ খোলা, পরণে পা পর্য্যন্ত সারঙ, আবার অনেকে মালাই ধরণের জামা-ও প'রেছে। মাথায় নৈবেদ্য অন্ন নিয়ে একদল মেয়ে; হাতে খোলা ছাতি ধ'রে জামা গায়ে একদল মেয়ে—এরা মাথায় ক'রে কিছু ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে না, শুনলুম এরা রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়ে—এদের সকলের মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজা র'য়েছে দেখলুম; কচি তালপাতার নানা পূজার উপকরণ নিয়ে আর এক দল; তার পরে চার পাঁচটা মুসলমানদের বড়ো বড়ো তাজিয়ার মতন এল, পাতায় ফুলে সাজানো আর তার উপর সোনালী রূপালী কাগজের কাজ করা; শেষে এলেন শ্রাদ্ধাধিকারী পুঙ্গব সুখবতীর পরিবারের মেয়েরা—হ'লদে, কালো, আর বেগুনে ফাগের রঙের কাপড় প'রে—এদের চলার ভঙ্গিটা বড়ো অদ্ভুত লাগ্‌ল—দেহযষ্টি হাঁটুর কাছে একটু যেন ভেঙে-ভেঙে ধীরে-ধীরে এই চলন, খুব

বাঁশের সিঁড়ি-পথে শোভাযাত্রার মেয়েরা
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

চমৎকার দেখাচ্ছিল। দুই একটী অতি সুন্দরী মহিলা ছিলেন এই দলে। এই সমস্ত মেয়ের দল রাস্তা থেকে ধীরে ধীরে মাচার উপর দিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে শবধারের মহলে নাম্‌লো। ডচ্ বন্ধুদের সঙ্গে এই মাচার উপর দিয়ে চ'ড়ে দেয়ালের মাথায় উঠে দাঁড়ালুম, মাচার বাঁশের রেলিং ধ'রে রইলুম। পুঙ্গব সুগবতীও এসে উঠলেন, আর তাঁর বাড়ীর মেয়েরা যখন উঠছিলেন আর নামছিলেন, তখন তিনি তাঁদের হাত ধ'রে ধ'রে সাহায্য ক'রছিলেন। এইরূপে মেয়েদের এই সমগ্র মিছিলটি পাঁচীলের উপর দিয়ে গিয়ে, শবাধারের পাশে তাদের জিনিসপত্র সব রেখে দিলে। তার পরে এত উপহার দ্রব্যের কি যে হ'ল, সে কথা জান্‌তে পারি নি।

এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য নানান দূর জায়গা থেকে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছিল—বিস্তর মেয়ে আর পুরুষ এসেছিল। এদের যে আকর্ষণী শক্তি ছিল, চলা-ফেরায় আর দেহ-ভঙ্গিতে যে সহজ মনোহর ভাব ছিল, তার দিকে দেখবো না মিছিল দেখবো তা ঠিক ক'রতে পারা যাচ্ছিল না। এখানেও সেই বাঙলির শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রের মতন চিত্ত অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছিল। অনেকগুলি ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় আর দু চার জন আমেরিকান দর্শককেও দেখলুম,—তারাও আমাদের মতন-ই সমস্ত জিনিসটার রস উপভোগ ক'রছিল, কিন্তু তাদের আর আমাদের মনোভাবে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল ;— যতটা আমাদের ব'লে আমরা এই জিনিসটাকে ভাবতে পারছিলুম ততটা নিজের ক'রে দেখা এদের পক্ষে অবশ্য সম্ভব ছিল না। এই ভীড়ের মধ্য দিয়েও আমরা ঘোরা ফেরা খুব ক'রলুম। দু তিনটে ঘাসে ঢাকা বড়ো বড়ো মাঠ, সেখানে সমাগত লোকেরা ব'সে কোথাও বা খাওয়া-দাওয়া ক'রছে, কোথাও বা বিশ্রাম ক'রছে; দু চারটে ভাত তরকারী আর অন্য খাদ্য দ্রব্যের দোকানও খুলে গিয়েছে ; মোটর-লরী ক'রে বাদুঙ থেকে আর দূর দূর জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা দলে দলে আসছে, যাচ্ছে ; ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয়, আর অভিজাত আর ধনী বলিদ্বীপীয় জনগণের মোটর গাড়ীর সারি। এত লোক জন, কিন্তু গোলমাল বা অভব্যতা কিছুই নেই। আর একটাও পাহারাওয়ালা আজকে চোখে প'ড়্‌ল না।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ওয়াদাঃ'
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

এই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখি একটা মাঠের মধ্যে মস্ত নারকেল পাতায় ছাওয়া একটা আটচালার ভিতরে, যাতে ক'রে শব দেহের দাহ-কার্য্য হবে সেই উদ্দেশ্য প্রকাণ্ড একটা কাঠের গোরুর মূর্ত্তি তৈরী ক'রে রঙ-চঙ ক'রছে। এই গোরুর মূর্ত্তিটা একটা ছোটো হাতীর মতন আকারে ; পিঠের কাছটা ফাঁপা ক'রে রেখেছে, সেখানে শবাধারটী বসিয়ে দেবে। এটিকে নিয়ে যাবে দাহ-স্থানে। আশে পাশে এই উদ্দেশ্যে অন্য

মূর্ত্তিও তৈরী ক'রছে—মস্ত মাছের মূর্ত্তি, আর সিংহের মূর্ত্তি। এই সঙ্গে অন্য লোকেরা যারা নিজ নিজ আত্মীয়দের সংকার ক'রবে তারা নিজ নিজ জাতি অনুসারে এই সব মূর্ত্তি দাহ-কার্য্যের জন্য ব্যবহার ক'রবে।

সন্ধ্যে হ'য়ে যায়, আমরা পুঙ্গব সুখবতীর কাছে বিদায় নিলুম। আমার সঙ্গে সুরাবায়ার শিল্পী বণিক লোকুমলের দেওয়া ডচ্ বই—গীতার অনুবাদ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বই, যোগ কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে থিওসোফিস্টদের ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ, আর রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো গল্পের ডচ অনুবাদ—এই বইগুলি শ্রীযুক্ত সুখবতীকে উপহার দিলুম। আমার সঙ্গে পুঙ্গব সুখবতীর অল্প-স্বল্প আলাপ হ'য়েছে, ভাষার অভাবে বিশেষ আগ্রহ থাকলেও বেশী কথাবার্ত্তা হ'তে পারেনি—আমি ডচ বা মালাইয়ে কথাবার্ত্তা চালাতে পারি না, আর তিনিও ইংরিজি জানেন না। তিনি বাকে আর ত্রেউএসকে দিয়ে প্রস্তাব ক'রলেন—তাঁর পিতৃব্যের পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে আমি যদি বেদ পাঠ করি, তা হ'লে তাঁর আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বড়ো আনন্দ হয়; কত দিন পরে ভারতবর্ষ থেকে ঐ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হ'য়েছে, ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই তো তাঁরা পালন করেন, অতএব ভারতীয় ব্রাহ্মণের একটী অনুষ্ঠানও যদি হয়, তা হ'লে তার থেকে আবার নোতুন ক'রে ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। শ্রীযুক্ত সুখবতীর এই কথা আমার কাছে বেশ লাগ্‌ল। যদিও আমি পুরোহিত বা পণ্ডিত নই, তথাপিও কর্ত্তব্য-বোধে এ ভার আমার নেওয়া উচিত; তবুও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ আর অনুমতি আগে নেবো ঠিক ক'রলুম। শ্রীযুক্ত সুখবতীর এই প্রস্তাব ভারত আর বলির ছিন্ন যোগ-সূত্রের পুনঃ সংস্কারের পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। ডচ বন্ধুরাও এই প্রস্তাবের অনুমোদন ক'রলেন।

শবদাহের জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃষাকার চিতা

সন্ধ্যের পরে উবুদ থেকে বাডুঙ-এ আমাদের বাসায় ফিরে এলুম। কবি সকালের চেয়ে শারীরিক আর মানসিক দুরকমেই ঢের ভালো আছেন দেখে আমরা

আরামের নিঃশ্বাস ফেললুম। আমরা যা দেখে এসেছি তার বর্ণনা শুনে তাঁরও উৎসাহ খুব ফিরে এল; আর আমার দ্বারায় বেদ-পাঠের প্রস্তাবের কথা শুনে তিনি খুব অনুমোদন ক'রলেন আর ব'ললেন যে আমাকে যথাসাধ্য ভালো ক'রে এই কাজটি সাঙ্গ ক'রতে হবে।

[ক্রমশঃ]

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ *

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২৫শে জুলাই, ১৯৩০

সম্রাটের মত জার্ম্মেনী পরিক্রমণ করচি—শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে। যেখানে যা-কিছু সুন্দর, স্মরণীয়; এদেশের মনীষী যাঁরা ভাবচেন, আঁকচেন, লিখচেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটচে, আমরাও ভাগ পাচ্ছি। এমন গভীর ক'রে বিচিত্র ক'রে য়ুরোপকে জানবার শুভযোগ কখনো হবে ভাবিনি। মহামানুষের দেশে এসেচি, এরা বড় ক'রে ভাবতে জানে এবং প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ভাবকে কর্ম্মে নিয়োগ করে। এদের জাতীয় জাগরণ একান্ত দুর্গতির মধ্যেও মানবচরিত্রের পূর্ণতাকে অস্বীকার করেনি, শিল্পে সাহিত্যে সমাজসৃষ্টিতে রাষ্ট্রিকচিন্তায় এরা গোড়া থেকে কাজে লেগেচে। এমন নূতন ক'রে একাগ্র সাধনাদ্বারা এরা নূতন জর্ম্মানীকে গড়ে তুলচে যে, স্তম্ভিত হতে হয়। বাড়ী বানানো, বই লেখা, দৈনিক সাংসারিক বিধিব্যবস্থা, সকল ক্ষেত্রেই এদের মন সম্পূর্ণ নূতন চেতনের উজ্জ্বল আলো ফেলেচে, মূল থেকে প্রাণের সব বদলে গেছে, মূল থেকে প্রাণের উচ্ছ্বসিত, অজেয় বীর্য্য দুর্দ্দমনীয় হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এরা ইংরেজের মত তুষারশীতল ভদ্রতার আড়ালে গর্ব্বিত আত্মচেতনায় নির্ব্বাসিত নেই। এরা ফরাসীর মত চঞ্চলচকিত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নয়, এদের মধ্যে ভারি একটা চারিত্রবিস্তার আছে, সরল আড়ম্বরহীন হৃদয়বান মনুষ্যত্ব আছে। পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসে ভাবতে পারি না;—'টাগোরে' শুনলেই হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ, ট্রামগাড়ীর টিকিট ক্লার্ক, কলেজের ছেলেমেয়ে অধ্যাপক, বণিক, রাষ্ট্রনেতা রাজকুলপ্রতিনিধি—এমন কেউ নেই এদেশে যার মুখ উজ্জ্বল হয়ে না ওঠে; যেখানেই আমরা যাই জয়ধ্বনি আনন্দ অভ্যর্থনায় এদের পক্ষে উৎসাহ সম্বরণ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পথে পথে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে 'টাগোরে'কে দেখবে বলে—এদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা তাঁরা সভয়ে ক্ষণেকমাত্র ওঁর কাছে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎফুল্লচিত্তে চলে যান। যার যা-কিছু আছে, ফুলের বাগান, সুন্দর বাড়ী, বড় গাড়ী, সমাদর, আতিথ্য অজস্র হয়ে কবির কাছে ঝরে পড়ে; উনি অনাসক্তচিত্তে সকলের মধ্য দিয়ে চলে যান, কিছুই ওঁকে বাঁধে না। সমস্তক্ষণই এত ইনস্পায়ার্ড থাকেন যে, যখনই যা বলচেন তা কবিতার মত শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায়। চিন্তার চরম ঐশ্বর্য্য পথে পথে ছড়িয়ে চলে যান। কোনোখান থেকে বিদায়কালে রবীন্দ্রনাথের বন্দনায় যে করুণা, যে বেদনা লোকের মুখে দেখতে পাই তাতে আমাদের মন বিকল হয়ে যায়। আমরাও সঙ্গগুণে ভালবাসা পাই, বন্ধুহৃদয়ের দান এমন করে আমাদের কাছে আসে যে সঙ্কোচ হয়, যোগ্যতার পরীক্ষায় অন্তর শুচি হয়ে ওঠে। কি সুন্দর দেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কি বলব—এতই বেশী সৌন্দর্য্য দেখেচি, এত বেশী সহৃদয়তা পেয়েচি যে বহুকাল পূর্ব্বেই আমাদের

* শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে লিখিত পত্র হইতে।
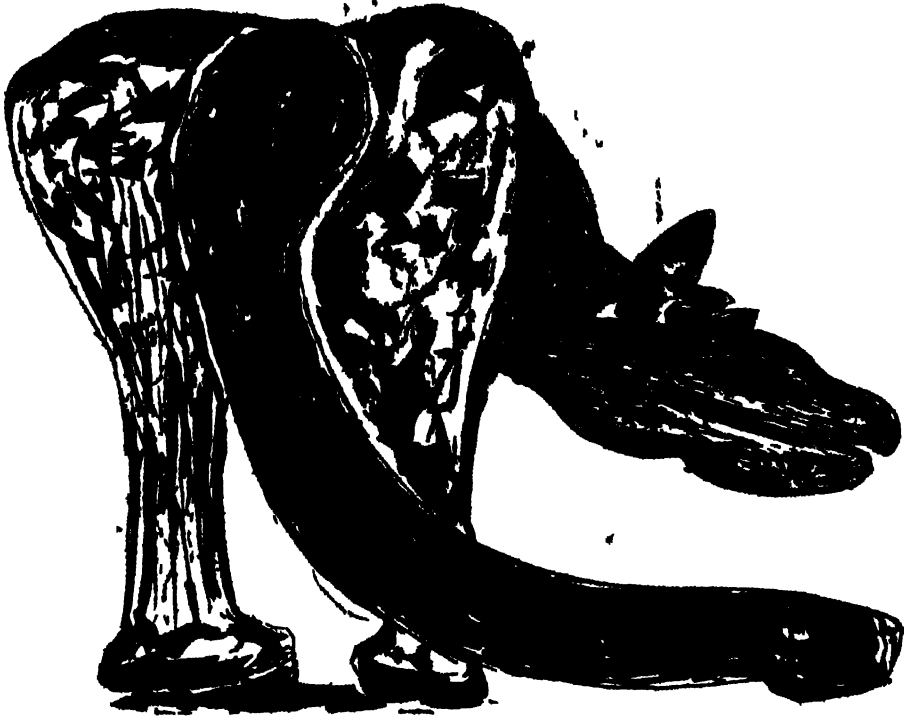
রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত একটি চিত্র

কথা ফুরিয়ে গেছে। একদিনের একটি ছোট অভিজ্ঞতা ঘটনা একটুখানিও ভুলি না, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই লেখবার বেলায় কেবল দুচারটে সাধারণ কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। কেমন করে বোঝাব প্রতিনিয়ত কি পাচ্চি, কি বুঝচি, জানচি, ভাবচি। হয়ত কোনোদিন সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোড়নে কিছু একটা পূর্ণ প্রকাশের আভাস কোনো রচনায় দিতে পারব। কিন্তু এখন নয়। বার্লিন, ড্রেসডেন, ম্যুনিক, এট্টাল, ওবেরআমেরগাউ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডামস্টার্ট এবং আশেপাশে কত ছবি, কত লোক, কত কি দেখলাম—এখনো শেষের কাছেও আসিনি। প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথকে নূতন ক'রে চিনচি—কত ভাবে তাঁর প্রতিভার উপর অজস্রধারা প্রতিক্ষণে যে আসচে, এবং প্রতিবারই তাঁর চমকিত মনের ঐশ্বর্য্য ঝলে উঠচে।

আমরা ডেনমার্ক এবং সুইটজরল্যাণ্ড হয়ে আরও একটি প্রকাণ্ড নূতন অভিজ্ঞতার রাজ্যে যাব ভাবচি। পুরো ঠিক হয়নি, হ'লেই জানতে পারবেন। জেনেভাতে মস্ত ব্যাপার হবে।

২৬শে জুলাই, ১৯৩০

* * মারবুর্গে এসে এই চিঠি শেষ করচি। পাহাড়ের মধ্যে অতি রমণীয় এই শহর। আজও আবার গভীর রাত্রে চিঠি লিখতে বসেচি। সমস্ত দিনের তরঙ্গিত শত স্মৃতি মনে গুঞ্জন করচে। রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধ'রে ইংরেজিতে একটি নূতন রকম টেক্নীকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখেচেন। ছবির মত এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা। শুনেচেন নিশ্চয় এদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শিল্পরাজ্যে একেবারে চরম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েচেন। বার্লিন ড্রেসডেন ম্যুনিক তিন জায়গায়

একই সঙ্গে প্রদর্শনী চলেচে। এদেশের খবরের কাগজ এই ছবির খবরে উপ্‌ছে পড়চে, জার্ম্মেনীর সব চেয়ে বড় শিল্পীরা সমস্বরে বলচেন, এ সব ছবির পূর্ব্বাপর নেই, এর মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম মিলেচে, এর মধ্যে প্রতিভার মন্ত্রশক্তি নূতন সৃষ্টিতে পরম বিকাশ পেয়েচে। প্যারিসেও এমনি মস্ত আন্দোলন হয়েছিল, বার্মিংহামেও তাই, জার্ম্মেনীতে নানা জায়গায় একসঙ্গে প্রদর্শনী খোলাতে উৎসাহ আরও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে। তা ছাড়া হয়ত জার্ম্মেনী সব জিনিষকে গভীর ক'রে নিতে জানে, অন্য দেশের চেয়েও বেশী,—জানি না। এদের শিল্প নূতন পথ খুঁজচে, সারা দেশময় আজ নূতন জাগরণের আন্দোলন, রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক দৈন্যদুর্গতি এদের চিত্তকে সূক্ষ্ম প্রখর ক'রে রেখেচে। তাই ভাবের গভীর বোধে এরা যেমন ক'রে সাড়া দেয় এমন বোধ হয় আর কোনো জাতির পক্ষে আজ সম্ভব নয়। যে কারণেই হোক্, জর্ম্মেনী রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভায় অভিভূত হয়েচে। এখানে প্রতিদিন লোকের মুখে, খবরের কাগজে, সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয় যা বেরোচ্চে, ভবিষ্যৎকালে তার থেকে সুসম্বদ্ধ একটি ভাবের ধারা বাংলায় প্রকাশ করা দরকার হবে। যে রকম দেখা যাচ্চে তাতে মনে হয়, ইংরেজি গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল উপহার পাওয়ার সময় যে রকম য়ুরোপ জুড়ে আন্দোলন হয়েছিল, ছবি প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথ সেই রকম আন্দোলন তুলেচেন। এ কথাটা ইতিমধ্যে আমাদের দেশে কি ভাবে কতদূর প্রকাশ হয়েছে জানি না, কেন না আমাদের দেশের ইংরেজি খবরের কাগজে খবর প্রকাশ পায় না, মারা পড়ে। আইন্‌ষ্টাইনের নূতন আবিষ্কারের চেয়ে ইংরেজ লর্ড-লেডীর শেয়াল শিকারের খবর বেশী থাকে। যাই হোক্, সমগ্র য়ুরোপে যে উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে, তা'র জোয়ার বঙ্গোপসাগরের কূলেও পৌছবেই, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমিও ভাল করে সব কথা গুছিয়ে জানাতে পারলাম না, এইজন্যে দুঃখ বোধ হচ্ছে। কিন্তু এতটা উত্তেজনার মুখে শান্তভাবে বিশদ করে বর্ণনা লেখাও অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে এদেশে কি কাণ্ড চলেচে, তাড়াতাড়ি ক'রে একটু জানিয়ে দিলাম মাত্র।

অধ্যাপক অটো, ডক্টর ফ্রিক প্রভৃতি ভারত-পরিচিত এবং বহু বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে এখানে পরিচয় হ'ল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা ক'রে ষ্টেশন থেকে
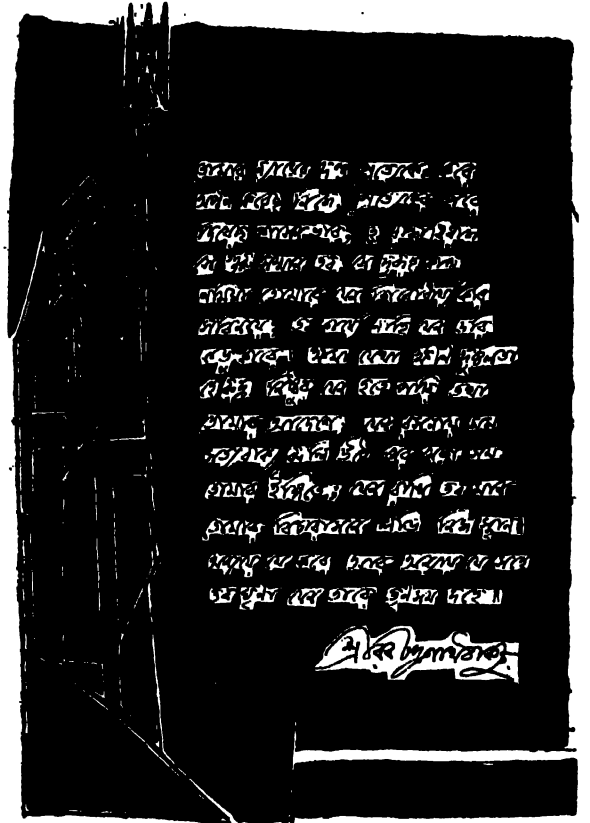
রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রসম্বলিত হস্তাক্ষর

আজ শহরে আন্‌লেন। আগামী পরশুদিন সোমবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন।

এখানেও বহু লোকে ভারতের বিষয় বিশেষভাবে জানে এবং জান্‌তে চায়। রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট কথা বলতে নিরস্ত হন নি। তিনি যেখানে যাচ্ছেন, কত সহস্র লোকের মনকে চিরদিনের মত আমাদের সঙ্গে সত্যভাবে গভীরভাবে মেলাচ্ছেন, কেউ কি তা বুঝতে পারে? আজকের দিনে ভারতবর্ষের তপস্যার

অগ্নি সকলেই একে একে চিত্তে গ্রহণ করচে, ভারতবর্ষকে প্রণাম করচে। আমরা যদি একান্ত সত্য হয়ে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গীন মুক্তিসাধনায় শৈথিল্য না করি, শুধু ভারতকে নয়, সমস্ত জগতকে নূতনতর আশার পথ দেখাবো।

আজ আর নয়, তাহ'লে সকালে শয্যা থেকে উঠতে কষ্ট হবে—অনেক রাত হয়েছে।

এল্‌সিনোর, ডেনমার্ক
৭ই আগষ্ট, ১৯৩০

শনিবার দিন কোপেনহেগেনে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হবে। এখানে খুব সাড়া পড়ে গেছে—নরওয়ে সুইডেন থেকে দলে দলে লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এবং তাঁর বক্তৃতা শুনতে ও ছবির প্রদর্শনীতে যোগ দিতে আসচে।

বড় ভাল লাগচে। সুন্দর, শ্যামল, সমুদ্রবেষ্টিত দেশ; হেমন্ত ধান্যের সোনার প্রাচুর্য্যেভরা মাঠ, মন্থর-গতি পরিপুষ্ট গোরু চরচে, ঝকঝকে পরিষ্কার গ্রাম্যকুটীর, হাসিমুখী ছেলেমেয়ে লোকজন নীল সমুদ্রের ধার দিয়ে পথে চলেচে। এখানকার গ্রামের কৃষক পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-নাথের বই পড়েছে, তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। প্রতিদিন এমন সব দৃশ্য দেখি, যাতে মন বিচলিত হয়—কোথায় সুদূরে এসেচি কিন্তু এখানেও আমাদের কবিকে এরা আপন বলেই জানে। সব দ্বার তিনি খুলে দিয়েচেন, যেখানেই যাই রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক ব'লে সম্মান সমাদর পাই।

Berlin, Wannse
Friedrich Karlstrasse 18.
১৯শে আগষ্ট, ১৯৩০

এখানে সুমধুর সময় কাটল। এই বাড়ীর লোকেরা আমাদের আপন হয়ে গেছেন—হ্রদের ওপর এদের বাড়ীতে আছি। আইনষ্টাইন কাছেই আছেন, প্রায়ই দেখাশোনা হয়। জার্ম্মেনীর ন্যাশান্যাল গ্যালারি রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি ছবি চেয়ে নিল। হৈ চৈ পড়ে গেছে। ডেনমার্কেও ছবির প্রদর্শনী চলেচে—যতদূর সম্ভব সমাদর হচ্ছে।

কাল যাচ্ছি জেনেভায়। এসব দেশে এলে শুধু বেঁচে যেন লজ্জা বোধ হয়, সবক্ষণ কিছু প্রতিদান দিতেই হবে; চলা চাই, বলা চাই, লেখা চাই, সভায় নিমন্ত্রণে সুসজ্জিত হয়ে যাওয়া চাই। এখানে যা পেলাম ধন্যমনে তাই নিয়ে এখন দেশের গাছের ছায়ায় নিভৃত অনামা কুটীরে বসে স্বপ্ন দেখতে চাই।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

৩৫

দেবকুমার ট্যাক্সিটাকে বিদায় করিয়া হলের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ যেন তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মায়ার কেমন একটা অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। এত সাজার জন্ম দেবকুমার তাহাকে না জানি কি ভাবিতেছে।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাইবার জন্ম সে বলিল, "আর দেরি করলে আরম্ভ হয়ে যাবে না?"

দেবকুমার হাতঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলিল, "তা হওয়া সম্ভব। আপনার গাড়ী যদি তৈরি থাকে তাহ'লে বেরিয়ে পড়া যায়।"

মায়া বলিল, "তৈরিই আছে" এবং মিনিট দুইয়ের ভিতর গাড়ী আসিয়া হাজিরও হইল। আয়াকে রাত্রে তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়া, মায়া দেবকুমারের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা জনবিরল, অনেকক্ষণ পরে পরে একজন পথিক বা একটা গাড়ী দেখা যায়। দেবকুমার বলিল, "নীরবতার কেমন একটা 'এফেক্ট' আছে, নিজেকেও চুপ করে যেতে হয়। অথচ কথা বল্‌তে যে ইচ্ছে করছে না, তা মোটেই নয়।"

মায়া একটু হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছে করছে ত বললেই হয়। চুপ করে থাকতেই হবে এমন ত কোনো আইন নেই?"

দেবকুমার বলিল, "কিন্তু যা বল্‌তে চাই তা ব'লে বস্‌লে সেটা বেআইনী বলে গণ্য হতেও পারে।"

মায়ার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া উঠিল। কি এমন কথা? ইচ্ছা করিলেই সে কথা ঘুরাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু দেবকুমার কি যে বলিতে চায় তাহা শুনিবার একটা অদম্য আকাজ্ঞা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "কথাটা শুন্‌লে বুঝতে পারি, আইনী কি বেআইনী।"

দেবকুমার বলিল, "তাহ'লে সাহসে ভর ক'রে বলেই ফেলি। আমি যে-দেশে ছিলাম সেখানে সুন্দর মানুষ খুব সুলভ, কিন্তু সেখানেও আপনার মত সুন্দর মানুষ দেখিনি।"

মায়ার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। কি যে সে বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া গেল। এই কথাটা শুনিবার ইচ্ছাই কি তাহার মনে মনে ছিল না?

দেবকুমার মিনিট-খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলেন? এইজন্তেই আমি বল্‌তে চাইছিলাম না।"

মায়া পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "একটুও রাগ করিনি।"

কথা না বলিয়া দেবকুমার বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না, কিন্তু সেও অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল। তাহার পর শহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "এসে ত পড়লাম। মনটা কিন্তু ঠিক নাচ দেখ্‌বার উপযুক্ত অবস্থায় নেই।"

মায়ার অবস্থাও দেবকুমারের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল ছিল না। সে অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিল মাত্র। বাহির হইয়াছে যখন, তখন তাহাকে যাইতেই হইবে এবং তিনঘণ্টা জনপূর্ণ হলে বসিয়াও থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতেছিল ফিরিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে, এবং একলা একঘরে খানিক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে।

যে হলটিতে নাচ হইবে, তাহার সম্মুখে তখন ভয়ানক ভীড় জমিয়া গিয়াছে, যেমন গাড়ী ঘোড়া মোটর তেমনি মানুষ। পুলিসের উৎপাতে একখানা গাড়ী আধ মিনিটের বেশী দাঁড়াইতে পাইতেছে না। মায়াদের

গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র দেবকুমার তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া বলিল, "চট্ করে নেমে পড়ুন, যা ভীড় হয়েছে।"

মায়া নামিতে যাইবামাত্র পিছনের একটা গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠিল। দেবকুমার ব্যস্ত হইয়া মায়াকে বাহু ধরিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল, "চলুন এইটুকু পার হয়ে যাই। ইস্ কম হ'লেও হাজারখানিক লোক দাঁড়িয়েছে।"

মায়া কোনো উত্তর দিল না। দেবকুমার একটু বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, মায়ার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গিয়াছে। কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "ভয় পেয়েছেন না কি?"

মায়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না।" তাহার পা তখন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কোনোমতে ফুটপাথ্ অতিক্রম করিয়া সে হলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বসিবার জায়গা খুঁজিয়া পাইতে বেশী দেরি হইল না। বসিয়া পড়িয়া মায়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দেবকুমার বলিল, "বাঙালীরা দেখছি conspicuous by their absence. তাদের নাচ ভালই লাগে না বোধ হয়।"

মায়া বলিল, "বাঙালী মেয়ে ত দেখ্‌ছি একমাত্র আমি।"

দেবকুমার বলিল, "তা আমরা মেয়েদের যা অবস্থায় রেখেছি, তাদের এসব জায়গায় না আনাই ভাল। প্রকাশ্য জায়গায় হাজার লোকের মাঝে তারা যেরকম হৈ-চৈ বাধায়, দেখ্‌লে ভারি বিরক্ত লাগে। যতদিন বাইরে সপ্রতিভ এবং সহজভাবে চল্‌বার জ্ঞানটা না হয়, ততদিন না বেরনই ভাল।"

মায়া বলিল, "তা বের না করলে কি করে তারা শিখবে?"

এই সময় নাচ সুরু হওয়াতে তাহারা কথা বন্ধ করিল। কিন্তু যদিও মায়ার চোখ ষ্টেজের দিকে ছিল, তাহার মন ছিল অন্য কোনোখানে। কি যে দেখিল এবং কি যে শুনিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। দেবকুমারের অবস্থাও প্রায় তাহারই মত, কিন্তু তবু সে মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিল, তবে মায়ার কাছে হাঁ না ভিন্ন অন্য কিছু জবাব পাইতেছিল না।

ঘণ্টা তিন পর তাহারা যখন বাহির হইয়া আসিল, তখনও মায়া গম্ভীর হইয়াই আছে। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি ভাল লাগল না?"

মায়া বলিল, "না, বেশ ত লেগেছে।"

দেবকুমার গাড়ীতে মায়াকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "আপনাকে গিয়ে পৌঁছে দেওয়াই আমার উচিত, এবং তা যাবও, কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার ভয়ানক ভয় করছে। মনে হচ্ছে, কোনো কারণে আপনি যেন ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন।"

মায়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি যে আপনি বলেন তার ঠিক নেই। বিরক্ত হতে যাব কেন? তার মত কিছু ত হয়নি?"

দেবকুমার গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তাহ'লে এরকম মুখ করে রয়েছেন কেন? আপনার ভাল লাগ্‌বে মনে করে এলাম, অথচ আপনি একটু 'এন্‌জয়' করলেন না, এতে নিজেকে ভারি 'স্নাব্‌ড্' লাগছে।"

গাড়ীটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল, মায়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, এবার দেবকুমারের দিকে খানিকটা ফিরিয়া বসিয়া বলিল, "আমি এন্‌জয় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভাল ক'রে মন দিতে পারলাম না।"

দেবকুমার একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমার জান্‌তে চাইবার কোনো অধিকার নেই, তবু না জিগ্‌গেস করে আমি থাক্‌তে পারছি না। কেন আপনি মন দিতে পারলেন না, আমায় দয়া করে বল্‌বেন?"

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কয়েক দিন থেকে আমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে আছে।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে অল্পদিন

হ'ল মাত্র চিনেছেন, কিন্তু আমার এই কথাটা আপনি দয়া করে বিশ্বাস করবেন যে, আপনাকে বাজে কথা আমি বলি না। ভদ্রতার খাতিরেও কিছু বলি না। আপনাকে আমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করি। আপনার কাছ থেকেও সেটা দাবি করতে পারি কি না জানি না।"

মায়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তা পারেন।" দেবকুমার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "তাহ'লে, অনুগ্রহ ক'রে আমার একটা কথার উত্তর দেবেন?"

মায়া বলিল, "কি কথা বলুন।" তাহাদের গাড়ী তখন জনহীন পথে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। হাওয়ার ঝাপটায় মায়ার শরীর শীতল হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

দেবকুমার বলিল, "কেন আপনার মন এত খারাপ হয়ে আছে? আমি কি কিছু করতে পারি?"

মায়ার হাত পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হাত হইতে রুমালটা নীচে পড়িয়া গেল। দেবকুমার নীচু হইয়া সেটা কুড়াইয়া মায়াকে দিতে গিয়া, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এ যে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। ভয়ে তাহার ভদ্রতা-বোধটাও বোধ হয় চলিয়া গেল, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া কি হয়েছে আমায় বল। বিশ্বাস কর, তোমার জন্যে মানুষের সাধ্য কোনো কাজ করতে আমি ত্রুটি করব না।"

মায়ার চোখ বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল। দেবকুমার বুঝিল। তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "তুমি আজ আমায় যা দিলে, তা আমার জন্মজন্মান্তরের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তোমার বাবার অনুমতি না নিয়ে আমি আর কিছু বলব না। তুমি যদি বল ত, কাল সকালেই তাঁর কাছে যেতে পারি।" মায়া অশ্রুপূর্ণ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাবেন।"

দেবকুমার আস্তে আস্তে মায়ার একখানা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। বলিল, "একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মায়া, আমার মত হতভাগাকে ভালবেসে হয়ত তুমি ঠক্‌লেই। তবু এই সময়টা চোখের জল ফেলো না। তোমার মুখে হাসি দেখলে তবু আমার প্রাণে একটু ভরসা আসে। তোমার বাবার কাছে যেতে আমার খুবই মুস্কিল বাধ্‌বে। আমার এমন কিছু নেই যার জন্যে তিনি খুশি হয়ে তোমাকে আমার হাতে দিতে পারেন। তবু কেন জানি না, আমার আশারও অন্ত নেই। তোমায় প্রথম যেদিন দেখি, তখন থেকে কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলে দিয়েছিল তুমি আমারই হবে।"

মায়া কথা বলিল না। দেবকুমার তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখ, আজ নাচটাচ আমিও কিছু দেখিনি। সারাক্ষণ খালি তোমাকে দেখেছি। ভাল পোরট্রেট পেণ্টার যদি কেউ থাকৃত, তাহ'লে এই পোষাক আর এই গহনা পরিয়ে তোমার একটা ছবি তাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিতাম। তুমি সব সময়েই সুন্দর, কিন্তু আজকের মত সুন্দর তোমায় কোনোদিন দেখিনি।"

মায়া চোখ মুছিয়া আরও একটু কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, "কাল সকালেই কি আপনি যাবেন বাবার কাছে? একটু, একদিন দেরি করুন।"

দেবকুমার কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি বললে নিশ্চয়ই দেরি করব। কিন্তু কেন দেরি করতে চাইছ মায়া? একেবারে নিশ্চিত ক'রে সব জানা কি ভাল না?"

মায়া বলিল, "আমার আর একজনের কাছে অনুমতি নিতে হবে।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে

মায়া বলিল, "আমার মায়ের। তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁকে আমি অবহেলা করতে পারব না।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর অনুমতি তুমি কি ক'রে পাবে?"

মায়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এ কথা আমি কাউকে বলি না, কিন্তু আপনাকে বলব। মায়ের কাছে মনে মনে যা বলি, তা তিনি জানতে পারেন। তারপরই তাঁকে স্বপ্নে দেখি। কিছু তিনি বলেন না,

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝতে পারি, তিনি খুশি হয়েছেন কি না।"

দেবকুমার কিছু বলিল না। গাড়ী যখন প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন মায়ার দুই হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া, হয়ত মায়ের অনুমতি পাবে না। তখন কি কর্‌বে? আমার কাছে তাহ'লে আর আস্‌বে না?"

মায়ার চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।"

গাড়ী ফটকের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হলটা খালি, ছোক্‌রা সিঁড়ির এক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছে। গাড়ী থামার শব্দে সে চম্‌কিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল।

মায়া নীরবেই গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। দেবকুমারও তাহার পিছন পিছন হলে ঢুকিয়া বলিল, "তোমার গাড়ীটাকে আর খাটাব না, ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ন'টার সময় এখানে আসতে বলে দিয়েছি। ন'টা বাজ্‌তে আর বেশী দেরি নেই, মিনিট দশ বারো। ততক্ষণ নীচেই কোথাও বসা যাক্।"

নিরঞ্জনের আপিস ঘরটা খালি পড়িয়া, তিনি তখনও ফেরেন নাই। মায়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, দেবকুমারকে ডাকিয়া বলিল, "এই ঘরে আসুন।"

দেবকুমার ঘরের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি চিরকালই 'আপনি' থাকব না কি?"

মায়ার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল, সে বলিল, "এখনও সময় উৎরে যায় নি ত? হঠাৎ 'তুমি' বল্‌তে কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে।"

দেবকুমার উঠিয়া আসিয়া মায়ার চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া বলিল, "তোমার হয়ত হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমি কিন্তু গোড়া থেকেই 'তুমি' বল্‌তে ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই আমার একটুও বাধবাধ ঠেকেনি। ভাগ্যে রাশিয়ান্ ব্যালেটটা এসেছিল, তাহানা হ'লে আরও কত দিন তোমায় "আপনি" "মশায়" করে কাটাতে হ'ত তা কে জানে? কৃতজ্ঞতার খাতিরে আরও একদিন আমাদের যাওয়া উচিত। অবিশ্যি নাচ দেখাটা সমানই হবে।"

মায়া বলিল, "যা হবার তা হ'তই, রাশিয়ান্ ব্যালেট না হোক্ একটা কিছু উপলক্ষ্য করে হ'ত।"

দেবকুমার উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "ঐ যে আমার রথ এসে পৌঁছল দেখ্‌ছি। লোকটা একটু কম পাংচুয়েল হ'লেও ক্ষতি ছিল না। নিতান্ত তাহ'লে উঠতে হ'ল। তোমার বাবার কাছে কাল তাহ'লে যাব না? কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে গেলে তিনি অমত করতেন না।"

মায়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আপনার তা মনে হচ্ছে?"

দেবকুমার বলিল, "তোমাকে ব্যালেটে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন ব'লে। আমাকে একেবারে একটা 'য়্যান্‌ডিজায়ারেব'ল্' মনে কর্‌লে কখনও তা করতেন না।"

মায়ারও এই কথা এই কারণে মনে হইয়াছিল, সে বলিল, "হয়ত আপনার কথাই ঠিক। বাবা এর আগে কখনও আমাকে একলা কারও সঙ্গে যেতে দেন নি।"

দেবকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ নিয়ে যেতে চেয়েছিল কি?"

মায়া বলিল, "তা চায়নি অবশ্য।"

বাহিরে ট্যাক্সিওয়ালা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে বোঝা গেল। দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, চললাম, কাল না যাই, পরশু কিন্তু নিশ্চয় যাব। এর ভিতর তোমার যা কর্‌বার করে নিও। কাল কি আস্‌ব একবার, না তাও বারণ?"

মায়া বলিল, "না, না, বারণ কেন হবে, আপনি আসবেন।"

দেবকুমার মায়ার দুই হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আজ রাত্রে খুব ভাল স্বপ্ন দেখো। এতখানি পাবার পরে যদি আবার ফিরে যেতে হয় তাহ'লে সহ্য করতে কিছুতেই পারব না।"

মায়া দেবকুমারের বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "আপনার চেয়ে আমারই ভয় বেশী।"

দেবকুমার মায়ার চুলের উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "থাক্, ও বিষয়ে ইতর-বিশেষ ঠিক করবার প্রয়োজন না হ'লেই ভাল। যাই তাহ'লে এখন, কেমন? কাল সাড়ে-পাঁচটার মধ্যেই আসব।"

মায়া সিঁড়ি পর্যন্ত দেবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া গেল।

উপরের ঘরে উঠিয়া আসিয়া দেখিল তাহার আয়া কোথা হইতে একখানা ছেঁড়া মাদুর জোগাড় করিয়া আনিয়া কার্পেটের উপর বিছাইয়া দিব্য ঘুমাইতেছে। তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "আমাকে একটু ওভ্যালটিন্ করে দে। আমি আর কিছু খাব না।"

বুড়ী বক্ বক্ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

মায়া কাপড় গয়না সব খুলিয়া রাখিল। তখনও তাহার শরীর মন প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার জন্য সে মুখ হাত ধুইয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

আয়া ওভ্যালটিন্ করিয়া আনিল। মায়া বলিল, "একটু জল দে। আর কিছু দরকার নেই। যাবার সময় সিঁড়ির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাস্।"

আয়া আলো নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরখানিকে রহস্যময় করিয়া তুলিল। মায়া খাটের উপর বসিয়া একমনে মৃতা জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। নিজের হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ দিয়া সে যেন লোকান্তরিতাকে সব বুঝাইতে চাহিল।

খানিক পরে মাথা তুলিয়া সাবিত্রীর ছবির দিকে চাহিয়া দেখিল। ছবিখানা যেন দুলিয়া উঠিল। তাহার পর কি যে দেখিল সেই-ই শুধু জানে।

পতনের শব্দে আয়া ছুটিয়া উপরে আসিল। মায়া অজ্ঞান হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে। নিরঞ্জনও এই সময় আসিয়া পৌঁছিলেন।

৩৬

কোকাইনের বাড়ীর সে শান্তি টুটিয়া গিয়াছে। গৃহকর্তা হইতে ঝি চাকর পর্য্যন্ত সবাই শঙ্কিত, শশব্যস্ত। মায়ার এখনও ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই, দুই-তিনবার চোখ খুলিয়া তাকাইয়াছে মাত্র। নিরঞ্জন শহরের যত ডাক্তার ছিল, সব জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছে না, ব্যাপার কি তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ।

নিরঞ্জন আসিয়াই মায়াকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেন। তখনি ডাক্তার আনিতে পাঠান, কিন্তু ডাক্তার আসিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। তবে এখনই কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া নিরঞ্জনকে নিশ্চিন্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঝি চাকর কেহই ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। ছোক্‌রা বলিয়াছে দিদিমণিকে ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে সে ফিরিতে দেখিয়াছে, কিন্তু তখন তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও অসুস্থ দেখায় নাই। ব্যারিষ্টার সাহেব যখন চলিয়া যান, তখনও সে দিদিমণিকে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতে দেখিয়াছে। বুড়ী আয়া বলিল, দিদিমণিকে সে ওভ্যালটিন্ করিয়া দিয়া নীচে চলিয়া আসিয়াছিল, পরে কি হইয়াছে তাহা সে কিছুই জানে না। আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকাল হইবার আগে আর কিছু করা অসম্ভব। নিরঞ্জন সমস্ত রাত কন্যার শয়নকক্ষে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন।

ভোর হইতেই তিনি দেবকুমারের কাছে চিঠি লিখিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন, সে যেন একবার নিশ্চয় আসে। মায়াকে সজ্ঞান অবস্থায় সে-ই কালরাত্রে দেখিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে কোনো খোঁজ মিলিলেও মিলিতে পারে।

সকালের দিকে আবার ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন। মায়া একবার চোখ খুলিয়া চারিদিকে তাকাইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি শিশুর দৃষ্টির মত অর্থশূন্য। কোনো কথা সে বলিল না, কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে বলিয়াও বোধ হইল না। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ মায়া?"

মায়া কোনো উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পরে আবার চোখ বুজিল। ডাক্তার বলিলেন, "থাক তাড়া-হুড়ো করে দরকার নেই। এখনও 'শক'-এর 'এফেক্ট' কাটেনি, আস্তে আস্তে আবার নরম্যাল অবস্থায় আসবেন। ওঁকে যেন কোনো রকমে 'ডিস্টার্ব' না করা হয়। একজন নার্স আনতে পাঠান, সেই-ই চার্জ নিয়ে থাকবে। চাকর-বাকর ক্রমাগত ঢুকে যেন গোলমাল না করে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, আপনিই গিয়ে একজন নার্স পাঠিয়ে দেবেন। আমার চাপরাশীকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। আপনি আর কাকে কাকে ডাকা দরকার মনে করেন? কলকাতায় টেলিগ্রাম কর্‌তে হ'লেও আজই করা ভাল।"

ডাক্তার বলিলেন, "আহা, আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন? তেমন সিরিয়স্ মনে করলে আমিই কি টেলিগ্রাম কর্‌তে বল্‌তাম না? তা আপনি যখন অত ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন বিকেলে আমি একেবারে সিবিল সার্জ্জেনকে নিয়ে আস্‌ব। আমার মনে হয়, দু-এক দিনের মধ্যে আপনার মেয়ে নিজের থেকেই ভাল হয়ে উঠবেন।"

নিরঞ্জন ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার তখনও চা খাওয়া হয় নাই। ছোক্‌রা আসিয়া জানাইল চা দেওয়া হইয়াছে। নিরঞ্জন চিন্তিত মুখে খাবার ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। খাওয়ার রুচি তাঁহার ছিল না। এক পেয়ালা চা শুধু টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগিলেন।

মায়া তাঁহার একমাত্র সন্তান। জীবনের সকল ব্যর্থ স্নেহ, ভালবাসা, সবই এই একমাত্র কন্যাকে আশ্রয় করিয়া এতদিনে সার্থক হইয়াছিল। মায়াই ছিল তাঁহার বিশ্বজগৎ। তাহাকে বাদ দিয়া কোনো কিছু তিনি আজকাল ভাবিতেও পারিতেন না। তাহার হঠাৎ এই রকম অসুখ হইয়া পড়ায় নিরঞ্জনের বুকের ভিতরটা [illegible] গেল। কেন যে এইপ্রকার হইল, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, ডাক্তারদেরও কিছুই বলিতে পারেন নাই। দেবকুমার আসিলে খানিকটা কিছু বোঝা যাইবে মনে করিয়া তিনি তাহার আসার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল। নিরঞ্জন ছোক্‌রাকে বলিলেন, "তুমি ব্যারিষ্টার সাহেবকে এখানেই নিয়ে এস, আর একটা চায়ের পেয়ালা দাও।"

ছোক্‌রা পেয়ালা সাজাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল এবং মিনিটখানিক পরেই দেবকুমারকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। দেবকুমারের চেহারা ভাল দেখাইতেছিল না, কোনো কারণে সেও বেশ খানিকটা মুষ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা বোঝাই যাইতেছিল।

ছোক্‌রাকে বিদায় করিয়া দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "বোসো। চা খেয়ে এসোনি বোধ হয়?"

দেবকুমার বলিল, "না, আপনার চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে এলাম, চা খাইনি।"

সেও এক পেয়ালা চা টানিয়া লইয়া বসিল বটে, কিন্তু খাইবার চেষ্টাও করিল না। খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "তোমায় কেন ডেকেছি বুঝতে পারনি বোধ হয়। তাড়াতাড়িতে সব কথা লিখিনি। কাল রাত্রে ব্যালেট থেকে ফিরবার পরই মায়া হঠাৎ ফেণ্ট করেছে, এখন পর্য্যন্ত ভাল করে জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার বল্‌ছেন খুব একটা 'শক্' পেয়ে সম্ভবতঃ এ রকম হয়েছে। তুমি যদি কিছু বল্‌তে পার, সেইজন্যে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। ঝি-চাকররা কিছুই জানে না।"

দেবকুমারের মুখ আশঙ্কায় বেদনায় যেন কালো হইয়া উঠিল। মিনিটখানিক ভাবিয়া লইয়া বলিল, "কালকে 'এক্‌সাইটেড্' হবার মত কারণ তাঁর ঘটেছিল বটে, তবে কিছু শক্ পেয়েছেন বলে ত মনে হয়নি। আমার সঙ্গে যখন ফেরেন তখন ত বেশ ভালই ছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এক্‌সাইটেড কেন হয়েছিল, আমায় বল্‌তে পার?"

দেবকুমার বলিল, "আমি তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম।" সাজাইয়া গুছাইয়া কিছু সে বলিতে পারিল না, তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "মায়া কি উত্তর দিয়েছিল?" দেবকুমার আগের মত ভাবেই বলিল, "তিনি অমত করেন নি। বাড়ী পৌঁছানোর সময় তাঁকে কিছু অসুস্থ মনে হয়নি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কেন এরকম হ'ল কিছু বুঝ্‌তে পারছ না?"

দেবকুমার বলিল, "কিছু না। এক্সাইটমেন্টের আতিশয্যে এতটা হ'তে পারে না। বিশেষ ক'রে তাঁর যখন অসম্মতি ছিল না। আমি চলে যাবার পর কিছু এমন ঘটেছে সম্ভবতঃ যা তাঁকে খুব শক্ দিয়েছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি যে ঘটতে পারে তা ত জানি না। চাকরবাকররা তাহ'লে কিছু ত অন্ততঃ নোটিস করত? আর কতটুকু বা সময়? তুমি যাবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি।"

খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর দেবকুমার বলিল, "আমি আজই আপনার কাছে যাব ঠিক করেছিলাম, আপনার অনুমতি নিতে। শুধু মায়া বারণ করায় একদিন দেরিতে যাব স্থির ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার কিছু অসম্মতি নেই বাবা। সবদিক্ দিয়েই তুমি মায়ার যোগ্যপাত্র। সেও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ব'লেই আমার মনে হয়েছিল। আমার বিশেষ সেকেলে প্রেজুডিস্ নেই, তবু যার-তার সঙ্গে মেয়েকে বেশী মিশ্‌তে আমি দিই না, পাছে এর থেকে মায়ার কোনো মনোবেদনার কারণ ঘটে। তুমি যে কখনও সে রকম কিছু ঘটাবে না তা বিশ্বাস করি ব'লেই তোমাকে কিছু বাধা দিইনি। আজকার দিনটা সবদিক দিয়ে আনন্দের দিন হ'ত, যদি মায়ার এই অসুখটা না হ'ত।"

দেবকুমার অবনত হইয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন তাহার মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এমন সময় ট্যাক্সি চড়িয়া চাপরাশী নার্স লইয়া ফিরিয়া আসিল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁকে কে দেখছেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমাদের পঞ্চানন ডাক্তার। তিনি বিকেলে সিবিল সার্জ্জনকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। দেখি তাঁরা কি বলেন। দরকার হ'লে কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে হবে।"

দেবকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি ওঁকে একবার দেখে যেতে পারি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল, ডাক্তার যদিও ওঁর ঘরে লোকজন যেতে দিতে বারণ করেছেন, তবু তুমি গেলে ক্ষতি কিছু নেই, বরং লাভ হতে পারে।"

নিরঞ্জন দেবকুমারকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। মায়ার ঘরের দরজার কাছে বুড়ী আয়া আসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল, সে দেবকুমারকে দেখিয়া একবার কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল, তাহার পর সরিয়া বসিল। বুড়ীর ধারণা হইয়াছে যে, দেবকুমারের কোনো ত্রুটিতেই মায়ার এই দশা হইয়াছে।

দেবকুমারের তখন সে-সব কিছু লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। সে নিরঞ্জনের পিছন পিছন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

মায়া তখনও ঘুমাইতেছে মনে হইল। তবে মুখের রং আর আগের মত অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ নাই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। নবাগতা নার্সটি চুপচাপ এক কোণে বসিয়া আছে, তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই।

দেবকুমার চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মায়ার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "বিকেলে আর একবার আস্‌ব, সিবিল সার্জ্জেন ক'টার সময় আস্‌বেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সাড়ে চারটা কি পাঁচটায়। তুমি তোমার বাবাকে বোলো আজ সব কাজ দেখতে। আমি একেবারেই যেতে পার্‌ব কিনা জানি না। আজ আমার বোনকে আস্‌তে টেলিগ্রাম কর্‌ছি। শুধু 'পেড্ য়্যাটেনডেণ্টে'র উপর মায়াকে ইন্দু না আসা পর্য্যন্ত আমার কাজকর্ম্মের খুবই অসুবিধা হবে।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। নিরঞ্জন নিজের কাগজপত্র লইয়া উপরেই আসিয়া বসিলেন। দুপুর বেলাটা প্রায় একইভাবে কাটিয়া গেল। মায়া তাকাইল না বা কথা বলিল না, কিন্তু অবস্থার কোনো অবনতিও লক্ষিত হইল না।

বিকালে সিবিল্ সার্জ্জেনকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চানন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবকুমারও কয়েক

মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিল। ডাক্তার মায়াকে পরীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া সে আর ঘরের ভিতর ঢুকিল না, বাহিরেই ঘুরিতে লাগিল।

সম্প্রতি কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই, এর বেশী কিছু সিবিল সার্জ্জনও বলিতে পারিলেন না। যেমন হঠাৎ অসুখ করিয়াছে, তেমনি হঠাৎ সারিয়াও যাইতে পারে, আবার অনেক দেরি হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়। নিরঞ্জন তাঁহাকে পরের দিন আবার আসিতে বলিয়া দিলেন।

ডাক্তাররা চলিয়া গেলে, দেবকুমার নিরঞ্জনের কাছে আসিয়া বলিল, "আমাকে দিয়ে কিছু যদি কাজ হয় ত বলুন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কাজ করবার লোকের ত অভাব নেই, আগলাবার লোকেরই অভাব। ইন্দু না আসা পর্য্যন্ত, আমার দেখছি ঘর থেকে বার হওয়াই দায় হবে। তুমি যদি কয়েক ঘণ্টা ক'রে সকালে কি বিকেলে এখানে থাক, তাহ'লে সেই সময়টা আমি আপিসের কাজগুলো সেরে আসতে পারি। ইন্দু কলকাতাতেই আছে। ইংলিশ মেলে রওনা হ'লে তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।"

দেবকুমার বলিল, "যখন আপনি থাক্‌তে বল্‌বেন তখনি থাক্‌ব। এখন কি শহরে যাবার আপনার দরকার আছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এখন গিয়ে বিশেষ কিছু লাভ নেই, কাল সকালে যাব। তুমি ভোরেই চলে এস, গাড়ী পাঠিয়ে দেব। এখানে এসেই চা-টা খেও।"

দেবকুমার বলিল, "বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বেন বল্‌ছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বেশ ত। সন্ধ্যার সময় আস্‌তে পারেন।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। নিরঞ্জন একবার উপরে গিয়া মায়াকে দেখিয়া আসিলেন, তাহার পর বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন।

শিবচরণবাবু আপিসের কাজকর্ম্ম কোনোমতে চুকাইয়া সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জন তখন নীচেই ছিলেন। শিবচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার মা-লক্ষ্মী কেমন আছেন?"

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সেই একই রকম।"

শিবচরণবাবু বলিলেন, "এমন একটা আনন্দের সময় এমন দুর্দ্দৈব। আমার কপালেই এই রকম। যখনই ভাল কিছু হয়েছে, তার সঙ্গে তখনি মন্দ একটা কিছু ঘটেছে। ছেলে হয় না, ছেলে হয় না ক'রে সে কি কম আপশোষ ছিল। তা ছেলে যদি বা হ'ল, তার মা গেলেন মারা। দেবকুমারের বিয়ে এর চেয়ে ভাল কিছু কল্পনাও করতে পারিনি। তা এই সময় কি না এমন বিপদ। ডাক্তাররা কিছু বল্‌তে পারছে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না। ভাল করে জ্ঞান না হলে কিই বা বল্‌বে? কি যে ব্যাপার কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।"

শিবচরণ বলিলেন, "দেবকুমারকে অনেক রকম করে জিগ্‌গেস করলাম, সেও কিছু বল্‌তে পারল না। যাক্‌, ভগবানের কৃপায় মা-লক্ষ্মী আমার শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাল হয়ে গেলে বাঁচি। তাঁকে আজ আমার আশীর্ব্বাদ করে যাবার কথা, কিন্তু শুভকার্য্য এরকম নিরানন্দের মধ্যে করা ঠিক নয়। আজ শুধু তাঁকে দেখে যাই।"

নিরঞ্জন তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন। নার্স নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল, "একটু আগে একবার চোখ খুলে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। এখনও জেগেই আছেন।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে খাওয়ানো হয়েছে?"

নার্স বলিল, "হ্যাঁ, দুধ খাইয়েছি।"

শিবচরণবাবু বলিলেন, "চেহারা তো কিছু খারাপ হয়নি। মা-লক্ষ্মী শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবেন। যেদিন উঠে বসবেন, সেইদিনই আশীর্ব্বাদ করে যাব।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ত করবেনই। আপনার আগ্রহে তাড়াতাড়ি যদি সেরে ওঠে ত ভাল।"

তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে মায়া আর একবার চোখ খুলিয়া তাকাইল। নার্স তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছু চাই?"

শীত

শ্রীইন্দুভূষণ রক্ষিত

মায়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, মাগো', তুমি কোথায় গেলে? ও পিসীমা। চার ধারে এরা সব কারা ঘুরছে?"

নার্স তাড়াতাড়ি আয়াকে নিরঞ্জনকে ডাকিতে পাঠাইল। নিরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া মায়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মায়া, কি হয়েছে, মা? কাকে ডাকছ তুমি?"

মায়া কিছুক্ষণ অর্থশূন্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলে কোথায় গেল? তুমি কে? এটা কি হাসপাতাল?"

নিরঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নার্সকে বলিলেন, "তুমি ওকে নিয়ে বোসো। আমি আবার ডাক্তারকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি। অসুখটা খুব অপ্রত্যাশিত টার্ন নিচ্ছে।"

নার্স ঘাড় নাড়িল। নিরঞ্জন বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

আকাশের বিয়ে

আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

কপালে সিঁদুর দিয়া,
আজ বুঝি ওই ছোট নদীটির আকাশের সাথে বিয়া।
ঢেউগুলি তাই মুখর হয়ে'ছে ধানে ভরা দুই কূলে,
সোনার শীষেরে কি কথা উহারা বলিবারে চাহে খুলে।
বুনো পাখী আজ পাখা ঝাপটায় ও-পারের কাশ বনে
এ উহার ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দেয় আজ শুধু অকারণে।
ধান ক্ষেত তার সিঁথি আঁকে যেন চিকণ পথের আ'লে
বালী হাঁস শ্বেত মালা হ'য়ে দোলে ছোট্ট ঢেউয়ের তালে;
নদীর ওপারে দূর গেঁয়ো বন, কালো কাজলের মত
শেষ রেখা টানে, যেথায় চোখের দৃষ্টি হ'য়েছে হত।

আকাশ করিছে বিয়া—
আজি এ সাঁঝের নীরব আঁধারে নদীটিরে চুমো দিয়া।
মেঘের বসন রঙন রঙীন, রাঙা যে আকাশখানি
সেই রঙ আজি কে দিল ঢালিয়া নদীটির বুকে আনি।
চাঁদ সখা তার মুখ টিপে হাসে তারারা চাহিয়া থাকে
আকাশের গায় মিলন রাতের পূর্ণিমা ওরা আঁকে।
তারই হাসি দোলে নববধূটির আর্সির কূলে কূলে;
রাত্রির রাণী বাসর সাজায় সন্ধ্যা তারার ফুলে।
দূর আকাশের অধরে মিশেছে নদীর অধর সীমা
রাতের গোপন আঁধারেতে ওরা যাপে মধু চন্দ্রিমা।
ছোট্ট নদীর বুকে
আকাশের নীল ছবি ভাসে যেন নব মিলনের সুখে।

কষ্টিপাথর

বৈদ্যুতিকশক্তি সাহায্যে মৎস্যচাষ ও মৎস্যশিকার
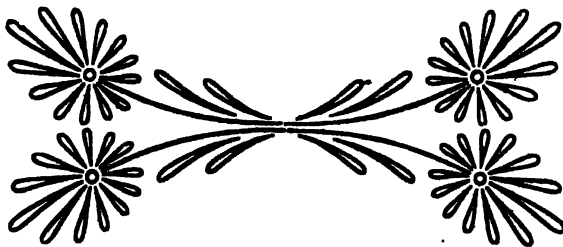
মৎস্য একটি অতীব পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। দুইটি সাধারণ কারণে এই পদার্থ দুর্ম্মূল্য হইতেছে। (১) মৎস্যবংশ সেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না; (২) মৎস্য ধরার কোন সহজ উপায় এদেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই।

সকলেই জানেন, কুম্ভীর হইতে আরম্ভ করিয়া কচ্ছপ, বোয়ালমাছ, শৈল, চিতল, গজার প্রভৃতি কতকগুলি রাক্ষুসে মাছ মাছের পোনা-দিগকে খাইয়া ফেলে। একটি রুইমাছ এককালীন একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডিম প্রসব করে। যদি সবগুলি ডিম ফুটিয়া ঐ সকল পোনা বড় হইতে পারিত, তবে সুখের অবধি থাকিত না।...

বাংলাদেশে স্রোতস্বতী বড়নদী ভিন্ন স্বল্পস্রোতা ক্ষীণকায়া নদী, বিল, পুকুর ইত্যাদির তলদেশে শেয়ালা ও ঝাঁজি নামক উদ্ভিদ প্রচুর জন্মায়। এক হিসাবে এগুলি মাছের বিশেষতঃ রুই কাতলা প্রভৃতির খাদ্য, এবং যে জলাশয়ে এইরূপ উদ্ভিদ্ আছে, তথাকার মাছ স্বল্পকাল মধ্যেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়; গ্রীষ্মকালে জল অল্প থাকিলেও এই সমস্ত উদ্ভিদের নীচে লুক্কায়িত থাকিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে উহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে। যে সমস্ত জলাশয়ে এই উদ্ভিদ নাই, তথাকার মাছ বিস্বাদযুক্ত ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে। কাজেই প্রকৃতিদত্ত এই সমস্ত উদ্ভিদ উৎপাটন করা সমীচীন হইবে না। অথচ চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী টানাজাল দ্বারা মাছধরার চেষ্টা করিলে, সমস্ত মাছ এই উদ্ভিদ্-আচ্ছাদনের নীচে লুক্কায়িত হয়, কচ্ছপাদি কাদার মধ্যে আত্মগোপন করে; অধিকন্তু সমস্ত উদ্ভিদ এত সহজে ছিঁড়িয়া যায় যে, জালের তলদেশ ভারী হইয়া পড়ে এবং জাল চলে না। তদুপরি যদিও বা কিছু পরিমাণ বড় মাছ কোনও টানাজালে আটকান গেল, জাল সঙ্কুচিত করিবার কালে উহারা উদ্ভিদের নিম্নে পলায়ন করে। কিন্তু এইখানেই অসুবিধার শেষ নহে। যদি বা কোনও বড় বোয়াল, বা চিতল, বা কচ্ছপ জালে আটকা পড়িল, প্রায়ই তাহাকে মাটিতে তোলা যায় না। উহা জাল ছিঁড়িয়া জেলেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পলায়ন করে।...তদুপরি বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হেতু জাল দ্বারা নদীতেও মাছ ধরা সহজসাধ্য হয় না। সেই নিমিত্ত বর্ষাকালে মাছ আরও দুর্ম্মূল্য হয়।

বৈদ্যুতিকশক্তিপ্রবাহ দ্বারা মৎস্য ধরিলে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধাই নাই। ইহাতে চুনোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া কুম্ভীর পর্য্যন্ত যে-কোন আকারের, বা যে-কোন ধর্ম্মের জলজন্তু একই ভাবে কবলিত করা যায়। জলাশয়ের তলদেশ সমতল, কি অসমতল, কি আগাছাপূর্ণ,—যাহাই হউক না কেন, কিছুতেই আটকায় না। তদুপরি একটা নির্দ্দিষ্ট গভীরতা পর্য্যন্ত এই শক্তি সাহায্যে সহজেই মাছধরা যায়। কাজেই বর্ষাকালেও স্বচ্ছন্দে মাছ ধরা চলিতে পারে।

একটি মোটরগাড়ীর উপর অয়েল-এঞ্জিনচালিত বৈদ্যুতিক শক্তির কল হইতে দুইটি তামার তার জলাশয় অভিমুখে গিয়াছে। একটি তার সোজাসুজি জলাশয়ের তলদেশে স্থাপিত এবং অপরটি কতকগুলি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের সহিত জল স্পর্শ করিয়া আছে। এখন, যে আয়তনের স্থানের উপর এই ভাসমান তার রহিয়াছে, সেই স্থানেই শুধু মাছ বা জলমধ্যে অন্য যে কোন প্রাণী থাক, ভাসিয়া উঠিবে। দু'খানি নৌকা এই তারের পাশে দুইখানি ছাঁকনী জাল (যাহা দ্বারা মাছ উঠাইয়া লইতে হইবে) লইয়া দুই জন লোক সহ দাঁড়াইয়া থাকে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা মাত্র জলমধ্যস্থ ও ভাসমান তারের উভয় দিকের ছয় ফুট দূরবর্ত্তী স্থানের সমস্ত মাছ ছট্‌ফট্ করিতে করিতে একেবারে জলের উপরিভাগে চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার লোকেরা উহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া লইবে। এই ভাবে ঐ ভাসমান তারটি জলাশয়ের তীর দিয়া সরাইয়া লইয়া যাইবে, ও যেমন মাছ ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে, তেমনি উঠাইয়া লইবে। এই সমস্ত মাছ যতক্ষণ বিদ্যুৎশক্তির অধীনে থাকিবে, ততক্ষণ কাহাকেও অনিষ্ট বা আঘাত করিতে সমর্থ হইবে না। পরে নৌকায় উঠানো মাত্রই তাহাদের স্বাভাবিক জীবন্তভাব ফিরিয়া আসিবে। কাজেই, নৌকাতে তাহাদিগকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে হইবে। দুই মিনিটের অধিককাল একই স্থানে ভাসমান তারটি দ্বারা বিদ্যুৎচালনা করিলে, অথবা ঐ সমস্ত জলজন্তু নৌকায় না উঠাইলে উহারা আর নিজ শক্তিতে ভাসমান থাকিতে পারিবে না; অজ্ঞান অবস্থায় জলতলে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলে আধঘণ্টার মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা কোনও মাছ না তুলিতে পারি, তাহা তবু নষ্ট হইবার, বা মরিয়া যাইবার ভয় নাই। অধিকন্তু যদি কোনও ভয়ানক জলজন্তু ভাসিয়া উঠে, যেমন কুম্ভীর, আমরা তাহাকে গুলি করিয়া, বা বর্শায় বিঁধিয়া বা দুই মিনিট পরে ডুবিয়া গেলে আরও বিদ্যুৎ চালাইয়া মারিয়া ফেলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত ভাসমান অবস্থায় ঐ ভাসমান তার হইতে একটি তার তাহার গাত্রে সোজাসুজি সংলগ্ন করিয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিবে। এই উপায়ে আমরা মৎস্যকুলের পরম শত্রু কুম্ভীরবংশ বিনাশ করিতে পারি। তদুপরি রাক্ষুসে মাছ, বা কচ্ছপাদিকে অন্যান্য মাছের সহিত তুলিয়া লইলে তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন কম হইতে থাকিবে। মাছতোলার পর ইচ্ছামত বৃহৎ মৎস্য বাছিয়া রাখিয়া ক্ষুদ্রতর মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া দিতে পারি। জাল দিয়া ধরা অপেক্ষা এই উপায়ে দশ হইতে বার গুণ অধিক মাছ একই সময়ে ধরা যায়।...

ইহা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। অবশ্য এই ব্যবসায়ের পরিচালক একজন সুদক্ষ ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার হওয়া দরকার এবং তাঁহার দুইজন সহকারীও খুব সাবধানী লোক হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত কলকব্জার মূল ঐ বৈদ্যুতিক 'ডায়নামো'টা ৬০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন কোনও মোটরলরীর এঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত করিলেই চলিতে পারে। অনেক সময় কলিকাতার বাজারে পুরাতন মোটরগাড়ীর এঞ্জিন ২০০|৩০০৲ টাকায় পাওয়া যায়। ডায়নামো ও তাহার সরঞ্জাম ইত্যাদিতে ৩০০০৲ পড়িবে। নৌকা ও অপরাপর ছোটখাটো সাজসরঞ্জামীতে ৫০০৲, এবং ঐ সমস্ত চালাইতে আরও ৫০০৲, মোট এঞ্জিনসহ ৪২০০৲ বা ৪৫০০৲ টাকা হইলেই এই প্রণালীর সমস্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ হইতে পারে।...জার্ম্মানীতে এই প্রণালীর দ্বারা মাছের চাষ হয়।

[প্রকৃতি—আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৭] শ্রীকিরণচন্দ্র বাগচী

কবীর সাহেবের জীবনী ও বাণী

আচারী সম্প্রদায়ের চতুর্থ (কারো কারো মতে ৫ম বা ৬ষ্ঠ) গুরু হন রামানন্দ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে প্রয়াগে দ্রবিড়ী ব্রাহ্মণবংশে রামানন্দের জন্ম হয়; তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল রামদত্ত; গুরুদত্ত নাম রামানন্দ।...

গুরু রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের নাম রাখ্‌লেন "অবধূত" অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত। গুরু রামানন্দ বাস্তবিক গুরু নামের যোগ্য; তিনি সত্যভ্রষ্ট পতিতপাবন ছিলেন এবং গুরু রামানন্দের নীচ জাতীয় শিষ্যগণ স্ব স্ব জ্ঞান ভক্তি ও চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষকে পবিত্র ক'রে রেখেছেন। গুরু রামানন্দ এইরূপে ভারতে জাতীয় একতার মূল ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হয়েছেন কবীর। কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী আছে। তন্মধ্যে বহুপ্রচলিত জনশ্রুতি এই—কবীর কাশীর এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণ-কন্যা আপনার কলঙ্কচিহ্ন সদ্যজাত পুত্রকে কাশীর লহর তালাব নামক পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেন। প্রভাতে নিমা-নাম্নী একটি জোলা-জাতীয়া স্ত্রীলোক ও তার স্বামী নিরু বা নুর আলী ঐ স্থান দিয়ে বিবাহের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল'। নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ঐ সরোবরে জলপান কর্‌তে গিয়ে দেখলে কমলপত্রে কোন্ কলঙ্কিনীর লজ্জা ও স্নেহবেদনার ধন সদ্যজাত শিশু ভাস্‌ছে। শিশুর "সুন্দর মুরত মোহন মুরত কমল-নৈন" (সুন্দর শ্রী মোহন মূর্ত্তি ও কমল-নয়ন) দেখে মুগ্ধ ও স্নেহার্দ্র হয়ে নিঃসন্তান নিমা ঐ শিশুকে তুলে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।...

১৪৫৫ সংবতে (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের সোমবারে পূর্ণিমা তিথি বর্ষাকালে প্রকট হয়েছিল, তখন মেঘ ডাকছিল, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল', বৃষ্টি পড়্‌ছিল, ঝড় হচ্ছিল। এমন সময়ে লহর-পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল কমলের মধ্যে কবীর-ভানু প্রকাশিত হয়েছিলেন।

লৈহর তালাব-মে কমল খিলে
তাঁহা কবীর-ভান প্রকাশ ভয়ে।

...জোলা-দম্পতী শিশুকে গৃহে এনে নিজের পুত্রবৎ পালন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁরা শিশুর নামকরণের জন্য একজন কাজীকে ডেকে আন্‌লেন। কাজী এসে কোরান্ খুলতেই তাঁর দৃষ্টি পড়্‌ল কবীর শব্দের উপর। শিশু সেই নামেই পরিচিত হলেন।

কবীর আরবী শব্দ; তার অর্থ মহান্, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। কবীরের পালক পিতা নিরু সেখের প্রতিবাসী প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। বালক কবীর হিন্দু বালকদের সঙ্গেই খেলা করতেন। তাঁর খেলা ছিল ভগবৎপূজন ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন। হিন্দু বালকদের সংসর্গে তিনি ভগবানের ভারতবর্ষীয় ভাষার নামই কীর্ত্তন করতেন।...

কবীর জাতে জোলা ব'লে লোকে তাঁকে উপহাস কর্‌ত। তার উত্তরে কবীর বলেছিলেন—

কবীর তেরে জাত কো সব-কোই হাসনহার
বলিহারী ওয়া জাত্‌ কো জো সিমরে সৃজনহার।

ওরে কবীর, তোর জাতের জন্যে সবাই তোকে উপহাস করে। বলিহারী ঐ জাতের যে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। কারণ স্বয়ং ভগবান একজন মহাতাঁতী—

ধরণী আকাশ-কী কারগাহ্‌ বানায়ী।
চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী।

ধরণী ও আকাশকে কারখানা বানিয়ে তিনি চন্দ্রসূর্য্য দুই মাকু হরদম চালাচ্ছেন।...

কবীর প্রত্যহ একখানি মাত্র বস্ত্র বয়ন করতেন। এবং সেই বস্ত্র বিক্রয় ক'রে যা পেতেন তা থেকে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রেখে বাকী অর্থ দরিদ্র সেবায় দান করতেন।...

কবীর সহজ ভক্তি ও নির্ম্মুক্ত জ্ঞান লাভ করলেও একজন সৎগুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন।...

কবীর রামানন্দের খ্যাতি শুনেছিলেন। কবীর তাঁর শরণাপন্ন হলেন।...

ব্রাহ্মণ রামানন্দ স্বচ্ছন্দে মুসলমানকে শিষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন একথা মেনে নিতে ছুঁৎমার্গী জাতওয়ালাদের মনে লাগে। তাই তারা গল্প রচনা করেছে যে রামানন্দ কবীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। কবীর অগত্যা গভীর রাত্রে রামানন্দের বাড়ীর দরজায় গিয়ে শুয়ে রইলেন; প্রত্যূষে রামানন্দ গঙ্গাস্নানে যাবার জন্য বাহিরে পা দিতে গিয়ে কবীরের গায়ে পদার্পণ করেন। অজ্ঞাতসারে একজন লোকের গায়ে পা দিয়ে সঙ্কোচে রামানন্দ বলে ওঠেন "রাম রাম!" এই গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক রাম-নাম উচ্চারণকেই কবীর রামানন্দের মন্ত্রদীক্ষা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কবীর ভগবানকে রাম (আনন্দময়), প্রভু, সাঁই (স্বামী), আল্লা, খোদা (স্বধা বা আত্মপ্রতিষ্ঠ), পুরা সাহব (অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম), অনগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত বা স্বয়ম্ভূ দেবতা) প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। যিনি নাম-রূপের অতীত সকল নাম-রূপ তাঁরই, এ-কথা কবীর বুঝেছিলেন।...

তাই কবীর বারম্বার বলেছেন—

অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
রাম রহীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কাশী কাবা এক হ্যায়, একৈ রাম রহীম।
ময়দা এক, পকবান বহু, বৈঠি কবীরা জীম॥

অলখ ইলাহী, রাম রহীম, কৃষ্ণ করীম, কাশী কাবা সব এক,—একেরই দুই নাম। যেমন ময়দা এক, কিন্তু ময়দা দিয়ে বহু পকান্ন প্রস্তুত করা হয়, তেমনি। এই কথা জেনে কবীর স্থির হয়ে বসেছেন।...

যো খোদায় মস্‌জিদমে বসতু হ্যায়
আউর মুলুক কেহি কেরা?
তীরথ মুরত রাম-নিবাসী
বাহর করে কো হেরা।

যদি খোদা কেবল মসজিদেই বাস করেন, তবে অন্য দেশগুলো কার? তীর্থের মধ্যে ও মূর্ত্তির মধ্যেই কেবল আনন্দময় বাস করেন? তবে বাহিরটাকে দেখে কে?...

কবীর লেখাপড়া জান্‌তেন না; কিন্তু তিনি সহজ জ্ঞানের ও মুক্ত বুদ্ধির বলে গভীর তত্ত্ব শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিত্ব প্রকাশ করে গেছেন।...

কবীরের সময়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্ম্মমতের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়্‌ছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা, তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামির জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন। এই অতি কঠোর নিয়মের গণ্ডীতে সমাজের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। এই সময় রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত ক'রে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করবার মহৎ চেষ্টা করেছিলেন।

কবীরের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধু ভক্তের জীবনের উপর পড়েছে দেখা যায়। আহ্‌মদাবাদের দাদু কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক কবীরপন্থীর শিষ্য হয়েছিলেন। কাশীনিবাসী তুলসীদাসের উপরও তাঁর প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তুলসীদাস অধিক হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কবীরের মিত্র ছিলেন ভক্ত সাধু রইদাস্ চামার। বৃন্দাবনবাসিনী মীরা বাঈ কবীরের ভক্তির কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরু নানক দেশপর্য্যটনে বাহির হয়ে কাশীতে এসে কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখ গ্রন্থসাহেব কবীরের বাণীতে পূর্ণ। গুরু নানকের প্রচারিত শিখ ধর্ম্মকে কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের ছায়া ও শাখা বলা যেতে পারে। ঐ দুই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মসমন্বয় ও উভয়কে একই ভূমিকায় মিলিত করা এবং একেশ্বরবাদ ও সর্ব্ব মানবের একজাতিত্ব প্রচার। অযোধ্যার জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মালব দেশের বাবালাল বাবালালী সম্প্রদায়, বীরভান সাধুসম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কবীরের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করে গেছেন। এঁদের সকলের উপদেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম্মের সমন্বয় হয়েছে দেখা যায়। এই-সব সাধু মহাত্মাদের চেষ্টাতে উত্তর-ভারতের হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার যে কত কমেছে তা দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়।...

মনকে নির্ম্মল পবিত্র ঈশ্বরপরায়ণ না ক'রে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান পালনকে কবীর নিন্দা করেছেন।

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া গলে লপটে সুত।
ভক্তি ভাবকা মরম ন জানে য্যায়সা জঙ্গলী ভূত।

ব্রাহ্মণ হলো তো কি হলো, কেবল গলায় সুতাই লেপ্টাল; ভক্তি-ভাবের মর্ম্ম সে জানে না, এমনি সে জঙ্গলী ভূত।...

তীরথ-মে তো সব পানী হৈ,
হোবৈ নহী কছু ন্হায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নহি বোলায় দেখা॥

তীর্থ তো কেবল জল, আমি স্নান করে দেখেছি তাতে কোনো ফল হয় না। প্রতিমা সকল তো জড় মাত্র, ডেকে দেখেছি সাড়া দেয় না।

পুরান কোরান সব বাত হৈ
যা ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈ
সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা॥

পুরাণ কোরান সব তো কেবল মাত্র কথা, তাদের পর্দা খুলে আমি তাদের আসল রূপটি দেখে নিয়েছি। কবীর কেবল অনুভব-করা কথা বল্‌ছেন—আর সব মিথ্যা ভুল, তা তো অনুসন্ধান করে দেখা গেছে।...

মুসলমানেরা কবীরের ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার কাছে নালিশ করলে। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন সিকন্দর শা লোদী (১৪৮৮-১৫১৭)। ১৪৯৫ সালে সিকন্দর শা কবীরকে গেরেপ্তার করিয়ে জৌনপুরে দরবারে হাজির করলেন। কবীর সেখানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু রাজাকে সেলাম করলেন না। তোষামোদকারী সভাসদেরা বল্লে—আরে কাফের, রাজা শ্রেষ্ঠ পীর, তাঁকে সেলাম করছ না কেন?

তখন কবীর বল্লেন—

কবীর তেই পীর হ্যায়, যে জানে পর-পীর
জো পর-পীর ন জান হী, তে কাফের বে-পীর॥

হে কবীর, তিনিই পীর যিনি পরের পীড়া বা বেদনা অনুভব করেন; যে ব্যথিত-বেদন অনুভব করতে পারে না সে ব্যক্তি কাফের।

তখন বাদশাহ্ কবীরকে প্রশ্ন করলেন—তুমি হিন্দু না মুসলমান? কবীর উত্তর দিলেন—

হিন্দু কহঁ তো ম্যায় নহীঁ, মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলা গৈবী খেলে মাহিঁ॥

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতাত্মক পুত্তলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের খেলা চলেছে।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হঁ মসীত।
দাস কবীর তহাঁ ধ্যাবহী জহাঁ দোনকী পরতীত॥

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে, মুসলমান মস্‌জিদে। দাস কবীর সেইখানে ধ্যান করে যেখানে দুজনেরই প্রতীতি।...

সিকন্দর লোদী শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।...

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে গৃহস্থের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

কবীর এই লক্ষণান্বিত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন।

কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ; তিনি ছিলেন বনখণ্ডী বৈরাগীর পালিতা কন্যা। তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন।...

কবীর হাটে কাপড় বেচে বাড়ী আস্‌ছিলেন। সন্ন্যাসী কবীরের ছেলে হয়েছে শুনে তাঁর প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ মোল্লা সবাই মিলে হাটের পথে এগিয়ে গিয়ে বিদ্রূপ করে কবীরকে বল্লে—কবীর, তোমার ছেলে হয়েছে। তারা ভেবেছিল কবীর এই সংবাদে লজ্জা পাবেন, কিন্তু কবীর ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্ন মুখে এই সুন্দর বাণী উচ্চারণ করলেন—

অনহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো মঙ্গল থার।
ঘর-আংগন-কী কদর ভঈ হৈ রাহ্ ভৈ গুলজার॥

অসীম পথের পথিক অতিথি হয়ে এসেছেন, মঙ্গল-থালা ধরে তাকে বরণ করি। আজ আমার ঘর ও অঙ্গনের আদর বাড়ল, আর পথ হলো ফুলের বাগানের মতন উজ্জ্বল শোভাময়।

জনম-মরণ-মেঁ কদম তুম্হারা অবস ভয়া হৈ কাল।
মেরা ঘর-মেঁ ডেরা লগায়া পায়া হৈ হম্ কমাল॥

হে অসীমের মহাযাত্রী আমার পুত্র, জন্ম-মরণে ক্রমাগত তোমার দুই পদক্ষেপ চলেছে, মহাকাল অবশ হয়ে ক্ষণকালের জন্য তোমাকে স্থির করেছে। তুমি আমার ঘরে ক্ষণিকের আশ্রয় নিয়েছ। আমি কমাল বা পরিপূর্ণতাকে পেয়েছি।...

কমাল পিতার সাধনার ধারা নিজের সাধুজীবনে বহন করে অগ্রসর ক'রে নিয়ে গেছেন। এখন কবীরপন্থীদের সংখ্যা ৪০।৫০ হাজারের কম নয়।

কমালের পরে কবীরের একটি কন্যা জন্মে। কবীর তাঁর নাম রাখেন কমালী।

কমালী একদিন কূপ থেকে জল আন্‌তে গিয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে কমালীর হাতের জলের ছিটা লাগে। ব্রাহ্মণের কলসী ছুঁৎ হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে কবীরের কাছে নালিশ করে। কবীর সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন—

পণ্ডিত বুঝ পিয় তুম পানী।
তোহে ছুত কহাঁ লপটানী?
জা মাটিকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী॥

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝে সুঝে জল খেয়ো। এই জলে কোথা হতে ছুঁত লাগ্‌ল? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো সেই মাটির সঙ্গে সকল পৃথিবীর মাটির তো সংযোগ রয়েছে।…

এইরূপে পণ্ডিত ও মোল্লা উভয়কে তিরস্কার করে তিনি সকলকে দেশকালাতীত সত্য সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং দেশের সকল লোককে দেশকালের সংস্কার থেকে মুক্ত স্বাধীন নির্ম্মলা বুদ্ধিতে সব কিছুকে বিচার করে দেখ্‌তে বলেছিলেন।…

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহিমানা।
আপস-মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ, মরম কোই নাহি জানা॥

হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে আমার রহিম; পরস্পর দুজনে লড়াই করে মরছে কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বটি কেউ বুঝ্‌ল না।…

কবীর প্রাণের জ্বালা জুড়াবার মতন লোকের সন্ধানে তিব্বত আফ্‌গানিস্থান তুর্কিস্থান খোরাসান বাল্‌খ্‌ বুখারা ইরাণ প্রভৃতি বহু দূর দূরান্তর দেশ পর্য্যটন করেন। অবশেষে গোরখপুরের নিকটে হিমালয়ের পাদমূলে মগহর গ্রামে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানেই নির্জ্জনবাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত কর্‌বার সঙ্কল্প করেন।

কাশীতে মর্‌লে শিব হয় বলে লোকের যেমন ধারণা, তেমনি অন্ধবিশ্বাস আছে যে, ব্যাসকাশী ও মগহরে মানুষ মর্‌লে পর-জন্মে গাধা হয়। তাই কবীর কাশী ত্যাগ ক'রে মগহরে বাস কর্‌বেন স্থির কর্‌লে তাঁর শত্রুরা যেমন খুশী হয়েছিল ভক্ত শিষ্যগণ তেমনি দুঃখিত হয়েছিল।

কবীর ভক্তদের এই বলে বোঝালেন যে—হাম্ মুফ্‌ত্ মুক্তি নেহি লেঙ্গে—আমি বিনামূল্যে মুক্তি নেবো না। ভগবানের সাধন ভজন না করে কেবল কাশীতে দেহত্যাগ করে স্থানমাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি ভগবদ্‌ভক্তি থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে আমি মগহর থেকেই মুক্তি আদায় করে নেবো।…

মগহরে কিছুদিন বাস করার পর কবীরের দেহ অপটু হয়ে এল। তখন তিনি বুঝ্‌লেন যে, তাঁর দেহের বিনাশ আসন্ন হয়ে এসেছে।…

কবীর আমি নদীর তীরে পুষ্পশয্যায় শুয়ে শেষ গান গাইলেন—
গাউ গাউরী দুলহনী মঙ্গলচারা।
মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভতারা॥

হে কন্যাযাত্রিণী সখীগণ, তোমরা আমার বিবাহের মঙ্গলাচার গান কর। আমার ভর্ত্তা রাজা রাম আমার গৃহে এসেছেন।…

কবীর নিজের শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করে বিদেহ হয়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সৎকার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ লাগ্‌ল—হিন্দুরা বলে কবীর ছিলেন হিন্দু, তাঁর দেহ দাহ করতে হবে; মুসলমানেরা বলে কবীর ছিলেন মুসলমান, তাঁর দেহ সমাধিস্থ করতে হবে। কিম্বদন্তী আছে যে, বস্ত্রাচ্ছাদন অপসারণ ক'রে দেখা গেল কবীরের দেহ অন্তর্দ্ধান করেছে, কেবল কতকগুলি ফুল প'ড়ে আছে। সেই ফুল ভাগ করে নিয়ে কতকগুলি ফুল হিন্দুগণ কাশীতে নিয়ে গিয়ে দাহ করে এবং বর্ত্তমান কবীর-চৌরা নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করে; এবং অর্দ্ধেক ফুল মুসলমানেরা নিয়ে সেই মগহরে কবর দিয়ে রাখে। সেইজন্য কাশীর কবীর-চৌরা ও মগহর উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থ হয়ে আছে।…

ঐতিহাসিকদের মতে কবীরের জন্ম ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর মৃত্যু ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে। কবীর জন্মান্তর বিশ্বাস কর্‌তেন। তিনি জন্মমৃত্যুকে বলেছেন ঝুলন বা দোলা আর মৃত্যুকে বলেছেন প্রিয় পতির সহিত মিলনের জন্য যাত্রা এবং জীবন হচ্ছে বিরহের অবস্থা।…

ঈশ্বরের সহিত ভক্তের যোগকে কবীর পতির সহিত সতীর মিলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে মিলন শুধু দুজনের; প্রগাঢ় মিলনের আনন্দ অপরকে লিখে বা বলে বুঝান যায় না, এবং সেই আনন্দ-মিলনের কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাইরে পড়ে থাকে।

লিখা লিখীকী বাত নাহি হৈ, দেখা-দেখিকী বাত।
দুলহা দুলহিন মিলি গয়ে, ফীকি পরী বরাত॥

লেখালিখির কথা নয়, কেবল মাত্র অনুভবগম্য ঐ মিলন—বর আর বধূ মিলে গেল, আর বরযাত্রীরা সব নগণ্য হয়ে পড়্‌ল।…

কবীরের জন্ম-মৃত্যুর ঝুলন কবিতাটি অতি চমৎকার সুন্দর, কিন্তু দীর্ঘ। তারই কয়েকটি কলি এখানে উদ্ধৃত করি—

গ্রহ চন্দ্র তপন জোত বরত হৈ
সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন্নমেঁ
কহৈ কবীর পিউ গগন গাজৈ।

সূর্য্য গ্রহ চন্দ্র তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী;
শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐক্যতান নৌবতে,
কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি।

কবীরের কাছে জীবন হচ্ছে মৃত্যুর সাধনা—যাকে Plato বলেছেন—a practice of dying। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কবীরের একটি অমৃতময়ী বাণী উদ্ধৃত করে কবীর-পরিচয় শেষ করি—

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো,
মৈঁ কেহি বিধি কহৌঁ গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ
বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো॥

তিনি এমনও নন তিনি তেমনও নন; কেমন করে আমি সেই গভীর কথা বলব গো? যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্বজগৎ লজ্জা পায়; যদি বলি তিনি বাহিরে তবে যে সে কথাও মিথ্যা হয়।

বাহর ভীতর সকল নিরন্তর
চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর
বাতন কহা ন জাঈ লো॥

বাহির ভিতর সকলের মধ্যেই নিরন্তর হয়ে তিনি বিরাজ করছেন, চেতন অচেতন দুটি তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নন প্রচ্ছন্নও নন, তিনি প্রকটও নন অগোচরও নন বাক্যে যে তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না।

(শতদল, চৈত্র, ১৩৩৬) শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ীর ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাটমন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তার উপর। প্রাচীন আমলের বড় জাজিম ও সতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানা, কাঁচের সেজ ও বাতির ডুম টাঙানো, দেবদারু পাতার ফটক-বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশে আশীষবাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর আসিবে। বরের গ্রাম এই নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও অঞ্চলের নাকি বড় গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বেলা পাঁচটা বাজিলে বরপক্ষের দুজন লোক আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা জানাইলেন বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, সন্ধ্যার পরও হইতে পারে, নানা কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রওনা হইতে পারা যায় নাই, অন্য সব বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয়. রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখচি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন। প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, সারা দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * *

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেচে বুঝি? উঃ রাত অনেক হয়েচে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে, সে বিস্ময়ের সুরে বলিল,—কি—কি—প্রণব - কিছু হয়েচে নাকি?

উত্তরের পরিবর্ত্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল ছল চোখে তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল,—ভাই, আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমায় বিয়ে কর্ত্তে হবে, আর সময় বেশী নেই, রাত খুব অল্প আছে আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলে অপু এত অবাক্ হইত না।

প্রণব বলে কি!···প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে!·· এই সময় দু'জন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয়নি, তবুও আপনার কথা সব পুলুর মুখে শুনেচি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বল্‌চি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে-পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি?

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পরে বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোকজনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাজরমুখো

সেকেলে বড় পাল্কীতে উঠাইয়া বাজনা বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা আদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরের বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ীর উঠানে পাল্কীখানা আসিয়া পৌছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও!!

সে কি বেজায় চীৎকার!

একমুহূর্ত্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চীৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্ত্তা স্বয়ং দৌড়াইয়া গেলেন, বরপক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক, প্রজারা অবাক্, গ্রামসুদ্ধ অবাক! সে এক কাণ্ড! চক্ষে না দেখিলে বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠানি জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয় কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের শূদ্র ভদ্র সকলে উপস্থিত, সকলের সাম্‌নে—বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও কিছু নয়, ও রকম হইয়া থাকে···কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে ধামা চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে বরের একটু সামান্ত ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময়ে যে থাকে তাহা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে স্বরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় মামীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও-পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে, সকলের বহু অনুনয় বিনয়েও এই তিন চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি এমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙিতেও সাহস করে নাই। অপর্ণাও এম্‌নি মেয়ে, সবাই জানে মা তাহার গলায় যদি সত্যই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনো টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্তভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হ'লেই ও মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এ সব দিকের গতিক তো জানেন না, দো-পড়া হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?···আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর, ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী!···এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া আর এ অঞ্চলে ও মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

প্রণব বলিল, শুনুন ভাদুড়ী মশাই, আমার বন্ধুকে আমি জানি ভালো করেই। আমি বলচি আমার বোনের যদি খুব শিবপূজোর জোর থাকে, তবেই এর মত স্বামী পেতে পারে, নয় তো নয়—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি, মাতামাতি··· মাথার মধ্যে যেন চৈতন্তদেবের নগর সংকীর্ত্তন স্বরু হইয়াছে!···এ কি সঙ্কটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন!···এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেল—আবার এক বৎসর ঘুরিতেই একি! বিবাহের উপর তাহার একটা দারুণ বিদ্বেষের ভাব আছে, মনে মনে সে বিবাহকে ভয়ও করে।

মেয়েটির মুখ মনে হইল···আজই সকালে দিঘীর ঘাটে তাহাকে দেখিয়াছে···কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহারই অদৃষ্টে উৎসবের দিনে এই ব্যসন!···তাহা ছাড়া রাম-দা এর কাণ্ডটা ··

সে বলিল 'চল ভাই, যা করতে বল্‌বে, আমি করবো, এস।

নীচে কোথাও কোনো শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া দিয়াছে, বরপক্ষ এবাড়ী হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইঁহাদের সরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন, এবাড়ীর ঘরে ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরের উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দু-চারজন লোক জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য্য এই যে সম্প্রদান সভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসন-খানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

***

এসব ঘটনাগুলি পরবর্ত্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, যতই তুচ্ছ হোক্, গভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন— সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির বাঁটটা বাঁশের— অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল।

রেশমী-চেলী-পরা সালঙ্কারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ শাঁক বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান সভায় চারিধারে গোল করিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলী পরিল, নতুন উপবীত ধারণ করিল, কলের পুতুলের মত মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রীআচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মত সে-ও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, ব্যাপারটা কি ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যেন সে সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শির্ শির্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে,—না—ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নীচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মামী-মা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ীর আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপুজোর জোর ছিল বড়বৌ, তাই এমন বর মিল্‌লো। ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেচে।...

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দুটী নত করিয়া আছে, অপু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটীর মুখে ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন ভঙ্গিটি একচমক দেখিয়াই এত সুঠাম ও সুন্দর মনে হইল। দেবী প্রতিমার মত রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু-এক গাছা কানের আশে পাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুল আলো পড়িয়া জ্বলিতেছিল। মুখশ্রীর পবিত্রতা মনে একটা আনন্দের ভাব জাগাইয়া তোলে।

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে এক-জনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন, একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর ভাগ্যে কখনও জোটে নাই—কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনা বরকে দেখিয়া এবং তাহার কথা ও গলার স্বর শুনিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড় মামী-মা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে বোধ হয় বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁর অমন রাশ-ভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে যখন নিজে বরকর্ত্তার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—

বড়-বৌ, কি কর পাগলের মত, দোর খোল, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অটল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেচি, তখনই আমার মন যেন বলেচে এ আমার আপনার লোক—ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেচে গিয়েচে কিন্তু এত মায়া কারোর ওপর হয়নি কখনও—ভেবে দ্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এবাড়ী না আস্‌তো—

পূর্ব্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি করে হবে মা, ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েচেন, ও ছেলেকে যে আজ এখানে আস্‌তেই হবে মা—

প্রণবের মামী-মা বলিলেন—আবার যে এমন ক'রে কথা বল্‌বো তা আজ দুঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে—যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারও চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতিকষ্টে উদ্গত অশ্রুজল চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রণবের মামী-মার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন···মায়ের পরই বোধ হয় এমন আর কাহার উপর··কেবল আর একজন আছেন তিনি মেজো বৌরাণী—লীলার মা।

তাহা ছাড়া মায়ের উপর তার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানে যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না।···যাক্ সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নতুন জামাই খুব ভাল গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন, বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, না সে পারে ভাল করিয়া বসিয়া কাহারও দিকে চাইতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা। মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারি সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠান্‌দি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাত্‌নি, তোর বর ভেবেচে, ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর?···সে আবার কার বর?···এই যে সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয়?···স্ত্রী···তাহারই স্ত্রী? কথাটা এখনও যেন সে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না, সবটা মিলিয়া যেন একটা স্বপ্ন বা একটা বড় ঠাট্টা।···

পরদিন সকালে পূর্ব্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তর তর্ক, ঝগড়া, শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুয্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মামাকে বলিল—ওসব বড়লোকের মুখ্যু জড়ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্ব্বকে কত বড় মনে করি!··· একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেচি আজ তিন বছর ধরে—কি পড়াশুনোর টান, আর কি ভয়ানক খাটুনি খাটছে—ওকে একটা সত্যিকার মানুষ বলে ভাবি—অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। সে রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের চারিধারে ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাসরের রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় নাই আদৌ—আজকার রাত্রে তাহার সঙ্গে আলাপের সুবিধা ঘটিবে, তাহার সম্বন্ধে সব কথা জানা যাইবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী?…স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল, তা যেন এ নয়…কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতি কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে বসো—

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্য-ধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামী-মা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া ঝকিয়া নীচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটুখানি হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ, তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটি—কি রং!…কি গ্রীবার ভঙ্গি! চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া একগ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে, সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েচে—না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝ্‌তে পেরেচি ভারি কষ্ট হয়েচে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন!…অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্ব্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এরকম তো কখনো হয় নাই!…

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর।

অপু বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না? ইয়ে—এখানেই তো শোবে?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোয়া—সেটা কি ভাল দেখাইবে? কেমন যেন বাধবাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি ভেবেছিলে?…মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন?…সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েচে—কেন বলুন না?…কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম! কি অপূর্ব্ব রোমান্স এ!…ইহার অপেক্ষা কোন্ রোমান্স আছে আর জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে!…জীবনের, জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয়!…তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়…ঘরের হাওয়া যেন…ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না…বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম, না? আস্‌চি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ীর লোকে এখনও ঘুমায় নাই, বৌভাত কাল এখানেই হইবে, নীচে তাহারই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচুর শাক কুটিতেছে, রান্না কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে, সেখানে এত রাত্রে পানতুয়া ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে খানিকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে, এ দুদিন যে কি ঘটিতেছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য, জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ সময় কোথায়?···মায়ের যে বড় সাধ ছিল··· মনসাপোতার বাড়ীতে শুইয়া শুইয়া কত রাত্রে সে-সব কত সাধ, আশার গল্প···মায়ের সোনার দেহ কোদ্‌লা-তীরের শ্মশানের চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল···মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন্ উৎসব···

তপ্ত আকুল চোখের জলে চারিদিক ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্ব্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

(২০)

কলিকাতার কর্ম্মকঠোর, কোলাহল-মুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য গত শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদীতীরবর্ত্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাড়ীর রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা?···

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নীচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ করে থাক্‌লে হবে না, তুমি যদি বলো আস্‌বো, নৈলে আস্‌বো না, সত্যি অপর্ণা। বলো কি বল্‌বে?

মেয়েটি লজ্জারক্তমুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে? মা রয়েচেন, বাবা রয়েচেন, ওঁদের—আপনি ভারি—

—বেশ, আস্‌বো না তবে। তোমার নিজের যদি ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেচি?

—তা হ'লে?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আস্‌তে, আস্‌বেন—না হয় আস্‌বেন না, আমার কথায় কি হবে?···

ও কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতূহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই, যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘির মোড়ে একজন ফিরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব।···মেয়েটির মাথার চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়।···

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির মুখখানি কি রকম যেন?···ভারী সুন্দর মুখ—কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতার চোখদুটির ভঙ্গী অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের

সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দুটি চোখে, পরে কপোলে···তারপরই যেন সারামুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে···ভারী সুন্দর দেখায় সে সময়···তারপরই আসে সে অপূর্ব্ব সুন্দর হাসিটি···ওরকম হাসি আর কারুর মুখে অপু কখনো দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল—না—কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আসে অতি অল্পক্ষণের জন্য—আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায়। অপর্ণা—কেমন নামটি?···

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন তাঁর কোন্ পুণ্যে এরকম তরুণ দেবতার মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই, কলিকাতায় একা থাকিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশী হইল, হাসিয়া বলিল—তবুও তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূর!···না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম, সেটা গেল যখন ছিঁড়ে ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়ীতে নিয়ে যেতে, তার আগে আস্তে পারলে না—আচ্ছা, সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো?

—ওঃ—সাক্ষাৎ এ্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ার্!···ঢের ঢের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর মত—

কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে—অপর্ণা?···অপর্ণা কিছু বলে নাই?··· হয়ত কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না?···

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপর মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁহার মনে ধারণা প্রণবই তাহার মামীমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই, চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে?··· কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল। কেনারাম মুখুয্যের ভাইটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল, অপর্ণাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন সব গোলমাল হইয়া গেল, সারা রাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন আবার একটু হুঁস্ হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমার বিয়ে হ'ল না?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই···বাড়ি ফিরিবার পথেও তার মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ!··ঘরে তালা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস্ কেন, হাস্‌বার কি আছে? পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয়নি, সে বেচারীর আর দোষ কি? ও নিয়ে হাসি ভাল লাগে না।

দিন যাইতে লাগিল, অপুর লাইব্রেরীর পড়াশোনাতে আর তত মন নাই। ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, গ্রহনক্ষত্রের কথা এসব ছাড়িয়া আজকাল সে কেবল বাংলা উপন্যাস পড়ে—বিশেষ করিয়া যে-সব উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত প্রণয়ের কথা বেশী। দেখিল, তাহার মত বিবাহ নাটক নভেলে অনেক ঘটিয়াছে, অভাব নাই। বড়লোক শ্বশুর দরিদ্র জামাই, স্ত্রীও যেন তত মানে না, অভিমানে স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, স্ত্রীকে পত্র লিখিল দূর দেশ হইতে—'আবার যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হইতে পারি' ইত্যাদি। ওগো নিষ্ঠুর, ওগো প্রিয়তম, তুমি যে অভিমান করিয়া চলিয়া গেলে, তুমি কি একটিবারও ভাবো নাই যে—ইত্যাদি। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—বহুদিন পরে স্বামী আসিয়াছে—পা টিপিয়া টিপিয়া সঙ্গোপনে স্ত্রীর শয্যার পার্শ্বে···স্ত্রী সব সময়ই যেন অপর্ণা, স্বামী সব সময়ই সে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে সে যে বেশ ছিল, এ কোন্ সোনার শিকল তাহার মুক্ত

বন্ধনহীন হাতে পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে ?

পূজার সময় শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিল না। একে তো অর্থাভাবে সে নিজের ভাল জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ী হইতে পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারী বাধবাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পূজার সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে একটা ভাল চাকুরি-বাকুরী যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনে কোনো ভদ্রসন্তানের চলিতে পারে না, বিশেষতঃ সে যখন বিবাহিত। এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জ্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে...এম্‌নি ধরণের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারে ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুয্যের ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

শীতকালে বার-তিনেক লোক আসিল, অপর্ণার মা কাঁদাকাটা করিতেছেন, (অপর্ণা কি করিতেছে সে সম্বন্ধে সকলে একেবারে নির্ব্বাক) কিন্তু সে সময় অপুর দোষ ছিল না, ছুটি চাহিয়াও সে পাইল না।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্ব্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবীতে তাহাকে ভাল মানায়, না এই তসরের কোটটাতে ?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি, অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ীর বাহিরের উঠানে পা দিতেই কে পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্ত্তে বাড়ীর উপরের নীচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়ীতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে আগু বাড়াইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়ীতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালঙ্কেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অপর্ণা একা আসিল না, তাহার পিছনে একদল বালক-বালিকা উপরে উঠিয়া দোরের বাইরেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্ত্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না!...লীলার মত চোখ ঝল্‌সানো সৌন্দর্য্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী দেবীমূর্ত্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তির মুখে এ-ধরণের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরণের সৌন্দর্য্য...সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার মাটির জিনিষ, এই দূর পল্লীপ্রান্তের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তের বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চ্যুতবকুলবীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্নে নদীঘাটের যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আল্‌তা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে...ইহাদেরই স্নেহপ্রেমের, দুঃখ-সুখের কাহিনী, বেহুলা লক্ষীন্দরের গানে, ফুল্লরার বারমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায় উপকথায়, সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পে।...

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারাবছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন ?...

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে একবার ডাগর চোখদুটি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—আর আমার বুঝি রাগ হ'তে নেই ?...

অপু দেখিল এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তাপোষে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ

একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয়!

—পূজোর সময় আসিনি তাই?…তুমি ভাব্‌তে কি না?…ও সব মুখের কথা—ছাই ভাব্‌তে!…

—না গো না, মা বললেন তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পূজো চলে গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নীচু করিল। অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি বললে না?

অপর্ণা বলিল—আমি জানিনে, বল্‌বো না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা?…ওসব কথা বল্‌তে আছে?—ছিঃ—ব'লো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েচ, একথা তো তোমার মুখে কখনও শুনিনি অপর্ণা?—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তার পর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে গো শুনি?…সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও?

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বল্‌ছিল, সত্যি?…

—যাইনি, এবার ভাবচি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা, তোমার কি কথার উত্তর দেব বলো তো?…ওসব আমি মুখে বল্‌তে পারবো না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেচে, জানো?…

—ইংরেজদের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়ী বাংলা কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রূপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না?…

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝিরঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো? কাউকে কাল না ব'লো বিছানায় রেখে দেবে? আছে চাঁপাগাছ কোথাও?…

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি একথা কাউকে বল্‌তে পারবো না কিন্তু—তুমি ব'লো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে…

—আচ্ছা কেন বলো তো চাঁপাফুলের কথা তুল্‌লাম?…

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরি হইল না যে অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহা হাসিবার ভঙ্গীতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা!…

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে একবার কিন্তু নিয়ে যাবো দেশে, যাবে তো?

অপর্ণা বলিল—মাকে ব'লো, আমার কথায় তো হবে না…

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কা[illegible] হবে। দুখানা মোটে চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার প[illegible] আর সেখানে যাইনি, তোমাদের মত ঝিচাকর নেই নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে—রাজী আছ কি না? আমি কিন্তু গরীব, তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। তুমি হ'লে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা এবার একটু দৃঢ়স্বরে কথা কহিল। বলিল—কেন একশোবার ওকথা বলো?… তুমি কাল মাকে বাবাকে ব'লে রাজী করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছতলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বল্‌ছিল, আমি সব শুনেচি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও, তোমার ইচ্ছে, আমার তাতে মতামত কি?

রাত্রে দুজনে কেহ ঘুমাইল না। (ক্রমশঃ)

উষার আলো—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ প্রণীত ; মূল্য ১৲।

এই বইখানি যখন আমার হাতে পড়ল, তখন আমার মনে হ'ল শ্রদ্ধেয় স্বামীজি কবিত্বপূর্ণ নাম দিয়ে নিশ্চয়ই দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন ; তিনি যে বড় রকমের দার্শনিক পণ্ডিত, তা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার পর, স্বামীজির লিখিত 'পরিচয়ে' দেখ্‌লাম যে, এখানি তত্ত্ববিদ্যার পুথি নয়—উপন্যাস। 'পরিচয়ে' আর একটু এগিয়ে জানতে পারলাম, মূল চরিত্র উপন্যাসে চারটি—সুব্রত, চিরব্রত, রেণু আর দয়া। অর্থাৎ এর মধ্যে দুইটি যুবক আছেন, দুইটি যুবতী আছেন। সুতরাং, আমার ধারণা জন্মাল যে, আমাদের তরুণ-দলের উপন্যাস-লেখকগণ আমাদের দেশের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদিগের উপরও তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত করেছেন—মঠের সাধু-সন্ন্যাসীরাও উপন্যাস ও গল্প লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন। তখন অতীব আগ্রহের সঙ্গে স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের এই 'উষার আলো' পড়তে আরম্ভ করলাম। ছোট বই ; পড়তে বেশী সময় লাগ্‌ল না। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, সুলেখক, ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীজি উপন্যাস-রূপ চিনির লেপ দিয়ে সাইকলজি বা মনস্তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ করেছেন—উপন্যাসটা আবরণ মাত্র। এই গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত দেশে স্বামীজির ন্যায় মনস্তত্ত্ববিদের উপযুক্ত কাজই হয়েছে। বইখানি প'ড়ে যে আনন্দ পেয়েছি, সে কথা না বল্‌লেও চলে। সেই আনন্দের ভাগ দেশের নর-নারীকে দেবার জন্য আমার এই অকিঞ্চিৎকর 'পরিচয়-পত্র।'

শ্রীজলধর সেন

রামচন্দ্র—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত এবং ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা হইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানি ছেলেদের জন্য লেখা। জলধরবাবু প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক। তিনি তাঁহার সাহিত্য-শক্তি শিশু-সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। ফলে 'রামচন্দ্র' নানা দিক দিয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণের কথা আমাদের চির-আদরের বস্তু। ইহা নিত্যনূতনভাবে আমাদের রস পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। তাই রামায়ণ শুনিতে আমাদের কখনও ক্লান্তি আসে না। তাই শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই রামচন্দ্রের জীবন-কথা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। সেই অপূর্ব্ব কথা সুললিত ভাষায় এবং মনোহর ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার 'রামচন্দ্র'কে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের পক্ষে সর্ব্বথা উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। দশরথের কথা এবং রামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার পাতালপ্রবেশ এবং লক্ষণবর্জ্জন পর্য্যন্ত রামায়ণের সকল কথাই সংক্ষেপে এবং সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইখানি শুধু শিশুদের নয়, বয়স্কদেরও মনোরঞ্জন করিবে। পুস্তকখানি চিত্রশোভিত। সুন্দর প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়াছেন শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

আলোর পাহাড়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ। মূল্য এক টাকা।

এখানি ছেলেদের বই। কতকগুলি ছোট গল্প আছে। রাস্কিনের লেখা প্রসিদ্ধ গল্পটির অনুসরণে প্রথম গল্প 'আলোর পাহাড়' রচিত হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলি লেখকের পরিকল্পিত। 'মেঘমালার দেশে' দার্জ্জিলিঙের বর্ণনা। কয়েকটি গল্প ছেলেরা উপভোগ করিবে।

চায়ের-ধোঁয়া—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং ১৬ টাউনসেণ্ড রোড, হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

ছেলেদের জন্য লেখা কতকগুলি ছোটগল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে এবং পড়িয়া হাসিতে পারিবে। লেখকের সরস রচনাভঙ্গী বইখানিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

কাব্য-সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার হইতে এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এইরূপ একখানি কাব্য-চয়নিকা প্রকাশ করিয়া প্রকাশক এক দীর্ঘ-অনুভূত অভাব দূর করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় কবি। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। ইচ্ছা থাকিলেও সকলের পক্ষে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। কাজেই 'কাব্য-সঞ্চয়নে'র প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই সংগ্রহে মৌলিক কবিতা ও অনুবাদ দুইই স্থান পাইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের সকল ভাল কবিতাই নির্ব্বাচিত হইয়াছে, বরং দু-একটি অতি দীর্ঘ কবিতা পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি হইত না। রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কাব্য-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রীতিমূলক কবিতাগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছেও সুপরিচিত। 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি', 'চরকার গান', 'আমরা বাঙ্গালী' প্রভৃতি কবিতাগুলি বহু সভায় আবৃত্ত হইয়াছে। ছন্দো-নৈপুণ্যে এবং শব্দপ্রয়োগে সত্যেন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ' 'ঝর্ণা' 'পিয়ানোর গান' প্রভৃতি কবিতা ছন্দ বৈচিত্র্যের উদাহরণ। 'নীল পরী', 'লাল পরী', 'জর্দ্দা পরী', 'সবুজ পরী' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার কাব্য প্রতিভার এক সুকুমার দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনুবাদে তাঁহার মত সার্থকতা কেহই লাভ করিতে পারেন নাই।

'সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গা দিদির পাগল ভাই।'
'বীরসিংহের সিংহ শিশু। বিদ্যাসাগর! বীর।'
'চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর ঘর!
ঘর-ঘর সম্পদ, আপনার নির্ভর।'

প্রভৃতি লাইনগুলি লোকের মনের উপর চিরকালের ছাপ রাখিয়া যায়। এই উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন-গ্রন্থখানি কাব্যামোদীমাত্রেরই আদরের বস্তু হইবে। প্রচ্ছদপটখানি অপূর্ব্ব সুন্দর। তরুণী আপনার বাঁশীর সুরে আপনি আত্মহারা। এখানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা।

সূচীরেখা—(প্রথম ভাগ) শ্রীসুলেখা দেবী প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার হইতে এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

সূচী-শিল্পের এই সুন্দর বইখানি দেখিয়া মহিলাগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া আজ ঘরে ঘরে এ শিল্পের চর্চ্চা হইতেছে। শ্রীমতী সুলেখা দেবীর পুস্তকখানি সত্যই কালোপযোগী হইয়াছে। সূচী-শিল্পে হাত থাকিলেও অনেক মেয়েকে ডিজাইন ও প্যাটার্ণ লইয়া গোলে পড়িতে হয়। 'সূচীরেখা' সে বিপত্তি হইতে তাঁহাদের উদ্ধার করিবে। ব্লাউসের সকল প্যাটার্ণই রচয়িত্রীর পরিকল্পিত। ডিজাইনগুলি সুচিত্রিত। ইহাতে ব্লাউসের ডিজাইন ছাড়া ছোট ছোট ফুল লতা-পাতা ও অন্যান্য নানা রকম সুন্দর ডিজাইন আছে। কাপড়ে ছবি তুলিবার নিয়ম, বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বইখানির আদর হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পারিবারিক চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০।

পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য সম্প্রতি প্রাপ্ত হইলেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে ১৩৩৪ সালে। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত।"—উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। তবে দুঃখ এই যে, ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী কোনও গুণের পরিচয় গ্রন্থে পাইলাম না। কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও সেই সঙ্গে তাহাদের প্রতিকারকল্পে কতকগুলি পাচন ও মুষ্টিযোগের প্রয়োগ-বিধি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু পাচন ও মুষ্টিযোগ বলিতে কি বুঝায় পাচনাদির জন্য কোন্ দেশ-জাত উদ্ভিদের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে সংগ্রহ করিতে হয়, এবং কিরূপ স্থানের ও কিরূপ অবস্থার উদ্ভিজ্জ গ্রহণযোগ্য নয়,—এ সব কথার কিছুই ইহাতে নাই। ইহা ছাড়া আরও ত্রুটি আছে। লেখক 'ডেঙ্গুজ্বর' সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এ জ্বরও অনেকটা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত।...কোষ্ঠশুদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শ্লেষ্মা-জন্য জ্বরে যে-সকল ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, ডেঙ্গুজ্বরে সেই সকল ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" কিন্তু ডেঙ্গুজ্বর আদৌ শ্লেষ্মাত্মক ব্যাধি নয়; বায়ু ও পিত্তের মিলিত প্রকোপ-হেতুই উহার উৎপত্তি। সুতরাং 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা শ্লেষ্মা-জন্য জ্বরের ব্যবস্থা' ডেঙ্গুজ্বরের পক্ষে যে কুব্যবস্থা, তাহা বলাই বাহুল্য। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন,—'নবজ্বরে এক সপ্তাহ অতীত না হইলে পাচন প্রয়োগ করিতে নাই।' ইহার পর নবজ্বর-প্রসঙ্গে আর একস্থানে বলিয়াছেন,—"যদি জ্বর শ্লেষ্মা-প্রধান হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মীবিলাস ১ বড়ি ও মকরধ্বজ ১ রতি মিশাইয়া দিন দুই-তিনবার সেবন করাইলে চমৎকার ফল দর্শে।" কিন্তু ঐ দুইটা কথাই ঠিক নয়। নবজ্বরের দুইটি অবস্থা—সাম ও নিরাম। নিরাম জ্বরে লঙ্ঘনও বিধেয় নয়, ঔষধ সেবনও দোষের নয়। আর সাম জ্বরে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রথম সপ্তাহ-মধ্যে প্রয়োগ করিতে নাই বটে, কিন্তু যে-সমস্ত ঔষধ রসের পরিপাককারক বা উপদ্রব-নিবারক, তাহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়। লেখক শ্লেষ্মাপ্রধান নবজ্বরে লক্ষ্মীবিলাসের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। লক্ষ্মীবিলাসে অভ্র ও ধুস্তূর বীজ আছে। কিন্তু শ্লেষ্মাপ্রধান নবজ্বরে লৌহ বা অভ্রঘটিত ঔষধ দিতে নাই। আর ঐ জ্বর সপ্তাহ পার না হইলে ধুস্তূরঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করাও অসঙ্গত। তাহাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। এরূপ ভুল ও ত্রুটি গ্রন্থে অনেক আছে, বাহুল্য-ভয়ে আর দেখাইলাম না। লেখক যদি কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের "পাচন ও মুষ্টিযোগ," কবিরাজ যশোদানন্দন সরকারের "গৃহস্থের মুষ্টিযোগ ও কবিরাজের চিকিৎসা-প্রবেশ" ও দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নের "বিবিধ তীব্র মুষ্টিযোগ" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া এ গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

উদিতা—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত; প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা। পৃষ্ঠা ১৪৪; সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই।

বাংলা দেশের যে কয়জন নারী-কবি বাংলা কাব্য-সরস্বতীর গলায় মালা হইয়া দুলিতেছেন, তাঁহাদের সেই মালায় আর একটি সাথী গাঁথা পড়িলেন। বয়সে ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠা, তাহা সত্ত্বেও ইঁহার কবিতার মধ্যে পরিণতির যে-সম্ভাবনা দেখিতেছি, মনে হয় ইঁহার দ্যুতি একদিন অনেকের সপ্রশংস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সেদিন ভাদ্র সপ্তদশ জন্মদিনে ইঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "উদিতা" প্রকাশিত হইয়াছে। "উদিতার' অনেকগুলি কবিতা গত চার বৎসর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল; ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর বার বৎসরের সদ্য উন্মুখ কবি-প্রতিভা ষোলো বৎসর পর্য্যন্ত যতটুকু পরিণতি লাভ করিয়াছে, তার প্রায় সবটুকু পরিচয় এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। বইখানি পড়িলেই একথা সকলের আগে মনে পড়ে যে, কবিতাগুলি কবির বয়সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, একটা স্বাভাবিক কবি প্রতিভা যেন কবিতাগুলির ধ্বনি ও ছন্দের ক্ষীণ দুর্ব্বলতাকেও ছাপাইয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এটা একটু বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়াও আর একটি বিস্ময়ের কথা এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। "উদিতা"-র ভূমিকা-লেখক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাতেই তাহা বলা ভাল। "কিছুকাল থেকে তার লেখায় একটা যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেটা তার এবয়সের পক্ষে একেবারেই অনপেক্ষিত। ভাবের ছবি মনে অল্পবয়সেও রচিত হ'তে পারে, কিন্তু তত্ত্বের গাঁথুনি তো তেমন সহজ নয়। কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি চলে, কিন্তু তাকে ডাক দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যদি বা এমন ঘটে, মৈত্রেয়ীর বয়সে সেটা আশ্চর্য্যের কথা। জ্ঞানের পথে যে-উপলব্ধি, সে তো পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে বলেই জানি। শুধু চিন্তা করা নয়, চিন্তা করতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আনন্দই যদি প্রধান হয়ে উঠে, এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্ব্বতা বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান নিতে পারবে।" কবিগুরুর একথা সত্য, কিন্তু ইহার ফলে "উদিতা"র বেশীর ভাগ কবিতাই একটু heavy হইয়া পড়তে বাধ্য হইয়াছে, এবং তাহাদের সহজ সাবলীল গতি মাঝে মাঝে একটু পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সুখের কথা এই যে, তত্ত্বের তাড়নায় মৈত্রেয়ীর কল্পনা কোথাও জটিল হয় নাই, ভাববেগ কোথাও শিথিল হইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করে নাই; এক কথায় তত্ত্বের আনন্দ কোথাও কাব্যের আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। তাহা ছাড়া "উদিতা"র প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই ভাবের এমন একটা গভীরতা, ধ্বনির ও গতির এমন একটা শুদ্ধ গাম্ভীর্য্য আছে, যাহা মনকে অভিভূত না করিয়া পারে না। 'কোন কথা নহে', 'উপহার', 'আলো', 'অন্তর', 'পরিণতি', প্রভৃতি কবিতা এই হিসাবে সত্যই উপভোগ্য। শুধু ভাবের গভীরতা, এবং ধ্বনি ও গতির গাম্ভীর্য্যেই

নয়, কল্পনার ঐশ্বর্য্যেও কবিতাগুলি অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'জন্মলীলা' কবিতাটিতে তাহার খুব সুন্দর পরিচয় আছে। মনের কোনো বিশেষ ভাব ও ধারণাকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিবার ও তাহার মধ্যে একটা সার্থকতা খুঁজিবার মানুষের যে একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহার মধ্যে কল্পনার প্রসারের যে-বিচিত্র সুযোগ আছে, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী সে-সুযোগকে কোথাও ব্যর্থ হইতে দেন নাই। আর শুধু কল্পনার প্রসারের কথাই বা বলি কেন, এই কবিতাগুলির প্রকাশের ভঙ্গীও খুব সুন্দর। 'জন্মলীলা'র

"আজি এই বসন্তের প্রথম সকালে
আকাশ রঙীন্ হ'লো নীলে আর লালে,
　　আনন্দ সিন্দূরে
সুন্দর করিয়া দিল শিশির বিন্দুরে।
শুষ্কপত্র ঝরে গেল আম্রবন তলে,
বিকশিত কিশলয়ে আনন্দ উছলে
যে-বীচিটি পড়েছিল প্রাঙ্গণের কোণে
　　সে আজিকে হায়
কখন উঠিল কাঁপি পুষ্পিত লতায়।"

আমি ইচ্ছা করিয়াই অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবিতাগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম না; শুধু ইহাদের বিশিষ্টতার দিকে একটু ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে-সহজ কবি-প্রতিভার পরিচয় আছে, তাহা আমি সানন্দে উপভোগ করিয়াছি, আশা করি সকলেই তাহা করিবেন। প্রার্থনা করি, বাংলা কাব্যাকাশে সদা-উদিতা শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর কবি-প্রতিভা জয়যুক্ত হোক্।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

পঞ্চশর—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত ও ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে রাধহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৫২ পৃষ্ঠা কাপড়ে বাঁধাই দাম পাঁচ সিকা।

প্রেমেন্দ্রবাবুর গল্প লেখার হাত আছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ভিন্ন ভিন্ন নামে মাসিকপত্রে ছাপা হইয়াছিল, সেগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে একত্রে গাঁথিয়া "পঞ্চশর" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলা দেশে ছোটগল্পের বাজার বড়ই মন্দা শুনিতে পাই, তাই কি গুটিকয় ছোটগল্পকে একটি বড় গল্পের ছাঁচে ঢালাই করার এই কৌশল? ব্যবসাদারি হিসাবে হয়ত ভালই, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি নিশ্চয়ই ইহা সুবিচার নয়। সাহিত্যের ধার ধারি না, অথচ সাহিত্য-প্রকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের যে দুর্গতি ঘটে "পঞ্চশর" তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পড়িতে পড়িতে লেখকের প্রতি সত্যই মায়া হয়। মুদ্রাকরের হাতে পাণ্ডুলিপি সঁপিয়া দিলেই প্রকাশকের কর্ত্তব্য ফুরায় না—প্রকাশক সে-কথা জানেন কি? জানিলে আগাগোড়া মারাত্মক ছাপার ভুলে এবং অন্তর্বিধ ভুলে—যেমন 'স্পেসিং' এবং প্যারা ভাগ,—বইখানিকে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়া লেখক ও পাঠককে বধ করিতেন না।

গ্রন্থের "পঞ্চশর" নাম সার্থক, কারণ গল্পগুলি সমস্তই নরনারীর প্রেমের কাহিনী—নানান্ সুরের platonic হইতে physical। স্থানে স্থানে কিছু কিছু ভাষার ত্রুটি সত্ত্বেও প্রায় সবগুলিই সুলিখিত। 'চিত্রা', 'কসোলিয়া', 'নীপুদা', 'গণেশ' এবং 'লতা ও কমল'-এর গল্পে লেখকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছি; তার মধ্যে 'চিত্রা' ও 'গণেশ' শ্রেষ্ঠ।

স. ব.

সঙ্গীত-মুকুর—প্রথম খণ্ড, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বংশে জন্ম। তাঁহার নিজেরও সঙ্গীতে অসাধারণ বুৎপত্তি। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শিক্ষা-বিভাগ হইতেও সঙ্গীতকে শিক্ষার বিষয় রূপে গ্রাহ্য করা হইয়াছে। সঙ্গীত-মুকুর বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ লেখা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি বেশ ভাল এবং ইহার সাহায্যে অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা সহজে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অ. চ.

কুন্তলীন পুরস্কার—১৩৩৭, এইচ বসু, পারফিউমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৬১ বহুবাজার, কলিকাতা।

এবারকার কুন্তলীন পুরস্কারে মোট সাতটি গল্প আছে। প্রথমেই পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন'—স্বপ্নেরই মত অভিভূত করিয়া ফেলে। স্বপ্নরাজ্যের আবেশ গল্প শেষ হইয়া গেলেও রেশের মত মনে লাগিয়া থাকে। তাহার উপর শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের মোহন তুলিকা গল্পটিকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়াছে। শৈলজানন্দের 'ভয়ঙ্কর' গল্পটি বেশ লাগিল, তবে আর একটু অল্প পরিসরের মধ্যে রাখিলে ভাল হইত। সৌরীনবাবুর 'পুরুষস্য ভাগ্যম্' গল্পটি সুন্দর।

গল্প-সাহিত্যের অনেক সুপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনাই কুন্তলীন পুরস্কারে স্থান পাইয়াছে। প্রকাশক মহাশয় 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"পুরস্কার প্রকাশ করিয়া শারদীয় মহোৎসবের আনন্দ যদি কিছুমাত্র বাড়াইতে পারি, তবেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।" আমাদের মনে হয়—তাঁহার চেষ্টা-যত্ন সার্থক হইয়াছে।

বাংলা
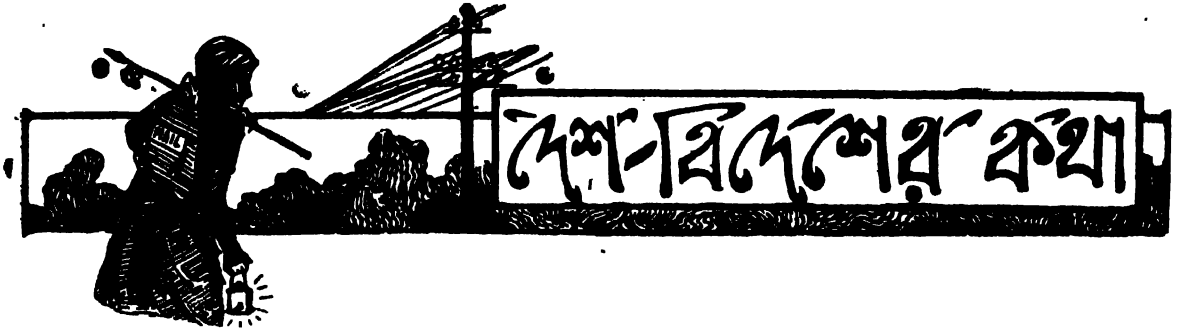
কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতি (কেন্দ্রীয় মানব-সেবক সঙ্ঘ), ফরিদপুর—

এ দেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজের দুরবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুর আজ হিন্দুত্ব নাই; মুসলমানের আজ মুসলমানত্ব নাই। ভ্রান্ত গোঁড়ামীর চূড়ান্তই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন। ভারতবাসীর সংকীর্ণতা, বিশেষতঃ মুসলমান ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও বিদ্যাহীনতা আজ দেশের ও দশের মুক্তি-পথে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি সম্পর্কে একবারে হতাশ হইতে হয়। দেশের এই বিরাট সম্প্রদায়টি আজ সর্ব্বতোভাবে অনুন্নত ও সর্ব্বক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ। এমন নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে যে সমাজ-জীবন আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহারা কখনও সত্যের সন্ধান পাইতে পারে না এবং নিজেদের স্বদেশের বা বাহিরের বিপুল বিশ্বের কোন কল্যাণ-কামনাও তাহাদের প্রাণে স্থান পাইতে পারে না।

এই অজ্ঞানান্ধ ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে শিক্ষার প্রভাবে উন্নত ও মার্জ্জিত করিতে না পারিলে দেশের কোন বৃহত্তর স্থায়ী কল্যাণ ইহাদের দ্বারা সাধন হওয়া অসম্ভব। নিখিল ভারতের এই বিরাট মুসলমান সমাজে প্রকৃত জীবন্ত ও কার্য্যকরী কোন সেবা ও সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ছিল না। দেশের এ হেন ঘোর দুর্দ্দিনে বড় আশা ও সাহসে বুক বাঁধিয়া "কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতি" (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নিখিল মানব-সেবক-সমিতি) নামে একটি উদার প্রতিষ্ঠান প্রায় তিন বৎসরকাল যাবৎ ফরিদপুর শহরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই "কেঃ খাঃ এনছান সমিতি" কর্ত্তৃক বাংলা ও আসামের বিভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে, জিলায়, শহরে ও পল্লীতে 'শাখা খাদেমুল এনছান সমিতি' প্রতিষ্ঠা, যাবতীয় সংগঠন, কুসংস্কার নিবারণ, মুষ্টি-চাউল সংগ্রহের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, প্রয়োজনানুযায়ী মাদ্রাসা স্থাপন, গরীব ছাত্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান, ছাত্রাবাস, অনাথ আশ্রম (এতীমখানা) ও দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন, নিরাশ্রয় হিন্দুমুসলমান মৃতের শেষ ব্যবস্থা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপের সময় দীর্ঘকাল যাবৎ 'বিপন্নদিগকে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য দান, গ্রাম্য বিবাদ বিসম্বাদ পল্লীর শাখা খাদেমুল এনছান সমিতি-সমূহের দ্বারা সালীসি বৈঠকে নিষ্পত্তি করিয়া জনসমাজের অর্থ রক্ষা ও শান্তি রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা এবং সামান্য ব্যয়ে বিবাহ, শ্রাদ্ধ (ফাতেহা) প্রভৃতি সম্পন্ন করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ প্রকারের শারীর চর্চ্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং তাঁত প্রতিষ্ঠা করিয়া খদ্দর তৈয়ারের নিয়ম প্রণালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে প্রয়াস পাওয়া হইতেছে।

অনন্তের সন্তান এই মানুষ অনন্তকে চায়। মানুষের মন অনন্ত, প্রেমও অনন্ত। তাই অনন্তকে বাদ দিয়া মানুষের মন সান্তের সাধনায় সীমাবদ্ধ থাকিতে একান্ত নারাজ। মানুষের মন-তন্ত্রী দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনন্তের গুরু গম্ভীর আহ্বানে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। সমগ্র মানব-জাতি যাহাতে অনন্তের এই মহানিমন্ত্রণে প্রাণের সহিত সাড়া দেয়, তজ্জন্য "মোয়াজ্জিন" নামক একখানা উৎকৃষ্ট সচিত্র বাংলা সাহিত্য পত্রিকাও ভারতীয় খাদেমুল এনছান সমিতি-সমূহের মুখপত্ররূপে ফরিদপুরের "কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতি" কর্ত্তৃক প্রায় তিন বৎসর কাল যাবৎ পরিচালিত হইতেছে।

একাধারে অজ্ঞ ও অনুন্নত মানুষ-ভাইকে শিক্ষার প্রভাবে উন্নত, জন-সমাজের সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে উদার ভাব ও উন্নত চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ, সকল মানুষেরই জীবনপ্রবাহে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি, বিবেকের ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং সত্য, সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন পন্থী সমস্যা-সমাধানামূলক এই উদারনৈতিক সার্ব্বজনীন মুক্তি-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করণার্থে দেশ-বিদেশে এই সমিতির শাখা গঠন করিতে প্রত্যেক মুসলমানকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি—যেহেতু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে সত্য, সমাজ ও সাহিত্য-সেবার জন্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রকৃত জীবন্ত সমিতি এই একটি ভিন্ন আর নাই।

এতদ্ব্যতীত এই জীবন্ত ও কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানকে যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য দান করিতে এবং উক্ত আদর্শ মুখপত্র "মোয়াজ্জিন" পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে দেশের প্রকৃত হিতকামী হিন্দু-মুসলমান সকলের সমীপেই আমরা একান্তভাবে নিবেদন জানাইতেছি। নিবেদন ইতি।
২১ ভাদ্র, ১৩৩৭।

নিবেদক :—

এ-কে, ফজলুল হক্ (এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি, এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)

ফকির আবাখালেদ রশীদউদ্দীন আহ্‌মদ (মৌলানা পীর বাদশাহ্ মিয়া সাহেব)

মোহাম্মদ ইউছুফ আলী চৌধুরী (জমিদার) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ, কেঃ খাঃ এনছান সমিতি, ফরিদপুর।

সৈয়দ আবদুর রব, সম্পাদক, কেঃ খাঃ এনছান সমিতি এবং মোয়াজ্জিন, ফরিদপুর (বাংলা দেশ)।

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাধিকামোহন বৃত্তি লইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

শ্রীসঞ্জীব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন বড়দিনের অবকাশে আগ্রায় হইবে। এই সম্মিলন প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব ও আদরের জিনিষ। পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই সম্মিলনে যোগ দান করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বাগচী মহাশয় উক্ত অধিবেশনের স্থানীয় কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রবাসী বঙ্গ ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচারার্থ একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। বঙ্গের বাহিরে সকল ছাত্র ও ছাত্রীগণ, যাঁহারা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সদস্ত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। যাঁহারা সদস্ত নহেন, তাঁহারা প্রবন্ধের সঙ্গে অথবা পূর্ব্বে বাৎসরিক চাঁদা আট আনা অথবা এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন। (ষোল বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীর জন্ত আট আনা, তদূর্দ্ধ বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীর জন্ত এক টাকা)। পরিচালক সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে সদস্ত হইবার আবেদন পত্র পাঠান হইবে। প্রবন্ধটি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পরিচালক সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বিষয়:—(ছাত্রদিগের জন্ত)—"নব্য যুবকদিগের কর্ত্তব্য কি?" লেখকেরা নিজের মতের সমর্থন বঙ্গ সাহিত্য হইতে করিবেন। প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক; দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক। (ছাত্রীদিগের জন্ত)—'স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত, কিম্বা তাহাতে প্রভেদ থাকিবে?" লেখিকারা নিজ মতের সমর্থন বঙ্গ সাহিত্য হইতে করিবেন। প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক; দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।
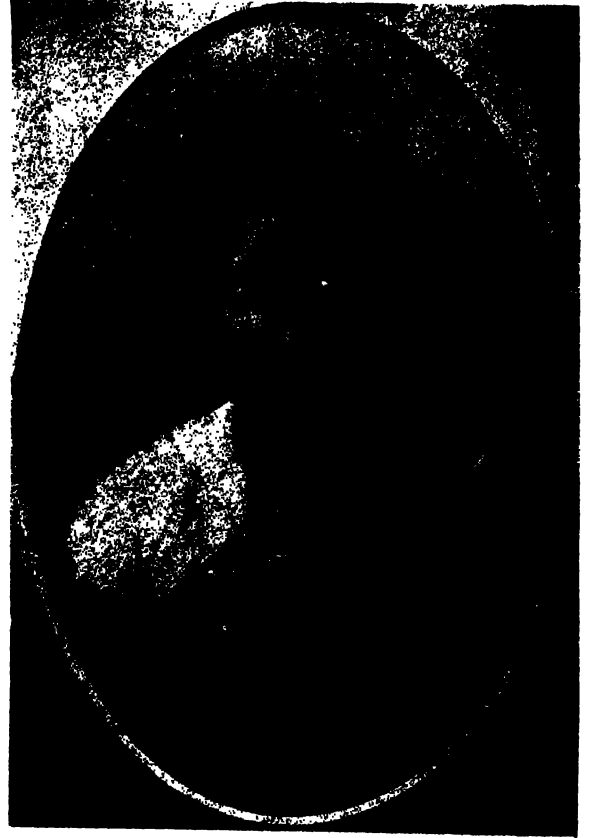
শ্রীমতী লাবণ্য মিত্র
ইনি সত্যাগ্রহের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন
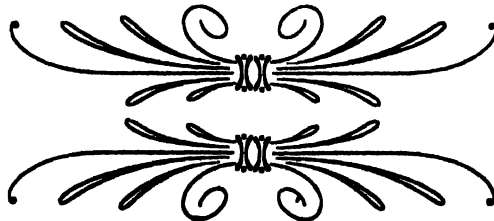
ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

ব্রিটিশজাতি—"আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।
কিন্তু, মিঃ গান্ধি, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দুজনের একজনকে
যেতেই হবে

—*Simplicissimus, Munich*

শ্রমিক গভর্ণমেন্টের সমস্যা—সর্ব্বত্রই খানাখন্দ

—*Glasgow Herald*
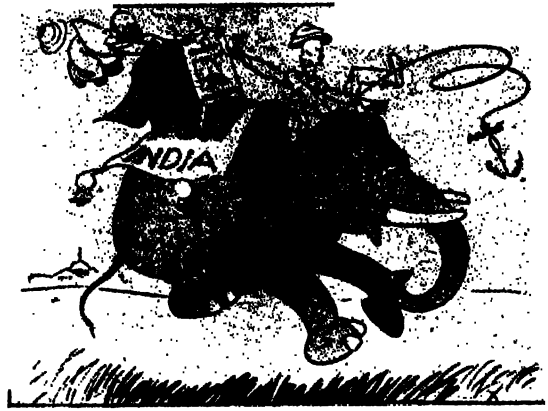
বড়লাট—সব ঠিক আছে! (I have the situation will in hand)

—*Glasgow Evening News*

ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

—*Kladderadatsch, Berlin*

নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা

নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলাকে এখন আর তেমন নব্য বলা চলে না, এখন উহার পরিচয় সকল বাঙালীরই কিছু-না-কিছু জানা আছে। আর বাঙালীই বা বলি কেন? ভারতবর্ষের চিত্রকলানুরাগী রসিক সমাজ ইহাকে আর অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখেন না। বিভিন্ন প্রদেশেও বঙ্গীয় চিত্রপদ্ধতির অনুকরণে ও প্রেরণায় ইহার অনুরূপ চিত্রকলা জন্মলাভ করিতেছে। কাজেই, ইহাকে নব্য বলিয়া সঙ্কোচ করিবার বা বঙ্গীয় বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। বরং বিপরীত কারণে ভয় হয়, আমাদের নব্য বঙ্গীয় চিত্রশিল্পী সমাজ বুঝি শিল্পের অপেক্ষা তাহার পদ্ধতিটাকেই বড় করিয়া তোলেন এবং আমাদের নিজস্ব চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার অন্ধ অবজ্ঞা বুঝি আজিকার দিনে আবার ফ্যাসান-মাফিক অন্ধ স্তুতিতে আসিয়া ঠেকিতেছে।

নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা যদি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পাচার্য্যগণের রূপকর্ম্মের অনুকৃতিকেই তাহাদের শিষ্যানুশিষ্যদের একমাত্র আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়া দিত তাহা হইলে সত্যসত্যই আশঙ্কার কারণ ছিল। কারণ, আদর্শ যতই না সুন্দর ও সুনিপুণ হাতের কাজ হোক শুধু তার অনুকরণে তার প্রাণকে ধরা যায় না। তাই, শিষ্যপরম্পরায় এইরূপ অনুকরণে ক্রমশঃই আদর্শের রূপ ও পটুত্বের হ্রাস দেখা যাইত। নব্য বঙ্গীয় চিত্রশিল্পীদের কাহারও কাহারও চিত্র দেখিয়া যে এইরূপ আশঙ্কা হয় ই তাহা নয়। তবে, আশার কথা এই যে, এখনও ন চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা যুগের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শিল্পাচার্য্যগণের আসল ক্ত ও আসল প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই এই তি অবলম্বন করিয়াছেন, নিতান্তই পদ্ধতির চমকদার াবে প্রভাবান্বিত হন নাই। তাই, তাঁহাদের প্রাণ পথে মুক্তি পাইতেছে, বন্দী হইয়া পড়িতেছে না। পদ্ধতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণবান্ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে ভয় পায় না। আনন্দের কথা এই যে, নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা যে সচল আছে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

বঙ্গদেশের যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার শিক্ষা ও অনুশীলন হয়, তাহার একটি ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি অফ্ আর্টস, অন্যটি কলাভবন, ও তৃতীয়টি কলিকাতা আর্ট্স স্কুল। ইহার মধ্যে আর্ট্স স্কুলে সাহেবী ও সরকারী প্রভাব সমধিক ছিল। কিন্তু উহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয়ের চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির শাখা বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় বর্ত্তমানে চিত্রকলার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ভারতীয় কলা কারুকলার কার্য্যকরী শিল্পক্ষেত্রেও প্রকাশলাভ করিতেছে। ইহা বড়ই সুলক্ষণ। কলাভবনে সেই চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। ওরিয়েণ্টাল্ সোসাইটি অফ্ আর্টস বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশীয় চিত্রকলা পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতাচয়ের আয়োজন করিতেছেন, আশা করা যায় ইহাতে সোসাইটির ভারতীয় শিল্পের নূতন সাধকগণ নিজ শিল্পকে ঐসব বিভিন্ন শিল্প-পদ্ধতির পটভূমিকায় স্থাপন করিবার অবসর পাইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের মন স্বচ্ছ ও তাঁহাদের কলা-নৈপুণ্য আরও খাঁটি হইবে।

এই সব প্রতিষ্ঠানের যে সব কৃতী ছাত্র নিজেদের শিক্ষার ও সাধনার কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ গুরুগণের প্রতিভার অধিকারী কিনা, তাহা ঠিক নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদেরও যে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বটুকু আছে তাহা স্বীকার্য্য। সে বৈশিষ্ট্য উপভোগ্যও।

এইরূপ কয়েকটি শিল্পী শ্রীযুক্ত ইন্দু রক্ষিত, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকৃষ্ণ রায়, তারকনাথ বসু, আত্মানন্দ সিংহ ও ননীগোপাল দাসগুপ্ত, তাঁহাদের দুই একটি শিল্প নিদর্শন এখানে প্রকাশ করা গেল—মনে রাখিতে হইবে যে, মুদ্রণের অসুবিধায় তাঁহাদের শিল্প-সুষমার যথেষ্ট পরিচয়

গ্রামের দৃশ্য শ্রীতারকনাথ বসু

ইহাতে দেওয়া সম্ভবপর নয়। ইহা শুধু পাঠক সাধারণের মনের কৌতূহল-বোধকে চরিতার্থ করিবার জন্ম ও রসিকবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার জন্ম।

কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বঙ্গীয় চিত্রকলা আজ আর বাংলারই একান্ত নয়। শ্রীযুক্ত চিত্রা, মথুরাদাস গুজরাটী ইহারই সাক্ষ্য। শ্রীযুক্ত চিত্রা কলাভবনের পূর্ব্বতন ছাত্র; এখন তিনি স্বদেশে মাদ্রাজ স্কুল অফ্ আর্ট স-এ কাজ করিতেছেন।

এই সব ভিন্নদেশীয় শিল্পীচিত্তও যে বঙ্গীয় পদ্ধতিতে আপনাদের প্রকাশ-পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন তাহা একদিকে যেমন সমগ্র ভারতীয় মনের এক-ধর্ম্মের প্রমাণ, তেমনি আবার বাঙালীর এই কলাপদ্ধতি যে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবের উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছে, তাহাও উপলব্ধি করা যায়। দুইদিক হইতেই ইহা আশার কথা। আশার কথা এই যে ইহাদের সৃষ্টি আড়ষ্ট নয়—অর্থাৎ, এই পথে এমন কিছু নাই যাহা সঙ্কীর্ণ ও জড়।

ঠাকুরমা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকৃষ্ণ রায়

রাজপুতনী শ্রীইন্দু রক্ষিত

বৈশাখ—শ্রীননীগোপাল দাস-গুপ্ত

প্রদীপ—শ্রীআত্মানন্দ সিংহ
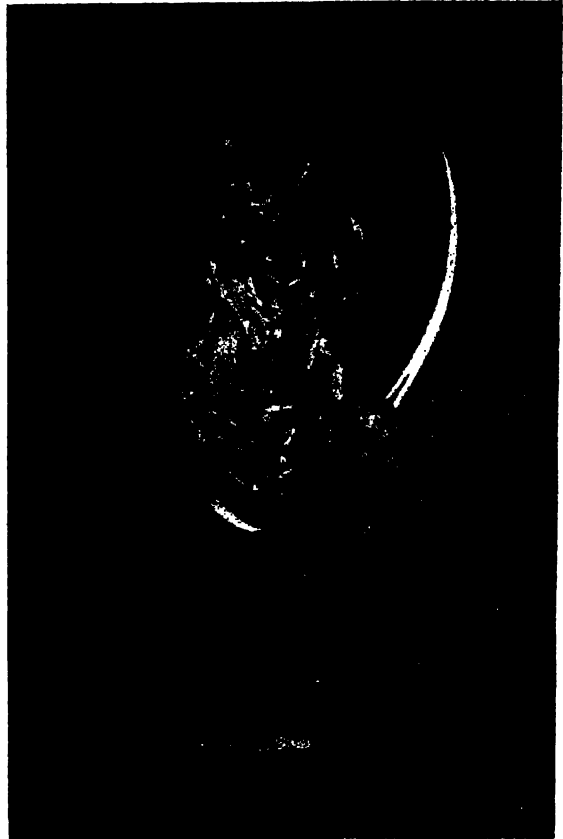
চন্দ্রোদয়- শ্রীমথুরাদাস গুজরাটি

প্রত্যাবর্ত্তন— শ্রীইন্দু রক্ষিত

আয়েষা—শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা

নৌকা—শ্রীতারকনাথ বসু
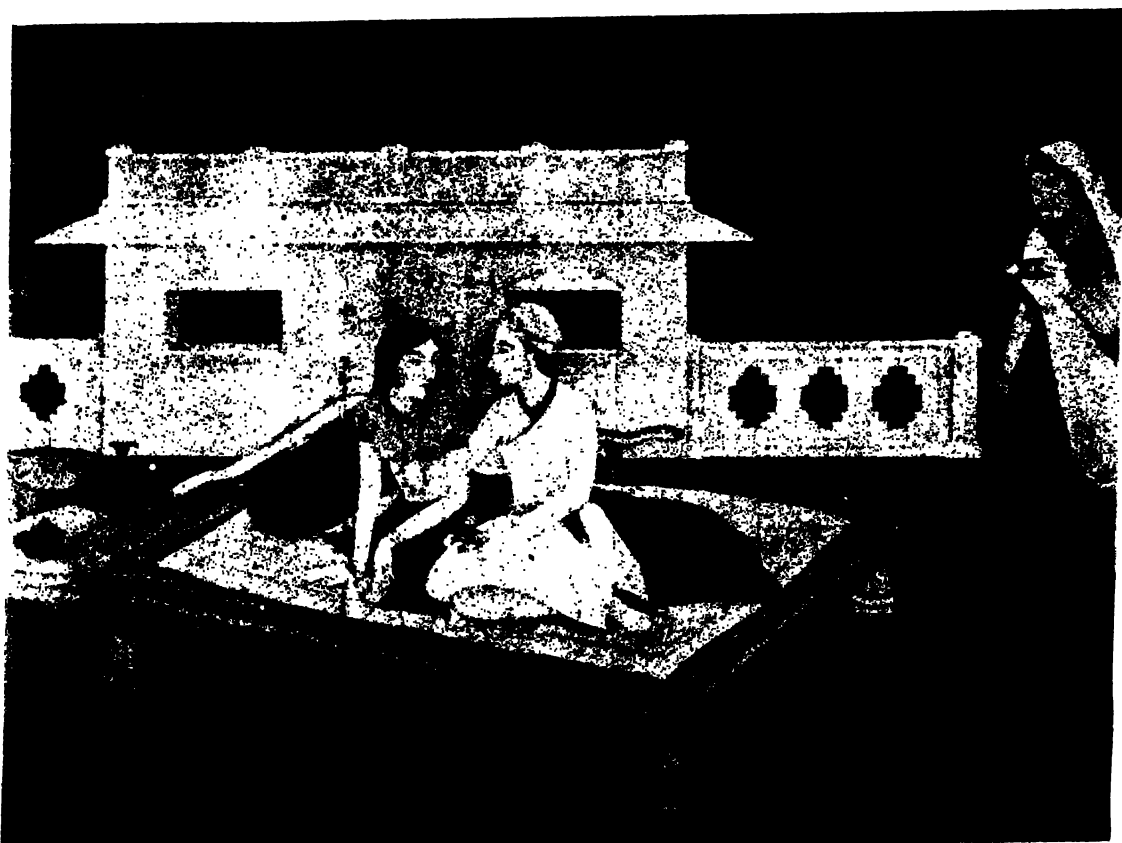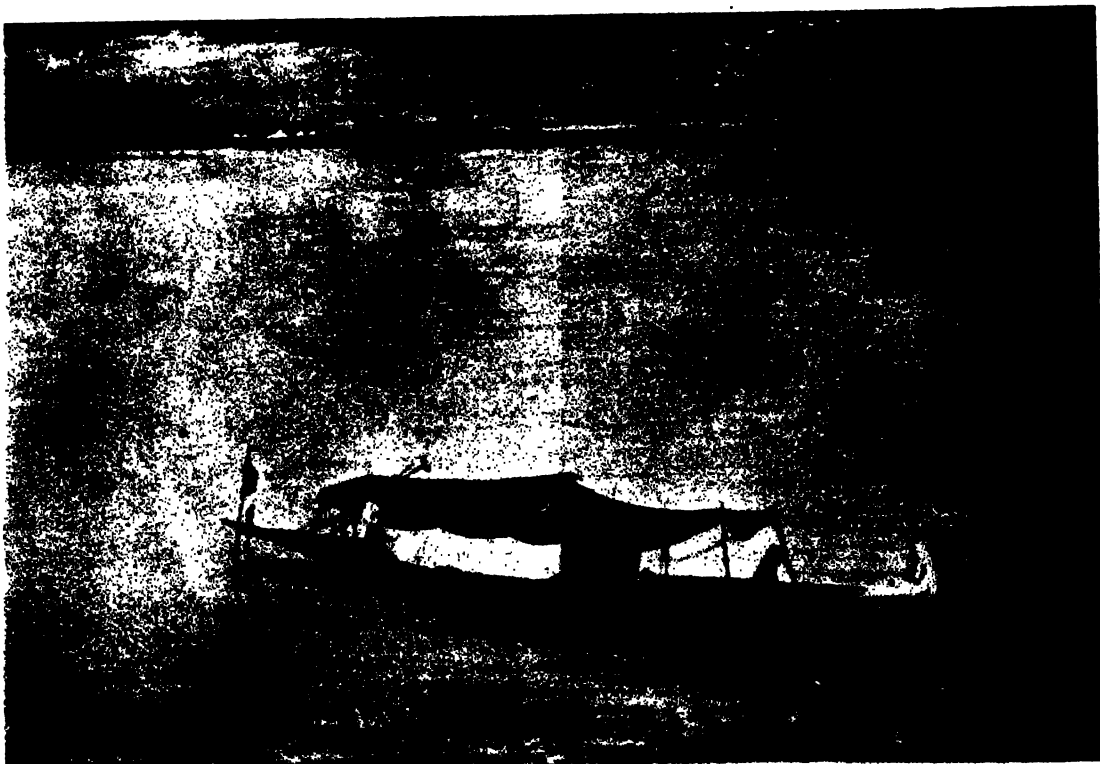
(গং)গোল টেবিল বৈঠক

লণ্ডনে ব্রিটেনের কতকগুলি প্রতিনিধি এবং ইংরেজ গবন্মেণ্টের নির্ব্বাচিত কতকগুলি ভারতীয় ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের যে আলোচনা সভা হইবে, তাহাকে যে গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে না,তাহা আমরা শ্রাবণ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। ইংরেজ গবন্মেণ্টের মনোনীত ভারতীয়েরা যে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ভারত প্রতিনিধি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারেন না, তাহাও ঐ সঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক, ইংরেজ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে কিরূপ কত লোক বাছিয়া তাঁহাদিগকে এই দেশের প্রতিনিধি বলিয়া জগতে পরিচিত করিতে চান।

ব্রহ্মদেশ সমেত ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত;—সাক্ষাৎ-ভাবে ইংরেজদের দ্বারা শাসিত অংশ এবং (পরোক্ষভাবে ইংরেজ শাসিত ও) সাক্ষাৎভাবে দেশী রাজাদের দ্বারা শাসিত অংশ। এই বিভাজন ভাষা ধর্ম্ম জাতি প্রভৃতি অনুসারে নহে, কেবল সাক্ষাৎ শাসনকর্ত্তাভেদে এইরূপ ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের লোক-সংখ্যা ২৪,৭০,০৩,২৯৩ এবং দেশী রাজ্যগুলির লোক-সংখ্যা ৭,১৯,৩৯,১৮৭। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ শাসিত ভারত হইতে ৫০ এবং দেশী রাজ্য হইতে ১৬ জন মানুষ লইয়াছেন। কিন্তু লোক-সংখ্যা অনুসারে দেশী রাজ্যগুলির ১৫ জন লোকও বৈঠকে পাঠাইবার অধিকার হয় না।

এখন দেখা যাক্, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্য হইতে কত লোক লওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা—

	লোক-সংখ্যা	তথাকথিত প্রতিনিধি সংখ্যা
হিন্দু	১৬,৩১,৪৪,৭০০	২৪
মুসলমান	৫,৯৪,৪৫,৩৩১	১৪
বৌদ্ধ	১,১৪,৯০,৮১৫	২
আদিম জাতিসমূহ		
খৃষ্টিয়ান	৩০,২৭,৮৮১	৩
শিখ	২৩,৬৭,০২১	২
জৈন	১১,৭৮,৫৯৬	০
পার্সী	৮৮,৪৬৪	২
ব্রিটিশ	১,১৫,৬০৬	৩
মোট	২৪,৬৯,৬০,২০০	৫০

ব্রিটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু, কিন্তু হিন্দু "প্রতিনিধি" লওয়া হইয়াছে অর্দ্ধেকেরও কম। মুসলমানেরা মোট লোকসংখ্যার সিকিরও কম, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে গৃহীত "প্রতিনিধি" মোট প্রতিনিধি সংখ্যার শতকরা ২৮ জন অর্থাৎ সিকির অনেক বেশী। ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অর্দ্ধেকের অনেক কম, কিন্তু মুসলমান "প্রতিনিধি"র সংখ্যা হিন্দু প্রতিনিধির অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী। বৌদ্ধদের সংখ্যা মুসলমানদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, কিন্তু তাহাদের "প্রতিনিধির" সংখ্যা মুসলমানদের এক-সপ্তমাংশ। বৌদ্ধদের সংখ্যা খৃষ্টিয়ানদের প্রায় চারিগুণ, কিন্তু বৌদ্ধ "প্রতিনিধি" ২ জন, খৃষ্টিয়ান ৩ জন, আদিম জাতিসমূহের মোট লোকসংখ্যা খৃষ্টিয়ান, শিখ, জৈন, পার্সী ও ব্রিটিশদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে একজনও "প্রতিনিধি" গৃহীত হয় নাই। শিখদের সংখ্যা পার্সীদের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু তাহাদের "প্রতিনিধি"র সংখ্যা সমান। জৈনরা সংখ্যায় পার্সী ও

ব্রিটিশদের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাহাদের একজনও "প্রতিনিধি" নাই। ভারত-প্রবাসী ব্রিটিশরা সংখ্যায় পার্সী ছাড়া আর সকলের চেয়ে কম হইলেও তাহাদের "প্রতিনিধি" তিন জন।

সরকারী লোকেরা বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে ৬ কোটি লোক অস্পৃশ্য ও অবনত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা সত্য হইলে তাহারা উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু ছাড়া আর সব ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রত্যেকের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেবল ১ জন লোককে—ডক্টর আম্বেদকরকে—মনোনীত করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিশেষ করিয়া অবনত শ্রেণীর লোকদের এবং আদিম জাতিসমূহের প্রতি ন্যায়বিচার ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক। কিন্তু (গণ্ড)গোল টেবিল বৈঠকে তাহাদের প্রতি ন্যায়বিচার কিরূপ হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। যদি বলেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ যথেষ্ট লোক নাই যাহারা বৈঠকের আলোচনায় যোগ দিবার যোগ্য, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া এমন করিয়া তাহাদের বহু কোটি লোকের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, যে, এখনও তাহাদের মধ্যে একটা বৈঠকে হাত তুলিবারও লোক একজনের বেশী মিলে না।

দেশী রাজ্যসমূহ হইতে যাঁহাদিগকে লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের ১৬ জনের মধ্যে ১০জন রাজা মহারাজা নবাব, বাকী ৬জন তাঁহাদের মন্ত্রী বা অন্য কর্ম্মচারী। এই রাজ্যগুলির ৭,১৯,৩৯,১৮৭ জন প্রজার মধ্যে একজনও মানুষ নাই! রাজা মহারাজারা যদি বলেন, তাঁহারাই প্রজাদের প্রতিনিধি, তাহা হইলে সেরূপ বাজে কথায় বিশ্বাস করিবার ভাণও সরকারী বেসরকারী ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন লোক করিবে না। দেশী রাজ্যসমূহের প্রজাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মের লোক কত, এবং "প্রতিনিধি"দের মধ্যে কতজন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক। রাজা-নবাবদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী। সে হিসাবে ১৬ জনের মধ্যে ৪ জন মুসলমান "প্রতিনিধি" বেশীই হইয়াছে। প্রজাদের মধ্যে ৫,৩৫,৮৯,৮৮৬ জন হিন্দু, ৯২,৯০,৯০২ জন মুসলমান। এই দুটি সংখ্যা অনুসারেও দেশী রাজ্যসমূহের মুসলমান "প্রতিনিধি"র সংখ্যা বেশী হইয়াছে।

আমরা ব্যবস্থাপক সভা বা অন্য কোন প্রতিনিধি-সভাসমিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও শ্রেণীর আলাদা আলাদা প্রতিনিধি চাই না। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা তাহার সমর্থন করেন, এবং বলেন, যে, গবর্মেণ্ট সকলের প্রতি, বিশেষতঃ সংখ্যান্যূন ও অনুন্নত শ্রেণী সকলের প্রতি, ন্যায়বিচার করিতে চান; এই কারণে আমরা (গণ্ড)গোল টেবিল বৈঠকের সভ্যদের নামতালিকা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতি গবর্মেণ্ট কিরূপ ন্যায়-বিচার করিয়াছেন, তাহারও কিছু নমুনা দিতে চাই। প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী; তাহার পর যথাক্রমে আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বিহার-উৎকল, পঞ্জাব…। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের পঞ্চাশ জন তথাকথিত প্রতিনিধির মধ্যে ১০ জন লওয়া হইয়াছে মান্দ্রাজ হইতে। সকলের চেয়ে সংখ্যাবহুল বাঙালীদের মধ্য হইতে লওয়া হইয়াছে মোটে পাঁচ জন। তাঁহাদের মধ্যে আবার স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র সরকারী লোক, সুতরাং তাঁহাকে কোন দিক দিয়াই বাঙালীদের প্রতিনিধি বলা যায় না। বাকী চারি জনের মধ্যে দুজন মুসলমান, দুজন হিন্দু। পঞ্জাবের লোক-সংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু পঞ্জাব হইতে মোট অন্যূন ছয় জন লোক লওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা পঞ্জাব হইতেও কম। সেখান হইতে অন্যূন আট জন লওয়া হইয়াছে। "অন্যূন" বলিতেছি এইজন্য, যে, কে কোন্ প্রদেশের লোক নামের দ্বারা তাহা সব স্থলে ঠিক করিতে পারিতেছি না।

মুসলমান বাঙালীদের ভাবিবার একটি কথা আছে। ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী মুসলমান বাস করেন বঙ্গে—২,৫২,১০,৮০২। তাহার পর পঞ্জাবে ১,১৪,৪৪,৩২১। কিন্তু পঞ্জাব হইতে তিন জন মুসলমান লওয়া

হইয়াছে, বাংলা হইতে দুজন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মুসলমানের সংখ্যা কেবল ৩৮,২০,১৫৩। সেখান হইতে তিনজন মুসলমান লওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশ ও অন্য সব প্রদেশ হইতে যেসব মুসলমান লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা প্রতিনিধিস্থানীয় কি না তাহার বিচার মুসলমানেরা করিবেন।

পঞ্জাবের সকলের চেয়ে বেশী লোক মুসলমান, সংখ্যায় হিন্দু ও শিখদের স্থান যথাক্রমে তাহার নীচে। যথা—

মুসলমান	১,১৪,৪৪,৩২১
হিন্দু	৬৫,৫৭,২৬০
শিখ	২২,৯৪,২০৭

কিন্তু "প্রতিনিধি" লওয়া হইয়াছে মুসলমানদের মধ্য হইতে ৩, শিখদের মধ্য হইতে ২ এবং হিন্দুদের মধ্য হইতে ১ জন।

বিহার উৎকলে হিন্দুদের সংখ্যা ২,৮১,৬৬,৪৫৭, মুসলমানদের সংখ্যা ৩৬,৯০,১৮২। কিন্তু তথাকার হিন্দুদিগের মধ্য হইতে কেবল একজন লোককে লওয়া হইয়াছে, এবং তিনি এক জন অনভিজ্ঞ, অল্পবয়স্ক জমিদার।

ভারতীয় নারীদের মধ্য হইতে দুইজনকে মনোনীত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একজন মান্দ্রাজের এক মন্ত্রীর স্ত্রী, সুতরাং তিনি আধা-সরকারী মানুষ। অন্য জন পঞ্জাবের অন্যতম প্রধান সাম্প্রদায়িক নেতা স্যর মহম্মদ শাফীর কন্যা। মনোনীত ভারতীয়দের মধ্যে তিন জন প্রাদেশিক শাসনপরিষদের সভ্য আছেন—বঙ্গের একজন, আগ্রা-অযোধ্যার একজন এবং মধ্য-প্রদেশের একজন। এই তিন প্রদেশে বেসরকারীর যোগ্য লোকদের সংখ্যা কি এতই কম যে, সরকারী লোক আমদানী করিতে হইল?

জলপথে স্থলপথে মাল আনয়ন ও প্রেরণ, আমদানী রপ্তানী শুল্ক, ব্রিটিশ মুদ্রার সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ের হার, ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা, প্রভৃতির দ্বারা ভারতীয়দের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের অবনতি বা উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এইজন্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় বিধিতে এমন কিছু থাকা চাই যাহার দ্বারা তাহার শিল্পকৃষিবাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু (গণ্ড)গোল টেবিল কন্‌ফারেন্সের জন্য ভারতীয় পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত একজনকেও লওয়া হয় নাই। বোম্বাইয়ের দেশী বণিকগণ সভা করিয়া বলিয়াছেন, এই কন্‌ফারেন্সের জন্য মনোনীত ভারতীয়েরা দেশের প্রতিনিধি নহেন, এবং কন্‌ফারেন্স দ্বারা ভারতবর্ষের অনিষ্টই হইবে। বোম্বাই হইতে মনোনীত লোকদিগকে সামাজিকভাবে একঘরো করিবার চেষ্টাও হইতেছে।

যে-সব লোককে মনোনীত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য লোক নাই এমন নহে। কয়েকজন যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি স্ব-স্ব দলের প্রতিনিধি সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা হইলে সেই সেই দলের লোক তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত। কংগ্রেস অবশ্য বৈঠককে বয়কট করিয়াছেন; কিন্তু উদারনৈতিক সংঘ, মুস্লিমলীগ প্রভৃতি উহাকে বয়কট করেন নাই। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে কেন নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দিলেন না? সরকার নিজের মনের মত লোক বাছিবেন অথচ বলিবেন, ইহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। ইহা হাস্যকর ব্যাপার।

যত লোকের নাম ফর্দ্দে আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের এবং সকলের সমষ্টির মতের সমর্থক ভারতবর্ষে কত আছে? বেশী নয়। তাহা অপেক্ষা বেশী সমর্থক ও অনুচর কংগ্রেসের আছে। সুতরাং কন্‌ফারেন্সে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের খুব কম লোকেরই প্রতিনিধি। অথচ তাঁহাদের তর্ক-বিতর্ক ও ক্রিয়া-কলাপ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও জাতির দ্বারা জগতে ঘোষিত হইবে।

পঞ্চাশ জনের মধ্যে জো-হুকুম অনেক আছেন, এবং অন্য অনেক আছেন যাঁহারা ভারতীয় মহাজাতি অপেক্ষা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন। এমন লোকও অবশ্য আছেন যাঁহারা জাতীয় কল্যাণই চান। কিন্তু অন্য এমন সব লোক লওয়া হইয়াছে, যাহাদের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য স্থাপন অসাধ্য বলিলেও চলে। ইচ্ছা করিয়া গবর্ন্মেণ্ট ঐরূপ

অনেক লোক মনোনীত করিয়াছেন কি না কেমন করিয়া বলিব? পরচিত্ত অন্ধকার। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠক **গণ্ডগোল** টেবিল বৈঠকে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ও আশঙ্কা আছে। তাহা যদি হয়, তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও জাতি জগৎকে বলিতে পারিবে, "এই দেখ ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্রাকার নমুনা; ইহারা নিজেরাই জানে না তাহারা কি চায়, সুতরাং আমরাই তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রধানতঃ সাইমন রিপোর্ট অনুযায়ী একটি সুব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম।" গোল টেবিল বৈঠক **গণ্ডগোল** টেবিল বৈঠকে পরিণত হইবার আশা কিংবা তাহাকে **গণ্ডগোল** টেবিল বৈঠকে পরিণত করিবার ইচ্ছা অনেক ইংরেজের ছিল ও আছে বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহাদের একটা মুখপত্র "ইংলিশম্যানে"র নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য পড়ুন। উহা ৮ই সেপ্টেম্বরের "ইংলিশম্যানে" বাহির হইয়াছে।

"The interests represented are too diverse for agreement, the range of subjects too great for practical consideration in the time at disposal. *Yet it is well that this should be shown to the world.* The inevitable consequence will be to give new weight to the Report of the Simon Commission." (Italics ours. Editor, *Prabasi.*)

তাৎপর্য্য। "যে-সব লোকসমষ্টির প্রতিনিধি লওয়া হইয়াছে তাহাদের স্বার্থ এত বিভিন্ন যে, ঐকমত্য অসম্ভব; যতটুকু সময় পাওয়া যাইবে তাহাতে এত বেশী বিবেচ্য বিষয়ের "কেজো" বা ফলপ্রদ বিবেচনা অসম্ভব। **তথাপি পৃথিবীকে ইহা প্রদর্শিত হওয়া ভাল।** সাইমন কমিশন রিপোর্টের গুরুত্ব বৃদ্ধি ইহার অনিবার্য্য ফল হইবে।"

শুনিয়াছি আইনে এইরূপ বলে, যে, কোন কথা কাজ বা ব্যবস্থার স্বাভাবিক বা অনিবার্য্য ফল যাহা, বক্তা কর্ম্মী বা ব্যবস্থাকারীর উদ্দেশ্য তাহাই ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া ন্যায়সঙ্গত। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন এবং কতকগুলি নানা মতের লোক তাহাতে হাজির করার উদ্দেশ্য কি এই ছিল, যে, উহা গণ্ডগোল টেবিল বৈঠকে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের অসামর্থ্য ও মতভেদ জগদ্বাসীর নিকট সুস্পষ্ট করে?

ইঙ্গ-ভারতীয় বৈঠকের কাজ ও কাজের প্রণালী

লণ্ডনে ইঙ্গ-ভারতীয় কন্ফারেন্সে কি কাজ হইবে, কিরূপ প্রস্তাবসমূহের আলোচনা হইবে, আলোচনার প্রণালী কিরূপ হইবে, এবং বৈঠক প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধে মীমাংসা ও সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইবেন, তাহা না জানিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে উহাতে যোগ দিবার জন্য যাইতেছেন, তাঁহাদের কাহারও বুদ্ধি নাই ও স্বদেশপ্রেম নাই বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি ও স্বদেশ-প্রেম কি-জাতীয় বুঝিতে পারিতেছি না।

লর্ড আরুইন বলিয়াছেন, দাসত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণস্বাধীনতা পর্য্যন্ত কোন্ রকম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতবর্ষের উপযোগী তাহার আলোচনা কন্ফারেন্সে হইতে পারিবে। কথাটা তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, না কিঞ্চিৎ উত্যক্ত হইয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু যেভাবেই তিনি উহা বলিয়া থাকুন, উহার মধ্যে সত্য আছে।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে কেহই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের কম কিছু চান না। অন্যদিকে অনেক বিখ্যাত ইংরেজ এবং ভারতপ্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ-সমিতি বলিতেছে, যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে যে অধিকার আছে, তাহাও কমাইয়া তাহাকে মর্লী-মিণ্টো আমলের অবস্থায় বা তাহারও আগেকার অবস্থায় আনা হউক। সাইমন কমিশন রিপোর্টেও ভারতীয়দিগের অধিকার কিছু কমাইবার এবং লাটদের ও আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা কিছু বাড়াইবার সুপারিস আছে। সুতরাং লণ্ডনের বৈঠকে ভারতবর্ষের কেবল রাষ্ট্রীয় উন্নতির আলোচনাই হইবে, অবনতির আলোচনা হইবে না, এরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধিরা কি বড়জোর এই বলিতে লণ্ডন যাইবেন, "হে প্রভুগণ, আমাদের আরও অবনতির ব্যবস্থা করিও না," এবং এই প্রার্থনার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিবেন? এতদিন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা করিয়াও তাঁহাদের সাধ মিটিল না?

অবশ্য পূর্ণস্বাধীনতা বা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের

আলোচনাও হইতে পারিবে। কিন্তু আলোচনা ও তাহার শেষ ফল কিরূপে নির্ণীত হইবে? বৈঠকের কার্য্য-প্রণালীর কোন আভাসই পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষ হইতে ৫০+১৬=৬৬ জন লোক মনোনীত হইয়াছেন, আরও কয়েকজন হইতে পারেন, সরকারী জ্ঞাপনীতে এরূপ আভাস আছে। ব্রিটিশ পক্ষের কতজন লোক বৈঠকে থাকিবেন, জানা নাই। তাঁহাদেরও তিন রাজনৈতিক দলের কি ৬০।৭০ জন লোক বৈঠকের সভ্য হইবেন? এ পর্য্যন্ত কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় না, যে, ব্রিটেনের এত প্রতিনিধি কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবে।

কিন্তু ভারতীয়দের সংখ্যার চেয়ে ইংরেজদের সংখ্যা যদি কম বা বেশী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইবে? লর্ড আরুইনের এক বক্তৃতায় আছে, যে, কন্‌ফারেন্সের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐকমত্য (এগ্রীমেণ্ট) যাহা হইবে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাহাকে ভিত্তি করিয়া পার্লেমেণ্টে বিল উপস্থিত করিবেন। কিন্তু ঐকমত্যটা কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবে? যে-যে প্রস্তাবে বৈঠকের সভ্যদের মধ্যে কেহই আপত্তি করিবে না, কেবল তাহাই বৈঠকের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে? তাহা হইলে ত ঐকমত্যের সম্ভাবনা খুব কম বলিতে হইবে। কারণ, বৈঠকটা গোল ত নহেই, প্রধানতঃ ত্রিকোণ ও ত্রিভুজ। এক বাহু বা পক্ষ ইংরেজ, আর এক বাহু ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা,এবং তৃতীয় বাহু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত ভারতীয়েরা। ব্রিটিশ পক্ষে ব্রিটিশ তিন রাজনৈতিক দলেরই লোক থাকিবে। ভারতবর্ষকে কত কম দেওয়া যায়, সে বিষয়ে মূলতঃ তিন দলের বেশী মতভেদ না থাকিলেও, পুরা ঐকমত্য না হইতেও পারে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ নামে রাজা হইলেও তাঁহারা ইংরেজের সম্বন্ধে ভারতীয় প্রজাদের চেয়ে অধিক দাসমনোভাবের পরিচয় দিতে বাধ্য। তথাপি সব বিষয়ে তাঁহারা ইংরেজদের মতে সায় দিতে পারিবেন না, এবং তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে ঐকমত্য হইবার সম্ভাবনা কম। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে গবর্ন্মেণ্ট যথাসাধ্য নিজেদের মনের মত সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকিলেও, তাদের সবাই "ধামাধরা" বা "জো-হুকুম" নয়। সুতরাং সবাই একমত হইয়া ইংরেজের মতে সায় দিতে পারিবে না।

অতএব, অনেক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে না মনে করা যাইতে পারে।

তাহা হইলে কি অধিকাংশের ভোট অনুসারে প্রস্তাবগুলির ভাগ্যনির্ণয় হইবে? সেই প্রণালীই যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে ভোটগণনা কি প্রকারে হইবে? ইংরেজ ও ভারতীয় প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট, এইরূপ একটা বুঝাপড়া আগে হইতে হইয়া বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইবে কি? তাহা যদি হয়, এবং যদি ইংরেজ সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, যে, কোন কোন বিষয়ে সব ভারতীয় একমত হইলে ব্রিটিশ পক্ষ হারিয়া যাইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজা ও প্রজাদের মধ্যে সম্ভবতঃ এত "জো-হুকুম" আছে, যে, এরূপ 'দুর্ঘটনা' না-ঘটিতেও পারে।

বৈঠকের সভাপতি কে হইবেন, তাহার আলোচনা বিলাতী সংবাদপত্রমহলে হইতেছে। কোন কোন কাগজ লয়েড জর্জ্‌কে সভাপতি করিতে বলিতেছে। একখানা কাগজ লিখিয়াছে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সভাপতি হইবেন স্থির হইয়াছে। তাহা অসম্ভব নয়। এত বড় একটা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হওয়া সঙ্গত। ভারতবর্ষের প্রতি সভাপতির মনের ভাবের উপর ভারতবর্ষের কম-পাওয়া বেশী-পাওয়া বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না, বলিতে পারা যায় না।

কংগ্রেসের নেতাদের সহিত মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে সন্ধির কথাবার্ত্তা নিষ্ফল হওয়ায়, বিলাতী অনেক খবরের কাগজে এই গুজব রটিয়াছে, যে, বিলাতী রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের নেতারা বৈঠকের সভ্য হইবেন না, তাঁহাদের দলের অন্য কোন কোন লোককে তাঁহারা বৈঠকে পাঠাইবেন। এই চালের অর্থ অনুমান করা যাইতে পারে। কংগ্রেসের নেতাদের বৈঠকে যোগ

দিবার কথা যদি স্থির হইত, তাঁহাদের অন্ততঃ কতকগুলি সর্ত্তে গবর্মেণ্ট রাজী হইলে তবে তাহা হইত। এই সর্ত্তগুলি ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাতে গবর্মেণ্ট রাজী হইলে, এরূপ সর্ত্ত পণ্ড করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্মেণ্টের বিরোধী রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের সর্ব্বপ্রধান লোকদের বৈঠকে উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইত। কিন্তু এখন কংগ্রেসকে বাদ দিয়া বৈঠক হইতে যাইতেছে। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকরা বেশ বুঝে, যে, কংগ্রেস-বর্জ্জিত বৈঠকে যাহাই স্থির হউক, তাহা সারতঃ কংগ্রেসের মতের ও দাবীর অনুযায়ী না হইলে, তাহার বেশী গুরুত্ব থাকিবে না। সুতরাং সেরূপ কোন নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা একটুও দায়ী হইবার লাঘব স্বীকার করিতে চান না। অধিকন্তু, যদিই ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষকে কিছু বেশী দেওয়া বৈঠকে স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে পার্লেমেণ্টে তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিতে চান। তাঁহাদের দলের লোকেরা বৈঠকে যোগ দিয়া কোন প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়া থাকিলেও দলপতিরা পার্লেমেণ্টে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অধিকারী থাকিবেন কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু সেরূপ আচরণ অসঙ্গতিদোষ দুষ্ট হইলেও ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের তাহাতে বাধিবে না।

ভারতবর্ষের উদারনৈতিকদের মধ্যে প্রধান প্রধান কোন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে লিখিয়াছিলেন, যে, বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দিলে তাহা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবে। অথচ তাঁহাদেরই কেহ কেহ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যাইতে রাজীও হইয়াছেন। অন্ততঃ এপর্য্যন্ত (৩১শে ভাদ্র পর্য্যন্ত) তাঁহাদের অসম্মতির কোন সংবাদ কাগজে বাহির হয় নাই। ভারতীয় উদারনৈতিক সংঘের গত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি স্যার ফিরোজ সেথনা এলাহাবাদের 'লীডার' কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি নিজের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, বৈঠকটাকে যত দূর সম্ভব সফল করিবার চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য। স্যার ফিরোজ সেথনা সম্প্রতি 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে বৈঠক সম্বন্ধে আশা ও আশঙ্কা উভয়ই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে যোগ দিবেন না, এমন কথা এ পর্য্যন্ত খবরের কাগজে প্রকাশ পায় নাই। ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা। তিনি নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন আন্দোলনে যোগ দিয়া দণ্ডিত হইয়াছেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিলাম। তিনি যাইবেন না বলিয়াছেন বলিয়া ৩১শে ভাদ্র পর্য্যন্ত শুনি নাই। হিন্দু মহাসভার প্রধান নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। হিন্দু মহাসভার কোন অধিবেশনে বৈঠক সম্বন্ধে কোন আলোচনা বা প্রস্তাব ধার্য্য হয় নাই। এ অবস্থায় কেবল মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা যাইতেছে বলিয়া ডাক্তার মুঞ্জেরও যাওয়া সঙ্গত হইবে মনে করি না। কাহাকেও পরামর্শ দেওয়া বা নিবৃত্ত করার ভার আমাদের উপর নাই। আমরা কেবল আমাদের মত প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সমাপন করি।*

সাইমন কমিশনকে কেবল কংগ্রেস বয়কট করেন নাই, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি প্রমুখ উদারনৈতিকরাও উহার সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখন সাইমন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়া অপমানকর মনে করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারাই ব্রিটিশ রাজনৈতিক ফাঁদে পা দিয়া কার্য্যতঃ লণ্ডনে সাক্ষ্য দিতে যাইতেছেন। একথা বলা বিন্দুমাত্রও অযৌক্তিক বা অন্যায় নহে। যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কোনই প্রতিশ্রুতি পান নাই। "তোমরা বলিবে আমরা শুনিব, আমরা বলিব তোমরা শুনিবে," ব্যাপারটা এইরূপ। তাহার পর সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া হইবে কিছুই জানা নাই। সিদ্ধান্ত কিছু হইলেও তাহাই যে আইনে পরিণত হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই।

---

* উপরোক্ত পংক্তিগুলি লিখিত হইবার পর সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ডাক্তার মুঞ্জে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই বৈঠকে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমাদের অনুমান, ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস দ্বারা বর্জ্জিত বৈঠকে যাহা স্থির হইবে, তাহা কংগ্রেসের দাবীর অনুরূপ হইবে না; সুতরাং তদনুসারে আইন হইলেও তাহা কাজে পরিণত করা দুঃসাধ্য হইবে। কংগ্রেস দ্বৈরাজ্যের (ডায়ার্কীর) বিরোধী ছিলেন। তাহা চলিল না; আবার নূতন কিছু করা আবশ্যক হইল। এখন কংগ্রেসের বিনা সম্মতিতে যদি অন্য কোন রকম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, কংগ্রেস তাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিবেন; সুতরাং তাহাও চলিবে না, এবং আবার একটা কিছু করা আবশ্যক হইবে। কেহ যদি মনে করেন, কংগ্রেসকে গবর্ন্মেণ্ট পিষিয়া ফেলিতে পারিবেন, সেটা ভুল। কংগ্রেস নামটা মরিতে পারে, জিনিষটা মরিবে না। উহা প্রবলতর ও উগ্রতর মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারে।

অতএব যাঁহারা গবর্ন্মেণ্টের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না-পাইয়া লণ্ডন বৈঠকে যাইবেন তাঁহারা ভুল করিবেন; কেন না তাঁহাদের শ্রম নিষ্ফল হইবে। আমরা ধরিয়া লইতেছি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অনেকে তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে অকপটভাবে দেশের সেবা করিতে যাইতেছেন। যাঁহারা পরের (অর্থাৎ গরীব ভারতীয়দের) পয়সায় বিলাতে আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিতে এবং ইংরেজের তোষামোদ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলার অসম্মান স্বীকার করিতে আমরা রাজী নহি।

—

সাপ্রু-জয়াকরের নিষ্ফল মধ্যবর্ত্তিতা

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর মধ্যবর্ত্তী হইয়া বড়লাটের এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যে শান্তি স্থাপনের কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন, আশ্বিনের প্রবাসীতে তাহার নিষ্ফল হওয়ার সংবাদ দিয়াছি। ঐ সংখ্যায় এই ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশও করিয়াছি। কেন করিয়াছি তাহা বলা হয় নাই।

গবর্ন্মেণ্ট যাহা বলিবেন, তাহাতেই সায় দিয়া কংগ্রেসের আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, এরূপ মত আমাদের কখনও ছিল না, এখনও নাই। গবর্ন্মেণ্ট যদি প্রতিশ্রুতি দিতেন, যে, কংগ্রেসের মূল দাবী গ্রাহ্য করা হইবে, এবং সেই সর্ত্তে যদি নেতারা আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টা থামাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম। তাহা হইলে দেশের বিস্তর শক্তিমান ও সাহসী লোক নানাপ্রকারে যে দুঃখ পাইতেছেন তাহার নিবৃত্তি হইত, বাণিজ্যের ও অন্য নানাপ্রকারের ক্ষতি নিবারিত হইত, এবং শক্তিমান লোকদের শক্তি দেশের নানাপ্রকার গঠনমূলক সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিত। ইহা হইল না বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি। নিজে যে দুঃখকে বরণ করিতে পারি নাই, অন্যের জন্য সেই দুঃখের দীর্ঘজীবন কামনা করিতে পারি না।

কিন্তু লর্ড আরুইন যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা বলা হইতে নিবৃত্ত আছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া একথা আমাদের মনে হইয়াছে, যে, কোনও কংগ্রেস নেতা এরূপ সর্ত্তে (অর্থাৎ এক প্রকার বিনাসর্ত্তেই) সন্ধি করিতে পারিতেন না। কেহ করিলে তাহা মহা দুঃখের কারণ হইত এবং সেরূপ সন্ধি কংগ্রেস দল কখনও গ্রাহ্য করিত না।

সন্ধির কথাবার্ত্তা নিষ্ফল হওয়ায় বিলাতী কাগজ মহলে আন্দোলন চলিতেছে। কোন কাগজ সভ্য ভাষায়, কোন কাগজ বা অভদ্র ভাষায় গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসকে কড়া কথা শুনাইতেছে। একটা কাগজ ত গান্ধীজীকে পাগল বলিতেও ছাড়ে নাই। গোটা দুই কাগজ কংগ্রেস পক্ষের দাবী ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছে। নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের যে সাপ্তাহিক জ্ঞাপনী বাহির হয়, তাহাতে সরকার বাহাদুর নেতাদের ঘাড়েই সব দোষ চাপাইয়াছেন।

একটা বিলাতী কাগজ বলিয়াছে, যে, নেতারা যেন ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন! ভারতবর্ষের যাহারা অহিংস সংগ্রামে সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছে, ইংরেজরা তাহাদের মনের গতি বুঝিতে পারিতেছে না। সত্যাগ্রহীরা ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ঘাড়ে নিজেদের

সর্ত্ত চাপাইবে, সত্যাগ্রহীদের মনের ভাব এরূপ নয়। তাহারা যাহা চায় তাহা তাহারা চাহিতেই থাকিবে, ইংরেজ তাহাদিগকে পিষিয়া ফেলিলেও দাবীটা ঐরূপই থাকিবে। তাহারা নিজে দুঃখ সহিয়া সফলকাম হইতে চায়। মনে করুন, ইংরেজরা সমস্ত সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করিয়া কিংবা ঠেঙ্গাইয়া কাবু করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বল তোমরা কি চাও। তোমরা সাইমনের প্রস্তাবগুলাতে রাজী কি না বল"; তাহা হইলেও কংগ্রেস পক্ষ হইতে এখনকার মত উত্তরই পাওয়া যাইবে। আমরা সত্যাগ্রহীদের মনের ভাব যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের বর্ত্তমান চেষ্টা বিফল হইলেও তাঁহারা বলিবেন, "ইংরেজদের যাহা ইচ্ছা তাহা তাহারা করিতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের মনের মত না হইলে তাহা আমাদের সম্মতিক্রমে করিতেছে, ইহা আমরা কখনও কোন অবস্থাতেও স্বীকার করিব না।"

বিলাতী কাগজওয়ালাদের মত আমাদের দেশের সম্পাদকেরাও বিচার করিতেছেন, সন্ধির কথাবার্ত্তার ব্যর্থতার জন্য কে বেশী দায়ী, বড়লাট না কংগ্রেসনেতারা। বলা বাহুল্য ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের কাগজগুলা সব দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইতেছেন। তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু দেশী কোন কোন কাগজও যে সব দোষ বা প্রায় সব দোষ নেতাদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন, তাহা ভাল লাগিতেছে না।

নেতাদিগকে কেহ কেহ এই জন্য দোষ দিয়াছেন যে, তাঁহারা 'ডেলী হেরাল্ডের' প্রতিনিধি স্লোকুম্ সাহেবকে যে-সব সর্ত্ত দিয়াছিলেন, তাঁহাদের শেষ সর্ত্ত কোন কোন বিষয়ে তাহা হইতে ভিন্ন। সত্য সত্যই বিশেষ কোন প্রভেদ হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার দরকার নাই। মানিয়া লইলাম, কিছু প্রভেদ হইয়াছে। তাহা স্বাভাবিক। কারণ মহাত্মা গান্ধী যে সর্ত্ত দিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু যে সর্ত্ত দিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তিগত ভাবে একা একা দিয়াছিলেন। তাঁহারা কোথাও বলেন নাই, যে, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঐ সব সর্ত্ত দিতেছেন, কিংবা কংগ্রেস উহার দ্বারা বাধ্য। পরে যখন অন্যান্য এমন কংগ্রেস নেতাদের সহিত তাঁহাদের আলোচনা হইল যাঁহারা তাঁহাদের অনেক পরে কারারুদ্ধ হওয়ায় দেশের আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা ও সত্যাগ্রহের অবস্থা অধিক জানেন, তখন সর্ত্তগুলি কিছু পরিবর্ত্তিত ত হইবেই। শেষে তাঁহারা যে সর্ত্ত দিলেন তাহাও কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি এবং সমগ্র ভারতীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

নেতারা যে-সব সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, একটি একটি করিয়া আলোচনা করিলে তাহার কোনটিই অযৌক্তিক মনে হয় না। তবে একথা অবশ্য উঠিতে পারে, যে, খুঁটাইয়া সবগুলির উল্লেখ করা এখনই দরকার ছিল কি না। আমাদের মনে হয়, নেতারা যদি ভারতবর্ষের জন্য সেই সব ক্ষমতা ও অধিকার চাহিতেন যাহা সব ডোমীনিয়নের বা কোনও ডোমীনিয়নের আছে, তাহাই যথেষ্ট হইত। ইচ্ছা হইলে ডোমিনিয়নগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে, ইহা তাহাদের একটি অধিকার। ইহা ইংরেজদের লেখা বহিতে পড়িয়াছি এবং মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও ভারতবর্ষের জন্য এই অধিকার দাবী করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাও ঠিক, যে, ইংরেজরা মনে করে, যে, প্রত্যেক ডোমীনিয়নেই এমন অনেক লোক আছে যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইতে চায় না এবং তাহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পৃথক হওয়া কঠিন; সুতরাং থিওরিতে ডোমিনিয়নগুলির পৃথক হইবার অধিকার থাকিলেও কাজ তদনুসারে হয় নাই, হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষও এই অধিকার পাইলেই পৃথক্ হইবেই, এইরূপ বলা যায় না। সব বিষয়ে স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইলে পৃথক হইবার আবশ্যক কি এবং তাহাতে লাভই বা কি? ডোমীনিয়নদের পৃথক্ হইবার ক্ষমতা যে আছে, তাহা আগামী অক্টোবর মাসের সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সে দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়র নেতা হার্টজগ পরিষ্কার করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সৈন্যদল ও রণতরী বিভাগের উপর ক্ষমতা নেতারা চাহিয়াছিলেন। ডোমীনিয়নদের নিজ নিজ আত্মরক্ষার বন্দোবস্তের উপর তাঁহাদের ক্ষমতা আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ণ ডোমীনিয়নত্ব পাইলে এই ক্ষমতা ও অধিকার তাহার অন্তর্গত থাকিত।

বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ বয়কট করিবার ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসার্থ প্রয়োজন ব্যতীত সুরা উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করা, লবণের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া সকলকে বিনা শুল্কে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া, প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণ ডোমীনিয়নত্বের অন্তর্গত মনে করা অযৌক্তিক নহে। অতএব সর্ত্তের মধ্যে এগুলি খুলিয়া না বলিলে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু খুলিয়া না বলিলেও যে বড়লাট কেবল একমাত্র সর্ত্ত পূর্ণ ডোমীনিয়নত্বে রাজী হইতেন তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেন-না, তিনি নেতাদের প্রধান একটি সর্ত্তে রাজী হন নাই, এবং অপ্রধান অনেকগুলিতেও রাজী হন নাই। বস্তুতঃ তিনি নেতাদের চিঠির সুরের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোন আলোচনা বা কথাবার্ত্তা চালান অসম্ভব বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ-সমূহ এই দেশেরই দ্বারা ন্যায়তঃ পরিশোধ্য কিনা, তাহা কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বা অন্য সমিতিদ্বারা পরীক্ষা করাইবার দাবী যে কংগ্রেসনেতারা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই করিয়াছেন। ইহা সাক্ষাৎভাবে ডোমীনিয়নের ক্ষমতার অন্তর্ভূত নহে বলিয়া, এবং এই দাবী কংগ্রেসে অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া, সম্ভবতঃ নেতারা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রশ্নটিও ডোমীনিয়নত্ব লাভের পর তুলিলে চলিত। হত্যা, দৈহিক হানি বা উভয়ের চেষ্টা প্রভৃতি হিংসাত্মক অপরাধ ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীদিগের মুক্তি, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত ছাপাখানা প্রভৃতি ফেরত দেওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাহারও সবগুলিতে বড়লাট স্পষ্টরূপে রাজী হন নাই।

—

বড়লাটের অকপটতা ও বদান্যতা

বিলাতী কোন কোন কাগজ বলিতেছে, বড়লাটের অকপটতা ও মহানুভব বদান্যতার প্রতিদান নেতারা করেন নাই। কোন মানুষ কপট কি অকপট তাহার বিচার করা প্রীতিকর নহে, তাহা আমরা করিতে চাই না। বিশেষতঃ বড়লাট কেবলমাত্র নিজের মত অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। তাঁহাকে প্রধান সব বিষয়ে নিজের শাসন-পরিষদের সভ্যদের এবং বিলাতী মন্ত্রীদের মত লইতে হয়। সুতরাং তাঁহার কথায় ও কাজে বা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের কাজে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি না থাকিলে তাহার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কতটা দায়ী, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুও নহেন। সুতরাং তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষটি যে কিরূপ তাহা জানি না। অতএব তাঁহাকে কপটও বলিতে চাই না, অকপটও বলিতে চাই না। কিন্তু তিনি যে-সব বক্তৃতা করিয়াছেন এবং মধ্যবর্ত্তীদের মারফৎ যাহা জানাইয়াছেন, তাহার মধ্যে মহানুভবতা বা বদান্যতার নামগন্ধ ত কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি বলিয়াছেন বটে, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যে-যে এবং যতদূর রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালন করিবার যোগ্যতা ও সুযোগ তাহার আছে; তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়াইবার চেষ্টা তিনি করিবেন। কিন্তু এই অতি-অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মধ্যে মহানুভবতা কোথায় আর বদান্যতাই বা কোথায়? প্রথমতঃ, তাঁহার এই অঙ্গীকারের মূল্য কি, তাহা জানা নাই। ইহা কি তাঁহার ব্যক্তিগত অঙ্গীকার, না ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অঙ্গীকার, না ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টেরও অঙ্গীকার? ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ত বলেন, যে, পার্লেমেণ্ট কি করিবেন তাহা অজ্ঞাত বলিয়া তাঁহারা কোন কথা দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, (এবং ইহাই বিশেষ করিয়া বিবেচ্য), কোন্ রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালনের কতটুকু যোগ্যতা ভারতবর্ষের আছে, তাহা লইয়াই ত ইংরেজদিগের ও ভারতীয়দের মধ্যে মতভেদ। তাহা অপেক্ষাও ভিত্তিগত মতভেদ এই, যে, আমরা যোগ্য কি অযোগ্য তাহার বিচার করিবার অধিকার কোন বিদেশী জাতির নাই। ভারতবর্ষের চেয়ে কম যোগ্য অথচ স্বাধীন অনেক দেশ পৃথিবীতে আছে। অবশ্য এটা খুবই প্রবল যুক্তি, যে, ভারতীয়দের যোগ্যতার

বিচার করিবার অধিকার কাহারও থাক্ বা না থাক্, ইংরেজরা এখন দেশটার মালিক; সুতরাং ভারতে জাতীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইলে হয় তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, যে, আমরা যোগ্য, নয় তাহাদিগকে কোন প্রকার শক্তিদ্বারা আমাদের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাইতে হইবে। আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে ইংরেজদের সব আপত্তি বার-বার খণ্ডিত হইয়াছে। এখনও যে-সব ইংরেজ আপত্তি করে তাহারা আমাদের খণ্ডন না-পড়িয়া বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন আপত্তিরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সুতরাং ইংরেজ জাতিকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া জাতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন আশা নাই মনে করিয়া কংগ্রেস সত্যাগ্রহের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। প্রথম চেষ্টায় ইহা ব্যর্থ হইতেও পারে, কিন্তু ইহা কালক্রমে সফল হইবেই।

বলিয়াছি, কোন্ দিকে ভারতবর্ষের যোগ্যতা অযোগ্যতা কিরূপ ও কত, সে-বিষয়ে ইংরেজ ও ভারতীয়দের খুব মতভেদ আছে। সুতরাং "তোমাদের যোগ্যতা অনুসারে তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাইবে," বড়লাটের এই প্রতিশ্রুতি কার্য্যতঃ অর্থহীন ও মূল্যহীন। ইহার একমাত্র পরিষ্কার মানে এই হইতে পারে, "আমরা তোমাদিগকে আমাদের সুবিধা ও ইচ্ছা অনুসারে যাহা দিতে চাই তাহাই তোমাদিগকে লইতে হইবে।" কথাটা দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদ করা যাক্। সব রাজনৈতিক দলের ইংরেজ বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষার ভার (অর্থাৎ উহা ইংরেজদের জাতীয় জমিদারী সম্পত্তি রূপে তাহাদের নিজ হস্তে উহার স্বত্ব রক্ষার ভার) সাম্রাজ্যের অর্থাৎ ব্রিটেনের হাতে থাকিবে, সৈন্যদল ও রণতরী বিভাগের উপর ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রভাব ও ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা আরও বলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গবর্ন্মেণ্টের বড়লাট ছোটলাট প্রমুখ রাজপুরুষদের হাতে থাকিবে, এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপ থাকিবে। ইহার মানে, তোমরা যত ইচ্ছা বকিতে ও লিখিতে পার, তোমাদিগকে সায়েস্তা করিবার ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকিবে। এরূপ অবস্থা যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বা কোনও প্রকার স্বায়ত্তশাসন নামের যোগ্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

ইংরেজরা আরও বলেন, দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা এবং সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা ও রাজপ্রতিনিধির থাকিবে। অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হইলেও, ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির উপর ব্রিটেন প্রভুত্ব করিতে থাকিবেন। সুতরাং সমগ্র ভারতে কখনও কোন অখণ্ড জাতীয় প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইতে পারিবে না।

ইংরেজপক্ষের আর একটা কথা এই, যে, পররাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন রক্ষণ ভঞ্জন প্রভৃতি কাজও ব্যবস্থাপক সভার এলাকার বহির্ভূত এবং ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতার অঙ্গীভূত থাকিবে। সুতরাং এদিকেও ভারতের জাতীয় কর্ত্তৃত্ব অসম্পূর্ণ থাকিবে।

এই সকল ও অন্য নানা বিষয়ে যদি বড়লাটের, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মত ইংরেজ সাধারণের মত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মূল্য কি যে আছে বলিতে পারি না। তাঁহার মত যে অন্য অধিকাংশ ইংরেজদের মত হইতে মূলতঃ ও সারতঃ ভিন্ন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আরও কয়েকটা কারণে তাঁহার গুণকীর্ত্তনে যোগ দেওয়া কঠিন হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তীদের মারফতেই হউক বা সাক্ষাৎভাবেই হউক, যাহাদের সহিত রফা ও সন্ধির কথা হইতেছে, তাহাদের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন—অভদ্রতা হউক বা না হউক—বিবেচকজনোচিত, বিজ্ঞজনোচিত, এবং প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক রীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু বড়লাট সন্ধিবিষয়ক পত্রেই সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টার অনিষ্টকারিতা ও অন্যান্য অখ্যাতি রটনা করিয়াছেন, এবং নেতাদের চিঠির সুরের নিন্দা করিয়াছেন। যাঁহাদের সহিত রফা ও সন্ধির কথা হইতেছে, তাঁহাদের ও তাঁহাদের কাজের প্রতি এইরূপ ভাষাপ্রয়োগ পরাক্রমের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু সৌজন্য, সুবিবেচনা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

তাহার পর গবর্ন্মেণ্টের দুই একটা কাজেরও পরিচয়

লউন। পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু নরম ও ভদ্রভাষায় স্লোকুম্ব সাহেবকে নিজের সর্ত্তগুলি জানাইবার পরই তাঁহাকে জেলে নিক্ষিপ্ত করা হইল। ইহা কিরূপ সৌজন্য ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক? যদি বলেন, তিনি বেআইনী কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার জেল হইল, ইহাতে আশ্চর্য্য কি, অসৌজন্যই বা কি? উত্তরে বলি, তাঁহার জেল হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি নুন তৈরী করিয়া লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন ও অন্যান্য বেআইনী কাজ করিয়াছিলেন। তখন সরকার বাহাদুর তাঁহাকে জেলে পাঠান নাই। এত মাস যদি সরকার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিলে কি সাম্রাজ্য উল্টিয়া যাইত? অথবা কোন আমলা কি মনে করিয়াছিলেন পণ্ডিত মোতীলালকে জেলে দিলে তাঁহার সর্ত্ত ও সুর আরও নরম হইবে?

ইহা গেল রফা ও সন্ধি আরম্ভ হইবার আগেকার কথা। রফা ও সন্ধির কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছে, তখন দুজন মহিলা সভ্য ব্যতিরেকে কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির (সভাপতিসমেত) সমুদয় সভ্যকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠান হইল। এই কাজটি কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট করেন নাই। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের, বড়লাটের, খাস এলাকাভুক্ত দিল্লীতে এই কাজ হইয়াছে। এই কাজটির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, বিবেচকতা, রাজনীতিজ্ঞতা, ও মহানুভবতার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দিল্লীতে আগে হইতে বেআইনী ঘোষিত ছিল না; ঐ সহরে তাহার অধিবেশন হইবার প্রাক্কালে উহাকে বেআইনী ঘোষণা করা হইল এবং তাহার পর সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হইল। তখন রফা ও সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অবশ্য কয়েক মাস যাবৎ বেআইনী কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দিল্লীতে যখন উহা এতদিন বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, এতদিন উহার অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিলে সাম্রাজ্য লুপ্ত হইত না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, উক্ত ঘোষণার সময় ডাঃ আন্সারী কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উহার অন্যতম সভ্য ছিলেন, ইঁহারা সত্যাগ্রহের আইন লঙ্ঘন কার্য্যে বহুদিন যোগ দেন নাই। তাঁহাদিগকে উষ্ণমস্তিষ্ক মনে করিবার কারণ নাই। তাঁহারা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাকে কোন্ পথে চালান, তাহা দেখিবার জন্য দুদিন অপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি হইত?

অবশ্য আমলাতন্ত্র তাঁহাদের প্রেষ্টিজের কথা ভাবিয়া থাকিবেন। ইহাও তাঁহাদের কেহ কেহ ভাবিয়া থাকিতে পারেন, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির পুরুষসভ্যদিগকে জেলে পাঠাইলে ভারতীয়েরা বুঝিতে পারিবে গবর্ন্মেণ্ট ভয় পান নাই। গবর্ন্মেণ্টও এখন বোধ হয় নেতাদের সর্ত্তগুলি হইতে বুঝিয়া থাকিবেন, যে, তাঁহারাও ভয় পান নাই। ঠিক্ কংগ্রেসের কাগজ এখন একখানাও নাই বলিলেও চলে। কিন্তু যাহাদের মত কংগ্রেসের সহিত কতকটা মিলে, সেই সব কাগজের লেখা হইতেও গবর্ন্মেণ্ট বুঝিয়া থাকিবেন, কংগ্রেসপক্ষীয় লোকেরা এবং তাহাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন লোকেরাও ভয় পায় নাই, এবং সন্ধির কথাবার্ত্তা নিষ্ফল হওয়ায় নিরাশ হয় নাই।

রফা ও সন্ধির কথাবার্ত্তার সময়ের মধ্যে সরকার বাহাদুর নেতাদিগকে যেমন ক্ষণিক রেহাইও দেন নাই, তেমনি সর্ব্বসাধারণের উপরও দমননীতি প্রবলতর বেগে চালাইয়া আসিয়াছেন এবং নূতন নূতন অঞ্চলে কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া আসিতেছেন। গবর্ন্মেণ্ট যে ভয় পান নাই বা পরাজিত হন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য এই সমস্তই আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট-নামধেয় মানুষগুলির মত কংগ্রেসনেতা-নামধেয় মানুষগুলিও রক্তমাংসে নির্ম্মিত মানুষ। ইংরেজ বা ভারতীয় কেহ কেন এরূপ মনে করেন, যে, গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে উগ্র হইতে উগ্রতর মূর্ত্তি গ্রহণ করা আবশ্যক ও সঙ্গত, কিন্তু নেতাদের পক্ষে তাঁহাদের সর্ত্তগুলি একটুও কড়া করা সঙ্গত নহে? কেহ কেন এরূপ আশা করেন, যে, গবর্ন্মেণ্টের দমননীতি যতই কঠোর হইবে, নেতাদের সর্ত্তগুলি ততই নরম ও লঘুপাক হইতে থাকিবে?

ব্যাজপ্রশংসা ?

বড়লাটের একটি চিঠি সম্প্রতি তিনি খবরের কাগজসকলের মারফতে প্রকাশ করিয়াছেন। উহা সন্ধির কথাবার্ত্তা উপলক্ষ্যে মধ্যবর্ত্তীদের আচরণ সম্বন্ধে। তিনি চিঠিখানার গোড়ায় তাঁহাদের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের সার্ব্বজনিক কার্য্যে সময় ও শক্তি ব্যয় এবং তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করি। তাহার পর, চিঠির ল্যাজে হুল থাকা সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবাদ অনুসারে বড়লাট মধ্যবর্ত্তীদের দোষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহাদের সহিত বড়লাটের যে-সব কথা গোপনীয় ভাবে হইয়াছিল, তাঁহারা তাহাও তাঁহার অনুমতি না লইয়া কংগ্রেস নেতাদিগকে বলিয়াছেন ও সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উত্তর মধ্যবর্ত্তীরা ঠিক দিতে পারিবেন, আমাদের মন্তব্য কেবল এই, যে, রাজনৈতিক দর কষাকষি যথাসম্ভব লিখিত আকারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবং মৌখিক কিছু হইলে তাহা অনতিবিলম্বে লিখিত আকারে যাঁহাদের মধ্যে কথা হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক; এবং কোন্‌টি প্রকাশিতব্য ও কোন্‌টি গোপনীয় তাহাও প্রত্যেক লিখিত জিনিষটির প্রত্যেক পাতার মাথায় লেখা থাকা দরকার, নতুবা ভবিষ্যতে বাদানুবাদ ও মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ঘটে।

সকলের চেয়ে ভাল হইত, যদি বড়লাট সাক্ষাৎভাবে সেই সব কংগ্রেস নেতাদের সহিত কথা কহিতেন যাঁহাদের মত মধ্যবর্ত্তীদের সাহায্যে জানা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া, কিংবা কয়েদের অবস্থাতেই একত্র করিয়া,তিনি ইহা করিতে পারিতেন। তাহা হইলে কাহারও ভুল বুঝিবার অবসর থাকিত না। ইহার বিরুদ্ধে এই একটি আপত্তি হইতে পারে, যে, তাহা হইলে লোকে বলিত, গবর্মেণ্ট প্রথমে অগ্রসর হইয়া সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও যে লোকের মনে সে সন্দেহ নাই, এরূপ বলা যায় না।

বড়লাট অতঃপর মধ্যবর্ত্তীরা তাঁহাকে না দেখাইয়া তাঁহাদের একটি নোট প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। নোটটি তাঁহাকে দেখাইয়া তাহার পর ব্যবহার করিবার কথা ছিল কিনা মধ্যবর্ত্তীরা বলিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষে বড়লাট একটি বিশেষ বিষয়ে মধ্যবর্ত্তীদের লেখা হইতে সর্ব্বসাধারণের ভ্রম জন্মিতে পারে বলিয়াছেন। বিষয়টি এই, নেতারা চাহিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সরকারী সব ঋণ নিরপেক্ষ কোন পক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইবে, কোন্ ঋণ ভারতবর্ষ পরিশোধ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, কোন্ ঋণ পরিশোধ করিতে ভারতবর্ষ বাধ্য নহে। মধ্যবর্ত্তীরা বলেন, বড়লাট তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সমুদয় সরকারী ঋণ এই প্রকারে অস্বীকার করিতে দিতে তিনি অসম্মত,কিন্তু কোন কোন দফা সম্বন্ধে কেহ ইচ্ছা করিলে গোলটেবিল বৈঠকে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। বড়লাট তাঁহার চিঠিতে বলিতেছেন, এমন কথা হইতে লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহার মতে কোন কোন ঋণ অস্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মতে প্রত্যেক সরকারী ঋণই ভারতবর্ষ শোধ করিতে বাধ্য। মধ্যবর্ত্তীরা বলিতে পারিবেন, এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত বড়লাটের কি কথা হইয়াছিল।

স্মৃতিবিভ্রম, ভাষার অস্পষ্টতা, বুঝিবার ভুল, বা অন্য কারণ হইতে উৎপন্ন ভুল কেবল মধ্যবর্ত্তীদেরই হইতে পারে, বড়লাটের হইতে পারে না, এমন নয়। বরং দুজন মানুষের একসঙ্গে ভুল হওয়ার চেয়ে একজনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

সরকারী ঋণ অস্বীকার করা যাইতে পারেই না, এমন নহে। কোন সময়ে কোন দেশের উপর যাহাদের কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহারা অন্যায় করিয়া যদি এমন কতকগুলা ঋণ সেই দেশের উপর চাপাইয়া থাকে, যাহা সেই দেশের উপকারের জন্য করা হয় নাই বা যাহার দ্বারা সেই দেশ উপকৃত হয় নাই, এবং যদি সেই দেশের লোককে পুরুষানুক্রমে সেই ঋণগুলার সুদ দিতে বাধ্য করা হয় এবং পরিশেষে আসল টাকাটা দিতে বাধ্য করা হয়; তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই অন্যায়। রুশিয়ার বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট আগেকার সরকারী ঋণ অস্বীকার করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন আমেরিকার নিকট অনেক বেশী টাকা ধার করিয়াছিল। তাহা অস্বীকার না করিলেও এখন ব্রিটিশ

প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাহা অপেক্ষা কম কিছু লইতে আমেরিকাকে রাজী করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং কোন গবর্মেণ্ট কোন দেশের নামে কিছু ধার করিলেই সেই দেশের লোক তাহা পুরুষানুক্রমে সুদে আসলে শোধ করিতে বাধ্য, বিধাতার এমন কোন বিধান নাই। যদি সেই দেশের গবর্মেণ্টের উপর সেই দেশের লোকদের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে ত বিশেষ বিশেষ সরকারী ঋণের পরিশোধনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেই পারে।

—

ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ

ইংরেজ আমলের আগে ভারতবর্ষের কোন সরকারী ঋণ ছিল না। রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশাহদের কাহারও কাহারও ঋণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু প্রজা-সমষ্টি তাহা শোধ করিতে বাধ্য ছিল না। অবশ্য নৃপতি তাহাদের সম্পত্তি লুটপাট করিয়া ঋণশোধ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। সে কথা স্বতন্ত্র।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই প্রথম ভারতবর্ষের উপর সরকারী ঋণ চাপান হয়। এগুলা সমস্তই কোম্পানী নিজের রাজ্য ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ করিয়াছিলেন। প্রজাদের হিতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৫৮ সালে ইহার পরিমাণ হয় ছয় কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পাউণ্ড। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার খরচ ইহার অন্তর্গত নহে। তাহা আলাদা। এই সমস্ত ব্যয় কোম্পানীর নিজের বহন করা উচিত ছিল। সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ও ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হয়। তাহাতে ভারতের সরকারী ঋণ দশ কোটি পাউণ্ডের উপর হইয়া যায়। ঋণ যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, প্রত্যেক ঋণের উল্লেখ করিয়া তাহার বোঝা ভারতবর্ষের উপর চাপাইবার ন্যায্যতা অন্যায্যতার বিচার করিব না। পাঠকেরা স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয় এবং এই দেশে ইংলণ্ডের রাজার রাজত্ব স্থাপিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার সময় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এককোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। এই এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড কোম্পানীকে দিয়া ইংলণ্ডেশ্বর অথবা ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষের রাজত্ব পাইলেন; কিন্তু টাকাটা ঋণস্বরূপ ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হইল। সম্পত্তির মালিক যিনি বা যাঁহারা হইলেন তাঁহারা মূল্য দিলেন না, মূল্য দিল ভারতবর্ষ। এই দেশ কোম্পানীর অধীনতার বিনিময়ে ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনতা পাইল এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড দিয়া।

আবিসীনীয় ও চীন যুদ্ধগুলার খরচও ভারতবর্ষকে ঋণ করিয়া বহন করিতে হয়, যদিও ইহাতে ভারতের কোন স্বার্থ ছিল না। এইসব খরচ সরকারী রেলওয়ে ও খাল নির্ম্মাণের ব্যয়, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের ব্যয় প্রভৃতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মোট ঋণ একুশ কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড হয়। বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় পচাশি কোটি পাউণ্ড। পাউণ্ড ও টাকার বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে ইহা ১,১৩২ (এগার শত বত্রিশ) কোটি টাকার সমান।

ঋণ এত বাড়িয়া যাইবার একটা প্রধান কারণ গত মহাযুদ্ধ। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষকেও এই যুদ্ধে টানিয়া ছিল। নতুবা জার্ম্মেনী ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন শত্রুতা ছিল না। ঋণ বাড়িল দুই প্রকারে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর সামরিক বিভাগের খরচ খুব বাড়িয়া যায়। বার্ষিক চলিত রাজস্ব হইতে তাহা সম্পূর্ণ নির্ব্বাহ করিবার সম্ভাবনা না থাকায় ঋণ করিয়া তাহার অধিকাংশ নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের নিকট হইতে থোক দেড়শত কোটি টাকা "স্বেচ্ছাকৃত" দান রূপে গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ঋণ মোটামুটি কুড়ি কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিনশত কোটি টাকা বাড়িয়াছে। ইহার কারণ, সামরিক ও অসামরিক ব্যয় যত বাড়িয়াছে, রাজস্ব তদনুরূপ বাড়ে নাই, সুতরাং কতক খরচ ঋণ করিয়া চালাইতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সরকারী সব ঋণই অ-লাভজনক এবং অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে, এরূপ

বলা যায় না। কিন্তু অনেক শত কোটি টাকা অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, এবং অনেক শত কোটি টাকা ঋণ করিয়া সামরিক ও অন্য ব্রিটিশ প্রয়োজনে রেলওয়ে ও অন্য এমন পূর্ত্তকার্য্য করা হইয়াছে, যাহা লোকসানের ব্যাপার। এই জন্য কংগ্রেস ও কংগ্রেসনেতারা চান যে, কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক আদালত বা কমিটি সব ঋণ ও তাহার ব্যয় পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিউন, কোন কোন্‌টি ভারতবর্ষ ন্যায়তঃ পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাঁহারা প্রত্যেক সরকারী ঋণই নির্ব্বিচারে অস্বীকার করিতেছেন না, প্রত্যেকটির ন্যায্যতা অন্যায্যতার পরীক্ষা চাহিতেছেন।

—

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর কারামুক্তি

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ বেসরকারী চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করেন। সেই মতের প্রভাবে গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার রোগ সম্বন্ধে সরকারী ডাক্তারদের মত লয়েন। তদনুসারে তাঁহার কারামুক্তি হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ অচিরে তাঁহার রোগমুক্তি কামনা করিতেছে। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিসের কাজ

সম্প্রতি কলেজ ষ্ট্রীট ও গোলদীঘিতে পুলিস যখন মিছিল ও জনতা ভাঙিতেছিল, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অট্টালিকা হইতে কাহারা নাকি "শেম শেম" ("ধিক্ ধিক্") বলিয়া চেঁচাইয়াছিল এবং পুলিসের উপর ইঁট-পাটকেল ছুঁড়িয়াছিল। পুলিসের অভিযোগ এইরূপ। ইহার সত্যতা পরীক্ষিত হয় নাই। আশুতোষ অট্টালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এম্-এ পাশ-করা ছাত্রেরা পড়ে, সেখানে ইঁট-পাটকেল সঞ্চিত থাকে না। ছাত্রেরাও তাহা সঙ্গে করিয়া আনে না। বাহিরের লোক সেখানে ঐসব "অস্ত্র" লইয়া ঢুকিয়াছিল কিনা, তাহারও কোন প্রমাণ প্রকাশিত হয় নাই। পুলিশ যখন তাহাদের কাজ সারিয়া চলিয়া গেল, তখন সেখানে অর্থাৎ অট্টালিকাটির বারান্দা ও কামরাগুলিতে অন্ততঃ ২।৪টা ঢিলও পড়িয়া ছিল কিনা, তাহাও কাগজে পড়ি নাই।

যাহা হউক, ধরিয়া লইলাম পুলিস যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু কোন জায়গায় কোন লোকে ধিক্ ধিক্ বলিলে বা ঢিল ছুঁড়িলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার পুলিসের আছে। কে অপরাধী তাহা স্থির করিতে না পারিলে উপস্থিত সকলকেই না-হয় পুলিস গ্রেপ্তার করিতে পারে। তাহাতে যদি তাহারা বাধা দেয় বা বল প্রয়োগ করে, তখন পুলিসের পক্ষে (সরকারী ভাষায়) "ন্যূনতম" বল প্রয়োগ করিবার কারণ ঘটে। কিন্তু আশুতোষ অট্টালিকায় এরূপ কিছু ঘটে নাই। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, পুলিস তাহার ভিতর ঢুকিয়াই অনেক ছাত্রকে বেদম প্রহার করে, অনেকে গুরুতর আহত হয়। ভাইস্-চ্যান্সেলার লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দী স্বয়ং সেখানে রক্তের দাগ দেখিতে পান। কয়েক জন ছাত্রকে হাসপাতালে যাইতে হয়। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠকেরা খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। পুলিসের কাজের সরকারী বা বেসরকারী* তদন্ত কিরূপ হইল বা না হইল, হইয়া থাকিলে তাহার ফল কি হইল, তাহা ১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত খবরের কাগজে দেখিতে পাই নাই। কাগজে কেবল দেখিয়াছি, যে, ভাইস্-চ্যান্সেলার এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, যে, অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বাড়ীতে বে-আইনী কিছু হইতেছে বলিয়া পুলিসের মনে হইলে পুলিস তৎক্ষণাৎ সেখানে না গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোন-না-কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিবেন। তাঁহার দ্বারা প্রতিকার না হইলে তখন পুলিস স্বয়ং কিছু করিতে পারিবেন। ইহা ভবিষ্যতের কথা, এবং এরূপ নিয়ম ভাল। কিন্তু অদূর অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পুলিসের দোষ থাকিলে তাহার কোন প্রতিকার হইবে না?

---

*কাগজে দেখিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহা আজ ২রা আশ্বিন শুক্রবার সীণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবার কথা।

ঢাকায় ছাত্রনিগ্রহের অভিযোগ

ঢাকায় দুজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে কে গুলি করায় এবং একজন মেডিক্যাল ছাত্র তাহা করিয়াছে বলিয়া পুলিসের সন্দেহ হওয়ায় মেডিক্যাল ছাত্রাবাসগুলিতে পুলিস খানাতল্লাস করে। তৎসম্বন্ধে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, পুলিস বহুসংখ্যক ছাত্রকে এরূপ প্রহার করে, যে, কয়েক ডজন ছাত্রকে হাসপাতালে যাইতে হয়। এরূপ অভিযোগও হইয়াছে, যে, পুলিস তাহাদের অনেক জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছে। তাহাদের আঘাতপ্রাপ্তির সরকার পক্ষের বর্ণনা অনুযায়ী এই কারণও কাগজে বাহির হয়, যে, পুলিস খানাতল্লাস করিতে আসিতেছে বলিয়া আতঙ্কে ছাত্রেরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইতে চেষ্টা করার নিজে নিজেই আঘাত পায়। এই কারণটির উল্লেখ পড়িয়া আমাদের স্কুলজীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট একটি ছাত্র নালিশ করে, যে, অপর একজন ছাত্র তাহার কানে কামড়াইয়া দিয়াছে। হেডমাষ্টার মহাশয় অভিযুক্ত ছাত্রটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, "না, স্যার, ও। নিজেই নিজের কানে কামড়াইয়াছে।" আমাদের সন্দেহ হয়, ঢাকার মেডিক্যাল ছাত্রেরা পুলিসের বদনাম রটাইবার জন্য পরস্পরকে আঘাত করিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া থাকিবে।

খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, ঢাকার নূতন পুলিস সাহেব সহানুভূতি সহকারে ছাত্রদের অভিযোগ শুনিতেছেন ও তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহার এইরূপ আচরণ ভাল চক্ষে দেখিতেছে। এরূপ স্থলে,বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কাহারও সহানুভূতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ বা প্রকাশ করা অনুচিত। সুতরাং তাহা আমরা করিতেছি না। কিন্তু বার-বার পুলিসের নামে অভিযোগ হইবে, এবং তাহার পর পুলিসের কোন বড় কর্ত্তা সহানুভূতি সহকারে অনুসন্ধান করিবেন, ইহা ভাল নয়। পুলিসের নামে অভিযোগ তিন প্রকারে নিবারিত হইতে পারে। প্রথম, একটা অর্ডিন্যান্স জারী করা, যে, খবরের কাগজে পুলিসের নামে অভিযোগ প্রকাশ দণ্ডনীয় হইবে; দ্বিতীয়, পুলিসের লোকদের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার করা যাহাতে সত্য অভিযোগের কারণ না ঘটে; তৃতীয়, বেসরকারী লোকদের নামে আদালতে নালিশ যে প্রকারের হইতে পারে, পুলিসের নামে নালিশও সেই প্রকারে হইতে পারিবে, এইরূপ আইন করা। বর্ত্তমানে আইন ঠিক্ এরূপ নাই।

—

ঢাকায় পুলিসের নামে নালিশ অগ্রাহ্য

কিছু দিন পূর্ব্বে আঘাতের ফলে অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের মৃত্যু হয়। আঘাতের বিবরণ দুরকম পাওয়া গিয়াছিল। এক, পুলিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরণ্য আইন ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া তদন্ত করিতে যায়। তখন পুলিসের সঙ্গে অন্য লোকদের সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষজাত ধস্তা-ধস্তিতে অজিতনাথ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া হাস-পাতালে মারা যান। অন্য বৃত্তান্ত এই, যে, অজিত অন্য কতক লোকদের সঙ্গে দর্শকরূপে দাঁড়াইয়াছিল, পুলিসকে কোন প্রকার বাধা দেয় নাই বা অন্য প্রকারে উত্তেজিত করে নাই। তথাপি পুলিস অজিত ও অন্যান্য দর্শকদের প্রতি ধাওয়া করিয়া প্রহার আরম্ভ করে। অজিতের উপর প্রহার সাংঘাতিক হওয়ায় সে মারা পড়ে। অজিতের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একজন সার্জেণ্ট এবং কয়েকজন কন্‌ষ্টেবলের নামে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তিনি ঢাকার তাৎকালিক পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হড্‌সন্ সাহেবের নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার জন্য বাংলা-গবর্মেণ্টের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। বাংলা-সরকার সে প্রার্থনা আগেই নামঞ্জুর করিয়াছিলেন।

মৃত ছাত্রটির ভ্রাতার উক্ত উভয় চেষ্টা বিফল হওয়ায় লোকের এ বিশ্বাস উৎপাদিত হইল না, যে, পুলিসের কাহারও কোন দোষ ছিল না। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য ও উক্তি প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষিত হইবার সুযোগ বন্ধ করিয়া দিলে লোকের সন্দেহ দূর না হইয়া দৃঢ়ই হইয়া যায়।

—

বেসরকারী পেশাওয়ার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পটেল মহাশয়ের সভাপতিত্বে পেশাওয়ারের হাঙ্গামার যে তদন্ত হয়, তাহার রিপোর্ট কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে কমিটির সিদ্ধান্ত-গুলি লাহোর দিল্লী, এলাহাবাদ ও বোম্বাইয়ের কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল। রিপোর্ট পুস্তকটিরও অনেক খণ্ড দেশের নানা জায়গায় এবং বিদেশে গিয়া থাকিবে। সুতরাং কমিটির বক্তব্য খুব জানা না-পড়িলেও অনেকে জানিয়াছে, এবং যতগুলি বহি ধরা পড়ে নাই তাহাও নিশ্চয়ই হাতে হাতে ফিরিতেছে। অতএব, একদিকে কমিটি যেমন সর্ব্বসাধারণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া জানাইতে পারেন নাই, অন্যদিকে তেমনি গবর্ন্মেণ্টও জিনিষটি সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারেন নাই।

এই বেসরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার এবং আমেরিকা পৌঁছিবার পূর্ব্বে একখানি প্রসিদ্ধ আমেরিকান্ সাপ্তাহিকের একজন সম্পাদকের লেখা "অমৃতসর ও পেশাওয়ার" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়াছি। তাহাতে পেশাওয়ারের ঘটনা সম্বন্ধে গান্ধীজির ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজের বৃত্তান্তই প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, সংবাদ চাপা দেওয়া দুঃসাধ্য।

বঙ্গের মডারেট নেতার একটি মন্তব্য

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের মডারেট দলের নেতা এবং ভারতসভার সভাপতি। তিনি ভারতসভার গত বার্ষিক অধিবেশনে ধীরভাবে সংযত ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি কংগ্রেস দলের প্রতি ইচ্ছা করিয়া অবিচার না করিলেও কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কথা বলিতে পারিয়াছেন মনে করি না। যাহা হউক, এই বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। গবর্ন্মেণ্টের লোকদের লেখায় ও বক্তৃতায় এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা দেখা যায়, যে, পুলিস ও শাসক কর্ম্মচারীরা খুব ধীর ও সংযত ব্যবহার করিতেছেন, দাঙ্গা মারপিট রক্তপাত ইত্যাদির জন্য বেসরকারী লোকেরা—বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের লোকেরা—দায়ী। অতএব দেশের অশান্ত অবস্থার কারণ সম্বন্ধে একজন ধীর ও শান্ত মডারেট নেতার মত জানা ভাল। যতীন্দ্রবাবু ভারতসভার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

In spite of the banning of public meetings in many localities and the difficulties placed in the way of the public press, the facts as to the violence committed by men employed under the executive administration receive widespread publicity leading gradually to an attitude which does not incline men to peace. Compared with the violence displayed towards the people, the violence on the part of the people has been negligible.

বিদেশী কাপড় বর্জ্জন

বিলাতী ও দেশী নানা কাগজে প্রকাশিত বিবরণ পড়িয়া বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে বিদেশী কাপড়ের আমদানী অনেকটা কমিয়াছে। সব রকম কাপড় প্রস্তুত করিবার যথেষ্ট উপকরণ দেশে আছে। সেইজন্য আশা করিতেছি, বিদেশী কাপড়ের আমদানী একেবারে বন্ধ হইতে পারিবে। তাহা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা বিক্রেতা ক্রেতা সকলকেই করিতে হইবে। পূজার কেনা-বেচা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে উহা শেষ হইবে। এই সময়, সকলের উচিত নিজে বিদেশী কাপড় ক্রয় হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং অন্য সকলকেও সৌজন্যসহকৃত যুক্তিদ্বারা নিবৃত্ত করা। শুধু বিলাতী ও অন্য বিদেশী কাপড় নহে, বৎসরের সকল সময়ে এবং বিশেষ করিয়া পূজার আগে অন্য অনেক রকম বিদেশী জিনিষ ভারতীয়েরা ক্রয় করেন, যাহা হয় অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য কিংবা দরকারী জিনিষ হইলেও যে জাতীয় জিনিষ দেশীও পাওয়া যায়। এই সব বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনীয়।

পাটের দর

এ বৎসর নানা কারণে পাটের দর এরূপ কমিয়াছে, যে, তাহাতে পাট উৎপন্ন করিবার খরচের অর্দ্ধেকও

পোষায় না। সেইজন্ত এবং অনেক জায়গায় বন্যা হওয়ায় পাটচাষীদের মধ্যে বড় অন্নকষ্ট হইয়াছে শুনা যাইতেছে। ইহারা প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের লোক এবং মুসলমান। পাটচাষীদিগের এই বিপদে কি প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি কলিকাতার আলবার্ট হলে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে গবর্মেণ্টকে উচিত মূল্যে চাষীদের পাট কিনিয়া রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিশোরগঞ্জের বহু গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা প্রহৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ার কারণ সরকারী মতে চাষীদের অন্নকষ্ট। এই কারণ সত্য হইলে, চাষীরা স্বাবলম্বনেরই একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল বলিতে হইবে। অনেক লুণ্ঠনকারী ধৃত ও দণ্ডিত এবং লুণ্ঠিত ধন ফেরত দিতে বাধ্য হয় নাই। যাহা হউক, উক্ত উপায়েও কিশোরগঞ্জ মহকুমার চাষীদেরও অন্নকষ্ট সম্ভবতঃ দূর হয় নাই; যে-সব জায়গায় লুণ্ঠন হয় নাই, সেখানকার ত কথাই নাই। সুতরাং পাটচাষীরা তাহাদের জিনিষগুলির উচিত মূল্য যাহাতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করা গবর্মেণ্টের নিশ্চয়ই উচিত। আলবার্ট হলের সভা জমিদারদিগকেও অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে ধার দিয়া ও অন্য প্রকারে সাহায্য করেন। গবর্মেণ্টকে আর একটা অনুরোধ সভা করিয়াছেন, যে, ভবিষ্যতে প্রতি বৎসর যথা সময়ে যেন চাষীদিগকে পাটের সম্ভাবিত চাহিদা অনুসারে কম বা বেশী পরিমাণ জমিতে উহার চাষ করিতে বলিয়া দেওয়া হয়।

(গণ্ড)গোল বৈঠকের সভ্যবৃদ্ধি ও হ্রাস

লণ্ডনের ইঙ্গ-ভারতীয় কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের যে তালিকা আগে বাহির হইয়াছিল, তাহার উপর এলাহাবাদের অধ্যাপক শাফাত আহমদ খানের নাম নূতন ঘোষিত হইয়াছে। অতএব, এখন ইতিপূর্ব্বেই অতিরিক্ত মুসলমান সভ্যের দল আরও পুরু হইল।

লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে, যে, শ্রীযুক্ত দেওয়ান চমনলাল বৈঠকে যোগ দিবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ওরূপ কনফারেন্সে তাঁহার বাঙ নিষ্পত্তি অরণ্যে রোদনের মত হইবে।

উৎকলবাসীরা বলিতেছেন, একজন উৎকলীয়কেও ডাকা হয় নাই, অনুন্নত শ্রেণীসমূহের লোকেরা বলিতেছেন, তাঁহারা সংখ্যায় মুসলমানদের সমান হইলেও তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল একজনকে ডাকা হইয়াছে। এই সব অসন্তুষ্ট মানব-সমষ্টি হইতে কোন এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া দেওয়ান চমনলালের শূন্য আসনে বসান হইবে কি?

বোবার শত্রু নাই ইহা যেমন সত্য কথা, মূকের মিত্র নাই ইহাও রাজনৈতিক ব্যাপারে সেইরূপ সত্য। সেই জন্য সাঁওতাল কোল ভীল মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের মধ্য হইতে একজনকেও ডাকা হয় নাই। তাহারা এজন্য চেঁচামেচিও করিতেছে না। তাহার কারণ এই হইতে পারে, যে, তাহাদের অতিবিশেষ বন্ধু ইংরেজ জাতি তাহাদের এরূপ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, যে, তাহারা সুখে মসগুল ও বাহ্যজগৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ায় কোণ-বিহীন কনফারেন্সের খবরই রাখে না।

—

সেনেটর ব্লেনের প্রস্তাব

আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সেনেটর ব্লেন তথাকার সেনেটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করেন, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে আমেরিকা যেন তাহা মানিয়া লয়েন, ভারতীয়েরা অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভের যে চেষ্টা করিতেছে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বলপ্রয়োগ দ্বারা যেন তাহা দমন না করেন, ইত্যাদি। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। এই প্রস্তাবের সমর্থন জন্য ব্লেন সাহেব ভারতবর্ষীয় কতকগুলি কাগজ হইতে গুলি চালান, লাঠি চালান প্রভৃতির বর্ণনা একত্র করিয়া তাহা তাঁহার প্রস্তাবের সহিত নথিভুক্ত করিবার অনুরোধ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই অনুরোধ অনুসারে কাজ হইবে, এবং সেনেটের সরকারী কার্য্যবিবরণে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহ হইতে গৃহীত বৃত্তান্তগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

—

দেশী ও বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী

সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য দেশী জীবনবীমা কোম্পানী অনেক থাকিতেও আমাদের দেশের অনেক লোক এখনও বিদেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করেন। ইহা দেশের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের বীমাকারীদিগের নিকট হইতে বৎসরে মোটা-মুটি পাঁচ কোটি টাকা পান। এই টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, কিংবা ভারতবর্ষে বিদেশীদের এমন সব কারবারে খাটে যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের ধন আরও বেশী করিয়া তাহারা আহরণ করিতে পারে। এইজন্য যাঁহারা জীবন-বীমা করিতে চান, তাঁহাদের কোন-না-কোন দেশী কোম্পানীতে বীমা করা উচিত।

গবন্মে'ণ্ট সম্প্রতি একটা বহি বাহির করিয়াছেন যাহার দ্বারা দেশী কোম্পানীগুলির ক্ষতি এবং বিদেশী কোম্পানী সমূহের সুবিধা হইতে পারে। সরকারী পুস্তকে লেখক দেশী কোম্পানী হইতে টাকা পাইবার বিলম্ব প্রভৃতি নানা অসুবিধার কথা লিখিয়াছেন, দেশী কোম্পানী কোথায় কবে ফেল হইয়াছে লিখিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু বিলম্ব যে সব স্থলে হয় না, এবং যখন হয় তখন তাহার কারণ যে কোম্পানীদের শৈথিল্য বা বেবন্দোবস্ত ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, তাহা বলেন নাই। যে-যে রকমের তথ্য দিয়া দেশী কোম্পানীগুলিতে বীমা করার অসুবিধা গবর্ন্মেণ্ট প্রকারান্তরে লোককে জানাইতে চাহিয়াছেন, বিদেশী কোম্পানীদের সম্বন্ধে সেরূপ কোন তথ্য দেন নাই।

আমরা এই পুস্তক দেখি নাই। দেশী জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের যে-একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক মহাশয়ের লেখা একটি চিঠি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান হইতে উপরের প্যারাগ্রাফটি লিখিত।

বিশ্বভারতীতে উৎসব

সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে হলকর্ষণ উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট বলদের জন্য ও চাষের জন্য কয়েকজন চাষীকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ব-ভারতীর কৃষিবিভাগের জন্য যে বিস্তৃত ভূখণ্ড ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচখানি সাঁওতাল গ্রাম পড়িয়াছে। এই সব গ্রামের পুরুষ ও নারী উৎসবে যোগ দিয়াছিল। উৎসবান্তে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে সাঁওতাল কৃষকদিগকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

বার বৎসর পূর্ব্বে প্রসাদ-নামক একটি বালক শান্তি-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর বালকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। তাহার নামে সেটি এখনও চলিতেছে। একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও ঐ গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্পাদক যে প্রতিবেদন পাঠ করেন, তাহা হইতে জানা যায়, যে, ভুবনডাঙ্গা গ্রামে, যে-সব নারী ইস্কুলে আসিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার ভারও বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা লইয়াছেন। তা ছাড়া, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের পল্লীসেবাসংঘ গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা কাজ করেন ও করান, রোগীর চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করেন, ছেলেদের খেলার আয়োজন করেন, এবং অন্যান্য উপায়ে পল্লীবাসী-দের সহিত সহৃদয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

মুসলমান বন্ধুগোষ্ঠী

কলিকাতায় সম্প্রতি অধ্যাপক আবদুর রহিম সস্ত্রীক কতকগুলি বন্ধুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। উদ্দেশ্য, কোন দল গঠন নহে, কিন্তু এমন একটি মিত্রগোষ্ঠী গঠন যাঁহারা নিজেদের মধ্যে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের মহল্লায় সামা-জিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ও মত গঠনের চেষ্টা করিবেন। ইঁহারা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি চান না, বিশুদ্ধ ইসলামের এবং তদনুযায়ী ভারতীয় স্বাজাতিকতার পক্ষপাতী। এই মিত্রগোষ্ঠীর সাফল্য বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী কার্য্যালয়ের ছুটি

প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ১১ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ২৬শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর হইতে সমুদয় কাজ আরম্ভ হইবে।

যুদ্ধে পায়রার ব্যবহার—

পায়রা রাত্রিতে উড়ে না ইহা এতদিন স্বতঃসিদ্ধ ছিল, কিন্তু মানুষের পাল্লায় পড়িয়া পায়রাকে সে সংস্কার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গত যুদ্ধে পায়রা সংবাদবাহকের কাজ করিয়াছে। বেতার টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ কিম্বা মানুষ সংবাদবাহকের চেয়ে বেশী সংবাদ তাহারা বহন করিয়াছিল। কিন্তু গত যুদ্ধের পায়রাও রাত্রিতে উড়িতে জানিত না। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝা যায়, যে রাত্রিচর হইলে পায়রারা সংবাদবাহকের কাজ আরও অনেক ভাল করিতে পারিবে। তাই যুদ্ধের পর আমেরিকায় রাত্রিচর একদল পায়রা সৃষ্টি

এরোপ্লেন হইতে পায়রাকে ছাড়া হই

একটি সংবাদবাহী পায়রা। ইহার নাম লিলি। এই পায়রাটি রাত্রিতে সংবাদ লইয়া যাইবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

গাড়ীতে বসান পায়রার খোপ
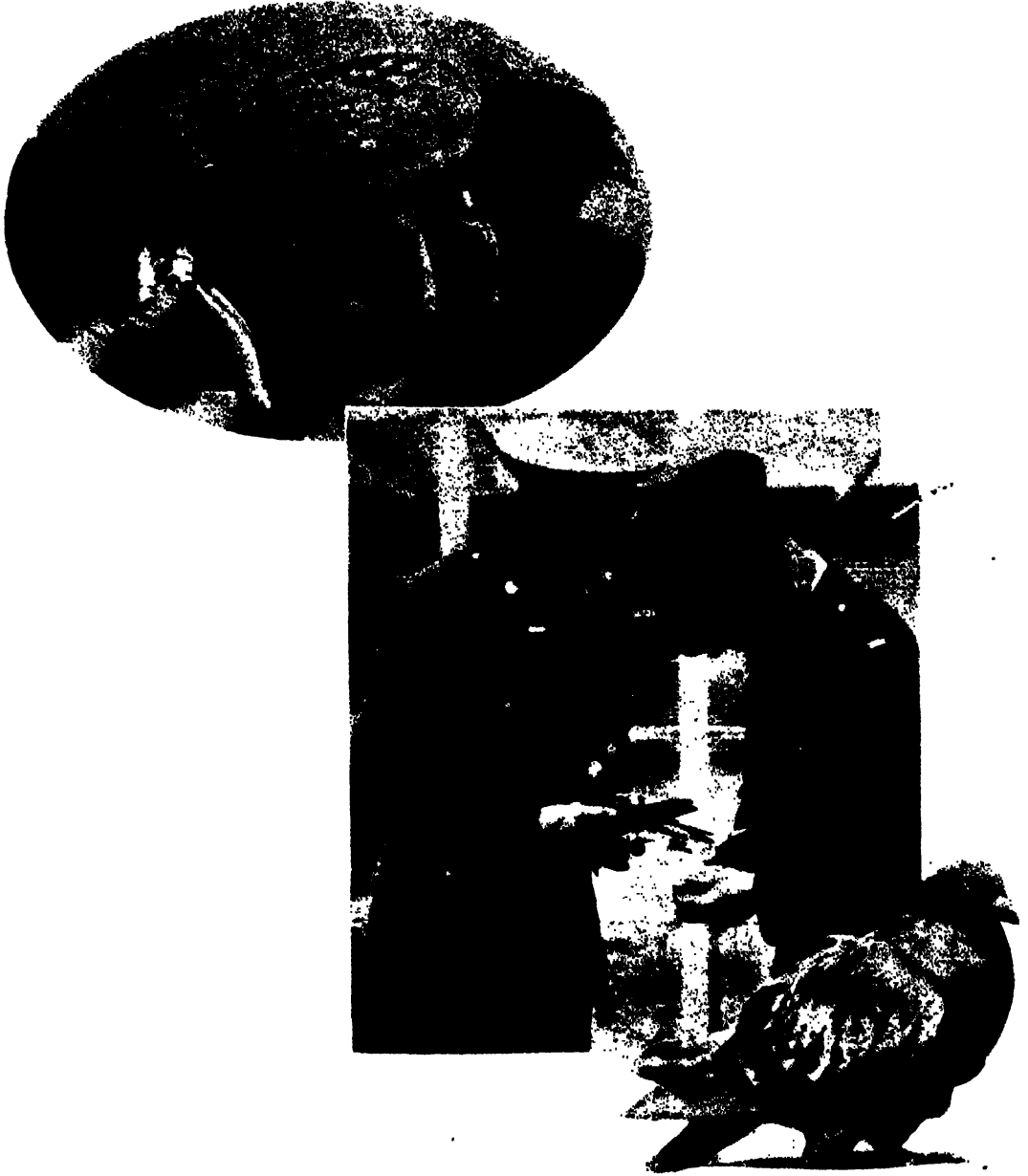
উপরে—পায়রার পায়ে একটি চোঙের মধ্যে চিঠি পুরিয়া দেওয়া হইতেছে। মাঝের ছবিতে 'আঙ্কল স্যাম'-এর পা হইতে চিঠি বাহির করা হইতেছে। নীচের ছবিটি 'শের আমি' নামক পায়রার। ইহা যুদ্ধের সময়ে একটি সৈন্যদলকে বাঁচায়।

করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। বহু পরিশ্রম ও চেষ্টার পর কতকগুলি রাত্রিচর পায়রা তৈরী হইয়াছে। এই রকম ৬টি পায়রাকে মনমাথ দুর্গ হইতে ছাড়া হয়। ১৩ মাইল দূর হইতে রাত্রির অন্ধকারে তাহারা ঠিক ঠিক তাহাদের পাঁচায় ফিরিয়া আসে। এদের মধ্যে একটি সব চেয়ে কম সময়—২০ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসে। জারূসী দুর্গের পায়রাদের পানামা, ফিলিপাইন, হাওয়াই প্রভৃতি নৌ-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে তাহারা অনেক বেশী রাত্রিতে উড়িবার কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

সংবাদবাহী পায়রা রাত্রিচর হওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, তাহারা রাত্রির আড়ালে শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া সংবাদ বহন করিতে পারে। গত যুদ্ধে জার্ম্মাণী এবং মিত্রদল উভয় পক্ষই যোদ্ধা পায়রাদের গুলি করিয়া মারিয়াছে। এমন কি জার্ম্মাণরা ইহাদের মারিবার জন্য বাজ এবং শিকরে লাগাইয়াছিল, অবশ্য বাজ এবং শিকরেরা শত্রু এবং মিত্র পায়রাতে তফাৎ করিতে পারিত কি না বলা শক্ত।

পায়রার রাত্রির ভয় দূর করিবার জন্য প্রথম রীতিমত গবেষণা সুরু হয়। গত যুদ্ধে যে যে পাখী সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরিয়াছে

উপরে—পাস্তোর ইনষ্টিটিউটে আমেরিকা হইতে আগত একজন বিদ্যার্থিনী পরীক্ষায় নিযুক্ত।

নীচে— একজন সামরিক কর্মচারীকে জলাতঙ্ক রোগের জন্য চিকিৎসা করা হইতেছে।

তাহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। সেই সব পাপী এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটা সন্ধ্যায় উড়িবার পরীক্ষা হইয়া যাহারা কৃতিত্ব দেখায় তাহাদের সন্তান উৎপাদনের জন্য রাখা হয়।

কেবল সন্ধ্যায় উড়িবার পরীক্ষা পাশ করার দরুণই তাহাদের গ্রহণ করা হয় তাহা নয়। ইতিপূর্ব্বে তাহারা এক জেনেরেশান সংবাদবাহী পায়রা সৃষ্টি করিয়াছে কি না তাহাও দেখা হয়। এই পরবর্ত্তী বংশধরদের দুইটি বৃত্তিই খুব প্রবল হয়, একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরা, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের ঘরের আকর্ষণ। দেহের দিক হইতেও তাহারা খুব পরিপুষ্ট হয়। এক শ' মাইল তাহারা অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে।

রাত্রিচরদের শিক্ষা অতি অল্পবয়সে আরম্ভ হয়। আঠার দিন বয়সেই খাঁচা হইতে বাহির করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের বসাইয়া রাখা হয় যাহাতে তাহারা সন্ধ্যার জগৎটাকে চিনিতে পারে। অতি

পাস্তোর ইনষ্টিটিউট এ রোগের বীজাণুকে বোতলে বন্ধ করিয়া [illegible] চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য রাখা হয়। বীজাণুগুলিকে সতেজ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে নলে করিয়া একটু একটু জল দেওয়া হইতেছে।

নীচের ছবিতে 'সেরাম' ও ভ্যাক্সিন তৈয়ারী করিবার যন্ত্রাদি।

অল্পসময়ের জন্য তাহাদের এই স্বাধীনতাটুক দেওয়া হয়। তার পরেই তাহাদের আবার খাঁচায় পুরা হয়। এই খাঁচার দরজা ৪" ইঞ্চি লম্বা ১" ইঞ্চি চওড়া। সুতরাং দরজা খোলা থাকিলেও স্বাধীনমত তাহারা কিছুতেই বাহিরে আসিতে পারে না। রাত্রির প্রকৃতিকে চিনিবার সুযোগ ছয় সপ্তাহ দেওয়া হয়। উড়িবার ক্ষমতা হইলে তাহাদের আধ ঘণ্টা ধরিয়া উড়ান হয়। অন্ধকার হইয়া গেলে খাবার ভরা টিনের বাজাইয়া নীচে নামাইয়া খাওয়ান হয়।

উড়িতে শিখিবার দুই সপ্তাহ পরে আধ মাইল দূরে গাছপালা ঘর বাড়ী হীন ময়দানে লইয়া গিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অমনি ছাড়িয়া দিলে তাহারা চিরকালের সংস্কার মত অন্ধকারে চুপচাপ বসিয়া থাকে কিন্তু জোরে আকাশের দিকে ছুড়িয়া দিলে অন্ধকার সত্ত্বেও তাহারা উড়িতে বাধ্য হয়। এবং উড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। দূরত্ব ক্রমেই বাড়ান হয়, ১০০ মাইল হইলে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

এই বানরটির উপর একটি ঔষধের পরীক্ষা হইতেছে

শিক্ষাকালে অন্ধকারে উড়িবার দিকে যেমন নজর দেওয়া হয় পাখাদের ঘরে ফিরিবার প্রবৃত্তিটাকে খুব প্রবল করিবার চেষ্টাও চলে। ইহার জন্য তাহাদের ২৪ ঘণ্টা খাবার না দিয়া উড়ান হয় এবং ঘরে ফিরিতেই তাহাদের খাইতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন জোড়া বাঁধিয়া উড়ে তখন স্বামী স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেও তাহাদের ঘরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

সুশিক্ষিত পাখী ঘণ্টায় ৫০ মাইল উড়িতে পারে। গতবার আমেরিকার পাখীর রেসে 'ডোবর' নামে একটা পাখী ঘণ্টায় ৮০ মাইল উড়িয়াছিল। "টোপেকো হেন" সব চেয়ে বেশী দূর ১৫০০ মাইল উড়িয়াছিল। স্কট ফিল্ড আর একটি বিখ্যাত পক্ষী।

গত যুদ্ধের দুইটি সংবাদদাতা মাত্র বাঁচিয়া আছে। দি মকার 'বোমেঁ'র যুদ্ধে একটি চোখ হারাইয়া ও সংবাদ লইয়া যথাস্থানে পৌঁছায় এবং তাহার ফলে বহু আমেরিকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। 'স্পাইক' এটি অতি দরকারী খবর বহন করিয়াছিল। 'শের আমি' ছিল সব চেয়ে বিখ্যাত পাখী। তাহার বুকে একটি গুলি লাগিলে এবং একটা পা উড়িয়া গেলেও একটি খবর সে দেয় যাহাতে একটি সৈন্যদলের ২৫০ জন লোকের প্রাণ বাঁচে।

—

প্যারিসের পাস্তোর ইন্‌স্টিটিউট্‌—

প্যারিসের পাস্তোর ইন্‌স্টিটিউট্‌ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোগনিবারক ঔষধের কারখানার অন্যতম। বেক্টেরিওলজি বিজ্ঞানের স্রষ্টা লুই পাস্তোরের বিজ্ঞানাগার রূপে প্রায় ৫০ বৎসর আগে দেশের লোকের অর্থে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তোরের মৃত্যুর পর হইতে তাহার উদ্ভাবিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। পপুলার সায়েন্স নামক আমেরিকার একটি পত্রিকায় এই কারখানার ছবি প্রথম বাহির হয়। এই কারখানার সঙ্গে একটি বিজ্ঞানাগার আছে সেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ রিসার্চ্চ করিতেছেন এবং পাস্তোরের পর আরও বহু নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গীতগোবিন্দের একটি দৃশ্য

একখানি প্রাচীন চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

২য় সংখ্যা

রাশিয়ায় লোকশিক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

মস্কো

কল্যাণীয়েষু

রথী, রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখচি আশ্চর্য্য ঠেকচে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলচে। চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্য্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হয়েচে এর কোন উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আরেক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না;—কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহ করার জন্যে ত মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেচে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। মুস্কিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিষ করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সভ্যতার সহায়তা করা সম্ভব। যাই হোক আমি ভাল করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ

মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে। ভেবে দেখ না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে ইংলণ্ডকে চির-দিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড় হয়ে উঠে মানব-সমাজে বড় কাজ করচে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের জন্যে একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায় কম পরে তাতে কি যায় আসে, তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে আসে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ। প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে-মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলচে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়চে তা দেখে আশ্চর্য্য হচ্চি। আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্চে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ ত প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কি আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হচ্চে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায় তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্ম্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কি প্রচুর আয়োজন ও কি বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এসিয়ার অর্দ্ধ-সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেচে—সায়ন্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায়, এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখচে তারা কৃষি ও কর্ম্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করেচি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্য্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের ত কথাই নেই—ইংলণ্ডে মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েচি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করচে। আমাদের কর্ম্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহ'লে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কি হয়েচে আর কি হতে পারত। হ্যারি টিম্বর্স এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করচে—তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে—আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলিনে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্চে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েচে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয়, মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্চে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষা-সত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটু-খানি ছিটেফোঁটা শেখানো না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার—বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান। ম্যাডাম দিনা আমাদের ইলেক্‌ট্রিসিটি ও জল দেবেন কথা আছে, এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে। আমাদের ওখানে যে ছাপাখানা আছে তাতেও পালা করে ছেলেদের শিক্ষানবিশি করা উচিত, তা ছাড়া মোটরের কাজ—শুধু গাড়ি চালানো নয়, ওর যন্ত্রতত্ত্ব।

কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত ছুটো। থাকে আড়ষ্ট, সর্ব্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে; তারপরে শারীর বিজ্ঞান। এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্ম্মের ভার দেওয়া হয়েচে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম তদারকের দায়িত্ব নেয়, কর্ত্তৃত্ব সবই ওদের হাতে কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেচি—কেবলি নিয়মাবলী রচনা হয়েচে, কোনো কাজ হয়নি। তার অন্যতম কারণ হচ্চে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েচে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ্য; অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই—আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথি-মুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই—নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে সব কথা এতকাল ভেবেচি এখানে তার বেশী কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্য্যকর্ত্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয় অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য—এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়—মাথা গুণতি করে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়—তারা পুরো একখানা মানুষ নয়।…

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

ওঁ

"ব্রেমেন" জাহাজ

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল, আমাদের দেশে পলিটিক্স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সব রকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেচে। এ সম্বন্ধে সুরেনকে আমি আগেই লিখেচি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট্, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মত গিলে ফেলেছিল, ল্যাজের পাকে যাকে সে জড়িয়েচে তার হাড়গোড় দিয়েচে পিষে। প্রায় বছর তের হ'ল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝ্‌তেই পারচ ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ, ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্ব্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এত বড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেচে—আর্ট সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্দ্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কি দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্ত-প্রাসাদকে কি রকম ধূলিসাৎ করে দিয়েচে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কি রকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েচে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না। সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেচে, কিন্তু যে-ঐশ্বর্য্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্ব্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেচে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েচে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েচে। শুধু পেটের ভাত পশুর

পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—একথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো একথা তারা স্বীকার করেচে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিষ নীচে তলিয়ে গেছে একথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েচে এবং ভরে উঠেচে ম্যুজিয়ম, থিয়েটর, লাইব্রেরি, সঙ্গীতশালা। আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্ম্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন খুসি হাত চালিয়েচে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চূণকাম করতে সঙ্কুচিত হয় নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্ত্তারা আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্ত্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েচে—তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্ব্বজনের সর্ব্বকালের পক্ষে একথা তারা মনে করেনি, এমন কি পুরোনো পুজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই করেচে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিষ আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার করবার জো নেই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন—সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না। ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায় প্রাচীন অনেক পুথি মঠে মঠে আটক্ পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্ম্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েচে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্চে ম্যুজিয়মে। একদিকে যখন আত্মবিপ্লব চল্‌চে, যখন চারিদিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েচে প্রত্যন্ত প্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুথি, কত ছবি, কত খোদকারীর কাজ সংগ্রহ হ'ল তার সীমা নেই।

এতো গেল ধনীগৃহে ধর্ম্মমন্দিরের যা-কিছু পাওয়া গেছে তার কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্ম্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী পূর্ব্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েচে। শুধু ছবি নয় লোকসাহিত্য লোকসঙ্গীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবলবেগে কাজ চল্‌চে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্ব্বেই সুরেনকে তার বিবরণ লিখেচি। এতকথা যে তোমাকে লিখচি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বচ্ছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্ত্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল, সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সমস্তই আছে,—অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্য শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর। কাগজে পড়লুম সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন-উপলক্ষ্যে হুকুম পাস হয়েচে প্রজাদের কান মলে শিক্ষা-কর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েচে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষা-কর চাই বই কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গবর্ণর, ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্সন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে সব বড় বড় বিলাতী মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি ক'রে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরাপেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না?

একেই বলে শিক্ষার জন্মে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্তে কিছু দিয়েও থাকি—আরও দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল, এবং আমিই তাদের দিচ্চি, দিচ্চে না এই রাজ্যশাসকদের সর্ব্বোচ্চ থেকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্তে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্চে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পয্যন্ত সকলেই নিয়েচে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেণ্ট এতদিন পরে ছশো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম, গবর্মেণ্টের প্রশ্রয় শালি-বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করার জন্তে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেচে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্তেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মানুষরা এদের অধার্ম্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে ? মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে ?

অনেক কথা বলবার আছে। এ রকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেচি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সঙ্কল্প আছে। অনেকবার মনে হয়েচে আর কোথাও নয় রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে, কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্ত নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক্, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাইনে। আমি যে আর্টিষ্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পয্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলি মনে হয় দৈবগুণে পেয়েছি নিজ গুণে নয়।

ভাসচি এখন মাঝ সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কি আছে জানিনে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব ? ইতি ৫ই অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কা'র কথা ?—কাহারি সে মরমের অবরুদ্ধ গান,
শুনিব প্রান্তর-তীরে বসি ?
কোন্ আলো, রজনী রূপসী
অমার অঞ্চল মেলি সচকিয়া করিছে সন্ধান ?
কা'র সে নিঃশব্দ রূপ, প্রাণ ভরি হেরিছে ধরণী ?

নাহি জানি কি সে মোহ !—হেরি দূরে নীলকান্ত মণি
অন্ধকার-অজগর শিরে।
সিন্ধুর ফেনিল কালো নীরে,
বিজলী ঝলকি উঠে মর্ম্মান্ত শিহরে।—পদধ্বনি,
শুনি শুধু—সেথা কোন্ মায়াবিনী অমরী পরীর।

কল্পনা-বিহগী বুঝি শিহরিছে আকাশ-শরীর
বন্ধহীন ডানার ঝাপটে।
ছায়াম্লান সুদূর পর্ব্বতে,
নির্ঝর-কিঙ্কিণী বাজে !—উদাসীন দক্ষিণ সমীর,
ফিরিছে মাধবীবনে ;—দূরে বাজে বধূর মঞ্জীর !

লক্ষ্মী *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

১

লক্ষ্মীপূজা হিন্দুর একটী বিশিষ্ট পূজা। লক্ষ্মীদেবী বরাবর হিন্দুগৃহে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। প্রতি গৃহে লক্ষ্মীপূজার বিধি আছে। গৃহই লক্ষ্মীর মন্দির, কাজেই লক্ষ্মীর আর স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ মন্দির আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মন্দিরে অন্য দেবতার সহিত লক্ষ্মী বিরাজিতা থাকিবার কোন বাধা নাই।

লক্ষ্মীর অনেক নাম—শ্রী, পদ্মা, পদ্মালয়া, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, মা, লোকমাতা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা ইত্যাদি। এই নামগুলির মধ্যে শ্রী ও লক্ষ্মী সকলের চেয়ে পুরাতন।

ঋগ্বেদে শ্রী শব্দের প্রয়োগ আছে। লক্ষ্মী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু কোথাও এ দুটী শব্দ সৌভাগ্যদেবী অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদে শ্রী শব্দের প্রয়োগ অন্ততঃ ৮১ বার আছে। এই সমস্ত জায়গায় শ্রী বলিতে 'শোভা' বা 'শোভাময়', 'সৌন্দর্য্য' বা 'সৌন্দর্য্যময়' বুঝাইয়াছে। কোথাও 'শ্রী' বিশেষ্য, কোথাও বা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ছাড়া ক্রিয়াহিসাবে 'শ্রী'র প্রয়োগ অন্ততঃ ২১ বার আছে। ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ তাঁহাদের সযত্ন সঙ্কলিত 'বৈদিক সূচী'তে (Vedic Index'এ) বলিয়াছেন—ঋগ্বেদে, 'শ্রী' শব্দের অর্থ 'prosperity' এবং ইহার প্রয়োগ ঋগ্বেদে মাত্র একবার। এই একটীমাত্র প্রয়োগ তাঁহারা পাইয়াছেন অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের উনবিংশ [? বিংশ] ঋকে। এই ঋক্‌টীতে আছে "অশ্রীর ইব জামাতা।" ইহার অর্থ 'কুৎসিত জামাতার ন্যায়'—'দরিদ্র জামাতার ন্যায়' নয়।† দিবাভাগে জামাই কেন শ্বশুরবাড়ী যায় না, সন্ধ্যার পরই যায়, প্রসঙ্গ দেখিলে বোঝা যায় কুরূপই

* লক্ষ্মী সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণশাস্ত্রী, আনন্দ কুমার স্বামী, হপ্‌কিন্স, বর্গত গোপীনাথ রাও প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে তাঁহাদের সংগৃহীত উপকরণ হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

† ন শ্রীরশ্রীঃ। তদ্বত্তাতীত্যশ্রীরঃ। মত্বর্থীয়ো রঃ। গুণৈর্বিহীনঃ কুৎসিতো জামাতা।—সায়ণ

তাহার কারণ। দারিদ্র্য নয়। শ্রী শব্দের বহুল প্রয়োগের মধ্যে দু'পাঁচ জায়গায় শোভা-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ধনৈশ্বর্য্যের যে সম্পর্ক নাই তাহা নয়, তবে এখানকার অর্থ—দেখিতে কুৎসিত। ক্রিয়া হিসাবে 'শ্রীণীহি' (৮.২.১১), শ্রীণন্তি (১৮৪.১১ ; ৮.৬৯৩ ; ৯.৮৪৫ ; ৯.৯৩.৩) প্রভৃতির প্রয়োগ আছে ; 'শ্রী'ধাতু-নিষ্পন্ন 'শ্রীতঃ' (৮.৮২৫) ও 'শ্রীতাঃ' (৮.২.২৮) আছে। এই সমস্ত স্থানে 'শ্রী' ধাতুর অর্থ সোমের সহিত দুগ্ধ সংমিশ্রণ করা, বৈদিক পরিভাষায় ইহাকে 'অভিষবণ' করা বলে।

তবে ঋগ্বেদে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ একবার মাত্রই আছে ; আর সেখানে তিনি সৌভাগ্যদেবীও নন। ঋগ্বেদ বলেন—

• "ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি"—১০.৭১.২

'তাঁহাদের বাক্যে [বাক্য-রচনায়] অতি চমৎকার লক্ষ্মী নিহিত আছে।' এ লক্ষ্মীর অর্থ দেবী নয়, অন্যরূপ।

পাপিলক্ষ্মী—পুণ্যা লক্ষ্মী

অথর্ববেদে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবতী রমণীকে 'লক্ষ্মী' বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী কখন ভাল, কখন মন্দ। অথর্ববেদ (৭.১১৫.১) লক্ষ্মীকে 'পাপিলক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

'প্র পতেতঃ পাপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামুতঃ পত।'

এই বেদে (৭. ১১৫.৪) 'পুণ্যা লক্ষ্মী'ও আছেন—

'রমন্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্যাঃ পাপীস্তা অনীনশম্'
'অপ ক্রামতি সূনৃতা বীর্যং পুণ্যা লক্ষ্মীঃ'
—১২.৫.৬

শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৮—৪.৪. ১১ ; ৮—৫.৪.৩) লক্ষ্মীকে 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম শ্রীকে শরীরিণী রূপে দেখিতে পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩.১) শ্রী প্রজাপতি হইতে সঞ্জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সৃজমানোঽতপ্যত। তস্মাচ্ছ্রান্তাত্তেপানাচ্ছ্রীরুদক্রামৎসা দীপ্যমানা ভ্রাজমানা লেলায়ন্ত্যতিষ্ঠত্তাং দীপ্যমানাং ভ্রাজমানাং লেলায়তীং দেবা অভ্যধ্যায়ন্।"

প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির জন্য তপ করিলেন। তিনি তপঃ-শ্রান্ত হইলে শ্রী সঞ্জাত হইলেন।

কম্পমানা শ্রীর জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য দেবতাদের লোভ হয়। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা শ্রীকে মারিয়া তাঁহার দানগুলি আত্মসাৎ করিতে চান। প্রজাপতি বলিলেন,—পুরুষ সাধারণতঃ স্ত্রীলোককে মারে না, শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহার দানগুলি তিনি লইতে বলেন। ফলে অগ্নি তাঁহার অন্ন, সোম—রাজ্য, বরুণ—সাম্রাজ্য, মিত্র—ক্ষত্র, ইন্দ্র—বল, বৃহস্পতি—ব্রহ্মবর্চস, সবিতা—রাষ্ট্র, পূষা—ভগ, সরস্বতী—পুষ্টি, ত্বষ্টা—রূপ লইলেন (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১১ ৪.৩.৪)। শ্রী বলিলেন, প্রজাপতি, আমার সকলই ইহারা লইল। প্রজাপতি বলিলেন, 'যজ্ঞেনৈনান্ পুনর্যাচস্ব'—যজ্ঞে তুমি এগুলি ফিরাইয়া পাইবে। শ্রী সফলকামা হইলেন।

যজুর্বেদে শ্রী দেবীরূপে কথিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রূপের কোন উল্লেখ নাই। সংহিতা-গ্রন্থে শ্রী ও লক্ষ্মী উভয়েরই উল্লেখ আছে। তাঁহাদের আকৃতির কোন বর্ণনা সংহিতাতে না থাকিলেও তাঁহারা যে শরীরিণী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহারা তখন অভিন্ন ছিলেন না। বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১.২২) লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের পত্নীদ্বয় করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী।

অতঃপর পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে সুলক্ষণ হিসাবে শ্রী-লক্ষ্মী-র উল্লেখ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীসূক্তে শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্ন দেবতা। শ্রীসূক্তের পাঠের এত গণ্ডগোল যে, শ্রীসূক্তের কাল-নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে শ্রীসূক্ত যে বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই শ্রীসূক্তে সর্ব্বপ্রথম পদ্মের সহিত শ্রী বা লক্ষ্মীর সম্পর্ক। ইহার পূর্ব্বে কোথাও পদ্মের সহিত শ্রীর সম্বন্ধ নাই। শ্রীসূক্তে তিনি 'পদ্মস্থিতা' এবং পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা।

শ্রী ও লক্ষ্মী পূর্ব্বে এক দেবতা ছিলেন না। সূত্রগ্রন্থের কাল পর্য্যন্ত শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্ দেবতা ছিলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০.৩৫) পাই "শ্রিয়ং আবাহয়ামি গায়ত্র্যা।" শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্য-সূত্রেও (২.১৪) তাহাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রেও (২.৫.৯.১০) আছে—"শ্রিয়ং দেবীং তর্পয়ামি।"

বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১.২২) শ্রী ও লক্ষ্মীকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও তাঁহারা অভিন্ন নন। বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকে অগ্নির সহিত দেখা যায় (১.৭২.১০ ; ২.১.১২ ; ৮.৩ ; ১০.১)। বাজসনেয়ী সংহিতা (৩১.২২ ; ৩৯.৪), তৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৫.২.), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২-৪.৬.৬), শতপথ-ব্রাহ্মণ (১৪-৩.২.১৯ ইত্যাদি), বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্র (২-৫ ৯.১০), মহানারায়ণ-উপনিষৎ (৩৫.২), হিরণ্য-কেশি-গৃহ্য-সংহিতা (১.১১.১) ও শক্তি-উপনিষদে শ্রী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। শ্রীর নিকট বলির কথা শাঙ্খায়ন-গৃহ্য-সূত্রে (২-১৪.১০ ইত্যাদি) আছে। শাঙ্খায়ন-মতে শয্যার শিরোদেশে শ্রীর নিকট বলিদানের বিধি। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ মনুসংহিতায় (৩.৮৯) লক্ষ্মীর নিকট বলির সূচনা হইয়া থাকিবে। মনুও তাই বলিয়াছেন—

> উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
> ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥

গৃহের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে 'শ্রিয়ৈ নমঃ,' দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' এবং গৃহমধ্যে প্রাঙ্গণে 'বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ' বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

শ্রীর জন্য প্রার্থনাও উপনিষদে আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ (১.৪) উপদেশ করেন—

"বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।"

আমার নিকট শ্রীকে আনয়ন কর,—কেন না তিনি বাস, গো ও অন্নপান আনিয়া দিয়া থাকেন।

শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্ন হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত শ্রী ও লক্ষ্মীর সম্বন্ধে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি।

দানবগণ শ্রীকে হারাইয়া ফেলেন

আমাদের শাস্ত্রের মতে অসুরেরা দেবতাদের বড় ভাই ; তাঁহারা কখনও কখনও দেবতাদের মত উদারহৃদয় ও বিক্রমশালী হইয়া থাকেন, পূজার্চ্চনার সময়ে দেবতাদের মত তাঁহারাও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন (রামায়ণ ২.২৫,১৬)। পুরাণে পাই, দানব অসুরগণ প্রথমে ধার্ম্মিক ছিলেন। অহঙ্কারের চরম সীমায় উপনীত হইয়া তাঁহারা পাপলিপ্ত হইয়া ওঠেন এবং সেইজন্য তাঁহারা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। এই অপরাধে শ্রী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন।

শ্রী ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, চরিত্র-বলেই কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব ; দানবগণ যখন ধার্ম্মিক ছিলেন তখন তিনি তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহারা যখনই দুশ্চরিত্র হইয়া ওঠেন তখনই শ্রী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান।

সমুদ্রোত্থিত শ্রী

দেবগণ মানুষের যুদ্ধবিগ্রহে কদাচিৎ যোগদান করেন, তবে শাস্ত্রে আছে,পুরাকালে কয়েকটী যুদ্ধে তাঁহারা যোগ-দান করিয়াছিলেন,দেব ও দানবে যে সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল (মহাভারত, ১.১৮) তাহাতে প্রথমে চন্দ্র ওঠেন, পরে শ্রী ও বারুণী, এবং সর্ব্বশেষে স্বর্গবৈদ্য সুধাপাত্র লইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন (রামায়ণ)।

শ্রী স্ত্রী

মহাভারতে আছে—শ্রী স্ত্রী বলিয়া কথিত। স্বামী স্ত্রীলোকের আদর্শ দেবতা, মাতাপিতাও পুত্রকন্যাগণের নিকটে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। এই সকল অতি-সাধারণ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নারী নিজেই দেবত্বের প্রতিমূর্ত্তি, সেইজন্য শ্রী স্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১৩.৪৬.১৫)।

ব্রাহ্মী শ্রী

ঋষি এবং ব্রহ্মর্ষির মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে, ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষির মধ্যেও সেই রকম অতি সামান্য পার্থক্য আছে। এই ঋষিগণকে প্রায় সর্ব্বস্থানে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে কৃষ্ণ যখন পথ অতিক্রম করেন, তিনি পথের উভয়পার্শ্বে দেবর্ষি এবং রাজর্ষিদিগকে দেখিতে পান। তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত পথ অতিক্রম করিতে থাকেন এবং তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মী শ্রী ছিলেন।

পদ্মা

সামান্ত লক্ষ্মী—মহাবলিপুরম্

পরিবার দেবতা-রূপে লক্ষ্মী

লক্ষ্মী-নরসিংহ

লক্ষ্মী-গণেশ

বরাহী

বিষ্ণুমূর্ত্তিতে লক্ষ্মী
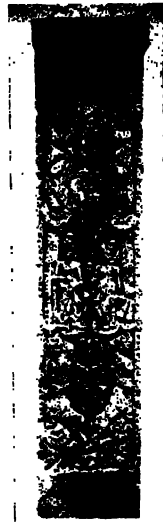
স্তম্ভগাত্রে গজলক্ষ্মী – সাঁচী

লক্ষ্মী-নারায়ণ

কোল্লাপুর-মহালক্ষ্মী
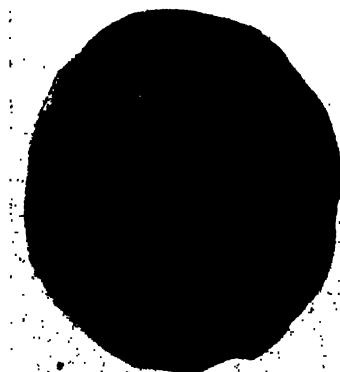
মুদ্রায় গজ-লক্ষ্মী

কুবের ও লক্ষ্মী

শ্রী লক্ষ্মী বলিয়া উক্ত

দানবগণ যতদিন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন শ্রী তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন চরিত্রহীন হইয়া পড়েন তখনই তাঁহারা শ্রীভ্রষ্ট হন।

রামায়ণে (১.৭৭.৩০) আছে, লক্ষ্মী অথবা শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কথিত। শ্রী শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দেব ও দানবগণ পরস্পর অসূয়া প্রদর্শন করেন। মহাভারতে (১০.৬১.৪৪ ; ৬৭.১৫৬) পাওয়া যায়, শ্রী ভাগ্যদেবী, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী এবং প্রদ্যুম্ন-জননী। লক্ষ্মী-দেবী ধাতা এবং বিধাতার ভগিনী। তিনি কেবল-মাত্র বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী এ কথা সত্য নয়, যেহেতু তিনি ধর্ম্মের পত্নী বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মী সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন এবং যাঁহারা কর্ম্মঠ তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। লক্ষ্মী পদ্ম হইতে জাত, পদ্মের ভক্ত, তিনি তাই পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (৪. ১৪. ১৬)।

শ্রী—ধনদাত্রী দেবী

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণবৃষ্টি করেন ইহা একটা কিংবদন্তী। ধনেশ্বর কুবেরের সঙ্গেও তাঁহাকে তুলনা করিতে দেখা যায়। কুবেরের শ্রী আছে এবং এই শ্রী অর্থে 'ধনরত্ন' বুঝায়। বায়ু এবং অগ্নির সহায়তায় মৃত্তিকা হইতে ধনরত্ন তোলা হয় এবং অগ্নি-দেবতার পূজা করিলে মনুষ্যদিগকে ধনরত্ন দান করা হয়।

শ্রী—পদ্ম

মহাভারতে (৩.২০৩.১২) আছে বিষ্ণু খুব সুন্দর এবং কমনীয়। তিনি পদ্মনাভ এবং তাঁহার সুদৃশ্য পদ্ম-নাভি হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাঁহার ললাটের পদ্ম হইতে ধর্ম্মের পত্নী শ্রী জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণ (৫. ৭. ১৪) বলেন, পদ্মহস্তা শ্রীর মনোহারিণী মূর্ত্তি ধনেশ্বর কুবেরের রথে ক্ষোদিত রহিয়াছে। পদ্মহস্ত সুলক্ষণ।

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী

লক্ষ্মী শান্তনুর স্ত্রী এবং ব্যাসের জননী, মহাভারতে (৫.১৪৭.১৯) এ কথাও আছে। কালী দুর্ভাগ্যের সূচনা করেন এবং অলক্ষ্মী বলিয়া কথিত। লক্ষ্মী দেবগণের নিকটে এবং অলক্ষ্মী দানবগণের নিকটে আসেন ; অলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে কালী আসেন এবং সমস্ত বস্তু ধ্বংস করিয়া ফেলেন, যুদ্ধবিগ্রহে কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হয় এবং সেইজন্যই প্রাণহানি ঘটে। যখন সদ্গুণরাজি বিনষ্ট হয় তখন কালীর আবির্ভাব হয়।

শ্রী ও ইন্দ্র

শ্রী ইন্দ্রের সহিত উপবিষ্টা আছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় (মহা-১২.২২৮.৮৯) কিন্তু শ্রী বলেন "লক্ষ্মীতিমামাহু" তিনি লক্ষ্মী (১২.২২৫.৮), এবং সেইজন্য সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তিনি পূজিতা হন।

লক্ষ্মী ও শ্রী পৃথক্ দেবতা

হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী তোমাকে রক্ষা করুন, মহাভারতে (৯.৪৫.১৩) এইরূপ উক্তি আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লক্ষ্মী এবং শ্রীকে পৃথক্ দেবতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কুবের ও লক্ষ্মী

রামায়ণে (৫.৭.১৪) কুবেরের রথে পদ্মহস্ত লক্ষ্মী সংস্থাপিতা আছেন।

কুবেরকে লক্ষ্মীর সহিত দেখা যায়, কিন্তু তখনও উভয়ের স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।—মহাভারত (৩.১৬৮.১৩)।

মহাভারতে (২.১০.১৯) কুবেরের রাজসভায় লক্ষ্মীকে নলকুবেরের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কুবেরের সহিত বসুধরার মূর্ত্তি স্থাপত্যে আছে, বসুধরাকে কেহ কেহ লক্ষ্মী নামে অভিহিত করেন।

লক্ষ্মী-পূজা

রামায়ণে বর্ণিত তপোবনে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্যই দেবতাদের মূর্ত্তির পূজা

হইত। রাম যখন অগস্ত্য-দর্শনে গমন করেন তখন তিনি তাঁহার আশ্রমে ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, বিবস্বান্, সোম, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, বাসুকি, অনন্ত, গায়ত্রী, বসুগণ, বরুণ, কার্ত্তিকেয় এবং ধর্ম্ম—এই আঠারজন দেবতার মূর্ত্তি ও আয়তন (মন্দির) দেখিতে পান। নারদ বলেন যে, তিনি নিজে এই সমস্ত দেবতার পূজা করেন এবং বরুণ, বায়ু, আদিত্য অগ্নি, স্থাণু, স্কন্দ, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বাচস্পতি, চন্দ্রমা, অপ, ক্ষিতি, এবং সরস্বতীর পূজা করিতে অপরকে উপদেশ প্রদান করেন।

রামায়ণে (১.৭৭.৩০) শ্রী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী। কখনও কখনও লক্ষ্মী এবং শ্রীকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া ধরা হয়। মহাভারতের (১.১৮.৩৫) মতে শ্রী শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিনি সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মহাভারত বলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী রুক্মিণী এবং প্রদ্যুম্ন-জননী। যজুর্ব্বেদে (তৈঃ সং ৭.৫.১৪.৩; বাজসনেয়ী সং ২৯.৬০) বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন অদিতি। তিনি বিষ্ণু-পত্নীরূপে বলি গ্রহণ করিতেন। তিনি ছিলেন, আদিত্যের মাতা (একবার ভগিনী বলিয়াও উল্লেখ আছে), মিত্র ও বরুণের মাতা, দক্ষের মাতা বা কন্যা, দেবতাদের মাতা, রাজা ও পুত্রগণের মাতা। প্রত্যুত পৃথ্বীদেবীর ন্যায় মাতৃত্বই তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে পৃথ্বীর সহিত অভিন্না বলা হইয়া থাকে। ধনের জন্য তাঁহার স্তুতি করা হইয়া থাকে। শ্রী বা লক্ষ্মী যখন বিষ্ণুর পত্নী হইলেন তখন এই সমস্ত ধর্ম্মও তাঁহার প্রতি আরোপিত হইল।

লক্ষ্মীই রুক্মিণী

রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীর অংশ-বিশেষ।

লক্ষ্মীই দেবসেনা

স্কন্দ রুদ্রের তনয় এবং কৃত্তিকাসুত বলিয়া অভিহিত হন; দৈত্যসেনার ভগিনী দেবসেনা তাঁহার স্ত্রী; দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী। দেবসেনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র কেশীকে আহত করেন। ইন্দ্র দেবসেনার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন এবং জন্মগ্রহণের ছয় দিনের মধ্যেই যখন স্কন্দ সমগ্র জগৎ জয় করেন তখন তিনি স্কন্দের হস্তে দেবসেনাকে সমর্পণ করেন। পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতি এই বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেন। শ্রী আশীর্ব্বাদ করেন। তাই এই বিবাহের স্মারক শ্রীপঞ্চমী।

সৃষ্টি-কারণে লক্ষ্মী

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি ইহারা ধর্ম্মের পত্নী। শম, কাম ও হর্ষ ধর্ম্মের সন্তান, প্রাপ্তি, রতি ও নন্দ ইহাদের স্ত্রী; ইহারাই জগতের সৃষ্টির কারণ।

বিভিন্ন শাস্ত্রে লক্ষ্মী

ভূমিদেবী বিষ্ণুর দ্বিতীয়া স্ত্রী, ইহার একটী হস্তে পদ্ম এবং ইহার অপর হস্ত নিম্নদিকে অবনত, তাঁহার মস্তকে মুকুট এবং তাঁহার কৃষ্ণ কেশদাম চরণচুম্বী—তিনি একটী পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা। ভূমিদেবী লক্ষ্মীর নামান্তর মাত্র।

অথর্ববেদে (১১.৪) প্রজাপতির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য দেখানো হয়। উক্ত বেদের বহুস্থানে এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩) শ্রীকে সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধির দেবী বলিয়া প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পদ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডের একটী অধ্যায়ে ভগবদ্-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক অধ্যায়ে বিষ্ণুর সহস্র নাম আছে, অপর একটী অধ্যায়ে রাধার সহিত লক্ষ্মীদেবীর সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে; তাঁহার জন্মদিন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপখ্যানটী প্রচলিত আছে—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া ঋষিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভৃগুকে দেবতাদের কাছে পাঠান। ভৃগু প্রথমে কৈলাস-পর্ব্বতে শিবের সহিত দেখা করিবার জন্য যান। শিব পত্নী-প্রেমে

তন্ময় হইয়াছিলেন বলিয়া ঋষির সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। এইরূপে অপমানিত হইয়া শিবকে অভিশাপ দেন যে, তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিকর্তৃক লিঙ্গরূপে পূজিত হইবেন। তারপর ভৃগু ব্রহ্মার নিকটে যান। সেখানে ব্রহ্মাও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখান নাই। তারপর ভৃগু মন্দার-পর্ব্বতে বিষ্ণুর কাছে যান। সেখানে তিনি দেখেন যে, বিষ্ণু নাগেরউপরে অধিষ্ঠিত এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, প্রকৃতি কৃষ্ণের আজ্ঞায় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এবং রাধা এই পঞ্চমূর্ত্তিতে বিভক্ত হন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে অদ্বৈত এবং রামভক্তি মুক্তির পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের মত উক্ত গ্রন্থ সাত ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রের ন্যায় ইহা শিব এবং উমার কথোপকথনে পরিপূর্ণ। রামকে বিষ্ণু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, রাবণ যে সীতাকে চুরি করিয়াছিলেন তাহা মায়ামাত্র। এইগ্রন্থের শেষে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময় প্রকৃত সীতা লোকচক্ষুর গোচর হন।

পদ্ম-সংহিতায় ও লক্ষ্মী-তন্ত্রে লক্ষ্মী বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি এবং জগৎকারণ বলিয়া পূজিতা হইয়াছেন। *

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মাকে সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলা হইয়াছে। শাক্ত দার্শনিকগণের মতে তিনিই শক্তি। শক্তি যে শুধু স্ত্রীবাচক তাহাই নয়। শক্তিই জননী; এই শক্তিই শিবের সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতী, উমা, দুর্গা, কালী; বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণা।

রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের ধারণা যে, প্রভু তাঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীর মধ্য দিয়া সত্য প্রকাশ করেন। রামানুজ বলিয়াছেন—“লক্ষ্মীদেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হয়।”

রামায়ণে শ্রীকে ক্ষীরাব্ধিতনয়া নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, কেন-না, তিনি সুরাসুর কর্তৃক সমুদ্র মথিত হইলে উত্থিত ফেনরাশির মধ্য হইতে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী মূর্ত্তিতে উত্থিত হন। পুরাণের আখ্যানসমূহ হইতে তিনি যে ভৃগু ও খ্যাতির দুহিতা এবং তিনিই যে রামের সমস্ত অবতার-কালে তাঁহার পত্নী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বর্ণনাগুলি সমস্তই অপেক্ষাকৃত একালের, কেন-না, ঋগ্বেদে লক্ষ্মী শব্দের উল্লেখ দেখা গেলেও ইহা ঠিক যে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ নহে।

বিষ্ণুর পত্নী অথবা শক্তি-স্বরূপা লক্ষ্মীকে পীতবর্ণে চিত্রিত করা হয়, তাঁহার আসন পদ্ম বা কমল, হস্তে কখনও কমল, কখনও শঙ্খ, আবার কখনও বিষ্ণুর গদা। জন্মের সময় তাঁহার এরূপ রূপলাবণ্য ছিল যে, সমস্ত দেবতাই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন, পরিশেষে বিষ্ণুই তাঁহাকে লাভ করেন। শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে পদ্মা বা কমলা বলা হয়, তাহার কারণ পদ্ম তাঁহার অতি প্রিয়বস্তু; তিনি বরাহীও বটেন, যেহেতু বিষ্ণুর বরাহ অবতারে তিনিই শক্তি; তিনি যখন বরাহের অঙ্কে উপবেশন করিয়া থাকেন, বরাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি আদ্যামায়া, জগতের মাতা, তিনি নারায়ণী, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি। কখনও তাঁহাকে ভৃগুকন্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু দেবরাজের উপর দুর্ব্বাসার অভিশাপের ফলে, ত্রিভুবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ক্ষীরাব্ধিতলে আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্ধানে পৃথিবী শস্যশ্রীশূন্যা হয়। পরে সমুদ্রমন্থনকালে তিনি অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া পুনরুত্থিত হন, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

জাতি ও সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী

বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মীকে জগন্মাতা বলিয়া পূজা করেন; তাঁহারা বলেন, ইনি আদিমায়া। যাঁহারা বৈষ্ণবতন্ত্রে থাকিয়াও শক্তি-উপাসক, তাঁহারা ইহাকে অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পৃথগ্‌ভাবে পূজার্চ্চনা করেন।

জৈনগণ পূর্ব্বে শ্রী ও লক্ষ্মীকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া

* Eggeling, p. 850.

মনে করিতেন। তাঁহাদের ত্রৈলোক্য-দীপিকা-নাম-সংগ্রহণীতে আছে, জীবজগতের দক্ষিণার্দ্ধের দেবী হইতেছেন—শ্রী, হ্রী, ধৃতি; আর উত্তরার্দ্ধের দেবী হইতেছেন—কীর্ত্তি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী। বর্ত্তমানকালে দীপালির সময় জৈনদিগের মধ্যে লক্ষ্মী-পূজার বিধি আছে। সেই সময়ে ইঁহারা ইঁহাদের হিসাবপত্রের খাতা একটী বেদীর উপর সজ্জিত করেন। পুরোহিত আসিয়া জৈনের কপালে, লেখনীতে ও খাতায় চন্দনের তিলক আঁকিয়া দিলে তিনি তাঁহার হিসাবের খাতার পাতায় পাঁচ সাত বা নয় বার শ্রী অক্ষরটি লিখিতে থাকেন। পরে একটী রজতমুদ্রা ঐ খাতার পাতার উপরে রাখা হয়। এই রজতমুদ্রাই লক্ষ্মী ও উহার স্থাপনাই লক্ষ্মীপূজা, এইরূপ তখন ধারণা করিয়া লওয়া হয়।

ভিলেদের আদি দেবতা লক্ষ্মী। বিশেষ বিপদ-আপদ উপস্থিত হইলে ভিলরমণীরা ইঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকে।

নিম্নশ্রেণীর আগরওয়ালাদিগের জাতীয় দেবতা লক্ষ্মী।

অহোমেরা যখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে, তখন তথাকার বারভূইয়ারা রাজা অরিমত্তের মন্ত্রী সমুদ্রের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। কথিত আছে, অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ বিতাড়িত হইলে সমুদ্রই সিংহাসন অধিকার করেন। সমুদ্রের পুত্র মনোহর। এই মনোহরের কন্যা লক্ষ্মী সূর্য্যের ভার্য্যা হন। শান্তনু ও সামন্ত ইঁহারই দুই পুত্র।

মাদ্রাজের মাল জাতি ছয়টী পাত্র স্তূপীকৃত করিয়া লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে।

গুজরাতে লক্ষ্মী পূজায় বেশ ধূমধাম হয়। লক্ষ্মী-পূজায় গুজরাতীদের অনেক আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকে। ইঁহাদের লক্ষ্মী কিন্তু আমাদের মত নয়। তাঁহার হস্তে বীণা থাকে। শুক্রনীতিসারে বীণাহস্তা লক্ষ্মীর একটী ধ্যান আছে।

উত্তর-ভারতের কোন কোন প্রদেশে লক্ষ্মীকে চান্দ্র-সৌরবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করা হইয়া থাকে, ঠিক যেমন দুর্গা সৌরবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী; তবে এই রূপকটী কর্ণাট দেশের পণ্ডিতেরা প্রত্যাখান করিয়াছেন; তাঁহার নামের সহিত চন্দ্রের কোনও সংযোগই ইঁহারা স্বীকার করেন না।

লক্ষ্মীর কোন মন্দির না থাকিলেও, তিনি প্রাচুর্য্য ও সৌভাগ্যের দেবী বলিয়া অনুরাগের সহিত সম্পূজিত হন, সুতরাং তাঁহার প্রতি অবহেলার কারণ পাওয়া যায় না। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

উত্তর-ভারতে আহীররা ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে ঘোষী নাম প্রাপ্ত হয়। বোম্বাইয়ে ঘোষীরা বিবাহ ও জন্ম কালে অনেক হিন্দুপ্রথা পালন করিয়া থাকে। দশহরাতে তাহারা যেমন "দেবী" পূজা করে, সেইরূপ দীপালি উৎসবে তাহারা লক্ষ্মী পূজা করে।

রোমানদের সিরিস যেমন শস্যসম্ভারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কল্পিত ও অর্চ্চিত হন, সেইরূপ লক্ষ্মীও আমাদের নিকট আরাধ্য দেবতা—শস্যোৎপাদনের প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার নাম প্রচারিত।

বেলগাঁও প্রদেশে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মহালক্ষ্মীকে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বলিয়া জ্ঞান করা হইত। তখন প্রত্যেক বার বৎসর অন্তর তাঁহার উদ্দেশ্যে সমারোহে যাত্রা দেওয়া হইত। এই যাত্রায় মহিষ, ছাগ, এবং নানা পক্ষী বলি দেওয়া হইত। শেষে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষাকল্পে ইহাদের রক্ত ভাতের সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

মহারাষ্ট্র কৃষকেরা এখনও তাঁহার পূজার প্রতি আস্থাহীন হয় নাই। রবিশস্য বেশ জন্মাইলেই, তাহারা তাহাদের ক্ষেত্রে গিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে পাঁচটী পাথর একত্র করে ও তাহার উপর সিঁদুরের চিহ্ন দেয় ও কিছু গমের ময়দা রাখে। এইগুলিকে তাহারা পঞ্চপাণ্ডু বলিয়া পূজা করে। বিকালে তাহারা যবনালের কয়েকটী শীর্ষ লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, সঙ্গে অবশ্য একটী কাপড় দিয়া ঘেরা প্রদীপ থাকে। ইহাই তাহাদের লক্ষ্মী। এই উৎসব অমাবস্যা তিথিতে মাসের ২৮এ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজপুতানায় একটী উৎসবে লক্ষ্মীকে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিরূপে অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। কৃষিজীবীরা

তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ একটা পুষ্প ও ধান্যপূর্ণ শস্য-পরিমাপক 'ধারী' স্থাপিত করে ; আর তাঁহার প্রতিকৃতিকে সাজাইতে হইলে তাহারা পদ্মা-রূপেই সাজায়, হাতে তখন একটা পদ্ম থাকে। সমুদ্রমন্থনের সময় চৌদ্দ মণির মধ্যে লক্ষ্মীও উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে রম্ভা বলিয়া থাকে ; ইহাতে একটু ভুল করা হয়। এক জল-বুদ্বুদ হইতে সমুত্থিত হইলেও তাঁহারা সমান নহেন ; একজন ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, অপরজন সৌন্দর্য্যের। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া তাঁহাকে প্রলয়-পয়োধি-শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর চরণতলে অবস্থিতা করিয়া দেখানো হয়।

ইণ্ডো-চীনের অন্তর্বর্ত্তী চম্পা একটা প্রাচীন নগরী। এই চম্পাবাসিগণ চাম্ নামে পরিচিত। চামদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লক্ষ্মীর স্থান অতি উচ্চে। কোচিন চীনে ইহার একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার মস্তকে মুক্তার মুকুট, করে বলয়। ইনি চতুর্ভুজা। উপরের দুই হাতে শঙ্খচক্র, নীচেকার দুই হাতে গদা। কয়েকটি সমাধি-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও ইহার প্রতিকৃতি দেখা যায়, পদ্মপাণি হইয়া ইনি নাগচ্ছত্রের তলে বসিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী-মূর্ত্তি

হিন্দু দেব-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে আরও কোন-না-কোন দেবতার সম্পর্ক আছে। সৃষ্টি-কারণ ব্রহ্মার মুখে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বাস করেন, বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীও বাস করেন এবং তাঁহারই প্রভাবে জগতের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

লক্ষ্মী এবং পৃথ্বী বিষ্ণুর দুই পত্নী ; লক্ষ্মী রক্ত-পদ্মাসীনা, চতুর্হস্তা। তাঁহার উপরের দুইটী বাহুতে দুইটী পদ্ম এবং অপর দুইটী বাহুতে বরাভয় মুদ্রা। সুধালাভ করিবার উদ্দেশ্যে যখন সমুদ্রমন্থন হয় তখন তিনি উত্থিত হন। পৃথ্বীর মাত্র দুইটী হস্ত আছে—দক্ষিণ হস্তে তিনি অভয়দান করিতেছেন এবং বাম হস্তে দাড়িম্ব-ফল ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বাম পদ একটী রত্ন-স্থালীর উপর প্রসারিত। যখন লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর সহিত অবস্থান করেন তখন তাঁহার দুইটী হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গজ-লক্ষ্মী

দু'একটী ধ্যানে চারিটী হস্তেরও উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীর অষ্ট-রূপও শাস্ত্রে স্বীকৃত। এগুলির মধ্যে গজ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিই সচরাচর প্রচলিত। তিনি চতুর্হস্তা এবং বিনায়কের ন্যায় একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে সমাসীনা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী পদ্ম এবং বাম হস্তে সুধা-পাত্র। দেবীর অপর দুই হস্তে বিল্ব-ফল এবং শঙ্খ। তাঁহার পশ্চাতে দুইটী হস্তী কলসী হইতে তাহাদের শুণ্ড দিয়া দেবীর মস্তকে জলবর্ষণ করিতেছে। মুদ্রায়ও এরূপ মূর্ত্তি বিরল নহে। প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্রেও গজ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। সাঁচীতে এইরূপ একটী গজ-লক্ষ্মী আছে। দ্বি-হস্তবিশিষ্টা গজ-লক্ষ্মীকে সামান্য-লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শিল্পসারে ইঁহাকে ইন্দ্র-লক্ষ্মী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

মহাবলিপুরমে সামান্য-লক্ষ্মীর একটী সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির মধ্যভাগের মূর্ত্তিটী সামান্য-লক্ষ্মীর। দেবী দ্বিভুজা, বিবসনা, সাগরোদ্ভূত পূর্ণবিকসিত পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। আসন ও পদ্ম-পত্র অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মস্তকাবরণ একটু অসাধারণ। কর্ণে বৃহৎ ও গোলাকার কুণ্ডল এবং অঙ্গে আভরণ। দেবীর হস্তদ্বয়ে দুইটী পদ্ম-কোরক সংস্থাপিত। চারিজন বিবসনা সহচরী তাঁহার সেবাতৎপরা।

তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুইটী বিশালকায় হস্তী শুণ্ড দিয়া দেবীর মস্তকের উপরে জল ঢালিতেছে। দেবীর দ্বিতীয়া সহচরীর হস্তে একটী পদ্ম এবং দক্ষিণ ভাগের অপর সহচরীর হস্তে চন্দন, হরিদ্রা অথবা অন্য কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য রাখিবার জন্য একটী সুদৃশ্য পাত্র। সহচরীদ্বয়ের শিরোভূষণ এবং অলঙ্কার আড়ম্বরবিহীন এবং উল্লেখযোগ্য—ইহা হইতে পল্লব-যুগের পরিমার্জ্জিত রুচির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবসনা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির সহিত পল্লব-স্থাপত্যের কৃষ্ণ-মণ্ডলস্থ গোপীদিগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ দুটী

সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। পদ্মারূঢ়া সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বক্ষোভারে আনতা, পদ্ম-নয়না, শ্বেত-বস্ত্রাচ্ছাদিতা, হেমপাত্রজলসিক্তা, পদ্ম-হস্তা প্রভৃতি বাক্যে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা শ্রী-সূক্তে গীত হইয়াছে। মনীষী হ্যাভেল মহাবলিপুরমের মূর্ত্তিটিকে "স্বর্গোত্থিতা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি" বলিয়া মনে করেন।

মহা-লক্ষ্মী

মহা-লক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মীর অপর একটী মূর্ত্তি, তাঁহার চারিটী হস্তে পাত্র, কৌমোদকী অসি এবং শ্রীফল। মহা-লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার মস্তকে লিঙ্গ আছে। পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা অথবা অধিরূঢ়া, এবং বরাভয়া মূর্ত্তি হইলে সেই মূর্ত্তির নাম হয়—বীর-লক্ষ্মী। শিল্পসারে কথিত আছে যে, কোল্লাপুর-মহালক্ষ্মী ষড়্‌ভুজা। তাঁহার তিনটী হাতে গদা, অসি এবং মদ্যপাত্র। অষ্টভুজা বীর-লক্ষ্মীর আটটী হস্ত আছে। প্রত্যেক হস্তের কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

জ্যেষ্ঠা-লক্ষ্মী

জ্যেষ্ঠা-লক্ষ্মী লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাঁহার এক হস্তে লৌহ-নির্ম্মিত পদ্ম এবং অপর হস্তখানি তিনি আসনের উপরে রাখেন। কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উভয় হস্তে পদ্ম থাকিতে দেখা যায়।

দেবীর পদদ্বয় কথঞ্চিৎ প্রসারিত। তাঁহার দক্ষিণ দিকে একটী বৃষমুখী মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটী তাঁহার সন্তানের। জ্যেষ্ঠার বামভাগে তাঁহার রূপবতী কন্যার মূর্ত্তি। কখনও কখনও দেবীকে রক্তবর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে রক্ত-জ্যেষ্ঠা আখ্যা দেওয়া হয়।

দেবদেবীগণের মধ্যে সরস্বতীর কেশবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-দেবীর কেশবন্ধ কুন্তলা-প্রণালীতে হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমূর্ত্তিতে লক্ষ্মী

দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং বাম পার্শ্বে ভূমিদেবীকে লইয়া বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট, এরূপ মূর্ত্তি বিরল নহে।

যদি নারদ, কামিনী, সনক এবং সনৎকুমার প্রভৃতি মূর্ত্তি-সংশ্লিষ্ট না থাকে তাহা হইলে বিষ্ণুকে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত করা হয়; আর যদি ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী, ভূমিদেবী, সূর্য্য এবং চন্দ্র মূর্ত্তির সহিত না থাকে তাহা হইলে তাহাকে অধম শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

বিষ্ণুর বীরশয়ন-মূর্ত্তিতে তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ; তাঁহার একটী হস্ত উপাধানের কার্য্য করে এবং অন্য হস্তে চক্র থাকে; বামদিকের একটী হস্তে শঙ্খ এবং আর একটী হস্ত সরলভাবে প্রসারিত থাকে। বিষ্ণুর পাদমূলে লক্ষ্মী এবং ভূমিদেবী উপবিষ্টা থাকেন।

অধম ভোগস্থানক মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর হস্তে চক্র এবং শঙ্খ থাকে। মধ্যভাগের বিষ্ণুর দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং বাম দিকে ভূমিদেবীর মূর্ত্তি। লক্ষ্মীদেবীর বামহস্তে একটী পদ্ম এবং ভূমিদেবীর দক্ষিণ হস্তে একটী নীলোৎপল থাকে।

ভোগাসন-মূর্ত্তিতে চালুক্যদের রাজধানী বাদামীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুর মূর্ত্তিতে বিষ্ণু 'অধিশেষ' নাগের উপরে আরূঢ় আছেন। বিষ্ণুর বামপদ প্রসারিত নয় এবং নাগের উপরে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিন্যস্ত রহিয়াছে।

আইহোলের মন্দিরে বিষ্ণুর বীরাসন-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ভকোনমে বিষ্ণুর অধিশেষ নাগের উপরে উপবিষ্ট একটী মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং পশ্চাতের বাম হস্তে শঙ্খ; বামপদ নিম্নদিকে সর্পের মস্তকের উপরে প্রসারিত রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপরে প্রসারিত এবং বাম হস্ত, বাম উরুর উপরে রহিয়াছে, বিষ্ণুর দক্ষিণ ও বাম দিকে লক্ষ্মী ও ভূমিদেবীকে উড্ডীন অবস্থায় দেখা যায়। ইহাই বীরাসন-মূর্ত্তির অধম শ্রেণীভুক্ত।

অগ্নি পুরাণে বরাহ-বিষ্ণুর মূর্ত্তির বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে। ইহাতে উল্লেখ আছে, বিষ্ণুর দক্ষিণ এবং বাম হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও পদ্ম অথবা লক্ষ্মী থাকিবে। বিষ্ণুর বাম হস্তে লক্ষ্মী উপবিষ্টা এবং তাঁহার পদতলে ভূমিদেবী এবং অধিশেষের মূর্ত্তি।

বরাহ-মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণের এবং চতুর্হস্ত। এই চারিটী হাতের দুইটীতে শঙ্খ এবং চক্র থাকে। বরাহ-দেব সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট এবং বহু অলঙ্কারে সুসজ্জিত।

দক্ষিণ দিকে কাঞ্চন-বর্ণের লক্ষ্মী-মূর্ত্তি উপবিষ্টা। লক্ষ্মীর বাম হস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্ত আসনের উপরে থাকে। যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তির বাম দিকে কৃষ্ণবর্ণা ভূমিদেবী উপবিষ্টা থাকেন।

বরাহ-মূর্ত্তির দক্ষিণ উরুদেশের উপর দেবী বসুমতী উপবিষ্টা থাকেন। শিল্প-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, লক্ষ্মীদেবীও বরাহের পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকেন।

কখনও কখনও গিরিজা-নরসিংহ মূর্ত্তিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিটী হস্ত, এবং পশ্চাতের দক্ষিণ এবং বাম হস্তে যথাক্রমে চক্র এবং শঙ্খ থাকে। নরসিংহ-মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে একই আসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বিরাজিত থাকেন।

লক্ষ্মীনরসিংহ-মূর্ত্তি পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা; তাঁহার দক্ষিণ পদ নিম্নদিকে বিলম্বিত এবং বাম পদ আসনের উপরে প্রসারিত। নারায়ণের ক্রোড়ে লক্ষ্মী উপবিষ্টা এবং তাঁহার প্রত্যেক পদ পদ্মের উপরে সংস্থিত। লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নরসিংহের দেহ আলিঙ্গন করিয়া থাকে এবং তাঁহার বাম হস্তে একটী পদ্ম থাকে।

'নারদ-পঞ্চরাত্রে' লক্ষ্মীকে বাসুদেবের নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, নারায়ণের সহিত লক্ষ্মী দেবী থাকেন। লক্ষ্মী নারায়ণের বাম ভাগে উপবিষ্টা; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া থাকে। নারায়ণের বাম হস্তও দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম সংস্থিত। সিদ্ধির স্বভাবতঃ সুন্দর এবং অলঙ্কার-বিভূষিত মূর্ত্তি চামর-হস্তে লক্ষ্মী-নারায়ণের-সম্মুখে দণ্ডায়মানা। নিম্নদিকের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গরুড়ের মূর্ত্তি। বিষ্ণুর জলশায়ি-মূর্ত্তিতে সংস্কৃত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদতলে এবং ভূমিদেবী শিরোভাগে উপবিষ্টা।

দেবী নানাভাবে পূজিতা হইয়া থাকেন। পূজা-পদ্ধতির নিয়মের তারতম্যানুসারে দেবীর বিভিন্ন নামান্তর হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে—গুপ্ত-রূপি-দেবী তিন প্রকার আকার গ্রহণ করেন, যথা, লক্ষ্মী, মহা-কালী এবং সরস্বতী; ইহারা যথাক্রমে রজঃ, সত্ব এবং তমোগুণের আধার। গুপ্তরূপী দেবী মহাকালী এবং মহামারী; তিনি ধনদাত্রী লক্ষ্মী এবং যশোহারিণী অলক্ষ্মী নামেও পরিচিতা।

শিল্পরত্নে উল্লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মীর বর্ণ শুভ্র এবং তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে বিল্ব-ফল, তাঁহার কণ্ঠদেশে মুক্তার হার এবং দুইজন সহচরী তাঁহাকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছেন। বিষ্ণুর পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী থাকিলে তাঁহাকে দ্বিহস্তবিশিষ্টা দেখা যায়। কিন্তু একটী পৃথক মন্দিরে তাঁহার পূজা করিলে তাঁহাকে চতুর্হস্তা হইতে দেখা যায়; তখন তিনি সিংহাসনে পদ্মের উপরে অধিরূঢ় থাকেন, তাঁহার মস্তকেও পদ্ম থাকে, কেয়ূর এবং কঙ্কণ দ্বারা তিনি বিভূষিত থাকেন।

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্ব্বতীকে একই দেবী বলিয়া কল্পনা করা হয়।

লক্ষ্মী-গণপতি

শক্তি-গণেশ বলিতে লক্ষ্মী-গণপতি, উচ্ছিষ্ট-গণপতি, মহা-গণপতি, ঊর্দ্ধ-গণপতি এবং পিঙ্গল-গণপতি বুঝায়। লক্ষ্মী-গণপতির আটটী হাত আছে। আটটী হাতে শুকপক্ষী, দাড়িম্ব, পদ্ম, স্বর্ণপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পকলতা এবং বাণ আছে। মন্ত্রমহোদধিতে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মী-গণপতির তিনটী চক্ষু আছে। দুইটী হস্তে দণ্ড এবং চক্র থাকিবে এবং তিনি তৃতীয় হস্তে অভয় দান করিবেন। কিন্তু চতুর্থ হস্তে কি থাকিবে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ চতুর্থ হস্ত দ্বারা গণপতি লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিবেন। লক্ষ্মী-গণপতির বর্ণ স্বর্ণের মত হইবে। লক্ষ্মী-দেবীও গণেশকে আলিঙ্গন করিবেন এ কথাও উক্ত আছে।

লক্ষ্মী-গণপতির প্রস্তর-মূর্ত্তি বিশ্বনাথ-স্বামী মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুদেশীয় রাজা অরিকেশরী পরাক্রম পাণ্ডবদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটীও এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটীর ছয়টী হস্তে চক্র, শঙ্খ, শূল, পরশু, দন্ত এবং পাশ আছে। অবশিষ্ট চারিটী হস্তে কি আছে তাহা ঠিক বলা যায় না গণপতির শুণ্ডে একটী পান-পাত্র আছে।

বহ্বারম্ভে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুনের প্রথমে রসময় সহসা একদিন পাঁচু খানসামার লেনে একটা মেসে প্রবেশ করিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে আপনা আপনি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ফুল স্বভাবধর্ম্মে ফোটে, বায়ু গন্ধ বিলাইয়া দিকে দিকে ফুলের মাহাত্ম্য প্রচার করে।

বিনীত রসময় আসিয়াই ভবেশকে জিজ্ঞাসা করিল, —সীট্ খালি আছে?

ভবেশ বলিল,—আছে।

রসময় পুনরপি পরম বিনীতভাবে বলিল,—দেখুন, আমি একটু ইয়ে চাই,—বেশ নিরিবিলি।

এ বয়সে বিনীত ভাবটাই কৌতুকের কারণ—কথার ধরণটাও কেমন কেমন যেন! ভবেশ হাসিয়া বলিল,— সিঙ্গেল সীটের ঘর তো খালি নেই। তবে দুজনে থাকতে পারেন।

রসময় অকারণ পুলকের উচ্ছ্বাসে টেবিল চাপড়াইয়া কহিল,—অল্ রাইট। তাই ভাল। কাল—না আজ বিকেলে এসেই হাজির হব।

ভবেশ বলিল,—যদি মাপ করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

রসময় বলিল,—বিলক্ষণ! কি বলবেন বলুন না। আমাকে ওসব নেচারের লোক মনে করবেন না। একদম ফ্র্যাঙ্ক।

ভবেশ বলিল,—খালি ঘর খুঁজছেন, কাব্যটাব্য লেখা অভ্যাস আছে না কি?

রসময় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামিতে চাহে না। যেন এত বড় মহৎ সম্মানের কথা সে কল্পনাই করিতে পারে নাই!

হাসির বেগটা মন্দীভূত হইলে কহিল,—না, না— এমনি চাইছিলুম। কি জানেন—আমি একটু বেশী রকমের ফ্র্যাঙ্ক কি না—অর্থাৎ—

ভবেশ হাসিয়া বলিল,—বুঝেছি। তা এ মেসে সে-সব ভয় নেই, অনেক প্রফেসারও থাকেন কি না। নমস্কার।

—নমস্কার। আজই ও-বেলা—বাকী কথাটা ইসারায় সারিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

বৈকাল চারিটায় বিছানাপত্র, বই খাতা লইয়া রসময় এই মেসের একটি সীট্ দখল করিয়া মহা উৎসাহে পড়া শুনায় মনোযোগ দিল।

প্রফেসর থাকিলেও রসময়ের ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ'-এর ভয় কাটিল না। অবশ্য সেজন্য রসময়কে কেহ এক তিলও দুঃখ করিতে দেখে নাই।

মেসের মধ্যে যে কয়টি সম-বা অসমবয়সী ব্যক্তি ছিলেন, সকলেই এই অনাত্মীয় যুবকের নিকট কিছু-না-কিছু উপহার পাইয়াছিলেন। কেহ আপত্তি করিলে সে বলিত,—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড আমি দিচ্ছি, না নিলে বাস্তবিক দুঃখিত হব। যদি না নেন তো—ইত্যাদি। অগত্যা লইতে হইত।

কাহারও উপহাসের মাত্রাধিক্য ঘটিলে রসময় পরদিনই তাহাকে মূল্যবান্ একটা কিছু উপহার দিয়া তাহার মুখ-বন্ধের চেষ্টা করিত। এইরূপে তাহার উপহারের দ্রব্য-গুলিতে মেসের প্রত্যেক কক্ষের প্রতিটি সীট্ পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

রসময় আত্মপরিচয় দিয়াছিল,—তাহারা তিন ভাই। মা আছেন—বাপ নাই। অন্য দুই ভাই রীতিমত পুত্রকন্যা লইয়া সংসারী, শুধু রসময় পাঠ্য-জগতের প্রাণী। তথাপি সংসার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কোনো সংসারীর অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। সংসারের এত খুঁটিনাটি হিসাব-নিকাশের কথা সে বলিতে পারিত যে, মনে হইত, সেখানকার যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহার সীমা সে লঙ্ঘন করিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যেও তাহার অনুরাগ

অতুলনীয়। সে সম্বন্ধে সমালোচনা যাহা করিত, তাহা যে-কোনো সবজান্তা মাসিক সমালোচনার চেয়ে কঠোর ও তাহার মতে পক্ষপাতশূন্য। শোকে-সুখে হাসিতে-কান্নায় গানে-গল্পে সর্ব্বক্ষণই সে সকলের পাশটিতে অকুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া সহানুভূতির প্রলেপ মাখাইতে দক্ষ ছিল।

বাড়ী তাহার এই কলিকাতারই অপর প্রান্তে। কলেজ দূর বলিয়া এবং সেখানে হট্টগোলের মধ্যে পড়া-শুনার অসুবিধা হয় বলিয়া সে মেসে আশ্রয় লইয়াছে।

বিমলের সঙ্গে তাহার ভাবটা হইয়াছিল কিছু বেশী। এই কম-বেশীর কথা লইয়া অনেক দিন অনেক তর্ক হইয়াছে। সে বলিয়াছে,—তাহার উদার অন্তরে ভালবাসিবার ধারাটুকু কখনও কোনো তীর ঘেঁষিয়া যায় নাই, এবং তীরের শ্যামল শস্যসম্ভারের শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া সে স্রোত মুহূর্ত্তের তরেও নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহা চলিয়াছে—আপনা ভুলিয়া—তটিনীর দুটি তীরে সম্পদ রচনা করিয়া সকলকে সমানভাবে পরিতৃপ্তি বিলাইয়া অবিরাম অশ্রান্ত গতিতে।

কিন্তু বিমলের টেবিলে উপহারের মাত্রাধিক্য দেখিয়া সকলে স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল,—এখানে নদীর স্রোতটা কিছু প্রবল এবং ভগ্নতটের ক্রোড়ে যে এতটুকু স্থান রচনা করিয়াছে তাহার মধ্যে কুলুকুলু ধ্বনিটুকু আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেসে সকলেরই স্বতন্ত্র একটা মত থাকে এবং তাহা লইয়া অবসর-মুহূর্ত্তে তুমুল তর্কের সৃষ্টি হইয়া থাকে। রসময়ের কোনো স্বতন্ত্র মত ছিল না, অথচ যে-কোনো বিষয় লইয়া সে কয়েক ঘণ্টা অনর্গল তর্ক করিতে পারিত।

কেবলমাত্র বিবাহ-প্রসঙ্গে সে কোনো তর্ক করিত না। নিজের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে মুখে যে কথা বলিত, কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকস্থলেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত।

হয়ত কোনোদিন সতীর্থের নিকট আসিয়া চুপি চুপি কহিত,—আজ দুটো টাকা না দিলেই নয়। বাড়ী থেকে খরচ আসতে দেরী হয়ে গেছে, জামার দোকানে—ইত্যাদি।

সে দিত। এবং কয়েক ঘণ্টা পরে সারা মেসটিতে প্রচার হইয়া পড়িত—রসময়ের সদ্যক্রীত ফাউণ্টেন পেনটি অমুককে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

ঋণদাতা যদি আড়ালে ডাকিয়া বলিত,—এই তোমার জামার দোকান?

সে শশব্যস্তে বলিত,—চুপ চুপ! উনি শুনলে দুঃখু পাবেন। কদিন থেকে বলছিলেন কি না, না দিলে কি মনে করবেন।

সকলকে সন্তুষ্ট করিবার এই প্রয়াস তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন সকালেই বৃষ্টি নামিয়াছিল। এমন দিনে বাতায়নে বসিয়া বিরহী যক্ষের কল্পনা করায় তৃপ্তি আছে ও মেসের মধ্যে অলকার কল্পনা-প্রসারও বেশ বাড়িয়া চলে। বাতায়ন-বাহিরে অবিরাম ধারা বর্ষণে ধূম্রাকার মেঘের মধ্যে অ-দেখা প্রিয়ার মূর্ত্তিখানি অস্পষ্টপ্রায় হইয়া জাগিলেও, মনটাকে এক মুহূর্ত্তে উদাস করিয়া ফেলে। ইচ্ছা হয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া যাই সেই একটি প্রিয় গৃহকোণে এবং মুখোমুখী বসিয়া এই ধারার সঙ্গে মনের উল্লাস মিশাইয়া দিয়া কয়েকটি মুহূর্ত্তের স্বর্গ সৃষ্টি করি।

হরিশের ঘরে জনকয়েক জড় হইয়া রসময়কে ধরিয়া বসিল, এমন বাদলার দিনে একটি মুখরোচক গল্প না হ'লে মানায় না, যা হয় কিছু বল।

কে একজন বলিল,—যা হয় কিছু নয়, ওর সঙ্গে রোমান্স থাকা চাই।

রসময় বলিল,—একটি রোমান্সের কথা মনে আছে। তবে তাকে ঠিক রোমান্স বলা চলে না, কেন-না বাঙ্গালীর জীবনে ওটার একান্ত অভাব।

সকলে বলিল,- মধু অভাবে গুড়। তাই যথেষ্ট। বল।

রসময় যাহা বলিল—

কলিকাতারই একটা গলি। এ-পার ও-পার দুখানা বাড়ী। একটির অধিবাসীরা বহুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছে, অন্যটির প্রায়ই ভাড়াটিয়া বদল হইয়া থাকে। কারণ ভাড়ার হারটা কিছু অত্যধিক। লোকে মাথা গুঁজিবার জন্য প্রথমে দু-এক মাস এখানে আশ্রয় লয়—পরে সুবিধা বুঝিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সুতরাং ঐ বাড়ীর

অধিবাসীদের সঙ্গে পাড়ার কাহারও বিশেষ পরিচয়ের অবসর ঘটিয়া উঠে না। এমন প্রায়ই আসে যায়। সেবার শ্রাবণ মাসেই হইবে বোধ হয়—যাহারা আসিল তাহাদের সঙ্গে সাম্‌নের বাড়ীর আলাপটা সহসা ঘটিয়া গেল। উপলক্ষ্য সামান্য। ও-বাড়ীর একটি দশ-বারো বৎসরের ছেলে ঘুড়ি উড়াইতেছিল। বাড়ীর ছাদের আলিসায় ঘুড়িখানি বাধিয়া গেল। বালকের ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাহা মুক্ত না হওয়াতে সে সাহায্যের জন্য তাহার দিদিকে ডাকিল। সে আসিয়াও অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন তরুণীর দৃষ্টি পড়িল এ বাড়ীর ত্রিতলের ক্ষুদ্র ঘরখানির ভিতর। একটি কুড়ি-বাইশ বৎসরের যুবক বসিয়া একমনে পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। ওই ছাদের কলরব কোলাহল তাহার পাঠের কোনো ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

তরুণী তাহার ভাইটিকে সে কথা বলিল।

খোকা উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল,—ও মশাই শুনছেন, ও মশাই।

সে-চীৎকারে যুবকের তন্ময়তা ভাঙিল। মুখ তুলিয়া সে চাহিল। দেখিল, ছাদের আলিসায় ভর দিয়া দুখানি ব্যগ্র উৎসুক মুখ তাহারই পানে চাহিয়া আছে। একটি বালকের, অপরটি তরুণীর। কল্পনার প্রসার যুবকের কতদূর ছিল জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল—তরুণী সুন্দরী; শ্রাবণ-অপরাহ্নে সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা সে সৌন্দর্য্যকে সুপ্রকাশিত না করিলেও তাহা চাহিয়া কিছুক্ষণ দেখা যায়। হয়ত বা বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই দেখিবার ব্যাকুলতাকে দমন করিতে পারে না।

যাহা হউক, যুবক অনুরোধ রক্ষা করিয়া তরুণীর পানে আর একবার চাহিল। সে-মুখখানিতে তখন কৃতজ্ঞতার মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসন্নতার স্পর্শ লাগিয়া তাহারও অন্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সম্ভাষণের ভাষা যখন ফুটিল, তখন তরুণী দৃষ্টির অন্তরালেই চলিয়া গিয়াছে।

তারপর, প্রতিদিনই বালকটির ঘুড়ি লাটাই বহিয়া তরুণীকে সে ছাদের উপর ছুটাছুটি করিতে দেখিত। চকিতদৃষ্টিতে তাহার ত্রিতলের নিস্তব্ধ কক্ষখানির মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে সে ত্রুটি করিত না। উচ্চহাস্যের লহর তুলিয়া পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইত।

তবু যুবকের মনে হইত, নীরস পাঠ্য-পুস্তকের অন্তরালে যে লুপ্তপ্রায় সরস্বতী নদীটি এতকাল অন্তঃ-সলিলা বহিতেছিল, তাহার এই অকস্মাৎ প্রকাশ কিছুমাত্র বিচিত্র বা অশোভন নহে। ইহা পাঠেরও পরিপন্থী নহে। তপস্যার জগতে এমনি একটি কাম্যফল আত্ম-গোপন করিয়া থাকে, তপস্যা শেষে যাহা বরস্বরূপ লাভ করিয়া তপস্বী ধন্য হয়।

বালকটিকে মধ্যস্থ করিয়া আলাপ জমিল। কিন্তু না জমিলেই বুঝি ভাল হইত। কল্পনায় যাহা অনায়াসলব্ধ ছিল, বাস্তবের স্পর্শে তাহাই দুরাশায় পরিণত হইল। দুইটি মিলন-তৃষাতুর অন্তরে ধর্ম্মের গণ্ডী একটি উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া জগতের কঠোরত্ব বুঝাইয়া দিল।

যুবক কিন্তু মরিয়া হইয়া উঠিল। তরুণীকে লাভ করিতে সে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিল।

পিতা ছিলেন না, ভাইয়েরা অভিভাবক। কিন্তু তাঁদের সাম্‌নে এ কথা বলা যায় না। বৌদিদিদের সুপারিশ ধরিল।

বড়টি পরিহাস করিয়া বলিল,—ঠাকুরপো কি স্বয়ম্বরা হবে না কি?

ছোট বলিল,—কিন্তু ওরা যে খৃষ্টান।

যুবক বলিল,—খৃষ্টান নয়, ব্রাহ্ম। ওরাও হিন্দু—

দুজনে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—ওমা, ছি ছি ছি! তা কি হয়?

—কেন হয় না! দোষ কি?

ছোট বলিল,—তা ঠাকুরপোর ত এখন একটি মেম টিচারই দরকার। পড়া-টড়া বলে দেবে।

ক্রুদ্ধ হইয়া যুবক বলিল,—কি যে ঠাট্টা কর! দাদাদের বল্‌বে কি না?

উভয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামিতে চাহে না।

যুবক রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়-বৌ বলিল,—তুমি যে দেখছি মরিয়া হয়ে গেছ গো।—সঙ্গে সঙ্গে আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাস্যধ্বনি!

বিরক্ত হইয়া যুবক চলিয়া গেল।

পরদিন কথাটা বাড়ীর ছোটবড় সকলেই শুনিল এবং তাহার ফলস্বরূপ ত্রিতলের ঘরখানিতে বৃহৎ একটি তালা ঝুলিতে লাগিল। যুবক বুঝিল—তাহার অদৃষ্টের দ্বারও উহারা এমনি নির্ম্মম করে রোধ করিতে চাহে।

ছাদের উপর অস্থির পদে খানিক পায়চারী করিয়া সে নামিয়া আসিতেছে, এমন সময় অন্য ছাদ হইতে মৃদু আহ্বান আসিল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে নিশ্চল দেহটি মিশাইয়া সে আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মুখের বিষণ্ণ রেখাগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু কণ্ঠের স্বরে বিষণ্ণতা ধরা পড়ে।

যুবক আসিয়া এধারে দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়া যাওয়ার পর মেয়েটি মৃদুকম্পিতকণ্ঠে কহিল,—আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?

যুবক উত্তর না দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তরুণী একটু থামিয়া পুনরায় কহিল,—এই আলাপের কথাবার্ত্তা কি ভুলে যেতে পারেন না?

যুবক চঞ্চল হইয়া কহিল,—কি বলছেন আপনি, ভুলে যাব?

তরুণী বলিল,—কেন ভুলবেন না? আমরা ত কাল বাদে পরশু উঠে যাব। মাত্র দুদিনের জন্য এসেছিলুম,—কেন চিরদিনের জন্য—

অধীর কণ্ঠে যুবক কহিল,—চিরদিনের পরিচয় দুদিন কেন, একটি মুহূর্ত্তে দৃঢ়তর হয়। সেকি জীবনভোর চেষ্টা করলে ভোলা যায়?

তরুণী বলিল,—কিন্তু বাড়ীর লোকের উপরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

যুবক ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—তোমায় গোপন করবো না,—হয়ত তুমি সবই শুনেছ। আমার বাড়ীতে কারও ইচ্ছা নয়, এ বিয়ে হয়। তাঁদের আপত্তি ধর্ম্ম নিয়ে। আমি কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী সহ্য করতে পারি না।

তরুণী মিষ্ট স্বরে বলিল,—ধর্ম্ম যে জাতির প্রাণ।

যুবক শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল,—ধর্ম্ম কোথায়? আছে শুধু প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান। নইলে এতবড় ধর্ম্মের অবমাননা কোন্ পুঁথির পাতায় লেখা আছে? একটা জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোন্ মহাধর্ম্ম সাধিত হবে বলতে পার?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। প্রশ্নের কোনো উত্তর মিলিল না।

যুবক স্বর নামাইয়া কোমল কণ্ঠে কহিল,—আমি এই ধর্ম্ম ত্যাগ করবো। যদি তোমার অমত না থাকে—

তরুণী ত্রস্ত হইয়া কহিল,—না, না।

সবিস্ময়ে যুবক বলিল,—কি, না?

তরুণী ততক্ষণে আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়াছে। স্থির স্বরে বলিল,—বেদনার সৃষ্টি করে কোনো কাজ করলে জীবনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আপনি বুদ্ধিমান, ভেবে দেখুন। হয়ত কিছুদিন পরে এই উচ্ছাসটুকু থাকবে না, তখন—

যুবক গম্ভীর মুখে বলিল,—এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। এ সত্যকে উচ্ছ্বাস বলতে চাও,—বল—কিন্তু দুদিনের বলো না। এ চিরদিনের।

তরুণী বলিল,—আমরা কাল উঠে যাব। যদি আর দেখা না হয় অনুগ্রহ করে দোষত্রুটি—

ব্যথিত কণ্ঠে যুবক কহিল,—অমন ক'রে বল্‌লে সত্যিই ব্যথা পাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—দেখা আমাদের হবেই। কোনো বাধাই আমায় আটকে রাখতে পারবে না।

উপরে ক্ষীণ চন্দ্রের ছায়াটুকু ততক্ষণে মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল।

তরুণী আর কোনো উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। পরদিন। যুবক আসিয়া ও-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্তা—বোধ হয় তরুণীর পিতা—বাহিরের ঘরে বসিয়া চাকরটিকে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইবার জন্য গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন। মুখখানি তাঁর অসম্ভব রকম গম্ভীর। চোখের চশমা ও

মুখের দাড়ি-গোঁফ সে গাম্ভীর্য্যকে রূপ দিয়াছে। গলার স্বরটিও শ্রুতিসুখকর নহে।

যুবক তাহার সম্মুখে পড়িয়াই একটু থতমত খাইয়া গেল। এ যেন নারিকেলের শুষ্ক রসহীন আবরণ। ইহাকে ভেদ করা দুরূহ এবং শ্রমসাপেক্ষ।

গৃহকর্ত্তা আগন্তুকের পানে চাহিয়া বসিতে বলিলেন না। স্বভাবসিদ্ধ কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কাকে চান?

যুবক মনে করিল এমন রূঢ় অভদ্রোচিত প্রশ্ন সে জীবনে শোনে নাই। কিন্তু কণ্টকে গঠিত মৃণাল—ইহা সে জানিত।

একটু ইতস্তত করিয়া সে প্রশ্ন এড়াইয়া কহিল,—আমি আপনাদেরই সাম্‌নের বাড়ীতে থাকি, একটু আলাপ করতে এলুম।

লোকটি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল,—কিন্তু দেখছেন ত এখন অসময়—আজই আমরা উঠে যাব।

—কেন বিশেষ সুবিধা হ'ল না এখানে?

—সে কথা বলাই বাহুল্য।

এমন কাটা-কাটা জবাব—কতক্ষণ আর ধৈর্য্য রাখা যায়। একটা ক্ষুদ্র নমস্কার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধৈর্য্যহারা যুবক নমস্কার না করিয়াই বেশ একটু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দোর-গোড়ায় খোকার সাথে দেখা। সে আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল,—কোথায় গিয়েছিলেন,—আসুন না।

কিন্তু ঝুনা নারিকেলের রূঢ়ত্ব তাহার উৎসুক দন্তের পীড়া উৎপাদন করিয়াছিল,—সে আর দাঁড়াইতে চাহিল না।

টানাটানিতে খোকার হাত হইতে গোটা-দুই মাথার কাঁটা ও একটি চিরুণী খসিয়া মাটিতে পড়িল।

যুবক সে দুটি তুলিয়া কহিল,—এ কার জিনিষ খোকা?

খোকা কহিল,—দিদির। এখুনি দিদির সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে দোতলার জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। দিদি রাগ করলে তাই কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া কহিল,—এ দুটি আমার কাছে থাক। তোমার দিদিকে বলো।

আশঙ্কায় বালকের মুখ শুকাইয়া গেল। যুবকের হাত ধরিয়া সে বলিল,—না, না আমায় দিন। নইলে দিদি বড় রাগ করবে, কথা কবে না।

বালককে সান্ত্বনা দিয়া সে কহিল,—আচ্ছা, আমার কথা বলো, তা হ'লে আর কিছু বলবে না। আচ্ছা ছাদে গিয়ে আমি তাকে এখুনি বলছি—তুমি তাকে পাঠিয়ে দাওগে ত।

অবিলম্বে দুই ছাদে দুইজনের আবির্ভাব হইল। তরুণী হাসিয়া কহিল,—আজকাল ডাকাতী করতে আরম্ভ করেছেন দেখ্‌চি।

যুবক বলিল,—কাজেকাজেই। রত্নলাভের চেষ্টা পৃথিবীর সব জাতিই সর্ব্বসময়েই এমনি ক'রে করে। সাক্ষী তার ইতিহাস।

তরুণী কহিল,—সাক্ষী-সাবুদের দরকার নেই। আমার সামান্য মাথার কাঁটাটা কি এমন মহামূল্য রত্ন—

যুবক ম্লানহাস্যে কহিল,—সব জিনিসের মূল্য সকলের চোখে ত সমান নয়। আমার কাছেও অমূল্য। তোমার সঙ্গে আলাপের ওই স্মৃতিটুকুই আজীবনের সম্বল হয়ে থাক্‌বে।

তরুণী সবিস্ময়ে বলিল,—সে কি। আপনি পাগল। না, না, ও-সব যা-তা বলবেন না জ্যেঠামশায়ের কাছে একবার—

যুবক তাড়াতাড়ি উৎফুল্লস্বরে কহিল,—তিনি তোমার জ্যেঠামশায়। যাক্, বাঁচলুম।

তরুণী অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিল।

যুবক ভাবাবেগে বলিতে লাগিল,—ওই ঝুনো নারকোলটাকে তোমার বাবা মনে ক'রে এমন কষ্ট পাচ্ছিলাম!

তরুণী ব্যথিতকণ্ঠে কহিল,—উনি বড়ই স্নেহশীল। বাইরে দেখতে গম্ভীর, কিন্তু মনটি ওঁর ছোটছেলের মতই কোমল।

যুবক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—না না তা বলছি নে। তখন হয়ত খুব ব্যস্ত ছিলেন, যাক ওসব কথা। পরে ঈষৎ আবেগকম্পিত কণ্ঠে কহিল,—বোধ হয় এই আমাদের শেষ দেখা।

তরুণী ছলছল নেত্রে কহিল,—বোধ হয়।

তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। কতক্ষণ এ ভাবে দুজনে দাঁড়াইয়া থাকিত বলা যায় না, মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্র প্রখরতর হইয়া বাহ্য জগতের চৈতন্য আনিয়া দিল। জন্মের শোধ শেষ দেখা দেখিয়া দুটিতে পরস্পরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

রসময় সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিয়া সকলকে সচকিত করিয়া দিল। সকলে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—নয়নে তাহার দুটি অশ্রুবিন্দু পতনের আবেগে টল্‌টল্‌ করিতেছে।

হরিশ বলিল,—তা হ'লে এ উপন্যাসের নায়ক তুমি স্বয়ং।

রসময় বিহ্বলদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, হাঁ।—অমনি সমবেত বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন উঠিল,—গল্পটা যে মাঠে মারা গেল। তারপর, কোথায় বা গেল সেই তরুণী—

রসময় বলিল,—তা ত জানি না।

রমেন বলিল,—কি নাম তাঁর?

—তাও জানি না।

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রসময় তাড়াতাড়ি কহিল,—নাম না জানলেও স্মৃতি তার অক্ষয় হয়ে আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তা থাকবে—

ভূপেন বলিল,—কিন্তু সেই চিরুণী—কাঁটা—

পকেট হইতে কাগজের একটি মোড়ক বাহির করিয়া সে বিছানার উপর রাখিল। সকলের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে বাদলধারা ভেদ করিয়া একটি জীবন্ত কাহিনী যেন ফুটিয়া উঠিল; একটি তরুণীর মোহময় মুখ,—চক্ষের বিলাসবিহ্বল অর্দ্ধবিকশিত দৃষ্টি, অধরের সূক্ষ্মাগ্র কম্পন ও পুষ্পসারের অলক-গন্ধবাহী সৌরভ।

সকলেই সাগ্রহে মোড়ক খুলিয়া ফেলিল। বাহির হইল একটি ছোট চিরুণী ও দুটি কাঁটা। ঘরের ম্লান আলোকেও তাহা চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

হরিশ বলিল,—এযে নতুন রে,—একদম।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রসময় বলিল,—একদিন মাত্র সে ব্যবহার করেছিল।

ভূপেন চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল,—কিন্তু এখানা বড্ড ছোট্ট দেখাচ্ছে যে! বোধ হয় ন-দশ বছরের মেয়ের মাথার।

বোমা-ফাটার মত শব্দ করিয়া ক্রুদ্ধ রসময় বলিল,—চুপ ষ্টুপিড। আমার পবিত্র স্মৃতির এমনভাবে অপমান করিস না।

এবং পরমুহূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া আমাদের হাত হইতে জিনিষ কয়টি কাড়িয়া লইয়া দ্রুতপদে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

এমনভাবে রাগিতে কেহ তাহাকে কোনদিন দেখে নাই। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বুঝিল আঘাতটা যেমনই অতর্কিত, তেমনই নির্ম্মম হইয়াছে। ভূপেনকে সকলে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ভূপেন তাহাতে একটুও দমিল না। কহিল,—আচ্ছা দাঁড়াও, এ রহস্য যদি ভেদ না করি ত আমার নাম ভূপেন নয়। ওর আষাঢ়ে গল্পের না কিছু করেছে!—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

এমনভাবে বাদলার আনন্দটা মাটি হইয়া যাওয়ায় সকলেরই মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। চুপচাপ যে যাহার সীটে পড়িয়া রসময়ের দুঃখময় জীবনের কথাই ভাবিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—রসময় এখানে থাকে?

ভূপেন কলতলায় মুখ ধুইতেছিল, অগ্রসর হইয়া আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা আলাপ করিল। অবশেষে ভদ্রলোককে লইয়া হরিশের ঘরে ঢুকিয়া ভূপেন সমবেত চা-পান-নিরত যুবকবৃন্দের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—ইনি রসময়ের মেজদা। কালকের চিরুণী-রহস্য এঁর কাছ থেকেই শুনতে পাবে।

সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া বসাইল ও তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল।

তিনি বসিয়া বলিলেন,—যাক্‌, সন্ধানটা পেলুম নিশ্চিন্ত! ছোঁড়া এমনি ভাবিয়ে তুলেছিল! ভদ্রলোকের কাছে অপমান আর কি?

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

তিনি বলিলেন,—আর বলেন কেন মশায়,—ভাইটির আমার মাথায় একটু ছিট আছে। অবশ্য আগে খুব ভালই ছিল। বৌমাটি মারা যাওয়ার পর থেকেই এই অবস্থা।

বৌমা! তবে কি রসময় বিবাহিত? সেই ছাদের প্রান্তে রোমান্সের রমণীয় কাহিনী—ত্রিতলের পাঠকক্ষ, ঘুড়ির কথা,ঝুনা নারিকেলের তথ্য—সমস্তই গত কল্যকার বৃষ্টির মত কয়েক ঘণ্টার মায়া-রহস্য!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য বেশী দিনের কথা নয়, বৌমাটি আমার মারা গেছেন—গেল পৌষমাসে, অর্থাৎ মাস দুই হ'ল। মা আমার বড়ই শান্তশিষ্ট ছিলেন। আহা! ন'দশ বছরের বেলায় এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে।......ভাইয়ের অবস্থা দেখে আমরা ত মাঘ মাসেই বিয়ের সব ঠিক করি। কিন্তু দেনা-পাওনার সামান্য গণ্ডগোলে সে জায়গার সম্বন্ধ গেল ভেঙে। এই আর কি, ওর হ'ল রাগ। ফাল্গুনের প্রথমেই বাড়ী ছেড়ে মেসে এসে উঠেছে। কত জায়গায় না খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি।

সকলের চোখে চোখে কৌতুক-হাস্য খেলিয়া গেল। ভূপেন গম্ভীরভাবে বলিল,—তারপর?

ভদ্রলোক বলিলেন,—মা ত ছেলের জন্য কাঁদাকাঁটি করতে লাগলেন। অবশেষে আমরা দুভায়ে বাছাবাছি না করে একটি সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছি। তাকে কদিন ধরে খুঁজছি—কাল কলেজে সন্ধান পেয়েছি। ইচ্ছে আছে ফাগুনের শেষেই বিয়েটা দেব। সে কোথায় একবার ডেকে দিন না।

জন-চারেক ছোক্‌রা লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—না, সে ত মেসে নেই। ঠাকুর বললে, এই মাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন। আপনাদের ঘরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি শুনলেন, পরে ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক যুক্তকরে সকলকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—যাক্, আর ভাবনা নেই। সে যখন বিয়ের কথা শুনেছে, তখন ঠিক বাড়ী গিয়েই হাজির হবে। বড় উপকার করলেন—নমস্কার।—বলিয়া তিনি হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

সেইদিন হইতে রসময়কে আর কেহ এ মেসে খুঁজিয়া পায় নাই।

কাশ্মীরের কথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

(২)

মটন্ থেকে কিছুদূর গেলেই বামে লিদার নদীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নয়ন-মন এক নিমেষেই অভিভূত করে, স্বল্পতোয়া কলনাদিনীর উচ্ছল গতিবেগে মনে পড়ে।

"আমি ভাঙিব পাষাণকারা।
আমি ঢালিব করুণা ধারা।
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া,
আকুল পাগল পারা।"

নদীর মাঝে উইলো গাছ, তীরে চীনার, নদীর মাঝের জল বরফ-গলা, স্ফটিকস্বচ্ছ, তীরের জল লালচে, যেন লালপাড় প্রবাহিণী শাড়ী।

মটন্ হ'তে ১১ মাইল দূরে আইশ্‌মুখম জনপদ—পর্ব্বতগাত্রে যেন সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। এই স্থান হ'তে দেখা যায় মার্ত্তণ্ড ক্যানাল্। আইশ্‌মুখম হতে পাহালগাম পর্য্যন্ত পথের পাশে এই স্রোতস্বিনীর লীলা যে কি মধুর তাহা বোঝান যায় না। এই ক্যানাল লিদার হ'তে বাহির হ'য়ে মার্ত্তণ্ড মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে মিশেছে ঝিলমে। কাশ্মীরের জল-সরবরাহ সহজ ও স্বাভাবিক, চারিপার্শ্বেই

প্রস্রবণ ও ছোট ছোট গিরিনদী, সামান্য চেষ্টাতেই ক্ষেতে জল দেওয়া যেতে পারে। কাশ্মীরে বৃষ্টি হয় বৎসরে মাত্র ২৭ ইঞ্চি। শালী বা ধানই এখানকার প্রধান শস্য এবং কাশ্মীরবাসীর একমাত্র অন্ন। কাশ্মীরীরা রুটি খায় না, যে গম জন্মায় তাহাও উৎকৃষ্ট নয়। পূর্ব্বে অনাবৃষ্টিতে প্রায় দুর্ভিক্ষ হ'ত। কাশ্মীর-রাজ বহু অর্থব্যয়ে জল-সরবরাহের এমন সুব্যবস্থা করেছেন যে মনে হয় কাশ্মীরের কোন শস্যই জলের অভাবে নষ্ট হয় না। অতিবৃষ্টি ও অতি তুষারপাতই কৃষককে দুঃখ দেয়।

পাহালগামে খালসা হোটেল আছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাওয়াও মন্দ নয়। কাঠের ঘর, চারটি কুঠরীর ভাড়া নীচের তলায় দৈনিক ২৲ উপরের তলায় ৩৲,মাসিক ১০০৲ টাকায় সব খরচ চলে। তবে সপরিবারে গেলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে পাইনের নীচে বাস করাই ভাল; মাসিক পনের কুড়ি টাকা ভাড়ায় ডবল ফ্লাই টেণ্ট পাওয়া যায়। যাঁরা তাঁবু নেবেন যেন খুব ভাল ক'রে শোধন ক'রে নেন। খালসা হোটেলে কোন যক্ষ্মা-রোগীকে থাকতে দেওয়া হয় না। পাহালগামে দুধ, দই,
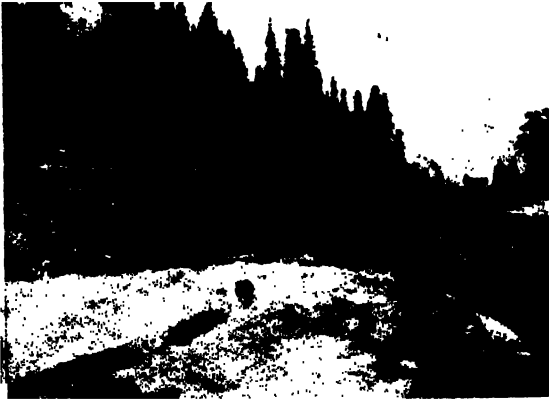
অমরনাথের পথে বরফের সেতু

ও মধু বেশ সস্তা। জ্বালানি কাঠও শ্রীনগরের দনায় খুব সস্তা।

শোনা যায় কাশ্মীরে মার্চ্চ ও এপ্রিলের সৌন্দর্য্য কি অনবদ্য অবর্ণনীয়। তবে বাঙালীর পক্ষে শীত সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীনগর হ'তে একটি প্রোগ্রাম করা দরকার।

(১) সিন্দ্ নদীর উপত্যকা প্রায় ৪০ মাইল বিস্তৃত। সোনামার্গ ও গন্ধর্ব্বল এই সিন্দ্ নদীর তীরে। গন্ধর্ব্বল নদীপথেই যাওয়া ভাল। হাউসবোট নিয়ে ঝিলম্ ও সিন্দ নদীর সঙ্গম (সাদীপুর) হ'য়ে

চন্দনওয়ারীর পথে

গন্ধর্ব্বল পৌছতে দেড়দিন সময় লাগে। সিন্দ নদীর জল শাদাটে ও হজমী। গন্ধর্ব্বল স্থানটি বেশ নির্জ্জন, পাখীর কাকলী ছাড়া আর কোনো কোলাহল নেই। দুধ ও মাছ সস্তা। গন্ধর্ব্বলের খুব নিকটেই এক টিঝরণা আছে, তার জল বেশ হজমী। গন্ধর্ব্বল হ'তে তিন মাইল দূরে ক্ষীরভবানীর মন্দির, মন্দিরের কোন বিশেষত্ব নাই। আষাঢ় শুক্লাষ্টমীতে মেলা হয়। এই মেলাতে কাশ্মীরী পণ্ডিত ও পণ্ডিতানীদের একত্র সম্মেলন হয়। কাশ্মীর হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার ও মেলামেশা দেখবার এই সুযোগ হারান উচিত নয়। গন্ধর্ব্বল হ'তে সাত মাইল দূরে মানসবল হ্রদ। কাশ্মীরেও এমন স্বচ্ছ জলের

হ্রদ আর নাই। কুড়ি-বাইশ ফিট জলের নীচে পর্য্যন্ত মাছের খেলা দেখা যায়।

গন্ধর্ব্বল হতে সাদীপুরে ফিরে হাউসবোট ছেড়ে কেবল রান্নার নৌকা ও শিকারা নিয়ে উলার হ্রদ

অমরনাথ তীর্থের অভ্যন্তর

দেখতে যেতে হয়। উলার সোপোর জনপদের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রায় ১৪ মাইল ইহার পরিধি। ঝিলম উলার হ্রদের একপ্রান্তে প্রবেশ করে অন্য প্রান্তে বাহির হয়ে বারামুল্লা অভিমুখে প্রবাহিত। উলার হ্রদে অপরাহ্নে নৌকা চালান বিপজ্জনক, কারণ ঝড়ের সম্ভাবনা খুব বেশী, নৌকাগুলির তলা চেপ্টা কাজেই সামান্য ঝড়েই ডুবে যায়। মনে আছে ডাল হ্রদ পার হবার সময় এমন ঝড় আসে, ভাসমান বাগানের আশ্রয় না পেলে সেদিন সমাধিস্থ হতে হ'ত। এই সব হ্রদে সাঁতার দেওয়া যায় না, কারণ জলের নীচে পদ্ম শালুক ও অনেক রকম 'জড়' (weeds) জন্মায়, একবার পা আটকালে আর ছাড়ান যায় না। ভারতে উলার হ্রদের মত বিরাট সুন্দর হ্রদ আর নেই।

গন্ধর্ব্বল হতে যেতে হয় সোনামার্গ ও বাল্‌তাল। সোনামার্গ থেকে একদিনে অমরনাথ পৌছান যায় এবং কোলাহাই গ্লেশিয়ার-পথে লিদারভাট্‌ হ'তে সোনামার্গ একদিনে পৌছান যায়, তবে পথ এত দুর্গম যে সহজে কেহ এ পথ অতিক্রম করতে সাহস করেন না। মে মাস ছাড়া এ পথে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। গন্ধর্ব্বল হ'তে সোনামার্গ ৩৫ মাইল, পথে কাঙ্গন্ ও গুণ্ডে ডাকবাংলো আছে। সোনামার্গ হ'তে বাল্‌তাল্ ৯ মাইল। সোনামার্গে ডাকবাংলো, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস আছে। দুধ, মাখন, আটা, চাউল, ডিম, মাছ ও মাংস পাওয়া যায়। বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান, তবে অশ্বযান ও তাঁবুর ঝঞ্ঝাটের জন্য খুব কম লোকই এখানে যান।

এই সব ডাকবাংলোয় সকলেই আশ্রয় নিতে পারেন। দৈনিক জন-পিছু ১৲ টাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কারও সাধ্য নাই কাউকে সরিয়ে দেবার। তবে চব্বিশ ঘণ্টার পর আর থাকবার অধিকার নেই। নূতন আগন্তুক এলেই বাংলো ছেড়ে দিতে হবে। তবে যদি বাংলো খালি থাকে, তবে যতদিন ইচ্ছা থাকা যায়।

শ্রীনগর থেকে ৪২ মাইল দূরে হরমুকুট গঙ্গা, হিন্দুরা এখানে আত্মীয়স্বজনের অস্থি নিক্ষেপ করেন।

গুলমার্গ। শ্রীনগর হতে ট্যাঙমার্গ বাসে ২৮ মাইল, ট্যাঙমার্গ হ'তে গুল্‌মার্গ ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে ৩ মাইল, গুল্‌মার্গের অর্থ গোলাপের ময়দান। চারিদিকে

পাহালগামের পথে লিদারের দৃশ্য

পাহাড়, মাঝে একটি নালা প্রবাহিত। মনে হয় একটি বাঁধ দিয়ে এই নালা বন্ধ করলেই গুলমার্গের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়। এককালে যে এটি হ্রদই ছিল এই অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে।

গুলমার্গের উচ্চতা প্রায় ৮৫০০ ফিট। ঠাণ্ডা খুব বেশী, বাদলা বৃষ্টিও বেশী, সূর্য্যের মুখদর্শন সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই ইংরেজেরা এ স্থান বিশেষ পছন্দ করেন। গুল্‌মার্গকে ইংরেজের বস্তি বললেই মানায়। ভারতীয় লোক খুব কমই এখানে বাস করেন। এখানকার পানীয় জলে লৌহ খুব বেশী থাকায় ভয়ানক কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। সেইজন্য সোডা হুইস্কিপায়ীদেরই এসব স্থান পোষায়। গুল্‌মার্গ দেখলে শিলং মনে পড়ে। চোখ জুড়ান সবুজ ময়দান, পাশে পাইনের ঘন বন। সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। পাশেই খিলেন্‌মার্গ, আল্‌পাথর ও আপার-ওয়াটের চিরতুষার, মনে হয় হাতবাড়ালেই বরফ পাওয়া যায়। বিস্ময়ে ও আনন্দে আকুল হ'য়ে উঠতে হয়। আনন্দের বিষয় এই সব অপূর্ব্ব রমণীয় স্থানে সহজেই যাওয়া যায়। বরফের উপর গড়াগড়ি দেওয়া বা স্কেটিং করার মধ্যে একটা নূতন আনন্দ অনুভব করা যায়। গুলমার্গ হ'তে নাঙ্গা পর্ব্বত ও হরমুখ দেখা যায়। উলার হ্রদ ও ঝিলম্‌ উপত্যকার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। যাঁরা কাশ্মীর-ভ্রমণে আসেন তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য গুলমার্গ দর্শন। সত্যিকার আনন্দ পাবেন। তবে এখানে কিছুদিন বাস করার অনেক অসুবিধা আছে। যাঁরা একদিনেই ফিরতে চান তাঁরা যেন খিলেন্‌মার্গ দেখেন। গুলমার্গ হ'তে খিলেনমার্গ মাত্র ৩ মাইল।

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্য্য মন্দির দ্রষ্টব্য। রাত্রে মনে হয় যেন একখান বড় হীরা ঝলমল ক'রছে, কারণ উহা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। উপর থেকে শ্রীনগর শহর ও ঝিলমের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। এখানকার রেশমের কারখানা দেখবার জিনিষ। সরকার থেকে পাস নিতে হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ হাজার মণ রেশম এই কারখানায় উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয় প্রায় সব রেশমই বিদেশে রপ্তানী হয়। কলিকাতার উল্টাডাঙ্গার আরিফ ব্রাদার্স এই রেশমের কাপড় তৈরি সুরু করেছে। লালমণ্ডি বা কাশ্মীরের যাদুঘরে অনেক দেখবার জিনিষ আছে। সাহ হাম্‌দানের জিয়ারাট বা মসজিদের কারুশিল্প উপভোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র ইতিহাস কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে কাশ্মীরের মত দুর্ভাগ্য আর কোন দেশেরই হয় নাই। সম্রাট ললিতাদিত্য ও অবন্তীবর্ম্মন প্রভৃতি কয়েকজন রাজাকে বাদ দিলে কাশ্মীরের রাজাদের নররাক্ষস বললেও কোন অত্যুক্তি হয় না। নিত্য দুর্ভিক্ষ, অতি-শোষণ ও পাশবিক অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখের সীমা ছিল না। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে হিন্দু নির্যাতন সুরু। সিকান্দার শাহ নামে
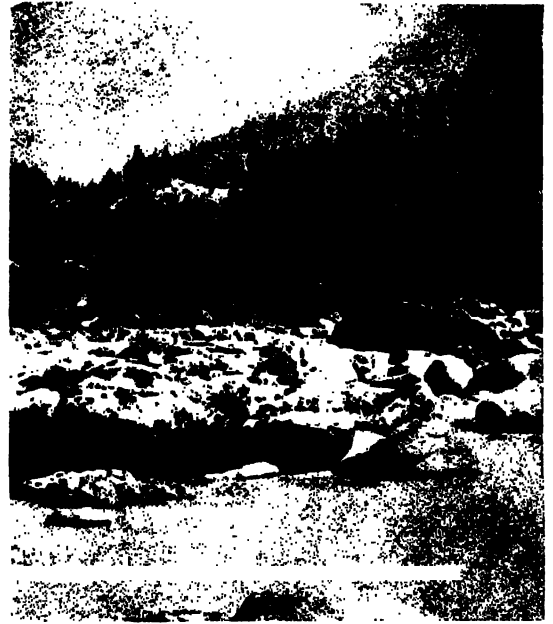
সোনামার্গ

এক ব্যক্তি হিন্দুদের কীর্ত্তি ধ্বংস করে ফেললে, হিন্দুদের জোর ক'রে প্রায় সকলকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করলে। মাত্র এগারটি ব্রাহ্মণ পরিবার আত্মরক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনৈক মহাপ্রাণ মুসলমান সম্রাট হন। তাঁর নাম জাইন-উল আবেদিন। তিনি সম্রাট আকবরের ন্যায় উদারনৈতিক ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন; প্রজারা তাঁর রাজত্বকালে সুখে ছিল।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর কাশ্মীর জয় করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান কাশ্মীরকে বড় ভালবাসতেন। তাঁদেরই হাতে-গড়া সালামার বাগ আজ্ছেবল

ও ভেরীনাগ তাঁদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দেয়। কাশ্মীর পাঠানদের হস্তগত হ'লে আবার অত্যাচার সুরু হয়। ১৮১৯ সালে শিখেদের হাতে আসে। শিখরাজত্বেও প্রজাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না।

১৮৪৮ সালে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে ব্রিটিশ-রাজ ক্ষতি-পূরণ দাবী করায় ডোগরা রাজপুতবংশীয় জম্মুর রাজা গুলাব সিং ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দেড় ক্রোর টাকা দেওয়ায় ব্রিটিশ রাজ কাশ্মীর বিক্রয় করেন। উপস্থিত মহারাজ হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরের অধীশ্বর। অতীত ও বর্ত্তমানের আলোচনা এবং তুলনা করলে মাত্র এই সত্যটুকু বলা যায় যে, কাশ্মীরের ভাগ্যে এমন সুশাসন আর কখনও হয়নি।
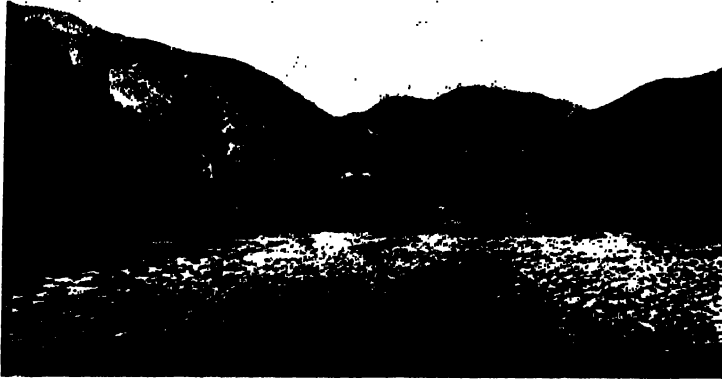
মানসবল হ্রদ

কাশ্মীর ও জম্মুর আয়তন প্রায় ৮৪,০০০ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। কাশ্মীরে শতকরা ৯৩ জন মুসলমান, ৭জন হিন্দু। কাশ্মীর ও জম্মু মিলিয়ে শতকরা ২৭জন হিন্দু, ৭৩জন মুসলমান। নিজামের সঙ্গে বদল করলে মন্দ হয় না। কারণ তা'তে সমধর্ম্মার রাজত্ব হয়। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বর্ত্তমান আয় পৌনে তিন ক্রোর। কাশ্মীরে কয়লা, পেট্রোলিয়ম, নীলকান্তমণি এগেট সোনা রূপা প্রভৃতি প্রায় সব খনিজ পদার্থই পাওয়া যায়। এই সব ভার্জিন ফীল্ড হতে যেদিন তাহাদের অমূল্য সম্পদ উদ্‌ঘাটিত হবে, আশা করা যায় সেদিন কাশ্মীরের আয় নিজাম-রাজ্যের আয়কেও ছাড়িয়ে যাবে। উপযুক্ত মন্ত্রীর পরিচালনায় উপর এই রাজ্যের কল্যাণ নির্ভর করছে।

বহুকালের অত্যাচারে জর্জ্জরিত কাশ্মীরীর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। ১৮৩৬ সালে মেকলে বাঙালী চরিত্রের উপর যে তীব্র মন্তব্য প্রয়োগ করেন, আজ কাশ্মীরীদের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অথচ এমন সুশ্রী এবং এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ ভারতে আর নেই। কিন্তু পাঞ্জাবী দোকানদার বলে "আমাদের এক দাম, আমরা পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী নই।" কাশ্মীরীদের আদবকায়দা ও ব্যবহার বিশেষ মোলায়েম, তবে এদের কথায় ও কাজে তফাৎ বড় বেশী। অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা স্বতন্ত্র। দারিদ্র্য দূর হ'লে এবং শিক্ষিত হ'লে এরাই আদর্শ মানুষ হ'য়ে উঠবে। সাপ্রু ও নেহরুর নাম ত আজ জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের শরীরের গঠন, মুখশ্রী, নাসিকার গঠন এবং গায়ের রং অনবদ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের রং ফরসা। চেনা যায় কাশ্মীরী পণ্ডিতের কপালের ফোঁটায় এবং কাশ্মীরী পণ্ডিতানীদের কোমরবন্ধে। সাধারণ মুসলমানদের অবরোধ নেই। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণমেয়েরা অন্তঃপুরবদ্ধ হওয়ায় তাঁদের রং ফ্যাকাশে শাদা, এবং গঠন কেমন আলগা ব'লে মনে হয়। লালচে আভা নেই। মুসলমান-মেয়েদের খোলা হাওয়ায় কর্ম্মঠ জীবন যাপন করায় দেহ বেশ সুগঠিত এবং মুখে লালচে আভা দেখা যায়। চোখ কতকটা ইরাণীদের মত। তবে এদের পরিচ্ছদে কোনো সুসঙ্গতি ও সৌষ্ঠব নেই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই একটা ঢিলা আঙ্গরাখা ব্যবহার করে। এ রকম পরিচ্ছদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। দারিদ্র্য বড় বেশী, শীতের দেশ, উপযুক্ত গরম কাপড় সংগ্রহ করার সামর্থ্য নেই। একমাত্র সম্বল কাংড়ী। একটা মাটির গামলা উইলো (বেতের মত) দিয়ে ঢাকা। তাতে

আগুন থাকে এবং সেটা তারা ঢিলা আঙ্গরাখার মধ্যে নিয়ে শরীর গরম করে। অসাবধানতায় অনেক সময় গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং মানুষও পুড়ে মরে। অধিকাংশ কাশ্মীরীর পেট আগুনের আঁচে পুড়ে যায়।

এক উড়িয়া ছাড়া ভারতে কাশ্মীরীর মত গরীব আর নেই। এরা দুবেলাই ভাত খায়। এক রকম শাক এদের প্রধান তরকারী। কাশ্মীরী মেয়েরা বহু সন্তানবতী হয়, লোকে বলে এই শাকই নাকি কাশ্মীরীদের বহু প্রজা ও সৌন্দর্য্যের মূল। এই কারণেই কাশ্মীরী কুলি মজুর, হাঞ্জী বা ঘোড়ার সইসদের সঙ্গে দরকসাকসি করতে কষ্ট হয়। কাজ অনুসারে বক্‌শিস্ দেওয়া ভাল। চাকুরের আনন্দ 'উপরি'তে, সাহেবদের আনন্দ এলাওয়েন্সে, কাজেই খুব উদারভাবে এই গরীব-দুঃখীদের বক্‌শিস্ দেওয়া উচিত। ঘোড়ার সঙ্গে যে-সব সইস যায়, কি কষ্টই না সহ্য করে তারা। আরোহী যাতে কোনো কষ্ট না পায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইউরোপ ও আমেরিকা 'টিপস্' না দিলে কোনো কাজই হয় না। আমাদের দেশের লোক কত অল্পে সন্তুষ্ট হয়। যাঁরা সামর্থ্য সত্ত্বেও বক্‌শিস্ দিতে কাতর হন, বুঝতে হবে তাঁরা হৃদয়হীন।

কাশ্মীরীরা বড় মোলায়েম স্বভাবের লোক। ঝগড়া, মারামারি খুবই কম। মজঃফরাবাদ শহর বাদ দিলে খুনজখম হয় না বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোট ছেলেদের মধ্যে বদমাইসি নাই বললেও চলে। অধিকাংশ মামলাই বিষয়-ঘটিত।

গিলঘিট্ ও স্কার্দু মুসলমানপ্রধান। লে ও লডক্ বৌদ্ধপ্রধান। লডক্ তিব্বতের একটা অংশ মাত্র। এখানে উকিল নাই, আদালত নাই, জেল নাই; ভারী শান্ত এখানের মানুষ। লে শহর মনে হয় পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। নয় হাজার হইতে তের হাজার ফিট উচ্চে মানুষের বসতি। এখানে নারী সাধারণত চারজন স্বামী গ্রহণ করে। মনে হয় জতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবেরা এই তিব্বত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাজেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বে তাঁদের সংস্কারে বাধে নাই। এখানে খাদ্য উৎপন্ন হয় খুব কম, কাজেই প্রজাবৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। স্কার্দু ও গিলঘিটে মুসলমান বহুপত্নীক।
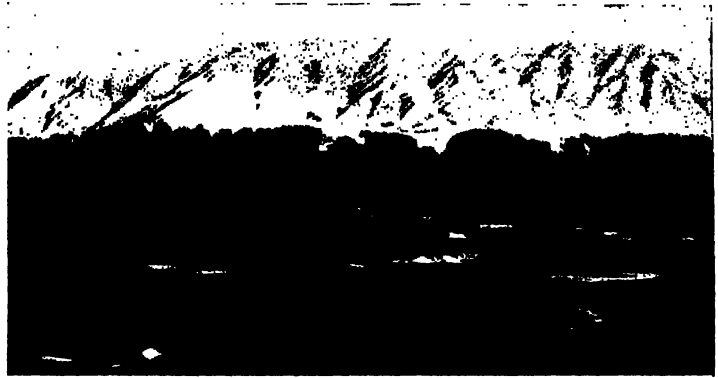
গুলমার্গ

কাশ্মীরের প্রধান সম্পদ তাহার শিল্প। এক চীন ছাড়া এত সূক্ষ্ম শিল্পকাজ আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। এত কম মজুরী পৃথিবীর আর কোনো মজুর পায় না। অথচ এই মজুররা যেন যাদুকর। কোনো শিল্পীই তিন আনা হতে আট আনার বেশী মজুরী পায় না। এত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা যে, সে মরে অনাহারে, নিষ্ঠুর নিয়তির এই পরিহাস! শালে, টেবিল-ক্লথে, পালঙ-পোষে, শাড়ী কাঠের ও রূপার উপর কাশ্মীরী শিল্পী যে কাজ করে তা দেখলে আলাদীনের প্রদীপ মনে পড়ে। পাপিয়ার মাশে ও কাঠের উপর রঙের কাজ খুবই সুন্দর। পাপিয়ার মাশে বস্তুটি হচ্ছে ছেঁড়া কাগজ ও ছেঁড়া ন্যাকড়ার রাসায়নিক সংমিশ্রণে কম্পাউণ্ড বিশেষ, বেশ হাল্‌কা। দেখতে কাঠের মত।

এখানে কোনো জিনিষ কেনা বড়ই কঠিন ব্যাপার, কারণ প্রতিপদেই ঠক্‌বার ভয়। কাশ্মীরী ব্যবসাদার চীনাবাজারের ব্যাপারীদেরও হারিয়ে দেয়। দাড়ি

ছুঁয়ে মুসলমান শপথ করে, কিন্তু দর অর্দ্ধেক কমিয়ে দিলেও জিনিষ বিক্রী করে। পাঞ্জাবী দোকানদার যথা কানাদ কোম্পানী, হাঁসরাজ সোনি ও কাশ্মীর ডিপোতে (তিনটিই আমিরা কদলে) এক দর এবং মনে হয় বেশ ন্যায্য দাম। এইখানে যাচাই ক'রে ফেরিওয়ালাদের কাছে জিনিষ কেনা যেতে পারে। অনেক সময়ই ঠক্‌তে হয়, তবে প্রতিযোগিতায় সস্তাতেও পাওয়া যায়। বড় দোকানদারদের দোকানে জিনিষ দেখা দরকার, কারণ ষ্টাণ্ডার্ড বোঝা যায়, কাঠের কাজ গানীমেদী ও পীর এবং রূপার কাজের জন্য খিজির মহম্মদের দোকানই সব চেয়ে বড়। ধনী লোকদের উচিত এই সব দোকানে কেনা। ছোট দোকানে বা কারিগরের বাড়িতে জিনিষপত্র বেশ সস্তায় পাওয়া যায়।

লডক প্রদেশের প্রধান সহর লে'র দৃশ্য

কাশ্মীরী সিল্কের যে বিজ্ঞাপন থাকে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ কাশ্মীরী সিল্ক প্রায় সবই বিদেশে রপ্তানী হয়। ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান হ'তে সিল্ক আমদানী হয় কাশ্মীরে, কাশ্মীরীরা তাঁতে বুনে তার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করে। সাধারণতঃ দশ টাকা হ'তে পঞ্চাশ টাকা শাড়ীর দাম। হাঁসরাজের দোকানে সব চেয়ে ভাল প্যাটার্ণ পাওয়া যায়। শাল সম্বন্ধে পণ্ডিত গুলাম মহম্মদ নূরুদ্দীনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, এমন অমায়িক ভদ্রতা কাশ্মীরেও দুর্লভ। এখানে অনেক মুসলমান 'পণ্ডিত' উপাধি ব্যবহার করেন, অতীত হিন্দুদের স্মৃতির গৌরবে হিন্দুর উপাধিও পীর হয়। দু-জন ফেরীওয়ালা উল্লেখ-যোগ্য ; পণ্ডিত নারায়ণ ভজু সংস্কৃত ও পার্সীয়ান শ্লোকের বৃষ্টি করেন, এবং মহম্মদ শোভানার ধূর্ত্ততা মনে রাখবার জিনিষ। এদের প্রধান সম্পদ কতকগুলি বড়লোকের প্রশংসাপত্র, এরা এইরূপে ক্রেতাদের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে কার্য্যসাধন করে।

হাউস-বোটের জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। প্রাতে ৭টা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপারীরা শিকারা করে জিনিষপত্র বিক্রী করতে আসে। সমস্ত দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় এই-সব জিনিষপত্র দেখে। ব্যাপারী-দের ধৈর্য্য ও ভদ্রতা অসীম। কিছু খরিদের জন্য অনুনয়- বিনয় করে। অনেক সময় তাদের কাতরতা দেখে কিছু খরিদ করতেই হয়। এরা নাছোড়বান্দা এবং আশ্চর্য্য রকম বুদ্ধিমান। মাখন, রুটি, পনীর, কেক ইত্যাদিও শিকারা ক'রে পৌঁছে দেয়। মাস মাস বিল দেয়।

যে-কোন শৈলনিবাস অপেক্ষা কাশ্মীর সস্তা ব'লেই মনে হয়। কাশ্মীরী চাল টাকায় আট দশ সের, ঘি'র সের ১।০, ভাল দুধ টাকায় ৫।৬ সের, মাছ ।৶০, মাংস ৮০। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হ'তে যে সব জিনিষ আমদানী হয় তার দাম টাকায় চার আনা বেশী মনে হয়। ঘি ও মাছ ভাল নয়। ডিম প্রধান খাদ্য ডজন ।৶০। মে জুন মাসে চেরী, ষ্ট্রবেরী, খোবাণী পাওয়া যায়, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি পাওয়া যায়। ফল খুব বড় হয় এবং দাম সস্তা। জনৈক মাদ্রাজী বন্ধু বললেন যে দেড় মাসে তাঁর সর্ব্বসমেত খরচ হয়েছিল এক শত টাকা।

কলিকাতা থেকে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণী এবং মোটর বাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকায় কাশ্মীরে পৌঁছান যায়।

কাশ্মিরী পণ্ডিত ও বাঙালী ব্রাহ্মণের অনেকটা সাদৃশ্য

আছে। উভয়েই মাছ-মাংস খায়। বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারে যদি কাশ্মীরী পণ্ডিতকন্যা বধূরূপে পাওয়া যায় বড়ই ভাল হয়। সৌন্দর্য্য ও ইউজেনিক্‌সের দিকে কল্যাণ হওয়ারই সম্ভাবনা।

কাশ্মীরের শাল প্রসিদ্ধ। কাশ্মীর-রাজাকে এখনও প্রতি বৎসর ছ'খানা শাল ভারত-সম্রাটকে উপঢৌকন বা কর দিতে হয়। শাল তৈরি হয় পশমিনায়। পশমিনার গজ চার টাকা হইতে একশ' টাকা। পশমিনা তিব্বত ও লাদাক অঞ্চল হ'তে আমদানী হয়, ছাগলের লোম হইতে তৈরি। এই সব ছাগলের লোম খুব বড়। বাহিরের অংশ মোটা এবং খস্‌খসে, ভিতরের অংশ মোলায়েম। ভিতরের অংশকে তিন চার ভাগে কাটা হয়, চামড়ার খুব নিকটের যে লোম তা হতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশমিনা তৈরি হয়। শালে যে পশমিনা লাগে তার প্রস্থ ৫৮ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন গজ। দশ টাকা হ'তে পনর টাকা গজের বেশ ভাল পশমিনা পাওয়া যায়। "চার সুতী কা তফতা" অর্থাৎ দুটো পশমিনা সুতা পাকিয়ে এক সুতা করা হয় এবং এইরূপ দুই পাকান সুতার টানা-পড়েনে যে কাপড় তৈরি হয় তাহাই চার সুতির তাফতা, ইহা বেশ মজবুৎ কাপড়। ত্রিশ চল্লিশ টাকা মজুরীতে বেশ সূক্ষ্ম কাজ পাওয়া যায়। ৭৫৲ টাকায় বেশ শাল পাওয়া যায়। ২০০৲ টাকা খুব ভাল শাল মেলে। তবে যে পশমিনার গজ ১০০৲ টাকা, তার দোরোখা শালের দাম সাত-আট শ' টাকা। এত মোলায়েম যে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা যায়। তা ছাড়া মেয়েদের ব্যবহারের জন্য রিং শাল পাওয়া যায়, ইহা পশমিনা ও রেশমে তৈরি, দাম ত্রিশ-চল্লিশ টাকা, আংটির মধ্যে গলে যায়। তাছাড়া ৬০৲ হ'তে ৮০০৲ টাকা এক জোড়া জোবের দাম, ধোসার ও মলিদার দাম ১৫৲ হ'তে ২৫৲। কাশ্মীরী পট্টু বড় চমৎকার জিনিষ। কানাদ কোম্পানী-কে লিখলে নমুনা পাওয়া যায়। একটাকা গজে বেশ ভাল পট্টু পাওয়া যায়। ৮ গজে সুট তৈরি হয়। জার্ম্মান পশম কাশ্মীরে আমদানী হয়, তাকে র‍্যাফল বলে, খুব মোলায়েম, কিন্তু মজবুত নয়।

পালংপোষ ও টেবিলক্লথে যে পশমের কারুকার্য্য হয়, তাহা ব্যাপারীরা বলে পশমিনা বা র‍্যাফেল, কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শ্রীনগরে যে পশম পাওয়া যায় সাধারণতঃ তাহাই এই সব কাজে ব্যবহৃত হয়। সুপেয়ান্ অঞ্চলে যে পশম হয় তাহা অপেক্ষাকৃত মোলায়েম। এই দুই পশমেই কাজ হয়, এবং রেশমের কাজও হয় একা

নিষাৎ বাগ

শুইবার সাধারণ পালংপোষ পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

কাশ্মীর হ'তে ফিরবার পথে বানিহাল হ'য়ে জম্মুই প্রশস্ত। মধ্যাহ্নে শ্রীনগর হ'তে বাহির হ'লে ৫৩ মাইল দূরে ভেরীনাগ দেখা প্রয়োজন। ইহাই ঝিলমের উৎপত্তিস্থল। একটি ক্ষীণধারা মাত্র, প্রায় ২৫ মাইল নীচে সঙ্গমে লিদার নদীর সহিত মিলিত হ'য়ে নূতন রূপ ধরেছে। লিদারের জলেই ইহার পুষ্টি, কিন্তু লিদারের নাম হারিয়ে গেছে ঝিলমে।

লোয়ার মুণ্ডা পর্য্যন্ত পথ সমতল। তার পরেই চড়াই, প্রায় চার হাজার ফিট উঠতে হয় বানিহাল টনেল

পৌঁছতে। এই ৪০০০ ফিট উঠতে ও নামতে দু-দিকে কুড়ি মাইল ক'রে রাস্তা তৈরি ক'রতে হয়েছে। এই বানিহালই কাশ্মীর ও জম্মুর সীমান্ত প্রাচীর। রাত্রে বানিহাল ডাকবাংলোতে বিশ্রাম। প্রাতে যাত্রা ক'রে রামবানে চীনাবের সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় দশ-বার মাইল রাস্তা চীনাবের তীরে, ঝিলমের গর্জ্জ মনে পড়িয়ে দেয়। চীনাবের উপত্যকা ২৫০০ ফিট নীচে, তার পর আবার চড়াই আরম্ভ। পথে পড়ে বাতোৎ, ডাকবাংলো আছে, ঘন পাইনের বন, বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান, কাজেই যক্ষ্মা রোগীর আড্ডা (উচ্চতা ৬০০ ফিট), প্রায় ৮০০০ ফিট উঠে তারপর উৎরাই সুরু হয়। কুদ্ ডাকবাংলোতে মধ্যাহ্নের স্নানাহার সমাপন ক'রে তিন-চার ঘণ্টায় জম্মু পৌছান যায়। বানিহাল পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রাওয়ালপিণ্ডি পথের চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। জম্মুতে একদিন কাটান যেতে পারে। জম্মুতে কতকগুলি সুন্দর মন্দির আছে। দূর হ'তে সন্ধ্যালোকে মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোন যাদুকরের হাতে তৈরি। জম্মু হ'তে ওয়াজিরাবাদ ৫২ মাইল।

কাশ্মীর সম্বন্ধে দু'খানি গাইড আছে। Dr. Atri's Guide, দাম ১৷৷০, Neve's Guide ৩৷৷০, Col. Younghusbandএর বই সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য। ত্রিবর্ণ চিত্রে ভরা। কত কবি চিত্রকর যুগে যুগে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কাশ্মীর চোখে দেখলে মনে হয় তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে। কাশ্মীর সত্যই ভূ-স্বর্গ।

রিক্ত রাহী

শ্রীজ্যোতি সেন

একলার জীবন, নিঃসঙ্গ পথেরই যাত্রা, চলিতে চলিতে চলার আনন্দ ফুরাইয়া যায়, পা দুটি অচল হইয়া ওঠে, পথ আর কাটে না। কিরণেরও ঐ দশা।

একলা লোক, একাকীই সংসার পাতে, কিছুতেই জমিয়া ওঠে না। ছড়াইয়া পড়িয়া সব ছারখার হইয়া যায়।

নদীতীরে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বাড়ীখানি; একেবারে নির্জ্জন। সেই জনপ্রাণীহীন বাড়ীতে তার একলার জীবনযাত্রা,—কখনো চলে, কখনো যেন থামিয়া দাঁড়ায়।

জীবনের স্বচ্ছন্দগতি পঙ্গুর মত খোঁড়াইতে থাকে।

একলা লোকের সংসার,—একটা ঘরেই সব। শোওয়া, বসা, কাজকর্ম্ম, যা'কিছু ঐ একটি ঘরে। ঘর আরও আছে, উপরে নীচে সাত আটখানা, কিন্তু থাকিয়াও নাই, খালিই পড়িয়া থাকে।

বাড়ীই আছে, নারী ত নাই, কে আর গুছাইয়া সংসার করে? ঘরখানা দেখিলেই ঘরের লোকটিকে চেনা যায়। মেঝের উপর এদিক-ওদিক জিনিষপত্রগুলি যে-যার মনে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, মিল বা মিছিল বলিয়া ঘরের ভিতর কিছু নাই।

দরজার পাশেই জোড়া-দুই জুতা একপরত ধূলা-কাদা গায়ে যেন চোখ বুজিয়া রহিয়াছে। লোকটিরও সেদিকে চোখ পড়ে না, তক্তাপোষের গা ঘেঁষিয়া ছাতি, লাঠি ও লণ্ঠন শিয়রের কোণটিতে খাড়া হইয়া আছে—পাহারাই দেয় না কি, অমনি থাকে। বাসনপত্র বাক্স তোরঙ্গ যে যেখানে ঠাঁই পাইয়াছে সে সেখানেই রহিয়াছে, দিনের মধ্যে দশবার নড়িয়াও ঠিক জায়গায় আসে না।

রান্না করিবার জন্ত রাঁধুনী আছে, কিন্তু এ কাজ ত তার নয়; সেজন্ত ঝি রহিয়াছে, ঠিকা ঝিও দায় সারিয়াই যায়, তাই ঘরখানা দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে। গৃহস্থের সংসারে এমন হয় না।

কিন্তু কে-ই বা গৃহস্থ আর কারই বা সংসার—কিরণ কাহাকেও কিছু বলে না।

ঝি যেমনই হোক্, বামুন-ঠাকুরাণী তেমন নয়। ব্রাহ্মণের বিধবা,—যত্নআত্তি একটু করে। সাড়ে সাত টাকা মাহিনায় শুধু রান্না করিবারই কথা, প্রয়োজন হইলে বাজারে যায়, ভাত লইয়া বসিয়াও থাকে। কিন্তু প্রায়ই তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয়। লোকটির স্নান করিতে যাইতেই যত আলস্য। আলস্য ভাঙিয়া তেল মাথায় দিয়া যদি বা স্নানে যায় ত গামছা খুঁজিতে আবার দেরি হয়।

বামুন-ঠাকুরাণী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, বলে—তোমার যে কি, তুমিই জান। সারা ঘর ত ঘুরচ, কিন্তু কেন ঘুরচ তাও হয়ত মনে নেই। ঐ ত গামছাটা ঝুলচে ঐ জান্‌লার ওপর, দেখতে পাও না, না কি,—কোন্ রাজ্যে থাক ?

কিরণ হাসে, বামুন-ঠাকুরাণীর কথায় রাগ করে না, মন যে কোন্ রাজ্যে থাকে তাহা তারও জ্ঞানের অগোচর।

জবাব না দিয়া কিরণ কলতলায় চলিয়া যায়।

স্নান করিয়া কাপড় পরিতে গিয়া দেখে কাপড়খানা পরিবার অযোগ্য হইয়াছে, পরা যায় না। চেঁচাইয়া বলে,—একখানা কাপড় দিয়ে যান্ ত, এ-খানা ছেঁড়া। বামুন-ঠাকুরাণী কাপড় লইয়া কলতলায় গিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে,—কাপড়খানাও একটু দেখে নিতে পার না ? কি রকম তুমি ? এমন হ'লে চলে ?

কিরণ ম্লান হাসিয়া জবাব দেয়, - চলছে ত।

কিন্তু সন্ধ্যাকালে রান্না করিতে আসিয়াই বামুন-ঠাকুরাণী চেঁচাইয়া বলিয়া ওঠে,—চলছে ত! এ'কে আবার বলে চলা ?

কিরণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, জিজ্ঞাসা করে—কি হ'ল ? চেঁচামেচি কেন ?

বামুন-ঠাকুরাণী ব্যঙ্গ করিতেও পটু, হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া বলে,—চেঁচাই আমার মাথা খারাপ হ'য়েচে ব'লে, ঘরে যে কিচ্ছু নেই, বাঁদরে খেয়ে সব শেষ করেছে, এখন খাবে কি ? যাও বাজারে যাও, সন্ধ্যেবেলা আমি বেরুতে পারব না।

না গিয়া উপায় নাই, কিরণকেই উঠিতে হয়। কিন্তু বিরক্ত হইয়া পড়ে, রাগ করিয়া বলে,—জ্বালাতন আর কি!

বামুন-ঠাকুরাণী মুখ টিপিয়া হাসে, বলে,—জ্বালাতন বই কি,—সংসারী না ঝকমারী; সহ্য কত্তে না পার সন্নেসী কেন হও না ?

হওয়াই উচিত,—বলিয়া কিরণ অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়।

বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে বামুন-ঠাকুরাণী বলে,—বে-থা একটা কর, নইলে কে তোমার সংসার দেখবে ?

—কাউকে দেখতে হবে না, নিজেই দেখতে পারব, বলিয়া লণ্ঠনটা বিছানার উপর তুলিয়া তাক হইতে বই লইয়া কিরণ পড়িতে বসে।

বামুন-ঠাকুরাণী হাসে। রাগ কম নয়, কিন্তু রাগের কথাটা কি হ'ল ?

কিরণ জবাব দেয় না।

বামুন-ঠাকুরাণী আগের পুরাতন কথাটা নূতন করিয়া আবার সুরু করে, নিজেই দেখবে। যা দেখচ তা আর বলে' কাজ নেই। নিত্যি তিরিশ দিন আমার ঐ ঝঞ্ঝট ভুগতে হয়। তারপর একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া অভিভাবিকার মতই ভারি-কণ্ঠে বলে,—সত্যি বলছি কিরণবাবু, বিয়ে তোমার করা দরকার। বলে,—পুরুষ আর নারী, এই দু'য়ে সংসারী।

মিথ্যাও নয়। নারীহীন বাড়ী একটা গৃহ, না সে আবার সংসার ?

কিরণ বই হইতে মুখ তুলিয়া বামুন-ঠাকুরাণীর মুখের পানে তাকায়। মুখ দেখিবার জন্ত নয়—হয়ত একটি নারীর কথা মনে পড়িয়া যায়, আর শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। ভাবে, সে কি এই সংসারে আসিবে ?

আসিতেও পারে। কিন্তু না আসাও ত কিছু বিচিত্র নয়।

একদিন একটা তুচ্ছ ঘটনাতেই ত একত্র হইয়াছিল, তারপর ঘনিষ্ঠতা! কি সে দুর্নিবার আকর্ষণ, দেখা না হইলেই দিন কাটিত না।

ভালবাসা ছাড়া আর কি!

কিন্তু কোথা হইতে সুধীর আসিল, সুধীর আসিয়া আঙিনার আলোটুকু আড়াল করিয়াছে। কোন্ এক সময়ে আলোটুকুও মুছিয়া যাইবে,—তার হয়ত দেরিও নাই।

একখানি গৃহের পরিকল্পনা, এতদিনের পরিচয় আগাগোড়াই দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। বিবাহে আর উৎসাহ থাকে না।

বামুন-ঠাকুরাণীরই যেন মাথাব্যথা, কিরণ উৎসাহ না দিলেও তার উৎসাহের সীমা নাই। বলে,—বিয়ে তোমাকে কত্তেই হবে। কথায়ই আছে—মা বউ স্নেহ, তারে বলে গেহ। মা নেই, বউ নেই—এমনিভাবে মানুষ বাঁচে। মা ত আর পাবে না, বউ একটি নিয়ে'স।

কিরণ চুপ করিয়াই থাকে।

সেদিন দুপুরে খাইতে বসিলে বামুন-ঠাকুরাণী পুরাতন প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিল। 'বিয়ে যদি কর ত বল, মেয়ে দেখি।'

কিরণ হাসিয়া বলিল,—দেখুন না, দেখতে দোষ কি? আছে না কি মেয়ে?

বামুন-ঠাকুরাণীর গাল-ভাঙা মুখে পুলকের বান ডাকিল। বলিল,—মেয়ের আবার অভাব? পথে ঘাটে,—তুলে আনলেই হয়—

কিরণ কহিল,—কই আমার চোখে ত পড়ে না। কি জানি, আমারই হয় ত চোখ নেই। তা বেশ ত পথ থেকেই না হয় একটা কুড়িয়ে নিয়ে আসা যাবে—কি বলেন?

কথাটা একটা পরিহাস বুঝিতে পারিয়া বামুন-ঠাকুরাণী গম্ভীর হইয়া বলিল,—তুমি ঠাট্টা করচ, কিন্তু ঠাট্টার কথা এ নয়।

না-ও হইতে পারে। কিরণ চুপ করিয়া রহিল। এই নীরবতাও বামুন-ঠাকুরাণীর সহ্য হয় না, বলিল,—তুমি মনে করেছ আমি কিছু জানিনে বা বুঝিনে।... সব খবরই রাখি।

—রাখেন না কি? তা'ত আর জানি না, তা' বেশ ত গোপন করবারও কিছু নেই।—বলিয়া কিরণ মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

বামুন-ঠাকুরাণী কহিল, ওরা যে বেম্ম, বেম্মদের কি আবার—বলিতে গিয়া বামুন-ঠাকুরাণী সীমা ছাড়াইয়া যা তা বলিতে লাগিল।

স্পর্দ্ধা বটে। কিরণের মুখখানি মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া উঠিল, রাগে মুখ দিয়া তার কথা আসিল না। ভালবাসার কাছে যে জাতিবিচার নাই বামুন-ঠাকুরাণী তার কি বুঝিবে? কিরণের রাগটা কিছুতেই তার সমীচীন মনে হইল না, বলিল, তুমি মিছে রাগ করচ, আমি কি এমন অন্যায় কথা বললুম?

কিরণ আর কথা কহিল না।

কথা বলিবার রুচি আর থাকে কি? কিন্তু ও যে বেচারা,—উহার উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। নিঃশব্দে খাইয়া উঠিয়া নীরবে নতমুখে এক কোণে বসিয়া থাকে। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য লইয়া বসিয়া থাকাও যায় না। ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে সুরু করে। বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবে।

ভাবনার কি অন্ত আছে? জীবনের শূন্যতার ফাঁক দিয়া ভাবনাগুলিই বার-বার উঁকি মারিতে থাকে, মনের ভিতর জীবনের যত-রকম প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তা সদর রাস্তার ভিড়ের মত জড় হইয়া মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

মমতার কথাই মনে পড়ে। মমতার জগৎ সুধীরকে লইয়া হয়ত গড়িয়া উঠিতেছে। আর তার জগৎ? সে জগৎ মমতার ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে, সে নাই।

বেলা পড়িলে কিরণ ছাদে গিয়া বসিল।

খোলা ছাদ। অশ্বত্থ গাছের ডালগুলি আসিয়া ছাদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অশ্বত্থ-ডালের ফাঁক দিয়া গঙ্গার জল আর বালুচর দেখা যায়। বালুচর

ছড়াইয়া বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত। তারই কিছুদূরে একটা প্রাসাদ।···প্রাসাদ ত নয়, যেন মায়াপুরী। একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

মনের ভিতর একটা দুঃসহ আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। ঐ রকম পুরীই ত চাই। ওইখানেই জীবনের স্বপ্ন সত্যিকার রূপ পাইতে পারে। জীবন ওখানেই হাত পা ছড়াইয়া চলে, জীবনের স্বাদও মানুষ পায়।

তখন বেলা যায় যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, গঙ্গায় একটি দুটি করিয়া অনেক নৌকা ভাসিয়াছে। কিরণ গঙ্গার পানে তাকাইল। তাকাইতেই সহসা দেখিতে পাইল একখানি নৌকায় মমতা, মমতার ভাই ও সুধীর। সুধীর আর মমতা বড় কাছাকাছি বসিয়াছে। সুধীর খুব হাসিতেছে, হাসির শব্দটাও যেন কানে আসিয়া পৌঁছে।

কি এত কথা? কেনই বা এত হাসি? কে জানে কি? একদিন তাহার সঙ্গেও—

ভাবিতেই বুকের ভিতরটায় কি একটা দাহ উপস্থিত হইল, মনে হইতেছিল বুকটা বুঝি বা পুড়িয়া যাইতেছে। না দেখিলেই যেন ছিল ভাল। সহ্য হয় না। অশ্বথের একটা শাখায় দুই হাত রাখিয়া কিরণ তার ভিতর মুখ গুঁজিয়া চোখ বুজিল। চোখ বুজিয়াও থাকা যায় না, মাথা তুলিয়া আবার দেখে। চোখে জল আসে, সব ঝাপ্সা হইয়া যায়।

অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ছাদ হইতে নামিয়া রাস্তায় ঘুরিতে সুরু করিল। কোথাও যেন একটু দাঁড়াইবার জায়গা নাই।

গঙ্গার ঘাটে একবার এ-ঘাট আবার ও-ঘাট করিয়া অনেকবার হইয়া গেল। তবু যেন কোথাও বসিতে পারে না। যখন বাড়ীর দিকে ফিরিল তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে।

নির্জ্জন পল্লী রাত্রির অন্ধকারে ঘুমাইতেছিল। তারই এক প্রান্তে অশ্বথের ডালপালায় ঢাকা জন-মনুষ্যহীন বাড়ীখানি যেন আড়ষ্টভাবে চোখ বুজিয়া তার প্রতীক্ষা করিতেছে। পাশের সেই বাড়ীটার ছাদে পদধ্বনি শোনা গেল। গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

অতি সন্তর্পণে তালা শিকল খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেশলাই জ্বালিয়া বিছানাটা দেখিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল।

ঘর অন্ধকার। মনটা তার চেয়েও বেশী। শুইয়াও সেই কথাই মনে হইতে লাগিল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতে-ছিল। তবু ভাতের থালাটা গামলার নীচেই চাপা পড়িয়া রহিল। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। মনটা অন্ধকারে নামিয়া একটা কল্পনার পৃথিবী গড়িতে বসিল। জীবনে যাহা হয় নাই, হয় ত হইবেও না, সেই সব এই অখ্যাত জগতের অলক্ষিত আবাসে বাস্তবের মতই গড়িয়া উঠিতে লাগিল। একখানি গৃহ, একটি গৃহশিল্পী নারী, একটা সংসার!

কিন্তু কিসের সংসার—কার?—ভাবিতেই সব অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, একটা দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত অন্তর নিঃশেষে বাহির হইয়া আসিয়া সব শূন্য করিয়া দিল।

সকালবেলা উঠিয়াই কিরণ চিঠি লিখিতে বসিল। মমতাকে ইহাই তার প্রশ্ন করিবার বিষয়,—বিবাহে তাহার সম্মতি আছে, কি, নাই। খুব আবেগের সঙ্গে লিখিল। প্রথমেই এই রকম—

"কি বলিয়া যে সম্বোধন করিব খুঁজিয়া পাই না, যে সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হয়, সে সম্বোধন করিবার সময় আসে নাই, কাজেই—,

এই যে চিঠি লিখিতেছি তাহাও ন্যায় কি অন্যায় কিছুই বুঝিতে পারি না, অন্যায় হইলে মার্জ্জনা করিবেন।···

······ভালবাসার কথা মুখে বলি নাই, নাটকীয় অভিনয়ের ভঙ্গীতে নিজের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিতে যেন বাধে। বোধ হয় না বলিলেও কাহারও কিছু বুঝিতে বাকী নাই।·········

···· ভালবাসা অনেক কিছু দাবী করে,—দাবী করা অসঙ্গতও নয়। আপনার কি মনে হয়?······

······সম্বন্ধটা পাকা করাই সমাজ ও সংসারের দিক দিয়া মঙ্গল।···মনের অবস্থা বড়ই খারাপ, বুদ্ধি দিয়াও

কিছু বিচার করিবার ক্ষমতা আজ নাই, তাই সরলভাবে অন্তরের কথা খুলিয়া বলিলাম, আপনার যাহা ভাল মনে হয় করিবেন। ...

...অন্তরের উপর জবরদস্তি চলে না, সব দিক বিবেচনা করিয়া আমাকে আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা জানাইবেন।"

চিঠিখানা ডাকে না দিয়া নিজের হাতেই মমতাকে দিবে স্থির করিয়া বাহির হইল।

মমতা তখন ঘরে বসিয়া একখানা সিল্কের চাদরে কি একটা হাতের কাজ করিতেছিল। নীচে কিরণের কণ্ঠ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় রেলিঙের ধারে আসিল। কহিল—আসুন, সবাই ওপরে রয়েচেন।

কিরণ উপরে উঠিয়া গেল।

মমতার বাবা সস্নেহে কহিলেন—তোমাকে আজকাল আর দেখতেই পাই না। কি হ'ল তাই ভাবি। কাজের চাপ পড়েছে বোধ হয়? খবর কি? চেহারাও খারাপ দেখচি। অসুখ করেছিল কি?

কিরণ মাথা নাড়িয়া কহিল—অসুখ, না অসুখ করেনি, এমনি—

মমতার মা বসিয়াছিলেন।

একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন,—ব্যবসা কেমন চল্‌ছে? নীরেন বললে খুব নাকি কাজ পড়েছে? একটু মন দিয়ে কাজ কর। এইত তোমাদের সময়।

কিরণ বলিল,—কাজ? তা আছে। অনেক কাজই আসে। কিন্তু কি জানি কেন পেরে উঠি না।

ঐ ত তোমার দোষ,—বলিয়া মমতার মা ম্লান একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন, একটু বিরক্তি ও অবজ্ঞা যেন সেই হাসির গা ঘেঁষিয়া আছে।

কিরণের সেদিকে মন ছিল না। ভাবিতেছিল কি করিয়া মমতাকে চিঠিখানা দিবে।

সুবিধাও হইয়া গেল।

মমতার মা কি একটা কাজে চলিয়া গেলেন। দুই একটা কথা বলিয়া তার বাবাও শেষে উঠিলেন। ঘর শূন্য হইল।

কিরণ মমতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। মমতা আসে না। সিল্কের চাদরে পাড় তৈরি করা তখনও চলিয়াছে।

খানিকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। মমতা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—ওকি—চলে যাচ্ছেন যে? বসুন। হাতের এই কাজটা একটু,—এই এক্ষুনি আসচি,—একটু বসুন।

নাঃ, যাই,—বলিয়া কিরণ তার হাতের ওপর চিঠিখানা একরকম ছুঁড়িয়া ফেলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

মমতা চমকিয়া উঠিল। বলিল,—একি! এটা?

যাইতে যাইতে কিরণ মুখ ফিরাইয়া কহিল,—পড়ে দেখবেন,—তারপর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

জবাব আসিল না।

কিরণের মনটা আশায় ও আশঙ্কায় দুলিয়া দুলিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

দিন-দুই কোনরকমে কাটিয়া গেল। তারপর মমতার ভাই আসিয়া খবর দিল, তার বাবা একবার যাইতে বলিয়াছেন।

চিঠির জবাবে চিঠিই আশা করিতেছিল। আবার ডাকিয়া পাঠাইবে,—মনেও ভাবে নাই। লজ্জা ও কুণ্ঠায় মনটা কি রকম হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালবেলা চা না খাইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কি জানি দেরীই যদি হয়!

বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া অভ্যাসমত একবার দুইবার ডাকিল। সেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল—আসুন।

উপরে উঠিয়া ঘরে ঢুকিতেই পাশের ঘরের দরজাটি বন্ধ হইয়া গেল। হাতখানি দেখিয়া বুঝা গেল, ভিতর হইতে মমতার বোন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কাজ করিতেছিলেন, খাতাপত্র হইতে মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—বস।

কিরণ বসিল।

ঘরখানা নিস্তব্ধ। দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল কোন কথাবার্তা নাই। মমতার মা-ও কি-একটা হিসাবের

খাতায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন। কেহই কথা বলে না। ঘণ্টা-দুই এভাবেই কাটিল। কিরণের মনটা অবসাদে ও দুশ্চিন্তায় একেবারে যেন শুইয়া পড়িল।

তারপর হঠাৎ মমতার বাবা তার সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন,—তোমাকে ভাল ব'লেই জানতুম; কিন্তু তুমি যে এমন হবে, বুঝতে পারিনি। তোমার ব্যবহারে মমতা ভারি ক্ষুণ্ণ হয়েচে, অপমানিত বোধ করেচে। কে তোমাকে চিঠি লিখ্‌বার অধিকার দিলে? এই নাও, ফেরৎ নিয়ে যাও তোমার চিঠি। চিঠি সে পড়েও নি।

বজ্রপাত হইলে যেমন হয়, হয়ত তাই হইল। কিরণের মুখে কথা নাই। কথা বলিবার ক্ষমতা কি করিয়া যেন লুপ্ত হইল, বলিতে গিয়াও মুখে আসিল না। অন্যায়? হয়ত তাই—

তিনি আবার কহিলেন—তোমার চিঠি পেয়ে কেঁদে-কেটে সে খায়নি—ঘৃণায় তোমার কাছে বেরুতে পারে না।

তারপর আরও অনেক কথা, মানুষের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে কত কি,—

কিন্তু শুনিবার অবস্থা সে নয়। সবই শুনিয়াছে, একটা কথাও তার ভিতরে পৌছে নাই।

কি করিয়া যে সে মেয়েটির অপমান করিল, তাহা ন রকমেই বুঝিতে পারিতেছিল না। অপমান যদি থাকে, তবে অপরাধ ত নিশ্চয়ই।

সমস্ত ঘরখানা সহসা যেন ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল, কি তে গিয়া কি বলিল তাহারও ঠিক নাই। মুখ দিয়া এই কথাগুলিই বাহির হইল,—আমার ভুল হয়েচে, ান করা হবে বুঝলে কখনও লিখতাম না, মার্জ্জনা ।—বলিয়া গায়ের চাদরটা কুড়াইয়া লইয়া টলিতে ত পথে নামিয়া পড়িল।

পাথরের রাস্তাটা বার-বার পায়ে আঘাত করিতে াল, তারও যেন কত বড় আক্রোশ, মার্জ্জনা করিতে না।

কিরণ শতবার নিজেকে ধিক্কার দিল।

কেন তার এ দুর্ম্মতি হইল? কেনই বা অকারণ ওই মেয়েটিকে মর্ম্মপীড়া দিল? সত্যি, এ অন্যায়ের মার্জ্জনা নাই।

নিজের মুখখানি দেখিবার ঘৃণায় নিজের মনেই ছোট হইয়া পড়ে। বেশ হইয়াছে। ইহাই তার শাস্তি। দেনা-পাওনার কথা আর মনে আসিবে না।

ভালবাসা? তুচ্ছ এ জিনিষ। কে চায়?

ঘরে আসিয়া বসিল। অপমানের যন্ত্রণা বুকের ভিতর পীড়া দিতেছিল, হতাশায় চোখের জল গড়াইয়া দুই পাশ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

মাঘ মাস। খুব শীত পড়িয়াছে। শীতের বেলা দেখিতে-না-দেখিতে বাড়িয়া যায়, কিরণ লেপ মুড়ি দিয়া গুঁড়িশুড়ি মারিয়া তখনও বিছানাতে পড়িয়াছিল। বামুন-ঠাকুরাণী আসিয়া বালিশের নীচ হইতে টাকা লইয়া গিয়া বাজার করিয়া ফিরিল, রান্না চড়াইল, তার পর তার রান্নাও প্রায় শেষ হইয়া আসে, কিরণ তথাপি উঠে না। ইচ্ছাও যেন নাই। কিছুদিন যাবৎ এই রকম চলিয়াছে। কোন ব্যাপারেই যেন ইচ্ছা বা উৎসাহ দেখা যায় না।

বামুন-ঠাকুরাণী রান্নাঘর হইতে আসিয়া দুই তিনবার ডাকিয়া গিয়াছে, এবার লেপটা টানিয়া মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া কহিল—আজ কি বিছ্‌নায়ই পড়ে থাক্‌বে?

কিরণ বিরক্ত হইয়া চোখমুখ বিকৃতি করিয়া একটা ধমক দিল—ওকি, সবটাতেই বাড়াবাড়ি। ভারি আস্পর্দ্ধা।

—ওঠো, বিছ্‌না তুলি।

—আপনার তুলতে হবে না, যান্, বলিয়া কিরণ বিছানায় উঠিয়া বসিল।

বামুন-ঠাকুরাণী হাসিল।

কিরণ বিরক্তিভরে জোর করিয়াই যেন হাত মুখ ধুইতে কলতলায় চলিয়া গেল। বামুন-ঠাকুরাণী বিছানাটা ঝাড়িয়া উল্টাইয়া রাখিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিল।

জানালা দিয়া ঘরের ভিতর রোদ আসিয়াছে, কিরণ মুখ ধুইয়া আসিয়া ঘরের ভিতর জানালার কাছে রোদে পিঠ দিয়া বসিল।

সকালবেলার রোদ চায়কোণা হইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। রোদে তার ছায়া জানালার বাজু ও গরাদগুলি সমেত ছবির মত দেখাইতেছিল।

কিরণ ছায়াগুলির পানে তাকাইয়া একভাবেই বসিয়া রহিল। কিছুই যেন করিবার নাই। কার জন্যই বা করিবে?

যে-নারীকে জীবনে কামনা করিয়াছিল, সে কামনায়ই রহিয়া গেল। এই অখ্যাত সংসারে গৃহরচনা করিতে সে আসিবে না। তবে? যে পাখী উড়িয়া চলিয়া যায় তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নীড় রচনা করা যায় না,—লাভও নাই।

যে যায় তার পথ ছাড়িয়া দাও—ইহাই ভাবিতেছিল। বামুন-ঠাকুরাণী আসিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার হয়েচে কি?

কিরণ বামুন-ঠাকুরাণীর কথায় জবাব দিল না। মাথা নোয়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বামুন-ঠাকুরাণী কহিল—আমাকে ত বলবেই না, কিন্তু বুঝি সবই।

বুঝে থাকেন ত ভালই,—বলিয়া কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বামুন-ঠাকুরাণী কহিল,—কেনই-বা বুঝব না? আয়নার কাছে গিয়ে নিজেই একবার চেহারাখানা দেখ ত। নাওয়া-খাওয়া কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে ঘরে বসে রয়েচ, বুঝতে কিছু বাকী থাকে? কিন্তু লাভ কি?

—কিছুই না।

—তবে? নিজের সর্ব্বনাশ কেন করচ? কি হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কিরণ চুপ করিয়া থাকে।

বামুন-ঠাকুরাণী আবার বলে,—আবেগের উপর যা-তা করচ, কিন্তু কোনদিকে ফিরেও তাকাও না যে কি হ'য়ে যাচ্ছে। কতকগুলো দেনা করে বসেছ, তাও ত শুধতে হবে? সেদিন একজন হিন্দুস্থানী এসেছিল, বললে অনেক টাকা না কি পাবে। জল্‌দি না দিলে রেহাই নেই।

—এসেছিল না কি?

কিরণের মুখখানা ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া গেল, হতাশায় ও অবসাদে কণ্ঠটি বোধ হয় শুকাইয়া উঠিল, বলিল—কই বলেন নি ত? কিন্তু কোথা থেকেই বা দিই? অনেক টাকাই হয়েচে। যাক্‌গে, যা হবার হবে।

কিরণ ব্রাকেট হইতে একটা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বামুন-ঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া বলিল,—ওকি, এখনই আবার বেরুচ্চ? খেয়ে তারপর যাও, ভাত নিয়ে আমি বসে থাকতে পারব না। রোজই ওই, আমার আর সহ্য হয় না।

কিরণ পথে নামিয়া তখন অনেক দূর গিয়াছে, শুনিতে পাইয়াও কান দিল না।

শীতের দ্বিপ্রহর। রোদের তাপটা ছুঁচের মত বিঁধিতেছিল। সেই রোদে একলা উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তারপর নীরেনদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

নীরেন কিরণের পানে সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। দীর্ঘ সুকোমল দেহখানি অনাহারে ও অত্যাচারে রুক্ষ লিক্‌লিকে হইয়াছে। স্নান না করায় মাথাটা উস্কখুস্ক, চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে।

নীরেন জিজ্ঞাসা করিল—একি হয়েচে, চোখমুখ ও রকম কেন—খবর কি?

কিরণ মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—খবর? সব খবরই হয়ত শুনেছ।

—কই? না।

কিরণ আগাগোড়া খুলিয়া বলিল।

নীরেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভারি ভুল করলে।

কিরণ চুপ করিয়া রহিল।

নীরেন কি একটু ভাবিয়া পুনরায় কহিল—কিন্তু মমতার কথা ভেবেও আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। অপরাধই বা এমন কি যে তার জন্য এত বড় শাস্তি দিতে পারে? তুমি দুঃখিত হয়ো না ভাই,—পাওনি, তার জন্যে দুঃখ কি, কি আসে যায়? পাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড়? ভালবাসতে পারাটা কি তার চেয়েও মহৎ নয়?

কিরণ চুপ করিয়া শোনে।

ভালবাসিতে পারা, সবাই হয়ত পারে, কি এর সার্থকতা? ধারণায় আসে না। বলিল,—মানুষ পাওয়ার জন্যেই ভালবাসে না?

নীরেন হয়ত অন্তর দিয়াই কথাটা ভাবিল, বলিল,—না পেলেও ক্ষতি নেই।

পথে বাহির হইয়া কিরণ ভাবিতে লাগিল। সমস্যাটার কিছুতেই মীমাংসা হয় না। নীরেনের কথার হয়ত অর্থ আছে, দিয়াই লাভ,—কিন্তু লোক্‌সানের কাছে তার দাম কতটুকু? তুচ্ছ মনে হয়।

কিরণ মমতার ছায়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মুছিলেও যায় না, যায় কি?

অন্তরের আঙিনায় যাহাকে ডাকিয়া আনিয়া মানুষ আসন পাতিয়া দেয়, আসনে সে না বসিলেও আঙিনায় তার স্মৃতিটুকু ধুলার সঙ্গে মিশিয়া থাকে।

মমতার সঙ্গে বাহিরের সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, এখন যেটুকু আছে সেটুকু শুধুই অন্তরের,—তার একলার। মনে হয় ঐটুকুই ভাল। সবই ত গিয়াছে, কোনো আশাই নাই, এটুকু যতদিন আছে, থাক্ না।

বামুন-ঠাকুরাণী বুঝিল। বলিল,—বিয়ে কর, বিয়ে করে সংসারী হও, কেন দুঃখ পাও?

কিরণ বামুন-ঠাকুরাণীর অহেতুক স্নেহের কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া একটু শ্লেষের সহিত বলিল,—আপনি যে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—কেন বলুন ত?

বামুন-ঠাকুরাণীর মনে হয়ত আঘাত লাগে—মুখখানি ফ্যাকাসে হইয়া যায়। বলে,—বিয়ের কথা বলেছি, অন্যায়টা কি হয়েচে? বিয়ে তুমি করবে না, এমন ত নয়।

কিরণ চুপ করিয়া থাকে।

বিবাহ কোনদিন হয়ত করিবে, কিন্তু আজ এখনই তার কি? বিবাহের কথা হইলে মমতার কথাই যে মনে পড়ে। তাহাকে বাদ দিয়া গৃহ-রচনার কল্পনা যেন জমে না। সেও ত ভালবাসিত, হোক সে পথেরই ভালবাসা,—কি আসে যায়, ভালবাসাইত। প্রেমের জগতে তার কি কোনোই স্থান নাই?

সে আসিবে না, নাই-বা আসিল। যে যায় তার পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। উপায় কি!

বামুন-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিল,—বিয়ে না করে কি হবে, তাতে কিই-বা আছে? যা নয় তাই নিয়ে যদি মানুষ অনর্থ ছিষ্টি করে, তাতে অনর্থই বাড়ে।

নারী একটি ঘরে আনিতেই হইবে? কিন্তু আনিলেই কি হয়? নারীমাত্রই কি পুরুষের যথেষ্ট।

শুধু তাও নয়—

একটা সংসারের বোঝা বহন করা, বা একটা পুরুষকে চরিতার্থ করা, এইটুকুতেই একটি নারীর সার্থকতা নয়। কিন্তু বামুন-ঠাকুরাণী তাহার কি জানে?

বসিয়া ভাবে, কোন কাজে মন বসে না।

ব্যবসাটি যায়-যায় হইয়াছে, পাওনাদারের তাগাদাও বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানীটি আবার আসিয়াছিল, বলিয়া গিয়াছে আর সবুর করিবে না, আবার কাজ করিতে চেষ্টা করে, নিজের বিলাত-বাকী আদায় করিতে বাহির হয়, কিন্তু এতদিনের তাচ্ছিল্যে যাহা বিকল হইয়া আছে তাহা সহজে বাগে আসে না।

আজকাল বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ কম। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মোটেই লক্ষ্য নাই। বামুন-ঠাকুরাণীর সঙ্গে প্রায়ই লাগে।

বামুন-ঠাকুরাণী বলে,—তোমার জন্যে সবসুদ্ধ দুর্ভোগ ভুগ্‌বে এ কেন?

কিরণ রাগিয়া বলে,—আমি কাউকে ভুগ্‌তে বলি নে, কেন ভোগেন? ছেড়ে দিলেই পারেন?

বামুন-ঠাকুরাণী গালে হাত দিয়া বসে, বলে,—একদিন হয়ত তাই হবে। কথাবার্ত্তারও তোমার লাগাম নেই।

সকালবেলা হইতেই মাথা ধরিয়াছে, কিন্তু আজ আর ঘরে বসিয়া থাকার উপায় নাই, গ্রাহকদের কাজ অসমাপ্ত ও অর্দ্ধসমাপ্ত রহিয়াছে, না দিলেই নয়।

কাজ করিতে করিতে বেলা পড়িয়া গেল। তারপর কিরণ টাকার তাগাদায় বাহির হইল, শীঘ্রই কিছু টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। দুই এক জায়গায় যাইতেই অনেক দেরী হইল।

যখন ফিরিল তখন রাত্রি অনেক।

গায়ে প্রবল জ্বর, চোখ দুটি রক্তবর্ণ।

বামুন-ঠাকুরাণীর চোখ দুইটি বোধ হয় রাগে দুঃখে তার চেয়েও রক্তবর্ণ হইয়াই ছিল। কিরণের অবস্থাটা সে অনুমান করিতে পারিল না, বলিল,—তোমার বিবেচনা ভাল, নিজেও সারাদিন উপোস করে কাটালে, আর আমাকেও বেশ শাস্তি দিলে।

কিরণের চৈতন্য হইল, বামুন-ঠাকুরাণীর হয়ত খাওয়া হয় নাই, কহিল,—আমার জন্যে কেনই-বা শুকিয়ে রইলেন? রাত ত অনেক হয়েচে,—হোক্, কিছু মিষ্টি না-হয় আপনার জন্যে নিয়ে আসি, ভাত ত আর খাবেন না।

—দরকার নেই আমার মিষ্টিতে।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বামুন-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিল,—কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া হ'লে কি মানুষের এমনই হয়? ঘর-সংসারও মনে থাকে না?

কিরণের শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, বিছানাটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,—লক্ষ্মীছাড়া মানুষের আবার ঘরসংসার কি?

বামুন-ঠাকুরাণী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—ঘর-সংসার না থাকে না-ই থাক্, কিন্তু আমি আর তোমার সংসার ঠেল্‌তে পারব না, আজ চাল অভাবে রান্না হয়নি। সেই সকালে বেরিয়েছ, আর এই এলে, একবার খোঁজও নাও নি যে ঘরে কিছু আছে কি নেই। ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা আর হিসেবের খাতাটা ঐ তাকে রইল। সাড়ে সাত টাকা মাইনের জন্য মাসের ভেতর সাড়ে সাতদিন এ দুর্ভোগ আমার সয় না, বলিয়া বামুন-ঠাকুরাণী বাহির হইয়া গেল।

কিরণ নিঃশব্দে বিছানায় বসিয়া রহিল।

জবাব দেওয়ার মত কথা হয়ত ছিল, কিন্তু শরীরের অবস্থাটা তেমন ছিল না।

পীড়িত শরীর। বসিয়া থাকা যায় না, শুইয়া পড়িল।

শূন্য ঘর, মনটাও শূন্য।

মাথাটা গরম হইয়া আছে, এই শীতেও একটু বাতাস না হইলে আর চলে না। কিন্তু কে দেয়?

বামুন-ঠাকুরাণীর দোষ নাই। লক্ষ্মীছাড়ার খেয়াল লইয়া সকলেরই আর চলে না। কিন্তু কিরণের যেন লোকজন অভাবে আজ সব অচল হইয়া আসে। এই সংসারের শূন্য আঙিনায় মনটা আজ কোন্ এক স্নেহময়ীর জন্য যেন বার বার কাঁদিয়া ওঠে। আজ যেন একটু স্নেহ না হইলে আর চলে না।

স্নেহ যে কি অনেক দিন হইতে তার কোনো পরিচয় নাই, মন হইতে যেন তাহা মুছিয়া গিয়াছে। মা যখন ছিল তখন স্নেহ ও হয়ত কিছু পাইয়াছে। কিন্তু সে আর কয়দিন? জন্মের ছয় মাস পরেই মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ছয় মাসের সঞ্চয়, সারাজীবনের পক্ষে কতটুকু?

মায়ের মুখখানি মনেই পড়ে না, একখানি ছবি পর্য্যন্ত নাই। ছেঁড়া-খোঁড়া পুরাতন একখানি পুঁথির পৃষ্ঠায় মায়ের নিজের হাতের লেখা নামটি রহিয়াছে। ঐটুকুই মায়ের স্মৃতি।

অতিকষ্টে বিছানা হইতে কোনরকমে উঠিয়া কিরণ বাক্সটা খুলিল, খুলিয়া ভিতর হইতে কাগজে মোড়া বইখানির নাম-লেখা পাতাটা উল্টাইয়া উহা বুকে চাপিয়া ধরিল।

তারপর জ্বরের ঘোরে বিছানায় আসিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে রাত্রির ব্যাপার দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। উঠিয়া গঙ্গার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল।

সেই জল,—সেই বালুচর,—যেন জীবন ও মৃত্যু ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিল না, মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। বিছানায় আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভাবিল, বামুন-ঠাকুরাণী আসিবে। বেলা যতই বাড়িতেছিল ততই ক্ষুধা পাইতেছিল। কিন্তু বামুন-ঠাকুরাণী আসিল না।

সাতদিনে সেই জ্বর ছাড়িল। নীরেন আসিয়া ঔষধ পথ্য দিয়াছে। বামুন-ঠাকুরাণী আর আসেই নাই।

কিরণ তারপর নিজের হাতেই রান্না করে, নিজেই লইয়া খায়।

কিন্তু খাওয়া প্রায়ই হয় না।

নীরেন বলে,—লোক রাখ। এমনি আর ক'দিন কাটাবে?

একটা চাকরও জুটিয়া গেল।

লোকটার কাজ মোটেই পছন্দ হয় না, সে গুছাইয়া কাজ করিতে জানেও না। তারপর ভাতগুলি কোনদিন গলিয়া যায়, কখনও বা ডাল ধরিয়া যায়। বামুন-ঠাকুরাণীর এ সব হইত না। যত্নও সে করিত, আর এ কেবল দায় শোধ করে।

কিন্তু কি আর করা?

ছন্নছাড়া সংসার আরও বিশ্রী হইয়া ওঠে।

বসন্তকাল। অশ্বত্থের শাখায় হাওয়া লাগিয়াছে। কচি পাতাগুলি ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। পাশের বাড়ীর ছাদে শীতের ঝরা রাশিকৃত শুকনো পাতা এক একটা দমকা হাওয়ায় সর্‌ সর্‌ শব্দে উড়িয়া উড়িয়া পথের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে।

কচিপাতার মৃদু গুঞ্জনের পাশে ঝরা পাতার করুণ কর্কশ ধ্বনি মিলন-সঙ্গীতের কাছে বিদায়ের আর্ত্তনাদেরই মত মনে হয়।

মধুর নয়। কিন্তু বিশ্রীই বা কি?

এটাই ত নিয়ম। প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে ইহাই ত চলিয়াছে। কিরণের ভালই লাগিতেছিল।

ছাদের ওপর বসিয়া গঙ্গার পানে তাকাইয়া আছে। গঙ্গার ঘাটে পাথর-বোঝাই বড় বড় নৌকাগুলি আসিয়া লাগিয়াছে। একটি শূন্য করিয়া সমস্ত পাথর তীরে রাখিয়া আবার ভাসিল, আবার হয়ত পাথর লইয়া আসিবে।

এমনি করিয়াই হয়ত মানুষও একবার নৌকা বোঝাই করে, আবার শূন্য করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু তার নৌকা হয়ত আর বোঝাই হইবে না, শূন্যই থাকিয়া যাইবে।

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—বামুন-ঠাকুরাণী আসিয়াছে।

আসে,—আসুক। কিরণ বসিয়াই রহিল।

বামুন-ঠাকুরাণীই উপরে উঠিয়া আসিল। কহিল,—তোমার সঙ্গে রাগ করেও থাকা যায় না, দুমাস অন্ত জায়গায় চাক্‌রি করলুম, কিন্তু ভাল লাগলো না, আট টাকা মাইনে আর খাওয়া, হলে হয় কি? তোমাকে একলা ফেলে কি থাক্‌তে পারি?

কিরণ হাসিল। জ্বরে যখন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সে একলা ফেলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। দুই মাসের কথা। এত শীঘ্র মানুষ ভোলে না। বলিল,—আমি ত অত মাইনে আর খোরাক দিয়ে আপনাকে রাখ্‌তে পারব না।

—মাইনে আমি চাই না।

কিরণের কানে অদ্ভুত শোনাইল, কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিল,—আপনি না চাইলেও আমি পারি না।

বামুন-ঠাকুরাণী সস্নেহে কহিল,—রাগ করেছ?

কিরণের গা জ্বালা করিতে থাকে।—আপনার ওপর রাগ করব? কেন? এমন রাগ আমার নেই।

বামুন-ঠাকুরাণীর মুখখানি যেন হঠাৎ অমাবস্যার মত অন্ধকার হইল। কিরণ তার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, বলিল,—জগতে কারুর উপর আমার রাগ নেই, কিসের জন্য রাগ করব?

বামুন-ঠাকুরাণী কহিল,—তোমার রাগ আমি চিনি না? না তোমাকেই চিন্‌তে পারি নি? সে যাক্‌। তাড়িয়ে দিচ্ছ, দাও। কিন্তু আমার অবস্থা ভেবে দেখো, বলিয়া বামুন-ঠাকুরাণী ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

কিরণ ডাকিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কাহারও জন্য কিছু ঠেকিয়া থাকে না।

কিরণের একলার জীবনযাত্রা কোথাও ঠেকে না। কিন্তু ধাক্কা খায়। সেদিন ঘরে আসিয়া দেখিল ঘর খোলা, চাকর নাই, কোথায় উধাও হইয়াছে। কিছু টাকা এবং জিনিষপত্রও সরিয়া গিয়াছে।

তবু সবই ঠিক আছে, ঠিক রাখিতেই হয়। নিজের হাতেই রান্না, নিজের হাতেই বাসন-মাজা—সব।

ক্লেশ বোধ হয় না।

সকালে আটটায় জানালা দিয়া প্রভাত দেখা দেয়, পথে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি এগারটায় লণ্ঠনের আলোতে সন্ধ্যাদীপ জলে। হয়ত জলেও না।

সত্যই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয় কেন? কে করে? নারী? নারী না হইলেই কি পুরুষের চলে না?

চলে না বোধ হয়।

কিন্তু কোনও বিশেষ একটি নারী না হইলেই যে কোনো নরের জীবন অচল হইয়া থাকে,তাহাও হয়ত নয়।

সুধাদা'র কথাটাও এই।

বামুন-ঠাকুরাণীও ইহাই বলিত।

কিরণ বুঝিতে পারে। মমতাকে ভুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভোলা সহজ নয়। রাত্রির অন্ধকারে মমতা যেন তার মনে মূর্ত্তিমতী হইয়া ওঠে। রাত্রিগুলিই স্বপ্নময়ী, স্বপ্ন লইয়া আসে। এক একটা রাত্রি কিরণের সম্মুখে এক একটা যুগের বিরহজর্জ্জরিত বেদনা লইয়া উপস্থিত হয়।

সন্ধ্যা হইলেই বিশ্রী লাগিতে থাকে, যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ সেই এক আচ্ছন্নতা।

বিছানায় শুইয়া লণ্ঠনের আলোতে পড়ে, পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া সুধাদা'র কথাটা ভাবে।

একটি নারীর জন্য একটা পুরুষের জীবন ব্যর্থ হয় না। কিংবা একটি পুরুষের জন্যও একটি নারী নিঃস্ব হইয়া পড়ে না। জীবনের যাত্রাপথে নরনারী প্রেমের উপাদান কুড়াইয়া চলে, কোনটা রাখে, কোনটা-বা ফেলিয়া যায়।

সুধাদা'র কথাগুলিতে সোজাসুজি কোন সান্ত্বনা না থাকিলেও সত্যের আশ্বাস-বাণী আছে। ভাল লাগে।

তার কাছে গিয়াই বসে।

গ্রীষ্মকাল। দিনের অসহ্য উত্তাপ রাত্রির গায়েও উষ্ণতা রাখিয়া যায়। ঘরে শোয়া যায় না, বাহিরে শুইতে হয়।

কিরণ সেই খোলা ছাদে অশ্বত্থগাছের শাখাটার নীচে একটা মাদুর পাতিয়া বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়া পড়ে। অশ্বত্থের শাখায় একটু একটু হাওয়া লাগে, পাতাগুলি সেই হাওয়াটুকু কুড়াইয়া লইয়া কিরণের গায় ছড়াইয়া দেয়।

কোথায় কে যেন হতভাগ্যের জন্য এতটুকু স্নেহ বুকে করিয়া আছে, অসহায় মানব-সন্তানটিকে সে হয়ত অবজ্ঞা করে না।

কিন্তু তামসী রাত্রির দুঃস্বপ্নময় আচ্ছন্নতা কোথা হইতে আসে, কল্পিত সংসারের দুয়ারে রিক্ত মানুষটিকে লইয়া মায়া সৃষ্টি করিয়া খেলিতে থাকে। সেদিনও সেই খেলাই চলিয়াছে।

এই কল্পনায় মমতার আঁচল ওড়ে না। অন্তরের অজানা আলয়ে যে-নারীর অচেনা মুখ মাঝে মাঝে মানুষকেও আনমনা করিয়া ফেলে,—সেই নারীটি যেন বাহির হইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করে, ভালবাসা দেয়, আর বাস্তব নারীর জন্য মনটাকে লুব্ধ করিয়া তোলে।

চোখে ঘুম নাই।

পাশের বাড়ীতেও বুঝি বা সেই অবস্থা।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল, বোধ হয় জানালার ধারেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ভিতরে যেন লণ্ঠনও একটা জ্বলিতেছে, তারই আলো নারীটির দেহের ও মুখের একপাশে পড়িয়াছে, ওদিকটা রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা। অস্পষ্ট, তবু চেনা যায়।

কেন জাগিয়া আছে? উত্তরটা মনে মনেই খোঁজে। হয়ত কাহারও প্রতীক্ষায়।

বিরহ? হইবেও বা।

কত অন্ধকার রাত্রিই কত নরনারী একত্রে অনন্ত বিরহ বেদনায় জাগিয়া থাকে,—কে কার খোঁজ রাখে?

অকারণেই যেন কিরণের মনে একটা পুলক দেখা দিল—কবেকার পুরোনো একটা বিরহের সুর মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, তাহারই গুঞ্জনধ্বনি গান হইয়া কণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিল।

গানটি থামিতেই কিরণ শুনিতে পাইল নারীটি চাপা-কণ্ঠে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছে—

গানের কথাগুলি ভারি করুণ,—

—তোমার কণ্ঠে ওকি বেদনার সুর,—হে বিরহী, তোমার ব্যথা যেন ক্রন্দন হইয়া আমার অন্তরকে

উদ্বেলিত করিয়াছে,—এই অন্ধকার ধরণীর সুপ্ত বক্ষে কার জন্ম কাঁদিয়া মর,—কে সেই নিঠুর প্রিয়া তোমাকে চির-কান্নার তরঙ্গায়িত সায়রে ভাসাইয়াছে?

এ যেন শুধুই গান নয়, গানের পেছনে একটা প্রাণও হয়ত মুখ বাড়াইয়া আছে।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই দেখে তরুণীটি স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা শাড়ীখানি ছাদে মেলিয়া দিতেছে।

চোখোচোখি হওয়ায় তরুণীটি হাসিয়া মুখ ফিরাইল —আজ আর আত্মগোপন করিবার মত কোনই লক্ষণ নাই, অতি পরিচিতের মত ভাব। শাড়ী মেলিয়া দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল,—বামুনদিদিকে আবার রাখতে পারেন কি? লোকজন ছাড়া আপনার কি করে চলবে? কিরণ বিস্মিত হইয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না।

তরুণীটি কহিল,—কি ভাবচেন? বামুনদিদির মুখেই সব শুনেছি—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বলুন, রাখবেন? আমার চেয়ে আপনারই দরকার বেশী, বলেন ত আমি ছেড়ে দিতে রাজী আছি। পুরুষ মানুষের কি রান্নাবাড়া ঘরঝাঁট দেওয়া অতশত কাজ পোষায়?

—পোষায় না সত্যি। কিন্তু না পোষালেও কার কি আসে যায়? তরুণীটি লজ্জিত হইল।

কহিল,—আপনার খুব কষ্ট হয়, তাই বলছিলুম, কিছু মনে করবেন না।

কিরণ শুষ্ক একটু হাসিয়া মাথাটাকে বার-দুই এদিকে ওদিকে নাড়িয়া কহিল,—না না, মনে করবার কিছু নেই, থাকলেও সে আপনার উদারতার কথাই মনে করব। কিন্তু কষ্ট ত খাটুনীর জন্যে নয়, কষ্টের কথা ব'লে আর কাজ কি!—বলিয়াই থামিল, তারপর কি ভাবিয়া পুনরায় বলিল—একটা কথা, কিছু মনে না করেন ত জিজ্ঞাসা করি। দেখ্‌চি আপনার খুব স্নেহ—আমার সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই তবু আপনার কি টান—অথচ আমি ত আপনাকে চিনি না—জানি না—

তরুণী হাসিয়া কহিল,—জেনে আপনার লাভ কি?

লাভ? কিরণ কহিল,—লাভ-লোকসানের কথা ছেড়ে দিন, আজ সে কথা আলোচনা করে ফল নেই। জানতে ইচ্ছে হয়, এই। এর পর আর ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা থাক্‌বে না। আজই শেষ।

—কেন?

—আর দেখা হবে না।

তরুণীটির মুখখানি শুষ্ক ফুলের মতই যেন ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল, কণ্ঠটিও ভিজিয়া উঠিল, কহিল,—কেন, কেন দেখা হইবে না?

কিরণ তার আর্দ্র চোখের পানে তাকাইয়া নিজেও হয়ত আর্দ্র হইয়া গেল, বলিল,—এখান হতে চলে যাচ্ছি—আর ফিরব না, দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, দাঁড়াবার জায়গা আর নেই—

তরুণীটির যেন কি হইল—মুখেও কথা নাই, চলিয়া যাইবারও তাড়া নাই, জলভরা চোখে পথটার পানে তাকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু কোথায় যাইবে কিছুই ঠিক নাই, যাইতে হইবে ইহাই জানা আছে। এই বৃহৎ সংসারের কোথাও কি এতটুকু ঠাঁই নাই, কিন্তু কোথায়?

এই ঘর, ঘরের সংসার, বৃথাই সব; ফেলিয়া যাইতে হইবে। লইয়া যাইবার জায়গা নাই।

বাক্স খুলিয়া মায়ের নাম লেখা বইখানা আর মমতার মুখের একটুক্‌রা ছবি বাহির করিয়া সঙ্গে লইল, ছন্নছাড়া ঘরখানার পানে সস্নেহে একবার তাকাইয়া বইখানা ও ছবির টুক্‌রাটি বুকে চাপিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অজ্ঞাতের যাত্রা—নিতান্তই দিশাহীন। তার কোনো বাঁধাধরা পথ নাই।

যাইতে যাইতে অন্ধকার নগরীর পানে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল, তারপর চোখ মুছিয়া অন্ধকারে চলিতে লাগিল।

মহাকবি সূরদাস

শ্রীঅমৃতলাল শীল

পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্মসংস্কারের মহাযুগে যখন সমস্ত ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার সংস্কার হইতেছিল, এবং ভারতের হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞানমার্গকে পদদলিত করিয়া ভক্তি ও প্রেমমার্গ আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতেছিল, সেই সময়ে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সহিত বঙ্গদেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার খণ্ডযুগ আরম্ভ হইয়াছিল ও পদাবলীর সাহায্যে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। সে সময়ে যে কেবল বঙ্গদেশেই এরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, যুক্ত-প্রদেশেও ভক্তি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসাতে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির উদয় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব [১৪৮৬ হইতে ১৫৩৪ ঈশাব্দ] যখন পুরীতে বসিয়া মধুর রসের প্রেম বিলাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সমসাময়িক তৈলঙ্গী বিপ্রকুলোদ্ভব বল্লভাচার্য্য [১৪৭৯ হইতে ১৫৩০ ঈশাব্দ] পূতসলিলা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে বসিয়া বাৎসল্য রসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যাতে যেমন "মহাপ্রভু" শব্দে চৈতন্যদেবকে বুঝায়, সেইরূপ এ অঞ্চলে "মহাপ্রভু" শব্দে বল্লভাচার্য্যকেই বুঝায়। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু অতি অল্প কাল মধ্যেই (১৫৩২ ঈ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র বিট্‌ঠলনাথ [জন্ম ১৫১৫, মৃত্যু ১৫৭৬ ঈ) সম্প্রদায় শাসন করিতে লাগিলেন। বল্লভাচার্য্য প্রয়াগের বেণীতীরে অরয়াল * গ্রামে বাস করিতেন, এখনও সেখানে গঙ্গা ও যমুনার তটের কাছে তাঁহার আশ্রম আছে। চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনের ফেরৎ প্রয়াগে দশ দিবস (জানুয়ারি ১৫১৬, সৌর মাঘ ২০ হইতে ২৯শে) বাসকালে রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বল্লভাচার্য্য এক দিবস নিমন্ত্রণ করিয়া এই আশ্রমে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন ঐ আশ্রম "মহাপ্রভুর গদী" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি শেষ বয়সে কাশীতে বসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিট্‌ঠলনাথ গুজরাট, কচ্ছ, রাজপুতানা ইত্যাদি দেশ পর্য্যটন করিয়া ১৫৬৪ ঈশাব্দ হইতে বৃন্দাবনের কাছে গোকুলে বাস করিয়াছিলেন, ও তাঁহার প্রধান গদী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বংশজরা এখনও "গোকুলে গোসাঞি" নামে প্রসিদ্ধ।

বল্লভাচার্য্য ও বিট্‌ঠলনাথ উভয়েই বৈষ্ণব পদ রচনা করিতে কবিদের উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বেই গুরু রামানন্দ রাম নামে উপাসনা ও বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভক্তিমার্গ হইতে স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-বিচার তুলিয়া দিয়া সকল জাতীয় শিষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন :—

> জাত পাঁত পুঁছে নহিঁ কোই।
> হরিকো ভজে,সো হরি কা হোই।

তাঁহার বার জন প্রধান শিষ্যমধ্যে একজন মুসলমান, একজন চর্ম্মকার, একজন রাজপুত, একজন জাট, একজন নাপিত, দুইজন স্ত্রীলোক ও পাঁচজন বিপ্র ছিলেন। ইহার মধ্যে মুসলমান বৈষ্ণব কবীর ও চর্ম্মকার রবিদাস [রইদাস, রুইদাস, রুহিদাস] আপনাদের স্বতন্ত্র "পন্থ" স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার জাতিবিচার অমান্য করিবার প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে, রাজপুত-কুলগৌরব, মাড়বার নন্দিনী; মেবার বধূ, রাজমহিষী স্বনামখ্যাতা ভক্তকবি মীরাবাঈ চর্ম্মকার-নন্দন রবিদাসকে আপনার শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র কবি তুলসীদাস তাঁহার অমর গ্রন্থ সাহায্যে সমস্ত ভারতের হিন্দীভাষী

* চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার নাম বোধ হয় ভ্রমক্রমে আড়ৈলী লেখা হইয়াছে।

রাম-উপাসক বৈষ্ণবদের এখনও শাসন করিতেছেন। রাম-উপাসকদের কবি যেমন তুলসীদাস, কৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণবদের সেইরূপ, বা তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কবি সূরদাস। তুলসীদাস যেমন বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে মূল বিষয় লইয়া আপনার ইচ্ছামত "রামচরিত-মানস" ইত্যাদি পাঁচখানি গ্রন্থ সৃজন করিয়াছেন, সূরদাস সেইরূপ ভাগবতের ছায়া অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁহার "সূরসাগরের" পদে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের ঘটনাগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী মধুর ও স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে সেগুলি পড়িতে বসিলে মনে আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে, এবং ঘটনাগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

সূরদাস সূর-সারাবলীর একস্থানে লিখিয়াছেন, "শিব বিধান তপ করেউ বহুত দিন, তউ পার নহিঁ লীন।" ইহাতে বোধ হয় তিনি প্রথম বয়সে শৈব ছিলেন ও শৈবমতে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে, বল্লভাচার্য্যের প্রভাবে কৃষ্ণ-উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিট্‌ঠলনাথ আপনার পিতার চারজন ভক্ত শিষ্য ও কবি সূরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দ দাস, ও কৃষ্ণ দাস, এবং আপনার চারজন ঐরূপ শিষ্য ছীত স্বামী, গোবিন্দ স্বামী, চতুর্ভুজ দাস ও নন্দ দাসকে লইয়া এক কবি-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। সূরদাস বলিয়াছেন,—

থাপি গোসাঞি করি মেরি আঠ মধ্যে ছাপ

অর্থাৎ গোসাঞি কবিদের "অষ্ট ছাপ" স্থাপন করিয়া আমাকে তাহার মধ্যে রাখিলেন। এই অষ্ট ছাপের কবিমধ্যে প্রধানতম কবি সূরদাস ছিলেন। বিট্‌ঠলনাথ তাঁহাকে "সাগর" উপাধি দিয়াছিলেন অথবা আদর করিয়া সাগর বলিয়া ডাকিতেন, সেইজন্য তিনি এই নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মহাকবি সূরদাস সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালের কোনো সমালোচক বলিয়াছেন,—

সুর সুর, তুলসীশশি, উড়গণ কেশবদাস।
অব কে কবি খদ্যোতসম, কহিঁ কহিঁ করঁ্যা প্রকাশ।

অর্থাৎ কবিদের মধ্যে সূরদাস সূর্য্যসম, তুলসীদাস চন্দ্রসম ও কেশবদাস তারাসম। এখনকার অন্য কবিরা খদ্যোৎ-সম, মধ্যে মধ্যে বা কোথাও কোথাও একটু উজ্জল হইয়া ওঠেন আবার নিবিয়া যান।

সূরদাসের জীবন সম্বন্ধে বেশী কথা জানা নাই, কেন-না আমাদের দেশে কবিদের জীবনী সংগ্রহ করার নিয়ম কোনকালে ছিল না। কবির কবিতা পড়িয়া তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়াই ভারতবাসীরা তৃপ্ত, কবির জীবনী জানা প্রয়োজনীয় মনে করে না। কবির চরিত্র পূত কি দূষিত, ভারতবাসী তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয় না, সে কেবলমাত্র তাহার অমৃতময় বাণী শুনিতে চাহে। পাশ্চাত্য প্রথানুসারে আজকাল কবিদের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা লেখা হইতেছে, কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবি সম্বন্ধে আমরা নাম ছাড়া বেশী কিছু জানি না। সংস্কৃত-সাহিত্যে এমন অনেক কবিতা আছে যাহার রচয়িতার নামও জানা নাই। কবি কালিদাসের নাম পৃথিবীর সকল সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলে শুনিয়াছে, তাঁহার কাব্যের রসগ্রহণও অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ দেশবাসী ও কোন্‌কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয়রূপে জানা নাই। ইহা ছাড়া সূরদাস বৈষ্ণব-ভক্ত ছিলেন ও বৈষ্ণবদের মত বিনয়ী ছিলেন, তিনি স্বয়ং কখনও আপনার কীর্ত্তি বা যশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন নাই, অন্য ভক্ত লেখকরাও সে-সকল কথা লেখেন নাই বা লেখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তবে, এ প্রদেশে সূরদাস সম্বন্ধে নানা প্রবাদ এখনও মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ঐতিহাসিক না হইলেও একেবারে ভিত্তিশূন্য নহে।

সূরদাসের সমস্ত পদগুলি আজ পর্য্যন্ত একত্র হয় নাই। যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়াছে। এখনও এ অঞ্চলের সাহিত্যিকরা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে অতি অল্প কথাই জানা গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকরা সূরদাসের জীবনী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে, সারস্বত ব্রাহ্মণ সংগ্রহকারী তাঁহাকে সারস্বত ব্রাহ্মণ,

ও কনোজিয়া ব্রাহ্মণ লেখক তাঁহাকে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ অনেকেই এই প্রসিদ্ধ ভক্ত-কবিকে আপনার জাতির লোক প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মারবার (যোধপুর) ইতিহাস-বিভাগের রাজকর্মচারী কায়স্থ-কুলোদ্ভব স্বর্গীয় মুন্‌শী দেবীপ্রসাদ "বশ্‌শাশ্‌" রাজপুতানার ইতিহাস সম্বন্ধে একজন সচল এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। তিনি জীবনব্যাপী অনুসন্ধানে অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি কবি সুরদাস প্রণীত একটি পদ "দৃষ্টিকূট" নামক গ্রন্থে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ও তাহাকে প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ করিবার কারণ খুঁজিয়া পান নাই। তাহাতে কবি আপনার বংশ-পরিচয় লিখিয়াছেন, অতএব এই পরিচয়ই বিশ্বাস্য বোধ হয়। দেবী-প্রসাদ এই কবিতা প্রকাশিত করিলে গ্রিয়রসনও ইহাকে সুরদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

চোহান-সম্রাট পৃথ্বীরাজের সভাতে "ব্রহ্ম ভট্ট" বা "রাও" অর্থাৎ ভাট-জাতীয় বরদাই কবি চন্দ রাজসভাসদ ও রাজকবি ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে জ্বালা দেশ [পঞ্জাবের আধুনিক জলন্ধর জেলায় জ্বালামুখী পর্ব্বতের চারিদিকের দেশ] দান করিয়াছিলেন, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সেখানকার রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। চন্দের চার পুত্রমধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গুণচন্দ্র, তাঁহার পুত্র শীলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র পৃথ্বীরাজের বংশধর, রণথম্বের রাজা বীরবর হাম্মীরের বাল্যসহচর ছিলেন। "তাসু বংশ অনূপ ভয়ো হরিচন্দ অতি বিখ্যাত।" অর্থাৎ তাঁহার বংশে অতি বিখ্যাত হরিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানে বীরচন্দ্রের কয় পুরুষ পরে হরিচন্দ্র তাহা লেখা নাই, কিন্তু দু-এক পুরুষের বেশী হইবে না, কেননা, হাম্মীর যুবক অবস্থায় ১৩০১ ঈশাব্দে অলাও-উদ্দীন খিলজীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, ও সুরদাসের জন্ম ১৫০০ ঈশাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে হইয়াছিল। যাহা হউক, হরিচন্দ্রের পুত্র বীর রামচন্দ্র গোপাচলে [গোয়ালিয়রে] বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সাতপুত্র উৎপন্ন হইয়া-ছিল, প্রথম ছয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, উদারচন্দ্র, রূপচন্দ্র, বুদ্ধিচন্দ্র, দেবচন্দ্র ও সংস্কৃতচন্দ্র দেশের রাজা লোদী পাঠানদের অধীনে যোদ্ধা ছিলেন, বিদেশী আক্রমণকারী মোগল বাবরের সহিত যুদ্ধে তাঁহারা সকলেই বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

> সো সমর করি শাহিসেবক, গয়ে বিধি কে লোক।
> রহে সূরজচন্দ, দৃগতেঁ হীন, ভর বর শোক।

কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ দৃষ্টিহীন সুরজচন্দ [বা সুরদাস] শোকাকুল হইয়া জীবিত রহিলেন।

গোপাচল বা গোয়ালিয়র সেকালে সঙ্গীত-বিদ্যার কেন্দ্র ছিল, বোধ হয় রামচন্দ্র এই বিদ্যাতে পারদর্শী হইবার আশাতেই সেখানে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ইহার পর উচ্চশ্রেণীর গায়করূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল তাঁহাকে "বাবা রামদাস গোয়ালিয়ারী, গোয়েন্দা" লিখিয়াছেন। গোয়েন্দা অর্থে "গায়ক"। সম্ভবতঃ তিনি সাধুদের মত জীবনযাপন করিতেন বলিয়া লোকে "বাবা রামদাস" বলিত, কিংবা অতিবৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া লোকে সম্মান করিয়া "বাবা রামদাস" বলিত। এ প্রথা এ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদাউনীও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক রামচন্দ্রের সপ্তম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম সূর্য্যচন্দ্র, সূর্য্যদাস, সুরদাস বা সুরশ্যাম, এই চার প্রকারে কবির নাম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

সুরদাস অন্ধ ছিলেন, তিনি ঐ পদে লিখিয়াছেন, আমার ছয় ভ্রাতা বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন, কেবল আমি অন্ধ, শোক করিতে বাঁচিয়া রহিলাম।

> পরো কূপ, পুকার কাহু, শুনি না সংসার।
> সাতয়েঁ দিন আর যদুপতি কীন আপ উদ্ধার।

একদিন আমি কূপে পড়িয়া গিয়াছিলাম, পড়িয়া অনেক চেঁচাইলাম, কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না। সপ্তম দিবসে স্বয়ং ভগবান যদুপতি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। এ পদের এরূপ অর্থও হইতে পারে, যে, আমি সংসার-রূপ কূপে পড়িয়াছিলাম, আমি অনেক কাঁদিলাম, কিন্তু সংসার আমার ডাক শুনিল না, তখন

আর্ত্ত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। সপ্তম দিবসে, অর্থাৎ শেষে স্বয়ং ভগবান আমাকে উদ্ধার করিলেন।

দিয়ো চখ, দ্যা কহি শিশু শুন মাঁগ বর বো চাই।
হোঁ কহী প্রভু ভক্তী চাহত, শত্রু নাশ সুভাই।

তিনি আমার চক্ষু দান করিলেন, ও বলিলেন, "রে শিশু, শুন, আপনার ইচ্ছামত বর চাও।" অথবা তিনি আমাকে জ্ঞান-চক্ষু দান করিলেন ও বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি বলিলাম, "প্রভু, আমি ভক্তি চাই ও আমার শত্রুনাশ হউক।"

দুসরে ন রূপ দেখোঁ দেখি রাধেশ্যাম।
শুনত করুণাসিন্ধু ভাখী, "এবমস্তু" সুধাম।

"আমি রাধাশ্যাম রূপ দর্শন করিয়া সেই চক্ষে আর অন্য কোন রূপ দেখিতে চাহি না। এই কথা শুনিয়া করুণাসিন্ধু ভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "এবমস্তু"। তিনি আমার শত্রুনাশ সম্বন্ধে বলিলেন,—

প্রবল দছিন বিপ্রকুল তেঁ শত্রু হুইহে নাশ।

দক্ষিণ দেশের প্রবল বিপ্রকুলের হাতে তোমার শত্রু নাশ হইবে। [সূরদাসের ভ্রাতৃঘাতী শত্রু মোগল-রাজবংশ এ ঘটনার ও রচনার বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্যের বিপ্রকুলোদ্ভব প্রবল পেশোয়াদের হাতে লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অথবা, তাঁহার অজ্ঞান-রূপ শত্রু দক্ষিণ-দেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভব গুরু বল্লভাচার্য্য নাশ করিয়াছিলেন।]

ভগবান আমাকে বর দিয়া বলিলেন,—

অক্ষত বুদ্ধি বিচার বিদ্যা মান মানে সাস।

তোমার অক্ষয় বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, বিদ্যা ও মান হইবে। তাহার পর

নাম রাখো মোর সূরজদাস, সূর, সুশ্যাম।

আমার নাম রাখিলেন, সূরজদাস (সূর্য্যদাস), সূর, ও সুশ্যাম। তাহার পর তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন, আমি ব্রজে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই কবিতার সহিত তাঁহার "সূরসারাবলী"র অন্য স্থানের উক্তির [শিব বিধান তপ করেউ বহুত দিন] ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। এ কবিতানুসারে তিনি শিশুকাল হইতেই "বহুপতি" উপাসক, 'বহুত দিন' 'শিব বিধান তপ' আর হয় না।

এই পদ আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পূর্ব্বের একটি প্রবাদ আছে, যে, সূরদাস বাল্যে চক্ষুহীন ছিলেন না। প্রথম যৌবনে তিনি এক মন্দিরে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী পূজারিণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে অনেকক্ষণ পলকহীন নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। যখন পূজারিণী মন্দির ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে লাগিল, সূরদাসও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সে আপনার গৃহের নিকট পৌছিয়া, সূরদাসের কাছে আসিয়া কঠোরভাবে বলিল, "তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার ও বিদ্বান বোধ হইতেছে, কি উদ্দেশে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছ?" সূরদাস লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "একটি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, দিবে কি?" যুবতী বলিল, "যদি দিবার মত হয়, নিশ্চয় দিব, কি চাও বল।" সূরদাস বলিলেন, "দেখ, আমার এই দুইটি চক্ষু আমার পরম শত্রু, ইহারা আমাকে অধর্ম্মের ও নরকের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি ভিক্ষা করিতেছি, তুমি একটি ছুঁচ আনিয়া আমার চক্ষু দুটি অন্ধ করিয়া দাও।" সেই সময় হইতে তিনি অন্ধ।

বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ গল্প বাঙ্গালী লেখকরা কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ প্রবাদ আরও অন্য সাধু, বিশেষতঃ অন্ধ সাধু সম্বন্ধে আছে। অতএব ইহার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে সূরদাস নামের সহিত অন্ধত্বের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে যুক্তপ্রদেশে লোকে অন্ধ, বিশেষতঃ অন্ধ গায়ক ও সাধুকে [সে ধনবান হউক বা ভিখারী হউক] সূরদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

যাহা হউক, দিল্লীর নিকট সিহী গ্রামে ব্রহ্মভট্ট বা ভাট কুলে সূরদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য এক প্রবাদ আছে যে, তিনি আগরা হইতে নয় ক্রোশ দূরে মথুরার পথে, যমুনাতীরে গউঘাট নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি জন্মান্ধ হউন বা না হউন, তিনি যে বিদ্বান্ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার জানিতেন, পুরাণে তাঁহার ভাল জ্ঞান ছিল। ইহা ছাড়া তিনি

ফার্সী ভাষাও অল্প-বিস্তর জানিতেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায়, অথবা জন্মের কিছু পূর্ব্বে, যুক্তপ্রদেশের ও পঞ্জাবের হিন্দুরা—বিশেষতঃ কায়স্থ ও খেত্রীরা—লোদী সম্রাটদের উত্তেজনায় ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ও রাজসরকারে লেখকদের পদে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপ ফার্সী-শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে আকবরের রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রী ও সেনাপতি খেত্রী-কুলোদ্ভব রাজা টোডর মল্ল টণ্ডন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের মোগল-সামন্তরা আপনার আপনার জায়গীরের হিসাব রাখিতে হিন্দু দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। ইহার পূর্ব্বে ম্লেচ্ছের ভাষা শিক্ষা করিয়া সমাজে পতিত ও অপবিত্র হবার ভয়ে ব্রাহ্মণরা, মসিধারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া বীরত্বনাশের ভয়ে অসিজীবী ক্ষত্রিয়রা ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতেন না। অন্য জাতীয় লোকেও আপনার আপনার জাতীয় ব্যবসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" উক্তির সমর্থন করিতে সকলে ব্যস্ত থাকিত। একান্ত নিরুপায় না হইলে কেহ চাকরি করিতে চাহিত না, চাকরিকে সকলেই দাসত্ব, কষ্টকর ও হীন ব্যবসায় মনে করিত। অতএব রাজ-সরকারের লেখকদের কাজ বিদেশী ইরানীদের একচেটে ছিল। বিদেশী বলিয়া তাহাদের যেমন বেশী বেতন দিতে হইত, সেইরূপ তাহারা এ কাজে দক্ষ, ও প্রকাশ্যে উৎকোচ বা নজরানা গ্রহণ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল।

তিনি "সুরসারাবলী" পুস্তক সমাপ্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

গুরু প্রসাদ হোৎ ইহ দরসন, সরসঠি বরস প্রবীণ

অর্থাৎ ৬৭ বৎসর বয়সে এই পুস্তক শেষ করিলাম। এই গ্রন্থখানি তাঁহার বৃহত্তম গ্রন্থ "সুরসাগরের" সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহার পর, তিনি সুরসাগরের কতকগুলি কূট পদ একত্র করিয়া "সাহিত্য-লহরী" নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সাহিত্য-লহরীর প্রণয়ন-কাল যে-শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অনেকে ১৬০৭ সম্বৎ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার পাঠে কিছু ভুল আছে, একটু পরিবর্ত্তন করিলে বা লেখার সামান্য ভুল থাকিলে সম্বৎ ১৬৩৭ দাঁড়ায়, ও অন্য ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অনেকটা মিলিয়া যায়। ১৬৩৭ ঠিক হইলে, ও সে সময়ে ৬৭ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার জন্মকাল ১৫৭০ সম্বৎ অথবা ১৫১৩ ঈশাব্দ হয়। কিন্তু এরূপ শ্লোকে তিথি নক্ষত্র থাকিলেও ঠিক সময় জানা যায় না, কেন না একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে তারিখ দিয়া প্রকাশকের হাতে তুলিয়া দিবার প্রথা সেকালে ছিল না। পুস্তক শেষ হইবার ও তারিখের শ্লোক-রচনার পরও যতকাল কবি রচনাক্ষম বা জীবিত থাকিতেন, পুস্তকের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলিত, কিন্তু তারিখ আর বদলান হইত না। কবি বিহারীলাল প্রণীত "সতসঈ" ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ পুস্তকখানি শেষ হইয়াছে সম্বৎ ১৭১৯ চৈত্র কৃষ্ণষষ্ঠী সোমবার [মার্চ্চ ১৬৬৩ ঈ] কিন্তু তাহাতে ১৬৬৭-৬৮ ঈশাব্দের ঘটনা বর্ণিত আছে। অতএব ১৬৩৭ সম্বতে যে তাঁহার ৬৭ বৎসর বয়স ছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

সুরদাসের গুরু বল্লভাচার্য্য শেষবয়সে কয়েক বৎসর কাশীতে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন বাসকালে ১৫২৮ ঈশাব্দের পূর্ব্বে সুরদাসকে দীক্ষিত করিয়া থাকিবেন। তিনি ১৫৩০র শেষে বা ১৫৩১ আরম্ভে দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। ১৫১৩ সুরদাসের জন্ম হইলে দীক্ষার সময়ে ১৫ বৎসরের বেশী বয়স হয় না; অতএব "শিব বিধান তপ করেউ বহুত দিন" এই কথার অর্থ হয় না। আবার ১৬০৭ ঠিক হইলে তাঁহার জন্ম ১৪৮৩ ঈশাব্দে হয়। বেরমের সময়ে (১৫৬০ ঈশাব্দে) তাঁহার বয়স ৭৭।৭৮ হয়। তিনি আপনার পিতার সপ্তম ও শেষ পুত্র, অতএব সে সময়ে তাঁহার পিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স এক শত হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। ওরূপ বৃদ্ধের গান শুনিয়া লক্ষ টাকা দান করা বিশ্বাস হয় না। অতএব এ সকল উক্তির সামঞ্জস্য হইতেছে না।

আবুলফজল লিখিত আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সময়ের কবি, সাধু, গায়ক, বাদক ইত্যাদির নামের তালিকা আছে, কিন্তু তাহাতে কেবল এরূপ লোকেরই নাম আছে যাহারা রাজকোষ হইতে কোনপ্রকার বৃত্তি পাইত। ঐ তালিকাতে তুলসীদাসের নাম নাই, কিন্তু

আকবর যে তুলসীদাসের অস্তিত্বের সংবাদ রাখিতেন তাহার নানা প্রমাণ আছে। তুলসীদাস আকবরের সেনাপতি আবদুল রহীম খাঁনখানাঁর বন্ধু ছিলেন। রহীম খাঁনখানাঁ স্বয়ং হিন্দী ভাষার একজন বড় কবি ছিলেন ও কবিদের সন্ধান রাখিতেন। আইন-ই-আকবরীতে সূরদাসের পিতার নাম "বাবা রামদাস গোয়ালিয়ারী, গোয়েন্দা" ও সূরদাসের নাম "সূরদাস, পিসর বাবা রামদাস গোয়েন্দা" এইরূপে লেখা আছে, অর্থাৎ উভয়ের নাম গায়ক-শ্রেণীমধ্যে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, যখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি ত্যাগী সাধুরূপে বৃন্দাবনে বাস করিতেন, বিষয়ীদের কাছেও যাইতেন না, তখন আকবর বাদশা সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাইতে অস্বীকার করিলেন। বৃন্দাবনের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সাধু, সম্রাট আপনার কিছুই করিতে পারিবেন না, কিন্তু আপনি না যাইলে আমার চাকরি যাইবে, আমার অন্ন মারিবেন না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন সম্রাট কেন যাইতে বলিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, তাহাতে এইমাত্র লেখা ছিল, "শুনিয়াছি বৃন্দাবনে সূরদাস নামে ভাল কবি ও গায়ক বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইবে।" ইহার পর পাল্কী ঘোড়া ইত্যাদি যে যান-বাহনের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার আজ্ঞা ছিল। সূরদাস ফতেপুর-সীকরীতে আসিয়া সম্রাটের সহিত দেখা করিলেন। বাদশা গান শুনিতে চাহিলে তিনি তানপুরা সঙ্গতে মুখে মুখে রচনা করিয়া গান ধরিলেন,—

কহা ভগৎ কো কাম ?
সীকরী মেঁ কহা ভগৎ কো কাম ? ।
আওৎ যাৎ পনহৈয়াঁ কাটী, ভূল গয়ো হরিনাম ॥
জা কো মুখ দেখে হোয় পাতক, তাকো করো পরনাম ॥
ফির কভয়েঁ এইসী জিন করিও, সূরদাস কে শ্যাম ॥
কহা ভগৎ কো কাম ?
সীকরী মেঁ কহা ভগৎ কো কাম ?

সীকরীতে ভক্তের কি প্রয়োজন ? যাইতে আসিতে জুতা ছিঁড়িল মাত্র, ও হরিনাম ভুলিয়া গেল। যাহার মুখদর্শনে পাতক হয়, তাহাকে প্রণাম করিতে হইল। হে সূরদাসের শ্যাম, আর কখন এমন করিও না। সীকরীতে ভক্তের কি প্রয়োজন ? এই গান গাহিবার সময়ে তিনি যেমন প্রাণ ঢালিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গাহিয়াছিলেন, সেইরূপ বাদশা ও সভাসদরা নিস্তব্ধ ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শুনিয়াছিলেন। গান শেষ হইলেও কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ ছিলেন, পরে বাদশা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে তোমার দুইটি গুণের কথা শুনিয়াছিলাম যে, তুমি ভাল কবি ও ভাল গায়ক, আজ দেখিলাম, তোমার আর একটি গুণ আছে, তুমি ভাল ফকীর [সাধু]ও বটে।" বাদশা তাঁহাকে এক-শতী "মনসব" পুরস্কার দিলেন। একশতী মনসবের তিনটি শ্রেণী ছিল, তাহার মাসিক বেতন ৫০০৲, ৬০০৲ ও ৭০০৲ টাকা। মনসবদাররা সমর-বিভাগের কর্ম্মচারী-রূপে গণিত হইত। একশতী মনসবদারকে যুদ্ধের জন্য দশটি * ঘোড়া, তিনটি হাতী, দুইটি উট ও পাঁচটি ভারবাহী বলদের গাড়ী রাখিতে হইত, যুদ্ধের সময়ে তাহারা সম্রাট-নিযুক্ত সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিত, কিন্তু সাধুদের এসকল রাখিতে হইত না, তাহারা বেতনের পূরা টাকা পাইত। সূরদাস বলিলেন, "আমি ভিখারী সাধু, আমি এ মনসব কি করিব ? আমি লইব না।" আকবর হাসিয়া বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি তুমি প্রকৃত সাধু, তোমার অর্থের প্রয়োজন নাই, সেই-জন্য লইতেছ না। তুমি সাধু বলিয়া সাধুর গর্ব্ব ত্যাগ

---

* একশতী মনসবদারকে রাখিতে হইত—দুইটি ইরাকী, দুইটি মুজন্নিস, দুইটি তুর্কী, দুইটি ইয়াবু [ছোট ঘোড়া, টাটু] ও দুইটি তাজী বা আরব-দেশীয় ঘোড়া, দশটি ঘোড়াতে দশজন অশ্বারোহী সৈনিক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সহিত। তিনটি হাতী—একটি সাদা [সাধারণ] ও একটি মাঝোলা [মাঝারী] ও একটি করহা [ছোট]। প্রত্যেক হাতীতে তিনজন লোক, একজন যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্রসহ একজন মাহুত ও একজন বর্শাধারী সেবক। করহা বা ছোট হাতী প্রায় ভারবহন করিত। দুইটি সাধারণ উট, প্রত্যেক উটের সহিত একজন লোক। পাঁচটি অরাবা, অর্থাৎ ভারবাহী বলদের ছ্যাকড়া গাড়ী। প্রত্যেক গাড়ীর সহিত দুইটি বলদ ও একটি লোক। ইহাদের বেতন দিয়া যাহা বাঁচিত, তাহা মন-সবদারের বেতন। [আইন-ই-আকবরী]। এ নিয়ম কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে হায়দ্রাবাদে পূর্ব্বে ছিল, এরূপ সেনাকে Irregular Army (বে-কায়দা ফৌজ) বলিত, এখন আর নাই।

করিতেছ না ; কিন্তু আমিও বাদশা, আমি বাদশার মান ছাড়িব কেন ? তোমাকে এ মনসব লইতে হইবে, তবে তোমার অর্থের যদি প্রয়োজন না থাকে, তুমি দান করিও।"

এই গান সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। এক প্রবাদ মতে বাদশা তাঁহাকে গান গাহিতে বলিলে তিনি,"মন রে, কর মাধবসে প্রীতি" গান ধরিলেন। সভাসদ্‌রা বলিলেন, "ও নহে, রাজার গুণবর্ণনা করিয়া একটি গান গাও।" সূরদাস মুখে মুখে নূতন গীত রচনা করিয়া গাহিতেন, পূর্ব্বরচিত গীত এমন অবস্থায় গাহিতেন না। তিনি দ্বারিকাতে রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়া একটি গান গাহিলেন। সভাসদ্‌রা আবার বলিলেন, "ও হইল না, তোমার সম্মুখে সম্রাট বসিয়া, তাঁহার গুণ-বর্ণনা করিয়া একটি গান গাও।" কিন্তু সূরদাস মৌন ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সূরদাসের সঙ্গী সেবক বা শিষ্যেরা বলিলেন, "সূরদাসজী সাধু হইবার পর ভগবানের গুণগান ছাড়া আর কাহারও গুণকীর্ত্তন করেন নাই।" আকবর এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, আর পীড়ন করিলেন না।

এই গল্পে বোধ হইতেছে, যে, সূরদাস ১৫৭৪ ও ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, কেন না ফতেপুর-সীকরী ১৫৭৩ হইতে ১৫৮৩ পর্য্যন্ত রাজধানী ছিল, ও ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মনসব-রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা,কিন্তু জন্ম বা মৃত্যুর ঠিক সময় জানা নাই। ইহার পর কোনো সময়ে সূরদাস গোকুলে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

সূরদাস প্রথম বয়সে, শৈব থাকা কালে, নল-দময়ন্তীর গল্প কবিতায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে পুস্তক পাওয়া যায় না। পরিণত বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গেয় পদ ছাড়া আর কিছু রচনা করিতেন না। মধ্যে মধ্যে কেবল কয়েকটি দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূরদাসের পূর্ব্বজ পণ্ডিতরা সংস্কৃতেই কবিতা রচনা করিতেন, হিন্দীতে গেয় পদ ছাড়া কবিতা-রচনা-প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। হিন্দীতে ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র এই সময়েই কবি কেশবদাস প্রচলিত করিয়াছিলেন।

সূরদাসের "সূরসাগর" প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তাহাতে কবি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রত্যেক ছোট-বড় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বহু সুললিত পদ রচনা করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, পুস্তকখানি যখন রচিত হইয়াছিল তখন তাহাতে একলক্ষ [মতান্তরে ১,২৫,০০০] পদ ছিল, কিন্তু এখন পাঁচ হাজার অপেক্ষা বড় বেশী পাওয়া যায় না। তবে এখনও সব সংগ্রহ করা হয় নাই, এ অঞ্চলের সাহিত্যিকরা এখনও চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দী ভাষাতে সূরদাসের পদের মত হৃদয়গ্রাহী কবিতা আর নাই বলিলেই হয়। একজন কবি উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

কিধোঁ সূর কো সর লগো ? কিধোঁ সূর কী পীর ?
কিধোঁ সূর কো পদ শুনো ? যো অস্ বিকল শরীর ?

তোমার কি হইয়াছে ? তুমি কি কোনো সূরবীরের শরাঘাতে পীড়িত ? কিংবা তোমার কি শূলবেদনা হইয়াছে ? কিংবা তুমি কি সূরদাসের পদ শুনিয়াছ, যে তোমার শরীর এত বিকল হইয়াছে ?

বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ও চৈতন্যদেবের শৈশব ও কৈশোর লীলার অনেক মধুর পদ আছে, তাহাতে সমস্ত জীবনের সত্য ও কল্পিত ঘটনাগুলি অতি মধুর ভাষাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ সূরদাসের হিন্দী পদগুলিও অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত। সেগুলি ভক্ত গায়কের মুখে শুনিতে বড় মধুর। এ দেশের গ্রামে গ্রামে বালক-বালিকা হইতে তানসেনের মত গায়কেরা পর্য্যন্ত অতি আনন্দের সহিত ঐ পদ গাহিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, আকবর বাদশা মিঞা তানসেনের মুখে সূরদাসের পদ শুনিতে ভালবাসিতেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপোষ্য শিশু, দোলায় শুইয়া থাকেন, তখনকার বর্ণনা করিয়া সূরদাস গাহিতেন,—

যশোদা হরি পালনে ঝুলাওয়েঁ,
ইহি অন্তর অকুলায় উঠে হরি যশোমতি মধুরে গাওয়েঁ ।।

যখন শ্রীকৃষ্ণের কিছু বয়স বাড়িয়াছে, তখন নন্দরাজা তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিক্ষা দিতেছেন, শিশু পড়িয়া যাইতেছে, তিনি আবার তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতেছেন, বার-বার একটা কথা বলাইয়া কথা কহিতে শিখাইতেছেন,—

গহে অঙ্গুরিয়া তাত কী নন্দ চলন সিখাওয়ৎ।
অররয়ায় গির পরৎহাঁ, কর টেকি উঠাওয়ৎ॥
বার বার বকি, শ্যাম সোঁ কছু বোল বকাওয়ৎ।
সূর শ্যাম মুখ দেখি মহর মন হর্ষ বঢ়াওয়ৎ॥

এ বর্ণনা কত স্বাভাবিক হইয়াছে, ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। যখন শিশুর আধ আধ বোল ফুটিয়াছে তখন মাতার কাছে শিশুসুলভ আবদার করিতেছে,

মৈয়া কবহিঁ বঢ়েগী চোটী?
কিতীবার মোহেঁ দুধ পিয়ৎ ভই, ইয়ে অজহুঁ হ্যা ছোটী।

মা আমার, আমার মাথার চুল কবে বড় হইবে? আমি কত দিন হইতে দুধ খাইতেছি, তবু আমার বেণী এত ছোট কেন?

শিশু আবদার ধরিয়াছে অন্য বালকদের সহিত খেলিতে যাইবে না, তাহাকে অন্য বালকদের সঙ্গে দেখিলেই দাদা বলদেব ক্ষ্যাপায়, বলে, "বসুদেব তোর পিতা, ও দেবকী তোর মাতা।"

খেলন অব মেরী জাৎ বলইয়া।
যবহিঁ মোহিঁ দেখৎ লরকন্ সঙ্গ, তব হিঁ খিজৎ বল-ভইয়া।
মোসে কহৎ তাত বসুদেব কো, দেবকী তেরী মইয়া॥

আর একদিন আকাশের চাঁদ খেলনা রূপে লইবার জন্য শিশু আবদার করিতেছে, মাতা যশোদা তাহাকে নানারূপে ভুলাইতেছেন,

চন্দ্র খিলোনা ল্যাহোঁ মইয়া মেরী, চন্দ্র খিলোনা লইহোঁ।
ধৌরী কো পয় পানা ন করিহোঁ, বেণী সির ন গুথৈ হোঁ॥
হ্বৈ হোঁ লোট অভই ধরণীপর, তেরী গোদ ন অইহোঁ।
লাল কইহোঁ নন্দ ববা কো, তেরো সুৎ ন কইহোঁ॥
কান লায় কছু কহৎ যশোদা, দাউ হিঁ নাহিঁ শুনৈহোঁ।
চন্দাহুতে অতি সুন্দর তোহিঁ নবল দুলহনিয়া বিয়েহোঁ॥
তেরী সো। মেরী শুন মৈয়া, অবহিঁ বিয়াহন জৈহোঁ।
সূরদাস সব সখা বরাতী নূতন মঙ্গল গৈহোঁ॥

মা আমার, আমি চাঁদ লইয়া খেলা করিব। না দিলে আমি দুধ খাইব না, মাথার বেণী বাঁধিয়া দিতে দিব না। আমি এখনই ধরণীতে লুটাইব, তোর কোলে যাইব না, আমি নন্দ বাবার পুত্র হইব, তোর পুত্র হইব না। যশোদা কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিতেছেন, তোমাকে একটি কথা বলি, তাহা বলদেবকে বলিব না, চাঁদ অপেক্ষা সুন্দরী বধূ আনিয়া তোমার বিবাহ দিব। (এই কথা শুনিয়া শিশু আনন্দে বলিল) তোমার দিব্য, মা, চল এখনই বিবাহ করিতে যাইব। সূরদাস বলিতেছেন, সকল সখা ও বরযাত্রীরা মিলিয়া নূতন মঙ্গল গীত গাহিব।

শিশু আর একটু বড় হইয়াছে, প্রতিবাসী ব্রজ-গোপীদের ঘরে গিয়া শিকা হইতে ননী চুরি করিয়া খাইতে শিখিয়াছে, গোপীরা যশোদার কাছে অভিযোগ করিতেছে, শিশু আত্ম-সমর্থনে একজন এড্‌ভোকেটের মত বক্তৃতা করিয়াও যশোদার মত বিচারককে ভুলাইতে না পারিয়া শিশুর প্রধান অস্ত্র অভিমান করিয়া মোকদ্দমায় ডিক্রি লাভ করিতেছে।

মৈয়া মেরী, মঁ্যা নহিঁ মাখন খায়ো।
ভোর ভয়ো গইয়ন কে পাছে, মধুবন মোহিঁ পঠায়ো॥
চার পহর বংশীবট ভটকিয়ো, সাঁঝ পরে ঘর আয়ো॥
মঁ্যা বালক, বহিয়ন কো ছোটো, ছিকো কিস বিধ পায়ো?॥
গোয়াল বাল সব ব্যার পরে হ্যাঁ, বরবস্ মুখ লপটায়ো॥
তু জননী মন কী অতি ভোরী, ইনকে কহে পতিয়ায়ো।
জিয় তেরে কছু ভেদ উপজ হ্যা, জান পরায়ো জায়ো॥
ইয়হ লে অপনী লকুট কমরিয়া, বহুতহী নাচ নচায়ো।
সূরদাস তব বিহঁসি যশোদা লে উর কণ্ঠ লগায়ো॥

মা আমার, আমি মাখন খাই নাই। ভোরবেলাই ত তুমি আমাকে গরু লইয়া মধুবনে পাঠাইয়াছিলে। সমস্ত দিন বংশীবটে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময়ে ঘরে আসিলাম। আমি ত বালক, আমার হাত ছোট, শিকাতে হাত গেল কেমন করিয়া? গোয়ালের বালকেরা শত্রুতা করিয়া আমার মুখে মাখন মাখাইয়া দিয়াছে। মা জননী, তোর মন সাদা (বা কপটতাহীন), ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিলি। আমি পরের ছেলে বলিয়া তোর মনে কিছু ভেদজ্ঞান হইয়াছে। (যখন এত কথাতেও যশোদা নরম হইলেন না, তখন শিশুর শেষ যুক্তি কান্না ও অভিমান) এইনে তোর কৌপিন ও কম্বল, * আমার চাই না, তুই অনেক নাচ নাচালি। সূরদাস তখন হাসিয়া ফেলিলেন, ও যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

ক্রমে ব্রজের লীলাখেলা ফুরাইল, কৃষ্ণ বলরাম এখন বলবান বালক রূপে প্রসিদ্ধ হইলেন। অত্যাচারী কংস

---

* এ প্রদেশের ভক্ত কবিরা শিশু কৃষ্ণকে সেকালের গোপ বালকের মতই সাজাইয়াছেন, তাহাকে বহুমূল্য রত্নাভরণ ও সূক্ষ্ম ধুতি চাদর পরান নাই। সকল কবিই কৌপিন ও কম্বল বর্ণনা করিয়াছেন।

দুই ভাইকে নিহত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অক্রূরকে পাঠাইলেন, যে উপায়ে হউক বালকদের মথুরাতে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। মার মন, বিপদটাই আগে ভাবে। যশোদা দুই ভাইকে যাইতে দিবেন না, ব্রজবাসীদের করুণস্বরে উঁহাদের আটক করিতে বলিতেছেন,—

> যশোদা বার বার ইয়োঁ ভাখে.
> হ্যা কই ব্রজ হিতু হমারো, চলত গোপালহি রাখে?

যশোদা বার-বার এইরূপ বলিতেছে; ব্রজে আমার এমন কেহ হিতাকাঙ্ক্ষী আছে কি, যে গমনোদ্যত গোপালকে আটক করিয়া রাখে? এই পদের পাঠান্তরে—"দ্বার দ্বার ইয়ো ভাখে" অর্থাৎ যশোদা দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াইতেছে। অন্য অর্থ বার-বার অর্থাৎ এক একটি চুল, অর্থাৎ যশোদার এক একটি লোম এইরূপে বিলাপ করিতেছে। প্রবাদ আছে, সম্রাট আকবর তানসেনের মুখে এই পদটি শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন ও প্রায়ই এই পদ গাহিতে বলিতেন।

যশোদা যখন উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন,

> কহৎ কান্হ, শুনো যশোমতি মইয়া।
> আবহিঁগে দিন চার পাঁচ মেঁ হম হলধর দোউ ভইয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শুন মা যশোমতি, আমি ও হলধর আমরা দুই ভাই চার পাঁচ দিনে আসিব।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাইবার পর ব্রজের গোপীরা খেদ করিতেছে,

> অখিয়াঁ হরি দরশন কি পিয়াসী।
> দেখ্যো চাহৎ কমল নয়ন কো নিশিদিন রহৎ উদাসী॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছেন, তিনি বিরহিণী ব্রজবালাদের জ্ঞান ও যোগ উপদেশ করিতে বলিয়াছেন কিন্তু গোপীরা বলিতেছে তাহারা জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা করিতে চাহে না, তাহারা শ্রীহরিকে ভক্তিমার্গে পাইতে চাহে।

> হম কো হরি কি কথা শুনাও
> ইয়ে অপনী গিয়ান-গাথা অলি মথুরা হি ল্যা যাও॥
> উধো জী হমহিঁ ন যোগ সিখাইয়ে
> যে হি উপদেশ মিলে হরি, হমকো সো ব্রত নেম বতইয়ে॥

হে উদ্ধব, আমাদের যোগ শিখাইও না, যাহাতে হরি পাওয়া যায়, সেই উপদেশ দাও, তাহার ব্রত নিয়মের কথা বল।

> উধো যোগ যোগ হম নাহী
> অবলা সার জ্ঞান কহা জানে, ক্যাসে ধিয়ান ধরাহিঁ

হে উদ্ধব, আমরা যোগ শিক্ষা করিবার উপযুক্ত নই। আমরা অবলা, আমরা জ্ঞান ও ধ্যানের কথা কি বুঝিব?

> যোগী ভরমত যেহি লাগি ভুলে, সো তো হ্যাঁ অপু মাহিঁ

যোগীরা যাহার জন্য পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে ত নিজের শরীর মধ্যেই রহিয়াছে।

ব্রজবালারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ ব্রজের বিরহে কাতর হইয়াছিলেন। মথুরা ও পরে দ্বারিকাতে গিয়া তিনি ধন-রত্ন সুন্দরী প্রেমময়ী স্ত্রী সকল প্রকার ভোগের পদার্থ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যের ব্রজের খেলা, গোপীদের অহেতুক প্রীতি ভুলিতে পারেন নাই।

> রুকমিনী মোহিঁ ব্রজ বিসরৎ নাহিঁ
> ওয়া ক্রীড়া খেলৎ যমুনাতট, বিমল কদম কী ছাঁই
> সকল সখা অরু নন্দ যশোদা ওয়ে চিৎ তেঁ ন টরাহিঁ
> যদপি সুখ নিধান দ্বারাবতি, তউ মন কহুঁ ন রহাহিঁ

রুক্মিণী, আমি ব্রজ ভুলিতে পারিতেছি না। সেই যমুনাতটের খেলা ও বিমল কদমতলার ছায়া ভুলিতে পারিতেছি না। সখাসকল ও নন্দ যশোদাকে চিত্ত হইতে দূর করিতে পারি না। দ্বারাবতীতে সকল সুখ থাকিলেও তাহাতে মন লাগিতেছে না।

সুরদাসের সমসাময়িক ভক্তকবি নাভাজী "ভক্তমাল" নামক পুস্তকে ভক্তদের জীবনীর মধ্যে সুরদাসের জীবনী লিখিয়াছেন, কিন্তু সে লেখা এত সংক্ষিপ্ত যে, থাকা না থাকা সমান। তাহাতে এইমাত্র আছে যে সুরদাস দরিদ্র পিতামাতার সন্তান, ভক্ত ও কবি ছিলেন। ভক্ত-মালের টীকাকার লিখিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। ইহা ছাড়া এত বড় ভক্ত ও কবি সম্বন্ধে লিখিবার মত আর কিছু পান নাই।

বল্লভ-সম্প্রদায়ের চুরাশীজন প্রধান ভক্তের জীবনী "বার্ত্তা" নামক পুস্তকে লেখা হইয়াছে। তাহাতেও একজন প্রধান ভক্তরূপে সুরদাসের জীবনী আছে, কিন্তু ভক্তমাল অপেক্ষা বেশী কিছু নাই।

সুরদাসের পিতা বাবা রামদাসের গায়ন সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক বদাউনী লিখিয়াছেন যে, আকবরের বাল্যাবস্থায় অতালীক [শিক্ষক] বেরম খাঁ খানখানাঁ শলীম শাহের সময়ের গায়ক লখনউ-বাসী বাবা রামদাসের গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। ভক্তির কথা শুনিয়া বেরমের দুই চক্ষু হইতে ধারা পড়িতে থাকিত। তখন রাজকোষের অবস্থা ভাল ছিল না তথাপি বেরম একবার একলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। একবার গান শুনিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন, সভার সমস্ত সাজ রামদাসকে দান করিলেন। এ ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫৬০ ঈশাব্দে, কেন-না মার্চ্চ ১৫৬১ বেরমের ক্ষমতা ও জীবনের অবসান হইয়াছিল। বদাউনী বড় কাহারও সুখ্যাতি করেন না, অল্প দোষ পাইলে তাহাকে যত বড় করিয়া দেখান সম্ভব দেখাইতে ছাড়েন নাই। হিন্দুদের ত তিনি গাল না দিয়া কথা বলিতেন না, বীরবরের মত লেখকের নাম আপনার পুস্তকে কোনস্থানে পাজী, হারামজাদা, সগে বেদীন (ধর্ম্মহীন কুকুর) ইত্যাদি মধুর শব্দ ছাড়া কখন লেখেন নাই। যেখানে রাজা ভগবানদাস, বীরবর, টোডরমল্ল ইত্যাদির মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন, সেখানে তাঁহার বাঁধা গৎ "জহন্নমে গেল," "সাপ ও বিছার আহার্য্য হইল" ইত্যাদি। এরূপ লোক যখন রামদাসের গায়নের সুখ্যাতি করিয়াছে তখন তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ-শ্রেণীর গায়ক ছিলেন।

সুরদাসের দেহান্তের পর তাঁহার কবিতাবলীর প্রথম সংগ্রহ-কর্ত্তা ছিলেন, ঐ বেরমের একমাত্র পুত্র নবাব আবদুল রহীম খান খানাঁ। এই আবদুল রহীম স্বয়ং তুর্কী ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। রহীমের সৎ সই [সপ্তশতী দোহা সংগ্রহ] এখনও হিন্দী-সাহিত্য-আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান।

কারায় শরৎ

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎরবির সোনার আলো ঝরিছে
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে;
মেঘলা দিনের ওড়্না ফেলি চাইছে ভুবন নয়ন মেলি,
রাঙামাটি রঙীন্ আলোয় বাঁচিলো;
আমার শুধু চোখের কাছে আজ্কে ক'টা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিলও।
আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাত্লো যে মন কোন্ আমোদে
কোন্ প্রাণে আজ উঠ্ল যে গান গাহিরে!
কেমন করে বুঝাই প্রাতে পেলাম দু'হাত আঙিনাতে
মাঠ ভরে' যা' পাওনি তুমি বাহিরে!
আজ্কে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল যত পুরানো;
কেউ-বা কালো কেউ-বা মেটে লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে আজ যায় না নয়ন ঘুরানো!

এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যাবে
শরৎরবি সোনার তুলি বুলায়ে,
দূরের স্বপন পাখায় মাখি বসল হেথায় কতই পাখী
বসবে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে,
এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদলবারির হাতের লেখায়
কতই ছবি কতই আছে রচনা
কচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তাদের কথা,
তাদের প্রসাদ—তাদের প্রাণের যাচনা।
আজ্কে তাদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া
আজ পূজা চায় সবাই যেন! শেওলা জলে পান্না হেন,
রাঙা ইট আজ উঠ্ল দ্বিগুণ রাঙিয়া।
এই উঠানে, এ-জেলখানায় দেখ্ছি আলো দিব্যি মানায়
দুদিন আগে এ কথা কই ভাবিনি!
সকল দীনের দৈন্য নাশি শরৎ এল মধুর হাসি,
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী!

ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমনি করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে ;
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এম্‌নি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙীন্ চিঠি লুকায়ে !
সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে ;
কঠিন সে হয় কোমল বড়, পুরানো হয় নূতনতর,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।

আশ্বিনে সেইদিন এসেছে আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা !
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে, তোমরা কি তার সবটা পাবে,
হেথায় আমি একটুও কি পাবো না ?
বাইরে আলো দুষ্টু ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,—
ধরার নয়ন ভরে স্বপন আবেশে।
হেথায় আলো লক্ষ্মীমেয়ে করুণ চোখে রয় যে চেয়ে
যায় কি পারা থাক্‌তে ভালো না বেসে ?

কুকিদের সমাজ ও ধর্ম্ম

শ্রীলালতুদাই রায়

কুকিদের কোনো সাহিত্য, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান নাই। সভ্য জগতের বাহিরে পাহাড়ে জঙ্গলে তাহাদের বাস। কিন্তু অশিক্ষিত অসভ্য হইলেও তাহারা মানুষ। নগণ্য হইলেও জন-বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের তাহারাও একটি জাতি। ধর্ম্মে তাহারা বিরাট্ হিন্দুসমাজেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা। পাহাড়ীরা কিরূপ, তাহারা কি ভাবে আছে, সভ্য সমতল-বাসীরা তাহা জানেন না ; যাহা জানেন তাহাও সব সত্য বা সম্পূর্ণ নহে। বহির্জ্জগতের সঙ্গে তাহাদের কোন যোগ নাই এবং কখনও কোনো যোগ যাহাতে না হয় তাহার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হইতেছে না। আমরা ধ্বংসের পথের যাত্রী। কতক পরের চেষ্টায়, কতক নিজের চেষ্টায়, মনের আনন্দে তর্‌তর্ করিয়া চলিয়াছি। আমাদের বলিবার কথা অনেক আছে,কিন্তু উপায় নাই, ভাষা নাই। কুকিদের বর্ত্তমান অবস্থা ও সমস্যাগুলি সুধীগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলেই আমার প্রথম কর্ত্তব্য শেষ হইবে বলিয়া মনে করি।

শিক্ষাহীন, শৃঙ্খলাবিহীন জাতির যেমন হয়, আমাদেরও সেইরূপ আজ নানা সমস্যা, সর্ব্বোপরি মিশনারী আন্দোলন-সমস্যা। আমাদের কথা লিখিতে হইলে মিশনারীর কথা বাদ দিয়া লেখা চলে না। আবার, "সত্য ব'ল, প্রিয় ব'ল না ব'ল সত্য অপ্রিয়," এ নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। অপ্রিয় সত্য হইলেও দুই-একটি কথা আমাকে লিখিতে হইয়াছে ও হইবে। এজন্য কেহ মনে কষ্ট পাইলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে যেভাবে প্রচারিত হইতেছে, তাহা আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। কাছাড়, মণিপুর ও লুসাই পাহাড়ের বহু কুকি-সর্দ্দারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা ও পরিচয় আছে। নানা কাজে আমাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কুকিদের বহু গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিতে হয়। ইহাতে আমি আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিখিতে চেষ্টা করিব।

মিশনারীদের মধ্যে বহু ভাল লোক ভারতে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ ভারত কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাঁহারা বাস্তবিকই প্রেমিক ছিলেন

এবং ভারতে বহু সংকাজ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম খারাপ নহে। কোনো ধর্ম্ম কখনও খারাপ হইতে পারে না। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কোনো ধর্ম্মই সমাজের ক্ষতিকর হইবে না। কিন্তু প্রচারকগণ প্রচারের উপযুক্ত হওয়া চাই। কেবল শাস্ত্রের কয়েকটা বাঁধা বুলি মুখস্থ করিতে পারিলে এবং অন্য ধর্ম্মকে যথেচ্ছা নিন্দা করিতে পারিলেই প্রচারক হওয়া যায় না। আজকাল আমাদের মধ্যে সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি একটি অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যাইতেছে। প্রচারকগণের চরিত্র, ব্যবহার এবং আপনা-আপনির মধ্যে কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই অশ্রদ্ধার অন্যতম মুখ্য কারণ, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। •

বিলাতী সাহেব অপেক্ষা দেশী সাহেবদের প্রচার-কার্য্য আবার অতি চমৎকার। বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, "রৌদ্রের তাপ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু রৌদ্রতাপে তপ্ত বালুকা-কণার তাপ সহ্য করা যায় না।" কালা পাদ্রী-সাহেবদের প্রচার-কার্য্যটি যদি পাঠকগণকে একবার দেখাইতে পারিতাম! প্রভু বলিয়াছেন, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর।" যথার্থ প্রেমিকদের এই 'সুসমচার প্রচার' দেখিলে মনে একসঙ্গে নবরসের উদয় হয়। যাঁহার নামে ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে, সেই মহাপুরুষ যীশু যদি একবার আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যটি দেখিয়া যাইতেন, তবে নিশ্চয়ই খুশী হইয়া তিনি প্রত্যেক প্রচারকের বেতন বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিতেন এবং পাহাড়ের মাথায় মাথায় প্রত্যেকের জন্য আরও বড় বড় বাংলো প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। ত্যাগী ভক্তের রাজা যীশুর ধর্ম্মের আজ এই চমৎকার পরিণতি বটে! সাদা পাদ্রীসাহেবদের প্রচার-কার্য্য সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। পাঠ্যাবস্থায় শহরের চৌমাথায় বাঙালী পথিক, দোকানদার ও কুলি মজুরদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ আমারও মাঝে মাঝে হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। জনৈক বৃদ্ধ প্রচারকের সঙ্গে আমার বিশেষ আত্মীয়তা আছে। তাঁহাকে সত্যবাদী ও খুব খাটি লোক বলিয়াই জানি। লুসাই পাহাড়ে প্রথম যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তিনি তাহাদের মধ্যে একজন। খ্রীষ্টান হইবার পর বহু বৎসর তিনি প্রচারকের কার্য্য করিয়াছেন। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের উপর হইল তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট, সালভেশন আরমি, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাইবেলের সদুপদেশগুলি আমার মনপ্রাণ অধিকার করাতেই আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। পরে দেখিলাম বাইবেলের উপদেশের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের কোনো সম্বন্ধ নাই। চার্চ্চের বক্তৃতার অর্থ শুধু অন্য ধর্ম্মের নিন্দা; প্রচারের সময় নিন্দা, গালাগালি, প্রলোভন ইত্যাদি ব্রহ্মাস্ত্র। যে-কোনো উপায়েই হউক না কেন, যে যত বেশী লোককে খ্রীষ্টান করিতে পারিবে তারই তত বেশী প্রমোশন হইবে, আর যার বেতন যত বেশী, ধর্ম্মজগতে তিনিই তত বড়। আমি এই সব অত্যন্ত খারাপ মনে করি। এইজন্যই এ-সম্প্রদায় ও-সম্প্রদায় সব ঘুরিয়া সব ঘাটের জলই সমান দেখিয়া চুপ করিয়া আছি। এখন বাইবেলের উপদেশগুলি মাথায় লইয়া সমাজের বাহিরে একা বসিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" ধর্ম্মের যে ক্ষীণ প্রদীপটি এতদিন মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল, প্রচারের তীব্র বায়ুবেগে তাহাও আজ নিবিয়া গেল। আমাদের যাহা ছিল তাহাও হারাইলাম, যাহা পাইলাম তাহাও ধরিতে পারিলাম কই?

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নানা মত প্রচার করিতেছেন। আমি মনে করি, খ্রীষ্ট বলিয়া কেহ থাকুন বা না থাকুন, অথবা তিনি বুদ্ধদেবের কোনো শিষ্য-প্রশিষ্যই হউন, সেই সময়ে এই রকম চরিত্র সমাজে ছিল নিশ্চয়। আমি সেই চরিত্র ও অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করি, যীশু খ্রীষ্টকেও তদ্রূপই করিয়া থাকি। সত্যই খ্রীষ্টের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, ত্যাগের ধর্ম্ম। কিন্তু উপযুক্ত প্রচারকদের হাতে পড়িয়া

তার কি রূপটাই না হইয়াছে। রামকৃষ্ণকথামৃতে পড়িয়াছি, "মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর উঠে।" দোকানদারকে ধর্ম্মগুরু করিয়া দিলে সে যদি দাঁড়ি-পাল্লা লইয়া ধর্ম্ম দান করিতে বসে তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

যাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করা হইতেছে, তাহাদের অভাব-অভিযোগ কোথায়, তাহাদের উন্নতি করিতে হইলে কোথা হইতে কি ভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে, ইত্যাদির কোনো খবর না রাখিয়া কেবল 'ট্রানের' (ত্রাণের) জন্য টানাটানি করিলে লাভ কিছু হয় না, শুধু তাহাদের স্বর্গলাভের ব্যবস্থা ভাল হয়, সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় বলিয়াছিলেন—

ভারতে দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়,—তোমরা খ্রীষ্টানরা তাহাদের জীবনরক্ষার কোনো চেষ্টা না করিয়া পৌত্তলিকদের আত্মার মুক্তির জন্য দলে দলে মিশনারী পাঠাইতেছ এবং সারা ভারতময় চার্চ্চ নির্ম্মাণ করিতেছ। ভারতে ধর্ম্মপ্রচারের এখন কোনো আবশ্যকতা নাই। রুটির ব্যবস্থারই এখন একান্ত দরকার। ধর্ম্ম ভারতের যথেষ্ট আছে। তারা চায় রুটি, দেওয়া হইতেছে পাথরের নুড়ি। যে খাদ্যের অভাবে মারা যাইতেছে তাহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতে যাওয়া আর তাহাকে অপমান করা একই কথা।"*

আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগ। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের নাকি কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। এখানে অধিকারী অনধিকারী নাই। সকলের জন্যই এক জুতা, এক টুপি, এক কোট। গায়ে লাগুক বা না লাগুক। জামা-জুতা বড় হউক বা ছিঁড়িয়াই যাউক তাহাতে ক্ষতি কি?

বাগানের বৃক্ষ-চারা যখন তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হয় তখন সে আপন শক্তিতেই বাড়ে। শিক্ষিত মালী তাহাকে শুধু সাহায্য করে মাত্র। কোন্ গাছের পক্ষে কিরূপ সার উপযোগী বা অনুপযোগী, কোন্‌টিই বা গাছের শত্রু, গাছের উপযোগী সারই বা কখন কি পরিমাণে দিতে হয়, যে মালী এই সব জানে না, তাহাকে ভাল মালী মনে করা যায় না। ভাল করিতে গিয়া অনেক সময় সে বিপরীতই করে। ধর্ম্মের বেলা নাকি এই সব যুক্তি খাটে না। স্বর্গরাজ্যের ধর্ম্মের সঙ্গে পাপপূর্ণ জগতের নীতি খাপ খাওয়াইতে যাওয়া বাতুলতা। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব শুধু বিশ্বাস কর আর স্বর্গে যাও। ব্যস্!

যতই অশিক্ষিত বা অসভ্য হউক না কেন, প্রত্যেক জাতিরই একটা সমাজ আছে এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিছু-না-কিছু ধারণা থাকেই। শিক্ষিত সভ্য জাতির নিকট যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কুকি জাতিরও একটি সমাজ আছে। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা কিছু কিছু আছে। আজ আমরা কুকি জাতিকে যে অবস্থায় দেখিতেছি, তাহা সেই জাতির কত কালের, কত ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতি তাহা কে বলিবে? নদী যতই ক্ষীণ হউক না কেন, উৎপত্তি-স্থান হইতে যাহা হাজার হাজার মাইল চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তাহার পথে চলিতে দাও। তাহার গতিশক্তিকে নষ্ট না করিয়া বর্দ্ধিত কর, সাহায্য কর, মূলধারাকে বাঁচাইয়া ইচ্ছামত রূপ দাও। যে রাস্তায় উহা এতদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যদি ভুল হইয়া থাকে, হইয়াছে; তাহার পথেই তাহাকে শোধরাও। বলিতে পার না, "ফের, ফের, আবার উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া চল, আবার নূতন করিয়া ঠিক রাস্তায় যাত্রা কর।" আবার রাস্তা ভুল হইয়াছে কি না তাহা কে বলিবে? আজ অবিকশিত অবস্থায় যে-সব অসম্পূর্ণতা, দোষ, ত্রুটি, দেখা যাইতেছে, বিকশিত অবস্থায় তাহা কি রূপ গ্রহণ করিবে কে জানে? বালককে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে তাহার

* "Christians must always be ready for good criticism. You Christians who are so fond of sending out missionaries to save the soul of the heathen, why do you not try to save their bodies from starvation? In India, during the terrible famines, thousands died from hunger, yet you Christians did nothing. You erect churches all through India, but the crying evil of the East is not religion. They have religion enough. But it is bread that these suffering millions of burning India cry out for with parched throats. They ask for bread but we give them stones; it is an insult to a starving man to teach him Metaphysics."

১। ঝরণা হইতে জল তোলা হইতেছে। পিঠের ঝুড়িতে বাঁশের চোঙার মধ্যে জল। কুকিরা এই প্রকার ঝুড়ি দ্বারা এই ভাবেই পাহাড়ে মালপত্র বহন করে।

২। কুকি মেয়ে তাঁতে কাপড় বুনিতেছে। পিছনে একটি মেয়ে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছে।

৩। শ্রীযুত লালভুদাই রায়

কুকিদের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা

। কুকিদের বাসগৃহ। বাম পার্শ্বের ছোট ঘরখানা হাঁসের জন্য নির্ম্মিত

। সস্ত্রীক জনৈক কুকি রাজা

ঠিক ঠিক ধারণা কেহ করিতে পারে না। প্রত্যেক লোকের সমষ্টিই সমাজ। একটি লোকের যেমন বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি আছে, প্রত্যেক সমাজেরও এই সব অবস্থা আছে। জাতি-হিসাবে কুকিদের এখন বাল্যকাল বলা যাইতে পারে। অপোগণ্ড বালকের মাথায় যৌবনের উদ্দাম ভাবরাশি চাপাইবার চেষ্টা করিয়া শিশুহত্যা করিও না।

পাশ্চাত্য ভাব বাংলা দেশে প্রথম যখন প্রবেশলাভ করে, তখনকার অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। বাঙ্গালী জাতি শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি, তাই সহজেই নিজকে সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। আমরা এ ধাক্কা কবে পর্য্যন্ত হজম করিয়া উঠিতে পারিব, কে জানে? খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান, এক সঙ্গে, এক গ্রামে, এক পরিবারে বাস করে। সাহেবদিগকে [দেশী খ্রীষ্টান] প্রতি মুহূর্ত্তেই সজাগ থাকিতে হয় কি-জানি সাহেবত্ব চলিয়া যায়; আর অখ্রীষ্টান কুকিরা মিশনারীদের হাবভাব দেখিয়া এমন ভয় পাইয়া গিয়াছে যে, সাহেবত্বের ভয়ে নিজেরা এক পাও অগ্রসর হইতে চায় না। এক জন নিজের নাম, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম সমস্তই যাহাতে তাহার অসভ্য পিতা পিতামহের মত না হয় তাহার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, আর অপর জন নিজের পিতা পিতামহের আচার নিয়মের এক চুলও যাহাতে পরিবর্ত্তন না হয় তাহার জন্য সচেষ্ট। সাহেবেরা সংখ্যায় কুকিদের চেয়ে ঢের বেশী। সাহেবদের অধিকাংশই যুবক আর কুকিদের অধিকাংশই বৃদ্ধ। এই দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে পড়িয়া আমাদের সামাজিক জীবন ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে এ জাতির সংস্কারসাধন করাও মহা দুষ্কর।

আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের যে চিত্র মিশনারী মহাত্মারা প্রদান করেন, তাহা চমৎকার বটে। আমাদের সম্বন্ধে বলা ত স্বাভাবিকই। যে-সব ভারতীয় সুসভ্য জাতি জগতের আরও পাঁচটা জাতির সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেও মিশনারীরা কখনও কৃপণতা করিয়াছেন, এ অপবাদ তাঁহাদের শত্রুও দিতে পারিবে না। ভারতীয়গণকে জগতের সমক্ষে যত হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যাইবে, মিশনারীদের কার্য্য সম্বন্ধে জগৎ ততই উচ্চ ধারণা করিবে। আবার স্বর্ণখণ্ড, রৌপ্যখণ্ড আসিবার রাস্তাও অনেকটা পরিষ্কার হইবে। তাঁহাদের এই সুসংহত প্রচারের ফলে মিশনারীরা বহু পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা যথার্থ প্রেমিক, তাঁহারা পরের কতকগুলি দোষ বা কুসংস্কার লইয়া কখনও এত হৈচৈ করেন না। যে পরকে আপনার মত ভাল না বাসিতে পারে সে কখনও পরের দোষ সংশোধন করিতে পারে না। আবার পরের দৃষ্টি লইয়া অপরের গুণ বা দোষ সব সময় ঠিক ঠিক বুঝাও যায় না। এই পরের দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা অযাচিতভাবে সামাজিক কুসংস্কার দূর করিতে আসেন, তাঁহাদের উপকার প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যাচাররূপে বর্ষিত হয়। আমাদের অবস্থাও তাহাই। যে ভাবে আমাদের সংস্কার করা হইতেছে, তাহার শ্রী দেখিলে বলিতে হয়,—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

যাঁহারা হ্যাট কোট না পরে, তাহারাই উলঙ্গ আর যাহারা চার্চ্চে যায় না, ব্যাপটাইজড্ না হয়, বাইবেল মানে না, তাহারাই ধর্ম্মহীন। যদি কোনো মিশনারীর এইরূপ উৎকট ধারণা থাকে তবে তিনি আমাদিগকে কেন, বহু ভাল, সভ্য জাতিকেই উলঙ্গ, ধর্ম্মহীন বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমরা ধর্ম্মহীন, উলঙ্গ থাকি, মানুষের মাংস খাই, পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উদরসাৎ করি, এইরূপ বহু উৎকট ধারণা আমাদের সম্বন্ধে অনেকেরই আছে। আমাকে শত শত বার বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক এই সব প্রশ্ন করিয়াছেন। আমাদের সম্বন্ধে বাহিরের শিক্ষিত লোকের ধারণার জন্য মিশনারীগণই সম্পূর্ণ দায়ী কি না জানি না। আমরা একেবারে ধর্ম্মহীন কি-না পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন। উলঙ্গ থাকা সম্বন্ধে এই বলিতে পারি, আমি নিজে বহু বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর লোককে কোমরের সুতার সঙ্গে কাপড়ের একটা টুকরা

কৌপীনের মত পরিতে দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহারা খুব গরীব তাহারা এই রকম কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে। অন্যান্য সকলেই এর চেয়ে ঢের বেশী কাপড় ব্যবহার করে। কুকি কেন, একেবারে উলঙ্গ বা নরমাংসভোজী অন্য কোনো পার্ব্বত্য জাতিকে আমি কখনও দেখি নাই এবং এইরূপ আছে বা পূর্ব্বে কখনও ছিল এরূপ কথা কাহারও মুখে শুনিও নাই। পিতামাতার মাংস খাওয়ার কথা শুনিলে হাসিই পায়। প্রতি বৎসর শত শত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বাঁশ ও কাঠের জন্য পাহাড়ে যায়। তাহারা পাহাড়ীদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে ব্যতীত তাহাদের কাহাকেও কখনও কোনো পাহাড়ী লোক গলাধঃকরণ করিয়াছে এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না।

সামাজিক ব্যবস্থা

কুকিদের সমাজ সম্বন্ধে গত প্রবন্ধে কতকটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রতি গ্রামে একজন রাজা (সর্দ্দার), একজন পুরোহিত ও একজন কর্ম্মকার থাকেন। রাজা গ্রামস্থ প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করেন। এই প্রতিনিধিগণকে লইয়াই রাজা বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করেন এবং গ্রামের সমুদয় ব্যবস্থা করেন। রাজা যদি কোনো অন্যায় করেন, তবে তাঁহার বিচারের জন্য চতুষ্পার্শ্বের দশ-পনরটি গ্রামের রাজা এক এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি লইয়া সভা করেন এবং তাহাতে উক্ত রাজার বিচার হয়। অপরাধী রাজা যদি এই বিচার না মানেন তবে সকলে একযোগে তাহাকে একঘরে করেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে কোন নূতন লোক আসিয়া বাস করিতে চাহিলে গ্রামবাসীরা তাহার সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দেয়। যে পরিমাণ শস্য হইলে তাহার বৎসর চলিয়া যাইবে, গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সেই পরিমাণ শস্য তাহাকে দান করে। কে কি পরিমাণ শস্য দিবে তাহা রাজা ঠিক করিয়া দেন। যদি কোনো দৈব কারণে গ্রামস্থ কাহারও শস্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত উপায়েই তাহারও সম্বৎসরের ব্যবস্থা হইয়া যায়। ইহা দান, গ্রহীতাকে উহা ফেরৎ দিতে হয় না। গ্রামস্থ কোন লোক পীড়িত হইয়া চাষ করিতে না পারিলে গ্রামস্থ সমুদয় যুবক যুবতী একদিন গিয়া তাহার ক্ষেতের কাজ করিয়া আসে। বৎসরান্তে গৃহস্থকে একটি ভোজ দিতে হয় মাত্র। গ্রামের কাহারও ঘর করিতে হইলে গ্রামের সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া এক বা দুইদিনেই তাহার ঘর তৈয়ার করিয়া দেয়।

বিবাহ

বরের পক্ষ হইতে কন্যার বাড়ীতে ঘটক পাঠানো হয়। বিবাহে কন্যার পিতার মত হইলে, বরপক্ষ একখানা ছোট কোদাল ও শাড়ী লইয়া কন্যার ঘরে যায় এবং এক কলসী মদ খাওয়াইয়া বিবাহের দিন, দেনা-পাওনা ইত্যাদির কথা পাকাপাকি করে। তারপর শাড়ী ও কোদালখানা কন্যার পিতাকে দিয়া আসে। এই শাড়ী ও কোদাল গ্রহণ করার পর কেহ বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে না। যে পক্ষ ভঙ্গ করিবে, অপর পক্ষকে তাহার ৪০ টাকা অর্থ-দণ্ড দিতে হয়। উচ্চবংশের বিবাহে বরপক্ষ কন্যাকে ১২০ টাকা ও নিম্নশ্রেণীর বিবাহে ৮০ টাকা পণ দিতে হয়। পণের অর্দ্ধেক টাকার মধ্যে বর যাহা পারে বিবাহের দিন দিবে এবং বাকী টাকা কন্যার জীবিত-কালে আদায় করিতে হয়। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা কন্যার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায় হয়। কন্যার বাড়ীতেই বিবাহ হয়। বিবাহের দিন টাকা-পয়সার আদান-প্রদানের পর কন্যার পিতা কন্যাকে একটি বেতের বাক্স, একখানা শীতবস্ত্র, একটি চরকা এবং বস্ত্রবয়নের উপযোগী একখানা তাঁত দেয়। অলঙ্কারাদি যে যেমন পারে দেয়। তৎপরে আত্মীয়কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিতেরা ভূরিভোজন করেন। বিদায়ের সময় পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন,—গুরুজনেরা বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দেন।

সন্তানের জন্ম

ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলে জন্মের সপ্তম দিনে গ্রামের এক জন বৃদ্ধা আসিয়া নবজাত শিশুকে ঘর হইতে বাহির করেন। বাহিরে আসিবার সময় একখানা জলন্ত কাঠ

হাতে করিয়া লইয়া আসেন। শিশুর সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য মন্ত্রপাঠ করিয়া কাঠখানা মাটিতে রাখিয়া দেন। মেয়ের বেলায় পঞ্চম দিনে এই অনুষ্ঠান হয়। ইহার পর হইতে শিশুকে ঘরের বাহির করা হয়। এক মাসের পর হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে যে যখন পারে, সন্তানের নাম রাখে। সন্তানের মামা সন্তানের নাম রাখে। নামকরণ-উৎসবে ভোজন, নৃত্য, গীত ইত্যাদি হয়।

শ্রাদ্ধ

কুকিদের মধ্যে একমাত্র হ্রাংখল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই শবকে মাটিতে কবর দেয়। হ্রাংখলরা শব দাহ করে। শ্মশান বা কবরের স্থান গ্রাম হইতে একটু দূরে একটি পৃথক স্থানে করা হয়। মৃত্যুর এক মাস পরে প্রথম শ্রাদ্ধ, তিন মাস পরে দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ এবং এক বৎসর পরে শেষ শ্রাদ্ধ করিয়া মৃতের কাজ শেষ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ সংক্ষেপে হয়। বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ খুব বড় করিয়া করা হয়। যাহার যে প্রকার ক্ষমতা, সে সেই প্রকার খরচ তাহাতে করে।

ধর্ম্মানুষ্ঠান

কুকিরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। শিব, কালী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, চন্দ্র, সূর্য্য, বনদেবতা, সর্পদেবতা, পৃথিবী, রাম লক্ষণ, ভূতের পূজা ইত্যাদি কুকিদের মধ্যে প্রচলিত। বিভিন্ন দেবতার পূজা হইলেও এক ঈশ্বরই বিভিন্ন রূপে পূজা গ্রহণ করেন—এরূপ বিশ্বাস কুকিরা করিয়া থাকে। জগতের শুভ অশুভ দুই-ই এক ঈশ্বরের শক্তি হইতে আসে। ঈশ্বর সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন। কুকিদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বত্র সমানভাবে হয় না। আমাদের কোনো সাহিত্য নাই, ধর্ম্মগ্রন্থ নাই; কাজেই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ধর্ম্মের বিকাশের সুযোগ হয় নাই। কুকিদের মধ্যে পরকাল ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস দেখা যায়। প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক মন্ত্র আছে। প্রত্যেকের পূজা পৃথক পৃথক দিনে হয়। আবার কখন কখন শিবপূজার সঙ্গে বহু দেবতার পূজাও হয়। পূজাতে পশুবলি, গীত, নৃত্য, বাদ্য সবই হয়। পূজার মন্ত্রগুলি সবই আমাদের ভাষায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বেদের প্রণব ওঁ আমাদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের আদিতে আছে। বলা যায় না কখন হিন্দুধর্ম্মের একটি ক্ষীণ রশ্মি এই সব পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু দেবদেবীর পূজার মন্ত্র যাঁহারা জানেন তাঁহারা দেখিবেন, আমাদের মন্ত্রগুলি হিন্দু দেবদেবীর মন্ত্রের অনেকটা অনুরূপই বটে। নিম্নে শিবপূজার শিবের মন্ত্রের যথার্থ অনুবাদ দিলাম।—

"ওঁ শিব, (তুমি) সর্ব্বভূতে আছ, সোনাতে আছ, রূপাতে আছ, স্থলে আছ, জলে আছ, অশ্বে আছ, গজে আছ, বৃক্ষে আছ, প্রস্তরে আছ; তুমিই মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা, পশুর সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমি (যজমানের নাম) কে রক্ষা কর, মৃত্তিকার দূষিত বায়ু হইতে রক্ষা কর, দূষিত জল হইতে রক্ষা কর, মনুষ্য পশু হইতে নির্গত দূষিত বায়ু হইতে রক্ষা কর, দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা কর, তাহাদের অবস্থা উন্নত কর; তাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, তুমিই তাহাদের মাতা, তুমিই তাহাদের পিতা; শ্রান্ত পথিক যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহারা তোমার আশ্রয় লইয়াছে, বৃহৎ প্রস্তরের ন্যায় তোমার আশ্রয় লইয়াছে; (পরিবারস্থ) পুরুষগণ তোমার সেবক হইবে, তোমার অন্ন সংগ্রহ করিবে, তোমার খাদ্য সংগ্রহ করিবে, তোমার মদ্য সংগ্রহ করিবে; স্ত্রীগণ তোমারই বস্ত্র বয়ন করিবে, তোমার মদ্য প্রস্তুত করিবে,; সকল রোগ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা কর; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; অদ্য শুভ মাসে, শুভদিনে তোমার পূজা হইল, পূজার সামগ্রী অযোগ্য হইলেও যোগ্য বলিয়া গ্রহণ কর, আমার মন্ত্র অশুদ্ধ হইলেও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ কর; বাম হস্তের দত্ত বাম হস্তে গ্রহণ কর, দক্ষিণ হস্তের দত্ত দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর; যে যে-ভাবে তোমার ভজনা করে, তুমি সেই ভাবেই গ্রহণ কর বলিয়া অদ্য আমার ভাবে তোমার পূজা দিতেছি; মনুষ্য সন্তানগণের চক্ষু থাকিয়াও তোমাকে দেখিতে পায় না, নাসিকা আছে তোমার সুগন্ধ অনুভব করিতে পারে না, জ্ঞান আছে তোমায় বুঝিতে পারে না; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল বুঝিতেছি আমি সেই ভাবে তোমার পূজা দিতেছি; বলির পশু অযোগ্য হইলেও যোগ্য বলিয়া গ্রহণ কর; আমি যে-ভাবে তোমার পূজা করিলাম, অশুদ্ধ হইলেও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিও।"

ভূত ও সর্পপূজার জন্য আমাদের বদনাম আছে। হিন্দুদের নিকট এই সব পূজার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সর্পপূজা ভারতের বহুস্থানে প্রচলিত। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি বড় বড় পূজায় ভূতের পূজা আছে। ভূতগণ যাহাতে কোনো প্রকার বিঘ্ন না করে এইজন্য মাষভক্ত বলি দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পূজাস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলা হয়।

আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি। অসভ্য পিতা পিতামহের ধর্ম্মের নামে আমাদের হাসি পায়। আজকাল

আমরা আর কোনো দেবতা মানি না—কেবল পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য ভাবের বাহকগণই আমাদের একমাত্র উপাস্য। একমাত্র এই উপাস্যের উপাসনা ছাড়া আমরা আর কিছু করি না। মিশনারীগণ আমাদিগকে ভূতোপাসক বলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আমি ভূতোপাসক মনে করি না। তবে মিশনারীগণ কি মিথ্যা বলেন? নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে আমরা যথার্থই ভূতোপাসক। আমাদের ঘাড়ে আজ সত্যই ভূত চাপিয়াছে। এ বিপদে আমাদিগকে কে রাম নাম শুনাইয়া রক্ষা করিবে?

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমি আমার স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে এই বুঝিয়াছি,—এই সমাজের গতি যেমন আশু পরিবর্ত্তন করা দরকার, তেমনই দুষ্কর। কি ভাবে কুকিজাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তাহা পরে আলোচনা করিব।

হিন্দুসমাজ যুগে যুগে সকলকেই তাহাদের ন্যায্য স্থান দিয়া আসিয়াছে, সকলকেই নির্ব্বিচারে আশ্রয় দান করিয়াছে। হিন্দুসমাজ যদি আজ জীবিত থাকে তবে তাহার এই শক্তিও লোপ পায় নাই। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শিখ, জৈন, শৈব, গাণপত্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও আজ হিন্দু। আমাদের মত একটি নগণ্য জাতিকে আশ্রয়দান করিলে বিরাট হিন্দুসমাজের একবিন্দুও ক্ষতি হইবে না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, বালক তাহা জানে না। দু'হাতে আগুন ধরিতে যায়। যে আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, আমাদের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিতেছে, তাহাকেই মিত্র মনে করিতেছি, তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি। বালক আমরা, নির্ব্বোধ আমরা। দেখিলে, হায়! চক্ষে জল আসে। যাহারা একটু সজাগ হইয়াছে, তাহারাও দিশাহারা। দুঃখ, বলিতে জানে না, কাহাকে দুঃখ জানাইবে, বোঝে না। এই অনাদৃত, মূক সমাজের দু'টি কথা আমি দেশবাসীকে নিবেদন করিতে পারিলাম কি-না বলিতে পারি না।

স্থানাভাব

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

১

একটি গল্প।

"ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—রেখার বিয়ের রাত্রে।...

জ্যোৎস্না-রজনীর আবেশ-বিহ্বল স্নিগ্ধ চাহনির ছায়ায় ঘিরে ওর চাহনিও হয়ে উঠেছিলো—আবেশ-বিহ্বল।

ও ফিরে ফিরে আমার পানে চেয়েছিলো।

কেমন যেন হেসেও ছিলো!

আর—

সে-নয়নবাণাহত হৃদয় আমার—বাণবিদ্ধ কপোতেরই মত যেন—পড়লো লুটিয়ে, ওর সে-দৃষ্টির পায়ে—

—লুটপুট!

গল্পের নাম,—"হৃদয়ের শুক্তিপুটে সে-মুখখানি ফুটলো, ওগো ফুটলো—সোনার কাঠির পরশ পেয়ে ঘুমটা যখন টুটলো।" লেখক—শ্রীঅমুকবিহারী অমুক। আর পড়িবার ইচ্ছা হইল না, সম্পাদক মহাশয় পাণ্ডুলিপিখানি উল্টাইয়া নীল পেন্সিলের ধ্যাবড়া হরফে লিখলেন—"স্থানাভাব"।

গল্পের সঙ্গে টিকিট দেওয়া ছিল।

একটি দেড়-গজী কবিতা।

১

যুবন-গাঙে ভরা জোয়ার উঠলো ফুলে
সই লো সই,
নিটোল বুকের যুগল দোলায় দুলে দুলে
সই লো সই;
উদ্বেলিয়া উচ্ছ সিয়া কল্লোলিয়া
সই লো সই,

সব ভুলায়ে মন দুলায়ে দুলুবুলায়ে
সই লো সই।
২
যুবন-গাঙে—"

কবিতাটির নাম—'ত্রিদিবের সুধা'; লেখক—শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক। সম্পাদক মহাশয় কবিতাটি বাজে কাগজের ঝুড়ির অভাবে পৃথক করিয়া রাখিলেন।

কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। সেইজন্য 'মঞ্জরী'র নিয়মাবলীর মধ্যে ছাপা-হরফে লেখকদিগের প্রতি জানানই আছে--'কবিতার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।'

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, এ-স্থান 'মঞ্জরী'-কার্য্যালয় নহে, সম্পাদক মহাশয়ের আবাসবাটীর অভ্যন্তরস্থ শয়ন-গৃহ। কাল—রাত্রি। সম্পাদক মহাশয় আহারাদির পর আরামকেদারায় উপবেশনপূর্ব্বক আলবোলাসংযুক্ত গড়গড়ায় মৃগনাভিখচিত বিষ্ণুপুরী তামাক অভাবে কাঁচি-সিগারেট বসাইয়া তাহার ধূমপান করিতে করিতে 'মঞ্জরী'র জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত ছিলেন।

একটি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম—'সাহিত্যের শুচিব্যাধি'; লেখক শ্রীঅমুকনাথ অমুক।

সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধটি বার দুই তিন পাঠ করিলেন। লেখক বহু স্বনামধন্য প্রাচীন সাহিত্যিকের উক্তি উদ্ধার করিয়া, বহু বাস্তব প্রতিবেদন হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন,—সাহিত্যে অধুনা-বর্দ্ধিত শুচিব্যাধি কি ভাবে সাহিত্যের জীবনলক্ষণ বৈচিত্র্য ও বহুভঙ্গিম স্বচ্ছন্দবিকাশের গলায় পা দিয়া সাহিত্য-জগতে বাংলার আশু সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। বিধি-নিষেধ, বিশেষ রীতি ও ধর্ম্মের শৃঙ্খলে সাহিত্যকে বাঁধিতে গিয়া কি ভাবে যে সাহিত্যের জীবনমূলেই কুঠারাঘাত করা হইতেছে, তাহাই দেখাইতে গিয়া লেখক বিচক্ষণ চিন্তাশীলতার সাহায্যে অতীত যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদিগকে পাঠকের দর্শনক্ষেত্রে স্বীয় উদ্দেশ্যানুযায়ী ক্রমোনিয়মে পরের পর প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। পোপ, বোয়ালো, কর্ণেই, ওভিদ, কালিদাস, বাণভট্ট, পিউরিটান কবি মিল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের গল্স্‌ওয়ার্দ্দী,জোলা, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, শরৎচন্দ্রও তাহাতে বাদ যান নাই।

লেখকের নাম ইতিপূর্ব্বে কোথাও পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয়ের মনে পড়িল না; মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, বর্জ্জাইস অক্ষরে লেড্‌ আউট্ করিয়া ছাপিলেও প্রবন্ধটির আয়তন সাড়ে তিন গজের অনধিক হইবে না। তা'ছাড়া গবেষণার অনেক স্থান তাঁহার দুরধিগম্যও বটে। অতএব নীল পেন্সিলের মোটা হরফে—"স্থানাভাব"।

এখানিতেও টিকিট দেওয়া ছিল।

টিকিট-দেওয়া অমনোনীত রচনাগুলি হইতে টিকিট খুলিয়া লইয়া, তাহা নোট বহির ভিতর রাখিয়া সম্পাদক মহাশয় রচনার পিছনে লিখিয়া দেন 'স্থানাভাব'। এই 'স্থানাভাব' অঙ্কিত রচনাগুলি 'মঞ্জরী' কার্য্যালয়ের 'অফিশিয়াল প্রপার চ্যানেল' ঘুরিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে বেদম হইয়া লেখকের হাতে গিয়া উপস্থিত হয় তিন মাস, ছয় মাস কখনও বা বৎসরখানেকেরও পরে।

টিকিট না দেওয়া অমনোনীত রচনাগুলির অদৃষ্টে কিন্তু স্থানাভাব ঘটে না—অবশ্য, বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

২

গৃহিণী গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

—বলি, শুন্‌চো?

—না, এখনও শুনিনি, এবং না বললে শোনবার সম্ভাবনাও নেই।

শ্রীমতি নলিনী দেবী বিরক্ত হইলেন। হইবারই কথা।—নাও, মস্করা রাখ;—পাঁচ ছেলের বাপ হ'তে চললে—

—অতএব—

—থামো ঢের হয়েছে—বলিতে বলিতে একখানি কাগজ তিনি সম্পাদক মহাশয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিতেই, তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর মাত্র না দিয়া, যুগবৎ নীল পেন্সিল দিয়া কাগজটির পশ্চাদ্দেশে 'স্থানা ভাব' লিখিতে লিখিতে চসমার ফ্রেম ও ভ্রূর ফাঁক দিয়া আড়নয়নে শ্রীমতীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সম্পাদক মহাশয় কহিলেন—এ তো আর রান্না শেখা

নয় গিন্নি, এসব শিখতে হ'লে রীতিমত বিদ্যের দরকার।

শ্রীমতী নলিনী দেবী প্রায়ই লেখা দিয়া 'মঞ্জরী'কে অনুগৃহীতা করিতে চাহিতেন। কিন্তু অবিবেচক সম্পাদকপ্রবরটির অনুগ্রহে সে-চাওয়া কোনদিনই তাঁহার সফল হইত না। স্বর্গীয় হেমচন্দ্রের কবিতাংশ উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় রহস্যচ্ছলে কহিতেন—কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থলেখা সাধ।

যাহা হউক, আজিকার লেখাটি কিন্তু গল্প বা কবিতা কিছুই নহে; একখানি আদি ও অকৃত্রিম প্রেম-পত্র। কাজেই সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত কথায় বিরক্তিজনিত গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীমতী কহিলেন—পড়েই দেখো ছাই, আমার তো বাবু দেখে শুনে হাত-পা সেঁদুচ্চে পেটে।

গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, প্রাকৃত, সংস্কৃত, ইংরেজী অথবা অন্য কোন্ ভাষা হইতে এই 'সেঁদুচ্চে' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে?—রুট্ খুঁজিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় কথাটি নোট করিয়া লইলেন। পত্রটি খুলিয়াই কহিলেন—তাই তো—এ আবার কি!

শ্রীমতী শ্লেষযুক্ত কণ্ঠে কহিলেন—প্রেম-পত্তর গো, প্রেম-পত্তর, ও-বাড়ীর বিপ্‌নে ছোঁড়া দিয়েচেন তোমার রূপসী কন্যা মিনতিরাণীকে।

পত্রের নিম্নে স্বাক্ষরিত তিন অক্ষরের 'বিপিন' কথাটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সম্পাদক মহাশয়ের কল্প-নেত্রে ভাসিয়া উঠিল—একটি যোল সতের বছরের খস্‌খসে কিশোর মূর্ত্তি। সম্মুখের একটি দাঁত একটু ভাঙা, উচ্চ নাসিকা, কোটরগত চক্ষু, বড় চুল রাখিলে স্বীয় অভিভাবক কর্ত্তৃক হয়ত সে তিরস্কৃত হয় তাই ছোট চুলেরই সঙ্গে (আনুমানিক) এক ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মাথার স্থানবিশেষে সে-গুলি পশ্চাৎ দিকে ঈষৎ হেলিয়া থাকে, ঢিলা মালকোঁচা (লুঙ্গিও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়), কামিজের হাত গুটানো, গলার বোতাম খোলা, চলিবার সময় কাঁটাকাটির আগায় আলুরদমেরই মত মাথাটি মাঝে মাঝে টক্‌টক্ করিয়া নড়ে। কহিলেন—তা' বটে! কিন্তু দেখো নিলি, ও-মানে—হবেই। তুমি জানো না তাই!—আজকাল ছেলেমেয়েদের সকলেরই একটা ক'রে কিন্তু 'প্রাইভেট লাইফ্' থাকে।

—প্রেমে যদি পড়েই থাকেন, তো কিই বা আর করছি বলো?

শ্রীমতী সখেদে ও নাটকীয় স্বগত কণ্ঠে কহিলেন—মা গো,—একটুও যদি ছিরি আছে কথার!—প্রকাশ্যে কহিলেন—বলি, হ্যাঁ গা, মেয়েটাকে কি তা ব'লে তুমি গোল্লায় দেবে না কি?

—আহা-হা, গোল্লায় দেবো কেন? বিয়েই দেবো। সত্যিই যদি তিনি বিপিনের অনুরাগাসক্তা হয়ে থাকেন, তো খোঁজটোজ নিয়ে দেখো, আগামী বোশেখে একটা ভালো দিনটিন দেখে, দুই হাত না হয়—

—মরণ-দশা আমার! মিনি কেন প্রেমে পড়তে যাবে গো! ঐ বিপ্‌নে ছোঁড়াটাই ফচ্‌কেমী করতে—

অপঠিত পত্রখানা অতি অবজ্ঞাভরে অমনোনীত রচনার স্তূপের উপর নিক্ষেপ করিয়া সম্পাদক মহাশয় নিশ্চিন্তের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—যাক্, বাঁচালে প্রেয়সি!

চকিতে চারিদিক দেখিয়া লইয়া শ্রীমতী অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে কহিলেন—একঘর ছেলেমেয়ে, বুড়ো হ'তে চল্‌লে, এখনও—

বাধা দিয়া সম্পাদক মহাশয় কহিলেন,—বুড়ো! কি বলছো গিন্নি,—বুড়ো? তোমাদের রবিবাবু কি বলেছেন জানো?—(প্রায় বক্তৃতার সুরে) শরীর বুড়ো হয়ে গেলেও মনের মধ্যে একটা চিরতরুণ, একটা অনন্ত-কালের কবি, একটা সবুজ—মানে একটু কাছে সরে এসো প্রেয়সি, (জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া) ফাগুন মাস, আম-বকুলের গন্ধও ভেসে আসচে, তাও আবার দখিন হাওয়ায়! আর ঐ দেখো—ভাঙা চাঁদটাও নারকেল গাছটার পেছনে কেমন বেমালুম খাপ খেয়ে গেছে। ঐ, ঐ শোনো, কোকিল—

কোকিল নয়, একটা পাপিয়া।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিলেন—এত রঙ্গও জানো! কাগজ চালাও ব'লে এ্যাক্টো চালাতেও তো কিছু কম শেখনি!

(পত্রটার প্রতি চাহিয়া) তা' শিখেছো শিখেছো একটা হিল্লে কিন্তু ওর করতেই হবো বাবু।

৩

বিপনে অর্থাৎ পাশের বাড়ীর বিপিন মেট্রোপলিটানের সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়ে। অবশ্য আউট্‌বুক্‌স্ হিসাবে বহুদিন হইতে সে নভেল পড়াও সুরু করিয়াছে।

যাঁহারা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিতে ভালবাসেন, কিংবা প্রেমে পড়ার বঞ্চিত সৌভাগ্যজনিত গায়ের জ্বালা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা হয়ত বলিবেন—ঐ নভেল পড়া হইতেই বিপিনের প্রেমে পড়ার উৎপত্তি। লেখক কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, কেন-না, বিপিন তেমন ছেলেই নয়। পাঠক-পাঠিকারা না জানিতে পারেন, কিন্তু ঐ ও-বাড়ীর সুখেনের যোড়শী পিসি অমলা যেদিন সন্ধ্যায় ঝড়েরই মত বিপিনের ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ বিপিনের দুই হাত ধরিয়া বড় আকুল কণ্ঠে কহিয়া বসিল—"তুমি আমায় পাগল করেছ বিপিন-দা"—সেদিন সে কি মহত্ত্বের সহিত, কি অপূর্ব্ব সংযমের সহিত, কি মমতার সহিত যে অমলার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিল—"ছি, ওকথা কি বলতে আছে ভাই, আমি যে তোর দাদা হই!" অপরে না জানিতে পারে, কিন্তু সে-কথা তাহার 'ফ্রেণ্ড্-সারকেলের' (বন্ধু-মহলের) সকলেই জানে যদিও হতভাগা যোগেশটা বলে—কি একটা ফাজ্‌লেমী করিতে গিয়া অমলার নিকট হইতে ভালমাখা হাতের চড় খাইবার পর হইতেই কথাটা নাকি বিপিন সকলকে বলিয়া বেড়ায়।

এই বিপিনই একদিন দ্বিপ্রহরে ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে পাশের বাড়ীর সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা মিনতিকে দেখিয়াই (যদিও সে মিনতিকে ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই দেখিয়াছে) আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—জন্মজন্মান্তর ধরিয়া হৃদয়ের এক স্বপ্নপাগল যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে মিনতির প্রেমে পড়িয়া গেল।

সেইদিনই অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া, নানা মাসিকের পাতা উল্টাইয়া, একখণ্ড সাদা কাগজে অতি-আধুনিক ভাষায় মিনতির প্রতি প্রেম-নিবেদন করিয়া বিপিন এক পত্র রচনা করিয়া ফেলিল।

সে-পত্রে বসন্তের দীর্ঘশ্বাস, জ্যোছনার আকুল শিহরণ, মলয়ের কম্প্র স্বর, হৃদয়ের দুরু দুরু প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়িল না। এক কথায় বিপিনের মতে পত্রখানি এমনই 'এ্যাপীলিং' হইল, যে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন হৃদয়হীন তরুণী নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কি না এই হার্ট্-পেনিট্রেটিং (মর্ম্মভেদী) আবেদনটির হোপ্‌ফুল রেসপন্স্ (আশাপ্রদ উত্তর) না দিয়া স্থির থাকিতে পারে। অতঃপর অতি আনন্দিত চিত্তে, অতি-আধুনিক রীতিসম্মত উপায়ে পত্রখানি শেষ করিয়া সে লিখিল—"ইতি—তোমার কি জানি-কে।"

কিন্তু তখনই অতি দুঃখের সহিত তাহার মনে পড়িয়া গেল—ও-বাড়ীর মদ্‌নাটা রোজ সন্ধ্যায় ছাদে দাঁড়াইয়া হুম্ হুম্ করিয়া মুগুর ভাঁজে। তা ছাড়া নন্দীটাও চিলে-কোঠায় উঠিয়া রোজ ঘুড়ি উড়ায় বটে।—নাঃ, তাহাকে নামসই করিতেই হইল।

পাঠক-পাঠিকারা যাহাই বলুন, বিপিন কিন্তু বন্ধুদের শতাধিকবার বলিয়াছে, যে, সে ভীরু কাপুরুষ নহে; তাহার অভিসারগামী মন খিড়কী দরজা দিয়া প্রণয়িনীর অন্তঃপুরে গমনাগমন করে না, সদর দরজা দিয়া করে। অর্থাৎ সে চোর নয়, বীর প্রেমিক ইয়াং লকিনভারের মত বিবাহ-সভা হইতে প্রণয়িনীকে ছিনাইয়া লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিবার স্বপ্নও সে দেখিতে জানে। কাজেই নাম তো সহি করিলই, উপরন্তু পত্রের নিম্নদেশে পৃথক করিয়া তাহার পিতার নাম, এমন-কি বাড়ীর নম্বর-সম্বলিত ঠিকানাটাও লিখিয়া দিতে সে বিন্দুমাত্রও (?) ভীত হইল না।

—কি জানি, মাঝ হইতে মদ্‌নাটাই কি শে জিতিয়া যাইবে? গায়ের রংটাও তাহার বিপিনে চেয়েও আবার একটু ফ্যাকাসে।

৪

বাঙালীর সংসারে এক শ্রেণীর বালিকা দেখিত পাওয়া যায়, যাহারা ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী ধরিবার স

সঙ্গে নভেলও ধরিয়া ফেলে, এবং অচিরে যে-কোনো ছেলেরই সংস্পর্শে আসিয়া নিঃসংশয়ে অনুমান করিতেও আরম্ভ করিয়া দেয়, যে, নিশ্চয়ই ছেলেটি তাহার প্রেমে পড়িয়া গেছে।

মিনতি কিন্তু সে রকম মেয়ে নয়। নভেল পড়িলেও নভেল-পড়ার থার্ডক্লাস প্রতিক্রিয়া তাহার নাই। পিতার টেবিলের ধারে বসিয়া সে নভেল পড়ে, 'মঞ্জরী'র প্রুফ দেখার কাজে পিতাকে সাহায্য করে এবং ছাপাখানার ভূতের কৃপায় 'ঠাঁই'কে 'ঠাঁপ,' 'চুষি'কে 'ঘুসি' এবং 'কাঠি'কে 'লাঠি'র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়াও ওঠে।

এই মিনতি সেইদিন বৈকালে কাপড় তুলিবার জন্য উপর-দালান পার হইয়া রান্নাঘরের ছাদে আসিয়া দাঁড়াতেই দেখিল—একখানি ভাঁজকরা সাদা কাগজ উড়িতে উড়িতে তাহারই সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেখানা কুড়াইয়া লইয়া তাহার প্রথম সম্বোধন ছত্রটি ("হিয়াপ্রিয়া মধুময়ী মিনতি আমার") পাঠ করিতেই কৌতুকহাস্যে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া উপরের দিকে চাহিতেই দেখিল—ও-বাড়ীর বিপিনটা ছাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—আ-হা, কি রঙ্গই হয়েছে ছেলের!

বিপিনের অবস্থা তখন কাহিল। সৌভাগ্য তাহার যে, সে ছাদটার আলিসার উপর হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নতুবা নিশ্চয়ই মাথা ঘুরিয়া ঝুম্ করিয়া প্রণয়িনীর পায়ের তলাতেই অবলুণ্ঠিত হইয়া হয়ত বা তাহাকে ইহলোকের মায়াই পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকের মুসাফিরখানায় কড়িকাঠ গণিয়া মিনতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইত।

তা বিপিনের দোষ নাই। সুন্দরী মিনতির স্বপ্নময় সুন্দর চোখদুটির সেই সহাস চাহনিতে অনেক বর্ষীয়ানেরও অবস্থা যে বেমালুম ঘায়েল হইয়া পড়িতে পারে, এ-কথা লেখক হলফ করিয়া বলিতেও প্রস্তুত আছেন। বিপিন তো ছেলেমানুষ!

মিনতি পত্রখানা নষ্ট করিয়া ফেলিতেই চাহিয়াছিল; নিরর্থক গোলমাল করিয়া বেচারা বিপিনকে বিপন্ন করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। তাই তাহার দিদি অচলা মিনতির হাত হইতে ফস্ করিয়া পত্রখানা টানিয়া লইয়া বরাবর তাহার মা'র নিকট গিয়া উপস্থিত করিবার খানিক পরে মিনতিও মা'র সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—ওসব আমি পছন্দ করিনে মা, একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঘোঁট-পাকানো, বাবার কানে গিয়ে তোলা—

মধ্যপথেই বিস্ময়াভূত হইয়া মা কহিলেন—ওমা, কি হবে?

ইহার পর আর কথা বলা চলে না। মিনতি চুপ করিল, মা সেইদিনই রাত্রে কথাটা বাবার কানে গিয়া তুলিলেন।

দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর মিনতি একবার শুধু বাবার নিকট গিয়া বলিয়াছিল—চিঠিখানা নিয়ে আর গোলমাল কোরো না বাবা।

কন্যার মাথায় হাত দিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে, মা।

পরে অনেক সন্ধান করিয়াও সম্পাদক মহাশয় কিন্তু পত্রটা ঘরে খুঁজিয়া পান নাই।

৫

ওদিকে বিপিনের 'ফ্রেণ্ড-সারকেলে' রীতিমত এক চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। একদা সকলেই হিংসামিশ্রিত বিস্ময়সহকারে শ্রবণ করিল—পাড়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মিনতিরাণী পরমসৌভাগ্যবান্ বিপিনচন্দ্রের সহিত প্রেমে পড়িয়া গেছে। বিপিন এমনই সব 'অব্যর্থ' প্রমাণপত্রসহ সংবাদটা সকলের নিকট হাজির করিল, যে, পরম মিথ্যুক যোগেশটাকেও শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে হইল—"ভালই তো!"

ক্রমে বিপিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার সম্মান আপনা-আপনিই যেন 'ফ্রেণ্ড-সারকেলের' শীর্ষস্থানে গিয়া অধিষ্ঠিত হইতেছে। সকলেই বিপিনের সহিত বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠতম করিতে উন্মুখ, সকলেই চাহে সকলের কাছে

প্রমাণ করিয়া দিতে, যে, তাহারই সহিত বিপিনের ইন্‌টিমেসিটা (ঘনিষ্ঠতা) সব চেয়ে বেশী।

স্কুল হইতে ফিরিবার মুখে রূপণাটা তো সেদিন সগর্ব্বে নোন্‌টাকে বলিয়াই বসিল—"জানিস্‌? বিপিন আমাকে তার যে-সব 'প্রাইভেট্' কথা বলে, মরে গেলেও তোরা সে-সব কথা কখনও শুনতে পাবিনে।" অনুরোধে-উপরোধে হার মানিয়া শেষে রূপণার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বসিবার পর রূপণা নোন্‌টাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া—আর কাহাকেও কথাটা বলিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া—বলিয়া দিল, কি ভাবে কাল সন্ধ্যায় বিপিন আসিয়া তাহাকে বলিয়াছে, যে, কিছুক্ষণ আগেই ছাদে দাঁড়াইয়া মিনতি ঘাড় ফিরাইয়া বিপিনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে হাত দিয়া ইঙ্গিতে চুম্বন ছুঁড়িয়া দিয়াছে।

কথাটা শুনিয়াই নোন্‌টা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল—পুঃ, এই? বিপিন এর থেকেও ঢের বেশী প্রাইভেট কথা নোন্‌টাকে বলিয়া থাকে। কথা তো কথা, এমন-কি—দয়া করিয়া সে রূপণাকে জানাইল,—কি ভাবে পরশু সন্ধ্যায় সে বিপিনের পরামর্শমত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া একটি ঘরের জানালার কাছে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ঘরের ভিতর হইতে 'খুট' করিয়া একটা সঙ্কেত হইতেই জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইয়াছে—মিনতি নতজানু হইয়া দুই হাতে চেয়ারে উপবিষ্ট বিপিনের কোমর জড়াইয়া, তাহার মুখের দিকে বড় আকুল নয়নে চাহিয়া কহিতেছে —"রাজা আমার!"

দশ বারদিন অতীত হইবার পরও মিনতির নিকট হইতে কোনো 'হোপ্‌ফুল-রেসপন্স্' না পাইয়া মনে মনে বিপিন খুবই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাহার এ ভাবান্তর 'ঝানু-ছেলে' নৃপেনের লক্ষ্য এড়াইল না; একদিন গোপনে তাহার কারণ জানিতে চাহিয়া বিপিনকে চাপিয়া ধরিতে, বড় করুণকণ্ঠে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপিন কহিল—ভাই, জানি না কেন, মিনতি আমার উপর যেন অভিমান করেছে।

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া অর্থসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নৃপেন কহিল—হুঁ,—দেহি পদপল্লবমুদারম্‌!

বিপিনও মৃদু হাসিল।

তা নৃপেন মুখে যাহাই বলুক, বন্ধুর জন্য সে 'ফীল' করে। অন্যান্য বন্ধুদের ডাকিয়া সেইদিনই সে গোপনে সকলকে জানাইয়া দিল—বিপিনকে চোখে চোখে একটু 'গার্ড' করিতে হইবে; কি-জানি মনটা কখন একটু আন্‌-ব্যালেন্স্‌ড্ (বেসামাল) হইয়া পড়িলে হয়ত বা সে শেষে আত্মহত্যাও করিয়া বসিতে পারে।

৬

নৃপেনের অনুমান বাস্তবের কত দূর ঘেঁষিয়া চলে, তাহা দু-তিন দিনের মধ্যেই সকলে প্রত্যক্ষ করিল।

অর্থাৎ একদিন সন্ধ্যার পর মদনাদের স্বল্পালোকিত বৈঠকখানায়, ভিতর-পকেট হইতে একখানা চকচকে ছোরা বাহির করিয়া ধরিতেই, খাঁ করিয়া বিপিনের ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া নৃপেন স্নেহযুক্ত কণ্ঠে কহিল—না ভাই ছি, স্থির হও।

বিরহবিধুর বিপিন স্নানাহার ভুলিয়াছে (অর্থাৎ স্নান করে কিন্তু তেল মাখিতে ভুলিয়া যায়, আহারে বসে মাত্র), চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডল, ধূলিরুক্ষ কেশ, ক্ষীণ কণ্ঠে হাসিয়া কহিল,—পাগল হয়েচিস নেপু, আত্মহত্যা করা কি আর সহজ কথা ভাই? স্থির হয়ে বোস, একটা পরামর্শ করি, মন দিয়ে শোন্‌।

নৃপেন বিপিনের হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া ছোরাটার উপর সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল—বল্‌।

বিপিন ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল,—দেখ্‌, কাল ওরা (মিনতি) আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবে। আমি স্থির করেছি সুবিধে বুঝে এক সময় তাকে একটু নিরিবিলিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে, এই ছোরাটা হাতে দিয়ে বলবো—'দাও দাও—আমার বুকে বসিয়ে দাও—সকল হৃদয়-জ্বালার অবসান হোক্‌!' (নৃপেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবাবিষ্ট বিপিন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাহা লক্ষ্য

করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে লাগিল) ভয় নেই রে, ভয় নেই ; সে তেমন মেয়েই নয়। তবে কি জানিস, হয়ত সে ছোরাটা নিয়ে নিজের বুকেই ড্রাইভ (চালনা) করে দিতে পারে (নৃপেন পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। সাতজন্ম ভাবিলেও এমন রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। ইস্! মিনতির প্রেম কত গভীর, কত সুন্দর! কি অদ্ভুত মেয়ে ঐ মিনতি, মরি মরি, যেন মূর্ত্তিমতী প্রেম—ধন্য বিপিন, ধন্য তাহার অদৃষ্ট, ধন্য তাহার রোমান্স!)—বিপিন সগৌরব ও গদগদকণ্ঠে আপন মনেই যেন কহিয়া চলিল—এমনই অভিমানী মিনতি আমার! (ক্ষণেক থামিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) তাই ভাবছিলুম, তোকে আড়ালে কোথাও দাঁড় করিয়ে রাখবো ভাই, বিপদ বুঝলে একটা হুইসেলের তীব্র শব্দ করলেই তুই চক্ষের নিমেষে নক্ষত্রবেগে এসে মিনতির ছোরাসুদ্ধ হাতখানা খপ্‌ করে ধরে ফেল্‌বি।"

হুইসেল বাজাইয়া তাহাকে ডাকিবার আগে বিপিন নিজেই যে কাজটা সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে—মনটা রোমাঞ্চকর রোমান্স-অনুভূতির উচ্চতম স্তরে ইতিপূর্ব্বেই চড়িয়া বসায়—নৃপেন একথাটা আর ভাবিবার অবসরই পাইল না। গর্ব্বে ও আনন্দে সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। কথাটা সকলেই শুনিয়াছে,—সে মিনতির কোমলপেলব, সুন্দর, সুগোল, মধুর হাতখানি একবার ধরিতে পাইবে। সে কল্পনায় অভিভূত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৭

মিনতি আসিল, চলিয়াও গেল ; কিন্তু কিছুই হইল না। বিপিনের অকস্মাৎ সে সময় বাহিরে দরকার পড়ায় স্নানের ঘরে গিয়া খিল দিল এবং নৃপেন নীচেকার একটা ঘরে একখানা খোলা রেলওয়ে টাইম টেবলএর সম্মুখে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দেখিতে লাগিল—কোমল, পেলব, সুন্দর, সুগোল, নিতান্ত সুকুমার একখানি করকমল একটা ইস্পাত-কঠিন ছোরার সংস্পর্শে আসিয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় কেবলই যেন সঙ্কুচিত এবং আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে।

কথাটা যথাসময়ে, অর্থাৎ তাহার পরদিনই সন্ধ্যায় মদনাদের বৈঠক-গৃহে বসিয়া 'ফ্রেণ্ড সারকেলের' সকলেই শুনিল।

ফোক্‌রে ওরফে ফকিরচন্দ্র প্রায়ই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। অর্থাৎ 'দক্ষিণ জানালার ধারে', 'সিঁড়ির পাশে', 'তিনটে টোকা' 'পাঁচবার হাততালি', 'আবেস্তা', 'ভ্যালাটিন্' ইত্যাদি বাক্য সম্বলিত, বিভিন্ন তরুণীকে লিখিত, বিশেষ গোপনীয় পত্র আনিয়া 'ফ্রেণ্ড সারকেলে'র মধ্যে মাঝে মাঝে পাঠ করে। সব শুনিয়া কহিল—রেখে দাও না বাবা, তোমার প্রেম ভিতর-পকেটে তুলে। 'মঞ্জরী'-সম্পাদকের রূপসী কন্যা মিনতি-রাণী প্রেমে পড়লেন কি না শেষকালে আমাদের গোপাল বিপিনচন্দরের সঙ্গে! মরণ নেই আর কি!

মদনা মহাবীরের চেলা। বয়স প্রায় কুড়ি একুশ হইবে। একসারসাইজ করে, অতএব ক্ষুধা বাড়াইবার জন্য ভাঙের গুলিও মাঝে মাঝে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। নিত্যকার বৈঠকে সে কথা কহে খুব কম ; শুধু মাঝে মাঝে তালু ও জিহ্বার সাহায্যে ঘোড়া হাঁকাইবার মত একপ্রকার চ্যাক চ্যাক শব্দ করিয়া বলে—"হুঁ হুঁ ব্বব্বা, ইয়ারকী?" গালে হাত দিয়া মেয়েলী ঢঙে কহিল—"তাই না তাই, ওমা, কোথায় যাই। (সহজ কণ্ঠে) আমাদের ঝামা-বোলানো অদৃষ্টে কি বাবা প্রেমে পড়া রোমান্স জোটে? (খেম্‌টাউলীদের মত ঘাড় নাড়িয়া কোমল ও বিচিত্র সুরে)—

সেই হাতে হাতে ঠেকা
তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে দেখা
গোপন হৃদয়-কোণে মৃদু শিহরণ?

বিপিন, নৃপেন এবং হৃদয়বান্ধব ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

হৃদয়বান্ধব, ওরফে রিদে, মদনার সমবয়সী। মেট্রোপলিটনের ম্যাট্রিক্ ক্লাসে তিন বৎসর থাকিয়া অভিজ্ঞতার মূল্য সঞ্চয় করিতেছে। তা ছাড়া সে স্বদেশী করে, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মোটা মোটা ইংরেজী বই প্রায়ই তাহার বগলে দেখিতে পাওয়া যায় (যদিও ফোক্‌রে ষ্টুপিড্‌টা ফাজলেমি করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' বানান করিতে বলে)। উপরন্তু

প্রমাণ করিয়া দিতে, যে, তাহারই সহিত বিপিনের ইন্‌টিমেসিটা (ঘনিষ্ঠতা) সব চেয়ে বেশী।

স্কুল হইতে ফিরিবার মুখে রূপ্‌ণাটা তো সেদিন সগর্ব্বে নোন্‌টাকে বলিয়াই বসিল—"জানিস্? বিপিন আমাকে তার যে-সব 'প্রাইভেট্‌' কথা বলে, মরে গেলেও তোরা সে-সব কথা কখনও শুনতে পাবিনে।" অনুরোধে-উপরোধে হার মানিয়া শেষে রূপ্‌ণার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বসিবার পর রূপণা নোন্‌টাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া—আর কাহাকেও কথাটা বলিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া—বলিয়া দিল, কি ভাবে কাল সন্ধ্যায় বিপিন আসিয়া তাহাকে বলিয়াছে, যে, কিছুক্ষণ আগেই ছাদে দাঁড়াইয়া মিনতি ঘাড় ফিরাইয়া বিপিনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে হাত দিয়া ইঙ্গিতে চুম্বন ছুঁড়িয়া দিয়াছে।

কথাটা শুনিয়াই নোন্‌টা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল—পুঃ, এই? বিপিন এর থেকেও ঢের বেশী প্রাইভেট কথা নোন্‌টাকে বলিয়া থাকে। কথা তো কথা, এমন-কি—দয়া করিয়া সে রূপণাকে জানাইল,—কি ভাবে পরশু সন্ধ্যায় সে বিপিনের পরামর্শমত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া একটি ঘরের জানালার কাছে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ঘরের ভিতর হইতে 'খুট' করিয়া একটা সঙ্কেত হইতেই জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইয়াছে—মিনতি নতজানু হইয়া দুই হাতে চেয়ারে উপবিষ্ট বিপিনের কোমর জড়াইয়া, তাহার মুখের দিকে বড় আকুল নয়নে চাহিয়া কহিতেছে—"রাজা আমার!"

দশ বারদিন অতীত হইবার পরও মিনতির নিকট হইতে কোনো 'হোপ্‌ফুল-রেসপন্স্‌' না পাইয়া মনে মনে বিপিন খুবই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাহার এ ভাবান্তর 'ঝানু-ছেলে' নৃপেনের লক্ষ্য এড়াইল না; একদিন গোপনে তাহার কারণ জানিতে চাহিয়া বিপিনকে চাপিয়া ধরিতে, বড় করুণকণ্ঠে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপিন কহিল—ভাই, জানি না কেন, মিনতি আমার উপর যেন অভিমান করেছে।

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া অর্থসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নৃপেন কহিল—হুঁ,—দেহি পদপল্লবমুদারম্‌!

বিপিনও মৃদু হাসিল।

তা নৃপেন মুখে যাহাই বলুক, বন্ধুর জন্য সে 'ফীল' করে। অন্যান্য বন্ধুদের ডাকিয়া সেইদিনই সে গোপনে সকলকে জানাইয়া দিল—বিপিনকে চোখে চোখে একটু 'গার্ড' করিতে হইবে; কি-জানি মনটা কখন একটু আন্‌-ব্যালেন্স্‌ড্‌ (বেসামাল) হইয়া পড়িলে হয়ত বা সে শেষে আত্মহত্যাও করিয়া বসিতে পারে।

৬

নৃপেনের অনুমান বাস্তবের কত দূর ঘেঁষিয়া চলে, তাহা দু-তিন দিনের মধ্যেই সকলে প্রত্যক্ষ করিল।

অর্থাৎ একদিন সন্ধ্যার পর মদনাদের স্বল্পালোকিত বৈঠকখানায়, ভিতর-পকেট হইতে একখানা চকচকে ছোরা বাহির করিয়া ধরিতেই, ধাঁ করিয়া বিপিনের ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া নৃপেন স্নেহযুক্ত কণ্ঠে কহিল—না ভাই ছি, স্থির হও।

বিরহবিধুর বিপিন স্নানাহার ভুলিয়াছে (অর্থাৎ স্নান করে কিন্তু তেল মাখিতে ভুলিয়া যায়, আহারে বসে মাত্র), চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডল, ধূলিরুক্ষ কেশ, ক্ষীণ-কণ্ঠে হাসিয়া কহিল,—পাগল হয়েচিস নেপু, আত্ম-হত্যা করা কি আর সহজ কথা ভাই? স্থির হয়ে বোস্‌, একটা পরামর্শ করি, মন দিয়ে শোন্‌।

নৃপেন বিপিনের হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া ছোরাটার উপর সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল—বল্‌।

বিপিন ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল,—দেখ্‌, কাল ওরা (মিনতি) আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবে। আমি স্থির করেছি সুবিধে বুঝে এক সময় তাকে একটু নিরিবিলিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে, এই ছোরাটা হাতে দিয়ে বলবো—'দাও দাও—আমার বুকে বসিয়ে দাও—সকল হৃদয়-জ্বালার অবসান হোক্‌!' (নৃপেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবাবিষ্ট বিপিন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাহা লক্ষ্য

করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে লাগিল) ভয় নেই রে, ভয় নেই ; সে তেমন মেয়েই নয়। তবে কি জানিস, হয়ত সে ছোরাটা নিয়ে নিজের বুকেই ড্রাইভ (চালনা) করে দিতে পারে (নৃপেন পুনরায় শিহরিয়া উঠিল। সাতজন্ম ভাবিলেও এমন রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। ইস্! মিনতির প্রেম কত গভীর, কত সুন্দর! কি অদ্ভুত মেয়ে ঐ মিনতি, মরি মরি, যেন মূর্ত্তিমতী প্রেম—ধন্য বিপিন, ধন্য তাহার অদৃষ্ট, ধন্য তাহার রোমান্স!)—বিপিন সগৌরব ও গদগদকণ্ঠে আপন মনেই যেন কহিয়া চলিল—এমনই অভিমানী মিনতি আমার! (ক্ষণেক থামিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) তাই ভাবছিলুম, তোকে আড়ালে কোথাও দাঁড় করিয়ে রাখবো ভাই, বিপদ বুঝলে একটা হুইসেলের তীব্র শব্দ করলেই তুই চক্ষের নিমেষে নক্ষত্রবেগে এসে মিনতির ছোরাসুদ্ধ হাতখানা খাঁ করে ধরে ফেলবি।"

হুইসেল বাজাইয়া তাহাকে ডাকিবার আগে বিপিন নিজেই যে কাজটা সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে—মনটা রোমাঞ্চকর রোমান্স-অনুভূতির উচ্চতম স্তরে ইতিপূর্ব্বেই চড়িয়া বসায়—নৃপেন একথাটা আর ভাবিবার অবসরই পাইল না। গর্ব্বে ও আনন্দে সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। কথাটা সকলেই শুনিয়াছে,—সে মিনতির কোমলপেলব, সুন্দর, সুগোল, মধুর হাতখানি একবার ধরিতে পাইবে। সে কল্পনায় অভিভূত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৭

মিনতি আসিল, চলিয়াও গেল ; কিন্তু কিছুই হইল না। বিপিনের অকস্মাৎ সে সময় বাহিরে দরকার পড়ায় স্নানের ঘরে গিয়া খিল দিল এবং নৃপেন নীচেকার একটা ঘরে একখানা খোলা রেলওয়ে টাইম টেবলএর সম্মুখে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দেখিতে লাগিল—কোমল, পেলব, সুন্দর, সুগোল, নিতান্ত সুকুমার একখানি করকমল একটা ইস্পাত-কঠিন ছোরার সংস্পর্শে আসিয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় কেবলই যেন সঙ্কুচিত এবং আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে।

কথাটা যথাসময়ে, অর্থাৎ তাহার পরদিনই সন্ধ্যায় মদনাদের বৈঠক-গৃহে বসিয়া 'ফ্রেণ্ড সারকেলের' সকলেই শুনিল।

ফোক্‌রে ওরফে ফকিরচন্দ্র প্রায়ই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। অর্থাৎ 'দক্ষিণ জানালার ধারে', 'সিঁড়ির পাশে', 'তিনটে টোকা' 'পাঁচবার হাততালি', 'আবেস্তা', 'ভ্যালেন্টিন্' ইত্যাদি বাক্য সম্বলিত, বিভিন্ন তরুণীকে লিখিত, বিশেষ গোপনীয় পত্র আনিয়া 'ফ্রেণ্ড সারকেলে'র মধ্যে মাঝে মাঝে পাঠ করে। সব শুনিয়া কহিল—রেখে দাও না বাবা, তোমার প্রেম ভিতর-পকেটে তুলে। 'মঞ্জরী'-সম্পাদকের রূপসী কন্যা মিনতি-রাণী প্রেমে পড়লেন কি না শেষকালে আমাদের গোপাল বিপিনচন্দরের সঙ্গে! মরণ নেই আর কি!

মদনা মহাবীরের চেলা। বয়স প্রায় কুড়ি একুশ হইবে। একসারসাইজ করে, অতএব ক্ষুধা বাড়াইবার জন্য ভাঙের গুলিও মাঝে মাঝে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। নিত্যকার বৈঠকে সে কথা কহে খুব কম ; শুধু মাঝে মাঝে তালু ও জিহ্বার সাহায্যে ঘোড়া হাঁকাইবার মত একপ্রকার চ্যাক চ্যাক শব্দ করিয়া বলে—"হুঁ হুঁ বব্বা, ইয়ারকী?" গালে হাত দিয়া মেয়েলী ঢঙে কহিল—"তাই না তাই, ওমা, কোথায় যাই। (সহজ কণ্ঠে) আমাদের ঝামা-বোলানো অদৃষ্টে কি বাবা প্রেমে পড়া রোমান্স জোটে? (খেম্‌টাউলীদের মত ঘাড় নাড়িয়া কোমল ও বিচিত্র সুরে)—

সেই হাতে হাতে ঠেকা
ভীরু চোখে চেয়ে দেখা
গোপন হৃদয়-কোণে মৃদু শিহরণ?

বিপিন, নৃপেন এবং হৃদয়বান্ধব ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

হৃদয়বান্ধব, ওরফে রিদে, মদনার সমবয়সী। মেট্রোপলিটনের ম্যাট্রিক্ ক্লাসে তিন বৎসর থাকিয়া অভিজ্ঞতার মূল্য সঞ্চয় করিতেছে। তা ছাড়া সে স্বদেশী করে, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মোটা মোটা ইংরেজী বই প্রায়ই তাহার বগলে দেখিতে পাওয়া যায় (যদিও ফোক্‌রে ষ্টুপিড্‌টা ফাজলেমি করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' বানান করিতে বলে)। উপরন্তু

তাহার কণ্ঠে "ভইস্" আছে; টেবিল অভাবে বাঁ হাতের চেটোয় মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত ঠুকিয়া সকল প্রসঙ্গেই সে জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে পারে—"কেবল থিয়োরী আর বক্তৃতায় কিছুই হইবে না, প্র্যাক্‌টিস চাই প্র্যাক্‌টিস,—প্র্যাক্‌টিকাল্ না হইলে অভাগা জাতির অদৃষ্টে স্বরাজ—"

বিশ্ব-ফাজিল ফোক্‌রেটা একদিন খামখা রিদেকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছিল—"হ্যাঁরে, সকলকে যে খদ্দর পরতে ব'লে বেড়াস, তুই নিজে তো কক্ষনো পরিস না?" রিদে বলিয়াছিল—"কেন-না, আমি ভণ্ডামীকে ঘৃণা করি। খদ্দরের প্রতি যে আমার শ্রদ্ধা আছে, খদ্দর প'রে লোককে তা দেখিয়ে বেড়ানকে আমি—হঁ্যা,—ভণ্ডামী ও ধৃষ্টতারই পরিচায়ক ব'লে মনে করি।" নাছোড়বান্দা 'রাসকেল' ফোক্‌রেটা ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিয়াছিল—"তাহ'লে ন্যাসেন্যাল ফ্লাগটাকে (জাতীয় পতাক) খদ্দরের বানিয়ে একটা ক'রে নমস্কার ঠুকে কংগ্রেস-প্যাণ্ডেলে ঢুকলেই তো লোকে পারে? বেচারা গান্ধীকেও তাহ'লে আর চরকা, খদ্দরের জন্যে বাঙালীদের গালাগাল খেতে হয় না?" আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া রিদে বলিয়াছিল—"এই তর্ক করে করেই তো দেশটা গেল!—কেবল থিয়োরী আর থিয়োরী!'

এই রিদে অর্থাৎ হৃদয়বান্ধবও বিপিনের জন্য 'ফীল' করে। ফোক্‌রের ব্যঙ্গোক্তি, মদনার সভঙ্গিম কবিতা-আবৃত্তি এবং সকলের হাসিতে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া সে ক্রোধযুক্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—"বুঝলে? তোমরা সিদ্ধি টেনে বসে ওখানে কবিতাই ওড়াও আর থিয়োরী চালাও। সাধ করে কি দেশটার—"

উত্তেজিত রিদের মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা সজোরে টেবিলের বুকে বসিয়া পড়িতে ছুটিল; কিন্তু হায়, মধ্যপথে টেবিল-ল্যাম্পটার উত্তপ্ত চিম্‌নিটা হাতে ঠেকিতেই 'উঃ' বলিয়া হাতটা সরাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ বহু কণ্ঠের 'হাঁ! হাঁ!' শব্দ ও প্রসারিত হস্তের ঠেলাঠেলি সত্ত্বেও ল্যাম্পটা গড়াইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে সব অন্ধকার এবং স্তব্ধ!

বিপিনের হঠাৎ ভাবিতে আনন্দ হইল,—দুইটি বিপরীতগামী ট্রেনে যেন কলিসন্ লাগিয়াছে। একটা প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, সমবেত কণ্ঠের আতঙ্ক রোল, গোলমাল, লণ্ডভণ্ড—তারপর সব অন্ধকার।......ভাঙা গাড়ীর স্তূপীকৃত লোহালক্কড়ের তলায় একটা বড় সুন্দর মধুভার যেন তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিতেছে—"বিপিন প্রি-য়-ত-ম!"

বিপিন গদগদকণ্ঠে কহিল—"মিনতি প্রি-য়-ত-মে!

৮

"ওগো, তোমার একখানা কি সরকারী চিঠি এয়েছে দেখ।"

বিপিনের মা বিপিনের পিতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্রের ঘরে ঢুকিলেন; আর ঢুকিল—বিপিনের দিদি বিপিনের বোন, বিপিনের ভাইঝি—সরযূ, অণিমা, খুকী। ঢুকিয়া মহেশচন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীর হাত হইতে একখানা লম্বা খাম লইয়া তিনি কহিলেন—"এযে দেখচি 'মঞ্জরী' আপিস থেকে এসেচে!" খুলিয়া একটা সাদা কাগজ টানিয়া বাহির করিতেই সকলের চোখে পড়িল—নীল পেন্সিলের মোটা হরফে লেখা—"স্থানাভাব"। কাগজটির ভাঁজ খুলিয়াই তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন—হিয়া-প্রিয়া মধুময়ী মিনতি আমার"—

"দূর ছাই, ব্যাটারা—"

তা বিরক্ত হইবার কথাই। মেয়ে, নাতনী ...

মহেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর ঠাকুমা, পিসিমারা সব চিঠিখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, দাদাবাবু আবার ঘরে ঢুকিয়া পত্রটা লইয়া গেলেন, 'মিনতি মঞ্জরী' আরও কত-কি-সব কথা হইল খুকী ভাল বুঝিতে পারিল না। দ্বিতীয় ভাগটা পড়া থাকায় মোটা হরফের "স্থানাভাব" কথাটা সে আগেই পড়িয়া লইয়াছিল, এখন পিসীমাদের মুখে একাধিকবার তাহার মেজ-কাকা বিপিনের নামটাও শুনিল। ব্যস্, তাহাই যথেষ্ট! মহানন্দে সে বিপিনের খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

ব্যর্থপ্রেমিক উদাসী বিপিন তখন ছাদের আলিসার উপর বসিয়া ব্যর্থপ্রেমিকের সনাতন রীত্যনুযায়ী দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরিয়া যায় বিপিনের দেশ-ভ্রমণ আর শেষ হয় না। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়, তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জলাশয় হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করে। এমনই করিয়াই তাহার দিন যায়।

হঠাৎ একদিন। এক ঘন-জলদজালাচ্ছন্ন বাদল সন্ধ্যায় বৃষ্টিবাত্যাবিতাড়িত হইয়া সুদূর দেশের এক গৃহস্থ কুটীরের বহিরলিন্দে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহাকে অতিমাত্রায় চকিত ও বিস্মিত করিয়া দিয়া "বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজচেন কেন, ভিতরে এসে দাঁড়ান," বলিয়া স্বপ্নাতীত সম্ভাবনায় বিদ্যুদ্দীপ্তিরই মত মিনতি আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। কোলে তাহার একটি শিশু-সন্তান, সিঁথিতে সিঁদুর। স্বীয় হস্তস্থিত প্রদীপের ক্ষীণরশ্মি প্রতিফলিত বিপিনের সুন্দর (?) মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই "এ কি, বিপিন-দা!" বলিতে বলিতে হস্তস্থিত দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গে মিনতির সর্ব্বাঙ্গ কঁাপিয়া উঠিল; প্রদীপ ও শিশুটিকে মাটিতে বসাইয়া বিপিনের পাদমূলে প্রণতা হইয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অতঃপর বিপিনও যথারীতি এ করুণ দৃশ্যে আপনাকে আর সংবরণ করিতে না পারিয়া কোথায় নিঃশব্দে বৃষ্টি-বাত্যাবিক্ষুব্ধ রাজপথের সূচিভেদ্য অন্ধকারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাইবে—না—কোথা হইতে পোড়ারমুখী খুকীটা দুপ্‌দাপ করিয়া ছাদে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিতান্ত বেরসিকেরই মত কহিয়া বসিল—"মেজকা, মেজকা, তোমার স্থানাভাব এয়েচে।"

*　　*　　*

তাহার পর কি ঘটিয়াছিল ঘটনাচক্রেই তাহা আর জানিতে পারা যায় নাই, তবে বিপিন আর কখনও যে কাহারও প্রেমে পড়ে নাই, এ-কথা লেখক বিশ্বস্তসূত্রেই অবগত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ

কলিকাতা

…মেয়েরা নিয়ম মানবে না এ কখনো হতে পারবে না, কিন্তু সকল ভদ্র নিয়মই তারা নিজের অন্তরের ভদ্রতা থেকেই গ্রহণ করবে এইটেই আমি প্রত্যাশা করি। ছাত্রীদের প্রতি আমার একান্ত বিশ্বাস ও সর্ব্বান্তঃকরণের স্নেহ আছে।… শুচিতা ও শোভনতার আদর্শ মেয়েদের অন্তরের জিনিষ, চিরদিন আমি এই সংস্কারকেই মনে রেখেচি। এইজন্যই বাইরের শাসন অতি কঠিন করে আমি তাদের অসম্মান করতে বেদনা পাই। কিন্তু ওরা নিজের স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মলতার নিয়মসংযম নিজেই উজ্জ্বলিত তপস্যার দ্বারা রক্ষা করবে এইটে যেন ওদের কেবল কর্ত্তব্য না হয় যেন হয় আনন্দময় স্বধর্ম্ম।

[ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষালাভ ও অবস্থান নিয়ে যাঁদের মনে উদ্বেগ হয়, তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—]

…দুর্ভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে তাঁরা দুই একটি আমেরিকান বই নিয়ে আলোচনা করচেন। একটা কথা তাঁরা ভুলে যান যে, পশ্চিম মহাদেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে যে বিপ্লব ঘটবে, বিদ্যালয়ে তার আরম্ভ নয়। সেখানে সমস্ত সমাজে সম্প্রতি এসম্বন্ধে নীতি-বিপর্য্যয় ও রীতি-বিকার ঘটেচে।

সেখানে দেখতে দেখতে সমাজের ভিত্তি বদলে যাচ্চে—কোথায় পৌঁছবে কেউ বল্‌তে পারবে না। সেখানকার ব্যবহার ও চিত্তবৃত্তি দিয়ে এখানকার অবস্থার বিচার চলে না। চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে মেয়েদের মনে বহু-কালের যে আদর্শ সংস্কারগত হয়ে গেছে আমাদের দেশে এখনো তার মূলে আঘাত পড়েনি, অবশ্য আমাদের স্বভাবের মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই একথা বলা অত্যুক্তি, কিন্তু তাকে নিয়ে বাইরে থেকে যত অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি করতে যাব ততই সেটা ব্যাধিতে এসে দাঁড়াবে। এই সংশয়কে অগ্রাহ্য করার দ্বারাই এ'কে বিনাশ করা যায়। পরস্পরকে বিশ্বাস করার দ্বারাই সমাজের হাওয়া নির্ম্মল হয়। একথা কখনোই সত্য নয়, যে, তুর্কিস্থানের কড়া পাহারার আড়ালেই মেয়েদের মনের শুচিতা রক্ষিত হয়; ঠিক তার উল্টো। যাকে বিশ্বাস করিনে সে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়; যতই অযোগ্য হয় ততই বাঁধন আরো কড়াক্কড় করতে হয়। মানবচরিত্রের স্খলন প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে সর্ব্বত্রই আছে, ভিতরে তার উত্তেজনা আরো বেশি। বস্তুতঃ আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্ব্বলতা ও নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের পরেই দাবী রাখতে হবে, দরোয়ানের পরে নয়। যারা চরিত্রকে দেউড়ির পাহারার জিম্মায় রাখতে চায় তারা গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার ব্যবস্থা করে। সংশয়-কণ্টকিত বেড়ার বাহুল্য করতে গেলেই ভিতরে ভিতরে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে পশুর কোঠায় ফেলা হয়। আমি মেয়েদের স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি; এইজন্য তাদের আমি সন্দেহের চোরা-কুঠরির মধ্যে পৃথক রাখতে দেখলে ব্যথা পাই। যদি কখনো চাঞ্চল্যের কোনো দুর্নিবার লক্ষণ কারো মধ্যে দেখা দেয় তবে ধৈর্য্যের সঙ্গে স্নেহের সঙ্গে তাকে অন্তরের দিক থেকে নির্ভর দিতে হবে। যেখানে সে পশু সেখানে শাসন করে কোনো ফল হয় না, যেখানে সে মানুষ সেখানেই তাকে জাগরূক করতে হয়। তা করতে গেলেই পশুর প্রতি সংশয়ের চেয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই বেশি কাজে লাগে। এই কাজে চাই চিরসহিষ্ণু অনুকম্পা।

খোলা বাতাসে কোনো কোনো অতি দুর্ব্বলকে রোগে ধরে—তাই বলেই নিখিলের পক্ষে বদ্ধ বাতাসই নিরাময় ও নিরাপদ বলে গণ্য করতে পারিনে। খোলা বাতাসেই ব্যাধির বিরুদ্ধে শরীর সুদৃঢ় হয়। মেয়েদের আন্তরিক আত্মগৌরব আমরা যেন কিছুতেই দুর্ব্বল না করি। যাক্—এ সব কথা বিশেষ করে বার-বার করে বলার দরকার হয় তার কারণ বাহ্যিক আশুফললাভের লোভে আমরা আভ্যন্তরিক সফলতাকে প্রায় নষ্ট করে ফেলি। ইতি ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

[শ্রীমতী আশা দেবীকে লিখিত]

—•—

বার্লিন

ভারতবর্ষের যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার পঙ্গুতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়ে ছেলেরা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য—কিন্তু জীবিকার জন্যে শিক্ষা মেয়েদের তেমন অপরিহার্য্য হয়নি। এইজন্য বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিদ্যাদানের উৎকৃষ্ট প্রণালী মেয়েদের জন্যেই প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর। যদি করে তুলতে পারি তবে এবারকার মতো এইটেই আমার শেষ সার্থকতা হবে।

ভানুসিংহের পত্রাবলী সেদিন আমার হাতে এসে পৌচেছে। পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারদিকে মূর্ত্তিমান্ হয়ে উঠ্‌ল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তি-নিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। নিজের কীর্ত্তি নিয়ে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, তবু সত্যের খাতিরে বল্‌তেই হচ্চে, এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাক-ঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়—আর কালের যে-সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছু দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল, পত্রাবলী তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। দাদুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌচেছে। ইতি ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

[শ্রীমতী ভক্তি দেবীকে লিখিত]

বার্লিন হইতে ডাকে প্রেরিত

...বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিষ

আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্যেই আসল জিনিষকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানিনে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ-দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার ক'রে এবং প্রণাম ক'রে যাব আমার জীবন-দেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে, তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয় রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানাভাবে দেশে গিয়ে পৌছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারিনে ব'লে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বার-বার মনে হয়, বাণপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। ইতি ২৬ আগষ্ট, ১৯৩০

[শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

সাইমন কমিশনের কবুল

[প্রবাসী-সম্পাদককে লিখিত একখানি চিঠি]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

অতলান্তিক মহাসাগর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেচি, চলেচি আমেরিকার পথে। রাশিয়া-যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কি রকম চলচে আর ওরা তার ফল কি রকম পাচ্চে সেইটে অল্পসময়ের মধ্যে দেখে নিতে চেয়েছিলুম।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্চে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্ব্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেচে।* সে হচ্চে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখেনি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায় তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেচে ব'লে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়—কেবলি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, ক্ষিধে পায় কিন্তু খাবার কোথায়

* তাহাও স্পষ্ট ভাষায় নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক

আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত—অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না তারপরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি, তাহলে সেটা কেমন হয়? ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েচে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেচে, ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেচে, নিজেরই ধর্ম্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব্ব করে রেখেচে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায় —এ সমস্ত দূর হল কি করে? বাইরেকার কোনো কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার-সাধনের ভার দেওয়া হয়নি, একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েচে, সে হচ্চে ওদের শিক্ষা। জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্প কালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েচে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে, বর্ত্তমান তুরুস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয়নি,—যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধদ্বারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করিনি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েচি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টম্সন্ অতি করুণস্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েচেন। আমাকেও মানতে হয়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায়নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত। এই তো হোলো ওদের দশা,—বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্য্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েচে—রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায়নি—ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা—তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেচে তার "ডিফিকাল্টি" ভারত-কর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকাল্টির চেয়ে বহু গুণে বড়ো। অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হোত। কিই বা জানি কিই বা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে! আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। Law and order কি পরিমাণে রক্ষিত হচ্চে বা না হচ্চে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাইনি—শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তি আছে, বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে, আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হোলো চাঁদের কলঙ্কের দিক কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য্য—যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেচে। শোনা যায়

য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেচে—এখানে তাই হোলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্চে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ। আমাদের সম্রাট-বংশীয় খৃষ্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্টিস্ যে কি রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কো আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না। প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হোলো—এতকাল আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছি। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন, যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্ত্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হোলো এই—সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশ-বিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

যাই হোক এদেশের "এনর্ম্যাস্ ডিফিকাল্টিজে"র কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্টিজ অতিক্রমের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি ৪ অক্টোবর, ১৯৩০।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩৭)

মঙ্গলবার দুপুরে রেঙ্গুনে ইংলিশ মেল ষ্টীমার আসিয়া পৌঁছায়। অন্য ষ্টীমারগুলি চার দিনের দিন পৌঁছায়, এটি সে জায়গায় তৃতীয় দিনে আসে; এই জন্য যাহাদের তাড়াতাড়ি থাকে তাহারা ইংলিশ মেল ষ্টীমার ধরিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই কারণে এই জাহাজটিতে অসাধারণ ভীড় হয়।

আজ মঙ্গলবার, বেলা প্রায় তিনটা। জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। গাড়ী, মোটর, রিক্শ, কুলি মজুর ও যাত্রীদের অভ্যর্থনাকারীর দল মিলিয়া এমন একটা ভীড় এবং কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে যে, পারতপক্ষে সেখানে কেহ দাঁড়াইতে বা কান পাতিতে চায় না। জাহাজ চোখে দেখা যাইতেছে বটে, তবে এখনও ঘাটে ভিড়ে নাই।

বাহিরে একখানি মোটরে নিরঞ্জন বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক ও বিষণ্ণ, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতেছিলেন।

খানিক পরে মুখ তুলিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন,

"আর একবার গিয়ে দেখে এস, জাহাজ ভিড়তে কত দেরি। আমার এক ঘণ্টার মধ্যে একবার আপিসে না গেলেই চল্‌বে না।"

ড্রাইভার আবার জেটির ভিতরের দিকে চলিল। কিন্তু সে ফিরিয়া আসার আগেই জাহাজের সিঁড়ি নামানোর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কুলি এবং জনতার চীৎকার নিরঞ্জনকে জানাইয়া দিল যে, জাহাজ ভিড়িয়া গিয়াছে। তিনি মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন, সঙ্গে একটি মান্দ্রাজী ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহার জিম্মায় গাড়ী রাখিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মাঝ-পথে ড্রাইভারকেও ফিরিয়া যাইতে দেখিলেন।

আজ ইন্দুর আসিবার কথা, সঙ্গে কলিকাতা হইতে এক জন বিখ্যাত চিকিৎসকও আসিতেছেন। ইনি সকল প্রকার স্নায়বিক রোগের বিশেষজ্ঞ। রেঙ্গুনের চিকিৎসকগণ যখন মায়ার অসুস্থতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন নিরঞ্জন বহু অর্থব্যয়ে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকটিকে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মায়াকে এই অবস্থায় লইয়া যাওয়াও কঠিন, এবং লইয়া গেলে নিরঞ্জনেরও সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। বারে বারে কাজ ফেলিয়া কলিকাতায় গিয়া বসিয়া থাকিলে কাজের বড়ই ক্ষতি হয়, সেইজন্য কলিকাতা যাইবার চেষ্টা আর করেন নাই।

যাত্রীরা যেখানে নামে, বাহিরের লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হয় না। কাঠগড়ার বাহিরে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, যাত্রীরা নামিবার ছাড়পত্র সমর্পণ করিয়া তাহার পর কাঠগড়া পার হইয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে পারে। নিরঞ্জন রেলিং-এর কাছে আসিয়াই জাহাজের ডেকের উপর ইন্দুকে দেখিতে পাইলেন। সে ব্যগ্র হইয়া জনতার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে কেহ লইতে আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্যই বোধ হয়। তাহার পাশেই এক জন খদ্দর-পরিহিত যুবক দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। আর কাহারও ত আসিবার কথা ছিল না? জাহাজে ইন্দু ইহার সহিত আলাপ করিয়াছে তাহাও সম্ভব নয়। হিন্দুঘরের মেয়ে সে, হাজার বয়স হইলেও কখনও নিজে অগ্রসর হইয়া অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিবে না। পরিচিত কেহ হইলে নিরঞ্জনও তাহাকে চিনিতেই পারিতেন। ডেক-যাত্রীর ঠেলাঠেলি একটু কমিতেই ইন্দু এবং সেই যুবকটি নামিয়া আসিলেন। চিকিৎসক ডাক্তার মিত্রের সহিত নিরঞ্জন সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন না; কাজেই তিনি আসিয়াছেন কি না, এবং নামিয়াছেন কি না, তাহা নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না।

কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেই ইন্দু রেলিং-এর ওপাশ হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদা, মায়া এখন কেমন আছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "প্রায় একই রকম। তবে এখন নাইচে খাচ্ছে। আসল রোগ যা তা ত কিছু সারবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ মিত্র এসেছেন?"

ইন্দু ও তাহার সঙ্গী যুবকটি ছাড়পত্র জাহাজ-ঘাটের কর্ম্মচারীর হাতে সমর্পণ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। কুলি তাহাদের জিনিষপত্র আনিয়া গাদা করিয়া এক জায়গায় রাখিতে লাগিল। ইন্দু এতক্ষণ পরে নিরঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "না, ডাঃ মিত্র এর পরের ষ্টীমারে আসছেন, শুক্রবারে এসে পৌঁছবেন। আমার সঙ্গেই আসছিলেন, কলকাতায় খুব জরুরী ডাক এল একটা, তাই আসতে পারলেন না। ভাগ্যে প্রভাস আসছিল, তাই তার সঙ্গে আসতে পারলাম, নইলে আমাকেও আটকে থাকতে হত।"

যুবক অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন এতক্ষণে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ও তুমি প্রভাস! এত বছর আগে তোমাকে দেখেছি যে, মোটেই চিনতে পারিনি। তা বেশ, তোমায় দেখে খুব খুশী হলাম। মায়া যদি শীগ্‌গির সেরে ওঠে, তাহলে তোমাদের কাজকর্ম্মের কথাও হতে পারবে।"

প্রভাস বলিল, "মায়ার অসুখের কোনো কথাই আমি শুনিনি। আগে যেমন ঠিক ছিল, সেই অনুসারে আসা ঠিক করে কলকাতায় এসেছিলাম, নিতান্ত পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ব'লেই এ কথা শুনলাম। তখন টিকিট কিনে ফেলেছি আর পিসীমাও আসবার

সঙ্গী পাচ্ছেন না দেখে চলেই এলাম। নইলে এখন না এসে মায়া সারবার পরে এলেও চলত।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এসেছ, ভালই হয়েছে। আশা ত করছি মায়া শীগগির সেরেই উঠবে। আর লোকের অভাবে ইন্দুর আসা না হ'লে, আমাকে বড় মুস্কিলে পড়তে হ'ত। ওকে দেখ্‌বার শুন্‌বার কেউ নেই, মাইনে-করা লোকের হাতে ভরসা করে বাড়ী থেকে বেরতেও পারি নে। তারা সব বোঝেও না, কোন্ অবস্থায় কি করতে হবে, কিছু না বুঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকে।"

ইন্দু বলিল, "তা ত হবেই। বাঙ্গালী ঝি-চাকর হলেও বা কথা ছিল, এরা ত কথাই বুঝবে না অর্দ্ধেক। তা চল গাড়ীতে গিয়ে বসা যাক্। যা ভীড়, এর ভিতর দাঁড়াতেই কেমন একটা অসোয়াস্তি লাগে। প্রভাস আমাদের সঙ্গে যাবে ত?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার বাড়ী ছাড়া ও আবার কোথা যাবে? ও ত ঘরেরই ছেলে।"

মান্দ্রাজী ভৃত্য একটা ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া আনিল। তাহাতে করিয়া জিনিষপত্র সব চাকরের সহিত চালান করিয়া দেওয়া হইল। নিরঞ্জন, ইন্দু এবং প্রভাস বাড়ীর গাড়ী করিয়া রওনা হইলেন।

ইন্দু গাড়ী ছাড়িতেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ার কি অসুখ তা' ত ভাল করে লেখনি কিছু চিঠিতেও। টেলিগ্রাম থেকে ত কিছুই বোঝা যায় না। খুব কি ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না সে রকম কিছু নয়। একবার মাত্র মূর্চ্ছা হয়েছিল, সেটা ভাঙতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙার পর থেকে কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে আছে, কাউকে চিন্‌তে পারছে না, কোনো কথা মনে আন্‌তে পারছে না।"

ইন্দু ভীতভাবে বলিল, "ও মা, সে কি কথা! তোমরা ত ও সব মান না, কিন্তু গাঁয়ের লোকে শুনলে বল্‌বে ভূতে পেয়েছে। খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে ত ঠিক মতন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া করছে বটে, তবে ঠিক স্বাভাবিকভাবে নয়। সবকিছু নিয়েই গোলমাল করছে। ঝি-চাকর কারও ছোঁওয়া কিছু খেতে চায় না, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতে চায় না। বামুন ঠাকুর একটা আছে, তাই রক্ষা, সে-ই খাবার-টাবার এনে দিচ্ছে, অন্য সব কাজ নিয়েই হয়েছে মুস্কিল।"

ইন্দু বলিল, "এতদিন কে চিকিৎসা করছিলেন? তাঁরা কি বলেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এখানকার সব ডাক্তারকে ত দেখালাম। কেউ বিশেষ কিছু বল্‌তে পারে না। সেই জন্যেই ডাঃ মিত্রকে আনাচ্ছি।"

বাড়ী পৌঁছিতে অনেকক্ষণ লাগিল। ইন্দু বলিল, "বাগানটা ত খুব বাহারের হয়েছে দেখ্‌ছি।"

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সব মায়ার নিজের হাতে করা। কত জায়গা থেকে যে ফুলগাছ আনিয়েছিল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এর পর সব অযত্নে নষ্ট হবে আর কি।"

চাকর-বাকর আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল। নিরঞ্জন ছোক্‌রাকে বলিলেন, "আপিস-ঘরের পাশের ঘরে এই বাবুর জিনিষপত্র সব নিয়ে রাখ্। একটা খাট সেখানে পেতে দে। তুমি আসবে তা ত জানা ছিল না প্রভাস, কাজেই ভাত এখনই পাবে না। জলটল খাও, ইন্দু ত রান্না করবেই, তখন তুমিও খেয়ো। বামুন-ঠাকুরের রান্না রাত ন'টার আগে কিছুতেই আজকাল আর হয় না।"

ইন্দু বলিল, "বেলা পড়ে এল, এখন আবার রান্না করে পিণ্ডি গিলতে বস্‌তে পারব না। সন্ধ্যার পর জলটল খাব এখন। সঙ্গেই ফল, মিষ্টি অনেক আছে। প্রভাসকে ভাল করে চা খাইয়ে দিও এখন, তারপর ঠাকুরের রান্না যখন হয় খাবে। কাল থেকে সব ঠিক কর্‌তে হবে, একজন মেয়েমানুষ সংসারের মাথায় না থাক্‌লে চাকর-বাকর কখনও ঠিক করে কাজ করে না।"

প্রভাস বলিল, "কি আশ্চর্য্য! আমার খাওয়াটা এমন একটা কি ব্যাপার যার জন্যে সবাই এত ব্যস্ত হচ্ছেন? ষ্টীমারে আমি একবার খেয়েওছি, এর পর যখন হয় খাব। বিদেশে কাজ করি, সারাক্ষণ আমার

নাওয়া-খাওয়া দেখবার জন্তে কে বসে থাকে? কতদিন ত না খেয়েই কেটে যায়।"

ইন্দু বলিল, "সেখানে কাটে ব'লে কি এখানেও কাট্‌বে? যাও, এখন হাতমুখ ধোও গিয়ে। ও কি দাদা, তুমি আবার এখনি বেরবে না কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমায় একটু আপিসে যেতে হবে, শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। চল, একবার উপরে মায়াকে দেখে আসবি।"

ইন্দু বলিল, "ওমা সত্যি, যার জন্তে এলাম, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, নীচে দাঁড়িয়ে বাজে বক্‌ছি। চল, চল।"

প্রভাস তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল, নিরঞ্জন ইন্দুকে লইয়া মায়ার কাছে চলিলেন।

মায়ার শয়নকক্ষের বাহিরে বুড়ী আয়া বসিয়াছিল। সে কাছে গেলে মায়া এখন চটিয়া ওঠে, কাজেই ঘরের ভিতর সে বড় একটা যায় না। কিন্তু একজন স্ত্রীলোক রোগিণীর কাছাকাছি থাকা দরকার, সুতরাং বেশীর ভাগ সময় সে ঘরের বাহিরে বসিয়া থাকে।

ঘরের সাজসজ্জা প্রায় আগের মতই আছে; তফাতের মধ্যে এককোণে মেঝের উপর একটা সাদাসিদা বিছানা পাতা, তাহার উপর মায়া শুইয়া আছে।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা, মাটির উপর শুয়ে কেন? অসুখ শরীরে আবার ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে একখানা কাণ্ড করুক। খাটে শোয়াওনি কেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কিছুতেই ওকে শোয়ান যায় না। কি যে সব বলতে আরম্ভ করে, অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না। ওর কোনো কারণে ধারণা হয়েচে, এটা হাসপাতাল, তাই সব তাতেই তার ভয় আর আপত্তি। তুই ব'লে দেখ না একবার, যদি কথা শোনে।"

ইন্দু ডাকিল, "মায়া, মায়া!"

মায়া ঘুমায় নাই, এমনিই চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুর ডাকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল, "কেগা? কেন ডাকছ?"

ইন্দু বলিল, "ওমা, আমায় চিনতে পারছিস না? পিসীমাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলি?"

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। ইন্দুকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "তাই ত, পিসীমাই ত! কি করে এখানে এলে?"

ইন্দু বলিল, "তোর অসুখ শুনে দেশ থেকে এলাম দেখতে। এখন কেমন আছিস?"

মায়া বলিল, "আছি ত ভালই এক রকম। কিন্তু এখানে সব তাতে বড় অসুবিধে। সব ছোঁয়া-নেপা করে একাকার করে রাখে, বড় ঘেন্না করে। এত জায়গা থাকতে হাসপাতালে কেন যে আমাকে নিয়ে এল, এখানে কি হিন্দুর মেয়ে টিকতে পারে?"

ইন্দু অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এ যেন সেই সাত-আট বৎসর পূর্ব্বের মায়া, যাহাকে লইয়া সে প্রথমে রেঙ্গুনে আসিয়াছিল। সব তাতেই তাহার ভয়, সব তাতেই তাহার বিতৃষ্ণা। জীবনের মাঝখান হইতে আটটা বৎসর তাহার কেমন করিয়া মুছিয়া গিয়াছে। শিক্ষিতা বাকপটু মায়া আর নাই, তাহার স্থলে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাপন্ন বালিকা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিরঞ্জন বলিলেন, "সারাক্ষণই এই ধরণের কথা বলে। কি যে ব্যাপার ভাল ক'রে বুঝতেই পারছি না। এখানকার ডাক্তাররাও কেউ কিছু বলতে পারছে না। ডাঃ মিত্র এলে কিছু যদি বলতে পারেন।"

নিরঞ্জন যদিও কথাগুলি ইন্দুকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছিলেন, তথাপি মায়া তাহা শুনিতে পাইল। খানিকটা যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "বাবার এক কথা। নিজে দেশ ছেড়ে, ধর্ম্ম ছেড়ে সাহেব হয়েছেন ব'লে সবাই তাই হবে না কি? আমাকে সুদ্ধ কোথায় এনে তুল্‌লেন দেখ না! যত-সব ম্লেচ্ছ কারখানা। এ খাটে কত মানুষ শুয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। আর রাশ-রাশ যত ফিরিঙ্গী-আনার কাপড়-চোপড়। এসব অন্যের পরা জিনিষ আমি কেন পরব? এতে কি আচার থাকে? কত কষ্টে আমার বাক্সটা খুঁজে বার করেছি জান না। আমার যা কাপড় আমি তাই পর্‌ছি।"

ইন্দু লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মায়ার কথাই ঠিক। শুধু যে সে মাটিতে বিছানা করিয়া শুইয়া আছে তাহা নয়, কাপড়-চোপড়ও পরিয়াছে পাড়াগাঁয়ের

ধরণে। একখানা লালপেড়ে শাড়ী এবং একটা লেশ-বসান পুরাতন সেমিজ ভিন্ন তাহার গায়ে কিছুই নাই। সেমিজটা তাহার বহু পূর্ব্বের সম্পত্তি, রেঙ্গুন আসিবার সময় সে গ্রামের দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "কোন্ কালের এক পুরনো বাক্স ওর ড্রেসিং-রুমের কোণে পড়েছিল, সেটাকে টেনে এনেছে। তার ভিতর যত ছেঁড়া কাপড় ছিল, সব বার করে পরছে। তুই পারিস ত ওকে একটু বোঝা, আমি আপিসের কাজ সেরে আসি।"

ইন্দু মায়ার পাশে বিছানায় বসিয়া বলিল, "মায়া, উঠে তোর খাটে শো দেখি। এটা হাসপাতাল কেন হতে যাবে, এ ত মেজদার বাড়ী? তোর জন্যে এত ক'রে ঘরদোর সাজিয়েছে, এত কাপড়-জামা করিয়েছে, তুই কিছু ব্যবহার করবি না?"

মায়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমার প্রবৃত্তি হয় না, পিসিমা, কেমন যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। বাবা যে কিছু বোঝেন না। তিনি ধর্ম্ম ছেড়েছেন ব'লে সবাই কি তা ছাড়বে? হিন্দুর মেয়ে আমরা, ধর্ম্মই হ'ল আমাদের আসল জিনিষ।"

ইন্দুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এ যেন পরলোকগতা সাবিত্রীই তাহার কন্যার মুখ দিয়া কথা বলিতেছে। নিরঞ্জন তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে বিদেশী সভ্যতার আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সাবিত্রী কি লোকান্তরে থাকিয়াই এমনি করিয়া প্রতিশোধ লইতে বসিল?

বহুকাল পূর্ব্বে সে মায়াকে যেমন করিয়া বুঝাইতে বসিয়াছিল, আজ আবার তেমনি করিয়া বুঝাইতে বসিল। বলিল, "তাত বটে, তাই ব'লে কি বাপ-ভাইয়ের মনে কষ্ট দিতে হবে? হিন্দুর মেয়ের আসল ধর্ম্ম ভালবাসার ধর্ম্ম। যারা ভালবাসার পাত্র তাদের জন্যে সব করতে পারা উচিত। একটু চাল-চলন বদলালে তোর বাপ যদি খুসি হন, তা কেন তুই পারবি না? এটা সত্যি কিছু হাসপাতাল নয়, এ সব জিনিষপত্র সব তোর জন্যেই তৈরি করা, কেউ আগে ব্যবহার করেনি। এ সব নিলে, তোর কোনো আচারের ত্রুটি হবে না। আমি ত হিন্দুর ঘরের বিধবা, আমার চেয়ে ত আচার-বিচারের খুঁটিনাটি তুই ভাল বুঝিস না? আমি বলছি তোর কোনো অন্যায় হবে না। তুই খাটে উঠে শো দেখি, আমিও তোর সঙ্গে শোব এখন। খাওয়া-দাওয়া ত তোর বামুনেই জোগাড় করে দেয়, তবে আর মুস্কিলটা কি? আর এ ছেঁড়া কাপড়খানা ছেড়ে ফেল, আল্‌মারী থেকে ভাল কাপড়-জামা বার করে দিই, প'রে বোস্। চুলগুলো বাঁধ, এমন করে শরীর নষ্ট করিস্ নে। বাপের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ আছে কি?"

মায়া খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "কি জানি পিসিমা, ঠিক কিছু বুঝতে পারি না। বাবার মনে কষ্ট দেওয়া ঠিক না, কিন্তু মাকেই কি ভুলে যাওয়া উচিত? তিনি কত দুঃখ পেয়ে গেলেন, স্বামীশুদ্ধ তাঁকে ত্যাগ করলেন, তবু ত তিনি ধর্ম্ম ছাড়েন নি।"

ইন্দু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "থাম্ থাম্, আর ভট্‌চায্যির মত বক্তৃতা দিতে হবে না। মা ভারি কীর্ত্তিই করেছেন। আজন্ম স্বামীকে জ্বালান বুঝি ভারি ভাল? হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর মেয়ে ক'রে বড় যে ফড়্‌ফড়ি করিস্, হিন্দুর ছেলেমেয়ে মা-বাপের জন্যে কি না করেছে? রাজ্য ছেড়েছে বনে গেছে। রামের গল্প পড়েছিস্, পুরুর গল্প পড়েছিস্? একটু খাটে উঠে শোওয়া আর একখানা ফর্‌সা কাপড় পরতেই তোদের প্রাণ বেরিয়ে যায়?"

মায়া অশ্রুপূর্ণ চোখে ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা আমি খাটে উঠে শুচ্ছি, কাপড় ছাড়ছি। কিন্তু ওসব সায়া, জ্যাকেট আমি পরব না এখন। একটা সেমিজ আর শাড়ী দাও। কিন্তু আমার মায়ের নামে অমন করে বোলো না। তোমরা তাঁকে দেখতে পারতে না, কিন্তু তিনি আমার মা ত।"

ইন্দু আলমারী খুলিয়া কাপড়জামা বাহির করিতে করিতে বলিল, "দেখতে পারব না কেন? সে কি আমাদের পর ছিল? তবে অন্যায় দেখলে বলব না?

এই নে, এই কাপড়, জামা তোর পছন্দ হয় ?" মায়া বলিল, "আচ্ছা দাও।" ইন্দুর সাহায্যে কাপড়চোপড় বদলাইয়া সে খাটে উঠিয়া শুইল। ইন্দুর আদেশে বুড়ী আয়া মেঝের পাতা বিছানাটা উঠাইয়া লইয়া গেল।

(৩৮)

প্রভাস রেঙ্গুনে আসিয়া মহা ফাঁফরে পড়িয়াছিল। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল, তাহা হওয়া এখন অসম্ভব। মায়া এখন পর্য্যন্ত সারিবার কোন লক্ষণই দেখায় নাই। ইন্দু একদিন প্রভাসকে উপরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার নাম শুনিবামাত্র মায়া মুখ লাল করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল, কিছুতেই তাহাকে প্রভাসের দিকে ফিরান গেল না। অগত্যা প্রভাস নামিয়া আসিল, তাহার পর আর মায়ার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। নিরঞ্জন তাহাকে মায়ার গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে খাওয়া-শোওয়া বাদে বাকী সব সময়টাই বেড়াইয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু ইহাও তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত না, একলা একলা আর কাঁহাতক্ ঘোরা যায় ? সঙ্গে যাইবার কেহ নাই, বাড়ীর সকলেই বিষণ্ণ, বিব্রত, গল্প করিবার সময় পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। অজয় দু-একবার প্রভাসের সঙ্গে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারও পরীক্ষার বৎসর, বেশী সময় সে নষ্ট করিতে সাহস করিত না।

চলিয়া যাইতেও প্রভাস পারিতেছিল না। কিছু কাছের দেশ নয়, একবার ফিরিয়া গেলে আবার কবে যে আসিতে পারিবে, তাহার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই। অথচ মায়ার এই ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করার উপরে তাহার সমস্ত মন পড়িয়াছিল। অন্য অনেক গ্রামে সে এই সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইয়াছে, নিজেদের গ্রামেই এতদিন অর্থের অভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন একটা সুযোগ তাই চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিতে তাহার মন উঠিতেছিল না। মাসখানেক ছুটি তাহার ছিল, যদিই ইহার মধ্যে মায়া সারিয়া ওঠে, এই ভরসাই সে করিতেছিল।

আজ শুক্রবার, কলিকাতার ডাক্তার আসিবার কথা। নিরঞ্জন চা খাইয়া, তাঁহাকে আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইন্দু বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেছিল। প্রভাস চা খায় না, সে জলযোগ শেষ করিয়া বসিয়া খবরের-কাগজ পড়িতেছিল।

ছোক্‌রা এমন সময় আসিয়া খবর দিল, "হুজুর, ব্যারিষ্টার সাহেব।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এই কাম্‌রামে লে আও।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "তুই যাস্‌নে, ছেলেটি আমাদের আত্মীয় হবার খুব সম্ভাবনা আছে, যদি ভগবান্ দয়া করেন।"

বিবাহের নামগন্ধ পাইলে কৌতূহলী না হয় এমন নারী জগতে দুর্লভ। ইন্দু আবার বসিয়া পড়িল। প্রভাস নিরঞ্জনের কথায় খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিতে লাগিল। হাঁ, দেখিবার মত চেহারা বটে, রূপে অন্ততঃ মায়ার উপযুক্ত পাত্রই হইবে। দেবকুমার নিকটে আসিতেই নিরঞ্জন বলিলেন, "এই যে। কাল সারাদিন এসনি যে ?"

দেবকুমার বলিল, "বড় কাজের চাপ পড়েছিল, সেই জন্যে আসতে পারিনি। বাবার আবার জ্বর এল, তাঁকে দেখ্‌বার কেউ ছিল না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আজ কেমন আছেন ?" দেবকুমার বলিল, "এখন ত বেশ ভালই দেখে এলাম।"

নিরঞ্জন ইন্দুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই মায়ার পিসী, মঙ্গলবারের ষ্টীমারে এসেছেন।"

দেবকুমার যদিও সাহেব সাজিয়াই আসিয়াছিল, তবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ইন্দুকে অবনত হইয়া প্রণাম করিল। ইন্দু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "বেঁচে থাক বাবা, যেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, তেমনি কপাল হোক্। তুমি আমাদের আপনার জন হবে শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে, এখন ঠাকুরের কৃপায় মেয়েটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠলেই হয়।"

দেবকুমার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বিশেষ ভাল আশীর্ব্বাদ করলেন না, পিসিমা, আজকালকার দিনে রাজপুত্রদের যা কপাল, তা বেশী লোভনীয় নয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা বটে। আচ্ছা দেবকুমার বোসো, আমি একবার হোয়াফে যাচ্ছি, ডাঃ মিত্রকে আন্‌তে। যদিও কি ক'রে তাঁকে চিন্‌ব জানি না, তিনিও আমাকে কখনও দেখেন নি।"

দেবকুমার উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। ডাঃ মিত্রকে আমি চিনি, বিলেত যাবার আগে বেশ আলাপ ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হয়। প্রভাসের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হ'ল না ত। প্রভাস, এই আমাদের শিবচরণবাবুর ছেলে দেবকুমার, এখানে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। দেবকুমার, ইনি আমাদের গ্রামেরই ছেলে প্রভাস গাঙ্গুলি, সোশ্যাল ওয়ার্কে খুব উৎসাহী। এঁর সাহায্যে মায়া গ্রামে একটা স্কুল করবে ঠিক করেছিল, সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইতেই এঁর আসা। মায়া অসুখ করে পড়াতেই মুস্কিল হয়েছে।"

দেবকুমার প্রভাসকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ বিকেলে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব। এই কাজগুলি আমার নিজের খুব ভাল লাগে, যদিও সুবিধার অভাবে কিছু করতে পারিনি। ওদেশে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজের ধরণধারণ অনেকটা দেখে এসেছি।"

প্রভাস প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনার কাছেই আমি অনেক নূতন কথা শুনতে পাব।" বেশী কিছু বলিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। অন্য সকলে দেবকুমারকে দেখিয়া যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুন, তাহার নিজের এই বিলাত-ফেরৎ যুবকটিকে মোটেই ভাল লাগিল না। রূপবান্ বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের দাম ত রূপের উপর নির্ভর করে না?

নিরঞ্জন দেবকুমারকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু বলিল, "দিব্যি খাশা ছেলেটি, না প্রভাস? ঘর আলো করা জামাই হয়। এখন মেয়ে সারলে বাঁচি। যাই দেখি গিয়ে কি করছে। আমি ধরে-বেঁধে না খাওয়ালে ত খাবেও না কিছু। তুমি কি এখন বেরুবে?"

প্রভাস বলিল, "দূরে কোথাও যাব না। এই লেকের ধারে একটু ঘুরে আসি।" অকারণেই তাহার মনটা বড় ভারি লাগিতেছিল, সে একটা ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইন্দু ছোক্‌রাকে টেবিল পরিষ্কার করিতে আদেশ করিয়া উপরে চলিল।

মায়া মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ইন্দুর সঙ্গে তাহার যে-সকল দেবদেবীর পট, পূজার সামগ্রী প্রভৃতি ছিল, সব এখন মায়া দখল করিয়াছে। ঘরের এক কোণে ঠাকুরের সিংহাসন পাতিয়াছে, সকালে অঞ্জলি, বিকালে আরতি প্রভৃতি সুরু করিয়াছে। তাহার পুরাকালের যে সকল বাংলা সংস্কৃত বই ছিল সব বাহির করিয়াছে, মাঝে মাঝে সে সব খুলিয়া বসে। তবে মিনিট পাঁচ সাতের বেশী মন্ দিতে পারে না, আবার তুলিয়া রাখে। পোষাক-পরিচ্ছদেরও বিশেষ বদল হয় নাই, তবে পুরান ছেঁড়া কাপড়গুলি ত্যাগ করিয়া এখন আলমারীর কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ভাব পূর্ব্বেরই মত, কিসের আঘাতে যেন তাহার চেতনা অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি রে কিছু খাস্‌নি যে বড়? সব ত দেখ্‌ছি সাজানো রয়েছে।"

মায়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "যা সব নোংরা বাসন-কোসন। ভাল করে মাজে না কিছু না, তেল ব্যাড়্‌ ব্যাড়্‌ করছে। ওতে কি মানুষে খেতে পারে?"

ইন্দু জানিত মায়ার সঙ্গে এ অবস্থায় তর্ক করা বৃথা। তাহাকে নাওয়াইতে খাওয়াইতে হইলে তাহার মতে চলিতে হইবে। সুতরাং আর কথা না বলিয়া সে আবার নীচে নামিয়া গেল, এবং আলমারী খুলিয়া শ্বেত পাথরের রেকাবী, বাটি, গেলাস সব বাহির করিয়া নূতন করিয়া খাবার গুছাইয়া উপরে লইয়া আসিল। ছোক্‌রা মহানন্দে আগেকার খাবারগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল, এগুলি এখন তাহারই ভোগে লাগিবে।

মায়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "পিসিমা, তিনি কি এখনও আছেন নাকি?"

ইন্দু বলিল, "তিনিটা কে আবার? তোর বর?"

মায়া মুখ লাল করিয়া বলিল, "পিসিমা কি রকম ক'রে যে কথা বল।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা কি রকম ক'রে বল্‌তে হবে তুইই শিখিয়ে দে না। তোদের সব হাল ফ্যাশানের নিয়ম-কানুন ত আমি জানি না।"

মায়া বলিল, "যা-তা বল কেন? আমি আবার কবে থেকে হাল ফ্যাশানের হলাম? ও সব শুন্‌লে আমার হাড় জ্বালা করে।"

ইন্দু বলিল, "তা না হয় বল্‌ব না, তুমি তেকেলে বুড়ীই যখন। তা দেবকুমার এসেছে তা তুই জান্‌লি কি ক'রে? সে ত উপরে মোটেই আসেনি।"

মায়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবকুমার কে পিসিমা? কই আমি ত জানি না কেউ এসেছে ব'লে।"

ইন্দু একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, "তবে তুই কার কথা জিগ্‌গেস কর্‌ছিলি? দেবকুমারের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তা যেন জানিস না? তোর বাবা এখনি আমায় বল্‌লেন, আগে ত শুনিও নি। দিব্যি খাসা রাজপুত্রের মত চেহারা, আবার পড়াশুনোয়ও তেমনি।

মায়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "বাবা যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দেন, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব। হিন্দুর মেয়ে একবার যাকে স্বামী ব'লে জানে, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কর্‌তে পারে না।"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু বুঝিতে পারিল। দারুণ একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা যেন শুখাইয়া উঠিল। ভগবান এ কি করিলেন? এমন সুন্দর দুইটি জীবনকে এমনি নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করিতে বসিলেন? মায়া নিজের মাঝখানের কয়েক বৎসরের জীবনকে কি করিয়া এমন সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলিল? দেবকুমারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ কে করিয়াছে তাহা ইন্দু ঠিক জানে না। কিন্তু নিরঞ্জনকে যতদূর সে জানে, মায়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের কোনো সম্বন্ধ নিশ্চয়ই তিনি করেন নাই। বিবাহের কোনো তাড়াতাড়ি তাঁহার ছিল না। মায়া এবং দেবকুমার নিজেরাই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকিবে, তিনি সম্মতি দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এ সমস্ত স্মৃতিই কি মায়ার মন হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? দেবকুমারের নাম তাহার মনে কোনো পরিচয়ের স্মৃতিই জাগায় না, তাহার প্রতি ভালবাসার কোনো চিহ্নই এই অদ্ভুত বালিকার ভিতর এখন পাওয়া যায় না। কোথায় এ নিদারুণ সমস্যার সমাধান?

শুধু দেবকুমারকে যে মায়া ভুলিয়াছে তাহা নহে। কবে কোন্ কৈশোরে যে-মানুষটি সম্বন্ধে সামান্য অনুরাগের অঙ্কুর তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই মূর্ত্তি এত দিনের পর আবার মায়ার জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। মায়া যে প্রভাসের কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে বিষয়ে ইন্দুর সন্দেহমাত্র ছিল না। সে ভাবিয়া কোনো কূল দেখিতে পাইল না। ভয়ে উদ্বেগে তাহার মাথার ভিতরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মায়া তখনও মুখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। বেশী উত্তেজনায় পাছে তাহার কিছু অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা থাক্, ওসব কথা পরে হবে এখন। কিছু কি আর ঠিক্ হয়েছে? আমি অমনি ঠাট্টা কর্‌ছিলাম। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কি বিয়ে হ'তে পারে? মেজদার মত কি তুই জানিস না? তুই এত বড় মেয়ে হয়েছিস্, যা তুই বল্‌বি সেই অনুসারে কাজ হবে।"

মায়া এতক্ষণ খাওয়া ফেলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। ইন্দুর কথায় খানিকটা যেন আশ্বস্ত হইয়া আবার খাইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "তাই হলেই ভাল। শুধু শুধু একটা গোলমাল বাধাতে আমিই চাই নাকি? তাই ব'লে আমাকে নিয়ে যা-তা কর্‌লে চল্‌বে কেন? কই তুমি ত বল্‌লে না তিনি আছেন কি না?"

ইন্দু অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আছে।" মনে মনে বলিল, "এমন উৎপাত হবে জান্‌লে কে ও আপদকে সঙ্গে ক'রে আন্‌ত? না-হয় দু-দিন পরেই আস্‌তাম। আহা, দেবকুমার ছেলেটি চমৎকার, এমন চেহারা লাখে একটা দেখা যায় না। ব্যারিষ্টারও হয়েছে। টাকাকড়ি আছে কি না কে জানে। তা মেজদার যা-কিছু, সব ত ঐ মায়াই পাবে? টাকা থাক্‌লেই বা কি, না থাকলেই বা কি? এ ছেলের কাছে কি আর প্রভাস লাগে? কোনো টুলো পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে,

সে-ই ওকে মানাবে। এখন এ পোড়া রোগ সারলে বাঁচি। এমন কাণ্ড জন্মে শুনিনি বাপু।"

মায়ার খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "পিসিমা, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমার ঘরে এস, কেমন? একটু যোগবাশিষ্ট রামায়ণ শুনব তোমার কাছে।"

ইন্দু বলিল, "দেখি, সময় পাই ত আস্‌ব। আজকের জাহাজে কে এক ডাক্তার আস্‌ছে তোর জন্যে, মেজদা একটু আগে তাকে আনতে গেল। তাদের সব খাওয়া-দাওয়া হোক্, তোকে দেখা হোক, তারপর সময় থাকে পড়্‌ব। বাগানে একটু বেড়ালেও পারিস্? সারাক্ষণ এই একটা ঘরের মধ্যে বসে আছিস্, এতে ত শরীর আরও খারাপ হয়।"

মায়া বলিল, "কেন? তোমরা ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে টাকা নষ্ট করছ, তা তোমরাই জান। আমার ত কিছু হয়নি? মাথাটা মাঝে মাঝে একটু ভার লাগে—এই যা। বাগানে যাব বিকেলে, সকালে অনেক সব বাইরের লোকজন থাকে, যেতে লজ্জা করে।"

ইন্দু বলিল, "নিজের কি অসুখ, সব কি নিজে বোঝা যায়? তুই কেমন যেন হয়ে গেছিস্, কি সব আবোলতাবোল বকিস্, তাই ত মেজদা এত ডাক্তার ডাকাডাকি করে।"

মায়া বলিল, "তোমার পছন্দ-মত কথা না হলেই আবোলতাবোল হ'ল? আমি কি ক্ষেপেছি যে আবোলতাবোল বকব?

ইন্দু বলিল, "যাক্ গে সে কথা। তুই এখন কি করবি? আমি ত নীচে যাচ্ছি. ভাঁড়ার দেব, তরকারি কুটব, তারপর স্নান করে নিজের রান্না চড়াব। ততক্ষণ একলা থাকবি?"

মায়া বলিল, "করবার ত কিছু খুঁজে পাই না। ঘরের কাজ সব ত চাকরবাকরেই করছে, তার উপর তুমি রয়েছ। আমার যে-ক'খানা বই ছিল, তা ত পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, বইয়ের অভাব নাকি ভারি? তার ওদিক্‌কার পড়বার ঘরে, নীচে লাইব্রেরী-ঘরে বই ঠাসা রয়েছে, এসে পড় না? তাহ'লে ত সময় বেশ কাটে। চল্‌না আমার সঙ্গে, বই নিয়ে আস্‌বি।"

মায়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আচ্ছা চল।"

ইন্দু তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার পড়িবার ঘরে লইয়া গেল। মায়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব বইয়ের আলমারী-গুলি দেখিতে লাগিল। বলিল, "বাবার টাকা যেন কামড়ায়, না পিসিমা? বই কিনেই কত টাকা উড়িয়েছেন দেখ? আমার জন্যে এত বইয়ের কি দরকার ছিল? সাতজন্মেও পড়ে শেষ করতে পারব না।"

ইন্দু বলিল, "শেষ করতে পারবি না কেন? এর অনেকগুলোই ত তোর কলেজের বই বলে শুনি।"

মায়া খানিকক্ষণ ইন্দুর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বই বল্‌লে পিসিমা?"

ইন্দু বলিল, "কলেজের বই, কলেজের বই। কানেও আজকাল কম শুন্‌ছিস্ নাকি?"

মায়া বলিল, "কম শুনতে যাব কেন? কিন্তু কি তুমি যে সব বল্‌তে সুরু করেছ! আমার কলেজের বই মানে কি? আমি আবার কবে কলেজ গেলাম? বাবার কলেজের বই?"

ইন্দু ভীতভাবে বলিল, "তুই একখানা বই খুলে দেখ না, পড়তে ভাল লাগে কিনা।"

মায়া আলমারীর দরজা টানিয়া খুলিয়া একখানা বই বাহির করিল। অনেকক্ষণ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "পিসিমা, তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করছ। এ সব ত ইংরিজি বই। আমি কোথা থেকে পড়ব? নীচের ঘরে বাংলা বই যদি কিছু থাকে, তাই চল নিয়ে আসি গে।"

ইন্দু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে অনেক কষ্টেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু পড়তে পারছিস না?"

মায়া হি হি করিয়া বোকার মত হাসিয়া উঠিল। বলিল, "পিসিমা, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি বি-এ, এম-এ, পাশ যে ইংরিজী পড়্‌ব?"

(ক্রমশঃ)

মূর্খ শতক

সংস্কৃত সাহিত্যে সকল বিষয়েই একটা শাস্ত্র আছে, সেইরূপ মূর্খেরও একটি শাস্ত্র আছে, তাহার নাম মূর্খশতক। এই পুস্তকখানি ছাপা হইয়াছে। গুজরাতের লোক ব্যবহারচতুর বলিয়া এই পুস্তকের গুজরাতী তর্জ্জমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।...বইখানির পশ্চিম-ভারতে বেশ সম্মান আছে। কে যে এইরূপ অপরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানা যায় না, কিন্তু বহুকাল হইতে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে, বইখানি চলিয়া আসিতেছে।

বইখানি অত্যন্ত ছোট, মাত্র ২৫টি শ্লোক, কিন্তু ভারি দরকারী। এক একটি শ্লোকে চারি প্রকারের মূর্খের লক্ষণ দেওয়া আছে; তাহা ছাড়া গোড়ায় একটি আর শেষে একটি শ্লোক উপক্রমণিকা ও উপসংহার-হিসাবে দেওয়া আছে। পুস্তকখানি হইতে বুঝা যায়, সেকালেও অনেকরকম মূর্খ ছিল এবং মূর্খদের মোটামুটি একশত ভাগে ভাগ করা হইত। মূর্খলোক যাহাতে মূর্খত্ব পরিহার করিয়া ব্যবহারচতুর হইতে পারে এবং অভিজ্ঞভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারই জন্য এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছিল।

মূর্খশতকের প্রত্যেক ছত্রে এমন মূল্যবান ও সারগর্ভ উপদেশ নিহিত আছে যে তাহা সারাজীবন মানুষের কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। বইখানি বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত।...

১। সামর্থ্যে বিগতোদ্যোগঃ।—যাহার সামর্থ্য বা ক্ষমতা সত্ত্বেও উৎসাহ নাই। পয়সা রোজকার করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যে সব লোক আলস্যে কাল কাটায় এবং নির্ধন থাকে; পাঠাদি করিবার ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা পড়াশুনা না করিয়া হেলায় আপনাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে তাহারা প্রথম প্রকারের মূর্খ।

২। স্বশ্লাঘী প্রাজ্ঞপর্ষদি।—যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের সভায় বসিয়া নিজের শ্লাঘা করিয়া থাকে, এমন ব্যক্তি যত বড়ই শাস্ত্রজ্ঞ হউন না কেন তিনি মূর্খ হইবেনই।

৩। বেশ্যাবচনবিশ্বাসী।—বেশ্যার কথায় যিনি বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের প্রেমে মুগ্ধ হন এবং সংসার ছারেখারে দেন তিনি মূর্খ।

৪। প্রতারী দম্ভডম্বরে।—যিনি দম্ভ ও আড়ম্বর দেখিয়া আসল জিনিষের কথা ভুলিয়া যান।

৫। দ্যূতাদি চিত্তবদ্ধাশঃ।—দ্যূত বা জুয়াতে নিশ্চয় টাকা পাইবার আশায় যিনি বসিয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ।

৬। কৃষ্যাদ্যায়েষু সংশয়ী।—যিনি কৃষিকর্ম্ম হইতে লাভ হইবে কি না সংশয় করিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত থাকেন।

৭। নির্বুদ্ধিঃ প্রৌঢ়কার্য্যার্থী।—বুদ্ধিহীন হইয়াও যে বড় বড় কার্য্য করিতে যায় সে একটি মূর্খ।

৮। বিবিক্তরসিকো বণিক্।—যে ব্যবসাদার হইয়াও অরসিক সে একজন মূর্খ।

৯। ঋণেন স্থাবরক্রেতা।—ধার করিয়া স্থাবর সম্পত্তি যে ক্রয় করে সে একজন মূর্খ।

১০। স্থবিরঃ কন্যকাবরঃ।—যে বৃদ্ধ তরুণী বিবাহ করিয়া ঘরে আনে সে একটি মূর্খদিগের সেরা।

১১। ব্যাখ্যাতা চাশ্রুত গ্রন্থে।—যে অজানা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে সে একটি মূর্খ, কারণ যাহা নিজেই জানে না তাহা অপরকে বুঝাইবে কি?

১২। প্রত্যক্ষার্থেঽপ্যপহ্নবী।—যিনি কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না তিনি একটি মূর্খ।

১৩। চপলাপতিরীর্ষ্যালুঃ।—কুলটা বিবাহ করিয়াও যিনি স্ত্রীর প্রতি দ্বেষ করেন তিনি একটি মহামূর্খ।

১৪। শক্তশত্রুরশঙ্কিতঃ।—প্রবল শত্রু থাকা সত্ত্বেও যিনি নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ।

১৫। দত্ত্বা ধনানুশয়ী।—টাকা দান করিয়া যিনি পরে অনুশোচনা করিয়া থাকেন তিনি একটি মূর্খ।

১৬। কবিনা হঠপাঠকঃ।—যিনি নিজে অপণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিতের সহিত হঠকার করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন।

১৭। অপ্রস্তাবে পটুবক্তা। কোন প্রসঙ্গ বা কারণ ব্যতিরেকে যিনি বক্ বক্ করিয়া প্রচুর বকিতে থাকেন, তিনি একটি উজবুক।

১৮। প্রস্তাবে মৌনকারক।—যখন প্রসঙ্গ বা কারণ উপস্থিত হয় তখন কথাবার্ত্তা না কহিয়া যিনি মৌনাবলম্বী হন, তিনি মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯। লাভকালে কলহকৃৎ।—লাভের সময় উপস্থিত হইলে যিনি লাভদাতার সহিত কলহ করিয়া লাভের পথ বন্ধ করেন তিনি একটি মূর্খ।

২০। মন্যুমান ভোজনক্ষণে।—ভোজন করিবার সময় যিনি রাগিয়া আগুন হইয়া যান তিনি একটি হস্তিমূর্খ।

২১। কীর্ণার্থঃ স্বল্পলাভেন।—সামান্য লাভের জন্য যিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

২২। লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ।—লোকের উক্তিতে যিনি ব্যথিত হইয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ।

২৩। পুত্রাধীনে ধনে দীনঃ।—পুত্রের হাতে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যিনি শেষে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন।

২৪। পত্ন্যাবত্তার্থযাচকঃ।—পত্নীর নিকট একবার কোন জিনিষ বা অর্থ দিয়া আবার তাহার নিকট হইতে যে চাহে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

২৫। ভার্য্যাখেদাৎ কৃতোদ্বাহো।—এক ভার্য্যায় বিরক্ত হইয়া দ্বিতীয়বার সুখের আশায় যিনি দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খশ্রেণীভুক্ত হন।

২৬। পুত্রকোপাৎ তদন্তকঃ।—যিনি পুত্রের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন।

২৭। কামুকস্পর্দ্ধয়া দাতা।—যে-ব্যক্তি কামীলোকের সহিত রেষারেষি করিয়া বেশ্যা-আদিকে ধনপ্রদান করিয়া থাকে সে মূর্খ শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।

২৮। গর্ব্ববান্ মার্গণোক্তিভিঃ।—যে ব্যক্তি কৃপাকাঙ্ক্ষীর চাটু-বাক্যে আপনাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া থাকে তাহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

২৯। ধীদর্পাৎ হিতশ্রোতা।—আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিয়া দর্পে যিনি হিতবাক্য শ্রবণ না করিয়া বিপদে পড়েন, তিনি মূর্খপদবাচ্য হইয়া থাকেন।

৩০। কুলোৎসেকাদসেবকঃ।—কুলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া প্রয়োজন হইলেও যিনি চাকুরি করিতে ঘৃণা বোধ করেন এবং দৈন্যে দিনযাপন করেন, তিনি মূর্খপদবাচ্য হইয়া থাকেন।

৩১। দত্বার্থান্ দুর্লভান্ কামী।—যে কামীপুরুষ দুর্লভ সামগ্রী দিয়া আপনার কামচরিতার্থ করে সে একটি গোমূর্খ।

৩২। দত্বা শুল্কমমার্গগঃ।—যে ব্যবসায়ী মালের উপর সরকারী শুল্ক দিয়াও গুপ্তমার্গ দিয়া মাল লইয়া গিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহাকে মূর্খ বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩৩। লুব্ধে ভূভুজি লাভার্থী।—যে রাজাকে অত্যন্ত লোভী জানিয়াও তাহার নিকট হইতে কোনরূপ লাভের আশা করিয়া থাকে, সে একটি মহামূর্খ।

৩৪। ন্যায়ার্থী দুষ্টশাস্তরি।—যেখানে শাসক দুষ্ট ও অত্যাচারী তাঁহার নিকট হইতে যে ন্যায়বিচার আশা করিয়া থাকে সে একটি আস্ত মূর্খ।

৩৫। কায়স্থে স্নেহবদ্ধাশঃ।—এস্থলে কায়স্থ বলিতে রাজকর্ম্মচারী বুঝায়, বিশেষতঃ যাহারা খাজনা আদায় করিয়া থাকে। ইহারা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত উৎপীড়ন করিত এবং বিশেষ অত্যাচারী ছিল। অতএব যিনি কায়স্থের স্নেহের উপর নির্ভর করিয়া কোন আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন।

৩৬। ক্রূরে মন্ত্রিণি নির্ভয়ঃ।—রাজ্যের মন্ত্রী ক্রূর প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও যে লোক নির্ভয়ে বিচরণ করে সে মূর্খ।

৩৭। কৃতঘ্নে প্রতিকার্য্যার্থী।—যে ব্যক্তি কৃতঘ্নের জন্য উপকার করিতে ব্যগ্র হয়, সে একটা আসল হাঁদা।

৩৮। নীরসে গুণবিক্রয়ী।—যে-ব্যক্তি রসগ্রহণ করিতে জানে না তাহার নিকট নিজের গুণের পরিচয় দেওয়া মূর্খের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

৩৯। স্বাস্থ্যে বৈদ্যক্রিয়াদ্বেষী।—যে সুস্থ অবস্থায়ও নানারূপ ঔষধাদি সেবন করিয়া শরীরস্থ যন্ত্রাদির বিকার ঘটাইয়া থাকে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়।

৪০। রোগী পথ্যপরাঙ্মুখঃ।—যে রোগী রোগের ভোগকালে পথ্য সেবন না করিয়া নিজের ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করিয়া বিপদ আনয়ন করে সে মূর্খশ্রেণীভুক্ত হয়।

৪১। লোভেন স্বজনত্যাগী।—লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে আপনার আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করে সে মূর্খ।

৪২। বাচা মিত্রবিরাগকৃৎ।—পরুষবাক্য প্রয়োগে যিনি বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

৪৩। লাভকালে কৃতালস্যঃ।—লাভের সময় আগত দেখিয়াও যিনি আলস্যবশতঃ লাভ নষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৪৪। মহর্দ্ধিঃ কলহপ্রিয়ঃ।—অশেষ ধনশালী হইয়াও যিনি সামান্য অর্থ লইয়া হেঁচড়াহেঁচড়ি করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৪৫। রাজ্যার্থী গণকস্যোক্তেঃ।—গণক 'রাজযোগ আছে' বলিয়াছে বলিয়া যিনি তাহার কথায় নির্ভর করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় বসিয়া থাকেন তিনি গণ্ডমূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

৪৬। মূর্খমন্ত্রে কৃতাদরঃ।—যিনি মূর্খের বা অনভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া বিপদে পড়েন তাঁহাকে মূর্খশ্রেণীভুক্ত করিতে হয়।

৪৭। শূরো দুর্ব্বলবাধায়ে।—যিনি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে।

৪৮। দৃষ্টদোষাঙ্গনারতঃ।—যে স্ত্রীলোকের একবার চরিত্রদোষ দেখা গিয়াছে তাহার সহিত যিনি তাহা সত্ত্বেও আসক্ত থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৪৯। ক্ষণরাগী গুণাভ্যাসে।—ভাল কার্য্যে বা গুণের অভ্যাসে যাহার আসক্তি অল্পকালের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, তিনি একটি মূর্খ।

৫০। সঞ্চয়েঽন্যৈঃ কৃতব্যয়ঃ।—বাপদাদার সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি যিনি উড়াইয়া দেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৫১। নৃপানুকারী মানেন।—সকলে সম্মান করে বলিয়া গর্ব্বে রাজার বেশভূষাদি যাঁহারা অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মূর্খ।

৫২। জনে রাজাদিনিন্দকঃ।—যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে রাজা, রাজমন্ত্রী ইত্যাদির নিন্দা করে সে মূর্খ।

৫৩। দুঃখে দর্শিতদৈন্যার্ত্তিঃ।—দুঃখে বা দারিদ্র্যে পড়িয়া যে দারিদ্র্যদুঃখ সকলের নিকট ব্যক্ত করে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়।

৫৪। সুখে বিস্মৃতদুর্গতিঃ।—সুখের সময় আগত হইলে যিনি পূর্ব্বের কষ্টের কথা বিস্মৃত হন তিনি একজন মূর্খ।

৫৫। বহুব্যয়োঽল্পরক্ষার্থম্।—সামান্য জিনিস রক্ষা করিতে গিয়া প্রচুর ব্যয় করিয়া ফেলা একটি মূর্খের লক্ষণ।

৫৬। পরীক্ষায়ৈ বিষাশনঃ।—বিষ খাইলে শরীরে কি হয় পরীক্ষা করিবার জন্য যে ব্যক্তি কৌতূহলপরবশ হইয়া বিষ ভক্ষণ করে এবং করিয়া বিপদাপন্ন হয় তাহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খনামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫৭। দগ্ধার্থো ধাতুবাদেন।—নিকৃষ্ট ধাতু হইতে সোনা বাহির করিবার চেষ্টায় যিনি আপন অর্থাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করেন।

৫৮। রসায়নৈ রসক্ষয়ী।—রসায়নাদি তীব্রবীর্য্য কবিরাজী ঔষধাদি সেবন করিয়া যিনি শরীরস্থ রসাদির ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫৯। আত্মসম্ভাবনাস্তব্ধঃ।—নিজেকে একজন মস্ত বড়লোক বা

পণ্ডিত মনে করিয়া যিনি সর্ব্বদাই ফুলিয়া থাকেন, তাঁহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া থাকে।

৬০। ক্রোধাদাত্মবধোদ্যতঃ।—ক্রোধবশতঃ যিনি আত্মঘাতী হইতে যান, তিনি মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

৬১। নিত্যং নিষ্ফলসঞ্চারী।—যিনি নিত্যই কোন কার্য্য না থাকা সত্ত্বেও কেবলই ভবঘুরের ন্যায় টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

৬২। যুদ্ধপ্রেক্ষী শরাহতঃ।—যুদ্ধ করিতে গিয়া শরের আঘাত পাইয়াও যিনি যুদ্ধ দেখিতে থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৬৩। শয়ী শক্তবিরোধেন।—প্রবল শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়াও যিনি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইয়া থাকেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ বলিয়া অভিহিত করেন।

৬৪। স্বল্পার্থঃস্ফীতডম্বরঃ।—অতি অল্প আয় থাকা সত্ত্বেও যিনি অত্যন্ত আড়ম্বর ও চাকচিক্য বাহিরে দেখাইয়া থাকেন তাঁহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া থাকে।

৬৫। পণ্ডিতোঽস্মীতি বাচালঃ।—আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া যিনি সদাসর্ব্বদা বাচালতা করিয়া থাকেন, তিনি পণ্ডিত হইলেও মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

৬৬। সুভটোঽস্মীতি নির্ভয়ঃ।—যিনি আপনাকে ভাল যোদ্ধা মনে করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

৬৭। প্রফুল্লিতোঽতিস্তুতিভিঃ।—যিনি চাটুকারের তোষামোদ-বাক্যে অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে বোকা বলা হয়।

৬৮। মর্ম্মভেদী স্মিতোক্তিভিঃ।—কেহ উপহাস করিয়া কথা বলিলে তাহার মর্ম্মভেদী উত্তর যে দেয় তাহাকে অজ্ঞমূর্খ বলিতে পারা যায়।

৬৯। দরিদ্রহস্তন্যস্তার্থঃ।—যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্রের হস্তে অর্থ-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে তাহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া চিনিতে পারে।

৭০। সন্দিগ্ধেঽর্থে কৃতব্যয়ঃ।—যাহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে এরূপ বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা মূর্খের লক্ষণ।

৭১। স্বব্যয়ে লেখ্যকালস্যো।—যিনি আপনার জমাখরচাদি লিখিতে আলস্য করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খনামে অভিহিত করা যায়।

৭২। দৈববশাৎ ত্যক্তপৌরুষঃ।—দৈবের উপর নির্ভর করিয়া যিনি পুরুষকারকে বিদায় দেন তিনি একজন মূর্খ।

৭৩। গোষ্ঠীরতির্দরিদ্রশ্চ। যে দরিদ্র হইয়াও বড় বড় লোকের সহিত, বড় বড় সমাজে মেলামেশা করে তাহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ বলিয়া থাকেন।

৭৪। দৈন্যে বিস্মৃতভোজনঃ।—শোক বা তাপ পাইয়া যিনি আহারের কথা বিস্মৃত হন তাঁহাকেও মূর্খ বলিতে পারা যায়।

৭৫। গুণহীনঃ কুলশ্লাঘী।—নির্গুণ হইয়াও যে-ব্যক্তি আপনার কুলের শ্লাঘা করিয়া থাকে সে একটি নিরেট মূর্খ।

৭৬। গীতগায়ী খরস্বরঃ।—গাধার মত গলা লইয়া যিনি অনবরত গর্দ্দভরাগিণী ভাঁজিতে থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৭৭। ভার্য্যাভয়ান্নিষিদ্ধার্থী।—স্ত্রীর ভয়ে যে টাকাকড়ি গোপনে রাখিয়া দেয়, বা টাকাকড়ির কথা গোপন রাখে তাহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৭৮। কার্পণ্যোনাপ্তদুর্নামঃ।—অতিরিক্ত কার্পণ্যবশতঃ যিনি চতুর্দ্দিকে দুর্নাম কিনিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৭৯। ব্যক্তদোষজনশ্লাঘী।—যে ব্যক্তির দোষ জনসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ লোকের সুখ্যাতি যিনি করিয়া থাকেন তিনি একটি আস্ত বোকা বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন।

৮০। সভামধ্যার্ধনির্গতঃ।—সভাতে বসিয়া সভাশেষ হইবার পূর্ব্বে যিনি সকলের সমক্ষে বহির্গত হইয়া যান তাঁহাকে অসভ্য বলিয়া লোকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকে।

৮১। দূতো বিস্মৃতসন্দেশঃ।—যে দূত নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া কি খবর দিতে আসিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায় তাহাকে মূর্খ বলা হয়।

৮২। কাসবাংশ্চৌরিকারতঃ।—কাসির ব্যায়রাম থাকা সত্ত্বেও যে রাত্রে ঘরে সিঁদ দিয়া চুরি করিতে যায়, সে একটি খাজামূর্খ

৮৩। ভূরিভোজ্যব্যয়ঃ কীর্ত্তেঃ।—যিনি শুধু নাম হইবে বলিয়া বাড়ীতে খুব খাওয়ান-দাওয়ান করেন, তিনি একটা মূর্খ।

৮৪। শ্লাঘার্থে স্বল্পভোজনঃ।—নিজের খ্যাতি ও গৌরব বিস্তৃত হইবে বলিয়া যিনি অত্যল্প পরিমাণ আহার করিয়া থাকেন তিনি একটা অজ্ঞমূর্খ।

৮৫। স্বল্পে ভোজ্যেতিঃতিরসিকঃ।—যে তরকারি অতি অল্প রান্না হইয়াছে তাহাই বারবার যিনি চাহিয়া থাকেন তিনি একটা মূর্খ।

৮৬। বিক্ষিপ্তশ্লক্ষ্ণচাটূক্তিঃ।—লুকায়িত চাটুবাক্যে যিনি বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া ঠকিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হয়।

৮৭। বেশ্যাব্যাপারকলহী।—বেশ্যাঘটিত ব্যাপার লইয়া যাঁহারা আপনা-আপনির ভিতর প্রকাশ্যে কলহ করিয়া থাকেন তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞমূর্খ বলিয়া গণ্য হন।

৮৮। দ্বয়োর্গুহ্যে তৃতীয়কঃ। দুইজনে যেখানে গোপন পরামর্শ করিতেছেন সেইখানে যাইয়া হাজির হওয়া একটি মূর্খের কার্য্য।

৮৯। রাজপ্রসাদে স্থিরধীঃ। রাজা কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে যিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া অচঞ্চল চিত্তে বসিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৯০। অন্যায়েন বিবৃদ্ধিসুঃ।—কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া যিনি উন্নতির আশা করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৯১। অর্থহীনেঽর্থকার্য্যার্থী।—অর্থহীন হইয়াও যিনি ব্যয়বহুল কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৯২। জনে গুহ্যপ্রকাশকঃ।—যিনি গোপন কথা প্রকাশ্যে প্রচার করিয়া নিজেকে ও আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে ফেলিয়া থাকেন তাঁহাকে খাজামূর্খ বলা যাইতে পারে।

৯৩। অজ্ঞাতপ্রতিভূঃ কীর্ত্ত্যৈ।—শুধু কীর্ত্তি বা নাম হইবে বলিয়া যিনি অজ্ঞাত লোকের হইয়া জামিন হন তিনি একটা মূর্খ।

৯৪। হিতবাদিনি মৎসরী।—হিত উপদেশ দিতে আসিলে যিনি উপদেশকের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি একটা মূর্খ।

৯৫। সর্ব্বত্র বিশ্বস্তমনাঃ।—যিনি সদাই সকলকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন, যিনি অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি, ভাল ও খারাপ লোকের তফাৎ বুঝিতে পারেন না, ভাল ও মন্দ কার্য্যের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৯৬। ন লোকব্যবহারবিৎ। যিনি লোক-ব্যবহার জানেন না তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৯৭। ভিক্ষুকশ্চোষ্ণভোজী চ।—যে ভিক্ষুক হইয়াও সর্ব্বদা উষ্ণ-ভোজন করিতে চাহে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়।

৯৮। গুরুশ্চ শিথিলক্রিয়ঃ। যে-গুরু গুরুগিরি করিতে থাকিলেও ক্রিয়াকলাপ ও সদাচার বর্জ্জন করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৯৯। কুকর্ম্মণাপি নির্লজ্জঃ।—কুকর্ম্ম করিয়া যিনি অপ্রস্তুত হন না, এবং নির্লজ্জের মত কুকর্ম্মের সমর্থন করিয়া থাকেন, তিনি একটি গাধা।

১০০। সাস্থ্যশ্চ সহাসগীঃ। যিনি আহ্লাদে গোপালের মত অনবরতই হ্যা হ্যা করিয়া হাসিয়া কথা কহিয়া থাকেন তিনি সভাসমাজে একটি গণ্ডমূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

(পঞ্চপুষ্প—আশ্বিন, ১৩৩৭)　　শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

—

প্রাচীন শিল্প-কলার রেখা-ছন্দ

...চিত্র বা ভাস্কর্যের মধ্যে রেখা-ছাঁদ কি ভাবে শিল্পী ধ'রে থাকেন তার দৃষ্টান্ত অঙ্ক ক'ষে দেখানো সম্ভব নয়, তবে ছবি বা ভাস্কর্যটি দেখলে তার মধ্যে শৃঙ্খলা বা উচ্ছৃঙ্খলার ভাবটি দেখলে সাধারণ লোকেরও বুঝতে দেরী হয় না। যেমন কোনো Futurist School-এর চিত্রে বা অতি-আধুনিক ইউরোপীয় মূর্ত্তিকলায় আমরা দেখি ছাদ-বাঁধটি বেশ আছে,---নেই কেবল তার ভিতর সাধারণ চোখে-দেখা কানে-শোনা দুনিয়ার সাধারণ জিনিষের রূপ। সে এক অতি মাত্রায় অতি-মানুষিক বা বেশীমাত্রায় বে-বস্তুর চেহারা। সেখানে শিল্পী abstract ভাবে দেখাতে চেয়েছেন রেখা-ছন্দের গতি dynamic motion)---খুব ভীষণ বেগে তখন তুলি-কলম চালিয়ে গেছেন শিল্পী। এই গতি (dynamic) ও স্থিতি (static) এই দু'য়ের খেলাই হ'ল শিল্পীর খেলা। রেখা-ছন্দ এই দ্বন্দ্ব ও ছন্দের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখা যায় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিয়ম-প্রণালীটি একটি কোনো শিল্পীর একচেটে হ'য়ে যায় নি।...কাব্যের ছন্দ এমন ছাঁদে বাঁধা যে তার শব্দ অর্থ যোজনা ছাড়া কেবল অর্থশূন্য ধ্বনির সঙ্গে ছন্দ জুড়ে চালালে তা' একেবারে অচল হ'য়ে যায়। কিন্তু শিল্পকলায় একটি শুধু ছন্দ-লতা (arabesque) বিনা তাৎপর্য্যে ও বিনা ভাব-ব্যঞ্জনায় আঁকা যায়,---কেবল তার abstract ছন্দ-রেখার সুকুমার সমন্বয়েই অতি অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠতে পারে। তবে এরূপ ছন্দ-লতাটি চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যের অলঙ্কারস্বরূপই হয়, যদিও তাকে বড় একটা উঁচু স্থান দেওয়া হয় না।...ছন্দ-লতা ও ছন্দ-রেখা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে একটি হ'ল আরটির বাহন। ছন্দ-রেখা যোজনা দ্বারাই ছন্দ-লতাটি রচনা করা হয় গালিচার উপর, পর্দ্দার উপর। নানান গৃহ-সজ্জায়, আসবাবপত্রে ছন্দ-লতার স্থান ব্যবহারিক শিল্পকলায় এবং কখনো কখনো চিত্র ও ভাস্কর্যের শোভাবর্দ্ধনের জন্য, কখনো ফ্রেমের উপর কখনো বা তার pedastalএর গায়ে এবং স্থাপত্য-কলার শোভনতায়। ছন্দ-লতাকে সাধারণতঃ মণ্ডনলতা বা কারিকরের ভাষায় "মড়ুরী" বলা হয়।

ইউরোপে আজ সাড়া প'ড়ে গেছে রেখা-ছন্দের খোঁজের, এমন কি তার ভিত্তি পর্য্যন্ত তাঁরা নাড়াচাড়া করছেন। এপষ্টাইনের ভাস্কর্য্য এবং কয়েকজন অতি-আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্করের ভাস্কর্য্যকলা দেখলে দেখা যায় তাঁরা এখন প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের অসভ্যদের বাসন-কোসনের গায়ে আঁকা, গুহা-গহ্বরের গায়ে আঁকা চিত্র ও কারুকলার দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করছেন। তাঁরা অন্ততঃ এটা তাদের কাছ থেকে শিখেছেন যে, রেখাঙ্কনের বাজে খরচ রেখাছন্দের অন্তরায়।...এরা গতানুগতিক পন্থায় প্রকৃতির হুবহু নকল ক'রে সুখ পান না, এঁরা সেই চিরন্তন সত্যের সন্ধান করছেন,—যার সন্ধান আমাদের দেশের অতি-প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচশত বৎসর থেকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত করে গেছেন; এবং তার পরবর্ত্তী কালেও কিছু রাজপুত ও মোগলের মধ্যে গতিশীল ছিল, এবং পরে একেবারে ফল্গুধারার মত আপাততঃ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল।...

ইউরোপ আজ যে ছন্দ-রেখার জ্ঞান অতি প্রাচীন প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের শিল্পের ভিতর পেয়েছেন, আমাদের দেশের ঋষি-শিল্পীরা বহুযুগ পূর্ব্বে সে তত্ত্বের খনি আবিষ্কার ক'রে গিয়েছিলেন তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হ'চ্ছে প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি। তাঁরা যখন এই মূর্ত্তিটি গড়েছেন তখন ইউরোপের শিল্পকলার শৈশব অবস্থা; তখন তারা মানুষের শরীরের পেশীর হুবহু নকল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে মূর্ত্তিগুলির মধ্যে খুঁটিনাটি রেখার ভঙ্গী দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এদিকে আমাদের ঋষি-শিল্পীরা রেখার সংযম এবং রেখাছন্দের (significant form-এর) গতিশীলতার ভিতর এই মূর্ত্তিটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। তাঁরা Anatomy-র গোড়ার কথা proportion, মাপ বা প্রমাণটি ঠিক বজায় রেখে খুঁটিনাটি পেশীসংস্থানের বাহার না দেখিয়ে সহজ রেখার ছন্দ গতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি সিংহের মত বীর ও নিবাত-নিষ্কম্প দীপের শিখাটির মত স্থির গৌতমের সৌম্যমূর্ত্তি।...

আধুনিক ভারতের শিল্পীরা ইউরোপীয় সভ্যতার এবং ইউরোপীয় শিল্পরসিকদের মাপকাঠিতে দেশের শিল্পের বিচার করায় দেশের শিল্পকে বুঝতে আমাদের এত বেগ পেতে হ'চ্ছে। বুদ্ধমূর্ত্তিটির পেশী-সংস্থান হুবহু ঠিক না হ'লেও যে প্রমাণ বা proportion-এর ভিত্তির উপর মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটির প্রতি কারুই লক্ষ্য নেই। আধুনিক শিল্পীরা যাঁরা দেশের আর্টের চর্চ্চা করেন তাঁরা এই সত্যটি একেবারে লক্ষ্য করেন না ব'লেই দেখা যায় যে, তাদের কারো বা চিত্রে হাত-পাগুলি হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ'য়ে পরিণত হ'চ্ছে—কারু বা লতানে scroll-এর মত জড়িয়ে যাচ্ছে কারু বা ধোঁয়াকালীতে ঢাকা একটা ফাঁকা ফানুষের মত উড়ে চলছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।...

সংযত রেখা-সঞ্চালন-প্রচেষ্টা প্রাচীন ভারত-শিল্পের এক প্রধান প্রতীক। অজন্তার প্রাচীন চিত্রকলায়, সাঁচী, ভরহুৎ, অমরাবতীর প্রস্তরচিত্রের ভিতর এই রেখা-সংযম ও ঠিক প্রয়োজনমত ভাবব্যঞ্জনা অতি অবহেলায় শিল্পীরা যা ক'রে গেছেন তা' এখনো পর্য্যন্ত কোনো দেশে কোনো শিল্পী করতে পারেন নি। তবে কোনো শিল্পকলার নকল হ'লেই সেটা নকলই থেকে যায়, তার আর প্রাণ বা গতিশীলতা থাকে না। তাই ভারতবর্ষে কোনো একটি ধরণের শিল্প একভাবে ধারাবাহিক চলে আসেনি এবং চলাটাও বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়। ভাবব্যঞ্জনার আতিশয্য ভারত-শিল্পে দেখা যায় না। ঠিক যতখানি ভাব (expression) ফোটানোর প্রয়োজন শিল্পীরা বুঝেছেন ঠিক ততটাই ফুটিয়েছেন। দর্শকের কল্পনার উপর আস্থা তখনকার শিল্পীদের ছিল।...

রেখার অপব্যয় না ক'রে রেখাঙ্কন করার ক্ষমতালাভ করা যে কত বড় কথা তার পরিচয় প্রাচীন জাতকের ছবিগুলি, অশোক-

প্রতিষ্ঠিত পাথরের রেলিং প্রভৃতিতে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে কোনো কোনো ইউরোপীয় শিল্পী অসভ্য (primitive) ব'লে থাকেন এবং আমরাও তাই সেগুলিকে কৃপার চক্ষে দেখতে থাকি। আসলে এই অতি-প্রাচীন ভারত-শিল্পেরই ছিটেফোঁটা যদি আজ কোনো দেশের শিল্পীর বোধগম্য হ'ত এবং তিনি যদি সেইমত আপনার পথ কেটে নিতে পারতেন, তাহ'লে আজ আবার বুদ্ধের মত প্রতিমূর্ত্তি, নটরাজের মত মূর্ত্তি নতুন ক'রে গড়তে দেখতে পাওয়া যেতো। নটরাজের মূর্ত্তির ভিতর অতি-প্রাচীন যুগের সেই সহজ সরল রেখা-ছন্দের যা গতি দেখতে পাওয়া যায়, তা' যে-কোনো দেশের যে-কোনো কালের শিল্পী ও রসিককে অভিভূত করবেই করবে। তাই আজ রোঁদা ফরাসী দেশের বিখ্যাত শিল্পী হয়েও ভারতের এই ভারতীয় যা' নটরাজের ভিতর দিয়ে শিল্পী কত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করে গেছেন তার রসাস্বাদ করে ধন্য জ্ঞান করেছেন। এ বিষয় তাঁর ফরাসী ভাষায় লেখা প্রবন্ধ পাঠে বেশ জানা যায়। তিনি এই মূর্ত্তিটির রেখা-ছন্দ ধরবার জন্যে কখনো এটিকে তীব্র আলোকে, কখনো ছায়ায়, কখনো মোমবাতি জ্বেলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছিলেন এবং তাঁর সুললিত ভাষায় সেই সব ভাব প্রকাশ ক'রে গেছেন। মূর্ত্তিটির প্রতি-অঙ্গ যেন তাঁর কাছে কথা কয়েচে বলে মনে হয়। ভাবব্যঞ্জনার আতিশয্য এর কিন্তু কারণ নয়। মূর্ত্তিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন যে শিব জটাজুট এলিয়ে তাণ্ডব-নৃত্যে রত। শারীরিক খুঁটিনাটি গঠনের ভিতর কোনো চাঞ্চল্য নেই, অথচ সমগ্র ভঙ্গী ও মাপটির ভিতর এমন একটি গতি ফুটে আছে যে, খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলে মানুষের মনকে যে কোথায় নিয়ে যায় তা' বলা যায় না। এতে ডানা লাগিয়ে মানুষ-পরীর ওড়ার মত বিকটভাবে গতিচাঞ্চল্য দেখানো হয় নি—এতে সংযত রেখা-সঞ্চালনের ফলেই মূর্ত্তিটি এত মূর্ত্ত হয়ে উঠেচে।

রেখা অর্থে এখানে সব বস্তুর এবং চিত্রের ভিতর যে সীমারেখা আছে সেটা রঙেরই হোক বা কোন বস্তুরই হোক তাকেই আমরা রেখা বল্‌চি। তার সুসংযত প্রয়োজনই হ'ল রেখা-ছন্দ। ছবি বা মূর্ত্তি গড়তে গেলেই তার ভিতর এই রেখা-সংস্থান আপনা থেকেই আসবে। এখন এই রেখার ভিতর কতটা প্রয়োজন এবং কতটা অপ্রয়োজন বিচার করার শক্তিই শিল্পীর শক্তি। ছোট ছোট শিশুরা নানাপ্রকার ছবি আঁকে; এমন কি কোনো কোনো শিশু বেশ ভালই ছবি আঁকে; কিন্তু তাদের সেই রেখার ছন্দ-বিচার থাকে না বলেই সেগুলিকে আর্টের কোঠায় ফেলা হয় না।...তবে বড় শিল্পীরা খেলার ছলেই বড় বড় কাজ জগতে রেখে গেছেন। প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তি বা ছবিগুলি দেখলে মনে হয় না যে, সেগুলি খুব পরিশ্রম করে তৈরী করেছেন শিল্পীরা। মনে হয় যেন অতি অবহেলায় সেগুলি রচনা করা। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবটিকে আনা সকল সময় সকল শিল্পীর দ্বারা হয় না।...খাজুরাহো, কোণার্ক এই দুটি প্রাচীন মন্দিরের খোদাই কাজের ভিতর যে কাজের আনন্দ আছে তা' তার খোদিত চিত্রের বিষয়গুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।...তা' ছাড়া ভরহুতের রেলিঙেএর মধ্যে কমলের ভিতর লক্ষ্মী ও দেবতার মূর্ত্তিগুলি কি সহজ ও সরল রেখাভঙ্গীতে গঠিত যে মনে হয় ইউরোপের অতি-আধুনিক শিল্পী এপষ্টাইন আর এর চেয়ে কত নূতন তথ্য এই বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করতে পারবেন?

আমাদের বিশ্বাস, এই সকল প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে তাঁদের অতি-প্রাচীনতম শিল্পীদের নিকট এই রেখা-ছন্দের শিক্ষলাভ করেছিলেন, নতুবা এমন শিল্পজ্ঞান কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কখনো তাঁরা সহসা অর্জ্জন করতে পারেন নি। দেখা যায় যে, রেলিংগুলির গঠন প্রভৃতিতে তাঁরা অতি-প্রাচীন কাঠের তৈরী রেলিঙের ভাব বজায় রেখেছিলেন।...

কিন্তু আসল কথা হ'ল এই যে, প্রাচীন শিল্পের রেখা-ছন্দের সংযম এবং ভাব-ব্যঞ্জনার গাম্ভীর্য্য বোঝবার ও ভাববার বিষয়। ইউরোপ আমাদের বোঝাবে তার সাধনার দ্বারা সেই আশায় ব'সে না থেকে নিজেদের সাধনা করতে হবে এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আনন্দের উৎস যেখানে, সেখানে পুনরায় ঘা দিতে হবে, তাহ'লে সেই প্রাচীন শিল্পের ছন্দ-কথা আমাদের কাছে সোনার জীয়নকাঠি ছোঁয়া রাজকন্যার মতই জীবন্ত হ'য়ে উঠবে।

(বঙ্গলক্ষ্মী—কার্ত্তিক, ১৩৩৭) শ্রীঅসিতকুমার হালদার

'বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ'

গত কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় 'বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠার পরিচয় পাইলাম তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি; "স্নেহঃ পাপশঙ্কী"---বাংলা ভাষার প্রতি ঐকান্তিক মমতাই তাঁহার এই অত্যধিক আশঙ্কার কারণ বলিয়া মনে হয়। তথাপি প্রবন্ধটি ভালো করিয়া পড়িয়া লেখকের মনোভাব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলাম না; তাই এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বাংলা ভাষার অতীত ও বর্ত্তমান, তাহার শক্তি ও বিশেষ করিয়া অশক্তি সম্বন্ধে, তিনি যে-সকল তথ্য-প্রমাণ ও কারণ সন্ধান দিয়াছেন, তাহাতে এ ভাষার ভবিষ্যৎ লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় নাই; অথচ এই তথ্যগুলিকে তিনি ঠিক উল্টা সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার যে কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি তাহা এই—বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার তুলনায় তাহার দৈন্য দর্শনে একটা ক্ষুব্ধ অধীর অসন্তোষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজীশিক্ষিত বহু বাঙ্গালীর যে মনোভাব—নিজ ভাষার প্রতি অনাস্থা—প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যদি আজও সেই মনোভাব শিক্ষিত বাঙ্গালাকে অভিভূত করে তবে তাহা যে বড় দুঃখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, যুক্তিপ্রবণতা এ সকল গুণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি সেই সকল গুণের অতিরিক্ত অনুশীলনে যে এক ধরণের cynicism জন্মে, তাহা কম অনিষ্টকর নহে। নির্ম্মম, অপক্ষপাত, যুক্তি-বিচার যদি শ্রদ্ধা সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টি (imagination)-সম্পন্ন না হয়, তবে সত্য-সন্ধান ব্যর্থ হয়। আমরা সকলেই জানি, সাদাকে কালো, এবং কালোকে সাদা করিবার পক্ষে যুক্তির অভাব ঘটে না---সত্যসন্ধান করিতে হইলে নিজ ব্যক্তিগত রুচি, অভিমান, বা অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হয়। লেখক মহাশয়ের নিজেরই তথ্যবিচারে যে স্পষ্ট আশার সূচনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে স্বীকার না করিয়া তিনি নিরাশার দিকেই ঝুঁকিলেন কেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এই প্রবন্ধে, তিনি দুই দিক দিয়া এই নৈরাশ্যের কারণ দর্শাইয়াছেন—(১) বর্ত্তমানে এই ভাষার অন্তর্বিরোধ ও বহির্বিরোধ; (২) এই ভাষার সর্ব্বভাব-প্রকাশক্ষমতার অভাব ও এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের অতিমাত্র সঙ্কীর্ণতা।

প্রথমটির প্রথমাংশের আলোচনায় তিনি একটি অভিনব ধারণার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,—বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর 'জাতীয়' ভাষা হইতে পারে নাই, অর্থাৎ বহু উপভাষার অত্যধিক স্বাতন্ত্র্য থাকায় ভাগীরথী তীরের উপভাষা সমধিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সাধারণ ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, লেখক এই ভাষার প্রাধান্য বা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাষা হইবার দাবী স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত; এবং তাহার পক্ষে তিনি নানা যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এ-সকল যুক্তির পূর্ব্বে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই ভাষা ভুঁইফোঁড় ভাষা নয়, ইহার একটা বনিয়াদী ভিত্তি আছে (যেমন আর কোনও উপভাষার নাই)—এই রাঢ়ের ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বকাল হইতেই একটা সাহিত্যিক আদর্শ ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল; সেই রাঢ়ের ভাষাই পরবর্ত্তী যুগের ভাগীরথ-সভ্যতার কৃষ্টির সাহায্যে বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। লেখকের সংশয়ের কারণ এই ভাষার কথ্য রূপ লইয়া,—সাহিত্যিক ভাষা-হিসাবে ইহা যে আপন প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে, তাহাতে বোধ করি তাঁহার অসম্মতি নাই; বরং, এক ক্রিয়াপদ ছাড়া, আর কোনও ভঙ্গিতে ইহাকে কথ্যভাষার অনুসারী করিবার চেষ্টা যে ফলবতী হয় নাই তাহা তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু এই উপভাষার কথ্য রূপটিই সাহিত্যিক রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে—সাধুভাষার মণিমালার মধ্যে তাহার ডোরটির মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এজন্য বাংলা-সংস্কৃতির নিত্যব্যবহার্য্য জীবন্ত বুলিহিসাবে এই উপভাষা যে অবর্জ্জনীয়, তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? প্রাদেশিক উপভাষা কোন্ দেশে প্রচলিত নাই? সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ দেশের standard উপভাষা-জাতীয় ভাষা হইতে পারিয়াছে? কলিকাতার (?) কথ্য-ভাষা সভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের একমাত্র অবলম্বন হইতে বাধ্য, তাহার কারণ এই ভাষার আপেক্ষিক নমনীয়তা, ইহার বাক্‌ভঙ্গির সরসতা এবং ইহার শব্দ-সজ্জায় মার্জ্জিত মনোবৃত্তি, ভাবুকতা, ও রসিকতার সহজ বিকাশ; এক-কথায় বাংলার এই একমাত্র উপভাষাই বহুদিন বর্ব্বরতার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা শকুন্ত-ভাষা না রহিয়া মানব-ভাষার পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। সেজন্য, ইহা যে প্রদেশের ভাষা সেই প্রদেশবাসীর কোন বিশেষ গৌরবের কারণ হয়ত নাই, কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার ফলে এই সৌভাগ্য তাহাদের ঘটিয়া থাকিতে পারে ভাষাকে বাণী-সৌন্দর্য্যদান করিতে হইলে জাতির যে রসবোধ, মার্জ্জিত রুচি ও আধ্যাত্মিক কৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা হয়ত' এ প্রদেশবাসীর একচেটিয়া নহে; কিন্তু যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার বা করিবার নাই। সব দেশেই এইরূপ ঘটে, এবং এ প্রাধান্য শিরোধার্য্য করিতেই হয়। বর্ত্তমান যুগে কলিকাতা বাংলা-কাল্‌চারের কেন্দ্র হওয়ায় সকল বাঙ্গালীর পক্ষে এই ভাষার পরিচয় লাভ এবং তদ্দ্বারা বাংলা-কালচারের উৎকর্ষের দিকটিকে আত্মসাৎ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, ইহা তাহাদের বহু ভাগ্য। আজ যে সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাদ-বিসম্বাদ রাগ-দ্বেষ প্রকাশ করিবার একটা ভদ্র জাতীয় ভাষা লাভ করিয়াছেন, তাহাও ইহারই কল্যাণে—এমন কি এই ভাষারই বিরুদ্ধে আলোচনা করিবার কারণ ও উপায়, উভয়ই মিলিয়াছে ইহারই প্রসাদাৎ। এই ভাষাই যে পরিমাণে দূরতম প্রদেশে প্রসারিত হইবে সেই পরিমাণে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের আয়তন বিস্তৃত হইবে; যে বাঙ্গালী এই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন তিনিই শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন। এখনও ঠিক তাহা হইতেছে না, তাহার কারণ আর কোনও উপভাষার

মহিমা নয় ; মাতৃভাষার ইজ্জত অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার ইজ্জত বেশী বলিয়া। কিন্তু এদিকেও যে হাওয়ার পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন– দূরতম প্রদেশের বাঙ্গালাও কলিকাতার ভাষা আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইতেছেন। ইহা অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইংরেজী standard [জাতীয় ?] ভাষার কথাই ধরা যাক। ইংরেজের কথা ছাড়িয়া দিই, স্কটলণ্ডবাসীর পক্ষেও বিশুদ্ধ ইংরেজী আয়ত্ত করা সম্ভব হইয়াছে শিক্ষা ও চর্চ্চার ফলে ; কোনও প্রদেশবাসী ইংরেজ বা স্কচ্ ভদ্রলোক যদি এই ভাষাকে আয়ত্ত না করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে ওই ভাষার দুর্ব্বলতা বা অনুপযোগিতা প্রমাণিত হয় না—ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার অভাবই সূচিত হয়। কথা উঠিতে পারে, এইরূপ একটা standard ভাষা দেশময় প্রচলনের যে সুযোগ ও আবশ্যকতা ইংলণ্ডে ছিল বা আছে, তাহা বাংলায় আছে কি ? যদি তাহা না থাকে এবং কখনও তাহা না হয়, তবে তাহার কারণ একই—বাঙ্গালা জাতির জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিলম্ব, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই জাতির সর্ব্ববিধ আত্মোৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থার অভাব। ইহা যদি সম্ভব না হয়, তবে ভাষা কেন, এই জাতির জাতীয় জীবনই সঙ্কটাপন্ন হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথা এখনই জোর করিয়া বলা চলে, তাহা এই—বহু উপভাষার মধ্যে একটা উপভাষাই যে প্রাধান্য লাভ করে, তাহা যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কারণেই হউক - মূলে তাহা একটা accident-এর মত হইলেও—তাহার গূঢ়তর কারণ ঐ ভাষারই অন্তর্নিহিত শক্তি। বাংলা ভাষার ইতিহাসে যে উপভাষা এই চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছে, শিক্ষিত সমাজের মনোভাব-প্রকাশে সেই ভাষার প্রভাব কোনও সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক অভিমানের দ্বারাই ক্ষুণ্ণ হইবার নয় ; যাহা নিজ শক্তি শ্রী ও সমৃদ্ধিবলে একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আর কোনও উপভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহা অসম্ভব। বর্ত্তমানে এই ভাষার উপর প্রাদেশিক ভাষার যে উপদ্রব লেখক-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাতেও শেষ পর্য্যন্ত কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। লেখক-মহাশয় যে 'উপভাষা'র প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন---ইহা তাহার সেই প্রাধান্যেরই একটি স্পষ্ট প্রমাণ। প্রাদেশিক ভাষাভাষী বাঙ্গালী এই ভাষাকেই আয়ত্ত করিবার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও, এখনও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারিতেছেন না, তাই বহু অশুদ্ধ প্রয়োগ তাঁহাদের ভাষায় ও রচনায় এখনও দেখা যাইতেছে---কেহ কেহ হয়ত এই অক্ষমতাকেই প্রাদেশিক ভাষার ন্যায্য অধিকার বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু কতকগুলি গ্রহণযোগ্য শব্দ এই উপায়ে ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গেলেও, ভাষার রীতি প্রকৃতি বা গঠনে 'প্রাদেশিকতা' কখনই জয়ী হইবে না ; তার কারণ, বাংলা কৃষ্টির যত প্রসার ঘটিবে, ততই সকল প্রদেশের বাঙ্গালীই এই প্রাদেশিকতার বিরোধী হইবে—ভাষাগত শালীনতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অজ্ঞান-প্রসূত অভিমান দূর হইবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক বুলির কোনো কোনো শব্দ হয়ত বিনা আপত্তিতেই এই ভাষায় প্রবেশ করিবে ; 'প্রাণপণে'র পাশে 'আপ্রাণ' টিকিয়া থাকিবে ; সঙ্গে'র সঙ্গে সাথে' এবং 'করলে' বা 'বললে'র স্থানে বিকল্পে 'করুন' বলুন ---এমন কি 'মোটামুটি'র সঙ্গে 'মোটামোটি ও হয়ত চলিবে ; কিন্তু দোকান দিয়াছে', দালান দিয়াছে' চলিবে না। 'তা'র'-এর স্থানে ওর', অথবা 'আলাদা' অর্থে 'আলগা', 'চোপ টান ক'রে' বুক টান ক'রে' প্রভৃতি বিশুদ্ধ বুলির ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য হইবে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতার আর একটা কারণ---বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা-মূলক কোনও প্রতিষ্ঠান এখনও কোনো দিক দিয়াই গড়িয়া উঠে নাই।

লেখক-মহাশয়ের মতে বাংলা ভাষার ঐক্যবিধানের আর এক অন্তরায় পর-ভাষার আক্রমণ। এ বিষয়ে তিনি মুসলমানী বাংলা ও হিন্দী এই দুই-এর উপদ্রব আশঙ্কা করিয়াছেন। মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে ভাবিবার আছে বটে, কিন্তু যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের জীবনধারার মূল নিয়ম অবগত আছেন, তাঁহারা এ সমস্যায় বিচলিত হইবেন না। বাঙ্গালী মুসলমান যদি বাঙ্গালা না হ'ন, তবে তাঁহারা এই দেশে বাস করিয়া কখনও সেই শক্তি সেই প্রতিভার অধিকারী হইবেন না, যাহা দ্বারা এক্ষেত্রে সত্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব। বাংলা ভাষাকে জোর করিয়া আরবী ফারসী উর্দ্দুর ছাঁচে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের সংখ্যাবাহুল্য যেমনই হউক, আমার মনে হয়—তাঁহারা 'নিহতাঃ পূর্ব্বমেব', তাঁহাদের দ্বারা ভাষার মত এত বড় একটা জীবন্ত সত্য বস্তুর কোনও হানি হইতে পারে না। তাঁহাদের এইরূপ experiment-এর ফলে, আবশ্যকমত আরও কিছু বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে পারে, কিন্তু তদ্দারা বাঙ্গলা ভাষার আত্মা বা প্রাণ-শক্তির কোনও ক্ষতি হইবে না। বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক আস্ফালন ও হুড়াহুড়ি যে কখনও নিত্যকার সত্য হইতে পারে না, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ নাই। এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে বাঙ্গালীর জাতীয়তাই আরও ব্যাপক হইয়া উঠিবে, এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি আরও বিচিত্র, আরও বেগবান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মোটের উপর বাংলা ভাষা যদি এখনও সেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া না থাকে, যাহা দ্বারা সর্ব্ব অবস্থায় নিজ জাতি-রক্ষা সম্ভব, তাহা হইলে, বাংলা ভাষা কেন—বাঙ্গালা জাতিরই ভবিষ্যৎ নাই বলিতে হয়। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহাদের আশঙ্কা ঘটিয়াছে, তাঁহারা যে বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যলোপেরও আশঙ্কা করিবেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত ; সম্ভবতঃ উপস্থিত আলোচনার বাদ-প্রতিবাদে সেই বিতর্কই উঠিবে, অতএব এখানে এ প্রসঙ্গে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। বর্ত্তমানে আমরা এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি যাহার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ফলাফল সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করা দুঃসাহসমাত্র। আমাদের নেশনত্ব স্পৃহার মূলে যে বিজাতীয় প্রভাবের চাঞ্চল্য যুগধর্ম্মের তাড়নায় ঘটিতে বাধ্য, তাহাকেই বড় করিয়া দেখা ও দেখানো যে যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সহজ---এবং নানা কারণে কাহারও কাহারও জাতীয় আত্ম-চৈতন্য আচ্ছন্ন হওয়াও বিচিত্র নয় ; একজন্য সমস্ত অনুকরণ-কর্ম্মের অন্তরালে জাতির নিজস্ব প্রবৃত্তি ও ঐতিহ্য-সংস্কার বা স্বধর্ম কি ভাবে নূতন করিয়া পথ খুঁজিতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে হইলে কেবল কতকগুলি সুলভ ও প্রত্যক্ষ তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তর্ক-যুক্তির দ্বারা সত্য-সন্ধান হইবে না।

লেখক মহাশয় এই প্রসঙ্গে হিন্দীর সঙ্গে বাংলার শক্তি-পরীক্ষার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষার জন্ম-মূলে শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রভাব উল্লেখ করিয়া, আজিও সেই কারণে বাংলার হিন্দী-মুখীনতার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভাষাতত্ত্ব বা ভাষার ইতিহাসে সম্যক অধিকার না থাকিলেও আমি এই সিদ্ধান্ত অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহি। নদী-প্রবাহ যে পুনরায় উৎসমুখে ফিরিয়া যায়, এমন কথা বোধ হয় evolution-বাদীরাও স্বীকার করেন না। যে মূলভাষা হইতে ইংরেজীর উদ্ভব হইয়াছে, জর্ম্মান ভাষা তাহার নিকটতর বংশধর বলিয়া ইংরেজী কি কোনও অবস্থায় পুনরায় জর্ম্মানত্ব লাভ করিবে ? না, ইংরেজী যে ধরণের একটা স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া উঠিয়াছে---বাংলা এখনও ভাষা-হিসাবেও সে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই ? লেখকবাঙ্গালী না হইয়া যদি কোনও

বিদেশী গবেষক হইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার নির্ম্মম যুক্তিমত্তা এতদূর অগ্রসর হইত না। লেখক কলিকাতার মত শহরে কুলি ও দোকানদারদের সংস্পর্শে যে ধরণের যে হিন্দী বুলির আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াছেন, মাদ্রাজ অঞ্চলে সে ধরণের ইংরেজী বুলির প্রচলন বোধ হয় আরও বেশি: কিন্তু সেজন্য তামিল বা তেলেগুর জাতি যাইবার আশঙ্কা হইয়াছে কি? জানি না, যদি হইয়া থাকে তবে সে ভাষার জন্য দুঃখ হয় বটে কিন্তু পরিতাপের কারণ নাই। হিন্দী ও বাংলা এবং ইংরেজী ও তামিলের সম্বন্ধ একরূপ নয় জানি, কিন্তু প্রভাবের ধরণ উভয়ত্র একই—এইজন্য এ দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষার গ্রাম্য হিন্দীর যে উৎকট প্রভাব দেখা যায়, লেখক তাহাই স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বাংলা ভাষার জাতিচ্যুতি ঘটে নাই এবং ঘটিবেও না; তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল অঞ্চলের বাঙ্গালীরা মূল বাঙ্গালী সভ্যতা বা কাল্‌চার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আছেন, তাহারই ফলে ভাষার এই মলিনতা ঘটিয়াছে। 'কুত্তা', 'বকরী'—এমন কি 'বিজয়াদশমী'র পরিবর্ত্তে 'দশেরা' প্রভৃতি যে অগণ্য অ-বাঙ্গালী বুলির প্রচলন সেখানে দেখা যায়, তাহাতে কেবল ইহাই মনে হয় যে, এ সকল অঞ্চলে 'শুদ্ধি'র প্রয়োজন আছে।

কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার প্রভাবে যে কোনও প্রাদেশিক ভাষার পূর্ণ প্রসারে বাধা ঘটিবার যে সম্ভাবনা আছে তাহা আমারও মনে হয়; এবং ইহাও মনে হয়, যদি সেইরূপ কোনও একটা রাষ্ট্রভাষার সত্যই উদ্ভব হয় তবে বাংলা সে স্থান অধিকার করিবে না। কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে—ভারতের ভাগ্যবিধাতা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে কি বিধান করিবেন সে সম্বন্ধে কল্পনাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া লাভ কি? যাঁহারা ধীর চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বর্ত্তমান আন্দোলনের বাহ্য আকারের অন্তরালে সারা ভারতের একাত্ম-সাধন অপেক্ষা একটা উগ্র প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা লক্ষ্য করিতেছেন; পরিণামে কি ঘটিবে, ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয়তার কোন্ মূর্ত্তি দেখা দিবে সে সম্বন্ধে এখন নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। পূর্ব্বকালে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধের অভাবে, হিন্দু সংস্কৃতিমূলক যে বন্ধনসূত্রে একটা মহাভারতের প্রতিষ্ঠা হইযাছিল, আজিকার এই রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষার ফলে সেই আত্মীয়তা কি ভাবে কতটুকু বজায় থাকিবে, সে বিষয়ে ভাবনার কারণ আছে। অতএব এখনই রাষ্ট্রভাষার জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যদি সেরূপ কোনও রাষ্ট্র-ভাষার প্রাধান্য ভবিষ্যতে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কতক পরিমাণ আত্মসঙ্কোচের ফলে বাংলা ভাষা যে পতিত হইয়া থাকিবে, বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষারূপে তাহার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি অথবা ঘরোয়া প্রয়োজনের পক্ষে তাহার উপযোগিতা হ্রাস হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ দেখি না। জগতের অপর কোনও বৃহত্তর গৌরবাঢ়ী ভাষার পাশে আসন না পাইলেও একটা জাতিবিশেষের ভাষারূপে তাহার মূল্য নির্ভর করিবে এই জাতির নিজস্ব প্রতিভা ও প্রাণ-মনের উৎকর্ষের উপর। বাঙ্গালী সেই নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে নানাক্ষেত্রে দিয়াছে—একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সম্যক প্রকাশ বাঙ্গালীকে ভারতীয় অপর সকল জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণও যথেষ্ট আছে; বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, তথাপি আজিকার দিনে তাহার বংশ ও কীর্ত্তি পরিচয় নিতান্ত দুর্ল্লভ নয়। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, কিন্তু যে-পরিমাণ মালমসলা ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে অন্ততঃ বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—অন্ততঃ সেইগুলিই আমি সকল বাঙ্গালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। লেখক-মহাশয় উত্তর ভারতের যে কাল্‌চার ও হিন্দী ভাষার প্রভাবকে বাঙ্গালীর জন্মগত সংস্কার বলিয়াছেন, বাঙ্গালী যে তাহার নিকটেই মাথা মুড়াইয়া এ যাবৎ পণ্ডিতাগার্ভ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাংলার আর্য্য-সংস্কৃতিও বিশেষভাবে বাঙ্গালিয়ানায় রঞ্জিত—হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী এই সংস্কৃতিকে আপনার মত করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। বাঙ্গালার ধর্ম্ম সাধন, পূজা-পার্ব্বণ, স্মৃতি-সংহিতা, আহার-বিহার, আচার ব্যবহার, বেশ ভূষা—সর্ব্বত্র যে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, ততখানি স্বাতন্ত্র্য আর কোথাপি দেখা যায় না। ইহার মূলে কতটা বেদবিরোধী বৌদ্ধ তান্ত্রিক মনোভাব শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সাক্ষ্য দিবেন। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, আর একটা কথা কি কেহ অস্বীকার করেন?—কেবল ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার শাসনে এককালে কতকটা উপকার হইলেও সেই শাসনে কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য কখনও লোপ পায়? যুরোপে Holy Roman Empire কি টিঁকিয়াছে? এমন যে সর্ব্ববৈচিত্র্য-ধ্বংসকারী ইসলাম—এই ইসলামও কি মিসরে, পারস্যে, ভারতে ও চীনে সকল বৈশিষ্ট্যের একাকার সাধন করিতে সত্যই সক্ষম হইয়াছে? বাঙ্গালী যে উত্তরাপথের শাসন সম্পূর্ণ মানিয়া লয় নাই, তাহার আর এক প্রমাণ—বাংলার বাহিরে কোথাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর্য্যত্বের সম্মান লাভ করে নাই; বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীর প্রতি পশ্চিমাঞ্চলের যোগী সন্ন্যাসীদেরও সঘৃণ কটাক্ষ সকলেরই সুবিদিত। আমরা উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি বা হিন্দী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষা বা কাল্‌চারের দাসত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখি না।

লেখক-মহাশয়ের আশঙ্কার প্রধান দিকটার আলোচনা করিলাম। তিনি যে অপরদিক, অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মজ্জাগত দৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। যিনি কোনও ভাষা বা সাহিত্যের কোষ্ঠীবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যদি সেই ভাষার অতীতের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের শ্রী-সম্পদ দৃষ্টে তাহার গতিপরিণতির ধারা লক্ষ্য না করেন, কেবলমাত্র কোনও সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিশালী পরভাষার দিকে চাহিয়া নিজ ভাষা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ও হতাশা পোষণ করেন, তবে দীন-হীন আমরা সে অপবাদ নীরবে সহ্য করিব,—না করিয়া উপায় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এ ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী গ্রাহ্য করিব না। কারণ, বাংলা ভাষার দৈন্য তাহার মজ্জাগত নয়; এবং বাংলা সাহিত্যের যে বিশীর্ণতা এখনও ঘুচে নাই তাহার কারণও কোনও বংশানুক্রমিক ব্যাধি নয়। ভাষা ও সাহিত্য অন্যোন্যসাপেক্ষ হইলেও এ দুইএর শক্তি-মূল স্বতন্ত্র। কোনও ভাষা অতি সমৃদ্ধ হইলেও (যেমন সংস্কৃত ভাষা) তাহাতে যেমন অন্য কারণে সাহিত্য-সৃষ্টি বাধা পাইতে পারে, তেমনি ভাষা এককালে অপরিপুষ্ট থাকিলেও জাতির জীবনোল্লাসের ফলে সেই ভাষাতেই সাহিত্যের বান ডাকিয়া থাকে। বাংলা ভাষা গত শতাব্দী হইতে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই তাহার potential সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ আর নাই। যদি প্রতিকূল অবস্থার বশে জাতির প্রাণ-মনের শক্তি কোনও কালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা বাধাগ্রস্ত হয়, বা নানা কারণে ভাষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার সুযোগ না ঘটে, তবে সেটা ভাষার অপরাধ নয়। যাহা এখনও সম্ভব হয় নাই তাহা যে কখনো সম্ভব হইবে না, এবং তাহার প্রধান কারণ সে ভাষারই মজ্জাগত অশক্তি—বাংলা ভাষার সম্বন্ধে সে অভিযোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। বরং এই

ভাষার যেটুকু শক্তি, এই সাহিত্যের যে অপরূপ রস-লীলা আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে এই প্রশ্নই জাগে—যে জাতি তাহার ভাষার এবম্বিধ জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছে, সে জাতি কি মরিবে? লেখক-মহাশয় এই ভাষা ও সাহিত্য বিচারে একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, যে-ভাষায় সত্যকার রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে সে ভাষা দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে—সে ভাষার অমৃত-সংস্কার হইয়া গিয়াছে; এই শক্তি ও সৌভাগ্য জগতের যে কোনও ভাষার যদি একবার ঘটে তবে সে ভাষার আর বিনাশ নাই; জাতির প্রাণ-মনের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির সঙ্গে ভাবের রাজ্যে সে ভাষার অভিযান অপ্রতিহত হইবে। লেখক-মহাশয় বাংলা ভাষার সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষমতার যে অভাব লক্ষ্য করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, সেটা ভাষার চর্চ্চার উপর নির্ভর করে; সে শক্তি শ্রম-সাপেক্ষ, প্রতিভা-সাপেক্ষ নয়। যে ভাষায় literature of power সৃষ্টি হইতে পারে, সে ভাষায় literature of knowledge হইতে পারা একটা সমস্যার ব্যাপার নয়। Literature of knowledge-এর জন্য, ভাষাকে সর্ব্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধির উপযোগী করিবার জন্য, তাহাকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনযাত্রার কারখানায় মজুর-বৃত্তি করাইতে হয়—ইহা প্রয়োজনসাপেক্ষ, উদ্যমসাপেক্ষ, জাতির পুরুষকার-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের মজুর-বৃত্তি কোনও ভাষাকে জোর করিয়াও করানো যায়, কিন্তু যাহা জোর করিয়া ইচ্ছামাত্রে করানো যায় না—সেই দুর্লভ রস-সৃষ্টির পরিচয় আমরা বাংলা ভাষায় যে-ধরণের যেটুকু পাইয়াছি, তাহা যে-কোনও ভাষার পক্ষে গৌরবজনক, এজন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ। যে ভাষার সে শক্তি আছে সে-ভাষা যে প্রয়োজনের তাড়নায়, জাতির দৃঢ়সঙ্কল্পের তাগিদে অপর শক্তিও লাভ করিতে পারিবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। এই শক্তি বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে যেখানে যে পরিমাণ বিদেশী শব্দের সহায়তা গ্রহণ ন্যায্য হইবে তাহাতে ভাষার ধর্ম্মহানি হইবে না—যাহা অনাবশ্যক বা ভাষার স্বধর্ম্ম-সঙ্গত নয় তাহা আপনিই ঝরিয়া যাইবে।

লেখক-মহাশয়ও ভাষার ভবিষ্যৎকে জাতির ভবিষ্যতের সহিত জড়িত বলিয়া মনে করেন, এবং অনেকস্থলে তিনি নিজ নৈরাশ্যের প্রতিষেধক যুক্তিও উত্থাপন করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে কেন সহসা বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন আতঙ্কিত হইলেন, উহাই আশ্চর্য্য। আমার মনে হয়, তিনি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার আলোচনা করিলে এমন দ্বিধাগ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১০) বলিদ্বীপ—বাদুঙ ও উবুদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শনিবার।—

সকালে ধীরেনবাবুর সঙ্গে বাসা থেকে বাদুঙ শহরে একটু ঘুরতে বেরুলুম। শহরের হাট বা বাজারের চত্বরেই যা কিছু দেখবার। বাজারের মধ্যে খানিক ঘুরলুম—ঘুরে ফিরে বলিদ্বীপের জীবনের নানা বর্ণে উজ্জ্বল ও মধুর চলচ্চিত্র উপভোগ ক'রলুম। বাজারে এদের নানা রকমের শিল্প দ্রব্য দেখলুম। তার মধ্যে হাতী, সিংহ আর ঘোড়া-মুখো সুপারী-কাটা জাঁতি কিনলুম—কালো লোহার উপরে সাদা টিনের কোফ্‌ৎ-গারী রেখাপাতে, আর জন্তুগুলির মুখের গড়নের প্রাণবান সৌন্দর্য্যে এই জাঁতিগুলি বাস্তবিকই উচ্চ অঙ্গের তৈজস-শিল্পের নিদর্শন। মালাইদেশে কুআলা-লুম্পুরের সংগ্রহশালায় মালাই শিল্পের সমাবেশের মধ্যে এই রকম জাঁতি আমরা দেখে প্রশংসা ক'রেছিলুম। অন্য পিতলের আর তামার জিনিসও দু একটী নিলুম—চন্দ্রপুলি জাতীয় মেঠাইয়ের উপরে নকশা কাটবার জন্য ছোটো একরকম চাকা; পান ছেঁচবার জন্য পিতলের হামানদিস্তা; আর দেবতাদের মূর্ত্তি আঁকা পেটা তামার পাত্র, পঞ্চপাত্রের মতন—এদের পূজায় ব্যবহার করে,—পূর্ব্ব যবদ্বীপের Tengger তেঙ্গের অঞ্চলের লোকেরা এখনও মুসলমান হ'য়ে যায় নি, তাদেরও পূজা অনুষ্ঠানে এই ধরণের পাত্র এখনও ব্যবহৃত হয়।

সকালেই বাকেরা কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেনবাবুর সঙ্গে উবুদ রওনা হ'লেন। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে কবির সঙ্গে যাত্রা ক'রলুম। সকালটায় আমাদের বাসার বারান্দায় ব'সে লোক-চলাচল দেখতে লাগলুম। হঠাৎ

দূর থেকে গামেলানের ধ্বনি কানে এল; ছোটো একটা মিছিল রাস্তা দিয়ে গেল, গামেলান বাজনা বাজাতে বাজাতে রঙীন সারং পরা কতকগুলি পুরুষ, খোঁপার নানা রঙের ফুল প'রে কতকগুলি স্ত্রীলোক, আর কতকগুলি ছোটো ছেলে, সকলেই উৎসবের বেশে সজ্জিত; মেয়েদের মাথায় কাঠের বারকোষে আর হাঁড়ি আর ঝুড়িতে নানা ফল-ফুলুরী, মঙ্গল উপচার; দলের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি খোলা ছাতি, সব লাল কাপড়ে মোড়া সেকেলে তালপাতার ছাতি। সকালের মিষ্টি রোদ্দুরে এই শোভাযাত্রাটী অজন্টার যেন এক জীবন্ত প্রতিরূপ হ'য়ে চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল, কি অপরূপ সুন্দর লাগ্‌ল যে কি আর ব'লবো। কবিও মুগ্ধ হ'য়ে প্রশংসা ক'রতে লাগলেন।

বেলা আড়াইটেয় আমরা উবুদ যাত্রা ক'রলুম। গৃহস্বামী পুঙ্গব সুখবতী কবিকে স্বাগত ক'রে নিয়ে বসালেন। রাস্তায় তখন ভীড় আর ধরে না। সুখবতীর বাড়ীর কোণে চৌরাস্তার ধারে pavillion বা ছতরীতে চেয়ার দিয়ে কবির বসবার জায়গা ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদেরও কবির কাছে বসবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। ডচ্ ভদ্র মহিলা ও পুরুষ যাঁরা উৎসব দেখতে এসেছিলেন তাঁদেরও অনেকেও ছতরীতে এসে ব'স্‌লেন। কবির সঙ্গে এঁদের আলাপ হ'তে লাগ্‌ল। এঁদের মধ্যে ডচ Official Tourist Bureau-র কর্ত্তা শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda আর তাঁর সহধর্ম্মিণী, আর শ্রীমতী Demont নামে একটি ডচ্ মহিলা, যিনি বান্দুঙ শহর থেকে এসেছিলেন আর আমাদের নিয়ে কবিকে বান্দুঙে তাঁরই বাড়ীতে অতিথি হ'তে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, ইনিও ছিলেন, পুঙ্গব সুখবতীর

পুঙ্গব সুখবতীর প্রাসাদের কোণের ছতরী রাস্তায় মেয়েদের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

পুঙ্গব সুখবতীর ভাই
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

একটি ছোটো খুড়তুতো ভাইকে দেখলুম—অতি সুপুরুষ নবযুবক, দাদার হ'য়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে আভিজাত্যপূর্ণ সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যাগতদের কাছে কাছে আছে। এর পরিধানে সোনার জরীর বড়ো বড়ো ফুল তোলা বেগুনে রঙের 'সুন' বা রেশমের কাপড়, সেই রকম রঙীন জরীদার উত্তরীয় কোমরে জড়িয়ে' বাঁধা, গায়ে সাদা রেশমের পাঞ্জাবীর মতন একটা হাত-কাটা জামা, কোমরে একখানা ক্রিস বাঁধা, আর মাথায় রঙীন রুমালের ছোটো একটা পাগড়ী বাঁধা। ছেলেটার সঙ্গে পরে আমার আলাপ হ'য়েছিল। কিছু কিছু ইংরিজি ব'লতে পারে। যবদ্বীপে Malang মালাং শহরে একটা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেখানে ডচ আর অন্য ইউরোপীয় ভাষা পড়ানো হয়। এর ডাক-নাম Tjokorde Rake চকর্দে রাকে।

রাস্তায় আজকেও মেয়েদের শোভাযাত্রা হ'ল। এই 'যাত্রা' বা মিছিল এদের সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। তবে আজ গত কল্যের মত অত ভীড় ছিলনা শোভা-যাত্রাটীতে। রাজবাড়ীর মেয়েরা আজকেও শোভাযাত্রায় যোগদান ক'রেছিলেন। কালকের মতন আজও বাঁশের মাচা পথ বেয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে তবে মেয়েদের শোভাযাত্রা রাজবাটীতে প্রবেশ ক'রলে। পুঙ্গব সুগ-বতীর ভাই উপরে উঠে দাঁড়ালেন, রাজবাড়ীর মেয়েদের নামবার সময়ে সাহায্য ক'রতে। সমস্ত ব্যাপারটা, আর তার সঙ্গে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষের ভীড়, সবটার একটা মনোহর শ্রী আর শালীনতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়ে যথেষ্ট সাধুবাদ দিলেন।

শোভাযাত্রা ঢুকে যাবার পরে বাঁশের আর রঙীন কাগজের কতকগুলি পুতুল নিয়ে বেরুল—লম্বা লম্বা ক'রে বানানো এলো-চুল রক্তদন্তিকা রাক্ষসীর মূর্ত্তি, রাক্ষসের মূর্ত্তি; এই সব পুতুল নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রতে লাগ্‌ল, কোথাও বা দু চারটে পুতুল একত্র ক'রে একটু পুতুল-নাচ বা নাট্যাভিনয় ও ক'রলে। দূর পাড়াগাঁ থেকে আগত বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষ আর ছেলের দল ভীড় ক'রে এই পুতুল-নাচ দেখতে লাগ্‌ল।

আমরা ছতরীতে আর বেশীক্ষণ ব'সে রইলুম না, ভীড়ের মধ্যে ঘুরতে লাগলুম। সুরেনবাবু আর বাকে ক্যামেরা এনেছিলেন, ছবি তুলতে লেগে গেলেন।

তারপরে রবীন্দ্রনাথ পুঙ্গবের বাড়ীতে অতিথিদের বসবার ঘরে একটু বিশ্রাম ক'রে বাঙ্গুঙে ফিরে গেলেন। আমরা র'য়ে গেলুম। পুঙ্গবের অনুরোধমতো আজকে আমায় বেদপাঠ ক'রতে হবে। পূজোর জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিলুম। পাঠের জন্য বইও সঙ্গে ছিল। পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদান, পঞ্চপাত্র,—এসব ছিল। সাধারণ পাঠে পঞ্চপ্রদীপের দরকার হয় না, কিন্তু বাহুল্য ক'রে সেটি জালিয়ে রেখে দিয়ে পাঠ ক'রবো স্থির ক'রেছিলুম। পঞ্চপ্রদীপ জালবার জন্য একটু ঘী পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম; শুনলুম ও দেশে ঘীয়ের নামও কেউ জানে না—দুধই খায় না তো ঘী পাবে কোথা থেকে? পদণ্ডেরা কি দিয়ে হোম করে জিজ্ঞাসা করায় ব'ল্‌লে যে হোম প্রায় অজ্ঞাত, আর যদি বা কখনও কখনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটু হোম করে, তা হ'লে নারকেল তেলেই 'মধ্বাভাবে গুড়ম্'-এর মতো ঘৃতাভাবে নারিকেল তৈল দিয়েই কাজ চালায়। সন্ধ্যে হবার কিছু পরে আমাকে যে আঙিনায় পদণ্ডদের বসবার মাচা হ'য়েছে সেইখানে নিয়ে গেল। সমস্ত আঙিনাটায় লোক গিশ্‌গিশ ক'রছে। আজকে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পর্কে পূজা পাঠ অনুষ্ঠানাদির ঘটাটা একটু বেশী। আমি মাচার উপরে উঠে পাঠের ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। ডাক্তার খোরিস্‌ও উঠলেন। মাচার উপরে চারিদিকে একটু বারান্দার মতন স্থান, আর মাঝে একটু উঁচু জায়গা—বারান্দা থেকে একহাত আন্দাজ উঁচু হবে। বিজলীর বাতি জ্ব'লছে, আর্ক ল্যাম্প ও আছে। মাচার উপরে উঠে উঁচু জায়গাটিতে ব'সে, ওদেরই দেওয়া একটা ছোটো কতকটা ডমরু আকারের একটি-পায়াযুক্ত কাষ্ঠাধারের উপরে একখানি কাপড় বারকোষ রেখে পাঠের জন্য পুস্তকাধার ক'রে নেওয়া গেল। প্রচুর ফুল ছিল, বারকোষের উপরে বই ক'খানা রেখে বইয়ের চারিদিকে ফুলগুলি সাজিয়ে রাখলুম। পঞ্চপ্রদীপ জেলে পুস্তকাধারের পাশে রেখে দিলুম। কি কি প'ড়্‌বো তা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

পুঙ্গব সুখবতী, তাঁর কতকগুলি আত্মীয় আর তাঁর কতকগুলি পদণ্ড—এঁরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বেদপাঠ শোনবার জন্য মঞ্চের উপরে এসে দাঁড়ালেন। আমি ডাক্তার খোরিসকে বুঝিয়ে দিলুম—ইংরিজীতে—যে কঠোপনিষৎ আর গীতা থেকে কিছু কিছু প'ড়বো—কঠোপনিষদের প্রথম গোটা দুই বল্লী, আর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আর একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন); আর শেষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের কতকগুলি ঋক্ প'ড়বো, সেগুলি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পঠিত হ'য়ে থাকে; আর 'মধু বাতা ঋতায়তে' এই সূক্ত দিয়ে আমার পাঠ সাঙ্গ ক'রবো। পঠিতব্য অংশগুলির আশয়ও কিছু কিছু ব'লে দিলুম। শ্রীযুক্ত খোরিস মালাইয়ে পুঙ্গব আঁর পদণ্ডদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। আমি আচমন ক'রে যথাবিধি ব'সে নিয়ম-মতন সুর করে উপনিষৎ আর গীতা থেকে প'ড়লুম—আর বেদথেকে সাদাসিধে ভাবে প'ড়লুম—স্বাধ্যায় করা আমার জানা নেই, সেরকম ক'রে পড়বার চেষ্টা ক'রলুম না। আঙিনায় সমাগত বলিদ্বীপীয় লোকেরা চুপ ক'রে শুনলে—গোলমালের লেশও ছিল না। ব্যাপারটা এদের আছে অবশ্য খুবই নোতুন ছিল। আমার উচ্চারণ আর পাঠের রীতি এদের কাছে সম্পূর্ণ রকমে অজ্ঞাত, বইগুলিও অজ্ঞাত—তান্ত্রিক কতকগুলি মন্ত্র নিয়েই এদের পদণ্ডদের কারবার। আমি মিনিট পনের কুড়ির বেশী সময় নিই নি। এরি মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কতকগুলি ডচ আর আমেরিকান দর্শক সেই আঙিনাটাতে হাজির হ'ল। চশমাচোখে, মুগার পাঞ্জাবী গায়ে, সুর ক'রে অজ্ঞাত ভাষায় আমি পাঠ ক'রছি, গৃহকর্তা আর স্থানীয় পুরোহিত দুই এক জন পাশে দাঁড়িয়ে—এরা দেখেই অবাক। পরে মাচা থেকে নেমে তাদের বলাবলি ক'রতে শুনলুম—a Brahmin Priest who has come from India. পাঠশেষে, পুঙ্গব সুখবতী আমার সামনে কতকগুলি কাপড়চোপড় এনে ধ'রলেন—এদেশের "বেনারসী জোড়" বলা চলে, স্থানীয় কাজ; তাতে বোনা সুতোর বেগুনী রঙের কাপড় একখানা, তাতে চওড়া রূপালী জরীর পাড় আর লাল হ'লদে আর সবুজ রেশমের আর রূপালী জরীর বড় বড় ফুল তোলা; এখানা উত্তরীয়-স্থানীয়, বুকে বাঁধতে

উবুদের পুঙ্গব কর্ত্তৃক উপহৃত বলিদ্বীপীয় পরিচ্ছদে
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

হয় এখানা; একখানা হ'লদে সুতোর কাপড়, তার পাড়টা জরীর, আর তাতে সবুজ রেশমের ঘরে লাল আর বেগুনে আর জরীর ফুল তোলা,—এটা পরণের জন্য; আর একখানা ঐ ধরণের রঙীন আর জরীর ফুলতোলা হ'লদে কাপড়, মাথায় পাগড়ীর মতন বাঁধবার জন্য; আর লাল আর হ'লদে জরীর চওড়া ফিতার কোমরবন্ধ দুটো। এছাড়া পদণ্ডদের বসবার আসন একটি,—এটা সোনালী ছাপ করা রঙীন কাপড়ের পাড়বসানো একখানি গদী; আর

একখণ্ড সোনালী ছাপা কাপড়; সবগুলি একটি রঙ-করা ফুল-আঁকা কাঠের থালার উপরে ছিল। আমি সেগুলি ডানহাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে স্বীকার ক'রলুম। পরের দিন আমাদের মোটরে সেগুলি পুঙ্গব সুখবতী তুলে দেন। প্রতিদানে আমিও আমার সঙ্গে ক'রে আনা পূজার তৈজসপত্রগুলি পুঙ্গবকে উপহার দিই। এই কাপড়-চোপড়গুলি বলিদ্বীপে একবার পরেছিলুম। পুঙ্গব সুখবতী ডচ্ ভাষায় অনেকগুলি ছবিওয়ালা একখানি ছোট বই প্রকাশিত ক'রেছেন—Hoe die Balier zich kleedt 'বলিদ্বীপীয়েরা কিভাবে কাপড় পরে'। এই বইয়ে তিনি ব'ল্‌ছেন যে বলির জীবনযাত্রা শীঘ্র শীঘ্র বদলাচ্ছে, লোকেদের পোষাক পরিচ্ছদও তাই ব'দ্‌লে অন্য ধরণের হ'য়ে যাবে—এই জন্য ভবিষ্যৎ কালের লোকেদের উদ্দেশ্যে বলিদ্বীপীয়দের প্রাচীন পোষাক পরিচ্ছেদের একটা সচিত্র বর্ণনা তিনি লিখে রেখে যাচ্ছেন। সুরেন বাবু এদের কাপড় পরার রীতি দেখে শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে পুঙ্গব সুখবতীর দত্ত কাপড় প'রেছিলুম, আর সুরেনবাবু সেই কাপড় পরিয়ে আমার এক ছবিও নিয়েছিলেন। মাথার রুমালের পাগড়ী, আর বলিদ্বীপীয় কায়দায় পাগড়ীর নীচে পরা জবাফুলটা বাদ দিয়ে, পুঙ্গবের প্রদত্ত বস্ত্র আর উত্তরীয় প'রে বাঙলা দেশে পূজাবাড়ীর দালানে, বা ভারতের কোনও দেবমন্দিরে হাজির হ'লে,- বিদেশীয় বা অভারতীয় পোষাক প'রে এসেছি একথা কেউ ব'ল্‌তে পার্‌ত না। কাপড়ের কাজটা আমাদের দেশের পক্ষে একটু অসাধারণ হ'লেও, আমাদের ভারতীয় চেলী বা বেনারসী বা অন্য ধরণের জরীতোলা রঙীন পট্টবস্ত্রের সঙ্গে এ জিনিস বেশ চ'লে যায়—মোটেই বেখাপ বা বেমানান হয় না।

সাতটা সাড়ে সাতটায় আমার পাঠ শেষ হ'ল। আগে থেকেই ঠিক ছিল, কোপারবার্গের পরামর্শ-মতন, সন্ধ্যের পরে যে যাত্রা নাচ গান অভিনয় সাধারণের জন্য রাজপ্রাসাদে ঢালাও ভাবে হবে, আমরা সে সব দেখবো। দেখে শুনে ফিরতে রাত হবে, তাই আমরা সঙ্গে ক'রে কিছু খাবার এনেছিলুম—পনীরের স্যাণ্ডুইচ্, ডিম সিদ্ধ, কলা। পাঠের পরে, রাজবাড়ীর আর এক আঙিনায় দেখি, মুখস-পরা 'তোপেঙ' যাত্রার আসর ব'সেছে। ডচ আর আমেরিকান দর্শক কতকগুলি র'য়েছেন; এই ক'দিনে অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। এঁদের জন্য কতকগুলি চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। একটা তক্তপোষের মতন কাঠের বসবার জায়গায় অভিজাত শ্রেণীর বলিদ্বীপীয় অভ্যাগতেরা ব'সেছেন; সাধারণ লোকে ভূঁয়ে ব'সেছে। 'তোপেঙ' যাত্রা গিয়াঞারে আগেই দেখেছি, এখানেও সেই রকমের। অভিনেতাদের চেয়ে দর্শক আর শ্রোতৃবর্গ আমাদের কৌতূহল আকৃষ্ট বেশী ক'রছিল। ডচ চিত্রকর Sayers তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রিয়ে দিলেন। এই ব্যক্তিটী আমেরিকান, নাম A. Rooseveldt, গত আড়াই বছর ধ'রে বলিদ্বীপে আছেন - একটী Tourists' Agents-এর আপিস আছে এঁর; বিদেশী যাত্রীদের বলিদ্বীপ দেখবার ব্যবস্থা সেখান থেকে করা হয়। এ ছাড়া লোকটী নিজেও একজন চিত্রকর আর ভালো ফোটোগ্রাফর। বলিদ্বীপের লোকদের প্রতি এর খুবই টান। ব'ল্‌লে, আমি তো 'বালিনীজ' হ'য়ে গিয়েছি। বলিদ্বীপের লোকেদের অনেক রীতিনীতির খুবই প্রশংসা ক'রলে। তবে বলিদ্বীপ আর যে সত্যযুগের স্বর্গরাজ্য থাকছে না, কালধর্ম্মে সবই বদলাচ্ছে, সে কথাও ব'ল্‌লে। ব'ল্‌লে—মশায়, এই আসরে এখন দেখছেন প্রায় দু'আনা লোকে—কি মেয়ে কি পুরুষ—গায়ে একটা ক'রে জামা চড়িয়েছে; দেড় বছর দু বছর পূর্ব্বে এদেশে যখন প্রথম আসি, তখন এত বড়ো আসরটায় দুজন লোকের গায়েও জামা থাক্‌ত না, সব নিজেদের দেশের চমৎকার 'বাতিক' কাজের ছোবানো কাপড়ের একখানা ক'রে উত্তরীয় মাত্র কাঁধে ফেলে বা কোমরে জড়িয়ে আস্‌ত। লোকেদের মতিগতি যে এখন আধুনিক জগতের উপযোগী হ'য়ে উঠছে, তা তাদের এই পোষাকের ফ্যাশান বদলানো থেকে বুঝতে পারা যায়।

'তোপেঙ' যাত্রায় বেশীক্ষণ লাগল না, শীগ্‌গির শীগগির শেষ ক'রে দিলে। এর পরে Hardja 'হার্জা' ব'লে একরকম গীতিনাট্য হবে, সেটা ব'সতে অল্প কিছু দেরী হবে। আমরা তখন আমাদের মোটরে গিয়ে

আহার সেরে এলুম। বাকে-দম্পতী অতি পূর্ব্বেই কবির সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন। আহার চুকিয়ে, যে দরদালানে শবাধার রাখা হ'য়েছে, তারি আঙিনায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। পূজার মাচায় ব'সে এক পদণ্ড-শিব আর এক পদণ্ড বুদ্ধ—শিবের আর বুদ্ধের পুরোহিত—খুব ঘটা ক'রে পূজো আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। মাচার পাশে একটা আটচালার মতন, তার উঁচু দাওয়ায় শপ বিছানো, সেখানে কি পাঠ হ'চ্ছে—সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। Lontar 'লোন্তার' বা তালপাতার পুথির পাতা তুলে ধ'রে সুর ক'রে ক'রে একজন কি প'ড়ছে, আর কালো কোট গায়ে একজন বৃদ্ধ, তাঁর মাথায় ঝুঁটী তাতে ক'রে বুঝলুম তিনি হ'চ্ছেন একজন শৈব-পদণ্ড, এক একটী শ্লোক বা পদ পড়বার পরে তার ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ছোট্টো আটচালাটীতে কতগুলি ভদ্রলোক চুপ ক'রে ব'সে ব'সে শুনছেন। গিয়াঞারের রাজাও সেখানে এসেছেন দেখলুম—তিনি আমায় ডেকে সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে স্থান ক'রে বসালেন। যা পাঠ হ'চ্ছিল, অনুমানে আঁচ ক'রছিলুম যে রামায়ণই পাঠ হ'চ্ছিল। ব্যাখ্যাতা বৃদ্ধ খানিক পরে নিরস্ত হ'লেন, পিতলের সরু চোঙের মতন হামানদিস্তায় পান-সুপারী পুরে একটা সরু পিতলের ডাঁটি দিয়ে ঐ পান-সুপারী ছেঁচে থেঁতো ক'রতে লেগে গেলেন। তখন একটী অল্পবয়সী লোক তারপরে ব্যাখ্যাতা হ'ল। কি পাঠ হ'চ্ছে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম। শুনলুম, রামায়ণ পাঠ হ'চ্ছে, প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায়, পালা হ'চ্ছে অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কায় হনুমানের ক্রিয়াকলাপ।

এই রামায়ণ পাঠের আসরে একটী প্রবীণ-বয়সী পদণ্ডের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেঁটেখাটো চেহারার লোকটী, পরণে একখানা 'বাতিক'-এর রঙীন কাপড়, কোমরে একখানা বেগুনে রঙের জরীর বুটাদার উত্তরীয়। ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে দু এক কথার পরে আমাকে নিয়ে গেলেন পূজামঞ্চে—যেখানে পদণ্ড দুজন পাশাপাশি ব'সে পূজো ক'রছেন। এই পদণ্ডদের পূজা খানিকক্ষণ ধ'রে দেখলুম। পদণ্ড-শিব কোনও মূর্ত্তি নিয়ে বসেন নি, খালি তাঁর সামনে কাঠের একপায়া গোল চৌকির উপরে একটা অষ্টদল সাদা ফুলের মধ্য দিয়ে তালপাতার ছোটো একটা শিবলিঙ্গের মতন দেবপ্রতীক সজ্জিত র'য়েছে। পদণ্ড-বুদ্ধ কিন্তু পিতলের ছোটো ছোটো দু তিনটী মূর্ত্তি সামনে রেখে দিয়েছেন—দাঁড়ানো মূর্ত্তি, কোন্ কোন্ দেবতার তা বুঝতে পারলুম না, সুবিধা ক'রে কাউকে জিজ্ঞাসাও ক'রতে পারলুম না। প্রচুর জল ছিটিয়ে আর ফুল ছড়িয়ে, আর বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র আউড়ে, আর দুহাতের আঙুল দিয়ে নানা রকমের মুদ্রা ক'রে পদণ্ড দুজন একমনে পূজা ক'রে যাচ্ছেন। যে বৃদ্ধ পদণ্ডটী আমায় এবার উপরে নিয়ে এলেন, তাঁকে অষ্টদল ফুলটার উপরে তালপাতার দেবতা প্রতীকটা কি তা জিজ্ঞাসা ক'রতে, তিনি ঊর্দ্ধ আর অধঃ নিয়ে দশ দিকের সঙ্গে শিবের দশটা রূপের নাম ব'লতে লাগলেন—'ঈংসন' বা ঈশান, 'হারা' বা হর, 'সাবুউঅ' বা শর্ব্ব, ইত্যাদি; তার পরে আর কি কি মালাই মিশ্র বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব'ললেন, তা ধ'রতে পারলুম না,—তার মধ্যে মধ্যে 'অংকসা' বা 'আকাশ', 'বুমি' বা 'ভূমি' এই রকম বিকৃত উচ্চারণে দু একটা সংস্কৃত শব্দ কানে এল। তান্ত্রিক পূজার কোনও মণ্ডল ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছেন ব'লে মনে হ'ল। অষ্টদল ফুলটার আটটা পাপড়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে আট দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে কল্পিত অষ্টমূর্ত্তি শিবের প্রতীক, এইটেই যেন তাঁর বলবার উদ্দেশ্য। তারপরে পদণ্ডটী মুদ্রা সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন ক'রলেন, আমি কি কি মুদ্রা জানি। এই ব'লেই সাধা হাতে অবলীলাক্রমে নানা মুদ্রা ক'রে আমায় দেখাতে লাগলেন। আমি এই বিষয়ে অতি সহজেই পরাজয় স্বীকার করলুম—ব'ললুম যে আমি সামান্য ব্রাহ্মণ মাত্র, পুরোহিত বা পদণ্ড শ্রেণীর পূজা আচারে দক্ষ ব্রাহ্মণ নই, সুতরাং মুদ্রা ক'রতে শিখিনি।

এই পদণ্ডটি আমায় পাঠ ক'রতে দেখেছিলেন,—বিদেশী লোক, হঠাৎ একদিনের জন্য পুঙ্গবের কাছে এতটা খাতির পেয়েছি তাও দেখেছিলেন—আর বোধ হয় সেটা এঁর ভালো লাগেনি। মুদ্রা বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ধরা প'ড়ে যাওয়ায় এখন বোধ হয় ভদ্রলোক মনে মনে একটু

আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলেন। তারপরে প্রশ্ন ক'রলেন 'মহাগুরু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পূজার অনুষ্ঠানের সব মুদ্রা ক'রতে পারেন, আর নিশ্চয়ই তিনি এমন অনেক মুদ্রা জানেন যা বলিদ্বীপের পদণ্ডদের অজ্ঞাত। আস্তে আস্তে মালাই ভাষায় এই প্রশ্নটি আমায় বার দুই করা হ'ল; আমি বুঝলুম তাঁর জিজ্ঞাস্যটা কি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে পূজার মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নেবারও ইচ্ছা প্রকট ক'রলেন। আমি ভাবলুম—এইবারে সারলে! আর একে সব কথা বোঝাই বা কি ক'রে? এমন সময়ে আমেরিকান্ রুসভেল্টকে সেই আঙিনায় দেখে ইশারা ক'রে ডাকলুম। পূজার মাচার তলায় আস্‌তে তাকে ব'ললুম —একটু দোভাষীর কাজ করুন। সে ব'ললে—আমার মালাইয়ের দৌড় অতদূর নেই—তবে একজন দোভাষী খুঁজে আন্‌ছি। এই ব'লে পাশের মহল থেকে তার পরিচিত একজন ডচ্ ছোকরাকে ডেকে নিয়ে এল। ছোকরা ইংরিজি বেশ জানে, ডচ্ সরকারে কি একটা কাজ করে, মালাইও ভালো জানে। মুদ্রা বিষয়ে আমাদের গভীর আলোচনা পূজারত পদণ্ডদের বিরক্ত না ক'রে যাতে নির্ব্বিবাদে হ'তে পারে সে জন্য এই পদণ্ডটীকে নিয়ে পূজোর মাচা থেকে নেমে ডচ্ ছোকরাটির সঙ্গে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ব'সলুম—একটি আট-চালার রোয়াকে। একে তখন ব'ললুম—রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে পূজার্চ্চনা করেন, তাতে তিনি মুদ্রার বা আগমোক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করেন না। তবুও এ ছাড়বেনা, একবার গিয়ে মুদ্রা-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রবে। আমি ব'ললুম, আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। তারপরে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা উঠল। এই পদণ্ডটি ব'ললেন, আমাদের বলিদ্বীপের আচার-অনুষ্ঠান সব দেবতা আর ঋষিদের কাছ থেকে পাওয়া—অর্থাৎ সনাতন। মনে মনে পদণ্ডটীর staunch patriotism অর্থাৎ তার এই কিছুতেই-হ'ঠবে-না এমন স্বদেশের মর্য্যাদা-বোধটিকে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। ভারতবর্ষের দাবী কেন অত সহজে মান্‌বে? কোথাকার কোন্ দূর দেশ থেকে আমরা এসেছি; ডচ্ অফিসার থেকে পুঙ্গবেরা আর পদণ্ডেরা সকলেই আমাদের স্বীকার ক'রে নিচ্ছে; একটু যাচাই হওয়া দরকার, আমরা ঠিক কি, আর আমাদের যোগ্যতা আর দাবীই বা কতটুকু। এই ব্যাপারটি নিয়ে আরও একটু তর্ক করবার ইচ্ছেয় পদণ্ডটি আমাকে আর সঙ্গের ডচ্ ছোকরাটীকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল আর একটি মহলে। সেখানে দেখি, একটি ঘরের দাওয়ায় অন্য কতকগুলি পদণ্ড ব'সে আছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের এই পদণ্ডটা দেশভাষায় কি কথাবার্ত্তা ক'রলে। আমি তখন ইংরিজিতে ডচ্ দোভাষী বন্ধুটিকে ওদের এই কথাগুলি ব'লতে অনুরোধ ক'রলুম।—'আমি খানিকটা খানিকটা ক'রে বলি, আর সে মালাইয়ে অনুবাদ ক'রে যায়।—আমি ব'ললুম—'আমি আস্‌ছি ভারতবর্ষ থেকে; অনেক দিনের পথ সে দেশ; আমাদের দেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত, যেরকম অনুষ্ঠানাদি আছে, বলিদ্বীপের সঙ্গে সে সব বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারত আর পৌরাণিক কাহিনী, বেদ আর আগম আমাদের দেশে আছে; পুরাণে আর ইতিহাসে বর্ণিত সব দেশ নগর নদী পর্ব্বত আমাদের দেশে এখনও বিদ্যমান; মন্ত্রের ভাষা সংস্কৃত আমরা এখনও চর্চ্চা করি; আর আমাদের ভাষাও এই সংস্কৃত থেকে হ'য়েছে। নানা দিক থেকে বুঝতে দেরী হয় না যে বলিদ্বীপের সভ্যতা ধর্ম্ম রীতি নীতির মূল সূত্রগুলি ভারতবর্ষ থেকেই এসেছে। এক সময়ে যবদ্বীপেও এই সভ্যতা আর ধর্ম্মের জয়জয়কার ছিল; এখন আর নেই, ওদেশের লোকেরা মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যখন ধর্ম্ম সভ্যতা আর সংস্কৃত ভাষা এ অঞ্চলে আসে, সে হ'চ্ছে দেড় হাজার দু হাজার বছর পূর্ব্বেকার কথা। তার পরে প্রায় আট ন'শ' কি হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপে কোনও যোগ ছিল না। এর মধ্যে আমাদের দেশে নানা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে; দু হাজার দেড় হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে রকমের ধর্ম্ম পালন ক'রতেন, যে সব অনুষ্ঠান ক'রতেন,—সেগুলি যে অবিকৃত ভাবে কোনও পরিবর্ত্তন না ক'রে যথাযথ রূপে

আমরা পালন ক'রে আস্‌ছি সে কথা ব'লতে পারি না; তবে সংস্কৃত ভাষার আর শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চর্চ্চা আমাদের মধ্যে কখনও লোপ না পাওয়ায়, তার অনেক খানি যে আমরা বজায় রেখেছি, একথা বলা যায়। তবুও নিশ্চয়ই কিছু কিছু জিনিস ব'দলে ফেলেছি—পুরাতন জিনিস কিছু কিছু হারিয়ে ফেলেছি বা বর্জ্জন ক'রেছি, আর তার বদলে, বা অধিকন্তু, নোতুন ভাব-ধারা আচার-অনুষ্ঠানও কিছু কিছু এসেছে। বলিদ্বীপের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। ভারতীয় গুরুদের আর ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণাদির বংশধরদের কাছ থেকে দু হাজার দেড় হাজার বছর আগে বলিতে যে ধর্ম্মের প্রচার হয়, তারও সবটুকু বলিতে অবিকৃত নেই—সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলায় এই রূপ সন্দেহ করা যায়। আবার হয় তো কতকগুলি বিষয়ে বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণশীল—যেখানে ভারতে পরিবর্ত্তন এসেছে। এক্ষেত্রে, এমন সব বিষয়ে, আমাদের উভয় দেশের অধিবাসীদের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপটী বের করবার উপায় কি? দুই দেশের ভাব-ধারা আচার অনুষ্ঠান মিলিয়ে দেখা,—আর দু দেশের ব্রাহ্মণদের মিলে সহযোগিতা ক'রে, এক জোটে আলাপ আলোচনা অধ্যয়ন গবেষণা করা; তবেই জ্ঞান আর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার ক'রে সত্যের নির্ণয় হ'তে পারে। আমরা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি—আমাদের উদ্দেশ্য, এই ভাবে আমাদের দেশের আর এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদানের যোগ-সূত্রের পত্তন করা। মহাগুরু জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁকে মানে। তাঁর উপদেশের মূল-তত্ত্ব তিনি আমাদের বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত থেকেই, প্রাচীন ব্রাহ্মণ আর ঋষিদের শাস্ত্র আর আগম থেকেই পেয়েছেন। বলিদ্বীপের লোকেদের আমরা ভাইয়ের মতন দেখি, সমানে সমানে যেমন তেমনি এদের সঙ্গে চ'লতে চাই—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর মন্ত্রদাতা ঋষিদের উত্তরাধিকার আমরা মিলে মিশে ভালো ক'রে বুঝতে চাই।'—এই ভাবের কথা ব'ললুম—আস্তে আস্তে। আমার কথা পদণ্ড কয়জন বেশ মন দিয়া শুনে, সকলেই একবাক্যে ব'ললেন, আপনি ঠিক কথাই ব'লছেন—আপনাদের দেশের পণ্ডিতে আর আমাদের দেশের পণ্ডিতে মিলে কাজ করলেই সত্যের নির্দ্ধারণ সম্ভব হবে। যাতে বলিদ্বীপে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ হয় সে বিষয়ের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার ক'রলেন।—আমাদের পূর্ব্বোক্ত পদণ্ডটিও স্বীকার ক'রলেন যে আমি ভালো কথাই ব'লেছি। তারপরে তিনি নিজের নাম আমায় জানালেন—নামটী হ'চ্ছে Pedanda Gede Resi, ঠিকানা Poetoe Majoen, Sedaang, Den Pasar (পদণ্ড গডে রেসি বা ঋষি, পুতু মায়ুন, সেদাআঙ, দেন্‌-পাসার)। ভদ্রলোকটী যাকে বলে একটী character.—পরে রবীন্দ্রনাথকে এই পদণ্ডটীর কথা বলি, আর ইনি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নোতুন কর-মুদ্রা শিখতে আসবেন, মুদ্রাকরণে তাঁর দক্ষতার যাচাই-ও যে ক'রে যাবেন, তাও বলি। কবি হাসতে হাসতে ব'ললেন—'এই দেখ, তুমি কোথায় কার সঙ্গে আলাপ ক'রে যত বিভ্রাট ঘটিয়ে আসবে—এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হ'য়েছে এই বালিতে এসে পদণ্ডদের দণ্ডাঘাতে সেটুকু সব বুঝি মাটি হ'য়ে যায়। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও—সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা ক'রতে আসে, তাহ'লে বিশ্বভারতীর জন্যে থালি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি আমি গরীব বেচারা দাঁড়িয়ে 'ফেল' হ'য়ে মারা যাবো!'

এর পরে 'হার্জা' নাচ দেখলুম। এটা হ'চ্ছে নাচ-গান-মিশ্র হাস্যরসময় ভূমিকা যুক্ত একটা ballet 'ব্যালে' ধরণের গীতিনাট্য। নাচটাই উপভোগ্য—গানে বলিদ্বীপের কৃতিত্বের অত্যন্ত অভাব। এটা বোধ হয় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চ'লেছিল। আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত দেখে, পুঙ্গব সুগ্রবতীর কাছে আর অন্য ইউরোপীয় আর আমেরিকান বন্ধু যারা নাছোড়বান্দা হয়ে শেষ পর্য্যন্ত থাকবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদুঙ-এ ফিরলুম—ক্রেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ, ধীরেনবাবু, সুরেনবাবু আর আমি।

ক্রমশঃ

ব্যঙ্গচিত্র

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের দাবাখেলা

[তাঁহাকে একসঙ্গে মিশরের ওয়াফদ, ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহী ও বিলাতের রক্ষণশীলদের সঙ্গে লড়িতে হইতেছে]

—De Groene Amsterdammer

ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

ব্রিটানিয়া (জন বুলের প্রতি)—জন, বাঘটা যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে

—Dublin Opinion
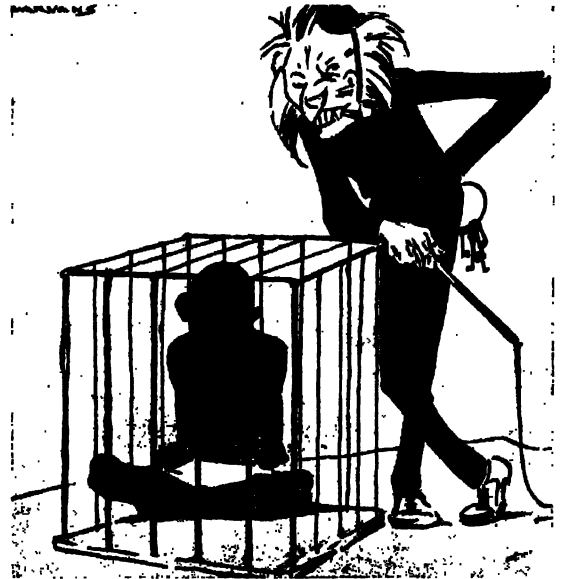
ব্রিটিশ-সিংহ ও কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী

—Kladderadatsch, Berlin

ব্রিটিশ স্বর্গে দুর্ভাবনা

গারাণী ভিক্টোরিয়া (সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতি)—এডোয়ার্ড একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখ তো, আমি এখনও ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী আছি কিনা

—*Kladderadatsch*, Berlin
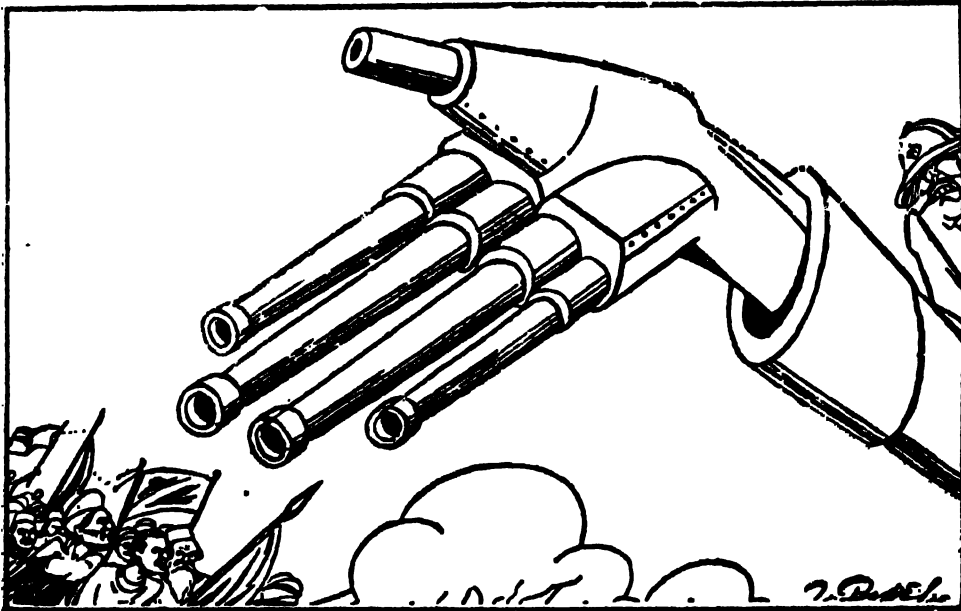
শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে উৎসুক

—*Pravda*, Moscow

নাবিকহীন নৌকা—

পোর্টস্‌মাথের নৌবহর প্রদর্শনীতে বিরাটকায় যুদ্ধের জাহাজগুলি যখন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন এই ৩৫ ফুট মোটরবোট-খানি নাবিকহীন হইয়াও ভূতচালিতের মত চলাফিরা সুরু করিল। চারিটি মাস্তুল দেখিয়া অবশ্য অনেকেই আন্দাজ করিল যে অদৃশ্য হস্তখানি বেতার-বার্ত্তার। কেবল এই নৌকাখানিই নয়, ইতিপূর্ব্বে এরোপ্লেন, মোটরকার এবং ট্যাঙ্ক প্রভৃতিও বেতারে চালিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় এই রকম একটি নৌকাকে বিস্ফোরকে বোঝাই করিয়া শত্রুর মধ্যে ছাড়িয়া দিলে একপক্ষ মেঘনাদের মত আড়ালে থাকিয়া অন্য পক্ষের অনেক সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে।

বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে চালিত নাবিকহীন নৌকা

কৃত্রিম সমুদ্র—

বিগত যুদ্ধের পর আজ পর্য্যন্ত এগারটি সাবমেরিণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহাতে ৪৬৮ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। দুর্ঘটনার কারণ এই, যে, জলের নীচ দিয়া চলিবার সময় কোন রকম যন্ত্র বিকল হওয়াতে জলের উপর উঠা সাবমেরিণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বাতাসের অভাবে কিছুকালের মধ্যে লোকদের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে। এই রকম দুর্ঘটনার সময় যাহাতে লোকগুলি সাবমেরিন হইতে বাহির হইয়া উপরে উঠিতে পারে, সেই রকম শিক্ষা দিবার জন্ত কৃত্রিম সমুদ্রের সৃষ্টি, এবং একটি যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা নাকে মুখে লাগাইয়া জলের ভিতর দিয়া উপরে উঠা সম্ভব হইবে।

সমুদ্র সৃষ্টি করা হইয়াছে এই বিরাট মিনারটির মধ্যে। ইহা প্রায় তের তালার সমান উঁচু এবং ব্যাসে ১৮ ফিট। ইহা সমুদ্রের লোণা জলে ভর্ত্তি। সাবমেরিণের নাবিকদের কৃত্রিম ফুস্ ফুস্ নাকে দিয়া ইহার মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হয়। ইহার নীচে সাবমেরিণের মত অবিকল একটি কুঠুরী আছে, সেই কুঠুরী হইতে তাহারা উপরে উঠা অভ্যাস করে। প্রথম একটা দড়ি বাঁধা 'বয়া' ছাড়িয়া দেয়, তারপর সেই 'বয়া'র দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

এই মিনারটি তৈরী করিতে খরচ পড়িয়াছে এক লক্ষ কুড়ি হাজা ডলার। ইহা ষ্টিলের তৈরী। বাহিরে এলুমিনিয়াম রং দেওয়া ভিতর আলো দিবার জন্ত এবং জল গরম রাখিবার জন্ত ব্যবস্থ আছে। বাহিরেও ইহাকে আলোকিত করা হয় এবং এরোপ্লেনে পথনির্দ্দেশের জন্ত এখান হইতে 'বীকন' লাইট ফেলা হয়।

জলমগ্ন সাবমেরিণ হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য নির্ম্মিত মিনার
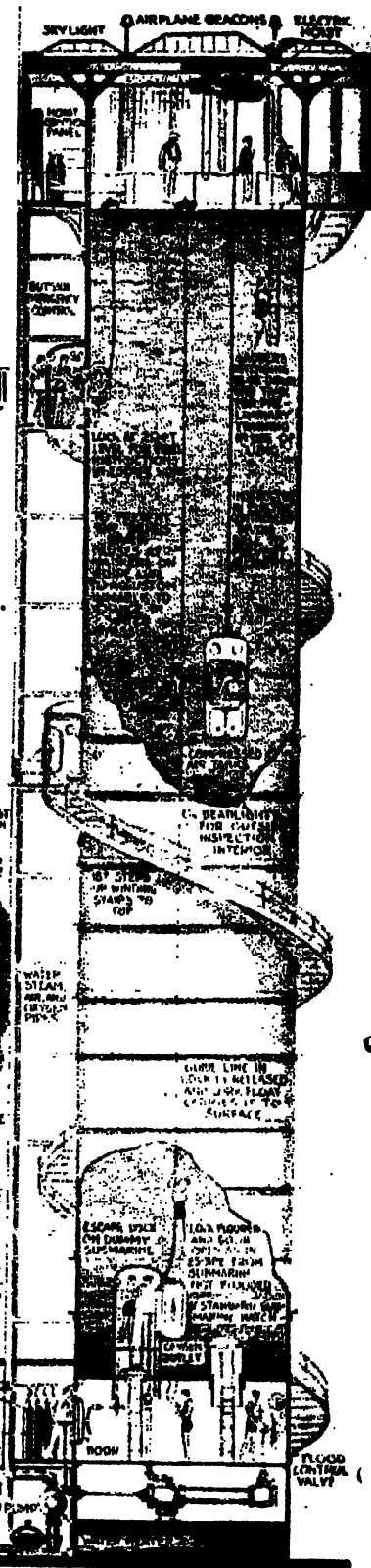
মিনারের ভিতরের দৃশ্য
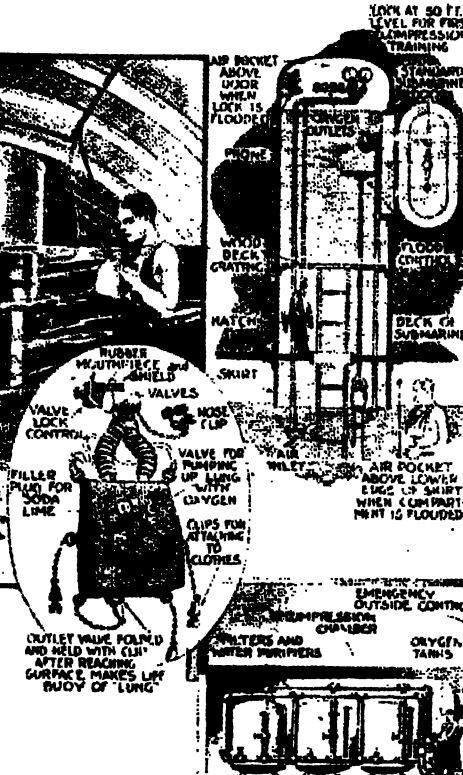
পারস্য ও তুরস্ক দেশের মৃৎশিল্প—

ছবিতে পারস্য এবং তুরস্ক দেশীয় কতকগুলি প্রাচীন চিত্রিত মাটির বাসন দেখান হইয়াছে। তুর্কী বাসনগুলি যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আনাতোলিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান এসিয়া মাইনরে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যুগ অটোমান সাম্রাজ্যের চরম সম্প্রসারণের সময়। এই সময়ের শিল্প খুব উন্নত ছিল। তুর্কদের নিজেদের কোন শিল্পকলা ছিল না। অটোমান প্রভাবেই তাহাদের শিল্পকলা গড়িয়া উঠে। তুর্কদের নিজস্ব পদ্ধতির জন্য পারস্যের আর্টও কম দায়ী নয়। আবার এদিকে ইতালীয় আর্টের স্বাভাবিকতাও তাহাকে প্রভাবান্বিত করিতে ছাড়ে নাই।
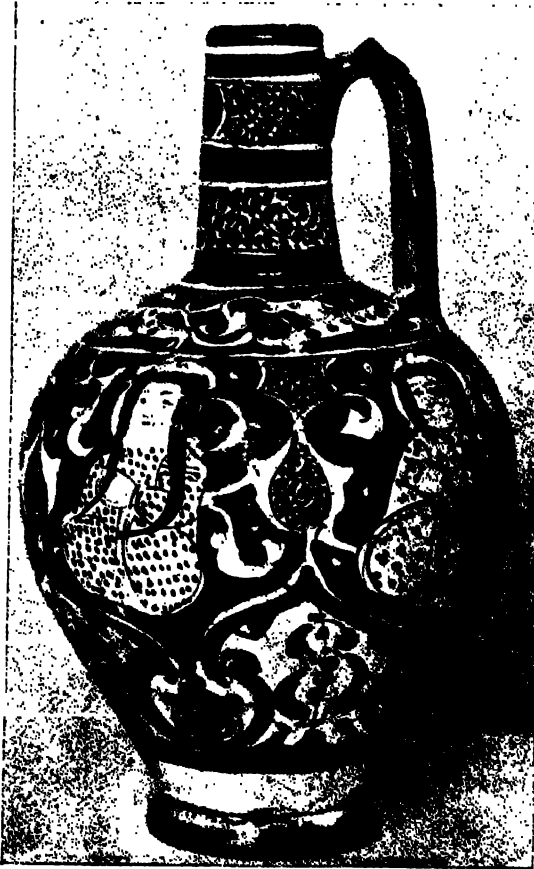
একটি পারস্যদেশীয় কুঁজা (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

আগে একটা ভুল ধারণা ছিল যে এই জাতীয় সব 'পটারী'-ই রোড্‌স দ্বীপে তৈরী। এমন কি এখন পর্য্যন্ত ইহাদের রোড়ীয় বাসন বলা হয়। এখন অবশ্য জানা গিয়াছে যে নিসিয়া ইহাদের জন্মস্থান। নিসিয়ার পুরাতন নাম ইস্নিক।

এক রকম অল্প ধূসর বর্ণ মাটির বাসন পোড়াইয়া শক্ত করিয়া তাহা হইতে ইহাদের তৈরী করা হয়। পোড়া বাসন গুলির উপর একটা সাদা 'গ্লেজ' কোটিং দিয়া কাজ করা হয়। নীল, সবুজ, লাল এবং

তুরস্কদেশীয় একটি থালা (ষোড়শ শতাব্দী)
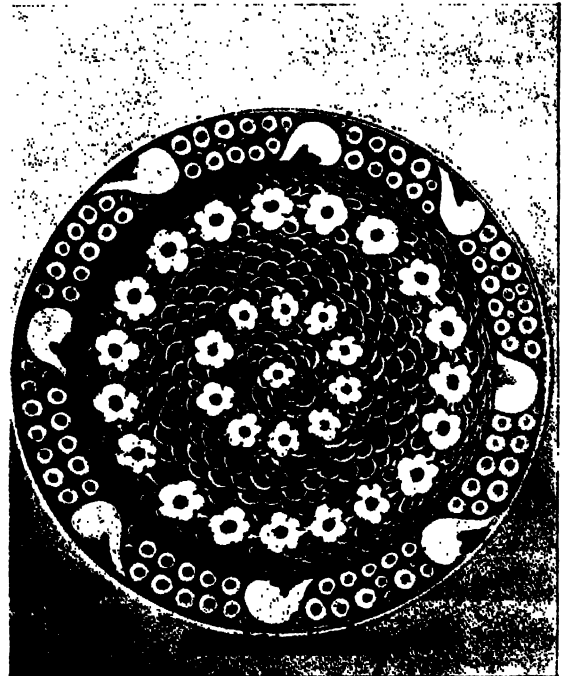
তুরস্কদেশীয় একটি থালা (ষোড়শ শতাব্দী)

একটি তুরস্কদেশীয় কুঁজা (ষোড়শ শতাব্দী)

তুরস্কদেশীয় মগ (ষোড়শ শতাব্দী
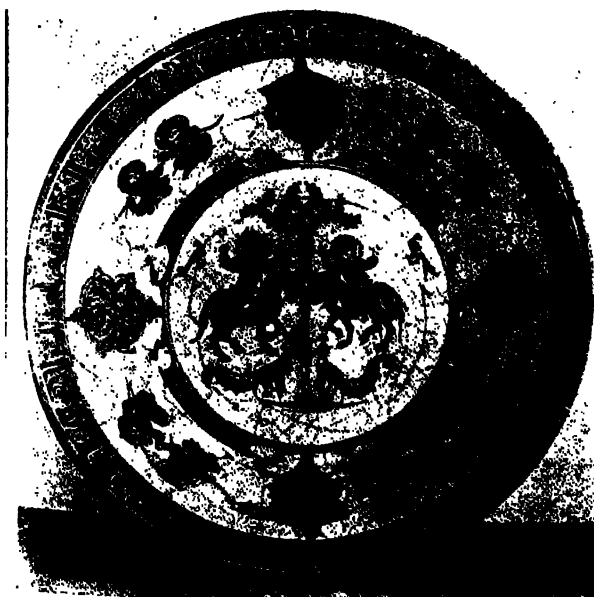
পারস্যদেশীয় একটি বাটির ভিতরের কারুকার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

পারস্যদেশীয় একটি বাটির ভিতরের কারুকার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

ঘনকাল চটকহীন রং-এ অল্প স্লিলিকে কাজ পোরসেলিন্-এর মত শুভ্র জমির উপর অতি সুন্দর দেখায়।

রচনার মধ্যে কাল্পনিক রেখাচিত্র, ফুল পাতা এবং কচিৎ চিত্রিত লিপি দেখা যায়। ইহা'ই সাধারণতঃ ইস্‌লামীয় রচনার ধারা। এই শিল্পের সব চেয়ে অভিনব এবং বিশিষ্ট রচনা লতাপাতার ছবিকে একটা কৃত্রিম ভঙ্গিতে সাজাইয়া একটি অপূর্ব্ব প্যাটার্ণ সৃষ্টি করা। জলের ফুল, গোলাপ, পিঙ্ক্ এবং দেবদারু গাছ এই গুলি এই আর্টে খুব বেশী প্রচলিত। মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি এ আর্টে প্রায় বর্জ্জিতই বলা যাইতে পারে।

পারসী বাসনগুলি তুর্কী হইতে বেশী পুরাতন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের মোগল বিজয়ের পর হইতে এই শিল্প অবনতির পথে চলে। সুলতানাবাদ এবং বেগেস এই দুইটি জায়গাই এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র, পারস্যের নির্ম্মাণপদ্ধতি তুরস্ক হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নয়, তবে ডিজাইনের দিক হইতে যথেষ্টই তারতম্য দেখা যায়। বেগেসের বাসনগুলিতে সোনালি এবং অন্যান্য রঙে অতি নিপুণভাবে বাদশাহী জীবনের চিত্র আঁকা হইয়াছে। অন্যান্য রচনা যাহা দেখা যায় তাহা বেশীর ভাগই জ্যামিতিক। পারসিরা সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। তাই তাহাদের সজীব প্রাণীর ছবি আঁকিতে কোন বাধা ছিল না। কতকগুলি বাসনে অতি সুন্দর জালির কাজ করা হইয়াছে। জালির ফাঁকগুলি সাদা অনেক রঙীন স্বচ্ছ রজ দিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই গুলিকে পারসী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

মানের দায়*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

স্পেনদেশে টলিডো নামক একটি শহর আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডন্ এন্‌রিক্ ডি ট্রাষ্টামারা টলিডো অবরোধ করেন। কিন্তু নগরের অধিবাসীরা বিশেষ সাহসের সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন।

শত্রুসৈন্য টেগস্ নদীর অপর পারে সিগারেল্‌স্ নামক সুন্দর স্থানে তাঁবু গাড়িয়াছিল। নগরের সহিত এই প্রান্তর সান্ মার্টিনের সেতুর দ্বারা সংযুক্ত। নগরবাসীরা প্রায়ই এই সেতু অতিক্রম করিয়া ডন্ এন্‌রিকের সৈন্যদলের উপর গিয়া পড়িত এবং তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিত। টলিডো শহর সুন্দর প্রাসাদ, তোরণ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত, তাহারও মধ্যে এই সেতুটি সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সিগারেল্‌স্ প্রান্তরটিতে বহুসংখ্যক ফুল ও ফলের বাগান, বাগান-বাড়ী, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতি ছিল। ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক কবি ইহার বিষয়ে সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন।

ডন্ এন্‌রিক টলিডোবাসীদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, তিনি সান্ মার্টিন সেতুটি ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।

অন্ধকার রাত্রে তাঁহার সৈন্যেরা প্রান্তরের শোভাবর্দ্ধনকারী গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া সেতুর উপর স্তূপাকারে সাজাইয়া দিল। প্রভাত হইতে-না-হইতে সেতুর উপর ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। উহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, এবং উহার ভয়াবহ আলোকে শত্রুসৈন্যদল, টেগস্ নদীর জল, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সব আলোকিত হইয়া উঠিল। বিবিধ কারুকার্য্যখচিত খিলান ও স্তম্ভগুলি যখন মড়মড় করিয়া উঠিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, কমলালক্ষ্মীই যেন বর্ব্বরের অত্যাচারে আর্ত্তনাদ করিতেছেন।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া নগরবাসীরা দৌড়িয়া নদীতীরে গিয়া সমবেত হইল, যদিই কোনো উপায়ে ঐ সুন্দর সেতুটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ঘোররবে সেতুটি ভাঙিয়া পড়িয়া নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সূর্য্যালোকে যখন রাজধানীর হর্ম্ম্যরাজি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন নগরের অধিবাসিনীরা কলস লইয়া নদীতীরে জল আনিতে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু নদীর জল আর পূর্ব্বের মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল নাই, ঘোলা ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে এবং সেতুর ধ্বংসাবশেষে জলরাশি

* স্প্যানিশ্ গল্প হইতে

তখনও পরিপূর্ণ। রমণীরা জল না লইয়াই শোকাকুল-চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

টলিডোবাসিগণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল; কারণ এই সেতুটিই সিগারেল্‌স্ প্রান্তরে যাইবার একমাত্র পথ ছিল। নিজেদের সকল বল একত্র করিয়া তাহারা শত্রুদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিল।

সান্ মার্টিনের সেতু ধ্বংস হইবার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। রাজা ও প্রধান ধর্ম্মযাজক বহুবার আর একটি সেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রধান প্রধান স্থপতিগণও তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর সেতু কিছুতেই নির্ম্মিত হইল না। নদীর খরস্রোতে কাষ্ঠের ভারা কিছুতেই টিকিতে চায় না, খিলান নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জলস্রোত কাষ্ঠরাশিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

টলিডোর প্রধান ধর্ম্মযাজক দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন, যে-কোনো দেশীয়, যে-কোনো ধর্ম্মাবলম্বী স্থপতি আসিয়া সেতু নির্ম্মাণকার্য্য গ্রহণ করিলে, তাঁহারা প্রভূত অর্থদান করিতে সম্মত আছেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না। সেতু-নির্ম্মাণের পথে বাধা—টেগসের তীব্র স্রোত, উহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বোধ হইল না।

অবশেষে একদিন একটি পুরুষ ও একটি রমণী কাম্ব্রন তোরণ দিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। উহারা সকলেরই অপরিচিত। তাহারা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখিল, পরে ছোট একখানি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই ঘর-করণা পাতিয়া বসিল। ঘরখানি সেতুর নিকটেই।

পরদিন লোকটি সোজা প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন প্রাসাদে দরবার চলিতেছে। বিভিন্নদেশীয় পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক, যোদ্ধা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছেন। বিদেশী একজন স্থপতি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আগন্তুককে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং অভিবাদনাদি হইয়া যাইবামাত্র তিনি স্থপতিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বিদেশী বলিলেন, "সদাশয় প্রভু, আমার নাম জুয়ান্ ডি আরেভালো। এই নাম আপনার অপরিচিত। আমি স্থপতি, এই কারণে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ-প্রচার করিয়াছিলাম, আপনি কি তাহা শুনিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন?"

"হাঁ, এই আহ্বান শুনিয়াই আমি টলিডোতে আসিয়াছি।"

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেতু-নির্ম্মাণকার্য্যে যে বাধা আছে, তাহা আপনি জানেন?"

স্থপতি বলিলেন, "আমি ঐ বাধার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু উহা অতিক্রম করিতে পারিব।"

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন কোথায়?"

স্থপতি উত্তর করিলেন, "সালামান্‌কাতে।"

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নির্ম্মিত কোনো প্রাসাদ আমাকে দেখাইতে পারেন? আপনার নৈপুণ্য কিরূপ উহা হইতে আমি বুঝিতে পারিব।"

স্থপতি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "প্রভু, সেরূপ কিছুই আমি দেখাইতে পারিব না।"

ধর্ম্মযাজক অসহিষ্ণুভাবে হাত নাড়িলেন। তাঁহার মুখের ভাবও সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিদেশী স্থপতি বলিলেন, "প্রভু, যৌবনে আমি যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় আমাকে উক্ত ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জন্মভূমি ক্যাষ্টাইলে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেখানে আমি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা ও স্থপতির কার্য্য করিতে আরম্ভ করি।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "আপনি যে নিজের নির্ম্মিত কোনো বিখ্যাত প্রাসাদের নাম করিতে পারিলেন না, ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।"

স্থপতি বলিলেন, "টর্ম্মেস্ এবং ডুয়ারোতে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে, যেগুলি অন্য স্থপতির কীর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু সেগুলির যশ এই হতভাগ্যেরই প্রাপ্য।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

জুয়ান ডি আরেভালো বলিলেন, "আমি দরিদ্র এবং অখ্যাতনামা ছিলাম, উদরান্নের বেশী আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি নাই। যশ অন্যেই অর্জ্জন করিয়াছিল।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "আপনাকে এতবড় কাজের ভার দিয়া আমরা যে ঠকিব না, ইহার ত কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারিলেন না। কাজ দিতে না পারায় আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।"

স্থপতি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি এমন একটি জামিন দিতে পারি যাহাতে আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন।"

প্রধান ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "কি সে?" স্থপতি উত্তর করিল, "আমার প্রাণ।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

স্থপতি বলিল, "সেতুর মধ্যস্থ খিলানের নীচের কাঠের ভারা যখন সরানো হইবে, আমি তখন তাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকিব। সেতু যদি ভাঙিয়া পড়ে, আমিও উহার সহিত সমাধিস্থ হইব।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "ভাল কথা, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

স্থপতি বলিলেন, "প্রভু, আপনি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দেখুন, আমি নিশ্চয়ই কাজটি সুসিদ্ধ করিতে পারিব।"

ধর্ম্মযাজক স্থপতিকে প্রচুর সৌজন্যসহকারে বিদায় দিলেন। যুবক আশাপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও শিল্পী-পত্নী অতুলনীয়া রূপসী ছিলেন।

স্থপতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমা ক্যাথারিন, এই নগরের শোভাবর্দ্ধন-কারী যে-সকল স্থাপত্যের নিদর্শন থাকিবে, তাহার ভিতর একটি আমার নাম চিরস্মরণীয় করিবে। আমি সেতু নির্ম্মাণ করিবার আদেশ পাইয়াছি।"

দিন কাটিয়া চলিল। টেগস্ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া নগরবাসীরা আর বলিত না, "এইখানে এককালে সান্ মার্টিনের সেতু বিরাজ করিত। নূতন সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, মাঝের খিলানটি এখন স্পষ্টই দেখা যাইত। যদিও সেতুর নিম্নে ও চারিপাশে তখনও কাঠের মঞ্চ বাঁধা ছিল, তবু উহার সৌন্দর্য্য বুঝা যাইত। পুরাতন সেতুর ধ্বংসের উপরেই নূতন সেতুটি নির্ম্মিত হইতেছিল।

রাজা, প্রধান ধর্ম্মযাজক ও নগরবাসী সকলে মিলিয়া স্থপতিকে প্রশংসা করিতেছিলেন এবং তাঁহার উপর উপহার বর্ষণ করিতেছিলেন। টেগসের খরস্রোতের বাধা অতিক্রম করিয়া শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যসহকারে নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল।

টলিডো নগরের রক্ষাকর্ত্তা সাধু ইডেলফান্সোর বাৎসরিক উৎসবের দিন আসিয়া পড়িল। জুয়ান ডি আরেভালো প্রধান ধর্ম্মযাজককে জানাইলেন যে সেতুর কাজ শেষ হইয়াছে, এখন কাঠের ভারাগুলি সরাইয়া লইলেই হয়। ধর্ম্মযাজক এবং নগরবাসীরা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইটপাথরের গাঁথুনির নীচের কাঠের ভারা সরানো ব্যাপারটা যথেষ্ট বিপদ-জনক, কারণ গাঁথুনি উপযুক্ত পরিমাণ দৃঢ় না হইলে কাঠের ভারা সরানোমাত্রই নদীর ভীমস্রোতের আঘাতে সমস্ত সেতুটি ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু স্থপতি নিজেই খিলানের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করাতে কেহই কোনো বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন না। স্থপতিও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কাজ করিতেছিলেন।

পরদিন সেতুটিকে পবিত্র বারিসিঞ্চন করিয়া ও আশীর্ব্বাদ করিয়া সাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইল। টলিডো শহরে যতগুলি গির্জ্জা ছিল, প্রত্যেকটিতে আনন্দসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। নগরবাসীরা উচ্চস্থানে উঠিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সিগারেল্স্ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রান্তরটি বহু বৎসর নিস্তব্ধ ও জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, কারণ সান্

মার্টিনের সেতু ধ্বংস হওয়ায় সেখানে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। সকলে আশা করিতে লাগিলেন যে, পরের দিন হইতে আবার প্রান্তরটি আনন্দময় জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

রাত্রিকালে জুয়ান ডি আরেভালো সেতুর নিকটে আসিয়া মধ্যের খিলানটির উপর আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কল্যকার উৎসবের জন্য সমস্ত ঠিক আছে কি না তাহাই তিনি দেখিতে-ছিলেন। গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান করিতে করিতে তিনি এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। একটা কথা মনে হইয়া তাঁহার ধমনীর রক্ত যেন হিমশীতল হইয়া আসিল। সেতু হইতে নামিয়া পড়িয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দ্বারের সম্মুখে আসিতেই তাঁহার স্ত্রী সহাস্যমুখে তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া তিনি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় জুয়ান, তোমার কি হইয়াছে? কোনো পীড়া হইয়াছে কি?"

স্থপতি নিজের চঞ্চলতা দমন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "না, আমার কিছুই হয় নাই।"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, কোনো কিছু বিপদ ঘটিয়াছে।"

স্থপতি বলিলেন, "আজ বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আর এই কয়দিন আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম গিয়াছে, এই কারণে অসুস্থ দেখাইতেছে।"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "তুমি ভিতরে আগুনের ধারে আসিয়া বোসো, আমি খাবার গুছাইয়া আনিতেছি। আহার ও বিশ্রাম করিলেই তুমি আবার সুস্থবোধ করিবে।"

জুয়ান যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "সুস্থবোধ করিবই বটে!" তাঁহার স্ত্রী তখন আগুনে আরও কাঠ দিয়া টেবিলটি তাহার ধারে টানিয়া নিয়া খাবার গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। জুয়ান নিজের মানসিক বিষাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে আর প্রতারণা করা গেল না। তিনি বলিলেন, "আমাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম দেখিতেছি যে, তুমি আমার নিকট হইতে কিছু গোপন করিতে চাহিতেছ। আমি কি আর তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের যোগ্য নই?"

স্থপতি মাথা তুলিয়া বলিলেন, "ক্যাথারিন্‌, তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে সন্দেহ করিয়া আর আমার দুঃখের উপর দুঃখ বাড়াইও না।"

স্থপতির পত্নী আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "যেখানে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নাই, সেখানে ভালবাসা কি করিয়া থাকিতে পারে?"

স্থপতি বলিলেন, "আমার এবং তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এই দুঃখ গোপন করিতেছি, ইহা জানিতে চাহিও না।"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "অন্য কোনো কথা হইলে জানিতে চাহিতাম না। কিন্তু তোমার গোপন দুঃখ আমি জানিতে চাই, জানিয়া উহা লাঘব করিতে চাই।"

স্থপতি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অসম্ভব। এ দুঃখের কোনো প্রতিকার নাই।"

পত্নী বলিলেন, "আমার অসীম ভালবাসার কাছে অসম্ভব বলিয়া কোনো জিনিষ নাই।"

স্থপতি বলিলেন, "ভাল, তবে শোন। কাল আমার প্রাণ নষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মানও নষ্ট হইবে। সেতুটি কাল নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িবে, এবং আমিও উহার সঙ্গে সলিল সমাধি লাভ করিব। সেতুটি বহু যত্নে, বহু আশা লইয়া আমি রচনা করিয়াছি, কিন্তু উহাই আমার মৃত্যুর কারণ হইবে।"

তাঁহার পত্নী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, না, তাহা কখনও হইতে পারে না।" তিনি দুই হাত দিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনের অসহ্য বেদনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্থপতি বলিলেন, "হাঁ, প্রিয়তমে, যে সময় আমি সফলতা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরনিশ্চয় ছিলাম, সেই সময়েই আবিষ্কার করিলাম যে গণনায় আমি একটি ভীষণ ভুল করিয়াছি এবং উহার জন্য কাল যখন কাষ্ঠের ভারা সরানো হইবে, তখন সেতুটি ভাঙিয়া পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহার নির্ম্মাতা এই হতভাগ্য স্থপতিও ধ্বংস লাভ করিবে।"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "সেতু ভাঙিয়া নদীগর্ভে বিলীন হইতে পারে, কিন্তু তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে না। আমি নতজানু হইয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিব।"

জুয়ান বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা সফল হইবে না। প্রধান ধর্ম্মযাজক যদি আমাকে মুক্তিদান করিতে স্বীকারও করেন, তথাপি আমি স্বীকৃত হইব না, সম্মানহীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।"

ক্যাথারিন বলিলেন, "তোমার প্রাণ এবং মান দুই-ই আমি রক্ষা করিব।"

রাত্রি গভীর হইয়া চলিল। জুয়ান দুঃখে, উদ্বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমও তাঁহার দুঃস্বপ্নে পূর্ণ, উহাতে কোনো আরাম বা বিশ্রাম ছিল না।

ক্যাথারিনও ঘুমের ভাণ করিয়া শুইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জুয়ানকে উদ্বিগ্নভাবে দেখিতেছিলেন। যখন স্থির বুঝিতে পারিলেন যে, জুয়ান নিদ্রিত হইয়াছেন তখন অতি সন্তর্পণে উঠিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে জানলা খুলিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি ঘন অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের তীব্র আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। টেগসের জলস্রোতের ভীম গর্জ্জন ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ শোনা যায় না।

ক্যাথারিন জানলা বন্ধ করিয়া দিলেন। উনান হইতে একখানি জলন্ত কাঠ বাহির করিয়া লইয়া, আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ গাত্রাবরণে ঢাকিয়া তিনি নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন বুকের ভিতর আছড়াইয়া পড়িতেছিল, তবুও তিনি সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন।

কোথায় তিনি চলিয়াছেন? তিনি কি ঘোর অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া লইবার জন্যই জলন্ত কাঠখানি বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন? পথটি অতি দুর্গম, উহার মধ্যে মধ্যে বিশাল প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো এবং উহা অতি অসমান। কিন্তু তিনি জলন্ত কাঠখানিকে যেন অঙ্গাবরণের তলে গোপন করিবারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি সেতুর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাতাস তখনও তীব্রবেগে বহিতেছে এবং নদীর তরঙ্গরাজি সেতুর উপর রুদ্ধ আক্রোশেই যেন আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। পারিলে সে এ সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যায়।

ক্যাথারিন সেতুর প্রবেশ-পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহ তখন কম্পিত হইতেছিল। তিনি উত্তাল তরঙ্গমালার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়াই এত ভয়? না, তিনি স্বহস্তে ধ্বংসের আগুন জ্বালাইতে যাইতেছেন বলিয়াই এত ভয়? এতদিন পর্য্যন্ত শান্তিময় গৃহস্থালীর কাজ ভিন্ন আর কিছুই তিনি করেন নাই। ঠিক সেই সময়েই দিগন্তপ্রতিধ্বনিত করিয়া বজ্রনিনাদ শোনা গেল। ঐ শব্দেই কি রমণীর ক্ষীণ দেহযষ্টি কাঁপিয়া উঠিল? জলন্ত কাঠখানি লইয়া তিনি সেতুর নীচের কাঠের ভারাতে সংযুক্ত করিলেন। কাষ্ঠমঞ্চটি শীঘ্রই ধরিয়া উঠিল, এবং বাতাস অত্যন্ত তীব্র থাকায় অগ্নিশিখা অবিলম্বেই গগনভেদ করিয়া উঠিল। সেতুর খিলান প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে দেখিতে ধরিয়া উঠিল।

ক্যাথারিন তখন দ্রুতবেগে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। আগুনের আলোতে এবং বিদ্যুতের জ্যোতিতে তাঁহার পথ দেখিতে পাইবার কোনোই বাধা হইল না, তিনি অবিলম্বেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যেমন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। জুয়ান তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তিনি পত্নীর বাহিরে গমন বুঝিতেও পারেন নাই। ক্যাথারিন তাড়াতাড়ি আসিয়া

বিছানায় শুইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিলেন, যেন তিনি মোটেই শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া যান নাই।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নগরের পথগুলি জনকোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। নগরবাসিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে সেতুর দিকে দৌড়িয়া চলিয়াছে। প্রতি গির্জ্জা হইতে ঘোররবে বিপদ-সূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভয়ানক শব্দে সেতু ভাঙিয়া পড়িল। বহু বৎসর পূর্ব্বে শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক সেতু বিধ্বস্ত হওয়ার সময় টলিডোবাসিগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, আজও সেইরূপ আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

জুয়ান চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার পার্শ্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত, এত কোলাহলেও তিনি জাগরিত হন নাই। স্থপতি যথাসম্ভব শীঘ্র পোষাক পরিয়া বাহিরে দৌড়িয়া গেলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অগ্নিরাশি তখন আকাশ চুম্বন করিয়াছে। মনে মনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া সত্ত্বেও মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না।

প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং নগরবাসিগণ মনে করিলেন, খিলানের উপর বজ্রপাত হওয়াতেই কাষ্ঠমঞ্চে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। সকলের দুঃখের সীমা রহিল না। সকলেই স্থপতির গম্ভীর দুঃখ এবং নিরাশায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রচুর যশ লাভের মুহূর্ত্তেই কি না তাঁহার ভাগ্যে এমন বিপৎপাত হইল। নগর-বাসীরা কোনোদিনই নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারিল না যে, সেতু বজ্রের আগুনেই ধ্বংস হইল, না, মানুষের হাতও তাহার ভিতর ছিল। কিন্তু জুয়ান ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং সৎচরিত্র পুরুষ ছিলেন, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার জীবনরক্ষা করিবার জন্যই ভগবান সেতুটি বিনষ্ট করিলেন, বজ্রপাতেই এই অগ্নিরাশির সৃষ্টি হইয়াছে।

সেতু ধ্বংস হওয়াতে জুয়ানের যশ অর্জ্জন করার দিন এক বৎসর পিছাইয়া গেল মাত্র। পরের বৎসর, ঐ একই উৎসবের দিনে, তাঁহার নির্ম্মিত নূতন সেতু উন্মুক্ত হইল। প্রধান ধর্ম্মযাজকই উন্মোচনের কার্য্য করিলেন। আনন্দিত নগরবাসিগণ সেতু অতিক্রম করিয়া দলে দলে সিগারেল্‌স্ প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, বহু বৎসর তাহারা এ সুখ হইতে বঞ্চিত ছিল। প্রধান ধর্ম্মযাজক সেদিন সমস্ত নগরবাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে জুয়ান ও ক্যাথারিন বসিয়া আহার করিলেন। পরে ধর্ম্মযাজক জুয়ানকে প্রচুর সাধুবাদ দিয়া একটি বক্তৃতা করিবার পর, নগরবাসিগণ আনন্দসূচক কোলাহল করিতে করিতে জুয়ান এবং ক্যাথারিনকে তাঁহাদের গৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিল।

তাহার পর পাঁচ শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু জুয়ানের সেতু এখনও খরস্রোতা টেগসের উপর দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়বার আর গণনায় তাঁহার কোনো ভুল হয় নাই।

পুস্তক-পরিচয়

দেশীয় রাজ্য—স্বর্গীয় কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত। ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। প্রকাশক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম-এ (হার্ভার্ড), কর্নেল-হাউস, আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য। ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী ৩৩৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার ত্রিপুররাজগণের পার্শ্বচর এডিকং ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি বহু দেশীয় রাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন এবং দেশীয় রাজ্যের বহু মহারাজা মহারাণী মন্ত্রী দরবারী ও ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের বহু পলিটিকাল এজেণ্ট ছোটলাট বড়লাট প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল; তাতে আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে তিনি সদালাপী, বিনয়ী, সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এই সকল গুণ থাকাতে তিনি উচ্চপদস্থ মান্য ব্যক্তির সহিত ও সাধারণ লোকের সহিত তুল্যভাবে মিশতে পারতেন। এইরূপ মেলামেশার ফলে তিনি যে-সব অভিজ্ঞতা ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেইগুলি মাঝে মাঝে মাসিক-পত্রে প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছিলেন। লেখকের সুযোগ্য পুত্র পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা পিতার সেই রচনাগুলি একত্র সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে পিতৃঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধ করতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের বন্ধু রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ভূমিকায় এই পুস্তকের পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ

সারগ্রাহী পুস্তক বাঙ্গালা কেন," 'ভারতের কোন' ভাষায়ই হয় নাই।" এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে— ১। ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান; (২) দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; (৩) দেশীয় রাজ্য; (৪) দিল্লীর দরবার ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ, (৫) দিল্লীর শিল্পপ্রদর্শনী; (৬) দেশীয় রাজগণ ও উপাধি-ব্যাধি, (৭) দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা; (৮) ত্রিপুরার বীরচন্দ্র; (৯) ঝুলন-স্মৃতি; (১০) হোরি; (১১) বীরচন্দ্রের শাসনে খেলা; (১২) ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ; (১৩) ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ; (১৪ ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা; (১৫) বাধিক; ১৬) ত্রিপুরার শিল্প; ১৭। মণিপুর-চিত্র; ১৮) মহিপুরে রাজোদ্বাহ। লেখকের দৃষ্টিশক্তি ছিল, সহৃদয়তা ছিল; তিনি দরদের সহিত দেশীয় রাজার ও দরবারের দোষগুণ বিচার করেছেন। কিন্তু রচনার ভাষায় সব জায়গায় প্রবাহ না থাকাতে স্থানে স্থানে বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই সামান্য ত্রুটি প্রকাশক পরবর্ত্তী সংস্করণে মার্জ্জনা ক'রে দিলে বইখানির উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হবে। বইখানিতে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেক পরিচয় আছে। তথাকথিত স্বাধীন রাজারা ইংরেজের সামান্য কর্ম্মচারীরও যে কত অধীন তার বহু বিবরণ এতে আছে। স্বাতন্ত্র ভারতে স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠা হলে দেশীয় রাজ্যের স্থান ও সম্বন্ধ কিরূপ হবে, ভারতের স্বরাজ-সাধনার সে একটা বড় সমস্যা। সুতরাং দেশী রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও পরিচয় থাকা দরকার। এই পুস্তক পাঠ করলে অনেক সংবাদ জানা যাবে। ত্রিপুরা-রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের বন্ধুত্ব বাঙলা সাহিত্যে দুখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক দান করেছে— রাজর্ষি ও বিসর্জ্জন। সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরার সম্পর্ক এই পুস্তক থেকে জানা যাবে। কর্নেল মহিম ঠাকুর দক্ষ ফটোগ্রাফার ছিলেন; তাঁর তোলা বহু ফটোগ্রাফ আমি প্রবাসীর সংস্রবে থাকার সময় প্রবাসীতে ছেপেছিলাম। এই পুস্তকে তাঁর তোলা বহু ফটোগ্রাফ আছে—ত্রিপুরার রাজাদের, রবীন্দ্রনাথের, জগদীশচন্দ্রের ও নানা দৃশ্যের চিত্র এই বইখানিকে অধিকতর আকর্ষক করেছে। গ্রন্থারম্ভে লেখকের জীবনী সন্নিবিষ্ট আছে। বইয়ের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গ, বহু দেশের দৃশ্যের ও প্রথার ও আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকাতে বইখানি মনোরঞ্জক ও উপাদেয় হয়েছে।

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিকানা—শ্রীসুরেশ দাশগুপ্ত প্রণীত এবং ১২, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা, গোলাপ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

বইটি ছেলেদের জন্য লেখা একখানি ছোট প্রহসন। কলেজের সকাল সকাল ছুটি হইয়াছে। ছেলেরা কি করে? শেষে পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া পথিকদের নানারূপে নাকাল করিবার খেলা বাহির করিল। নাটকের কথাবার্ত্তা উপভোগ্য। রচনারীতি ভাল। বইখানি স্কুল-কলেজে অভিনয় করিবার উপযোগী। বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে।

বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৭ সাল।—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত এবং ৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

এখানি পঞ্চম বার্ষিক শিশুসাথী। ছাপা ও কাগজ চমৎকার। একরঙা এবং বহুবর্ণের অনেকগুলি ছবি আছে। প্রচ্ছদপট প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণ ঘোষের আঁকা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা লেখকের লেখা আছে। গল্প, উপকথা, কবিতা, জীবনী, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপভোগ্য রচনায় বার্ষিকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরা বইখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অবলা—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ৩৩ নং ম্যাক্‌লাউড্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। পৃঃ সং ৯১। মূল্য আট আনা।

ছোট গল্পের বই, সাতটি গল্প আছে। ভাষায় নূতনত্ব আছে বলিতে হইবে, একটু নমুনা দেওয়া গেল :—

"কিস্তীর চাল, অনিচ্ছায় ব্যায়াম, ব্যাগ হাতে প্লাটফর্ম্মে পদচারণ। তাহারও এক বিঘ্ন সুরকীর গোটা বিছান প্লাটফর্ম্মের প্রান্তদ্বয়। অথচ ভিখারী স্বচ্ছন্দ কাথোর অনধিকারী। (অর্থ কি?) শক্ত মত জুতার ফিতা বাঁধিয়া সংযত পদক্ষেপই এ সন্নিপাতের বিষবড়ী। তথাস্তু।"

কিন্তু যদিও বইখানির আগাগোড়া এইরূপ খামখেয়ালি গোছের ভাষা এবং আর্টের কসরৎও কোথাও নাই, তবুও গল্পগুলি উপভোগ্য। সকল গল্পের মূলে জীবন—এই জীবনের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় মোটেই ভাসা-ভাসা নয়। "আসামীর কাটগড়ায়" ও 'নন্দিনী' এই দুটি গল্প ভাল লাগিল।

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি—প্রকাশক শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং। ৪৩ নং ষ্ট্রাণ্ড্ রোড, কলিকাতা। পত্র-সংখ্যা ১১৯। মূল্য দেড় টাকা।

এবারকার 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' অন্য অন্য বৎসরের মত উপভোগ্য হয় নাই মনে হইল—অবশ্য তাহার একটা কৈফিয়ৎ সম্পাদক ভূমিকাতেই দিয়াছেন। লেখাদেের ব্যঙ্গচিত্রগুলি বড় মামুলি ধরণের। শ্রীবিমল মজুমদারের 'গোধূলি'র ছবিটি বেশ লাগিয়াছে, কিন্তু শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসুর 'সমঝদার' ছবিটি কি না দিলেই চলিত না?

গল্পগুলির মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কণিকা'র প্রথমাংশ ভাল লাগিয়াছে, শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবীর 'নিরুদ্দেশের যাত্রা'তে নূতনত্ব না থাকিলেও শেষের রেশটি মিষ্ট। কিন্তু সকলের অপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে শ্রীমতী সুরুচিবালা রায়ের 'বিবাহ বিচ্ছেদ' বৈচিত্র্যে ও গম্ভীরতায় গল্পটি সত্যই উপভোগ্য—অল্প কয়েকখানি পাতার মধ্যে উদ্দিষ্ট রসটি বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়-চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীস্বর্ণেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ৭৬ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

এখানি নবপ্রকাশিত গ্রন্থ নয়, ১৩৩৪ সালে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" জানাইয়াছেন—"প্রত্যেক ঔষধের সহিত উহার উপাদানগুলির গুণ-পরিচয় সম্বলিত পুস্তক এরূপভাবে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই সংগ্রহ করেন নাই।"—এ কথা সত্য; কিন্তু ইহাতে পুস্তকের উৎকর্ষতা যে কিছু বাড়িয়াছে, এমন মনে করি না। কবিরাজী ঔষধের ঐ প্রকার গুণ-পরিচয়ে তাহার রোগ-প্রতীকার-শক্তির হেতু প্রদর্শন করা বড়ই কঠিন কাজ। উদাহরণ-স্বরূপ, এই গ্রন্থোক্ত "রামবান" নামক ঔষধটির কথাই বলি। গ্রন্থকার তরুণজ্বরে ইহা 'প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়' লিখিয়াছেন। এ কথায়
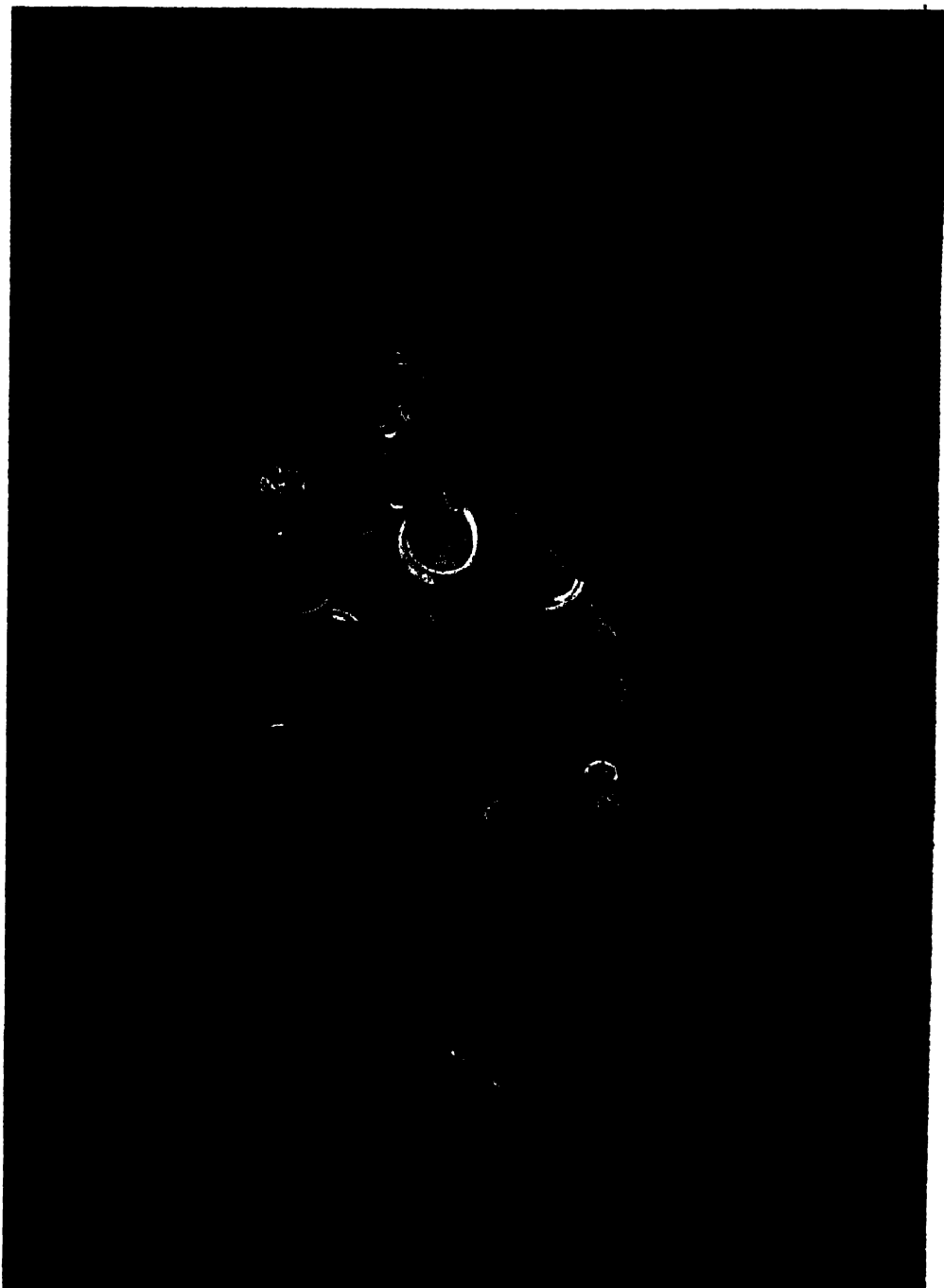
বাসুকী

এন্, মল্লিক

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু 'রামবাণ' প্রস্তুত করিতে হইলে এই ইহার উপাদান-সমূহকে কাঁচা তেঁতুলের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া লইতে হয়। অথচ কাঁচা তেঁতুলের গুণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা একবাক্যে বলিয়াছেন, "ইহা পিত্তকফজনক ও রক্তদুষ্টিকারক।" এখন কথা হইতেছে এই যে ঔষধে পিত্তকফকারক ও রক্তদুষ্টিকারক দ্রব্য আছে, সে ঔষধ তরুণজ্বর নাশ করিতে কেন সমর্থ তাহা যখন লেখক বলেন নাই, তখন তাঁহার ইচ্ছামত কতকগুলা ঔষধের কতকগুলা উপাদানের অসম্পূর্ণ গুণ-পরিচয়-দ্বারা গ্রন্থকে অযথা স্ফীত না করিলেই ভাল হইত। বরং ইহার পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার যদি কবিরাজী চিকিৎসার মূলসূত্রগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীর উপকার হইত। লেখক 'প্লেগ' সম্বন্ধে ইহাতে লিখিয়াছেন, 'এই রোগ হইবামাত্র রাজদ্বারে সংবাদ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।' ---প্লেগ-চিকিৎসার সহিত রাজদ্বারের সম্পর্ক কি, বুঝিলাম না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সমবায় ও পল্লীসংস্কার—শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, নর্টন বিল্ডিংস্, লালবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৷৵৹ আনা।

যে যে উপায়ে দেশের আশু অথচ স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে সমবায় তাহাদের মধ্যে একটি। সমবায়ের প্রচলন না হইলে পল্লীসংস্কার মাত্র কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ সমবায় হইতে সঙ্ঘশক্তি জন্মে, এবং এই সঙ্ঘশক্তিই পল্লীসংস্কারের গোড়ার কথা। সুধীজনেরা ইদানীং এইদিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং সমবায়ের বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সমবায়ের ইতিবৃত্ত কার্য্য প্রণালী এবং বিধি-ব্যবস্থা সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সমবায় প্রচেষ্টার উৎপত্তি, বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা, গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আসল নয়টি কথা, কো-অপারেটিভ আইন ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী, বিভিন্ন প্রকারের সমিতি, গ্রাম্য সমিতি পরিচালনের নিয়ম, সুপারভাইজারদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা, পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি, আয়বৃদ্ধির উপায়, উপবিধি সংশোধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পুস্তকখানিতে আছে।

বঙ্গদেশের সমবায়-সমিতি-সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযামিনীমোহন মিত্র মুখবন্ধে বহিখানির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—"ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে অনেক মূল্যবান কথা আছে। ইহাতে কেবল সমিতি চালাইবার কথাই বলা হয় নাই; পরন্তু বিশেষ দরকারী কথা, যথা—পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা, সঞ্চয়ী হইবার এবং আয় বৃদ্ধি করিবার উপায় প্রভৃতি কথা আছে। সুপারভাইজারদিগকে যে ভাবে কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করাইলে গ্রাম্য সমিতির উন্নতি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও উন্নতি হইবে। সুপারভাইজার প্রত্যেক সমিতিতে যাইয়া এই পুস্তকে লিখিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে এবং কৃষকদিগকে তদনুসারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে অনেক সমিতিই আদর্শস্থানীয় হইবে। ইহা ছাড়া সমবায় সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।"

সরল কৃষিশিক্ষা—শ্রীসন্তোষবিহারী বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, নর্টন বিল্ডিংস্, কলিকাতা। মূল্য ১।৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া নানারূপ কৃষি-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীরূপে এবং বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরূপে দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া তিনি কৃষি বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার ফল। বইখানিতে কৃষিবিষয়ক এই সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে—উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদান, বিভিন্ন উপাদানের উপকারিতা, মৃত্তিকার প্রকারভেদ, মাটির পরিচর্য্যা, সারের প্রকারভেদ, সার দিবার মোটামুটি নিয়ম, সার মিশাইবার নিয়ম, সবুজ সার, সেচন, জমীর রস সংরক্ষণ, নিড়ান, চাষ-আবাদ, শস্যপরিচয়, বীজ-নির্ব্বাচন, ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার, কৃষি যন্ত্রাদি।

কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীযদুনাথ সরকার ভূমিকায় বহিখানির পরিচয়ে লিখিয়াছেন :—"সন্তোষবাবু এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষ-ভাবে তাঁহার কার্য্যকরী কৃষিতে লিপ্ত থাকিবার অভিজ্ঞতা-ফল সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। আজকাল যে সকল মধ্য-ইংরেজী স্কুলে কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে সেই সকল স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে বইখানি বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়, আর যে-সকল শিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর কৃষির দিকে অনুরাগ জাগিয়া উঠিবার উপক্রম প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাদের পক্ষেও বইখানা বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া মনে করি। যে সকল সহজ-প্রণালী অবলম্বন করিলে, উৎপন্ন ফসলের মাত্রা বাড়ান যায়, কোন্ জমি ও কোন্ ফসলের পক্ষে কি সার উপযোগী, অল্প খরচে জল সিঞ্চনের প্রকৃষ্ট উপায়, এবং বীজ-নির্ব্বাচন প্রভৃতি, যাহা বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে কৃষিতে অত্যাবশ্যকীয়, সে সমস্তই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে উদ্ভিদ-জীবনী, ফসলের রোগ ও উহার প্রতিকার, যাহা প্রত্যেক শিক্ষিত কৃষকের অবশ্যশিক্ষণীয়, তাহাও এই সরল কৃষিশিক্ষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

র. চ.

সম্পাদকীয় মন্তব্য—কার্ত্তিকের প্রবাসীতে "পারিবারিক চিকিৎসা" নামক বহির যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার, তাহার লেখকের এবং প্রবাসীর সম্পাদকের বিরুদ্ধে কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি। পুস্তক সমালোচনার সমালোচনা প্রকাশ করা আমাদের নিয়ম নহে বলিয়া চিঠিগুলি মুদ্রিত হইল না।

প্রবাসীর সম্পাদক

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২১)

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইচ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? চাকরী-বাকরী ভাল করো, ঘর দোর ওঠাও, নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাগা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্চে দিন দিন—না কি? জামাইকে ও-সব কি কথা বলেচো? আজকালকার ছেলে-মেয়েদের ধরণ আলাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি চাকরী-বাকরী ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ করে তোমার মেয়ে সে ধরণেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাই-এর সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা। কাল সারাদিন অপর্ণাকে লইয়া রেলে ষ্টীমারে কাটানো—উঃ! .. শুধু সে আর অপর্ণা, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়ীতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে শুধু তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না।

কিন্তু ষ্টীমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা সে ভাবে কাটিল। তার পরেই রেল।

এইখানে অপু সর্ব্বপ্রথম গৃহস্থালী পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে।

ট্রেনের তখনও অনেক দেরী। যাত্রীদের রান্না খাওয়ার জন্য ষ্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানের খাবার আনিতে যাইতেছে, বধূ বলিল—তা কেন? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন চার ঘণ্টা দেরী গাড়ীর, আমি রাঁধবো।

অপু ভারি খুসী। সে ভারি মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার যে কেন মনে আসে নাই!

মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যে কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজাচুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়া লাল-জরিপাড় মট্‌কার শাড়ী পরিয়া ব্যস্ত-সমস্ত অবস্থায় এটাওটা ঠিক করিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—বাড়ীওয়ালী জিগ্যেস্ করচে, উনি তোমার ভাই বুঝি? আমি হেসে ফেল্‌তেই বুঝ্‌তে পেরেচে, বল্‌চে,—জামাই! তাই তো বলি!—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়া ছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে! সুন্দর নিটোল বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ। গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ-পর্য্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনো ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দুজনের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সর বাছা, জামাইকে যেতে বল। তোমাদের ও কি কাজ মা? সর আমি দি ধরিয়ে।

বধূ তাগাদ দিয়া তাহাকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়ীওয়ালীকে

দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবতে পেঁপে-কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মিশানো চিনির সরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ ভারী গিন্নীপনা যে!···আচ্ছা তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে। অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো, দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলাইয়া বলিল ঠিক হোলে কিন্তু আমায় কি দেবে?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল, ঠিক হোলে যা দেবো, তা এখুনি পেতে চাও?

—যাও, আচ্ছা তো দুষ্টু?

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া চুপি-চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে! এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—পৃথিবীতে একমাত্র আপনার জন! পরে সে সন্তর্পণে নীচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঁঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ! আমার লাগে না বুঝি?···ভারী দুষ্টু তো?··· রান্না থাক্‌বে পড়ে বলে দিচ্চি যদি আবার চুল ধরে টান্‌বে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরণের কথা বলিত—এই ধরণেরই স্নেহ-প্রীতি ঝরা চোখে। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রাণু-দি', কি নিরুপমা-দি', কি লীলা, কি অপর্ণা --এদের সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছে—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরণের কথা বলে, চোখেমুখে একই ধরণের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারী করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাষ্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ডক্লাশে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া স্কুলের চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনো দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুসি হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেণ আসিলে তিনি সেকেণ্ড্ ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণা কখনও কলিকাতা দেখে নাই। তাহাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য ষ্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ী ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল। রিপণ কলেজের কাছে গাড়ী থামাইয়া দর্পের সুরে বলিল—এই দ্যাখ না আমাদের কলেজ, এখান থেকে পাশ দেওয়া হয়ে গিয়েচে আমার, দেখেচো কত বড় কলেজটা! অপর্ণা বিস্ময়-ভরা ডাগর চোখে বাড়ীটা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল; অর্পণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে, কিন্তু কোনো বিষয়ে কোনো অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির, সংযত, বুদ্ধিমতী – এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য্য – যাহার পরিণতি সে দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে; উছলিয়া পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে কি দৃঢ়তা, অটলতা!

মনসাপোতা পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়ীঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়ীঘর অপরিষ্কার, রাত্রি-বাসের অনুপযুক্ত। উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ী হইতে তাহার তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানের পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুস্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝাপে জোনাকীর ঝাঁক জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ আসিয়া তরুণ দম্পতীকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না। তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেঁট্‌রা তোরঙ্গ মাত্র দেশলাই-এর কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। তবুও অপুর মনে হইল ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে, সদ্যফোটা

বিল্বপুষ্পের সুগন্ধের সঙ্গে, নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তের শান্তি ও নীরবতার সঙ্গে, অদৃশ্য মাতৃ-আশীর্ব্বাদ যেন মিশাইয়া আছে। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল—মা যখন বরণ করে নিতে পারলে না আমার বৌকে, অত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেবো ?

* * * *

তেলিদের বাড়ীতে কেউ ছিল না, তিন চার মাস হইতে তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ীতে তালাবন্ধ, নতুবা কালরাত্রে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে বাড়ীর লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের স্বরে বলিল—এসো এসো, নিরুদিদি, এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ করে ঘরে তুল্‌বে, দুধে-আল্‌তার পাথরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি এখন সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক্! নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চোদ্দ বছরে যেমন পাগলটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছ। বৌ নিয়ে আস্‌চো তা একটা খবর না, কিছু না। কি কোরে জান্‌বো তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙ্গা ঘরে হুপ্ করে এনে তুল্‌বে? ছি ছি, ছাখো তো কাণ্ডখানা! রাত্রে যে রইলে কি করে এখানে, সে কেবল তুমিই পার।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাবো নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকরীতে যেতেই হবে। নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুসি, বলিল—আমি আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেবো বৌকে এখানে থাকৃতে দেবো না! অপু বলিল—তা হবে না, আমায় মায়ের ভিটেতে সন্দে দেবে কে তা হ'লে? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেও। নিরুপমা তাতেই রাজী। চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলী পরিয়া তাহাদের বাড়ী পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে সে অপুকে সত্যসত্য স্নেহ করে, তাহার দিকে টানে। সর্ব্বজয়ার মৃত্যুর সময় সে এখানে ছিল না, শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া সব শুনিয়া ভারী দুঃখিত হইয়াছিল, আরও দুঃখিত হইয়াছিল অপুর ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্ম্মুখী আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে ঘর গৃহস্থালী পাতাইয়া, বাসা বাঁধাইবার প্রবৃত্তি নারীমনের সহজাত ধর্ম্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল, যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ী ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভাল লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুণিতে থাকে। মনে হয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা নব-বিবাহিত, তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। কোনো রকমে এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ী গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। এই সাত আট দিনের মধ্যে অপর্ণ বাড়ীর চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে! তেলি বাড়ীর বুড়ীঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এল.-মাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক্, এখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোষের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজের হাতে উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ী যেন ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। অথচ অপর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক্, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ী থাকিতে নিজের হাতে তাহাকে কখনো বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ী যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয়, ফি শনিবার বাড়ী যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ বারো টাকার বেশী মাসে এ পর্য্যন্ত সে দিতে পারে নাই। সে বোঝে ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে

দস্তুরমত বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল।

শ্রাবণ মাস গেল। তাহার ছোট ঘরটির সাম্‌নে মিত্তিরদের প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকের পাশে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের ধারে চাঁপাগাছের ডালে ডালে ফুল ধরিল, প্রতি রাত্রে খোলা জানালা দিয়া সুমিষ্ট গন্ধটা ঘরে আসিতেই তাহার বুকের মধ্যে বেদনাটা জাগিয়া উঠে·· একটা দারুণ যন্ত্রণা, ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, রীতিমত ছট্‌ফট্‌ করে। কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রে অপর্ণার সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল, শুধুই সে কথা ভাবে।

ডাকপিয়নের খাকির পোষাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্ত্তে নিরাশা ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের হ্যারিসন রোড পোষ্টাপিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখসুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়াছিল? পূর্ব্বে কালেভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন কিছু ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসর খানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই। উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই একবৎসর! মনে আছে, তখন তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখ্‌চি?- রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্দ্ধেক বীরেন বোসের নামে?

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাক্‌লেই চিঠিপত্তর আসে পাঁচদিক থেকে। তোমার নেই কোনো চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিত কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হল্‌দে খাম, মেয়েলি হাতে লেখা পোষ্টকার্ড। এক একবার হাতে তুলিয়া লোভদমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, ইতি আপনার স্নেহের ছোট বোন সুশী ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না? আজকাল আর সেদিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

বাছিয়া বাছিয়া পচিশখানা ভাল খাম ও চিঠির কাগজ কলেজষ্ট্রীটের একটা দোকান হইতে সে কিনিয়া আনিল। যখনই বড় মন উতলা হয়, তখন একখানা করিয়া চিঠি লেখে স্ত্রীকে। তাহার পর চাতকের মত উত্তরের প্রত্যাশায় থাকে, প্রায়ই ঠিক হিসাব মত দিনেই উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু যেদিন না আসে! ভগবান সে-সব দিনের সৃষ্টি করেন কোন্‌ প্রাণে?

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলা মাসের মত দীর্ঘ।

যেদিন জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া যাইবে, সেদিনটার কথা ভাবিতেই পারা যায় না! শিয়ালদহ ষ্টেশনটা সেদিন পর্য্যন্ত থাকিলে বাঁচি, উঠিয়া না যায়!

*　　*　　*

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় সে আপিস হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনে আসিল। পথে নববিবাহিত বন্ধু অনাথ বাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল্‌ কল্লে আবার সেই চারটে পচিশ, দুঘণ্টা দেরী হয়ে যাবে বাড়ী পৌছতে—আচ্ছা আসি নমস্কার।

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে ধূলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কি গাধাবোট গাড়ীখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটী? বাড়ী পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে। খুসির সহিত ভাবিল চিঠি লিখে তো যাচ্ছিনে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ী যখন পৌছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরী। বধূ বাড়ী নাই, বোধ হয় নিরুপমাদের বাড়ী কি পুকুরের ঘাটে

গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটুলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া তাকের আয়না। চিরুণীর সাহায্যে টেরী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সাম্‌নে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরাণো রোগ, মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড়্ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভের স্বরে বলিল—ওমা, তুমি! কখন—কৈ—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ। আচ্ছা তো ভীতু!

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—বা রে, ওই রকম কোরে বুঝি আচম্‌কা ভয় দেখাতে আছে? কটার গাড়ীতে এলে, এখন—তাই বুঝি আজ ছ' সাতদিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাব্‌চি—

অপু বলিল—তারপর তুমি কি রকম আছ বলো? মায়ের চিঠি পত্র পেয়েচ?

তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েচ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো, না? তোমার জন্যে এনেচি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বলো?

—কি খাবে বলো? ঘি এনে রেখেচি, লুচি ভেজে দি, আর আলুপটলের ডাল্‌না করি—আর দুধ আছে—

মায়ের মৃত্যুর পরে এমন যত্ন অপুর অদৃষ্টে ঘটে নাই।

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক্ হইল, বাড়ীর পিছনের উঠানে অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে নিজের হাতে গাঁদার চারা বসাইয়াছে। রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা, লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল, আজ পুঁইশাক খাওয়াবো, আমার গাছের ওই দোপাটীগুলো দ্যাখো? কত বড়, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েচে আর একটা জিনিস দ্যাখোনি এস দেখাবো—

অপুর সারাশরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে?

—হবে না আর কেন? আচ্ছা, কিন্তু এত ফুল থাক্‌তে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁততে গেলে? অপর্ণা সলজ্জমুখে বলিল—জানিনে—যাও।

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো একথা অপর্ণাকে জানায় নাই, যে মিত্তির বাড়ীর কম্পাউণ্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে এই দু মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে,একথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্ম্মব্যস্ত, সদা হাসিমুখ মেয়েটির উপর তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? মাগো, কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারা-গাছ থাক্‌তে দেয় না, রোজ খেয়ে দেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় বসে বসে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি' আসে, ও-বাড়ীর মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিরু দিদি।

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পরে একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়তো বা সারারাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বস্‌বে? গরম গরম সেঁকে দি—অপু বলিল—তা হবে না, আজ এস আমরা দুজনে একপাতে খাবো। অপর্ণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল। অপু দেখিয়া বলিল, ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ও-রকম বস্‌লে চলবে না।

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার এত বদ্‌খেয়ালও মাথায় আসে, মাগো, মা! দেখ্‌তে তো খুব ভালো-মানুষটি ·

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সে-রাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালায় রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া তুলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারী খান-তিনের বেশী নিজের জন্য লইতেই পারিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অপর্ণা বলিল—কই কি বই এনেচ বল্লে দেখি?

মাদুরটা বিছিয়ে এস দুজনে বসি মেজেতে—তোমাকে আজ পড়াশুনোর সব নিয়ম বলে দেবো, অপর্ণা। রোজ রাত্রে খানিকটা কোরে পড়বে, দু তিন মাসে কত শিখতে পারবে দেখো। পড়াশুনার আগ্রহ অপর্ণারও খুব। সে ইংরাজি জানে না, শিখিবার খুব ইচ্ছা। কোন্ বইখানা আগে পড়িতে হয়? দুজনেই কৌতুকপ্রিয়, সমবয়সী, স্বচ্ছ-মন, বালক বালিকার মত আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো এই পদ্যটা?

অপর্ণা প্রদীপের সল্‌তেটা চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া উস্কাইয়া দিয়া পিল্‌সুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না কই দেখি?

অপর্ণা যে এত সুন্দর কবিতা পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জলমুখে চাহিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল - থাক্‌গে পড়া, একটা গান করো না?

অপু বলিল—একটা টিপ পরো না খুকী? ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে?

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—সত্যি বল্‌চি অপর্ণা, আছে টিপ্‌—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ্ পরে? আমার ছোট বোন্ শান্তির এখন টিপ্ পরবার বয়েস তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতে হইল। সত্যই ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আয়ত, সুন্দর চোখ দুটির উপরে দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়াভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর! অপুর মনে হইল এই মুখের জন্যই জগতের মত টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার বার সতৃষ্ণচোখে চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্চে, এ বয়েসে কি টিপ মানায়? কি করি পরের ছেলে, বল্লে তো আর কথা শুন্‌বে না তুমি?

—না গো পরের মেয়ে, শোনো, একটু সরে এসো তো—

—ভারী দুষ্টু—

অপু হঠাৎ হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আমায় দেখ্‌তে কেমন দেখায় বলো—না সত্যি—কেমন মুখ আমার? ভালো, না পেচার মত?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জল দেখাইল—নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেচার মত।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো খুব ভালো, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয়নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সস্নেহে অপুর হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল—মাগো, তুমি কি! এতেই হয়ে গেল রাগ?

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে কানাচে, গাছে পালায় বাঁশবনে, ঝিম্ ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা। চারি ধার নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাসজল বাদল রাতের দম্‌কা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের ঘরের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা।

বধূ ভাবে তাহার এই শিশুর মত সরলপ্রাণ স্বামী কত কষ্টই না পাইয়াছে একা একা—সে সব কথা

পুলু-দার মুখে সে শুনিয়াছে। যা হইবার হইয়া গিয়াছে, এই বার থেকে সে যখন আসিয়াছে, আর কোনও কষ্ট হইতে দিবে না।

অপু বলিল—দ্যাখো, আজ রাত্রে মায়ের কথা বড় মনে হয়—মা যদি আজ থাকৃতো ?

অপর্ণা শান্ত স্বরে বলিল—মা সবই জানেন, যেখানে গিয়েচেন, সেখান থেকে সবই দেখ্চেন। পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেচি।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখে শান্ত,স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল দ্যাখো, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল দুপুর বেলা, বিকেলে আঁচল পেতে পান্‌চালার পিঁড়েতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পুতেচি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েচি,খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে, বুঝলে ? স্বপ্নে দেখ্চি একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ীপরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মত মুখের আদল, আমায় আদর করে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলচেন, ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুখবিসুখ হবে আবার ? তারপর তিনি তাঁর হাতের সিঁদুরের কোটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চম্‌কে জেগে উঠ্‌লাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হোল যে তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কি না—দেখি কিছুই না—বুক যেন ধড়াস্ ধরে উঠল—চারিদিক অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি সন্দে হয়ে গিয়েচে—বাড়ীতে কেউ না - খানিকক্ষণ না পারি কিছু কর্ত্তে—হাত পা যেন অবশ—তার পরে মনে হল এ মা,—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলিনি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরে বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিম্‌ঝিম্ শব্দ। একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তান রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে হাওয়ায় দম্‌কা, অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধ।

জীবনের এইসব মুহূর্ত্ত বড় অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব কথা, এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারাজীবনেও সে সব চিন্তা মনে আসিত না।··· কেমন একটা রহস্য · জন্ম মৃত্যু···আত্মার অদৃষ্টলিপি··· একটা বিরাট অসীমতা···

কিন্তু পরক্ষণেই অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনো কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোনো কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা, তিনটা। তারপরে আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফর্সা হ'য়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে ?

—না। তুমি একটা কাজ করো না ? কাল আর যেও না—

—আপিস কামাই করবো ? তা কি কখনো চলে ?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাঁহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁঠ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি! আচ্ছা দুষ্টু তো ?···এখুনি হারাণের মা কাজ কর্ত্তে আস্‌বে- বুড়ী কি ভাববে বলো দিকি ? ভাববে এত বেলা অব্‌ধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা ছাড়ো, আমার লজ্জা করে—ছিঃ—অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখ্‌খুনি এলো ব'লে বুড়ী—পায়ে পড়ি তোমার, ছাড়ো—

অপু নির্ব্বিকার।

এমন সময়ে বাহিরে হারাণের মায়ের গলা শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির স্বরে বলিল—ওই

এসেচে বুড়ী—ছাড়ো ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা ঘরের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা ভোর হয়ে গিয়েচে। ওঠো, ওঠো, ঘড়াঘটীগুলো বার করে দেবে না?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিঁঠ খুলিয়া দিল। আপিস্ কামাই করিয়া সেদিনটাও অপু বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

ক্রমশঃ

পাটব্যবসায়ে মন্দা

প্রতিবিধানের পথ

শ্রীসুধীরকুমার সেন

পৃথিবীব্যাপী এক অভূতপূর্ব্ব আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে কাঁচা মাল হিসাবে ও কলের তৈরী জিনিষ হিসাবে পাটের রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় এবং পাটের চাষ খুব বেশী করিয়া হওয়াতে পাটের উৎপাদন বাড়ায় বাংলা দেশে পাট-ব্যবসায়ে ভয়ানক মন্দা পড়িয়াছে।

চাষী দেখিতে পাইতেছে যে, পাট যে দরে বিক্রী হয়েছে তাহাতে শুধু যে চাষের খরচ পোষাইবে না তাহাই নয়, ক্ষেতের পাট কাটিয়া ঘরে তোলাও ভুল হইবে।

গত কয়েক বৎসর লক্ষ্মী খুব কৃপা করিয়াছিলেন। সুসময়ে আশানুরূপ বর্ষণ হইয়াছিল, উৎপাদনও হইয়াছিল প্রচুর। যে-বৎসর চড়াবাজার থাকিত তার পরের বৎসর দর ততটা উঠিত না, তবুও বৎসরের পর বৎসর পাটে বেশ ভাল লাভ পাওয়া গিয়াছে। খুব আয় দেখা যাইতেছিল, পাটচাষের জমিও দিন দিন বাড়িতেছিল, এই বৎসর দেখা গেল যে, ১৯২৬ সনের পরে আর কখনও বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হয় নাই, এবারকার শস্যও হইয়াছে চমৎকার। কিন্তু বেচাকেনা এবার বেশী নাই—একেবারেই নাই বলিলেই চলে।

অবস্থা যখন এই দাঁড়াইয়াছে তখন প্রত্যেকেরই ইহার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করা উচিত, কারণ, ইহার একটা সমাধান হইলে সকলেরই সমস্যা মিটিবে। যে-জমীদার সদর খাজনা জোগাইবেন তিনি নিজে খাজনা আদায় করিতে পারিতেছেন না। অনাহারে মৃত্যু ও সর্ব্বনাশের পথে বসিয়া চাষী আজ এক পয়সাও খাজনা দিতেছে না। মহাজন, মাড়োয়ারী, সমবায় ঋণদান সমিতি ও সমবায় পাট সমিতিগুলিরও দুর্দ্দিন উপস্থিত। প্রত্যেক ব্যবসায়েরই অবস্থা সঙ্গীন; চাষীর হাতে টাকা না থাকিলে—বাংলা দেশের শতকরা সত্তরটি লোকই চাষী—ব্যবসায়ে জোর ধরে না। সরকারের পরোক্ষভাবে অনেক টাকা লোক্সান হইবে, কারণ আমদানী-রপ্তানী না থাকায় রেলপথের ও ডাক বিভাগের আয় কমিয়া যাইতেছে।

অনেক দিক হইতেই অনেকরূপ প্রস্তাব আসিতেছে। ভারত-সরকার রাষ্ট্রীয় গোলমালে, আয়হ্রাসে ও আইন-অমান্য আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনোরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। বাংলা সরকার বোধ হয় সামান্য কিছু 'তাকাভি' বীজ শস্যের ঋণ দিয়া গৃহস্থদিগকে সাহায্য করিবেন; কিন্তু যে জমিদারবর্গ সদর খাজনা বিষয়ে কিছু সুবিবেচনার দাবী করিতেছে তাহারা বা চাষীরা কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। গৃহস্থদের ঋণদান করিলে মহাজন বা ব্যবসায়ীদের হয়ত একটু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু তাহাও এত কম যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

প্রস্তাবগুলি প্রধানত এই ধরণের—(ক) শস্য কাটিবার জন্য টাকা সরবরাহ করা ও শস্য মজুত করিয়া রাখা; (খ) আগামী বৎসরের জন্য উৎপাদন-হ্রাসের ব্যবস্থা করা;

(গ) জমিদারের ও সরকারের সমানরূপে এবারকার খাজনা মাফ করা।

এই সব প্রস্তাবানুযায়ী কাজ হইলে দুর্দ্দশার কতকটা লাঘব হইবার কথা, কিন্তু ইহাতে উহার প্রতিকার হইবে না। ভাল বর্ষণ হইলেও যখন ধানের দর লাভজনক হয় না, তখন যতই না বারণ করা যাউক, আমাদের চাষীরা নিশ্চয়ই পাট সমানভাবেই বুনিয়া চলিবে এবং প্রত্যেক বৎসরই পাটের উৎপাদন এইরূপ বেশী থাকিবে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, যদি এবারকার সব শস্য কাটিয়া তোলা হয় তাহা হইলেই বৎসরান্তে যাহা মজুত থাকিবে তাহাতে আগামী বৎসর ত চলিবেই, এমন কি তারপরের বৎসরের চাহিদাও তাহাতে মিটিবে। চাষ-বারণ করিলেও কিছু হইবে না, এইরূপ বারণ কোনও দেশেই টিকে নাই। কফি, চা, রবার, কর্পূর nitrates, Hennequen-এর উৎপাদন-খর্ব্বের চেষ্টায় কি ফল হইয়াছে তাহাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পাট অবশ্য আমাদের একচেটিয়া জিনিষ, সে হিসাবে উহার সহিত চা বা কফি চাষের তুলনা চলে না। কিন্তু একচেটিয়া জিনিষ লইয়াও এইরূপ উৎপাদন-খর্ব্ব করিলে কারবারী একচেটিয়া দেশেরই ক্ষতি হয়। আর যেখানে চাষী অশিক্ষিত, ক্ষেত চষিয়াই দুবেলা দুমুঠা আহার যোগাইবার চেষ্টা করিবে, সেখানে এইরূপ বারণসূচক আদেশ কাজে খাটানো খুব শক্ত কথা। পাট চাষ ত খুব বড় বড় যৌথ কারবার বা খুব বড় ধনীদের জীবিকার উপায় নয় যে দু-এক বৎসর ঘরের টাকা খাইয়া উৎপাদকরা সুদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারিবে। শস্যের উৎপাদন হ্রাস সম্ভব হইলেও নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। পাটের ব্যাপারে উহা সম্ভবও নয় এবং উহা কোনও রূপ সুব্যবস্থাও নয়।

সদর খাজনা বা জমিদারের খাজনা মাফ করাও সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র—উহা প্রতিকার নয়।

তাহা হইলে এই অবস্থার প্রতিকার হইবে কিরূপে? পাটের বাজারে অস্বাভাবিক চড়া দর দেখা দিলেই আবার পাটের চাষ চলিবে, এইরূপ অধিকতর পরিমাণ জমিতে যদি সুবর্ষণ হয়, উৎপাদন বাড়িবে, এবং ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্দ্দশাই দেখা দিবে। আমরা কি তাহা হইলে চিরদিনই এমনিতর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিব? এক বৎসর লাভ ও পর বৎসর সর্ব্বনাশ ইহাই কি নিয়ম হইয়া দাঁড়াইবে?

শুনা যায়, হেনরি ফোর্ড নাকি স্থির করিয়াছেন, যে ব্যবসাক্ষেত্রে চড়া অস্বাভাবিক চাহিদা (boom) নিবারণ করিতে পারা যায়, এবং তাহা যদি সম্ভব হয় তবে অতি-জোগানের (slump) ফলে বাজারে মন্দাও দেখা দিবে না। তাঁহার অভিমত এই যে, উৎপাদন, প্রয়োজন প্রভৃতি হিসাব বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাবের অঙ্কগুলির সংযোগ সাধন করিয়া জাতির যতটা চাহিদা ততটা পরিমাণ শস্য বা শিল্পজাত উৎপাদন করিতে হইবে। যদি এইরূপ দুঃসাধ্য হিসাব সম্ভবও হইত, তাহা হইলেও অন্যান্য দেশের চাহিদা ও জোগানের ধাক্কায় ইহার ওলট-পালট হইয়া যাইত। কিন্তু, কোনও দেশ স্বাধিকার-সম্পন্ন হইলেও কার্য্যতঃ এই মতের দ্বারা ব্যবসাক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। আজকালকার শিল্পজগতের একটি সুপরিচিত কথা—ম্যাস্ প্রডাক্শান্। হেনরি ফোর্ড-এর মত কার্য্যে পরিণত হইলে ঐরূপ ম্যাস্ প্রডাক্শান্ খর্ব্ব হইবে। যদি হিসাবের ফলে উৎপাদন খর্ব্ব করা যায় তাহা হইলে তাহা বেশী উৎপাদন হইবে না, খর্ব্বিত (restricted) উৎপাদন হইবে।

আমাদের কৃষিজাত ও কাঁচা মালে, এমন কি আমাদের শ্রমজাত শিল্পদ্রব্যে পর্য্যন্ত, আমরা যে বরাবর অত্যধিক উৎপাদনের সমস্যা সৃষ্টি করিতেছি, তাহার প্রতিকার চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

ম্যাস্ প্রডাক্শান্ খর্ব্ব করা ব্যর্থ। তাহা না করিতে হইলে প্রতিকারের পথ ম্যাস্ ডিষ্ট্রিবিউশান ও ম্যাস্ সেল্। প্রতিনিমেষে ভাবিতে হইবে কাঁচা মালকে নূতন কি কাজে লাগানো যাইতে পারে, নূতন কি দ্রব্য তাহাতে প্রস্তুত সম্ভব, নূতন কি পন্থা অবলম্বন করিলে জনসাধারণ এই সব দ্রব্য বেশী কিনিবে। আমরা পাট উৎপাদন করি বেশী, কিন্তু কাজে লাগাই কম। আমরা কাঁচা পাট ও পাটের

শিল্পজাত রপ্তানী করি। কিন্তু পাটের নূতন উপযোগিতার ক্ষেত্র আমরা সৃষ্টি করি না, কিংবা পাট হইতে নূতন শিল্পজাত তৈয়ারীর চেষ্টাও আমরা দেখি না। আজ আমাদের মন্ত্র হওয়া উচিত "পাট কাজে লাগাও" (পাটের জিনিষ ব্যবহার করুন)। বাংলা দেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষে এই এক কথাই ধ্বনিত হওয়া উচিত। পাটের নূতন-নূতন ব্যবহারের উপায় কি—ইহাই লোকের ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত। কি করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি।

১। তসর তৈয়ারীতে পাটের দরকার। পাট ও রেশম একটির পর একটি, এইরূপ টানা-পোড়েনে দিলে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের বস্ত্র হইবে।

২। র‍্যাশান্ ক্রাশ্ নামীয় বস্ত্রে কিছু কিছু পাট মিশ্রিত।

৩। কার্পেট পাট হইতে আরও বেশী পরিমাণ তৈয়ারী করা চলে।

৪। রঙীন পাটের আঁশ দিয়া সতরঞ্চি তৈয়ারী করা যায়।

৫। ঝাড়িবার পুঁছিবার কাজে ন্যাকড়ার পরিবর্ত্তে পাট ব্যবহার করা চলে। ন্যাকড়ার পুতুল, ক্রিকেটের কোটি কোটি বল এবং যেখানেই কোনও রূপ গদীর প্রয়োজন, সেখানেই পাটের প্রয়োগ চলে।

৬। পাটের রঙীন ডোরাকাটা চিক্কণ আঁশের দ্বারা জাপানীতে এক সময়ওয়াল-পেপারের কাজ চালানো হইত।

৭। চামড়ার পরিবর্ত্তে জুতার শুকতলা পাটের হওয়া সম্ভব। চটিজুতার ঐরূপ শুকতলা হওয়া উচিত।

৮। 'টেপ্'-এর বা ফিতার পরিবর্ত্তে পাট ব্যবহার করা যায়।

৯। যেখানে ক্যান্‌ভ্যাস ও বিদেশের ক্যানভাস্ প্রয়োগ চলিতেছে, সেখানেই মোটা আঁশের পাট ব্যবহার করা উচিত।

১০। আস্তর ও চূণকাম করিলে মোটা আঁশের পাট দিয়া বেড়া দেওয়া যায়।

১১। রঙীন আঁশের পাটের থলি দ্বারা ক্যানভাসের বা বিলাতি চামড়ার ব্যাগ বা ছেলেদের বইয়ের থলির কাজ চলে।

১২। পাটের বনাতি বোধ হয় চমৎকার ম্যাকিণ্টশ বা তেরপলের কাজ দিবে।

১৩। শীতবস্ত্র পাটের সূতায় তৈয়ারী করা যাইতে পারে। নাতিশীতের দেশে পাতলা পশম ও টুইড্ কাপড়ের স্থান এইরূপ পাটের শীতবস্ত্র অধিকার করিতে পারে।

১৪। টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন্ ও মাছধরার জাল আলকাৎরা ছোপানো পাটের সূতায় তৈয়ারী করা যায়।

১৫। পর্দ্দা ও জানালার কাপড় পাটে তৈয়ারী হইতে পারে।

১৬। পাট হইতে বিছানার আবরণ হওয়া সম্ভব। যদি পাটের সুন্দর রঙীন্ ছিট বুনা যায়, তাহা হইলে 'বেড্'-এর পরিবর্ত্তে উহাতে শেজের ঢাক্‌না করা চলে।
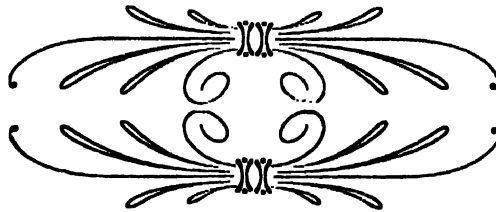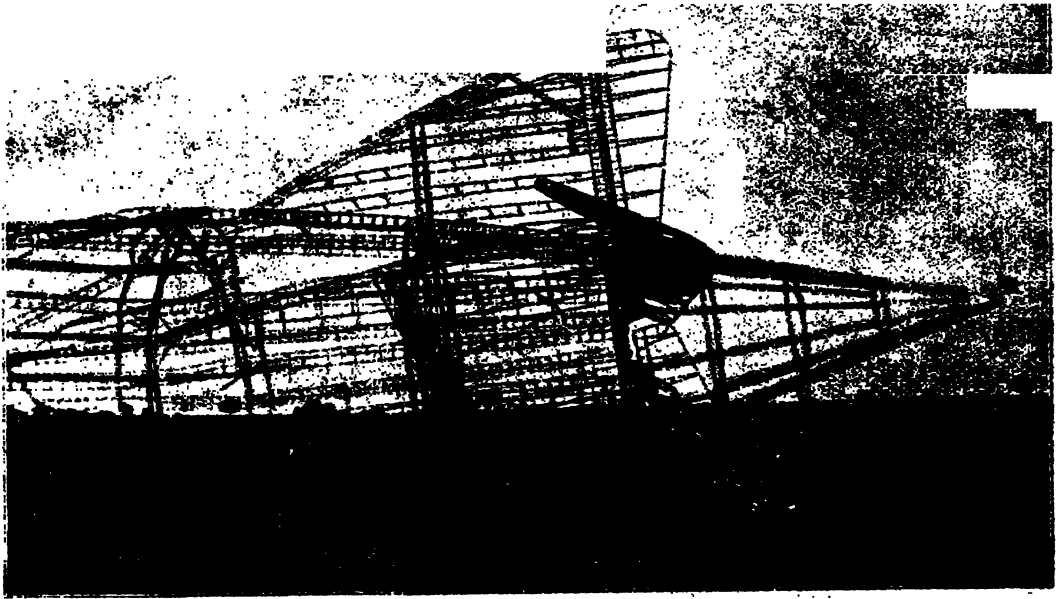
দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ ও বাংলা

শিক্ষাকার্য্যে দান—

কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য এবং কাম্প্‌তির ব্যবসায়ী পরলোকগত ডি, লক্ষ্মীনারায়ণ শিল্পশিক্ষার উন্নতিকল্পে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার দাস, ডি-এস্-সি (লণ্ডন)—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয় লণ্ডনের ইম্পীরিয়াল কলেজ অফ সায়ান্সে সম্প্রতি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার জন্য লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক, গ্রন্থাবলী এবং একটি অনুবীক্ষণ-লণ্ডনের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র এবং বৈজ্ঞানিকসমাজ ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং ১৯২৫ সালে সাদাম্‌টন্ সহরে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সমক্ষে বিজ্ঞানের প্রগতি বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তাহা সমবেত সমগ্র প্রাণিতাত্ত্বিকদিগের নিকট প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। লণ্ডনের জুয়লজিকাল সোসাইটির অনুরোধে ডাক্তার দাস তথাকার পশুশালায় কতকগুলি ভারতীয় মৎস্য উপহার দিয়াছিলেন। সেগুলি আজিও জীবিত আছে এবং এতদঞ্চলে ঐ জাতীয় মৎস্যের মধ্যে বিরল নিদর্শন বলিয়া এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

১৯২৬ সালে যখন আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু য়ুরোপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তিনি জীববিদ্যা-

অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার দাস

বন্দী কে ?

বার্লিনের একটি পত্রিকা এই ধাঁধাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন

যন্ত্র পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। আপেক্ষিক শরীরসংস্থানবিদ্যা ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর মৌলিকতা ও তৎসম্পাদন কলার শ্রেষ্ঠত্ব ডাক্তার দাসের গবেষণার বিশেষত্ব; এবং এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক জগতে যশের অধিকারী করিয়াছে।

ডাক্তার বসন্তকুমার দাস যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট হইতে সরকারী বৃত্তি পাইয়া এখান হইতেই যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিলাত যান এবং তথাকার বিজ্ঞানাগারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে তাঁহার আধুনিকতম গবেষণা বৈজ্ঞানিকদিগের বর্ত্তমান ধারণায় কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

গ্রেটব্রিটেনে প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়নকারী ভারতীয় ছাত্রদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই জন্তুবিদ্যানুশীলক অন্যান্য সভা-সমিতি ব্যতীত তথাকার জগৎবিখ্যাত রয়াল সোসাইটির বাৎসরিক সান্ধ্যসম্মিলনীতে তিনবার নিমন্ত্রিত হইয়া জন্তুবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় তিনি তাঁহার আবিষ্কার সমূহের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ জাতীয় মৎস্যকে কি প্রকারে জলে নিমজ্জিত করিয়া ডুবাইয়া মারা যাইতে পারে।

অধ্যাপনার জন্য একজন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ পদের জন্য বহু প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি ডাক্তার বসন্তকুমার দাসকেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ডাক্তার দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে স্যর জগদীশচন্দ্র বসু যে অভিভাষণ দান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ডাক্তার দাসের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বসন্তকুমার দাস প্রায় চার বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ডাক্তার দাসের রচনাবলী রয়াল সোসাইটির পত্রে (Philosophical Transactions), এবং অন্যান্য দেশীয় সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁহার গবেষণাত্মক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই সকল [illegible]

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

কোন পত্রিকা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে হইলে সেই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা করাই রীতি। কিন্তু কখন কখন কোন কোন সম্পাদক তাহা করেন না। মডার্ন রিভিউ বা প্রবাসী হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া তাহার নাম না করিতে কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ রুশিয়া দেখিয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা জানিতে সকল পাঠকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য তাঁহার বক্তব্য যত বেশী লোকে পড়ে, ততই ভাল। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত এবং পরে প্রকাশিতব্য তাঁহার চিঠিগুলির কোন কোন অংশ কোন সম্পাদক নিজের কাগজে উদ্ধৃত করিতে বা অনুবাদ করিয়া দিতে চাহিলে তাহা অনায়াসে করিতে পারেন; সর্ত্ত কেবল এই, যে, প্রত্যেক সংখ্যায় উদ্ধৃত প্রত্যেক চিঠির অংশের **শিরোদেশেই** ছাপিয়া দিতে হইবে **"প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।"** অনুবাদ সম্বন্ধেও সর্ত্ত এই।

—

মার্জ্জার ও অহিংস আইনলঙ্ঘন

বিড়ালের নয়টা প্রাণ আছে বলিয়া ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে। অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টাকে সরকার বাহাদুর মার্জ্জারের মত নবপ্রাণ-বিশিষ্ট মনে করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, উহার আরম্ভ হইতে সরকারী সাপ্তাহিক পরিবীক্ষণে বলা হইয়েছে, যে, উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ উহার প্রাণ বধ করিবার নিমিত্ত একটি একটি করিয়া নয়টি অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে। নয়টি প্রাণ বধ করিবার জন্যই কি নয়টি অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজন হইয়াছে? তাহাতেও যদি অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা বিনষ্ট না হয় কিংবা যদি দশম অর্ডিন্যান্স আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রমাণ হইবে, যে, এই প্রচেষ্টা মার্জ্জার-জাতীয় নহে।

—

নবম অর্ডিন্যান্স ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

নবম অর্ডিন্যান্সের কেবল একটি কথার আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কি কারণে এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হইল, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া লর্ড আরুইন বলিতেছেন :—

"In view of the declared intention of the Congress to cause still greater damage and suffering to the public, I have considered it my duty to take such further powers as, in the opinion of my Government, will assist in checking the activities of the various organizations, through which effect is being given to the mischievous programme of the civil disobedience movement and other subversive movements."

লাট সাহেব বলিতেছেন, যে, কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের আরও বেশী ক্ষতি করিবার এবং সর্ব্বসাধারণকে আরও বেশী দুঃখ দিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করায় তিনি আরও কিছু ক্ষমতা গ্রহণ করা নিজের কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন। তিনি দমননীতি অনুসরণ করিবার নিমিত্ত নিজেই নিজের নিকট হইতে যত ইচ্ছা ক্ষমতা গ্রহণ করুন, সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহিতেছি না। কিন্তু আমরা জানিতে চাই, কংগ্রেস কবে, কোথায়, কাহার মুখ দিয়া সর্ব্বসাধারণকে দুঃখ দিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াছেন। মানুষ খুব ভাল উদ্দেশ্যে কাজ করিলেও কখন কখন সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি হয় ও নানাবিধ কষ্ট হয়। ইংলণ্ড ও তাঁহার মিত্র রাজ্যসমূহ, তাঁহাদের মতে, গত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত, জগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং সব জাতিকে নিজ নিজ দেশের শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত। তাঁহাদের এই সব মহৎ উদ্দেশ্য থাক্ বা না-থাক্, আমরা ধরিয়া লইলাম, উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও দেখা যাইতেছে, ঐ যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রদেশ সকলের বিস্তর লোক হত ও আহত হইয়াছে, তাহাদের পরিবারবর্গ দুঃখ পাইয়াছে, ঐ সব দেশের বাণিজ্যিক ক্ষতি খুব হইয়াছে, এবং ইংলণ্ডে এখনও কুড়ি লক্ষেরও অধিক লোক বেকার রহিয়াছে। ঐ সব দেশের রাজস্ব

ও চিন্তাশীল লোকেরা জানিতেন, যে, মহাযুদ্ধে এরূপ দুঃখ ও ক্ষতি অনিবার্য্য কিন্তু তা বলিয়া কি কেহ এরূপ বলা সঙ্গত মনে করেন, যে, ইংলণ্ডের গবর্ন্মেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সময় ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ও দুঃখ দিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের গবর্ন্মেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সময় ফ্রান্সের জনসাধারণকে দুঃখ দিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ?

তেমনি ইহা সত্য কথা, যে, অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা আরব্ধ হওয়ায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ও দুঃখ পাইতেছে, কিন্তু এইরূপ দুঃখ দেওয়া ও ক্ষতি করা কংগ্রেসের ঘোষিত (বা অঘোষিত গুপ্ত) অভিপ্রায় ? কখনই নহে। কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্য দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা। গবর্ন্মেণ্ট কিংবা অন্য কেহ সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু অন্য সকল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে-সকল ক্ষতি ও দুঃখ হইয়াছে, তাহা যেমন স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র ছিল, কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রাম সম্বন্ধেও তাহাই মনে করা ও বলা ন্যায়সঙ্গত। অস্ত্রচিকিৎসক দেহের অঙ্গবিশেষে যখন অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তখন রোগীর কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট দেওয়াটাই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য ছিল, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ সত্যবাদী ব্যক্তি বলিবেন না। অস্ত্রচিকিৎসককে কখন কখন মানুষের হাত পা চোখ কান কাটিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার অঙ্গহানি হয়। কিন্তু এইরূপ ক্ষতি করাটাই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য ছিল বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। উদ্দেশ্য, মানুষকে নীরোগ করা, তাহার হিত করা।

—

নবম অর্ডিন্যান্সের ফল

নবম অর্ডিন্যান্স জারি করিবার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বড়লাট বলিয়াছেন, যে, সর্ব্বসাধারণের মত অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রমশই অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইতেছে, এবং যদি তাহা আরও জোরের সহিত ইহার বিরুদ্ধে চালিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র দেশে এরূপ শৃঙ্খলা ও শান্তির অবস্থা পুনঃস্থাপিত হইবে, যাহাতে তিনি অর্ডিন্যান্সের মত রাজবিধি অনাবশ্যক বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবেন। লোকমত ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইতেছে, বড়লাট সরকারী খবর এইরূপ পাইয়াছেন। আমরা সেরূপ খবর পাই নাই। আমরা ভারতীয় বলিয়া এবং সমস্ত দেশ হইতে খবর পাইবার যেরূপ ব্যবস্থা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের আছে, আমাদের তাহা নাই বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু বিলাত হইতে বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড স্বয়ং গুজরাট ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্য কোন কোন অঞ্চল দেখিয়া লিখিয়াছেন, সমগ্র হিন্দু অধিবাসী কংগ্রেসের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহার সমর্থন করিতেছে, এবং মুসলমানদেরও অর্দ্ধেক—বিশেষতঃ শিক্ষিত ও তরুণ মুসলমানেরা—কংগ্রেসের সমর্থক। বড়লাট বা তাঁহার শাসনপরিষদের কোন সভ্য ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড সাহেবের মত স্বচক্ষে কোন অঞ্চল দেখেন নাই। সুতরাং কাহার কথা অধিকতর ভ্রমশূন্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ বড়লাটের নিকট খবর প্রাদেশিক লাটদের নিকট হইতে আসে, তাঁহারা খবর পান কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে, এবং শেষোক্ত হাকিমরা পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফৎ অধস্তন পুলিস কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে পান। দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপনের ভার আছে পুলিসের উপর। তাহারা কি স্বীকার করিবে, যে, তাহাদের চেষ্টা বিফল হইতেছে ? তাহাদের পক্ষে ইহা বলাই স্বাভাবিক, যে, প্রচেষ্টাটার জোর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। উহার জোর কমিবার একটা প্রমাণ এই দেওয়া হয়, যে, সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার সংখ্যা কমিতেছে। কিন্তু মোকদ্দমা কমান বাড়ান তো সম্পূর্ণরূপে পুলিসের হাতে ; এবং মোকদ্দমার সংখ্যার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। গ্রেপ্তার ও মোকদ্দমা না করিয়া পুলিস অধিকতররূপে লাঠি চালান ও "ন্যূনতম বলপ্রয়োগে"র অন্যান্য সুবিদিত উপায় অবলম্বন করিতেছে কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বোম্বাইয়ের খবরের কাগজগুলিতে দেখা যায়, সেখানে লাঠিপ্রয়োগ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িতেছে।

সে যাহা হউক, নবম অর্ডিন্যান্সের ফল কিরূপ হইতেছে, তাহাই এখন বিবেচ্য। এই অর্ডিন্যান্স জারি হইবার আগেই পুলিস কলিকাতায় কংগ্রেসের ও তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি সমিতির আফিসে তালা লাগাইয়াছিল। এখন তাহাই সর্ব্বত্র হইতেছে। আগেও পুলিস খানাতল্লাসী করিয়া কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া যাইত, এখনও লইয়া যায় কার্য্যতঃ বেশী তফাৎ হয় নাই। তবে আগে কাহারও মোটরগাড়ী বাজেয়াপ্ত হয় নাই, এখন তাহা হইতেছে। অবশ্য কংগ্রেসের আফিস পুলিস আগে সর্ব্বত্র বন্ধ করে নাই, এখন তাহা করিতেছে। তাহাতে কিন্তু এখনও কংগ্রেসের কাজ

অচল হয় নাই; কোথাও মাঠে, কোথাও গাছ-তলায়, কোথাও রাস্তায় আফিস বসিতেছে। কংগ্রেসের সংবাদপত্রসকলও বাহির হইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সত্যাগ্রহের জোর বেশী; সেখানে কংগ্রেসের আফিস করিবার বাড়ীর অভাব হইতেছে না—বিশেষতঃ বোম্বাই শহরে ও আহমেদাবাদ শহরে। বোম্বাইয়ে পুলিসের সহিত লোকে পরিহাসও করিতেছে। পুলিস সেখানকার একটি বড় বাড়ীতে স্থাপিত কংগ্রেস আফিস খানাতল্লাস করে ও তল্লাসের পর তাহা তালাবন্ধ করে। জিনিষপত্র সেখানে কিছুই ছিল না, কেবল একগাদা পুরাতন জুতা ছিল। বোম্বাইয়ে ও আহমেদাবাদে অনেক গৃহস্থ নিজের নিজের বাড়ীতে "কংগ্রেস আফিস" বলিয়া সাইনবোর্ড ঝুলাইয়াছে।

সত্যাগ্রহকে গবন্মেণ্ট বৈপ্লবিক ব্যাপার বলিতেছেন। যাহাদের পার্থিব বিষয়সম্পদ বেশী, তাহারাই বিপ্লবকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে। কিন্তু সত্যাগ্রহের জোর বোম্বাইয়ে সকলের চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও তথাকার বিদেশী কাপড়ের বাজার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ আছে, পুলিস খুলাইতে পারে নাই। এবং "ব্যাপারী মহামণ্ডল" নামক সেখানকার সকল বণিক্‌সমিতির সংঘ বড়লাটকে তারযোগে নবম অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনা ও প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন।

বিলাতী কাপড় ও অন্যান্য কোন কোন বিলাতী মালের কাটতি কিরূপ কমিয়াছে এবং ক্রমশঃ কিরূপ কমিতেছে তাহার বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

—

গুজরাটে সত্যাগ্রহ

গুজরাটের বারদোলী এবং অন্যান্য তালুকার অনেক গ্রামের চাষী গৃহস্থেরা সরকারী জমীর খাজানা না দিয়া ঘরবাড়ী জমী জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক। ব্রেলস্‌ফোর্ড সাহেব স্বয়ং এই সকল গ্রাম দেখিয়া তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হাজার হাজার লোকের এই প্রকারে স্বেচ্ছায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাঁহার নিকট গুজরাটী গ্রামবাসীরা পুলিসের ন্যূনতম বলপ্রয়োগের যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তত্রত্য কমিশনার গ্যারেট সাহেব তাঁহার নিকট এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বয়ং দেখিবার শুনিবার নিমিত্ত কোন কোন জায়গায় যান। তাঁহাকে চাষীরা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছে, স্বরাজ না পাইলে তাহারা খাজানা দিবে না। বলপ্রয়োগের বর্ণনা তিনি অসত্য বলিতে পারেন নাই, অথচ পুলিস কেন প্রহার করিল তাহাও নাকি বুঝিতে পারেন নাই। পুলিসের কোথাও কোথাও লাঠি চালাইবার এই একটা কারণ তিনি অনুমান করেন যে, সেখানে হয়ত আন্দোলনকারী কোন কোন লোক ছিল। কিন্তু আন্দোলনকারী কোথাও থাকিলে পুলিস তাহাকে ঠেঙাইতে পারে, ইহা কোন আইনে বা অর্ডিন্যান্সে নাই। যে আইন লঙ্ঘন করে, কোন কোন অপরাধের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকার পুলিসের আছে। কিন্তু আন্দোলনকারী মাত্রেই আইনলঙ্ঘক বা ঐরূপ অপরাধী নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের দেশী বিদেশী প্রত্যেক সম্পাদক কোন-না-কোন প্রকার আন্দোলন করে, কিন্তু তাহাদিগকে ঠেঙাইবার ব্যবস্থা কোন আইন বা উপআইনে নাই।

—

গুজরাটের গৃহত্যাগীদিগকে ফেরত চাওয়া

গুজরাটের বারদোলী ও অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলের অনেক চাষী গৃহস্থ বড়োদা রাজ্যে নিজ নিজ আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, বোম্বাইয়ের গবন্মেণ্ট বড়োদা গবর্ন্মেণ্টের নিকট এই সব গৃহত্যাগী প্রজাদিগকে ফেরত পাঠাইতে বলিয়াছেন। বড়োদা গবর্ন্মেণ্ট কি করিবেন জানি না। কিন্তু বড়োদা ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্য-সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া যদি স্বাধীন দেশ-সমূহের মধ্যে খুব ছোটও হইত, তাহা হইলেও ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট তাহার নিকট হইতে গৃহত্যাগী প্রজা ফেরত চাহিতে পারিতেন না। কারণ, এই সকল গুজরাটী গৃহস্থ চুরি ডাকাতী জাল জুয়াচুরি খুন লঘু বা গুরুতর আঘাত প্রভৃতি কোন রকমেরই অপরাধ করে নাই। তাহাদের কাহারও কাহারও কাছে বোম্বাই গবন্মেণ্ট যে সামান্য খাজানা পাইবেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যের ঘরবাড়ী জমী তাহারা রাখিয়া গিয়াছে; তাহা হইতেই খাজানা আদায় হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে এক্‌স্‌ট্রাডিশ্যনের অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত অপরাধীকে তদ্দেশের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও রাজনৈতিক—বিশেষতঃ অহিংস রাজনৈতিক—অপরাধের জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে না।

—

"ন্যূনতম বলপ্রয়োগ"

বড়লাট বলিয়াছেন, পুলিস বাধ্য হইয়া "ন্যূনতম বলপ্রয়োগ" করিয়া থাকে। অন্য কোন কোন লাটও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে জিজ্ঞাস্য এই, যে, ভারতীয় ব্রিটিশ কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স অনুসারেও যাহারা কোন দোষ করে নাই, তাহাদের অনেকের প্রতিও পুলিস বলপ্রয়োগ করিয়াছে ও করে কি না? যাহারা গ্রেপ্তারে কোন বাধা দেয় না এবং যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই চলে, তাহাদের প্রতি ন্যূনতম বা অধিকতম কোন প্রকার বলপ্রয়োগের প্রয়োজন, ন্যায্যতা ও বৈধতা কোথায়? কি প্রকার বলপ্রয়োগকে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ বলে? ন্যূনতম ও তদপেক্ষা অধিক বলপ্রয়োগের মাপকাঠি কি? বোম্বাইয়ের একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।

বোম্বাইয়ের চিকিৎসক সম্মেলনের (Bombay Medical Union) কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ২৯শে অক্টোবরের অধিবেশনে উহার অবৈতনিক সম্পাদক ডাক্তার দেশমুখ, এম ডি (লণ্ডন), এফ্ আর সি এস (লণ্ডন), মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

"That the Managing Committee of the Bombay Medical Union looks upon with horror and disgust the very high percentage (62 p. c.) of head injuries inflicted on the public by the police during their lathi charges on Sunday the 26th October, 1930."

তাৎপর্য্য, "বোম্বাই চিকিৎসক সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি, ২৬শে অক্টোবর সর্ব্বসাধারণের উপর পুলিসের লাঠি প্রয়োগ দ্বারা আহত লোকদের মধ্যে মস্তকে আঘাতের সংখ্যা (শতকরা ৬২), বীভৎস ও বিভীষিকাজনক মনে করেন।"

এইরূপ মনে করিবার কারণ এই, যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহা একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, যে, মস্তকে সামান্য আঘাতেরও ফল গুরুতর হইতে পারে বলিয়া তাহাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা উচিত নয়।

বোম্বাইয়ে পুলিস কোন্ তারিখে লাঠি চালাইয়া আহত লোকদের মধ্যে কত জনের মাথা জখম করিয়াছিল কমিটি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন; যথা, বর্ত্তমান বৎসরের

২১শে জুন	শতকরা	১০	জনের মাথা	জখম
১১ই জুলাই	"	১৩	"	"
২রা আগষ্ট	"	১৯	"	"
১৮ই সেপ্টেম্বর	"	২০	"	"
২৬শে অক্টোবর	"	৬২	"	"

সুতরাং কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, "২৬শে অক্টোবর বোম্বাই পুলিস যে বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, সর্ব্বসাধারণকে যথাসম্ভব গুরুতর আঘাত করিবার জন্যই তাহা করিয়াছিল।" এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্ন্মেণ্টের মত জানা যায় নাই।

পুলিসের ন্যূনতম বলপ্রয়োগের ফলে কেবল যে বোম্বাইয়েই অনেকে গুরুতর আঘাত পাইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য প্রদেশেও ইহা ঘটিতেছে; যেমন আসামের শ্রীহট্টে, বঙ্গের ঢাকা শহরে, মেদিনীপুর জেলার নানা গ্রামে, ইত্যাদি। আসামে ও বঙ্গে ন্যূনতম বলপ্রয়োগের বৃত্তান্ত বাংলা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। এই সকল বৃত্তান্তে কেবল লোকদের দৈহিক আঘাত এবং স্থল-বিশেষে মৃত্যুর অভিযোগই যে আছে, তাহা নহে, সম্পত্তিনাশের অভিযোগও আছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করিয়া যে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের রিপোর্টে এই সব কথা আছে। রিপোর্টগুলি বড়লাট ও বঙ্গের লাটকে পাঠান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা তাহা পাইয়া কি করিয়াছেন, জানা যায় নাই।

—

নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বোম্বাই-লাট

বোম্বাই শহরে ২৬শে অক্টোবর জাতীয় পতাকা অভিবাদন উপলক্ষ্যে পুলিস সভায় মহিলাদের হাত হইতে পতাকাগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য তাহাদের গায়ে হাত দেয় ও ধস্তাধস্তি করে, এবং কতকগুলি মহিলাকে একটা মোটরগাড়ী করিয়া একটা জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসে, এইরূপ সংবাদ বোম্বাইয়ের কাগজে বাহির হয়। বোম্বাইয়ের মেয়র ও দেশী বণিকদের চেম্বারের সভাপতি শ্রীযুক্ত হোসেনভাই লালজি বোম্বাই-লাটকে জানান যে, এই কারণে শহরে খুব উত্তেজনা হইয়াছে এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট কি মনে করেন এবং কি প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করেন। উত্তরে বোম্বাই-লাট স্যার ফ্রেডরিক সাইক্স লিখিয়াছেন, যে, "তিনি দুটি ঘটনা সম্বন্ধেই পূরা তদন্ত করাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, যে, খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ অত্যন্ত অত্যুক্তিপূর্ণ। একটা অপরাধের জন্য মহিলাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং তাহাদের বিচার করিয়া জেলে না পাঠাইয়া তাহাদিগকে পুলিসের একটা গাড়ীতে করিয়া বড় রাস্তায় এমন এক জায়গায় ছাড়িয়া

দেওয়া হয় যেখানে সর্ব্বদা গাড়ী চলাচল হয়। সুতরাং তাহাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। ইহাকে অমানুষিক দুর্ব্যবহার বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বসাধারণের মন উত্তেজিত হওয়ায় পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন, যে, এরূপ আর করা হইবে না।"

লাটসাহেবের এই কৈফিয়ৎটার কোন মূল্য নাই। পুলিসের ব্যবহার অমানুষিক না হইতে পারে—আমরাও ওজন না করিয়া কড়া-কড়া বিশেষণ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি—কিন্তু ইহা যে দুর্ব্যবহার তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি উহা দুর্ব্যবহার না হইবে, যদি উহা নিতান্ত অনাবশ্যক ও উচ্ছৃঙ্খল বেআইনী কাজ না হইবে, তাহা হইলে "উহা আর করা হইবে না" কেন বলা হইতেছে? লোকের মন উত্তেজিত হইতেছে, অতএব ইহা আর করা হইবে না, বলায় কেহ ভুলিবে না। লাঠিপ্রয়োগেও ত সর্ব্বসাধারণের মন উত্তেজিত হইতেছে, কিন্তু তাহা ত বন্ধ করা হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, গবর্ন্মেণ্ট মনে করেন সত্যাগ্রহ দমন করিবার তাহা একটা উপায়।

বোম্বাই-লাট যে তদন্ত করাইয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ পুলিসের বা তদ্বিধ সরকারী চাকরোদের দ্বারা। তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই বেদবাক্য। এক্ষেত্রে এই সরকারী তদন্তের ফল সত্য বলিয়া বোম্বাইয়ের কোন শ্রেণীর লোক যে বিশ্বাস করে না, তাহার প্রমাণ এই যে, বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সভায় কেবল তিন জন ছাড়া সব সভ্যের মতে পুলিসের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, পারসীদের সভায় পুলিসের কাজের নিন্দা হইয়াছে, বোম্বাইয়ের বহুসংখ্যক নাইটদের পত্নী লেডিদের ও অন্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দ্বারা আহূত এক বৃহৎ নারীসভায় পুলিসের কাজ নিন্দিত হইয়াছে, এবং বোম্বাইয়ের পঁচিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক অনুরোধপত্রে তথাকার শেরিফকে এই ঘটনার আলোচনা করিবার জন্য নগরবাসীদের এক সভা আহ্বান করিতে বলা হইয়াছে। [পরে প্রকাশ, অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।]

মহিলাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে না পাঠাইতে ত কেহ অনুরোধ করে নাই, অনেক মহিলাকে ত জেলে পাঠান হইয়াছে। আইন যেমনই হউক, আইন অনুসারে কাজ হইলে ত সত্যাগ্রহীরা তাহাতে আপত্তি করে না। জঙ্গলের কাছে না হইলেও শহর হইতে দূরে মহিলাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসাটা কি রকম ব্যবহার? তাঁহারা হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিবেন এরূপ কেন মনে করা হইয়াছিল? কিংবা ভাড়াটিয়া গাড়ী জুটিবে এবং মহিলাদের কাছে ভাড়াও থাকিবে, ইহাই বা কেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল?

বস্তুতঃ কিন্তু মহিলাদিগকে জঙ্গলের ধারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা মিথ্যা কথা বলিতেছেন এবং পুলিসের লোকেরাই সত্য কথা বলিতেছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এই রকম ব্যাপার নূতন নহে। মেদিনীপুর জেলায় কতকগুলি মহিলাকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া গাড়ী করিয়া লোকালয় হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে পুলিস কতকগুলি মহিলাকে অন্ধকার রাত্রিতে শহর হইতে দূরে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল।

জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইবার জন্য মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া ও ধস্তাধস্তি করা সম্বন্ধে বোম্বাই-লাট বলেন, "আমি দেখিতেছি, কোন স্থলেই ন্যূনতম বল অপেক্ষা বেশী বল প্রযুক্ত হয় নাই। একটি বে-আইনী সভা দ্বারা জাতীয় পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং ঐ অনুষ্ঠান নিষেধ করা হইয়াছিল। ঐ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে বাধা দিবার জন্য পুলিসকে পতাকাগুলি কাড়িয়া লইতে হয়। মহিলারা তাহাতে যথাশক্তি বাধা দিতেছিলেন। সুতরাং কিছু ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি অনিবার্য্য হইয়াছিল। নারীদের প্রতি বলপ্রয়োগে আমার চেয়ে কেহ বেশী দুঃখিত নহে। কিন্তু যাঁহারা নারীদিগকে আইনলঙ্ঘকের অবস্থায় স্থাপিত করেন দায়িত্ব তাঁহাদের। অতীত কয়েক মাস ধরিয়া কংগ্রেস মহিলাদিগকে সামনে খাড়া করিতেছেন, বে-আইনী সভা মিছিল প্রভৃতি কাজে তাঁহাদিগকে যোগ দেওয়াইতেছেন। অন্য যে সব দেশে নারীরা আইন অগ্রাহ্য করায় ব্যাপৃত হইয়াছিল, সেখানে পুলিস যে রূপ প্রণালীতে কাজ করিয়াছিল, এখানে তাহারা তাহা অপেক্ষা কম কড়া ব্যবহার করিতেছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাধারণ বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞানের জয় হইবে, আশা করা যায় না কি?...যদি পুরুষ ও নারীরা আইন ভঙ্গ করিতে থাকে, তাহা হইলে, আমার আশঙ্কা হয়, উভয়ের বিরুদ্ধেই সমভাবে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই।"

কর্ত্তৃপক্ষের মুখে আইনের মর্য্যাদা রক্ষার কথা শুনিলে হাসি পায়।

যেখানে বলপ্রয়োগের কোনই প্রয়োজন ছিল না, সেখানে প্রযুক্ত বলটা ন্যূনতম বা অধিকতম ছিল, তাহা বিবেচনা করা অনাবশ্যক। যে-সকল মহিলার হাতে জাতীয় পতাকা ছিল, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই হইত। অন্য সত্যাগ্রহীদের মত তাঁহারা তাহাতে বাধা দিতেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সব

স্বশাসক ডোমীনিয়নের এক একটা জাতীয় পতাকা আছে, এবং ভারতসচিব ওয়েজ্‌উড বেনের মতে গত দশ বৎসর ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমীনিয়নত্ব ভোগ করিতেছে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের লোকদের একটি জাতীয় পতাকা কেন থাকিবে না? যাহা ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা বলিয়া অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার আগে হইতেই ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া কোন আইনে অর্ডিন্যান্সে বা হাইকোর্টের রায়ে ঘোষিত হয় নাই। সুতরাং তাহা কাড়িয়া লইবার আইনসঙ্গত অধিকার পুলিসের নাই। আইনসঙ্গত অধিকারের কথা বলিতেছি এই জন্য, যে, বোম্বাই লাট স্বয়ং আইনের মর্য্যাদা রক্ষার কথা তুলিয়াছেন।

তাহার পর মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া ও ধস্তাধস্তি করা। আগেই বলিয়াছি, জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইবার অধিকার পুলিসের নাই। মহিলারা পতাকাগুলি নিজেদের হাতে রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। কেহ তাঁহাদের বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহা রক্ষা করিবার অধিকার যেমন তাঁহাদের আছে, নিজ নিজ হস্তস্থিত জাতীয় পতাকা রক্ষার অধিকারও তেমনি আছে। মহিলারা অন্য দেশে আইন ভঙ্গ করিলে পুলিস আরও অধিক কঠোর ব্যবহার করিয়াছে, বোম্বাই লাট বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নারীরা—যেমন ইংলণ্ডের ভোটলাভাথিনী সাফ্রাজেট মহিলারা—যে আইনলঙ্ঘন করিয়াছিলেন তাহা নিরুপদ্রবভাবে নহে, এবং তাঁহাদিগকে পুলিস গ্রেপ্তার করিতে গেলে তাহাতে তাঁহারা বাধা দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে গায়ের জোর খাটান চলিয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষের নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহিণীদের প্রতিও বল প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বোম্বাই-লাট আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। ভারতবর্ষের মহিলাদের ও পাশ্চাত্য মহিলাদের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে সংস্কার সম্পূর্ণ পৃথক্। পাশ্চাত্য দেশে যে-কোন পরিচিত পুরুষের সহিত ভদ্র মহিলাদেরও হাত ধরিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নৃত্য করা চলিত রীতি। আমাদের দেশে পুরুষদের সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড (করকম্পন) করাও ভদ্রমহিলাদের চলিত রীতি নহে। সুতরাং এ দেশে মহিলাদিগকে ঠেলাঠেলি করা গুরুতর অশিষ্টতা।

—

বামনদাস বসু

পূজার ছুটির জন্য কার্ত্তিকের প্রবাসী কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য আমরা যথাসময়ে প্রয়াগনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রবাসীতে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। তাঁহার মত বিদ্বান্, চরিত্রবান্, কৃতী ও দেশভক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজের মুকুটমণি খসিয়া পড়িয়াছে, ভারত-আকাশের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইয়াছে।

মেজর বসু মহোদয়ের সম্বন্ধে পৌষের প্রবাসীতে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। এইজন্য এখন আর কিছু লিখিলাম না।

—

নিরালম্ব স্বামী

গৃহস্থাশ্রমে নিরালম্ব স্বামীর নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান জেলার চন্না নামক গ্রামে তাঁহার

নিরালম্ব স্বামী

জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর হইয়াছিল। প্রবাসীর সম্পাদক এলাহাবাদের কায়স্থ

পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময় শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিলেন, লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল; কিন্তু পরীক্ষার জন্ত পঠনীয় পুস্তক পাঠে তেমন মনোযোগী তিনি ছিলেন না। কলেজ ছাড়িয়া যাইবার পর তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা অবগত নহি। তিনি কিছু কাল বড়োদা রাজ্যের সৈনিক বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন এবং আধুনিক রণকৌশল অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যখন বড়োদায় ছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ তথাকার শিক্ষা-বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মন্ত্র লাভ করেন। অরবিন্দ, তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত, প্রভৃতি যখন আলিপুরে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র আদি অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন যতীন্দ্রনাথও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নিরালম্ব স্বামী শেষজীবনে শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় ওরফে সোঽহম স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আফগানিস্থান, তিব্বত এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে প্রয়াগে যে কুম্ভমেলা হয়, সেই সময় তিনি প্রবাসী-সম্পাদকের কোটাপার্চার বাসায় থাকিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময় নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতেন। নিজের গৈরিক বসন এবং একটি কি দুটি কম্বল তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত নানা কথা তাঁহার জানা ছিল। সন্ন্যাসী বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে গেলে কুম্ভমেলার সমুদয় আখাড়া আদি দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া একদিন আমরা তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে গেলাম। নৌ-চালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। মাঝিকে বিশ্রাম দিয়া নিজেই একটা নৌকা চালাইয়া আমাদিগকে কোন কোন জায়গায় লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী হইলেও সাংসারিক বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি মনটাকে নির্লিপ্ত করেন নাই। তাঁহার দেশভক্তি প্রবল ছিল। যত সাধু সম্প্রদায়ের আখাড়ায় তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, সর্ব্বত্রই মোহন্ত বা অন্য প্রধান সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এবং সাধুসন্তদিগের বাণীতে ভারতবর্ষ কখন স্বাধীন হইবে সে বিষয়ে কিছু উক্ত আছে কি না। প্রায় সকলেই উত্তর দেন, ওরূপ সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন এবং কিছু জানেন না। কেবল গরীবদাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রৌঢ় সাধু, সন্ন্যাসী যতীন্দ্রনাথ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করায়, বলিলেন, "আমাদের একখানি গ্রন্থে [বা একটি সন্তবাণীতে, ঠিক্ কিসে বলিয়াছিলেন, এখন মনে নাই] আছে, ভারতবর্ষ আটাশ বৎসর পরে স্বাধীন হইবে।" সন ১৩১২ হইতে আটাশ বৎসর ১৩৪০ সনে পূর্ণ হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাব্যতা ও সত্যতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, মনের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাদেরও কতকটা গুপ্ত বিশ্বাস থাকিতে পারে। সুতরাং বলা বাহুল্য, সাধুটির কথা শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছিল।

নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম তাঁহার জন্মগ্রাম চন্নাতেই অবস্থিত ছিল। গত ১৯শে ভাদ্র তিনি দেহরক্ষা করেন।

—

শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিক্ষা

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত এস্ তাকাগাকি জাপানী ব্যায়াম ও কুস্তি জুজুৎসু শিক্ষা দিয়া থাকেন। জাপানে এই ব্যায়াম শিক্ষা দিবার যত খুব বিখ্যাত শিক্ষক আছেন, তিনি তাহার মধ্যে একজন। শান্তিনিকেতনে অনেক ছাত্র ও ছাত্রী এবং অন্য কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। বালিকা ও বালকদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই জুজুৎসু শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী শিক্ষকের ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। জাপানী শিক্ষক শ্রীযুক্ত তাকাগাকির দুই জন জাপানী বন্ধুও কুস্তিতে যোগদান করেন। তাঁহারাও এ বিষয়ে ওস্তাদ।

যথানিয়মে জুজুৎসু অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ও শরীর বলিষ্ঠ হয়, এবং আততায়ীর কোন কোন প্রকার আক্রমণ হইতে জুজুৎসু দ্বারা বেশ আত্মরক্ষা করা যায়। এই জন্য যাহারা জুজুৎসু জানে তাহাদের সাহস ও মনের স্থৈর্য্য বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশের পালোয়ান ও কুস্তিগীররা যে-প্রকার মল্লযুদ্ধ করে এবং যত প্রকার প্যাঁচ জানে ও ব্যবহার করে, তাহার সহিত জুজুৎসুর নানা প্যাঁচের কিরূপ সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে তাহা কোন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চর্চ্চা করিলে বলিতে

পারিবেন, এবং জুজুৎসু হইতে আমাদের দেশী রীতির কিছু উন্নতি হইতে পারে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিবেন।

জুজুৎসুর একটি কৌশল

শ্রীযুক্ত এস্ তাকাগাকি

শ্রীযুক্ত তাকাগাকি শিষ্যগণের জুজুৎসু খেলা দেখিতেছেন

পাটের মূল্য হ্রাস

পাট বাংলা দেশের একটি প্রধান ফসল। যখন চাষীরা ইহার ভাল দাম পায়, তখনও পাটের ব্যবসায়ে এবং পাট হইতে মিলে নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া যে লাভ হয়, তাহার তুলনায় চাষীরা সামান্য টাকাই পাইয়া থাকে। চাষীদের অজ্ঞতা এবং জোট বাঁধিয়া উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত দরে ইহা বিক্রয় করিবার ক্ষমতার অভাব ইহার কারণ। বর্ত্তমান বৎসরের মত যখন পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন ত চাষীদের মজুরীও পোষায় না।

এ বৎসর পাটের দর খুব কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের খুব অন্নকষ্ট হইয়াছে। কোন কোন স্থান হইতে অনশনে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কেবল চাষীরাই যে বিপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। তাহারা খাজানা দিতে না পারায় অনেক জমীদারের বিপদ হইয়াছে। কাহারও কাহারও জমীদারী নীলামে চড়িয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। যত পাট দরকার তাহা অপেক্ষা উহা বেশী উৎপন্ন হইলে দর কমিবে, ইহা বুঝা সহজ। কোন্ বৎসর কত পাট দরকার হইবে যদি আগে হইতে তাহা অনুমান করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ করা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হেতু দর কমিবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহা বলাও সহজ। সব জেলায় চাষীদের কাছে এই কথাটা পৌছাইয়া দেওয়া ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য হইলেও দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু পাটের চাষ কমাইতে বলিলেও কোন্ জেলায় কোন্ গ্রামে কোন্ চাষী কত পরিমাণে কমাইবে তাহা স্থির করা এবং স্থির হইলে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সব চাষীকে কাজ করিতে বাধ্য করা যায় কিনা, তাহা বিবেচ্য। পাট চাষের পক্ষে কাহারও জমী ভাল, কাহারও মাঝারি গোছের, কাহারও মন্দ। কাহারও জমীতে কেবল পাটই হয় বলিয়া তাহারই উপর তাহার নির্ভর। কাহারও জমীতে বা অন্য ফসলও হয়। কাহারও নগদ টাকার বেশী দরকার, কাহারও হয়ত খাদ্য শস্যের প্রয়োজন বেশী। এবম্বিধ ও অন্য নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চাষীর অবস্থার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং একটা সাধারণ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সুপ্রযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পরামর্শ যিনিই দেন এবং সাধারণ বিধান যিনিই প্রদান করুন, তাহার প্রয়োজন থাকিলেও কৃষকেরা নিজে শিক্ষিত ও চিন্তাক্ষম না হইলে যথাযোগ্য প্রতিবিধান হইবে না। আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, সুতরাং অধিক লিখিব না।

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেনের লেখা যে-প্রবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশিত হইল, তৎপ্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাট আমরা যত বেশী প্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারি, ততই উহার আদর ও মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা। অতএব ঐ প্রবন্ধে যত রকম জিনিসের উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন আরও কত রকম জিনিষ কেবল পাট হইতে বা পাট মিশাল দিয়া আমরা প্রস্তুত করিতে পারি, কেহ কেহ তাহার আলোচনা করিলে ভাল হয়। বিদেশীদের মিলের সাহায্য না লইয়া কি করিতে পারা যায়, তাহাই বিশেষ করিয়া বিবেচ্য। এরূপ আলোচনা আমরা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহারা দয়া করিয়া সংক্ষেপে কেবল কাজের কথাই লিখিবেন।

—

গল্পলেখকদিগের প্রতি

যাঁহারা প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য গল্প লিখিয়া পাঠান, তাঁহাদিগকে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক গল্পে চারি হাজারের বেশী শব্দ না থাকা আবশ্যক। তাহা অপেক্ষা কম হইলে ক্ষতি নাই, বরং ভাল। যাঁহারা গল্প পাঠাইবেন, তাঁহারা উহাতে কত শব্দ আছে লিখিয়া দিলে বাধিত হইব। এক একটি গল্পের জন্য প্রবাসীর আট পৃষ্ঠা অপেক্ষা বেশী স্থান দিলে অসুবিধা হয়। ইহার আট পৃষ্ঠায় চারি হাজার অপেক্ষা কিছু কম শব্দ ধরে। যাঁহারা চারি হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দের গল্প পাঠাইবেন, তাঁহাদের গল্প অপঠিত অবস্থায় ফেরত গেলে তাঁহারা বিস্মিত হইবেন না।

—

লেখকগণের প্রতি

অন্যান্য পুরাতন মাসিক পত্রিকার মত প্রবাসীর কার্য্যালয়ে অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, প্রতিবাদ প্রভৃতি আসিয়া থাকে। যাঁহারা এই সকল লেখা পাঠান, তাঁহারা **তাহার সঙ্গেই** দয়া করিয়া লিখিয়া দিবেন, যে, রচনাটি মনোনীত বা প্রকাশিত না হইলে তাহা ফেরত চান কিনা; যদি ফেরত চান তাহা হইলে রচনাটির সঙ্গেই যথেষ্ট ডাকটিকিট দিবেন, নতুবা অমনোনীত হইলে উহা নষ্ট হইবে। কোন কোন লেখক লেখেন, লেখাটি অমনোনীত হইবার সংবাদ তাঁহাকে জানাইলে তিনি উহা ফেরত পাঠাইবার জন্য ডাকমাশুল পাঠাইবেন। এইরূপ সংবাদ দিবার ব্যবস্থা আমাদের নাই।

—

সত্যাগ্রহে নারীদের স্থান

বোম্বাই-লাটের একটি অভিযোগ এই, যে, সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার নানা কাজে মহিলাদিগকে পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রথম প্রথম নারীদিগকে এই বিপৎ-সঙ্কুল অভিযানে যোগ দিতে দেন নাই। তাঁহারা নিজেই স্বাধীনতার আহ্বানে, দেশভক্তির প্রেরণায়, স্বেচ্ছায় এই প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য অনেক লোকের ধারণা আছে, যে, নারীর সম্মান করিতে তাহারাই জানে। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভারতবর্ষে যে সমাজে নারীর সম্মানিত স্থান আছে, তাহা আমরা ত জানিই, এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে অভিজ্ঞ ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় স্যার (তখন কর্ণেল) টমাস মনরো বলিয়াছিলেন :—

"......if a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, a capacity to produce whatever can contribute to convenience or luxury; schools established in every village for teaching reading writing and arithmetic; the general practice of hospitality and charity among each other; and above all a treatment of the female sex, full of confidence, respect and delicacy, are among the signs which denote a civilized people, then the Hindus are not inferior to the nations of Europe;..."

অন্যান্য দেশের মত এদেশেও নারীদের অসম্মান কখন কখন হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন কাজে পুরুষ ও নারী উভয়েই যোগ দেন, তখন নারীদিগকে সম্মানিত স্থান দেওয়াই সুনিয়ম। তদ্ভিন্ন যদি তাঁহাদিগকে, সামনে না রাখিয়া অন্যত্র রাখা হয়, তাহা হইলে কি ইংরেজ সরকার তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে বিরত থাকেন? পিকেটিং প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধী বিশেষ করিয়া নারীদের জন্যই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এই জন্য, যে, তাহা হইলে পিকেটাররা উপদ্রব ভয়প্রদর্শন মারপিট করিতেছে এই মিথ্যা অভিযোগের সু(?)যোগ পুলিস কম পাইবে?

ইংরেজরা কি বলিবে না বলিবে, অবশ্য আমরা তাহা মনে রাখিয়াই কাজ করি না। কিন্তু মহিলারা যদি সত্যাগ্রহে যোগ না দিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে সেই কারণেও স্বরাজের অযোগ্য বলা হইত—বলা হইত, ভারতবর্ষ এরূপ অশিক্ষিতের ও অসভ্যের দেশ যে, মুষ্টিমেয় বাবুরা লম্ফঝম্ফ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গৃহের মধ্যে অন্ধকার। আমরা সকলেই খুব উন্নত, বলিতেছি না; কিন্তু স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় ভারতীয় মহিলারা যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেক ভারতীয় পুরুষকেও বিস্মিত করিয়াছে। এখন কাহারও কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, যে, সুযোগ পাইলে ভারতীয় মহিলারা জাতীয় ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যক্ষেত্রে সেইরূপ উচ্চ স্থান লাভ করিবেন পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে যেরূপ উচ্চ স্থান তাঁহারা বহুযুগ ধরিয়া অধিকার করিয়া আছেন।

—

পুলিসের নামে দোষারোপ

গবর্মেণ্ট পুলিসের চোখ দিয়া দেখেন। বর্ত্তমানে পুলিস-রাজত্ব চলিতেছে। কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন জজ তাঁহার একটি রায়ে এমন কথাও বলিয়াছেন, যে, পুলিসের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ যাহাতে উৎপন্ন হয় এরূপ কিছু বলিলে গবর্মেণ্টের প্রতিই অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ উৎপন্ন করা হয়। সুতরাং পুলিসের প্রতি দোষারোপ করা বিপৎসঙ্কুল ব্যাপার। তাহা সত্ত্বেও

সব প্রদেশের কাগজে প্রত্যহ পুলিসের প্রতি দোষারোপ-যুক্ত সংবাদ বাহির হইতেছে। অবশ্য প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারী দোষী ইহা কেহ বলিতেছে না। কিন্তু কাগজে যে-সব বৃত্তান্ত বাহির হয়, তাহাতে কোন্ তারিখে কোন্ স্থানে পুলিস কি করিয়াছে, তাহা লিখিত থাকে। সুতারাং কোন্ কোন্ কনষ্টেবল ও উচ্চতর কর্ম্মচারীর উপর দোষারোপ করা হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা গবন্মেণ্টের পক্ষে সুসাধ্য। কিন্তু গবন্মেণ্ট এই সব দোষারোপ সম্বন্ধে এবং বেসরকারী তদন্তকমিটিসকলের রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন কিনা, জানা যায় না। তবে, ইহা দেখা যাইতেছে, যে, যেখানে যেখানে অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিভাগীয় অনুসন্ধানের ফলে তথাকার কোন হাকিম বা পুলিস কর্ম্মচারীর কোন প্রকার শাস্তি হইয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হয় নাই। অতএব, ইহাই মনে করিতে হইবে, যে, তদন্তকমিটিসমূহের সভ্যেরা, তাঁহাদের কাছে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা, সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা এবং যাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা—সকলেই মিথ্যাবাদী কিংবা ভ্রান্ত।

কিন্তু ফোটোগ্রাফগুলাও কি মিথ্যা কথা বলে? ফোটোগ্রাফেও কিছু প্রতারণা চলে জানি, কিন্তু তাহা ধরা দুঃসাধ্য নহে! ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কাগজে জখম লোকদের ছবি বাহির হইয়া থাকে, বঙ্গেও হয়। তাহা না হয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও আইনসঙ্গত ন্যূনতম বলপ্রয়োগের ফল। কিন্তু বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত ঘরবাড়ীর ছবি যে-সব বাহির হয়—যে রকম ছবি কয়েক দিন পূর্ব্বেও কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—সেই সকল ছবিতে যে বলপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইরূপ বলপ্রয়োগের ন্যায্যতা, আইনানুযায়িত্ব এবং প্রয়োজন কি? এই ফোটোগ্রাফগুলি অলীক কাল্পনিক ঘরবাড়ীর ফোটোগ্রাফ বলিয়া প্রমাণ না করিতে পারিলে আমাদের জিজ্ঞাসা মিটিবে না।

পুলিসকে দোষ দিয়া আমাদের সুখ হয় না, গৌরব বাড়ে না। পুলিসের অধিকাংশ লোক আমাদের স্বদেশবাসী জা'ত ভাই। তাহাদের কাহারও সত্য যাহা কলঙ্ক, তাহা আমাদেরই কলঙ্ক। উদরান্নের জন্য অপকর্ম্ম করিবার বিস্তর লোক এদেশে বহুকাল হইতে জুটিয়া আসিতেছে বলিয়াই ত আমাদের জাতির এত দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা।

পুলিসের অনেক লোক জানেন তাঁহারা আমাদেরই ভাই। বোম্বাই ক্রনিক্লে একজন পুলিস্ ইন্স্পেক্টরের সহিত বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্তা মহিলা সত্যাগ্রহী কুমারী মিঠু বেন পেটিটের যে কথোপকথন মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ইন্স্পেক্টরটির নাম ইস্মাইল দেশাই। তিনি সরভোগ নামক স্থানে গিয়া শ্রীমতী মিঠু বেনকে ডাকিয়া পাঠান। তাহার পর উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়।

মিঃ ইসমাইল—আপনারা কেন পিকেটিং কচ্চেন।

মিঠুবেন—দেশের জন্য। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। বেশী কথা বলার সময় আমাদের নাই। যদি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা থাকে তবে বের করুন, আমরা প্রস্তুত।

মিঃ ইসমাইল—আপনারা মেয়েমানুষ, তাই আমার কষ্ট হয়।

মিঠুবেন—আমরা এ সময়ে মেয়েমানুষ নই। আমরা পুরুষরূপে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব, সুতরাং আপনার যা ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

মিঃ ইসমাইল—আমার সঙ্গেই যখন আপনারা এভাবে কথা বলছেন, তখন পুলিসের অন্য লোকেরা আপনাদের কথা সইবে কেমন ক'রে?

মিঠুবেন—তাদের সহিত কোন কথা বলার প্রয়োজন আমাদের নেই।

মিঃ ইসমাইল—আমি আপনাদের ভ্রাতাস্বরূপ, আপনাদিগকে পিকেটিং হ'তে ক্ষান্ত থাকতে অনুরোধ করছি।

মিঠুবেন। আমি আপনার ভগ্নীরূপে আপনাকে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ভগ্নীর পাশে এসে দাঁড়াতে অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ ক'রে আমার ভ্রাতৃবধূকেও আমাদের সঙ্গে পিকেটিং করতে পাঠাবেন।

মিঃ ইসমাইল—আপনাদের মত ভিক্ষুকে আমার বেতন যোগাতে পারবে না।

মিঠুবেন—দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন বেতনের প্রয়োজন নাই।

মিঃ ইসমাইল—আপনাদিগকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হ'লে ক্ষমা করবেন।

ইস্মাইল দেশাইয়ের মত লোকেরা বেতন ভিন্ন আর কিছু বুঝে না। বেতনভোগী লোকদের দ্বারা যদি সত্যাগ্রহের পথে স্বরাজ অর্জ্জন সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বেতনের অভাবও হইত না। কারণ, বলা বাহুল্য, কুমারী মিঠু বেন পেটিট স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত

গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ধনী পারসী পরিবারের কন্যা। ইস্মাইল দেশাইয়ের মত অনেক লোককে ভৃত্য রাখিবার সঙ্গতি তাঁহাদের আছে।

—

সীণ্ডিকেট ও ছাত্রপ্রহারের প্রতিকার

আশুতোষ ইমারতে অনধিকার ও অকারণ প্রবেশ করিয়া কলিকাতা পুলিসের কতকগুলা লোক নিরপরাধ ছাত্রদিগকে যে প্রহার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেট তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা কি করিলেন? বঙ্গের গবর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার। তাহার মানইজ্জত রক্ষা এবং ছাত্রদিগকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সহানুভূতির সহিত এই বিষয়টি বিবেচনা করিবেন বলিয়াছিলেন। তিনিই বা কি করিলেন? আমাদের বিবেচনায়, সীণ্ডিকেট যখনই বুঝিলেন, যে, নির্দ্দোষ ছাত্রেরা প্রহৃত হইয়াছে, তখনই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিকার না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস বন্ধ থাকিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের করা উচিত ছিল, এবং প্রতিকার এখনও না হওয়ায় সব ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সমুদয় ছাত্রদেরও দলবদ্ধ হইয়া ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করা উচিত ছিল। মান ও প্রাণ হাতে লইয়া ক্লাসে না গেলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যেমন রাস্তার দিনমজুরেরা বাঁচিয়া আছে।

—

বার-বার বেশী সুদে ঋণগ্রহণ

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বার-বার বেশী সুদে ইংলণ্ডে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ঋণগ্রহণের একটা কারণ, রাজস্ব যত আদায় হইতেছে, তাহাতে সরকারের চলতি খরচও চলিতেছে না; তাহার উপর পুরাতন কোন কোন ঋণ শোধের সময় আসায় নূতন ঋণ করিয়া তাহা শোধ করিতে হইতেছে। ইংলণ্ডে ঋণগ্রহণের কারণ একাধিক। একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, গবর্ন্মেণ্ট এদেশে যথেষ্ট টাকা ধার পাইবেন কিনা সে বিষয়ে রাজপুরুষদের সন্দেহ আছে। তাঁহারা সভ্য জগৎকে জানাইতেছেন বটে, যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক গবর্ন্মেণ্ট-ভক্ত আছে, বিশেষতঃ সম্পত্তিশালী লোকেরা। কিন্তু সম্পত্তিশালী লোকদের যদি গবর্ন্মেণ্টের উপর বিশ্বাস ও তাহার প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা গবর্ন্মেণ্টকে টাকা ধার দিবে না কেন? ভারতের অধিকাংশ লোক খুব গরীব হইলেও, ৪০।৫০ কোটি টাকা ধার দিবার মত ধনী সমষ্টি এদেশে আছে। তাহারা যদি যথেষ্ট ধার না দেয়, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্টের বাজার-সম্ভ্রম ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, হয়ত এই ভয়ে এদেশে ধার লইবার চেষ্টা হয় নাই। বিলাতে টাকা ধার করিবার আর এক অনুমিত কারণ, ইংরেজ-সরকারের স্বদেশবাসীরা যাহাতে সুদের টাকাটা পায়। সেখানে ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী ধনী লোক ও ধন আছে, সুতরাং তথা হইতে ধার পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বেশী সুদ দিবার কারণ, যাহাতে নিশ্চয়ই ধার পাওয়া যায়। কেননা, ধার না পাওয়া গেলে অসুবিধা ত ছিলই, অধিকন্তু গবর্ন্মেণ্টের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং বাজার-সম্ভ্রমও নষ্ট হইত। সুদ যে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, ঋণের কাগজের মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী হইয়া গিয়াছে। ঋণ গ্রহণ করা উচিত কিংবা অনুচিত, আবশ্যক কিংবা অনাবশ্যক, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য ঋণগ্রহণের প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে স্থাপিত করা হয় নাই। অথচ এই সব ঋণের জন্য ভারতীয়দিগকেই দায়ী করা হইবে। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমাদের ইচ্ছা ও সুবিধা মত তোমরা নিজের দেশে ধার করিবে, এবং তাহা সুদে আসলে শোধ করিতে বাধ্য থাকিব আমরা—ইহা অতি সুবন্দোবস্ত! কংগ্রেস যে বলিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্টের কোন্ ঋণ ন্যায্য ও আমাদের পরিশোধ্য, তাহা কোনও নিরপেক্ষ স্বাধীন পক্ষ দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, তাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা!

—

পিকেটিঙের জন্য বেত্রাঘাত

সত্যাগ্রহীদের সরকারী আদালতে বিচারের সময় তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন না করায় এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করায় কোন কোন স্থলে অবিচারের যে প্রতিকার হইতে পারিত তাহা হয় না। ইহা আমরা সাধারণভাবে বলিতেছি। তাঁহারা যে ব্রিটিশ আইন আদালত মানেন না, সমুদয় সরকারী কাজকর্ম্মকেই ইংরেজদের অনধিকার চর্চ্চা মনে করেন, তাহা তাঁহারা ভাল করেন বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস। সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

সত্যাগ্রহঘটিত আইনভঙ্গের জন্য আগে আগে বঙ্গের বাহিরে কয়েক জায়গায় অভিযুক্ত কয়েক ব্যক্তির বেত্রাঘাত দণ্ড হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় একজন বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট পিকেটিঙের জন্য দুজন বালককে বেত্রাঘাত দণ্ড দেন, বেত মারাও হইয়া যায়। তাহার পর একজন উকীল প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেন, যে, পিকেটিঙের জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা কোন আইনে বা অর্ডিন্যান্সে নাই। প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইয়া পরে বলেন, যে, দণ্ডদাতা ম্যাজিষ্ট্রেট ভুল করিয়াছেন। চমৎকার ভুল! ছেলে দুটি যে বেত খাইল, তাহার কি প্রতিকার হইবে? দণ্ডদাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের কিছু শাস্তি, অন্ততঃ পদাবনতি হওয়া উচিত নয় কি? যে-সব অপরাধ দুর্নীতিমূলক, তাহার জন্যই পাকা বদমায়েসদের বেত মারিবার ব্যবস্থা আছে, এবং তাহাও সভ্যদেশসমূহে বর্জ্জিত হইতেছে। অতএব পিকেটিঙের জন্য বেতমারা যে কত বড় অন্যায় কাজ তাহা সহজবোধ্য।

—

বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারের ধমকানি

গবর্ণ্মেণ্ট কংগ্রেসকমিটি প্রভৃতি যে-সকল সভা সমিতিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাদের কাজের সংবাদ, তাহাদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব, আগে হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রভৃতি মুদ্রিত করায় বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার বোম্বাইয়ের তিন খানি দেশী দৈনিক ইংরেজী কাগজকে ধমক দিয়াছেন, যে, এরূপ কাজ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের মধ্যে পড়ে। বোম্বাইয়ের সাংবাদিকগণ পুলিস কমিশনারের এই ধমকের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কোন্ কাজ যে কি আইন বা অর্ডিন্যান্স অনুসারে দণ্ডনীয়, তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ, সরকারের অনভিপ্রেত যে-কোন কাজের জন্য দণ্ড দিবার মত ব্যবস্থা আইনে বরাবর আছে। তাহা থাকা সত্ত্বেও, অধিকন্তু, অতি সত্বর নূতন নূতন অর্ডিন্যান্স জারি হইতে পারে।

বোম্বাইয়ের পুলিস-সর্দ্দার যে-সব সংবাদ ছাপা আইনবিরুদ্ধ বলিতেছেন, তাহা প্রেস অর্ডিন্যান্সেও নিষিদ্ধ ছিল না, এবং প্রেস অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকার সময়েও অনেক কাগজ সেরূপ সংবাদ ছাপিয়া দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই পুলিস-সর্দ্দারের মত যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে আগে হইতেই ফৌজদারী কার্য্যবিধি মজুত থাকা সত্ত্বেও প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করিবার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছিল?

কোন প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির দ্বারা কোন বেআইনী সভাসমিতির কাজের সাহায্য হইলে নবম অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুলিস তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে, এবং যে গৃহে ঐ সাহায্য হয় তাহার বর্ত্তমান অধিকারীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহা দখল করিতে পারে। বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারেন, যে, যেহেতু বম্বে ক্রনিক্ল, ফ্রীপ্রেস জর্ন্যাল এবং ইণ্ডিয়ান ডেলীমেলের প্রেস ইত্যাদি এইরূপ সাহায্য করিতেছে, অতএব তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত হইল, এবং ঐ কাগজ তিনখানির প্রেসের বাড়ী ও আফিস-বাড়ী পুলিসের আয়ত্ত হইল।

—

গোল টেবিল বৈঠক ও দমনের প্রকোপ

অনেক বার বলিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে গবর্ণ্মেণ্ট বলেন, আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা দুর্ব্বল হইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অর্ডিন্যান্সও জারি

হইতেছে—ইহার রহস্য বুঝা ভার। যাহা মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে মারিবার জন্য সম্প্রতি সকল প্রদেশেই দমননীতি খুব জোরে চালান হইতেছে। ইহারও রহস্য বুঝা ভার।

কোন দুটা ঘটনা বা ব্যাপার সমসাময়িক হইলে, কিংবা কালে একটা অন্যটার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে, উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্ক থাকিবেই, এরূপ বলা যায় না। সেই জন্য, ১২ই নবেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন ও তাহার আগের কিছু দিন হইতে দমন কার্য্য প্রবল ভাবে চালান, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে বলা যায় না। কিন্তু সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। ইংরেজ সাংবাদিক ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড সাহেব ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার মতে কংগ্রেস গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ না দিয়া অবিজ্ঞের কাজ করিয়াছেন। এহেন ব্যক্তিও বলিতেছেন, গোল-টেবিল বৈঠককে সফল করিতে হইলে ভারতবর্ষে রাজ-নৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দিয়া দেশের মধ্যে একটা শান্ত ভাব আনা উচিত। তিনি ইংরেজ এবং রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া সাংবাদিক মহলে ইংরেজীভাষী জগতে তাঁহার নামও আছে। অতএব গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা করা যে দরকার, তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন, রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে মুক্তি দিয়া দেশকে শান্ত করিতে। কিন্তু ঠাণ্ডা করিবার আর একটা উপায় আছে। যথা, দমননীতি খুব জোরে চালাইয়া দেশে এমন অবস্থা উৎপন্ন করা যাহাতে কেহ টুঁ শব্দটি করিতে না পারে। এই প্রকারে দেশকে শান্ত করার অন্যপ্রকার সার্থকতাও আছে।

যখন এক দল লোক চূড়ান্ত স্বাধীনতা চায়, এবং তাহাদের কাজের দ্বারা দেখায় যে তাহারা পূর্ণস্বরাজের জন্য সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রাণপণ করিয়াছে, তখন অন্য কতকগুলি লোককে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া জগতের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে স্বরাজের মত কিছু একটা দিবার অঙ্গীকার করিয়া হাত করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যদি "মরিয়া" দলের লোকদিগকে "ঠাণ্ডা" করিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাদের সাড়াশব্দও কেহ আর না পায়, তাহা হইলে সহজে-ভুলায়িতব্য * মডারেটদিগকে বিশেষ কিছু দিবার অঙ্গীকার করা দরকার হয় না। চরমপন্থীদের সাড়া-শব্দ কিছু আর না পাওয়া গেলে, মডারেটদেরও সুর বেশী চড়াইবার সুযোগ থাকে না—তাঁহারা পরোক্ষ-ভাবে এ ভয় দেখাইতে পারেন না, যে, তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিলে চরমপন্থীদের দল পুরু হইবে এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু চরমপন্থীরা কার্য্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকিলে, মডারেটরা জানেন তাঁহাদের দাবী বেশ উঁচু না করিলে দেশে ফিরিয়া তাঁহারা ভাত কল্‌কেও পাইবেন না।

অতএব, এই সব কারণে চরমপন্থী সত্যাগ্রহীদিগকে "ঠাণ্ডা" করিয়া গোলটেবিল-বেষ্টনকারী নরম ব্যক্তিদিগকে নরমতর বা নরমতম করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকিতে পারে।

ইতি (গণ্ড)গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে দমন-নীতির প্রকোপ-বৃদ্ধির আনুমানিক নিদান।

—

কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির বাঙালী সভ্য

কাগজে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হওয়ায় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে সভ্যের যে পদটি খালি হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। আমাদের কেবল ইহাই মনে হয়, যে, কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির কাজ করিতে হইলে প্রত্যেক সভ্যের ইংরেজীতে কিংবা অন্ততঃ হিন্দুস্থানীতে করণীয় সব কাজের ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ক্ষমতা থাকা চাই—সভ্যের পদ কেবল সম্মানের পদ নহে! সংবাদটি পড়িলে এই প্রশ্নও মনে আসিবার কথা, যে, বঙ্গের অন্যতম প্রধান কংগ্রেস-নায়ক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

* বৈয়াকরণেরা মাফ করিবেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন কমিটির সভ্য করা হইল না। সভ্য নিয়োগ করিবার ক্ষমতা কাহার হাতে, জানি না। তিনি বা তাঁহারা যদি সুভাষবাবুকে ডিঙাইয়া অন্য কাহাকেও মনোনয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা বিবেচ্য। আর যদি সুভাষবাবুকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গররাজী হইয়া থাকেন, তাহারও কারণ জানিতে লোকের কৌতূহল হইবে। অবিলম্বে নিশ্চিত কারাদণ্ডকে তিনি ভয় করেন, ইহা বলা চলিবে না। কিন্তু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে, তিনি দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত ভাবে কলিকাতার মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকা এবং যথাসম্ভব কংগ্রেসের কাজ করা বেশী পছন্দ করেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার

শুনিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রারের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসায় শীঘ্রই একজন নূতন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কিছু সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে ঠিক তাহার উল্টা কাজ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তাহা সত্ত্বেও সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন জন্য আমরা এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু বলিব। নূতন রেজিষ্ট্রারের যে-যে রকম যোগ্যতা ও গুণবত্তা থাকা দরকার, কোন-না-কোন বিদ্যায়তনের আফিসের কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অবশ্য তাহার অন্তর্গত। তাহার উপর, সৎ চরিত্র, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যে-যে গুণে অধ্যাপকেরা ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, রেজিষ্ট্রারেরও তাহা থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে-সব সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মনে রাখিয়া ইহা লিখিতেছি।

—

বিনা বিচারে বন্দীদের দশা

বাংলা দেশের যুবকদের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। সাধারণ আদালতের বিচারে অনেক সচ্চরিত্র যুবক শাস্তি পাইয়া থাকে। তাহার উপর আছে স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যালের (বিশেষ আদালতের) বিচার। তাহাতে নির্দ্দোষের শাস্তি হইবার সম্ভাবনা কিছু বেশী। সর্ব্বোপরি সেই বিধি যাহার বলে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে সরকার বাহাদুর ছাপাইয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ শ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারী ও হাকিম সন্দেহ হইলেই মানুষকে বিনা বিচারে আটক করিতে পারিবেন।

যাহাদিগকে সাধারণতঃ এই ভাবে বন্দী করা হয়, তাহারা দাগী বদমায়েস ও নিম্ন শ্রেণীর লোক নহে, শিক্ষিত ও ভদ্র শ্রেণীর লোক, এবং সাধারণতঃ সচ্চরিত্র বলিয়াই পরিচিত। সাধারণ বা বিশেষ, কোন প্রকার আদালতের বিচারেই তাহারা অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

অতএব, এই আশা স্বভাবতই করা হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট তাহাদিগকে আটক রাখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন এবং তাহারা যাহাতে সুস্থদেহে ও সুস্থমনে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা গবর্ন্মেণ্ট তাহাদিগকে আটক রাখিবার জন্য বক্সা দুয়ারের দুর্গ মনোনীত করিয়াছেন। ইহা ভুটান ও ইংরেজাধিকৃত বাংলা দেশের সীমান্তে অবস্থিত। স্থানটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। এরূপ স্থানে বিনা বিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা ঠিক্ করিয়া কেবল ভগবান এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জানেন।

বন্দীদিগকে কি ভাবে থাকিতে হইবে, তাহার কতকগুলি নিয়মও সরকারী কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছে। তাহার কোন কোনটি অনাবশ্যক—যথা বন্দীদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে; কারণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার উপায় থাকিলে বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলেরা স্বভাবতঃ পরিষ্কার থাকিতেই চায়। একটি নিয়মে আছে, যে, কেহ এমন কিছু করিতে পারিবে না যাহা হইতে দুর্ব্বলতা আদি জন্মে। ইহার

উদ্দেশ্য বোধ হয় প্রায়োপবেশন বন্ধ করা। কিন্তু বন্দীরা আপনাদিগকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত মনে করিলে যদি উপবাস দিয়া প্রতিবাদ করিতে এবং প্রতিকার না হইলে মরিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা দুঃসাধ্য। আর, যাহাদিগকে কখন্ ছাড়িয়া দিবে তাহার স্থিরতা নাই, তাহাদের মরণেও বাদ সাধিবার এত বেশী প্রয়োজন আছে কি? সরকারী কি রকম কোন্ লোক বন্দীদের নিকটস্থ হইলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম আদি করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম আছে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই নাই। বন্দীরা যে কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে কোন চিঠি লিখিতে বা পাইতে পারিবে না, তাহাও নিয়মের মধ্যে আছে।

বন্দীরা পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের পলায়ন বন্ধ করিবার নিমিত্ত তলোয়ার বন্দুক আদি তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এই নিয়মটিই সকলের চেয়ে দরকারী। একজন সাধারণ কনেষ্টবলেরও যদি এরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, যে,পলাতক কোন বন্দীর বিরুদ্ধে তলোয়ার না চালাইয়া বা তাহাকে গুলি না করিয়া তাহার পলায়ন বন্ধ করা যাইবে না, তাহা হইলে তলোয়ার ও বন্দুক ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে, কোন কোন স্থলে কোন কোন বিনা-বিচারে-বন্দী ব্যক্তির কার্য্যতঃ প্রাণদণ্ড হওয়া না-হওয়া সাধারণ একজন পাহারাওয়ালার মনের ধারণার উপর নির্ভর করিতে পারে। "প্রাণদণ্ড" বলিতেছি এইজন্য, যে, নিয়মাবলীর মধ্যে এই অত্যাবশ্যক কথাটি নাই, যে, রক্ষীরা পলায়ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত কেবল শরীরের নিম্নদেশ লক্ষ্য করিয়াই গুলি ছুঁড়িবেন বা তলোয়ার চালাইবেন, বুক বা মাথায় আঘাত করিবেন না। হিংস্র সিংহ বাঘ ভালুক খাঁচা হইতে পলাইলে মানব-সমাজকে নিরাপদ রাখিবার জন্য ঐসব পলায়িত জন্তুকে মারিয়া ফেলিতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। এই বন্দীরা মানুষ হইলেও বাঘ ভালুক সিংহের মত। অথচ বন্দী হইবার আগে তাহারা সব তোমার আমারই মত মানুষ-ভাই ছিল।

নামজাদা ইংরেজ লেখক রেভারেণ্ড এডোয়ার্ড টমসন (আজকাল তিনি রেভারেণ্ড অর্থাৎ "ভক্তিভাজন" শব্দটি তাঁহার পুস্তকাদির আখ্যাপত্রে নিজের নামের আগে ব্যবহার করেন না—লোকে তাঁহাকে আর ভক্তি করে না এই সন্দেহে কি?) তাঁহার নব প্রকাশিত "ভারতবর্ষের পুনর্গঠন" (Reconstruction of India) শীর্ষক বহির এক জায়গায়, মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরুইনকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভারতবর্ষের প্রতি সাধু ইচ্ছার প্রমাণস্বরূপ যে এগারটি সংস্কারের সূত্রপাত করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৭৬), মিঃ গান্ধী এরূপ কথা বলিতেছেন যেন তিনি আকবর বা আওরংজেবের সহিত ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আকবর ও আওরংজেব যে-যুগে জীবিত ছিলেন, সে-যুগে শাসনকর্ত্তাদের স্বৈরিতা সম্বন্ধে লোকমত যেরূপ ছিল, তাহার তুলনায় ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগের লোকমত বিবেচনা করিলে লর্ড আরুইন, এমন কি প্রাদেশিক গবর্ণরেরাও, আকবর বা আওরংজেবের চেয়ে কম অনিয়ন্ত্রিতশাসনশক্তিবিশিষ্ট নহেন। তাঁহারা হাতীর পায়ের তলায় মানুষকে ফেলিয়া তাহার প্রাণবধ করিবার কিংবা তাহাকে ফুটন্ত তেলে ভাজিবার কিংবা জীয়ন্তে দেওয়ালে গাঁথিয়া ফেলিবার হুকুম দিতে পারেন না বটে। কিন্তু বড়লাট অর্ডিন্যান্স দ্বারা মানুষকে কোন বা সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, কোন কোন নির্দ্দোষ এমন কি সৎ কাজকেও অপরাধে পরিণত করিতে পারেন, এবং সাধারণ বিচারপ্রণালী যে-কোন সময়ে থামাইয়া (যেমন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়) প্রাণদণ্ড হইতে পারে এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীর বিচার সুবিচারের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক বাঁধাবাঁধি-নিয়ম-মুক্ত স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যাল দ্বারা করাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন, বঙ্গে বিনা-বিচারে-বন্দীদের জন্য যেরূপ সব নিয়ম হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে প্রাদেশিক গবর্ণরেরাও বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগের পক্ষে খুবই স্বৈরশাসক।

—

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর মুখব্যাদান

লণ্ডনের মেয়র তথাকার গিল্ডহলে বার্ষিক একটি ভোজ দিয়া থাকেন। এবারকার ঐ ভোজে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে যে-যে বাক্যে ভারতবর্ষের উল্লেখ ছিল, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

The task of broadening liberty which had engaged the attention of the Imperial Conference would be undertaken at the forthcoming Indian Round Table Conference.

One conference ends and another begins. Enormous burden lies on the shoulders of His Majesty's ministers and their tasks call for keen spiritual understanding, not merely the understanding of the mind, not merely the understanding of the logic of affairs, but understanding of the spirit of the peoples of the Dominions,--the bone of our bone, the flesh of our flesh—and in addition to it the understanding of that wonderful people, their old philosophy and the gorgeous and ancient historical colouring and ancestry,—the Indian colleagues who have come to confer with us. Unless we have that spiritual understanding, we may play and may build but we shall have no contentment in our quarters.

While we are regretfully bidding farewell to Dominion Premiers we are welcoming the Aga Khan and his colleagues. We shall be in conference with the representatives of the people with whom we have been thrown in the closest contact for centuries, whose history we have moulded, the ways of whose destiny we have changed and whose minds we have influenced—with their representatives and their princes. We shall be engaged in the same task of broadening liberty so that we may live with them under the same Crown, they enjoying the freedom in self-government which is essential for national self-respect and contentment. I must say in one sentence what must make my position clear. It is very regrettable that attempt should be made not by conference and deliberation but by disintegration in order to gain this end. These things rouse enmity, cause loss and suffering and put obstacles in the way of those who claim their rights and those who wish with all their heart to grant them. Those who have come here to deliberate and negotiate deserve the fullest meed of gratitude both of India and of Great Britain.—*Reuter*.

বহ্বাড়ম্বরবিশিষ্ট কথার কুহেলিকায় প্রধান মন্ত্রী তাঁহার আসল সঙ্কল্পটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। গোপনের এই চেষ্টা হইতেই বুঝা যাইতেছে, তিনি ভারতীয় মডারেটদের দাবীও গ্রাহ্য করিতে চান না। তিনি ভারতবর্ষের দর্শন, তাহার প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে যুগান্তরকারী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে নির্ব্বাক! ভারতের ইতিহাস ইংরেজ জাতি গড়িয়াছে, ভারতীয়দের মনের উপর তাহারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং তাহাদের ভাগ্যের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয়েরা যে অনেক দিন হইতে নিজেদের ইতিহাস গড়িতেছে, একজন ভারতীয় যে ভারতীয়দের মনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং তিনি ও তাঁহার সহ-কর্ম্মীরা যে ভারতের ভাগ্যচক্র নিজেদের বাঞ্ছিত পথে চালাইতেছেন, এসব কথা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাক।

তিনি ভারতের স্বাধীনতা বিস্তৃততর করিতে চান বুঝিলাম, কিন্তু যথেষ্ট বিস্তার করিতে চান না, তাহাও সহজেই অনুমেয়। ভারতবর্ষের লোকদিগকে বিস্ময়কর জাতি বলিয়া, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, জমকাল প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণসমাবেশ ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগ হইতে উদ্ভব বুঝা আবশ্যক বলিয়া, তিনি এদেশের লোকদের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহাদিগকে গবর্মেণ্ট নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল আগা খাঁর নাম করিয়া অন্য সকলকে তাঁহার সহকর্ম্মী বলা হইয়াছে। ইহা বলায় অন্য সকলের অপমানই করা হইয়াছে। আগা খান ভারতবর্ষে থাকেন না, ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ টাকার সাহায্যে ফ্রান্সে ও অন্যত্র আমোদ-প্রমোদ ঘোড় দৌড়ের খেলা করিয়া বেড়ান। ভারত-বর্ষের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই। ভারতবর্ষের অন্য লোকদের কথা দূরে থাক, মুসলমানদের জন্যও তিনি কিছু স্বার্থত্যাগ বা পরিশ্রম করেন নাই। মুসলমানদের মধ্যে অজ্ঞ লোকদের সংখ্যা বেশী বলিয়া তাঁহাকে অনেক মুসলমান আপনাদের নেতা মনে করে। তিনি 'হিজ হাইনেস' বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু তাঁহার একহাতপরিমিত রাজ্যও কোথাও নাই। প্রজাদের হিতকারী রাজা কোন কোন দেশী রাজ্যে আছেন। তাঁহাদের নাম না করিয়া আগা খাঁর নাম করিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদিগকে খুব সম্মানিত করিয়াছেন।

গবর্মেণ্টের বাছাই করা লোকদিগকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলা মিথ্যা কথা। ভারতবর্ষের কোন

রাজনৈতিক দল বা ধর্ম্মসম্প্রদায় বা দেশী রাজ্য নিমন্ত্রিতদের এক জনকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে নাই। রাজনীতি বিষয়ে যাহারা চিন্তা করে, এরূপ ভারতীয়দিগের প্রায় সকলেই প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য কনফারেন্স করা রামশূন্য রামায়ণের অভিনয়। গবন্মে'ণ্ট বলিতে পারেন না, যে, কংগ্রেস-ওয়ালারা এই বৈঠকে যোগ দেন নাই—কংগ্রেসকে বা ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেসওয়ালাদের এক জনকেও গবন্মে'ণ্ট ডাকেন নাই।

স্বশাসনের অধিকার ভোগ জাতীয় আত্মসম্মানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ইহা বলিয়া প্রধান মন্ত্রী ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। এই অধিকার ব্রিটেন ভোগ করে, ডোমীনিয়নগুলিও ভোগ করে। ভারতবর্ষও তাহা ভোগ করিয়া এক রাজার অধীনে তাহাদের সহিত বাস করিবে মিঃ ম্যাকডনাল্ড এই কথা বলিয়াছেন। ইহা পুরাতন মামুলী কথা। কখন ভারতবর্ষ স্বশাসক হইবে, তাহা না জানিলে এ সবই ফাঁকা কথা। তারিখ-বিহীন অঙ্গীকার অঙ্গীকারই নহে। ডোমীনিয়নের লোকের সহিত ব্রিটিশজাতির অস্থি মাংসের সম্পর্ক, প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন; ইহা অনেকটা ঠিক। যাহারা একজাতীয় তাহারা একরাজার অধীনে থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু যাহারা জাতি ধর্ম্ম ভাষা আচার ব্যবহারে স্বতন্ত্র, তাহারা সেই রাজার বরাবর অধীন থাকিবে, ইতিহাস কি এ আশাকে সমর্থন করে?

সর্ব্বশেষে অবশ্য কংগ্রেসের নেতা ও কর্ম্মীদের নিন্দা আছে। তাঁহারা নাকি শত্রুভাব উত্তেজিত করিতেছেন, এবং ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হইতেছেন। তাঁহারা নাকি খণ্ডবিখণ্ড ও চূর্ণিত করেন, পরামর্শ ও আলোচনা করিতে চান না। ইংরেজদের মতে সায় দিয়া আলোচনা না করা মহা অপরাধ বটে। যাঁহারা অধিকার দাবী করেন এবং যাঁহারা সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাহা মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত, কংগ্রেস নাকি তাঁহাদের পথে কাঁটা দিতেছেন। "সমস্ত হৃদয়ের সহিত"ই বটে; এই হৃদয়টা কিন্তু খুঁজিয়া বাহির করাই কঠিন—এই যা দুঃখ।
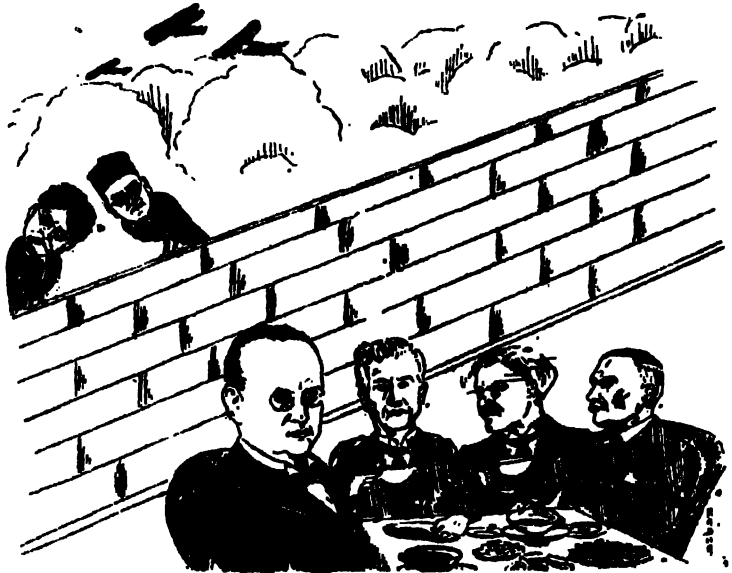
"অভ্যর্থনা!"

'আমরা কি ভুক্তাবশেষটুকুও পাব না!'

[গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণ এরোপ্লেন বাহিনীর খেলা দেখিতে গিয়া বসিবার জায়গা কিংবা খাদ্যাদি কিছুই পান নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। একজন ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর শ্রীযুক্ত তাম্বেকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীগণ ইংরেজী বলিতে পারেন কিনা।]

লণ্ডন বৈঠকের ভারতীয় সভ্যগণ

গোল টেবিল বৈঠকের সভ্যগণ এখনও (১১ নবেম্বরের খবর অনুসারে) গোড়াতেই কি প্রধান দাবী উপস্থিত করিবেন, সে বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। গবন্মে'ণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যে রকম লোক বাছাই করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে এরূপ ফল হইবে অনুমান করিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম। অনুমান করিয়াছিলাম, গবন্মে'ণ্ট জগদ্বাসীকে বলিতে পারিবেন, "দেখ, ভারতীয়েরা একমত হইতে পারে না; অতএব আমরাই তাহাদের জন্য একটা কিছু করিব।" স্যার

তেজবাহাদুর সপ্রু বলিতেছেন, পূর্ণ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ ভিন্ন অন্য কোন জিনিষেই তাঁহার মন বসিতেছে না। অনেকে চান, যে, ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা পূর্ণ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস দিবেন কিনা তাহা গোড়াতেই বলুন; তাহা অঙ্গীকার না করিলে অন্য আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। মুসলমান সভ্যেরা মিঃ জিন্নার ১৪ দফা দাবীতে অন্য সকলকে আগে রাজী করিয়া তবে সমগ্র ভারতের দাবীতে যোগ দিবার বিষয় বিবেচনা করিতে চান। সবাই কি পাইবে তাহা স্থির হইবার আগেই তাঁহারা নিজের পাওনাগণ্ডাটা ঠিক করিয়া লইতে চান। ইহা কালনেমির লঙ্কাভাগের মত।

ভারতীয় সভ্যদের স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন আগা খাঁ। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতির মত লোক পড়িয়া রহিলেন; সভাপতি হইলেন এমন একজন লোক যিনি ব্যসনী ও বিলাসী বলিয়াই পরিচিত, এবং যিনি ভারতীয় জাতির বা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাধীন মনুষ্যসুলভ অধিকার লাভের জন্য কিছুই করেন নাই, বরং যখন সুযোগ পাইয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষের দমননীতির সমর্থন করিয়াছেন।

গুজরাট ও মেদিনীপুর

গুজরাটের চাষী গৃহস্থেরা সত্যাগ্রহ করিয়া খাজানা না-দেওয়া স্থির করায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া হাজারে হাজারে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। ইহার উল্লেখ আমরা অন্যত্র করিয়াছি, এবং বিশেষ বৃত্তান্ত পাঠকেরা দৈনিক কাগজে দেখিয়াছেন। বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে লোকেরা খাজনা ও ট্যাক্স না-দিবার চেষ্টা করিতেছে। মেদিনীপুর জেলার অনেক গ্রামে এই চেষ্টা হওয়ার তথাকার সত্যাগ্রহীরা এরূপ নানা দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতেছে, যাহার বর্ণনা খবরের কাগজে সচরাচর প্রকাশিত হইতেছে না কিন্তু যাহা অন্য সূত্রে জানা যাইতেছে। তাহা এ প্রকারের, যে, গুজরাটের নিকটেই যেমন দেশী রাজ্য আছে, মেদিনীপুরের পার্শ্বেই যদি সেইরূপ দেশী রাজ্য থাকিত, তাহা হইলে মেদিনীপুরের ঐ সকল গ্রামের লোকেরা সেই দেশী রাজ্যে চলিয়া যাইত।

এশিয়ার মহিলাদের কন্ফারেন্স

আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লাহোরে এশিয়ার সমস্ত দেশের মহিলাদের কন্ফারেন্স হইবে। এশিয়ার নানা দেশ হইতে মহিলাদের সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি পাওয়া গিয়াছে। প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা, তাঁহাদিগকে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা প্রভৃতির উদ্যোগ চলিতেছে। সংক্ষেপে এই কন্ফারেন্সের উদ্দেশ্য—(১) এশিয়ার নারীদের মধ্যে প্রাচ্য সভ্যতা ও কৃষ্টির (culture-এর) ঐক্য সম্বন্ধে বোধ জন্মান; (২) প্রাচ্য সভ্যতার সদ্‌গুণাবলী (সাদাসিধা জীবনযাত্রা প্রণালী, দর্শন, ললিতকলা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, মাতৃত্বের প্রতি ভক্তি, আধ্যাত্মিক চৈতন্য ইত্যাদি) নির্দ্ধারণ করিয়া জাতির এবং সমুদয় পৃথিবীর সেবার জন্য তৎসমুদয় সংরক্ষণ; (৩) বর্ত্তমানে প্রাচ্য সভ্যতায় দৃশ্যমান দোষত্রুটির (অসুস্থতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, শ্রমিকদিগকে কম মজুরী দেওয়া, শিশুমৃত্যু, বিবাহের নানা কুপ্রথা, ইত্যাদির) আলোচনা করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ; (৪) পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে (শিক্ষা, পরিচ্ছদ, চলাফিরার স্বাধীনতা, বায়োস্কোপ, কলকারখানা প্রভৃতি হইতে) প্রাচ্যের উপযোগী জিনিষ বাছিয়া লওয়া; (৫) এশিয়ার নানাদেশের আর্থিক, ধর্ম্ম-নৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত তথ্য ও অভিজ্ঞতার বিনিময় দ্বারা পরস্পরকে শক্তিশালী করা; এবং (৬) পৃথিবীব্যাপী শান্তির দিকে মানবজাতিকে অগ্রসর করা।

প্যালেষ্টাইন, সীরিয়া, সিংহল, নেপাল, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইরাক, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, আনাম, মালয়, হাওয়াঈ, পারস্য, বালুচীস্থান, জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে কন্ফারেন্সের অনুকূল পত্রোত্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। বাংলা দেশ হইতে যাহাতে অনেক মহিলা প্রতিনিধি যান, তাহার চেষ্টা এখন হইতে করা উচিত। মাঘ মাসে লাহোরে শীত বেশী। অতএব প্রতিনিধিদের থাকিবার জায়গা ভাল হওয়া যেমন দরকার, তাঁহাদের খুব গরম পরিচ্ছদ লইয়া যাওয়াও তেমনি দরকার।

সব দেশেই কন্‌ফারেন্স-জাতীয় সভায় এমন লোকের আবির্ভাব হয়, যাহারা ঠেলাঠেলি করিয়া সামনে দাঁড়াইতে ও নিজের মত জাহির করিতে চায়। এক্ষেত্রেও তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। বাংলা দেশে অবরোধ প্রথা থাকায় ও অন্যান্য স্বাভাবিক কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও চরিত্রগাম্ভীর্য্যে শ্রেষ্ঠা অনেক মহিলা আত্ম-গোপন করেন। সেইরূপ মহিলাদিগকে লাহোরে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। তাঁহারা যদি সংক্ষেপে কিছু লিখিয়াও পড়েন, তাহা হইলে তাহাতে সকলে উপকৃত হইবে।

—

চৈনিক নারী

অল্প কয়েক বৎসরে চীন দেশে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চৈনিক স্বাজাতিকতা এই একটা বড় কাজ করিয়াছে, যে, সমাজে নারীদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্থান দিয়াছে। জীবনের সকল কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষদের মত চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক সরকারী কর্ম্মচারী, এবং ব্যাঙ্কারের কাজ করে। শাংহাইতে একটি ব্যাঙ্ক আছে, যাহার সমুদয় কাজ কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। একজন চৈনিক মহিলা ডাক্তার নিজেই নিজের মোটর চালাইয়া রোগী দেখিয়া বেড়ান। প্যারিসে আইনের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টার কুমারী সুমী চেং শাংহাই জেলার এমন একজন আইনজীবী যাঁহাকে সমব্যবসায়ীরা ভয় করে। অনেক চৈনিক বালিকা খুব ভাল কুস্তিগীর হইতেছে। গত বসন্তকালে হাংচাউয়ে ব্যায়ামপটু লোকদের তিনসপ্তাহব্যাপী এক সম্মেলন হয়। তাহাতে চীনের নানা প্রদেশ হইতে দুহাজার বালক ও বালিকা প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

—

ইঙ্গ-ভারতীয় বৈঠকের আরম্ভ

গত ২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নবেম্বর) গোলটেবিল বৈঠক নামে অভিহিত ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের প্রারম্ভিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে সমগ্র মানবজাতির প্রায় একপঞ্চমাংশ লোক বাস করে। ইহা অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া সভ্যদেশ বলিয়া পরিচিত। চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে ইহা মানবজাতিকে অনেক শ্রেষ্ঠ বস্তু উপহার দিয়াছে। মানবজীবনের এমন কোন বিভাগ নাই, যাহাতে অগ্রগণ্য মানুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। এ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠস্থানীয় যে অল্পসংখ্যক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন একটি দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তির মাতৃভূমি নহে। ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থাতেও, পৃথিবীতে বিখ্যাততম যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয়দের স্থান কাহারও নিম্নে নহে। মরুভূমিতে বনস্পতি জন্মে না, বৃক্ষবহুল স্থানেই জন্মে। ভারতবর্ষে যে পুরাকাল হইতে মহামানবের জন্ম হইয়া আসিতেছে, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, যে, মনুষ্যোচিত গুণ ভারতবর্ষীয় সাধারণ মানুষদের মধ্যেও বিরল নহে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দেশভক্তির, আত্মোৎসর্গের, সাহসের, সহিষ্ণুতার, মানবপ্রকৃতির উৎকর্ষে বিশ্বাসের, আশাশীলতার এবং সাতিশয় উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্ষমা ও অহিংসার অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইতেছে। এমন যে দেশ ও জাতি, তাহার ভাগ্যবিধানের চেষ্টা বিদেশে বিদেশীর আহ্বানে ও কর্ত্তৃত্বে হইতেছে, ইহা গৌরবের বিষয় নহে। বিদেশীর সহিত সহযোগিতা ও মৈত্রী আমাদের অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহা প্রকৃত সহযোগিতা হওয়া চাই; তাহা আনুগত্যের নামান্তর হইতে পারে না। যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মোৎসর্গ, সাহস ও দুঃখসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণচেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্মানকর নহে।

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। তিনি সমবেত ভারতীয় সভ্যদিগকে ভারতীয় দেশী রাজ্যসকলের নৃপতি ও প্রধানদের এবং ভারতবর্ষের জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করেন। ইংলণ্ডের রাজারা এরূপ সভায় যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের চিন্তা ও মনের ভাব কিছুই প্রকাশ পায় না, বলা যায় না; কিন্তু এপ্রকার সভায় রাজার বক্তৃতা মন্ত্রীমণ্ডলের মতানুসারীই হইয়া থাকে। মন্ত্রীমণ্ডল যাহা বলান, রাজা তাহাই বলেন। ভারতীয় সভ্যদিগকে তিনি প্রতিনিধি বলিতে বাধ্য ছিলেন। কারণ, তাঁহার মন্ত্রীরা, সুতরাং তিনি, জগতের কাছে বলিতে পারেন না, "আমরা ভারতবর্ষ হইতে আমাদের দ্বারা মনোনীত কয়েকজন লোকের সহিত পরামর্শ করিতেছি।" কেন-না, তাহা হইলে জগৎকে বলা হইবে, যে, ভারতবর্ষকে তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে নিজের মত জানাইবার কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। এইজন্য প্রকৃত সেল্‌ফ্-ডিটার্মিনেশ্যনের (প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বনির্দ্ধারণের) পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তাহার একটি মেকী অনুকরণ জগতের সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বরও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা অতি উচ্চ, এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রথা অনুসারে তিনি

কোন দলের লোক নহেন, অথবা সব দলেরই মানুষ তিনি। ইহা স্মরণ রাখিয়াও বলিতে হইতেছে, যে, বৈঠকে উপস্থিত ভারতীয়েরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নহেন। সত্য বটে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে যদি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইত, তাহা হইলে বৈঠকে উপস্থিত কেহ কেহ নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের অধিকার যখন কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তখন কেহই কাহারও প্রতিনিধি নহেন এবং যিনি যাহা বলিবেন, তাহা তাঁহার নিজের মত—তাহা কোন দল বা সম্প্রদায়ের মত বলিয়া গ্রহণীয় নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সভ্যদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অধিকারী কয়েকজন লোক থাকিলেও, কংগ্রেসের মত ও কার্য্য-প্রণালীর সমর্থক, অনুবর্ত্তক ও অনুষ্ঠাতাদের তুলনায় তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তকের সংখ্যা নগণ্য। কংগ্রেসের মতের জন্য লোকে ধনপ্রাণ দিতেছে এবং দিবার জন্য প্রস্তুত। এবম্বিধ নানা বিষয় বিবেচনা করিলে ইঙ্গ-ভারতীয় বৈঠকে সমবেত ভারতীয়দিগকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিলে যথার্থ কথা বলা হয় না।

ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতার কথাগুলি সুনির্ব্বাচিত। এইজন্য তাঁহার প্রত্যেকটি কথা পরীক্ষা করিলে অন্যায় হয় না। তিনি "রেপ্রিজেন্টেটিভস্ অব প্রিন্সেজ, চীফস্ এণ্ড পীপল্ অব ইণ্ডিয়া" কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়া" কথাটির মধ্যে যদি দেশী রাজ্যগুলিও তাঁহার অভি-প্রেত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের যদি বা এমন কেহ কেহ বৈঠকে গিয়াছেন যাঁহারা দলবিশেষের ও সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা মনোনীত হইতে পারিতেন, দেশীরাজ্যগুলি হইতে বেসরকারী প্রজাপক্ষীয় এমন একজনও যান নাই, যিনি দেশী রাজ্য-সকলের প্রজাদিগের প্রতিনিধি হইতে পারিতেন। বস্তুতঃ এই সাত কোটির অধিক লোকের অস্তিত্ব এই বৈঠকে উপেক্ষিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতায় কয়েকটি খাঁটি সত্য কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন, কোনও জাতির জীবনে দশ বৎসর অতি অল্প সময়; কিন্তু গত দশ বৎসরে, শুধু ভারতবর্ষে নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও, জাতীয়ত্বের যে সব ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, জাগিয়াছে ও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা কালের মামুলী মাপকাঠি দ্বারা মাপা যাইতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ লয়েড জর্জ বলিয়াছিলেন, সে সময়ে কোন কোন জাতি এক এক বৎসরে বহু শতাব্দী অতিক্রম করিতেছে, অর্থাৎ সাধারণতঃ বহু শতাব্দীতে যে পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটে, এক এক বৎসরে তাহা ঘটিয়াছে। পঞ্চম জর্জও এই মর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার শেষের দিকে বলিয়াছেন, যে, সকলেরই ন্যায্য দাবীর কথা মনে রাখিয়া তিনি কথা বলিতেছেন—সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের, নাগরিকদের ও গ্রাম্য কৃষকদের, পুরুষদের ও নারীদের, জমীদারদের ও রায়তদের, বলিষ্ঠদের ও দুর্ব্বলদের, ধনীদের ও দরিদ্রদের, এবং সকল জাতির, জা'তের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের। কেবল ধনিক ও শ্রমিকদের নাম বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের আমলে শ্রমিকদের অনুল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার পর তিনি বলিতেছেন :—

"I cannot doubt that the true foundation of self-government is the fusion of such divergent claims into mutual obligations and in their recognition and fulfilment."

তাৎপর্য্য। "আমার কোন সন্দেহ নাই, যে, এই সব পরস্পরবিরোধী দাবীর দ্রবীভবন ও সংমিশ্রণ হইতে পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধ্যকতা ও কর্ত্তব্যবোধ জন্মিলে এবং তাহা মানিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করিলে, তাহাই স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত ভিত্তি।"

ইহা সত্য কথা, যে, কোন দেশে স্বায়ত্তশাসন সফল হইতে পারে না, যদি সে দেশের লোকেরা কেবল নিজের নিজের দাবীর ও অধিকারের বিষয়ই ভাবে—অপর সকলের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের বিষয়ও ভাবিতে হইবে, এবং সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

ইংলণ্ডেশ্বরের বক্তৃতা শেষ হইবার পর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন :—

"Declarations made by British sovereigns and statesmen from time to time that Great Britain's work in India was to prepare for self-government have been plain. If some say that they have been applied with woeful tardiness, I reply that no permanent evolution has seemed to any one going through it to be anything but tardy."

তাৎপর্য্য। "ভারতে ব্রিটেনের কাজ হইতেছে তাকে স্বশাসনের জন্য প্রস্তুত করা, ব্রিটিশ নৃপতি ও রাজপুরুষদের দ্বারা মধ্যে মধ্যে উক্ত এই মর্ম্মের কথা সুস্পষ্ট। কেহ যদি বলেন, এইরূপ কথা অনুসারে কাজ বড়ই মন্দগতিতে হইয়াছে, তাহার উত্তরে আমি বলি, যে-কেহ কোন স্থায়ী

বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছেন, তিনিই উহা বড় আস্তে আস্তে হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়াছেন।"

এ রকম বাজে যুক্তির উত্তর ইংরেজী ও বাংলাতে অনেকবার দিয়াছি।

পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক—বিশেষতঃ ইংরেজদের জন্য, যাহারা দেখে না শুনে না, কিংবা দেখিতে শুনিতে হইবে বলিয়া চোখ কান অন্যদিকে ফিরাইয়া বা বন্ধ করিয়া আছে।

পাদরী এডোয়ার্ড টমসন্ ভারতবর্ষের পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় তাঁহার পুস্তকে ইংরেজদের কোন কীর্ত্তির উল্লেখ করিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষকে বরাবর স্বশাসন শিখাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"This is the penalty of having let resentment and wounded self-esteem fester through so many decades and grow to intolerable exacerbation, *of having for so long refused to give any considerable training in self-government* or any fair expression to promises often made and with especial solemnity set forth by Queen Victoria and each succeeding King Emperor."—*The Reconstruction of India*, P. 41.

সমস্ত বাক্যটির অনুবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে লেখক বলিতেছেন, গবর্মেণ্ট এত দীর্ঘকাল স্বশাসন শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেই কথাগুলি উপরে বাঁকা অক্ষরে ছাপিয়া দিয়াছি। যাহা সত্য কথা, তাহা চাপা দিবার চেষ্টা প্রধান মন্ত্রী না করিলেই ভাল হইত।

তাঁহার আর একটা উক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন :—

"Men who co-operate are pioneers of progress, civil disorder is the way of reaction. It destroys social mentality, wherefrom all constitutional development derives its source and whereupon all stable internal administration is based."

এই কথাগুলিতে মন্ত্রী মহাশয় নাম না করিয়া মহাত্মা গান্ধীর ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রচেষ্টার নিন্দা করিয়া, কো-অপারেশ্যান অর্থাৎ সহযোগিতার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল, যে, গান্ধীজী ইংরেজ জাতিকে বিশ্বাস করিয়া ২৯ বৎসর ধরিয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন—কখন কখন প্রাণ হাতে লইয়া করিয়াছিলেন—বৈঠকের কোন ভারতীয় সভ্য তাহা করেন নাই। গান্ধীজি বিশ্বাস করিয়া ইংরেজের সহযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজ জাতি তাঁহার সহযোগিতা না করায় এই প্রচেষ্টার উৎপত্তি।

সিবিল বিশৃঙ্খলার নিন্দা মিঃ ম্যাকডনাল্ড করিয়াছেন। কিন্তু উহা আংশিক সত্য। গান্ধীজী সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করেন নাই, কেবল অহিংসভাবে কোন কোন আইন অমান্য করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। যে-সব পরাধীন জাতি সশস্ত্র যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদেরও "সোশ্যাল মেণ্টালিটি" অর্থাৎ সমাজের অনুকূল মনোভাব বিনষ্ট হয় নাই; তাহারা স্বাধীন হইয়া সামাজিক কর্ত্তব্য পালন দ্বারা উন্নতি করিতেছে ও অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিদেরও মনোভাব যখন সমাজবিরোধী হইয়া যায় নাই, তখন অস্ত্রহীন অহিংসপ্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়েরা সমাজবিধ্বংসী মনোভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ মনে করিলে ইতিহাস হইতে সেরূপ সিদ্ধান্তের কোন সমর্থন পাওয়া যাইবে না।

গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় সভ্যেরা নিজ নিজ প্রাসাদে সুন্দর পোষাক পরিয়া আরামে থাকুন ও ইংরেজদের সঙ্গে খানাপিনা করিয়া সহযোগিতা করুন। গান্ধীশিষ্যেরা কোটি কোটি অর্দ্ধনগ্ন নিরন্ন লোকের ভগ্ন কুটীরে গিয়া তাঁহাদের সহিত কার্য্যগত ভ্রাতৃত্ব করিয়া প্রকৃত সামাজিকতা সুদৃঢ় করিতেছেন।

—

ভবিষ্যৎ ভারতশাসনবিধি সম্বন্ধে ভারত-গবর্মেণ্টের মন্তব্য

ভবিষ্যতে ভারতশাসনবিধি কিরূপ হওয়া চাই, সে বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত সাইমন কমিশন নিযুক্ত

হয়। তাহার রিপোর্ট, তাহার সহিত "সহযোগিতা" করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কমিটির রিপোর্ট, নেহরু কমিটির রিপোর্ট, এবং অন্যান্য মত বিবেচনা করিয়া ভারত-গবর্মেণ্ট এদেশের ভাবী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতসচিবকে আপনাদের একটি দীর্ঘ মন্তব্য পাঠাইয়াছেন। ইহা ২৭শে কার্ত্তিক রাত্রি ৮টার সময়ে রাইটার্স বিল্ডিঙে প্রবাসী কার্য্যালয়ের একজন কর্ম্মচারীকে দেওয়া হয়, ২৮শে প্রাতে সম্পাদকের হস্তগত হয়, এবং এই ২৮শেই প্রবাসীর ছাপা শেষ হইতেছে। এই মন্তব্যটি ২০৮ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহার এক এক পৃষ্ঠায় মোটামুটি প্রবাসীর এক এক পৃষ্ঠার সমান শব্দ আছে। মূল মন্তব্যটি ছাড়া সূচী ১০ পৃষ্ঠা এবং ৪৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী কয়েকটি পরিশিষ্ট আছে। এতবড় একটি মন্তব্যের মোটামুটি ধারণা যাহাতে হইতে পারে, সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি এরূপ কিছু লেখা যায় না। তবে, পাঠকেরা জানিয়া রাখুন, ভারত-গবর্মেণ্ট ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ দিবার ধার দিয়াও যান নাই, গবর্মেণ্টকে দেশবাসী-দের নিকট প্রকৃতপ্রস্তাবে দায়ী করিতেও চান নাই; সাইমন কমিশন যাহা বলিয়াছে, তাহারই কিছু অদলবদল, তাহাতেই কিছু জোড়াতাড়া ইহাতে আছে। কংগ্রেসের স্বাধীনতাবাদীর দল, সত্যা-গ্রহীর দল ভারত-গবর্মেণ্টের মন্তব্যে সন্তুষ্ট ত হইবেনই না, মডারেটদের অগ্রণী অগ্রসর লোকেরাও সন্তুষ্ট হইবেন না।

ভারত-গবর্মেণ্টের মতে, যাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস আইনলঙ্ঘনের বা অস্ত্রব্যবহারের—অর্থাৎ কোন প্রকার শক্তিপ্রয়োগের—পক্ষপাতী, তাহাদের সঙ্গে কোন বুঝা পড়া, কোন বন্দোবস্ত অসম্ভব। আমরা তাহা মনে করি না। গবর্মেণ্টের মন্তব্যের কথাগুলি এই :—

"..It must be recognized that there is, particularly among the younger men, a considerable body who have adopted independence not as a phrase but as a settled aim, who are fundamentally hostile to the British connection and who, though they may not all favour or believe in the efficacy of the methods of terrorism which many of them are prepared to pursue, are at any rate convinced that it is by force applied in some form or other that they can achieve their end. With such men it would be idle to expect that any settlement is possible." P. 9.

এখানে সরকার বাহাদুর অহিংস শক্তি প্রয়োগেরও বিরুদ্ধে মত দিতেছেন, এবং পরবর্ত্তী বাক্যে উপরে বর্ণিত চরমপন্থীদের সম্বন্ধে এই আশা প্রকাশ করিতেছেন,

"that gradually through experience of a constitution, which gives a considerable degree of self-government, they may come to realize that more can be achieved by working the constitution than by endeavouring to overthrow it."

ইহার মানে বুঝিয়াছি। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় যে বলা হইতেছে,

"The time has passed when it was safe to assume the passive consent of the governed. The new system must be based as far as possible on the willing consent of a people whose political consciousness is steadily being awakened."

জনগণের যে রাজনৈতিক জাগৃতির ফলে গবর্মেণ্টকে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে, তাহা শাসনযন্ত্র-পরিচালনের (working the constitution-এর) ফল, না অহিংস শক্তিপ্রয়োগের ফল ?
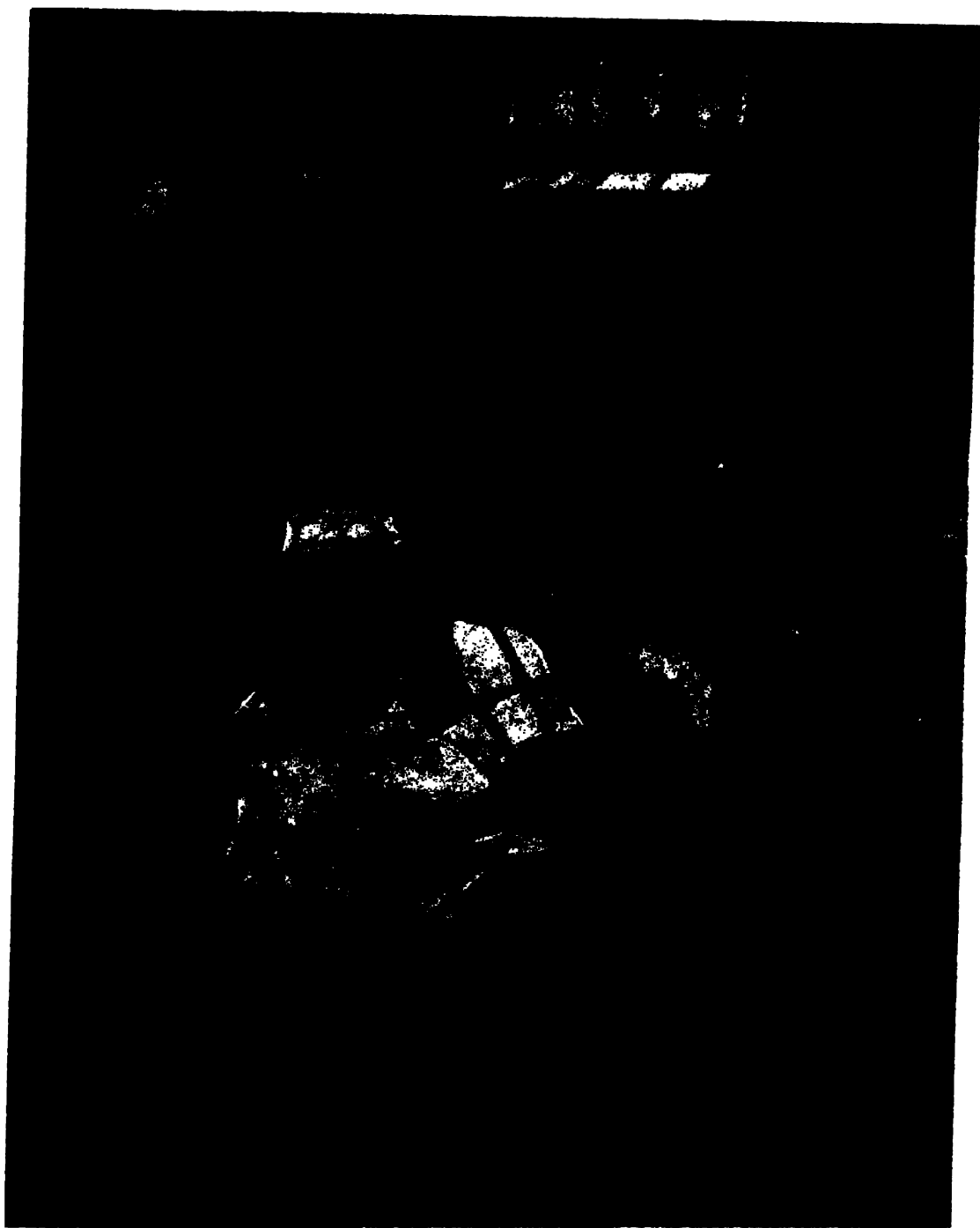
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৭

৩য় সংখ্যা

রাশিয়ার সর্ব্বব্যাপী নির্ধনতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু—

রাণী, স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে, ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগ্‌নির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের আমেজ-দেওয়া সবুজ। বনের শেষ সীমায় বহুদূরে গ্রামের কুটীরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায় পপলার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান। মস্কৌয়েতে কয়দিন যে-হোটেলে ছিলুম, তার নাম গ্র্যাণ্ড হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজ-সজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে, তালি-দেওয়ারও সঙ্গতি নেই, ময়লা হয়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এই রকম—একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্ব্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দ্দশায়, দুষ্কর্ম্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই, ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখিনে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের চোখে খুব পড়ে। অন্যদেশে যাদের

আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তারাই একমাত্র। মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেচে। কেউ ফিট-ফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্দ্ধান করেচে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ ব'লে এক ভদ্রলোকের বাড়ী যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। যে-বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়লোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই - নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোবানাপিতবর্জ্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনশূন্য ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যাণ্ড হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই—কেননা সকলেরই এক দশা। আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সে জন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না; তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনীচু ছিল না—সকলেরই ঘরে একটা মোটা-মোটি রকমের চালচলন ছিল—তফাৎ যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের অর্থাৎ গান বাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তাছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য অর্থাৎ ভাষা ভাব ভঙ্গী আচারবিচারগত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহার-বিহার ও সকল প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত। ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেচে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিস-বিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হ'ল, তখন তারা বিলিতী বাবুগিরির চলন সুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে, সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্চে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্য্যাদা এক মুহূর্ত্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেচে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব—কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েচে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব—তারপরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

[শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীসকে লিখিত]

—

রাশিয়ায় সকল মানুষের উন্নতির চেষ্টা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু—

প্রশান্ত, বহুকাল গত হ'ল তোমাকে আর রাণীকে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগলপত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটেছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখ্‌তে উৎসাহ বোধ করিনে। অন্তত তোমাদের দিক্ থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়— তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে উঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজচে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারচে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেচে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব— আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক্, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করচে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্ব্বে সবপ্রথমেই মনে হয়, কি অসম্ভব সাহস! সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় ক'রে তার তহবিল হয়ে উঠেচে পর্ব্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলচে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েচি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হ'ত তাতে তেমন আশ্চর্য্য হতুম না, কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইচে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে এরা যেটা চাচ্চে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়, হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিৎবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্দ্ধর্ষ।

এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলচে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক একটা দুর্ব্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার-সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত। একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী

পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করচে। এ বাণী চিরদিন টিক্‌বে কি-না কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্ত্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দ্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চল্‌ছিল, টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারদিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না, তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানব-সংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখিনে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানব-সমাজের মধ্যে যদি ভার-সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করে-ছিলুম, তোমাদের দুঃখটা কি? সে বল্‌লে, আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন। আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক তোমরা যখন দুর্ব্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কি উপায়ে? সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে—যারা ধনী যারা শক্তিমান তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্চে তার দুঃখের জোর।

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেচে বলেই কোনমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেচে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারচে যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেচে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্বত হয়ে উঠেচে। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলচে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করচে—তার দূতদের ঘরে ঢুক্‌তে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্চে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্চে দুঃখীর দুঃখ—কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সবচেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে-বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তাহ'লে সবচেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে—কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খট্‌কা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখলুম ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেচে। আমি রাশিয়াতে আস্‌চি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েচে। এমন কি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেচি। অনেকে বলেচে ওরা অতি আশ্চর্য্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত। আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েচে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেচে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা রকম যে, আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেচে আমাকে যা

দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় হ'ত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজ্‌ছিল। মনে মনে ভাবছিলুম ধনশক্তিতে দুর্জ্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তি-সাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রুকুটীকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাবো না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্য্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কি, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের। যদি কেউ বলে দুর্ব্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তাহ'লে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই? তারা হয়ত ভুল করতে পারে— তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করবে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেচে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তাহ'লে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে—এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্য্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুল্‌লে; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায় হয়ে উঠ্‌চে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানব সমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্ব্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবরই নেই—এখানকার মোটর গাড়ীর দুর্য্যোগে দুটো একটা মানুষ মলে তার খবর এদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কি অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে! যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না। আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে উঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকল প্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্ব্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যেসব শক্তিমান্ জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে একথা প্রচারিত, যে, আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চল্‌ত—গেল কি উপায়ে? কেবলমাত্র শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে-শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা। অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হচ্ছে আমাদের অশক্তির সবচেয়ে বড়ো ট্যাক্‌সো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ law and order আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম। জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব ব'লে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েচি। এজন্যে কর্ত্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাইনি, প্রত্যাশাও করেছি—কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে। ফাঁকা law

and order নিয়ে না ভরে পেট না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্ম্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ককষা—কেবলমাত্র মাথা গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকারকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম-এ পাশ করবার মতন নয়।

কিন্তু এসব কথা আর একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আটলাণ্টিক পাড়ি দেব—কতদিনের মেয়াদ্ আজও নিশ্চিত করে বলতে পাচ্চিনে। কিন্তু শরীর মন কিছুতে সায় দিচ্চে না—তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না—যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে কয়টা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়—সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিষটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্ব্বলতা ততই ধরা পড়ে—ততই শৈথিল্য ঝগড়াঝাঁটি পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য্য, ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়—দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশী করে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এখানে আমার ছবির আদর অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বই কম হয়নি। এদের গ্যালারির জন্যে চারখানা ছবি কিনবে বলে এরা যথেষ্ট চেষ্টা করচে—কিন্তু এদের অর্থাভাব প্রায় আমাদের বিশ্বভারতীরই মতো—তবু কোনো রকম করে জোগাড় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ইতি ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০।

[শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীসকে লিখিত]

বার্লিন

কল্যাণীয়েষু—

প্রশান্ত, মস্কৌ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হচ্চে তারই বিবরণ রাণীকে কিছু দিয়েচি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক, মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যাদের মন অন্তর বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হ'ল তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্ত-সম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে—কি অসীম তার অপব্যয়, কি নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটো বড়ো সহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনা শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার

শিক্ষণীয় বিষয়ের সুনিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়েচে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষ্যে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এই রকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এককালের নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত ক'রে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেচে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি খাবার ঘরে কেউ কেউ ব'সে খাচ্চে, পড়বার ঘরে একদল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম —সেখানে সবাই এসে জমা হ'ল। তারা নানাস্থানের লোক, কেউ বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেচে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক; কোনো রকম সঙ্কোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষ্যে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বল্‌লে, আমিও কিছু বল্‌লুম। তারপরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন?

উত্তর দিলুম, "যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এরকম বর্ব্বরতা দেখিনি। তখন গ্রামে এবং শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবন-যাত্রায় সুখে দুঃখে তারা ছিল এক। এসব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্চি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এই রকম অমানুষিক দুর্ব্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক্, এর মূল কারণ হচ্চে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। কিন্তু যে-পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেচ? ভবিষ্যতে তাদের কি গতি হবে?

উত্তর। শুধু লেখা কেন তাদের জন্ম আমি কাজ ফেঁদেচি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েচে তার তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্ম।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চল্‌চে সে সম্বন্ধে তোমার মত কি?

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয়নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্চে কি না?

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না?

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই যে চাষীদের জন্যে আবাস ব্যবস্থা হয়েচে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না?

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্য কি করা হচ্চে মস্কৌ এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক্, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কি, তোমাদের ইচ্ছা কি?

একজন যুবক চাষী, য়ুক্রেন প্রদেশ থেকে এসেচে, সে বল্‌লে,"দু বছর হ'ল একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল ফসলের বাগান আছে তার থেকে আমরা সবজির জোগান দিই সব কারখানা ঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কৌটায় মোড়াই হয়। এছাড়া বড়ো বড়ো

ক্ষেত আছে সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা ক'রে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের ক্ষেত নিজে চষে, তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফল উৎপন্ন হয়। প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড় শো চাষীর ক্ষেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্দ্ধেক চাষী তাদের ক্ষেত ফিরিয়ে নিলে। তার কারণ সোভিয়েট কম্যুন দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্ম্মচারীরা ঠিক মতো ব্যবহার করেনি। তাঁর মতে ঐকত্রিকতার মূল নীতি হচ্চে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্বয় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকির ভাগ লোক আবার ফিরে এসেচে। এখন আগেকার চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হয়েচে।''

তারপরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক বল্লে, "সমবেত ক্ষেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের (collective farm) সঙ্গে নারী উন্নতি প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েচে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলচে। আমরা মেয়ে ঐকত্রিকরা দল তৈরি করেছি, তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতি সাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ ক'রে দেবার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি ক'রে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয় আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হয়েচে।"

সুখোজ প্রদেশে জাইগান্ট নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কি রকম বিস্তার হচ্চে সেই সম্বন্ধে আমাকে বল্লে, "আমাদের এই ক্ষেতে জমির পরিমাণ একলক্ষ হেক্টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করতো। এবছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েচে। এই রকম লাঙল এখন আমাদের তিনশোর বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আটঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় ক্ষেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।''

আমি বললেম, "ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম—ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বল্লে, আমি ভালো বুঝতে পারিনে। বেশ বোঝা গেল অসম্মতির কারণ মানব চরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়। তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হ'ত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হ'ত, তাহ'লে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হ'ত যে ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হ'তে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতম উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন

গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ। এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্ব্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হ'লেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না। সোভিয়েটেরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েচে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। একথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজস্ব না হ'লে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানব-চরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিষটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে-ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সেক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি, একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্কির রিপাব্লিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী বল্‌লে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত আছে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা দেখেছি স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই, ছোটো ক্ষেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুক্‌রো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি বল্‌লুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বল্‌লেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগের জন্যে সোভিয়েট গবর্মেণ্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েচে এরকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে বল্‌লুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব করে তুলে হয়ত পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বল্‌লেন, সেটাই যে আমাদের আশু সঙ্কল্প তা নয় —কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তা হ'লে এই প্রমাণ হবে সমাজে পারিবারিক যুগ সঙ্কীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা বশতই নবযুগের প্রসারতার মধ্যে আপনিই অন্তর্দ্ধান করেছে। যা হোক্, এ সম্বন্ধে তোমাদের কি মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে ?"

সেই য়ুক্রেনিয়ার যুবকটি বল্‌লে, "আমাদের নূতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেচে আমার নিজের দিক থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচেছিলেন শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাই বোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হ'ত না, এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশুবিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী-মেয়ে বল্‌লে, "শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি তা বাপ মা ভালো করে শিখতে পারচে।"

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে বল্‌লে, "কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই

বুঝি, তার জন্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগস্বীকার করতে আমরা রাজি। কবিকে জানাও, সোভিয়েট সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফৎ ভারতবাসীদের 'পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি যদি সম্ভব হ'ত আমার ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, "সে খিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, সে মস্কৌ এসেচে কলে কাপড় বোনার বিদ্যা শিখতে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে—বিপ্লবের পরে সেখানে একটি বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে সেইখানে সে কাজ করবে।"

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে, মাষ্টার মশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্য বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কৌ কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখেনি, ওদের মন গেছে বদ্‌লে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হ'ল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মত এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ করচে না, যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চ্চা বিভাগের উন্নতি ঘটেছে, তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে বীজ বাছাইয়ের কোন চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মন বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষিকলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্চে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান, উজবেকিস্থান, জর্জ্জিয়া, য়ুক্রেন, প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড় সর্ব্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্য্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারিনি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে law and Order-এর আবহাওয়ায় মানুষ, সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি। এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেচে। চোখে দেখলুম—এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণ-বিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্ব্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেচে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশবিদেশের কাছে তার রটনা চল্‌চে; ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে-কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই-ই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১লা অক্টোবর, ১৯৩০।

[শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীসকে লিখিত]

বিজ্ঞানের নূতন রূপকথা

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

প্রচলিত কথা হইতে বিভিন্ন কোন নূতন কথা যখনই বিজ্ঞান বলিতে গিয়াছে, তখনই জনসাধারণ উহাকে রূপকথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা বরাবরই দেখা যায়; অবশ্য কালের প্রবাহে এই রূপ-কথাই শেষে অপরূপ সত্য কথা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তবে গ্যালিলিওর যুগে নূতন কথা বলার জন্য বক্তাকে নির্যাতিত হইতে হইত,—পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতেও,আর এখনকার কালে জনসাধারণ যাহাই বলুন না কেন, বৈজ্ঞানিক মহলে তাহার রীতিমত যাচাই চলিতে থাকে। সেকালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া আকাশে নূতন ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে যখন নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন তাঁহারা সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না, পাছে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য তাঁহাদের চিরদিনের পোষিত ধারণাকে আঘাত দেয়; কিন্তু একালে জার্ম্মানি হইতে আইনষ্টাইন যখন তাঁহার নূতন আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন ইংলণ্ডের এডিংটন পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়া গেলেন, অথচ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির মধ্যে তখন তুমুল সংগ্রাম।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে, প্রাকৃতিক ঘটনাকে একেবারে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই তত্ত্ব কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যাহা পরীক্ষায় সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, কয়েকটি অমীমাংসিত ব্যাপার ছিল এই তত্ত্ব তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। দেশকাল সম্বন্ধে মানবের পূর্ব্বধারণার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া—ঐ অরূপ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব নূতন রূপ কল্পনা করিয়া—নূতন করিয়া গতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছে। এই গতিশাস্ত্র হইতে এমন সব ব্যাপার দাঁড়ায়, যাহা জনসাধারণের নিকট শুধু দুর্জ্ঞেয় নয়, একেবারে প্রহেলিকা, রূপকথা।

এক ফুট লম্বা একটা লাঠি সাম্‌নে পড়িয়া আছে, তুমি বলিবে এক ফুট, আমি বলিব এক ফুট, যে-কেহ দেখিবে বলিবে এক ফুট, এই তো সোজাসুজি কথা। কিন্তু আইনষ্টাইনের তত্ত্ব হইতে এই দাঁড়ায় যে, এরোপ্লেনে উড়িয়া যাইতে যাইতে যদি তুমি এই লাঠিটা দেখ তো আর তোমার নিকট উহা এক ফুট বলিয়া বোধ হইবে না এবং যত জোরে তুমি চলিয়া যাইবে তত ছোট বলিয়া উহা মনে হইবে; আমি অবশ্য বরাবরই এক ফুট দেখিতে থাকিব এবং এরোপ্লেন হইতে নামিয়া আসিয়া যদি তুমি দেখ, তাহা হইলে তোমার নিকটও উহা সেই এক ফুট বলিয়াই মনে হইবে। আলোর বেগ হইল প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল; তোমার এরোপ্লেনের গতি যদি আলোর বেগের সমান হয় তাহা হইলে এই লাঠিটা হইবে শূন্য, উহা একেবারে মিলাইয়া যাইবে। আর আইনষ্টাইন বলেন যে, আলোর অপেক্ষা অধিক গতিসম্পন্ন কিছু হইতে পারে না। গতি কত হইলে উহা কি পরিমাণ ছোট হইবে আইনষ্টাইন অঙ্ক কষিয়া ঠিক করিলেন। তোমার এরোপ্লেন, মনে কর, সেকেণ্ডে ১,৬১,০০০ মাইল বেগে চলিতেছে এবং এরোপ্লেন যেদিকে চলিতেছে তুমি সেইদিকে লম্বা হইয়া সটান শুইয়া আছ। পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া যদি নিমেষের মধ্যে তোমাকে দেখা সম্ভব হয় তো দেখিব তুমি লম্বায় ছয় ফুটের জায়গায় তিন ফুট হইয়া গিয়াছ, কিন্তু চওড়ায় যেমন তেমনি আছ—অপরূপ চেহারা! তুমি কিন্তু বলিবে সাম্‌নে আয়না রাখিয়া আমি তো বরাবরই দেখিয়াছি কই, চেহারার তো কোন বৈপরীত্য ঘটে নাই; তামা তুলসী গঙ্গাজল লইয়া জোর গলায় তুমি এই কথা বলিবে, আমিও তেমনি গলায় বলিব যে, আমি দেখিয়াছি তুমি থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছ; এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইবে না, কারণ কেহই ভুল দেখি নাই; এ ধাঁধা বা মরীচিকা নয়; যে যাহা দেখিয়াছে ঠিকই দেখিয়াছে এবং এ রকম দেখিতেই হইবে। আর তুমি এরোপ্লেন হইতে আমাকে এবং পৃথিবীর লোককে কি রকম দেখিবে? তুমি যেদিকে

চলিয়াছ সেইদিকে যদি মুখ বা পিছন করিয়া আমরা দাঁড়াইয়া থাকি তো তুমি দেখিবে আমরা খাড়াইএ, চওড়ায় ঠিক আছি, তবে একেবারে চেপটা হইয়া গিয়াছি, পেটে পিঠে প্রায় ঠেকিয়া গিয়াছে।

সময়ের দিক দিয়াও আমরা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সব দেখিব। পৃথিবী হইতে দেখিব এরোপ্লেন মধ্যে তোমার নড়াচড়ার গতিবিধি খুব ঢিমেচালে চলিতেছে—বেড়াইতেছ টুকটুক্ করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে, হাই তুলিতে হাঁ করিয়া আছ তো আছই, মুখের বিড়ি শেষই আর হয় না। অবশ্য তুমি বলিবে—আরে, আমি যে তোমাদের সম্বন্ধে অবিকল ঐ রকমই দেখিতেছি। সময়ের দিক দিয়াও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব হইতে এমন সব মজার মজার কথা আসিয়া পড়ে যাহা শুনিতে একেবারে রূপকথা ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না। মনে কর,একখানা এরোপ্লেন করিয়া বহুদিনের জন্য খাবার জিনিষপত্র লইয়া শূন্যপথে তুমি যাত্রা করিলে; তোমার এরোপ্লেন যাইবে আলোর বেগ অপেক্ষা কিছু কম বেগে; ঘড়ি তোমার সঙ্গে আছে। তোমার ঘড়ির পাঁচ বৎসর কাল অবধি সটান চলিয়া বাড়ীমুখে রওনা হইলে এবং দশ বৎসর পরে এই পৃথিবীতে তোমার বাসস্থানে ফিরিলে। যাত্রার সময় তোমার এই অভিযান লইয়া কাগজে খুব সরগরম পড়িয়া গিয়াছিল, তুমি ভাবিয়াছিলে ফিরিবা-মাত্রই টাউন হলে তোমাকে এক বিরাট সভায় এক প্রকাণ্ড অভিবাদন দেওয়া হইবে, খবরের কাগজের পাতাগুলা তোমার আগমন-বার্ত্তায় ভরিয়া যাইবে; কিন্তু হরি, হরি, এ কি! ফিরিয়া দেখিলে কেহ তোমাকে চেনে না; তুমিও কাহাকেও চেন না, তোমার যাত্রার কথা কাহারও মনে পড়ে না; লোকজনের রীতিনীতি, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সব বদলাইয়া গিয়াছে; বহুকষ্টে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দরজায় যে বৃদ্ধটিকে দেখিলে পরিচয়ে জানিলে সে তোমার পৌত্র। বাড়ীতে ক্যালেণ্ডার দেখিলে এটা ২০৩০ সাল, তোমার দশ বৎসরে পৃথিবীতে ১০০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

এরোপ্লেনের গতি আলোর অপেক্ষা কম না হইয়া যদি আলোর সমান হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত দাঁড়ায়। ধর, দুই যমজ ভাই, প্রত্যেকেরই বয়স ২০ বৎসর; একজন এরোপ্লেনে আলোর সমান গতিতে যাত্রা করিল। পৃথিবীর সময়ের পঞ্চাশ বৎসর পরে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ভাই এখন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ; কিন্তু সে নিজে যে কুড়ি সেই কুড়িতেই রহিয়া গিয়াছে; দেহে, প্রাণে, সে যে নবীন ছিল, সেই নবীনই আছে; সময় যে চলিয়া গিয়াছে সে জানিতেও পারে নাই, তাহার নাড়ী টিক্‌টিক্ করে নাই, বুক দপদপ করে নাই, কাল তাহার নিকট এতটুকুও অগ্রসর হয় নাই। হে তরুণ, তুমি যদি চিরনবীন থাকিতে ইচ্ছা কর, যাত্রা কর একখানি এরোপ্লেন লইয়া, দেখিও এরোপ্লেনের গতি যেন সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হয়, তাহার পর পৃথিবীর সময়ের যতদিন ইচ্ছা ঘুরিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া এস, ৫০।৬০।৭০ বৎসর—তুমি সেই তরুণ—দেহে, মনে, প্রাণে; শুধু সাবধান, ফিরিয়া তোমার পূর্ব্ব তরুণীর সহিত আলাপ করিতে যাইও না, তিনি এখন পক্ককেশা, লোলচর্ম্মা, গলিত-দশনা বৃদ্ধা।

আধপোয়া রৌদ্র! কে একজন প্রণয়ী তাহার প্রণয়িনীর রূপ চাহিয়াছিল—এক সের চাঁদের আলোতে এক ছটাক 'তিলোত্তমা'র রঙ মিশাইয়া স্বর্ণকটাহে জ্বাল দিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইলে যাহা দাড়ায়। কিন্তু আইন-ষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে আধপোয়া রৌদ্র বলিলে আর বিশেষ দোষের কিছু হইবে না। আইনষ্টাইন দেখাইলেন শক্তি হইল পদার্থের রূপান্তরমাত্র, এবং কতখানি পদার্থ লোপ পাইলে কতখানি শক্তি পাওয়া যাইবে আইনষ্টাইন তাহাও কষিয়া দিলেন। অনেকে মনে করেন যে, সূর্য্য যে প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড তাপ দিতেছে তাহার কারণ সূর্য্য একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইতেছে এবং তাহার পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইতেছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এক মিনিটে সমস্ত পৃথিবী যে রৌদ্র-কিরণ পায় তাহা আধপোয়া সূর্য্য পদার্থ-ক্ষয়ের সমান। সুতরাং আধপোয়া সূর্য্যকিরণ কথাটা একেবারে অচল নয়।

আইনষ্টাইন বলেন, এই যে আকাশ (space) উহা সমাকার নয়—বক্রাকার—ফলে দাঁড়াইতেছে যে,

আকাশস্থিত কোন সরলরেখাকে আর ইউক্লিডের সরলরেখার সংজ্ঞা দিলে চলিবে না; ত্রিকোণের তিনটি কোণ আর ১৮০ ডিগ্রী নয়; বৃত্তের ব্যাসগুলি আর পরস্পর সমান নয়; সমান্তরাল সরলরেখাদ্বয় যে একেবারে মিলে না, তাহা নয়। 'দেশে'র সহিত 'কাল' জড়িত এবং 'ঘনমাত্রা' (mass) 'দেশ' ও 'কালে'র সহিত সংশ্লিষ্ট।

আইনষ্টাইনের আর এক কল্পনা হইল যে, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে পদার্থ-কল্পনা করিবার ধারা আইনষ্টাইন তত্ত্বে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—সেখানে 'দেশ' ও 'কাল' পৃথক নয়, একটার সহিত আর একটা জড়িত। যাহা হউক, তাঁহার মতে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নয়, কিন্তু ইহা অসীম। পাঠক সব বুঝিলেন তো? মানব এতদিন যেরূপ চিন্তার ধারায় অভ্যস্ত ছিল সব একেবারে ওলট-পালট খাইয়া গেল।

কিন্তু এসব কথা যে রূপকথা নয়, ইহা যে বৈজ্ঞানিক সত্য তাহার প্রমাণ কিছু আছে কি? অবশ্য আছে, তবে এ সবের প্রত্যক্ষ (direct) প্রমাণ তো কিছু থাকিতে পারে না, আনুমানিক (indirect) প্রমাণ আছে। আইনষ্টাইনের এই তত্ত্ব হইতে আরও কতকগুলি বিষয় আসে যাহা পরীক্ষায় যাচাই করা যায়। আইনষ্টাইনের আলোচনার একটা সিদ্ধান্ত এই যে, আলোকরশ্মিও মাধ্যাকর্ষণের হাত এড়াইতে পারে না। পৃথিবীর পাশ দিয়া যে আলোকরশ্মিটা যাইতেছে পৃথিবী উহাকে টানিতেছে তবে এই টান্‌টা এতই কম যে উহা পরীক্ষায় ধরা যায় না। আচ্ছা, পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য পদার্থ ধর—যাহা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী ভারী, যেখানকার আকর্ষণ এই পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক প্রবল, যেমন সূর্য্য। আইনষ্টাইন হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, কোন নক্ষত্র হইতে আলো যদি সূর্য্যের খুব কাছ দিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছায় তবে সূর্য্যের আকর্ষণ-দরুণ ঐ রশ্মির যে বাঁকটা হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় দুই সেকেণ্ড, এক ডিগ্রীর প্রায় দুই হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ; খুব কম হইলেও সূক্ষ্ম যন্ত্রে উহা ধরা পড়িতে পারে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রাসের সময় যখন সূর্য্যের আলো নক্ষত্রের আলোককে ঢাকিয়া দিতেছে না তখন নক্ষত্রের আলোকরশ্মি সূর্য্যের কাছ দিয়া আসিতে বাঁকিয়াছে কি-না ইহা বার-বার পরীক্ষিত হইয়াছে; দেখা গিয়াছে উহা বাঁকিয়াছে এবং আইনষ্টাইন যতটা বলিয়াছিলেন ঠিক ততটাই বাঁকিয়াছে। আর একটা ব্যাপার; নিউটনের গতিশাস্ত্র অনুসারে বুধগ্রহের যে পথে চলা উচিত বরাবর দেখা যাইতেছিল উহা অবিকল সেই পথে চলে না, একটু ব্যতিক্রম হয়; ইহার কারণ কিছু পাওয়া যায় নাই। আইনষ্টাইনের হিসাবে এ গরমিল আর নাই। আরও দু-একটা বিষয়ে আইনষ্টাইনের তত্ত্বের ফলাফল পরীক্ষায় যাচাই হইয়াছে এবং এই তত্ত্ব দৃঢ়রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই তত্ত্বের ফলাফলের যে-সব কথা রূপকথা বলিয়া মনে হয়, তাহা শুধু এইটাই প্রমাণ করে যে অনেক সময় রূপকথা অপেক্ষা সত্যকথা অধিক বিস্ময়কর।
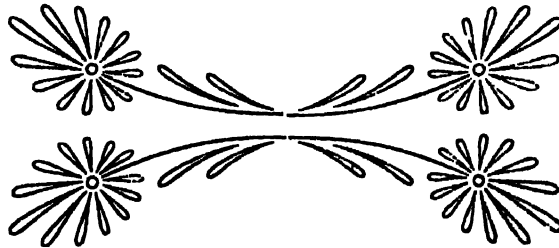
চীনযুদ্ধে দফাদার হরিনারায়ণ বসু

ডাক্তার পান্নালাল দাস, জয়পুর, রাজপুতানা

১৯০১ সালের চীনযুদ্ধে পুরস্কৃত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বসু মহাশয় এখনও ৭৩ বৎসর বয়সে রাজপুরে (দেরাদুন) স্ব-অর্জ্জিত বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

১৮৫৭ সালের ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইঁহার পিতা ৺সূর্য্যকুমার বসু ঝাঁসি জিলায় ডাক-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ডাক লুণ্ঠন ও ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রাণবধ করিবার ষড়যন্ত্র করে। তিনি তাহা অবগত হইয়া সপরিবারে আসন্নপ্রসবা স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে (শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) লইয়া রাত্রিযোগে প্রাণভয়ে গোপনে ঝাঁসি পরিত্যাগ করেন। তখন সহর ছাড়া চতুর্দ্দিকই দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি দাতিয়া ও ওরাই জিলার মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলপথ দুরতিক্রম্য হইলেও নিরাপদ ভাবিয়া সেই পথই অবলম্বন করিলেন। সপ্তাহকাল এই অরণ্যপথ অতিক্রম করিবার পর হরিনারায়ণ বাবুর মাতার গর্ভযন্ত্রণা অনুভূত হওয়ায়, তাঁহারা সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হন। অল্পক্ষণেই তিনি ওরাই জেলার বনে লোকাবাস হইতে বহুদূরে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন (৮ই নভেম্বর, ১৮৫৭ সাল)। নব-প্রসূত এই বালকটি আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক। জনমানবশূন্য বনে যদিও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা পাইলেন কিন্তু তাহা হইতে ভীষণতর লুণ্ঠকদিগের কবল হইতে নিস্তার পাইলেন না। ভূমিষ্ঠ হইবার দুই দিন পরে কয়েক জন লুণ্ঠনকারী সৈন্য এই জঙ্গলপথ দিয়াই যাইতেছিল, তাহারা গোযান দেখিয়া এই অসহায় বিপদগ্রস্ত পরিবারের সন্ধান পাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া প্রাণমাত্র ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। অদৃষ্টের এই ভীষণ তাড়নাতেও স্থিরমতি সূর্য্যকুমার বাবু, নিরাপদ ভাবিয়া যে জঙ্গলের আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া, কানপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং নভেম্বর মাসের শেষভাগে অতিকষ্টে কানপুর পঁহুছিয়া এলাহাবাদে আসিলেন। বিদ্রোহ উপশমিত হইল, সূর্য্যকুমার বাবু তথায় একটি বসতবাটি ও কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু কালের কুটিল গতির প্রভাবে দুইটি শিশু পুত্র বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন।

হরিনারায়ণ বাবুর বয়স তখন একবৎসর মাত্র। মাতা মাতঙ্গিনী বিবধ অসুবিধা ও কষ্টে পড়িয়াও সময়োপযুক্ত শিক্ষার জন্য, যখন হারনারায়ণ বাবুর বয়স ৫ বৎসর, তখন তাহাকে নিকটস্থ এক বাংলা পাঠশালায় এবং ১০ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণকে বাঙ্গালীদের স্কুলে পাঠাইলেন। দুই ভ্রাতা সকালে বাংলা ইংরাজী পড়িয়া বিকালে মাদ্রাসায় উর্দ্দু শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে উভয় ভ্রাতাই বাংলা স্কুল ছাড়িয়া কাটরা মিশন হাই স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১১ বৎসর বয়সে হরিনারায়ণ চার্চ্চ মিশন স্কুলে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজাঞ্চীখানায় শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হইলেন। চার্চ্চ মিশন স্কুলটি তখন বর্ত্তমান কায়স্থ পাঠশালার নিকট ছিল। ১৮৭৫ সালে এখান হইতে হরিনারায়ণ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে মাতুলালয় গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে কলেজে পড়িবার জন্য পাঠান, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি পাঠ ত্যাগ করেন, এবং কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে না হয় এই উদ্দেশ্যে মাতুল মহাশয়কে একটি কর্ম্ম জোগাড় করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ৩০ ত্রিশ টাকা বেতনে অধস্তন শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন (১৮৭৮ সাল)। অল্প দিনেই কিন্তু শিক্ষা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন-

পেশা শিখিবার জন্য কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতে ভর্ত্তি হন। নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়া ১৮৮৩ অব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাধীন জীবিকা-উপার্জ্জনকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কেবল কি করিয়া বাঙ্গালীর দুর্লভ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারেন তজ্জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইল। হরিনারায়ণ বাবুর এইরূপ মানসিক চঞ্চলতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও মাতুল তাঁহাকে কলিকাতায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও এই সময় বিবাহ হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তিনি মাতুলাশ্রয়ে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর গেলেন। কিন্তু কিছু দিন পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি এলাহাবাদে যান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরোগ্য লাভ করিলে মিরাটে বদলী হইলেন এবং সেই সঙ্গে হরিনায়ণ বাবু অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত মিরাটে আসেন এবং কিরূপে সৈন্যদলে যোগদান করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিত পারেন তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৮৫ সালে সৌভাগ্যক্রমে মিরাট জেলার প্রধান সেনানায়কের অফিসে ৩০ ত্রিশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় কেরাণীর পদ লাভ করিলেন। ইহার কিছুকাল পর, ১৮৮৬ সালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার উপর সমস্ত সংসারের ভার পড়িল। ১৮৮৮ সালে তাঁহার কার্য্যকুশলতায় তিনি বড়বাবু অর্থাৎ প্রধান কেরাণীর পদে উন্নীত হইলেন। তদানীন্তন ষ্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন রবার্ট দেশী অশ্বারোহী পল্টনের নায়ক ছিলেন। হরিনারায়ণ বাবুর কার্য্যপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহাকে সুস্থ সবলকায় দেখিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি সৈনিকদলে সৈনিকরূপে ভর্ত্তি হইতে চাও ?" এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, ভগবান তাঁহার মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এত দিনে পূর্ণ করিবার জন্য এই প্রশ্ন ক্যাপ্টেন রবার্টের দ্বারা উত্থাপিত করিয়াছেন। পরমেশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কাপ্তেন সাহেবকে আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এক সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহার নাম কেরাণী হইতে সৈনিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার সৈন্যদলে সন্নিবিষ্ট হইলেন। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার সময় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একটু কৌশল অবলম্বন করিয়া নাম ধাম কিছু অজ্ঞাত রাখিতে হইয়াছিল। কারণ খাঁটি বাঙ্গালী যোদ্ধারূপে ভর্ত্তি হওয়া তখন একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তিনি সৈন্যদলে, মৈনপুরী জিলা অধিবাসী রাজপুত হরনারায়ণ সিং হইলেন। এবার তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল। সৈনিকদলে তাঁহার সংখ্যা হইল ১১৩৭। অন্ততঃ তিন বৎসর কার্য্য করিতে হইবে এবং ভারতে বা ভারতের বাহিরে যেখানে সৈন্যদল যাইবে সেইখানেই যাইতে হইবে এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইল। অতঃপর হরিনারায়ণ বাবুর নিজের ভাষাতেই তাঁহার চীন যাত্রার বৃত্তান্ত দিতেছি।

১৯০০ খৃঃ যখন চীনদেশে অশান্তি উপস্থিত হয় তখন আমাদের সৈন্যদলকে চীন-অভিযান ফৌজের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। যুদ্ধক্ষেত্র দেখিবার যে আমার সাধ ছিল তাহা এতদিনে পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিয়া ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ডাক্তারী পরীক্ষায় যোগ্য সাব্যস্ত হইয়া আমি কোমর বাঁধিলাম। আমার বৃদ্ধা মাতা ও পরিবারবর্গ এই সংবাদ পাইয়া মহা অনর্থ বাধাইলেন। যুদ্ধযাত্রায় নিরস্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু আমার স্থির প্রতিজ্ঞা হইতে কেহই আমাকে টলাইতে পারিলেন না। অনেক প্রবোধ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলাম। ১লা জুলাই লক্ষ্ণৌ হইতে রেলযোগে কলিকাতা পঁহুছিয়া ৩রা জুলাই খিদিরপুর ডকে জাহাজে আরোহণ করিলাম। চারিখানি জাহাজ আমাদের রেজিমেণ্টকে লইয়া রওনা হইল। ১০ই জুলাই বৈকালে চারটার সময় জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দর ছাড়িয়া মাকাও বন্দরের কাছাকাছি আসিলে, হংকংস্থ ব্রিটিশ পাইলট বোট হইতে বিপদসূচক সঙ্কেত পাইয়া জাহাজকে আবার নোঙ্গর করিতে হইল। চীনারা তথাকার সমুদ্রে ডাইনামাইট ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। ব্রিটিশ পাইলট-বোট যখন ডাইনামাইটগুলির তার কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিল তখন আবার জাহাজ অগ্রসর হইল, এবং হংকং

বন্দরে ১৩ই জুলাই প্রাতে পঁহুছিল। পঁহুছিবামাত্র তথাকার ব্রিগেড-মেজর আমাদের জাহাজকে ওয়েই-হাই-ওয়েই নামক বন্দরে —যেখানে আমাদের পূর্ব্বগামী জাহাজ তিনখানি অপেক্ষা করিতেছিল—যাইতে আদেশ দিলেন। ১৮ই জুলাই তথায় পঁহুছিলে টাকু দুর্গ অভিমুখে অতি সাবধানের সহিত অগ্রসর হইবার হুকুম হইল। চিলি উপসাগরে পঁহুছিলে আমাদের জাহাজের মাস্তলের একটি রজ্জু ঢিলা হইয়া পাটাতনে পড়িয়া যাওয়ায় জাহাজখানি ভাল চলিতেছিল না, তাই এক নাবিক-বালক দড়িটি লইয়া ৭০ ফুট উঁচু মাস্তলের আগায় বাঁধিবার জন্য চড়িতে চড়িতে হঠাৎ হাত ফস্‌কাইয়া একেবারে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া আমাদের চক্ষের অগোচর হইয়া গেল। জাহাজের কাপ্তেন তখনই জাহাজখানি দাঁড় করাইয়া তিনখানি লাইফ-বোট নামাইয়া দিলেন এবং বালকটিকে সমুদ্র-কবল হইতে উদ্ধার করাইলেন। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইলাম যে. বালকটি কোন রূপ ভীত বা ব্যথিত না হইয়া সহাস্যমুখে জাহাজে উঠিল। টাকু দুর্গের নিকট পঁহুছিলে আমরা কামান দাগার শব্দ শুনিতে পাইলাম। ২০শে জুলাই তথায় পঁহুছিয়া আমাদের পূর্ব্বগামী তিনখানি জাহাজকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা কামানের গোলার লক্ষ্য হইতে তফাৎ থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল। আমাদের জাহাজ কয়েকখানি ও অন্যান্য শক্তির জাহাজগুলি এইরূপে এক পক্ষ কাল নিশ্চেষ্ট হইয়া আবদ্ধ রহিল। রুষিয়া ও জাপান শক্তিদ্বয় পাওটিং হইতে যুগপৎ আক্রমণ করিয়া চীনাদিগকে পরাভূত করিয়া টাকু দুর্গ দখল করিলে ৬ই আগষ্ট সাঙ্কেতিক বার্ত্তা পাইয়া আমাদের জাহাজগুলি নিরাপদে টাকু দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। ৮ই আগষ্ট প্রাতে টাকু বন্দরে পঁহুছিল। মধ্যাহ্নে আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া সেদিন সেখানেই বিশ্রাম লইয়া ৯ই আগষ্ট বেলা ১১টার সময় পাঁচখানি খোলা রুশীয় রেলগাড়ীতে সওয়ার হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় টিনসিন পঁহুছিলাম। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন, ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া চার মাইল দূরস্থ শিবির স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উর্দ্দি ও সঙ্গের সমস্তই ভিজিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে তখনই আমাদের ছোট ছোলদারী খাড়া করিতে আজ্ঞা পাইলাম। ছোলদারীটির মাপ ছিল ৬ ফুট×৪ ফুট×৪ ফুট। কেবল দুই জন সৈনিক মায় সরঞ্জাম থাকিতে পারে। আমাদের ঘোড়া দুটি ছোলদারীর সামনে ও ভারবাহী খচ্চরটি পিছনে বাঁধিয়া সব গুছাইয়া লইবামাত্র ঘোড়া পরিচর্য্যার ভেরী বাজিল। আমরা নিজেরাই ঘোড়ার সেবা করিতে নিযুক্ত হইলাম। দুই ঘোড়ার একটি সহিস। সে এখন খচ্চরটির সেবায় নিযুক্ত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই দানা ঘাস দিবার সঙ্কেত হইল। ভিজা কাপড়েই সব কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর আমরা বিশ্রামের অনুমতি পাইলাম।

মাথার পাগ্‌ড়ী, পায়ের বুট ও ভিজা কাপড় ছাড়িয়া একটু আরাম পাইলাম এবং বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানিক পরে বৃষ্টি থামিলে আমরা বাহিরে আসিয়া সেই আদ্র জমির উপর রসুইএর বন্দোবস্ত করিবার উদ্যোগ করিলাম। আমার সঙ্গী রাজপুত সৈনিকটি উনুন তৈরি করিয়া কাপড়েই আটা মাখিয়া ত্রিশটি আটার গুলি লিপ্‌টিয়া বা বাটি সেঁকিয়া লইল। আমরা তিন জনে, ২জন সৈনিক ও একজন সহিস, সেগুলি ভাগ করিয়া ঘি নুন ও লঙ্কা দিয়া খাইতে লাগিলাম। আমি কোন ক্রমে চারটি মাত্র গলাধঃকরণ করিয়া বাকি ছয়টি ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য থলেতে রাখিয়া দিয়া, কাঠে মাথা রাখিয়া সে রাত্রির জন্য নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলাম। প্রাতে নয়টার সময় হুকুম আসিল, বেঙ্গল ল্যান্সার সৈন্যদের সাতটী দলকে ১৬০ মাইল দূরস্থ য়্যাংচ্যাং যাইতে হইবে এবং অষ্টম দলটিকে ৮ মাইল দূরস্থ পেইচ্যাং নামক স্থানে যাইতে হইবে। এই অষ্টম দলে আমি ছিলাম। ১০ই আগষ্ট, ১৯০০ সাল, প্রাতে চারটার সময় পেইচাংস্থিত চীনা-সৈন্যাবাস আক্রমণ করিতে আমরা আদিষ্ট হইলাম। আমাদের দলটির ৯০ জন সৈন্যের ভিতর ১২ জন অশ্বারোহী, বিপক্ষদের সৈন্য-সংখ্যা সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির অনুসন্ধান লইবার জন্য আগেই রওনা হইল। বাকি সৈন্য কিছু পরে চলিল এবং ২০ মাইল পথ অতিক্রম

করিবার পর অগ্রগামী সৈন্যদের নিকট খবর পাওয়া গেল যে, আমাদের বিপক্ষ সৈন্যদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত, তাহারা দশবারটা পুরান ধরণের কামান এবং বর্শা ছোরা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত। তাহাদের সঙ্গে বারটা ঘোড়া ও ১২০ খচ্চর আছে।

পথমধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইলাম। কেননা পঁহুছিবামাত্র শত্রুশিবির আক্রমণ করিতে হইবে। সন্ধ্যা ৬টার সময় পাঁচ মাইল দূরে এক বাগানে কুচ করিলাম এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করিবার পর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইলাম। অনতিবিলম্বে খবর আসিল যে, বিপক্ষ সৈন্য পরিখা (ট্রেঞ্চ) মধ্যে আহারাদি করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং পরিখাসন্নিবিষ্ট প্রহরীরাও কর্ত্তব্য কর্ম্মে কিছু অমনোযোগী হইয়াছে। আমরা অশ্বারোহণ করিয়া সাবধানে দু তিন মাইল অতিক্রম করিলে শত্রুশিবির দৃষ্টিগোচর হইল। তখন রাত্রি নয়টা। আমাদের নায়ক তীরবেগে অশ্ব চালাইয়া শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে হুকুম দিলেন। আজ্ঞামাত্রই আমরা ভীমবেগে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলাম। তাহারা অপ্রস্তুত থাকিলেও অসমসাহসিকতার সহিত চার পাঁচ ঘণ্টা লড়াই করিয়া পরাভূত হইল। কতক মরিল, কতক জখম হইল, কতক পলাইল এবং ২০জন আমাদের বন্দী হইল। বারটি কামান, ১৫০ বন্দুক এবং দশটি রাইফল এবং সমস্ত সরঞ্জাম আমাদের দখলে আসিল। এই যুদ্ধে আমি বাম পদে আহত হইয়াছিলাম ; কিন্তু উৎসাহাধিক্যে কিছু কষ্ট কিয়ৎকাল অনুভব করিতে পারি নাই।

কয়েক ঘণ্টা পর যখন টিন্‌সিন শিবিরস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সঙ্গীদের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলাম তখন এক জন সৈনিক আমার আহত পদ ও রক্তাক্ত পটি প্রভৃতির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিল। আমাদের নেতাদের আজ্ঞায় আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা হইল। তখন আমার মাথা ঘুরিয়া আসিল। তিনি ডুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে টিনসিন হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন ১২ই আগষ্ট, ১৯০০ সাল। যখন ভর্ত্তি হইলাম তখন বেলা তিনটা। হাসপাতালে নিয়মিতরূপ চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত ক্ষত বিষাক্ত হওয়াতে ভয়ানক প্রদাহ হইয়া জ্বর হইতে লাগিল। হাসপাতালে দেড়মাস চিকিৎসার পর আরোগ্য না হওয়াতে আমাকে ওয়েই-হাই-ওয়েই সাধারণ হাসপাতালে পাঠান হইল।

দফাদার হরিনারায়ণ বসু

১লা অক্টোবর যাত্রা করিয়া ৩রা তথায় পঁহুছিয়া ভর্ত্তি হইলে আমার রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। রোগী-সংখ্যাগুলি দেখিলাম সবই আহত সৈন্যবৃন্দে পূর্ণ। কয়েক দিন চিকিৎসার পর আমার জ্বর ছাড়িল ও ক্ষতও ভাল হইতে লাগিল ; কিন্তু সঙ্গীবিহীন ও নিষ্কর্ম্মা

থাকাতে মানসিক প্রফুল্লতা নষ্ট হইল। কর্ম্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা রোগীদের পথ্যাদি পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমাকে তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া জানিতে না পারায় আমার সহিত আলাপ করিবার কোন প্রয়াস করিলেন না দেখিয়া আমিই আলাপ করিতে উৎসুক হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এলাহাবাদনিবাসী কমিসারিয়েট-এর কর্ম্মচারী বাবু বামাচরণ ঘোষ নামক একটি ভদ্রলোককে চিনিতে পারায় আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি যে আহত, পীড়িত হইয়া হাসপাতালের রোগী হইয়া আছি তাহা ভুলিয়া গেলাম। বামাচরণ বাবু হাসপাতালের প্রধান পর্‌ভেয়ার ছিলেন। আমি এতদিন ধরিয়া রোগীর পথ্য, দুধ সাগু খাইতেছিলাম, পরদিন প্রাতে ডাক্তার আসিয়া আমার অবস্থার উন্নতি দেখিয়া পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া রুটি-ঝোলের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু আমাকে আর হাসপাতালের পথ্য খাইতে হইল না। বামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটস্থ বাসাতে আমায় মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বেলা বারটার সময় যখন বামাচরণ বাবুর লোক আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতে আসিলেন তখন যেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, লাফাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার সহিত চলিলাম। বাসায় পঁহুছিলে তিনি আমার পরিধেয় পরিবর্ত্তন আদি ও স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনেকদিন স্নান না করার পর আজ স্নান করিয়া যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম। খাবার ঘরে গিয়া দেখিলাম,দশখানি পাতায় বাঙ্গালী রুচি-সুলভ শাকচচ্চড়ি অম্ল নিরামিষ হইতে আমিষ বিবিধ ব্যঞ্জনের আযোজন হইয়াছে। বামাচরণ বাবু তাঁহার অন্যান্য বন্ধুর সহিত আমাকে সমাদরের সহিত খাইতে বসাইলেন। পাঁচ মাস পর এইরূপ উপাদেয় ভোজন পাইয়া আমি সমস্তই পরম পরিতোষের সহিত গলাধঃকরণ করিলাম। আহারান্তে বিশ্রামের সময় বামাচরণ বাবু আমার যুদ্ধে আসার ও আহত হওয়ার গল্প শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। হাসপাতাল বাস কালে তিনি প্রতিদিনই মধ্যাহ্ন ভোজন যাহাতে তাঁহার সহিত করি, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, এবং রাত্রির আহার হাসপাতালেই আমার কাছে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। আরও মাসাবধি আমাকে হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল; প্রত্যহ এইরূপ উপাদেয় খাদ্য খাইয়া আমার স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইল। টিনসিন হাসপাতাল হইতে যখন আমি আসি তখন আমার ওজন ছিল ১ মণ ১৭ সের, এখন সাড়ে তিন মাস পরে আমার ওজন হইল ১ মন ৩৬ সের, অর্থাৎ ১৯ সের ওজনে বাড়িয়াছিলাম। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি একদিন ডাক্তার সমস্ত রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ৬১ জনকে ছুটির উপযুক্ত সাব্যস্ত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার যুদ্ধক্ষেত্রে এবং কাহারাই বা দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। আমি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ২৩শে ডিসেম্বর কর্ম্মে যোগ দান করিলাম। ২৬শে তারিখ হুয়াংচুয়াংতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হইয়া ২রা জানুয়ারি, ১৯০ , যুদ্ধে লিপ্ত আমাদের রেজিমেণ্টের সহিত মিলিত হইলাম। হুয়াংচুয়াং টিনসিন্ হইতে ৭৫মাইল এবং পেকিং হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে স্থিত। ৩রা জানুয়ারি হুয়াংচুয়াং হইতে ১০ মাইল পশ্চাৎভাগে, অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট সৈন্যব্যূহের পৃষ্ঠদেশে যাইতে হইল। আমরা অত্যন্ত সাবধানে যাত্রা করিয়া ব্যূহপৃষ্ঠ ভুট্টাক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় খুঁজিয়া পাইলাম সেখানে দুইদিন আমাদিগকে প্রায় আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাটাইতে হইল। ছোলাভাজা ও বোতলের জলই আমাদের ক্ষুৎপিপাসা যৎকিঞ্চিৎ নিবারণ করিল। ৬ই জানুয়ারি রাত্রি এগারটার সময় আলোক-সঙ্কেতে আদিষ্ট হইয়া আমরা তৎক্ষণাৎ পিকিং অভিমুখে ধাবিত আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগদান করিতে চলিলাম। রাত্রি দেড়টার সময় ঐ সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হইলে আমাদের নেতা সকলকেই বুট জুতা খুলিয়া নাগরা জুতা পরিয়া সাবধানে ডবল মার্চ করিয়া পিকিনাভিমুখে চালিত করিলেন। ৭ই অতি প্রত্যূষে আমরা পিকিং চিহো গেটের সম্মুখস্থ টংচাও নামক স্থানে উপনীত হইলাম। একটি পরিখা (খাল) উত্তীর্ণ হইয়া পিকিং দুর্গের উন্নত প্রাচীর দেখিতে

পাইলাম। প্রাচীর এত উচ্চ যে, শীর্ষস্থ প্রহরীবর্গ তলদেশ হইতে মাত্র দুই ফুট পুত্তলিকা-শ্রেণীর মত দেখাইতেছিল। আমরা ধীরে প্রাচীরের সান্নুদেশে উপস্থিত হইয়া চিহো দরজার সাম্‌নে কিছুক্ষণ লুকাইয়া থাকিয়া অনতিদূরে তোপধ্বনি শুনিতে পাইলাম। উত্তরে জাপানী সৈন্য এবং এবং দক্ষিণ ভাগ হইতে জার্ম্মান সৈন্য কিল্লা আক্রমণ করিয়াছিল। আমাদের নেতা দুরবীন সহযোগে কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, চিহো ফটকের উপরিস্থ প্রহরীগণ উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতেই দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এবং সুযোগ বুঝিয়া একদল স্যাপার মাইনার সৈন্যকে রজ্জু-সোপানদ্বারা দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করাইয়া ভিতর দিক হইতে দুর্গদ্বার উন্মোচন করাইলেন। এইরূপে দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া আমাদের সৈন্যদল নিঃশব্দে দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গে পঁহুছিয়া দেখিলাম, দুর্গবাসী ভীত ত্রস্ত বিশৃঙ্খল এবং পলায়নোন্মুখ। শুনিলাম রাণীমাতা প্রধান মন্ত্রীর সহিত অর্দ্ধরাত্রে (৮ই জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে) প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আমাদের সৈন্যদল ৮ই জানুয়ারি প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় অনায়াসে প্রাসাদ ও ধনাগার দখল করিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় ইংরেজ-পতাকা রোপিত করিল। বহিঃস্থিত সমস্ত শক্তি গুলি—জাপান, রুষিয়া, জার্ম্মানি, ইটালী, আমেরিকা, ফ্রান্স—যাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সহসা প্রাসাদ-শীর্ষে ইংরেজ-পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিফলমনোরথ হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। ব্রিটিশ-বাহিনীর প্রথম বেঙ্গল ল্যান্‌সারদের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি দূরে স্থিত প্রধান সেনাপতিকে জানান হইলে তিনি এই ব্রিটিশ-জয় সমস্ত জগতে ঘোষণা করিয়া দিলেন।

এইরূপে দুর্গ অধিকৃত হইলে, প্রাসাদ, ধনাগার, সহর প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। সহরের একটি মাত্র দ্বার, অর্থাৎ চিহো গেট, যাতায়াতের জন্য খোলা রহিল, এবং পাশ বিনা কোন বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। আমাদের প্রথম ল্যান্সার্স সৈন্যদল চিহো গেটে পাহারায় নিযুক্ত হইল।

পিকিং অধিকৃত হইলে কিছুদিন লুটপাট চলিয়াছিল, কিন্তু শাসনের গুণে সকলকেই লুটের মাল ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল। জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ (১৯০১) পর্য্যন্ত তিনমাস আমরা পিকিং অধিকার করিয়া রহিলাম, পরে চীনে শান্তি ঘোষণা হইলে ২৫শে মার্চ্চ দুর্গ চীনের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া আমাদের পল্টন টিনসিন অভিমুখে চালিত হইল। ৩১শে মার্চ টিনসিন পঁহুছিয়া প্রায় দুইমাস তথায় কুচ করিয়া রহিলাম। তখন চতুর্দ্দিক হইতে বিভিন্ন শক্তির সৈন্যদল অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া আমাদের বিজয়ী প্রথম ল্যান্সার সৈন্যদের দেখিতে আসিতে লাগিল। একদিন একজন জার্ম্মান সৈনিককে বলিতে শুনিলাম, ইহাদের ঘোড়াগুলি ত গাধার মত এবং সওয়ারগুলি কাঠের পুতুলের মত দেখিতে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা কি প্রকারে শৌর্য্যবীর্য্যে এত খ্যাতি লাভ করিল!

এপ্রিল হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত আমদের পল্টন টিনসিনে থাকিয়া হংকং যাইতে আদিষ্ট হইল।

৫ই জুলাই নির্বিঘ্নে বেলা একটার সময় হংকং উপস্থিত হইলাম।

যখন আমাদের পল্টন পিকিং-এ অবস্থান করিতেছিল তখন ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ও আমার সঙ্গী চারজন নন্‌-কমিশনড্ অফিসার এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া জাপান বেড়াইতে যাই। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রি নয়টার সময় পিকিং পঁহুছি। দুর্গদ্বারে যখন পঁহুছিলাম তখন দেখিলাম দ্বাররক্ষী চার জন শান্ত্রী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আমাদের দেখিয়া কঠোর কণ্ঠে আমাদের পরিচয় চাহিল। "বন্ধু" এই পরিচয় দিলে মশালের আলো দিয়া আমাদের চিনিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে দিল। পনর মিনিট মধ্যে আমরা আমাদের সৈনিক-আবাসে পঁহুছিলাম। ইম্পীরিয়াল সিটির কাছে সৈনিক-আবাসের নিকট আর এক দল প্রহরী আমাদের গতিরোধ করিয়া সৈনিক-আবাসে প্রবেশের সাঙ্কেতিক কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে রাত্রের, অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০১র সাঙ্কেতিক কথা ছিল "কলিকাতা"। তাহা বলিয়া আমরা

মেয়েটি আবার পড়াতে মন দিলে। ট্রেন চলতে সুরু করেছিল, ক্রমেই তার বেগ বাড়তে লাগল। মেয়েটির আর কিছু দেখা যায় না, শুধু কপালটি আর চুল আঁচড়াবার সহজ ভঙ্গীটি। চুলটা ভাল করে আঁচড়াবার কোনো চেষ্টাই চোখে পড়ে না, সাম্‌নের দিকে টেনে খোপা বাধা। মেয়েটির মুখটিও যেমন মারহাট্টি মেয়েদের মত, চুলও সেই রকম টেনে বাধা। মুখের ভাবের নির্ভীকতাও ঠিক মারহাট্টি মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায়—মেয়েটি মারহাট্টিই নয় তো? মারহাট্টি হ'লে তো কথা কইবার··? কনক যা হিন্দী জানে তাতে তো কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করা চলে না। হাম্ তুম্ করে চাকরদের সঙ্গে কোনো রকমে কথা চালাতে পারা যায়। এই অবধি—তাও একটা কিছু কথা চাকরদের বোঝাতে হ'লে হিন্দী ভাষার চেয়ে হাত পা নাড়াই তার কাছে লাগে বেশী। মেয়েটি মারহাট্টি হ'লে তো ·? কিন্তু হ'লেই বা তার কি? কনক তো আর মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার অভিপ্রায়ে এখানে ওঠে নি। মারহাট্টি হোক্, হিন্দুস্থানী হোক্ তাতে কনকের কি? একটি অসহায় মেয়ে একলা যাচ্ছে, তাকে আগলাতেই এ গাড়ীতে আসা—মেয়েটির গোত্র বর্ণের খোঁজে তার দরকারই বা কি!

কিন্তু মন উস্‌খুস্ করে। কেবলি মনে হয় মেয়েটি কে? কি ওর দরকার! কোথায় যাবে? একলা কেন যাচ্ছে? যে বাড়ীতে যাচ্ছে কে আছে সেখানে?

কথাই-বা বলা যায় কি করে? কেবল কপালটির দিকে তাকিয়েই যে সময় চলে গেল—কে জানে কোন্ ষ্টেশনে কখন নেমে পড়বে হঠাৎ। কিছুই জানা হবে না। কিন্তু কি বলা যায়? "জানলাটা খুলে দেব কি?" আর "পাখাটা বন্ধ করে দেব কি না" এই দুটি মাত্র সম্ভবপর প্রশ্ন কনকের মনে এলো, তার মধ্যে কোন্‌টা বলা যায়? মেয়েটি যে-বেঞ্চিতে বসেছিল সে দিকের দু'টা জানলা বন্ধ ছিল. কিন্তু বাইরে যা রোদ, গরম হাওয়াও বোধ হয় চলছে—জানলা খুলতে যাওয়াটা কি ঠিক সময়োপযোগী হবে? কিন্তু 'পাখাটা বন্ধ করব কি না' যে জিগেসই করা যায় না। এই দুপুর রোদ, আগুন গরম। মনে হচ্ছে আরও দুটো পাখা থাক্‌লে সে দুটোও খুলে দিতে পারলে ভাল হ'ত। এমন সময়ে পাখা বন্ধ করব কি না জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি তাকে আস্ত পাগল ভাববে যে। তাহ'লে ঐ একটি প্রশ্নই বাকি রইল, 'জানলাটা খুলে দেব কি?' ও ছাড়া আর উপায় নেই। কনক প্রশ্নটা মুখে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এমনও বিপদ! কত বড় বড় জটিল প্রশ্ন এ জীবনে কনক কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু এই অত্যন্ত একটা মামুলি কথা 'জানলাটা খুলে দেব কি' এইটে আর গলা দিয়ে সহজভাবে বেরোতেই চায় না। কনক নড়েচড়ে বসল, মাথার চুলটা হাত দিয়ে টেনে টেনে পেছন দিকে চালিয়ে দিল, কোটের সাম্‌নের দিকটা ধরে টেনে সোজা করে দিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন যেন অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠল, 'জানলাটা খুলে দেব কি?'

মেয়েটি চম্‌কে উঠল। প্রশ্নটা হয়ত ভাল করে বুঝতেই পারে নি। নিজের উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নেবার অভিপ্রায়ে কনক বিনীত স্বরে বলল, 'আপনার দিকের জানলা দুটো বন্ধ রয়েছে, হয়ত গরমে আপনার কষ্ট হচ্ছে। কোনোটা খুলে দেব কি?' মেয়েটি অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিল, 'হ্যা বেশ তো, দিন না।' কনক খুশী হয়ে দুটো জানলা খুলে দিয়ে স্বস্থানে এসে বসল। মেয়েটি মৃদুস্বরে ধন্যবাদ দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলে। আবার সব চুপচাপ। কনক হতাশ হয়ে পড়ল, আর তো কথা চালাবার কোনো পথই নেই। জানলাটা শুধু খুলে দিয়ে কি-ই বা হ'ল? মেয়েটি বাঙালী, বাংলা জানে ও সহজভাবে বাংলায় উত্তর দেয়, এ ছাড়া, আর তো কিছুই জানা গেল না। তার যে আরও কত কি জান্‌বার ছিল।

ট্রেনটা একটা ঝাঁকানি দিলে। মেয়েটির হাত থেকে কাগজখানা ছটকে নীচে পড়ে গেল। কনক শশব্যস্তে সেটা তুলে নিতেই মেয়েটি মৃদু হেসে বললে 'ধন্যবাদ।' কনক বইখানি মেয়েটির হাতেই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেখলে বড় ধুলো লেগে গেছে, ঝেড়ে তবে তো দেওয়া উচিত। নিজের রুমাল বের করে ঝাড়তে

ঝাড়তে চোখে পড়ল যে পাতায় উপুড় হয়ে বইটা পড়েছিল, সেটা হ'ল একটা গল্পের আরম্ভের পৃষ্ঠা ; গল্পের শিরোনামা 'ট্রেনের পথে,' আর নীচে লেখকের নাম 'শ্রীকনক দাস।'

আরে, এ যে তার নিজেরই নাম! চট করে মেয়েটির সঙ্গে কথা চালাবার একটা উপায় মনে এল।

বইখানা মেয়েটিকে ফেরৎ দিতে দিতে কনক মৃদু হেসে বললেন, 'কি পড়ছিলেন ট্রেনের পথে?' মেয়েটিও ভদ্রতাসূচক অল্প হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কেন নিজের রুমাল দিয়ে ধুলো ঝাড়তে গেলেন? আপনার রুমাল নিশ্চয় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়ীর নীচেটা যা হয়ে রয়েছে ধুলোয় ধুলোয়।'

কনক সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'নিজের লেখা কেউ পড়ছে, এর আগে কোনোদিন দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তাই আপনি গল্পটা এত মন দিয়ে পড়ছেন দেখে বেশ নতুন রকম মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি সোজা হয়ে বসল—কথাটা বোধ করি বা বুঝতে তার দেরি হ'ল ; একবার মাসিক পত্রখানার দিকে তাকাল, আবার কনকের মুখের দিকে তাকাল। বলল, "ট্রেনের পথে' গল্পটা বুঝি আপনার লেখা? আপনি বুঝি একজন বড় লেখক?" কনক উত্তর দিল, 'লিখলেই যখন লেখক হওয়া যায়, তখন সে নামটা এড়াই কি করে? কিন্তু বড় কি ছোট সে বিচারের ভার তো আপনাদেরই হাতে। তবে গল্পটা আপনি যখন মন দিয়ে পড়ছেন, তখন নিজেকে ভাগ্যবান বলেই তো মনে হচ্ছে।' মেয়েটি একটু কৌতূহলের সুরে বললে, 'হ্যাঁ, গল্পটার প্লটটা বেশ নতুন ধরণের। এ ধরণের গল্প তো আমাদের বাংলায় বেশী দেখি না, বরং ইংরেজী ম্যাগাজিনে দেখা-টেখা যায়। তা আপনি এ প্লট পেলেন কোথায়? নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন না কি?'

গল্পটার প্লট নিয়ে কথা চালাবার ইচ্ছা কনকের মোটেই ছিল না। কি যে তার প্লট, আর কি বা তার নূতনত্ব, যা নাকি ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতায় ছাড়া দেখবার জো-ই নেই, তা তার একেবারেই অজানা! কথা কইতে গিয়ে একটা বিপদ ঘটাক্ আর কি! তবু উত্তর তো একটা দিতে হয়! সংক্ষেপে সে বললে, 'কতকটা বটে।'

মেয়েটি ছাড়ে না। আবার সেই কথাই। বলল, 'কিন্তু এ-রকম অভিজ্ঞতা তো আমাদের দেশে হওয়া শক্ত। মেয়েটির যা চিত্র দিয়েছেন আপনি, এ-যেন ইংরেজ মেয়ে ব'লে মনে হয় ; বাঙালীর ঘরের মেয়ে ঠিক এ রকম তো প্রায় দেখা যায় না। কা'কে দেখে লিখেছেন বলুন তো!'

ভাল-রে-ভাল! কে এক কনক দাস এক বাঙালীর মেয়েকে মেম সায়েবের মত ক'রে খাড়া ক'রে কি গল্প লিখেছে—তা সে-ই জানে ; এখন তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে কনককে? 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' আর কাকে বলে? এর চেয়ে যে কথা না-কওয়াই ছিল ভাল। কপাল আর চুল দেখেই সময়টা কাটিয়ে দিলে ভাল হ'ত। যে জন্যে কথা কওয়া,—মেয়েটি কে, কোথায় যাবে, একলাই বা যাওয়া-আসা করে কেন, সে-সব কথা তো 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই রইল। মাঝ থেকে কে এক কনক দাসের 'ট্রেনের পথে'র মেম-ভাবাপন্না নায়িকা নিয়ে তার প্রাণ যায়!

যাহোক্ কিছু একটা উত্তর না দিলেও নয়। কনক বলল, "সবটাই কি আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা? লিখতে বসলে কত কি তো মন থেকে গড়েও নিতে হয়। আর তা ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়ের মধ্যে কি আর ইংরেজ-রমণীসুলভ কোনো গুণ থাকা এতই আশ্চর্য্য? ধরুন, আপনাকে নিয়েই যদি গল্প লেখা যায় তাহ'লে ঠিক বাঙালী মেয়েদের সেই জড়সড় ভাব আর সঙ্কোচ বজায় রেখে আপনার চিত্র আঁকতে গেলে কি তা ঠিক সত্যি হবে?"

নিজের কথা বলবার কৃতিত্বে কনক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঠিক প্রসঙ্গেই তো এসে পড়া গেছে। এইবার তো মেয়েটিকে নিজের সম্বন্ধে এই প্রশ্নের একটা কিছু উত্তর দিতে হবে! চট্ করে কথা মনে আসা, চট্ করে মাথায় বুদ্ধি খেলা—এই সবই তো হ'ল লেখকদের গুণ! সে সব গুণই তো কনকের চরিত্রে বর্ত্তমান দেখা যাচ্ছে। তাই যদিও ঠিক ঐ 'ট্রেনের পথে' গল্পটা তার নিজের লেখা নয়, তবু লেখকসুলভ সকল গুণ বর্ত্তমান রয়েছে

ব'লে কোনোদিন কনক ঐ রকম একটা গল্প লিখে ফেলতেও পারে তো। আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে এবারকার এই ব্যাপারটাই একটু রং চং দিয়ে গুছিয়ে লিখে কোনো মাসিক পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে তো হয়! তাই দেবে। হয়ত এই কাগজেই দেবে। কিন্তু সম্পাদক আবার নূতন লেখকদের লেখা নেন না—শুনেছে কনক। তা সেও তো এক কনক দাস! এই যে এক কনক দাসের লেখা বেরিয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাহ'লে তার লেখা পেলে বোধ হয় সম্পাদক বুঝতেই পারবে না যে, এ কনক দাস আবার ভিন্ন, এবং তার এই প্রথম হাতেখড়ি। যা হোক ভাবা যাবে এ বিষয়ে। চেষ্টা করলে কি না হয়?

মেয়েটি সহজ উত্তর এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলে, "তাই তো বল্‌ছি আপনার এ প্লট এই রকম ধরণের কোনো মেয়েকে দেখে তবেই বোধ হয় মাথায় এসেছে—কে সে মেয়েটি? হয়ত চিন্‌তেও পারি নাম শুনলে, তাই জিগেস কর্‌ছি।"

কনক একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লে, "সে একবার আমি এই রকম ট্রেনে করে আস্‌ছিলাম এই অল্পদিন আগে। আপনারই মত একটি সহযাত্রিনী পাবার সুযোগ আমার সে বারও হয়েছিল,—আমার ভাগ্যটা তাহ'লে দেখতেই পাচ্ছেন, এ বিষয়ে বেশ সুপ্রসন্ন। আপনার এই নিঃশঙ্ক ব্যবহার, সঙ্কোচহীন আলাপের ধরণ, সহজ কথা বল্‌বার ভঙ্গী, সবই আমার সেবারকার সহযাত্রিনীটিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাই আস্‌ছে মাসের কাগজেতে যদি ট্রেনের পথে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত দেখেন তাহলে কিছু আশ্চর্য্য হবেন না। যাক্, আপনি জানতে চান সেই মেয়েটির কথা? তা সে বিষয়ে আমারই ভাল করে জানা নেই, তা আপনাকে আর কি বলব? এই ধরুন না কেন, আপনাকে মনে করে যে গল্প লিখ্‌ব মনে করছি, তা আপনার সম্বন্ধে কিছু কি জান্‌লাম আমি? কিছুই না। তবে আপনাকে দেখেই যে আইডিয়াটা আমি ফর্ম্ করে নিয়েছি, গল্পটার ভিত্তি করতে হবে তারই উপরে তো! অবিশ্যি আর কিছু জানতে পারলে তো কত সময়ে কত সুবিধেই হয়—তা সে রকম সুবিধে তো আর সকল সময়ে জোটে না। কাজেই যেটুকু পাওয়া যায় তার উপর কল্পনার সাহায্য নিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হয় আর কি। তবে আপনি যদি দয়া করে—" বল্‌তে বল্‌তে গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হয়ে আস্‌ছে দেখে কনক একটু চমকে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখে যে একটা ষ্টেশন এসে গেছে। কনক অসমাপ্ত বাক্য শেষ করবার আগেই মেয়েটি উঠে গিয়ে জানলার ধারে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়াল। একটি সাহেবী পোষাক-পরা কনকেরই বয়সী ছেলে এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই মেয়েটি হেসে দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ছেলেটি একলাফে ভিতরে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে। মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আজ ট্রেনটা যেন মনে হচ্ছিল আর আস্‌বে না। আমি যে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি! থেকে থেকে কত ভাবনাও হচ্ছিল! খালি ভাবছিলাম একলা যেতে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

তৃতীয় ব্যক্তি যে বর্ত্তমান সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না ক'রে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেই বেঞ্চিটার উপর দুজনে বস্‌ল। মেয়েটির অন্যহাতে কাগজখানা রয়েছে দেখে সেটা টেনে বল্‌ল, "বাঃ, এই যে এ মাসের 'প্রবাসী' পেয়ে গেছ। তোমার সে গল্পটা বেরিয়েছে নাকি—সেই 'ট্রেনের পথে?' আমি এতক্ষণ কেবলি ভাবছিলাম সেবারে তো প্রায় রোমান্স হবার যোগাড়—এবার আবার না জানি কি হয়! তোমার আর কি বল? এসে দিব্যি তাই নিয়ে গল্প লিখে কাগজে পাঠিয়ে দেবে—নাম হবে কত! আর আমার এদিকে 'হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হয় সখি এ হৃদয়!' খোঁজ রাখছ না, ভাল ফল হবে না কিন্তু এর, তা বলে রাখছি। কই গল্পটা কই? দেখাও না।"

মেয়েটি লজ্জিতভাবে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বল্‌লে, ১৩০ পাতায়।'

কনক গাড়ীর মধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল আড়াল করবার মত কোনো জায়গা নেই। এক মুহূর্ত্তে উঠে পড়ে ধাঁ করে গাড়ীর দরজাটা টান মেরে খুলে লাফিয়ে পড়ল প্ল্যাট্‌ফরমে। গাড়ী সবে চল্‌তে আরম্ভ করেছে তখন। জায়গা থাকে, সময় পাওয়া যায়, উঠে পড়বে অন্য একটা কামরায়—না হয় ষ্টেশনেই থাক্‌বে দাঁড়িয়ে, পরের ট্রেনে যাবে।

অশোক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ক্রুদ্ধ অশোক কলিঙ্গরণে
ঘেরিয়া দন্তপুর,
অবরোধে ভরি' রচিল নগরী
নব অন্তঃপুর!
রুদ্ধ করিতে ক্ষুব্ধ জুয়ার
পুরবাসী যবে আঁটিল দুয়ার,
ফুঁসিতে লাগিল শত্রুবাহিনী
মৃত্যুপিপাসাতুর!

তিন মাস ধরি' মগধসৈন্য
আগলি' রহিল দ্বার;
নগরবাহিরে বাহিরিয়া আসে—
এহেন সাধ্য কার?
অসহ কষ্টে স্বেচ্ছাবন্দী
তবু চাহিল না করিতে সন্ধি,
হেলার চক্ষে বিপক্ষদলে
করিল অস্বীকার!

দুর্গ-কবাট প্রতিজ্ঞাসম
কিছুতে দিল না পথ,—
বন্যার মুখে শিলাগাঁথা যেন
হিমাদ্রি পর্ব্বত!
ক্ষুব্ধ নৃপতি জলদভিমান
গর্জ্জি' উঠিল সিংহ-সমান—
সারা কলিঙ্গ করিয়া শ্মশান
পুরাইব মনোরথ।

দিকে দিকে ধেয়ে চলিল অমনি
অসংখ্য সেনা তার:
কুণ্ঠাবিহীন লুণ্ঠনে উঠে
ঘরে ঘরে হাহাকার!

১

কোথায় শস্য, কোথা সম্পদ—
শূন্য হইল যত জনপদ;
চারিধারে বেড়ি' বিজয়ী সৈন্য
সাধে শুধু সংহার!

রাজ্য জুড়িয়া রাত্রিদিবস
শুধু হায় হায় রব;
শোণিতপঙ্কে সারা কলিঙ্গে
প্রলয়ের তাণ্ডব!
ভরি' উঠে দেশ হিংসার গানে,
শোনে তা অশোক তৃপ্ত পরাণে,—
যত শোনে কানে, তত বেড়ে' উঠে
বিজয়ের উৎসব!

—কিন্তু কে ঐ?—দেখ' তো মন্ত্রী—
কিসের ভিক্ষা চায়?
চোখ দুটি ওর বড় সুন্দর,
বিহ্বল করুণায়!...
বৌদ্ধ ভিক্ষু—আবার এখানে?
শুধাও দেশের কি বারতা জানে;
নূতন তথ্য এলে সন্ধানে,
ব্যর্থ না ফিরে' যায়।

—না, ও কিছু নয়—মিথ্যা সময়
লইও না সন্ন্যাসী;
যুদ্ধাবসানে সংবাদ লয়ে
সাক্ষাৎ করো' আসি';
রক্তে রঙীন আজি এ গোধূলি,
শান্তির কথা রাখো তব তুলি';
—খাদ্য পানীয় চাহ যদি, লহ,
থাকো যদি উপবাসী।

—কি বুঝিবে তুমি সংসারত্যাগী
ভারতের সম্মান ?
দেশমাতা মোর শুধু কি জননী ?—
সে মোর মনঃপ্রাণ !
শক্তির মূল, মুক্তির আশ,
চক্ষের আলো, মর্ম্মের শ্বাস,
ভারত আমার বিশ্বাসী বুকে
স্বর্গের সন্ধান !

—জানো কি, অশোক আত্ম-আহুত
সেই ভারতের পায়ে ?
রক্ততিলক পরালো সে যারে
বলি দিয়া নিজ ভায়ে !
ছার কলিঙ্গ—কি ছার মেদিনী ?
পাদপীঠে তার ত্রিজগৎ জিনি'
বিশ্বের রাণী চাহে সে করিতে
সাজাইয়া সেই মায়ে !

ফিরায়ে নয়ন, রাধাগুপ্তেরে
আদেশ করিলা ডাকি'—
পাটলিপুত্রে বার্ত্তা পাঠাও
লক্ষ সৈন্য লাগি' ;
যেখানে যা থাকে খণ্ডরাজ্য,
জিনি' ভরি' তোল' এ সাম্রাজ্য,—
আজি হ'তে জয় জপো নির্ভয়
দিবসযামিনী জাগি' !

—দেখ তো মন্ত্রী, ফিরে' গেল না কি
সন্ন্যাসী খালি হাতে ;
যাবার সময় কি যেন দেখিনু
অদ্ভুত আঁখিপাতে !
—কি বলিয়া গেল ? শান্তির পথ
করুণায় ছাড়ি' জানে না জগৎ !
—কি বলিল শেষে ? যুদ্ধের জয়
মরে সে আত্মঘাতে !

স্তব্ধ নৃপতি তিন দিন ধরি'
রহিল বিমনা হয়ে ;
পারিষদ দল আসে, ফিরে' যায়
যে যার বারতা কয়ে ;
যুদ্ধ-সচিব কহি' সংবাদ
মুখপানে চেয়ে গণে পরমাদ !
রাধাগুপ্তের মন্ত্রণা—সেও
ফিরে ব্যর্থতা বয়ে !

২

সেদিন আকাশে মেঘ করেছিল,
দেরীতে ফুটিল তারা ;
থেকে থেকে বয় এলোমেলো বায়
উদাসীন দিশাহারা !
শিবিরবাহিরে প্রস্তরাসনে
সম্রাট একা ভাবে আনমনে—
ঐ যে উর্দ্ধে নীরব দৃষ্টি—
অতি দূরে—ওরা কারা ?

মনে পড়ে' যায় সহসা প্রেয়সী
মূর্ত্তি সুনন্দার—
নির্ব্বাসিতা সে সীতারই মতন,
দুঃসহ দুখভার !
পত্নীরে যার হেন ব্যবহার —
সাজে কি তাহার রাজ-অধিকার ?
ভারতের নামে এও কি রে তবে
নিজেরই অহঙ্কার !

সুত মহেন্দ্র, কন্যা মিত্রা—
একে একে তারা আসি'
কলিঙ্গজয়ী রাজা অশোকের
চক্ষে উঠিল ভাসি' !
—রে আত্মঘাতী, ওরে উদাসীন,
তোরি সন্তান—তারা আজি দীন !
মূঢ় সম্রাট, এই আদর্শে
ভুলাবি জগৎবাসী ?

—মিথ্যা, মিথ্যা, সকলই মিথ্যা,
মিথ্যা উচ্চ নাম ;—
দেশের ছলনে চাহিস্ সাধিতে
আপন মনস্কাম !—
কে গাহিছে ঐ ?—"হে মুক্তিকামী,
সন্ধ্যার ছায়া আসিতেছে নামি' ;
লহ বুদ্ধের শান্তির বাণী—
আনন্দ অভিরাম !"

সেই বীরসেন—করদ ভৃত্য—
এহেন দর্প তার !—
মুখের বাক্য সহসা রুধিল
বাহিরের হুঙ্কার !
কলকোলাহল বিদরে গগন,
স্তনিত পৃথ্বী, ধ্বনিত পবন,
ত্বরিতে বাহিরে আসিয়া অশোক
নেহারিল চারিধার।

৩

সপ্তাহশেষে—সন্ধ্যা তখন—
সূর্য্য অস্তে যায়,
কালো জল আরো কালো হয়ে উঠে
দূরে পুর-পরিখায় ;
সারি' অবরোধ পরিদর্শন
মৌন নৃপতি বিষণ্ণ মন,
ধীর পদে আসি' পশিলা শিবিরে
ভ্রমণক্লান্ত কায়।

ব্যস্ত চরণে আনিল মন্ত্রী
নব সংবাদ বহি',—
বাঙ্গলার রাজা—প্রজা বীরসেন
হইয়াছে বিদ্রোহী !
কলিঙ্গরাজ যে স্বয়ম্বরে
কন্তারে তার সঁপিতে যে করে
চেয়ে বলেছিল—শূদ্র রাজার
সেবাদাস আমি নহি !

রাত্রির ভালে লক্ষ মশালে
চক্ষে পড়িল ধরা—
পুরদ্বারের পুরোভাগভূমি
অশ্বারোহীতে ভরা !
বঙ্গভূমির তরবারি-আঁকা
ঊর্দ্ধে তুলিছে সবুজ পতাকা ;
—ঐ বীরসেন জ্যোতিষ্কসম
শ্বেত উষ্ণীষ-পরা !

মশাল-আলোকে চমকিয়া চোখে
ক্ষিপ্র সে তরবার
অপ্রস্তুত মগধসৈন্যে
কাটি' চলে চারিধার !
ঘন ঘন উঠে বঙ্গের জয়,
মূঢ় সেনাদলে হানি' বিস্ময়
নিজ বল লয়ে পঁহুছিল বীর
যেথায় পুরদ্বার !

যন্ত্রচালিত দুর্গদুয়ার
অমনি সে গেল খুলি',—
মন্ত্রে যেন-বা চক্ষের ধনে
বক্ষে লইল তুলি';
অতি অপূর্ব্ব রণকৌশলে
স্তম্ভিত করি' বিক্রম বলে
বীরসেন আজি শত্রুর চোখে
ছড়াইয়া দিল ধূলি!

ক্ষণেকের তরে অশোকের মনে
জ্বলিয়া উঠিল রোষ,
ধিক্কার হানি' স্বীয় আলস্যে
জাগিল অসন্তোষ।
ক্ষুদ্র করদ—এত তেজ তার!
এ হেন দম্ভ—সম্মুখে কার?
তথাপি ধন্য বীর্য্য তাহার
নির্ভীক নির্দ্দোষ!

কহিল মন্ত্রী—কৃতঘ্নতার
দিতে হবে প্রতিফল,—
কলিঙ্গসাথে বঙ্গের মিল
ঘটাবে চোখের জল!
কহে সম্রাট—ঐ বীরত্বে
বৈরতে নয়, বাঁধি' মমত্বে
ভাবিতেছি মনে, সাধিব কেমনে
মগধের মঙ্গল।

শুধাল মন্ত্রী—এই কি শাস্তি
বিশ্বাসঘাতকের?
উত্তর এল—ভাবিনি সে কথা—
ভেবেছি বীরত্বের!
ক্ষুণ্ন মন্ত্রী ভাবে, এ কি কথা!
কোন্ পথে পাব মনের বারতা?
মৃদু গম্ভীরে রাজা কহে ধীরে—
রাত্রি হয়েছে ঢের।

৪

অর্দ্ধরাত্রে উদিল চন্দ্র
দুর্গ প্রাকারপারে;
প্রেতের মতন শোভিছে শিবির
আবছা অন্ধকারে;
প্রহরী হাঁকিছে দণ্ডে দণ্ডে,
ঘণ্টা বাজিছে কাংস্যকণ্ঠে;
একা সম্রাট স্তব্ধ বিরাট
চাহি' ব্যোমপারাবারে।

দূরে উঠে গান—"কেন মিছে নর
দুঃখের ভার বহ?
মুক্তিসাগরে কর নির্ব্বাণ
বাসনা সুদুঃসহ;
প্রতি নিঃশ্বাসে দিন যে ফুরায়,
ডাক' এই বেলা, ব্যথা যে জুড়ায়,
প্রভু সুগতের দু'টি রাঙা পায়
লহ রে শরণ লহ।"

—গান নয়, যেন কাঁদিছে করুণা
বেদনাসাগরতীরে,
স্তব্ধ বিমান, নিশীথের প্রাণ
ফাটিছে শিশিরনীরে;
রাজা অশোকের বজ্রবক্ষে
মর্ম্মপুরীর কক্ষে কক্ষে
ফিরে' ফিরে' করে পরশন তারি
বার বার ধীরে ধীরে!

৫

দু'টি বৎসর গেছে তারপর
কলিঙ্গ-রণভূমে;
জেগেছিল যারা বিশ্রামহারা,
ঘুমায় গভীর ঘুমে!
সম্রাট তার যজ্ঞের শেষে
বিজয়মাল্য পরিয়াছে কেশে;
শবসাধনার শেষের আহুতি
নির্ব্বাণ চিতাধূমে।

কলিঙ্গ শুধু পিঙ্গ নয়নে
চাহিয়া উর্দ্ধপানে,—
মরুভূমি যেন নির্ম্মেঘাকাশে
দৃষ্টিশায়ক হানে!
মাঠে নাহি ঘাস, পাতা নাহি গাছে,
শূন্য পুরীতে মহামারী নাচে;
শ্রান্ত অশোক ঘুরিছে আপন
কীর্ত্তির সন্ধানে!

ঐ সে কীর্ত্তি !—শূন্যভবনে
　　জননীর বাহুপাশে—
শবের বক্ষে—শিশু-কঙ্কাল
　　চুষিছে স্তন্য আশে !
কে বা তার কাছে তরুণ তাপসী
করুণ নয়নে কাঁদিতেছে বসি' ?
ঐ না মিত্রা—আপন পুত্রী
　　শ্মশানসেবার বাসে !

ঐ সে আবার !—অন্য পুরীতে
　　ভিন্ন মূর্ত্তিখানি !
থাকিতে জীবন, হিংস্র শ্বাপদে
　　কারে করে টানাটানি !
নিরন্ন দেহে নাহি কোনো বল,
কে কারে নিবারে ? সে আশা বিফল !
শ্বাপদের চোখে পড়িল নৃপতি
　　নিজ অন্তরবাণী !

ঐ আরবার !—মৌন নগরে
　　শূন্য প্রাসাদসারি ;
রিক্ত কক্ষে মুমূর্ষু তার
　　চাহিছে শেষের বারি !
মুণ্ডিতশির শিশু-সন্ন্যাসী
ব্যস্ত ব্যাকুল জল দিল আসি',—
মূর্ত্তির পানে চাহিয়া অশোক
　　চিনিল কুমারে তারি !

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ নাহি হয়
　　কীর্ত্তিতীর্থে আর ;
ঘুরে' ঘুরে' দেখে সম্রাট তার
　　নবজিত ভাণ্ডার !

খুঁজিয়া মন্ত্রী পশিল সেথায়,—
কহে মহারাজ, লগ্ন যে যায় !
এই বেলা জয় না করিলে নয়—
　　সুযোগ মিলেছে তার !

কানে আসে গান—"রাজার পুত্র
　　ভিখারী সেজেছে আজ !
ছিল নররাজ, আজি বিশ্বের
　　মহারাজ-অধিরাজ !
সব মিছে, শুধু দুঃখ সত্য—
জানিয়াছে সেই পরম তথ্য ;
সবার দুঃখে, সবার বক্ষে
　　জাগিছে তাহারি কাজ !"

হা হা করি' হাসি' কহিলা অশোক-
　　মন্ত্রী, আরো কি চাহ ?
আজিও তোমার মহা নরমেধ
　　হ'ল না কি নির্ব্বাহ !
শোনো—আমি নর, নহি নরপতি,
ঐ তো সমুখে দেহ-দুর্গতি !
মন্ত্রী, কোথায় ফিরাবে আমারে ?
　　হইয়াছে গৃহদাহ !

জননী ভারত, নূতন ছন্দে
　　এবারে গাব মা গান !
আর রাণী নহ, দেবী করে' আজি
　　দিব তোরে সম্মান।
ভুলেনি অশোক অতীতের পণ,
রণজয়ে আর নাহি তার মন ;
ধর্ম্মবিজয়ে জিনিয়া ভুবন—
　　চরণে করিব দান।
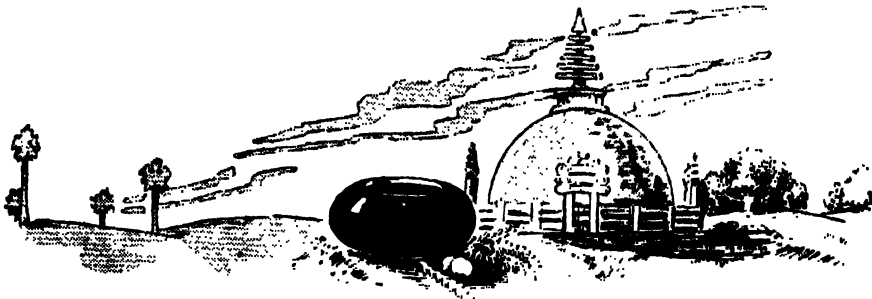
শাহজাহাঁ-আওরংজেব-সংবাদ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, পি-এইচ, ডি

শাহজাহার জীবন-নাটকের নট ও নাট্যকার স্বয়ং সম্রাট শাহজাহাঁ। দারা ও আওরংজেব তাঁহারই দ্বি-মূর্ত্তি—প্রকৃত সত্বার কোমল-কঠোর প্রতিবিম্ব। জাহানারা মমতাজের প্রতিচ্ছবি—সাক্ষাৎ প্রীতি ও সেবা ; রৌশনারা মূর্ত্তিমতী ঈর্ষা। যোগ্যতমের জয়লাভ, এই শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যর্থ করিবার জন্য শাহজাহার জীবন-ব্যাপী বিফলপ্রয়াস এই বিয়োগান্ত নাটকের মূলসূত্র। সম্রাটের মনের নিভৃততম প্রদেশে পরস্পরবিরোধী সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিসমূহের যে সংঘর্ষ তাঁহার অজ্ঞাতসারে চলিতেছিল, অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র, দরবারে দলাদলি এবং সাম্রাজ্যে ভ্রাতৃবিরোধ—সেই সংঘর্ষেরই ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহারই এক একটি মনোবৃত্তি। তাজের সৌন্দর্য্য, মোগল-চিত্রকলার চমক্, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব্ব সম্মিলন, মোগল-দরবারে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পণ্ডিত-সমাজের সমাদর, জয়সিংহ ও যশোবন্তের অভ্যুদয়—এই সমস্ত দেখিয়া অনেক সময় শাহাজাহাঁকে আকবর কিংবা দারা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাহজাহা প্রচ্ছন্ন আওরংজেব। তাঁহার বাহিরের দিক্‌টা দারা ; কিন্তু ভিতরটা আওরংজেব ; আওরংজেবের মধ্যেই শাহজাহা-চরিত্রের পূর্ণবিকাশ ও চরম পরিণতি। পিতার প্রধান গুণগুলি,—যথা নীতিনিয়ন্ত্রিত শৌর্য্য, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, মন্ত্রণা ও ভাবগোপনে চতুরতা, শাসনকার্য্যে অনালস্য ও দক্ষতা ইত্যাদি—আওরংজেবই পাইয়াছিলেন। শরিয়তের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান্, দেবমন্দির ও মূর্ত্তিভঙ্গকারী, জিহাদ ও ইস্‌লাম-প্রচারে উৎসাহী সম্রাট শাহজাহার উত্তরাধিকারী ও প্রিয়তম পুত্র দারা না হইয়া আওরংজেব হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ভালবাসার উপর মানুষের হাত নাই, শাহজাহাঁরও ছিল না। সেজন্য যোগ্যতার অনুপাতে তিনি আওরংজেবকে সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং দারাকে সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসিতেন। ইহাতে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে, আওরংজেবের পিতৃদ্বেষ কি শাহজাহাঁর পুত্র-নির্যাতনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ? পুত্রবৎসল শাহজাহাঁ অকারণ আওরংজেবের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন,—একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অথচ আওরংজেব যে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহারে ও চিঠিপত্রাদিতে পিতার প্রতি কোন অসম্মান কিংবা দুরভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে,—ইহারও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। আওরংজেব দারার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে শাহজাহাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তৃতীয় পুত্র তাঁহার বংশের কালস্বরূপ হইবে। দারার চরিত্রমাধুর্য্য শাহ-জাহাঁর হৃদয় জয় করিয়াছিল। তাই তিনি দারার দোষ দেখিয়াও দেখিতেন না ; পক্ষান্তরে আওরংজেবের ত্রুটি না থাকিলেও অনুমান করিয়া লইতেন। "আদব্-ই-আলমগিরী" গ্রন্থে এমন কতকগুলি চিঠিপত্র আছে যাহা সপ্রমাণ করে যে শাহজাহা বাস্তবিকই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় পুত্রের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। স্যর যদুনাথ তাঁহার রচিত আওরংজেবের ইতিহাসে বাহুল্য ভয়ে যে-সমস্ত ঘটনার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছেন তৎসম্পর্কীয় কয়েকখানি চিঠি এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

বাদ্‌শা-পছন্দ আমগাছ

বুরহান্‌পুরের শাহীবাগে একটি আমগাছ ছিল—ইহার নাম বাদ্‌শা-পছন্দ। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে আওরংজেব যখন দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে সম্রাট তাঁহাকে বাদ্‌শা-পছন্দ আম-

* *History of Aurangzib*, i. & ii, p. 180.

গাছটির কথা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। শাহজাদা সুবায় পৌঁছিয়া চিঠি লিখিলেন, আমের হেফাজতের জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, মৌসুমের সময় বাছা বাছা আম যথাসম্ভব সত্বর হুজুরে পাঠান হইবে। কিন্তু আমের ডালি যখন শাহজাহার নিকট পৌঁছিল, তিনি আওরংজেবের উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইলেন, কারণ আম ছিল সংখ্যায় কম, আবার তাহার মধ্যেও কয়েকটি পচা। ইহার কৈফিয়তের জবাবে শাহজাদা লিখিলেন—"এ বৎসর দক্ষিণ দেশে আম ভাল হয় নাই। বাদ্‌শা-পছন্দ গাছেও অন্যান্য বৎসরের মত আম ফলে নাই। সুবার সংবাদ-লেখকের বিবরণে হুজুর এ সংবাদ নিশ্চয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন। মুলতফৎ খাঁর আত্মীয় মীর সাবির ও মীর দারাব এখন বুরহান্‌পুরে আছে; তাহাদের লিখিয়াছি যেন খুব সাবধানে ভাল আম ডাকচৌকীর দ্বারা পাঠাইয়া দেয়।" ইহাতেও সম্রাটের মনের সন্দেহ ঘুচিল না—তিনি মনে করিলেন বাদ্‌শা-পছন্দ আম আওরংজেব নিজেই খাইতেছে এবং আম পাঠাইতে অবহেলা করিতেছে। তিনি রাগিয়া শাহজাদাকে লিখিলেন, "আমের হেফাজতের জন্য আগামী বৎসর দরবার হইতেই একজন লোক পাঠাইব ইচ্ছা করিয়াছি।" এক ঘা চাবুকের চেয়েও এই মন্তব্য অপমানজনক ও অসহ্য। কিন্তু আওরংজেব ইহার পরও পিতার সন্দেহ দূর করিবার জন্য লিখিলেন,—"সম্রাট একাজের জন্য স্বয়ং লোক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম কথা। দরবারে পাঠাইবার উপযুক্ত কি না দেখিবার জন্য এ বৎসর বাদ্‌শা-পছন্দ গাছের মাত্র তিনটি আম আমি আনাইয়াছিলাম। এবার বাদ্‌শা-পছন্দ গাছের মাত্র একটি শাখায় আম ফলিয়াছে। বাকী ডালগুলি ঝড়ে ভাঙিয়া গিয়াছে। শাহান্‌শাহ যে-আম পছন্দ করেন তাহা এখানে অপচয় হইতে দেওয়া এ অধীনের পক্ষে কেমন করিয়া প্রীতিকর হইতে পারে?"

শাহজাহাঁ এখন পুত্রের অন্য ত্রুটি খুঁজিতে লাগিলেন—আম না হয় কম ফলিয়াছে, কিন্তু ডালি পৌঁছিতে দেরি হয় কেন, আর আমই বা পচা হওয়ার কারণ কি? জাহানারা আওরংজেবের কাছে লিখিলেন—"বাবা বলিতেছেন এবার ভাল আম আসে নাই। বোধ হয় আম কাঁচা অবস্থায় পাড়া হইয়াছে, কিংবা ডাকচৌকীওয়ালা দেরি করিয়াছে, না হয় আমের ডালি মাটিতে রাখিয়াছে, অথবা আম বুরহানপুর হইতে দৌলতাবাদ হইয়া দিল্লীতে আসিয়াছে।" আম সম্বন্ধে বাদ্‌শার অভিযোগ শুনিয়া আওরংজেব নিজের অতিবিশ্বস্ত এবং চতুর কর্মচারী মহম্মদ্ তাহিরকে বুরহানপুরে পাঠাইয়াছিলেন। লোকে বলে 'সাট বুদ্ধি নাটি'; সাটের সংখ্যা পার হওয়ার পর শাহজাহারও বোধ হয় বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, নতুবা বুরহানপুর হইতে প্রেরিত আম দৌলতাবাদ হইয়া দিল্লীতে আসবার কল্পনা করিতে পারিতেন না। জাহানারার পত্রের উত্তরে আওরংজেব লিখিলেন—"মহম্মদ তাহির বুরহানপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে-সমস্ত ডালি রওনা হইয়াছে তাহাতে কাঁচা আম থাকিতেও পারে; কিন্তু এখন কেন কাঁচা আম পাড়া হইবে? ডাকচৌকীর উপর আমি হুকুম দিয়াছি, ডালি যেন আট নয় দিনের মধ্যে হুজুরে পৌঁছান হয়। সরকারী উকিল কিংবা অন্য কাহাকেও আদেশ করা হউক তাহারা যেন স্বতন্ত্র চিঠিতে ডালি রওনা হইবার সময়টা লিখিয়া দেয়। ডালি পৌঁছিবার তারিখের সহিত মিলাইয়া যদি সময়ের পার্থক্য দেখা যায়, ডাকচৌকীওয়ালাদের শাস্তি দেওয়া হইবে। আমের ঝুড়ি যাহাতে মাটিতে রাখা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য সিরোঞ্জ ও আগ্রায় লোক মোতায়েন করা হইয়াছে। ...বুরহানপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের আম মহম্মদ তাহির বুরহানপুর হইতে, এবং দৌলতাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের আম আমি স্বয়ং দৌলতাবাদ হইতে পাঠাইয়া থাকি। বুরহানপুরের আম দৌলতাবাদ হইয়া দরবারে পাঠাইবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?"

যাহা হউক পিতা পুত্রের ঝগড়া অবসানের সঙ্গে আমের মৌসুমও বোধ হয় ফুরাইয়া গিয়াছিল।

জিতাশঙ্করম্ [জিতসংগ্রাম ?] হাতী

শাহজাহাঁ শুনিলেন জাটিয়ার রাজা কিশোরী সিংহের

দুইশত হাতী আছে; তাহার মধ্যে জিতসংগ্রাম নামে হস্তীটির জোড়া হিন্দুস্থানে নাই। কিশোরী সিংহের কয়েক বৎসরের কর বাকী পড়িয়াছিল। সেই অজুহাতে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার সমস্ত হাতী—বিশেষতঃ জিতসংগ্রাম হাতীটি—দিল্লী পাঠাইয়া দিবার জন্য সম্রাট আওরংজেবকে হুকুম করিলেন। শাহজাদা কিশোরী সিংহের রাজ্যে খুব বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া জিতসংগ্রাম হাতীর বহু অনুসন্ধান করিলেন। শেষে বাদশাকে জানাইলেন, "জিতসংগ্রাম নামক হাতীর সন্ধান ঐ দেশের কেহই বলিতে পারিল না। কেহ কেহ বলে, ঐ মুলুকে এই নামে প্রসিদ্ধ পাহাড়ের উপর একটি কিল্লা আছে (!)। কিশোরী সিংহের নিকট এতগুলি হাতী থাকাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যদি বাস্তবিকই এরূপ কোন হাতী থাকিত, তবে যে-বৎসর শাহনওয়াজ খাঁ আপনার হুকুম-মত এ সুবার সমস্ত ফৌজ লইয়া ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন অবশ্যই বাদশাহী নজর-স্বরূপ হাতীগুলি লইয়া আসিতেন।···যে-ব্যক্তি কিশোরী সিংহের হাতীর কথা হুজুরে জানাইয়াছে এবং জিতসংগ্রাম হাতীর এত প্রশংসা করিয়াছে, তাহাকে অধীনের কাছে পাঠাইবার আদেশ হউক। সে বাদশাহী ফৌজের সহিত গিয়া কোথায় ঐ সমস্ত হাতী আছে দেখাইয়া দিলে বড় ভাল হয়। ···" শাহজাহান মনে করিলেন, হয়ত শাহজাদা কোনো মতলবে কিশোরী সিংহের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাইতে অনিচ্ছুক। তিনি উত্তরে আওরংজেবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন—"মহম্মদ্ সুলতান এবং হাদিদাদ খাঁকে যেন অবিলম্বে বাদশাহী ফৌজের সহিত দেওগড় (নাগপুরের অন্তর্গত কিশোরী সিংহের রাজধানী) আক্রমণে পাঠান হয়।" বান্দার রাজা শত্রুতাবশে কিশোরী সিংহের বিরুদ্ধে এই সমস্ত কারসাজি করিতেছিল, ইহা আওরংজেবের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি লিখিলেন, "ফৌজের সঙ্গে গিয়া বান্দার রাজা হাতী সনাক্ত করুন এবং যে প্রকারে হউক ঐ হাতী কিশোরী সিংহের নিকট হইতে হস্তগত করুন।"

এই জিতসংগ্রাম হস্তীর জন্য ১৬৫৫, ২২শে অক্টোবর দুইদল ফৌজ বিভিন্ন দিক্ হইতে কিশোরী সিংহের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। কিশোরী সিংহ বিনা যুদ্ধে মোগল-সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। আওরংজেব শেষ চিঠিতে সম্রাটকে জানাইলেন, "মির্জ্জা খাঁর সহিত জাটিয়ার রাজা আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার কাছে যে বিশটি হাতী ছিল সমস্তই সঙ্গে আনিয়াছেন এবং শপথ করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহার কাছে অন্য কোনো হাতী নাই; এ কয়টি ছাড়া তাঁহার কাছে অন্য কোন হাতী আছে,—ইহা যদি কখনও প্রকাশ পায় বা কেহ দেখাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। বান্দার রাজা এবং তাঁহার উকিল দুদা নায়েক বোধ হয় দরবারে পৌঁছিয়াছেন; তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে হাদিদাদ খাঁর কাছে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জিতসংগ্রাম ও জাটিয়া-রাজের অন্যান্য হাতীর কথা তাঁহারা কিছুই জানেন না,—কেহ বাদশার কাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিবে। হাদিদাদ খাঁ আমার কাছে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠিতেই শাহান শা সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।"

জাহাজ-নির্ম্মাণ

সম্রাট কোনো সূত্রে জানিতে পারেন, আওরংজেব সুরাট বন্দরে সরকারী কাঠের সাহায্যে একটি নূতন জাহাজ তৈয়ার করাইতেছেন। আওরংজেব নিজ পুত্র মহম্মদ সুলতানকে লিখিলেন, "আমি সুরাট্ বন্দরে কোনো নূতন জাহাজের ফরমাইশ দিই নাই। মোগল খাঁর আমলের একটি জাহাজ তাতা (সিন্ধু দেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বন্দর) বন্দরে ভাঙিয়া যাওয়ায় কক্রালা পরগণার লোকদের হাতে পড়িয়াছিল; ঐ ভাঙা জাহাজ খাল্সা-ই-শরিফা বা খাস সরকারী সম্পত্তি; বাদশাহের নিকট হইতে ইনাম-স্বরূপ আমি উহা পাইয়াছিলাম। কিছুদিন হইল সালামৎ-রস নামক জাহাজের সহিত বাঁধিয়া ইহা সুরাট বন্দরে আনাইয়াছি। ঐখানকার মুতসদ্দী আমার আদেশমত উহার প্রয়োজনীয় সংস্কার আরম্ভ করিয়াছে। ঐ জাহাজ মেরামত করা যদি বাদশার ইচ্ছাবিরুদ্ধ হয়, তবে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকখানি তক্তা উহার সংস্কারকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

বুরহান্‌পুরের কাপড়ের কারখানা

সেকালে বস্ত্রশিল্পের জন্ত বুরহান্‌পুরের প্রসিদ্ধি ছিল। সম্রাট ও তাঁহার অন্তপুরের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বুরহানপুরের খাস কারখানায় তৈরি হইত। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারও তথায় কারখানা স্থাপন করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় কাপড়, খেলাৎ এবং সম্রাট্‌কে উপহার দিবার বস্ত্রাদি তৈয়ার করাইতেন। বুরহানপুরের এই বস্ত্র-ব্যবসায় সরকারের একরকম একচেটিয়া ছিল। আওরংজেব যখন সুবাদার হইয়া দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে গেলেন তখন সম্রাট্ তাঁহাকে জানাইলেন, "দরবার হইতে পুনঃ পুনঃ তোমাকে বিশেষভাবে লেখা হইতেছে যে, বুরহান্‌পুরে বাদশাহী কারখানার অতিরিক্ত আর দু-একটি ছাড়া যেন অন্ত কারখানা সেখানে খোলা না হয়।" নূতন কারখানা খুলিবার পর বাদ্‌শার মনে সন্দেহ জন্মিল শাহাজাদা বাদ্‌শাহী কারখানার অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন। মীর নসীর (ডাকনাম নসীরা) নামক একজন লঘুচিত্ত চাটুকারকে সম্রাট্ বুরহানপুরের বাদ্‌শাহী কারখানার পরিচালক (দারোগা), এবং সুবার 'ওয়াকেয়ানবীস' (সংবাদ-লেখক) করিয়া পাঠাইলেন। এখনকার দিনে লাটসাহেবেরাও যেমন এসোসিয়েটেড প্রেসকে সমীহ করিয়া চলেন, মোগল সাম্রাজ্যের সুবাদারেরা ওয়াকেয়ানবীস বা সরকারী সংবাদ-লেখককে সেইরূপ খাতির করিতেন; কেন-না বাদ্‌শা তাহাদের চোখ দিয়া দেখিতেন, তাহাদের কান দিয়া শুনিতেন। নসীরা বুরহান্‌পুরে আসিয়াই কারখানা সম্বন্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ দরবারে জানাইল। উজীর সাদুল্লা খাঁ বাদ্‌শার আদেশ-মত আওরংজেবের কাছে ইহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আওরংজেব সাদুল্লা খাঁকে লিখিলেন,"মীর নসীর বাদশাকে জানাইয়াছে যে, আমার কর্ম্মচারীরা বুরহানপুরের বাদ্‌শাহী কারখানার জন্ত দড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম যোগাইতে অবহেলা করে। মীর নসীরের অভিযোগ এবং এই অশোভন ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে এরূপ পুনরায় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত সম্রাট্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আপনি জানেন, তাহার লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য এবং সম্রাটের কার্য্যে আমার কর্ম্মচারীদের আলস্য ও অমনোযোগিতা প্রদর্শন, কল্পনারও অতীত। আমার কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে যে যাহা লেখে বা বলে তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য বোধে ঐ সকল বিষয়ের জন্ত আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করাই যদি এখন দরবারের নিয়ম হইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে আমার কিছু বলিবার বা লিখিবার কোনো সার্থকতা নাই। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যতদিন হরনালা নামক কস্‌বা (ছোট শহর) আমার জাগীরের অন্তর্ভুক্ত আছে, ততদিন এই ঝগড়া শেষ হইবার নয়, কেন-না (বুরহান্‌পুর জেলার মধ্যে) হরনালাতেই সবচেয়ে ভাল সুতা পাওয়া যায়। কারখানার দারোগার মনগড়া মিথ্যাপবাদও দরবারে বেশ বিকায়; সুতরাং সে কখনও এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবে না। সে দড়ির মামলায় রং ফলাইয়া ও তাহার সঙ্গে আরও দুই-চারটা মিথ্যার ভাঁজ দিয়া আমার প্রতি বাদশার মন বিরূপ করিয়া দিবে।......যদি সম্রাটের হুকুম হয়, হরনালা কস্‌বাকে খাল্‌সা-ই-শরিফা বা বাদশাহী খাসমহালের সামিল করিয়া আমি পাইন-ঘাটের দেওয়ানের দখলে ছাড়িয়া দিতে রাজি আছি এবং উহার পরিবর্ত্তে অন্ত জায়গা গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলেই কারখানার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দারোগার মর্জ্জি-মাফিক পাওয়া যাইবে এবং তাহার মিথ্যা ও চুক্‌লির রাস্তাটাও বন্ধ হইবে। বাদ্‌শার কাছে নজরের উপযুক্ত কাপড় প্রস্তুত হইবে—শুধু এই উদ্দেশ্যে আমি এখানে কারখানা খুলিয়াছি। যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয় আমি নিজের কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে পারি। এ সমস্ত কথা আশা করি আপনি (সাদুল্লা) সম্রাটের কর্ণগোচর করিবেন।"

এই সামান্ত ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে, আওরংজেবের কারখানা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া শাহজাহাঁ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অপমানিত করিলেন।

মহম্মদ সুলতানের লাল পাগড়ী

শাহ সুজার কন্যা গুলরুখ বানুর সহিত আওরংজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানের নিস্‌বৎ বা বাগ্‌দান করা

হইয়াছে শুনিয়া শাহজাহাঁ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। শাহজাদা সম্রাটের ক্রোধশান্তির জন্ম মহম্মদ সুলতানকে দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। বালকের মাথায় বুরহান্‌পুরের জরোয়া রঙীন লাল পাগড়ী দেখিয়া শাহজাহাঁ পৌত্রকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাগড়ী কি জায়েজ? শরিয়তে কি ইহার বিধি আছে?" বাদ্‌শার দেখাদেখি দরবারী আমীর ও আলেম সম্প্রদায় শরিয়ত ভুলিয়া মুচকি হাসিলেন এবং সাহেবজাদাকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে কিছু বলাবলি করিলেন। বালক পিতামহের প্রশ্ন ও দরবারীদের ঠাট্টার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্যাপারটি সংক্ষেপে পিতার কাছে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ত লোকের মারফৎ আওরংজেব সব কথা জানিতে পারিয়া পুত্রের কাছে লিখিলেন, "তোমার লাল পাগড়ীর বিষয়ে বাদ্‌শাহ তাঁহার আলেমদিগকে কি বলিলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া কি কি কথা বাহির হইয়াছিল, এ সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে আমাকে জানানো উচিত ছিল। এ কথা প্রকাশ হইয়াছে যে, মৌলানারা বলিয়াছেন, 'এই এক বৎসর মাত্র ঐ রকমের পাগড়ী বুরহান্‌পুরে শরিয়ৎ অনুসারী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই রেয়াজটাও এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে পৌছিয়াছে; এ ব্যাপারের পর এই পাগড়ী সম্ভবতঃ শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে!' আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি এ ঘটনার প্রকৃত অর্থ সম্যক্ না বুঝিয়া ইহাকে সামান্ত কথা মনে করিয়াছ। যে সময় বাদ্‌শাহ মৌলানাদিগকে লাল পাগড়ী জায়েজ কি-না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি তোমার ঠাকুরদাদাকে বলিতে পারিতে, "হাঁ, ইহা জায়েজ; ইহার বিধি আমি আপনাকে দেখাইব।" শেখ নিজাম তোমার সঙ্গে এইরূপ কাজের জন্যই প্রেরিত হইয়াছেন। যদি এখনও সময় থাকে তাঁহাকে বলিও যেন কেতাব হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এ রকম পাগড়ীর ব্যবহার যে শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ নয়, এ কথা যেন বাদশাহকে নিবেদন করেন।

আওরংজেবের হস্তাক্ষর

শাহজাদারা সম্রাটের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন সেগুলি তাঁহাদের নিজ হাতেই লিখিবার রীতি ছিল। একখানি চিঠিতে আওরংজেবের হস্তাক্ষর একটু খারাপ ও ভিন্ন রকমের লক্ষ্য করিয়া শাহজাহাঁর সন্দেহ হইল, চিঠিখানি বোধ হয় শাহজাদা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানকে দিয়া লেখাইয়াছেন। আওরংজেব ইহার জবাবে লিখিলেন, "ইহার পূর্ব্বে যে নিবেদন-পত্র আপনার কাছে পৌছিয়াছে উহা আমি নিজ হাতেই লিখিয়াছিলাম। ঐ সময়ে আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলে ব্যথা থাকায় হস্তাক্ষর ভাল হয় নাই। যদিও আপনার পৌত্র মহম্মদ সুলতান বয়সের অনুপাতে খারাপ লেখে না, তবুও তাহার কিংবা অন্ত কাহারও দ্বারা আপনার কাছে চিঠি লেখানো কি সম্ভবপর হইতে পারে?" আর একবার শাহজাহাঁ আওরংজেবের চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িয়া স্থির করিলেন, চিঠির সবটা শাহজাদার হাতের লেখা বটে, কিন্তু তারিখটি বোধ হয় অন্ত হাতের লেখা। মহম্মদ সুলতান এই সময় বাদ্‌শাহের কাছে ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলিলেন, তারিখটি অন্ত হাতের লেখা হইতেও পারে। ছেলেমানুষের কোনো দোষ ছিল না, কেন-না দিল্লীশ্বর যদি বলিতেন—যমুনার জল বর্ষায় উজান বহিতেছে, পৌত্র হউক আর গোলামই হউক কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ভাঁটা যাইতেছে। চিঠির তারিখ অন্ত হাতের লেখা কি না, ইহার জবাবে আওরংজেব লিখিতেছেন, "আমার হাতের লেখা আপনি বেশ চিনিতে পারেন এবং ইহাও জানেন যে দরবারে যত নিবেদন-পত্র পৌছিয়াছে, উহার কোনটিতেই অন্যের কলমের দাগ নাই।……এই চিঠির তিন ফর্দ্দ আমি নিজের হাতে লিখিতে পারিলাম, শুধু এই দুইটি শব্দ অন্ত হাতের লেখা কেন হইবে?"

আওরংজেব দুগ্ধ পান করিয়া বিবোদগার করিয়াছিলেন কি না পাঠক বিচার করিবেন।

কবি

শ্রীসুবোধ বসু

বিনয় তখন ঘরে বসিয়া পড়া তৈয়ারী করিতেছিল। রাত প্রায় ন'টা হইবে। হষ্টেলের বারান্দায় যে জটলা চলিতেছিল তাহারই কোলাহল তাহাকে বার-বার উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু তবু সে বাহির হইয়া গেল না। অনেকদিন চেষ্টার পর আজ ঠিক সন্ধ্যাবেলা পড়িতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—আজ কোন মতেই সময় নষ্ট করা হইবে না। আকর্ষণ যতই প্রবল হউক, এ প্রতিজ্ঞা সে কোন মতেই ভাঙিতে রাজী হইল না, এবং আজই শেষ করিয়া ফেলিবে ভাবিয়া সমাপ্ত-প্রায় একটা বইয়ের পাতায় দ্রুত চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল। আর পঁচিশ পাতা পড়িলেই শেষ!

এমন সময় বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা দিবার শব্দ আসিয়া শঙ্কিত বিনয়কে আশু বিঘ্নের ভাবনায় বিরক্ত করিয়া তুলিল। না খুলিয়াই সে কহিল, 'কে?'

বাহির হইতে একটি ছেলে কহিল, 'আমি। দরজা খোলো।'

তেমনি করিয়া বিনয় কহিল, 'না ভাই, আজ আর জ্বালাতন ক'রো না, পড়্‌ব ভাবছি।'

বাহির হইতে প্রত্যুত্তর আসিল,'আজ রাতে যে কবির ঘরে তোমার ডিউটি, তোমাকে আমি ডাক্‌তে এলাম।'

'কবি' একটি ছেলের সঙ্গীদের দেওয়া নাম। তাহার আসল নাম পরিমল। কলেজের পত্রিকায় একবার তাহার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। তারপর বন্ধুদের উপহাসে সে বোধ হয় লেখাই ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ তাহার আর কোনো কবিতা কোন দিন বাহির হয় নাই, কিন্তু তাহার ব্যঙ্গের কবি-নাম আর ঘুচিল না। লাজুক ছেলেটির কাছে তাহা একেবারে অপবাদের মত হইয়া কোণ হইতে তাহাকে আরও কোণে ঠেলিয়া দিল। অকারণবর্ষিত হাসিবিদ্রূপে যে আপত্তি করিবে অতটুকু সাহসও তাহার ছিল না।

সেই ছেলেটিরই অসুখ। পালা করিয়া এক একজনকে রাত জাগিতে হয়। বিনয় ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, আজ তাহাকে জাগিতে হইবে। কিন্তু মনে পড়িয়া সে একটুও খুশী হইল না। বইটা যে আজও অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল তাহাই তাহার সবার চাইতে বড় দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল।

দরজাটা খুলিয়া আগন্তুককে কহিল, 'আমার ক'টা থেকে ক'টা অবধি, ভাই?' ছেলেটি কহিল, 'ন'টা থেকে দু'টো।'

উপায় নাই। একান্ত অনিচ্ছায় বিনয় বইটা বন্ধ করিয়া কহিল, 'আজ ওর অবস্থা কেমন?'

—'জ্বরটা একটু কমেছে বোধ হয়, কিন্তু সন্ধ্যা থেকে যা-তা সব প্রলাপ বক্‌ছে।'

ছেলেটি বিনয়কে শুশ্রূষা-সংক্রান্ত কয়টা উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। বিনয় বই-খাতা গুছাইয়া রাখিয়া আলোটা নিবাইয়া বাহিরে যাইবে ভাবিতেছিল, এমন সময় চঞ্চল আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'বিনুদা, খবর জানেন? আমাদের কবির একটা কবিতা আজ শিখার আপিস থেকে ফেরত এসেছে।'

বিনয় কহিল, 'তুমি জান্‌লে কি ক'রে?'

—'চিঠির বাক্সে পড়েছিল, আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।'

—'ওরা কি লিখেছে?'

চঞ্চল বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'যা লেখা উচিত ছিল আমার মনে হয় ঠিক তাই লিখেছে। পড়ে তো আমাদেরই ফার্ষ্ট-ইয়ারে, এদিকে কবিতার নাম হচ্ছে "প্রেম"। লিখেছে, আপনি যা বুঝেছেন প্রেমের সেটা সম্পূর্ণ মামুলি গৎ; বয়স, কল্পনা, আর ভাষার অধিকার বাড়লে লিখে পাঠাবেন, বিবেচনা করে দেখ্‌ব।—আমার তো মনে হয় রাইটলি সার্ভড্‌।'

বিনয় কহিল, 'ওকে কবিতাটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছ ?'

দুষ্টু হাসিয়া চঞ্চল কহিল, 'এখুনি ? আগে হোক্ ও ভাল, তারপর ওর চোখের জলে নাকের জলে এক না করি তো নাম বদ্‌লে রাখ্‌ব।'

পরিমলের পাশের ঘরের সহপাঠীটি পড়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। কহিল, 'আর জানিস্ ? আমাকে প্রায় একমাস ধরে ও বলে আস্‌ছে যে, ওর একটা কবিতা 'শিখা'তে ছাপাবে বলেছে।'

চঞ্চল কহিল, 'রাজ্যে আর রাবিশ্ নেই, তাই ওর ছড়া নেবে 'শিখা'তে ? আর কবিতার নাম হচ্ছে প্রেম। হাঁা, প্রেমের রূপ আঁক্‌বার লোক ওই তো বটে ! অসুখ না হ'লে 'ফুলস্ প্যারাডাইজ' যে কেমন ক'রে ভাঙে সেটা ওকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌তাম। তা রোসো না, ভাল হ'লে সভা ডেকে সবাইকে ওর কবিতা আওড়ে শোনাব।'

বিনয় চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিল। কহিল, 'ও না কবিতা-লেখা তোদের জালায় ছেড়ে দিয়েছিল রে ?',

চঞ্চল কহিল, 'আমরা তো তাই ভাবতুম। তারপর একদিন সুধীর এসে বললে, গভীর রাতে জেগে জান্‌লার ধারে বাতি জালিয়ে বসে বসে রোজই প্রায় ঐ করে। জর কি আর সাধে হয় ? এমন চেহারা, এত যে ঠাট্টা করি তবু লজ্জা হয় না !'

অপর ছেলেটি কহিল, 'কবিতার চোটে একেবারে জর ?'

তাচ্ছিল্যের সুরে চঞ্চল কহিল, 'তাকে কবিতা ব'লে কবিতার আর অপমান করো না। বাজী রাখুন বিনুদা, দু'ঘণ্টায় অমন এক ডজন কবিতা আমি লিখে দিতে পারি। যা-তা খানিকটা ছড়া মিলালেই হবে ?'

তারপর একটু ঢোক গিলিয়া কহিল, 'সবুরই কর না বাপু ! কবিতা লিখতে সাধ, বেশ তো বয়স তো আর পার হয়ে যাচ্ছে না। যত ডেঁপোমী ছেলেগুলোর—'

এমন সময় নটা বাজিল। বিনয় আলোচনা বন্ধ করিয়া ডিউটি দিবার জন্ত বাহির হইয়া পড়িল। পড়াটা নষ্ট হইল বলিয়া তখনও মনটা খারাপ। একটা অকাল-পক্ব ছেলে রাত জাগিয়া কবিতা লিখিয়া অসুখ ক'রে বসবে, তাহারই দায় সাম্‌লাইতে হইবে অন্ত সকলকে মিলিয়া !

ঘরের তক্তাপোষের উপর পরিমল তখন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিল। গায়ে একটা ইটালীয় রাগ্। মাথার ধারে ছোট্ট একটা তেপায়ার উপর ওষুধ-পত্র, জরের চার্ট। প্রখর বলিয়া ঘরের বিজলী বাতিটা নিবানো রহিয়াছে, টেবিলের উপর ক্যাণ্ডেল-ষ্ট্যাণ্ডে একটা বাতি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। বিনয় আসিয়া বিছানার ধারের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া সেটা নিবাইয়া দিল।

তখন বন্ধ-করা কাচের জান্‌লাটা ভেদ করিয়া বাহিরের রূপালী জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের গাছের শীর্ণ ডালের ছায়াগুলি আসিয়া সেই জ্যোৎস্নার ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কাচের ফ্রেমের ভিতর দিয়া বাহিরটাকে একটা ছবির মতই দেখায়, কবির রোগশীর্ণ মুখখানিও কেমন করুণ হইয়া চোখে পড়িতেছিল।

এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ইহারই ভিতর কোন এক সময় বিনয়ের অসতর্ক চোখ দুটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিয়াছিল। সহসা পরিমলের ক্ষীণ-কণ্ঠের ডাক শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, 'কি চাই, বল ?'

—'চাই না কিছুই বিনুদা ; আমার ঘুম আস্‌ছে না তাই তোমাকে ডাক্‌লুম।'

—'ও: ।'

—'তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে বিনুদা ? তবে ঘুমোও না একটু, আমার তো কোন দরকার নেই এখন।' বিনয় আপত্তি করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, কহিল, 'না, আমার ঘুমোবার দরকার নেই, কিন্তু তোমার কি ঘুম ভেঙে গেল ?'

পরিমল রাগ্‌টা গলার ধার পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া কহিল, 'আমি তো ঘুমোইনি বিনুদা, ঘুম আমার আস্‌ছে না।'

বিনয় হাত-পাখাটা উঠাইয়া লইয়া কহিল, 'হাওয়া করব পরিমল?'

—'দরকার নেই, বিনুদা।'

একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তারপর পরিমল বাহিরের আলোকোৎসবের পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'আজ কোন্ তিথি বিনুদা? পূর্ণিমা?'

—'না, আজ একাদশী।'

পরিমল মুগ্ধ চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া ঠিক ছেলেমানুষের আব্দারের সুরে কহিল, 'বিনুদা দাওনা খুলে একবার জান্‌লা দুটো, জ্যোৎস্না একেবারে ভিড় ক'রে আসুক্।'

বিনয় কহিল, 'না, না, ওটা খুল্‌লে শেষে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। ওটা বন্ধই থাক্।'

পরিমল কোন আপত্তি করিল না। ও-পাশ ফিরিয়া জ্যোৎস্নার দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল। হষ্টেলের কোন একটি ছেলে তখন বাঁশীতে রাতের সুর তুলিয়াছে তাহাই তাদের কানে আসিয়া পৌছিতেছিল। সুষুপ্ত রাতের কেমন একটা শব্দ শোনা যায়। দেওয়ালে মাঝে মাঝে টিকটিকিগুলি শব্দ করিতেছে। কখনও কখনও বা এক-একটা নিশাচর পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে।

—'বিনুদা?'

—'কি?'

—'বাইরের জগৎ আজ কি মধুর হয়ে উঠেছে, বিনুদা, পৃথিবী যেন কবিতা পড়ে যাচ্ছে। আজ ছাড়া কি অসুখ আর আমার কোনদিনই হ'তে পার্‌ল না?'

—'কি করবে, ভাই?'

—'না বিনুদা, কিছু তো করবার নেই জানি। কিন্তু চৈত্র মাসের এই রাতগুলির আশায় আমি যে কতদিন ধরে দিন গুণছি। আশা ব্যর্থ হ'লো এই দুঃখ বিনুদা।'

বিনয় চুপ করিয়া রহিল। পরিমলের গলার স্বর গভীর হইয়া আসিল। জ্যোৎস্না রাতটা ব্যর্থ হইয়া সত্যই যেন একটা বেদনায় পরিমলের বুকখানা ভরিয়া গিয়াছে। ইহাকে উপহাস করিতে তাহার রুচি হইল না।

—'আজ আমার অসুখ না হ'লে কি কর্‌তুম জানো বিনুদা?'

—'কি কর্‌তে, ভাই?'

—'জান্‌লা দিয়ে অজস্র জ্যোৎস্না এসে যখন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ত, আমি তারই ভেতর পা ছড়িয়ে বসে সারা রাত ধরে কবিতা লিখতুম। হয়ত দক্ষিণের বাতাস এসে গায়ে চন্দনের পরশ বুলিয়ে যেত, হয়ত রজনীগন্ধার সুবাস ভেসে আস্‌ত। তোমার কি মনে হয় না বিনুদা, চাঁদের আলোয়, পাতার মর্ম্মরে, ফুলের গন্ধে জড়িয়ে কবিতা আমার সরস হয়ে উঠ্‌ত?'

—'হ্যাঁ, মনে হয় বই কি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তেমনি মৃদু গলায় পরিমল কহিল, 'কিন্তু সে শুভলগ্ন ব্যর্থ হ'লো, বিনুদা।'

বিনয় তাহাকে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে কহিল। কিন্তু সে ঘুমাইল না। করুণ-চোখে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। একটু আগে কোন্ এক ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজিয়াছে। রাস্তার বিরল যানবাহন বিরলতর হইয়া আসিয়াছে। হয়ত মাঝে মাঝে রিক্স'র টুংটাং শোনা যায়, দু-একটা মোটর সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলে। নিঝুম রাত্রির একটা প্রশান্ত যেন এখন স্পর্শ পর্য্যন্ত করা চলে।

পরিমল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃসাড়ে পড়িয়াছিল। একবার নীরবতা ভাঙিয়া ডাকিল, 'বিনুদা!'

—'কি ভাই, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?'

—'না।'

—'তবে?'

—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাই না বিনুদা?'

বিনয় চুপ করিয়া রহিল। রোগী কি যে বলিতে চাহে সে-ই জানে। পরিমল একটু চুপ থাকিয়া কহিয়া গেল, 'এই যে জ্যোৎস্না ওঠা, হাওয়ায়-হাওয়ায় গাছের পাতার ঝিরঝিরাণি, ফুলের গন্ধ,—মানুষ না থাকলে এদের কিই বা আদর হ'ত, কেই-বা সম্মান দেখাতো, কেই-বা কবিতা লিখ্‌তো! মানুষের অনুভূতি আর কল্পনাতেই তো এদের সত্যিকারের দাম, সত্যিকারের রূপগুণ?'

—'তা তো ঠিক, ভাই।'

পরিমল খুশী হইয়া যেন একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,

কহিল, 'জানো বিনুদা, এই জ্যোৎস্নাকে আমার মনে হয় যেন বনজ্যোৎস্নার হাসি। এ আমার কল্পনার রূপ, সেই রূপই আমি চাঁদের আলোতে দেখি। তুমি বনজ্যোৎস্না জানো না, বিনুদা?'

—'না।'

ঠিক আব্দারে একটি মেয়ের মত করিয়া পরিমল কহিল, 'তার নামেই তো আমি কবিতা লিখি, বিনুদা, বনজ্যোৎস্নার নামে।'

বিনয় চম্‌কাইয়া উঠিল। এই মুখ-চোরা ভীরু ছেলেটি আজ তাহাকে সহসা এসব কি কথা বলিতেছে! সে কোনদিন কাহারও কাছে কবিতা লেখে বলিয়াই স্বীকার করিত না। তবে আজ কি জ্বরের ঘোরে মনের সমস্ত গোপন-কথা প্রকাশ করিয়া দিবে?

বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'তুমি বেশী কথা কয়ো না পরিমল, তাতে জ্বর বাড়বে।'

পরিমল পাশ ফিরিয়া অভয়-দেওয়ার সুরে কহিল, 'না বিনুদা, আজ আমায় চুপ করতে বলো না, আজ আমার ভেতর কথার জোয়ার এসেছে।'

বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরিমল ক্ষীণস্বরে বলিয়া চলিল, 'তার নাম বনজ্যোৎস্না, কিন্তু আমার ছন্দের কোঠায় তাকে আমি একটু বদলে দিয়েচি।—তোমার শৌরসেনী শুনতে ভাল লাগে না বিনুদা! সেই,—হলা পিয় সহি?'

—'লাগে।'

—'তাইতে তো তার নাম দিয়েছি বনবাসিনী। কণ্ব মুনির আশ্রমের লতারই মত। নীল রঙের শাড়ি সে পরে, তেমনিতর তনুদেহ। না বিনুদা, রঙ্ তার জ্যোৎস্নার মত নয় সত্যি, কিন্তু হাসি তো ওরই মত।'

বিনয় নীরবে শুনিয়া গেল। পরিমলের কণ্ঠে একটা তৃপ্তির সুর জাগিয়া উঠিয়াছে, বাধা দিয়া তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার মন উঠিতেছিল না। বাহিরের জ্যোৎস্না কেমন জাগর-ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই এক ঝলক সরিয়া আসিয়া রুগ্ন পরিমলের মুখের উপর পড়িল।

গলাটা পরিষ্কার করিয়া পরিমল কহিল, 'জানো বিনুদা, আমার কবিতাগুলি কিন্তু আমার মনেরই কথা। সে কথাগুলো গোপনে মনের ভেতর মৌমাছির মত গুনগুনিয়ে বেড়ায় তাদেরই আমি ছন্দের ভেতর দিয়ে বাইরে আনতে চাই। কিন্তু যে-সব কথা মনের ভেতরে একেবারে ঝল্‌মল্ করে, বাইরে এলে তার রূপ যেন ম্লান হয়ে যায়। সে আমার কি দুঃখ বিনুদা! তবু কেন লিখি জানো?'

—'কেন?'

—'আমার এ আনন্দ বাইরে প্রকাশ না ক'রে আমি থাকতে পারি না বিনুদা।'

বিনয় স্তব্ধ বিস্ময়ে আব্‌ছা বিছানাটার পানে চাহিয়া রহিল। পরিমলের চোখদুটি জ্যোৎস্নালোকে যেন ছলছল করিতেছে। সে যে হাঁ-না কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া পাইল না। রজনী গভীর হইয়াছে। পৃথিবীর বুকে জীবনের একটু স্পন্দনও নাই। আর রুগ্ন পরিমল কবিতার মত করিয়া বোধ হয় বা প্রলাপই বকিয়া যাইতেছে। কথার ভিতরও কেমন একটা জড়তা।

—'বিনুদা!'

—'কেন?'

—'তার কথা ভেবেই তো আমি কবিতা লিখি বিনুদা, কিন্তু সে খবর ও একটুও জানে না।'

—'তুমি ওকে বলনি?'

—'আমি বলব? না বিনুদা, অত সাহস তো আমার নেই। ওর চোখে চোখেও কি আমি চাইতে পারি? ওকে তো আমি এড়িয়েই চলি। কিন্তু তোমাকে আমার মনের কথাটি বললুম বিনুদা, বনজ্যোৎস্নাকে আমি ভালবাসি।'

যে কাহিনী অন্য সময় শুনিলে বিনয় ছোট্ট ছেলেটার পক্কতায় আর দুঃসাহসে বিরূপ হইয়া উঠিত তাহা আর এই নিস্তব্ধ রাতে জ্যোৎস্নালোকে যেমন দোষের মনে হইল না। এ সুরের ভিতর উপহাসের বস্তু আর নাই, শুধু কেমন একটা করুণতার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর চুপ করিয়া দুজনে আরও খানিকক্ষণ কাটাইল। ঘুম-ভাঙা একটা পাখী শিস দিয়া দূর হইতে

সুদূরে চলিয়া গেল। একটু আগে রাত একটা বাজিবার শব্দ কানে আসিয়াছিল। জগতে যে কোন মানুষ জাগিয়া আছে তাহাও মনে হয় না। স্বপ্নের মত একটা আচ্ছন্নতা কেবল যে রাতের গায়েই লাগিয়াছে তাহা নয়, বিনয়ের মনের ভিতরও লাগিয়াছিল। বিনয়ের দিকে পাশ ফিরিয়া পরিমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'আমি কিন্তু এখনও ঘুমোইনি বিনুদা।'

—'ঘুমোও ভাই, আর জেগো না।'

—'কিন্তু তোমাকে একটা কথা না ব'লে ঘুম আমার কোনমতেই আসবে না।'

—'কিসের কথা?'

—'আমার একটি কবিতার কথা। সেটিই আমার সবার চাইতে প্রিয় কবিতা, আমার দরিদ্র ভাণ্ডারের মাণিক্য। সেটি কবে লিখেছিলুম তুমি জানো বিনুদা?'

—'কবে?'

—'যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সেদিন এমনিতর কূল-ভাঙা জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরে গিয়েছিল, হয়ত একাদশী তিথিই; সেদিন যে জগৎটা কেমন ক'রে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল বিনুদা, তা আমি আজও ভেবে পাইনে। এতদিনের চেনা-জগৎ হ'তে জাগর-স্বপ্নের কোন্ এক মায়ালোকে যে চ'লে গেলাম—তার পথে পথে ফুলের রেণু ছড়ানো, তার আকাশ রামকেলীর সুরে ছেয়ে গেছে। আমার কবিতায় সে আনন্দেরই রূপ দিতে গিয়েছিলুম।'

—'ওঃ।'

—'কবিতা না লিখে তো সেদিন আমার উপায় ছিল না, মনের ভেতরটা অবধি যে তখন বীণার মত বাজছিল। জানো বিনুদা, সেই লেখাটার যাত্রারম্ভে কোন্ শুভচিহ্ন দেখেছিলুম?'

—'কোন্ শুভচিহ্ন?'

—'বললে তুমি বিশ্বেস করবে না, বিনুদা, সেদিন এই তরুণ কবিটিকে কবিগুরু নিজে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। টেবিলের উপর মাথা রেখে সে-রাতে অকারণে ফুলে ফুলে যখন কাঁদচি, তখন আমার মনে হ'ল বিনুদা, দেওয়ালে টাঙানো কবির পট হ'তে ওঁর হাতখানা সজীব হয়ে এসে আমার মাথাটি স্পর্শ করে গেল। সত্যি সত্যি চমকে উঠেছিলুম বিনুদা। সেই আশীর্ব্বাদ নিয়েই তো আমার কবিতাটি তৈরি, সে-আশীর্ব্বাদই হয়েছিল আমার ছন্দ-পথের পাথেয়।'

—'সেটিই বুঝি তোমার সবার চাইতে প্রিয় কবিতা?'

—'সবার চাইতে। তার ভেতরই তো বনজ্যোৎস্নার প্রথম আলো পড়েছে। সে কবিতাটির নাম কি জানো, বিনুদা?'

—'কি?'

—'তার নাম দিয়েচি "প্রেম", আমার মনের প্রেমের সেই তো স্বপ্নভঙ্গ, গুহার ভেতর বনজ্যোৎস্নার আলো পড়েছিল কি না?'

বিনয় নাম শুনিয়া একবারে চমকিয়া উঠিল। সেই নামেই তো বোধ হয় একটা কবিতা আজ ফেরৎ আসিয়াছে বলিয়া পরিমলের কটি বন্ধু বলিয়া গেল। সে নিজেও তো এই প্রত্যাখ্যানে কৌতুক বোধ করিয়াছিল, কিন্তু নতুন আবেষ্টনে সে যেন এখন অন্যরূপ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বলিবার আর কিছুই রহিল না।

পরিমল কহিল, 'জানো বিনুদা, কোন কবিতাই আমি কোন দিন ছাপতে পাঠাই না, যারা আমার মনের গোপন কথা, তারা সঙ্গোপনেই থাকে। কিন্তু ঐ কবিতাটিকে আমি কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া বিনয় কহিল, 'ওটাই বা পাঠাতে গেলে কেন পরিমল, ওরা যদি না নেয়?'

আত্মবিশ্বাসের সুরে পরিমল কহিল, 'না বিনুদা, সে ভয় নেই তোমার। ওরা নেবে এ আমার মন বলছে। আমার মনের ভিতরকার পদ্মের সবটা রূপ হয়ত ফোটেনি, তাতে কিন্তু মনের কথা বাইরে আনতে যদি কিছু পাপড়ি ঝরে থাকে, যদি কিছু গন্ধের অপচয় হয়ে থাকে, তবু তাকে চেনা যাবে না এমন নয়, বিনুদা! শুধু আমার ভয় কি জানো?'

'কি?'

—'বসন্ত চলে যাবার পর যদি বেরোয় তবেই আমার

দুঃখ। এ জ্যোৎস্নার গান কি কালবোশেখীর দিনে মানাবে, বিনুদা।”

বিনয় বেদনা-করুণ মুখে পরিমলের অস্ফুট শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিজের কবিতার কত বড় যে একটা দাম দিয়া তাহারই প্রকাশ হওয়ার আশায় সে বসিয়া রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া তখন আর বিনয়ের একটু হাসিও পাইল না। মনের ভিতর কোথায় যেন বেদনা বাজিতেছে।

পরিমল কহিল, 'তুমি বল্‌ছিলে কেন আমি ছাপাতে গেলাম, তাই না? তবে তোমাকে আমার মনের গোপন অভিলাষটুকু বলি, বিনুদা।'

—'বলো।'

পরিমল একটু চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর কহিল, 'ঐ কাগজটা যে বনজ্যোৎস্না পড়ে।'

—'ওঃ।'

—'তাইতেই তো শুধু ওতেই আমার লিখতে যাওয়া। ভাব্‌চি আমার কবিতা লেখা কাগজখানি যখন ওর হাতে পড়বে, বিনুদা, তখন জ্যোৎস্না উঠেছে, হাওয়া জেগেছে। জানলার ধারে বসে বসে সে পড়্‌ছে আমার কবিতাটি, দুপাশ দিয়ে চুল এসে বইয়ের পাতার উপর লুটিয়ে পড়ে, সোনার চুড়িটি লাগে ছাপার আখরের উপর তেরছা করে। মুখখানা তার আনন্দের আভায় উজ্জ্বল, চক্ষু জলে ভর-ভর, মনের ভেতরটা ঝমুঝুম্ করে বাজছে।'

পরিমল এক মিনিট চুপ করিয়া যেন দম্ সংগ্রহ করিয়া লইল। বিনয় একেবারে চিন্তিত উৎকর্ণ হইয়া চেয়ারে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। কবি যে সত্যি-কারেরই কবি হইয়া উঠিল। সুর করিয়াই যেন কথাগুলি বলিতেছে।

পরিমল গলা পর্য্যন্ত রাগ্‌টা টানিয়া লইয়া কহিল, 'আমার কবিতা তবেই সার্থক হয়, বিনুদা। ছন্দ দিয়ে, রঙ দিয়ে আমার সমস্ত ভাললাগা দিয়ে সে কল্পনার রাজ্যটি আমি সৃষ্টি করেছি, সুর করে পড়তে পড়তে বন-জ্যোৎস্নার কল্পনা যদি আমার গড়া কল্পনাকে এক নিমিষের জন্য ছুঁয়ে যায় তবেই আমি ধন্য হয়ে যাব।'

বিনয় কিছুই বলিবার পাইল না। এমনিতর কথা যে কাব্যের পুঁথিতে ছাড়া আর কোথায়ও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে তাহা তাহার কল্পনায়ও ছিল না। কিন্তু এই মধ্যযাম নিশায় জ্যোৎস্নারূপান্তরিত ঘরে একটি শীর্ণ রুগ্ন কিশোর যখন হয়ত জ্বরেরই ঘোরে এই সব কথা তাহাকে বলিয়া গেল তখন তাহার মনের ভিতরটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে পরিমলের কবিতাটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার করুণ দিকটা মর্ম্মান্তিক হইয়া প্রকাশ পাইল। কতখানি আশা যে পরিমলের ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা ভাবিতে বিনয়ের কষ্ট হইতেছিল।

কবি হয়ত সারারাত ধরিয়া এমনই করিয়া প্রলাপের পর প্রলাপ বকিয়া যাইত। কিন্তু আর একটি ছেলে বিনয়কে রিলিভ্ করিতে আসিলে কথাটা সেইখানেই থামিয়া গেল। অবসন্নের মত পরিমল তখন পাশ ফিরিয়া শুইল; শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস আসিয়া বিনয়কে এই খবরটি জানাইয়া গেল যে, পরিমলের অনেক কথাই না বলা রহিয়া গেল।

বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে বিনয় উঠিয়া চলিয়া আসিল। যে কবিতাটি তাহার চোখেও পড়ে নাই তাহার অনুপ্রাসগুলি মনের ভিতর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, কেমন একটা করুণ-ছন্দে মনটা ব্যথিয়া উঠিল। কবিতাটি যখন পরিমলের সমস্ত অনুভূতি দিয়া রচিত, তখন এ কবিতার অমর্য্যাদা সে করিবে কি করিয়া! পরিমলের কৈশোর-স্বপ্নের রঙের আভায় তাহা যে উষার আকাশের মত রাঙিয়া আছে। হয়ত উচ্ছ্বাসের স্রোতে ছন্দ উচ্ছৃঙ্খল, ভাষা হয়ত সুরের মোহে উদ্দাম, কল্পনা হয়ত অসংযত, কিন্তু সকল ত্রুটি সত্ত্বেও পরিমলের ঐ প্রত্যাখ্যাত রচনাটিকে সে কবিতা বলিয়া একান্তভাবে মানিয়া লইল। ঘরে গিয়া বিনয় দেখিল, অসমাপ্ত বইটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। কিন্তু তখন মন আর ইহাতে নাই।

পরদিন বিনয় চঞ্চলকে ডাকিয়া কহিল, 'পরিমলের সেই কবিতাটি কই রে?'

—'পড়বেন্?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আমি নিয়ে আসচি, কিন্তু আপনি জোরসে পেটে বেল্ট আঁটুন,—হাস্‌তে হাস্‌তে তা না হ'লে কিন্তু—'

চঞ্চল তাড়াতাড়ি কবিতাটি আনিতে ছুটিল। কহিয়া গেল, 'আমি কিন্তু পড়ব বিনুদা।'

চঞ্চল একদল ছেলে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আশ্চর্য্য হইয়া বিনয় কহিল, 'এরা কেন?' হাসিয়া চঞ্চল কহিল, 'ওরা সব সমজদার। রবীন্দ্র-পরিষদের মত পরিমল-পরিষদ্ গড়ব ভাবচি।'

তারপর সে পরিমলের সেই ফেরত-আসা কবিতাটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, 'শুনুন তবে,—আর এই দেখুন সতীশ এর ভাব-বস্তুর এরই ভিতর কেমন কার্টুন এঁকে ফেলেছে।'

বিনয় তার হাত হইতে কবিতাটি টানিয়া লইল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, 'চঞ্চল, এই কাবতা আমি ছিঁড়ে ফেলছি।'

—'নানা ছিঁড়্‌বেন না যেন। সমস্ত মজা মাটি হয়ে যাবে।'

—'তা যাক,' বলিয়া বিনয় কাগজটিকে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া জানলা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

চঞ্চল ক্ষোভে দুঃখে রাগে কহিয়া উঠিল, 'কি করলেন!'

বিনয় কহিল, 'ভালই করেছি চঞ্চল, একজনকে ঠাট্টা ক'রে কি লাভ ব'ল?'

—'কিন্তু ও যে একশো বার ঠাট্টার যোগ্য! আপনি একবার পড়লেনও না?'

বিনয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, 'না ভাই, না পড়ে ভালই করেছি। পড়লে হয়ত তোমাদের মতই আমারও হাসি পেত, কিন্তু আমি জানি হাসবার মত কবিতা ও নয়, হাস্‌লে অন্যায় হ'ত, অকরুণ হ'ত।'

চঞ্চল রাগত ভাবে কহিল, 'না পড়ে তবুও জানলেন আমাদের চেয়ে বেশী?'

—'হ্যা ভাই, না পড়েই জেনেছি'—বলিয়া বিনয় সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চঞ্চল ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থ আগন্তুকের দল বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'বিনয় রায় তিন বছরের সিনিয়র হ'য়ে খুব চাল দিচ্ছে।'

ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

ছেলেবেলায় আমরা অধরবাবুর ভারতের ইতিহাস পড়িয়া ভারতের ইতিহাসে প্রথম জ্ঞানলাভ করিয়াছি। তাহাতে প্রথম দিক দিয়াই এই ধরণের কথা ছিল যে, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থাই এই রকম যে, ইহার অধিবাসীরা দুর্ব্বল এবং পরপদানত হইতে বাধ্য। বর্ত্তমানে যে-সকল ইতিহাস-পুস্তক পড়িয়া আমাদের শ্রীমানগণ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাহাতেও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। ভারতের ভাগ্যে যত দুর্গতি ঘটিয়াছে, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থাই তাহার জন্য দায়ী। বাহির হইতে ভারতবর্ষ যে বার-বার আক্রান্ত হইয়াছে, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবই তাহার কারণ। আবার ভারতবাসী যে একতায় মিলিত হইতে পারে নাই এবং বার-বার পরাজিত হইয়া পরপদানত হইয়াছে, তাহার জন্যও দায়ী ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা। এমনি হতভাগ্য দেশে আমরা বাসা বাঁধিয়াছি যে, প্রকৃতিদেবীর চক্রান্তেই আমরা ক্রমশঃ পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসি এবং প্রত্যেক দিগ্বিজয়ীর সম্মুখে নতজানু নতমস্তক হওয়া ছাড়া আমাদের ভাগ্যে অন্য বিধান নাই! পাঠ্য-পুস্তকের গোড়ার দিকটাতেই এই তথ্যের সহিত বালকেরা পরিচিত হয়, তাহাদের মস্তিষ্কে এই তথ্য গভীরভাবে

মুদ্রিত হইয়া যায়। কিশোর বয়স হইতেই তাহারা জানিয়া রাখে, পরাজয় এবং পরাধীনতাই ভারতে বিধাতার বিধান। বড় হইয়া তাহারা যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে, তখন এই তথ্য সত্য কি-না, এই বিতর্ক তাহাদের মনে উদিতই হয় না।

বর্ত্তমানে প্রচলিত কতকগুলি ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বহুলপ্রচার পাঠ্যপুস্তক। তাহাতে আছে :—

"প্রকৃতির প্রভাব। ভারতে বিস্তৃত উর্ব্বর ভূমি আছে। এইখানে নানাপ্রকার শস্য এবং মানুষের প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আবার খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। এই দেশে লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য, মুক্তাহীরকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতসমুদ্রের উপকূলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বন্দর আছে। এই সকল কারণে এককালে ভারতবর্ষ ধনসম্পদে ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে অতিক্রম করিয়াছিল।

"প্রকৃতির এই অপর্য্যাপ্ত দানে ভারতের ভাগ্যে শুভ ও অশুভ, দুই প্রকার ফলই ফলিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হওয়াতে ভারতবাসী প্রকৃতির নয়নমনবিমোহন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিভোর হইবার অবসর পাইয়া কাব্য ও দর্শনের চর্চ্চায় নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল এবং এইজন্যই ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু এই কারণেই আবার ভারতের জনসাধারণ উত্তরের পার্ব্বত্য জাতিসমূহের মত কর্ম্মকুশল ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে নাই; কাজেই ভারতের সমৃদ্ধি-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ সকল পার্ব্বত্য জাতি অনায়াসে বার-বার ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে।

"এতদ্ব্যতীত এদেশের ভূমি ও জলবায়ু সহজ জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল হওয়ায় প্রকৃতির সহিত মানবের সংগ্রাম অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে কখনও তীব্র হইয়া উঠে নাই। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই এবং এই বিষয়ের চর্চ্চা ইউরোপের ন্যায় এদেশে তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

"এই দেশের আয়তন বিশাল। ইহার পর্ব্বতসমূহ গগনস্পর্শী, ইহার নদীগুলি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তৃতিতে অতুলনীয়, এই সকল বাধার ফলে সমগ্র ভারতবাসী এক বিরাট সম্মিলিত জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতীতকালে সমগ্র ভারতবর্ষ বা ইহার অধিকাংশ ভাগকে এক রাজশক্তির অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। বহু আয়াস সহকারে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত, অনতিবিলম্বেই তাহা পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। দেখিতে দেখিতে ভারত বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িত এবং উহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আর অন্ত থাকিত না। এইরূপে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা দেশবাসীর ইতিহাস ও স্বভাব গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

পৃঃ ৪-৫

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য তাঁহার ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য "ভারতবর্ষের নূতন ইতিহাস" নামক পুস্তকে এই সকল কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর তাঁহার ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষ তিনদিকে সমুদ্র-পরিবেষ্টিত হইলেও ভারতীয়েরা কোনও দিন নৌ-সাধনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।...কিন্তু দুই একটি জাতি ব্যতীত ভারতবাসীরা সমুদ্রের এত সান্নিধ্য সত্ত্বেও নাবিকবিদ্যায় দক্ষ হইতে পারে নাই। জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত নৌবল কোনও দিন যে ভারতবাসীর ছিল, তাহা বোধ হয় না।...তাহার কারণ, প্রথমতঃ ইহার তটভাগ সুদীর্ঘ হইলেও, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতের আশ্রয়স্থল হইতে পারে এরূপ সুবিধাজনক স্থান বড় বেশী নাই। দ্বিতীয় কারণ, এদেশের ভূমি স্বভাবতঃই শস্যশালিনী হওয়াতে লোকের উদ্যমশীলতার অভাব। তৃতীয় কারণ এই মনে হয় যে ভারতবাসীরা চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। সমুদ্র পার হইয়া অন্য জাতিকে পরাভব করিয়া অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, এরূপ কল্পনা তাহাদের মনে আসিত না।"

এইবার এই ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য পুস্তকের উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, ইহাদের মধ্যে কতখানি সত্য আছে।

(১) পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি অপেক্ষা ভারতবাসী অতীতে কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব অথবা ভীরুতার পরিচয় দিয়াছে কি না।

কোন জাতি কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী কি না, তাহা সেই জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জগতে সম্ভবতঃ এমন জাতি বা দেশ নাই যাহা কোন-না-কোন-সময়ে অন্য কোন প্রবলতর জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ পৃথিবীব্যাপী তাহারই মূল দেশ ইংলণ্ডের কথা ধরুন না কেন। ইতিহাসের আদি যুগ হইতে ইংলণ্ড বার-বার পরপদানত হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য একথা কোনদিনই কেহ বলিতে সাহস করেন নাই যে, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার কোনো মারাত্মক ত্রুটির জন্য ইতিহাসের আদিযুগ হইতে ইংলণ্ড এইরূপে বার-বার পরপদানত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

এইবার ভারতের কথা বিচার করা যাউক। ইতিহাসে বলে, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদিনিবাস নহে, আর্য্যগণও এদেশে আগন্তুক মাত্র। আর্য্যগণ যখন এদেশে আগমন করেন তখন ভারতবর্ষ দ্রাবিড়গণের অধিকারে ছিল। আর্য্যগণ সম্ভবতঃ সভ্যতায় দ্রাবিড়গণ অপেক্ষা হীনতর

ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা লোহার ব্যবহার জানিতেন এবং তাঁহাদের আর একটি প্রবল যুদ্ধ-সহায় ছিল অশ্ব। এই অশ্ব ও লৌহাস্ত্রের সহায়তায় আর্য্যগণ দ্রাবিড়গণকে উত্তরাপথ হইতে হটাইতে লাগিলেন। কিন্তু দ্রাবিড়গণ কি সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন? দ্রাবিড় ও আর্য্যগণের ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষের কোলাহল আজিও ঋগ্বেদে অমর হইয়া আছে। ভারতবর্ষে বাসহেতু দ্রাবিড়গণ অপদার্থ হইয়া পড়েন নাই। প্রাণপণে লড়িয়া প্রবলতর আর্য্যগণকে তাঁহারা উত্তরাপথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন নাই। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়গণই প্রবল।

ভারতবর্ষ কালক্রমে আর্য্যগণের নিজ বাসভূমি হইয়া উঠিল। আর্য্য আক্রমণের পরে প্রায় দুই হাজার বছর পর্য্যন্ত বাহির হইতে আর কেহ এই দেশ আক্রমণ করিয়াছেন এমন কথা ইতিহাসে পাই না। দুই হাজার বছরে ভারতের জলবায়ুর প্রভাবে আর্য্যগণের স্বভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহা জানিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে প্রবলপ্রতাপ পারস্য-সম্রাট দরায়ুস পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া উহার কতক অংশ অধিকার করেন। মগধে তখন শৈশুনাগ বংশ রাজত্ব করিতেছিল। তাহাদের রাজত্ব পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসেন, তখন এই অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের অধিকারে ছিল। দরায়ুসের আক্রমণকালেও সম্ভবতঃ পঞ্জাবের অবস্থা ঐ প্রকারই ছিল। পঞ্জাবের ছোট ছোট রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব অধিকার প্রবলপ্রতাপ পারস্য-সম্রাটের পক্ষে একটা অসাধারণ বীরত্বের কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পারস্য-সম্রাট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পঞ্জাবের রাজগণ কি করিয়াছিলেন, কতখানি বাধা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। দুই শতাব্দী পরে আলেকজাণ্ডার পারস্য-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। তাঁহার ভারত আক্রমণ পারস্যের ভারতীয় রাজ্যখণ্ড অধিকার করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবু, পারস্যের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার পর এত অল্পকাল মধ্যে যে পঞ্জাবের ক্ষুদ্র রাজগণ জগদ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে এতটা বাধা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পঞ্জাবের এই ক্ষুদ্র রাজগণের প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে।

ক্ষুদ্র রাজা পুরুর সহিত জগদ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এবং আধুনিক বিদেশী ঐতিহাসিকগণ সকলেই সমান শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং কেহই পুরুর বীরত্বের সমাদর করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতে বাস করিয়া আর্য্যগণ ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার দৌরাত্ম্যে বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন কি না এই যুদ্ধ-কাহিনীতে অতি স্পষ্টরূপে তাহা বুঝা যায়।

জগদ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ক্ষুদ্র রাজা পুরুকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য দূতমুখে আহ্বান করিলেন। দর্পিত পুরু উত্তর দিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে তরোয়ালের মুখে এই আহ্বানের উত্তর দিব।" সিন্ধুনদের দুই শাখা চিনাব ও ঝিলামের মধ্যস্থলে পুরুর ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। রাজ্যটির আয়তন ৫০×১০০ মাইলের বেশী নহে। বাঙ্গালী পাঠক এই বলিলেই ভাল বুঝিবেন যে, এই রাজ্য আয়তনে বাঙ্গালার একটি জেলা, মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমান এবং ময়মনসিংহ জেলা অপেক্ষা ছোট ছিল। বাঙ্গালা দেশে বারভূঞার আমলে দুই-একজন ভূঞার রাজ্যও ইহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা যে সাহস করিয়া পৃথিবী-বিজয়ী সেনা ও সেনাপতিগণ সহায় অদ্বিতীয় বীর আলেকজাণ্ডারের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে প্রকৃতির প্রভাবেই যে ভারতবাসী অমানুষ হইয়া যায় বলিয়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা একেবারেই মিথ্যা।

পুরু ও আলেকজাণ্ডারের দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী আমরা গ্রীক ঐতিহাসিকগণের প্রসাদেই জানিতে পারিয়াছি। ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি পুরু কোনরকমেই জগদ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। তবু

এই দ্বন্দ্বের কাহিনী পড়িয়া প্রত্যেক ভারতবাসীই গৌরব অনুভব করিবেন। ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পুরুর এই পরাজয় লক্ষ্য করিয়া প্রাচ্য ভারতীয়ের উপর পাশ্চাত্য গ্রীকের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই প্রথম দেখাইয়াছেন যে, তুলনা যদি করিতে হয় তবে তুলনা করা উচিত সেই-খানে, যেখানে যুদ্ধ সমানে সমানে হইয়াছিল।* চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য যখন ভারত হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন, তখন আলেকজাণ্ডারের রাজ্যের পূর্ব্বাংশের অধিপতি সেলিউকাসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেলিউকাস্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরূপে শত যুদ্ধের নায়কত্ব করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন। নিজ বাহুবলে তিনি আলেকজাণ্ডারের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ অধিকার করিয়া বৃহৎ এক রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কাজেই সেলিউকাস ও ভারতের নবীন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে সমকক্ষ যোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই উভয়ের যুদ্ধের ফল সকলেই জানেন। চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার ও বালুচীস্থান ছাড়িয়া দিয়া এবং সম্ভবতঃ নিজের কন্যা চন্দ্রগুপ্তকে সম্প্রদান করিয়া সেলিউকাস্ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত-সেলিউকাস প্রসঙ্গে আমরা ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, চন্দ্রগুপ্তের যুগে প্রাকৃতিক প্রভাবে ভারতীয়গণ কাবু হইয়া পড়ে নাই। উপযুক্ত নায়ক পাইলে তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকেও তাহারা পরাজিত করিতে সমর্থ।

মৌর্য্য-বংশের পতন এবং গুপ্ত-বংশের উত্থানের মধ্যবর্ত্তী যুগের ভারতের ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। এইমাত্র জানা যায় যে গ্রীক্, পারদ ও শক জাতীয় অনেকগুলি রাজবংশ পর পর বা একই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। ভারতীয় বীরগণ এই সমস্ত রাজ্যলোলুপ বিদেশীয়গণকে কি পরিমাণ বাধা দিতে পারিয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানিবার কোনই উপায় নাই। কেবলমাত্র উজ্জয়িনীরাজ গর্দ্দভিল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য* শকারির কাহিনী হইতে জানা যায় যে, শক, পারদ প্রভৃতি "কষ্টসহিষ্ণু পার্ব্বত্য জাতি"কে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে ভারতীয়গণ উপযুক্ত নায়কের পরিচালনার অপেক্ষা রাখিত মাত্র। বিক্রমাদিত্য শকদিগকে তাড়াইয়া উত্তর-ভারতে একচ্ছত্র হন এবং বিক্রম সম্বতের প্রতিষ্ঠা করেন।

তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শকগণ এক সময়ে ভারতের সমগ্র পশ্চিমাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শক-জাতীয় কুষাণ-সম্রাট কনিষ্কের রাজত্ব উত্তরাপথের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। শক আক্রমণের এই ভীষণ ঝটিকার সম্মুখে ভারতীয়গণের নত হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে শক-জাতির এই পররাষ্ট্র আক্রমণ শুধু প্রবল ঝটিকার সহিতই উপমিত হইতে পারে। প্রবলতর ইউচি জাতির আক্রমণে যখন তাহারা নিজবাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইল তখন নূতন রাষ্ট্র জয় তাহাদের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া উঠিল। তখন মরিয়া হইয়া তাহারা মধ্যএশিয়া ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী গ্রীক্ ও অন্যান্য জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি আক্রমণ করিল এবং ঝড়ের মত ঐগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। ঝড় বহিতে লাগিল এবং অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার আঘাত লাগিল। ভারতের পশ্চিমার্দ্ধের উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিয়া অবশেষে ঝড়ের গতি

* *Outline of Ancient Indian History and Civilization* by Dr. R. C. Majumdar, p. 133.

* এই গর্দ্দভিল্ল বংশের বংশাবলি পুরাণে উদ্ধৃত হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ এই বিক্রমাদিত্যের কাহিনী এবং তাহা দ্বারা বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠার কথা বড় বেশী বিশ্বাস করেন নাই, ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য ইতিহাসগুলিতেও বিক্রমাদিত্য স্থানলাভ করেন নাই। অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত *Cambridge History of India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ষ্টেন কনও সম্পাদিত সদ্যপ্রকাশিত Epigraphia Indicaর দ্বিতীয় খণ্ডে বিজ্ঞ সম্পাদকপ্রবর, অসন্দিগ্ধকণ্ঠে জোরের সহিতই বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিকত্বের সমর্থন করিয়াছেন।

থামিল। এই বিষম শক-ঝটিকা প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে এমন জননায়ক এই যুগে ভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উত্থানে প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ভারত বিদেশীয় আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিখ্যাত ঘটনা—হূন-ঝটিকা বহিতে আরম্ভ হইল। এই ঝটিকার আঘাতে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তরঙ্গের পর প্রবলতর তরঙ্গের মত মধ্যএশিয়া হইতে এই হূণ-আক্রমণ প্রসৃত হইতে লাগিল। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই তরঙ্গের আঘাত প্রথম ইয়ুরোপে অনুভূত হয়। এশিয়াতে হূণগণ পারস্য-রাজ্য অভিভূত করিয়া আফঘানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ কুষাণ-রাজ্যগুলি উন্মূলিত করিয়া প্রবলবেগে আসিয়া ভারতের গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে আঘাত করিল। মহাবীর স্কন্দগুপ্ত কিন্তু এই আঘাতে বিচলিত হইলেন না, সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া তিনি এই বর্ব্বর হূণ-ঝটিকাকে প্রতিঘাত করিলেন। হূণগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে, ৪৮০খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে শতাব্দীকাল অব্যাহত গতিতে বহিয়া ভারতেই প্রথম হূণ-ঝটিকা প্রতিহত হয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পরে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক ও শক আক্রমণেরই মত এই হূণ-আক্রমণও কিছুদিন পর্য্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশেই মাত্র এই আক্রমণের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিল, ভারতীয়গণ এই প্রচণ্ড ঝটিকার প্রথম আঘাতে যেন অনেকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের এই জড়ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল। হূণদের-বিরুদ্ধে ভারতীয় শক্তি জাগিতে লাগিল, গুপ্ত-বংশজ বালাদিত্য এবং মালবের নবোদিত ভূপতি যশোধর্ম্মণের নায়কতায় হূণ-নায়ক মিহিরকুল সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন, ভারতে হূণদের প্রতিপত্তি ফুরাইয়া গেল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, প্রকৃতির প্রভাবে ভারতীয়গণ মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসে নাই।

আরবে উল্কাগতিতে মুসলমান শক্তির অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। এক শতাব্দীর মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং গ্রীক বা স্পেনিস কোন জাতিই মুসলমান বীরগণের গতিরোধ করিতে পারিল না। ভারতের সিন্ধুদেশে প্রথম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান-ঝটিকা আসিয়া আঘাত করে। আর তারাইনের যুদ্ধে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজের পরাজয় হয় এবং এই পরাজয়েই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ যে অবশেষে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহার জন্য কি ভারতের প্রাকৃতিক প্রভাবের দোষ দিব? না, যে মুসলমান আক্রমণ সহিয়া আক্রান্ত কোন দেশই বেশীদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহাকে দীর্ঘ চারি শতাব্দী কাল বাধা দিয়া রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া ভারতীয়গণের বীরত্বের গুণ গাহিব? গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজগণ যে-ভাবে প্রকৃত প্রতিহারীর কাজ করিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের দ্বাররক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ শাহী-রাজবংশ গজনীর সবুক্তিগিনের এবং অসাধারণ যুদ্ধবিশারদ সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যে-ভাবে ভারতীয় রাজগণের শক্তিকে দলবদ্ধ ও জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মহাবীর পৃথ্বীরাজ প্রথম বারের যুদ্ধে ঘোরীকে যে-ভাবে হারাইয়া দিয়াছিলেন, এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই কি মনে হয় না যে, প্রাকৃতিক প্রভাবে ভারতীয়গণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এই কথা একেবারে মিথ্যা? ভারতে সাহস ও বীরত্বের অভাব কোনদিন-ই হয় নাই; কিন্তু যুদ্ধজয় শুধু সাহস ও বীরত্ব থাকিলেই হয় না। যোদ্ধারা যতই বীর হউক না কেন, সেনাপতি যদি মস্তিষ্কহীন হন এবং যুদ্ধকৌশল না বুঝেন, তবে যুদ্ধে

পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তারাইনের যুদ্ধের বিবরণ পড়িয়া বুঝা যায় যে, সম্মুখ যুদ্ধে ঝড়ের মত আক্রমণে পৃথ্বীরাজ খুব ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনায় যে মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি, সুব্যবস্থা ও কৌশল দরকার হয়, হয়ত পৃথ্বীরাজের তাহা ছিল না। যুদ্ধকালে ঘোরী ছল বল কৌশল তিনেরই প্রয়োগ করিতেন, পৃথ্বীরাজ বুঝিতেন কেবল বল। ঘোরী ছিলেন অসাধারণ দৃঢ়সঙ্কল্প কঠোর প্রকৃতি পুরুষ, আর পৃথ্বীরাজ ছিলেন সংগ্রামে বীর, বিরামে বিলাসী ব্যসনী পুরুষ। যুদ্ধকৌশলী সেনাপতি জানেন, যুদ্ধে হার জিত দুই-ই আছে, তাই এক যুদ্ধে হারিলে আবারও যাহাতে যুদ্ধ চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখিয়া তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই আমলের হিন্দু নায়কগণের মস্তিষ্কে যেন এই কথাটার উদয়ই হয় নাই। এক যুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিতেন। তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘোরীর ছলে এবং সেনাপতিত্ব কৌশলে পৃথ্বীরাজ যখন পরাজিত হইলেন, তখন ঘোরীকে বাধা দিবার মত আর কেহ রহিল না। দিল্লী আজমীর অঞ্চল অনায়াসে ঘোরীর অধিকারে আসিয়া গেল। এইরূপে এক যুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করার ফলেই পাঁচ শত বৎসর পরে তালিকোঠার যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাকৃতিক প্রভাবে,এমন কি দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতায়ও যে ভারতবাসী অমানুষ হইয়া যায় নাই এবং সমতল গরম দেশের অধিবাসীও যে পার্ব্বত্য দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে দমনে রাখিতে পারে, পৃথ্বীরাজের পতনের ৫০০ শত বৎসর পরেও পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং তুলিয়া তাহা দেখাইয়াছিলেন।

(২) পাঠ্যপুস্তকগুলির অপর একটি বিষয় যাহার বিচার আবশ্যক, তাহা এই যে, এই দেশের আয়তন অতি বিশাল এবং ইহার উন্নত পর্ব্বত ও বিস্তৃত নদীগুলি ভারতীয়গণকে একতাবদ্ধ হইতে দেয় নাই। কিছুদিনের জন্য একতাবদ্ধ হইলেও অবিলম্বে দেশ নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে মাতিয়া রহিয়াছে

সকলেই জানেন যে, রুশিয়া দেশটি বাদ দিলে ইয়ুরোপ যতটা বড়—একা ভারতবর্ষই ততটা বড়। ইয়ুরোপের রুশিয়া-বর্জ্জিত অংশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য আছে, যথা—জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ইটালি ইত্যাদি। আবার খুব ছোট ছোট স্বাধীন দেশও ইহাদের মধ্যে আছে—পর্ত্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, নরওয়ে, সুইট্জর-ল্যাণ্ড, ইত্যাদি। ইহাদের প্রায় সমস্তগুলি রাজ্যই রোমান অধিকারকালে রোমান্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইহাদের অনেকগুলি রাজ্য মিলাইয়া নেপোলিয়ন এক সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্য ধর্ম্মে এক, সভ্যতায়ও এক। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, এই ইয়ুরোপীয় রাজ্যসমূহের ভাষাগুলির সহিত ল্যাটিন ভাষারও সেই সম্বন্ধ। রোম সাম্রাজ্য ভাঙিয়া এইস্থানে যদি এতগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইয়াও স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিতে পারে, ঐতিহাসিকগণ যদি ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই না দেখেন, তবে ইহাদেরই মিলিত আয়তনের সমান ভারতবর্ষের বেলায়ই যত আপত্তি উঠে কেন ? ভারতের কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘকাল টিকিতে পারে না, উহা ভাঙিয়া বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইবেই। ইহাই স্বাভাবিক। মধ্যে মধ্যে সমরবিশারদ অসাধারণ বীর সম্রাটগণ দেশটাকে একচ্ছত্র করিয়াছেন বটে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, সমুদ্রগুপ্ত,এমন কি হর্ষবর্দ্ধনের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী যোদ্ধা কোনো দেশের ইতিহাসেই সুলভ নহে। তাঁহারা যে স্বীয় প্রতিভা ও বীর্য্যবলে উত্তর-ভারত একচ্ছত্র করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে এই বুঝা যায় যে, আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস্ সিজার, নেপোলিয়ন ইত্যাদি ইয়ুরোপীয় বীরগণের সহিতই তাঁহাদের আসন। ইহাদের লৌহ-মুষ্টি শিথিল হইবামাত্র যে ভারতবর্ষ স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ভারতের উন্নত পর্ব্বতসমূহ (পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে বিশেষ কোনো উন্নত পর্ব্বতের অস্তিত্ব যদিও দেখা যায় না) এবং বিস্তৃত নদীসমূহকে গালি পাড়িবার

আবশ্যকতা নাই। মেদিনীপুর জেলার সমান আয়তনের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর পুরু জগদ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে কি পরিমাণ বাধা দিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে প্রায় সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশ জুড়িয়া এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজা বর্ত্তমান ছিল। ইঁহাদিগকে শাহী বংশ বলিত। ইঁহাদের রাজধানী ছিল উদকভাণ্ডপুর বা বর্ত্তমান ওহিন্দে। এই রাজ্যেরই রাজা জয়পাল উত্তর-ভারতের অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া আমির সবুক্তিগিনের পার্ব্বত্য গজনীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রত্যন্ত রাজ্যের রাজা এইরূপে নিজের কর্ত্তব্য ভাল করিয়াই করিয়াছিলেন। দৈব দুর্য্যোগে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই, সে কথা স্বতন্ত্র। কাজেই বিভিন্নরাজ্যে বিভক্ত হইয়া ভারতের পতন হইয়াছে, অথবা রাজ্যগুলি প্রয়োজনকালে একত্র মিলিয়া কার্য্য করিতে পারে নাই, ইহা সত্য নহে।

(৩) পূর্ব্বে তিন নম্বরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের পুস্তক হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সত্য কি না, তাহা শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়কেই পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ভারতীয়েরা কোনদিন নৌবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহা কি সত্য? অতীতে ভারতবাসীর উদ্যমশীলতার অভাবের অভিযোগটাও কি সত্য? ভারতবাসী কি সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইয়া ঐ সকল দেশ অধিকার করিবার কল্পনা কখনও করে নাই? এই ইতিহাসই কি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থলগণকে শিখিতে হইবে?

ভারতীয়গণ বিদেশ জয় করিয়াছে অধিকাংশস্থলেই সভ্যতা বিস্তার দ্বারা। মারিয়া-কাটিয়া দেশবাসিগণের রক্তে দেশ রঞ্জিত করিয়া দেশজয় করাকেই আমরা প্রকৃত বিজয় বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। তাই ভারত হইতে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে লইয়া অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া অসীম শৌর্য্যের সহিত যে-সকল অধুনাবিস্মৃত মহাপ্রাণ মহাপুরুষ ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে যাইয়া ঐ সকল দেশকে আলোকিত করিয়াছেন বা তাহাতে নবপ্রেরণা জাগাইয়াছেন, তাঁহাদের বিজয় বৈজয়ন্তী কোনদিনই আমাদের চোখে তেমন করিয়া পড়ে না। অবশ্য ভারতের দেশ-বিজয় ব্যাপার সর্ব্বত্রই এইরূপ রক্তপাত ছাড়া হয় নাই। ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণে, ভারত-মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এবং নিকটবর্ত্তী দেশগুলিতে প্রচলিত প্রথামত রক্তের স্রোত বহাইয়াই রাজ্য বিস্তার করিতে হইয়াছিল।

ভারতীয়গণ কোনদিনই নৌবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করে নাই এবং সমুদ্র পার হইয়া রাজ্যজয় করে নাই, এমন কাঁচা কথা মিত্র মহাশয় কি করিয়া লিখিলেন? সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, জাভা, বলি, শ্যাম, কাম্বোজ, চম্পা ইত্যাদি স্থানে হিন্দুরাজ্যের বিস্তার তবে কেমন করিয়া হইল? এই সকল স্থানে হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভের নিকটায়, অথবা তাহারও পূর্ব্বে হইয়াছিল। আমাদের কিন্তু মনে হয়, মিত্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, ঐতিহাসিক সত্য ঠিক তাহার বিপরীত। সমুদ্রপারের ভারতীয়গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের চেষ্টায় ভারত-মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এবং নিকটবর্ত্তী দেশগুলিতে ভারতীয় প্রভুত্ব ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া পঞ্চ শতাব্দীর অধিক কাল এই দেশ অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুসলমানগণের পতনকালে দেশটা যখন ভিতরে বাহিরে সমস্ত রকমে পচিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছিল, ঐ সুযোগে ইংরেজগণ দেশের মালিক হইয়া বসে। এইরূপে পর পর দুইটা বিজয় সম্মুখে রাখিয়া বিদেশী ঐতিহাসিক যখন ভারতের ইতিহাস লিখিতে বসিলেন, তখন তিনি কারণ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন যে, এই দেশটা এত সহজে পরপদানত হয় কেন? ঐতিহাসিক প্রাক্‌মুসলমান যুগের ভারতের ইতিহাসের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে, এই দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাই খারাপ—উহাতেই যুগে যুগে দেশবাসিগণকে দুর্ব্বল করিতেছে এবং পরপদানত করিতেছে।

আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতের প্রকৃত দুর্ব্বলতার কারণ অন্তর্বিধ। জাতিভেদ প্রথার এক ফল এই

দাঁড়াইয়াছিল যে, যুদ্ধ-ব্যবসাটাও জাতিগত হইয়া গিয়াছিল। ব্যবসা বংশগত হইলে অন্যত্র যেমন হয়, এখানেও তেমনি হইয়াছিল। পুরুষ-পরম্পরায় যোদ্ধারা অতিশয় যুদ্ধনিপুণ ও একান্ত নির্ভীক হইয়াছিল; কিন্তু যোদ্ধার জাতিতেই এই সকল গুণ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। দেশের জন্য যুদ্ধ করা যে দেশবাসী সকলেরই কর্ত্তব্য, এই জাতীয় ভাব দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। যোদ্ধার জাতিও আবার যুদ্ধে যত নিপুণ হইত, মস্তিষ্ক-পরিচালনায় ততটা হইত না। ফলে যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গুণের অভাব প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত এবং বৈদেশিক আক্রমণকালে যোদ্ধার জাতি যুদ্ধে মারা গেলে বা পরাজিত হইলে শত্রুকে বাধা দিতে পারে, দেশে এমন আর কেহ থাকিত না। বাধামুক্ত বন্যার মত তখন শত্রু আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিত, শাস্ত্রগতপ্রাণ ব্রাহ্মণ অথবা বাণিজ্যগতপ্রাণ বৈশ্যের এমন সাধ্য থাকিত না যে একবারও তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। প্রবলতম সাম্রাজ্য সমূহেরও পতন হইয়াছে, বর্ত্তমানে যে-সাম্রাজ্যের লোহার গাঁথুনি দেখিয়া মনে হয় উহা কিছুতেই ভাঙিতে পারে না, তাহাতেও কালক্রমে মহাকালের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তথাপি দেখা যায়, কোনো কোনো প্রাচীন সভ্যতা ও জাতি আজিও টিকিয়া আছে। চীন সভ্যতাও চীন জাতির কথা এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে হয়। এই অতিবৃদ্ধ জাতির অঙ্গে আবার যেন যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে। জাতি হিসাবে ভারতীয়গণও বৃদ্ধ হইয়াছে। বিরুদ্ধ মুসলমান সভ্যতার সংঘাতেও উহা কিছু কিছু নূতন জীবনের পরিচয় দিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে উহা নানা দিকেই নবযৌবনচাঞ্চল্য প্রকাশিত করিতেছে। ইতিহাসের শিক্ষা ভারতীয়গণ যদি ভুলিয়া না যায়, তবে ভারতে নবীন জীবন ফিরিয়া আসিবেই আসিবে, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা উহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না।

সমাধান

শ্রীসীতা দেবী

মিত্রদের সংসারটা ছিল সমস্যায় ভরপুর। কোনো ব্যাপারই সেখানে সোজাসুজিরূপে দেখা দিত না। অন্যান্য পরিবারে যাহা গতানুগতিকভাবে চলিয়া যাইত, মিত্র-পরিবারে তাহাই হইয়া দাঁড়াইত গভীর সমস্যা।

বাঙালীর ঘরে ছেলেমেয়ে জন্মাইলেই তাহাদের বিবাহ হয়। সুতরাং রাধামোহন মিত্রের পুত্র কালীমোহনও যে সময় হইলেই বিবাহ করিবে এ বিষয়ে তাহার পিতামাতার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিবাহের বয়স হইবামাত্র মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। ছেলে প্রথমতঃ বলিল, সে বিবাহ করিবে না, বিলাত যাইয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করিবে।

রাধামোহন চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ যখন বিলাত না যাইয়া বিবাহ করিতে পারিয়াছেন, তখন কালীমোহন এমন কি ক্ষণজন্মা যে এই সামান্য কাজটা করিতে পারিবে না?

কালীমোহন বলিল, "সামান্য একটা বি-এ পাসের কি মূল্য? পরিবার প্রতিপালন করবার মত উপার্জ্জন কিসের গুণে করব?"

কথা হইতেছিল বাপের সঙ্গে নয়, মায়ের সঙ্গে। মা দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "শোন ছেলের কথা। কর্ত্তারা কে কবে বিলেত গিয়েছেন? তা ব'লে আমাদের সংসার কি চলেনি? তুই ত এক ছেলে, ভুব্‌নি ত দুদিন বাদে শ্বশুরঘর করতে যাবে, তখন সবই হবে তোর। এতে আর তোর সংসার চল্‌বে না?"

কালীমোহন বলিল, "চোদ্দপুরুষ যা করেছেন, ঠিক

তাই করতে হবে? তার বেশীও কিছু করবার জো নেই, কমও না? তোমাদের সংসার যেমন ক'রে চলেছে, আমার যদি তার চেয়ে ভাল ক'রে চালাবার ইচ্ছে থাকে? দেশে ত মেয়ের মড়ক উপস্থিত হয়নি যে, চারটে বছর সবুর করলেই আর বিয়ে হবে না?"

মা ছেলের নবাবী মেজাজ, সাহেবী পছন্দ ইত্যাদিকে প্রচুর পরিমাণে গাল পাড়িয়া, তখনকার মত তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু সমস্যাটা থাকিয়াই গেল। মায়ের শরীর দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে, কন্যা ভুবন এখন অনেক সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাহার ত বিবাহের বয়স ছাড়াইয়া যাইতেছে, আর ক'দিন তাহাকে ঘরে রাখা যাইবে? তাহার পর একলা হাতে সংসার চালাইবেন কি করিয়া?

ছেলে এই যুক্তির উত্তরে বলিল, "একটা ঝি রাখ।"

মা বলিলেন, "ঝি-চাকর রাখার রেওয়াজ আমাদের নেই বাছা। ঘরের কাজ চিরকাল আমাদের মেয়ে বৌয়েই করেছে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, গতর খাটিয়ে খাওয়া, এই আমাদের নিয়ম। চাকর-ঝির মাইনে গুনতে আমরা পারি না।"

কালীমোহন বলিল, "ঝির মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই ত বউ পুষবে কি ক'রে?"

মা বলিলেন, "তোর মত বেহায়া সাতজন্মে দেখিনি। একটু লাজসরম নেই, নিজের বিয়ের কথা নিয়ে সারাক্ষণ কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। তুই বউ নিয়েই আয়, তারপর পুষতে পারি কি না দেখা যাবে।"

কালীমোহন চুপ করিয়া রহিল। মা একটু ভরসা পাইয়া বলিলেন, "বোস্‌দের সেজ-কর্ত্তার মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ের বয়স হয়েছে। মেয়ে নামেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী। এমন সুন্দরী, ঠিক যেন পটের ছবিটি। তা ব'লে অকর্ম্মা যে কিছু তা নয়, মাত্র বারো বছর বয়স, এরই মধ্যে রান্নাবান্না সব কেমন চমৎকার শিখেছে। বললে তারা এখ্‌খুনি দেয়।"

কালীমোহন রূপসী কর্ম্মিষ্ঠা বধূ সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ না দেখাইয়া চলিয়া গেল। দিনরাত একই কথার আলোচনায় তাহার হাড়-জ্বালাতন ধরিয়া গিয়াছিল। মাকে তবু বক্তৃতা করিয়া কোনো মতে দমাইয়া দেওয়া যায়, বাপের কাছে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। হাজার সাহেবী মেজাজের হইলেও, কালীমোহন এখন পর্য্যন্ত বাপের মুখের উপর কথা বলিতে সাহস পাইত না। রাধামোহন ছেলের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই পাত্রীর খোঁজ সুরু করিয়াছিলেন, এ খবর সে পাইতেছিল, কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করা ছাড়া তাহার উপায় ছিল না।

পাত্রী ঠিক হইয়া গেল, রসময় দত্তের মেয়ে। মস্ত কারবার, শহরে পাকা বাড়ী, গ্রামে পাকা বাড়ী, ঐ এক মেয়ে। ছেলে অবশ্য আছে, তবু মেয়ের নামে দত্তবাবু বেশ-কিছু লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইত। কথাটা সম্ভবতঃ সত্য, কারণ ছেলেটি তাঁহার প্রথম পক্ষের, মেয়েটি দ্বিতীয় পক্ষের। দ্বিতীয়া পত্নী বাঁচিয়াই আছেন, তিনি কি আর মেয়ের জন্য বেশ-কিছু গুছাইয়া না লইয়া ছাড়িয়াছেন? তাহার উপর মেয়েটির চেহারা সুশ্রী নয়, এবং মেজাজটাও কিছু উগ্র বলিয়া বদনাম আছে। সুতরাং বেশ-কিছু হাতে না পাইলে এমন মেয়েকে কে ঘরে বরণ করিয়া আনিবে? মেয়ের মা কোনো এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে কালীমোহনকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন, ঐ ছেলেটিকে তাঁহার জামাই করিয়া দিতেই হইবে। সুয়োরাণীর আবদার, কাজেই রাধামোহন মিত্রের কাছে ঘটক আসিয়া জুটিতে বেশী দেরি হয় নাই।

এবার কিন্তু কালীমোহন মাকে দলে পাইল। গৃহিণী কর্ত্তার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, "কোথাকার এক বড়মানুষের কালো পেত্নী মেয়ে নিয়ে আসছ, আমার হাড় জ্বালাতে? সে কি কুটো ভেঙে দুখান করবে? আমি কি বুড়ো বয়সে বউয়ের বাঁদীগিরি করব? লক্ষ্মীকে হ'লে কেমন মানাত আমার ছেলের পাশে। একে ত সে বিয়ে করতে চায় না, তার উপর কুচ্ছিত বউ হ'লে, ঘরেই নিতে চাইবে না।"

রাধামোহন চটিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী ত নামেই, বাপের ট্যাক হাত্‌ড়ালে ত একটা পাই-পয়সা পাওয়া যায় না! বউয়ের রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? গেরস্ত ঘরের বউ,

মাঝামাঝি হলেই হ'ল। এদিকে যে হাতীর মত মেয়ে ঘরে পুষে রেখেছ, তাকে পার করবে কি দিয়ে? তিন বছর উপরি উপরি অজন্মা গেল, মহাজনের কাছে চালের খড়সুদ্ধ বাঁধা পড়েছে, এ সব ছাড়াবো কোথা থেকে? দত্তরা পাঁচ হাজার নগদ দিচ্ছে, সে খবর রাখ? ছেলের গুণ ত কত, তিনি আবার কালো বউ ঘরে নেবেন না। কেমন না নেন, তাই দেখ্‌ব। চামড়াটা একটু কটা হয়েছে কি না, তাই ধরাকে সরা দেখ্‌ছেন।"

ভুবনের বিবাহের কথা উঠিবামাত্রই গৃহিণী চুপ করিয়া গেলেন। সত্যই ত মেয়ে পার হইবে কেমন করিয়া? তিনি ত আর বাপের বাড়ী হইতে দু দশ হাজার আনিয়া দিতে পারিবেন না। সুতরাং বউ যতই কালো হোক, দত্তের মেয়ের সঙ্গে বিবাহে তাঁহাকে মত করিতেই হইবে। অদৃষ্টে সুখ থাকিলে, এই বউ লইয়াই ছেলের সুখ হইবে।

তিনি ছেলেকে বুঝাইতে গেলেন, সে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "নিজেদের সুবিধার জন্যে বউ আনছ, তোমরা খুশী হলেই হ'ল। আমি বিয়ে করতেই চাই না, জোর ক'রে যখন দিচ্ছ, তখন যেমন হোক আমার কিছু এসে যায় না।"

কথাটা ঠিক, তবু মা বাবা ছেলের বেয়াদবীতে চটিয়া গেলেন। পিতৃভক্তির খাতিরেও কালীমোহনের একটু খুশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজেদের অন্যায়টাও বোধ হয় তাঁহারা মনে মনে বুঝিতেছিলেন, কাজেই এ লইয়া আর বেশী কথা-কাটাকাটি করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না।

কালীমোহনের বিবাহ ঘটা করিয়া হইয়া গেল। বৌভাতও রাধামোহনের অবস্থার পক্ষে ঘটা করিয়াই হইল। কালীমোহন একেবারে চুপ মারিয়া গেল, এমন কি বাসরঘরে পর্য্যন্ত সে কথা বলিল না। শালী শালাজ পাড়ার মেয়ে সকলে রসিকতা করিয়া করিয়া হায়রাণ হইয়া বলিল, "ওমা, একেই এত পছন্দ করে আনা হ'ল? এ যে মাকাল ফল। রূপ থাকলে কি হয়, বোবা যে? ওরে লতি, বেশ বর হয়েছে তোর, যত খুশী বক্তৃতা শোনাস্, কথার জবাব দেবে না।"

নববধূ লতিকা মনে মনে খুবই চটিল, কিন্তু কনে মানুষ, তখন ত আর কিছু বলিতে পারে না, বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া গেল। পনেরো বৎসর বয়সেই সে রাগী স্বভাব এবং একগুঁয়েমীর জন্য গ্রামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবলমাত্র মায়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাড়িতে কেহ তাহাকে একটা কথা বলিতে ভরসা করিত না, না হইলে এতদিন তাহার পিঠে চেলা কাঠ পড়িতে সুরু হইত। মায়ের এক সন্তান, আদরে আদরেই তাহার দিন কাটিত, লেখাপড়া বা কাজকর্ম্ম শিখিবার সুবিধা হয় নাই।

লতিকার বরকে দেখিয়া খুব পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু কথা লুকানো থাকে না, বর যে বিবাহ করিতে চায় নাই, নিতান্ত টাকার লোভে তাহার মা বাপ জোর করিয়া বিবাহ দিতেছে, এ কথা কেমন করিয়া লতিকার কানেও পৌঁছিয়াছিল। কালীমোহনের নীরবতায় এ কথায় সে আরও সায় পাইল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। তাহার মত আদরিণী রাজনন্দিনীকে এত অবহেলা? না-হয় চেহারাই ভাল, তাই বলিয়া এত দেমাক আবার ভাল নয়। তাহাকে ত আর মাগ্‌না ঘরে নিতেছে না? পাঁচ হাজার টাকা পণ, গহনা, কাপড়, বরাভরণ, আসবাব, তৈজসে আরও কোন্ পাঁচ ছয় হাজার না যাইতেছে তাহার সঙ্গে? সুবিধা পাইলে স্বামীকে যে-সকল চোখা চোখা কথা শুনাইয়া দিবে, লতিকা তাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল।

কালীমোহনের মা খুব ঘটা করিয়া বরণ করিয়া বউ ঘরে তুলিলেন। সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "রংটাই যা শ্যামবর্ণ, নইলে চেহারায় খুব শ্রী আছে।" লতিকা যে পরিমাণ সোনা রূপা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে ইহার কম কিছুতেই তাহাকে বলা চলে না। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তখনকার মত স্বীকার করিয়া লইল যে, বধূর চেহারায় সত্যই বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে।

কিন্তু বউ লইয়া সমস্যা বাধিতেও দেরি হইল না। বউ মুখ বুজিয়া সারাদিন কাজ করিবে, হাজার গালা-গালিতে টুঁ শব্দ করিবে না, তবে না সে বউ? হইলই বা বড়মানুষের মেয়ে, বিবাহ হইয়াছে যখন গরীবের ঘরে, তখন তাহাকে সেইভাবে চলিতে হইবে, এবং

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলকে ভক্তি করিতে হইবে।

লতিকা কিন্তু এই সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝিল না। তাহার বাবা মা এত টাকা ঢালিয়া বিবাহ দিয়াছে, আবার সে কাজও করিবে? একে ত এই বিশ্রী খড়ের ঘরে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া আসিতেছে, এখানে থাকিবার কোনোই সুবিধা নাই। পুকুরে গিয়া স্নান করিতে কাপড় কাচিতে হয়, থাকিয়া থাকিয়া উইমাটির ঢেলা মাথার উপর ঝরিয়া পড়ে, একদিন না কি সাপও একটা রান্নাঘরের চাল হইতে পড়িয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইলে কি হয়, সে এতদিন দিব্য আরামে যত্নে থাকিয়াছে, তাহার এ সব বড়ই অসহ্য ঠেকিতে লাগিল। চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে সে নয়, কথাবার্ত্তায় মনের ভাব বেশ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সঙ্গের ঝি-টা সুদ্ধ এমন নাক সিঁটকাইয়া রহিল যেন সেও স্বয়ং নবাব খাঞ্জা খাঁর প্রপৌত্রী।

গৃহিণী ছুটিলেন কর্ত্তার দরবারে নালিশ করিতে। সব শুনিয়া কর্ত্তা হুঁকাটা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "এই রকম যে হতে পারে সে ভয় আমার ছিল। তা দেখ, আমাদের এখনি কিছু বলতে যাওয়া ভাল দেখায় না। বদনাম রটে যাবে যে এক কাঁড়ি টাকা গিলে এখন মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছি। দত্তজাকেও রাগাতে চাই না, টাকাওয়ালা মানুষ, খাতির রাখলে অনেক সুবিধা হয়ে যে ত পারে। এখনকার মত চেপে যাও। বরং কালীকে আড়ালে ডেকে বল, সে বুঝিয়ে বললে বউ শুনবে।"

গৃহিণী গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, "ওমা, এমন কাণ্ড কখনও শুনিনি, মা! বাপের টাকা আছে বলে কি বউ মাথায় চড়ে নাচবে? এই যে আমার ভাই-বৌরা এসেছিল কত বড়মানুষের ঘর থেকে, কিন্তু সাত চড়ে তাদের মুখে রা শুনেছ কেউ?"

ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্ কালু, তুই বউকে একটু বুঝিয়ে বল্, যেন সাম্‌লে চলে। আমি কিছু বলতে গেলে বউকাট্‌কী ব'লে নাম বেরবে এখনি। আর ঐ ঝি মাগীকে বিদায় করতে বল্, আমাদের সংসারে ও-সব পোষাবে না।"

কালীমোহন বলিল, "আর ত দুদিন পরে ওরা চলেই যাবে, তার জন্যে এত হাঙ্গাম কেন? ছ'টা দিন যখন কেটেছে, তখন বাকী ক'টা দিনও কাট্‌বে।"

গৃহিণী বলিলেন, "শোন কথা, একি দুদিন চারদিনের ব্যাপার নাকি? ঝিটাই না হয় আর আসবে না, বউও কি আস্‌বে না, না কি? এই পুজোর মাসটা পার হয়ে গেলেই তাকে আবার নিয়ে আস্‌ব না?"

ছেলে বলিল, "তোমাদের খুশী। আমি সাম্‌নের সপ্তাহে কলকতায় যাচ্ছি, একটা ছেলে পড়ানোর কাজ জুটেছে। এম্-এ পড়ব ঠিক করেছি। পাশ করে, চাকরি-বাকরী জুটলে তবে স্ত্রী নিয়ে যাব। ততদিন যেখানে তোমাদের এবং তাঁদের সুবিধে হয়, ব্যবস্থা কোরো। বোঝাতে-টোঝাতে আমি পারব না, বড়লোকের মেয়ে যখন এনেছিলে তখন এ সবের জন্যে তৈরি থাকাই উচিত ছিল।"

মায়ে ছেলেয় একপালা ঝগড়া হইয়া গেল। কালীমোহন বাহির হইয়া গেল এবং পাশের ঘরে বসিয়া লতিকা প্রতিজ্ঞা করিল যে, স্বামী যদি না থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও সে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর আসিবে না।

কার্য্যতঃ হইলও তাহাই। মেয়ে লইয়া গিয়া রসময় দত্ত রাখিয়াই দিলেন। রাধামোহন যতবার লইয়া যাইবার নাম করিলেন, একটা-না-একটা বাধা উপস্থিত হইল। কখনও মেয়ের অসুখ, কখনও তার মায়ের অসুখ, কখনও বা ভাইয়ের বিয়ে, কখনও বা দিন ভাল নয়। আসল ব্যাপার বুঝিতে কর্ত্তা গিন্নীর বাকি রহিল না, তাঁহাদের সংসারের খাটুনী খাটিতে বড়মানুষের মেয়ে আসিবে না।

গৃহিণী চটিয়া বলিলেন, "ছেলের আবার বিয়ে দেব। ঠ্যাকার দেখ না, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে যখন, তখন তার উপর দাবি কিসের?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে ভাল হ'লে কি আর এত লাঞ্ছনা সইতে হ'ত? কেমন বউ না আসত দেখ্‌তাম। একবার বিয়ে দিতেই জিব বেরিয়ে গিয়েছে, তার আবার বিয়ে দেব। কুলাঙ্গার পেটে ধরেছিলে!"

কালীমোহন সেই যে বিবাহের পর বাড়ী ছাড়িয়াছিল আর ঘরমুখো হয় নাই। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যের খাতিরে এক একখানা চিঠি লিখিত, কিন্তু তাহাতে রসকষ বেশী থাকিত না। লতিকার বন্ধুবান্ধবরা বরের চিঠি দেখিবার জন্য জুলুম করিলে সে মুখ ফুলাইয়া থাকিত। এমন নীরস চিঠি সে দেখাইবে কি করিয়া? স্বামীকে এ লইয়া অনুযোগ দিতে তাহার অভিমানে বাধিত, তবু মনের ঝাঁঝটা একটু-আধটু প্রকাশ পাইত মাঝে মাঝে। কালীমোহন দুঃখিত হইত বটে, কিন্তু চিঠির সুর বদ্‌লাইত না। দুইটা বছর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ইহার ভিতর ভুবনের বিবাহ এবং তাহার মাতার মৃত্যু, এই দুইটি ঘটনাতে কালীমোহনদের সংসার উলটপালট হইয়া গেল। কালীমোহন খুব ভাল ভাবেই পাশ হইয়াছিল, নানাস্থানে কাজের জন্য আবেদনও করিয়াছিল, কিন্তু মাতার মৃত্যু-সংবাদে সে সব ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে চলিয়া আসিল।

রাধামোহন গ্রাম ছাড়িয়া নড়িতে চাহিলেন না। বুড়া বয়সে কোথায় তিনি শহরে গিয়া মরিবেন? ছেলের কাজ হয় ভালই, সে যেন বউ লইয়া গিয়া ঘর-সংসার করে, তাঁহার ছেলের সংসারে থাকিবার সখ নাই।

শাশুড়ীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে লতিকা না আসিয়া পারে নাই। শ্বশুরের কথার ইঙ্গিত সে বুঝিল, কিন্তু তখন সবাই শোকে ম্রিয়মাণ, কাহাকেও কথা শুনাইবার সুযোগ সে পাইল না। স্বামীর চাকরি হইবে এবং সে তাঁহার সঙ্গে শহরে গিয়া বাস করিতে পারিবে, এই সংবাদটায় অবশ্য তাহার মন খানিকটা খুশী না হইয়া পারিল না।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর লতিকাকে আবার বাপের বাড়ী চালান করিয়া কালীমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কপালগুণে তাহার একটা লেক্‌চারারের কাজ জুটিয়া গেল। দুটি মানুষের সংসার এক রকম করিয়া চলিয়া যাইবে আশা করিয়া কালীমোহন বাড়ি ভাড়া করিয়া, স্ত্রীকে আনিবার জন্য এই প্রথমবার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

শ্বশুরবাড়ীতে আদরযত্ন অবশ্য খুবই পাইল, কিন্তু চারিদিকে বড়মানুষীর আতিশয্য দেখিয়া তাহার মন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। এত বিলাসের ভিতর পালিত যে মেয়ে, সে কি স্বামীর অল্প আয়ের সংসারে থাকিতে পারিবে? স্ত্রীর কাছে কথাটা কি ভাবে পাড়া যায় ভাবিতে ভাবিতে সে লতিকার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সে তখন জিনিষ গুছাইতে মহা ব্যস্ত। একটু হাসিয়া বলিল, "জিনিষ যা গুছিয়ে তুললে তা ধরাতে একখানা মার্ব্বল প্যালেস্ দরকার। আমার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাড়িতে ত কুলোবে না।"

লতিকা বাক্স হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "এই ক'টা জিনিষও ধরবে না? তাহ'লে বাড়ি বদল করতে হবে শীগগিরই দেখছি।"

কালীমোহন বলিল, "বড় বাড়ির বড় ভাড়াটা আসবে কোথা থেকে?"

লতিকা জাঁক করিয়া বলিল, "যতদিন বাবা-মা বেঁচে আছেন, ততদিন সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।"

কালীমোহনের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভাল করিয়াই বুঝিল, তাহার সংসার শান্তির হইবে না। যাহা কিছুর প্রতি তাহার বিরাগ, লতিকার সেইগুলির উপরেই অনুরাগ। কিন্তু ভাবিয়া আর হইবে কি? এই স্ত্রী লইয়াই তাহাকে ঘর করিতে হইবে। বাপ মা জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু মন্ত্র পড়িয়া পাণিগ্রহণ সে-ই করিয়াছে। সে নিজে ধর্ম্মত এবং আইনত দায়ী, এ বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের উপায় তাহার নাই।

ঘর-সংসার চলিতে লাগিল এক রকম। শান্তি ইহার মধ্যে বিশেষ ছিল না বটে, কিন্তু সুখ কিছু কিছু ছিল। লতিকার আর যতই দোষ থাক, স্বামীকে সে ভালবাসিত। কালীমোহনও একসঙ্গে বাসের ফলে তাহার প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু লতিকার বড়মানুষী আর হিন্দুয়ানী ফলানোর ঘটাতে তাহাদের মিলনের পথ কণ্টকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কালীমোহন হয়ত আসিয়া বলিল, "লতি, বায়স্কোপে যাবে?"

লতিকা বলিল, "যত সব বেহায়া ছবি দেখ্‌তে কি

চিঠি

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবের

প্রেস, কলিকাতা

যে তোমার ভাল লাগে। আর ওখানে ত মেয়েদের আলাদা বসবার জায়গা নেই? তার চেয়ে থিয়েটারে চল বরং।"

কালীমোহন বলিল, "ছবির বেহায়াপনাতে যত দোষ, আর আসল মানুষের বেহায়াপনায় দোষ নেই? তাও যে-চরিত্রের সব মানুষ! আমাদের দিশী থিয়েটারে মা বোন, স্ত্রী নিয়ে কারো যেতে নেই। ওর হাওয়াতে বিষ আছে।"

লতিকা দেখিল স্বামী অসন্তুষ্ট হইতেছে, কাজেই রক্ষা করিবার চেষ্টায় বলিল, "তবে বক্সে চল, হাজারটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমি বসতে পারব না।"

কালীমোহন উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "থাক, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। আমার ত বাপের জমিদারী নেই, বক্সটক্স আমার পোষায় না।"

"কথায় কথায় খুব বাপ তুল্‌তে শিখেছ," বলিয়া লতিকা রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দিন এইভাবেই কাটিতে লাগিল। লতিকার একটি মেয়ে হইল। চমৎকার সুন্দরী মেয়ে, যে দেখিল সে-ই মুগ্ধ হইল। লতিকার বাপের বাড়ীর লোকেরা বলিল, "লতি, তোকে ত ওর মা মনে হয় না, মনে হয় বোন। এ যেন জামাইয়ের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।"

অন্য কারও সম্বন্ধে এমন কথা তাহাকে শুনিতে হইলে লতিকা রক্ষা রাখিত না। কিন্তু নিজের পেটের মেয়ে, তার উপর ত আর হিংসা করা চলে না। বরং সে যে সুন্দর হইয়াছে তাহাতে মায়ের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিবার কথা। খুশী সে হইয়াও ছিল, তবে দু-একবার মনের ভিতর একটা রাগের ভাব যেন উঁকি মারিয়া গেল, এত বেশী সুন্দর না হয় নাই হইত। তাহার মেয়ে বলিয়া বোঝা গেলে ক্ষতি ছিল কি?

আহ্লাদ করিয়া মেয়ের নাম রাখিল সে অপ্সরা। ইহা লইয়াও ঝগড়া বাধিয়া গেল। কালীমোহন নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ও আবার কি শ্রীর নাম হ'ল? ভদ্রঘরের মেয়ের অমন বিটকেল নাম রাখা উচিত নয়।"

লতিকা চটিয়া বলিল, "সব তাতে খুঁতধরা তোমার এক স্বভাব হয়েছে। অপ্সরা নাম আমি কত বাড়িতে শুনেছি, তারা তোমার চেয়ে কিছু কম ভদ্র নয়, অপু বলে ডাকলেই হবে।"

কালীমোহন বলিল, "তবু হাঁড়ির ভিতর ঐ অপূর্ব্ব নামটি লুকিয়ে রাখা চাই-ই? কি এমন দায় উপস্থিত হয়েছে?"

মেয়ে যখন আধ আধ কথা বলিতে শিখিল, তখন নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "আপ্‌ছারা।" কালীমোহন হাসিয়া বলিত, "তার চেয়ে বল না কেন 'হাঁফ ছাড়া!' তুমি না হাঁফ ছাড়, আমি ছাড়ব বটে, যা না তোমার চমৎকার নাম।"

মেয়ে পাঁচ বছরের হইল। স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া কালীমোহন মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে চলিল। অপুর কান্নায় ব্যথিত হইয়া তাহার মা বলিল, "এখনি খনা লীলাবতী করে না তুল্‌লে চল্‌বে না? মেয়েটা যে কেঁদে খুন হ'ল? দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা ত মেয়ে। বাড়িটা একেবারে খাঁ খাঁ করবে। আর দু-বছর তর সইল না?"

কালীমোহন বলিল, "খনা, লীলাবতী হ'তে সময় লাগ্‌বে, একদিনেই কিছু হবে না। বাড়ি বসে বসে ত খালি বোকামী শিখবে, তার চেয়ে স্কুলেই যাক্‌।"

লতিকা মেয়েকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও গো বাছা, বিদুষী হও গে। আমার কাছে ত খালি বোকামী শিখবে, তোমার বিদ্বান্‌ বাপের পছন্দ হবে না।"

অপু কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। স্কুলে ভর্ত্তি করিবার সময় কালীমোহন মেয়ের নাম লিখাইল "অপর্ণা।" অপু খানিকটা অবাক হইয়া গেল, কিন্তু মস্ত বড় একবাক্স চকোলেট ঘুস পাইয়া সে এই নামটাই মানিয়া লইল।

হঠাৎ একদিন লতিকার মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। খবর আসিল তাহার বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন। কয়েকদিন পরে মায়ের চিঠিতে আরও জানিতে পারিল যে, বাবা তাহার নামে কিছুই লিখিয়া দিয়া যান নাই। লিখিয়া দিবার একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু এমন অসময়ে এমন হঠাৎ যে তিনি যাইবেন তাহা কেহ মনে করে নাই। সতীনপোর হাতে তোলায় তাঁহাকে ইহার

পর বাস করিতে হইবে বলিয়া লতিকার মা ঢের আক্ষেপ করিয়াছেন।

লতিকা একেবারে শয্যাগ্রহণ করিল। কালীমোহন স্ত্রীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাপ মা কারোই চিরদিন থাকেন না। তবে তোমার বাবা একটু বেশী অসময়ে গেলেন বটে। দুঃখ ক'রে কি করবে বল, জগতের নিয়মই এই।"

লতিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গেলেন যে আমায় একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন

কালীমোহনের কানে কথাটা বড় কটু শুনাইল। বাপের শোকের চেয়ে লতিকার টাকার শোকই বেশী হইল না কি? আত্মাভিমানেও তাহার একটু আঘাত লাগিল। অন্য সময় হইলে হয়ত শক্ত কথাই বলিয়া বসিত, কিন্তু লতিকা এখন শোকে কাতর, তাহাকে কড়া কথা বলা অমানুষের কাজ হইবে। স্ত্রীর পিঠের উপর হইতে হাতখানা শুধু সে সরাইয়া লইল এবং বলিল, "পথে বসতে যাবে তুমি কি দুঃখে? তোমার স্বামী ত এখনও মরেনি?"

কালীমোহনের অভিমানটা লতিকা ঠিক বুঝিল কি না সন্দেহ। বলিল, "তবু এর পর আর নিজের বলতে কিছু রইল না। এতদিন যাহোক্ একটা ভরসা ছিল যে তুমি দূর করে দিলেও খাবার পরবার ভাবনা থাকবে না। এখন ত তুমি ঝাঁটা মারলেও এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।"

এত দুঃখেও কালীমোহনের হাসি পাইল। লতিকা তাহাকে ভাল চিনিয়াছে বটে। এতদিন যেন লতিকাকে কেবলমাত্র তাহার বাবার টাকার লোভে সে ঝাঁটা মারিয়া তাড়ায় নাই। এখন যখন আর সে বাধা রহিল না, তখন ঝাঁটা মারিতে অবিলম্বেই সুরু করিবে। স্ত্রীকে আর কিছু না বলিয়া সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লতিকা কেমন যেন হইয়া গেল। টাকার শোকটা তাহার বড় বেশী রকমই লাগিয়াছিল। সারাক্ষণ মুখ ভার করিয়া থাকিত, ভাল করিয়া কথা বলিত না, সংসারের কিছু দেখিত না। কালীমোহন একদিন বলিল, "টাকা পেলে না ব'লে এখন কোথায় আরও গুছিয়ে চলবে, না তুমি যে দেখ্‌ছি আরো গা ঢেলে দিলে?"

লতিকা বলিল, "কিছু আর ভাল লাগে না। সংসারটা যে আমার তা আর মনেই হয় না।"

কালীমোহন বলিল, "বেশ আছ তুমি। স্বামী, মেয়ে কিছু তোমার নিজের নয়, টাকাটাই খালি নিজের ছিল। সেটা যেতেই জগৎ সংসার শূন্য হয়ে গেল?"

লতিকা মুখ ভার করিয়া বলিল, "তা খানিকটা হ'ল বৈকি

কালীমোহনের আর সহ্য হইল না, বলিয়া উঠিল, "টাকা পেলে, আমাদের আর বোধ হয় তোমার কোনো দরকার থাকবে না?"

লতিকা স্বামীর কথার ঝাঁঝে বুঝিল সে রীতিমত চটিয়াছে। কোনো উত্তর না দিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কালীমোহন আশা করিয়াছিল স্ত্রী অন্ততঃ এত বড় অভিযোগ মানিয়া লইবে না। কিন্তু লতিকা কিছু না বলাতে তাহার হৃদয়ে যেন একটা বিষাক্ত তীর ফুটিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, এতদিন সে ভুল বুঝিয়াছিল। লতিকা তাহাকে কোনোদিনও ভালবাসে নাই, ভালবাসিবার ক্ষমতাই তাহার নাই। কালীমোহনেরও পরিবর্তন আরম্ভ হইল। এতদিন স্ত্রীকে নিজের কাছে টানিবার তাহার একটা চেষ্টা ছিল, সকল দিক দিয়া স্ত্রীকে বুঝিবার এবং নিজেকে বুঝাইবার একটা প্রয়াস ছিল। এখন সে এ সবই যেন ত্যাগ করিল, অলক্ষিতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। লতিকা এটা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণটা বুঝিল উল্টা রকম। ব্যথিত মনে ভাবিল, "এখন ত হেলাফেলা করবেই? রূপেগুণে ত যুগ্যি ছিলাম না, টাকার লোভে আমায় এনে ছিল। সে টাকার আশাও যখন গেল, তখন আর আমার কি মান থাকল?" তাহার চালচলন আরও যেন বিগড়াইয়া গেল।

এতদিন টাকা জমানো বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিবার দিকে কালীমোহনের কোনো

ঝোঁক ছিল না। এখন কিন্তু সেইদিকে তার উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। লতিকা অবশ্য এ সকলের খবর বড় একটা পাইত না। আজকাল স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা খুবই কম হইত।

টাকার নেশাটা কালীমোহনকে কেন যে হঠাৎ এমন করিয়া পাইয়া বসিল, তাহা তাহার বন্ধুবান্ধব কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে ব্যাপার কি? এত টাকার খোঁজে মেতে গেলে যে? আর সব সখই যে এর তলায় তলিয়ে গেল? মেয়ের বিয়ের ভাবনা উপস্থিত হয়েছে না কি এরই মধ্যে?"

কালীমোহন বলিল, "সময় থাকতে প্রস্তুত হওয়া ভাল ত? মেয়ের মায়ের যে রকম পছন্দ, হয়ত রাজা বা জমিদার ছাড়া আর কাউকে পছন্দই হবে না, তাঁদের খাঁই মেটাবার ব্যবস্থা এখন থেকে করতে হবে ত?"

বন্ধু বলিল, "নিজে তাহ'লে তোমায় পছন্দ করলেন কেন? বড়মানুষ বলে ত পুরাকালে বিখ্যাত ছিলে না?"

কালীমোহন হাসিয়া বলিল, "তিনি ত স্বয়ম্বরা হননি।"

লোকে নানারকম কানাঘুষা সুরু করিল। হঠাৎ এত টাকার দরকার পড়িল কেন? বদখেয়াল-টেয়াল জুটিতেছে না কি? লতিকার কানেও দুচার-জন শুভাথিনী আভাসে ইঙ্গিতে নানা কথা পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন।

লতিকা কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে চলিল। হইলই বা মূর্খ, নিঃসম্বল, তাই বলিয়া স্বামী যা খুশী তাই করিবে নাকি?

কালীমোহন তাহার কথায় একটু হাসিয়া বলিল, "টাকাই ত চাও? তাহ'লে টাকা রোজগারে মন দিয়েছি বলে চটছ কেন?"

লতিকা ঝাঁঝিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বিদুষী না হলেও একেবারে গাধা নই। আমাকে খুশী করবার জন্তেই তোমার এত মাথাব্যথা পড়েছে বটে!"

কালীমোহন বলিল, "আর কেউ খুশী হবার লোক ত দেখছি না, এক যদি অপুটা হয়। তা তাও টাকার মহিমা বোঝবার মত বয়স এখনও হয়নি।" স্ত্রীর ঝগড়াকে আমলই সে দিল না।

ইদানীং লটারীর টিকিটও সে বার-বার কিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লটারীর টাকা পাইতে প্রায় কাহাকেও শোনা যায় না, কিন্তু কেউ-না-কেউ পায় ত! হয়ত সেও পাইতে পারে। তাহার মনিব্যাগের ভিতরটা গোলাপী ও নীল কাগজের টুকরায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কোনোটা বা গল্ফ জিমখানার, কোনোটা মান্দালের, কোনোটা বিদেশের।

কথায় বলে বিড়ালের ভাগ্যে কখনও শিকা ছেঁড়ে। কালীমোহন হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পাইল যে, সে আশী হাজার টাকা পাইয়াছে। এতবড় সুখবরেও তাহাকে বেশী বিচলিত দেখাইল না; যেন পাইবে বলিয়া এতদিন স্থিরই ছিল। টাকা দিয়া সে কি করিবে, তাহার প্ল্যানও সব প্রস্তুত আছে।

টেলিগ্রামখানা কুড়াইয়া লইয়া সে ভিতরের দিকে চলিল। মাঝপথে অপুর সঙ্গে দেখা হইল। সে পা ভাঙা একটা পুতুলকে পরম বাৎসল্য সহকারে কোলে করিয়া বসিয়া ছিল। কালীমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "অপু মা, তোমায় একটা খুব ভাল প্রেজেণ্ট দেব, তোমার কি চাই বল ত?"

অপু বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "বড় ডলি।"

কন্তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব দেখিয়া কালীমোহন হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আচ্ছা, তাই দেওয়া যাবে।"

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল লতিকা মেয়ের জন্ত ফ্রকে ফুল তুলিতে বসিয়াছে। স্বামীর হাতে টেলিগ্রামের হলদে কাগজ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কি হ'ল আবার? ও কাগজ দেখলেই যেন বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।" কালীমোহন বলিল, "খালি কি খারাপ খবরই আসে? সুখবরও আসে দুচারটা।"

লতিকা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুখবর এল আবার?"

কালীমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লে তুমি সব চেয়ে খুশী হও ?"

লতিকা মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি জানি বুঝি না। কিছুতেই এখন আর বেশী খুশী লাগে না। মেয়েটার একটা খুব ভাল বিয়ে হ'লে খুশী হই, কিন্তু তার এখনও ঢের দেরি। তাকে ধিঙ্গী না ক'রে ত তুমি বিয়ে দেবে না।"

কালীমোহন বলিল, "বেশ, মেয়ে জন্মাতে-না-জন্মাতে বিয়ের ভাবনা। যাক সে ভাবনা পরে ভেবো। সম্প্রতি হাজার পঞ্চাশ টাকা পেলে খুশী হও ?"

লতিকার চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিবার জোগাড় করিল। খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল হয়েছ নাকি ? হঠাৎ অত টাকা এল কোথা থেকে ?"

কালীমোহন বলিল, "লটারী থেকে। আশী হাজার পেয়েছি, পঞ্চাশ হাজার তোমায় লিখে দেব, দশ হাজার অপুর জন্যে থাকবে, আর কুড়ি হাজার আমার।"

লতিকা এইবার আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিল। ফ্রকটা এককোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া আসিয়া কালীমোহনের একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "যাক্, ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।"

কালীমোহন হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে।"

লতিকা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

কালীমোহন বলিল, "এই টাকার বদলে আমায় মুক্তি দিতে হবে। আমি ইউরোপ চলে যাব। পাঁচ-ছ' বছর সেখানে থাকব, নানা জায়গায় বেড়াব। অপুর ভাল ব্যবস্থা করে যাব, সে বোর্ডিংএ থাকবে, ছুটিতে তুমি আন্‌তে চাইলে তোমার কাছে আসবে। মোটের উপর তোমার ঘাড়ে কোনও ভার রইল না। কিন্তু আমার উপর আর কোনো দাবি রেখো না। যদি দেশে ফিরি, তাহ'লেও আলাদাই থাকব।"

লতিকা ধপ্ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। খানিক পরে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাকে তাহ'লে ত্যাগ কর্‌লে ?"

কালীমোহন বলিল, "আমি তোমায় ত্যাগ করিনি লতি, তুমিই আমায় ত্যাগ করেছ, অনেক দিন আগেই। আমি কেবল অবস্থাটা পরিষ্কার করে বল্‌লাম এই যা। একবাড়িতে আমরা এতদিন ছিলাম বটে, কিন্তু দুজনের মনের সঙ্গে দুজনের কোনো সম্পর্কই ছিল না। তুমি ছিলে তোমার ভাবনা নিয়ে, আমি ছিলাম আমার ভাবনা নিয়ে। সাংসারিক অবস্থার গতিকে এতদিন বাধ্য হয়ে একসঙ্গে ছিলাম। এখন আর যখন সে প্রয়োজন রইল না, তখন কেন আর কষ্ট পাওয়া ?"

লতিকার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অপু এই সময় দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া বাপকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা কেন কাঁদছে ? তুমি মাকে বকেছ ?"

কালীমোহন বলিল. "না, আমি বিলেত যাব কিনা তাই তোমার মা কাঁদ্‌ছে।"

অপু নাচিতে নাচিতে দৌড়িয়া আসিয়া কালী-মোহনকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "আমিও বিলেত যাব তোমার সঙ্গে, আমি এখানে থাক্‌ব না। মাও যাবে, না মা ?"

লতিকা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "টাকা আমার চাই না। টাকা নিয়ে কি কর্‌ব ? তোমাদের সুখের জন্যেই টাকা টাকা করতাম, নইলে আমার নিজের কিসের দরকার ? স্বামী যাকে ছেড়ে যাচ্ছে, সে পোড়ারমুখী টাকা নিয়ে কি কর্‌বে ?"

কালীমোহন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাদের বাদ দিয়ে টাকা চাও না ?"

লতিকা সজোরে মাথা নাড়িল, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

কালীমোহন তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল "তুমিও চল আমার সঙ্গে।"

লতিকা বলিল, "যাব। আমি ত লেখাপড়া কিছু জানি না. আমায় নিয়ে কি করে চল্‌বে ?"

কালীমোহন বলিল, "ক'দিনেই শিখে নেবে। তা হ'লে সপরিবারে যাবার ব্যবস্থাই করি ?"

লতিকা বলিল, "আচ্ছা।"

কালীমোহন বলিল, "যাক এতদিনে এই প্রথম দেখলাম যে আমাদের বাড়ির একটা সমস্যার অন্ততঃ সমাধান হ'ল।"

লতিকা বলিল, "গায়ের জোরে সমাধান করতে চাইতে এতদিন, তাই হয়নি। না হ'লে ভাল কথায় মেয়েমানুষকে বোঝালে, সে কবে বোঝে না?"

বঞ্চিতা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু যাব চলে—
চির-পুরাতন কথা ভেঙে চুরে ছন্দে গেঁথে বলে?
শুধু যাব এঁকে—
চির-পুরাতন ছবি সহস্রের পদপ্রান্তে থেকে?
শুধু কি তাহারই তরে, এত দীর্ঘ বর্ষ ধরে অন্তরে আমার
পূজার আসন পাতা? এত মন্ত্র স্তবগাথা, এত উপচার?
যত কাঁদি যত ডাকি, দেবতা আসিবে না কি?
বুঝিবে না ব্যথা?
যত্নে গাঁথা শতক্ষতি, এই তার পরিণতি? এই নিষ্ফলতা?
আমার ঐশ্বর্য তবে, চিরদিনই স্বপ্নে রবে,
মিলিবে না খোঁজ?
ভাগ্যে তবে চিরদিন শুধু লেখা লজ্জাহীন,
এ উচ্ছিষ্ট ভোজ।

সব ব্যর্থ হবে?
সমস্ত জীবন ধরি, যাব অভিনয় করি মিথ্যার উৎসবে?

কেন অযাচিতে
এত বর্ণ, এত আশা, এত প্রীতি, এত ভাষা
এল তবে চিতে?
কেন মোরে ছল করি, সভায় আনিল ধরি,
লজ্জা দিল কেন?
যদি শুনাবার মত বাণী নাহি, নাই হতো অভিনয় হেন!
প্রাণ লয়ে দীর্ঘ বেলা এমন নিষ্ঠুর খেলা নাই হতো মিছে;
দীপ নাহি দিতে তারে, যে-ভিখারী অন্ধকারে
আজন্ম ভ্রমিছে!
কারও খেয়ালের বশে, নাই হতো অপযশে দুরাশার শেষ।
বিড়ম্বনা কেন এই, ঘরে যার অন্ন নেই, তার রাজবেশ?
আছে গীত বাদ্য হাসি, আনন্দিত পুরবাসী,
সাজানো আসর
আছে যাহা-কিছু চাই, শুভলগ্নে শুধু নাই বিবাহের বর!
এ কি নির্যাতন!
কেন দেওয়া স্বর্ণঝারি, যদি তাহে নাহি বারি,
জুড়াতে জীবন?

কে তুমি নির্মম?
অদৃশ্য গোপনবাসী হাসিয়া নিষ্ঠুর হাসি বেদনায় মম
খেলায় আনন্দ আছে, কে যে মরে, কে যে বাঁচে
খেলিবার ঘুঁটি,
অত কি দেখিলে চলে? ঘোরে ফেরে দলে দলে
করে ছুটোছুটি,
শুধু তব ইচ্ছামত; যত চাও দাও তত, উচ্চপদ তারে;
পুনঃ মুহূর্তেক পরে তুলে লয়ে সেথা হ'তে ফেলো একধারে,
কি হইবে বৃথা ভুমি? খেল বন্ধু যত খুশী, শুধু দয়া করে
কর বুদ্ধিহীন জড়, দেখায়ো না কিছু বড়, অধম ছোট রে।

দান ফিরে নাও
তোমার দয়ার পাশে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে দাও মুক্তি দাও!

কেন এ ছলনা?
আর কত কাল মোরে, রাখিবে এমন করে দহিতে বল না?
দণ্ড যদি প্রাপ্য হয়, দাও দণ্ড হে নির্দ্দয়! অধম, নিলাজে,
নিষ্ঠুর চরণাঘাতে, আনো ফিরে চেতনাতে পথ-ধূলিমাঝে!
চূর্ণ হোক সব আশা, মৌন হোক সব ভাষা
শান্ত হোক প্রাণ;
ঘুচাও ঘুচাও লাজ, নীরব হউক আজ ছন্দহীন গান।
বাসনার ভস্মস্তূপে বন্দী করি অন্ধকূপে রাখো অন্ধবৎ
ক্ষণে ক্ষণে রুদ্ধ ঘরে, চোখে যেন নাহি পড়ে বাহিরের পথ।
মোরে দাও অধিকার বিশ্বমাঝে আপনার মূল্য বুঝে নিতে;
সত্য যদি দেয় শোক, যত অকরুণ হোক পারিব সহিতে।
অন্তরে বাহিরে নিত্য, ছলনায় জ্বলে চিত্ত সদা তৃপ্তিহীন,
শূন্যগর্ভ মঞ্জুষার বহিতে পারিনে ভার, আর রাত্রি-দিন।

লজ্জা লও কেড়ে
সহস্রের ভিড় ঠেলি নিজেরে লুকায়ে ফেলি,
সভা যাই ছেড়ে।

১লা ভাদ্র

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বলিদ্বীপ—বাঙ্গ্‌লি ও উবুদ

৪ঠা সেপ্টেম্বর, রবিবার।—

সকালে চিত্রকর Sayers, আমেরিকান Rooseveldt আর একজন জারমান ইঞ্জিনিয়ার কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। বলিদ্বীপের লোকেদের কথা হ'ল। রুসভেল্ট তো উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা ক'রলেন। ব'ললেন, দেশটী একেবারে paradise, স্বর্গ। কবি বললেন, স্বর্গ তো বটে, কিন্তু বাইরের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নানা অভাব আর অসন্তোষও তো আস্‌ছে—এইবারে এই স্বর্গের উদ্যানের দিকে নানা দুঃখ আর অশান্তির বিষ নিয়ে শয়তান-রূপ সর্প আস্তে আস্তে ঢুক্‌বে। রুসভেল্ট ব'ল্‌লেন—আস্তে আস্তে কি ব'ল্‌লেন—the Serpent is gallopping fast into this Eden—ঘোড়া ছুটিয়ে শয়তান এই স্বর্গোদ্যানে এল' ব'লে; বড়ো বড়ো সব দোকান খুল্‌ছে, তাতে নানা শস্তা-মাগ্‌গি ইউরোপীয় চটকদার জিনিস, ইউরোপীয় কাপড়-চোপড়, জুতো, মোটরগাড়ী, ঝুটো গহনা-টহনা সব এসে এদের চিত্তবিভ্রম ঘটিয়ে দিচ্ছে; এদের জীবনের সাবেক সারল্য আর থাক্‌ছে না। এই-সব জিনিসের আবশ্যকতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পয়সারও অভাব ঘ'টবে—তখন বলিদ্বীপ আর

বলিদ্বীপের পুরোহিতের দেবার্চ্চনা

বলিদ্বীপের ভোজের ব্যবস্থা—তরকারী কোটা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত

বলিদ্বীপ থাক্‌বে না। আমি ব'ললুম যে, বিদেশী tourist যে দলে দলে আসতে আরম্ভ ক'রছে, তাদের লা-পরওয়া হ'য়ে দু হাতে খরচ করা টাকার প্রভাবও এ দেশের লোকেদের পক্ষে কতকটা খারাপ হ'চ্ছে। কৃসভেল্ট নিজে টুরিস্টদের পাণ্ডা, এ কথায় তার ঘোরতর আপত্তি হ'ল।

আমাদের বাসার পাশে বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে কার বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে একটা উৎসব আছে—তার ভোজ আজ হবে। তার জন্য ঠিক আমাদের বাড়ীর হাতার পাশেই একজনের বাড়ীর আঙিনায় রান্নাবান্না হ'চ্ছে। আমরা দেখতে গেলুম। তরকারী রান্নাই হচ্ছে চার পাঁচ দল লোক নানা কাজে ব'সে গিয়েছে। কাঁচা বাঁশের মাচার মতন একটা বসবার জায়গায় ব'সে কতকগুলি লোক তরকারী কুটছে, না'রকল কুরছে। দেখলুম, 'নারকল-কোরাটা এরা তরকারীতে বড্ড বেশী ব্যবহার করে। দু-তিনটে আটচালা আছে, সেখানে হয় রান্না চ'লেছে, না হয় সব জিনিসপত্র আগুনে চড়াবার জন্য ব্যবস্থা হ'চ্ছে। বড়ো বড়ো কাঠের বারকোষে, বাঁশের আর বেতের চাঙারীতে আর মাটির গামলায় সব তরী-তরকারী না'রকল-কোরা স্তূপাকার ক'রে রেখে দিয়েছে। কলাপাতা, মোচার খোলা, কলার বাসনা, না'রকলের বালদো পাত্ররূপে খুব ব্যবহার হ'চ্ছে। বলি-

তরকারী রান্না
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

দ্বীপের লোকেরা মাটিতে বসার চেয়ে তক্তাপোসের মতো উঁচু জায়গায়—মাচায় বা রোয়াকে –ব'সেই কাজকর্ম্ম বা

গল্প-গুজব ক'র্‌তে ভালোবাসে। এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে ছোটো কতকগুলি নালার মতন করেছে, নালাগুলি কাঠকয়লার আগুনে ভরা; আর বাঁশের পাতলা

যজ্ঞবাড়ীর রসুইকর
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

চাঁচাড়ীতে মশলাযুক্ত মাংসের কীমা লাগিয়ে সারি সারি বিশ পঁচিশটা কীমাওয়ালা চাঁচাড়ী দুটো বাখারীর ভিতর লট্‌কে' নালার আগুনের উপরে রেখে সীক কাবাবের মতন ক'রে রাঁধছে—একটা দিক রান্না হ'লে বাখারী-শুদ্ধ চাঁচাড়ীগুলি একত্রে উল্টে নিয়ে আর একটা দিক আগুনে রাখ্‌ছে। এ রকম ক'রে মাংসের সীক কাবাব রান্না অদ্ভুত লাগ্‌ল। মাংস হ'চ্ছে সামুদ্রিক কচ্ছপের—আমাদের বাঙলাদেশের কর্ম্ম-বাড়ীতে মাছ কোটার মতন কচ্ছপের মাংস টুকরো টুকরো ক'রে কাটছে, কীমা ক'রছে—কচ্ছপের খোলাও বিস্তর প'ড়ে র'য়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে এই যজ্ঞি বাড়ী দেখলুম। এরা কিছু গ্রাহ্যই ক'রলে না, নিজের নিজের কাজেই নিযুক্ত রইল। বাকে আর স্থরেনবাবু কতকগুলি ছবি তুললেন। জিনিসটা বেশ কৌতুককর লাগ্‌ল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—রাঁধছে কুট্‌নো কুটছে জল প্রভৃতির যোগান দিচ্ছে পুরুষেরা—এখানে একজনও মেয়ে নেই। রান্নাবাড়ীর এদিকে উদিকে কতকগুলি কুকুর ঘোরাঘুরি ক'র্‌ছে।

উবুদে অন্ত্যেষ্টি ব্যাপারের আজ শেষ দিন—আজ বিকালে, সন্ধ্যার দিকে দাহ হবে। পুঙ্গব সুখবতী আজ বিস্তর ইউরোপীয় আর অন্য অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। আমরা এগারোটার সময়ে যাত্রা ক'রলুম। পুঙ্গব সুখবতীর নিমন্ত্রিতেরা সব জড়ো হ'য়েছেন; তাঁর প্রাসাদের একটা আঙিনায় একটা বড়ো আটচালায় চৌকী দিয়ে বসবার জায়গা করা হ'য়েছে। বলিদ্বীপ আর লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারন ছিলেন (এঁর সঙ্গে বলিদ্বীপে পঁউছুবার প্রথম দিনেই বাঙ্‌লির পুঙ্গবের বাড়ীর শ্রাদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল)। আমাদের জাহাজে যে ডচ ব্যারনটী ছিলেন তিনিও সপরিবারে এসেছিলেন, অন্যান্য পরিচিত ডচ কর্ম্মচারী অনেকে ছিলেন—এঁদের সব সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট পরা, ধবধবে সাদা পোষাক। বলিদ্বীপীয় অন্যান্য পুঙ্গব রাজা আর বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। তিন চার দল নানা রকমের গামেলান-বাজিয়ে' ছিল। শ্রীযুক্ত কারনের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করার পরে, আহারের জন্য ডাক প'ড়্‌ল। আর একটা বাড়ীতে টেবিলে ইউ-রোপীয় কায়দায় খাবার জায়গা হ'য়েছে। পুঙ্গব সুখবতীর

মাটীতে আগুন করিয়া মাংস রান্নার প্রক্রিয়া
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

স্ত্রী সেখানে আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ইউরোপীয়ানদের পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন, আমরা ভারতীয় প্রথায় নমস্কার ক'রলুম, তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'রলেন। অতি কৃশা মহিলা, পরণে গাছপালার নকশা-যুক্ত যব-

দ্বীপীয় বাতিক কাপড়ের সারং, গায়ে সাদা ডুরে কাপড়ের মালাই কোর্ত্তা, মাথার চুলে এলো খোঁপা, তাতে গোটা দুই গন্ধরাজ ফুল; দুটী জিনিস বড়ো বিসদৃশ ঠেকল—দাঁতগুলি পান খেয়ে একেবারে কালো রঙ পেয়ে গিয়েছে, আর বাঁ হাতে নখগুলি মস্ত বড়ো ক'রে রাখা। ধনীর ঘরের মেয়ে-পুরুষদের খেটে খেতে হয় না, তাই চীন-দেশে তাদের মধ্যে অনেকে এই রকম বড়ো বড়ো নখ রাখ্‌ত; হয়তো চীনের প্রভাবে এ প্রথা বলিদ্বীপেও এসে থাক্‌বে।

আহারের পদগুলি মিশ্র ইউরোপীয় আর বলীদ্বীপীয়। আহার চুক্‌ল বেলা আড়াইটের দিকে। কবি তারপরে আর থাক্‌তে পারলেন না, পাছে তাঁর আবার শরীর অসুস্থ হয় সেই ভয়ে বিশ্রাম করবার জন্য তাঁকে বাসায় নিয়ে গেল। কোপ্যারব্যার্গ সঙ্গে গেলেন—তিনি আজকেই যবদ্বীপে ফিরবেন—যবদ্বীপের জাহাজ ধ'রবেন। সেখানে তাঁর Java Institute-এর বাৎসরিক সভা আছে, Institute-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁকে সভায় উপস্থিত থাক্‌তেই হবে। এ ছাড়া, কবির যবদ্বীপ ভ্রমণের অনেক ব্যবস্থা তাঁকেই ক'রতে হবে। কবি এত দূর এসেও বলিদ্বীপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষ অনুষ্ঠানগুলি দেখতে পেলেন না, তাই আমরা আপসে দুঃখ ক'রছিলুম। শ্রীযুক্ত কারন ব'ললেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যর দিকে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

তার পরে শবদেহ Wadah 'ওয়াদাঃ' বা বিরাট শববাহী তাজিয়াতে তুলে মিছিল ক'রে গ্রামের বাইরে দাহস্থানে গিয়ে দাহ করা হ'বে। এসব অনুষ্ঠান চুক্‌তে অনেকক্ষণ লাগবে। সকলে তৈরী হ'লে আমরা এই শেষ অঙ্ক দেখতে এলুম।

বাইরে রাস্তায় বিরাট এক মিছিল তৈরী হ'য়ে র'য়েছে; মাথায় নানা উপচার ব'য়ে মেয়েদের দল; বর্শা বল্লম ধ'রে সেকেলে বলিদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাইক বা সেপাইয়ের দল; নানা ইতর ভদ্র ব্যক্তি। নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অনেক পর্দা সাদা কাপড়ে জড়ানো শবদেহ যে মণ্ডপে এ কয় দিন ছিল সেখান থেকে বা'র করা হ'ল। সুর ক'রে গানের ঢঙে বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর ভাঙা সংস্কৃতে মন্ত্র প'ড়তে প'ড়তে দুই তিনটী তোরণ পার হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন মহল পেরিয়ে শবদেহকে পাচীলের উপরের বাঁশের সিঁড়ি-পথ ধ'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ওয়াদা-র উপরে তোলা হল। তারপরে সে বিরাট

উবুদ—প্রাসাদের ভিতরে একটা তোরণ
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

ওয়াদাঃ নিয়ে তার দেড় শ' আন্দাজ বেহারা চ'ল্‌ল, শোভা-যাত্রা শুরু হ'ল। রঙীন কাগজে কাপড়ে আর সোনা রূপার ডাকের সাজে এই ওয়াদাটী দেখতে চমৎকার হ'য়ে ছিল। এর প্রধান অলঙ্কার ছিল, বিরাট পক্ষপুট প্রসার ক'রে এক গরুড় মূর্ত্তি; আর তা ছাড়া মুখসের ধাঁচে তৈরী বিস্তর কাঠের রাক্ষস আর দেবতার মুখও ছিল। শ্মশানভূমিতে পঁউছুলে, আগে

এই ওয়াদাঃ লুট হ'ত, দর্শকরা ইচ্ছে হ'লে যে যা পারত ভেঙে চুরে পছন্দ মত ওয়াদার অলঙ্কার নিয়ে যেতো;

উবুদ সাদা কাপড়ে জড়ানো নীয়মান শবদেহ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

কারণ ওয়াদাটিও আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার নিয়ম। পুঙ্গব সুখবতী কিন্তু স্থির ক'রেছিলেন, এইরকম ক'রে অত যত্নের সঙ্গে খোদা কাঠের মূর্ত্তিগুলি নষ্ট না ক'রে, বা যাকে তাকে না দিয়ে, ওগুলি আগুন লাগাবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে বাতাবিয়ার যাদুঘরে পাঠানো হবে, সেখানে চিরকালের জন্য বলির শিল্পকলার নিদর্শন-হিসাবে রক্ষিত হবে।

মাথার দিকটায় টলমল ক'রতে ক'রতে ওয়াদাঃ তো শোভা-যাত্রার সঙ্গে বেরুলো। আমরা এগিয়ে এসে শোভা-যাত্রা দেখতে লাগ্‌লুম। এই শোভা-যাত্রায় সেই মনোহর-গতি লীলাময়ী জনপদ কন্যা ও বধূদের সারি।—কালকের রাক্ষস-মূর্ত্তি পুতুলের সং ছিল। হাল-ফ্যাশানের পোষাক পরা—অর্থাৎ মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে গলা-আঁটা (বা টাই-কলার-যুক্ত গলা-খোলা) সাদা জীনের কোট, পরণে রঙীন সারং, পায়ে চাপলী—বা সাবেক-ধরণের পোষাকপরা, অর্থাৎ খালি গা, খালি মাথা বা মাথায় একটা রঙীন রুমাল বাঁধা, কানের পাশে ফুল গোঁজা, কোমরে রঙীন উত্তরীয় জড়ানো, পরণে রঙীন ধুতি, খালি পা—এই দু রকম বেশে বলিদ্বীপীয় অভিজাত আর ভদ্র জনগণ। বিস্তর গেঁয়ো লোকও এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি, এক জায়গায় রাজবাড়ীর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে ছাতি ধ'রে কতকগুলি দাসী চাকর; পুঙ্গব সুখবতীর পত্নীকেও দেখলুম। এদের সঙ্গে অতি ফুটফুটে সুন্দরী একটি ছোটো মেয়ে র'য়েছে, মাথায় তার একটি ঝলমলে সোনার ফুলের মুকুট-পরা; শুনলুম, এটী পুঙ্গব সুখবতীর মেয়ে। এঁরা মিছিলের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, মিছিল একটু দেখে

শববাহী 'ওয়াদাঃ'
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

তারপরে দাহ-স্থানে যাবেন। বাকে, সুরেনবাবু, আর ইউরোপীয় দর্শকেরা খুব ফোটোগ্রাফ নিচ্ছেন। আমাদের

পরিচিত বাডুঙ-এর সেই চীনা ফোটোগ্রাফরকেও দেখি, খুব ছবি নিতে ব্যস্ত।

আমরা দাহ-স্থানে গিয়ে পৌছুলুম। সদর রাস্তার

উবুদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

ধারে একটা বড়ো মাঠে দাহের ব্যবস্থা হ'য়েছে। খোলা ঘাসে ঢাকা মাঠ, দু দিকে গাছপালা। মাঠের মাঝখানে

চিতাগৃহ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

খড়ে ছাওয়া একটা মন্দিরের মতন বাড়ী করা হ'য়েছে—যেন বাঙলা দেশের দু-প্রস্থ ছাদবিশিষ্ট খ'ড়ো ঘর। এটা হ'চ্ছে চিতা-গৃহ। এর ভিতরে ইটের বেদির উপরে বিরাট একটি কাষ্ঠময় কৃষ্ণবর্ণ বৃষ-মূর্তি। ঘরের সাম্‌নেই বাঁশের উঁচু একটা সিঁড়ি-পথ। ওয়াদাটিকে এনে এই সিঁড়ি-পথের সামনে রাখা হয়। তারপর শবদেহ উঁচু ওয়াদা থেকে এই বাঁশের সিঁড়ি পথ বেয়ে সরাসরি চিতাগৃহের কাষ্ঠময় বৃষ-মূর্তির খোদাই করা ফাঁপা পিঠের ভিতরে নামিয়ে রাখা হয়। চিতাগৃহের পিছনে খানিক দূরে বাঁশের আর একটা ঘর বানিয়েছে, এটীতে রাজবাড়ীর মেয়েরা এসে সমবেত হ'লেন। আর তার অপর পাশে বিদেশী আর স্বদেশী অভ্যাগতদের বসবার জন্য একটা চালাঘর তৈরী করা হ'য়েছে। ইতস্ততঃ লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই দাহস্থানে চার দিক থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বাডুঙ থেকে বোম্বাইয়ে' খোজার দল, চীনে দোকানার দল, আরব ফেরিওয়ালারা—সব এসেছে। দাহস্থানে মাঠের মধ্যে ছোটোখাটো আরও কতকগুলি চিতাগৃহ তৈরী হ'য়েছে; আর যারা খরচ ক'রে খড়ের ঘর তুলতে পারে নি, তারা অমনি একটা মাচা বেঁধে তার উপরে বৃষ বা সিংহ বা মৎস্য মূর্তির শবাধার সাজিয়ে রেখেছে। জনকতক ভারিক্কে চেহারার ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খালি গায়ে, রঙীন উত্তরীয় আর কাপড় পরা, বোধ হয় এঁরা এই অঞ্চলের পদণ্ড বা মাতব্বর ব্যক্তি হবেন।

সন্ধ্যার দিকে, মাইল দেড়েক দূর রাজপ্রাসাদ থেকে মিছিলের মধ্যে শবাধার দাহস্থানে এসে পৌছুল। ওয়াদার উপরে ব'সে আর দাড়িয়ে সাদা কাপড়-পরা জনকতক পদণ্ড, আর পুঙ্গব সুগবতীর ভাইটি—যার কথা আগে উল্লেখ ক'রেছি। ওয়াদাটিকে চিতাগৃহের সংশ্লিষ্ট সিঁড়ি পথের সঙ্গে মিলিয়ে দাঁড় করালে। শ্বেতবস্ত্রে জড়িত শবদেহ কাঁধে ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি-পথ দিয়ে নীচে নামালে। দেহের সঙ্গে দুই রাজ-ছত্র চ'ল্‌ল। দেহ নীচে নামিয়ে কাষ্ঠময় বৃষের অভ্যন্তরে রাখা হ'ল। সেখানে

[illegible]
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত

মন্ত্র পড়ছিলেন। ভারে ভারে তীর্থ-জল নিয়ে মেয়েরা চল। মন্ত্র প'ড়ে প'ড়ে এই তীর্থ-জল দিয়ে বস্ত্রাচ্ছাদিত

ওয়াদাঃ হইতে শবদেহের অবতরণ
শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

মৃত দেহের স্নান চ'ল্‌ল—অনেকক্ষণ ধ'রে। ইতি মধ্যে ওয়াদাটিকে সরিয়ে নিয়ে একটু দূরে রেখে দিলে, আর তার অলঙ্কার-স্বরূপ কাঠের মূর্ত্তি-টূর্ত্তি আস্তে আস্তে খুলে নিলে। তারপরে তার অন্য অলঙ্কার রঙীন কাগজ আর জগজগা আর ডাকের সাজ নিয়ে সমাগত বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে খানিক কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। আমাদের মধ্যে বাকে গিয়ে খানিকটা ডাকের সাজের ঝালরের মতন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন।

বড়ো ওয়াদার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের যার যেমন সামর্থ্য তদনুসারে ছোটো আকারের আরও কতকগুলি ওয়াদাঃ এল। যারা নেহাৎ গরীব, তারা কেবল মাথায় ক'রে মৃতের আত্মার 'পুষ্প' বা প্রতীক নিয়ে এল—তাদের আত্মীয়দের মৃতদেহ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে এই সকল ওয়াদাঃ বা 'পুষ্প', যার যার চিতা-গৃহের কাছে বা চিতা-বৃষ, চিতা-সিংহ বা চিতামৎস্যের কাছে নি গেল। সেখানেও এই রকম তীর্থজলে স্নানের আর ম পাঠের ধূম চ'ল্‌ল।

মন্ত্রপাঠ আর অভিষেক যখন শেষ হ'ল, তখ

চিতা-বৃষের উপর শবদেহ স্থাপন
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত ।

শ্রাদ্ধাধিকারী-হিসাবে পুঙ্গব সুখবতী চিতায় আগুন দেবার জন্য এলেন। ইনি সাধারণ দৈনন্দিন পোষাকেই ছিলেন, পায়ে জুতাও ছিল, গায়ে সাদা কোট, পরণে রঙীন সারং, মাথায় রুমাল বাঁধা—আমাদের দেশের মত অশৌচ-পালনের কিছু দেখলুম না। কতকগুলি লম্বা কাঠির তাড়ায় আগুন জেলে কাষ্ঠময় বৃষের পেটের তলায় দিলেন, আর চাকর-বাকর আর অন্য লোকেরা খড় কাঠ নিয়ে বৃষমূর্ত্তির চারদিকে স্তুপাকার ক'রে রাখলে, নিমেষের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ'লে উঠ্‌ল। ওদিকে বিরাট ওয়াদাটাতেও আগুন ধরিয়ে দিলে। আর ঐ সঙ্গে অন্যান্য চিতা আর ওয়াদাঃও জ'লে উঠ্‌ল।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'য়ে এল। ক্রমে অন্ধকার রাত্রি এসে প'ড়্‌ল। আমরা ব'সে ব'সে বা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলুম। চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড। এতগুলি চিতা, ছোটো আর বড়ো, ক্ষুদ্র আর বিরাট এত অগ্নিস্তূপ এক জায়গায় কখনও দেখিনি। আগুনের লাল আভায় গায়ে দূর থেকে চলা-ফেরা ক'র্‌ছে বলিদ্বীপীয় লোকেদের কালো ছায়ার মতন দেখাতে লাগ্‌ল।

দু-তালার সমান উঁচু ওয়াদাটা সর্ব্বাঙ্গে কাগজে আর কাপড়ে মোড়া হওয়ায় একসঙ্গে সবটা জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। সে এক মনোহর দৃশ্য—যেন গগনস্পর্শী অগ্নিময় মন্দির। তারপরে খুব খানিকটা পুড়ে এই বৃহৎ আগুনের পাহাড়—তার বাঁশের সমস্ত কাঠামো সমেত এক পাশে ঝুঁকে প'ড়্‌ল, আর তার পরে হয় তো ভূমিসাৎ হ'য়ে যেত, কিন্তু তা না হ'য়ে পাশের একটা খুব উঁচু গাছের গায়ে হেলান দিয়ে প'ড়্‌ল। বিরাট বিশাল ওয়াদার এই অগ্নিময় আলিঙ্গনে গাছের সহমরণ ঘ'টল, চড়-চড় শব্দে গাছের কাঁচা ডালপালা ঝ'ল্‌সে গিয়ে পুড়তে আরম্ভ ক'রলে। জলন্ত ওয়াদার আগুন আর গাছের আগুন দুইয়ে মিলে এক 'বিকটোজ্জ্বল' দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রলে। ছোটো ওয়াদাঃ দুই একটার পাশে যে ছোটোখাটো গাছ ছিল তাদেরও এই দশা হ'ল।

চিতাগৃহে বৃষের মূর্ত্তি খুব জ্ব'লতে জ্ব'লতে, ঘরের চালে আগুন লাগ্‌ল। এইরূপে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিজ অনুগামী স্বগ্রাম আর স্বদেশবাসীদের সঙ্গে পুঙ্গব সুখবতীর পিতৃব্য ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ ক'রলেন।

আমরা তারপরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলুম। রাত্রি খানিক হ'য়েছে, নির্ব্বাণ আগুনের ছাইয়ের স্তূপ দেখবার আবশ্যকতা ছিল না। শুনলুম, মৃতের আত্মীয়েরা সারা রাত দাহ-স্থানে থাক্‌বেন। তারপরে চিতাভস্ম কিছু নিয়ে নিকটে কোনও বড়ো নদী থাকলে সেই নদীতে, নয় সমুদ্র কাছে হ'লে সমুদ্রে ফেলে দেবেন, তার পরে স্নান ক'রে বাড়ী ফিরবেন।

বলিদ্বীপের অভিজাত বংশে এইরূপ ঘটা ক'রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আর বেশী দিন ধ'রে চ'লবে না বোধ হয়। সমস্ত ব্যাপারে পুঙ্গব সুখবতীর প্রায় চল্লিশ হাজার গিলডার—আমাদের হাজার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ টাকা—খরচ হ'য়েছিল। ছোটো দ্বীপের এক জন জমীদারের পক্ষে টাকাটা কম নয়। তা ছাড়া, মৃত্যুর এতদিন পরে দেহের সংকার—এ বীভৎস প্রথাটাও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ক'মে আসবে। ইউরোপীয় শিক্ষা, মুসলমানদের দৃষ্টান্ত, আর মূল হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে প্রবর্দ্ধমান পরিচয়—এ সবে মিলে এই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠান বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মনের ধারণা ক্রমে অন্য রকম ক'রে দেবেই। যাই হোক, আমরা কিন্তু যে জগৎ চ'লে যাচ্ছে তার একটা অতি বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখে গেলুম।

৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।—

আজ বাডুঙে আমাদের শেষ দিন। আজ আমরা

বলিদ্বীপ—ইন্দ্রাসন গৃহের দেবমন্দির

উত্তর-পশ্চিম বলির পাহাড়ে অঞ্চলে Moendoek মুণ্ডুক্ ব'লে একটী স্থানে যাবো—এটাকে এই দ্বীপের সিমলা বা দার্জ্জিলিঙ বলা যায়। এখানে তিন দিন কবির সঙ্গে থাক্‌বো, তারপরে বুলেলেঙ হ'য়ে যবদ্বীপে ফিরবো—বলিদ্বীপের ভ্রমণ আমাদের সাঙ্গ হবে।

বাডুঙ শহরে একটী সুন্দর সেকেলে প্রাসাদ সরকার থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এই প্রাসাদটীর

নাম Poera Satrija অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-পুর বা প্রাসাদ, একে ডচেরা 'পুরা-সাত্রিয়ার মিউজিয়ম' বলে। খালি সুন্দর বাড়াটী প'ড়ে আছে, শূন্য পুরী খাঁ খাঁ ক'রছে; মিউজিয়ম ব'ললে যে নানা জিনিসের সংগ্রহ বোঝায়, তার কিছুই নেই। তবে বন-জঙ্গল হয় নি, সরকার থেকে সাফ-সুথরা রাখে, কতকগুলি ঘরে চাবি দেওয়া থাকে। বাড়ীটী এমন বড়ো নয়। দু-মহলা বলা চলে। বলিদ্বীপীয় রীতিতে বাড়ীর বাইরে একটা স্নানের জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে জলের ব্যবস্থা আর নেই। একটা চমৎকার আর বেশ উঁচু ছত্‌রী আছে, যা'র

বাছুঙ্‌ পুরা-সাত্রিয়ার ছত্তরী
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

বাড়ীর এক কোণে। বাড়ীর বাইরে একটা ঘড়ী বাজাবার টুঙ্গি-ঘর আছে। বেশ পরিষ্কার খোলা জায়গায়, বড়ো বড়ো দুই আঙিনা,—একটা বড়ো ঘর, পাশে ছোটো ঘর; আর একটা ছোটো দেবমন্দির, দেবতা অবশ্য নেই। অনেক প্রাসাদের সংশ্লিষ্ট এই রকম ছোটো দেবমন্দির থাকে, আর পাথরের কাজে সেগুলি দেখতে অতি সুন্দর
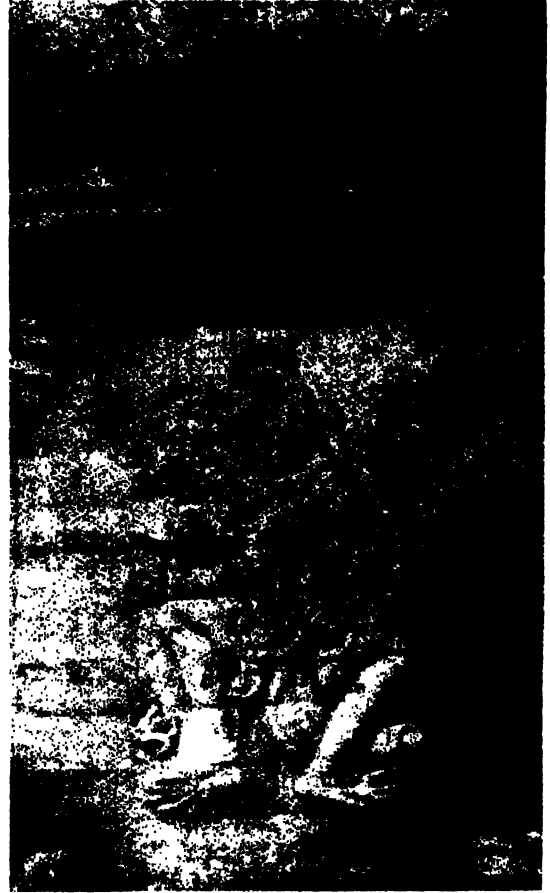
পুরা-সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত হনুমান মূর্তি
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

হয়। পুরা-সাত্রিয়াতে আর একটা দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, এর ঘড়ী-ঘরের সামনেকার বাইরের দিককার দেওয়ালের গায়ে নরম পাথরের ইটের উপরে খোদা কতকগুলি মূর্তি—bas-relief—এক একটা ক'রে মূর্তি বলিদ্বীপীয় শিল্প রীতি অনুসারে খোদা, খুব চমৎকার দেখতে, বেশ প্রাণযুক্ত মূর্তি ক'টী। আলাদা আলাদা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা হনুমান অঙ্গদ বিভীষণ প্রভৃতি রামায়ণের পাত্রপাত্রীদের মূর্তি। আবার তা ছাড়া মহাভারতের পাঁচ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর মূর্তি; সব-শুদ্ধ গুটি চোদ্দ-

পনেরো মূর্ত্তি, মেটে রঙের পাথরে কেটে তৈরী, হাত দুই লম্বা প্রত্যেকটা। এই মূর্ত্তিগুলি বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পুরা-সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত সীতামূর্ত্তি
[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত]

সুরেন বাবু পুরা-সাত্রিয়ার ছবি নিচ্ছেন এমন সময়ে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় ছোকরা এসে উপস্থিত হ'ল। ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে কথা কইলুম। এদের জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তোমরা কি? তোমাদের ধর্ম্ম কি? একটা ছেলে ব'ললে,'আমরা "বালি কাপির","স্লাম" নই; অর্থাৎ, বলিদ্বীপীয় "কাফের" বা হিন্দু,"ইস্লাম" বা মুসলমান নই।' বুঝলুম, আরবেরা আর যবদ্বীপীয় আর অন্য মালাই-ভাষী মুসলমানেরা, হিন্দু বলিদ্বীপীয়দের 'কাফের' ব'লে থাকে, আর 'কাফের' শব্দের অর্থ না বুঝে এরাও সরল মনে বিধর্ম্মীদের দেওয়া এই অবজ্ঞা-সূচক নাম নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে। আমি ছোকরাদের বললুম—'কাপির' ব'লো না, 'কাপির' একটা গালির কথা; ব'লো যে আমরা হিন্দু, বা বালির ধর্ম্মের লোক (ওরাং হিন্দু, ওরাং অগামা বালি)। 'হিন্দু' শব্দ এরা শুনেছে, তার মানেও জানে। ছেলে কয়টার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরও কথা কয়, কিন্তু

পুরা-সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত রামচন্দ্র মূর্ত্তি
[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গৃহীত]

ভাষাজ্ঞানের অভাবে আমাদের আলাপ বেশী দূর এগোল' না।

প্রাতরাশ সেরে, মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে, বেলা দশটার সময় আমরা বাড়ুঙ থেকে রওনা হ'লুম।

ক্রমশঃ

প্রাণলক্ষ্মী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আঁধার তিথিতে কানন-বীথিতে
তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি
হিমগদ্গদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াশায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্ম-মরণ-অতীত বেলায়
স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায়
এক হোলো একেবারে॥

সূর্য্য যখন উড়ালো কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জান্‌তে।
সেই ধ্বনি ধায় বকুল শাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।
অরুণরথের সে ধ্বনি, পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে॥

তিমির-ভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে,
নব-জাগরণ পরশরতন
আকাশে এলো অলক্ষ্যে
কিশলয়দল হোলো চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুর লক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
দুলে বিশ্বের চক্ষে।

অবগুণ্ঠিত তব চারি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত
শুধু ঝিল্লির ঘন ঝঙ্কার
নীরবের বুকে বাজে।
কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে॥

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য ?
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ন ?
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে-পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়॥

ন্যুয়র্ক। ১৮ নবেম্বর, ১৯৩০।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেক দিন হইতে ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য। তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি-এ পাস করিয়া এটর্নির আর্টিক্‌ল্‌ড্‌ ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইন্‌ষ্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আর ক্রীতদাসের কার্য্য করাইয়া লইলে চলিবে না। 'Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water।" দিনরাত আজকাল তাহার কেমন একটা উত্তেজনা—একটা স্বপ্নের মধ্যে দিন কাটে। ইহারই মধ্যে সে নিজেকে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ বলিয়া ভাবে। কিন্তু ইংলণ্ডকে তো সাহায্য করিতে হইবে

সেজন্য? প্রতিদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলে ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসে, যুদ্ধের ঋণ দানে কোন প্রদেশ অগ্রগামী হইতেছে। বাংলা পাঁচ কোটী, বোম্বাই সাড়ে চার কোটী! বাংলা জিতিতেছে।

এই সময়েই একদিন ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে কি অপূর্ব্ব মনের ভাব, আনন্দ!

জোয়ান অক্ আর্ককে রোমান্ ক্যাথলিক যাজক-শক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তাহার শৈশবের আনন্দ মুহূর্ত্তের সঙ্গিনী সেই পল্লী-বালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধারে শান্ত বাব্‌লা বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভরা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়!

বড় হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিন্‌মিনে, পান্‌সে—তাদের কাছে সে কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড় ইতিহাসে জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্য্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্ত্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুক তারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখদৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কলকাকলীময়, ফুল-ফোটা, অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে বাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—প্রীতি, না? এগ্-জিবিশন্ দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভাল আছ? প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী একটী প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা? আমার মাষ্টার মশায় অপূর্ব্ব বাবু—সেই অপূর্ব্ব বাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন! দেখুন, কত ছোট ছিলুম, বুঝ্‌তুম কি কিছু? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনো সন্ধানই কেউ বল্‌তে পারলে না।

আপনি আজকাল কি করচেন মাষ্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের আপিসে চাকরীও করি—

—আচ্ছা মাষ্টার মশায়, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ী কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্ব্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে-সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয়নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল, মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে ...তোমার বিচারের অধিকার কি?

আরও মাস দুই কোনো রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় গেল বাড়ী। সে দিন ষষ্ঠী, বাড়ীর উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসি কলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল! পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জল-যোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আলতা সিঁদুর পরাইয়াছে—হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস এলে। ভাব্‌ছিলাম এমন কপার বড়াটা আজ ভাঙলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা হও—অমন পেটুক কেন তুমি ?···পেটুক গোপাল কোথাকার।

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল—এগুলো খেয়ে ফেল, তারপর আরও দেব -দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি কম হয় নি তো ?···তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না ? খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেচে করতে !···বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল—বাঃ, ও রকম আল্পনা দিয়েচে কে ? ভারী সুন্দর তো ! অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে তো এলে না ! আমি বাড়ীতে পূজো করলাম, মা করতেন, সিঁদুর মাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েচে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দুটি খেতে পেতে গো—তারই ঐ আল্পনা—

—তাই তো ! তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেচো দেখ্‌চি ! লক্ষ্মীপুজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারী ভালো লাগে অপর্ণা—সত্যি, মা-ও খুব খাওয়াতে ভালবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেচি —একজন বুড়ো মত লোক আমাদের উঠানের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, খোকা খিদে পেয়েচে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পার ?···আমি মাকে গিয়ে বল্লাম, মা, একজন মুড়ি খেতে চাচ্চে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারী খুসী হবে - খাওয়াবে মা ? মা কি করলে বলো তো ?

—রুটী তৈরী করে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু করে সরের ঘি করে রাখ্‌তো, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়ী-টাড়ী এলে পাতে দিত, আমায় খুসি করবার জন্যে। মা সেই ঘি দিয়ে আটদশ খানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলে। লোকটা তো অবাক্, তার মুখের এমন ভাব হোলো !—

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেচেন, পূজোর পরে মুরারি দা আসবে নিতে, পাঁচ ছ মাস যাইনি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে ?

অপুর বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ী আসিল, আর এদিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ী যাইবার জন্ত পা বাড়াইয়া আছে ? সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপের বাড়ী যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয়।

অপু উদাস সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমা যাওয়া ঘটবে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয় সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। অপ খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবার যে বইগুলো এনে আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আন না ? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময় এক আধ কথায় জবাব পাইয়া ভাবিল সারাদিনে কষ্টে স্বামীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাই পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করি বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি সুরু করিল অপু বলিল—পাগল ! ছুটী কোথায় যে যাব আমি ? বোন্‌কে নিতে এসেচ, বোন্‌কেই নিয়ে যাও ভাই- আমরা গরীব চাকুরে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে ?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহা যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে ? দো-টানা মধ্যে পড়িয়া সে বড় মুস্কিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল- দ্যাখো, আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারি-দা এসেচে, আমি কি কিছু বল্‌তে পারি ?···রাগ কোরো না লক্ষ্মী তুমি এখন না যাও, কালীপূজার ছুটিতে অবিশ্যি কা যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর এক দিনও ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া রাত্রি সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালে ট্রেণে। কোনোদিন লুচি হয় না, কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিন রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবা আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে লুচি ক'খানা খাইয়াই অপু উদাসমনে জানালার কা

আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ীর উঠানের গাছে এখনও কি পাখী ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত—অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল !...বড়লোকের মেয়ে কিনা ?...আচ্ছা বেশ।... অভিমানের মুখে সে একথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ'মাস এই শূন্য বাড়ীতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে।

পরদিন প্রত্যুষে অপু কলিকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল,— অপু সে-পত্রের কোনো জবাব দিল না। দিন পাঁচ ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো ? অসুখ বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোনো জবাব গেল না।

মাসখানেক কাটিল।

কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ও গো, আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেচি তোমার কাছে ?... আজ এক মাসের ওপর হল তোমার একছত্র লেখা পাইনি, কি করে দিন কাটাচ্চি, তা কাকে জানাব ? দ্যাখো যদি কোনো দোষই করে থাকি, তুমি যদি আমার ওপর রাগ করবে, তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বল তো ?

অপু ভাবিল—বেশ জব্দ, কেন যাও বাপের বাড়ী ?— আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি ? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল— পথে, ট্রামে, আপিসে, বাসায়, সব সময়, সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে, পৃথিবীতে এমন একজন কেহ আছে, যে সর্ব্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহার চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে,—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

এদিকে অপুদের আপিসের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার যোগাড়, একদিন স্বত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্ত্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়। তাহার একজন সহকর্ম্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরীটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার যো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে আসলে অনেক দাঁড়িয়েচে, সুদটা দিয়ে থামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজনে বাড়ী ক্রোক দেবে মশাই, কি যে করি !

ইতিমধ্যে সে একদিন লীলাদের বাড়ী গেল, যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—একি আপনি ! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন ? অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ির মত হাসি ছাড়া লীলার কথার আর কোনো উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন ? অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা ? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েচি। এখন খবরের কাগজের আপিসে চাকরী করি।

লীলা প্রথমটা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল—কেন, কি জন্যে ছাড়লেন পড়া, শুনি ? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন !

লীলার চোখের এই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মী-

তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে? তাহার এই হালকা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্ব্ব-ই আছে? না যেন।

অপু বলিল—তুমি ত পড়চো, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজ ভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ করেচি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজ কাল পুরোনো বাসায় থাকেন, না, আর কোথায় উঠে গিয়েছেন?

লীলার মা ও মাসীমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে সেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়'টা শুনবো, মা আর মাসীমা সেই জন্যে এসেচেন। আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানার দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল, লীলা, আচ্ছা ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়ীতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে মনে আছে? মনে আছে সে কবিতাটা?

—উঃ! সে আপনি মনে করে রেখেচেন এতদিন। সে সব কি আজকার কথা?

অপু অনেকটা আপন মনেই অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে-আনা দুধ অর্দ্ধেকটা আমায় খাওয়ালে জোর করে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বালয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনো কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বার বার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে, কিন্তু লীলার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত দেখা কোনো মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গাতর ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্ত্তন তোলে না। লীলা তার বাল্যের সাথী, তার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্য্যভরা ভালবাসা।

দিন কয়েক পরে একদিন লীলার দাদামহাশয়ের এক দরোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতে ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল, দু-লাইনে পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়ীতে লীলা যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ী পরিয়া মাঝের ছোটঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চূর্ণ কেশের দু এক গাছা। অপু হাসিমুখে বলিল—থার্ড ইয়ার বলে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে? আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না, এখনও ঠিক ভাঙেনি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুসি ও হাল্কা হাসির আবহাওয়ার জন্য! ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে শত দুঃখের মধ্যেও অপুর মুখের আনন্দ, উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুসি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদীঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি করে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গেছলাম

আরতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
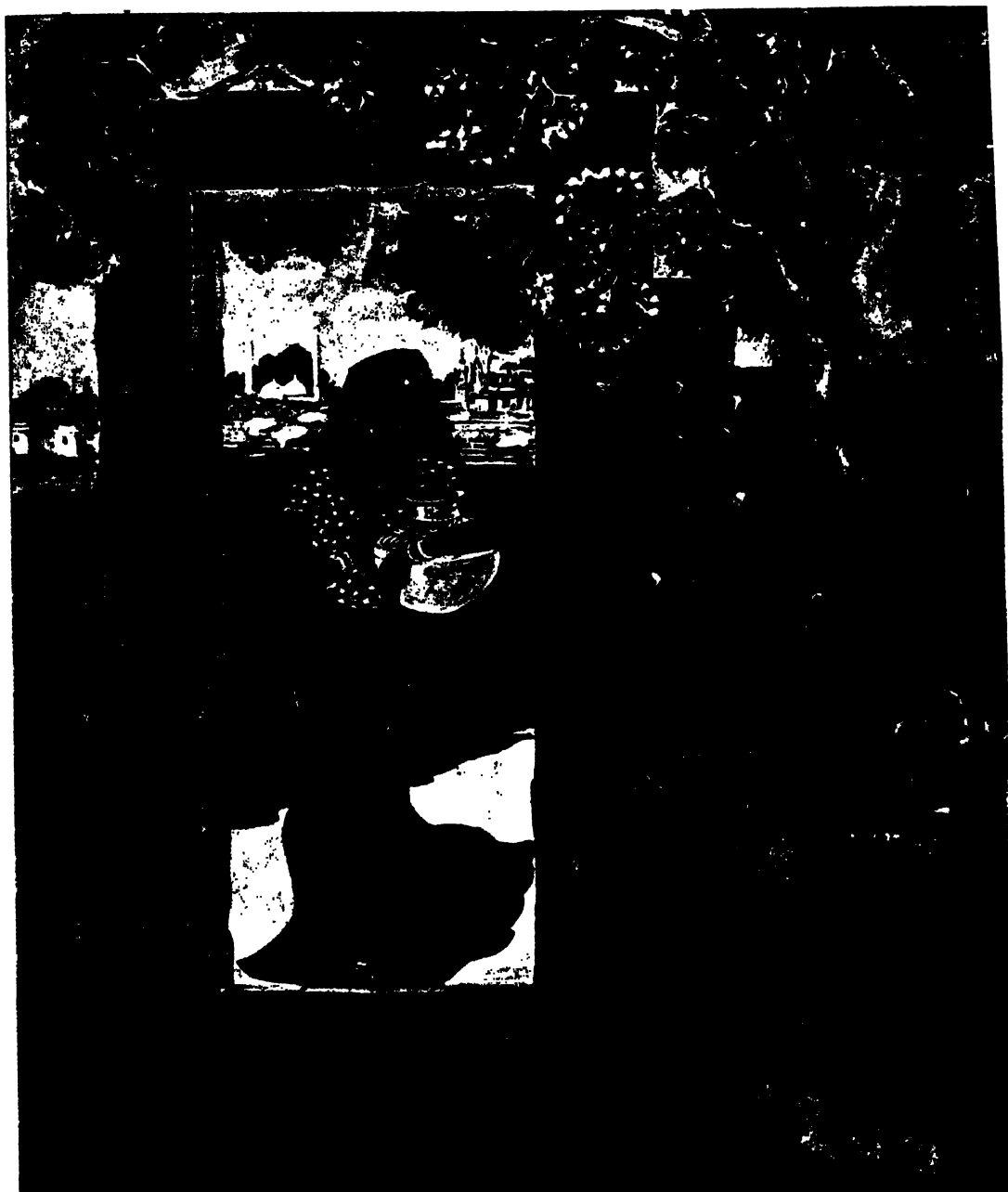
রূঢ়তা ও নিষ্ঠুর সংঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্ম সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু একবার বলি বলি করিয়াও শুধু বিবাহের কথা তাহাকে বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে, যে না বলিতে পারিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই।

ক্রমশঃ

হৈমন্তী

শ্রীগোপাললাল দে

ধানের সবুজ বান বহে যায় দিগন্তরে,
নব শীষে শীষে করতালি রণন্ রণ্;
পাতায় পাতায় শন্ শন্ বাজে বাতাস ভরে,
দূরে দূরে যায় বায়ু ভরে তার অনুরণন্।
মেঠো পথখানি ছাওয়া কুশ-কাশ তৃণের দলে,
কৃষক সে পথে চলেছে যেথায় কৃষাণী কালো,
কালো তার বেশ, কালো কেশপাশ, কালো আঁখি কালো।
বসন তলে,
কালো মেঘসম ধান তারই পাশে সেজেছে ভালো।

বন-তুলসীর গন্ধে আকুল বায়ুর ডাকে,
যেমন গেলাম হেমধূলিময় পল্লীপথে;
দেখি বনলতা ফুটে আছে শত পথের বাঁকে,
পুষ্প-ধনুর ঘর্ঘর বাজে ভ্রমর-রথে।
খেজুর তালের গাছ রহে থির ছবির মত,
নবীণ বেণুর শীর্ষ শোভিছে নীলাম্বরে,
হাওয়া নাই তবু জীর্ণ শাখায় অশথ পাতারা নৃত্যরত,
জলে কদলীর ছায়া হেরি মন কেমন করে।

সরসী-সায়রে টলমল করে শীতল জল,
লহরী-লীলায় চল-চঞ্চল শফরী খেলে,
পদ্ম সুবাস জলে ভাসে নীর-কুসুমদল
তীরে বসে আছে সারাদিন মাছ-শিকারী ছেলে
শ্যামা শিষ্ দেয় কপোতের পাখে রাখিয়া তাল,
দূর হতে আসে ঘুঘুদের মধু-কল-কূজন,
চন্দনা শোনে নয়নাভিরাম ভঙ্গিমগ্রীব সুচির কাল,
দূরে দিগ্‌বধূ ছলছল চায় উদাস মন।

রাতে পাদপীঠে চলে শিশিরের আলিম্পনা,
সন্ধ্যায় ঝরে হিম-কুঙ্কুম শ্যামল মুখে;
প্রভাত বায়ুতে চুয়া-চন্দন কুহেলি কণা,
বর্ষা স্নানের সিক্ততা ঘোচে রৌদ্র সুখে।
চন্দনটীকা দিয়া ভগিনীরা পায়সে তোষে,
ঘরে ঘরে আছে স্বাদু নবান্নে নিমন্ত্রণ;
বনেতে হইবে সুষ্ঠু ভোজন, মাঠে 'পৌষলা' প্রথম
পো'ষে,
মধুর মদিরা খর্জ্জুর-রসে তৃপ্ত-মন।

ইংরেজীর বাংলা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

[মৌখিক ভাষায় লিখিত। দুই অক্ষরের মাঝে ও মাথার দিকে কমা চিহ্ন থাকিলে ঈষৎ ইকার উচ্চারণ করিতে হইবে। । অক্ষরের উচ্চারণ য় মনে রাখিতে হইবে। 'বলিয়া', সংক্ষেপে, 'বল্যে' পড়িতে হইবে ; বোলে নয়।]

যখন কলেজে পড়ি, তখন একদিন রেভ্রেণ্ড লাল-বিহারী দে বল্যেছিলেন, "দেখ, যখন তোমরা ইংরেজীতে ভাব্তে পার্বে, স্বপ্নে ইংরেজীতে কথা কইবে, তখন জান্বে ইংরেজী শিখেছ।" দে-সাহেব আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের এক প্রোফেশর (অধ্যাপক নয়, অধ্যাপক টোলের) ছিলেন, তাঁর ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি স্বপ্নে ইংরেজীতে "লেকচার" দিবেন, আশ্চর্য কি! কিন্তু আমরা বাংলা তর্জমা করো ইংরেজী ব'ল্তাম। আমাদের কাছে কথাটা অসম্ভব ঠেকেছিল।

পরে বুঝ্লাম ইংরেজীভাষার অল্প বিদ্যাতেও ঐ ভাষায় ভাবা, এমন কি স্বপ্নে ইংরেজী বলা, অসম্ভব নয়। তা না হ'লে ইংরেজের ছেলেরা, যারা ইংরেজী শেখে নাই, দু-লাইন লিখ্তে গেলে দুগণ্ডা ভুল করে, তারা করে কি? অশুদ্ধ ইংরেজীই তাদের মাতৃভাষা।

শৈশব হ'তে আমরাও ইংরেজী প'ড়্তে প'ড়্তে লিখ্তে লিখ্তে, ব'ল্তে ব'ল্তে, ইংরেজীতে ভাবি, স্বপ্নেও ইংরেজী আওড়াই। এই অভ্যাসে আমরা বিজাতীয় হয়ে পড়্যেছি। কারণ দেহের দাসত্ব ঝেড়ে ফেল্তে পারা যায়, মনের দাসত্ব মনে গাঁথা থাকে। এখানে shall কি will ব'সবে, এখানে idiom ঠিক হ'ল, না ভুল হ'ল, দেখি ইংরেজেরা কি বলে,—এই চিন্তা বাল্যকাল হ'তে অষ্টপ্রহর ক'র্তে ক'র্তে, ইংরেজকেই শাস্ত্রকার মান্তে মান্তে, যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, শাস্ত্রকারের মুখের পানে চাই। ইংরেজ বলেন, আমরা কর্ম প্রস্তাব (initiative) ক'র্তে পারি না। এই অক্ষমতার মূল এখানে। আমাদের যে বুক দুর্-দুর্ ক'রে, কি জানি বিলাতী শাস্ত্রে কি বলে। আমরা গবেষণা ক'র্তে ব'স্লে আগে দেখি, কোন্ বিদেশী কি বল্যেছেন। আমরাও যে মানুষ, আমরাও যে পারি, এই আত্ম-প্রত্যয় গেলে মেষত্ব ঘটে। কে কি বলে, কে কি করে, জান্তে দোষ নাই! বরং যত জানা যায়, ততই ভাল। জাপানী ভাষা শিখ্লে, জাপানী আচার-ব্যবহার জান্লে, হিত হ'তে পারে। অনেক শিক্ষিত ইংরেজ জর্মানভাষা, সাহিত্য, বিদ্যা জানেন, কিন্তু মনে খাঁটি আছেন।

ইস্কুলে ও কলেজে ছেলেদিকে বাংলায় পাঠ দিলে তারা সহজে বোঝে, ভাল বোঝে, একথা কলেজে ঢুক্বার নয় দশ বছরেই বুঝেছিলাম। কিন্তু নিরুপায়। কলেজে ধুতি চ'ল্বে না, বাংলা চ'ল্বে না। ছাত্রেরা নির্বোধ নয়। এ দুটা তুচ্ছ কথা নয় অবরতা-বুদ্ধির (inferiority complex) তুচ্ছ উপাদান নয়। ছাত্রের বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী, আর্বী পরীক্ষা হ'বে, প্রশ্ন কর ইংরেজীতে, উত্তর লেখ ইংরেজীতে। কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় ইংরেজীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখালেন, পড় সে ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা চল্বে না! (এখন শুন্ছি সে ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ হয়েছে।) বাংলাকে ইংরেজী কতদিকে আক্রমণ ও গ্রাস ক'র্ছে, চক্ষুমান্কে ব'ল্তে হবে না। বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলন আমাকে দিয়ে ইস্কুলে কলেজে বাংলায় পাঠ দিবার প্রস্তাব করিয়েছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণগোচর করা হয়েছিল। সে বোধ হয় পনর ষোল বছর হ'বে। এখনও কিন্তু বিচারণার বিরাম নাই। মজার কথা এই, যাঁরা এই ব্যবস্থা সমর্থন ক'র্ছেন, তাঁরা ব'ল্ছেন, বাংলাকে শিক্ষার "বাহন" কর। সিন্দবাদের দৈত্য ঘাড়ে চেপে আঁকড়্যে বস্যেছে, "না" ব'ল্লেই বাহনত্ব ঘু'চ্বে না। medium শব্দের বাংলা যে চাই, "বাহন" যে ব'ল্তেই

হ'চ্ছে! আর, বাহন শব্দও ত ঠিক। বাহনের আরোহী যে বড়, এখন চিন্তার সময় হয়েছে।

এত গুরুতর কথা পাড়্‌ব না। আমরা বাংলা ভুল্‌তে চাই না, বাংলা বার্তাপত্র ও বাংলা মাসিক পুস্তক তার সাক্ষী। এই সবের সম্পাদকের জন্যে পাঠকের করুণা হ'বার কথা। তাঁরা প্রত্যহ নূতন নূতন ইংরেজী শব্দের অজস্র বর্ষণ মাথায় পেতে নিয়েছেন। বাংলা কাগজ, বাংলায় লিখ্‌তে হ'বে। উপরিক (superior) রাজপুরুষ কোথায় কখন্ কি সংবাদ (address) ব'ল্‌ছেন, প্রজ্ঞাপক (publicity officer) কখন্ কি প্রজ্ঞাপন (communique) ক'রছেন, এদিকে তার বাংলা ব'ল্‌তে হবে। ইংরেজী ভাষাটা ফাঁপা, বুদ্‌বুদের ন্যায় বেশ ভাসতে থাকে, শুনতে বেশ, প'ড়তে বেশ। বার্তা-পত্রের এক পাটি (স্তম্ভ নয়, column ক্ষেত্র নয়) পড়ি, ফেনপুঞ্জ শুখালে দেখি, মাত্রিক (material) অর্দ্ধরতি। ইংরেজী ভাষার এটা মস্ত গুণ, কিছু না ব'ল্‌লেও আধ ঘণ্টা ব'ল্‌তে পারা যায়। কিন্তু বার্তিকের (news-paper men) কষ্টের অবধি নাই, ভাবার্থ দিয়া কার্য্য সমাপ্ত করেন। ভালই করেন, ইংরেজ ব'ল্‌লেও আমরা অপ্রয়োগিক (unpractical) নই, বাক্-সংযম আমাদের কৃষ্টির (culture) এক লক্ষণ। ইংরেজের ঐশ্বর্যের সীমা নাই, ভাষার শব্দের ও বাক্-ভঙ্গিরও নাই। কিন্তু কাজের কথাগুলার ত বাংলা চাই। সেও যে সুদারুণ!

কটকে থাকবার সময় আমার জন-কয়েক ছাত্র, তখন গৃহী, সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বসাতে উদ্‌যোগী হ'লেন। আমায় পরিষৎ-পতি হ'তে হবে। আমি এক নিয়মে সম্মত হ'লাম, ইংরেজীর তর্জমা ক'রতে পাবে না, ইংরেজীর অন্ধবৎ অনুসরণ ও অনুবাদ ক'রতে পাবে না। "হাঁ, তা ত ঠিক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইংরেজীর স্থান নাই। সার, মিটিং কবে করা যাবে?" বলেই হেসে উঠ্‌লেন। একজন ব'ল্‌লেন, মিটিং কথাটা মেয়েরাও বলে। আমি বুঝিয়ে দিলাম, এ ত তর্জমা নয়, শব্দটা বাংলা হয়ে গেছে। আর একজন ছিলেন খুঁৎ-খুঁত্যে। তাঁর মনঃপূত হ'ল না; তিনি ব'ল্‌লেন, কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষৎ হ'তে নিয়মাবলী আনাতে হবে, দেখ্‌ব তাঁরা কি করেছেন। নিয়মাবলী এল, কর্মকর্তাদের (office bearers) সংজ্ঞা পড়া হ'ল, অধিকাংশই ইংরেজীর তর্জমা। সে সব নিলে আমাদের নিয়ম-লঙ্ঘন হয়। অগত্যা শব্দ-চয়ন ক'রতে হ'ল। কয়েকটা মনে আছে, President পরিষৎ-পতি, Vice-President—উপপরিষৎ-পতি, members —পারিষদ, associates—মিত্র (যদিও ৫০৲ টাকা দান না ক'রলে মিত্র হবার নিয়ম ছিল না), Patron—পোষ্টা, Executive Committee—কার্যাঙ্কক, Committee—পঞ্চক (পাঁচের বেশীও হ'তে পারে), Secretary—ব্যবহর্তা (ওড়িষ্যার রাজাদিগের 'বেবর্তা, এইরূপ, Joint-Secretary সহ-ব্যবহর্তা, Asst. Secretary—অনুব্যবহর্তা, Library—গ্রন্থশালা, Librarian—গ্রন্থপাল, Treasurer—অর্থপাল (আমাদের ধনের মধ্যে মাত্র চাঁদা) meeting—সমাগম, business কার্য, routine—প্রণিধি, programme—প্রগম (ওড়িয়া ভাষার সংসর্গে ম অকারান্ত), ইত্যাদি। দিন কয়েক একটু নূতন নূতন ঠেকত, পরে চলো গেছ্‌ল, এবং এখনও চ'ল্‌ছে। 'প্রগম' নবনির্মিত; তা ছাড়া সকল নামই সংস্কৃত, অর্থ ভাব্‌তে হয় না, উচ্চারণেও কষ্ট নাই। কেহ কেহ ভাব্‌ছেন, এই বহ্বারম্ভে ক্রিয়াটা লঘু হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু তা নয়, ব্যবহর্তার উৎসাহে এক মাসের মধ্যেই পরিষৎ "সাফল্য-মণ্ডিত" (crowned with success. সাফল্য-মৌলি ?) হয়ে উঠেছিল।

উপরে address শব্দে 'সংবাদ' লিখেছি। 'সংবাদ' শব্দের ঠিক অর্থ হয়েছে। গুরু-শিষ্যের সংবাদে একজন বক্তা, অপরে শ্রোতা। 'বাড়ীর সংবাদ কি?'—বাড়ীর লোকে কি ব'ল্‌লে। সংবাদ speaking, এই থেকে information হয় বটে, কিন্তু address শব্দের বাংলাও যে চাই। মহাত্মা গন্ধীর 'বক্তৃতা' শুনতে লোক দৌড়ে না, তাঁর 'সংবাদ' শুনতে যায়। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির 'অভিভাষণ' ছেড়ে 'সম্বোধন' ক'রছেন, কিন্তু সম্বোধনের সুর উঁচু নয় কি?

বাংলাবার্তাহরের কাজ ভারি কঠিন। বাংলা ও ইংরেজী, দুই ভাষার জ্ঞান চাই। এ 'রক্তিমা শুক্লিমার'

কর্ম নয়, বিষয়-জ্ঞান চাই। বিষয়েরও অন্ত নাই। মামলা মকদ্দমা, মারামারি দাঙ্গা, সে ত মামুলী ব্যাপার. একটু আইন জান্‌লে বুঝ্‌তে পারি। কোথায় জলপ্লাবনে (প্লাবন বাংলা-প্রয়োগ নয়) দেশ ভেসে গেল, কোথায় বিমান অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভূ-পতিত হ'ল, কোথায় পাটের দর কমে গেল, কোথায় বিলাতী কাপড়ের কাটতি ('চাহিদা' হিন্দী) সুরু হ'ল, এ যে নানারকমের খবর। স্যর রমন কেন যে 'নোবেল' উপায়ন (present. পুরস্কারে আমিষ-গন্ধ আছে) পেলেন, ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণ (ডাক্তার নয়, ডাক্তার চিকিৎসক) কি ব্যাখ্যান (lecture) দ্বারা বিদ্বজ্জনকে তৃপ্ত ক'র্‌লেন, ইত্যাদি দেশের বার্তা না শোনালেও চলে না। ভাষা-জ্ঞান ব'ল্‌তে শব্দ-জ্ঞান, শব্দার্থ-জ্ঞান ও ব্যাকরণ-জ্ঞান বুঝি। বার্তাহরণ অল্প পুঁজিতে চলে না। এক বার্তা-পত্রে প'ড়্‌ছিলাম, "বঙ্গোপসাগরে গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে।" ঝড়ের গোলযোগ হয়, আবহের দুর্যোগ। এক বার্তাহর পাঠককে শেখাচ্ছেন, "নারিকেলের মধ্যে চর্বির ভাগ শতকরা ৫২ ভাগ এবং শ্বেতসারের ২৭ ভাগ।" কথাটা এখানে ভাঙ্‌বার দরকার নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই একটি বাক্যে উপরি-উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের অভাব ঘটেছে। অনেকে 'কাপাস চাষ' স্থলে 'তুলার চাষ' লিখ্‌ছেন, কারণ ইংরেজীতে cotton cultivation. আমরা জল হ'তে নুন করি, 'তৈয়ার করি' না। আমরা বি-এ পরীক্ষায় পাশ (উত্তীর্ণ) হই, পাশ-করার কর্তা পরীক্ষক। একজন লিখেছিলেন, 'যতীন দাসের মৃতদেহ কলিকাতায় পৌঁছিলে শোভাযাত্রা হইয়াছিল।" তিনি জানাতে চান, শোক-যাত্রা। হয়ত কোন ইংরেজী-বাংলা অভিধানে procession মানে: ('মানে' লিখ্‌লে মান-অভিমান মনে আসে) শোভাযাত্রা লেখা আছে। কিন্তু এক ভাষার শব্দ অন্য এক ভাষায় আনতে গেলে সব সময় এক কথায় সারা যায় না। বিবাহের বর-যাত্রা, দেবীর বিসর্জন-যাত্রা, ঢাকায় জন্মাষ্টমী-যাত্রা কি বস্তু, বাঙ্গালী বুঝ্‌তে পারে। কলিকাতার জেলেপাড়ার সং-যাত্রা শোভা-যাত্রা নয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কলিকাতায় এলে বিজয়-যাত্রা হয়েছিল। যাত্রা উৎসব; গমন-পথের কোথাও নৃত্য কোথাও গীত হ'ত। সে হ'তে যাত্রা-গান শব্দের উৎপত্তি।

মাসিক পুস্তক (monthly periodical. পত্র, পত্রিকা বলি কেমনে?) সম্পাদকের কর্ম বহুগুণে লঘু। তাঁরও বিদ্যা বুদ্ধি, বিশেষতঃ উৎসাহ ও প্রভাব অবশ্য চাই। কিন্তু "প্রবন্ধ-লেখকের মতামতের জন্য প্রবন্ধ-লেখক দায়ী।" লেখকের দায় নিশ্চয়, কিন্তু সম্পাদক দায়াদ, অন্ততঃ দণ্ড-দায়াদ। তা ছাড়া পারকর্মের (dressing) ভার সম্পাদকের। পুস্তকের সব প্রবন্ধ এক বিষয়ের হ'লে সম্পাদকের জ্ঞান সে বিষয়ে থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ মাসিক পুস্তকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিশ্বের চর্চা থাকে, অধিকাংশ বিশ্ববাণী (miscellany. বিশ্ব all, বাণী a literary composition. আ'জকা'ল আকাশ-বাণীর তুলনায় বাণী message বলা হ'চ্ছে।) বিশ্ববাণী মণিহারীর ভাণ্ডার, সঞ্চয়নী (magazine)। সম্পাদককে লোক-বৃত্ত জানতে হয়, প্রকারান্তরে বার্তিক হ'তে হয়। এক পয়সার পুঁতিই বা হ'ল, কেন্তু ধূলা-মাখা পুঁতি কিনবে কেন? পুঁতির হাট বুঝতে হ'বে, পুঁতির দোষগুণও বুঝ্‌তে হ'বে। কাজটা সোজা নয়। বার্তিকের শ্রেণীবিভাগ কঠিন। কিন্তু এঁরাই লোকশিক্ষা দিচ্ছেন, বাংলাভাষার প্রসার ক'রছেন, নূতন নূতন শব্দ চালাচ্ছেন। শিক্ষকের কাজ চিরদিন কঠিন।

পূর্বে শুন্‌তাম, গাঁয়ে আন্দোলন চলেছে, অমুককে এক-ঘরে করা উচিত কি, না। এক পক্ষের মতে উচিত, অপর পক্ষের মতে উচিত নয়। এই যে উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ, দ্বন্দ্বের দোলায় আন্দোলন। বোধ হয়, কন্‌গ্রেসের জন্মবৎসরে দেশে agitation আরম্ভ হয়। বাংলায় 'আন্দোলন' হ'ল। এখন agitator-কে কি বলি? ইনি নিরীহ নন, শান্তিভঙ্গ করেন। ইনি agitate করেন, ক্ষোভ জন্মান। ইনি ক্ষোভক। চীৎকার দ্বারা শত্রুকে ভয় দেখালে সংস্কৃতে ডমর বলা হ'ত; ডমর অশস্ত্র কলহ, গ্রামে বলে, বিক্রম-প্রকাশ। Boisterous meeting ডমর ব'লতে পারি। লোকের স্বভাব বদলায় না, ভাষা বদলায়। যখন

আন্দোলনে ও বিক্রম-প্রকাশে ফল হয় না, তখন লোকে দোষীকে এক-ঘরো করে, সাহায্য দেয় না, non-co-operate করে। পরস্পরকে সাহায্য দিয়ে co-operate কর্যে গ্রাম চলে। 'সহযোগ' ও 'অসহযোগ,' কথা দুটা ইংরেজীর তর্জমা বল্যে নূতন ঠেকছে। দুই জনের বিবাদ না থাকলেই তারা সহযোগী (colleague) হয় না। Co-operative Society সহযোগী সমিতি বটে, এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সমবায় বটে (সমবায়ের পর 'সমিতি' শব্দ নিরর্থক)। অতএব সহযোগ চেয়ে সাহায্য শব্দ ভাল, non-co-operation movement সাহায্য-রোধ চেষ্টিত। movement চেষ্টিত, 'প্রচেষ্টা' বলার দরকার দেখি না। সাহায্য বন্ধ ক'র্‌তে পথ আগলানা (picketing) নূতন ব্যাপার নয়, আগল (pickets) না থাকলে এক-ঘরো কর্‌তে পারা যায় না। জমীদারের সহিত প্রজার বিবাদও নূতন নয়। প্রজারা বিরক্ত হ'লে খাজনা দেয় না। এই কথাটা এখন civil disobedience, আইন অমান্য নয়, কর-লঙ্ঘন (non-payment of taxes) নামে শুনছি। Passive resistanceও নূতন নয়। যে প্রজা প্রতিজ্ঞা করেছে কর দিবে না, তাকে মা'র-ধ'র ক'র্‌লেও দেয় না। Passive resistance 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' কেমনে বলি? 'প্রতিরোধ' কই? প্রতিরোধ হ'লেই ক্রিয়া থাকবে। অহিংস, অ-শস্ত্র, বিশেষণ দিলেও প্রতিরোধ active। প্রজা আপনাকে অসহায় মনে করে, জমীদারের উৎপীড়ন সহ্য করে, তার passive resistance অপ্রতিকার্য্য সহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকতেও প্রতিকারের চেষ্টা না করা, দমের লক্ষণ। বাহ্যবৃত্তির নিগ্রহ (restraint), দম। মহাত্মা গন্ধী অহিংসা পরমোধর্ম নিজ চরিতে পালন ক'র্‌ছেন। তিনি অহিংসাধর্মেই সত্য অস্তেয় (non-stealing) দয়া দম ক্ষান্তি (forbearance) প্রভৃতি ধর্ম-সাধন প্রচার ক'রছেন। যাঁর দমগুণ আছে, তিনি দমী। তাঁকে দান্ত বলাও চলে। মহাত্মা সাধারণ লোককে, অন্ততঃ তাঁর অনুগতিকে (following) দান্ত ক'র্‌তে পেরেছেন, ইহাই তাঁর মহতী-কীর্তি। non-violent দান্ত। non-violent non-co-operation এর non-violent বিশেষণ অনাবশ্যক। কারণ non-co-operation ঔদাসীন্য। উদাসীনের ক্রিয়া নাই। তথাপি যদি চাই, দান্তের ঔদাসীন্য, কিংবা দান্তাপসরণ (দান্তের অপসরণ taking no part)।

বর্ত্তমান দেশ-বিপর্যয়ে (abnormal condition) নূতন নূতন ক্রিয়া-বাচক শব্দ আবশ্যক হ'চ্ছে। পূর্বকালেও দেশ-বিপর্যয় ঘ'ট্‌ত; লোকে শব্দও পেত। শুক্র ও বৃহস্পতি, দুইজন অতি প্রাচীন নীতিজ্ঞ (politician) ছিলেন। রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে শুক্রের মত, দুষ্টকে নিগ্রহ কর, শিষ্টের চিন্তা ক'র্‌তে হবে না। তিনি অসুরদের গুরু ছিলেন। বোধ হয় অসুরদের মধ্যে দুষ্ট লোক বেশী ছিল। বৃহস্পতির মত, দুষ্টের নিগ্রহ যেমন চাই, শিষ্টের অনুগ্রহও তেমন চাই। বৃহস্পতি সুরদের গুরু ছিলেন, এবং প্রাচীন আর্য্যেরা তাঁর মতে "রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন" এই দুইকে রাজধর্ম স্বীকার ক'র্‌তেন। কিন্তু রাজা, প্রজাপতি না হ'লে, প্রজাকে পুত্রস্বরূপ দেখ্‌তে না পারলে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ হ'তে পারে না। কারণ, প্রজা শব্দের মূলার্থ পুত্রকন্যা। প্রজাপতি-রাজাকে ঈশ্বর দেবের অংশ দিয়ে নির্মাণ করেন, রাজা নররূপ মহতী দেবতা। তিনিই দণ্ড-পুরুষ, নেতা, শাসিতা, এবং ধর্মের প্রতিভূ।

মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, স্মৃতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে রাজধর্ম ব্যাখ্যাত আছে। সকল গ্রন্থেই রাজধর্মের সার দুইটি কথা আছে, রাজ্যশাসন ও প্রজা-পরিপালন। নৃপতি দণ্ডধারণ ক'র্‌বেন, আর স্বয়ং প্রজাপতি হ'য়ে প্রজাকে সম্যক্ অনুগ্রহ ক'র্‌বেন। শাসন Government, maintaing law and order.

রাজ্য সপ্তাঙ্গ,—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র (বা জন), দুর্গ, কোষ, বল, সুহৃৎ। রাষ্ট্র হ'তেই রাজ্যাঙ্গের উৎপত্তি। রাষ্ট্র (রাজ ধাতু হ'তে) রাজ্য (kingdom); কাজেই রাষ্ট্রবাসীজনও রাষ্ট্র (the people)। এই অর্থে রাষ্ট্রিক (the subjects of a kingdom) শব্দের প্রয়োগ আছে। রাষ্ট্রের প্রাধান্যহেতু রাষ্ট্রজনের নাম প্রকৃতি (subjects)। অমাত্য দ্বিবিধ, মন্ত্রী

(minister, adviser) যাঁর সহিত মন্ত্রণা, গুপ্তভাষণ হয়; আর সচিব বা কর্মসচিব, কর্ম-সহায় (executive councillors)। মহামাত্র প্রধান অমাত্য (prime minister)। মন্ত্রীমণ্ডল the body of councillors, cabinet. বল, সৈন্য (army), সুহৃৎ, মিত্র (friendly kings)। রাজ্যের সপ্তাঙ্গের কোন একটির ব্যসন (violation, evil) হ'লে রাজ্যের অমঙ্গল। তন্মধ্যে সুহৃৎ-ব্যসনের ফল লঘু, রাজার ব্যসনের ফল গুরু। কারণ একদিকে রাজা, অন্যদিকে রাজ্য, রাজার ব্যসন হ'লে রাজ্য টিকতে পারে না। নীতিজ্ঞেরা অবিনয় (নয়, regulation না মানা, autocracy), অধর্ম (injustice), লোভ (greed), ক্রোধ, ইত্যাদির ফল দেখিয়ে গেছেন। লোভ হ'তে ক্রোধ, এবং ক্রোধ হ'তে ত্রিবিধ ব্যসন জন্মে। (১) বাক্‌পারুষ্য,—অপবাদ, কুৎসা, ভর্ৎসনা; (২) দণ্ডপারুষ্য (severity of punishment) ত্রিবিধ,—অর্থহরণ (fine and confiscation of property); তাড়ন (corporal punishment); বধ (এখন প্রাণদণ্ড রহিত ক'র্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে; কিন্তু কামন্দক, কৌটিল্যের শিষ্য হ'লেও বলেছেন, রাজ্যাপহার ব্যতীত অন্য মহৎ অপরাধেও দণ্ডং প্রাণান্তিকং ত্যজেৎ)। (৩) অর্থ-দূষণ (ruinous expenditure in pursuing an offender)।

প্রকৃতির অনুরক্তিই রাজ্যরক্ষার মূল। সে মূলে আঘাত প'ড়্‌লে নানাবিধ ফল ঘটে। যথা, প্রকৃতির বিরাগ (disaffection), কোপ (excitement), ক্ষোভ (agitation), উদ্বেজন (unrest), দ্বেষ (enmity), উপজাপ (mischievous secret conspiracy), দ্রোহ (sedition), বিপ্লব (revolution), উত্থান (rebellion), প্রকোপ (revolt)। অরাজকতা বা রাষ্ট্রবিপ্লব (anarchy) মাৎস্যন্যায়; বড় মাছ যেমন ছোট ছোট মাছকে গিলে ফেলে, তেমন প্রবল দুর্বলকে গ্রাস করে। কোপ দ্বিবিধ, অন্তঃকোপ, স্বরাজ্যে কোপ; বহিঃকোপ, রাজ্যের বাহিরে কোপ। বহু প্রাচীনকালে, ভারতযুদ্ধেরও আগে, রাজ্যশাসনের চারি 'উপায়' (policy) আবিষ্কার হ'য়েছিল। সাম (conciliation), দান (concession), ভেদ (division), দণ্ড (punishment)। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উপায় প্রযোজ্য, সেটা বুঝ্‌লেই নীতিজ্ঞতা (statesmanship)। দানের সঙ্গে মান-দানও যায়। দানে বশীভূত হয় না, এমন মানুষ নাই। সকলের সহিত সাম, প্রিয়ভাষণ, ফলবান্ হয় না। দুই প্রবল পরস্পর উপাশ্রিত দলে, বিশেষতঃ জাতির দলে, ভেদ সহজে ঘটাতে পারা যায়। কালক্রমে 'উপেক্ষা' (indifference) আর এক উপায় গণ্য হ'য়েছিল। "সে আর কি ক'র্‌তে পার্‌বে," এই উপেক্ষা। কেহ কেহ আর একটা উপায় স্বীকার ক'র্‌তেন। সেটা মায়া (fraud) মিথ্যাপ্রদর্শন, ভয়-প্রদর্শন। মন্ত্রশক্তি (diplomacy) সকল রাজারই অভ্যস্ত। অন্যগতি থাক্‌তে দণ্ডপ্রয়োগ নীতিসম্মত ছিল না।

পররাজ্য জয় ক'র্‌তেও এই এই উপায়। স্বরাজ্যের সংলগ্ন রাজ্য নিশ্চয় অরি। তারপর মিত্র, তারপর উদাসীন। এইরূপ চারিদিকের বারটি রাজ্য নিয়ে রাজমণ্ডল। রাজ্যে কোপাদি ব্যসন ঘট্‌লে জয়েচ্ছু অরি-রাজার সুযোগ। বলীয়ান্ দ্বারা অভিযুক্ত (attacked) হ'লে, এবং অন্য প্রতিক্রিয়া না থাক্‌লে সন্ধি; কিন্তু কাল-যাপন করে। সন্ধি ষোল প্রকার। যথা, সমানে সমানে কপাল-সন্ধি (কপাল skull, মাথার খুলির দুই-ভাগ যেমন সমান ও সংযুক্ত); কিছু সম্প্রদান করে উপহার-সন্ধি; সজ্জনের সহিত মৈত্রী, সঙ্গত-সন্ধি, (এই সন্ধিতে উভয় পক্ষের সমান স্বার্থ থাকে, উভয়ে সম্পদে বিপদে ভিন্ন হয় না। এই সন্ধি উৎকৃষ্ট); এক অর্থ (object) সিদ্ধির উদ্দেশে উপন্যাস-সন্ধি; উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার দ্বারা প্রতীকার-সন্ধি; ইত্যাদি। প্রথম তিন সন্ধিই মূল। পূর্বকালে এই তিনের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধও একটা মূল সন্ধি গণ্য হ'ত।

রাজার দৈনিক কর্মের মধ্যে 'ব্যবহার-দর্শন' (administration of justice) একটা বাঁধা কর্ম ছিল। তিনি সভ্য-পরিবৃত হ'য়ে সভায় ব'স্‌তেন। তাঁর 'অধিকৃত' (officials in charge of departments) অবশ্য

ব'স্‌তেন। আর ব'স্‌তেন সভ্যেরা। কুল (বাদী প্রতিবাদীর জ্ঞাতি বন্ধু), জাতি (বাদী প্রতিবাদীর), শ্রেণী (এক এক বৃত্তির এক এক শ্রেণী), গণ (নানা জাতির ও বৃত্তির সঙ্ঘাত, corporations,বণিকদের), ও জানপদ (কারু প্রভৃতি,পৌর নয়), হ'তে 'সভ্য' করা হ'ত। সভ্যের কেহ বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর প্রতি স্নেহবশতঃ, কিম্বা লোভ বা ভয়বশতঃ স্মৃতি-(law) বিরুদ্ধ মত দিলে পরাজিতের দ্বিগুণ দণ্ড পেতেন। রাজ্যের সর্বত্র প্রথমে 'কুল' বিচার ক'র্‌তেন, কুলের নির্ণয়ে অসন্তুষ্ট হ'লে 'শ্রেণী' (trade guilds), তারপর 'গণ' (অন্য নাম পূগ ; পূগ বাকগুচ্ছ সাদৃশ্যে এই নাম), তার পর রাজাধিকৃত, তার পর স্বয়ং রাজা বিচার ক'র্‌তেন। আমরা বলি, রাজা পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ নিয়ে সভায় বসেন। পাত্র, মন্ত্রী ; মহাপাত্র, মহামন্ত্রী। মিত্র, বাদী প্রতিবাদীর, যারা উপকার প্রত্যাশা করে না। সভাসদ, নানা জাতির ও বৃত্তির মুখ্য। এঁরা assessors। সে কালে রাজ-পুরোহিত অমাত্যের সঙ্গে ব'স্‌তেন।

এই যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত উদাহরণ হ'তে দেখা যাবে, একটু যত্ন ক'র্‌লে বর্তমানের উপযোগী অনেক শব্দ পাওয়া যাবে। যে সকল শব্দ চল্যে গেছে, সে সবের বিচার নিরর্থক। কিন্তু যে সকল শব্দ দেশময় প্রচলিত হয় নাই, মাত্র লেখক-বিশেষের নিকট সমাদৃত আছে, সে সব বিচার্য। একই শব্দ নানা অর্থে লাগালে ভাষা খর্ব হয়ে পড়ে, পাঠকের জ্ঞান আব্-ছায়া হয়ে থাকে। কেহ কেহ 'নৈতিক অবনতি' লিখে 'নীতি' শব্দটার অর্থ-বিপর্যয় ঘটাচ্ছেন, 'গণ' আর 'জন' যে এক নয়, এক ক'র্‌লে 'গণ' শব্দের ভাব-প্রকাশক অন্য শব্দ থাকে না, সে চিন্তা ক'র্‌ছেন না। "তথাকথিত নিম্নশ্রেণী" বলাতে সে শ্রেণীর নিম্নত্ব যে আরও প্রকট হয়ে উঠে। শ্রেণীই বা বলি কি করো। যখন ভাগ ক'র্‌তেই হ'চ্ছে, আর সত্য সত্য ভাগ আছে, তখন 'অমুন্নত প্রকৃতি' বলা চলে। কোন জাতিকে animist, কিম্বা বাংলায় 'প্রেতপূজক', ব'ললে অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়। তাদিকে বরং চৈতনক ব'লতে পারি, যদিও হিন্দুও চৈতনক। সেদিন একখানা ইস্কুল-পাঠ্য বইতে দেখি, প্রথম পদ্য "Our God is in heaven."—গ্রন্থকার বাঙ্গালী, বোধ হয় হিন্দু। তিনি ভাবেন নাই, এই বিশ্বাস হিন্দু মুসলেমের নয়। এইরূপ গদ্য-পদ্য দ্বারা বালকদের ধর্মজ্ঞান-বিকাশের পথ বাঁকা করা হ'চ্ছে। ইস্কুলে moral training দিতে হ'বে, কি উপায়ে শুনি নি।

যে কথা হ'চ্ছে সে কথাই হ'ক। ইংরেজীর প্রতিশব্দ সংস্কৃত চাই, এমন কথা নাই। চাইলে আকাশের চাঁদ চাওয়া হ'বে। আদালতে ফার্সী শব্দ প্রচুর ; ইদানী ইংরেজী শব্দের বান ব'চ্ছে। মুন্‌সফ, জজ, মেজষ্টর, প্রভৃতি অসংখ্য ইংরেজী পদবীর বাংলা চ'ল্‌বে না। হাইকোর্টের জজকে 'বিচারপাত' ব'ল্‌লে মুন্‌সফের অধিকার খর্ব করা হয়। কিন্তু পদবীকে বাঙ্গালীর কানের ও জিবের অনুকূল করো নিতে হ'বে। এ বিষয়ে অশিক্ষিত জনই প্রমাণ। ষ্টীট, ডিস্‌ট্টিক, মুন্‌সিপাটি, গমের্ণ্ট, নিস্পেক্‌টর, হাইকোট, বোড, ইনান প্রভৃতি নাম বাংলা হ'য়ে গেছে। বার্তাপত্রে দীর্ঘনাম লিখে লাভ নাই। কতক-গুলি শব্দ কালবৈগুণ্যে এসেছে। এগুলার অর্থ এখনও প্রচলিত হয় নি, বাংলায় ব'ল্‌তে হ'বে। Ordinance খাস্ হুকুম ; মন্দ কি ? Interned অন্তরীণ ? কথাটার একটুও মানেঃ হয় না। Externed না থাক্‌লে বা চ'ল্‌ত। Interned গ্রাম-নিরুদ্ধ, externed গ্রাম-বাহিষ্কৃত, transported সমুদ্রান্তরিত, (দ্বীপান্তরিত ? কোন্ দ্বীপ অন্তরে ?), detenue নিরুদ্ধ। সংস্কৃতে 'আসেধ' custody, legal restraint, কিন্তু কেউ বুঝ্‌বে না।

এসব ছাড়া এখন "গোল টেবিল বৈঠক," Dominion Status, Federal Govt. ইত্যাদি নানা ছন্দের নানা শব্দ শুন্‌ছি। Dominion সামন্ত নয়, বটেও ; মিত্র নয়, বটেও ; স্ব-তন্ত্র বটে, পর-তন্ত্রও বটে। এটার নামান্তর না-কি, colonial। অতএব স-জাতির পরস্পর উপকার, Dominion form of Govt.-এর মূল নীতি। যাঁর Dominion, তিনি 'নাতি'। অতএব বাংলায় প্রতীকার-রাজ্য বা রাষ্ট্র ব'ল্‌তে হয়।

বার্তিকেরা বিষয় চিন্তা ক'র্‌বেন, না শব্দ চিন্তা ক'র্‌বেন। দুই চিন্তায় যুগপৎ আকুল না হ'য়ে কয়েকজন

মনে শব্দ চিন্তার শেষ করাই ভাল। ১৩২৬ সালের শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" "বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি" প্রবন্ধে সাড়ে চারি শত শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। দুই পাঁচটার ব্যাপক অর্থ, দুই পাঁচটার দুরূহ অর্থ হ'য়ে গেছে। দুই-ই দোষ। এখানে কতকগুলি নূতন শব্দ সঙ্কলন ক'রছি। পূর্ব সঙ্কলিত ও এই সকল শব্দ বার্তিক-সমাজ (Journalists' Association) বিচার করে ছেপে প্রচার করলে, তাঁদের ও পাঠকের, উভয়েরই সুবিধা হ'তে পারে।

Politics ... রাষ্ট্রনীতি
Political Division ... রাষ্ট্র বিভাগ
State or Province···রাষ্ট্র (দেশ, প্রদেশ, ভৌগোলিক)
Division of a ···ভুক্তি
India as a State···অধিরাষ্ট্র; ভারত-রাষ্ট্র
United States of India · ভারত-যৌথ-রাষ্ট্র, রাষ্ট্রমণ্ডল
Constitution · নিয়ম, প্রকৃতি
" - making···প্রকৃতি-নির্ণয়
—al···(রাষ্ট্র) নিয়মানুগত
Government···রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রশাসন
Form of ···রাষ্ট্র-তন্ত্র
Unstable···অপ্রতিষ্ঠ
Autonomous "···স্বশাসিত
Responsible "···জনানুমত
Central "···নাভি
Provincial "···অনুরাষ্ট্র;
Centralized" ···মধ্যগত। Centralization··· মধ্য-গমিতা
Decentralized "···পরিধিগত
Unitary "···একরাষ্ট্র-তন্ত্র
Federal "···সঙ্ঘ-তন্ত্র
National "···স্বরাষ্ট্র তন্ত্র
Dominion status···প্রতীকার-সংস্থা
Diarchy···দ্বি-অর্কী (অর্ক, সূর্য, রশ্মি)
—ical···দ্বি-আর্কিক
Bi-cameral···দ্বি-কক্ষ

Princes···রাজক
" of small States · রাজানক
chamber of ···রাজক-মণ্ডল
Governor of a State · রাষ্ট্রপতি (প্রশাস্তা ?)
" General···ভারতরাষ্ট্রপতি
Private Secretary · ব্যবহর্তা
Governor's Council···অমাত্য-মণ্ডল
a member···অমাত্য
Advisers or ministers···মন্ত্রী
Chief Minister···মহামাত্র
Cabinet···গূঢ়ামাত্য
Department···অধিকরণ
officers of a ···অধিকৃত
of Law and order·· শাসনাধিকরণ
of Justice···ন্যায়াধিকরণ
Military Dept·· বলাধিকরণ (যুদ্ধ, battle)
Nation building "···পালনাধিকরণ ইত্যাদি
Secretaries···সচিব
Chief Secretary···মহাসচিব
Director or Inspector-General···অধ্যক্ষ
The people of a State ··প্রকৃতি, জন
Franchise···জনাধিকার
Vote···ভোট। Voter · ভোটর
Casting vote·· নিস্পৃষ্ট-ভোট
Electors···বরক
Election···বরণ (Selection·· নির্বাচন)
Seperate interests·· গণ, যথা বণিকগণ, ভূম্যধিকারীগণ
Electorate...সমূহ বা বরকসমূহ
Indian Legislative Assembly ভারত-ব্যবহারিক সভা
Members of · সভাসদ্, সভ্য
President of · সভাপতি
Provincial Council...রাষ্ট্র সংসদ্
Members of···সদস্য
President of···সংসদ্‌পতি

Conservatives or Moderates…মন্থর
Liberal · ধীরক
Responsivist সংবাদী
Extremist…উদগ্র
Nationalist…রাষ্ট্রিক
Communalist ..সম্প্রদায়ী ?
Leader ·নেতা
Popular…অনুরক্ত-লোক, জনপ্রিয়
Unpopular বিরক্ত লোক, জনাপ্রিয়
Following…অনুগতি
Opposition Bench বিরোধী, প্রতিবাদী
Speech সংবাদ
Report·· উদন্ত
—er…ঔদন্তিক
Indian nation…ভারতী (ভারতীয় লেখা অনাবশ্যক)
Nation…রাষ্ট্রজন, রাষ্ট্র, জন
Citizens ··পৌরজন
Countrymen ··জানপদ
National · রাষ্ট্রজনিক (প্রায়ই, ভারতী)
„ school…স্বদেশী ইস্কুল
Race…বর্ণ* । Racial · বর্ণিক*
Martial races…শূরজাতি
Depressed classes…অনুন্নত প্রকৃতি

Agriculturists...ক্ষেত্রকর
Growers of ·· -কর, যথা, নীল-কর, নুন-কর
Manufacturers of… —কার,যথা, স্বর্ণকার, ঔষধকার
Trading in… —আলা, যথা,কাগজ-আলা, বাড়ী-আলা (ওয়ালা হিন্দী)
Arts and Industries ·· কলা ও ব্যবসায়
Cottage industries…গ্রামিক কলা
Factory „ ·· খর্বট কলা
Labour…দেহজীবী
Paid…ভৃত
Unpaid·· বিষ্টি (বেঠি)
Intellectuals…বুদ্ধিজীবী
Private servant…পরজীবী
Worker ..কার্মিক
Employer…ভর্তৃক
Employee…ভৃতক
Union of · ভৃতক-সমিতি
Trades Union…'শ্রেণী'
Corporations·· 'পূগ'
Class war…ভর্তৃ-ভৃতক কলহ
Organization · বিগ্রহ, কায়
Organized…অর্জিত
Affiliated…সংশ্লিষ্ট, অনুগত
Propaganda · স্বপ্রচার

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩৯)

ইন্দু কতক্ষণ যে বিস্ময়বিমূঢ়ের মত একই জায়গায় দাড়াইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে তাহার নিজেরই কোনো জ্ঞান ছিল না। মায়ার অসুখটা যে এমন অচিন্তনীয় রকম দুর্ঘটনা তাহা সে আগে বুঝিতেই পারে নাই। কয়েকটা বৎসরের ঘটনাবলির স্মৃতি যে তাহার নাই, তাহাই শুধু নয়, সে-সময়কার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার সবই তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। সাধারণ রকম দুঃখ শোক সব কিছুর সঙ্গেই ইন্দুর পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা এমনি অসাধারণ যে, ইহার সম্মুখীন হইয়া সে যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না।

বাহিরে গাড়ী থামার শব্দে সে যেন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। বুঝিল নিরঞ্জন ডাক্তারকে লইয়া জাহাজঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মায়া তখনও সব আলমারীগুলির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও বাংলা বই আছে কিনা দেখিতেছিল। ইন্দু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওরে তোর জন্যে ত মেজদা ডাক্তার নিয়ে এল, উপরের ঘরে চল।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই নিরঞ্জন, দেবকুমার এবং ডাক্তার মিত্র আসিয়া ঠিক লাইব্রেরীর দরজার সামনেই দাঁড়াইলেন। ডাক্তারের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বলিয়া বোধ হয়, শ্যামবর্ণ রং, দীর্ঘ কৃশাকৃতি।

মায়া এত লোকের পায়ের শব্দে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল এবং অপরিচিত পুরুষ দুইজন দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া জিব কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। দেবকুমারকে দেখিয়া চিনিবার কোনো লক্ষণ তাহার দৃষ্টির মধ্যে দেখা গেল না।

দেবকুমার এতখানি বিস্মৃতি আশা করে নাই। সামনাসামনি আসিয়া পড়িলে মায়া তাহাকে চিনিতে পারিবে এবং এই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই আবার নিজের লুপ্ত চেতনাকে ফিরিয়া পাইবে, ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল। দু-দিন আগে যে হৃদয়ের অন্তরতম ক্ষেত্রের অধীশ্বররূপে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ সেই নারীর জীবনে তাহার বিন্দুমাত্র স্থান কোথাও নাই, এত বড় ভয়াবহ দুর্ঘটনা সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিতেছিল না। এ যে মৃত্যুরও অধিক দুঃখ, ইহাকে সে সহ্য করিবে কি করিয়া? মায়ারই না হয় স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে, হতভাগ্য দেবকুমারের যে হৃদয়পটে তাহাদের প্রেমের চিত্র আগুনের রঙে আঁকা রহিয়াছে, তাহার শান্তি কোথায়?

দেবকুমারের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দুর চোখে জল আসিতেছিল। সে তাহার কাছে আসিয়া নীচু গলায় বলিল, "দুঃখ কোরো না বাবা, মায়া নিশ্চয় আবার সেরে উঠবে। তুমি এমন লক্ষ্মীছেলে, ভগবান তোমায় এমন কষ্ট কখনও দেবেন না।"

দেবকুমার হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "জগৎটা ত এত সোজা জায়গা নয় পিসীমা, ভাল হলেই যদি সুখী হওয়া যেত, তা হ'লে ত সংসারে দুঃখ কেউই পেত না। যাক্, আমার সুখ-দুঃখটা আসল কথা নয়, আসল কথা ওর সেরে ওঠা।"

নিরঞ্জন ডাঃ মিত্রকে বলিতেছিলেন, "ঐ আমার মেয়ে। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন, তারপর উপরে গিয়ে ভাল করে ওকে দেখবেন।"

ডাক্তারকে তিনি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গেলেন।

দেবকুমার বলিল, "আমি তাহ'লে এখন আসি পিসীমা, ওবেলা এসে খবর নেব, ডাক্তার কি বলেন।"

দেবকুমার চলিয়া যাইতেই ইন্দু আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। মায়া নিজের ঘরে বসিয়া একখানা

বাংলা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, ইন্দুকে দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, বাবার পাগ্‌লামী আর কোনো কালে যাবে না। কেমন মানুষ দু'টাকে হুট করে ঘরের ভিতর এনে উঠলেন।"

ইন্দু বলিল, "তা ডাক্তার ঘরে আসবে না ত কোথায় যাবে? তুই ত আর মুসলমানের বেগম নয় যে পরদার ওপার থেকে লোকে ডাক্তার দেখবে?

মায়া বলিল, "হিন্দুর মেয়ের বুঝি আর লজ্জাসরম নেই? আর একজন লোক কে, একজন ত ডাক্তার?"

ইন্দু বলিল, "আর একজন ত দেবকুমার, সত্যি তাকে তুই চিন্‌তে পারলি না?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কবে তাকে আমি দেখলাম যে চিন্‌ব?"

ইন্দু আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। মায়া বলিল, "ঐ বুঝি বাবা ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছেন? কি হাড় জ্বালাতন বাবা, অসুখ নেই বিসুখ নেই, দিনে পঞ্চাশবার করে ডাক্তার দেখাও।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোর অত গিন্নীপনায় কাজ নেই। তোর বাপ তোর চেয়ে কম বোঝেন না। যা দরকার তাই করছে। ডাক্তার যা জিগ্‌গেস করবে ঠিক ঠিক উত্তর দিস্ যেন।"

মায়া বলিল, "ঠিক উত্তর দেব না ত কি গড়ে গড়ে উত্তর দেব? তোমরা আমায় কি পেয়েছ যেন।"

নিরঞ্জন ডাক্তার মিত্রকে লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। ইন্দু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া নানাভাবে ডাক্তার মায়াকে পরীক্ষা করিলেন। কোনো প্রশ্নের সে ভাল করিয়া জবাব দিল, কোনো প্রশ্নের উত্তরে খালি ঘাড় নাড়িল। মোটের উপর তাহার কয়েক বৎসরের স্মৃতি যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, এবিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন ডাক্তারকে লইয়া নীচে আপিস ঘরে চলিয়া গেলেন। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরকম বুঝছেন? এ রকমের কেস্ আর কখনও ট্রিট করেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "এ ধরণের কেস্ খুবই রেয়ার, নিজে কখনও ট্রিট করিনি। আর যতদূর জানি এর ট্রিটমেণ্ট কিছু নেইও, ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকা ছাড়া। আপনার মেয়ের মেমরি যেমন হঠাৎ লোপ পেয়েছে, তেমনি হঠাৎ আবার ফিরেও আস্‌তে পারে। এটা হিষ্টিরিয়ারই কেস্, একে ডাবল্ পার্সন্যালিটির দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইয়ে এ ধরণের কেস্-এর হিষ্ট্রি কিছু পাওয়া যায়?"

ডাক্তার বলিলেন, "তা আছে। তবে অবিকল এই রকম হয়ত নয়। এ ধরণের কেসের হিষ্ট্রি কুড়ি-পঁচিশটার বেশী বড় পাওয়া যায় না। অবশ্য জগতে আর ঘটেনি তা বল্‌তে পারি না, তবে সব কেস্ ত রেকর্ডেড হয় না. আঠার শ একত্রিশ সনে ম্যাকনিশ ব'লে একজন ডাক্তার Philosophy of Sleep ব'লে একটা বই বের করেন, তাতে এই ধরণের একটা কেসের বেশ পরিষ্কার হিষ্ট্রি আছে। মেয়েটি আমেরিকান, তার নাম কি, তা ঠিক জানা যায় না, বইয়ে তাঁকে Lady of Macnish নামেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি হঠাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন। অনেক ঘণ্টা কিছুতেই তাঁকে জাগান যায় নি। এ ধরণের ঘুম মূর্চ্ছারই রূপান্তর অবশ্য। যখন তিনি জেগে উঠলেন, তখন দেখা গেল তাঁর স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে। তাঁকে আস্তে আস্তে আবার লিখতে পড়তে সব শেখানো হ'ল, মানুষদেরও ক্রমে ক্রমে তিনি চিনতে শিখ্‌লেন। কিছুকাল পরে, হঠাৎ আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন জাগলেন. তখন নিজের পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু মাঝের ঐ দিনগুলির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন। এই রকম অবস্থান্তর তাঁর বার-বার ঘটতে লাগ্‌ল, এক অবস্থায় আর এক অবস্থার কথা তাঁর একেবারেই মনে থাক্‌ত না।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর কি মরবার সময় পর্য্যন্ত এই ভাবেই কেটেছিল?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "না, তা কাটেনি। যতদূর মনে পড়ে, চার পাঁচ বৎসর তিনি এই রকম ভুগেছিলেন, তারপর সেরে যান।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এই ধরণের অসুখে কোনো চিরস্থায়ী অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে কি ?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "নার্ভাস্ অসুখ সম্বন্ধে কোনো কিছু ঠিক করে কি বলা যায় ? অনিষ্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেটা সাময়িক হতে পারে আবার চিরস্থায়ীও হতে পারে। Lady of Macnish-এর কেসে স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো অনিষ্ট হয়নি, তবে ডাক্তার ওয়ার মিচেলে-এর বইয়ে মেরী রেণল্ডস্ ব'লে একটি মেয়ের কথা পাওয়া যায়, তার বছর আঠারো বয়সে হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর দেখা গেল সে কালা এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এটা বেশী দিন থাকেনি। পাঁচ ছয় সপ্তাহ পরে কানে শুন্‌বার ক্ষমতাটা তার ফিরে এল, চোখে দেখার ক্ষমতাটাও আস্তে আস্তে ফিরতে লাগ্‌ল। আর একবার বহুক্ষণব্যাপী মূর্চ্ছার পর তার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখা গেল, ইন্দ্রিয়গুলি তার সব ঠিক আছে, কিন্তু স্মৃতি লোপ পেয়েছে। আবার লেখাপড়া সব তাকে শেখান হ'ল। চরিত্রের স্বভাবেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অসুখের আগে সে ভারি চুপচাপ আর শান্ত ছিল, এখন খুব ফুর্ত্তিবাজ হয়ে উঠ্‌ল। কিছুদিন পরে ফের মূর্চ্ছা হয়ে সে নিজের প্রথম অবস্থায় ফিরে গেল। আগের চেয়ে চুপচাপ এবং শান্ত হয়ে গেল। এক অবস্থায় আর এক অবস্থার কোনো স্মৃতি তার থাকত না। এ রকম বার-বার হ'তে থাকে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সে আবার সেই হাসিখুসি, ফুর্ত্তির অবস্থাটা ফিরে আসে। তখন থেকে একইভাবে পঁচিশ বছর সে ছিল। জীবনের শেষের দিকে, এই দুটো অবস্থা মিশে গিয়ে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কোনোটার থেকে কোনোটাকে আলাদা করা যেত না।"

নিরঞ্জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি যে হবে, কিছু ত বুঝতে পারছি না। এর কোনো চিকিৎসা নেই, আপনি বলছেন ?"

ডাক্তার বলিলেন, "চিকিৎসা আর কি ? সাধারণ স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, মন যাতে ভাল থাকে, তারই চেষ্টা করতে হবে, আর কি ? তারপর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আশা করা যাক যে আপনার মেয়ে শীগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সারবার সম্ভাবনা যতখানি, না সারবারও ততখানি যে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাই যদি হয় ত, তাহলেও একেবারে হাল ছেড়ে দেবার কারণ কি ? যতদূর দেখছি, মাঝের কটা বছর এর স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। এ ছাড়া বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কোনো ক্ষতি হয় নি। তাঁকে আবার লেখাপড়া শেখাতে হবে, আবার যেভাবে আগে ট্রেন্‌ড হয়েছিলেন, তাই করতে হবে। মানুষ করা মেয়েকে আবার ফিরে মানুষ করা, খুবই ট্রাবল্‌সাম্ ব্যাপার, তাহ'লেও উনি যদি না সারেন, তখন তাই করতেই হবে। জীবনটা তাঁর অনেক বৎসর পিছিয়ে যাবে বটে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "শুধু কি তাই ? কত সমস্যা যে এর থেকে সৃষ্টি হবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওর বাকদত্ত স্বামীকেও চিন্‌তে পারল না, দেখলেন ত ? ছেলেটিকে কি যে বোঝাব ভেবে পাই না, মেয়ের জন্যে যত দুঃখ আমার, দেবকুমারের জন্যেও প্রায় ততখানি। ভারি চমৎকার ছেলে, ওর জীবনটা যদি এই রকম করে নষ্ট হয়, সেটা প্রায় আমার মেয়ের অসুখের সমানই শোচনীয় ব্যাপার হবে।"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "যাক্, let's hope for the best. কিছু বেশী দিন ত হয়নি ? আমি যতগুলো কেসের কথা জানি সবই কোনো-না-কোনো সময় সেরে গিয়েছিল, আবার রিল্যাপস্‌ও অবশ্য করেছে। আপনার মেয়েও একসময় না একসময় লষ্ট মেমরি ফিরে পাবেন বলেই মনে হয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই আশা করা ছাড়া যখন উপায় নেই তখন অগত্যা তাই আশা করতে হবে। আচ্ছা, আপনি স্নানটান করুণ গিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর একবার বেরতে চান কি ?"

ডাক্তার মিত্র উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তা গেলেও হয়। বৃহস্পতিবারের আগে ত যাবার কোনো উপায় নেই, এই ক'টা দিন যেমন করে হোক কাটাতেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আপনাকে আমি প্রতি মেলেই ওর অবস্থার কথা লিখব, যদি কিছু করবার থাকে আমায় জানাবেন। In the meantime, যতদিন ওর কোনো পরিবর্ত্তন না দেখা যায়, ততদিন কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাব কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তার বিশেষ কিছু দরকার নেই। বরং পরিচিত লোকজনের মধ্যে থাকলে কিছু লাভ হলেও হতে পারে। দেবকুমারকে রোজ যদি তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন, তাতে কিছু উপকার হতে পারে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "গোলমাল ত সব ঐখানেই। এখানে আসবার আগে মায়া ভারি গোঁড়া হিন্দু ছিল। আমার স্ত্রীর ইন্‌ফ্লুয়েন্স আর কি ? তারপর এখানে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সেটা কেটে গিয়েছিল। এখন আবার সেই কন্‌সারভেটিভ মুড ফিরে এসেছে। দেবকুমারকে দেখলে ত সে উর্দ্ধশ্বাসে পালায়, তা তাকে দেখা করতে ব'লে আর লাভ কি ?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এসব মানসিক ব্যাধি নিয়ে বড় ভুগতে হয়। আচ্ছা দেখা যাক্।"

ডাক্তার মিত্র নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার পরও নিরঞ্জন আপিস-ঘরে অনেকক্ষণ একলাই বসিয়া রহিলেন। কতরকম চিন্তা যে তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। একমাত্র সন্তান মায়া, বিধাতা তাহারই অদৃষ্টে এ কি নিদারুণ অভিশাপ লিখিয়া দিলেন ?

খাওয়ার সময় প্রভাস ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র উপস্থিত ছিলেন বলিয়া সে নিরঞ্জনকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট্ করিতে লাগিল। অত বেশী আগ্রহ তাহার দেখানোও হয়ত শোভন হইবে না। মায়াকে অবশ্য সে বাল্যকাল হইতে জানে, কিন্তু সে এখন অন্য এবং অন্যের বাগদত্তা বধূ। তাহার বিষয়ে প্রভাসের বেশী উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত হইবে না। খাওয়া-দাওয়ার পর ইন্দুর কাছে খোঁজ করিবে ঠিক করিয়া, সে তখনকার মত নীরবেই খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন এবং ডাক্তার মিত্র উঠিয়া যাইবার পর প্রভাস কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পর ইন্দুর সন্ধানে চলিল। ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, ইন্দুর পূজার ঘর, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। সে তখন উপরে মায়ার কাছে।

প্রভাস অবশেষে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া উপরেই চলিল। তাহাকে দেখিয়া মায়া অবশ্য আগের মত পিছন ফিরিয়া বসিতে পারে, সে সম্ভাবনা বেশ ছিল ! কিন্তু প্রভাসকে সে ভোলে নাই, ইচ্ছা হইলে কথা বলিলেও বলিতে পারে। না-হয় ইন্দুর কাছে খোঁজ লইয়াই সে ফিরিয়া আসিবে।

ইন্দু মায়ার ঘরেই ছিল, সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মায়া বলিল, "পিসীমা, দেখ ত, কে উপরে উঠ্‌ছে। যে সে, যেখানে সেখানে এসে উপস্থিত হয়, এই বাড়ীর এই একটা বড় দোষ। সদর অন্দরের কোনো ভেদ নেই।"

ইন্দু দরজার কাছেই বসিয়া ছিল, গলা বাড়াইয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "প্রভাস বুঝি হবে।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি চান দেখ গিয়ে।"

মনে মনে প্রভাসের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সিঁড়ির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রভাস, কিছু চাই কি ?"

প্রভাস উঠিয়া আসিয়া বলিল, "চাই না বিশেষ কিছু ; তবে মায়াকে দেখে ডাক্তার কি বল্লেন তাই একটু জানতে ইচ্ছে করছে।"

ইন্দু বলিল, 'মেজদার সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সময় ত পাই নি ? একবার জিগ্‌গেস করেছিলাম, তাতে শুনলাম বলেছে হিষ্টিরিয়া না কি। নিজের থেকেই সেরে যাবে, ওর কোনো চিকিৎসা নেই।"

প্রভাস জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে সারতে পারার সম্ভাবনা সে বিষয়ে কিছু বলেছেন কি ?"

ইন্দু বলিল, "জানি না, বিকেলে চা খাবার সময় জিগ্‌গেস করব।"

প্রভাস অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা

করিল, "পিসীমা, আমি মায়ার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি? আমাকে চিনতে পারে বলেই মনে হয়। গ্রামের সেই স্কুল করার বিষয় বুঝিয়ে বললে হয়ত বুঝতে পারবে। আমি ত বেশী দিন শুধু শুধু এখানে বসে থাকতে পারব না,মায়া যদি খানিকটা বুঝেও জিনিষটাতে মত দেয়, তাহলে আমি ফিরে গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারি। টাকাকড়ির কথা অবশ্য সব কাকাবাবুর সঙ্গেই বলতে হবে।"

ইন্দু কঠিনস্বরে বলিল, "মেজদাকে জিগ্গেষ না করে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। যা অবস্থা হয়ে আছে, এতে কখন কিসে কি হয়, তার ঠিকানা নেই। একে ত বিপদ রাখবার জায়গা নেই, তার উপর যদি আবার বেড়ে যায়, তাহলেই গেছি।"

প্রভাস ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "থাক্ তাহলে, দরকার নেই।

নামিয়া যাইবার আগে সে একবার মায়ার ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল। মনে হইল কপাটের আড়ালে মায়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পরণের লালপেড়ে শাড়ীর একটা অংশ দেখা যাইতেছে। হয়ত উহাদের কথা শুনিবার জন্যই দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দু পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাছে প্রভাস কোনো কথা মায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলে বা দেখা করিবার চেষ্টা করে। মায়া পোড়ারমুখীর যা মনের ভাব, সে যে তাহা হইলে কি কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, ঠিকানা নাই। তাহা হইতে সে দিবে না। কিন্তু প্রভাস নীরবেই নামিয়া গেল।

(৪০)

মায়ার মনোজগতে এই সময়টা কি যে ঘটিতেছিল বা না ঘটিতেছিল তাহা সে নিজে ভিন্ন বড় কেহ একটা বুঝিতে পারিত না। বাহির হইতে যতদূর বুঝা যাইত, সে আবার তাহার বালিকা জীবনে ফিরিয়া গিয়াছিল, সেই মতামত, সেই শিক্ষাদীক্ষা, সেই অপরিণত বুদ্ধি। বয়সে সে তরুণী, কিন্তু মনের দিক দিয়া তেরো চৌদ্দ বৎসরের মেয়ের মতই তাহাকে বোধ হইত।

একটা জিনিষ কিন্তু নিরঞ্জন বা ইন্দু কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেটা মায়ার হৃদয়াবেগের বিকাশ। স্মৃতিলোপ হইবার পূর্ব্বে তাহার জীবনে প্রেমের স্পর্শ ভাল করিয়াই লাগিয়াছিল। দেবকুমারের জন্য সে সবকিছু বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার ভালবাসা বালিকার চপল ভালবাসা ছিল না, নারীর পরিণত মনের সমস্ত।েগী প্রেমই ছিল। দারুণ রোগের কবলে পড়িয়া সে দেবকুমারকে ভুলিল বটে, কিন্তু এই ভালবাসার বীজ তাহার মনে খানিকটা থাকিয়াই গেল।

ভালবাসা কখনও অবলম্বনহীন হইয়া থাকিতে পারে না। মায়া যাহাকে ভালবাসিয়া, ভালবাসার অর্থ বুঝিতে শিখিয়াছিল, তাহাকে এই বিস্মৃতিসাগরে হারাইয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। নিজের আত্মীয়স্বজন, যাহাদের সে চিনিতে পারিতেছিল, তাহাদের ভালবাসিয়া সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। নিজের অপরিস্ফুট চেতনার সাহায্যেই সে বুঝিল কি সে চায়। কিন্তু যাহাকে চায় কোথায় সে? ভাগ্যদোষে ধ্রুবতারা তাহার আঁধারে ডুবিয়া গেল, এখন আকুল আগ্রহ লইয়া ছুটিল সে আলেয়ার সন্ধানে।

প্রভাসকে সে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার মাতা সাবিত্রী বাঁচিয়া থাকিতে, মায়ার সঙ্গে প্রভাসের বিবাহ দিতে যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। বিবাহ হইয়াও যাইত, যদি সাবিত্রী লুকাইয়া বিবাহ দিবার প্রস্তাব না করিতেন।

ইন্দুর অসুখের সময় মায়া যখন আবার গ্রামে ফিরিয়া গেল, তখন বহু বৎসর পরে আবার তাহার প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তখন সে প্রভাসকে ভালবাসিয়া বসে নাই বটে, কিন্তু প্রভাস-সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই করিয়াছে। কাছাকাছি থাকিলে এবং প্রভাসের দিক হইতে সাড়া পাইলে, কালে এই ভাবটাই ভালবাসায় পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু মায়া অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল এবং দেবকুমারের ভালবাসায় একেবারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। তাহার পর এই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এখন সে হঠাৎ প্রভাসকেই যেন মনের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে চাহিল। এই অর্দ্ধআচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও

সে বুঝিতে পারিতেছিল এ যেন ঠিক সে যাহাকে চায়, সে নয়। কিন্তু আর কে কোথায় আছে? ভালবাসে সে, কিন্তু প্রভাস ভিন্ন আর কাহাকে সে ভালবাসিতে পারে? তাহাদের মিলন যদি হয়, তাহা হইলে স্বর্গগতা জননীর আশীর্ব্বাদ সে লাভ করিবে, তাহার আরাধ্য দেবদেবী-সকলের প্রসন্নতা সে লাভ করিবে, ধর্ম্মচ্যুতির ভয় আর তাহার থাকিবে না।

সে জানিত তাহার বাবা এ বিবাহ দিতে চাহিবে না। পিসীমার কাছে সে শুনিয়াছে, নিরঞ্জন কোন এক বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। পিসীমার মতও সেইদিকেই। সে একলা কেমন করিয়া নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করিবে? হিন্দুর মেয়ের এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা বা অগ্রসর হওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় তাহা মায়ার দৃঢ় ধারণা ছিল। না ভাবিয়া সে পারিত না, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু করা তাহার সাধ্যায়ত্তও ছিল না, এবং উহার চিন্তামাত্রেই তাহার মন সভয়ে পিছাইয়া যাইত।

কিন্তু সে স্থির হইতেও পারিতেছিল না। পাছে তাহার অমতেই নিরঞ্জন জোর করিয়া অন্য কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বসেন, এই দুর্ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। বিবাহ না করিয়া যে হিন্দুর মেয়ের গতি নাই, না হইলে সে বেশ চিরকুমারী থাকিয়া যাইতে পারিত। এমনিতেই তাহার বয়স যেন অনেক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রামে থাকিলে এতদিনে সকলে খোঁটা দিয়া তাহাদের অস্থির করিয়া তুলিত।

মায়ার খুব ইচ্ছা করিত, এই-সব বিষয়ে ইন্দুর সহিত সে আলোচনা করে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিত। পিসীমা হয়ত মনে করিবেন মেয়ে বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অথচ কোনোদিক হইতে কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া সে ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন প্রভাসকে উপরে উঠিতে দেখিয়া সত্যই সে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের কি কথা হয় শুনিবার জন্য। ইন্দু যে প্রভাসকে কোনো মতে বিদায় করিয়া দিতে ব্যস্ত, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল এবং মনে মনে পিসীর উপর বেশ খানিকটা চটিয়া উঠিতেছিল। এবাড়ীতে সবাই যেন মায়ার শত্রু, সে নিজে যাহা চায়, তাহার উল্টা পথে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে সকলেই ব্যগ্র। কে এখানে মায়াকে একটু সাহায্য করিবে? প্রভাস যখন এত ব্যস্ত হইয়া তাহার খবর লইতেছে তখন নিশ্চয় তাহার মায়ার প্রতি খানিকটা মনের টান আছে, এবং বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে নিশ্চয়ই রাজী হয়। কিন্তু কেই বা সে ভাবনা ভাবিতে বসিয়াছে?

প্রভাস নামিয়া যাইতেই ইন্দু আবার মায়ার ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল মায়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে এক-কোণে বসিয়া আছে। ইন্দু তাহার বিরক্তির কারণ ততটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, অত মুখ হাঁড়ি করে বস্‌লি যে?"

মায়া বলিল, "মুখ হাঁড়ি আবার কোথায় করলাম?"

ইন্দু বলিল, "মনে হচ্ছে যেন ভয়ানক চটে গিয়েছিস্, হয়েছে কি?"

মায়া কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর বলিল, "মাথাটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে।"

ইন্দু বলিল, "শুয়ে থাক খানিকক্ষণ, রোদটা পড়ে গেলে বাগানে বেড়িয়ে আসিস্।"

মায়া বলিল, "যা চারিদিকে তোমাদের বন্ধুবান্ধবের ঘটা, কোথাও কি এক পা বাড়াবার জো আছে?"

ইন্দু তাহার ঝাঁঝ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের বন্ধুবান্ধব আবার কোথায়? তোমারই বন্ধু বরং দু-চারজন আসে।"

মায়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার বন্ধুতে ত ঘর ভোরে উঠেছে। তোমরা ত যা বা দুই একজন আছ, পারলে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দাও।"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল। প্রভাসের সঙ্গে হয়ত মায়ার কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহার সমস্ত মন যেন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, না, না, ইহা হইতে দেওয়া যায় না। প্রভাস এখান হইতে চলিয়া গেলে সত্যই যেন আপদ বিদায় হয়। মায়াকে এখন কি যে এক সর্ব্বনাশের নেশা পাইয়া বসিয়াছে, সে তাহার

ঝোঁকে হয়ত এমন কিছু করিয়া বসিবে, ইহজন্মে যাহার আর কোনো প্রতিকার সম্ভব হইবে না।

খানিক ভাবিয়া ইন্দু বলিল, "ঝাঁটা আবার কাকে আমরা মারতে গেলাম, সবাইকেই ত আদরযত্ন কর্‌ছি। প্রভাস আর ক'দিনই বা আছে? দেশে তার মা তার বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে, সে কি আর ছেলেকে চিরকাল এখানেই বসিয়ে রাখবে?"

মায়া যেন সামলাইতে না পারিয়াই বলিয়া উঠিল, "কেন? বিয়ে কি আর দেশ ছাড়া আর কোথাও হ'তে পারে না?"

ইন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, "পারবে না কেন? তা তারা যদি দেশেই দিতে চায়, অন্য কোথাও না দিতে চায়?"

মায়ার মুখ আঁধার হইয়া গেল, বলিল, "তা অবিশ্যি, তবে ছেলে কোথায় বিয়ে করতে চায় তাও ত তাদের একটু দেখা উচিত?"

ইন্দু বলিল, "হিন্দু সমাজের ছেলে, বাপ মায়ে যেখানে দেবে সেখানে বিয়ে করবে। তাদের আবার মতামত কি? এই যে প্রভাসের ছোট ভাই সুভাষের বিয়ে হ'ল, কে তার মত নিতে গিয়েছিল?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ পিসিমা, সুভাষের বউ কেমন হয়েছে?"

ইন্দু বলিল, "হয়েছে মন্দ নয়, তবে মেয়ে তেমন খুব ফরসা নয়। তা দিয়েছে থুয়েছে বেশ।"

মায়া তখন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইন্দু একটু গড়াইয়া লইবার জন্য নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিকাল বেলা আবার মায়ার খোঁজ করিতে গিয়া দেখিল, সে উহারই মধ্যে চুল বাঁধিয়া, পাউডার মাখিয়া, দিব্য ভাল সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া আছে। পিসীকে দেখিয়া বলিল, "বাগানে না বেড়াতে যাবে বলেছিলে, চল না এইবেলা?"

ভাইঝীর উৎসাহ দেখিয়া ইন্দু আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রায় একতলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এমন সময় কলেজ-ফেরৎ অজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া বলিল, "দেখছ পিসীমা, অজয় কি রকম হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল? ক'মাস আগে ও মাথায় আমার চেয়ে ছোট ছিল।"

অজয় বলিল, "ক'মাসই বটে, বেশ কয়েক মাস না? চৌষট্টি কি আশি মাস হবে বোধ হয়?"

মায়া বলিল, "কেমন করে যে কথা বলে। চল্ না আমাদের সঙ্গে একটু বাগানে বেড়িয়ে আস্‌বি।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা রোশ, বই খাতাগুলো অন্ততঃ রেখে আসি।"

মায়া এবং ইন্দু অগ্রসর হইয়া চলিল। বাগানের ভিতর আসিয়া পড়িয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই কলকাতার ডাক্তার আমায় দেখে কি বল্‌ল পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "কিছু বিশেষ হয়নি বলেছে, এই নাইতে খেতে যাবে আর কি?"

মায়া বলিল, "তবে তখন যে তুমি ওর কাছে বল্‌ছিলে হিষ্টিরিয়া না কি হয়েছে? ছাই জানে তোমাদের ডাক্তার। কক্ষনো আমার হিষ্টিরিয়া হয়নি। হিষ্টিরিয়া হ'লে ত হাত পা ছোঁড়ে, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পড়ে থাকে। আমি কি তাই করি নাকি?"

ইন্দু বলিল, "ডাক্তারের চেয়ে কি তুই বেশী বুঝিস্? হিষ্টিরিয়া কত রকম আছে।"

এমন সময় অজয় আসিয়া জুটিল। বলিল, "বাগানটার আজ বড় সৌভাগ্য, তোমার শুভাগমন হয়েছে।"

মায়া বলিল, "আর তোমার শুভাগমন বুঝি খুব ঘন ঘন হয়? এতদিন যে এসেছি তা ছেলে বাড়ীতে আছে না নেই, তাই জানি না।"

অজয় বলিল, "জানবে কি ক'রে? তোমার গাড়ী-খানার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত ছিলাম যে। এখন ডাঃ মিত্র সেখানা নিয়ে সরে পড়ায় অগত্যা তোমাদের সঙ্গদান করতে এসেছি।"

মায়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আবার গাড়ী আছে না কি? কি গাড়ী?"

অজয়ের সব সময় মনে থাকিত না যে, মায়া আর সে মায়া নাই। সে এই প্রশ্নে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "মোটর গাড়ী গো, মোটর গাড়ী। তুমি ত ঘর

ছেড়ে বেরোও না, তাই আমি সেটাকে কাজে লাগাই। এই যে প্রভাসদাটা বেরচ্ছে, প্রভাসদা, ও প্রভাসদা !"

ইন্দু দেখিল মহা মুস্কিল। অজয় এইভাবে ডাকাডাকি করার পর, সে আর প্রভাসকে বাধা দিতে পারিবে না। তাহা অত্যন্ত বেশী অভদ্রতা হইবে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই, সুতরাং সে নীরবে প্রভাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রভাস বেশ বুঝিয়াছিল, ইন্দু তাহাকে মায়ার নিকটে যাইতে দিতে চায় না। কারণটা ঠিক না বুঝিলেও ইহাতে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল। সে মায়ার বাল্য-বন্ধু, তাহাকে দিয়া উঁহারা কি মায়ার অনিষ্টের আশঙ্কা করেন? তাহা হইলে প্রভাসের আর এ বাড়িতে বাস করাই উচিত নয়। মায়ার অনিষ্ট হোক বা নাই হোক, প্রভাসের নিজের ক্ষতি কিছু কিছু হইতেছিল। অকারণ নিজেকে দুঃখ পাওয়ার পথে দাঁড় করাইয়া লাভ কি ?

অজয় ডাকাডাকি করাতে সে একটু বিপদে পড়িয়া গেল। না যাইলে অজয় এবং মায়া কি মনে করিবে, এবং যাইলে ইন্দু কি মনে করিবে? একটুখানি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছ যে ?"

অজয় বলিল, "আসুন না, একটু, আমাদের সঙ্গে কয়েক পাক ঘুরে যান। মায়া-দির বাগান বোধ হয় আপনি ভাল করে দেখেনেই নি।"

প্রভাস আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাগানটা খুবই সুন্দর বটে। প্রথম এসেই ওটা আমি লক্ষ্য করেছি। সবটাই মায়ার তৈরি না কি ?"

মায়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানটা তাহার—মানে কি? যাহা হউক, প্রভাস যে কাছে আসিয়া কথা বলিতেছে, ইহাতেই সে খুশী হইতেছিল। এখন পিসীমা তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় না করিয়া দিলেই হয়।

মায়া-সম্বন্ধে প্রভাসের মনোভাবটা এখনও সুপরিস্ফুট হয় নাই, তবু অনেকখানি আগ্রহ যে তাহার ভিতর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এত কাছে আসিয়া, একটু কথা বলার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবেলা গ্রামের বাড়িতেও তুমি খুব বাগান করতে, না মায়া ?"

মায়ার মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে কথার কি উত্তর দিবে? আবার না দিলে যদি প্রভাস রাগ করিয়া চলিয়া যায় ?

সে নতমুখে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মনে আছে।" প্রভাস বলিল, "এখন আর সে-সব গাছ একটাও নেই, সব ছাগল গরুতে শেষ করেছে।"

ইন্দু বলিল, "বাড়ি-ঘরই কে দেখে তার ঠিক নেই, তা ফুলের গাছ। আমি মরবার পর ঘরদোর পড়ে গেলেও কেউ চেয়ে দেখবে না।"

মায়া ফিশ্‌ফিশ করিয়া বলিল, "আমায় যদি বাবা যেতে দেন, তাহলে গিয়ে থাকি, এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

ইন্দু তাড়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি না থাকলে এত খড়ের ঘর, শাক, বেগুন আগ্‌লাবে কে? আর ত সংসারে লোক নেই? মেয়ের যত অনাসৃষ্টি কথা।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, আমি তবে একটু ঘুরে আসি।"

এমন সময় হর্ণ বাজাইয়া একটা মোটর গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে নামিল দেবকুমার। সে বাড়ির ভিতরেই ঢুকিতে যাইতেছিল এমন সময় বাগানের দিকে চোখ পড়ায় সকলকে দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। যতই নিকটে আসিতে লাগিল, তাহার মুখের ভাব ততই কঠোর, চোখের দৃষ্টি ততই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। মায়ার আরক্ত মুখ, তাহার লজ্জানত দৃষ্টি, এ সব কাহার জন্য? শুধু তাহাকে ভুলিয়াই কি যথেষ্ট হয় নাই? আবার একজনকে তাহারই আসনে ইহারই ভিতর বরণ করিয়া লইতে হইবে? তাহার হৃদয়ে যেন বিষের তীর ফুটিয়া গেল।

দেবকুমার কাছে আসিতেই মায়া চকিত হইয়া ইন্দুর পিছনে গিয়া লুকাইল। অজয় হাসিয়া বলিল, "মায়াদি, কত তামাশাই যে দেখাবে। একটা ঘোমটা টেনে দাও না ?"

মায়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া ইন্দুকে বলিল, "পিসীমা, চল আমরা উপরে যাই।"

দেবকুমার কঠিনস্বরে বলিল, "আমিই যাচ্ছি, আর আউকে যেতে হবে না। অজয়বাবু, আপনার কাকাবাবু কি ফিরেছেন?"

অজয় বলিল, "হ্যাঁ, এই খানিক আগে এসেছেন।"

দেবকুমার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার আগে প্রভাসের দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে এত বেশী উগ্রতা ছিল যে, প্রভাস তাহা লক্ষ্য না করিয়াই পারিল না। ভাবিল, "এর পর পাত্ তাড়ি গুটতেই হয়, যে রকম বন্ধু দেখছি চারদিকে।"

দেবকুমারের মনে তখন দাবানল জ্বলিতেছিল। পারিলে সে আদিম মানবের মত তখনই প্রভাসের গলা টিপিয়া ধরিত। কিন্তু সভ্যতা যেমন আমাদের অনেক জিনিস দান করিয়াছে, তেমনি অনেক জিনিষ অপহরণও করিয়াছে। সুতরাং মনের উগ্র হিংস্রতাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া দেবকুমার নিরঞ্জনের সন্ধানে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

পুস্তক-পরিচয়

হিন্দু স্বরাজ্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। যে আদর্শ গান্ধীজীকে স্বরাজ লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং যে আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতের স্বরাজ-সৌধ গড়িয়া তুলিতে চান, এ গ্রন্থকে সেই আদর্শেরই ভাষ্য বলা যায়। আশ্চর্য্য এই যে, গ্রন্থখানি বিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, কিন্তু আজ ভারতবর্ষে স্বরাজ লাভের জন্য যে যে পন্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিরই ইঙ্গিত ইহাতে আছে। এরূপ গ্রন্থের পরিচয় অল্প কথায় দেওয়া যায় না—ইহা অমূল্য ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ। অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল, জড়তা-বিহীন। বাংলার প্রত্যেক নর-নারীর এরূপ গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন আছে।

রা. ব

শরৎ-প্রতিভা—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস্ প্রণীত ও ১৬ টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১১০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

লেখক 'নিবেদন' করিয়াছেন—"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনার আনুপূর্ব্বিক বিচার করা সম্ভবপর হয় নাই, এবং তাঁহার প্রতিভার সকল দিক আলোচনা করিতেও পারি নাই।" তবে তিনি "শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসের আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার মূলসূত্র বাহির করিতে চেষ্টা" করিয়াছেন, এবং আমাদের মনে হয় কৃতকামও হইয়াছেন।

গ্রন্থকারের মতে "আমাদের মনে দুই স্তরের অনুভূতি আছে। একটা অনুভূতি আমাদের বুদ্ধি, সংস্কার ও সমাজ হইতে পাওয়া—আর দ্বিতীয় ও গভীরতর স্তরের অনুভূতির প্রেরণা আসে অবচেতন আত্মার নিকট হইতে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে এই পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের চিত্রনে।"

আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সাহিত্য-রসবোধ ও রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ-সাহিত্য-পাঠক এই বই পড়িলে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে মনে হয়, পাইকা হরফে ঝরঝরে ছাপা হইলেও বে-মলাট বইয়ের দাম কম হওয়া উচিত—দশ-বারো আনার মধ্যে হইলে সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের সুবিধা হইত। লেখক বোধ করি জানেন না, 'পাঠ্য' কেতাব ছাড়া অন্য বই কিনিয়া পড়া এদেশের অনেকেরই মতে কদভ্যাস ও মূর্খতা তার উপর বেশী দাম হইলে ত কথাই নাই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শোধবোধ—শ্রীবিমল সেন। প্রকাশক, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট। পৃঃ সং ২২৩।

পুস্তকখানি আলেকজাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস 'Count of Monte Cristo'র সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা। যে উদ্দেশ্যে লিখিত তাহা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। ছেলেরা বইখানি পাইয়া আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই বেশ মনোরম। তবে মনে হয় ফরাসী নামগুলির বাংলা উচ্চারণ লিখিবার সময় লেখকের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডায়ারী—১৯৩১। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমরা প্রকাশকের নিকট হইতে ১৯৩১ সনের Everyman's Diary ও শ্রীযুক্ত প্রে, এন, ঘোষ সম্পাদিত সুপরিচিত Ghosh's Diaryর কয়েকখণ্ড পাইয়াছি। এই ডায়ারীগুলি নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই ভাল। প্রথমোক্ত ডায়ারীটির মূল্য বার আনা ও অপরগুলির আকার অনুযায়ী পাঁচ আনা হইতে তিন টাকা চারি আনা। এই সুদৃশ্য ডায়ারীগুলি পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইবে আশা করা যায়।

আর একখানি ঘোষের ১৯৩১ সালের বাংলা ডায়ারীও পাইয়াছি। মাস-মাহিনা, সুদকষা, কোর্টফিস, ষ্ট্যাম্প আইন, প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ইহা যথেষ্ট কাজে লাগিবে। বাংলায় এই ধরণের ডায়ারী সম্পূর্ণ নূতন।

ক. চ

প্যারীচাঁদ মিত্র

বর্ত্তমান যুগে মিত্র-মহাশয় "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কৃত্রিম নামে সুপরিচিত। তিনি সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণ বোধগম্য কথিত গ্রাম্য-বাঙ্গালার প্রবর্ত্তক এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উপন্যাস-রচয়িতা। কিন্তু সে সময়কার সমাজে তিনি কত উচ্চ আসনে আরূঢ় ছিলেন,—মাতৃভাষা সেবা ব্যতীত তাঁহার জীবনী কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে উজ্জ্বল ছিল, তখনকার কত সৎকার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে তিনি কিরূপ উৎসাহী ছিলেন,—সে যুগে একদিকে কুসংস্কার অপর দিকে নাস্তিকতায় দেশ যখন ভরিয়া উঠিতে যাইতেছিল, তখন তিনি কিরূপে সত্যধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, এমন কি সামান্য জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলে তাঁহার প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল হইত, তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের নিকট অজ্ঞাত।...

প্যারীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র, হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট, চৌমহা পরগণার অন্তর্গত হরিপাল পানিসেওলা গ্রাম হইতে কলিকাতা নগরীতে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে আসিয়া বাস করেন। পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জমি খরিদ করিয়া বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরদ্বয় এখনও দৃষ্ট হয়। গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রামনারায়ণ, রাজা রামমোহন রায়ের উদার ধর্ম্মনীতির পোষকতা করিতেন। রামনারায়ণের চতুর্থ পুত্র প্যারীচাঁদ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুলাই তারিখে (১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...

তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই তারিখে হিন্দু কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন তাহা অবিদিত।...

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়—পরিণতবয়স্ক প্যারীচাঁদ যৎকালে কলেজে উচ্চশ্রেণীতে পাঠ লাভ করিতেন, তখন পল্লীস্থ দুঃস্থ বালকদের বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান জন্য নিজ বাড়ীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ার প্রমুখাৎ অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী এই বিদ্যালয়ের পোষকতা করিতেন।...

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্যারীচাঁদ সব-লাইব্রেরীয়ান্-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে লাইব্রেরীয়ান ও সম্পাদক-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই বেতনভোগী পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে অবৈতনিক সম্পাদক পদে বৃত করিয়াছিলেন। লাইব্রেরী গঠন হওয়া অবধি তিন জন কিউরেটর-হস্তে অধ্যক্ষতার ভার ছিল। প্যারীচাঁদের সম্মান জন্য তাঁহার নাম এই বৎসর হইতে অবৈতনিক কিউরেটর বলিয়া করা হইয়াছিল।...

The Society for the Acquisition of General Knowledge—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই সভার সভাপতি ছিলেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী সম্পাদকদ্বয় ছিলেন। সভার অধিবেশনে প্যারীচাঁদ নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।...

(১) State of Hindustan under the Hindus (পাঁচটি প্রবন্ধ) এবং (২) Remarks on the Rev. K. M. Banerjea's Essay on Female Education.

এই সময়ে তিনি সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর জীবনী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের *Matia Review and Journal of Foreign Science and Arts* পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা প্রকাশ করিলে প্যারীচাঁদের প্রবন্ধ ইহাতে নিয়মিতভাবে প্রকাশ হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা প্রায় দুই বৎসর কাল স্থায়ী ছিল।...

The Hindu Theophilanthropic Society—দেশবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব আন্দোলন জন্য ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের পৈত্রিকবাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ এই সভার একজন কর্ম্মী ছিলেন।...

The Bengal British India Society—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্থাপিত হইয়াছিল। জর্জ টমসন্ ইহার সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ সম্পাদক ছিলেন। প্যারীচাঁদের তত্ত্বাবধানে সভা হইতে Evidences relating to the Efficiency of Native Agency in the Administration of Affairs in this Country নামক পুস্তিকা প্রকাশ হইয়াছিল।...

The Encyclopaedia Bengalensis—খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকের পঞ্চমভাগে প্যারীচাঁদ প্রণীত যুধিষ্ঠির প্লেটো এবং বিক্রমাদিত্য জীবনী প্রকাশ হইয়াছিল।...

The Agricultural and Horticultural Society—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারীচাঁদ এই সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সভার তত্ত্বাবধানে তিনি পাঁচভাগ "ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ" Indian Agricultural Miscellany) এবং কৃষিপাঠ নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সভা হইতে প্রকাশিত *Journal* নামক সাময়িক পত্রিকায় Bengal Ria নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি ইহার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অবৈতনিক সদস্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সম্মান বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি প্রথম পান।

পুলিশ কমিশন—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পুলিশের কতিপয় কর্ম্মচারীদের উৎকোচ-গ্রহণ-অনুসন্ধান জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। সিভিলিয়নদ্বয় জে-ই, কলভিন, এবং ডবলিউ্ ড্যাম্পিয়র ইহার সদস্য ছিলেন। কমিশন সমক্ষে প্যারীচাঁদ নির্ভীকচিত্তে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছিল। গঠনের সময় হইতে প্যারীচাঁদ ইহার সদস্য ছিলেন। এসোসিয়েশনের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ কমিটির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত এবং এই পদ তিনি মৃত্যুকাল

পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃত্বে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Notes on Evidences on Indian Affairs প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বীটন সোসাইটি গঠিত হইয়াছিল। ডাক্তার এফ্-জে, মোয়েট ইহার সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ সম্পাদক ছিলেন। দুই বৎসর পর প্যারীচাঁদ সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী দুই বৎসর ১৮৫৪ এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির Committee of Papers-এ সদস্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন।...

মাসিক পত্রিকা—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসরকাল ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫৫, ফেব্রুয়ারি মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে বিদ্যোৎসাহিনী সভা গঠিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ ইহার সদস্য ছিলেন।

বাণিজ্যবিষয়ক উদ্যম—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে কালাচাঁদ শেঠ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই তিনজন একত্র হইয়া "কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং"নামে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ১৮৪৪, আগষ্ট মাসে ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৮৪৫, জানুয়ারি মাস হইতে কালাচাঁদ শেঠ ও প্যারীচাঁদ মিত্র উভয়ে যৌথ কারবার চালান। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কালাচাঁদ শেঠের মৃত্যুর পর তাঁহার অছিরা পর বৎসর মার্চ্চ মাসে হিসাবপত্র চুকাইয়া লন। ইহার পর হইতে প্যারীচাঁদ স্বয়ং ব্যবসায় চালাইতেন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দুই পুত্র অমৃতলাল এবং চুণীলালকে অংশীদার করিয়া লইয়া "প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্‌স্‌" নামক যৌথকারবার চালাইয়া ছিলেন।...কলিকাতার সওদাগরেরা প্যারীচাঁদকে এত সম্মান করিতেন যে, তিনি অনেকগুলি লিমিটেড্ কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।...

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারীচাঁদ স্কুল বুক সোসাইটির কমিটির সদস্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন এবং এই পদে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

The Vernacular Literature Committee—বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট ব্যবহারোপযোগী গার্হস্থ্য-সাহিত্য-প্রচার-কল্পে এই সভা গঠিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ ইহার কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ সভার অস্থায়িভাবে সম্পাদকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সভা পরে স্কুল বুক সোসাইটির সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।...

The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভার স্থাপনাবধি প্যারীচাঁদ ইহার কর্ম্মিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। তাঁহার পরম বন্ধু কোল্‌স্‌-ওয়ার্দি গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি সভার অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ভাইস-চান্‌সেলর মাননীয় এইচ্‌ জে, রেনল্‌ডস্‌ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের কনভোকেশন বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন :—"যখন তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, তাঁহারই উদ্যমে বঙ্গদেশে জীব-ক্লেশ-নিবারণী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসে প্যারীচাঁদ এসিয়াটিক সোসাইটিতে সদস্যপদে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় কৃষি-প্রদর্শনী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ ইহার অন্যতম বিচারক ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হইয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান-সভা (Bengal Social Science Association) স্থাপিত হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভ হইতে প্যারীচাঁদ অবৈতনিক সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদ তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ত্যাগ করিয়াছিলেন।...

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৬ আইন পাশ হইলে প্যারীচাঁদ একজন জস্টিস্ অফ দি পিস্ মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান জস্টিসদের একটি সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা ইহাতেও প্যারীচাঁদের নাম দেখিতে পাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্যারীচাঁদ ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৬ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।...

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্যারীচাঁদ House of Correction—এবং জেলের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি হাইকোর্টের গ্রাণ্ড জুরর মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইনের বলে স্পেশাল জুরর মনোনীত হইয়াছিলেন।...এই সময়ে তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন।...

প্যারীচাঁদ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ১৮৭০ জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত Bengal Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন।

বন্ধুদের প্রতি অনুরাগ—তাঁহার বাল্যবন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার উভয়েই তাঁহাদের চরমপত্রে প্যারীচাঁদকে অছি নিযুক্ত করিয়া যান। এই অবৈতনিক কার্য্য সম্পাদনান্তে আদালত ও উত্তরাধিকারীরা উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কাহারও কোনও বৈষয়িক বিবাদ-বিসংবাদে তিনি প্রায়ই মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিতেন।

বদান্যতা—১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে প্যারীচাঁদ নিজ বাটীতে একটী অন্নসত্র খুলিয়া প্রত্যহ দুঃস্থদের অন্ন বিতরণ করিতেন। তাঁহার জমিদারীতে তিনি প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণার্থে "কুমার পুকুর" নামে এক পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার—তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি গল্পচ্ছলে সুরাপানের অনিষ্ট সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একজন আবেগপূর্ণ আন্তরিক পক্ষপাতী ছিলেন, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" (বেথুন সাহেবের স্কুল) স্থাপিত হইলে স্বীয় কন্যাকে শিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আনুমানিক ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে "ব্রাহ্মবন্ধুসভা" নামে সভা স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সভা প্যারীচাঁদের প্রণীত পুস্তকগুলি বালিকাদের পাঠোপযোগী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিল। যখন মিস্ মেরী কার্পেণ্টার প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মসমাজগৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে মিস্ কার্পেণ্টার সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রস্তাব এদেশবাসীদের গোচরীভূত

করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ এই সভার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গরমণীদের মানসিক উন্নতিকল্পে তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বহুবিবাহ-রহিত-বিধায় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল; প্যারীচাঁদ এই কার্য্যে বিশেষ তৎপর ছিলেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন) পাশের পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। এই সমারোহে প্যারীচাঁদ যোগদান করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতা রিভিউ—(ত্রৈমাসিক) পত্রিকায় প্যারীচাঁদ প্রণীত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—

(১) Zemindar and Ryot, (২) Agricultural Society of India; (৩) Court Amlas in Lower Bengal; (৪) Remarriage of Hindu Widows; (৫) Department o Revenue, Agriculture and Commerce; (৬) Development of the Female Mind in India; (৭) Indian Wheat; (৮) Psychology of the Aryas; (৯) Commerce in Ancient India; (১০) Social Life of the Aryas; (১১) Hindu Bengal এবং (১২) Early Commerce in Bengal.

যখন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় চার্টার সনন্দ প্রদান জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তর্কবিতর্ক হয় তখন লর্ড সভার জনৈক সভ্য (Lord Albemarle) প্যারীচাঁদের প্রণীত প্রথমোক্ত প্রবন্ধ হইতে এদেশের কৃষকদের দুরবস্থা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

মাতৃভাষার সেবা—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত দশখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টি করিয়াছিলেন—

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯); রামারঞ্জিকা (১৮৬০); কৃষিপাঠ (১৮৬০); গীতাঙ্কুর (প্রকাশাব্দ নির্ণয় হয় নাই); যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫); অভেদী (১৮৭১); ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত (১৮৭৮); এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা (১৮৮০); আধ্যাত্মিকা (১৮৮০), বামাতোষিণী (১৮৮১)।

তাঁহার দেহাবসানের পর তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য:—

ঈশ্বর উপাসনা (পন্থা, শ্রাবণ, ১৩১৬); পিতা ও পুত্র (নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩১৭); উপাসনা (বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক, ১৩৩৪)।

প্যারীচাঁদ ইংরাজি ভাষায় নিম্নলিখিত কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন:—

Biographical Sketch of David Hare (১৮৭৭); Spiritual Stray Leaves (১৮৭৯): Life of Dewan Ram Comul Sen (১৮৮০): Stray Thoughts on Spiritualism (১৮৮১): Life of Colesworthy Grant (১৮৮১): On the ·oul (১৮৮১); Agriculture in Bengal (১৮৮১):

এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার রচিত এই কয়েকটি সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ তাঁহার মৃত্যুর পরে National Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

Education in Bengal (Dec. 1907, January 1908): Early Account of the District Charitable Society (March 1908); Life of Rustomjee Cowasjee (April, July 1908), Moral Culture (July 1908), Yoga and Spiritualism. Early Recollections (June, August 1908): Notes on the Soul (October 1908 হইতে April 1909).

তাঁ র প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান ফীল্ড, হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গল হরকরা ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত।

ধর্ম্মচর্চ্চা—Hindoo Theophilantropic Society তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। এই সভা লোপের পর প্যারীচাঁদ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সাধনা করিতেন। আনুমানিক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের আধিপত্য হইয়াছিল এবং তর্ক মিটাইবার জন্য "ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা" গঠিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ এই সভার একজন সদস্য ছিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর প্যারীচাঁদ অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা—প্যারীচাঁদের নিম্নলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল:—

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Spiritualist পত্রে—

Psychology of the Buddhists (৩১শে আগষ্ট ১৮৭৭); God in the Soul (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭); The Spirit Land (১৬ নবেম্বর ১৮৭৭); The Spritual State (২৩ নবেম্বর ১৮৭৭); Soul Revelation (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮); The Soul (৩০শে মে ১৮৭৮)।

আমেরিকার বষ্টন হইতে প্রকাশিত Banner of Light পত্রে—

Abhedi, Progression of the Soul (আগষ্ট ১৮৭৮); Soul Revelation in India (৫ এপ্রিল ১৮৭৯), Socrates and Jesus Christ (১২শে এপ্রিল ১৮৭৯)।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Theosophist পত্রে—

Inner God (অক্টোবর ১৮৭৯), Hindu Bengal (আগষ্ট ১৮৮১)।

থিওসফি ধর্ম্মে অনুরাগ—আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে Theosophical Society গঠিত হইলে প্যারীচাঁদ Corresponding Fellow পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তিনিই এই সম্মান প্রথম পাইয়াছিলেন।

১৮৮৩, ২৩ নবেম্বর প্যারীচাঁদ জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

(পঞ্চপুষ্প—কার্ত্তিক, ১৩৩৭) শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র

সূর্য্যের কোষ্ঠী

সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে পরিমাণ সৌর-তেজ বিক্ষিপ্ত আছে, সমগ্র সৌর-শক্তির তাহা ২২০ কোটী ভাগের একভাগ মাত্র। ইহা হইতে সমগ্র সৌর-তেজের পরিমাণ কল্পনায় আনা যাইতে পারে। সূর্য্যের এই অফুরন্ত ভীষণ তেজ কোথা হইতে আসিতেছে? এক সময় মনে করা হইত, অগণিত উল্কাপিণ্ড নিরন্তর সূর্য্য-পৃষ্ঠে ধাক্কা খাইতেছে এবং সেই সঙ্ঘাতে যে তাপ উদ্ভূত হইতেছে, তাহাই সূর্য্যের পুঁজি এবং তাহাতেই উহার এই বিপুল দানশক্তি বজায় রহিতেছে। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই মতের অনেক গলদ বাহির করিলেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে, এই উল্কাপিণ্ডের সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে না যে, উহার সঙ্ঘাতজনিত তাপ এই ভীষণ ব্যয় পূরণ করিতে পারে। তাঁহাদের মতে সূর্য্যে একটি প্রকাণ্ড বায়ুপিণ্ড বর্ত্তমান; এই বায়ুপিণ্ড ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছে; এবং এই সঙ্কোচনের ফলে যে তাপের উৎপত্তি তাহাই সূর্য্যের পুঁজি। এই হিসাবে দাঁড়ায় যে, আর ১৭০ লক্ষ, মোটামুটি প্রায় ২ কোটী বর্ষ পরে সূর্য্যের পুনঃ সঙ্কোচন অসম্ভব হইবে। তখন উহা হইতে আর তাপ উদ্ভূত হইবে না এবং তখন হইতে বরাবর ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে যতক্ষণ না একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সেই শেষের দিনের কথা স্মরণ করাইয়া প্রবন্ধকার বলিতেছেন—"এই দুই কোটী বৎসর পরে সূর্য্য যে দিন অপসৃত হইবে, সেদিন সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত এই বিরাট সৌর-জগতে প্রাণের স্পন্দন আর কোথাও অনুভূত হইবে না। নদী বহিবে না, বায়ু প্রবাহিত হইবে না; উপরে অনন্ত আকাশ—মেঘ নাই; নীচে অসীম সমুদ্র—ঢেউ নাই; বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম নির্জীব, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রাণহীন; সমস্ত নিস্পন্দ, সমস্ত অচল, সমস্ত অন্ধকার; আর মানব-সভ্যতার এই শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিবার জন্য কোন জীবিত সাক্ষীও থাকিবে না।" পরিশেষে পাঠকবর্গকে অভয় দিয়া প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন "মাভৈঃ; সে দিনের এখনও ঢের দেরী আছে, এবং চাই কি ততদিনে বিজ্ঞানের এ মতটাও বা উল্টাইয়া যাইতে পারে।"

প্রবন্ধকারের এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও পাঠকবর্গের কেহ যদি এই ভাবিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকেন যে, এই ২ কোটী বৎসর পরে তাঁহাকে ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, তবে বিজ্ঞানের এই নূতন বাণী তাঁহাকে শুনাইতেছি,—তিনি শান্তিলাভ করুন।

সূর্য্যের সঙ্কোচন-ফলে তাহার তাপের উদ্ভব, হেল্মহোলজ্ এবং কেল্‌ভিন যখন এই মত প্রকাশ করিলেন, তখন বৈজ্ঞানিক-মহলে তেমন একটা সাড়া পড়িল না। সূর্য্যের বয়স ২ কোটী বৎসর, ভূতত্ত্ব ও প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। তা ছাড়া এই সঙ্কোচন-তত্ত্ব হইতে এই দাঁড়ায় যে খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র-গণের বয়স একলক্ষ বৎসরের বেশী হইতে পারে না; ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

এমন সময় রেডিয়ম আবিষ্কৃত হইল। ইহার কাণ্ড দেখিয়া বিজ্ঞানের বহুদিন-পোষিত অনেক বিষয়ে অনেক মতামত একেবারে উলোট-পালট খাইল। রেডিয়ম একটি মৌলিক পদার্থ, যাহা আপনা-আপনি ভাঙিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন আর একটা মৌলিক পদার্থে পরিণত হইতেছে। যে হারে রেডিয়ম ভাঙিতেছে, পরীক্ষায় তাহা নিরূপিত হইল। এই সব হিসাব হইতে এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর উপরকার ছালটার বয়স ২০০ কোটী, ২০০০ কোটী নয়, অন্তত এক লক্ষ কোটী বৎসর,—বেশীও হইতে পারে। সূর্য্যের উত্তাপ যে ইহার সঙ্কোচনের ফলে, এ তত্ত্ব এতদিন টলমল করিতেছিল; এইবার একেবারে ধূলিসাৎ হইল।

তা তো হইল! কিন্তু দাঁড়াইল কি? যে ইলেকট্রণতত্ত্ব আগেকার মতকে খণ্ডন করিল, তাহা শুধু ভাঙা শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল না, নূতন কিছু গড়িয়াও তুলিল; এবং সোনায় সোহাগা হইল—আইন-ষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব ইহাতে সায় দিল।...

শেষ অবধি স্থির হইল যে, পদার্থ ও শক্তি এ পরস্পর অদল-বদল হইতে পারে। এক ফোঁটা গোলাপের আতরে যেমন এক বোতল গোলাপজলের নির্যাস আছে, তেমনি পদার্থ আর কিছুই নয়, উহা শক্তির নির্যাস মাত্র। এক-খানি পদার্থ যদি কোন রকমে লোপ পায়—এবং লোপ পাইতেও পারে—তো তাহার পরিবর্ত্তে বিপুল শক্তির উদ্ভব হইবে। শুধু বিপুল বলিয়া আইনষ্টাইন ক্ষান্ত হইলেন না, হিসাবে বলিয়া দিলেন যে, এইটুকু পদার্থের বিনিময়ে এতটা পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা কথা;—বিজ্ঞান এতদিন দুইটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; একটি পদার্থ অবিনশ্বর; ইহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, রূপান্তর আছে মাত্র। সেইরূপ শক্তিরও রূপান্তর আছে মাত্র, শক্তিও অবিনশ্বর,—এই দ্বিতীয়। আইনষ্টাইনের কথায় এই দুইটি তত্ত্ব তো দাঁড়ায় না। না দাঁড়ায়—চলিয়া যাক; কিন্তু পদার্থ যে শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, ইহা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বে তো দাঁড়াইবেই; এবং আপেক্ষিক-তত্ত্ব যদি কোন দিন চলিয়া যায়, তো ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে না।

এডিংটন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, সূর্য্য যদি বৎসরে তাহার দেহ হইতে ২০ লক্ষ কোটী টন পদার্থ হারায়, তবে উহার বর্ত্তমান তাপ উদ্ভূত হয়। কিন্তু সর্ব্বনাশ! প্রতি বৎসর যদি সূর্য্য হইতে এতটা করিয়া পদার্থ লোপ পায়, তাহা হইলে সূর্য্যের আর দেরী কি? দেরী আছে,—ঢের দেরী, এবং আগেকার হিসাব হইতেও বেশী দেরী। এই হারে সূর্য্যের ক্ষয় হইতে চলিলেও উহার বাসনা বন্ধ করিয়া দেউলিয়া হইতে এখনও আরো ২০ কোটী নয়, আশ্বস্ত হউন, ১৫ লক্ষ কোটী বৎসর বাকী।

(ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭) শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
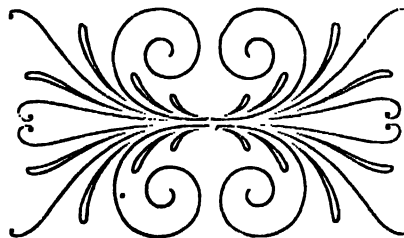
বামনদাস বসু

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পরে শ্যামাচরণ বসু নামক একটি বাঙালী যুবক লাহোরে উপস্থিত হন। সেকালে রেলগাড়ী না থাকায় তাঁহাকে অন্য যানে পঞ্জাব যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে লাহোর যাইতে তাঁহার কয়েক মাস লাগিয়াছিল। বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তঃপাতী টেংরা-ভবানীপুর নামক একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সেখানে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় ডাফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। লাহোর পৌঁছিয়া তিনি প্রথমে দুই বৎসর একটি মিশনরী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তাহার পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমিশনারের আফিসে কাজে নিযুক্ত হন। যখন পঞ্জাবে শিক্ষাবিভাগ প্রথম খোলা হয়, তখন তিনি উহার ডিরেক্টরের প্রধান কেরানী নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি পঞ্জাবে শিক্ষাকার্য্যের সুব্যবস্থা করেন। এই সুব্যবস্থার জন্য ডিরেক্টর যে সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহার অনেক অংশ বস্তুতঃ যে শ্যামাচরণ বসু মহাশয়েরই প্রাপ্য, তাহা ইংরেজ-সম্পাদিত তখনকার "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে" স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে ৪০ বৎসর বয়সে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং সুযোগ্য লোক ছিলেন। ধর্ম্মে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। সেকালে পঞ্জাবে জিনিষপত্র সস্তা ছিল। এই জন্য যদিও তাঁহার বেতন দুইশত টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র তিন শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি মৃত্যুকালে বিষয়-সম্পত্তি বেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধু নামে পরিচিত কোন কোন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন, এবং নিজের অলঙ্কারগুলিই একটি একটি করিয়া বিক্রয় করিয়া নিজের ও চারিটি সন্তানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের নিজের বাড়ী অন্যের হস্তগত হইয়া যাওয়ায় তিনি মাসিক ৸০ বার আনা ভাড়ার একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের কাম্মু নামক একজন বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিল। কাম্মু যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন বসু-পরিবারের সেবা করিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নেহালা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিল। এই কাম্মুই বার আনা ভাড়ার বাড়ীটি ঠিক করে এবং তাহারই হাত দিয়া ভুবনেশ্বরী দেবী একটি একটি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিতেন।

বামনদাস বসু শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের ও ভুবনেশ্বরী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল পাঁচ মাস মাত্র। তাঁহাদের চারি ভাই বোনের মধ্যে এক ভগিনী সকলের বড় ছিলেন। একমাত্র তিনিই এখনও জীবিত আছেন। বামনদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত ও মহানুভব শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব তাঁহা অপেক্ষা ছয় বৎসর কয়েক দিনের বড় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন শ্রীমতী জগৎমোহিনী দাস। বামনদাস সকলের ছোট।

তাঁহাদের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর সুশীলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও কর্ম্মিষ্ঠতার গুণে শ্রীশচন্দ্র ও বামনদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়াও মানুষ হইতে পরিয়াছিলেন—শিক্ষিত, চরিত্রবান, সুপণ্ডিত ও দেশভক্ত বলিয়া পরিচিত হইযাছিলেন। তাঁহারাও সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহাদের শৈশবে ও বাল্যকালে ভুবনেশ্বরী দেবী মাসিক দশ টাকা ব্যয়ে সংসার চালাইতেন। শ্রীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইবার পর তাঁহার মাতা বার আনা ভাড়ার কুটীরটি ছাড়িয়া মাসিক দেড় টাকা ভাড়ার অন্য একটি বাড়ীতে উঠিয়া যান। তিনি সাধারণ রকমের বাংলা

১। বামনদাস বসু—আহ্‌মদনগরের সিভিলসার্জ্জনরূপে   ২। শ্রীশচন্দ্র বসু

৩। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী   ৪। বামনদাসের সহধর্ম্মিণী

৫। ভুবনেশ্বরী আশ্রম—বসুদের এলাহাবাদস্থিত বাড়ী

নদাদের শেষ পাত্তা

বামনদাস —সামরিক পোশাকে

সেকহিল পাকার ডাক্তারের নিদর্শনসহ বামনদাস

"Ruin of Indian Trade and Industries"
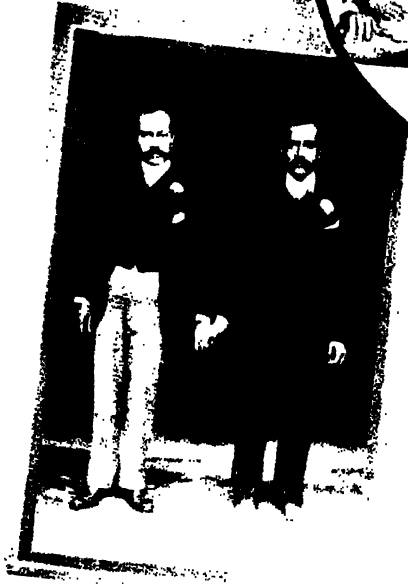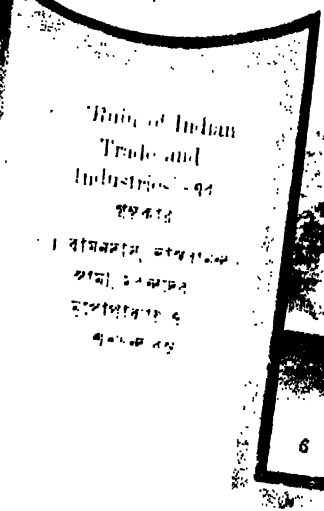
"... That Failed" নামক উপন্যাস

; পশ্চাতে পুত্র ললিতমোহন

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল কে-আর, কীর্ত্তিকর ও মেজর বামনদাস বসু
ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া Indian Medicinal Plants
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বামনদাস বসু (বামে), একজন বন্ধু (মধ্যে) শ্রীশচন্দ্র বসু (দক্ষিণে)

"Culture" প্রণেতা বামনদাস

লেখাপড়া জানিতেন। বাংলা রামায়ণ মহাভারত ও গীতা পড়িতে পারিতেন এবং তাঁহার দীর্ঘ ৮৬ বৎসর-ব্যাপী জীবনে এই গ্রন্থগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িতেন।

বামনদাস ১৮৮২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৭ সালে মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একটি বিষয়ে তিনি ফেল হওয়ায় অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার দাদা শ্রীশচন্দ্র এবং ছোট ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস বিলাত যাইতে উৎসাহ দেওয়ায় ও সাহায্য করায় তিনি তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাহার ঠিক্ পূর্ব্বে তাঁহার মাতার আদেশ অনুসারে তিনি এলাহাবাদের পরলোকগত হরিমোহন দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ইংলণ্ড পৌছেন। সেখানে তিনি প্রথমে এল্-এস্-এ, তাহার পর এম-আর-সি-এস এবং সর্ব্বশেষে ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে আই-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাহোরে থাকিতে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতে দুই বৎসরে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর অফিসারদের শিক্ষা পাইবার পর তিনি ১৮৯১ সালের ১৩ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসে রাজার কমিশন (King's Commission) প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর ১৩ই এপ্রিল তিনি বোম্বাই পৌছেন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সী তাঁহার কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে পেন্সান লওয়া পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই প্রদেশেই কাজ করেন। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ উপলক্ষ্যে আফ্রিকা, চিত্রাল প্রভৃতি যাইতে হইয়াছিল। অন্যসময়েও তিনি প্রায়ই সৈন্যদলের সহিত কাজ করিতেন; কেবল পুনা, আহমদনগর ও বেলগাঁওয়ে সিবিল সার্জ্জনের কাজ করিয়াছিলেন। বেলগাঁওয়ে কাজ করিবার পরই তিনি পেন্সান গ্রহণ করেন। পেন্সান লইবার সময় তিনি "মেজর" ছিলেন। বালুচিস্থান, মালাকন্দ প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সহিত গুরুতর শ্রমসাপেক্ষ কাজ করায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তাঁহার "স্কাভি" পীড়া ও তাহা হইতে বহুমূত্র হয়। ইহা তাঁহার পেন্সান লইবার অন্যতম কারণ। বহুমূত্রজনিত ব্যাধিতে বর্ত্তমান ১৯৩০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি যে কেবল ষোল বৎসর চাকরি করিবার পর পেন্সান

লাহোরে নিখিলভারতীয় আয়ুর্বেদিক কনফারেন্সের সভাপতি বামনদাস বসু

গ্রহণ করেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য তাহার উপলক্ষ্য হইলেও তাহা একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের আত্মসম্মানবোধ এবং জাতীয় সম্মানবোধ প্রখর ছিল। এরূপ লোকের পক্ষে সৈন্যদলের ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সহিত মিলামিশা ও চলাফিরা প্রীতিকর

ছিল না। তাহাদের সহিত কি প্রকার খিটিমিটি হইত, তাহার কেবল একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন এক বৎসর ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে যখন রেজিমেণ্টের ইংরেজ-সেনানায়কেরা রাজার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে মদ্যপান করিতেছিলেন, তখন বসু মহাশয়কেও তাঁহারা মদ্য পান করিতে বলেন। তিনি বিলাতে বা অন্য কোথাও জীবনে কখনও মদ্য পান করেন নাই। সুতরাং তিনি এই উপলক্ষ্যেও সুরা পান করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে ইংরেজ অফিসাররা তাঁহাকে এই বলিয়া খোঁটা দেন, যে. তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের নিমক খান অথচ তাঁহার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে পান করিবেন না—অর্থাৎ তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও অরাজভক্ত বলা হয়। তিনি উত্তর দেন, "আমি নিজের দেশের নুন খাই"—অর্থাৎ তাঁহার বেতন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে আসে। অন্য প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ও কথাও তাঁহার গোচর হইত।

তিনি চাকরি উপলক্ষ্যে স্বদেশে ও বিদেশে নানা স্থানে গিয়াছিলেন। অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত ও অন্যবিধ লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। এই সমুদয় সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মনে ছিল, তিনি তাহা ইংরেজীতে "জীবন স্মৃতি" (Reminiscences) নাম দিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শেষ কঠিন পীড়ার সময় ইহার অধিকাংশ হারাইয়া গিয়াছে। যদি এই হারান খাতাগুলি খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কথা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বসু মহাশয়ের একমাত্র সন্তান ও পুত্র ললিতমোহনের জন্ম হয়। তাহার জন্মের অনতিবিলম্বে জননী সুকুমারী দেবী পীড়িত হন। তাহা ক্রমে ক্ষয়রোগে পরিণত হয়, এবং তিনি ১৯০২ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। শিশুটিকে তাহার ছোট পিসী শ্রীমতী জগৎমোহিনী দাস মানুষ করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইবার পর মেজর বসু আর বিবাহ করেন নাই। তিনি এই ঘটনার পূর্ব্বে আমিষ ভক্ষণ করিতেন, যদিও বেশী নয়। বিপত্নীক হইবার পর নিরামিষভোজী হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, তিনি কখনও মদ্য পান করেন নাই। চা-পানও করিতেন না। ধূমপান ইংলণ্ডে একবারমাত্র করিয়াছিলেন। তাহাতে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ায় আর কখনও ধূমপান করেন নাই।

মেজর বসু পেন্সান লইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দাদা ও তিনি সপরিবারে এলাহাবাদের বাসিন্দা হন। তাঁহারা তথায় যে বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের মাতৃদেবীর নামে তাহার নাম ভুবনেশ্বরী আশ্রম রাখা হয়। তিনি পেন্সান লইয়া এলাহাবাদে আসিবার পর তৎকালে সেখানকার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায় না করিতে অনুরোধ করেন; কারণ তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে! বামনদাস অর্থগৃধ্নু ছিলেন না, তাঁহার পেন্সান তাঁহার ও তাঁহার শিশুপুত্রের সামান্য ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, এবং তাঁহার মনও স্বভাবতঃ অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা লেখা ও পড়ার দিকেই ধাবিত হইত। এই সব কারণে তিনি এলাহাবাদে চিকিৎসা ব্যবসায় না করাই স্থির করেন! বিনা পারিশ্রমিকে কচিৎ কখনও কেবল বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে রোগী তিনি দেখিতেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইত, তিনি কিরূপ সুচিকিৎসক ছিলেন।

পেন্সান লইবার পর তাঁহার নিজের ব্যয় সামান্য হইবার কারণ, তিনি সাতিশয় অবিলাসী ছিলেন। তাঁহার চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। সর্ব্বদা এক খানা মোটা ধুতি ও একটা পঞ্জাবী বা কামিজ পরিয়া থাকিতেন। বাহিরে যাইবার সময় একটা চাদর লইতেন। শীতের সময় একটা কোট পরিতেন। তিনি যথাসম্ভব দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন। কচিৎ কখন সরকারী বা অন্য উচ্চপদস্থ লোকদের সহিত দেখা করিতে হইলে আগে আগে পোষাক পরিতেন, শেষাশেষি অনেক বৎসর কোথাও যাইতেন না। দিন রাত খোলা জায়গায় থাকিতেন। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের সময় এবং বর্ষার বৃষ্টির সময় একটা ঘরে কিম্বা দুতলার একটা টিনের চালার নীচে আশ্রয় লইতেন। বৃষ্টির সময় ভিন্ন সকল ঋতুতে রাত্রে খোলা ছাতে শুইয়া থাকিতেন। তিনি অল্পাহারী

মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনপরিবৃত বামনদাস বসু

ছিলেন। জীবনের শেষ কিছু কাল দিন রাত্রে একবার আহার করিতেন।

পড়া ও লেখা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিল। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর চোখে ছানি হওয়ায় তিনি ভাল দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু তখনও সমস্ত দিন জাগ্রত অবস্থায় হয় পড়িতেন কিম্বা লিখিতেন। যখন চোখ ভাল ছিল, তখন সন্ধ্যার পরও কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে যত বহি লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি অপ্রকাশিত আছে। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের পূরা তালিকা ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার তিনি ইংরেজীতে যে প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাস লিখিয়াছেন, স্বদেশে ও বিদেশে নিরপেক্ষ লোকদের নিকট তাহা আদৃত হইয়াছে। আমেরিকার ভারতবন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের যত ইতিহাস আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং যে-কেহ যত্নপূর্ব্বক এই সময়ের ইতিহাস পড়িতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক।" ঐতিহাসিক আরও যত বহি তিনি লিখিয়াছেন, তাহাও উৎকৃষ্ট। তৎসমুদয়ও সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছে। বিলাতী ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক স্পেণ্ডার সাহেব তাঁহার "পরিবর্ত্তনশীল প্রাচ্য" (The Changing East) নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, জীবনের নানা বিভাগে শক্তিমান্ লোক ভারতে যত আছে, অন্য কোন প্রাচ্য দেশে তত নাই। তাঁহার মতে ভারতের বিত্তর লোক ইউরোপের

শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত বুদ্ধিবিদ্যাসাপেক্ষ কাজে সমকক্ষতা করিতে পারেন, এবং ইউরোপের যে-কোন দেশে তাঁহারা বিখ্যাত হইতেন। এইরূপ যে-কয়জন ভারতীয় লোকের তিনি নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু এবং বামনদাস বসুর নাম আছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র ও তিনি পাণিনি কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। শ্রীশচন্দ্র এখান হইতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করেন। ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইজন্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদ্ভিন্ন শ্রীশচন্দ্র কয়েকটি প্রধান উপনিষদের ঐরূপ সংস্করণ বাহির করেন এবং কোন কোন স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। ভট্টোজীদীক্ষিত প্রণীত "সিদ্ধান্তকৌমুদী" ব্যাকরণ দুই ভাই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বাহির করেন। সেক্রেড বুক্‌স্ অব দি হিন্দুজ নাম দিয়া পাণিনি আফিস হইতে যে বহুসংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও ইংরেজী অনুবাদ বা শুধু ইংরেজী অনুবাদ বাহির হয়, বামনদাস তাহা সম্পাদন করেন। তদ্ভিন্ন তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণ করেন।

বামনদাস ইচ্ছা করিলে একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হইতে পারিতেন। অনেক ইংরেজী কাগজে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় তিনি যে-সকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার তালিকা উহার ডিসেম্বর সংখ্যায় দিয়াছি। প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন :—

১৩০৯	বৈশাখ :—	শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত
	শ্রাবণ :—	সিন্ধুদেশ
	কার্ত্তিক :—	ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকর্ত্তা
	অগ্রহায়ণ :—	ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক
	চৈত্র :—	পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা
	বৈশাখ :—	বীজাপুর
	জ্যৈষ্ঠ :—	আহমদনগর
	আষাঢ় :—	জার্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ; "ঔরঙ্গজেবের সমাধি"—উত্তর
	শ্রাবণ :—	নাসিক
	আশ্বিন :—	গুজরাতী ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য
	কার্ত্তিক :—	চাঁদবিবির ছবি
	অগ্রহায়ণ, পৌষ :—	মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও সাহিত্য
	মাঘ :—	মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের তৃতীয় যুগ
	ফাল্গুন :—	বোলাপুর
	চৈত্র :—	পুণা
১৩১১	জ্যৈষ্ঠ :—	ঠানা জেলা
	শ্রাবণ :—	সাতারা
	কার্ত্তিক :—	বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত
	অগ্রহায়ণ :—	রত্নাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী
	পৌষ :—	বম্বাই সহর
	মাঘ :—	জঞ্জিরা
	ফাল্গুন :—	কচ্ছপ্রদেশ
	চৈত্র :—	খান্দেশ
১৩১২	বৈশাখ :—	কোলাবা
	পৌষ :—	অকবরের নিন্দুকগণ
	চৈত্র :—	ভারতধর্ম্ম কি ?
১৩১৩	বৈশাখ, কার্ত্তিক :—	হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলি
১৩২১	ভাদ্র :—	বাঙ্গালীর কয়েকটি বিশেষত্ব
১৩৩৩	বৈশাখ :—	আশীর্ব্বচন

বামনদাস বসু মহাশয়ের লেখা নানা শহরের ইতিহাস-সম্বলিত প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহা করা হইবে।

শ্রীশচন্দ্র ও বামনদাস বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ হৃদ্যতা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এবং সকল কাজে সহযোগিতা ছিল, সেরূপ সৌভ্রাত্র সচরাচর দেখা যায় না। এই সৌভ্রাত্রের গুণে তাঁহারা নানা মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রচার রূপ কঠিন কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন।

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে বামনদাস বাবুর সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ঠিক্ কোন্ বৎসর কোন্ তারিখে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু তাঁহার মনে ছিল। তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতির একটি খাতায় তাহা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি খাতার সহিত ঐ খাতাটি হারাইয়া গিয়াছে। পাণিনি আফিস হইতে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ বাহির করা হয়, আমি তাহার ইংরেজী খণ্ডটির প্রুফ দেখিয়াছিলাম এবং একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার দু-একটি পাদটীকাও আমার লেখা।

১৯০৬ সালে আমি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজে ইস্তফা দি। 'প্রবাসী'

তাহার পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল। তখন ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' বাহির করিতে মনস্থ করি। এই সময়ে এবং তাহার পরও বরাবর বামনদাস বসু মহাশয় নানা প্রকারে আমার সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বামনদাস বসু মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ঘটনার বৃত্তান্ত ও তারিখ তাঁহার মনে থাকিত। 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে বহু বৎসর পূর্ব্বে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইলে আমি যদি তাহা খুঁজিয়া না পাইতাম, তাঁহাকে চিঠি লিখিলে ফেরত ডাকে ঠিক্ সন্ধান তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক পুস্তক পড়িয়াছিলেন এবং অনেক পুস্তক হইতে অনেক অংশ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি যে-সব বিদ্যা জানিতেন, তদ্বিষয়ক অনেক কথা প্রয়োজন হইলেই জানিয়া লইতে পারিতাম। বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত ও ফার্সী কবিতা তিনি অনেক আওড়াইতেন।

লণ্ডনে পড়িবার সময় বামনদাসের পুরাতন পুস্তকের দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস ছিল। সেখান হইতে তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বহি এবং মুদ্রিত ছবি ক্রয় করেন। এই সকল ছবি ও বহি তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। দেশে আসিয়াও তিনি অনেক বহি ক্রয় করেন। তাঁহার দাদাও অনেক বহি কেনেন। পাণিনি আফিস হইতে প্রকাশিত বহির বিনিময়ে প্রাপ্ত এবং গবর্মেণ্ট ও কোন কোন গ্রন্থকার ও প্রকাশক কর্ত্তৃক উপহৃত বহু পুস্তক দ্বারাও এই গ্রন্থসমষ্টি পুষ্ট হয়। বসুভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের মাতার নামে এই গ্রন্থসংগ্রহের নাম ভুবনেশ্বরী লাইব্রেরী রাখেন। ইহাতে প্রধানতঃ সংস্কৃত, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক বহি বিস্তর আছে। বোম্বাইয়ের কর্ণেল কীর্ত্তিকর যখন ১৯১৪ সালে এলাহাবাদ আসেন, তখন এই লাইব্রেরী তাঁহার এত ভাল লাগে, যে, তিনি তাঁহার জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক সমুদয় গ্রন্থ ও পত্রিকা এবং অপুষ্পক উদ্ভিদসমূহের নমুনা, রঙীন ছবি ও ফোটোগ্রাফ উইল করিয়া তাঁহার বন্ধু মেজর বসুকে দিয়া যান। মেজর বসু ১৯২০ সালে এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সর্ত্তে দান করেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি শুষ্ক-উদ্ভিদ-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিবেন কীর্ত্তিকর উদ্ভিদ-মন্দির এবং ভারতবর্ষীয় অপুষ্পক উদ্ভিদসমূহ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করাইবেন যাহাতে কীর্ত্তিকর মহাশয়ের তদ্বিষয়ক গবেষণা ও চিত্র-সমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মেজর বসু কীর্ত্তিকর ও তাঁহার প্রণীত ঔষধার্থে ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদা-বলীবিষয়ক মূল্যবান্ সচিত্র গ্রন্থের একশত সেট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। প্রত্যেক সেটের মূল্য দুইশত পঁচাত্তর টাকা। ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদাবলী সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য সহায় রাম বসু মহাশয় কীর্ত্তিকর ফণ্ড হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত দুইজন গবেষক ছাত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা অচিরে ছাপিবার জন্য প্রেসে দেওয়া হইবে। উহাতে বহু রঙীন চিত্র থাকিবে। এই গ্রন্থখানির প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলে মেজর বসু আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ হইতে তাঁহার অভিলাষ অনুসারে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্রের জীবনচরিতের প্রকাশও দেখিয়া যাইতে পারিলে তিনি সাতিশয় সুখী হইতেন।

তাঁহার লাইব্রেরীর কিয়দংশ প্রয়াগের মহিলা বিদ্যাপীঠে তিনি জীবদ্দশাতেই দান করিয়া গিয়াছেন।

বামনদাস বাবু কেবল যে পুরাতন পুস্তকই সংগ্রহ করিতেন তাহা নহে; পুরাতন খবরের কাগজ ও পত্রিকা সংগ্রহেও তাঁহার উৎসাহ ছিল। যত বহি তিনি পড়িতেন, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ খাতায় টুকিয়া রাখিতেন। পুরাতন খবরের কাগজ ও পত্রিকা হইতে অনেক প্রবন্ধ ও তথ্য কাটিয়া রাখিতেন। চাকরি উপলক্ষ্যে কোন একটি স্থানে থাকিবার সময় তিনি তত্রত্য অফিসার ও অন্য লোকদের নিকট হইতে দশ মণ পুরাতন সংবাদ-পত্র ক্রয় করিয়া তাহা হইতে এইরূপ টুকরা কাটিয়া রাখেন। ঐ জায়গা হইতে বদলী

হইবার সময় ঐ টুকরাগুলিরই ওজন আড়াই মণ হইয়াছিল! অতএব, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, তাঁহাকে অন্য অফিসারেরা বাতিকগ্রস্ত মনে করিয়াছিল।

তাঁহার পুরাতন পত্রিকা ক্রয়ের অভ্যাস দ্বারা "প্রবাসী" উপকৃত হইয়াছিল। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ইংরেজী পত্রিকা হইতে প্রবাসীতে সারসংগ্রহ করিয়া দিতেন, তখন মেজর বসু এলাহাবাদ হইতে রেলে বাক্সবন্দী করিয়া ঐ সব পত্রিকা কবিকে পাঠাইতেন।

সংবাদপত্র হইতে কর্ত্তিত ও রক্ষিত এই টুকরাগুলির মধ্যে কিছু তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের জন্য, কতক বা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ-সমূহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমিও কিছু ব্যবহার করিয়াছি। সম্ভবতঃ এখনও কিছু সঞ্চিত আছে।

ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্ব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা জানিবার এবং মানুষকে জানাইবার প্রবল বাসনা হইতে তাঁহার ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ গ্রন্থের উৎপত্তি। ইতিহাস কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার জন্য কিরূপ উপকরণ সংগৃহীত হইয়া তাহা কি প্রকারে লিখিত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে তিনি অনেক অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা পড়িলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকার যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলেন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সমুদয় তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি গবেষকদিগকে আহ্লাদের সহিত পঠিতব্য গ্রন্থতালিকা দিতেন, অনেক সময় গ্রন্থ ধার দিতেন।

তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন উহার সেক্রেটরী ছিলেন, তখন কোম্পানীর আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পার্লেমেণ্টের সমুদয় রিপোর্ট আনাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক। ইহার কতকগুলি তিনি পড়িয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষকেরা ব্যবহার করেন না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। পার্লেমেণ্টের ভারতবর্ষ-সম্পৃক্ত এইরূপ রিপোর্টসংগ্রহ এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীতে যেরূপ আছে,সেরূপ ভারতবর্ষের আর কোন লাইব্রেরীতে আছে বলিয়া অবগত নহি। তিনি নিজে কয়েক হাজার টাকা এবং নিজের লাইব্রেরীটি দিয়া এবং আরও অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি গবেষণা-মন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর জন্য প্রতি বৎসর টাকার বরাদ্দ অনুযায়ী নানা বিষয়ে নূতন বহি কেনা হয়। কমিটির এক এক জন সভ্যের এক এক বিষয়ে বহির তালিকা দিবার কথা। কিন্তু মেজর বসুকে নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়েও বহির নাম দিতে হইত।

তিনি ভারতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত নানা উদ্ভিজ্জ ও অন্য জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কর্ণেল কীর্ত্তিকর এবং একজন ভারতীয় সিবিলিয়ানের সহযোগিতায় ঔষধার্থে ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদ-বিষয়ক তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় ঔষধপ্রস্তুতকর্ত্তারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে এবং লোকহিত সাধন করিতে পারিবেন।

১৯১০-১১ সালে এলাহাবাদে যে প্রদর্শনী হয়, বসু মহাশয় তাহার প্রত্নতত্ত্ব ও ভারতীয় ঔষধ এই দুটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিটির সভ্য ছিলেন। প্রদর্শনীতে তাঁহার ঔষধসংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। এই সংগ্রহ তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর প্রস্তাবিত মিউজিয়মে দান করিয়া গিয়াছেন। প্রদর্শনীর কমিটির সভ্য থাকায় তিনি আর দুটি কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনের বন্দোবস্ত হয় এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীকে চিত্র-বিভাগের ভার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কাজটি,ভারতীয় কার্পাস ও পশমী কাপড় ও কম্বল আদির যে নমুনা বহি কোম্পানীর আমলে প্রস্তুত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া প্রদর্শনীতে দেখান। এই নমুনা বহির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই

জানা ছিল না। তিনি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিলাতের তাঁতীরা প্রথম প্রথম ভারতবর্ষের লোকদের মত কাপড় ও পাড় প্রভৃতি করিতে পারিত না। তাহাদের সুবিধার জন্ম ভারতের ৭০০ সাত শত রকম কাপড়, পাড়, কম্বল প্রভৃতির টুকরা কাটিয়া ১৮ ভল্যুম বহি প্রস্তুত হয়। এই বহি মোট কুড়ি সেট প্রস্তুত হয়। তাহার একটি সেটও প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না। কিন্তু শেষে অন্ত মতলবে ১৩ সেট ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে এবং ৭ সেট ভারতবর্ষে রাখা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সেটগুলি এমন অনেক জায়গায় রাখা হয় যাহা বস্ত্রশিল্পের জন্ম বিখ্যাত নহে। লক্ষ্ণৌয়ে এক সেট রাখা হয় তাহা মেজর বসু জানিতেন। তাহাই তিনি আনাইয়া এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে দেখান।

এই প্রদর্শনী খুব বৃহৎ হইয়াছিল। ইহা দেখিবার জন্ম ভারতবর্ষের বহু রাজা মহারাজা ও সাধারণ লোক নানা স্থান হইতে এলাহাবাদে সমবেত হন। আমিও সপরিবারে গিয়াছিলাম এবং বসুভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে অতিথি ছিলাম। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে যেরূপ বহু অতিথির সমাগম দেখিয়াছিলাম, এমন আর কখনও কোথাও দেখি নাই। কয়েক দিন তাঁহাদের গৃহে প্রায় এক শত জন অতিথির পরিচর্য্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বহু মহিলা এবং বালকবালিকাও ছিলেন। আমার যতটা মনে পড়ে, বসুভ্রাতৃদ্বয় সেই সময়ে অতিথিদের জন্য নিজেদের বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান না হওয়ায় অন্য বাড়ীও ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মাতার, তাঁহাদের এবং বাড়ীর মহিলা ও ছেলেমেয়েদের আতিথেয়তা সুবিদিত। অন্যান্য বৎসরেও, বিশেষতঃ পূজার ছুটি, মাঘমেলা ও কুম্ভমেলার সময়, তাঁহাদের বাড়ীতে পরিচিত অপরিচিত বহু অতিথির সমাগম দেখিয়াছি। বসুভ্রাতৃদ্বয়ের সৌজন্ম অনুকরণীয়। তাঁহারা ছোট ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বামনদাস বসু মহাশয় যখন চাকরি উপলক্ষ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন, তখন অনেক দুরধিগম্য স্থানে গিয়া খনন করাইয়া মাটির নীচে হইতে অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তাহা গান্ধার শিল্পের নিদর্শন। এরূপ মূর্ত্তিসংগ্রহ মিউজিয়মে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যক্তি-বিশেষের এরূপ সংগ্রহ কেবল মেজর বসুর গৃহে আছে। ইহার সচিত্র বৃত্তান্ত পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। পাটনা মিউজিয়মের জন্ম পরলোকগত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ইহা তিন হাজার টাকা মূল্যে কিনিতে চান, কিন্তু বসু মহাশয় দেন নাই। তিনি একবার কৌশাম্বী দেখিতে গিয়া এক মুদির দোকানের বারাণ্ডায় উঠিবার ধাপে প্রাচীন লিপি-যুক্ত একখানি প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ কয়েক আনা মূল্যে ক্রয় করেন। এই আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া রাখালবাবু এলাহাবাদ গিয়া তাহার ছাপ তুলেন এবং পাঠ করেন। ইহার লিপি অতি প্রাচীন। রাখালবাবু একশত টাকা দিয়া ইহা কিনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বামনদাস বাবু দেন নাই। ইহা তাঁহাদের বাড়ীতে আছে। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল; অনেক দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াও ছিলেন। তাঁহার দাদা যখন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাকরি উপলক্ষ্যে কাশীতে ছিলেন, তখন এই সকল মুদ্রা সেখানে তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল। দুঃখের বিষয় তাহা চুরি হইয়া যায়।

মেজর বসু সাধারণতঃ সার্ব্বজনিক কার্য্যে যোগ দিতেন না, নিজের লেখা ও পড়া লইয়া থাকিতেন। ভারতীয় ঔষধ সংগ্রহ ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করায় তিনি একবার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। একবার পরলোকগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম সম্মেলনের (Convention of Religions) সহযোগী সম্পাদক হন, এবং একবার শ্রদ্ধানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির কাজ করেন। তিনি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং এই পরিষদকে তাঁহার এতদ্বিষয়ক সমুদয় লেখা-সংগ্রহ দান করিয়াছেন।

বামনদাস বসু মহাশয় বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বংশতঃ তিনি বাঙালী। কিন্তু জন্মের স্থান ও শিক্ষার স্থান লাহোর বলিয়া তাঁহাকে পঞ্জাবী বলিতে পারা যায়। তাহার পর চাকরি উপলক্ষ্যে তিনি ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের—নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের ও গুজরাটের লোকও বলা চলে। সর্ব্বশেষে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি প্রয়াগের স্থায়ী অধিবাসী হন। সে হিসাবে তিনি হিন্দুস্থানী। তাঁহার ভ্রাতা ও তিনি সাতিশয় হৃদ্যতার সহিত হিন্দুস্থানী বন্ধুদের সহিত মিশিতেন। এই সব কারণে তিনি যে-অর্থে "ভারতীয়", কম লোককেই সে-অর্থে ভারতীয় বলা যায়। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ভারতীয়, তাহা নহে। তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন ও আধুনিক দেশভাষা জানিতেন। প্রাচীন ভাষার মধ্যে তিনি সংস্কৃত এবং আরবী ও ফার্সী জানিতেন বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সভ্যতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া, তিনি পঞ্জাবী, পশ্‌তো, সিন্ধী, কাশ্মীরী, হিন্দী, উর্দ্দু, নেপালী, গুজরাটী ও মরাঠী জানিতেন এবং বলিতে পারিতেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে তাঁহার বন্ধু ছিল। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাষায় কথা বলিতেন। একবার দেখিলাম, তাঁহার একজন পুরাতন পাঠান-বন্ধুর সহিত পাঠানী রীতিতে করকম্পন করিয়া পশ্‌তো ভাষায় কথা বলিতেছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাজ করিবার সময় তিনি রক্ষী সঙ্গে না লইয়া একাকী পাঠান গ্রামে যাইতেন ও পাঠানদের কুটীরে বসিয়া গল্প করিতেন। তাঁহার ব্রিটিশ সহকর্ম্মীরা একাকী যাওয়ার বিপদের কথা বলিলে তিনি হাসিতেন। পাঠানেরাও ইংরেজদের এই ভয়ের কথা শুনিয়া হাসিত; বলিত, "আপনার সঙ্গে ত আমাদের কোন বংশানুক্রমিক ঝগড়া নাই; আপনার অনিষ্ট কেন করিব?" মেজর বসু কখন কখন সামরিক কর্ম্মচারীদের পশ্‌তো ভাষার পরীক্ষক হইতেন এবং তাঁহাদের উত্তরের কাগজ দেখিতেন। একবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ছোকরা ইংরেজ অফিসারের পশ্‌তোর জ্ঞানের মৌখিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে তাহাকে একটি পশ্‌তো কথার মানে জিজ্ঞাসা করেন, যাহার অর্থ 'মানুষ'। কিন্তু ছোকরাটি তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য উত্তর দেয়, "এর মানে কালা আদমী"। বামনদাস বাবু শান্তভাবে তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলেন, "না, এর মানে শাদা ইতর লোক।" তাহাতে সে চটিয়া স্থানীয় সেনাপতির কাছে নালিশ করিলে তিনি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বলেন, "তুমি মুখের মত জবাব পাইয়াছ।"

তিনি সার্ব্বজনিক কোন প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন না বটে, কিন্তু দেশের পরাধীনতা ও অপমান তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিত। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অনেক রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তিনি সাতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, দেশে গুপ্ত সমিতি এবং রাজনৈতিক হত্যা আদি হইবে, এবং প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ কৃষকদিগের দ্বারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অনুসৃত হইবে। এই এই বিষয়ে তাঁহার মুদ্রিত লেখা আছে। কিরূপে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতে পারে, তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধ সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা বৈদান্তিক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থিয়সফিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী জগৎমোহিনী ও ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি শিখধর্ম্মে কখনও দীক্ষিত না হইলেও একজন সাধারণ শিখ সিপাহীকে গুরু বলিয়া মানিতেন। এই সিপাহী অতি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। একটা যুদ্ধের পর লুটের অংশ লইতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে চাকরি ছাড়িতে হয়। একজন সাধারণ সিপাহীকে গুরু বলিয়া মানায় বুঝা যায় বামনদাস বাবু মনুষ্যত্বকেই মূল্যবান মনে করিতেন, পদমর্য্যাদাকে নহে। বামনদাস বাবু কাশ্মীর ভাস্করানন্দ স্বামীকে খুব ভক্তি করিতেন, এবং স্বামীজীও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। বসু মহাশয় জাতিভেদ-প্রথাকে হিন্দুসমাজের নানা দুর্গতির কারণ মনে করিতেন। তিনি পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য ফ্যাশানপ্রিয়তা অপছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির নামে এলাহাবাদে "জগৎ-তারণ বালিকা-বিদ্যালয়" স্থাপন করেন এবং ইহার জন্ত কিছু টাকা দিয়াছেন। ইহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহা বিশেষ করিয়া বাঙালী বালিকাদের জন্ত স্থাপিত। ইহাতে সরকারী সাহায্য আছে।

নূতন ধরণের মোটরকার—

ইংলণ্ডের বিখ্যাত এয়ারশিপ, আর—১০০-এর নির্ম্মাতা কমাণ্ডার বার্ণী একটি অদ্ভুত ধরণের মোটর-কার তৈরি করিয়াছেন। এই মোটর-কারটি ঘণ্টায় একশ আশী মাইল বেগে চলিতে পারিবে এবং এই বেগে চলিবার সময়ে মাটি হইতে কিছু উচ্চে উঠিয়া এরোপ্লেনের মত উড়িয়া যাইতে পারিবে। এই

কমাণ্ডার বার্ণীর গাড়ী দুটি লণ্ডনের রাস্তায় পরীক্ষিত হইতেছে।

এই গাড়ীর বডিটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা এরূপভাবে তৈরি যে বায়ুর ধাক্কায় মোটর গাড়ীটির গতি প্রতিহত হইবেনা।

এই মোটর-কারের ইঞ্জিনটি পিছনে অবস্থিত

গাড়ীর ইঞ্জিনটি পিছনে থাকে, এবং সম্প্রতি লণ্ডনের রাস্তার এই গাড়ীটির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ধরণের গাড়ী দুইটি মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু কমাণ্ডার বার্ণী বলেন শীঘ্রই তিনি এই ধরণের অনেকগুলি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিবেন।

মহিলা-সংবাদ

সত্যাগ্রহের জন্য দণ্ডিতা ভারতমহিলা

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী শাস্ত্রী　　শ্রীমতী অম্বালাল সারাভাই　　শ্রীমতী এল্, আর, জুৎসি

শ্রীমতী কে, নটরাজন　　শ্রীমতী সুরজ　　শ্রীমতী ইন্দ্রমালিনী ভট্ট

শ্রীমতী নন্দরাণী ধর

শ্রীমতী স্বর্ণবালা সেন

শ্রীমতী শোভনা রায়

শ্রীমতী ছায়া দেবী

শ্রীমতী কুন্দরাণী সিংহ

পঞ্চদশী

শ্রীজগৎ মিত্র

গরীবের ঘরের আইবুড়ো মেয়ে। বয়স তো পেছোয় না এগিয়েই চলেছে। মেয়ের দিকে চেয়ে বাপ-মায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

পাড়ার মেয়েরা বলে—মিত্তির-বৌ, তোমার মেয়ে এরকম ধিঙ্গি হচ্ছে কেন বল দিকি? বিয়ে দিলে তোমাকে এখনো বৌ করে আনা যায়, কিন্তু তোমার মেয়েকে আর যে রাখা যায় না ভাই।

ক্রমান্বয়ে সন্তান হয়ে হয়ে মিত্তির-বৌয়ের সূতিকা—বর্ত্তমানে সে শয্যাগত। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। তবু খিন্ খিন্ করে মিত্তির-বৌ বলে,—তাই তো ভাই তোমরাই দেখো, আমি আর কি বল্‌বো—বাঁচতে আর এক তিলও ইচ্ছে নেই আমার।

সান্ত্বনা দিতে এসে প্রতিবেশিনীরা রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়ে যায়। তারা চলে গেলে মিত্তির-বৌ হাঁপাতে থাকে, তখন ভুগতে হয় ঐ উমাকেই। জল পাখা বরফ নিয়ে সে এক হুলস্থূল ব্যাপার।

সংসারে কারই বা শরীর ভাল? গোটাপাচেক কুচো কুচো ভাইবোন—সব প্যান্ প্যান্ করছে। উমাই তাদের দেখে শোনে। বাবা বাতে পঙ্গু আর দাদা অম্বুলে। একমাত্র টন্‌কো কেবল উমার শরীর। শীতে-জাড়ে-বর্ষায় একদিনের জন্তেও খারাপ হ'তে জানে না বরং শত অত্যাচার অনাহার সত্ত্বেও দারুণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তার দেহ বয়সের মাপকাঠি ছাড়িয়ে চলেছে।

উমাকে দেখলে পনের বছরের মেয়ে বলে মনে

হয় না। বড় বড় তার হাত পা, গাঁট্টাগোট্টা গড়ন। চলতে গেলে বেঁকে চুরে চলে, হাসলে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে – এক কথায় তাকে সুশ্রীও বলা চলে না।

কাজেই উমার আজও বিয়ে হয় নি। টাকা এবং রূপ দুটোরই অভাব। তাই বলে বাপ-মা তো চুপ করে থাকতে পারে না। বাপ যদিওবা পারে, মা পারে না, কাজেই ভাবনায় চিন্তায় মায়ের রোগও সারে না।

স্বামীকে অকর্ম্মণ্য জেনে মা ছেলের মুখ চেয়ে থাকে। উনিশ বছরের ছেলে। বিনোদ যেমন ধৈর্য্যের সঙ্গে চাকরির জন্যে উমেদারি করে তেমনি ধৈর্য্যে বোনের বিয়ের জন্যেও উমেদারি করে। শুধু মুখের কথায় কিন্তু দুটোর একটাও হয় না। পাওনাগণ্ডার আশা নেই দেখে ঘটক আর বাড়ীতে মাথা গলায় না, কাজেই বিনোদ নিজেই টো টো করে ঘোরে। কিন্তু বৃথাই—মেয়ে দেখতে অনেকেই রাজি—কিন্তু বিয়ে করতে নয়। শেষ পর্য্যন্ত কিছু জলযোগ করে সবাই বাড়ি ফেরে।

যে কেউ আসে তার সামনেই উমা নিজের কুরূপ নিয়ে দাঁড়ায়। দর্শকের নিষ্ঠুর সমালোচনা আর তাকে বাজে না, এমন কি সস্তা প্রসাধনের ছলনায় পুরুষকে ভোলাবার হীনতাটুকু তার সয়ে গেছে। রূপ না হ'লে পুরুষের চলে না এ সত্য উমা সরলভাবেই বিশ্বাস করে, তাই ওকে কারুর পছন্দ হয় না ব'লে পুরুষের প্রতি ওর কোনো অভিমান নেই।

কোনো নবীন যুবক ওর স্বামী হবে এ যেন উমা ভাবতেই পারে না আজকাল। পাত্রের বয়স হ'লে বা দ্বিতীয় পক্ষের হ'লে কিছু তবু আশা হয়। কিন্তু তাও কই? সম্প্রতি একটি প্রৌঢ় দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র উমাকে বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল। আর পক্ষের তা'র তিনচারটে ছেলেমেয়ে আছে, সুতরাং খাটিয়ে মেয়েই সে চায়, কিন্তু সেও বিনোদকে চারবার ঘোরাবার পর সেদিন স্পষ্ট ব'লে দিয়েছে, অন্ততঃ তিনশো টাকা না হ'লে বিয়ে করতে পারবে না—অন্য এক জায়গায় সে পাঁচশো টাকা পাচ্ছে।

সেইদিন সকালে উমার বাঁ-চোখ নেচেছিল, মাথার ওপর কাক ডেকেছিল, দেওয়ালে টিকটিকি আওয়াজ করেছিল এবং চোখের সামনে একটা বেড়াল ডানহাত দিয়ে কান চুলকোচ্ছিল। এতগুলি শুভচিহ্ন দেখলে কার না আশা হয়? কিন্তু রাতে যখন দাদা এসে হতাশ হয়ে ব'সে পড়লো তখন আড়ালে উমার সে কি কান্না।

কান্না একটু আসে বই কি। বিয়ে হ'ল না ব'লে কান্না নয়। কান্না রাতে দাদার ঘুম হয় না ব'লে, মা'র রোগ সারে না ব'লে, আর দিনের পর দিন বাবার বকুনি খেতে হবে ব'লে। তা'কে যে কারুর পছন্দ হয় না এমন কি একটি বৃদ্ধও টাকা চেয়ে বসে, এ দোষ তো তারই! সে যে দেখতে ভাল নয় এও তো তারই দোষ!

দাদার মুখের দিকে চাইতে উমার ভয় হয়, বাবার কাছে যেতে তার বুক কাঁপে। কাজেকর্ম্মে উমার হাত যেন আর নড়ে না, আধঘণ্টার কাজ সে দু-ঘণ্টায় করে, এক বাসন সাতবার মাজে, মাছ কুটতে হাত কেটে যায়।

ভাতের দেরি দেখে দাদা বিরক্ত হয়ে বললো—কিরে রান্না করতে তুই যে আজ বুড়ো হয়ে গেলি উমা—বিয়ে ভেঙে গেল ব'লে এতই দুঃখু?

রোহিণী কি একটা কাজে মেয়েকে বহুবার ডেকে সাড়া পায়নি, রেগে এসে বললো—কি গো, কানে যে কথা যায় না, লুকিয়ে নভেল পড়া হচ্ছে বুঝি? দ্যাখো গরীবের ঘরে ওসব কেতাব-টেতাব চলবে না, বুঝলে? কাজকর্ম্ম বেশ ক'রে শিখতে হবে—কোথায় কোন্ হাঘরে পড়বে তা'র ঠিক কি! আর দ্যাখো ঐ নভেলি কায়দায় জানলায় দাঁড়িয়ে-টাড়িয়ে থাকাও হবে না—বয়সটি তো কম হয়নি তোমার!

কবে দাদার একখানি লাইব্রেরীর বই উমা একটু উল্টে দেখেছিল, কবে নতুন বরষার সমাগমে ঘনায়মান আকাশের দিকে চেয়ে উমা খানিকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়েছিল, সেই সামান্য ত্রুটি বাবা আজ ক্ষমা করেন নি—ঐ একই প্রসঙ্গ নিয়ে খোঁটা চলেছে বহুবার। মেঘের দিকে চেয়ে হয়ত উমার মনটি একটি অশ্রুসজল ব্যথায় উদাস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার থেকে 'মেঘদূত' কাব্যের কল্পনা করা বাবার পক্ষে একটু বেশীই। আর নভেল? ঐ বইগুলিতে যা লেখে উমার পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কিছু শক্ত। প্রেম? উমার সাংসারিক অভিধানে 'প্রেম' ব'লে কোনো শব্দই নেই। নারী আবার পুরুষকে পছন্দ করবে কি!...

মা বললো—দিনকে দিন তুই কি হচ্ছিস বলতো উমা, চুলগুলো বাঁধতে পারিস নে?—লোকের পছন্দ হবে কি ক'রে!

আন্তরিক মায়া যদি কারুর থাকে তো সে ঐ মায়ের। মায়ের কথায় উমা হয়ত চুলগুলি বাঁধলো—গায়ে একটু সাবান দিয়ে একখানি ফরসা কাপড়ও পরলো হয়ত, কিন্তু বাবা উঠলো জ্বলে—গরীবের মেয়ের অত ফ্যাসান আমার সহ্য হয় না, বুঝলে? পড়বে তো সেই কার না কার হাতে।

চুলগুলো রুক্ষ আলগা থাকলেও রোহিণীর সহ্য হয় না, —ঘরের বিধবা মেয়েটি তো নও, অত তাপস্যির দরকার কি বাপু? চুলগুলো একটু বাঁধলেই তো পার। গরীবের ঘরের কুরূপা-পঞ্চদশী অনূঢ়া মেয়ে শত চেষ্টাতেও বাবার মন পায় না। উদয়াস্ত সংসারে খাটে; তার

ওপর রোগীর সেবা—তা'তেও কারুর সহানুভূতি জাগে না।

দিনের পর দিন যায়। সামান্য তিনশো টাকার অভাবে প্রৌঢ় দ্বিতীয় পক্ষটিও বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল। সংসারে খেতেই কুলোয় না তো বিয়ের পণ আসবে কোথা থেকে! পূর্ব্বের ভিটেখানা থাকলেও রোহিণীর একটা কেন তিনটে মেয়েরই বিয়ে হয়ে যেতে পারত বাড়ি বিক্রী ক'রে। কিন্তু রেস খেলে রোহিণী সে বাড়ী পূর্ব্বেই খুইয়েছে।

মাত্র চল্লিশ টাকা পেনসনের ওপর নির্ভর ক'রে রোহিণীর সংসার চলে। ছেলে টিউশানি ক'রে পনের কুড়ি টাকা কোনো মাসে আনে কোনো মাসে আনে না—টিউশানি তো চিরস্থায়ী নয়! ম্যাট্রিক পাস ক'রে পয়সার অভাবে বিনোদের আর পড়া হয় নি। চাকরির জন্যে ঘুরে ঘুরে বেচারার তিনজোড়া জুতোই ক্ষয়ে গেল, তবু আজও একটা তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরিও জুটলো না।

কিন্তু শুনেছি ভাগ্য নাকি হঠাৎ সুপ্রসন্ন হন। হঠাৎ বেচারির ভাগ্যে বড়লোকের একটিমাত্র মেয়ে জুটে যায় কিংবা ডারবির টিকেট কিনে খোট্টা দরোয়ান মোটর হাঁকায়।

অবশ্য বিনোদের ভাগ্যে ডারবির টাকা জোটেনি, ধনীর এক মেয়েও না। তা'র একটা চল্লিশ টাকা মাইনের মাষ্টারি জুটে গেল। তার একটু ইতিহাস আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিনোদ ছেলে পড়াতে বেরিয়েছে। নানা চিন্তায় রাস্তার দিকে তার খেয়াল ছিল না; এমন সময় একটা মোটর হঠাৎ তার একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লো। ড্রাইভার ব্রেক না কসলে তার ভাগ্য সেদিন অন্য রকম হ'তে পারত। মোটরে ছিল বিনোদের স্কুলেরই একজন পুরানো সহপাঠী—অলোক মল্লিক। সে বিখ্যাত বড়লোকের ছেলে। অলোক যখন বিনোদকে চিনলো তখন তা'র লজ্জা রাখবার আর জায়গা নেই—শেষে পুরানো বন্ধুকেই চাপা!

অলোক বিনোদকে ছাড়লো না—অনেকক্ষণ তাকে নিয়ে মোটরে ঘুরলো। তার সাংসারিক অবস্থা জেনে নিল এবং শেষে নিজেরই একটি ছোট ভাইয়ের পড়ার ভার বিনোদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মাইনে ক'রে দিল চল্লিশ টাকা।

বিনোদ বিস্ময়ে বিমূঢ়। মল্লিকদের বাড়ীর সে হবে মাষ্টার? ওদের কে না চেনে! আর এই কি সেই স্কুলের অলোক? বিনোদের মনে পড়ে ছেলেবেলায় অলোক কি ভীষণ দুর্দ্দান্ত আর দাম্ভিক ছিল। বিনোদ গরীবের ছেলে, গোবেচারি—ক্লাসে ভাল ছেলে ব'লে তার নাম, সুতরাং অলোকের সে ছিল চক্ষুশূল। কারণে অকারণে সে বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করতো।

আর আজ সেই অলোক বিনোদকে পাশে বসিয়ে অকৃত্রিম বন্ধুর মত ব্যবহার করছে! বিনোদ অলোকের পরিবর্ত্তন দেখে বিস্মিত হ'ল।

এক কথায় চল্লিশ টাকা? এ যে কেরাণীর বাড়া। বিনোদ আনন্দে আত্মহারা। অলোকের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বিনোদ ধরা-গলায় বললো—জানি, আমরা পেট ভরে খেতে পাইনে, আমার বাবা গরীব, আমার মা শয্যাগত, তিন তিনটে বোনের আমায় বিয়ে দিতে হবে তবু চল্লিশ টাকা যে বড় বেশী হ'ল অলোক, তুমি বরং আমায় তিরিশ টাকাই দিও।

অলোক কোনো উত্তর না দিয়ে মোটরে বেরিয়ে গেল। বাবা মা প্রথমটা বিশ্বাস করতে চাইল না কিন্তু বিশ্বাস যখন করলো তখন পাগল হবার জোগাড়! বাত না থাকলে রোহিণী নাচতো নিশ্চয়ই।

তারপর ঐ চল্লিশ টাকাকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি মানুষের কত রকম জল্পনা কল্পনা। বিনোদ বললো—এবার তোমার অসুখ নিশ্চয়ই সারবে মা। দেখো আসছে মাস থেকে কি রকম ভাল ভাল ওষুধ আর ডাক্তার আনবো তোমার জন্যে।

মা বললো—ভয় নেই আমি সেরে উঠবো বিনু। তুমি কিন্তু সেই ভবানীপুরের পাত্রটিকে ব'লে এসো বাবা, কিছুদিন অপেক্ষা করতে। ব'লো তিনশো টাকা আমরা তা'কে দেবো।

রোহিণী বললো—গিন্নী, একটি সুন্দর মেয়ে হাতে আছে, খোকার জন্যে দেখলে হয় না? হাজারখানেকের কম কিন্তু রাজী হচ্ছিনে।

গিন্নী হেসে বললো—আগে উমার বিয়েটা তো হয়ে যাক্।

এমনি ধারা অলীক স্বপ্নরচনা চলছেই। বিশেষ ক'রে ভাইবোনদের মধ্যে যেন উৎসব লেগে গেছে, কারণ দাদা সেদিন কার কি জামা-কাপড় লাগবে তারই একটা লম্বা ফর্দ্দ ক'রেছে। তবু টাকা এখনও হাতে আসেনি—তাতে কি? দাদা কি একটা যে সে লোক! মল্লিকদের বাড়ির মাষ্টার, হেঁ-হেঁ!

মল্লিকদের নিত্যনূতন ঘটনা নিয়ে বিনোদ উমার কাছে রোজ গল্প করে। বলে—ওরে ওরা কি কম বড়লোক, জানিস্? ওদের মোটরই ন' খানা!···বাড়ি যে কতগুলো তা'র হিসেব নেই, আর ছেলেমেয়েরা সব কেমন ফুটফুটে যেন মোমের পুতুল···বড়লোকদের চেহারাই আলাদা, বুঝলি উমা?

তারপর অলোক সম্বন্ধে নানা গল্প। তার ছেলে-

বেলাকার ডানপিটেমি প্রভৃতি। তারপর খানিকটা তার রূপবর্ণনা। কি সুন্দর অলোককে দেখতে—যেন রাজপুত্তুর। ঠোঁটের ওপর বাদামী সরু সরু গোঁফ, চোখে প্যাসনে, মাথায় বাবরি। বিনোদ বললো—অলোক বি-এ পাস করে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। ওকি একটা কম ছেলে রে, আর আমি ওরই বন্ধু, বুঝলি উমা!

বিনোদের চোখদুটো উৎসাহে বেরিয়ে আসে—গল্প ক'রে তার আশা মেটে না। উমা মুগ্ধ হয়ে শোনে—দাদা যেন রূপকথা বলছে। দাদার গৌরবে উমার বুক আনন্দে ভরে যায়। অনেক কথা তার বিশ্বাসই হয় না, বলে—সত্যি, দাদা?

রান্নাঘরে কাজের মধ্যে উমার কল্পনায় মল্লিকদের সম্বন্ধে নানা ছবি ফুটে ওঠে। উমা ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম জানায়। আর প্রণাম জানায় সেই অদৃশ্য ধনী যুবকের উদ্দেশে যার অনুকম্পায় তার বাবা-মার মুখে হাসি ফুটেছে। যিনি তার দাদাকে ছোট ভাবেন নি, ঘৃণা করেন নি বরং তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। অলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় উমার মাথা যেন মাটিতে লুটতে চায়।

শুধু অলোক নয়, অলোকের মাও বিনোদকে স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। ধনীর গৃহিণী গরীবের সমস্ত কাহিনী শুনে নিয়েছেন। ও বাড়ীতে বিনোদের প্রায়ই নেমন্তন্ন। মা'র অসুখ শুনে তিনি প্রায়ই বিনোদের হাতে রোগীর পথ্য, আঙুর বেদানা প্রভৃতি পাঠিয়ে দেন। চাকরের হাতে একদিন একঝুড়ি আম পাঠিয়ে দিলেন, তার সঙ্গে এলো মা'র জন্যে লালপেড়ে শাড়ি।

বাবার মুখে হাসি ধরে না। রোহিণী বলে—বিনু, টিকে থেকো বাবা, রাগ ক'রে ছেড়ে দিও না যেন—ওঁরা ধনী লোক।

উমা এসে বললো—দাদা, পাঁচ সিকে দিতে হবে, সত্যনারাণের সিন্নী দেবো।

বিনোদের আপত্তি নেই কিছুতেই। এখন সে বড় লোক—কত খরচ করবে কর! উমা ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে উপোস করে, মার গ্রহ-শান্তির জন্যে উপোস করে, বাবার বাতের জন্যে উপোস করে—তাঁর হাতে মাদুলি পরায়। আর উপোস করে, নিজের সৌভাগ্যের জন্যে—সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন ব'লে।

একদিন রাত্রে বিনোদ এসে বললো—ওরে উমা, কাল মাকে একজন বড় ডাক্তার দেখতে আসবে রে। অলোকই পাঠাচ্ছে—ওদের বাড়ির ডাক্তার।

উমার আনন্দ ধরে না, এবার মা সেরে উঠবেন। রোহিণী বললো,—ডাক্তার তো আনছো বিনু, কিন্তু টাকা কোথায় পাবে?

—অলোকই পাঠাচ্ছে বাবা, ওর মা সবই জানেন কি না।

রোহিণী কপালে দুটি হাত ঠেকিয়ে বললো—ভগবান তুমিই ধন্য...হ্যাঁ বড়লোক বলে একেই।

পরদিন উমা রাত থাকতে উঠলো। চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটোলো এবং ভোরের প্রথম সূর্য্য-রশ্মিটিকেও প্রণাম করে ঘরে নিলো। তারপর ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে ফিট-ফাট করে ফেললো। বাড়িতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন—সে কি সাধারণ কথা!

যথাসময়ে হর্ণ বাজিয়ে ডাক্তার এলেন। বিনোদ ডাক্তারকে আনতে এগিয়ে গেলো। উমা রান্নাঘরে নিজের কাজে নিযুক্ত, কিন্তু তার মন ছিল বাইরে—ডাক্তার মাকে দেখে কি জানি কি বলবেন। বাড়ি তো এক-টুকরো—খান-দুয়েক মাত্র ঘর। তার একটাতে মা থাকেন শুয়ে; আর একটাতে বাবা দাদা এবং কুচো ছেলেরা শোয়। উমা রাতে মার কাছেই থাকে। রান্নাঘরে বসেই উমা সব শুনতে পায়। ডাক্তার আসছেন—রান্নাঘরের জানলা ভেজিয়ে একটু ফাঁক করে উমা দেখলে। মানুষের সামনে বেরুতে তার ভয়ানক লজ্জা। বুড়ো মেয়ের বেহায়াপনা বাবা সহ্য করেন না। হঠাৎ দাদার স্পষ্ট কথাগুলি উমার কানে গেল—আরে অলোক যে! তুমিও এলে যে, ভাই? কাল তো কিছু বল নি। চল, ভেতরে চল—আসুন ডাক্তারবাবু—

উমা চমকে উঠলো—অলোক-বাবু? মল্লিকদের ছেলে? সে উদগ্রীব হয়ে দেখছে যেন ভৌতিক কিছু একটা ঘটছে। গরীবের কুটীরে রাজার ছেলে। উমা যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কিন্তু সত্যই অলোক এসে হাজির।

ডাক্তারের পিছনে একটি সুন্দর প্রিয়দর্শন ছেলে—কি নিটোল তার স্বাস্থ্য, যেন পাথরে খোদা মূর্ত্তি। চোখে চশমা এবং মাথার চুলগুলি কোঁকড়া বটে, কিন্তু অলোকের বেশে কোনো বাহুল্য নেই। মুখের হাসিটি তার আরও মিষ্টি। অলোক হেসে বললো—বেশ যাহোক, কেন, তোমার বাড়িতে ব'লে আসতে হবে নাকি? তাছাড়া ডাক্তারবাবু বাড়িটা চেনেন না কি না...

কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় বিনোদের মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বললো—এসো এসো ভাই, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

বিনোদ বাবাকে ডাকলো—বাবা আছেন রে উমা? রোহিণীর বিশেষ ওঠবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু অলোকের নামে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ভিতর থেকে বললো—বিনু

অলোকবাবুকে ভেতরে নিয়ে এসো, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখো না।

ঘরে এসে বিনোদ বল্‌লো—এই যে এইখানে ব'সো ভাই, গরীবের ঘর, বুঝলে তো—রুগীর কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই অলোক।

রোহিণী বল্‌লো—ডাক্তারবাবুকে তোমার মার কাছে নিয়ে যাও বিনু। অলোকবাবু এইখানেই থাকুন—অলোক, বাবা বোস!

কিন্তু বস্‌বার জায়গা কই? ছোট্ট ঘর গাদাখানেক জিনিষে বোঝাই—আলো-বাতাসের জায়গাই নেই তো মানুষের! ঘরের অনেকটা জুড়ে একটা তক্তাপোষ, তাতে পুরানো একটা বিছানা। চাদরের অভাবে তার ওপর একটা পরবার ধুতি বিছানো—উমাই বুদ্ধি ক'রে পেতেছে, নইলে বিছানা উলঙ্গই থাকে। ঘরদোর পরিষ্কার করলেও রাতারাতি দেওয়ালগুলোতে বালি-রং ধরিয়ে চুণকাম তো করা যায় না, তাই দাঁত বার করা ঘরে অন্ধকার ইঁদুর এবং মশার রাজত্ব কিছু বেশী।

রোহিণী অধৈর্য্য হয়ে বল্‌লো—না বল্‌লে কিছু যদি একটা করবে, এদের নিয়ে আর পারা যায় না। নাঃ, উমা—ওরে উমি, একটা চেয়ার নিয়ে আয় শীগ্‌গির—বুড়ো মেয়ের কিছু যদি বুদ্ধি আছে দ্যাখো দিকি ভদ্রলোক কোথায় যে বস্‌বেন—

রান্নাঘরের জানালায় উমা ঠিক তেমনিভাবে তখনও দাঁড়িয়ে—মন তার কোথায় কে জানে? মল্লিকদের বাড়ির ছেলে তাদের সামান্য কুটীরে এসেছে—এ যেন তখনও তার বিশ্বাস হয়নি। বাবার ডাক তার কানে এলো, কিন্তু সে কি করবে? সে কি অলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে! কিন্তু ভদ্রলোক কোথায় যে বস্‌বেন সেও একটা ভাববার কথা। বাড়িতে কি ছাই একটাও চেয়ার আছে?—বাবা তো হেঁকে বস্‌লেন!

কিন্তু উমার সবচেয়ে কষ্ট ঘরের অবস্থা কল্পনা ক'রে। কে জানে অলোক আস্‌বে? তাহ'লে সে ঘরটিকে আরও ভাল করে গোছাতে পার্‌তো—অনাবশ্যক কতকগুলি জিনিষ বাইরে বার করে দিতো। যেমন করেই হোক একটা চেয়ার জোগাড় করে রাখতো, এমন কি গোটা-দুই ধূপও জেলে রাখতো হয়ত। ছিঃ ছিঃ, দাদা যদি একটু আগেও বল্‌তো একবার···। ভাইবোনগুলি ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারছে, যেন অপরূপ কেউ এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উলঙ্গ, কারুর পরণে সামান্য একটা ইজের মাত্র। লজ্জায় উমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল, ওদের টেনে এনে বেশ ঘা-কতক দিয়ে দেয়।

অলোক বল্‌লো—না, না থাক আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এই বিছানাতেই বস্‌ছি—চেয়ারের কি দরকার। আপনারও তো অসুখ শুনেছি রোহিণী বাবু!

রোহিণী বল্‌লো—হ্যাঁ বাবা, শরীর আর আমার ভাল কই? বাতে একেবারে পঙ্গু, তবে···

তারপরই রোহিণীর 'হাউমাউ' করে কান্না—আমার আর কি হয়েছে বাবা, 'বনুর মা বুঝি আর বাঁচে না।

অলোক সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লো—কিছু ভাববেন না আপনি, সব সেরে যাবে—ডাক্তার খুব ভালই, রোহিণী বাবু।

রোহিণী চোখ মুছে বল্‌লো—হ্যাঁ বাবা তা ঠিক; বিনুকে তুমি ভালবাস, তাই যা ভরসা, নইলে···

রোহিণীর চোখে আবার জল এসে পড়ল। প্রতি-মুহূর্ত্তে বৃদ্ধের কান্না দেখে অলোক তো অস্থির। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে এঘরে ফিরে এলেন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে রোহিণী নিজের কাজ করে নিল, অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় দুঃখের কথা অলোককে জানিয়ে ফেল্‌ল—এমন কি পয়সার অভাবে মেয়েটার যে বিয়ে হচ্ছে না সেটুকুও জানাতে ভুল্‌লো না। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে অলোক গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লো।

রোহিণী বল্‌লো—চল্‌লে অলোক, একটু বসলে না বাবা—তোমার জন্যে যে একটু মিষ্টি আনতে দিয়েছিলাম।

—ব্যস্ত হবেন না কাকাবাবু, না। হয় আর একদিন খেয়ে যাব'খন,—আজ একটা বিশেষ কাজ রয়েছে কিনা।

বিনোদের আনন্দ ধরে না—ডাক্তার বলেছেন মা শীঘ্রই সেরে উঠবেন। রোহিণী হেসেই খুন, তার মুখে অন্য কথা নেই—হ্যাঁ ছেলে বটে ঐ অলোক। কাকাবাবু! হেঁ হেঁ! বাবা বিনু, ভাল ক'রে কাজ কোরো বাবা, ফট করে রেগেমেগে ছেড়ে দিও না যেন। কাকাবাবু! আহা প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।···

একদিন বিনোদ এসে রোহিণীকে বললো—বাবা তুমি কি উমার বিয়ে নিয়ে অলোককে কিছু বলেছিলে?

—কেন বলতো?

—অলোকের মা সব জিজ্ঞেস করছিলেন। তিনি উমার বিয়ের সমস্ত খরচ দেবেন বলেছেন। অলোককে ওসব কেন বলতে গেলে বাবা? জান তো ও আমার জন্যে কত করে। মার ওষুধ আর ডাক্তারের খরচই তো কম নয়।

—তাতে কি হয়েছে বিনু, ওরা বড়লোক আর আমরা ভিখারী—আমাদের আবার লজ্জা কি?

সেই দ্বিতীয় পক্ষ পাত্রটির সঙ্গে উমার বিয়ের কথা এবার পাকাপাকি হবার সম্ভাবনা। বিয়ের দিন ঠিক

হলেই হয়। মার শরীর অনেক ভাল—চিন্তা কিছু কম এবং ওষুধ নিয়মিত পড়ে। উমা মল্লিকদের উদ্দেশে রোজ প্রণাম জানায়, আর প্রণাম জানায় তার বয়োবৃদ্ধ ভবিষ্যৎ স্বামীর উদ্দেশে। সংসারে তাহ'লে একজনের ঘরেও তার স্থান আছে।

ডাক্তারের সঙ্গেই অলোকের শেষ আসা নয়—সে আরও দু-একবার এ বাড়িতে এসেছিল। মাঝে একবার বিনোদ ভয়ানক অসুখে ভোগে। ডাক্তার দেখিয়ে অলোকই তাকে সুস্থ ক'রে তুললো।

অলোকের সামনে বেরোতে উমার মাথা কাটা যায় —দাদার ডাকে বাধ্য হয়ে তাকে ওঘরে যেতে হয়, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার বুক কাঁপে, তার পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। সভ্য এবং বনেদী ঘরের ছেলের কাছে উমা তার রূপ গুণ শিক্ষা এবং অবস্থার দীনতা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। দাদার ঘরে ঢুকে উমা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, পৃথিবীর কোনো কিছু তার মনে থাকে না - কি একটা অস্বাভাবিক শক্তি বিদ্যুতের মত তার ওপর ক্রিয়া করতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তার কাজে ভুল হয়। দাদার দুধ ঢালতে হয়ত ওষুধই ঢেলে ফেলল। তারপর রুগ্ন দাদার বকুনি—দিন দিন তুই একটা অকর্ম্মের ধাড়ি হচ্ছিস··· বুড়ো মেয়ে কোথাকার! যা পালা এখান থেকে, কিছু করতে হবে না।

অলোক হয়ত বাধা দিয়ে বললো—কেন শুধু শুধু মাথা গরম করছো বিনোদ, ভুল কার না হয় শুনি? দাদার তোমার মাথা খারাপ হয়েছে উমা কিছু মনে কোরো না।

উমা প্রথমটা চমকে ওঠে, তারপর মুখ নীচু করে একটু হাসে হয়ত—ঘরের বাইরে গিয়ে কিন্তু সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অলোক যতক্ষণ থাকৃত উমার কিন্তু উদ্বেগের শেষ থাকৃত না। ভাবতো—ছিঃ ঐরকম অন্ধকার ঘরে কি ভদ্রলোক বসতে পারে,তাও যদি একটু বাতাস বইতো। বাবাঃ, বিছানাটা কি ময়লাই না হয়েছে উমার খালি ভয় হয়, এ বাড়িতে এলে বুঝি অলোকের ভয়ানক কষ্ট হয়।

অলোকের ব্যবহারে কিন্তু কোনো আড়ষ্টতা ছিল না, সে বেশ সহজভাবে আসত যেত। এমন কি বিনোদের ছোট ছোট ভাইবোনগুলির সঙ্গেও অলোক অবাধে মিশতো। ধনীর দুলালের এই একান্ত সহজ সরলতা উমাকে আরও বিচলিত ক'রে তুলত। ভাইবোনগুলি অলোকবাবুকে ভয় করে না ব'লেও উমার লজ্জা যথেষ্ট— উনি কি একটা যে-সে লোক? বিনোদ সুস্থ হ'লে রোহিণী একদিন বললো—বিনু, অলোককে খেতে বলো কাল, বুঝলে? গরীব হ'লেও আমাদেরও, সাধ-আহ্লাদ আছে।

বিনোদ অনেক কষ্টে রাজী হ'ল। উমা কিন্তু এসে বললো—দাদা, অলোকবাবুকে এনে খাওয়াবে কি?

—আমিও তাই বলছিলুম উমা, কিন্তু বাবা তো শুনলেন না। তবে অলোকের কাছে আমার বিশেষ লজ্জা নেই। আমাদের সবই তো সে জানে।

গরীব হলেও মল্লিকদের বাড়ির ছেলের সামনে ডাল-চচ্চড়ি ধ'রে দেওয়া যায় না। উমার রান্নার হাত আছে —অনেক ভাল ভাল খাবার তৈরি হ'ল। বিনোদ খরচ করতে কুণ্ঠিত নয়। অলোক তো চটেই অস্থির— কেন এত খরচ করা? কিন্তু খেতে বসে অলোকের সে কি তৃপ্তি। উমা পরিবেশন করলে—অলোক তার রান্নার প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল। কোনো সঙ্কোচ নেই, যেন সে বাড়িরই ছেলে—আরে উমা তো বেশ রাঁধতে শিখেচে···উমা, আর একটু এঁচোড়ের তরকারি আনো ভাই···মাংসটা কি তুমি নিজে রেঁধেছ? বাঃ, বেশ হয়েছে তো!—কি কি দিয়ে রেঁধেছ একবার শিখিয়ে দেবে উমা?

প্রশংসা শুনে উমা লজ্জায় রাঙা হ'য় উঠল। এত বড়লোক বলে কি! কোথাও এতটুকু কি গর্ব্ব নেই? নারী হয়ে জন্মানো এইখানেই সার্থক। মানুষকে খাওয়ানোর তৃপ্তি জীবনে উমা আজ প্রথম পেলে। উমা স্তম্ভিত হয়ে অলোকের কথা শুনতে লাগলো—আরে ঘরের ছেলে হয়ে তুমিই যে জামাই ব'নে গেলে বিনু, উমা দাদাকে আর একটু মাংস দাও।

দাদাকে দিতে এসে উমা ভুলে অলোককেই দিয়ে ফেলল—আরে কর কি! তুমি যে আমায় পেটুক ঠাওরালে উমা। এ যে সেই তামাক খাবার ব্যাপার হ'ল।

তারপর অলোকের হো হো করে হাসি। না বুঝে রোহিণীও খুক খুক করে হাসতে লাগল। আহারান্তে উমা পান নিয়ে এল। অলোক বললো—তুমি কিন্তু আজ একটাও কথা বলনি উমা একা আমিই ব'কে মরছি।

অলোকের পায়ের ধুলো নিয়ে উমা বললো—সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, আপনাকে প্রণাম করা হয়নি কিন্তু।

অত বড়লোকের কাছে এর বেশী আর কি বলবার আছে? উমা আড়ালে চলে গেল। আহারান্তে খানিকটা কথাবার্ত্তা চলল—উমা কান পেতে রইল, অলোকের প্রত্যেকটি কথা ও গিলছিল যেন।

অলোক বলছিল—আপনার মেয়ে বড় লাজুক রোহিণীবাবু, কিন্তু বেশ কাজের—কেমন চমৎকার সব রান্না শিখেচে। একটু লেখাপড়াও যদি শেখাতেন ঐ সঙ্গে···

রোহিণী বললো—লজ্জাটজ্জা একটু থাকা ভাল অলোক, বিশেষ করে আমাদের ঘরে। আর উমার বয়স তো কম হয়নি বাবা—বিয়ে দিলেই হয়—।

—কি আর এমন বয়স রোহিণীবাবু? বিদেশে ঐ বয়সের মেয়েরা ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়, জানেন তো?

অলোক বিনোদের দিকে চেয়ে বললো—বিমু, শুনছি নাকি তোমরা উমার বিয়ের ঠিক করেছ···দ্বিতীয়-পক্ষের পাত্র না?

রোহিণী বিমর্ষমুখে বললো—কি করবো বাবা, জান তো টাকা না থাকলে মেয়ের বিয়ে আজকাল হয়ই না।

—নাই বা হ'ল বিয়ে—তা ব'লে মেয়েকে জলে ফেলে দেবেন? আমার মতে এ বিয়ে আপনাদের না দেওয়াই উচিত। একটা কথা কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমি মনে করছি···আপনার যদি আপত্তি না থাকে···আচ্ছা দু-একদিন পরে আপনাকে জানাব, রোহিণীবাবু। কিন্তু এ বিয়ে তুমি ভেঙে দাও, বিমু। যতদূর দেখেছি মনে হয় উমা ভারি সরল শান্ত মেয়ে··· লেখাপড়া একটু কম জানে বটে তা শিখিয়ে নিলেই হ'ল।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে উমা শুনছিল অলোকের কথা! এবার বুঝি সে সংজ্ঞা হারাবে। জীবনে এতখানি সহানুভূতি সে যে কখনও কারুর কাছে পায় নি। যদি সম্ভব হ'ত উমা গিয়ে অলোকের পায়ে লুটিয়ে পড়তো।

অলোক চলে গেলে রোহিণী বিনোদের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো,—বিমু, ব্যাপারটা কিছু কি বুঝলে? অলোক যে হঠাৎ বলতে গিয়ে থেমে গেল? মেয়েটার বরাত ভাল মনে হচ্ছে, হঠাৎ চোখে লেগে গেছে বাবাজীর!

বিনোদ বিরক্ত হয়ে বললো—কি যা-তা ভাবছেন বাবা, যা সম্ভব নয় অনর্থক তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? খবর তো দু-একদিন পরেই আসবে।

রোহিণী অপ্রস্তুত হ'ল, কিন্তু মন তার শান্ত হ'ল না। ভাবনার তার শেষ নেই—সংসারে অসম্ভব কি? গিন্নীর সঙ্গে রোহিণী আলোচনা করতে লাগল— বিনোদকে দেখলেই কিন্তু দুজনে চুপ করে যেত। শুনলে বিনোদ অসন্তুষ্ট হবে।

গিন্নী কথায় কথায় জিব কাটে। বলে—কি ভাবতে কি ভাবছি ঠাকুর, দোষ নিও না যেন। মেয়েটার যা হোক একটা হিল্লে হলেই হ'ল। আমরা গরীব বড় আশা তো করি নে!···

কিন্তু মনকে যতই চোখ ঠারুক রোহিণীর ভাবনা মোটেই কমত না,—সংসারে অসম্ভব কি?

অবস্থা কিন্তু সকলের চেয়ে শোচনীয় হ'ল উমার। রাতে সে ঘুমোত না। যদি বা একটু তন্দ্রা আসে, এমন সব স্বপ্ন দেখে যা শুনলে লোকে তাকে পাগল বলবে। উমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হ'ত। নিজেকে তার ভয়ানক পাপী মনে হ'ত। জানতে পারলে অলোকবাবু হয়ত তার মুখ দর্শন করবেন না। কিন্তু সেদিন তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন? উমা আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। কিন্তু আইবুড়ো মেয়ে সে, এ সব কি তার ভাবতে আছে?

দু-দিন আগে যে মেয়ের ভাববার কিছুই ছিল না, একটি বৃদ্ধ পাত্রের অসম্মতিতে যার চোখের জলের শেষ ছিল না, আজ তার ভাবনার শেষ নেই—স্বপ্নের শেষ নেই। উমা আজও বাসন মাজে, বাটনা বাটে, ঘর ঝাঁট দেয়—আজও সে এঁকে বেঁকেই চলে, হাসতে গেলে তার মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, তবু আজ স্বপ্ন দেখতে তার বাধে না। মুখের একটি কথায় স্বর্গ রচনা করা চলে আবার সেই একটি কথায় স্বর্গ ভেঙে যায়ও।·· মাটির বুকে বসে উমা দেখত আকাশের প্রশান্ত নীলিমা, সমুদ্রের উদার বিস্তৃতি। সে দেখত চাঁদের স্বপ্ন, যে চাঁদের কলঙ্ক নেই সেই চাঁদের!···

তারপর একদিন স্বপ্ন ভেঙে গেল। অলোক রোহিণীকে লিখে পাঠালো—আমাদের বৃদ্ধ সরকার রামলোচনবাবুর বড় ছেলেটি এবার বি-এ পাস করেছে। জেনে দেখলাম ঘরটর সবই ঠিক আছে। আপনার যদি ইচ্ছে থাকে, গোবর্দ্ধনের সঙ্গে উমার বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না—খরচ আমার মা-ই সব করবেন।

গোবর্দ্ধন পাত্রের নাম। গোবর্দ্ধনই হোক আর দুর্য্যোধনই হোক রোহিণীর আনন্দের শেষ নেই। উমার ভাগ্যে বি-এ পাস পাত্র—একি কম কথা! রোহিণীর কাছে উমার দাম বেড়ে গেল। বাবার কাছে সে আর বকুনি খায় না। রোহিণী বললো—হ্যাঁ ছেলে বটে ঐ অলোক—একেই বলে বড়লোকের ছেলে। বিমু, বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কোরো বাবা। দেখো যেন রেগে-মেগে ছেড়ে দিও না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, উমার চোখে আজকাল বাদল নেমেছে। বিয়ে ভেঙে গেলে যে মেয়ে কাঁদতো, বিয়ের ঠিক হবার পরও তার মুখে হাসি নেই। আশ্চর্য্য না? বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে হবে, বোধ হয় তাই! কিংবা হয়ত সেই বৃদ্ধ দ্বিতীয় পক্ষের ওপর তার মায়া পড়ে গেছে।

মা-ও মেয়ের সঙ্গে কাঁদে—এমন কি বাবার চোখেও জল আসে। এ রোহিণী যেন অন্য মানুষ। এখন রোহিণী বুঝছে, উমা সংসারের কতখানি ছিল।

ও-রকম প্রাণ দিয়ে বুড়ো বাবা-মা'র আর কে সেবা করবে?

কিন্তু উমা কাঁদে কেন? সব মেয়েই তো শ্বশুরবাড়ী যায়, তবে? উমা তো মানুষের সঙ্গে মেশেনি কোনদিন, তবে তার কান্নার সম্বল এল কোথা থেকে? তবে কি বরের 'গোবর্দ্ধন' নামটাই তার পছন্দ হয়নি? গরীবের ঘরের কুরূপা পঞ্চদশী অনূঢ়াও তাহ'লে স্বামী মনোনীত করবার স্পর্দ্ধা রাখে!

স্বামী নির্ব্বাচন না করুক তবু উমা আজ ভাবতে শিখেছে। সে ভাবে, কেন অলোক আসার আগেই সেই দ্বিতীয়পক্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায় নি? তার সে-ই ত ভাল ছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

দুইটি বাঙ্গালী যুবকের বীরত্ব—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হ্যারিসন রোডের সুপরিচিত দোকান ধর ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারীদ্বয়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ধর ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ধর যখন রাত্রে টাকা লইয়া দোকান হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন দুইটি মুসলমান গুণ্ডা তাঁহাদিগকে রিভলভার দেখাইয়া টাকা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। মণীন্দ্রবাবু তখনই ক্ষিপ্রহস্তে রিভলভারধারী লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। তখন দ্বিতীয় গুণ্ডা তাঁহাকে ছোরা মারিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যতীন্দ্র বাবু তাহাকে হঠাইয়া দেন। ইঁহারা দুইজনেই

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ধর

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ধর

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের আখড়ায় ব্যায়াম ও লড়াইয়ের কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আত্মরক্ষা—

বিগত জুলাই মাসে যখন কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বহু হিন্দু বাড়ী মুসলমান লুণ্ঠনকারিগণ বিনা বাধায় এবং নিঃসঙ্কোচে লুণ্ঠন করিয়া পাকুন্দিয়া ও হুসেনপুর থানার বহু হিন্দু অধিবাসীকে সর্ব্বস্বান্ত করে এবং যেদিন প্রাতে ৮টা ৯টার সময় জাঙ্গালিয়া গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীর লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটে, সেই দিনই কটিয়াদী থানার অধীন বানিয়াগ্রামের পিছন দিকে একটা জায়গায় প্রায় তিন চারি শত মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত নানাবিধ সাংঘাতিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া জমা হয় এবং বানিয়াগ্রাম লুণ্ঠনের চেষ্টা করে।

কিন্তু তাহারা সেই গ্রামের তালুকদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরীর উদ্যম ও নির্ভীকতার জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। দুর্ব্বৃত্তেরা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী

যখন বানিয়াগ্রামের নিকটে একটি মাত্র কনষ্টেবল ও জমাদারকে হটাইয়া গ্রামের ভিতর লইয়া আসে ঠিক সেই সময় সুরেন্দ্র বাবু খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে জমাদার তাঁহাকে গুলি ছাড়িতে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করিলে দুর্ব্বৃত্তেরা একটু হটিয়া যায়। কিন্তু তৎপর তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সুরেন্দ্র বাবু ও জমাদারের মাথা লইতেই হইবে ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন সুরেন্দ্র বাবু আরও কতকজন গ্রামবাসী এবং জমাদারকে সঙ্গে লইয়া গুলি ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হইতে থাকিলে লুণ্ঠনকারীরা তাহাদিগকে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলার চেষ্টা করে এবং বর্শা ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে পলাইতে বাধ্য হয়। তখন দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যে তিন জন ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া তাহারা সকলেই আসিয়া এক বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় দুর্ব্বৃত্তগণ পুনরায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ঐ বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিলে সুরেন্দ্র বাবু পুনরায় অগ্রসর হইয়া গুলি ছাড়িলে এবং তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলে দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করে। তখন পাট ক্ষেতের মধ্য হইতে আরও ছয় জন পলায়নকারী ধরা পড়ে। একমাত্র বন্দুক লইয়া এইরূপ অসমসাহসিকতার সহিত সুরেন্দ্র বাবু বাধা দিতে না পারিলে বানিয়াগ্রাম কেন, এই অঞ্চলের কোন হিন্দু বাড়ী রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী বড়দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন আগ্রায় হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সম্মিলনের সঠিক দিন পরে জ্ঞাত করা হইবে। পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই সম্মিলনে যোগদান করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ টাকা ও ছাত্রগণের জন্য ২৷৹ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সমাগত প্রতিনিধিবর্গের আহার ও বাসস্থানাদির যথাসম্ভব ব্যবস্থা অভ্যর্থনাসমিতি করিবেন।

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব—

গত ১৩ই আগষ্ট, ১৩৩০, শ্রীমান সারদাপ্রসাদ সিংহ বাংলা সরকারের প্রদত্ত, বিদেশে শিল্পশিক্ষার্থ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা
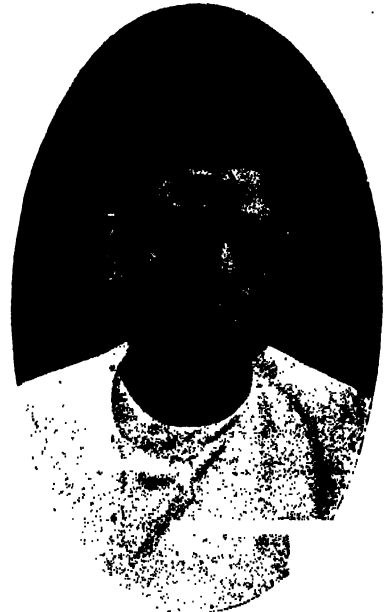
শ্রীসারদাপ্রসাদ সিংহ

করেন। তিনি ১৯২৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এস-সি পরীক্ষা যশের সহিত পাস করেন। অতঃপর সারদাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। এই সময়ে স্বীয় মেধার পরিচয় দিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলা সরকার আলোচ্য বর্ষে বিলাতে "ওয়াটার প্রুফ্ প্রস্তুত প্রণালী" শিক্ষার জন্ম যে বৃত্তি ঘোষণা করেন, তজ্জন্ম সাতজন প্রার্থী সিলেক্‌সন্ বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হন। উক্ত সাতজনের মধ্যে শ্রীমান্ সারদাপ্রসাদ প্রথম স্থান অধিকার করায় সরকারের মনোনীত প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হন। বিজ্ঞান-কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি "বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস" এ শিক্ষালাভ করিয়া ঐ শিল্প সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি বর্ত্তমানে লণ্ডনের "নর্থ লণ্ডন পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিউট" নামক প্রসিদ্ধ শিল্প শিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং মাসিক ২৭০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছেন।

খদ্দর প্রসঙ্গ—

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকলের দৃষ্টিই খাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। খাদির চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত পরিমাণ মাল এখন হঠাৎ দেশে উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। অবশ্য এরূপ চাহিদা দীর্ঘ দিন ধরিয়া থাকিলে উৎপন্ন মালের পরিমাণও খুব বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু হঠাৎ চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় বাজারে বিস্তর ভেজাল মাল আমদানী হইয়াছে। ইহাও আবার নানা শ্রেণীর। কতকগুলি জাপানী ও দেশী মিলের তথাকথিত খাদি পুরাপুরি মিলের মোটা সুতা ও কলের তাঁতের তৈয়ারী। বড়বাজারে এইরূপ খাদিই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া একদিকে মিলের সুতা ও একদিকে চরকার সুতার খাদিও কম নহে। বস্ত্রবয়ন-শিল্পকে পুরাপুরিভাবে কুটীর-শিল্পে পরিণত করিয়া যাহাতে লক্ষ লক্ষ কুটীরবাসীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে ইহাও বর্ত্তমান খাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কলকারখানার দ্বারাও কিছু কুলী-মজুর প্রতিপালিত হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেখানে যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া শ্রমিককে কাজ করিতে হয় তাহাতে শরীর, মন ও নৈতিক চরিত্রের ভয়াবহ অধোগতি ঘটিয়া থাকে। খাদির প্রচলন হইলে শ্রমিকগণ উহা হইতে রক্ষা পাইবে। বর্ত্তমান সময়ে কল চালাইয়া বড় বড় ধনীগণই লাভের বড় অংশ আত্মসাৎ করিতেছেন; খাদির বহুল প্রচলনের দ্বারা ঐ টাকা দরিদ্রের হাতে আসিবে।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলার উৎপন্ন খাদির প্রায় শতকরা নব্বই ভাগই চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি গ্রামে উৎপন্ন হইতেছে। খাদি-উৎপাদক একটি গ্রামেই আমার বাড়ী। আমি স্বচক্ষেই দেখিতেছি গ্রামের দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা চরকা কাটিয়া মাসে চার-পাঁচ টাকা এবং তাঁত বুনিয়া মাসে ১৫।২০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। অবশ্য গ্রাম্য-লোকেরা তাহাদের প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর কাজের অবসরেই চরখা কাটা ও তাঁতের কাজ করিতেছে। সুতরাং সুতা কাটা ও তাঁত বোনা পল্লীর দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কত উপকারী কাজ তাহা সকলেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধী স্থাপিত অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনাস এসোসিয়েশন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশুদ্ধ খাদি উৎপন্ন করিবার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ইহারা একদিকে অন্ধ্র প্রদেশের মসলিপটমে সূক্ষ্ম সুতার ও উৎকৃষ্ট রঙের ছাপা বিশিষ্ট কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন, অপর দিকে কাশ্মীর ও আসাম কেন্দ্রে পশমী ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশুদ্ধ খাদি উৎপন্নকারী কেন্দ্রগুলির নাম দেওয়া হইল। ইহার যে-কোনও কেন্দ্রে পত্র লিখিলেই নমুনা ও মূল্য-তালিকা পাওয়া যাইবে। "খাদি গাইড" নামক পুস্তকে সমগ্র ভারতের খদ্দর-শিল্পের বিবরণ পাওয়া যাইবে, মূল্য ১৲। প্রাপ্তিস্থান "All-India Spinners' Association, Mirzapur, Ahmedabad, Bombay Presidency.

কাশ্মীর কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট পশমী শাল, আলোয়ান, টুইড, পট্টু, কোটের থান ও কম্বল প্রস্তুত হয়। ইহার সমস্ত সুতাই স্থানীয় পশম হইতে চরখায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলের সুতা নহে।

কাশ্মীর:—(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন, কাশ্মীর শাখা, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

(খ) কাশ্মীর স্বদেশী ষ্টোরস্, শ্রীনগর।

পঞ্জাব:—(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন—আদমপুর, দোয়াবা, সেণ্ট্রল ষ্টোর্স, জলন্ধর জেলা, পঞ্জাব।

(খ) লালা হামা রাজ দীননাথ—বুলালা, ভায়া বিয়াস, পঞ্জাব।

যুক্ত প্রদেশ:—(ক) গান্ধী আশ্রম, মিরাট।

(খ) চিরঞ্জিলাল প্যারীলাল—হাপুর, মিরাট।

(গ) শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার—ধামপুর, বিজনোর জেলা।

রাজস্থান:—(ক) অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোশিয়েশন, রাজস্থান শাখা, জোহারি বাজার, জয়পুর সিটি। এখানে দোসুতি সার্ট ও কোটের থান পাওয়া যায়।

(খ) মদন খাদি কুটীর—করোলি, রাজপুতানা। এখানে বিশেষভাবে ধুতি, সার্ট ও কোটের থান পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি:—(ক) অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন টামিল নাড়ু ব্রাঞ্চ, টিরুপুর, এস, আই রেলওয়ে।

(খ) কাজু খদ্দর কোম্পানী লিমিটেড, টিরুপুর।

(গ) অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন, কাইন খাদি ডিপো, চিকাকোল, বি, এন, রেলওয়ে।

(ঘ) অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন, অন্ধ্র শাখা, মাসুলিপটম্। এখানে উৎকৃষ্ট ছাপবিশিষ্ট খাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজে সূক্ষ্ম সুতার ও উৎকৃষ্ট ছাপের খাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিহার ও উড়িষ্যা:—(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন বিহার শাখা, মজফরপুর।

(খ) গান্ধী কুটীর—মধুবনী, দারভাঙ্গা।

বিহারে সস্তায় চরকার সুতা পাওয়া যায়।

আসাম:—(ক) ইন্দ্রসেন পাঠক—বরপেটা, আসাম।

এখানে এণ্ডি, মুগা ও তসর পাওয়া যাইবে। এই দোকান অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের অনুমোদিত।

বঙ্গদেশ:—(ক) শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার, ১৩২।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খদ্দর পাওয়া যাইবে।

(খ) খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

(গ) অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

(ঘ) খাদি মণ্ডল (ফেনী)। ঐ

(ঙ) প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ (চন্দননগর)। ঐ

(চ) বিদ্যাশ্রম (শ্রীহট্ট)। ঐ

ঠিক কত বিশুদ্ধ খাদি বৎসরে তৈয়ারী হয় বলা শক্ত; তবে যদি বলি যে সম্প্রতি বাৎসরিক অন্ততঃ এক কোটি টাকার খাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

[আলোচনা—

কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ তাঁহার "ভারতে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনের প্রথমযুগ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "—তাহার নাম এণ্টারপ্রাইজ। উহা দুইখানি ষাট-অশ্বশক্তির এঞ্জিন সংযোজিত একখানি ৫০০ টন ভারবাহী জাহাজ—উহা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট ফলমাউথ হইতে ছাড়িয়া ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌঁছে। উহা আসিতে ১৩০ দিন লাগিয়াছিল।" কিন্তু Cecil L. Burns সম্পাদিত 'Victoria and Albert Museum—Bombay, Catalogue of Prints of Old Bombay" নামক পুস্তকে *Enterprize* সম্বন্ধে লিখিত আছে :—"She was built at Deptford and was of 470 tons burden. She started under the command of Captain Johnson on August 16th, 1825 and after a vayage of 113 days reached Calcutta."

অপর স্থানে সেমিরেমিস, বেরেনিস ও জেনোবিয়া নামক তিনখানি জাহাজের উল্লেখ করিয়া শেঠ মহাশয় লিখিয়াছেন—"উহারা প্রায় ৫৬০ টন ভারবাহী" কিন্তু উক্ত ক্যাটালগে আছে—"The Semiramis was built in 1842 with a tonnage of 031..."

সুতরাং হরিহর বাবু কোথা হইতে উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন বুঝিলাম না।

শ্রীসুধীরকুমার বসু

সংকীর্ত্তন—একটি প্রাচীন পট
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সুতাহাটার গ্রামবাসীরা লবণ প্রস্তুত করিতেছে

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আমার "বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত পড়িলাম, কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমার আলোচনা-পদ্ধতি ও মোহিত বাবুর আলোচনা-পদ্ধতিতে এত বড় একটা তফাৎ রহিয়াছে যে তাঁহার পক্ষে আমার কথা বোঝা এবং আমার পক্ষে তাঁহার কথা বোঝা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে দুরূহ। পীড়িত শিশুকে মাতা ও চিকিৎসক এক চক্ষে দেখিতে পারে না। বাংলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা যে সুস্থতা বা সবলতা কিছুরই পরিচায়ক নয়, একথা আমি যতটুকু জানি তাহার অপেক্ষাও ভাল করিয়া জানেন মোহিত-বাবু। তবুও যদি তিনি বাংলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কার কারণ না দেখেন, তবে তাহার জন্ত দায়ী করিব তাঁহার অকুতোভয় স্বভাষা-প্রেমকে, আমার উনবিংশ-শতাব্দী-সুলভ মাতৃভাষা বিদ্বেষকে নয়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমাদের স্বভাষা-প্রেম বা স্বভাষা-বিদ্বেষের উল্লেখ কি নিতান্তই অবান্তর নয়? স্পেন ও ফ্রান্সে আইবেরিয়ান ও সেল্টদের স্বভাষা-প্রেম লাটিন গোষ্ঠীর ভাষাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, এ-যুগেও আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের অত্যুগ্র আইরিশ জাতীয়তা গেলিককে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই কথাটা আশা-আকাঙ্ক্ষার নয়—বাংলা ভাষার গতি ও ধারার বিচার-বিশ্লেষণের। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি, একটা struggle for existence চলিয়াছে। একটি ভাষা কোন্ কারণে পরাজিত হয়, আর একটি ভাষা কেনই বা জয় লাভ করে, তাহার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এ-যুগে বাঙালী জাতি যে ভাষা-সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে বাংলা গোষ্ঠীর ভাষাগুলির কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা, আমি তাহারই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সে আলোচনায় আমার আশা-নিরাশার উল্লেখ করিবার কোনও স্থান ছিল না, তাই সেদিক হইতে আমি কিছু বলিতে পারি নাই; নহিলে মোহিত বাবু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ-কথাটা বলিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, যে, ভাগীরথ সভ্যতার [?] সংস্পর্শবর্জ্জিত, প্রত্যন্তবাসী এবং শকুন্ত-ভাষাভাষী বাঙ্গালী হইলেও বাংলা গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে অবলম্বন করিয়া একটা বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠুক এবং সে-ভাষা সব দিক হইতে সুসমৃদ্ধ হউক, ইহা আমিও কামনা করি।

আমার মূল প্রবন্ধে আমি বাংলা ভাষার সুযোগ-সুবিধা বাধা বিঘ্নের একটি খতিয়ান লইতে চাহিয়াছি। বিষয়টি এত বড় যে, উহার যে কোন একটি দিক লইয়া এক একটি বড় প্রবন্ধ, এমন কি গ্রন্থ, লেখা চলে। আমি শুধু সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। উহার প্রত্যেকটি কথা ও খুঁটিনাটি উক্তি লইয়া উত্তরপ্রত্যুত্তর চলে না,—কারণ, তাহার জন্ত মাসিক-পত্রে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। মোহিতবাবুর আলোচনারও বিশদ প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব মাত্র।—

[ক] মূল আলোচনার অনেকটাই কথ্যভাষা, সাধুভাষা, ও উপভাষার সম্বন্ধ লইয়া। এ-বিষয়ে মূল প্রবন্ধে বার বার 'কথ্য' ও 'সাধু' এই শব্দ দুইটির ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি না করায়, পাঠক-সাধারণের ধাঁধা থাকিয়া যাইতে পারে। তাই আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি:—

(১) কথ্য ভাষা মানুষের প্রাণের ভাষা, সাহিত্য মানুষের প্রাণের বা মনের সৃষ্টি, তাই সাহিত্যের ভাষা 'লেখা' ভাষা হয় না, তাহা স্বাভাবিক কথ্যভাষা হয়। 'ভাষাকে' প্রাকৃত ব্যাপারের জন্ত দূরে সরাইয়া রাখিয়া সাহিত্যিক কাজে 'সংস্কৃত' অর্থাৎ সাধুভাষা প্রয়োগ করার একটা সনাতন রীতি আমাদের জাতের প্রায় মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সেই কারণেই আমরা ভাবি, যে, সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার তফাৎ স্বাভাবিক। অন্ত কোনও বড় ভাষা ও বড় সাহিত্যের সম্পর্কে এই কথা খাটে কিনা তাহা আমার জানা নাই। বলা বাহুল্য, 'isn't, don't কে is not, do not লেখা এবং 'গেলুম', 'শুনেছিলুম'কে 'গিয়াছিলাম' 'শুনিয়াছিলাম' লেখা এক জাতীয় বৈষম্য নয়। প্রথমে শ্রেণীতে তফাৎ বর্ণ সঙ্কোচের, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তফাৎ ব্যাকরণগত রূপের। মোহিতবাবু যে বলিয়াছেন, বাংলা গোষ্ঠীর কোনও একটি 'উপভাষার কথ্য রূপটিই সাহিত্যিক রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে'—এ কথা এখনও বলা চলে না। সত্যই কি 'সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাদ-বিসম্বাদ, রাগ-দ্বেষ প্রকাশ করিবার একটি ভদ্র জাতীয় ভাষা লাভ করিয়াছেন?' মোহিতবাবুর কথাতেই উহার উত্তর পাইতেছি—'এখনও ঠিক তাহা হইতেছে না।'

(২) 'শকুন্ত ভাষার' আক্রমণ যে কত প্রচণ্ড তাহা 'ভাগীরথ-কৃষ্টির' কর্ষক সাহিত্যিকদের বাংলা লেখা হইতে উদ্ধার করিতে পারি—এখানে স্থানাভাব। শকুন্ত-ভাষা-ভাষীগণ যে কত গোঁড়া তাহা মোহিতবাবু স্বয়ং জানেন, এবং তাঁহাদের এ গোঁড়ামি যে কত জীবন্ত কালীঘাট অঞ্চলে পদার্পণ করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ভাগীরথীর কূলে বসবাসের পরেও অতিশয় কৃষ্টিশালী পরিবার কথার টানে, জোরে ও ভাষার রূপে পদ্মাপারের উপভাষাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন—ইহা নিতান্ত সাধারণ জিনিষ।

(৩) কেন ভাগীরথী কূলের ভাষা বাংলাদেশের উপভাষা-ভাষীদের সম্পূর্ণ জয় করিতে পারিল না? তাহার অন্যতম কারণ—

আমাদের দেশেও টেম্‌স্‌ কূলের ভাষাই সেই কাজে বাহির হইয়াছে এবং এ-কাজ এমনভাবে সারিতেছে, যে, উপভাষা-ভাষী ঘরে নিজ ভাষা কহিয়া বাহিরে টেম্‌স্‌-কূলের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী তীরের [ইডিয়ম্‌ নয়, সুর নয়, কিংবা জোর নয়] দুয়েকটি শব্দ ও রূপের মিশাল দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছু করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না; তাই, ইংরেজ মাত্রই যেমন ইংরেজী standard কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীমাত্রই তেমন কোনও একটি standard কথ্য-ভাষা শেখেন না, শিখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না; তাই আমাদের দেশে একটা standard কথ্য বাংলা গড়িয়া না উঠিয়া একটা নব্য উর্দ্দুর সৃষ্টি হইতেছে। এই বাংলা-বিজয়ী নব্য উর্দ্দু ভাগীরথী কূলের হলবাহকদেরও ঠিক পদ্মাপারের শকুন্তদের মতই পরাজিত করিয়াছে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে—শিক্ষিত পরিবারের [স্কুল-কলেজে শিক্ষিতা নহেন] গৃহিণীর ঘর-কন্নার কথাবার্ত্তা হইতে, শিক্ষিত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যালোচনা হইতে, নেতৃস্থানীয় মহাজনের রাষ্ট্রীয় আলোচনা হইতে। ছাপার অক্ষরে অবশ্য (সকলে না হইলেও) অনেকেই সাবধান; কারণ, লেখা কৃত্রিম ['সাধু'] করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাও হয়ত কিছুদিন পরে আর টিকিবে না। মোহিতবাবু দেখিতে পাইবেন যে, গত কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনাংশের ৭৩ পৃষ্ঠায় একটি খাঁটি বাঙ্গালী সাহিত্যিক একখানি খাঁটি বাংলা উপন্যাসের ৪টি বাক্যে (৩৫টি শব্দে) প্রশংসা করিয়াছেন—ইহাতে তিনি ৪টি ইংরেজী শব্দের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও একটি বাক্যে ইংরেজী বাক্যভঙ্গীর সুস্পষ্ট প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন। এই বাক্যচতুষ্টয়ের লেখক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত—তিনি কবিবর শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার।

(৪) 'মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে ভাবিবার আছে'—মোহিতবাবু এই কবুলমাত্র করিয়াই আলোচনাটা এড়াইতে চাহেন; আমি তাহা চাহি না। কি করিয়া একই হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দীতে ও প্রায় পরদেশীয় উর্দ্দুতে বিবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা ভুলিতে পারি না। কেন সিন্ধুতীরে উর্দ্দু বিজয়ী হইয়াছে, কেন কাশ্মীরে, পঞ্জাবে ঐ ফারসী জবান মিশ্রিত বুলি শিকড় গাড়িয়াছে, কেন হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা হইয়াও পরলোকগত মনীষী লালা লাজপত রায় প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্তও লিখিবার সময়ে উর্দ্দু ভিন্ন তাঁহার মাতৃভাষা পঞ্জাবী, বা হিন্দী ব্যবহার করিতেন না, তাহা আমি স্মরণে রাখিতেছি। এই দিকে শতকরা পঞ্চান্ন জন বাঙ্গালী মুসলমানের ঝোঁক এবং এদেশে অবাঙ্গালী হিন্দুস্থানীর প্রভাবও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(৫) হিন্দুস্থানী-অঞ্চলের প্রভাব বহুকাল হইতে বাঙ্গালাকে প্রাদেশিক করিয়া রাখিয়াছে, ও ভবিষ্যতেও হয়ত রাখিবে। যাঁহারা বাঙ্গালীর স্বাজাত্য [উপজাত্য ?] বোধের ভবিষ্যতে আস্থাবান্‌ তাঁহাদিগকে এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস, হিন্দুস্থানী-ভাষীরা এই যুগে বাংলা দেশে যে পরিমাণে ভিড় করিতেছে তাহাতে তাহারা নিজেদের ভাষার দ্বারা আমাদের প্রভাবান্বিত করিবেই। সে প্রভাব আজই প্রত্যক্ষ—সাধু ভাষার নয়, বাংলা কথ্য ভাষায়, বিশেষ করিয়া ভাগীরথী কূলের ভাষায়। গ্রাম্য হিন্দী শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের আশ্রয়ে সে অঞ্চলের উপভাষায় বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গের কোনও সহরে বা গ্রামে এখনও হিন্দুস্থানী বলিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে, পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, রিক্‌সাতে-ট্যাক্‌সিতে, ও হালে মুদি দোকানে ও খাবারের দোকানে, যে অপূর্ব্ব বস্তুর আশ্রয় লইতে হয়, ঠিক তাহারই সাহায্যে বঙ্কিমের জন্মভূমির অদূরস্থ একটি পল্লীর ভদ্রগৃহস্থকে পরিচিত পশ্চিমা পথযাত্রীর সহিত আলাপ করিতে শুনিয়াছিলাম। পল্লীটির নাম মোহিতবাবু নিশ্চয় শুনিয়াছেন—সে নাম কাঁচড়াপাড়া।

[খ] এখন বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'একটি মাত্র কথা বলিব। সে বৈশিষ্ট্য সর্ব্ববাদিস্বীকৃত; তবে উহা লইয়া পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালী কোনদিন উচ্চ কোলাহল করেন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের এই তথাকথিত বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের আর্য্যসভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার অক্ষমতার ফল মাত্র। বাল্কান পেনিনসুলার অর্দ্ধসভ্য দেশগুলি যে অর্থে ইয়ুরোপ হইতে স্বতন্ত্র, বাংলা দেশও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সেই অর্থেই স্বতন্ত্র। উহা আর্য্যসভ্যতার অনাবাদি ও অর্দ্ধ-আবাদি জঙ্গলমাত্র। সুতরাং পূর্ব্বযুগের বাঙালীরা আর্য্য আচার পদ্ধতিকেই বেশী শ্রদ্ধা করিতেন। নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙ্গালী গর্ব্ব করিতেছে সেইদিন হইতে, যে-দিন হইতে এই বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস সুরু হইয়াছে, যে-দিন সে ধারকরা ইংরেজীশিক্ষায় হঠাৎ শিক্ষিত হইয়াছে ও যেদিন তাহার বৈশিষ্ট্যের শিখাচ্ছেদ হইয়াছে। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য লইয়া পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালীর হয়ত লজ্জাবোধ করিবার সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার middleman হইয়া এ-যুগের বাঙ্গালীর বড়াই করিবার মত কিছুই দেখিতেছি না।

[গ] আমার শেষ বক্তব্য বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে। গত অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পরিমাণে না হউক উৎকর্ষে হয়ত নগণ্য নয়। কিন্তু আবার জানিতে চাহি,—পৃথিবীর জীবন্ত ভাষাগুলির তৎকালীন সাহিত্য কি তদপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর? 'জাতির জীবনোল্লাসের ফলে'—নূতন সভ্যতার সজ্ঘাতে—উহার সৃষ্টি; কিন্তু জাতির জীবনোল্লাস আজ যে খাদে প্রবাহিত বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিধারা যে তাহা হইতে অনেক অনেক দূরে।

আমার সিদ্ধান্ত কয়টিতে আশা বা আকাঙ্ক্ষা এ-দুয়ের কোন কথাই নাই—কারণ উহা নিতান্তই বর্ত্তমান বাংলা ভাষার খতিয়ান মাত্র।

শ্রীগোপাল হালদার
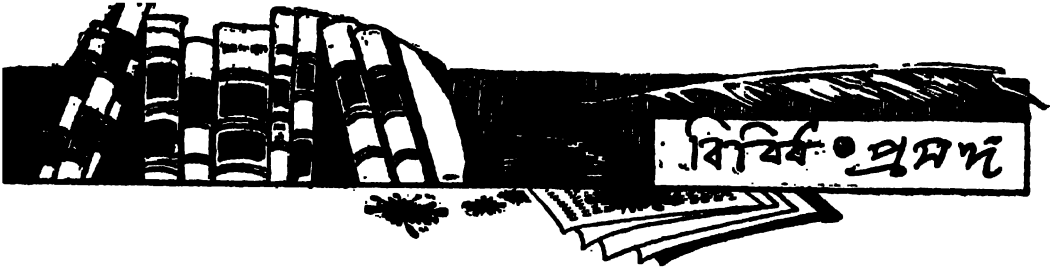
"ভয়োৎপাদন নীতির সহসা আবির্ভাব"

জেলসমূহের ইনস্পেক্টর-জেনার‍্যাল সিমসন সাহেব ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় নিহত হন। তিনি বড় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ইংরেজ ছিলেন। সুতরাং এই গর্হিত হত্যাকাণ্ডের সংবাদ স্বভাবতই তৎক্ষণাৎ বিলাতে পৌঁছিতে দেরি হয় নাই। ৯ই বিলাতী কাগজে এবিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে। ঢাকাতে অনেক সপ্তাহ ধরিয়া অরাজকতা অপেক্ষা অধম অবস্থা বিদ্যমান থাকায় যে অনেক গৃহদাহ, নরহত্যা, জখম ও লুটপাট হইয়াছিল, তাহার খবর এখনও ভাল করিয়া বিলাতী কাগজে বাহির হয় নাই এবং বিলাতী কাগজগুলা অনেক বিলম্বেও এই ভীষণ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না বলায় তৎকালে বিলাতপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পেক্টেটর কাগজে তাহাদের এই নৈর্বাক্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতকটা ঢাকার মত অবস্থা বাংলা দেশে কিশোরগঞ্জ মহকুমায়, সিন্ধুদেশে সক্কর প্রভৃতি স্থানে, এবং পেশাওয়ারে হইয়াছিল। তাহাতেও বিলাতী সম্পাদকদের টনক নড়ে নাই। বিদেশী ভিন্নধর্ম্মী অশ্বেতকায় পরাধীন লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের লোকদের ঔদাসীন্য আছে বলিয়া তাহাদের স্বদেশী সধর্ম্মী শ্বেতকায় লোকদের সম্বন্ধেও ঔদাসীন্য থাকিবে, আমরা এরূপ আশা করি না। সেরূপ ঔদাসীন্য স্বাভাবিক হইত না। তাহা যে নাই, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে এক জন ইংরেজের গায়ে আঁচড় লাগিলে যে তাহার স্বদেশবাসী ইংরেজদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, ইহা স্বাভাবিক ও ভালই। তবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভিন্নধর্ম্মী অশ্বেতকায় পরাধীন লোকদের গায়ে আঁচড়ের চেয়ে বেশী কিছু লাগিলে যদি ইংরেজদের হৃদয়ে একটু চিন্তার ছায়াও পড়িত, তাহা হইলে আমরা তাহাদের প্রশংসা করিতে পারিতাম; এবং কোথাও আমাদের স্বদেশী কাহারও অপমান, লাঞ্ছনা, প্রাণবধ ঘটিলে যদি আমাদের প্রাণে সামান্য একটুও ঘা লাগিত তাহা হইলে সন্তোষের বিষয় হইত।

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান কাগজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য ও ন্যায্য কথা কিছু বলিত। এখনও বলে, তবে আগেকার চেয়ে কম। সেই কাগজে সিমসন সাহেবের হত্যাসম্বন্ধে ৯ই ডিসেম্বর যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার নিম্নমুদ্রিত চুম্বক ৯ই ডিসেম্বরই রয়টার ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছে :—

The *Manchester Guardian* in its editorial deplores the outburst of terrorism in India at present "when the Round Table Conference is working and the method of discussion and compromise is revealing the possibilities of harmonious settlement of the Indian problem before unthought of." The *Guardian* says that the argument will be used that the murder of Mr. Simpson shows dramatically the necessity for law and order remaining in British hands, but actually it has no bearing on the general problem of India. As long as the Nationalist India has the sense of grievance, the methods of terrorism are liable to be used, whoever may be responsible for law and order. Fanatic excesses can best be cured by reasonableness and moderation. Injustice is the lifeblood of terrorism and the work of the Round Table Conference is to put an end to injustice."—*Reuter.*

তাৎপর্য্য। "যখন গোল টেবিল বৈঠক কাজ করিতেছে এবং যখন আলোচনা ও রফার পদ্ধতি ভারতীয় সমস্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসার অচিন্তিতপূর্ব্ব সম্ভাবনাসমূহ প্রকটিত করিতেছে, তখন ভারতবর্ষে ভয়োৎপাদন নীতির সহসা আবির্ভাবে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। গার্ডিয়ান বলিতেছে, যে, সিমসন সাহেবের হত্যা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ব্রিটিশ হস্তে রাখিবার আবশ্যকতা নাটকীয়

ভাবে প্রদর্শন করিতেছে এই যুক্তি ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহার সহিত ভারতবর্ষের সাধারণ সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী যে-ই থাকুক, জাতীয় অভিযোগের কারণ আছে এই বিশ্বাস যতদিন স্বাজাতিক ভারতবর্ষের থাকিবে, ততদিনই ভয়োৎপাদকদের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। সুযুক্তি ও সুবিবেচনা ও মিতব্যবহার উৎকট রাজনৈতিক উন্মাদজনিত অত্যাচারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অবিচার ভয়োৎপাদন নীতির প্রাণশোণিত (অর্থাৎ, অবিচার থাকিলে ভয়োৎপাদন নীতিও থাকে; কিন্তু যেখানে অবিচার নাই, সেখানে ভয়োৎপাদন নীতি নাই —সেখানে বিপ্লবীরা ভয়োৎপাদনের জন্য প্রাণবধ করে না), এবং গোল টেবিল বৈঠকের কাজই হইতেছে অবিচারের লয় সাধন করা।"

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মন্তব্য যে রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, তাহার সহিত আমাদের অনৈক্য নাই। তবে অন্য দু-একটা বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই।

যে-সব দেশে ব্যক্তিবিশেষের একচ্ছত্র রাজত্ব, যথায় তাহার ইচ্ছাই আইন, কিম্বা যে-সব পরাধীন দেশে আমলাতন্ত্র বিদ্যমান এবং কার্য্যতঃ প্রধান আমলাদের ইচ্ছাই আইন, সেই সকল দেশে বেসরকারী কোন কোন লোক গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপনার্থ,অথবা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত, কিম্বা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতিহিংসার জন্য সরকারী লোকদিগকে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করিলে সরকারী লোকেরা তাহাকে টেরারিজ্‌ম্ বা ভয়োৎপাদন নীতি এবং যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে টেরারিষ্ট বা ভয়োৎপাদক বলিয়া থাকে। এইরূপ নামকরণ সত্যমূলক। কিন্তু ঐ সব সরকারী লোকেরা ভুলিয়া যায় কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই এই সত্য গোপন করে, যে, পূর্ব্ববর্ণিত দেশসমূহে সরকারী লোকেরাও ভয়োৎপাদন নীতিতে বিশ্বাস করে এবং তাহারাও ভয়োৎপাদক। তাহারাও ভয়োৎপাদক বলিয়াই, ভারতবর্ষের সব প্রদেশে যেখানে গ্রেপ্তার করিলেই নির্ব্বিবাদে অসহযোগীরা জেলে যাইত, সেখানেও লাঠি দ্বারা বেদম প্রহার চলিয়াছে ও গুলি বর্ষিত হইয়াছে এবং তাহাতে অনেক বেসরকারী লোক হত ও আহত হইয়াছে; যেখানে রাজস্ব আদায়ের জন্য অসহযোগীদের তুল্যমূল্যের জিনিষ ক্রোক ও নিলাম করিলেই চলিত, সেখানে তাহাদের ঘরবাড়ী ধানের গোলা শস্যক্ষেত্র লুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে নারীদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই চলিত সেখানে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বাড়ী হইতে দূরে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বা প্রহার করা হইয়াছে; যেখানে নারী-দিগকে গ্রেপ্তার করিলেই চলিত সেখানে কোথাও কোথাও তাঁহাদের লজ্জাশীলতার হানি ও অন্য অত্যাচার হইয়াছে, ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতায় অজিতনাথের প্রাণবধ এবং ঢাকায় লোম্যান সাহেবের হত্যাকারীকে খুঁজিতে গিয়া মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসে তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার, টেরারিজম্ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই-সব ব্যাপার মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, টেরারিজ-মের আউটবার্ষ্ট বা হঠাৎ আবির্ভাব হয় নাই, গোল টেবিল বৈঠক আরম্ভ হইবার আগে হইতে সরকারী লোকদের দ্বারা ইহা চলিয়া আসিতেছে এবং গোল টেবিল বৈঠক আরম্ভ হইবার প্রাক্‌কাল হইতে এপর্য্যন্ত সরকারী লোকদের টেরারিজম্ ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার দল বিশ্বাস করেন না, যে, সরকারী লোকদের ভয়োৎপাদন নীতির জবাব, প্রতিশোধ বা প্রতিকার স্বরূপ বেসরকারী লোকদেরও ভয়োৎপাদন নীতি অবলম্বন করা উচিত। তাঁহাদের বিশ্বাস ও আচরণ ঠিক্ ইহার বিপরীত। তাঁহারা কোন প্রকার প্রতিশোধ না দিয়া সকল অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত এবং সহ্য করিতেছেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীদের প্রাণবধ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার সম্ভাব্যতায় বা এরূপ কাজের ঔচিত্যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, আমরাও করি না। এরূপ কাজ দ্বারা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টারও বিঘ্ন জন্মে। এবিষয়ে আগে আগে অনেক কথা লিখিয়াছি; পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

গোল টেবিল বৈঠকটাকে আমরা একটা ফাঁদ ও প্রহসন মনে করি। তথাপি ইহা ঠিক্, যে, যখন কতকগুলি

ভারতীয় লোক ভারতবর্ষের প্রতিনিধি না হইলেও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বিলাতে গিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কাজে কোন বিঘ্ন বাধা না জন্মান উচিত। কিন্তু এই বাধাবিঘ্ন বে-সরকারী টেরারিজম্ দ্বারাই জন্মে, সরকারী লোকদের টেরারিজম্ দ্বারা জন্মে না, এরূপ মনে করিবার কারণ কি আছে জানিতে ইচ্ছা করি।

—

ডাক্তার সিমসনের হত্যার জন্য দায়িত্ব

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ব্রিটিশ হস্তে থাকা উচিত, ডাঃ সিমসনের হত্যা ইহাই প্রমাণ করিতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান এই যুক্তি সঙ্গত মনে করেন না। কেন করেন না, তাহা ঐ কাগজের সম্পাদক বলেন নাই।

যখনই ভারতবর্ষে একটা "ধর্ম্ম"-দাঙ্গা বা কোন অরাজকতা বা লুটপাট ঘটে, বা কোন ইংরেজ খুন হয়, তখনই চরমপন্থী জবরদস্ত বাদশাহের দোস্ত ইংরেজরা বলে বটে, যে, ঐ সব ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয়, যে, ভারতবর্ষে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ইংরেজদের হাতে থাকা উচিত। এই-সব লোকেরা হয় আহম্মক নতুবা সত্য গোপন করিতে চায়। তাহারা ভুলিয়া যায় কিম্বা গোপন করিতে চায়, যে, এই সব ঘটনা ইংরেজরা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক থাকা কালেই ঘটিতেছে। সুতরাং তর্ক-শাস্ত্র অনুসারে কথা বলিতে গেলে জিনিষটি দাঁড়ায় এইরূপ :—

"ধর্ম্ম"-দাঙ্গা, অরাজকতা, লুট পাট এবং ইংরেজ ও দেশী সরকারী কর্ম্মচারী খুন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হাতে থাকা কালেই ঘটিতেছে; অতএব অন্ততঃ পরীক্ষা হিসাবেও দেখা উচিত এসব বিষয়ে প্রভুত্ব দেশী লোকদের হাতে গেলে অরাজকতা, দাঙ্গা, লুট-পাট, সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা লোপ পায় কি না, কিম্বা অন্ততঃ কমে কি না।

বড়লাট লর্ড আরুইন এবং অনেক প্রাদেশিক গবর্ণর পুলিসের কার্য্যদক্ষতার এবং সংযম ও সাধুতার মুগ্ধ এবং তাহার প্রশংসায় শতমুখ। আমরা এরূপ প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু সে কথা থাক্। সিমসন সাহেবের হত্যা পুলিসের শৈথিল্যের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেন, তাহা বলিতেছি। দেশের নানা জায়গায় অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশ্য খবরের কাগজে যত বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে অল্প-বয়স্ক লোকদের মন উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া আছে। যে-সব ছোট ছোট কাগজ গুপ্তভাবে (কতক সরকারী ডাকঘরেরই সাহায্যে !) প্রচারিত হয়, তাহাতে আরও গুরুতর অত্যাচারের কাহিনী ও অভিযোগ থাকে। লোকের মুখে মুখে যাহা ছড়ায় তাহা ভীষণতম। অনেক লোকের উত্তেজিত মানসিক অবস্থার কারণ এই-সব সংবাদ ও গুজব। সেগুলা খাঁটি সত্য বা মিথ্যা তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রকাশ্য খবরের কাগজের ও গুপ্ত সংবাদ-পত্রের প্রচার যদি-বা বন্ধ করা যায় বা কমান যায়, গুজব বন্ধ করিতে পারেন, এমন শক্তিমান লোক এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, সে-কথা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা বলিতেছিলাম, অনেকের মন উত্তেজিত অবস্থায় আছে। তাহার ফলে অল্প দিন পূর্ব্বে লোম্যান সাহেবের প্রাণনাশ হয়, এবং স্যর চার্লস্ টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। জেলের বাহিরে ও জেলের ভিতরে পুলিসের ও জেলবিভাগের লোকদের দ্বারা অত্যাচারের যত সংবাদ বাহির হয় তাহা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অনেকে—বিশেষতঃ উত্তেজনাপ্রবণ অল্পবয়স্ক লোকেরা—তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় পুলিস ও জেলবিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য তাঁহাদের জন্য গুপ্ত রক্ষীর বন্দোবস্ত করা পুলিস বিভাগের একান্ত কর্ত্তব্য। সিমসন সাহেবের সম্বন্ধে এই কর্ত্তব্য পালিত না-হওয়ায় পুলিসের নির্ব্বুদ্ধিতা, অসতর্কতা, বা শৈথিল্য প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহাকে যে বা যাহারা মারিয়াছে, তাঁহার প্রাণনাশের জন্য অবশ্য তাহারাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে নিরাপদ রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত করে নাই, তাহাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। আংশিক দায়িত্ব সেই সব নিরপদস্থ সরকারী লোকেরও আছে, যাহাদের দ্বারা দেশে জুলুম হওয়ায় উত্তেজনার হাওয়া দেশে বহিতেছে, এবং সেই সব

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরও আছে জুলুমের অভিযোগে যাঁহাদের বধিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা প্রশ্রয় বা মৌনসম্মতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

মেদিনীপুর জেলায় সত্যাগ্রহ

মেদিনীপুর জেলায় সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে অনেক গ্রামে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কিছু কিছু বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। কতকগুলি গ্রামে কি কি কারণে বাস্তবিক কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ

চাপালিয়া গ্রামের একটি পরিবার। পুলিসের অত্যাচারে ইহারা গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

করিবার নিমিত্ত কয়েকমাস পূর্ব্বে কলিকাতার আলবার্ট হলের এক সভায় একটি বেসরকারী তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গের মডারেট দলের নেতা ও গোল টেবিল বৈঠকের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, প্রভৃতি এই কমিটির সভ্য। এই কমিটি কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মেদিনীপুর জেলারই অন্য একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি।

রাইচক গ্রামের একখানি বাড়ী; পুলিস ইহা পুড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ

অনেক জায়গায় পুলিস কর্ত্তৃক লাঠিপ্রয়োগ এবং গুলিনিক্ষেপের সরকারী বর্ণনা এই, যে, আগে বেসরকারী লোকেরা পুলিসকে আক্রমণ করে বা করিবার উপক্রম করে, তাহার পর সংযত ও শান্ত পুলিস আত্মরক্ষার জন্য কিম্বা বেসরকারী আততায়ী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার

পুলিস না-কি ইস্‌মাইল চক-গ্রামের এই বাড়ীখানিও পুড়াইয়া দিয়াছে

নিমিত্ত "ন্যূনতম বল" প্রয়োগ করে। পুলিসের লোকদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে বা

চতুভুজগাঁও-এর একখানি লুণ্ঠিত বাড়ী

বন্দুক থাকে। তদ্ভিন্ন গবন্মেণ্টের সমুদয় শক্তি তাহাদের পশ্চাতে। তাহারা অন্যায় কিছু করিলেও শাস্তি কচিৎ পায়। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিঙে পুলিস ঢুকিয়া অন্ততঃ একজন নিরপরাধ লোককে প্রহার করিয়াছিল এবং তাহাদের কাজে কিছু বিবেচনার অভাব হইয়াছিল, স্বয়ং বঙ্গের গবর্ণর স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু পুলিসের কোন লোকের তাহার জন্য কোনই শাস্তি হয় নাই।

এ-হেন যে পুলিস, তাহাদিগকে অস্ত্রহীন সহায়সম্বলহীন গ্রাম্য লোকেরা আগেই কেন আক্রমণ করিবার মত পাগলামি ও বোকামি করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, বেসরকারী তদন্তের রিপোর্টগুলিতে দেখিতে পাই, সেগুলি সরকারী বৃত্তান্ত অর্থাৎ পুলিসের লোকদের প্রদত্ত বৃত্তান্তের সমর্থন করে না, বরং তাহাদেরই দ্বারা অত্যাচার হইয়াছে এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করে। তাহার সমর্থক আহত কোন কোন লোকের ফোটোগ্রাফও দেখিয়াছি। কিন্তু যিনি কোন পক্ষের কথাই সত্য

রাইচকের আর একখানি বাড়ী—ইহাও পুলিস পুড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ

বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন তিনি বলিতে পারেন, কোন নিরপেক্ষ আদালত কর্ত্তৃক প্রকাশ্য বিচার

না হইলে অত্যাচার হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। বেশ; তাহা হইলে নিরপেক্ষ আদালতের অনুসন্ধান তিনি করুন। আমরা আহত লোকদের ছবি দিতে বিরত থাকিলাম। অন্য রকম কতকগুলি ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা বিবরণ এই, যে, পুলিসের লোক ঘরবাড়ী ধানের গোলা ভাঙিয়া লুট করিয়া পুড়াইয়া দেওয়ায় তাহাদের অবস্থা ঐরূপ হইয়াছে। কয়েকটির ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতেছি। এগুলি
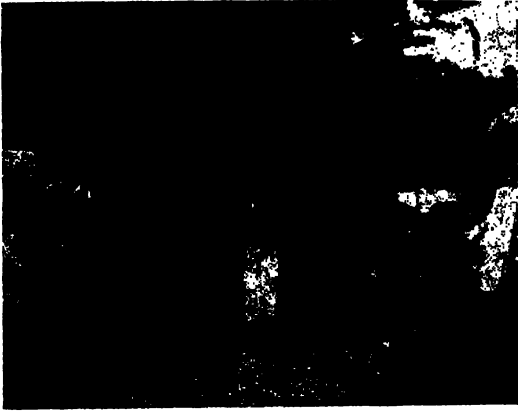
গোকুলনগরে এই ধানের গোলাটি পুলিস পুড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ

সম্বন্ধে গবর্মেন্টের তদন্ত করান উচিত। বেসরকারী আইনজ্ঞ লোকদের দ্বারা তদন্ত হইলেই ভাল হয়। নতুবা কতক এইরূপ বেসরকারী লোক এবং কতক হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-জজ ও উকীল-জজদের দ্বারা হউক। গবর্মেণ্ট তাহাও যদি না চান, কেবলমাত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-জজ ও উকীল-জজদের দ্বারা প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া সমুদয় সাক্ষ্য ও রিপোর্ট প্রকাশ করুন। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী, ধানের গোলা, ডিস্পেন্সারী প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরকে অনুসন্ধান করিতে বলিবার কারণ এই, যে, এই পদার্থগুলি অচেতন; ইহারা বেআইনী জনতা করে না, দাঙ্গা করে না, পুলিসকে আক্রমণ করে না, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের হুকুম অমান্য করে না, খাজনা বা টেক্স দিতে অস্বীকার করে না; সুতরাং তাহাদের উপর ন্যূনতম বা অধিকতম বলপ্রয়োগের কোন ন্যায্য কারণ নাই।

—

অধ্যাপক রামনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ ১৯৩০ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার

অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্

পাইয়াছেন। এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহা সাহিত্যের জন্য। অধ্যাপক রামন্ তাহার পর, এশিয়ার মধ্যে, এই পুরস্কার পাইলেন। ইহা এশিয়াবাসীর, ভারতীয়দের, মান্দ্রাজীদের, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের বিষয়। এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ৬৫০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে মোটামুটি ৯০,০০০ টাকা।

আলফ্রেড্ নোবেল সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ব্যবসাতে রাসায়নিক ও এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ডাইনামাইট ও তদ্বিধ অন্য অনেক জিনিষ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন, এবং মৃত্যু-কালে পাঁচটি পুরস্কারের জন্য প্রায় তাহার সমস্ত রাখিয়া যান। জাতিধর্ম্মভাষা-নির্বিশেষে পৃথিবীর যে-কোন দেশের লোক ইহা পাইতে পারেন। পাঁচটি পুরস্কারের মধ্যে একটি সাহিত্যের জন্য, একটি পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের জন্য, একটি রসায়নী বিদ্যার (কেমিষ্ট্রীর) জন্য, একটি পদার্থ-বিজ্ঞানের (ফিজিক্সের) জন্য, এবং একটি চিকিৎসা বিদ্যা কিম্বা শারীর বিজ্ঞানের (ফিজিয়লজির) জন্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের জন্য কিম্বা দর্শন, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতির জন্য কোন নোবেল পুরস্কার নাই।

অধ্যাপক রামনের আবিক্রিয়াটি কি, তাহা সহজে সংক্ষেপে বাংলায় বলা যায় না। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

—

শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী

কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী দিল্লীতে "চীফ্ এরোপ্লেন অফিসার" অর্থাৎ আকাশযানের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা সন্তোষের বিষয়। আমাদের দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ যে-সব বিদ্যা শিখিয়া যে-সব বৃত্তি অবলম্বন করে, দেবব্রত বাবু তাহা না করিয়া এমন কিছু শিখিয়াছেন যাহাতে বুদ্ধি বিদ্যা যান্ত্রিক জ্ঞান ও সাহসের প্রয়োজন, এবং তাহা এমন করিয়া শিখিয়াছেন, যে, তাঁহাকে একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে সরকারী প্রধান কর্ম্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এস-সি পাস করিয়া গ্লাসগোতে এঞ্জি-নীয়ারিং শিখিতে যান। তথাকার বি এস-সি হইবার পর তিনি অসামরিক আকাশযান চালনা শিখিবার জন্য একটি সরকারী বৃত্তি পান। এই বৃত্তি লইয়া তিনি লণ্ডনের ইম্পীরিয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেক্নোলজিতে শিক্ষালাভ করিয়া উপাধিপরীক্ষায়
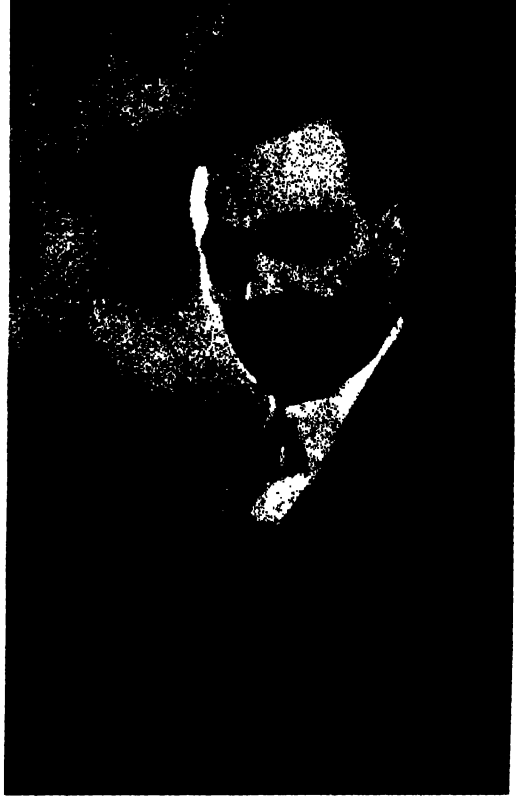
শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী

উত্তীর্ণ হন। তাহার পর বিলাতের কয়েকটি আকাশ-যানের প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎভাবে বিমানচালনা ও আকাশ-যানের কলকব্জা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন।

—

পরলোকগত নন্দলাল শীল

নিজামের রাজ্য দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের অবসর-প্রাপ্ত একাউন্টেন্ট-জেনারাল শ্রীযুক্ত নন্দলাল শীলের প্রায় ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী-সমাজ একজন কৃতী লোক হারাইল। প্রবাসীর ও অন্য কোন কোন পত্রিকার সুপণ্ডিত লেখক প্রয়াগবাসী অধ্যাপক অমৃতলাল শীল ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহাদের পিতা ৺ত্রৈলোক্যনাথ শীল মহাশয়ের বাড়ী

ছিল কলিকাতার নিকটস্থ বড়িশা গ্রামে। তিনি যৌবনকালে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ইটাওয়া শহরের অধিবাসী হন এবং প্রয়াগের মুঠিগঞ্জ মহল্লার ৺বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বেণী বাবুর পিতা ১৭৯৯ বা ১৮০০ সালে মুঠিগঞ্জবাসী

পরলোকগত নন্দলাল শীল

হন। সেখানে এখনও ইঁহার বংশের লোক আছেন। নন্দলাল বাবু এণ্ট্রেন্স পাস করিবার পর এলাহাবাদে কলেজে পড়িবার সময় ১৭ বৎসর বয়সে হায়দরাবাদে রাজস্ব সেক্রেটারীর আফিসে ৬০ টাকা (ব্রিটিশ ৫০ টাকা) বেতনে নকলনবীসের কাজে নিযুক্ত হন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফার্সী তাঁহার দ্বিতীয় ভাষা ছিল। হায়দরাবাদে তিনি ফার্সী ও আরবী ভাল করিয়া শিখিতে থাকেন। কিছু কাল পরে সেখানকার মত মৌলবীপ্রধান শহরেও তিনি ঐ উভয় ভাষায় বিদ্বান্ বলিয়া গণিত হইতেন। একবার ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দান সম্বন্ধে সেখানে মৌলবী ও পণ্ডিতদের একটি সভার অধিবেশন হয়। নন্দলাল বাবু, যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অনেক মৌলবী তখন স্বীকার করেন যে, তিনি বহু মৌলবী অপেক্ষা ইস্লামের তত্ত্ব বেশী জানেন।

নন্দলাল বাবু নিজের বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মিষ্ঠতার গুণে ৬০ টাকা বেতনের নকলনবীসের কাজ হইতে সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব সেক্রেটারীর এবং পরে একাউণ্টেণ্ট-জেনারাল্যের পদে উন্নীত হন। তখন তাঁহার বেতন ১৮০০ টাকা হয়। ১৯১৩ সালের শেষে তিনি পেন্স্যন লইয়া মান্দ্রাজে বাস করিয়া সেখানে কিছু ব্যবসা আরম্ভ করেন। গত ১১ই নবেম্বর তারিখে এলাহাবাদে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

হায়দরাবাদে তিনি অনেকগুলি স্মরণীয় কাজ করিয়াছিলেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি:—বজেট প্রথা প্রবর্ত্তন; হিসাবসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রবর্ত্তন, হিসাব-পরীক্ষা (audit) প্রবর্ত্তন, রসীদ ষ্ট্যাম্প প্রবর্ত্তন; দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে হায়দরাবাদে শতকরা ৬ সুদে প্রমিসরী নোট প্রবর্ত্তন; মুদ্রার উন্নতি এবং আধুলি সিকি দুয়ানি ও আনি প্রবর্ত্তন; ব্রিটিশ ও নিজামী মুদ্রার বিনিময়ের হার বাঁধিয়া দেওয়া; কারেন্সী নোট প্রবর্ত্তন; হায়দরাবাদ সরকার শতকরা ১৮—২৪ সুদেও টাকা ধার পাইতেন না, কিন্তু নন্দলাল এরূপ উন্নতি করেন যে, শতকরা ৬ সুদও বেশী মনে হইত; য়ুনানী হাকিমি কলেজে নানা উন্নত প্রথা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা অস্ত্র-চিকিৎসা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন; অনেক প্রাথমিক, মধ্য ও এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপন; থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর হল নির্ম্মাণ; দরিদ্রাশ্রম স্থাপন; সিটি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-সমূহ স্থাপন; উস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব উত্থাপন।

—

"পুলিস টেরারিজ্ম্" সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান

আমরা কল্য ১০ই ডিসেম্বর বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়াতেই ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বিপ্লবীদের ভয়োৎপাদন নীতি ও পুলিস প্রভৃতি সরকারী লোকদের ভয়োৎপাদন নীতির

সমতুল্যতা বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি, আজ ১১ই ডিসেম্বরের দৈনিক কাগজগুলির বিলাতী টেলিগ্রামে দেখিতেছি ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানও সেইরূপ কথা বলিতেছেন। যথা—

London. Dec. 10

In connection with Mr. Paul's speech on 9th December, the *Manchester Guardian* gives prominence to a letter quoting extracts from an account given by a lady member of the Society of Friends living in Bombay of alleged police brutality in disturbances in September. In the editorial the *Guardian* says that the letter amply bears out the contention that the general situation in India has been much worsened by the harshness with which police in many cases have carried out their duties. The paper adds that police terrorism may be considered as exactly on a par with the activities of the extreme wing of Indian nationalism.

তাৎপর্য্য। "মিঃ পলের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ম্যাঞ্চেষ্টার গ্যার্ডিয়ান একটি চিঠি ছাপিয়াছেন। তাহাতে বোম্বাইপ্রবাসিনী এক কোয়েকার মহিলার বর্ণিত পুলিস-অত্যাচারের কাহিনী উদ্ধৃত আছে। গার্ডিয়ান সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলিতেছেন, পুলিস যেরূপ কঠোরতার সহিত নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে সাধারণ অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কাগজটি আরও বলিতেছেন, যে পুলিসের টেরারিজ্‌মকে ভারতীয় চরমপন্থীদের কার্য্যাবলীর ঠিক্ তুল্যমূল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

মিঃ পলের পুরানাম কে টি পল (K. T. Paul)। তিনি একজন খৃষ্টিয়ান মান্দ্রাজী, পূর্ব্বে ওয়াই এম সি এ র সাধারণ সেক্রেটরীর দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তিনি গোল টেবিল বৈঠকের এক জন সভ্য। তিনি সিমসন সাহেবের হত্যার তীব্র নিন্দা করিয়া লণ্ডনে এক বক্তৃতা করেন। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে ঐ বক্তৃতা উপলক্ষ্যেই চিঠিটি লিখিত হইয়াছে। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ পল বলেন :—

Some actions of the executive through the police recently has doubtless been the immediate cause of provocation for such senseless acts. He hoped therefore that His Majesty's Government would see if it was impossible to carry on a vigorous and firm administration without recourse to those excesses which have often been unjustifiable and which he as eyewitness declared had often been brutal and immoral.

তাৎপর্য্য। "অধুনা শাসন-বিভাগ পুলিসের দ্বারা যে-সব কাজ করাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ [ডাঃ সিমসনের হত্যার মত] নির্বুদ্ধিতার কাজের সাক্ষাৎভাবে উত্তেজক কারণ। তিনি (মিঃ পল) এই হেতু আশা করেন, যে, মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের গবর্ন্মেণ্ট দেখিবেন, যে, অনেক স্থলে অসমর্থনীয় তাঁহার নিজের চোখে দেখা পুলিসের পাশব ও দুর্নীতি-প্রসূত অত্যাচার-সমূহ দ্বারা ব্যতীত দৃঢ় ও সতেজ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ অসম্ভব কি না।"

—

"চোর পালালে—"

আমরা গত কল্য ১০ই ডিসেম্বর ডাঃ সিমসনের হত্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, যে, পুলিসের নির্বুদ্ধিতা, অসতর্কতা ও শৈথিল্য এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী, এবং বড় বড় কর্ম্মচারীদের গুপ্ত রক্ষী রাখা ও অন্যবিধ সতর্কতা অবলম্বন করা তাহাদের উচিত ছিল। অদ্য ১১ই ডিসেম্বরের কাগজে দেখিলাম, রাইটার্স বিল্ডিঙে কড়া পাহারা ও অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

—

"কিশোরগঞ্জে কি ব্রিটিশ শাসন অবহেলিত হইবে ?"

১৮ই অগ্রহায়ণের সঞ্জীবনীতে এই নামের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। আমরা নিজে কিছু লিখিব না।

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার কথা এখনও পাঠকবর্গ বিস্মৃত হন নাই। সেই সময় যেরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ হইয়াছিল, তাহা সহজে ভুলিবার নহে। দাঙ্গার পর কতকগুলি লুঠের মামলা রুজু হইয়াছিল। তাহার বিচার করিবার জন্য মিঃ সি, আর, ব্যানার্জ্জিকে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। তিনি প্রায় সমস্ত লুঠের মামলারই বিচার শেষ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মামলারই আসামীদের প্রতি দুই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এই সমস্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের জজের নিকট ২৩টি আপীল দায়ের হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি মামলার আপীলের আবেদন মঞ্জুর হয় নাই, প্রারম্ভেই জজ সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আপীল শুনানীর পর ডিসমিস হইয়াছে। ছয়টি আপীলে আসামীদের শাস্তি কিছু হ্রাস হইয়াছে, একটি আপীলে আসামী অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এবং দুইটি স্থলে আসামীদিগকে

দায়রা সোপর্দ্দ করিবার আদেশ হইয়াছে। এখনও এগারটি আপীলের শুনানী চলিতেছে।

* * *

আদালতে যখন এইরূপ নির্ম্মম হত্যার মামলা চলিতেছে, তখন আবার নাকি কিশোরগঞ্জের গুণ্ডারা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ যে, ফরিয়াদী পক্ষের যে সমস্ত সাক্ষী সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তাহাদের উপর গুণ্ডাদের আক্রোশ বাড়িয়াছে। প্রথমতঃ সাক্ষীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এখন মারধর আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

[১] কয়েকদিন পূর্ব্বে হোসেনপুর থানার অন্তর্গত সাহিদলের অধিবাসী কুলচন্দ্র শীলকে খুন করা হইয়াছে। সে লুঠের মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল।

[২] ফরিয়াদী পক্ষের অন্যতম সাক্ষী মাঠখলার অধিবাসী শচীন্দ্র গোপও কয়েকদিন হইল প্রহৃত হইয়াছে। মাঠখলার বাজারের মধ্যেই তাহাকে মারধর করা হইয়াছে।

[৩] আর একটি সংবাদ এই যে, পাকদিয়া থানার অন্তর্গত স্থানের অধিবাসী শিবেন্দ্র রক্ষিতের ঘরখানি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

[৪] পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত শেড়িখালীর অধিবাসী গিরীশচন্দ্র সরকার ওরফে গিরীশ মাষ্টার গুরুতর জখম হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। তিনি এখন হাসপাতালে আছেন। তাঁহার জীবনের আশা খুবই কম। তিনি বলিয়াছেন, বসির নামক এক ব্যক্তিই তাঁহাকে জখম করিয়াছে। এই বসিরের এক ভাই লুঠের মামলায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সেই মামলায় গিরীশ মাষ্টার ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, যাহাতে ন্যায়বিচারের বিঘ্ন হয়, তজ্জন্য একদল গুণ্ডা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহাদের ধারণা হইয়াছে যে, গুণ্ডামী দ্বারাই তাহারা ন্যায়বিচারের হাত এড়াইতে পারিবে। এই অবস্থার গুরুত্বের কথা জ্ঞাপন করিয়া কিশোরগঞ্জ বার লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে বাঙলার গবর্ণর, ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির নিকট তার করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ সময় থাকিতে সাবধান হইবেন—ইহাই কিশোরগঞ্জের অধিবাসীরা প্রত্যাশা করিতেছে।

এই সম্পর্কে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। কিশোরগঞ্জের দাঙ্গায় কম পক্ষে ১০ হাজার লোক লিপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বোধ হয় ৫০০ লোকের বেশী ধৃত হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন যে, দাঙ্গার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আবদ্ধ করিলে কিশোরগঞ্জের কৃষিকার্য্য বিনষ্ট হইবে। কৃষিকার্য্য বিনষ্ট হইলে অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইবে। তাহাতে অশান্তি কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। তাই পুলিস বাছিয়া বাছিয়া বিশিষ্ট অপরাধীদিগকেই বিচারার্থ চালান দিয়াছিলেন। ইহার ফল কার্য্যতঃ ভাল হয় নাই। প্রশ্রয় পাইয়া দুষ্ট লোকের দুষ্প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরে যে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণিত হইল তাহাই আমাদের সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন ধানকাটা শেষ হইয়া আসিল। এ সময়ে প্রকৃত আসামীদিগকে দণ্ড দিয়া পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূল করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করুন। তাহা না হইলে কিশোরগঞ্জে গুণ্ডারাই রাজত্ব করিবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব এই যে, বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। এই গৌরব বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়।

প্রতিক্রিয়ার প্রকার ভেদ

কেহ যদি একটা দেওয়ালে খুব জোরে একটা কীল মারে, তাহা হইলে তাহার হাতে লাগে বটে; কিন্তু দেওয়ালটা কীল খাইয়া রাগিয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছে, এমন বলা যায় না। কারণ দেওয়াল অচেতন পদার্থ। বিছাতি গাছ ছুঁইলে যন্ত্রণা হয়, কিন্তু অতি পবিত্র বামুনঠাকুরকে অপবিত্র কেহ ছুঁইলে তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে চান, বিছাতি গাছ সেইরূপ রাগিয়া কাহাকেও শাস্তি দিল, এমন বলা যায় না।

জীবজগতে বোধ হয় কেঁচোকে এবং তদ্বিধ অন্য কোন কোন প্রাণীকে খুব আঘাত করিলে, বা পিষিয়া মারিয়া ফেলিলেও, তাহারা আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করে না। ইহা সাত্ত্বিকতা নহে। ইহা এক প্রকার জড়তা, কিম্বা অতি নিকৃষ্ট রকমের জান্তব স্বভাব। ছোট বড় অন্য অনেক প্রাণী আছে, যাহারা আঘাত করিলে আঘাত করে। যেমন, পিপীলিকা, মৌমাছি, বোল্‌তা কাক, টিয়াপাখী, কুকুর, ষাঁড়, ঘোড়া, বাঘ, সাপ ইত্যাদি। এই যে প্রতিক্রিয়া, ইহা জান্তব স্বভাব। এই জান্তব প্রকৃতি কেঁচোর জান্তব প্রকৃতির চেয়ে কিছু উচ্চ শ্রেণীর। এই উভয় প্রকার জান্তব প্রকৃতির পরিচয় মানব জাতির মধ্যে দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাবের মানুষ আছে। সেরূপ মানুষকে বশে রাখিবার জন্য আঘাত করিলে, সে বলে, "আমি তোমার অধীন হইব না, কিন্তু আঘাতের পরিবর্ত্তে তোমাকে আঘাত করিব না, তোমার প্রাণবধ করিতে চাহিব না। আমি তোমার জান্তবতা নষ্ট করিব, তুমি যে অপরকে তোমার অধীন রাখিতে চাও, তাহাকে তোমার সুখভোগের ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিতে চাও, তোমার এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাণবধ করিব।" এই রকমের মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

—

কলিকাতায় মণ্টেসরি শিক্ষাপ্রণালী

কলিকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। ইহার নীচের শ্রেণীতে ছোট ছোট ছেলেদেরও

লওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার উৎকৃষ্ট মণ্টেসরি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রীদিগের এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা আছে। তাহাতে শিশুরা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানলাভ করিতেছে। তাহারা নিজেদের দেহ পরিচ্ছদ জিনিষপত্র ও ঘর পরিষ্কার রাখিতে, পর্য্যবেক্ষণ করিতে, ছবি আঁকিতে, মাটির নানারকম জিনিষ প্রস্তুত করিতে, প্রভৃতি শিখিতেছে। মণ্টেসরি শিক্ষা-প্রণালীকে আমাদের দেশের উপযোগী করিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে উহার কিছু কিছু বাহ্য-পরিবর্ত্তন করা হইতেছে।

—

আশুতোষ বিল্ডিঙে পুলিসের অত্যাচারের বিচার

আশুতোষ বিল্ডিঙে পুলিস ঢুকিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দোষ ছাত্রদিগকে নিষ্ঠুর প্রহার ও রক্তপাত করিয়াছিল। বাংলার গবর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। ব্যাপারটা তাঁহার কাছে গিয়াছিল। অন্ততঃ একজন নির্দ্দোষ ছাত্রকে পুলিস প্রহার করিয়াছিল, এবং সাধারণতঃ কিছু অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিল, তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ভাল। কিন্তু পুলিসের কাহারও কোন শাস্তি, এমন কি তিরস্কারও, হয় নাই। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেট সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি মনে করিয়াছেন। আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, যেরূপ গর্হিত কাজ করিলে বেসরকারী লোকের শাস্তি হয়, সেরূপ গর্হিত কাজ করিলে সরকারী লোকেরও শাস্তি হওয়া উচিত।

—

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভা

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের গত বার্ষিক সভায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন এবং সম্প্রতি তাঁহার ছাত্রেরা যাহা করিয়াছেন তাহারও পরিচয় দেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেন—তাহা পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোক ও তাড়িত শাখার। পদার্থ-বিজ্ঞানেও তিনি জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণা করিতে করিতে যখন তিনি অজৈব (inorganic) পদার্থে জৈব পদার্থের (organic matter-এর) মত প্রতিক্রিয়া ও সাড়া পাইলেন, তখন হইতে তাঁহার গবেষণা-শক্তি নূতন দিকে ধাবিত হইল। উদ্ভিদ এবং জন্তু (animal) এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমধর্ম্মিতা তিনি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রদর্শন করিতেছেন। এবিষয়ে পাশ্চাত্য বহু বৈজ্ঞানিকের মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে কখন কখন আর্থিক ক্ষতি হয়, যশমানের লাঘব হইবার আশঙ্কা ত থাকেই। এই জন্য ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে মহানুভবতার প্রয়োজন। তাহা সকল মানুষের ও সকল বৈজ্ঞানিকেরই থাকিবে, এমন আশা করা যায় না। তা ছাড়া, খুব বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও প্রথম প্রথম অনেকে অকপটভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডারুইনের মত তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন বৈজ্ঞানিক গ্রহণ করেন নাই। এখনও তাঁহার মতের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়া থাকে। বস্তুতঃ, যে-বিষয়ে আগে কোন বৈজ্ঞানিক কিছু বলেন নাই, সে-বিষয়ে নূতন কিছু আবিষ্কার করিলে তাহা গৃহীত হইবার পথে বাধা উপস্থিত করিবার লোক বেশী না থাকিতে পারে। কিন্তু যে-বিষয়ে আগে হইতে বৈজ্ঞানিকদের নানা মত বিদ্যমান আছে, সে-বিষয়ে সেই সব মত খণ্ডন করিয়া নূতন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই বাধা উপস্থিত করিবার লোক অনেক দেখা দেয় ও যুদ্ধ ঘটে। আচার্য্য বসুকে এইরূপ যুদ্ধ এখনও করিতে হইতেছে। প্রত্যেক বিষয়েই তিনি অভ্রান্ত না হইতে পারেন, জয়ী না হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের সত্তর বৎসর পূর্ণ হইবার উৎসব-দিনে মনীষী রমঁ্যা রলাঁ তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র পাঠান তাহাতে তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিক যোদ্ধৃত্ব তাঁহার আছে।

রমঁ্যা রলাঁ তাঁহাকে আবার কবিও বলিয়াছিলেন। তাহাও সত্য। তাঁহার মধ্যে যে কবিত্ব আছে, তাহা ভারতীয়

প্রকৃতির বিশেষত্ব সূচনা করে। ১৯২৬ সালে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে দার্শনিকের কার্য্যক্ষেত্র ও কবির কার্য্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা করা হয় নাই; শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া অনেক এমন শ্লোকের চলন আছে, তাহা কবিতা না হইতে পারে, কিন্তু দার্শনিককে কবি হইতে নাই এমন কেহ এদেশে মনে করে না—যেমন দার্শনিক প্লেটো তাঁহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "According to our people, poetry naturally falls within the scope of a philosopher, when his reason is illumined into a vision,"; "আমাদের দেশের লোকদের মতে, কবিত্ব স্বভাবতই দার্শনিকের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে যখন আত্মিক আলোকপাতে তাঁহার বোধ সত্যদর্শনে পরিণত হয়," অর্থাৎ যখন তাঁহার ঋষিত্ব জন্মে। এই কারণে উপনিষৎকার ঋষিরা কবি ও দার্শনিক দুই-ই। রবীন্দ্রনাথ যেমন স্থল-বিশেষে দার্শনিক ও কবির অভিন্নত্বের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন, ভারতীয় প্রকৃতিতে তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক ও কবির অভিন্নত্বও তখন ঘটে যখন, ঋষির মত, বৈজ্ঞানিক সত্যদ্রষ্টা হন। আমাদের অনুমান, প্রাচীন ঋষিরা যেমন ধ্যাননেত্রে সর্ব্বভূতে একই সত্তার বিদ্যমানতা দেখিয়াছিলেন, আচার্য্য বসুও তেমনি সকল উদ্ভিদে ও প্রাণীতে একবিধ প্রাণের সত্তা ও ক্রিয়া মানস নেত্রে দেখিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক বাহ্য যান্ত্রিক উপায়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইহা তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবদান-পরম্পরার নূতনত্ব এবং ভারতীয় বিশেষত্ব। কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক যে তাঁহাকে ভাবুকতাপ্রবণ বলেন, তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল এবং ভারতীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান না-থাকার ফল।

—

একটি বাঙালী ছাত্রের গুণের আদর

বাঙালী ছাত্র হুমায়ুন কবীর অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রদের) য়ুনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় ছাত্র এই পদ ও সম্মান লাভ করেন নাই। হুমায়ুন কবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র এবং বাঙালী যুবা কবিদের অন্যতম।

—

লণ্ডনে চরখার কাজের ও চিত্রের প্রদর্শনী

ভারতীয় ছাত্রদের য়ুনিয়নের শিক্ষা-সেক্রেটারীর উদ্যোগে লণ্ডনের ফ্রেণ্ডস্ হাউসে সাবরমতী আশ্রমের চরখার কাজের এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও তাঁহার শান্তিনিকেতনস্থ ছাত্রদের রেখাচিত্র ও রঙীন চিত্রের একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

—

গোল টেবিল বৈঠক

লণ্ডনের তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের লোকদের আকাঙ্ক্ষিত প্রধান জিনিষটি ছাড়া আর নানা জিনিষের আলোচনা হইতেছে। যাহাদের মতিগতি নিতান্ত সাম্প্রদায়িক গোছের, সেইরূপ সংকীর্ণমনা কতকগুলি লোকছাড়া, ভারতীয় যে-কেহ দেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, তিনিই চান, যে, এদেশের সব ব্যাপারে ভারতীয়েরাই কর্ত্তা হইবে। ডোমীনিয়নত্বের মানে কার্য্যতঃ ক্রমশঃ যেরূপ প্রসারিত হইয়া চলিতেছে, তাহাতে অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষ কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি ডোমীনিয়ন হইলে ভারতবর্ষীয় সমুদয় ব্যাপারে এই দেশের লোকদের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইবে। অন্যেরা মনে করেন, এইরূপ কর্ত্তৃত্বের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আবশ্যক। যাহা হউক, কোন ভারতীয় স্বাজাতিকই (nationalist) ডোমীনিয়নত্ব অপেক্ষা কম কিছু চান না। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও অন্য কোন কোন নেতা লণ্ডন যাইবার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা ডোমীনিয়নত্ব বাদ দিয়া কিছু লইতে রাজী হইবেন না। অথচ পূর্ণ বৈঠকের পর খণ্ড বৈঠকের গোড়াতেই যখন ডাক্তার মুঞ্জে বলেন, যে, ডোমীনিয়ন

ষ্টেটাস কথাটি একটি প্রারম্ভিক প্রস্তাবের মধ্যে বসান হউক, তখন সপ্রু প্রভৃতির বিরোধিতায় ডাঃ মুঞ্জে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এখন ডাঃ মুঞ্জে এবং অপর কয়েক জন "প্রতিনিধি" প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে, ডোমীনিয়নত্বের কথাটি আগে ধার্য্য হইয়া যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর প্রভৃতি কেহ কেহ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তাঁহারা আগামী কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ডোমীনিয়নত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন অঙ্গীকার না পাইলে দেশে ফিরিয়া আসিবেন। ঐ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া লইবে। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রার দলটি এমন বাছিয়া লইয়া গিয়াছে এবং আগা খাঁ রূপী মূল গায়েনটি এমন বাছিয়াছে, যে, দুসার জন "ছোকরা" চলিয়া আসিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

সপ্রু প্রভৃতি তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট গরম বক্তৃতা করিতেছেন, এবং যুবকদের অসাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদের প্রকোপ হ্রাস, মহিলাদের জাগরণ প্রভৃতির সপ্রশংস উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য কথা। তবে কি না, কেবল সত্য যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা বহু পূর্ব্বেই হইয়া যাইত।

দেশী রাজ্যের রাজারা এই এক ধুয়া তুলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারত এবং দেশী রাজ্যসমূহকে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে এবং তাহা ফেডারেশ্যন দ্বারা করিতে হইবে। ফেডারেশ্যনে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সমগ্রভারতীয় ফেডারেশ্যনটির স্বয়ম্প্রভুত্ব চাই। কিন্তু দেশী নৃপতিরা বলিতেছেন,তাঁহাদের নিজের নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহাদের এখন যেমন ক্ষমতা আছে পরেও তেমনি থাকা চাই এবং তাঁহাদের প্রভু থাকিবেন ইংলণ্ডেশ্বর। তাহার মানে, তাঁহারা এখনকার মত স্বেচ্ছাচারী এবং ইংরেজের অধীন থাকিতে চান এবং তাঁহাদের প্রজাদের সুখ সুবিধা অধিকার তাঁহাদের মর্জির উপর নির্ভর করিবে। তাহা হইতে পারে না। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির লোকদের যে যে অধিকার আছে ও হইবে, দেশী রাজ্যের লোকদেরও সেই সেই অধিকার হওয়া চাই। নতুবা প্রদেশগুলি ও রাজ্যগুলির মধ্যে সাম্য হইবে না, এবং সাম্য ব্যতিরেকে ফেডারেশ্যনটা কিম্ভূতকিমাকার হইবে। দেশী রাজ্যসমূহের লোকেরা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চান, তাহা তাঁহারা তারযোগে বিলাতে যথাস্থানে জানাইয়াছেন।

মুসলমান "প্রতিনিধিরা" তাঁহাদের মিঃ জিন্নার ১৪ দফা দাবী ধরিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মনের ভাব অতি চমৎকার। মুসলমানেরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ আছেন, সেখানকার ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা আইন অনুসারে অন্য সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী থাকিবে; যেখানে তাঁহারা সংখ্যায় ন্যূন, সেখানে তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি যত জন হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি তাঁহারা চান। সিন্ধু দেশে ও ব্রিটিশ বালুচীস্থানে তাঁহাদের সংখ্যা বেশী; সেই জন্য ঐ দুটি অঞ্চলের নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহের ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ দুটিকে ব্যবস্থাপকসভাবিশিষ্ট প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, অতএব উহাকেও ব্যবস্থাপক সভা আদি দিতে হইবে। অর্থাৎ মুসলমানপ্রধান তিনটি নূতন "প্রদেশ" গড়িতে হইবে, কিন্তু হিন্দুপ্রধান নূতন কোন প্রদেশ গড়া হইবে না। সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যত সভ্য থাকিবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান হওয়া চাই: যদিও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের মুসলমানেরা (৫,৯৪,৪৪,৩৩১) উহার সমগ্র লোক-সংখ্যার (২৪,৭০,০৩,২৯৩এর) এক-চতুর্থাংশেরও কম। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ এবং দেশী রাজ্য-সমূহ সম্বলিত সমস্ত দেশটির লোকসংখ্যা ৩১,৮৯,৪২,৪৮০। তাহার মধ্যে মুসলমান ৬,৮৭,৩৫,২৩৩। সুতরাং সমস্ত দেশটিতেও মুসলমানেরা সব অধিবাসীর সমষ্টির এক-চতুর্থাংশের কম।

মুসলমানেরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক যুক্তি প্রয়োগ করেন। যে-যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা বেশী, সেখানে ব্যবস্থাপক সভায় ও সরকারী চাকরীতে

তাঁহারা বেশী অংশটা চান, যেহেতু তাঁহারা সংখ্যায় বেশী। আবার যেখানে তাঁহারা সংখ্যায় কম, সেখানে তাঁহারা সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব এবং সরকারী চাকরী চান, নতুবা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা হইবে না! এইরূপ দুমুখো যুক্তি হিন্দুরা কেন প্রয়োগ করিতে পাইবে না, বুঝিতে পারি না। তাহারাও কোন কোন প্রদেশ ও অঞ্চলে সংখ্যায় বেশী, কোথাও বা কম, এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তাহারা সংখ্যায় বেশী। মুসলমানেরা যদি বলেন, "আমরা শিক্ষায় অনগ্রসর এবং ভোটের উপর সংখ্যায় ন্যূন, অতএব আমাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব ও চাকরী বেশী করিয়া চাই," তাহা হইলে সংখ্যায় ন্যূন ও তাঁহাদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রসর অবনত শ্রেণীর লোকেরা ও আদিম-নিবাসীরাও ঐরূপ দাবী উপস্থিত করিতে পারে। মুসলমানেরা যদি বলেন, "আমরা আগে দেশের রাজা ছিলাম অতএব আমাদের বিশেষ দাবী গ্রাহ্য করিতে হইবে," তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কোন্ সময়কার রাজপদের উপর এই দাবী প্রতিষ্ঠিত। পঞ্জাবে শিখ রাজত্বের পর ইংরেজ রাজত্ব হয়। অন্যত্র মোগল বাদশাহ নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার মনিব ও রক্ষাকর্ত্তা ছিল মহারাষ্ট্রীয়েরা। এবং দেশের একটা বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর নামে ও কাজে উভয়তঃ মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজা ছিল। সুতরাং ইংরেজদের ঠিক্ আগে মুসলমানরা সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা ছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। মোগল বাদশাহের উপর মহারাষ্ট্রীয়দের কর্ত্তৃত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হইবে, যে, ইংরেজরা মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখদের হাত হইতে ভারতবর্ষের রাজত্ব পাইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপ্রভুত্বের উপর যদি মুসলমানদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দাবী মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং শিখেরাও করিতে পারে। কিন্তু এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্রাট ও রাজাদের পদচ্যুতি হইয়া সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখন, আগেকার কালে কাহার বাপদাদা ধর্ম্মভাই রাজা ছিল, সেকথা তোলা বৃথা। সত্যিকার জীবিত সম্রাট ও রাজারা মরিয়া ভূত হইতেছেন যে-যুগে, সে-যুগে আগেকার যে-সব রাজা বাদশাহ অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের দোহাই দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে।

অবশ্য, মুসলমানদের একদল—বরাবর তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া মুসলমান শব্দ প্রয়োগ করিতেছি—বলিতে পারেন, "আমরা তর্ক করিতে চাই না; যাহা চাহিতেছি তাহা না দিলে স্বরাজ স্থাপনে রাজী নই।" উত্তম কথা। কিন্তু দরদস্তুর করিয়া স্বরাজ স্থাপিত হয় না। যাহারা স্বরাজ লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে পারে, তাহারা স্বরাজ স্থাপন করিবে; দরদস্তুরে নিপুণ লোকেরা দরদস্তুর করিতে থাকুন।

স্বাজাতিক একটি মুসলমান সংবাদপত্র হিন্দুদিগকেও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলিতেছেন এবং বলিতেছেন, যে, হিন্দুরা যদি স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট), তাহা হইলে নেশ্যনের যে-কোন ধর্ম্মী লোকই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হউক বা চাকরী পাক্, তাহাতে তাহাদের আপত্তি হয় কেন? কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমরা বলিতাম, নেশ্যনের যে-কোন ধর্ম্মী লোক যে-কোন চাকরী পাক্ বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হউক তাহাতে মুসলমানেরাই আপত্তি করেন কেন? কিন্তু এরূপ প্রশ্ন না করিয়া স্বাজাতিকদের পক্ষের কথা যতটা বুঝি বলিতেছি। মুসলমানেরা চান, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে চির কাল নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মুসলমান সভ্য থাকা চাই-ই। কিন্তু সব সময়ে এই সংখ্যক যোগ্য মুসলমান পাওয়া না-যাইতে পারে, এবং যোগ্যতম লোক যাঁহারা এই মুসলমান সভ্যেরা তাঁহাদের মধ্যে গণনীয় না-হইতে পারেন। অথচ গণতন্ত্রের মানেই এই, যে, যাঁহারা অধিকাংশের মতে যোগ্যতম বিবেচিত হইবেন, দেশের কাজের ভার তাঁহাদের উপর থাকিবে। হিন্দু স্বাজাতিকেরা বলিতেছেন না, যে, হিন্দুরাই যোগ্য বা যোগ্যতম; মুসলমানদের মধ্যেও যোগ্য ও যোগ্যতম লোক থাকিতে পারেন। কোন কোন সময়ে যদি সব বা অধিকাংশ যোগ্য বা যোগ্যতম লোক মুসলমান হন, তাহাতে হিন্দুরা আপত্তি করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা কোথাও বরাবরের জন্য, চিরকালের জন্য, আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত অধিকতম বা

নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকার বন্দোবস্তে রাজী নহেন। তাহা হইলে কয়েকটি প্রদেশে হিন্দু রাজত্ব, কয়েকটিতে মুসলমান রাজত্ব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত স্বাজাতিকেরা তাহা চান না, তাঁহারা যোগ্যতমের দ্বারা দেশশাসন চান,—সেই যোগ্যতমেরা যে ধর্ম্মেরই লোক হউন। ইহাতে মুসলমানেরা বলিতে পারেন, সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, সুতরাং হিন্দু রাজত্ব হইবেই জানিয়া তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু আগে ত হিন্দুর আপেক্ষিক আধিক্য আরও বেশী ছিল, তথাপি মুসলমানেরা রাজা হইয়াছিলেন। তখন যে-শক্তির জোরে প্রভুত্ব হইয়াছিল, এখন তাহার সুযোগ নাই, কিন্তু অন্য শক্তির সুযোগ আছে। সুতরাং সংখ্যার আধিক্য ও প্রভুত্ব সমার্থক নহে। বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ তাহাদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাঙালী হিন্দুরা মুসলমানদের আগেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চাহিয়া বসে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই সন্দেহ আছে, যে, অপরেরা প্রাধান্য পাইলেই ভিন্নধর্ম্মীর প্রতি অবিচার ও স্বধর্ম্মীর প্রতি পক্ষপাত করিবে। পক্ষপাতিত্ব করা বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের লোকই কোন দেশে একেবারে নির্দোষ নহেন। আমেরিকাতেও মিঃ য়্যাল স্মিথ রোমান কাথলিক বলিয়া প্রেসিডেণ্ট হইতে পারেন নাই, এবং ইহুদী, নিগ্রো ও রোমান কাথলিকদের উপর অত্যাচার হয়। তথাপি এই শেষোক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরা আমেরিকাকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী বা অন্য কোন দেশের অধীন দেখিতে চায় না; তাহারা নিজেদের দেশকে স্বাধীন রাখিয়াই অত্যাচার, অবিচার, পক্ষপাতের বিরুদ্ধে লড়িতে চায় ও লড়িতেছে। ভারতবর্ষেও ইংরেজরা মুসলমানকে এবং ইংরেজকে সমান চক্ষে দেখে না, দেখিতে পারে না। তথাপি মুসলমানরা অনেকেই ইংরেজের অধীনতাকে স্বরাজ অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন। যখন তাঁহাদের রাজনৈতিক মনোভাব আমেরিকার ইহুদী, রোমান কাথলিক প্রভৃতির মত হইবে, তখন তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

পলতার মহালক্ষ্মী কটন মিল

দেশী কাপড় ব্যবহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা কয়েক রকমের হইতে পারে:—চরখায় কাটা সুতা হইতে দেশী হাতের তাঁতে বোনা, দেশী কলে উৎপন্ন সুতা হইতে দেশী হাতের তাঁতে বোনা, এবং দেশী কলের সুতা হইতে দেশী কলের তাঁতে বোনা। যদি প্রত্যেক বাড়ীতে চরখায় সুতা কাটা হইত এবং হাতের তাঁত চলিত, তাহা হইলে কলের সুতা বা কলের তাঁতের কোন সাহায্য না লইয়াও দেশের সকল লোকের জন্য কাপড় উৎপন্ন করা যাইত। কিন্তু অবস্থা যখন সেরূপ নহে, তখন কলের সাহায্যও লওয়া উচিত। দেশী কলের কাপড় যত উৎপন্ন ও বিক্রী হয়, তাহার অধিকাংশ বোম্বাই প্রদেশের। অথচ অন্য অনেক প্রদেশেও—যেমন বঙ্গে—কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে পারে। বঙ্গে যত কাপড়ের কল হইবে, তাহার কেবল অংশীদার, ডিরেক্টর ও আফিসের কর্ম্মচারীরা নহে, কারিগরেরাও বাঙালী যে পরিমাণে হইবে সেই পরিমাণে বাঙালীর বেকার সমস্যার সমাধান হইবে, মানসিক উৎকর্ষ বাড়িবে এবং আত্মসম্মান বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইবে। এইজন্য আমরা বাংলা দেশে সুপরিচালিত কাপড়ের কলের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতে চাই। সে দিন পলতার মহালক্ষ্মী কটন মিল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা এখন বড় নহে, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁতের সংখ্যা বাড়াইয়া বড় করিবার আয়োজন হইতেছে এবং তাহার জায়গা আছে। ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় করার সুবিধা এই যে, কলের পরিচালকগণ বাঙালীদিগকেই শিখাইয়া লইয়া তাহাদের দ্বারাই তাঁতের ও অন্যবিধ কাজ চালাইয়া লইতে পারিতেছেন। এখন তাঁতের কাজে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে দুইজন ছাড়া আর সবাই বাঙালী। কাজ বেশ চলিতেছে এবং কাপড়ও ভালই হইতেছে।

—

বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি এস্ সি পরীক্ষায় কুমারী উমা বসু পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানে প্রথম

শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্বর্ণপদক ও সোনামণি রৌপ্যপদক দান করিয়াছেন।

—

সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

ইউরোপের কোন কোন দেশে—যেমন গত মহাযুদ্ধের পর নবগঠিত স্বাধীন কতকগুলি রাষ্ট্রে—সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও সংখ্যায় ন্যূন ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক বাস করে। তাহাদের ভাষা স্বতন্ত্র। এই সংখ্যান্যূনদের সংখ্যা নিতান্ত কম হইলে তাহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার বন্দোবস্ত লীগ্ অব্ নেশুন্স করেন নাই। তাহাদের সংখ্যা কিছু বেশী হইলে—যেমন মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ২০।২৫—লীগ্ অব্ নেশুন্স্ কর্ত্তৃক প্রণীত কতকগুলি বিধি অনুসারে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আদি নিয়মিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংখ্যান্যূন লোকসমষ্টি-সমূহের অধিকার লীগ্ অব্ নেশুন্সের এই সকল বিধি অনুসারে ব্যবস্থিত হইলে ভাল হয়। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্নভাষী অনেক লোকসমষ্টি থাকায় ইংরেজ গবর্মেণ্ট ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হন, ইংরেজ সরকারের এই বদনাম আছে। লীগ অব নেশুন্সের দ্বারা ইউরোপের পূর্ব্বোক্ত দেশগুলিতে সংখ্যান্যূনদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা যে-যে বিধি অনুসারে হইয়াছে, ভারতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও সংখ্যান্যূনদের মতভেদের মীমাংসা তদনুসারে হইলে গবর্মেণ্টের ঐরূপ নিন্দার কোন কারণ ঘটে না। সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে ব্যবস্থা এক সঙ্গে একই নিয়ম অনুসারে হওয়া উচিত। বাংলা দেশের দুজন হিন্দু তথাকথিত প্রতিনিধি আগা খাঁর মধ্যস্থতায় বাংলার সমস্যার আলাদা সমাধানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বাংলা দেশের হিন্দুরা তাহা অগ্রাহ্য করিবে।

মিছিল সভাসমিতি ও পুলিস কমিশনার

কলিকাতার বড়বাজারের রাস্তায় পাঁচজন মহিলা "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা" ("আমাদের পতাকা ঊর্দ্ধে উড্ডীন রহুক") এই হিন্দী গান করিয়া বেআইনী মিছিল করিয়াছেন, এই অভিযোগে তাঁহাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলে প্রধান বিচারপতি স্যার জর্জ র‍্যাঙ্কিন এবং বিচারপতি এস্ সি মল্লিক তাঁহাদিগকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন, অধিকন্তু রায়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কলিকাতায় সব মিছিল সভাসমিতি বন্ধ করিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা কলিকাতার পুলিস কমিশনারের নাই; সুতরাং তাঁহার যে-হুকুম অমান্য করার জন্য মহিলাদের দণ্ড হইয়াছিল তাহা আইনসঙ্গত নহে, অতএব তাহা অমান্য করিলে কাহারও কোন অপরাধ হয় না; এবং যদি তাহা আইন-সঙ্গত হইত তাহা হইলেও কেবল তাহা অমান্য করিলেই অপরাধ হয় না—দেখাইতে হইবে, যে, আদেশ অমান্য করাতে সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা হইয়াছে, শান্তিরক্ষার বাধা ঘটিয়াছে বা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমার সাক্ষ্য হইতে তদ্রূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব অভিযুক্তা মহিলারা দণ্ডনীয় হইতে পারেন না।

হাইকোর্টের রায় হইতে বুঝা যাইতেছে, পুলিস কমিশনার আইন জানেন না, কলিকাতার যে-যে ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ আরও অনেক মামলায় বহু মহিলা ও পুরুষকে শাস্তি দিয়াছেন, তাঁহারাও আইন জানেন না, এবং যে বাংলা গবর্মেণ্টের অনুমোদন অনুসারে এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে সেই গবর্মেণ্টও আইন জানেন না; অথচ ইঁহারাই হইলেন আইনের মর্য্যাদার রক্ষক এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার মা বাপ!

যাহা হউক, পুলিস কমিশনারের বে-আইনী হুকুম অমান্য করার অভিযোগে আরও যে-সব ভদ্রলোক ও মহিলা জেলে পচিতেছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া খালাস দিলে বুঝা যাইবে, যে, এবিষয়ে বাংলা গবর্মেণ্টের ন্যায়পরায়ণতার উদ্রেক হইয়াছে।

অহিংস ভারতীয় সংগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে ন্যুয়র্কের সংবাদপত্র-সমিতিকে নিজের যে মন্তব্য গত নবেম্বর মাসে প্রেরণ করেন, তাহা প্রকাশিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করেন। আমাদের মাসিক কাগজে তাহা ছাপিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া তাহা আমরা ফ্রী প্রেসের মারফৎ দৈনিক কাগজ-সমূহে প্রেরণ করি। তাহা অনেক দৈনিকে ছাপা হইয়াছে দেখিয়াছি। "আনন্দবাজার পত্রিকা," "ষ্যাড্‌ভান্স" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা" রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যে "মডার্ণ রিভিউ"হইতে প্রাপ্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন,"লিবার্টী" তাহা গোপন রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কবির মন্তব্যটি নীচে মুদ্রিত হইল।

"In answer to the question as to whether India is ready for Independence, I must repeat that it is the sense of responsibility which comes with freedom itself that makes a nation fit for self-rule, because this fitness is not an artificial condition imposed from without but a natural process which is inevitably linked up with the creative unfoldment of a nation's life. Judged by an artificial standard hardly any nation is fit for self-government and it would not be fair for any country to claim social and political perfection, much less the right to rule and govern the destiny of any other country on the grounds of moral guardianship. As in the individual life so on the national plane our most important concern is to make truth operative, not through coercion, which kills it, but through the vital sanction of an awakened consciousness, and this can come only from within.

"I am proud that my countrymen, to-day under their great leader Mahatma Gandhi, have disdained to imitate the violent methods of the modern military nations in their struggle for freedom, but have made moral integrity and the spirit of sacrifice the directive power of their non-violent movement. By accepting spiritual force as their chief weapon, they have already proved their superiority to the primitive mentality of unashamed pillage and man-slaughter which persists in most countries to-day, and I have no doubt that if our countrymen can keep fast to this heroism of non-violence in spite of violent provocation they will have no difficulty in establishing freedom, which is already theirs in so far as they are true to their central ideal.

"I can tell you that the whole world to-day has to recognize the greatness of India's spiritual struggle for liberty. India has proved that human history has come to a stage when moral force has to be acknowledged even by politics. The invitation accorded to her by an imperial power which can easily coerce her to silence by a virulent maintenance of military law and order is itself a sign of the time undreamt of even a century ago. The real importance of the conference is not in the opportunity it may offer of a co-operation with the British politicians but with the soul-force of the whole world. We must know that this conference is going to hold its sittings before the world tribunal whose approbation it is eager to win."

—

পিকেটিং

পিকেটিং সম্বন্ধীয় অর্ডিন্যান্স যখন বলবৎ ছিল, তখনও কলিকাতায় অনেক মহিলা ও পুরুষ তাহা করিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে কারাদণ্ডের মিয়াদ শেষে খালাস পাইয়াছেন। এখন পিকেটিং অর্ডিন্যান্স আর বলবৎ নাই। এখনও পিকেটিং চলিতেছে। যাঁহারা একবার জেল খাটিয়া আসিয়াছেন এরূপ অনেক মহিলা ও ভদ্রলোক আবার এই কাজ করিতেছেন। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত এই কাজটি বে-আইনী ছিল, এখন বে-আইনী নয়—আইনের এমনই মহিমা! কিন্তু পিকেটিং এখন বে-আইনী না হইলে কি হয়? সরকারী রাস্তায় পথিক ও যানবাহনের চলাচলে বাধা উপস্থিত করার অভিযোগে সাধারণ আইন অনুসারেই কোন কোন পিকেটার দণ্ডিত হইতেছেন! তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে,মানুষকে দণ্ড দিবার জন্য পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের কোনই প্রয়োজন ছিল না, সাধারণ আইনই যথেষ্ট ছিল ও আছে; কেন-না "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম," অর্ডিন্যান্সগুলা অধিকন্তু ন দোষায়।

পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারেও আগে আগে যাঁহাদের শাস্তি হইয়াছে, তাঁহাদের শাস্তিও সব স্থলে আইন-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, শ্রীযুক্তা লুক্‌মানীর মামলার আপীলে বোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে এবং অন্য কোন কোন বিচারকের রায়ে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে, যে, কেবল নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ পিকেটিং কোন অপরাধ নহে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিলে ও তাহাদের কাজে বাধা জন্মাইলে তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

—

পটেল মহাশয়ের ও অন্য নেতাদের স্বাস্থ্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কারারুদ্ধ শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের স্বাস্থ্য খুব

খারাপ হইয়াছে। অথচ তাঁহাকে পঞ্জাবের জেল হইতে তাঁহার নিজের জন্মভূমি গুজরাটের কোন জেলে না পাঠাইয়া সুদূর কোইম্বাটুর জেলে পাঠান হইয়াছে। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়াছেন, যে, কোইম্বাটুরে তাঁহাকে রেল-গাড়ী হইতে চেয়ারে করিয়া নামাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে জেল হইতে খালাস দিলেই ভাল হয়। তাহা সরকার বাহাদুরের অভিপ্রেত না হইলে, তাঁহাকে গুজরাটের স্বাস্থ্যকর কোন স্থানের জেলে রাখিয়া তাঁহার মনোনীত কোন চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীনে রাখা উচিত। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে না তাঁহার কারাদণ্ডের ইহাই আইনসঙ্গত অর্থ ও উদ্দেশ্য, তাঁহার আয়ুহ্রাস উহার আইনসঙ্গত উদ্দেশ্য নহে।

জেলে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। তিনি এখনও সুস্থ হন নাই। শীঘ্র তাঁহার শরীর নিরাময় হউক ভারতীয় জনসাধারণ এই ইচ্ছা করিতেছেন।

নৈনি জেলে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের জ্বর হইয়াছিল। তিনি এখনও দুর্ব্বল আছেন। গান্ধীজীর ওজন কমিয়া গিয়াছে। অন্য অনেক নেতাও অসুস্থ। সকলে সুস্থদেহে জেলের বাহিরে স্বাধীন ভারতে নিজ নিজ জীবনের কার্য্য করিতে পারিলে আনন্দের বিষয় হইবে।

—

নারীহরণ দমনার্থ সরকারী চেষ্টা

গত ২৭শে মার্চ্চ পুলিসের এসিষ্টেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনার‍্যাল বঙ্গের সমুদয় রেঞ্জ বা চক্রের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনার‍্যালদিগকে নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে লেখা হইয়াছে, "কিছুকাল হইতে এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনেক আলোচনা ও মতপ্রকাশ হইয়া আসিতেছে। এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, যে, পুলিস নারীনিগ্রহের অভিযোগে যথাযোগ্য তদন্ত করে না। গবর্ন্মেণ্ট বিবেচনা করেন, যে, হিন্দু মুসলমান যে-কোন লোক এরূপ অপরাধ করে, তাহার শাস্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। অতএব আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আপনার অধীন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের মনে এই ধারণ জন্মাইয়া দিবেন যে, এই শ্রেণীর ঘটনা গুরুতর মনে করা আবশ্যক। তাঁহাদিগকে এই রকম মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ নোট রাখিতে বলিবেন। তাঁহারা দেখিবেন যেন সার্কেল ইনস্পেক্টরদিগের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে এগুলার তদন্ত হয়। এরূপ কোন মোকদ্দমায় আসামীদের শাস্তি না হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার বিস্তারিত রিপোর্ট আপনাদের নিকট পাঠাইবেন; আপনারা আপনাদের মন্তব্যসমেত তাহা ইন্‌স্পেক্টর-জেনার‍্যালের অবগতির জন্য পাঠাইবেন। তিনি আরও এই ইচ্ছা করেন, যে, আপনারা জেলা ও মহকুমার পরিদর্শনবিষয়ক নোট-সমূহে নারীহরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আপনাদের মত প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ রকম মোকদ্দমার হ্রাস বা বৃদ্ধি, ফলাফল, জেলা ও মহকুমার লোকসংখ্যা, লোকসংখ্যার কত অংশ হিন্দু ও মুসলমান, তাহাদের সংখ্যার শতকরা কতজন ঐরূপ অপরাধ করে, ইত্যাদি তথ্য লিখিবেন। ঐরূপ মোকদ্দমার তদন্তে পুলিসের কোন ঔদাসীন্য বা দোষ আপনাদের গোচর হইলে তৎসম্বন্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।"

এই চিঠিটি প্রায় নয় মাস পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। চিঠিটি অনুসারে কাজ হইলে সুফল হইবারই কথা। চিঠিটি লিখিত হইবার আগে এবং পরে বঙ্গে নারীহরণ ও তাহার অভিযোগ কত মাসের মধ্যে কত হইয়াছে, কত মোকদ্দমায় আসামীদের দণ্ড হইয়াছে বা হয় নাই, ইত্যাদি তথ্য জানিতে পারিলে, উহা ফলপ্রদ হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে।

এই রকম অপরাধ হিন্দুরা বেশী করে, না মুসলমানেরা বেশী করে, তাহা জানা অপেক্ষা ইহা দমন করাই বেশী আবশ্যক। কাহারা বেশী বদমায়েস, তাহা জানিবার বেশী চেষ্টা করিলে, কোন কোন কর্ম্মচারী এক শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাগুলিতে অবহেলা করিতে পারে, কোন কোন কর্ম্মচারী বা অন্য শ্রেণীর আসামী সম্বন্ধে ঐরূপ অবহেলা করিতে পারে। অতএব, শ্রেণী-বিভাগ ও শ্রেণী অনুসারে সংখ্যা নির্ণয়ের দিকে বেশী

মন না দিয়া জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বদমায়েসদিগকে শাস্তি দেওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

—

শাস্তির রকমওয়ারী

সত্যাগ্রহের ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য "অপরাধের" জন্য শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন রকম ও পরিমাণে দিতেছেন। একই প্রদেশে, এমন কি একই শহরে ও আদালতে,একই অভিযোগে শাস্তি নানাপ্রকার হইতেছে। কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ আরও চমৎকার। কি কারণে যে ভিন্ন. ভিন্ন কয়েদীকে হাকিম প্রভুরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলেন, তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ!

পাটের ব্যবহার

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে পাটের নানাবিধ ব্যবহারের কথা লিখিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইল আমরা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে গিয়া দেখিলাম, সেখানে লেডী প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ার কামরায় চটের পরদা রহিয়াছে। বলিয়া না দিলে সেগুলি হঠাৎ কাহারও চটের পরদা বলিয়া মনে হইবে না। নানা রঙের সূতা দিয়া ছাত্রীরা ফুল তুলিয়া সেগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। চটের স্বাভাবিক রঙের উপর সেগুলি বেশ মানাইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে চটে সবুজ নীল বা অন্য কোন রংও দিতে পারেন। চটের পরদা বেশ টেকসই এবং তাহাতে শীঘ্র ময়লা ধরে না।

জুট ফ্লানেলের জামা অনেকে পরেন। জুট কথাটা হইতেই বুঝা যাইতেছে, উহার কাপড়ে পাট মিশান আছে। এই রকম পাট মিশাইয়া র‍্যাপার এবং অন্যবিধ শীতবস্ত্রও হইতে পারে।

—

বাংলায় বৌদ্ধ জাতক-মালা

ষোল বৎসরের পরিশ্রম এবং প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ বৌদ্ধ জাতকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়া ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী অনুবাদ কয়েকজন বিদ্বান লোকের পরিশ্রমে এবং অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। ঈশান বাবু একা নিজের পরিশ্রমে ও ব্যয়ে বাংলা অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি একাধিক দীর্ঘ ভূমিকা এবং বহু টীকা সংযোজন করিয়াছেন। এই সব কারণে তাঁহার কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। জাতকগুলির গল্প মনোরম এবং উপদেশপূর্ণ। তৎসমুদয় হইতে প্রাচীন ভারতের যুগবিশেষের সামাজিক অবস্থার ইতিহাসও কতকটা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এরূপ গ্রন্থ বাঙালীদের মধ্যে যত বেশী লোকে পড়িবে, ততই বঙ্গীয় জনগণের মঙ্গল হইবে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আয়ব্যয়

কোন দেশেরই গবন্মেণ্ট মিউনিসিপালিটী ইত্যাদি একেবারে নিখুঁত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের লোকদের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের দোষ না-দেখা কিংবা দোষ দূর করিতে চেষ্টা না-করা বোকামি। অন্য দিকে, এদেশে দেশী লোকরা কোন একটা কাজ চালায় বলিয়াই সব দোষ হইতেছে, ইংরেজরা চালাইলে দোষ হইত না, এমন মনে করাও ভুল।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর দোষ ত্রুটি আছে। তাহা দেখাইয়া ইংরেজরা ইহার দেশী পরিচালকদের—বিশেষতঃ তাহারা অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালা বলিয়া—দোষ দেয়। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর আগেকার এবং তাহার পরবর্ত্তী অনেক বৎসরের কলিকাতা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তখন ইংরেজরাই ইহার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। তখন শহর এখনকার চেয়ে বেশী নোংরা ও দুর্গন্ধময় ছিল। মিউনিসিপালিটীর টাকার অপচয় তখন যে হইত না, এমন নয়। আয়ের শতকরা কম টাকা তখন শিক্ষা স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হইত। সুতরাং দেশী লোকেরা কলিকাতাটাকে আগেকার চেয়ে খারাপ করিয়া দিয়াছে, ইহা সত্য নহে। কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপালিটী

নির্দোষ নহে। ইহার গুরুতর অনেক দোষ আছে, ইহা সত্য কথা। কর্ত্তারা হয় ত বলিবেন, ইহার বর্ত্তমান আয়ে বেশী কিছু করা যায় না। ইহার ব্যয়ের সব দফা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া এবিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার আয় যেরূপ আছে, তাহাতে সাধারণ ভাবে আমাদের এই ধারণা আছে, যে, এই আয়েই কলিকাতার অবস্থা আরও ভাল করা যায়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদকের উক্তি অনুসারে ১৯৩০-৩১ সালে এই মিউনিসিপালিটীর আনুমানিক আয় হইবে ২ ৪৯,৩৩,০০০ টাকা (দুই কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা)। আসামের ও কতকগুলি দেশী রাজ্যের আয় কিরূপ তাহা নীচে দেখাইতেছি।

	বৎসর	আয়
আসাম	১৯২৬-২৭	২,৫৫,৭৭,০০০
বড়োদা	১৯২৭-২৮	২,৬২,০০ ০০০
কুচবিহার		৪০,০০,০০০
ত্রিপুরা		২৯,০০,০০০
বিহার-উড়িষ্যার ২৬টি		
রাজ্যের মোট আয়	১৯২৮-২৯	১,০৬,২৩,১০২
ইন্দোর		১,২৪,০০,০০০
ভূপাল		৬২,০০,০০০
গোয়ালিয়র		২,১৪,০০,০০০
কাশ্মীর	১৯২৭-২৮	২,৩৯,০০,০০০
ত্রিবাঙ্কুর		২,৩৯,০০,০০০
কোচিন		৭৫,০০,০০০
বিকানীর		৯৪,২০,০০০

মোটামুটি বলিতে গেলে নিজামের হায়দরাবাদ এবং মহীশূর এই দুটি রাজ্যের আয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্য সব ভারতীয় দেশী রাজ্যের মধ্যে তিন-চারিটির আয় ইহার প্রায় সমান, এবং বাকীগুলির অনেক কম।

রাজ্য চালাইবার জন্য আবশ্যক অনেক কাজ ও ব্যয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীকে করিতে হয় না। আবার এমন কাজও আছে যাহা কলিকাতা করে, রাজ্যগুলি সাক্ষাৎভাবে করে না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারীদের বেতনও ইংরেজ কর্ত্তাদের আমলে যেরূপ ছিল, এখনও মোটামুটি সেইরূপ আছে; বাড়িয়াছে কি না বলিতে পারি না। এদেশে ইংরেজরা নিজেদের জন্য খুব বেশী বেশী বেতনের বরাদ্দ করিয়াছেন। ছোট ছোট জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেটরা জাপান সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষাও অনেক বেশী বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বেতনও আগেকার আমল হইতে ইংরেজদের খাঁই অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। স্বরাজী দেশী আমলেও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, মিউনিসিপালিটীর বড় বড় কর্ম্মচারীদেরও বেতন জাপান সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর চেয়েও বেশী হইবার কোন ন্যায্যতা নাই। কেন-না, সাম্রাজ্যের কাজ ও একটি শহরের কাজ সমতুল্য নহে, এবং জাপানের লোকদের জনপ্রতি গড় আয় ভারতবর্ষের লোকদের জনপ্রতি গড় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। লোকে আশা করে, দেশী লোকেরা কিছু বেশী ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ হইবেন এবং ইংরেজদের চেয়ে কম বেতনে তাহাদের চেয়ে ভাল কাজ করিবেন। এই আশা পূর্ণ হইলে মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান আয়েই অনেক উন্নতি হইতে পারে। তাহার উপর যদি অপচয় নিবারিত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

ভ্রম সংশোধন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ত্রিবর্ণে মুদ্রিত "গীতগোবিন্দের একটি দৃশ্য" নামক চিত্রখানি শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ইংরেজীর বাংলা" প্রবন্ধে কয়েকটা বানান ভুল হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	পাটী	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮২	২	২৮	maintaing	maintaining
৩৮৪	১	১৮	উর্দ্ধৃত	উদ্ধৃত
৩৮৪	২	৩২	'নাতি'	'নাভি'

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ, ২য় খণ্ড } মাঘ, ১৩৩৭ { ৪র্থ সংখ্যা

বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্ত্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা
কালের রাত্রি ভেদি',
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি',
পথে পথে রচি' আলিম্পনের লেখা।
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উজ্জ্বলি' উঠে দিক্‌প্রাঙ্গণে
অগ্নিচক্ররেখা।
অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন:
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ আঁধারে
শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি'।
মহাদুঃখের মহানন্দের
সংঘাত লাগি চিরদ্বন্দ্বের
চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি'।
শতদলে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
প্রথম পরম বাণী
বীণা হাতে বীণাপাণি॥

১১ নবেম্বর ১৯৩০

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ব্রেমেন ষ্টীমার

অতলান্তিক

কল্যাণীয়েষু

সুরেন, রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেচি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ অন্যান্য যে সব দেশে ঘুরেচি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্ম্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স, কোথাও আছে হাঁসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়, কোথাও আছে মুজিয়ম—বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্ম্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেচে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে। যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা বিভক্ত, সেখানে এ-রকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল, এটা হয়েছিল অস্থায়ী-ভাবে—কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চল্‌চে তার প্রকৃতিই এই—সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধা-রণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে। উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—'মাগৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না? যে হেতু সমস্ত-কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—ব্যক্তিগত লোভেতে করেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' সেই একের থেকে যা আস্‌চে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বল্‌চে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড় বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'—কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বল্‌তে চায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।' য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভ, ব্যক্তির ভোগ নিয়ে। তারই মন্থন আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠ্‌চে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল একদলই পাচ্চে, অধিকাংশই পাচ্চে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য্য—বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে—এবং লোভের কাজই হচ্চে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চল্‌বে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টাদ্বারা সেটাকে যে মুহূর্ত্তে মানবো না সেই মুহূর্ত্তেই স্বপ্নের মত সে লোপ পাবে। রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলচে। সব-কিছু এই এক-চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাটপর্ব্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখিনি, তার কারণ অন্যদেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—'দুধুভাতু খায় সেই।' এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে

শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেন-না সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা "বিশ্বকর্মা"; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই, অতএব এদের জন্তেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেচে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তি-নিকেতনের লাইব্রেরীর মতো অকারী নয় (passive) — সকারী (active)।

রাশিয়ায় Region Study অর্থাৎ প্রাদেশিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় ২০০০ আছে, তার সদস্য-সংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এইসব কেন্দ্রে তত্তৎ প্রদেশের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্ত্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি (productive forces) কি কি আছে, কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ প্রচ্ছন্ন আছে কি না তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেচে, এই প্রাদেশিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চ্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।

এই রকম নিকটবর্ত্তী প্রদেশের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনের কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন— কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয়নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চ্চার পত্তন করচেন শুনেছিলুম; কিন্তু একাজটা আরও বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই আর এই সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কি রকম চলে তার বিবরণ শুন্‌লে নিশ্চয় তোমার ভাল লাগ্‌বে। মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে (Tretyakov Gallery) এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন-লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেচে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেচে। সেইজন্তে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেষ্ট্রি করানো দরকার হয়েচে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে যে-সব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আস্‌ত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য কর্ম্মিকের দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদী, দর্জ্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমতো বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েচে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্ম্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে-বিষয়টা প্রকাশ করচে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (space), তার উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique), এ সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এই জন্তে পরিচায়কের বেশ দস্তুর মতো

শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটি মাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কের কর্ত্তব্য কয়েকটি ক'রে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়, ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কি সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকদের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনি ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কি করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটি রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই :—আশাকে যে চিঠি লিখেচি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিক্রত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেচে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এই-জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনি আমরা বলতে সুরু করি এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্য সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সঙ্কল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করবার জন্যে কেবলি তাল ঠুকিয়ে পাঁয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চল্‌বে নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন করেচে। এরা জানে রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্ব্বর, যারা বর্ব্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্ব্বল। রাশিয়ায় নব-নাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েচে। এদের ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটেনি। মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না একথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলি মজুর সেজে কারখানা-ঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্চে আর লাঙল চালাচ্চে, তাহলেই বুঝতুম এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্ম্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজে অহঙ্কার করে বলতে থাকে, আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি—সে খুবই শক্ত হতে পারে কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বলে রাখচি এবং সাবধান করে দিচ্চি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচ গান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ায় নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েচে, সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্চে, এখনো থামেনি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেচে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতন্ত্রে কোথাও নূতনকে ভয় করেনি। এদের যে পুরাতন ধর্ম্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহুশতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায়

করে দিয়েচে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের ছুটোকেই দিয়েচে নির্ম্মূল করে, এত বড় বন্ধনজর্জ্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড় মুক্তি দিয়েচে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেন-না, যে ধর্ম্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্য্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েচে সে রাজার সর্ব্বপ্রধান সহায় যে ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন-না তার মার আরামের মার। সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েচে—অন্য দেশের ধার্ম্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্ম্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভাল। রাশিয়ার বুকের পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কি প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩রা অক্টোবর ১৯৩০।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত]

D. "Bremen"

কল্যাণীয়েষু

সুরেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড় বড় সহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে। চোখে দেখে দেখার আর একটা প্রণালী হচ্চে ভ্রমণ। তোমরা ত জানই আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প মনে বহন করে এসেচি। ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়। মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই খেজুদের চ'রে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়— তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রে শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকীতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না—জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই,—ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তাহলে কোনো অভাব থাকে না। এসম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো এক সময়ে শিক্ষা-পরিব্রজন চালাতে পারব। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুটবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখচি সর্ব্বসাধারণের জন্যে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলচে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্র জাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার্-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য তখন দেশ-ভ্রমণ ছিল সখের জিনিষ, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্ব্বসাধারণের জন্যে তার উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্ন কর্ম্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানাস্থানে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের চেষ্টা

করেচে। আগেকার কালের বড় বড় প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েচে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্য লাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর একটা। লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তারা নানাস্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণের দেশভ্রমণের উৎসাহ দেওয়া এবং তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা বিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েচে, সেখানে পথিকদের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল রকম দরকারী বিষয়ে তারা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এই রকম পান্থশিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েচে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজেষ্ট্রি করে। মে মাস থেকে আরম্ভ ক'রে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে—এক একটি দলে পঁচিশ ত্রিশটি ক'রে যাত্রী। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই যাত্রী-সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি—২৯শে হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এসম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না; সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল—তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে বা আরোগ্য লাভ করবে সে জন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না,—আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্চে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তাছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতেই প্রবাহিত তা আমাদের সিভিল সার্বিসে পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে-রকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলচে তা দেখে য়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করচেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্ব্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এদেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহুদূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে। বাংলা দেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মা রোগ ছড়িয়ে পড়চে—রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারচি নে যে, বাংলা দেশের এই সব অন্নবিত্ত (?) মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে? এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরো জেগেচে এই জন্যে যে, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকল্টিজ্ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করচেন। ডিফি-কল্টিজ্ আছে বই কি। একদিকে সেই ডিফিকল্টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপরদিকে ভারত-শাসনের ভূরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে? রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা আজও হয়নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্ব্বতপ্রমাণ, কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্চে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্টিজটা ঠিক কোন্‌খানে? যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাকতে পারে, তাছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাই সর্ব্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এমন সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এই রকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে তাদের শিক্ষার জন্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েচে তা দেখলে শিক্ষার জন্যে কি উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপব্লিকের জন্যে ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-

ককেশীয় রিপব্লিকের জন্ত ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজ্‌বেকিস্তানের জন্ত ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্ত ২ কোটি ৯ লক্ষ কব্‌ল্।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষা-বিস্তারের বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েচে।

যে বুলেটিন্ থেকে তথ্য সংগ্রহ করচি তারি ছুটি অংশ তুলে দিই :—

Another of the most important tasks in the sphere of culture is undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত অনেকগুলি রিপব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচার ব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হ'ত, তাহ'লে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হ'ত। ভাষা ইংরেজী হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল। মধ্যস্থের যোগে কাজ চলচে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। আত্মরক্ষার জন্তে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসন নীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরও বেড়ে গেচে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজী ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কতদূর হয়ে থাকে আমি আনাড়ি তা বুঝিনে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হ'তে পারত তা' একটুও হ'ল না।

আর একটা অংশ :—

"Whenever questions of cultural-economic construction in the nationa republics and districts come before th organs of the Soviet government, they are settled not on the line of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the broad masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs."

যাদের কথা বলা হ'ল তারা হচ্চে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকাল্টিজ্ সরিয়ে দেবার জন্তে সোভিয়েট্‌রা ছশো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করেনি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেচে। দেখে শুনে ভাবচি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও পিছিয়ে-পড়া জাত? আমাদের ডিফিকল্টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি?

একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার মুাজিয়ম আছে। এই খেলনা সংগ্রহের সঙ্কল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেচে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হ'ল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরও কিছু জানাবার আছে। কাল লিখব। পরশু সকাল পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে—তারপরে লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর, ১৯৩০।

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত]

ইংলণ্ড ও বর্ত্তমান ভারতীয় আন্দোলন

শ্রীসুধীর সেন, বি-এ

প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে চলিল নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস অহিংস আইনলঙ্ঘন নীতি অবলম্বন করিয়া সারা ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীনতা-অর্জ্জনের যে বিরাট প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতবর্ষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, পশ্চিমেও যে তাহা কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে নাই, তাহা নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে আসিতে আসিতে সে মহাতরঙ্গ তাহার দুর্দ্দম বেগের অনেকখানিটাই হারাইয়া ফেলে। ইহার উপর দূরত্ব ভিন্ন তাহার পথে অন্য বাধাও আছে। হল্যাণ্ড্ যেমন বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, তেমনি পশ্চিমের সংবাদপত্রসমূহও কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় আন্দোলনের প্রবল গতিকে প্রাণপণ বলে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুদূরত্বের ও সংবাদপত্রের এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম করিয়া সে ঢেউ যখন পশ্চিমের দ্বারদেশে আসিয়া আঘাত করে, তখন তাহার গর্জ্জন যে ক্ষীণ এবং গতি যে মন্দীভূত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি! বরং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে ঢেউ এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া এদেশকেও অল্প-বিস্তর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতেই এই আন্দোলনের যথার্থ আকার ও গুরুত্ব অনুমান করিয়া লইতে পারি।

ভারতবর্ষের এই মহা-আন্দোলনের কতটুকু পশ্চিম জানিতে পারে এবং সে-সম্বন্ধে পশ্চিম কি ভাবে, সে বিষয়ে বাংলার পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল থাকা একান্ত স্বাভাবিক। আমি আজ কিয়ৎপরিমাণে সেই কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইব।

টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ওয়ারলেস্ ইত্যাদির কল্যাণে এ যুগে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার যেরূপ সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা হইতে অনেকেই হয়ত অনুমান করিবেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো কথাই আজ পশ্চিমের অবিদিত নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পশ্চিমের প্রচণ্ড অজ্ঞতাই পশ্চিমপ্রবাসী ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয়। এ অজ্ঞতা হয়ত আর এক শতাব্দী পূর্ব্বে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত এবং দূরত্বকেই মানুষ ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া স্বভাবতই ধরিয়া লইত। কিন্তু বিজ্ঞান সে দূরত্বকে আজ প্রায় লোপ করিয়া দিয়াছে। এক দেশের ঘটনা আজ সে দেশে ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি সে দেশেরই লোকের শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই, হাজার হাজার মাইল দূরে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পশ্চিমের এই অজ্ঞতার কারণ তবে কি? তাহার প্রধান কারণ, বহির্জ্জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে যে দ্বার দিয়া ভাববিনিময়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারেই এক একটি সশস্ত্র পাশ্চাত্য প্রহরী চক্ষু আরক্ত করিয়া দণ্ডায়মান! খিড়কীর দরজাটুকুও আজ আর অরক্ষিত নাই! বহির্জ্জগতের কৌতূহলাক্রান্ত উৎসুক দৃষ্টি যতই সেখানে গিয়া পড়ুক না কেন, অন্তঃপুরনিবদ্ধা এই কন্যার সত্যিকার মনোভাব জানিবার উপায় তাহার ত নাই। প্রহরীদের কাছে আসিয়া পশ্চিম যখনই কন্যার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, তখনই উত্তর পায়—কন্যা সুখনিদ্রায় বিভোর!

তবে এখানকার সব সংবাদপত্রের মধ্যেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক দিক্ দিয়া একটি বিশেষ ঐক্য আছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির কারণ অসংশয়ে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে করিয়া এখানকার সংবাদপত্রসমূহ উদ্ধত স্পর্দ্ধার সহিত দিনের পর দিন যাহা ঘোষণা করে, তাহা একটা নির্ম্মম পরিহাস বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের

মতে এই অশান্তির একমাত্র কারণ আমাদেরই মত মুষ্টিমেয় লোক যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাকে বদ্‌হজম করিয়া স্বাধীনতার নামে দেশের নিরুপদ্রব শান্তিপ্রিয় সুখনিদ্রাবত জনসাধারণকে আইনভঙ্গ করিবার পাপপ্ররোচনা দিতেছে এবং রাজকর হইতে মুক্তি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া এ আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছে। জনসাধারণ যখন একবার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখন নেতাদেরও সাধ্য থাকে না যে তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখেন, ফলে চারিদিকে মারামারি খুনোখুনি আরম্ভ হয় এবং এইভাবে অহিংসা-আইনলঙ্ঘননীতি দেশময় হিংসা, বিদ্বেষ ও অশান্তির হলাহল ছড়াইয়া দেয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি স্থগিত হয়, মুষ্টিমেয় উগ্রমস্তিষ্ক দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের কল্যাণে অসংখ্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইত্যাদি।

যে কারণে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই সকল অদ্ভুত ধারণায় আস্থাবান উহা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এক মহা সমস্যা। গণতন্ত্রের মূল কথা এই যে, দেশের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যেক সমস্যাসম্বন্ধে ভাবিয়া নিজের মন্তব্য স্থির করিয়া নিজের মনোমত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। সেজন্য বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ-সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু সংবাদ-পত্রের কর্ত্তারা নিরপেক্ষ হইবার চেষ্টা করিলেও অজ্ঞাত-সারে নিজেদের সংস্কারকে প্রচার না করিয়া পারেন না। তাই সংবাদপত্র হইতে সংবাদ-সংগ্রহের বিপদ এই যে, আমরা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ নিজের চোখে না দেখিয়া অন্যের চোখে দেখিতে বাধ্য হই। প্রত্যেক সংবাদ-পত্রেরই যদি নিরপেক্ষ ও সংস্কারহীন হইবার একটা চিরজাগ্রত চেষ্টা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ধার-করা চোখে পৃথিবীকে দেখার বিপদ হইতে আমরা, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত হইতাম। কিন্তু খুব কম সংবাদপত্রই নিরপেক্ষ হইবার জন্য তেমনভাবে ব্যাকুল, সত্যের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ অতি গভীর—এমন অপবাদ কেহ তাহাদিগকে দিতে পারে না। আসল কথা এই যে, প্রত্যেক সংবাদপত্রই জনমতকে নিজের মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ব্যগ্র, সত্য ঘটনাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরাকেই সংবাদপত্র নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া মনে করে না। সংবাদপত্র তাই মানুষকে একটা জিনিষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে জিনিষ সে একটি বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করে।

দুইটি দেশের সম্বন্ধের দিক হইতে এই সংবাদ-সমস্যা একটি জটিল ব্যাপার হইলেও পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময়ই উহা তেমন গুরুতর আকার ধারণ করে না। ফ্রান্সকে ইংরেজরা নিজেদের সংবাদ-পত্রের চোখ দিয়াই দেখে সত্য, তেমনি ফ্রান্সও ইংলণ্ডকে ফরাসী সংবাদপত্রের মধ্য দিয়াই প্রধানত জানে। দুই দেশেরই নিজের মত প্রকাশের উপায় ও স্বাধীনতা এতখানি রহিয়াছে যে, কোনো দেশই সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন ভাবে মিথ্যাকে প্রচার করিতে সাহস করে না। "টাইম্‌স্"-পত্রে যদি ভুল সংবাদ ছাপান হয়, "ল তাঁ" অবিলম্বে তাহার প্রতিবাদ করে। একই দেশের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতের প্রতিযোগিতায় সে দেশের জনসাধারণ শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে পায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর জনসঙ্ঘও মোটামুটি সত্যকে পায়। সমস্ত জগতের সম্মুখে ইংলণ্ডের নিজের মত ব্যক্ত করিবার অধিকার যতখানি আছে, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী বা আমেরিকারও ঠিক ততখানিই আছে। পশ্চিমে এক দেশ তাই মিথ্যা রচনা করিয়া আর এক দেশকে বিপন্ন করিতে পারে না, কারণ সব দেশ হইতেই সেই মিথ্যা রচনার দ্রুত তীব্র প্রতিবাদ সর্ব্বদাই আসে।

এই সংবাদ-সমস্যা দুই দেশের মধ্যে তখনই বিশেষ-ভাবে জটিল ও উগ্র হইয়া উঠে যখন পৃথিবীর জনমতের দরবারে হাজির হইবার অধিকার উভয়ের মধ্যে সমানভাবে থাকে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহির্জগত যেটুকু সংবাদ পায়, তাহা কেবল এদেশীয় লোকের মধ্য দিয়াই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ-প্রদত্ত প্রত্যেকটি সংবাদকে পশ্চিম মানিয়া লয়, স্বজাতি বা প্রতিবেশীকে সন্দেহ করার কোনো কারণ আছে বলিয়া কাহারও মনে হয় না। আর ভারতবর্ষের প্রতিবাদ যে এতদূর আসিয়া

পশ্চিমের মনে তেমন কোনো সংশয় জাগাইয়া দিবে, তাহাও সম্ভব নয়।

এ দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ যদিই বা নিতান্ত সচেতন নিরপেক্ষতার সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচার করিত, তাহা হইলেও একটা প্রকাণ্ড বিপদ থাকিয়াই যাইত। ইয়ুরোপের দেশগুলি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই পরস্পরকে জানিয়া আসিয়াছে। স্বাদেশিকতা বা জাতীয় সঙ্কীর্ণতা প্রত্যেক দেশের যতই থাকুক না কেন, পশ্চিমের কোনো জাতি অন্য কোনো পাশ্চাত্য জাতিকে উপমানব বা সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া মনে করে না। ভারতবর্ষকে সেভাবে জানিবার সুযোগ পশ্চিমের কোনো দিন হয় নাই। ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ নরনারী যে-ভারতবর্ষকে কোনোদিন দেখিবার সুযোগ পাইবে না, সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে নিজেদের কল্পনায় এক অভিনব ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়া। সে কল্পিত ছবিতে বাঘ আছে, হাতী আছে, সাপ আছে, অর্দ্ধবিবস্ত্র অদ্ভুতাকৃতি অসভ্যেরা আছে; সেখানে ভাষার সংখ্যা এত বেশী যে কেহ কাহারও কথা বুঝে না; ধর্ম্মের নামে সেখানে মানুষ বহুপ্রকার জানোয়ার ও বিবিধাকৃতি পুতুলের উপাসনা করে; মারামারি, খুনোখুনি সেখানে চিরন্তন এবং শান্তিরক্ষার্থ ব্রিটিশ-সৈন্যের উপস্থিতি সেখানে একান্ত প্রয়োজন; সেই জঙ্গলময় বিরাট মহাদেশে মঙ্গলময় ব্রিটিশজাতি রেলগাড়ি স্থাপন করিয়াছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, দেশরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছে; অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী আজ স্বাধীনতার দাবি করিতেছে বটে, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে ব্রিটিশের প্রসারিত বাহু ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে অসংখ্য মানুষ হিংস্রপশুর মত পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া এতদিনের প্রতিষ্ঠিত শান্তিরাজ্যকে একেবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিবে, আর সেই অবকাশে হয় রাশিয়া, নয় জাপান, নয় জার্ম্মেনী গিয়া ভারতবর্ষকে নিজের কবলে আনিয়া সবলে এমন কুশাসন আরম্ভ করিয়া দিবে যে, তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-শাসন ফিরিয়া পাইবার জন্ম কাতর ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিবে; ইত্যাদি।

তাই বলিতেছিলাম, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের নরনারীর গোড়াতেই যে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুদীর্ঘ দুই শত বৎসরে তাহা নির্ম্মূল না হইয়া দৃঢ়তর হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো ফিল্ম দেখিতে যাও, দেখিবে সেখানে জঙ্গল আছে, হাতী আছে, অদ্ভুত পোষাকপরা পাগড়ীসমেত দুই একটি মহারাজ আছেন, আর মাঝে মাঝে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্ম শাড়ীপরা গহনায় ভারাক্রান্তা দুই একটি সাঁওতাল রমণীকেও হাজির করা হয় এবং তাহা হইতেই এখানকার রমণীরা ভারতীয় রমণীর রূপ ও রুচির নমুনা হাতে-হাতে পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। সংবাদপত্র খুলিলে দেখিবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সংবাদ থাকে—যথা, একজন মুসলমান একজন হিন্দুর মাথা ভাঙিয়াছে, একজন হিন্দু এক মুসলমানের বুকে পদাঘাত করিয়াছে, কোথাও হিন্দু-মুসলমানে খুনোখুনি আরম্ভ হইয়াছে এবং পুলিস বা সৈন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বহুকষ্টে শান্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কোথায় এক বঙ্গীয় যুবক কোন্ শ্বেতাঙ্গের উপর ঢিল ছুঁড়িয়াছে এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কোথায় কলিকাতার এক ক্ষুদ্র গলির একপ্রান্তে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্রকক্ষে চারিটি বোমা পাওয়া গিয়াছে এবং সেই উপলক্ষ্যে পুলিস বিশেষভাবে তদন্ত করিতেছে এবং অনুমানে অনেককেই সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইত্যাদি; অথবা, হাজার হাজার লোকের করতালিধ্বনির মাঝখানে জনৈক মুসলমান নেতা প্রচার করিয়াছেন যে, গান্ধীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, মুসলমানরা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিতে রাজী হইবে না এবং উগ্রপন্থীদের অন্যায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমান-সমাজ একমত হইয়া শান্তিস্থাপনে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্ম ব্যস্ত, ইত্যাদি; অথবা, অস্পৃশ্যরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, এবং উৎপীড়ক হিন্দু-সমাজের অপেক্ষা উদার ও নিরপেক্ষ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকেই যে তাহারা বড় বন্ধু বলিয়া মনে করে, তাহা যেন গান্ধী-প্রমুখ হিন্দুনেতারা বিশেষভাবে মনে রাখেন, ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের অপরাধ দুইটি—একটি তাহার স্বকৃত, অপরটি তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। তাহার স্বকৃত অপরাধ তখনই হয়, যখন সত্যকে সে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করে, যখন বৃহৎকে সে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রকে সে বৃহৎ বলিয়া দেখায়, অথবা যখন কোনো ঘটনা প্রকাশ করা সুবিধাজনক হইবে না মনে করিয়া সযত্ন ঔদাসীন্যে সে তাহার উপর একটা নির্ম্মম নীরবতার যবনিকা টানিয়া দেয়। কংগ্রেসানুসরণকারীদের সংখ্যা কমাইয়া, তাহাদের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া, অস্পৃশ্য বা মুসলমান-নেতারা কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ্ দুইয়েরই প্রভাব ভারতবর্ষে সমান, ইত্যাদি প্রচার করিয়া সংবাদপত্রসমূহ যখন এদেশীয় নরনারীর মনে ভারতীয় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেয়, তখন তাহার অপরাধ স্বকৃত এবং অমার্জ্জনীয়। আর তাহার অপরিহার্য্য ত্রুটি এই যে, অধিকাংশ ফিল্মের মতই সংবাদপত্রেরও কারবার অদ্ভুতকে লইয়াই। যাহা স্বাভাবিক, সাধারণ, তাহা সে অনায়াসেই অবহেলা করিয়া যায়, অদ্ভুত, অসাধারণ, অস্বাভাবিক, ইত্যাদিকে প্রচার করাই তাহার ব্যবসা। এ দেশীয় নরনারী যে-দেশকে কোনোদিন দেখিবার বা জানিবার সুযোগ পায় নাই, সে-দেশ সম্বন্ধে দিনের পর দিন যখন তাহারা কেবল মারামারি, খুনোখুনি, বোমা আবিষ্কার, ইত্যাদি সংবাদই পায় তখন সে দেশের প্রতি তাহাদের মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করিবার জন্য মনস্তত্ত্ববিশারদ হইবার প্রয়োজন হয় না।

সংবাদপত্রের কথা বাদ দিলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার বহির্জ্জগতের আরও দুই একটি পথ আছে। যথা—প্রথমতঃ সাইমন্ কমিশনের রিপোর্ট। সমস্ত পশ্চিম এই রিপোর্টকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি অভিনব বাইবেল মনে করিয়া বসিয়াছে। সাইমন্ কমিশনে ইংলণ্ডের তিনটি রাজনৈতিক দলের লোকই বর্ত্তমান ছিল এবং রিপোর্টেও সকলেই একমত, সুতরাং এ রিপোর্ট অভ্রান্ত না হইয়া পারে না, এই হইল পশ্চিমের ধারণা। কিন্তু পশ্চিম এ কথা অনায়াসেই ভুলিয়া যায় যে, এ কমিশনে একজনও ভারতবাসী ছিল না, এ রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টের দলিলপত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং যদিও কয়েকজন ভারতবাসী কমিশনের সম্মুখে নিজেদের রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তবু দেশের সব চেয়ে বড় যে রাজনৈতিক দল এবং সে দলের সব চেয়ে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ যাঁহারা তাঁহারাই এই কমিশনের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের কথা। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে কে? ভারতবর্ষের জনসাধারণকে কি এই জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ কখনও দেওয়া হইয়াছে? সে সুযোগ পাইলেও একজন ভারতীয় প্রতিনিধির উক্তি এই জাতিসঙ্ঘে হয়ত অরণ্যরোদনের মতই প্রতিভাত হইত। সে যাহা হউক, প্রতিনিধি যাঁহাদিগকে বলা হয় তাঁহারা সত্যই প্রতিনিধি নন, কারণ তাঁহাদের নির্ব্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘের কোনো হাত নাই।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা হইতে পাঠকপাঠিকারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে পশ্চিমের নরনারী অতি সামান্য সংবাদই পাইয়া থাকে। সমস্ত পশ্চিমকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিবার যে বিরাট ষড়যন্ত্র এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই নীরবতার ষড়যন্ত্র আরও ভীষণ এইজন্য যে, আজ ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক এবং এদেশের জনসাধারণই আজ আমাদের প্রভু। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও পার্লিয়ামেণ্ট জনসাধারণের উপর এমন একান্তভাবে নির্ভর করিত না, কাজেই তখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা ছিল ঢের বেশী। কিন্তু গত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী এখানে ভোটের অধিকারী অর্থাৎ আমাদিগকে শাসন করিবার উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে শাসন করে তাহারাই আমাদের অভাব

অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই এদেশের প্রত্যেক ভোটদাতা নিজের অজ্ঞাতসারে একটা সুবৃহৎ অন্যায়কে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতেছে, একটা বিরাট পাপের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতেছে। যদি সত্য ঘটনা সমস্ত ইংলণ্ডবাসীর কর্ণগোচর হইত, তবে হয়ত এই ইংলণ্ডেই ভারতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করিবার জন্য এক দলের সৃষ্টি হইত। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের চার কোটি নর-নারীর মধ্য হইতে দুই-চারজনও ভারতবর্ষের পক্ষ লইয়া কথা বলে কি না সন্দেহ। যে-দেশে প্রতিষ্ঠান গড়িবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, যে-দেশে যুগে যুগে প্রত্যেক সমস্যার সময়েই নানা দল গড়িয়া উঠিয়া সে-সমস্যার নানা প্রকার মীমাংসা লইয়া হাজির হইয়াছে, সেদেশে ভারতীয় আন্দোলনের সমর্থনকারী একটিও দল নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? আর এই সত্যই পশ্চিমের ভারত সম্বন্ধে সুবৃহৎ অজ্ঞতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয় কি?

জনসাধারণকে ভারত-সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখার বিষময় ফল আর এক দিক দিয়াও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা থাকার জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই ভারতবর্ষের দাবির এক বৃহদংশ পূরণ করিবার ইচ্ছা করিলেও সাহস করিবে না; কারণ এ প্রকার উদারতার বিরুদ্ধে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রতিবাদ করিবেই এবং ফলে হয়ত সে নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রিত্ব পদ হইতে অপসারিত হইতে হইবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণের এই নিষ্ঠুর অজ্ঞতার জন্য ভারতবর্ষ যে কেবল তাহাদের সমবেদনা হইতেই বঞ্চিত তাহা নহে, এ জনসাধারণ অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষের শত্রুতাচরণই করে। যদিই বা দুই একটি রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী হইয়া থাকেন, সংবাদপত্র ও জন-সাধারণের নিশ্চিত আক্রমণকে তুচ্ছ করা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া তাঁহারাও সহজেই চুপ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক নেতারা ন্যায়-অন্যায়ের কথা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া সুবিধা-অসুবিধার কথাই বিশেষভাবে ভাবেন; কি করিয়া নিজের দলের পক্ষে জনতাকে আনা যায় এবং নিজের দলকে মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত করা যায়, ইহাই তাঁহাদের প্রধান বা একমাত্র ভাবনা। সে অবস্থায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীকে স্থায়ী করিয়া রাখা তাঁহারা স্বভাবতই সুবিধাজনক মনে করেন। ভারতবাসীর প্রতি লর্ড আরুইনের যদিই বা কোনো সমবেদনা থাকে, তবু তিনি কি করিতে পারেন? ভারতের শাসনপ্রণালীকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাই তিনি করিতে পারেন, সেখানে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সে ক্ষমতা আছে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের। ভারতীয় শাসন কারখানার ইঞ্জিন এই লণ্ডন শহরেই। কিন্তু এখানকার এক একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাই বা কতটুকু? ধরুন, মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের কথা, ভারতীয় দাবির অনেকাংশ পূরণ করিবার ইচ্ছা যদিই বা তাঁহার থাকে, তবু তিনি কি করিতে পারেন? ভারত-সমস্যাকে তিনি স্বভাবতই তাঁহার অনেকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার মাত্র একটি বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভারত-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় জনমতের বিরুদ্ধে যাইতে কিছুতেই রাজী হইবেন না, কারণ তাহাতে না হইবে ভারত-সমস্যার মীমাংসা, না হইবে অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, হওয়ার মধ্যে কেবল এই হইবে যে, তাঁহাকে সদলে মন্ত্রিত্বপদ হইতে অনতি-বিলম্বে অবতরণ করিতে হইবে। সব রাজনৈতিক নেতাই গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ নন, সকলেই সুবিধার চেয়ে সত্যকে বড় মনে করেন না। আয়ারল্যাণ্ড্‌কে হোম্‌রুল্ দিবার জন্য বৃদ্ধবয়সেও এই সত্যপ্রিয় তেজস্বী মহাপুরুষ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা সমস্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিরল।

লণ্ডন

ট্যারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বছর ষোল আগেকার কথা। তেতাল্লিশ নম্বরের কলেজ মেস। সারারাত্রি অভিনয়দর্শনে রক্তচক্ষু রামহরিবাবু সকালবেলায় ডাকের চিঠিখানা খুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হুর্‌রে!" পাশের ঘরে দিগম্বরবাবু মোক্তারী পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতেছিলেন, ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?"

"সুখবর হে, সুখবর! গৃহিণী—"

"খাওয়াও তাহ'লে! ছেলে হ'য়েছে?"

রামহরিবাবু আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পুত্র নয় হে, কন্যা। তবু খাওয়াব, ছেলেমেয়ের কোনো তফাৎ নেই আমার কাছে। মিছির!"

মিছির-ঠাকুর আসিল এবং হুকুম পাইয়া মোড়ের সন্দেশের দোকানে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টার পর মেসসুদ্ধ লোক নবজাতার কল্যাণ-কামনা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিজ নিজ কামরায় প্রস্থান করিলেন। রামহরিবাবু তখন চিঠিখানা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলেন— "মেয়ের রং ফর্সা, তবে একটু ট্যারা।" রামহরিবাবু শ্যামাসুন্দরীর গলির স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারিণী সভার সদস্য ছিলেন—এ সংবাদে দমিলেন না—হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক! গুণে সব ঢাকবে। লেখাপড়া গান-বাজনাতে এমন তালিম ক'রে তুলব মেয়েকে—" ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বৌবাজারের একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ছোট সেতারের কত দাম পড়িতে পারে সেটাসুদ্ধ তখনই জানিয়া আসিলেন।

২

স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ছাড়া আর একটি লক্ষ্য রামহরিবাবুর ছিল, সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। আইন পাস করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় বার-তিনেক বি-এ ফেল করিয়া স্বগ্রাম তেঁতুলিয়া হাইস্কুলে থার্ডমাষ্টারীতে ভর্ত্তি হইলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার সিকিপরিমাণ কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করিলেন। গৃহিণী আপত্তি করিলেন, কিন্তু রামহরিবাবুকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম রঙীন ছবির বই, ক্রমে ক্রমে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম ও একটি ছোট সেতার সমস্তই কন্যাকে যোগাইলেন। গৃহিণী রুখিয়া কহিলেন, "ও ছাইপাশগুলো দিয়ে হবে কি? তার চেয়ে—" রামহরিবাবু কহিলেন, "সে ভাবনা আমার আছে।" গৃহিণী অতঃপর আর কিছু কহিলেন না।

বারো বৎসর বয়সের বীণা সেতার বাজায়; রামহরিবাবু চক্ষু মুদিয়া শোনেন, আর গৃহিণী রন্ধনশালায় ডাল সিদ্ধ করিতে বসিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে থাকেন। ভাবিতে ভাবিতেই বীণার বয়স তেরোর কোটায় গিয়া পৌঁছিল। গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার মাতামহের শ্বশুর-বংশ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত, সে ছোঁয়াচ গৃহিণীরও লাগিয়াছিল; একদিন স্পষ্টই রামহরিবাবুকে কহিলেন, "এইবার মেয়ে পার করবার ব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে থাকতে আমার বাপঠাকুর্দ্দা নরকে পচবে!" রামহরিবাবু মৃদু কহিলেন, "সে হবে।" কিন্তু সে বিষয় তাঁহার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখা গেল না। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামহরিবাবুকে অনেক কহিয়া দিনকয়েকের ছুটি লওয়াইয়া পাত্রের সন্ধানে পাঠাইলেন। রামহরিবাবু সতেরো জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী আসিয়া পাত্র-মণ্ডলীর নাম-ধাম গাঁই-গোত্র ও সেই সঙ্গে কন্যা গ্রহণের পারিশ্রমিকের অঙ্ক সমস্ত এক তালিকাভুক্ত করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যা হয় কর।"

গৃহিণী মেয়ে দেখার দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

মজলাহাটীর ভট্‌চাজ বাড়ী হইতে পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া জলযোগান্তে ফিরিয়া গেলেন; বাড়ী গিয়া মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পত্র দিবেন। শিবতলার রায়-বাড়ীর লোক মেয়ে দেখিয়া গেল। পাকা কথা হইল না। বাঁশকুড়ুলের চৌধুরী বাড়ী হইতে পাত্র স্বয়ং বন্ধুবান্ধবসহ দেখিতে আসিল; বাজনা শুনিয়া মৃদুস্বরে একটু বাহবাও দিয়া গেল। রামহরিবাবু গোপনে পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী তা হ'লে—"

ছেলেটি বিনয়ী। মাথা নীচু করিয়া কহিল, "আজ্ঞে মা সব আপনাকে লিখবেন। আমি ফিরে গিয়েই তাঁকে বলব।"

এইরূপে রামহরিবাবু কিছুদিনের মত গৃহিণীর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইলেন। এদিকে গৃহিণী দিন-কয়েক তাঁহার ভবিষ্য-জামাতৃবর্গের অভিভাবকগণের পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর জোড়া পোষ্টকার্ড লেখা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জবাব আসিতে লাগিল। মজলাহাটীর পাত্রের পিতার অসুখ, শিবতলার পাত্রের পরীক্ষার বৎসর, ইত্যাদি। বাঁশকুড়ুল হইতে যে-পত্রখানি আসিল সেটা একটু স্পষ্ট। পাত্রের মাতা লিখিয়াছেন, কন্যাটি ট্যারা;—ছেলের পছন্দ হয় নাই। পত্র পাইয়া গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠিলেন; চিঠিখানা হাতে করিয়া যেখানে রামহরিবাবু বসিয়া বীণার সেতার বাজনা শুনিতেছিলেন সেখানে গিয়াই উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেমন হ'ল তো। গুণে সব ঢাকবে না! দেখ!" বলিয়া রামহরিবাবুর নাকের ডগায় চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "যে রূপের ছিরি, তার আবার গান বাজনা! যা ঘুঁটে দিগে যা!"

বীণা সেতার রাখিয়া নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার পর পিতা ও মাতার কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা বীণা শুনিতে পাইল না, কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া মাতা অবিরত বলিতে লাগিলেন, "আহা রূপ! চোখ নয় ত নাটার বিচি!"

মাতা দ্বিপ্রহরে ঘুমাইতেছিলেন, সেই অবসরে বীণা আরশী লইয়া বসিল। এতদিন চোখে পড়ে নাই,—আজ দেখিল বাস্তবিকই ডান চোখটা অত্যন্ত ট্যারা। নিজের মুখ আরশীতে দেখিতে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। নানা রকম করিয়া আরশী ধরিয়া দেখিল; কোনো দিক হইতেই মুখখানিকে সুশ্রী দেখা গেল না। তখন আরশী ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেচারী বসিয়া রহিল। সেইদিন হইতেই বীণার বয়স যেন সহসা বাড়িয়া গেল। পিতা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ডাকিলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি জলের ঘটী লইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। রামহরিবাবু কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। কথা কহিলেন না। এদিকে গৃহিণীর পিতৃপুরুষকে নরকের দিকে আরও কয়েক পা অগ্রসর করাইয়া দিয়া আরও দুটি বৎসর চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বীণার প্রকৃতিতে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে মুখ নীচু করিয়া কথা বলা আরম্ভ করিল। বাধ্য হইয়া কখনও মুখ তুলিতে গেলে চোখের পাতা আপনা হইতেই মুদিয়া আসে—পাছে কেহ ট্যারা চোখটি দেখিয়া ফেলে! রামহরিবাবুর অবসর ছিল না; ছুটি হইলেই গৃহিণীর তাগিদে সম্ভব অসম্ভব পাত্রের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেন। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই স্কুলের কাজ। সাহস করিয়া আর বীণার বাজনা শুনিতেও চাহিতেন না। সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন। বীণাও সেতার ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সম্ভাবিত কোনও পাত্র আসিলে সেদিন আর বীণার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। তাহার চোখের সহিত নাটার বিচি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় গোলাকার বস্তুর তুলনা চলিতে থাকিত এবং কোনও মতে বিদায় হইয়া গেলেই যে পিতামাতার পিতৃপুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন তাহাও বীণা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিত।

সেদিন গৃহিণীর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। প্রভাতে নূতন একটি পাত্রের অভিভাবক মেয়ে দেখিয়া যাইবার সময় স্পষ্ট তাহার মেয়ে না-পছন্দ করিয়া গিয়াছেন।

হেতু মেয়েটি ট্যারা। রীতি অনুযায়ী বীণার লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। সমস্ত দিন না খাইয়া বীণা বিছানায় পড়িয়া রহিল; রামহরিবাবু স্কুল হইতে ফিরিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এদিকে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই বাড়িতেছিল। ঠিক এমনি সময় অঙ্গনে নূতন একটি লোকের আবির্ভাব হইল; আগন্তুককে দেখিয়াই গৃহিণীর স্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়া আসিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এস বাবা এস! কতদিন দেখিনি তোমাকে, ভাল ছিলে তো?"

আগন্তুক গৃহিণীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "এক রকম ছিলাম মাসীমা, আপনারা আছেন কেমন? মাষ্টার-মশাই কোথা?"

রামহরিবাবু গলার আওয়াজ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, "কে, সুকুমার! এস, বস এইখানটায়। তাই ভাবছিলাম গরমের ছুটিটা গেল এলে না! শহরে গিয়ে ভুলেই গেলে বুঝি আমাদের?" সুকুমার বাবরী একটু ঝাঁকাইয়া কহিল, "ভুলতে পারি আপনাদের মাষ্টার-মশাই! যে স্নেহ মমতা পেয়েছি আপনাদের কাছে, তা কি ভুলবার! বীণা কই? আছে কেমন সে?"

রামহরিবাবু না-ডাকিতেই বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রামহরিবাবু নানা বিষয়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, সুকুমার জানিত। কুশল প্রশ্নের পর সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল. "এখন কি শিখছ বীণা?" বীণা মৃদুস্বরে কহিল, "সেতার শিখ্‌ছি—" সুকুমার উৎসাহিত হইয়া কহিল, "দুর্ভাগা দেশ! ঘরে ঘরে যদি তোমার মত বীণা জন্মাতো তবে—"

কথাগুলি বীণার বড় মিষ্ট লাগিল। সমস্ত দিন তিরস্কার শোনার পর সুকুমারের এই স্নিগ্ধ কথা কয়টি শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল নানা কথার পর সুকুমার উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় বীণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়া গেল যে, কাল বৈকালে সে সেতার শুনিতে আসিবে।

(৩)

পাশের গ্রামের তালুকদারের একমাত্র পুত্র সুকুমার। যখন তেঁতুলিয়া স্কুলে সে পড়িত তখন রামহরিবাবুর বাড়ীতে সে একরূপ প্রত্যহের অতিথি ছিল। তাহার পর পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর। এখন আইন পড়িতেছে। মাঝে বাড়ীতে আসিলেই সে রামহরিবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইত।

গত বৎসর দেশে আসে নাই; দেশের ঘুমন্ত 'অন্তরলক্ষ্মী'কে জাগাইবার জন্য জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া 'জাগ্রৎ যৌবন সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়িয়াছিল; তাহারই কাজে সে ব্যস্ত ছিল। এই সমিতিরই স্থানীয় একটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বগলে 'জাগ্রৎ যৌবন সমিতি'র একগাদা ছাপা ইস্তাহার। সুকুমার বসিতেই রামহরিবাবু নিজের দুঃখ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গের মূল বিষয় বীণার বিবাহ। বিবাহের প্রসঙ্গ, সেইসঙ্গে রামহরিবাবুর মুখে কন্যার গুণ-ব্যাখ্যান শুনিতেই বীণার মা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রূপেই যে সব গুণ খেয়েছে! তুমি ত বাবা কলকাতায় থাক, একটা যেমন-তেমন দেখে শুনে মেয়েটাকে পার করে দাও!"

সুকুমার কহিল, "সে কি মাসীমা! যেমন তেমন ছেলে কি হবে? তবে ওর যোগ্য ছেলে আমি দেখব, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় কহিয়া গেলেন, "ওর যোগ্য ছেলে ত্রিভুবনে জন্মায় নি। অমন ডানাকাটা পরী—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "শুন্‌ছ! গঞ্জনা শুনে শুনে মেয়েটা একেবারে মুষ্‌ড়ে গেল। এখন লজ্জায় কারুও সাম্‌নে বেরোতেই চায় না। তুমি একটু ডেকে——"

"আচ্ছা, তা করব। বীণা কই?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

রামহরিবাবু ডাকিলেন, বীণা তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছিল, ধীরে ধীরে একখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম্‌-হরিবাবু কহিলেন, "সুকুমারকে একটু বাজনা শুনিয়ে দে।"

বাজনা শুনিয়া সুকুমার অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাজনা কে শিখাল বীণা?" বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "নিজেই শিখেছি।" রামহরিবাবু কহিলেন, "মাষ্টার রাখবার পয়সা কোথায় বাবা? তা নইলে ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে ইংরেজী আর সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব চলতি ভাষা একটু একটু শেখাই। তা জান তো উথায় হৃদি লীয়ন্তে—" সুকুমার কহিল, 'আমি বাজনা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি মাষ্টার-মশাই। ভাবছি শুধু শিক্ষার সুযোগ থাকলে বীণা কি হ'তে পারত।" কথা শুনিয়া বীণা তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিল। সুকুমার একবার অপাঙ্গে তরুণীর দিকে চাহিয়া হতভাগ্য দেশের মুক্তির জন্য বীণার ন্যায় নারীর সাহায্য কতখানি প্রয়োজন তাহা পল্লবিত ভাষায় উচ্ছ্বাসের সহিত কহিয়া গেল। রামহরিবাবু শুনিয়া সুকুমারের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "দীর্ঘজীবী হও বাবা, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।" পড়ার ঘরে দরজার আড়ালে বীণা দাঁড়াইয়া ছিল, সুকুমারের কথাগুলিতে সে যেন এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিল, তাহার সমস্ত মন আনন্দে ও ভরসায় সজীব হইয়া উঠিল।

বীণাকে দেশ-বিদেশের নারী-প্রগতির কাহিনী শুনাইতে রামহরিবাবু সুকুমারকে বলিয়াছিলেন। সুকুমার প্রত্যহ নিয়মিত আসিত এবং তাহার সমিতির উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের অধিকার প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া বীণার অন্তর-লক্ষ্মীকে জাগাইবার চেষ্টা করিত। বীণা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না, যে-কথা বুঝিত না তাহাও তাহার ভাল লাগিত। সুকুমারের কথা শোনা নেশার মত ক্রমে ক্রমে তাহাকে পাইয়া বসিল। সেদিন কি কারণে সুকুমারের আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, বীণার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। এমন সময় সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরি হ'ল কেন?" কথার সুরে অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, সুকুমার বুঝিল। বীণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "আমি না আস্‌লে কষ্ট হয় তোমার বীণা?" বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হ্যাঁ।" সুকুমার মৃদু হাসিল, তাহার পর বীণার দুই কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া কহিল, "আর আমি দেরি ক'রে আস্‌ব না বীণা, কিন্তু তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে, বল রাখবে?"

বীণা কহিল, "রাখব। কি কথা?" সুকুমার কহিল, "আমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকতে হবে, 'আপনি' বলতে পারবে না।" বীণা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "সে আমি পারব না, আমার লজ্জা করবে।" কিন্তু বীণার লজ্জা বেশীক্ষণ রহিল না, সুকুমার সেইদিনই বীণাকে 'তুমি' বলাইয়া ছাড়িল।

সেদিন বীণার মনে হইল সুকুমার বড় আপনার হইয়া গিয়াছে। পড়ার ঘরে বসিয়া সুকুমারের মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমাগতই বীণা তাহাকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন বীণা ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্ন দেখিল সুকুমার তাহার হাত ধরিয়া এক নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে।

ক্রমে সুকুমারের ছুটি ফুরাইল, বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল বীণা কাঁদিতেছে। "কাঁদছ কেন বীণা?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি চলে যাচ্ছ যে।" বীণা অতি মৃদুস্বরে কহিল।

"সামনের ছুটিতেই আবার আসব বীণা, তুমি কেঁদো না" বলিয়া সুকুমার রুমাল বাহির করিয়া বীণার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

বীণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমারের ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে ঘৃণা করবে না বল।"

সুকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ঘৃণা কেন তোমাকে করব বীণা? কি করেছ তুমি?"

বীণা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখ নীচু করিয়াই কহিল, "আমি যে ট্যারা আমাকে—" বলিয়াই বীণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুকের মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তেই বীণার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া সে কহিল, "তুমি ট্যারা বলেই তো আরও বেশী করে তোমার ভাল লাগে বীণা।" কথা শুনিয়া বীণার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল।

যাইবার সময়ে গৃহিণী সুকুমারকে একটি পাত্র দেখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। রামহরিবাবু সুকুমারের সম্মুখেই কহিলেন, "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, সুকুমার যখন কথা দিয়েছে, তখন কাজ কর্বেই। ওরা অসাধ্য সাধন করতে পারে।"

৪

সুকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতেই বীণা যেন একটা স্বতন্ত্র মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে মায়ের ভৎসনা শুনিয়া পিতার কাছে মাঝে মাঝে সে নালিশ করিত, আজকাল গালাগালি শুনিলে পড়ার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করে।

জবাব না পাইলে গৃহিণীর বকুনী ভাল জমিত না। ক্রমাগত বকিতে না পারিলে উত্তেজনায় তাঁহার মাথা ধরিত, কাজেই একদিন বীণার অকারণ ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া তিনি রামহরিবাবুকে বলিলেন, "ওগো শুনছ? মেয়ের যে আর একটা গুণ বাড়ল। ছিল ট্যারা, হ'ল বোবা। গালাগাল দিলেও কথা বলে না আর।" রামহরিবাবু বীণার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হেতুও প্রায় অনুমান করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে কয়েক দিন হইতে কন্যার একটা চমৎকার দাম্পত্য জীবনের চিত্র তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, তিনি গৃহিণীর অভিযোগের উত্তরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মেয়ে বড় হ'য়েছে, এখন আর রূপের খোঁটা দিও না। তোমার অদৃষ্টে ভাল জামাই আছে, ব'লে দিচ্ছি।"

গৃহিণীর হঠাৎ রামহরিবাবুর কথা কয়টি কেন যেন অত্যন্ত ভাল লাগিল, বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

রামহরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, গত তিন বৎসরের মধ্যে গৃহিণীর মুখে এমন মধুর কথা তিনি শোনেন নাই, নিবন্ত কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া তিনি প্রাণপণে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

সুকুমার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকখানা খাম রাখিয়া গিয়াছিল। আদেশ ছিল, বীণা যেন সপ্তাহে দুখানি করিয়া চিঠি লেখে।

কয়েক দিন তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া সেদিন বীণা সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া বীণা চিঠি লিখিল এবং চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া বীণার মন অনেকটা লঘু হইয়া গেল।

৫

টেবিলের উপরে বড় আয়না রাখিয়া সুকুমার মুখে 'স্নো' মাখিতেছিল। তাহার চৌকীতে বসিয়া তাহাদের সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নৃপেন দত্ত একখানি বৃহদাকার ডিকসনারী বাজাইয়া গজল গাহিতেছিল। এই সময় দারোয়ান ডাকের চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল। নৃপেন চিঠির উপরে চোখ বুলাইয়া কহিল, "এ কি হে সুকুমার, তোমারই হাতের লেখা ঠিকানা দেখছি যে।"

কাহার চিঠি সুকুমার বুঝিল। তাড়াতাড়ি 'স্নো'র শিশিটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া হাত বাড়াইল।

নৃপেন চিঠিখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "কার চিঠি আগে বল।"

সুকুমার কহিল, "দাও আগে পড়েনি, তারপর দেখাব।"

বলা বাহুল্য, চিঠিখানি বীণার। সুদীর্ঘ পত্র। সুকুমার একবার চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া মুখে 'স্নো' মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুমি একবার ভাল ক'রে জোরে পড় নৃপেন, আমি শুনছি।

নৃপেন পড়িল। বীণা লিখিয়াছে—

"তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমার কিছু ভালো লাগিতেছে না। লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা করে না, তুমি রাগ করিবে বলিয়া জোর করিয়া পড়িতে বসি।

যে পথ দিয়া তুমি আসিতে সেই পথের দিকে জানলা দিয়া চাহিয়া থাকি, তুমি শীঘ্র আসিবে। না আসিলে লেখাপড়া সমস্ত ভুলিয়া যাইব, ইত্যাদি।" এইকথা কয়টিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বীণা পাঁচ পাতা চিঠি লিখিয়াছে। নৃপেন চিঠি পড়িয়া কহিল, "খুব গেঁথেছ যা হোক! কে ইনি?"

সুকুমার তোয়ালে দিয়া মুখ ঘষিতে ঘষিতে কহিল,

"সে খবর এখন শুনো না। চিঠিটা দাও দেখি, চট্‌পট্ একটা জবাব লিখে দিই।"

"শেষটা কি হয় একবার জানিয়ো ভাই।" বলিয়া চিঠি রাখিয়া নৃপেন সুকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারকে চিঠি পাঠাইবার পর হইতে কেবলই বীণার মনে হইয়াছে যাহা লিখিবার ছিল তাহা লেখা হয় নাই। নিজের এই ত্রুটিতে ক্রমাগতই সে লজ্জিত হইতেছিল। ভাবিতেছিল, সুকুমার হয়ত রাগ করিবে এবং চিঠির জবাবই দিবে না, কিন্তু যথারীতি জবাব আসিল। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বার-বার বীণা চিঠিখানা পড়িল। উৎসবের বাঁশীর সুরের মত চিঠির কথাগুলি তাহার কানের মধ্যে সমস্ত দিন ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

চিঠিতে অনেক কথাই ছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুকুমারের মন উদাস হইয়া যায়; পড়িতে বসিলে একজনের স্নিগ্ধ আঁখি বহির পাতায় ভাসিয়া ওঠে, তাহারই হাতের সেলাই রুমালখানা বুক পকেটে নীরব গুঞ্জরণে গান গাহিতে থাকে। সুকুমারের এই প্রকার মারাত্মক অবস্থার বর্ণনায় চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পূর্ণ ছিল, শেষের দিকে গুটিকয়েক উপদেশও ছিল।

সন্ধ্যায় চিঠিখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিবার পূর্ব্বে তাহার উপরে মাথা রাখিয়া বীণা আপন-মনে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার উপযুক্ত হতে পারি।"

রামহরিবাবুর সেদিনকার কথা গৃহিণীর মনে ছিল; এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তিনি করেন নাই। কাজেই স্বামীর তাম্রকূট সেবন ও কন্যার সঙ্গীত-চর্চ্চা একপ্রকার অব্যাহতই চলিতেছিল, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি আবার সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। সুকুমার বীণার নিকট চিঠি লেখে, রামহরিবাবু তাহা জানিতেন। কহিলেন, "সুকুমার ঠিক করবে বলে গেছে। দেখ তো——"

গৃহিণী অবিশ্বাসের স্বরে কহিলেন, "হ্যাঃ, তার আবার সেকথা মনে আছে! বড়মানুষের ছেলে—গরীবের কথা ভাবতে দায় পড়েছে তার।" বীণা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, মায়ের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিল। রামহরিবাবু চশমা জোড়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "দেখ তো আর মাসখানেক, সে তো সামনের ছুটিতেই আসছে, বোঝা-পড়া তার সঙ্গেই কোরো।" বলিয়াই পরম নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন। সুকুমার পাত্র স্থির করিয়া দিবে এ সম্বন্ধে গৃহিণীর সন্দেহমাত্র ছিল না, সে শীঘ্রই আসিতেছে শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন।

বড়দিনের ছুটিতে সুকুমারের আসিবার কথা। পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন সম্বলিত একখানি পকেট পঞ্জিকা জোগাড় করিয়া বীণা—প্রত্যহ বড়দিনের তারিখ দেখিত। দিনগুলি অতি মন্থর গতিতে কাটিতেছিল। ক্রমে বড়দিন আসিল। সেইসঙ্গে সুকুমার আসিল। সন্ধ্যায় সুকুমারের সহিত বীণার সাক্ষাৎ হইল। সুকুমারের বুকে মুখ রাখিয়া বীণা কহিল, "তুমি বাবাকে বোলো, আমি কলকাতায় পড়ব। তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।"

সুকুমার কহিল, "তোমার বাবার যদি মত না হয়?"

বীণা মুখ তুলিয়া কহিল, "আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেয়ো।"

সুকুমার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আগে ইস্কুল ঠিক করি, তার পর জিজ্ঞেস করব।"

গৃহিণী প্রত্যহই সঙ্কল্প করেন, বীণার পাত্রের কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিবেন কিন্তু অবকাশ হয় না। বিশেষ রামহরিবাবু পত্নীকে বলিয়াছিলেন, সুকুমার নিজে বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ না তুলিলে তিনি যেন সুকুমারকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। দিনকয়েক গৃহিণী স্বামীর আদেশ অতি কষ্টে পালন করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বদিন যখন সুকুমার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে গেল, গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না। সুকুমার কবে ফিরিবে সেকথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িলেন। সুকুমার কহিল, "তার এত তাড়াতাড়ি কিসের মাসী-মা! লেখাপড়া শিখুক!" গৃহিণী কহিলেন,

"তাড়াতাড়ি কিসের বলিস নে বাছা, আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছরে—"

এ কথা সুকুমার পূর্ব্বেও শুনিয়াছে, জানিত গৃহিণীর নিজের বিবাহের কাহিনী অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের পূর্ব্বে শেষ হইবে না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সুকুমার কহিল, "পাত্র এক রকম দেখেই রেখেছি মাসী-মা, ব্যস্ত হবেন না। সামনের পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ঠিক করব।" বলিয়া সে আঙিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল, গৃহিণী ঘরের মধ্য হইতেই কহিলেন, "পাসফাশে কাজ নেই বাছা, যেমন-তেমন একটা দেখে-শুনে—"

সুকুমার যাইতে যাইতে জবাব দিল, "বীণাকে যদি ফেলে দিতেই হয় মাসীমা তবে না হয় আমাকেই—দেবেন" বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। কথা কয়টি সুকুমার খেয়ালের মুখেই কহিয়া গেল এবং কি কহিল পথে যাইতে তাহা চিন্তাও করিল না। অথচ এই কথায় রামহরিবাবুর ক্ষুদ্র গৃহস্থালী তুমুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। গৃহিণী ব্যঞ্জনের কড়াইটা ধুপ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া খন্তি হাতে করিয়াই রামহরিবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা! সুকুমার যেন কি ব'লে গেল।" রামহরিবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, গলাটা অত্যন্ত ধরিয়া আসিয়াছিল, বার-দুই কাশিয়া কহিলেন, "শুনতে তো পেলে! আমি আর—"

গৃহিণী খন্তিখানা রামহরিবাবুর গালে ঠেকাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, "বলই না শুনি, আমার যে গা কেমন কেমন করছে।" রামহরিবাবু বলিলেন, "বললে যে মেয়ে ফেলে দিতে হ'লে তাকেই দিতে। এখন যাও জল আন, মুখটা তো এঁটো করে দিয়েছ।" গৃহিণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বীণা সুকুমারের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হয় নাই। বিধাতার চোখে সে যে সুকুমারেরই স্ত্রী এ কথা সুকুমারের মুখেই সে সহস্রবার শুনিয়াছে, কিন্তু সকলের সম্মুখে সুকুমার এই কথা কহিয়া গেল দেখিয়া তাহার আর লজ্জার পরিসীমা রহিল না। সে-রাত্রে আর সে কাহারও সম্মুখে বাহির হইল না, খাইতে ডাকিলেও উঠিল না। রামহরিবাবু কহিলেন, "থাক্, ডেকো না—লজ্জা পেয়েছে!"

সেদিন রাত্রে মৃদুগুঞ্জনে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ চলিল এবং দিন-দুই পর একদিন পাঁজি দেখিয়া রামহরিবাবু সুকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুকুমারের বিবাহের কথা পাড়িতেই তাহার পিতা ব্রজদুলালবাবু কহিলেন, "ছেলের বিয়েতে আমার কোনো হাত নেই। ছেলের মত হ'লেই হ'ল। জানেন ত আজকালকার ছেলে।"

কথা শুনিয়া রামহরিবাবু আশ্বস্ত হইলেন এবং অনেক বিনীত অনুরোধ সহকারে সুকুমারের পিতাকে কন্যা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ব্রজদুলালবাবু মুখে কিছু বলিলেন না, রামহরিবাবু চলিয়া গেলে অন্তঃপুরে যাইয়া সুকুমারের মাতাকে সমস্ত কহিতেই তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "ওমা! সে কি কথা! রামহরি মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে!" তাঁহার আর কথা যোগাইল না। ব্রজদুলালবাবুর সাংসারিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। রামহরিবাবুর পরিবারের সহিত সুকুমারের হৃদ্যতা ছিল একথা তিনি জানিতেন। সুকুমারের মাতাকেও তাহা জানাইয়া দিলেন। সুকুমারের মাতা সকল কথাগুলি শুনিয়া পাত্রী দেখিতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সমস্ত দিন মুখ ভার করিয়া রহিলেন। বীণা নিবিষ্ট হইয়া সুকুমারকে একখানি পত্র লিখিতেছিল; মাতা আসিয়া কহিলেন, "লেখাপড়া থাক্ না আজ, সাবান মেখে স্নান করে নে। তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে।" কিছুদিন হইতে বীণা নির্ভয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলিত; চিঠির কাগজখানি উল্টাইয়া রাখিয়া কহিল, "আমাকে কি কেউ কোনো দিন দেখেনি মা, যে নতুন করে দেখতে আসবে?"

কথার ঝোঁকটা কাহার উপর গিয়া পড়িল গৃহিণী তাহা বুঝিলেন; বীণাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিলেন, "নে মা, আজ এই একটা দিন ছাড়া আর তোকে বলব না, ওঠ! বাপেরও তো পছন্দ চাই—"

বীণা গর্ গর্ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ব্রজদুলালবাবু সুকুমারের মাতুলের সঙ্গে

বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। ইতিপূর্ব্বে কাহারও সম্মুখে আসিতে এত ভয় তাহার কোনো দিন হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল যদি পছন্দ না হয়! এতদিন পরে আবার ট্যারা চোখ্‌টা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়িল। সুকুমারের পিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন তাহাও সে দেখিয়াছিল, ডান চোখের তারাটিকে ঠিক্ চোখের মাঝখানে আনিবার জন্ম সে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল এবং এই অসম্ভব-প্রয়াসে তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজদুলালবাবু বীণার অবস্থা বুঝিলেন, কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মৃদু আশীর্ব্বচনের সঙ্গে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

বীণা চলিয়া গেলে রামহরিবাবুর সহিত সুকুমারের মাতুলের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহারা মেয়ে দেখানো নিয়ম রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র—বিবাহ-বিষয়ে ছেলের মতই চরম এবং তাহাকে শীঘ্রই পত্র লেখা হইবে। ঘরের পিছনে বীণা দাঁড়াইয়া শুনিল এবং এই কথায় তাহার বুকের দুর্ভাবনার বোঝা নামিয়া গেল।

সেদিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিয়া বীণা অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করিল। সুকুমারের পিতা আসিয়া যে তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন সে-কথার উল্লেখ করিতেও ভুলিল না।

৬

সেদিন সুকুমারের অবকাশ আদৌ ছিল না। সন্ধ্যায় তাহাদের সমিতিতে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল সুকুমার তাহাই লিখিতেছিল এবং নৃপেন দত্ত টোস্ট ধরাইতেছিল। এই সময়ে ডাকের চিঠি আসিল। বীণার চিঠিখানা খুলিয়া সুকুমার পড়িতে বসিল। সমস্তই পুরাতন কথা। সেই ভাল না লাগা দিবারাত্রি অস্বস্তিবোধ —প্রতি সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলা—সুকুমার পাতাগুলি একবার উলটাইয়া গেল। চিঠির শেষের দিকে একটা কথা ছিল, পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল, বীণা লিখিয়াছে, "শ্বশুর আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন।" সেই সঙ্গেই আর একছত্রে লেখা আছে, "বলিয়াছেন তোমার মতেই তাঁহাদের মত।" চিঠিখানা ফেলিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িতেই সুকুমারের মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। চিঠিখানা তাহার মায়ের। সে—চিঠিতে রামহরিবাবুর সহিত তাহার পিতার সাক্ষাতের কথা এবং রামহরিবাবুর অনুরোধে তাঁহার কন্যাকে দেখার বিশদ বিবরণ লেখা ছিল। তৃতীয় পত্র রামহরিবাবুর। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুকুমারের কথাতে ভরসা পাইয়া তিনি ব্রজদুলালবাবুকে কন্যা দেখাইয়াছেন। যে-মাসে তাহার পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় সেই মাসেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা। সুকুমারের পত্র পাইলেই ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই সুকুমার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ননসেন্স'। নৃপেন দত্তের হাত হইতে ডিমের প্লেট পড়িয়া গেল, সে কহিয়া উঠিল, "ব্যাপার কিহে সুকুমার!" কতকগুলি ইংরেজী ভাষায় গালাগালি বকিতে বকিতে সুকুমার চিঠি তিনখানা মুঠা করিয়া নৃপেন দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। নৃপেন ধীরভাবে চিঠিগুলি পড়িয়া কহিল, "এতদূর এগিয়েছ যখন—" সুকুমার রুখিয়া উঠিল, কহিল, "কি বল্‌ছ বিয়ে করব!"

নৃপেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "অগত্যা! তা নইলে গায়ে কাদা মাখ্‌লে কেন, বল?" সুকুমার রুক্ষস্বরে কহিল, "দোষ কার? ফড়িং আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাখনা পুড়িয়েছে, দোষ কি আগুনের? বেশ বল্‌চ? তুমি আমার হ'য়ে মাকে চিঠি লিখে দাও আমি বলে যাচ্ছি।"

নৃপেন দত্ত কহিল, "ও সব ক'রোনা সুকুমার। তার চেয়ে অশ্বত্থামা হত ইতি ক'রে একটা চিঠি লিখে পশ্চিমে বেরিয়ে পড়। আস্তে আস্তে বেচারী সব ভুলে যাবে।"

সুকুমার কহিল, "তুমি জান না তাকে, হয়ত বাপের সঙ্গে এসেই পড়বে। সে এক কেলেঙ্কারী! মুখ দেখাতে পারব না! তার চেয়ে যা বলছি তা-ই কর। ছেঁড়া নৌকার আগুন নিবিয়ে দাও। আজকের মিটিংটাই মাটি হ'ল দেখছি!" বলিয়া সুকুমার চিঠির কাগজ বাহির করিল। নৃপেন নিজ নামে সুকুমারের পরামর্শ মত সুকুমারের মায়ের

কাছে পত্র লিখিল। বর্ত্তমানে বিবাহের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি—শেষে রামহরিবাবুর কন্তাকে বিবাহ করিতে আপত্তির বিচিত্র কারণ দেখাইয়া সে চিঠি শেষ করিল। মেয়েটি যে অত্যন্ত ট্যারা এ কথাটিও নৃপেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুকুমার লিখাইয়া দিল। চিঠিখানা নিজ হাতে ডাকে পাঠাইয়া সুকুমার মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচ্‌লাম হে! বড়ই ঘোরালো হ'য়ে উঠেছিল!"

নৃপেন দত্তের চিঠি পড়িয়া সুকুমারের মাতা ব্রজদুলাল-বাবুকে সগর্ব্বে কহিলেন, "দেখ্‌লে তো! তেমন ছেলেই গর্ভে ধরিনি। দাও চিঠি পাঠিয়ে মাষ্টারের বাড়ী।"

ব্রজদুলালবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "ছিঃ, তার চেয়ে লোক দিয়ে ব'লে পাঠাও এখন বিয়েতে ছেলের মত নেই।"

সুকুমারের মাতা কহিলেন, "উঁহু, মাষ্টারের মেয়ে ছেলেকে তাহলে 'গুণ' করবে।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন এবং নৃপেন দত্তের চিঠিখানা কান্ত দাসীর হাতে প্রাতঃকালেই যথাস্থানে রওনা হইয়া গেল।

বীণা সুকুমারের জন্ত একটা বালিশের ওয়াড় সেলাই করিয়া তাহাতে একজোড়া গোলাপ ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় মায়ের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার মাতা মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন, আর চীৎকার করিতেছেন, "ওরে আমার পোড়া কপাল।" দাওয়ায় শুকমুখে রামহরিবাবু একটি খুঁটি ধরিয়া বসিয়া আছেন আর কান্তদাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুকুমারের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া শঙ্কা-বিহ্বলস্বরে কহিল, "কি মা!", গৃহিণী বীণাকে দূর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "দূর্ হ! কালামুখী! দূর্ হ! মুখ দেখাস্ নি আর! দেখগে যা চিঠিতে কি লিখেছে!" বীণা কান্তদাসীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে, তখনও বীণা কাঠের পুতুলের মত নৃপেন দত্তের চিঠিখানা হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার যে কি হইয়াছে তাহা সে ভাবিতেও পারিতেছিল না। গত কয়েক মাসের বড় ছোট সকল ঘটনা, সুকুমারের প্রত্যেকটা কথা মনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল। সকল কথার মধ্যে একটি কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল, সুকুমার বলিয়াছিল—"ট্যারা বলেই তোমাকে আরও বেশী ভাল লাগে!" সুকুমার আজ লিখিয়াছে সে ট্যারা! ভাবিতে ভাবিতে দেয়ালে টাঙানো সুকুমারের ছবিখানার দিকে তাহার চোখ পড়িল; ভাবিল সুকুমারের সম্মুখের উঁচু দাঁত দুটি তো তাহার চোখে কোনো দিন কুশ্রী লাগে নাই। কেবলই মনে হইয়াছে দাঁত দুটি উঁচু না হইলে যেন মোটেই মানাইত না, কিন্তু তাহার ট্যারা চোখটি সুকুমারের চোখে বিশ্রী লাগিল কি করিয়া! "নাও, হয়েছে! খুব চলিয়েছ এখন দুটো গিলে নাও!" বলিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর কন্তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বীণা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যাকালে রামহরিবাবু ফিরিয়া অতি শুষ্কস্বরে বীণাকে ডাকিলেন, সে সাড়া দিল না। খাইবার জন্ত গৃহিণী ডাকিলেন, মাথাধরার অছিলায় সে বিছানায় পড়িয়া রহিল। রামহরিবাবু শুধু কহিলেন, "ওকে আর আজ ডেকো না।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া বীণা সুকুমারের চিঠি-গুলি পড়িল, তারপর সুকুমারের ছবিখানার দিকে চিঠি-গুলি আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "এসব তা'হলে মিছে কথা! আমি শুধু ট্যারা!"

ট্যারা! ট্যারা! কথাটি মনে করিতেই মাথার মধ্যে তাহার কেমন ওলটপালট হইয়া গেল। মনে হইল চোখটার সঙ্গে যেন সমস্ত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই; ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের উপর হইতে কখন বীণা পেন্সিল কাটা ছুরিখানা তুলিয়া লইল।

*　　*　　*

আর্ত্তনাদ শুনিয়া রামহরিবাবু ও তাহার পশ্চাৎ গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন বীণার সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে আর ছুরিখানা ডান চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে।

সংবাদটি যথারীতি সুকুমারের নিকট গিয়া পৌছিল

তবে অন্ত ধরণে, তাহার মাতা লিখিয়াছেন, "ছুরির খোঁচা লাগিয়া রামহরি মাষ্টারের মেয়ের ডান চোখটা একেবারে কানা হইয়া গিয়াছে।"

অ...র দাড়ি কামানো বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্র-পাঠে রত নৃপেন দত্তের দিকে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "দেখ্‌লি নৃপেন্, ভাগ্যিস্—"

কুমার-সম্ভবে সমাজতত্ত্ব

শ্রীফণীভূষণ রায়

কাব্যের প্রকৃষ্ট শ্রোতা হইলেন মহাকাল, কারণ কাব্য কোনো বিশেষ কালের সামগ্রী নহে—চিরকালের। তবুও সকল কাব্যই একটা বিশেষ কালে রচিত হয় এবং সেই বিশেষ কালকে না বুঝিলে কাব্য বুঝিবার পক্ষে কোনো গুরুতর ক্ষতি না হইলেও কবিকে বুঝিবার পক্ষে অনেক অন্তরায় ঘটে। এই হিসাবে সংস্কৃত কবিরা আমাদের অবোধ্য। কোন্ কালকে আশ্রয় করিয়া যে তাঁহারা চিরকালের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা জানি না; কারণ আমাদের দেশের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নাই - রাজনৈতিক ইতিহাসও নাই, সংস্কৃতির ইতিহাসও নাই। এই অবস্থায় কাব্য-কথা হইতে, কাব্যের গূঢ় নিবেদন হইতে কবিকে বুঝিবার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া কুমার-সম্ভব কাব্য এবং সেই কাব্যের কবিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আগেই বলিয়া রাখা ভাল—আজ ১৩৩৭ সনে হিন্দু সভ্যতা বলিলে বুঝি বৈদিক সভ্যতা ও বৌদ্ধ সভ্যতার গঙ্গা-যমুনা মিলন। কিন্তু এককালে এই দুই সভ্যতা পাশাপাশি চলিয়াছিল, পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া। এখন প্রশ্ন, মহাকবি কালিদাস এই প্রতিযোগী সভ্যতাদ্বয়ের কোন্‌টিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্য-জগতকে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইলে মহাকবির যুগনির্ণয় করা সহজসাধ্য হইবে। দেখা যাক্, কুমার কাব্য হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব কি না।

মহাকবি কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্য বিবাহ ও বধের কাব্য। হরগৌরীর পরিণয় এবং তারকাসুরের বধ—ইহাই কুমার কাব্যের কথাবস্তু। সুতরাং কোনো কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলা চলে—কুমার কাব্য হিন্দু কাব্য, কারণ বিবাহ ও বধের (হিংসার) উপর বৌদ্ধবিদ্বেষ বিশ্ববিশ্রুত। তবুও প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি—কাব্যনিহিত প্রমাণ—মদনভস্ম ও গৌরীর তপস্যা।

কুমার-সম্ভবে মহাকবি শিবকে প্রথমে দেখাইয়াছেন বুদ্ধের মত ধ্যানস্থ, শেষে দেখাইয়াছেন বশিষ্ঠের মত গৃহিণী-সহায় (স্যপত্ন্যো মূল কারণম্)। বুদ্ধের ও বশিষ্ঠের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, কুমার কাব্যে তাহা তিনি দূর করিয়াছেন: কেন? কুমার-সম্ভবের তত্ত্ব বুঝিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাইব—ধ্যানী শিব কেন যে অর্দ্ধ-নারীশ্বর হইলেন বুঝিতে পারিব।

আমরা পুরাণাদিতে পড়ি, কোনো ঋষি উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলে স্বর্গাধিপ ইন্দ্র সেই কৃচ্ছ্রসাধনে সচকিত হইতেন এবং সেই উগ্রতপস্বীর তপস্যা বিঘ্নের আশু ব্যবস্থা করিতেন। আর ব্যবস্থাও ছিল উত্তম। ঘন ঘোর আকাশতলে সর্পিল বিদ্যুতে আমরা ইন্দ্রের শক্তির পরিচয় পাই, ইন্দ্র বজ্রধর; কিন্তু ইন্দ্রের হাতে আর এক রকমের বজ্র আছে। মহাকবি বলেন, উর্ব্বশী সুকুমারং প্রহরণং মহেন্দ্রস্য। উর্ব্বশী হইল ইন্দ্রের হাতে সুকুমারং প্রহরণং পেলব বজ্র। দৈত্যের বুকে ইন্দ্র করিতেন বজ্রাঘাত, কিন্তু তপস্বীর বুকে করিতেন—উর্ব্বশী-আঘাত।

উত্তরতই নিঃসন্দেহে জয় লাভ হইত। ইন্দ্র তাই কেবল বৃত্রহা নহেন—বিশ্বামিত্রহাও বটেন। কুমার-সম্ভবের ধ্যানী শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্য উর্ব্বশী-আঘাত, অর্থাৎ পার্ব্বতী-আঘাতই যথেষ্ট হইত—কাব্যখানা যদি-না বৌদ্ধ যুগের পরে লেখা হইত। সোক্রাতেসের আবির্ভাবের পরে গ্রীকদিগের পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা যেমন বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিয়াছিল ('মননের' দ্বারা সোক্রাতেস 'বেদনা'র মধ্যে অসঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন কি না), সেইরূপ বৌদ্ধ আক্রমণের পর পার্ব্বতীর দ্বারা হরধ্যান-ভঙ্গ অসম্ভব হইয়াই পড়িয়াছিল। পার্ব্বতী-আঘাতে হরধ্যান ভঙ্গ তাৎকালিক মনীষীরা কিছুতেই মানিয়া লইতেন না। সুতরাং মহাকবিকে নূতন কথা শুনাইতে হইল। বিশ্বামিত্রহা ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন—মদন ভস্মীভূত হইল—মদন-বধূর বিলাপে বিশ্ব মুখর হইয়া উঠিল এবং বসন্ত পুষ্পাভরণা রত্তেরপি স্ত্রীপদ মাদধানা গৌরীকে আত্মনঃ ললিতং বপুঃ ব্যর্থং সমর্থ্য, শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইল। কুমার কাব্যের এইখানেই (৩য় স্বর্গ) যদি যবনিকা পড়িত তবে কাব্যখানা হইত বৌদ্ধ কাব্য। মহাকবি এইখানেই থামেন নাই—বৌদ্ধদিগের কথা মানিয়া লইয়া বৌদ্ধদিগকে এমন কথা শুনাইয়াছেন যাহা হিন্দুর কথা, বুদ্ধকে অবলীলাক্রমে বশিষ্ঠে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন—মদন-দহন শিবকে অনায়াসেই 'সদারসন্তোষী' করিয়াছেন। ভাঙ্গনের জোড়া লাগাইতে মহাকবি অদ্বিতীয়। ভাঙ্গনের কিরূপে জোড়া লাগিল—এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ছবি অনেকেই দেখিয়াছেন—নির্ভর-প্রসুপ্তা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া মধ্যরাত্রে সিদ্ধার্থ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই যে পলায়ন, ইহা কেবল দৈহিক নহে, মানসিক,—মনসা মথুরাং গচ্ছামি—সেইরূপ মনে মনে দৌড়। সিদ্ধার্থ পলায়ন করিলেন, গৃহত্যাগ করিলেন—তপস্যার দ্বারা রূপকে জয় করিবার জন্য। মহাকবি তপস্যার শক্তি মানিয়া লইয়াছেন, মদনকে ভস্মীভূত করাইয়াছেন, কিন্তু—এই কিন্তুতেই কুমার-কাব্যের বিশেষত্ব। নির্ভর-প্রসুপ্তা নারীকে না হয় পরিত্যাগ করা গেল (যদিচ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং... হিসাবে বাল্মীকি-সাপের ভয় থাকে), কিন্তু যে নারী

—সাত্যন্ত হিমোৎকরানিলাঃ
সহস্তরাত্রীরুদবাসতৎপরা—

তাঁহাকে কি করিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? নারীকে না হয় অস্বীকার করা গেল, কিন্তু তপস্বিনীকে কি করিয়া অস্বীকার করা যাইবে? রূপকে না হয় তপস্যার দ্বারা দূরীভূত করিলাম, কিন্তু যে-রূপ তপস্যার দ্বারা সার্থক, তাহাকে জয় করিবার অস্ত্র কোথায়? রূপের সঙ্গে তপস্যার সংযোগ হইলে তাহার গতি কে রোধ করিবে? তখন

স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
সমাললম্বে বৃষরাজ কেতনঃ

"সমাললম্বে" ছাড়া কোনো গতি থাকে না! সুতরাং দেখিলাম ভাঙ্গনের জোড়া লাগিল শিব-সীমন্তিনী শিবের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মদনভস্মের প্রচণ্ড বাধাকে অতিক্রম করিয়া বহুবিলম্বিত এই যে মিলন—হরিরগ্নির মিলনের শাশ্বত সৌন্দর্য্যে সুসমাহিত হইয়া উঠিল - ধ্যানী শিব অর্দ্ধ-নারীশ্বর হইলেন। কুমার-কাব্যের ইহাই হইল হিন্দুত্ব—মহাকবির ইহাই হইল কল্পান্ত, স্থায়ী কীর্ত্তি। বৌদ্ধবিপ্লবের পরবর্ত্তী হিন্দু-অভ্যুত্থান যুগে কাব্যখানা রচিত না হইলে কাব্যকথায় এইরূপ ছাঁদ কখনই থাকিত না—তপস্যাপরায়ণা পার্ব্বতীকে কখনই পাইতাম না।

এখন যদি আমরা কালিদাসের যুগ হইতে আধুনিক যুগে আসি তবে দেখি মহাকবি-নির্দ্দিষ্ট পন্থাই শাশ্বত মিলনের পন্থা - কেবল এই দেশে নয়, সর্ব্বদেশে। সর্ব্বত্রই দেখি রূপের সঙ্গে তপস্যা-সংযোগ না হইলে অবিনাশী প্রেম গঠিত হইয়া উঠে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "The essential of romantic love is that it regards the beloved object as very difficult to possess and as very precious". As very difficult to possess অর্থাৎ বহুল আয়াসের ধন—পথে-পড়িয়া-পাওয়া চৌদ্দ-আনা নহে। তবু পঞ্চম সর্গে পার্ব্বতীর তপস্যা দেখিয়া এই একটা

মনে সংশয় হয়—তপস্যার মোহে পড়িয়া যদি পার্ব্বতী শিবকে ভুলিয়া যান—বরফ-ঢাকা নদীর মত যদি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হ'ন—এক কথায়, যদি বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে ত মহতিবিনষ্টিঃ, কিন্তু হয় নাই। গৌরী তপস্যা করিয়া রূপকে সার্থক করিয়াছেন—মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—গৌরী 'ঘর বাঁধিবার' তপস্যা করিয়াছেন, ঘর ভাঙিবার তপস্যা করেন নাই। (ওথেলোতে সেক্সপীয়র এই মহা-তপস্যার কথাই বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গল্পটিকে বিয়োগান্ত করিয়া লঙ্কাকাণ্ড করিয়াছেন)। এই ঘর বাঁধিবার তপস্যায় গৌরী শিব-গৃহিণী—হিন্দুগৃহিণী হইলেন। বৌদ্ধ মতবাদ নর-নারীর মিলনের পথে যে অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল, পার্ব্বতীর ঘর বাঁধিবার তপস্যায় তাহা বিদূরিত হইল। কাব্যক্ষেত্রেও দেখি, সমস্ত বিক্ষোভকে পার্ব্বতীর তপস্যা শান্ত ও সমাহিত করিয়া তুলিয়াছে, সকল প্রকার ক্ষতিই পূরাইয়া তুলিয়াছে। তাই, মহাকবি যে গভীর আনন্দের মধ্যে কাব্যখানা শেষ করিয়াছেন, তাহা অতি সুসঙ্গতই হইয়াছে। যে মিলনের সূচনায় আর্ত্তকণ্ঠ দেবতাদিগকে বলিতে হইয়াছিল—ক্রোধং সংহর সংহরেতি—যে মিলন ঘটাইতে যাইয়া রতিকে "স্তন-সম্বাধমুরোজঘান চ" করিতে হইয়াছিল—কুমার কাব্যের উপসংহার কিন্তু সেই মিলনেই—হর-গৌরীর বাসর-শয্যায়।

দান্তের কাব্যে দশ মূক শতাব্দী বাণী পাইয়াছিল—কুমার-কাব্যে একটা মহাজাতি—একটা মহাদেশ—একটা মহাসংস্কৃতি বাণী পাইয়াছে।

মরা গাঙ্

শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী

এই মরা গাঙ্ গেছে কোন্ দেশে কোন্ কোন্ পথ দিয়ে,
কত শত হাসি অশ্রুর ভরা বুকেতে সাজায়ে নিয়ে।
গেছে কোন্ দেশে কোন্খানে কোন্ ঘাটে কোন্ বন্দরে,
কত যে গাঁয়ের কোল্ বেয়ে গিয়ে ঠেকেছে সে কোন্ চরে।
চর দুই ধারে বালুর পাথারে চক্ চক্ করে বালি,
মাঝখান্ দিয়ে গেছে সরু গাঙ্ চাঁদের একটা ফালি।
দুই পাড়ে ঘন-সবুজের মেলা দেখিয়া দু' আঁখি ভরে,
কে যেন কাঁদিয়া সারা হয় ঐ সবুজের মর্ম্মরে।
বাতাস বাধিয়া নারিকেল পাতা—ঝরে সর্ সর্ করি,
সুপারি তালের বনে বনে কার আঁখিজল পড়ে ঝরি।
বাঁশ বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা ঐ যে বেগুন-ক্ষেতে,
গাঁয়ের চাষারা 'টোঙে' চড়ে দেয় পাহারা দিবস রেতে।
গাঁয়ে গাঁয়ে যত গাঁয়ের বধূরা সন্ধ্যা সকাল বেলা,
এই মরা গাঙে আসে জল নিতে, করে না ত তারা হেলা।
কাঁখের কলস ডোবে না তবুও কত যে ভঙ্গি করি।
কাঁকাল বাঁকায়ে জলভরা চাই কলস ডুবায়ে ধরি।
মরা গাঙে গেছে সোঁৎ কবে মারা, আবদ্ধ জল পেয়ে,
দাম দল আর শ্যাওলাতে এসে ফেলেছে বক্ষ ছেয়ে।
কারাগার মাঝে বন্দীর মত পঙ্কিল জলরাশি,
জেল পেতে চায় মুক্তি শুনিয়া গেঁয়ো রাখালের বাঁশী।
নিদাঘী দিনের চাতকের মত বর্ষার বারি যাচে,
কালো মেঘ দেখে ময়ূরের মত দুই হাত তুলি নাচে।
বুকের পাঁজরে ওরি,—
দাগ কেটে কেটে 'দাঁড়েকোট' খেলে ছেলেগুলো দিন ভরি।
ছল্ ছলে জলে জাল পেতে ব'সে গাঁয়ের জেলেরা যত,
মাথায় বাঁধিয়া ফ্যাটা ধরে মাছ নানাবিধ শত শত।
ট্যাংরা পুঁটিতে খালুই ভরিয়া হাটের রাস্তা বেয়ে,
চ'লে যায় ওরা, মরা গাঙ শুধু দেখে চোখ চেয়ে চেয়ে।
কত যে গাঁয়ের গা-ঘেঁসিয়া চ'লে গেছে এই একই ধারা,
সোঁৎ নাই তবু সাগরে মিশিতে আকুল পাগলপারা।
পার হ'য়ে কত হাট মাঠ বাট চলে গেছে আঁকা বাঁকা,
বুকে বুকে কত বেদনা কাদা ও বালুতে সকলি ঢাকা।
ওর দিন গেছে ব'য়ে,—
নেতি কাদা এসে ভরাট করেছে, চেপেছে পাষাণ হয়ে।
ভরা বরষার ভরসায় ও যে এখনও রয়েছে বেঁচে,
এ-কূল ও-কূল দুকূল ভাবায়ে বরষার জল নেচে।
উঠিবে কবে বা ঢেউ তুলে দুলে, সেই আশা বুকে ধরি,
এখনো মরেনি, ব'সে ব'সে দেখি আর ভেবে ভেবে মরি।
হায়! মরা গাঙ্ তোরও,—
আশা আছে প্রাণে, সেই আশা নিয়ে আজও দেশ
দেশ ঘোরো!

মুঙ্গের দুর্গ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

জামালপুরে গাড়ী বদল ক'রে মুঙ্গেরের গাড়ীতে চ'ড়েই বন্ধুকে ব্যস্ত করতে লাগ্‌লাম। এমন একজন এ দেশের প্রবাসী বাঙালী চাই যার কাছে দুটো গল্প শুনতে পাব। গাড়ী ছাড়তে দেরি আছে এই ভরসায় বন্ধু প্লাটফরমে নেমে পড়লেন এবং খানিক পরেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে কামরায় ঢুক্‌লেন। আমার পরিচয় দিয়ে তাকে বল্‌লেন যে, আমি মুঙ্গের বেড়াতে চলেছি, তাই মুঙ্গেরে কি দেখবার আছে শুনতে চাই। ভদ্রলোক হেসে বললেন, মুঙ্গেরে এখন আর কি দেখ্‌বেন? মুঙ্গের ত আজকের শহর নয়, মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল এখানে, তাই এর নাম হয়েছে মুদ্গগিরি। সেই থেকে দাঁড়িয়ে গেছে মুঙ্গের।* কেল্লার পাশেই এক অতি প্রাচীন ঘাট আছে, সেই ঘাটে বসে মুদ্গল ঋষি বৎসরের পর বৎসর তপস্যা ক'রে চলেছিলেন। এক পক্ষ ধরে উপবাসী হয়ে তপস্যা করতেন, পক্ষের শেষদিন সন্ধ্যার সময় চাল যা সংগ্রহ হ'ত তাই ফুটিয়ে খেতো, আবার চলতো এক পক্ষ অভুক্ত অবস্থায় তপস্যা। এমনি ক'রে ঋষির তপস্যা চলেইছে, অবশেষে নারায়ণ একজন ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হলেন ঋষির সাম্‌নে। ঋষি পক্ষশেষে সেইমাত্র চা'ল ফুটিয়ে ভাত নামাচ্ছেন এমন সময় অতিথি উপস্থিত! প্রসন্নচিত্তে সমস্ত অন্ন দিয়ে অতিথির ক্ষুধা নিবারণ করলেন, নিজের আর খাওয়া হ'ল না। পরের পক্ষের শেষে নারায়ণ অন্য এক বেশে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এবারও এক মাসের উপবাসীর মুখের অন্নে নিজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করলেন। ঋষির মুখে কিন্তু তবু প্রসন্নতার চিহ্ন, বিরক্তি দুঃখ একটুও নেই। নারায়ণ তখন আপনার মূর্ত্তি ধরে ঋষিকে বল্‌লেন, "তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি তৃপ্ত হয়েছি। তোমার কি বর চাই বল।" ঋষি বললেন, "আমি আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন আমার সব পাওয়াই হয়ে গেছে; তবে বর যদি দেন ত এই বর দিন যে, এই ঘাটে আমার যেমন সকল কষ্টের শেষ হয়েছে, তেমনি নর-নারী যে-কেহ এই ঘাটে স্নান ক'রে আপনার পূজা করবে তারও জীবনান্তে বৈকুণ্ঠলাভ ঘটবে। 'তথাস্তু' বলে নারায়ণ অন্তর্হিত হ'লেন। সেই থেকে এই ঘাটটির নাম হয়েছে কষ্টহারিণী ঘাট।

ভদ্রলোক গল্প শেষ ক'রে আমার দিকে চাইতেই আমি বলল্লাম, "আপনার ঋষির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হচ্ছে; আপনার ঋষি নিজের জন্য অমরত্ব চান নি, ব্রাহ্মণত্বও চান নি। চেয়েছিলেন যা, তা সে-যুগের বড় বড় ঋষিদের মধ্যেও দেখা যায় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বৈকুণ্ঠলাভ, যা দুষ্কর তপস্যায় তিনি পেলেন তা অপরে বিনা আয়াসে পাক্ এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। এই ঋষির দেশের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে এ গুণ কতটা পেয়েছে বলুন ত!"

"রামচন্দ্র! সুর সব এক—Behar for the Beharis—পরার্থপরতা একটুও নাই।"

"যাক্, কষ্টহারিণী ঘাটের কথা বল্‌ছিলাম। সে ঘাট রাম ও সীতার পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে গেছে। রাবণ রাক্ষস হলেও ব্রাহ্মণের গুণ তাঁর ছিল অনেক। রাত্রে রাম সুস্থির হয়ে ঘুমতে পারতেন না, রাবণের প্রেতমূর্ত্তি যেন এসে তিরস্কার করত। রাম তাই লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বাহির হলেন। গঙ্গা পার হয়ে এই কষ্টহারিণী ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। দেবতারা ঘাটে উপস্থিত। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তাদের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে বসলেন। দেবতারা রাম ও লক্ষণের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন, কিন্তু সীতার অর্ঘ্য গ্রহণ করতে চাইলেন না; সীতা বহুদিন রাবণের গৃহে

* কানিংহাম সাহেবের মতে ঐ অঞ্চলে মুঙ্গ জাতি বাস করিত, তাই নাম মুঙ্গের—*Archaeological Survey*, Vol. XV.

একাকিনী ছিলেন। অবনতমুখী সীতা পরীক্ষা দিতে সম্মত হলেন, প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সীতা প্রবেশ করলেন, তাঁর স্বামী ও দেবর দেবতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন দর্শক হয়ে। সীতার চক্ষের জলে আগুন শান্ত হয়ে গেল, অগ্নিকুণ্ড বারিকুণ্ডে পরিবর্ত্তিত হ'ল, সীতা অদগ্ধ অবস্থায় বাহির হয়ে এলেন। সেই দিনের স্মৃতিকে পূজা করবার জন্য আজও রামের জন্মদিনে বহু নরনারী কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান ক'রে এই সীতাকুণ্ডের জলস্পর্শে আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করে।"

আমি বললাম, "আপনার সীতা সেদিন ভারতরমণীর প্রতীক হয়েই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। সৃষ্টির আদি যুগ থেকে রমণীর চরিত্রের এই অপমানের বিরুদ্ধে ভারতনারী-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অভিমান সেদিন সীতার চোখ দিয়ে বাহির হয়ে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করেছিল। আজও পরীক্ষার শেষ হয়নি, আজও পুরুষের মনে সেই সংশয় রয়েছে। সীতার পর কত সাধ্বী নারী পৃথিবীর শয্যা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অভিমান-অশ্রু আজও সীতাকুণ্ডের জলকে উষ্ণ ক'রে রেখেছে।

ভদ্রলোক বললেন, "বিজ্ঞান বল্‌ছে যে এখানে আগ্নেয়-গিরি আছে। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্গ এ অঞ্চলে এসে দেখেছিলেন যে, হিরণ্য পর্ব্বত থেকে ধূমরাশি উদ্গত হয়ে সব অন্ধকার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এ কথায় মন সায় দিতে চায় না, মন তৃপ্তি পায় সেই কুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সীতার সমবেদনায় একবিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই কুণ্ডের জলের সঙ্গে মেশাতে।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক যৌবনে কবিতা লিখেছেন কি না জানবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আরও গল্প শোনবার লোভে সে বিষয়ে আর প্রশ্ন করলাম না।

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "কেল্লার পশ্চিম সীমানার কিছু দূরে চণ্ডীস্থান ব'লে এক প্রাচীন দেবতার স্থান আছে। এ অঞ্চলের এক রাজা ছিলেন কর্ণ। তাঁর দানের কথা সারা ভারতের লোকই জান্‌ত। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কৌতূহল হ'ল জান্‌তে কোথা থেকে এত অর্থ পায় কর্ণ। তিনি ছদ্মবেশে এসে কর্ণের ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করলেন। কর্ণ প্রতিদিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে চণ্ডীস্থানের দেবী চণ্ডীর পূজা ক'রে তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য এক জলন্ত তেলের কড়ায় ঝাঁপ দিতেন। চণ্ডীদেবী প্রসন্ন হয়ে অমৃতকুণ্ডের বারি সিঞ্চন ক'রে তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলতেন এবং কড়ার তেল সোনার চাপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত। সেই সোনা পরদিন কর্ণ গরিব দুঃখীদের বিতরণ ক'রে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যে বিক্রম রাজা এই গুপ্তকথা জেনে ফেললেন। বিক্রম একদিন রাত্রে কর্ণের পূর্ব্বে এসে দেবীর পূজা আরম্ভ করলেন, নিজদেহের মাংস কেটে দেবীর পায়ে অর্ঘ্য দিলেন; রক্তাক্ত দেহে নুন মাখালেন। সর্ব্বশেষে তেলের কড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেবী বিশেষ প্রীত হয়ে বিক্রমকে বর দিতে চাইলেন। রাজা বল্‌লেন, "আমি চাই না স্বর্ণ, রত্ন। আমি চাই আপনাকে! আপনি আমার রাজ্যে চলুন।" চণ্ডী সম্মতি জানালেন। বিক্রম কড়া উল্টে দিলেন এবং সেই উল্টান কড়া চণ্ডীর গৃহের ছাদের উপর রেখে বার হয়ে এলেন। অব্যবহিত পরেই রাজা কর্ণ পত্র পুষ্প নিয়ে প্রতিদিনের মত শুচি হয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখ্‌লেন যে, কড়া উল্টান, তেল গড়াচ্ছে, দেবী নিরুদ্দিষ্টা। চণ্ডীদেবী মাত্র তখন বিক্রমের রাজ্যে যাবার জন্য বার হচ্ছিলেন। কর্ণের আর্ত্তনাদ শুনে থাম্‌লেন। কর্ণের অনুনয়-বিনয়, কাতরতা দেবীর হৃদয় বিচলিত করল। দেবী কর্ণের তৃপ্তির জন্য তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি প্রাচীরগাত্রে রেখে বিক্রমের সঙ্গে চলে গেলেন। আজও মন্দিরের গাত্রে সেই দুটি চক্ষু তেমনি চেয়ে আছে, সেই লোহার কড়া মন্দিরের ছাদ হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ট্রেন যে কখন মুঙ্গের ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছে তা বুঝতে পারিনি, কুলির ও যাত্রীর চীৎকারে চমক ভাঙল

* * *

অপরাহ্ণে আমরা সীতাকুণ্ড দেখবার জন্যে বাহির হলাম। মুঙ্গেরকে পশ্চিমে ফেলে আমাদের গাড়ী সোজা এক রাস্তা দিয়ে পূর্ব্বমুখে চলতে লাগল। প্রথমেই পড়ল কয়েকটি বাগান ও বাগানবাড়ী। তার পরেই দুধারে ধু ধু করছে মাঠ, দূরে খড়্গা পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের মধ্যে খেজুর ও তালগাছই চোখে পড়তে

লাগ্‌ল। সীতাকুণ্ড মুঙ্গের থেকে পাঁচ মাইল দূরে। মাত্র তিন মাইল এসেছি, দেখি গাড়ীর সঙ্গে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছে দুটি লোক,—তারা পাণ্ডা। আমরা তীর্থ করতে যাচ্ছি না, সুতরাং বিশেষ কিছু প্রাপ্য নেই জেনেও তাদের ছোটার বিরাম নেই। তখন অগত্যা একজনকে আমাদের গাড়ীর পিছনে বস্‌তে বল্‌লাম। সীতাকুণ্ডে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই সে-ই অগ্রগামী হয়ে আমাদের নিয়ে চল্‌ল। চারিধারে ইঁট দিয়ে বাঁধান লোহার রেলিঙে ঘেরা সীতাকুণ্ডের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। কুণ্ডের আয়তন যোল সতের বর্গফুট—জল বেশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। কুণ্ডের অনেক জায়গাতেই তলা থেকে বুদ্‌বুদ্‌ উঠে ওপরে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এ ওঠার বিরাম নেই। যেন বুদ্‌বুদ্‌গুলি একসঙ্গে গাঁথা—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানে কে যেন একটি একটি ক'রে তাদের ছেড়ে দিচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও কত নূতন জায়গায় বুদ্‌বুদ উঠতে লাগ্‌ল। পূর্ব্বের দু-এক জায়গায় আবার স্থির হ'য়ে গেল। কুণ্ডের উপরের সিঁড়িতে দাঁড়াতেই উত্তাপ অনুভব করলাম, জলে আঙুল ডুবিয়ে বোঝা গেল যে জল বেশ গরম। যাত্রীরা কেহই এ জলে স্নান করে না, স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হ'তে হয়। পূর্ব্বে একবার একজন ইংরেজ সৈনিক বাজি রেখে এই কুণ্ড সাঁতার দিয়ে পার হয়েছিল, তখনই তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।* জলের উত্তাপ কিন্তু সব সময়ে সমান থাকে না; গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হ'তে উত্তাপ কমতে থাকে, বর্ষার সময় উত্তাপ সবচেয়ে বেশী হয়। এই কুণ্ডের অল্পদূরেই আরও দুই-তিনটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সীতাকুণ্ডের একশ' গজ দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণের সন্ধান পাওয়া যায়; তদানীন্তন কলেক্টার ফিলিপ সাহেবের নামানুসারে এর নাম হয়েছে ফিলিপ কুণ্ড। কেলনার কোম্পানী এর জল নিয়ে সোডাওয়াটার ও লেমনেড তৈরি করেন। এই কুণ্ডগুলি একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং এরা একই প্রস্রবণের অংশ বলে অনুমিত হয়। সীতাকুণ্ডের ঘেরা জায়গার মধ্যে আরও চারটি কুণ্ড আছে; তাদের নাম যথাক্রমে—রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড ও শত্রুঘ্নকুণ্ড। তাদের জল অপরিষ্কার এবং প্রস্রবণের কোনো লক্ষণই নেই।

ফিরবার সময় গাড়ী পীরপাহাড়ের পথ ধরল। কিছু পথ যেতেই দূরে এক পাহাড়ের ওপর ছবির মত একটা সুন্দর বাড়ী চোখে পড়ল। চারিদিকে সমতলক্ষেত্র—মাঝখানে মাথায় এক সুন্দর মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে পীরপাহাড়। যে পীরের নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম, তাঁর নাম কেউ জানে না; কেবল আছে তাঁর এক সমাধি-মন্দির ঐ পাহাড়েরই ওপর। সেই মন্দিরের তলায় বৎসরে একদিন বহুলোক সমবেত হয়ে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়, একটা মেলাও বসে। পাহাড়ের তলায় এসে গাড়ী থেকে নামতেই সাম্‌নে দেখা গেল একটা সমাধি—মনে হ'ল কোনো মুসলমানের, কিন্তু সেটা একজন কাশ্মীরী মহিলার সমাধি। শ্রীমতী আনি বেকেট তাঁর স্বামী কাপ্তেন বেকেটের সঙ্গে এই পীরপাহাড়ে বাস করতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে কখনও স্বামীর সঙ্গে, কখনও একলা পাশের গ্রামে বেড়াতে যেতেন। একদিন রাস্তায় তিনি গ্রামবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান।*

পথ ধরে আমরা ওপরে চল্‌লাম। তিন দিকে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের ওপর সূর্য্যের শেষরশ্মি পড়ে তাদের সুন্দর ক'রে তুলেছে। গাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে কোথাও ছোট ছোট কুঁড়েঘর গ্রামের নিদর্শনস্বরূপ দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে প্রশান্তসলিলা ভাগীরথী; তার বহুদূরব্যাপী তীরভূমি পাহাড়ের তলায় এসে ঠেকেছে। এমন মনোরম স্থানে এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ ক'রে সেনাপতি গুরগন্‌ খাঁ তাঁর কবিদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন। বহুদিন ধরে এই বাড়ীই বিহারের Belvedere ছিল। সেনাপতি ও বড় বড় কর্ম্মচারী কেউ এলে এই বাড়ীতেই তাঁকে ভোজ দেওয়া হ'ত। ভোজের আসরে সেনাপতি গুরগন্‌ খাঁর এইখানে ব'সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইংরেজের

* *Wanderings of a Pilgrim*, by Fanny Parks.

* *Bengal: Past and Present*, Vol. VI.

মুণ্ডপাতের মন্ত্রণা করার কথা স্মরণ ক'রে দিলে ভোজের আনন্দ হ্রাস হ'ত কি না বলা যায় না; কিন্তু ইংরেজ-গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট নবাবের অতিথি হয়ে এইখানে নবাবী কায়দায় আদর-আপ্যায়ন ও সঙ্গে সঙ্গে বহু উপঢৌকন পেয়ে সপ্তাহকাল কাটিয়েছিলেন, একথা স্মরণ হ'লে একটুও যে আত্মপ্রসাদ হ'ত না ইহা নিশ্চয়।

পীরপাহাড় থেকে ফিরে যখন চণ্ডীস্থানে এসে গাড়ী থামল, তখন গোধূলির কাল ছায়া চারিদিকে পড়েছে। ভিখারীরা যাত্রীর আশায় তখনও রাস্তার ধারে বসে আছে। দু-একখানা দোকানও রাস্তার ওপর পাতা আছে—খেলনা থেকে আরম্ভ করে মোয়া পর্য্যন্ত। চণ্ডীস্থানের দু-পাশে দুই মন্দিরে অন্নপূর্ণা ও পার্ব্বতী আছেন। চণ্ডীর মন্দিরেও এক শিব আছেন—কালভৈরব; ভিতরে অন্ধকার একটি ঘরে প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম উত্তর দেওয়ালে পাথরের ওপর চণ্ডীর দুটো চোখ। আমাদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়ে কত যাত্রী মুগ্ধনেত্রে সেই শান্ত চোখের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। মন্দিরের ছাদও পাথরের খিলান করা ব'লে মনে হ'ল। কড়ার মত আকারও বটে, মনে হয় পাহাড় কেটে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়ে থাকবে। শহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত হলেও এ মন্দিরে যাত্রীর ভিড় অল্প হয় না।

* * * *

পরদিন আমরা দুর্গ দেখতে চললাম। গঙ্গার ওপর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়, তার ওপর অবস্থিত এই দুর্গ। তিন দিকে প্রশস্ত গড়, আর পশ্চিম দিকে পূত-সলিলা গঙ্গা। দুর্গ-প্রাচীর তের-চোদ্দ হাত উচ্চ, বাট হাত অন্তর এক একটি দুর্গবেষ্টনী (bastion)। উত্তরের লাল দরজা দিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলাম। উত্তর দক্ষিণে এক সুন্দর রাস্তা চলেছে, সেই রাস্তার দুই ধারে দুই বৃহৎ পুষ্করিণী; প্রত্যেক দিকেই পুষ্করিণীর পাশ থেকে একটি ছোট পাহাড়ের স্তূপ উঠেছে। বাঁ-দিকের পাহাড়ের শিখরদেশকে বলে কর্ণচৌরা, এইখানে রাজা কর্ণ প্রত্যহ প্রাতে স্নান করে এসে বসে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ দান করতেন। কর্ণচৌরায় একটি সুন্দর অট্টালিকা রয়েছে, সেটি সেনাধ্যক্ষ গভার্ডের বাসভবন ছিল, বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদের রাজা আশুতোষ রায়ের সম্পত্তি। দক্ষিণে অপর পাহাড়টির ওপরেও 'সাহ সাহেবের প্রাসাদ' নামে একটা সুন্দর বাড়ী ছিল। সে-বাড়ী ভেঙে সেইখানে কালেক্টার সাহেবের কুঠি ও কোম্পানীর বাগান নির্ম্মিত হয়েছে। উহার পশ্চিমে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর গঙ্গার উপরেই দুর্গের অস্ত্রাগার ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। যে-প্রাসাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা অতীতের পর্য্যটকমাত্রেই শতমুখে করেছেন, যার শ্বেতবর্ণের সুন্দর প্রাচীর, মিনার ও স্তম্ভ দেখিয়া দিনেমার ডাক্তার নিকোলস গ্রাফ চমৎকৃত হয়েছিলেন, আজ তার বিশেষ কোনো চিহ্নই নেই। উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জেলখানা আজ সেখানে শোভা পাচ্ছে। যেস্থান বেগম ও পুরমাহলাদের আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হ'ত, আজ সেখানে কয়েদীদের হাঁসপাতাল বসেছে, পনের ফুট চওড়া দেয়ালযুক্ত অস্ত্র ও বারুদখানায় কয়েদীরা রাত্রিবাস করে। যেখানে আজ জেলখানার গুদাম-ঘর সেখানে প্রাসাদবাসীদের ব্যবহারের জন্য একটা মসজিদ ছিল। সেই মসজিদের মেজের নীচে দিয়ে চারিটি সুড়ঙ্গ-পথ বার হয়ে গেছে। একটা পথ দিয়ে বেগমেরা গঙ্গাস্নানে আসতেন; কষ্টহারিণী ঘাটের প'কা ভাঙা সিঁড়ি এখনও রয়েছে। অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে অসুবিধা হ'ত ব'লে স্থানে স্থানে চিমনির আকারে নির্ম্মিত আলোকস্তম্ভ ছিল। সে সুড়ঙ্গ-পথের শেষ অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। আর একটা পথ দিয়ে বেগমেরা সামনের বাগানের এক ফোয়ারার তলায় এসে জলবিহার করতেন। অন্য রাস্তা দুটি কোথায় যাবার জন্য তা কেহ বলতে পারে না। একবার কয়েকজন কয়েদী পালিয়ে গিয়েছিল ব'লে সব পথগুলিই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। রাজপ্রাসাদের পাশে পশ্চিম দ্বারে দুর্গবেষ্টনীর নীচে এক কবি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। মোল্লা মহম্মদ সৈয়দ আরংজেবের কন্যা জেব-উন্নিসার গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি শেষবয়সে মক্কা যাবার বাসনা নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, পথেই মুঙ্গেরে তাঁর মৃত্যু হয়।*

* *Bengal Past and Present,* Vol. II.

১। পীরপাহাড

২। কর্ণচৌরা—গডার্ড সাহেবের বাসভবন

৩। চণ্ডীস্থান– [illegible] মন্দির

৭। পশ্চিম দিকের দুর্গ-বুরুজ—এই কেল্লায় মহম্মদ সরদ সমাহিত আছেন।

৫। ছকৰা নালার উপরের ভগ্ন সেতু

৬। ডিবার সাহেবের ঘড়ি ঘর
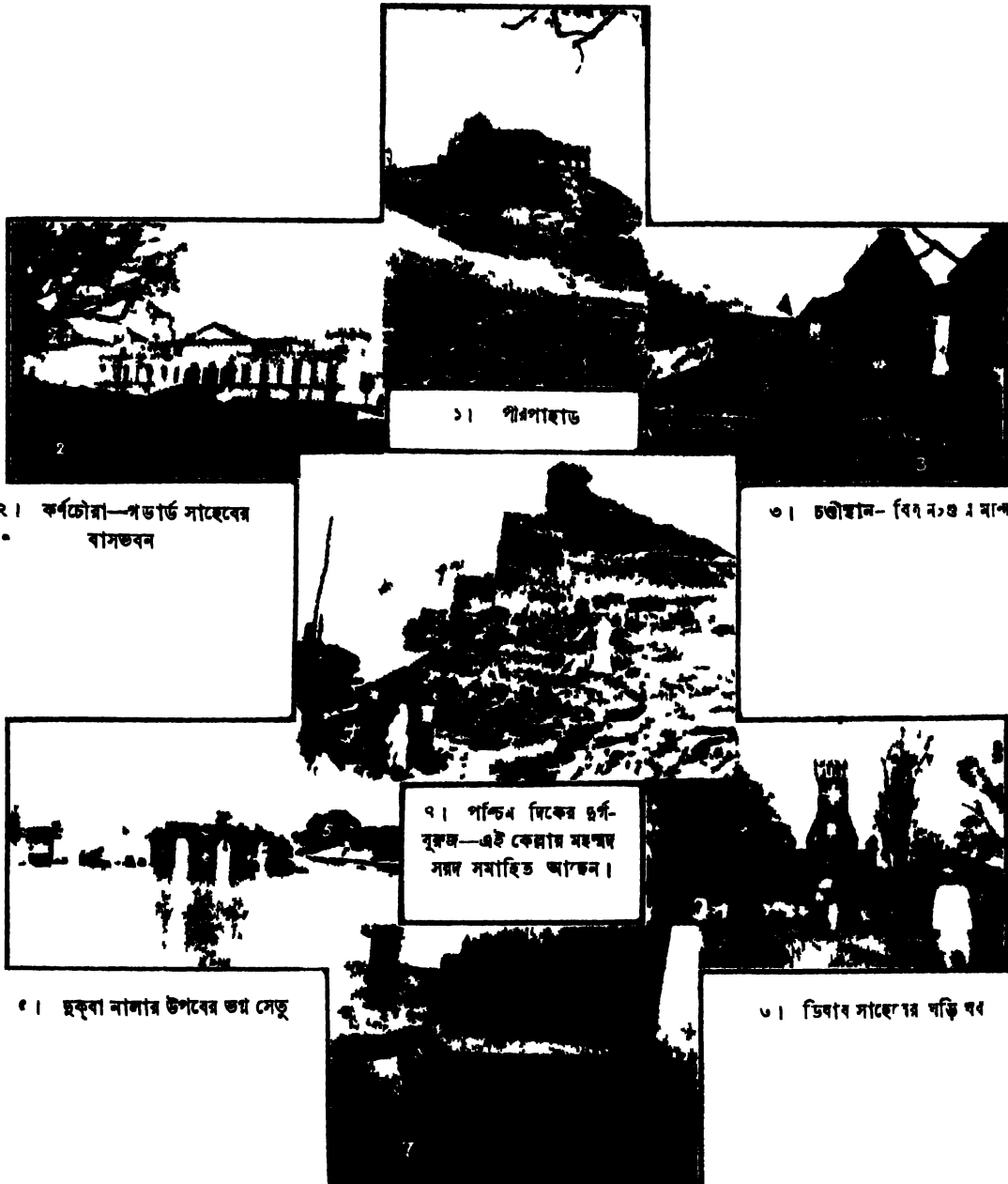
৬। মীরকাসিমের পুত্রের কবর

সাহনাফার দরগাই দুর্গের মধ্যস্থিত গৃহগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দক্ষিণ দরজার পাশেই উচ্চ জমির উপর এই সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান। যুবরাজ দানিয়াল মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তারূপে এসে দুর্গ-প্রাচীরের সংস্কার করতে লেগে যান। যুবরাজের কাছে সংবাদ এল যে দুর্গ-প্রাচীরের খানিকটা অংশ প্রত্যহ অতিযত্নে

তৈয়ার করা হয়, কিন্তু রাত্রে কে যে কেমন করে ভেঙে ফেলে দেয় তা নির্ণয় করা যায় না। রাজসভায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা করে ঠিক করলেন যে, ঐস্থানে নিশ্চয়ই কোন পীরের সমাধি আছে। সেই রাত্রেই যুবরাজ স্বপ্নে দেখলেন যে, এক পীর তাঁকে তাঁর কবরের উপর সমাধি-মন্দির করতে বলছেন। পীর তাঁর নাম কিছুতেই বললেন না। পরদিন মৃগনাভির সুগন্ধে তাঁর কবরের স্থান নির্ণীত হ'ল। তাই দানিয়ালের আদেশে সেই কবরের ওপর নির্ম্মিত এই সমাধি-মন্দিরের নাম হ'ল 'সাঙ্গনাফা'। মন্দিরদ্বারে দানিয়ালের প্রোথিত প্রস্তরলিপি আছে। তার পাশে বহু সমাধি, তার মধ্যে মীরকাসিমের মৃত পুত্রের সমাধিও রয়েছে। দুর্গ-সীমার মধ্যে অবস্থিত সাহেবদের বাড়ী ও দোকান-ঘরগুলো দেখতে সুন্দর, দু-একজন বাঙালীর বাড়ীও রমণীয়। কিন্তু সরকারী আদালত, মিউনিসিপাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আপিস ইত্যাদি ঘরগুলো অতি বেমানান ও অসুন্দর বলেই চোখে লাগল পূর্ব্ব দরজায় ডিয়ার সাহেবের অর্থে নির্ম্মিত ক্লক-টাওয়ার বা ঘড়ি-ঘর দুর্গপ্রাকারের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না এবং দুর্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির দিকে একটুও সাহায্য করে না। জেলখানার দক্ষিণ পাশের রাস্তা দিয়ে বাবুঘাটে এলাম, উদ্দেশ্য—গঙ্গার দিক হ'তে মুঙ্গের দুর্গের দৃশ্যটা কেমন দেখায় তাই দেখা। মানুষ, জানোয়ার ও মাল একত্র নিয়ে একখানা বড় খেয়া নৌকো যখন সামনের চরে নামিয়ে দিল তখন সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, শেষরশ্মি দুর্গের গৃহ ও প্রাকারের ওপর পড়ে রাঙিয়ে তুলেছে; পাদদেশে প্রশান্তসলিলা গঙ্গার কালো জল বয়ে চলেছে। দৃশ্যটি সত্যই ছবির মত সুন্দর দেখাতে লাগল। একপ্রান্তে কষ্টহারিণীর ঘাটে তখনও কয়েক-জন নরনারী স্নান করছেন; আর একপ্রান্তে কয়েক-খানা বড় মাল-বোঝাই নৌকো নোঙর ফেলে ভিড় করে রয়েছে। স্থানে স্থানে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে পড়ে তার অতীতের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অতীতের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক চিত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বৌদ্ধ দেবপালের বিজয়দৃপ্ত বিপুলবাহিনী যেদিন বঙ্গদেশ জয় ক'রে চম্পা-রাজ্যের এই নগরে শিবির সংস্থান করলে, নৌকোর শ্রেণী দিয়ে বিপুল বাঁধ সৃষ্টি ক'রে পালেদের সামন্ত ও মিত্র রাজারা বহু সৈন্য নিয়ে দেবপালকে সম্বর্দ্ধনা করতে এলেন—মুঙ্গেরের আকাশ ধূলোয় অন্ধকার হয়ে গেল, সেদিনকে স্মরণীয় করে রেখেছে দেবপালের এইস্থানে দেবকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণকে বহু জমি দান।* বঙ্গবিহার-বিজেতা বক্তিয়ার যেদিন দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দীনের অনুগ্রহ-ভিখারী হয়ে তাঁর দর্শনাভিলাষে দিল্লীর দরজায় ধন্না দিয়েও বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, সেদিন এই মুঙ্গেরই তাঁর ভবিষ্যৎ-সৌভাগ্যের সূচনা ক'রে দেয়। বক্তিয়ার সেদিন বুঝেছিলেন যে সাহস ও যুদ্ধকৌশল থাকলেও নগণ্য ও সহায়সম্পদহীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ সব সময়ই রুদ্ধ। তাই তাঁর মত কয়েকজন যোদ্ধা-যুবককে নিয়ে সকল রকম বিপদকে তুচ্ছ ক'রে তিনি মুঙ্গেরের চার পাশের ক্ষুদ্র শহরগুলো লুণ্ঠন করতে লেগে গেলেন। এতে একদিকে যোদ্ধা ও দুঃসাহসিক ব'লে যেমন তাঁর খ্যাতি প্রকাশ হ'তে লাগ্‌ল, অন্য দিকে তেমনি বহু অর্থও সংগ্রহ হ'ল।† মুঙ্গেরের সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভেট দিয়ে যেদিন আবার বক্তিয়ার দিল্লীতে এলেন, সেদিন বিনা আয়াসে তিনি কুতুবউদ্দীনের শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ লাভ ক'রে বিহার ও বাংলা জয়ের ভার পেলেন এবং বিজেতার বেশে মুঙ্গেরের এই দুর্গদ্বারে হানা দিয়ে এটি অধিকার ক'রে নিলেন। আবার যেদিন পাঠানের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হ'ল, দিল্লীর সিংহাসনে আকবর প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটির পর একটি দেশ জয় ক'রে রাজপুতদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আপনার শক্তি দৃঢ়তর করলেন, শস্য শ্যামলা ধনরত্নবহুলা বাংলার দিকে লুব্ধদৃষ্টি নিয়ে মোগলবাহিনী মুনেম খাঁর অধীনে ছুটে আসতেই পাঠানরাজ দাউদ যুদ্ধে হেরে উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়ে আকবরের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিলেন; কিন্তু শক্তিশালী আফগান স্বাধীনচেতা পাঠান, দুদিনেই এই

* Cunningham's *Archaeological Survey*, Vol. III.
† Elliot's *History of India*, Vol. II.

পরাধীনতার তীব্রজ্বালা অনুভব ক'রে অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। মুনেম খাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে অমনি যখন চারিদিকে আফগানের বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল—দেখতে দেখতে বাংলা বিহার থেকে মোগল-আধিপত্যের সকল চিহ্ন মুছে যাবার উপক্রম হ'ল, সেদিন বিদ্রোহদমনে প্রেরিত মোগল-সেনাপতিরা এই মুঙ্গের দুর্গকেই নিরাপদ স্থান মনে করেছিলেন। আবার যেদিন বাংলা বিহারের মোগল কর্ম্মচারীরা পাঠানদের সঙ্গে মিশে মোগল শাসনকর্ত্তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, সেদিন মোগলের বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন হিন্দু টোডরমল্ল। শত্রু ভাগলপুরের কাছে অগণিত সৈন্য নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে, টোডরমল্ল অগ্রসর হ'তে সাহসী হলেন না; এই মুঙ্গের দুর্গে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। চার মাস কাল মোগল বাহিনীর সিংহনাদে দুর্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।* এই দুর্গে বসেই টোডরমল্ল কৌশলে শত্রুদের পরাজিত করবার মতলব আঁটলেন। চারপাশে যে-সব হিন্দু রাজারা শত্রুসৈন্যদের রসদ যোগাচ্ছিলেন তাঁদের কাছে টোডরমল্লের চর চল্‌ল। সহধর্ম্মী টোডরমল্ল,—হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট আকবরের অনুগ্রহ—সর্ব্বশেষে শত্রুদের অপেক্ষাও অধিক মূল্যে আহার্য্য কেনবার প্রস্তাব রাজাদের প্রলুব্ধ করল। ভারে ভারে অপরিমিত রসদ মুঙ্গের দুর্গে এসে পৌছতে লাগল। দুর্গে প্রত্যহই উৎসব আর বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার; একমাস যেতে-না-যেতে শত্রু ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ল।

মুঙ্গের দুর্গের উত্তরদিকের ফটক

মুঙ্গের দুর্গে শাহ্‌ সুজার প্রাসাদ

সাহনাফের সমাধি-মন্দির

এই মঞ্চ হইতে শেঠ ভ্রাতাদের ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়

কষ্টহারিণী ঘাট

গঙ্গার দিক হইতে মুঙ্গের দু

* Elliot's *History of India*, Vol. V.

কয়েকজন উড়িষ্যায় গিয়ে পাঠান-সর্দ্দার কতলু খাঁর সঙ্গে যোগ দিল।†

যেদিন বৃদ্ধ শাজাহান রোগশয্যায় মরণাপন্ন এই সংবাদে দিল্লীর সিংহাসনের জন্ত চার ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল, সেদিন শুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্ত্তা-রূপে রাজমহলে। আওরংজীব ও মুরাদ এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই দারাকে হারিয়ে দিল্লী সিংহাসন অধিকার করতে হবে, তাই শুজা যা সৈন্ত ও অস্ত্র পেলেন তাই নিয়েই চললেন দিল্লীর অভিমুখে। পথে এলাহাবাদের কাছে সুলেমান পথরোধ করে দাঁড়াল, যুদ্ধ হ'ল—শুজা পরাজিত হয়ে সৈন্তদের নিয়ে পালিয়ে এসে সেদিন এই মুঙ্গের দুর্গেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। পিছনে শত্রু; দুর্গরক্ষার জন্য তখনই তিনদিকে প্রশস্ত পরিখা খনন করতে আদেশ দেওয়া হ'ল। মাঝে মাঝে ৫০ হাত অন্তর একটি ক'রে বুরুজ নির্ম্মাণ ক'রে দুর্গকে আরও দৃঢ় করবার ব্যবস্থা হ'ল। মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, প্রভৃতি দিল্লীর সমৃদ্ধি, দিল্লীর বিলাসিতার সঙ্গে পরিচিত শুজা পূর্ব্বেই সম্রাটপুত্রের উপযোগী ক'রে দুর্গপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন, এখন আরও দুর্ভেদ্য ক'রে এইখানেই রাজধানী করলেন। সুলেমান মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করে বসলেন, কিন্তু পিতার বিপদের সংবাদে তাঁকে ফিরে যেতে হ'ল। সুজা সেই অবসরে আবার সৈন্ত, রসদ ও অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত হলেন।

সংবাদ এল দারার পতন হয়েছে। আওরংজীব ও মুরাদের সৈন্তের অধিকারে দিল্লী ও আগরা, পিতা বন্দী, পিতার ধনরত্ন তাঁদের হাতে। তারপর সংবাদ পৌঁছল আওরংজীব বাংলায় আসবার জন্ত প্রস্তুত, শুজা আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। আবার মুঙ্গের দুর্গ থেকে শুজার সৈন্ত অস্ত্রশস্ত্র রসদ নিয়ে বা'র হ'ল, কাশীর কাছেই আওরংজীবের সৈন্ত সম্মুখে পড়ল। শুজার এবারকার আয়োজনের সংবাদে আওরংজীব বিচলিত হলেন এবং পৌরুষের উপর নির্ভর না ক'রে কূটনীতি অবলম্বন করলেন। শুজার সৈন্তবল, শুজার সাহস, শুজার সৈন্তচালনার কৌশল বৃথা হ'ল না, বিজয়লক্ষ্মী শুজার প্রতি প্রসন্ন হলেন। আওরংজীবের সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হ'তে লাগল, আওরংজীবের পরাজয়বার্ত্তা নিয়ে দিকে দিকে লোক চলে গেল, তখন শুজা হাতীর পিঠে বসে সৈন্ত পরিচালনা করছিলেন। শুজার প্রিয় অনুচর আলিবর্দ্দী খাঁ কোথা হ'তে ছুটে এক ঘোড়া এনে শ্রান্ত শুজাকে নাম্‌তে বললেন। সরল অসন্দিগ্ধচিত্ত শুজা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত বুঝতে পারলেন না, হাতীর পিঠ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্তদের মধ্যে প্রচার করা হ'ল সুজা নিহত ;* অমনি শুজার সৈন্ত পালাতে আরম্ভ করল। দ্বারে উপস্থিত বিজয়লক্ষ্মী সামান্ত ভুলের জন্ত অপরের ঘরে গিয়ে উঠলেন। হতাশ হৃদয়ে শুজা যখন মুঙ্গের দুর্গে ফিরে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক-চতুর্থাংশ সৈন্তও নেই, তখনও শুজা সাহস-সম্পদহীন নন। আওরংজীবের সৈন্ত শুজার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এসে পথ পেল না; পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের রাজারা তাঁদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে সৈন্য নিয়ে যেতে দিতে সম্মত নন। মুঙ্গের থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে সৈন্যশিবির স্থাপন করতে হ'ল। কিন্তু কৌশলী সেনাপতি মীরজুমলা নিশ্চেষ্ট রইলেন না। মীরজুমলার ভয়ে ও সম্রাটের অনুগ্রহপ্রাপ্তির লোভে খড়্গপুরের রাজার আপত্তি আর বেশী দিন রইল না।† যেদিন সুজা শুনলেন যে, একদিকে মহম্মদ ও অপর দিকে মীরজুমলা খড়্গপুরের মধ্য দিয়ে এসে রাজমহল দিয়ে আক্রমণ করতে আসছেন, তখন বুঝলেন যে আর কোনো আশা নেই। আওরংজীবের হাতে আপনার ও পুত্রকন্যার নির্যাতনের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তে শিউরে উঠলেন ও পরদিন শাজাহানের পুত্র শুজা সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে সাধের মুঙ্গের চিরদিনের জন্য ত্যাগ করলেন। সেই বিদায়-দৃশ্যের করুণ স্মৃতি আজও ভগ্ন প্রাসাদ বহন করে রয়েছে।

আর একদিন ঠিক এমনি করুণ বিদায়ের দৃশ্য এইখানে অভিনীত হয়েছে। বাংলার শেষ নবাব মীর-কাসিম ইংরেজ গভর্ণর ও কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যদের

† Stuart's *History of Bengal.*

* Manucci's *Storia do Mogor*, Vol. I.

† Sarkar's *Aurangzib*, Vol. II.

অর্থদানে বশীভূত ক'রে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে শীঘ্রই বুঝিতে পারলেন তাঁর ভ্রম। রাজকোষ শূন্য, বেতন না পেয়ে সৈন্তেরা অশান্ত, কর্ম্মচারীরা অত্যাচারী, অর্থলোলুপ, স্বস্বপ্রধান, জমিদার বিদ্রোহী, চারিদিকে কূটনীতি ও চক্রান্ত,—সর্ব্বশেষে ইংরেজের কর্ম্মচারীদের ঔদ্ধত্য নবাবের মূল্য শীঘ্রই বুঝিয়ে দিল। অর্থ চাই, নবাব-প্রাসাদের আনন্দস্রোত ও বিলাসিতা বন্ধ হয়ে গেল, দাসদাসীদের ছুটি হ'ল—সোনা রূপোর জিনিষপত্র বিক্রী করা হ'ল—সৈন্তেরা বেতন পেল—ইংরেজের দেনা কতক মিটল। মীরকাসিম তখন ইংরেজদের সহযোগিতায় চললেন বর্দ্ধমান, বীরভূমের বিদ্রোহ-দমনে। সৈন্তদের পাশে দাঁড়িয়ে মীরকাসিম বুঝতে পারলেন যে মোগল-সেনার শিক্ষা নাই, সাহস থাকলেও কৌশলে ইংরেজদের তুলনায় তারা কত তুচ্ছ। কিসের ওপর মীরকাসিম নবাবীর গৌরব করবে? অর্থ ও সৈন্ত যে দুটো রাজার বল, তাইত তাঁর নাই, তবে কেন আর খেলাঘরের নবাবী! একদিকে অহিফেনসেবী বিলাসানুরক্ত মীরজাফরের নিশ্চেষ্টতা—অন্যদিকে অত্যাচার-পীড়িত লাঞ্ছিত প্রজার করুণ দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠে ব্যথিত করে তুলল। মীরকাসিম প্রজার সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন—অন্তের পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাই সুসাধ্য করবার জন্তে জীবনপণ করে কাজে নামলেন।

মুর্শিদাবাদের বাইরে ইংরেজের চক্ষু হ'তে দূরে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হ'ল মুঙ্গের। দুর্গের সংস্কার হ'ল, নবাব সপরিবারে এসে মুঙ্গেরকে রাজধানী ক'রে বসলেন। চারদিক থেকে কারিগর এনে বন্দুক ও বারুদের কারখানা স্থাপিত হ'ল;—সেদিনকার মতি, মীরন ও দীপন দারুদগরের বংশধরদের কারখানা আজও কাশিমবাজারে বর্ত্তমান। রাজমহলের চকমকি পাথরে ও ছোট নাগপুর ও মুঙ্গেরের লোহায় এমন সব বন্দুক গোলা তৈরি হ'তে লাগল যা সেদিনের পক্ষে সত্যই আশ্চর্য্য।* গুরগন্ খাঁ, মার্কার, সমরু নবাবের চাকরি গ্রহণ করলেন,—সৈন্তদের ইউরোপীয় যুদ্ধরীতি ও কৌশল শিখাতে লাগলেন। পাটনার দেওয়ান রামনারায়ণের মত অসাধু, অত্যাচারী কর্ম্মচারী—যাঁরা নবাবের অর্থে আপনাদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন, তাঁদের মুঙ্গেরে ধরে এনে কতক অর্থ আদায় করলেন। বাংলায় আবার অশান্তির ঘোর কেটে আশার আলো দেখা দিল—নবাব রাজকার্য্যে মন দিলেন।

দু-দিনেই নবাব বুঝলেন যে আলিবর্দ্দী, সিরাজের সময় যে-ইংরাজ দেখেছিলেন সে-ইংরেজ নেই; ইংরেজের মূর্ত্তি বদলে গেছে। সেদিন ইংরেজ বাংলার পথে ঘাটে শহরে সাবধানে সঙ্কোচের সঙ্গে চলাফেরা করত, একটু অন্তায় করলেই তাদের জেলখানায় আটক থাকতে হ'ত। আজ নবাব-কর্ম্মচারীরা ইংরেজ দেখলেই সঙ্কোচে ও সভয়ে চলে, কথায় কথায় নবাবের লোককে ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'তে হয়। যারা একজনের নবাবী কেড়ে নিয়ে অন্তকে নবাব করতে পারে, তারাই যে দেশের কর্ত্তা একথা কাউন্সিলের সভ্য হ'তে প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারীই বুঝত। কোম্পানীর বাণিজ্য-করা সম্বন্ধে যা সুবিধা ছিল, সেই সুবিধা নিয়ে প্রত্যেকে বিনা করে ব্যবসা করে বড়-লোক হতে লাগল, তাদের অনুগৃহীত এদেশীয় ব্যবসাদাররাও ইংরেজ-কুঠীর কর্ম্মচারীর দস্তক নিয়ে কর ফাঁকি দিতে লাগল,—নবাবের কর্ম্মচারীরা বাধা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত ও ইংরেজ-হস্তে নির্যাতিত হ'তে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হতে চলল, নবাব-ভাণ্ডার কোষশূন্য হ'ল, কিন্তু সর্ব্বোপরি বার-বার মীরকাসিমের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত ক'রে তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গের দুর্গে এসে নবাবের সঙ্গে এক বোঝা-পড়া করলেন, কিন্তু কলিকাতার কাউন্সিল তা'তে মত দিল না। বিবাদ বেড়েই চলল, কখন্ যুদ্ধ বাধে তার ঠিক নেই, তাড়াতাড়ি নবাব ইংরেজ-বন্ধু জগৎ শেঠ বংশীয় শেঠ-ভ্রাতাদের মুঙ্গেরে আনালেন, পাছে ইংরেজ এদের কাছে টাকা পায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পাটনা-কুঠীর কর্ত্তা এলিস্ সাহেব অতর্কিতভাবে পাটনা শহর দখল ক'রে যুদ্ধ বাধিয়ে

* Brooms *Rise of Bengal Army*, Vol. II.

দিলেন। সেইদিনই রাত্রি বারোটার সময় মুঙ্গের দুর্গের চারিদিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে উঠল। পাটনা শহর নবাবের সেনা অধিকার করেছে, ইংরেজদের বন্দী করেছে। বাংলার নবাব-সৈন্য কাটোয়া ও ঘেরিয়ার যুদ্ধে হেরে গিয়ে উধুয়ানালায় এসে দাঁড়াল। একদিকে ভাগীরথী অন্য দিকে উধুয়া ও পাশে ছোট ছোট পাহাড় উঠে সত্যই সে জায়গাকে দুর্গম করে তুলেছিল। নবাব-সৈন্য প্রাচীরের উপর কামান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে—সম্মুখে গভীর জল—ইংরেজদের তোপ বসাবার স্থান মেলা শক্ত। দিনের পর দিন যেতে লাগ্‌ল, ইংরেজ-সেনা কোনো উপায়েই দুর্গমূলে পৌছতে পারল না—হয়ত এ অভিযান ঐখানেই শেষ হবে। মির্জ্জা নাজিফ খাঁ এক গুপ্তদ্বারের সংবাদ জান্‌তেন, রাত্রে যখন সকলে বিশ্রাম করছে সেই সময় নাজিফ খাঁ তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসী সৈন্যকে নিয়ে সেই গুপ্তদ্বার দিয়ে বার হয়ে সামনের অগভীর জল পার হয়ে সৈন্য-শিবিরে এসে লুটপাট ক'রে ফিরে যেতেন। ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। গুপ্তচর চারদিকে সন্ধান নিয়ে বুঝিতে পারল না, কোথা দিয়ে শত্রু আসে। এক দিন রাত্রে যে একজন নবাব-সৈনিক নাজিফের দলকে বার হ'তে দেখেছিল তা কেউ জানে না। পূর্ব্বে ইংরেজ সরকারে কাজ ক'রে সে বিতাড়িত হয়ে নবাবের সেনা-দলে লেগেছিল, সেদিন হঠাৎ তার ইংরেজ-প্রীতি জেগে উঠল, সে পরদিন লুকিয়ে ইংরেজদের সেই গুপ্তদ্বারের সন্ধান দিয়ে এল। ইংরেজ-সৈন্য সেই গুপ্ত দ্বার দিয়ে এসে অতর্কিতভাবে যখন নবাব-শিবির আক্রমণ করলে তখন সৈন্যরা নিদ্রিত। অতি অল্প সৈন্যই যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে প্রাণ দিলে। সবাই পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। প্রভাতের আলো যখন দুর্গে এসে পড়ল, তখন ইংরেজ জয়ী হয়ে দুর্গ দখল ক'রে বসেছে।*

উধুয়ানালার পরাজয়বার্ত্তা মীরকাসিমের কাছে পৌছলে নবাব রাগে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। রামনারায়ণের মত বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজ দরদীদের হত্যা করবার হুকুম দিলেন। দুর্গের মঞ্চের উপর থেকে জগৎ শেঠ পরিবারের মহাতপ চাঁদ ও সিতাব রায়কে ভাগীরথীর গর্ভে ফেলে দেবার সময় তাঁদের নিমকের চাকর চুনির মনিবদের সঙ্গে নির্মজ্জিত হবার কাতর প্রার্থনা—সে আর্ত্তনাদ আজও মাঝিরা শুন্‌তে পায়। তারপর শাহ্‌ শুজারই মত সপরিবারে এই মুঙ্গের দুর্গের কাছে শেষবিদায় নিয়ে স্ত্রী পুত্রদের রোটাস্‌ দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে আপনার ভাগ্যের শেষ পরীক্ষা করবার জন্য চল্‌লেন পাটনা। মুঙ্গেরের প্রান্তে ছুক্‌রা নালা পার হয়ে শেষ একবার মীরকাসিম দুর্গের দিকে ফিরে চাইলেন। তারপর আদেশ দিলেন নালার উপরের সেতু ভেঙে দিতে। সেই ভাঙা বৃহদাকারের পিল্পে-গুলা জলের উপরে দাঁড়িয়ে আজও সেইদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কার্য্যপটু, শাসনকার্য্যে নিপুণ, বিচক্ষণ এমন নবাব এ রকম সদিচ্ছা নিয়ে বাংলার মসনদে অনেক দিন বসেনি। কিন্তু বাংলার ভাগ্য-বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

* *Seir Mutakherin*, Vol. III.

বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কাহারা কি প্রকারে করিবেন, তাহার

জন-সংখ্যা

অমুসলমান	২২১০৬৩১৮	অনুপাত
মুসলমান	২৫৪৮৬১২৪	৭ : ৮

আলোচনায় সাধারণতঃ কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানদের কথাই বিবেচিত হয়। তাহা ঠিক নহে; কারণ দেশে তাঁহারা ছাড়া অন্য লোকও আছেন। মুসলমানেরাই প্রথমে, লর্ড মিণ্টোর আমলে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কথা তুলেন এবং এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তাঁহারাই, বিশেষতঃ বঙ্গে, সকলের চেয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন। অতএব প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন বিষয়ের আলোচনায় দেশের লোকদিগকে মুসলমান ও অমুসলমান এই দুই ভাগে বিভক্ত করা অসঙ্গত হইবে না। বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও এই ভাগ ব্যবহৃত হইবে।

মুসলমানেরা আলাদা করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চাহিবার কারণ এই বলিয়া থাকেন, যে, নতুবা তাঁহাদের উপর অত্যাচার হইবে, অবিচার হইবে, মুসলমানেরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, ইত্যাদি।

বঙ্গের কোন কোন মুসলমানপ্রধান ও অন্য জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ব্বাচনে দেখা যাইতেছে, যে, তৎসমূহের সব বা অধিকাংশ নির্ব্বাচিত সভ্য মুসলমান। সুতরাং আলাদা করিয়া মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার না

লিখনপঠনক্ষম (পুরুষ)

অ মু	২৭১০৬৪৫	অনুপাত
মু.	১২০৪১৬৯	৯ : ৪

লিখনপঠনক্ষম (স্ত্রী)

অ মু	৩৪৮৪৫২	অনুপাত
মু	৫৯৩৭৯	৬ : ১

পাইলে মুসলমানেরা নির্ব্বাচিত হইবেন না, এই আশঙ্কা অমূলক।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবর্ষে একজনও মুসলমান ছিল না। তাহার পর ক্রমশঃ বাড়িয়া মুসলমানের সংখ্যা অনেক কোটি হইয়াছে। বঙ্গে তাহাদের সংখ্যা শিশু হইতে বৃদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া, অমুসলমানদের চেয়ে বেশী হইয়াছে। ইহার দ্বারা কি ইহাই প্রমাণ হয়, যে, অমুসলমানেরা মুসলমানদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করে?

সমস্ত ভারতবর্ষের কথা এখন আমাদের আলোচ্য নহে, বঙ্গের কথাই আলোচ্য। নিরপেক্ষ লোকেরা বঙ্গের অতীত ও আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা

ইংরেজী শিক্ষা (পুরুষ)

অ মু ৬০৫৯৯০ অনুপাত
মু ১২৭৯০৭ ৫ : ১

ইংরেজী শিক্ষা (স্ত্রী)

অ মু ৪১৮৭৮ অনুপাত
মু ৩১৬১ ১৩ : ১

শিক্ষক

অ মু ৮১৭৬০ অনুপাত
মু ২৯৫৮৭ ৩ : ১

উকীল মোক্তার

অ মু ৫১৩১৭ অনুপাত
মু ৫৬০২ ৯ : ১

করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, এখানকার অমুসলমানেরাই সমস্ত বা অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক লুটপাট দাঙ্গা খুন করে নাই এবং তাহার দ্বারা মুসলমানদিগকে

চিকিৎসক

		অনুপাত
অ মু	১২৬৯৭৮	
মু	২৫৭৯০	৫ : ১

উৎপীড়িত ও বিপন্ন করে নাই। চাকরি আদি সম্পর্কে, কোন কোন স্থলে, অমুসলমান প্রার্থীর মত

মিউনিসিপ্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্মচারী

		অনুপাত
অ মু	১৯৫৬০	
মু	৪৭০৯	২৫ : ৬

মুসলমান প্রার্থীর উপরও অবিচার হইয়া থাকিবে। কিন্তু মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্ত বিশেষ 'নিয়ম

আছে, অমুসলমানদের জন্ত তাহা নাই। তাহা সত্ত্বেও যে মুসলমানদের সংখ্যা ও আশার অনুযায়ী যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান চাকরি পায় নাই, তাহার কারণ

সরকারী কর্মচারী

		অনুপাত
অ মু	৮৮৩৭৫	
মু	২৬৭৫১	১৩ : ৪

শিক্ষার ও অন্যবিধ যোগ্যতার অভাব। অতএব, এদিক্ দিয়াও বিশেষ করিয়া মোটের উপর মুসলমানদেরই উপর অবিচার হইয়াছে, বলা যায় না।

বাণিজ্য

		অনুপাত
অ মু	১৮৪৫৬৭৭	
মু	৫১৪১৮২	৩৭ : ১২

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানের কল্যাণ ও স্বার্থ এক। সরকারী ব্যবস্থাপক সভায় এবং কংগ্রেস

আদি বেসরকারী অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনৈতিক সভায় অমুসলমান সভ্যেরা মুসলমানদের পক্ষেই অনিষ্টকর আইন

মহাজন

অ মু	১৩১০৫৭	অনুপাত
মু	২৩০৫৪	৬ : ১

পাস বা প্রস্তাব ধার্য্য করিবার চেষ্টা করে নাই। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের উল্লেখ করেন।

পুলিস

অ মু	৩২৭১৫	অনুপাত
মু	১২২১৪	৮ : ৩

কিন্তু তাহার দ্বারা রায়তদের অসুবিধা হইয়া থাকিলে সকল ধর্ম্মেরই রায়তদের অসুবিধা হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ স্কুল কলেজ, শিক্ষার জন্ত দান, এবং লোকহিতার্থ দান ও প্রতিষ্ঠান অমুসলমানদের কীর্ত্তি ; অথচ তৎসমূহের

সাধারণ কৃষক

অ মু	১৩৯৮৪৯১৪	অনুপাত
মু	২২৪১৯৮৮৭	৩ : ৫

দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সকল ধর্ম্মের লোকেরই উপকৃত হইবার বাধা নাই, এবং সকলেই উপকার পাইয়া

সৈন্য

অ মু	৫৬৩১	অনুপাত
মু	৪৮৩	১২ : ১

আসিতেছেন। সুতরাং মুসলমানদের হিত যেন না-হয়, অহিতই হয়—এরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা বঙ্গের অমুসলমানেরা করে নাই।

এই সকল কারণে আমরা স্বতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অনাবশ্যক মনে করি। উহা অনিষ্টকরও মনে

ভিক্ষুক

অ মু　　১৮৭১৯৫　　অনুপাত
মু　　২০৮১৯৬　　১৮ : ২০

করি; কারণ উহাতে সমগ্র দেশে নাশন্তালিটী বা এক-জাতীয়ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বাধা জন্মে ও ভিন্ন ভিন্ন

প্রাইমারী স্কুল

অ মু　　৮০৩৩২০　　অনুপাত
মু　　৮২৯৯৭০　　৮ : ৮

সম্প্রদায় আপনাদিগকে আলাদা আলাদা মনে করিতেই অভ্যস্ত হয়। উহা সম্প্রদায়বিশেষের, যেমন মুসলমানদের, পক্ষেও অনিষ্টকর। কারণ, যদি মুসলমানদিগকে কেবল নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের উপরই অজ্ঞতা দুঃখ

কয়েদী

অ মু　　৫৮০৫　　অনুপাত
মু　　৮০৮২　　৫ : ৭

অভিযোগ দুর্দ্দশা নিবারণের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে এপর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক

মধ্য—

অ মু　　৮০৬৩২　　অনুপাত
মু　　১৯৮৫৭　　৪ : ১

দুর্ভিক্ষাদিতে মারা যাইত এবং অজ্ঞতা যতটা কমিয়াছে ততটাও কমিত না। ভবিষ্যতেও, সকল সম্প্রদায়ের

লোকদের সম্মিলিত চেষ্টায় সকল সম্প্রদায়ের যত কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, একটি মাত্র সম্প্রদায়ের লোকদের চেষ্টায় সেই সম্প্রদায়ের ততটা মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

উচ্চ—

অ মু ৮৪৫১২ অনুপাত
মু ১৫৭৯৪ ২৮ : ৫

সংখ্যায় কম কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকদিগের জন্ত যদি-বা কয়েক বৎসরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রয়োজন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সংখ্যায় বেশী কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্ত তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না।

তথাপি বঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধি বরাবর আইন অনুসারে মুসলমান হওয়া চাই, এই দাবি করিতেছেন। ইহা গণতান্ত্রিক প্রণালীর বিরোধী। এই প্রণালী অনুসারে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে,

কলেজ

অ মু ১৮০৫১ অনুপাত
মু ২৯৬২ ২৫ : ৪

এম-এ, এম-এস সি

অ মু ১০০১ অনুপাত
মু ১২৭ ৮ : ১

ল কলেজ

অ মু ২৫৪৫ অনুপাত
মু ৫৭৭ ৯ : ২

যোগ্যতম লোকদেরই প্রতিনিধি হওয়া উচিত। এরূপ প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাচিত অধিকাংশ সভ্য মুসলমান হইলে অমুসলমানদের কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না.

মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল

অ মু ২৯৪৮ অনুপাত
মু ৬০৫ ৫ : ১

কৃষি স্কুল

অ মু ১২৪ অনুপাত
মু ১৯ ১৩ : ২

যাহা হউক, মুসলমানেরা যে অধিকাংশ প্রতিনিধির দাবি করেন, তাহার ভিত্তি এই, যে, তাঁহারা অমুসলমান-দের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাহা সত্য হইলেও, শিক্ষায় এবং ট্যাক্সপ্রদানসামর্থ্যে তাঁহারা অমুসলমানদের চেয়ে নিম্নস্থানীয়। কিন্তু শিক্ষার ও সম্পত্তির অধিকারিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বয়সকেই ভোট দিবার অধিকারের যোগ্যতা মনে করিলে, সাবালক মুসলমান পুরুষ ও সাবালক অমুসলমান পুরুষদের সংখ্যাই বিবেচ্য।

ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ

অ মু ২২৮৫ অনুপাত
মু ১১৬৮ ২ : ১

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সার্ভে স্কুল

অ মু ৭১২ অনুপাত
মু ১০৪ ৭ : ১

কারণ, নাবালকেরা ভোটের অধিকারী হইতে পারে না। বঙ্গের স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোটে ৩৮,০০০ জন ভোটের অধিকারী ও তাহাদের অধিকাংশ অমুসলমান।

একুশ ও তাহার অধিক বয়সের লোকেরা সাবালক। সেন্সস রিপোর্টে ২০—২৫, ২৫—৩০, ইত্যাদি বয়সের লোকদের সংখ্যা আছে, ২১ বৎসর বয়স্ক লোকদের সংখ্যা নাই। যদিও কম বয়সের লোকদের সংখ্যা অধিক বয়সের লোকদের সংখ্যার চেয়ে সাধারণতঃ বেশীই হয়, তাহা হইলেও ২০ হইতে ২৫এর যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কুড়ি বৎসর বয়সের লোকদের সংখ্যা তাহার পঞ্চমাংশ ধরিয়া লইয়া তাহা বাদ দিলেই ২১ হইতে অধিকতম বয়সের লোকের সংখ্যা মোটামুটি পাওয়া যাইতে পারে।

কমার্শিয়াল কলেজ ও স্কুল

অ মু	২১৮০	অনুপাত
মু	১৬৭	১৩ : ১

আর্ট স্কুল

অ মু	৬০৬	অনুপাত
মু	২১	২৯ : ১

টেক্‌নিক্যাল স্কুল

অ মু	৪৪১৪	অনুপাত
মু	৯২৮	১১ : ৪

এইরূপে হিসাব করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায়, নীচে তাহা দিতেছি।

একুশ ও তদধিক বয়সের পুরুষ।

মুসলমান	৬০৯৬৩৩৮
অমুসলমান	৬০৮৬৯০৯
	৯৪১৯

এই হিসাব অনুসারে যে কেবলমাত্র ৯৪১৯ জন বেশী সাবালক মুসলমান পুরুষ দেখা যাইতেছে, তাহাও বাস্তবিক ভোটাধিকারী মুসলমানের আধিক্য নহে। কারণ, সাবালক মুসলমান ও অমুসলমান উভয়েরই সংখ্যা হইতে জেলের কয়েদী, ভিক্ষুকাদি লোক, উন্মাদগ্রস্ত প্রভৃতি অপ্রকৃতিস্থ লোক বাদ যাইবে। সমস্ত সংখ্যাই ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে দিতেছি। তদনুসারে মোট কয়েদী প্রভৃতির সংখ্যা ১৩৮৮৭, তন্মধ্যে অধিকাংশ, ৮০৮২, মুসলমান। মোট ৪৩৮১২৪ ভিক্ষুক যাযাবর প্রভৃতির মধ্যে অধিকাংশ, ২২০১৩২, মুসলমান। ক্ষিপ্ত পাগল প্রভৃতির মধ্যেও মুসলমানদের সংখ্যা বেশী মনে করিবার কারণ আছে; কিন্তু সেন্সস্ রিপোর্টে এই

সব ব্যাধিগ্রস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সব জা'তের লোকদের সংখ্যা আলাদা করিয়া দেওয়া নাই বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না।

এই প্রকারে দেখা যাইবে, যে, বঙ্গে সাবালক বলিয়া ভোটের অধিকারী হইতে পারে, এরূপ মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা অমুসলমান পুরুষদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী নহে; যদি-বা বেশী হয়, তাহা যৎসামান্য।

তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাও ধরিতে হইবে। এখন প্রায় কেবল সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়াই স্ত্রীলোকদের ভোট আছে। কিন্তু তাহাতে অতি সামান্য-সংখ্যক স্ত্রীলোক ভোট দিতে পারে বলিয়া অন্য যোগ্যতা অনুসারে ভোটাধিকার দিবার কথা উঠিয়াছে। সেই যোগ্যতা প্রধানতঃ শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। লিখনপঠনক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের অধিকাংশই অমুসলমান। যথা—

মুসলমান	২৮৬৭১
অমুসলমান	৩৭৯১৬০

আমরা দেখাইলাম, রাষ্ট্রীয় অধিকার যাঁহারা পাইতে পারেন এরূপ সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র ধরিলে বঙ্গে এরূপ মুসলমানদের চেয়ে এরূপ অমুসলমানদের সংখ্যা বেশী বই কম নহে। সকল বিষয়ে যোগ্যতা হিসাবে বঙ্গের সব কাজ করিতে মুসলমানেরা যোগ্যতম নহেন। তাহা আমরা খাঁ সাহেব আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী, এম্‌-এ প্রণীত "শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়" নামক পুস্তিকা হইতে ছবি ও সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। এই পুস্তিকাটি সৎ উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রত্যেক চিত্রের সহিত লেখকের মন্তব্য আছে। তন্মধ্যে আমরা কেবল পুলিস ও সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ভেটারিনারী স্কুল

অ মু	৯২	অনুপাত
মু	৫২	৯

"আমরা সময়ে অসময়ে দৈহিক বল ও সাহসের যে ডঙ্কা বাজাইয়া থাকি, তাহার সহিত সত্যের কোন সংশ্রব নাই। পুলিস ও সৈনিক বিভাগের কতকগুলি উর্দ্ধতন পদ ব্যতীত উচ্চ শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না; কেবলমাত্র হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও নির্ভীক প্রকৃতিই যথেষ্ট। অথচ এই দুই বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প।"

লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির রিপোর্ট হইতে নিম্নমুদ্রিত অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

	উচ্চতার গড়।	ওজনের গড়।	বুকের প্রসারের গড়।
অমুসলমান	৫ ফুট ৫½ ইঞ্চি	১।৫।/০	১·৯১
মুসলমান	৫ ফুট ৪½ ইঞ্চি	১।৩	১·৬৭

ছবিগুলিতে মু—মুসলমান, অ মু—অমুসলমান।
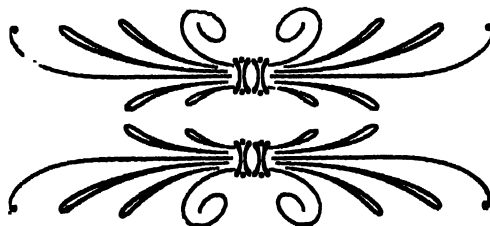
দেশদ্রোহী

(স্প্যানিশ গল্প হইতে)

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

গ্যালিসিয়াতে পাদ্রন্ নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে গার্সিয়া নামক একজন চিকিৎসক বাস করিতেন। চিকিৎসার কাজ ছাড়াও তাঁহার আর এক ব্যবসায় ছিল। তিনি দৈবজ্ঞ ও গণৎকারদের কাছে সাপ, ব্যাঙ, বৃষ্টির জল প্রভৃতি বিক্রয় করিতেন। মানুষের সঙ্গে আলাপাদি তিনি পছন্দ করিতেন না। সর্ব্বদাই গম্ভীর মুখে একাকী থাকিতেন। তিনি বিবাহও করেন নাই।

হেমন্তের কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি। আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া অন্ধকারই যেন রাজত্ব করিতেছে। রাত্রি দশটা হইবে, এমন সময় একদল মানুষ প্রায় অন্ধকারে মিশিয়া চিকিৎসকের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশের শোচনীয় অবস্থা রাত্রির অন্ধকারকে আরও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছিল। সাড়ে আটটায় ঘণ্টাধ্বনি হইবার পর সকল গৃহেরই দরজা জানালা সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলির ভিতর একজন শুদ্ধ গ্যালিশিয়ান ভাষায় বলিল, "আমরা কি করব ?"

আর একজন বলিল, "আমাদের কেউ দেখেনি।" একটি স্ত্রীলোক বলিল, "দরজাটা প্রথমে ভেঙে ফেল।" পনেরো কুড়ি জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সকলকে একেবারে মেরে ফেল।"

একটি বালক বলিল, "বুড়ো ডাক্তারের ভার আমি নিলাম।"

সকলে ব'লয়া উঠিল, "তার ভার নিতে আমরা সবাই রাজী আছি।

"লক্ষীছাড়া আবার ইহুদী।"

"তিনি আবার ফরাসীদের দিকে হয়েছেন।"

"আজ শুনলাম, প্রায় কুড়িজন ফরাসী তার সঙ্গে খানা খেতে এসেছে।"

"তা সত্যি হতে পারে। তারা মনে করেছে, এ বাড়ীতে তারা নিরাপদ, কাজেই দল বেঁধে এসেছে।"

একজন বলিল, "হ'ত আমাদের বাড়ী ত দেখিয়ে দিতাম! তিন তিনটা ভাড়াটেকে আমি এই জন্যে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছি।"

আর একজন বলিল, "আমার স্ত্রী কাল একটার মাথা ভেঙে দিয়েছে।"

একজন সন্ন্যাসীর পোষাক-পরা লোক কর্কশ গলায় বলিল, "আমি দুটি ফরাসী ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলেছি। তাদের ঘরে জলন্ত কাঠ কয়লা রেখে এসেছিলাম, তার গ্যাসেই দুইজন দম আট্‌কে মরেছে।"

"আর এই হতভাগা ডাক্তার কি না তাদের আগ্‌লাবার ভার নিয়েছে।"

"কাল বেড়াবার সময় দেখ্‌লে না কত খাতির করে তাদের সঙ্গে কথা বল্‌ছে ?"

"গার্সিয়ার কাছে এরকম ব্যবহার কেউ প্রত্যাশা করেনি। একমাস আগে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে স্বদেশ-প্রেমিক, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে রাজভক্ত পুরুষ ব'লে তার নাম ছিল।"

"হ্যাঁ, কত ঘটা করে নিজের দোকানে রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডের ছবি বিক্রী করত।"

"আর এখন তিনি নেপোলিয়ানের ছবি বিক্রী করছেন।"

"আগে আগে সে আমাদের কত উৎসাহ দিত দেশরক্ষার কাজে নামবার জন্যে।"

"এখন শত্রুসৈন্য সেই গ্রামের মধ্যে এসে পৌঁছল, তিনি তাদের দলেই ভিড়ে গেলেন।"

"আজ আবার সব ক'জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে নেমতন্ন খাওয়ানো হচ্ছে।"

"কি রকম হল্লা করছে শোন একবার। 'সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন' বলে না চেঁচালেই বাঁচি।"

একজন দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "রোস, এখনও সময় বয়ে যায় নি।"

একজন বৃদ্ধা বলিল, "আগে ভাল করে মদ টেনে মাতাল হতে দাও, তারপর ভিতরে ঢুকে সব ক'টাকে কচুকাটা করা যাবে।"

"ডাক্তারটাকে কুচিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।"

"তা যত ইচ্ছে কুচতে পার। স্পানিয়ার্ড হয়ে যে ফরাসীর দলে যোগ দেয়, সে ফরাসীর চেয়েও ঘৃণ্য। ফরাসীরা অন্য দেশকে পায়ের তলায় পিষে মারছে, আর তার সঙ্গে যোগ দেয় যে স্পানিয়ার্ড, সে নিজের জন্মভূমিকে অন্যের কাছে বিক্রী করছে। ফরাসী খুন করছে, কিন্তু স্পানিয়ার্ড পিতৃহত্যা করছে।"

বাহিরে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন ঘরের ভিতর গার্সিয়া আর তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গ প্রাণ ভরিয়া আহার করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহাদের ফূর্ত্তির আর সীমা ছিল না।

কুড়িজন ফরাসীকে গার্সিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁদের ভিতর সকলেই পদস্থ কর্ম্মচারী।

গার্সিয়ার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘাকার এবং কৃশ ছিলেন। তাঁহার গায়ের রং মৃতব্যক্তির মত এবং তাঁহার মস্তকে কেশ প্রায় ছিল না, বলিলেই চলে। তাঁহার কোটরগত চক্ষু গভীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহা মধ্যে মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার আতিশয্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দেখাইত।

আহারের আয়োজন করা হইয়াছিল প্রচুর পরিমাণে, মদ্যও নানাপ্রকার টেবিলের উপর উপস্থিত করা হইয়াছিল। হাসিগল্প খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসীরা অবাধে হাসিতেছিল, গাহিতেছিল, দিব্য করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার করিয়া চলিয়াছিল।

তাহাদের ভিতর একজন নেপোলিয়নের গুপ্ত প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, আর একজন ২রা মে রাত্রে মাড্রিডে কি ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিতেছিল, তৃতীয় একজন মিশরে নেপোলিয়নের যুদ্ধকাহিনী শুনাইতেছিল, অন্য একজন ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের গল্প করিতেছিল।

গার্সিয়া তাহাদের সঙ্গে সমানে আহার করিতেছিলেন, মদ্যপান করিতেছিলেন এবং গালগল্প চালাইতেছিলেন। ফরাসীদের চেয়ে তাঁহারই গলা বরং উচ্চে উঠিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশংসায় তিনি এমন মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, জুলিয়াস সীজারের সৈনিকেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে উচ্চকণ্ঠে তারিফ করিত, আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিত।

গার্সিয়া বলিতেছিলেন, "মহাশয়, আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা যে যুদ্ধ করছি, তা একেবারে নিরর্থক। আপনারা বিপ্লববাদীর দল স্পেনকে তার মজ্জাগত দীনতা হীনতার পাশ থেকে মুক্তি দেবার জন্য এসেছেন, তার কুসংস্কার, তার অন্ধ গোঁড়ামি, তার পুরাতন আচারবিচার দূর করতে এসেছেন। আপনাদের কাছ থেকে আমরা সত্য মন্ত্র পাব, জগতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই। অনুতাপ, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এসব নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়, সভ্যজাতির পক্ষে এ সব মত পোষণ করা অনুচিত, নেপোলিয়নই সত্য প্রেরিত পুরুষ, তিনিই দুনিয়ার লোককে মুক্তি দিতে নেমেছেন। আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যতখানি, তাঁর আয়ু যেন তত দীর্ঘ হয়।

সৈনিকের দল চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাধু, সাধু।"

চিকিৎসক কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে একটা উৎকট যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

শীঘ্রই তিনি আবার মাথা তুলিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মুখে আর কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। এক গ্লাস মদ্যপান করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, তাঁরও নাম ছিল প্যারিডেসের গার্সিয়া। তাঁর গায়ে হার্কিউলিসের মত জোর ছিল। তিনি একদিনে দুশ' ফরাসীর প্রাণবধ করেছিলেন। আমার বোধ হচ্ছে ইটালীতেই তিনি এই কাণ্ড করেন। আমি ফরাসীদের যত ভক্ত, তিনি

যে তা মোটেই ছিলেন না, তা বুঝতেই পারছেন। গ্রানাডার মূরদের সঙ্গে যে সময়ে স্পেনের যুদ্ধ হয়, তখন তিনি খুব সাহস দেখিয়েছিলেন। আমাদের রাজা নিজে তাঁকে নাইট উপাধি দেন এবং আমাদের খুল্লতাত আলেকজান্দার বর্জ্জিয়া যখন পোপ ছিলেন, তখন গার্সিয়া অনেকদিন দ্বাররক্ষীর কাজ করেছিলেন। ও, আমার পূর্ব্বপুরুষরা যে এত বিখ্যাত লোক ছিলেন, তা আপনারা জানতেন না? এই ডিয়াগো গার্সিয়া, যাঁর কথা বলছিলাম, নিজের বীর্য্যে কোসেনজা এবং ম্যান্‌ফ্রিডোসিয়া দখল করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধে তিনি সেরিলোনা জয় করেছিলেন, পাভিয়ার যুদ্ধেও খুব বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে আমরা ফ্রান্সের রাজাকে বন্দী করে এনেছিলাম, তাঁর তলোয়ার তিন শতাব্দী ধরে মাদ্রিডে ছিল, শেষে সেটা তোমাদের দলপতি ম্যুরা নিয়ে যান তিন মাস আগে। তিনি সরাইওয়ালার ছেলে, না?"

ডাক্তার আর একবার থামিলেন। ফরাসীদের ভিতর কেহ কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু গার্সিয়া উঠিয়া দাঁড়ানোতে তাহারা চুপ করিয়া রহিল। এক গ্লাস মদ উঠাইয়া লইয়া তিনি সিংহগর্জ্জনের মত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়গণ, আমি আপনাদের স্বাস্থ্য পান করছি, আমার পূর্ব্বপুরুষ গার্সিয়া যেন নরকে যান, কারণ তিনি জানোয়ার ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। ফ্রান্সিস্ ও বোনাপার্টের অধীনস্থ ফরাসীরা দীর্ঘজীবি হোন্।"

শত্রুসৈন্যের দলও চীৎকার করিয়া বলিল, "তাঁরা চিরজীবী হোন্।" সঙ্গে সঙ্গে সকলেই স্বাস্থ্য পান করিল।

ঠিক এই সময় সদর দরজার কাছে একটা শব্দ শোনা গেল।

ফরাসীরা জিজ্ঞাসা করিল, "শব্দ শুনতে পেলেন?"

গার্সিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওরা আমাকে খুন করতে এসেছে।"

ফরাসীরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কারা?"

গার্সিয়া বলিলেন, "আমারই প্রতিবেশী, এই গ্রামের লোক।"

"আপনাকে খুন করতে চায় কেন?" গার্সিয়া বলিলেন, "ফরাসীদের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে বলে। কয়েকদিন হ'ল রাত হলেই তারা আমার বাড়ী ঘেরাও করে। কিন্তু এতে আমাদের এসে যায় কি? আমাদের খাওয়া চল্‌তে থাক্।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চলুক। আমরা ত এখানে রয়েছি, আমরা আপনাকে রক্ষা করব।"

স্বাস্থ্য পান করার সময় গ্লাসে গ্লাসে স্পর্শ করা নিয়ম। কিন্তু উৎসবকারীদের তাহাতে শানাইতেছিল না। তাহারা বোতলে বোতলে ঠোকাঠুকি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন! ফার্ডিনণ্ডের মৃত্যু হোক্, গ্যালিসিয়া ধ্বংস হোক্।"

গার্সিয়া আশা করিতে লাগিলেন যে, স্বাস্থ্য পান করিলে তাহাদের চীৎকার কিছু কমিবে। তিনি বিষাদ-পূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন "ক্যালিডোনিও!"

তাঁহার কেরাণী ক্যালিডোনিও দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না। ডাক্তার শান্তভাবেই বলিলেন, "ক্যালিডোনিও, কাগজ আর কালিকলম নিয়ে এস।"

কেরাণী লিখিবার সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া গেল। তাহার প্রভু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এইখানে বসো আমি তোমায় যা-যা বলি তা লিখে রাখ। কতকগুলি অঙ্কপাত করতে হবে। দুসার করে লেখ। একটা সারের উপরে লেখ "জমা" আর একটার উপরে লেখ "খরচ।"

কেরাণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহাশয়, দরজার কাছে একদল লোক জুটে ভয়ানক গোলমাল করছে। 'ডাক্তারকে মেরে ফেল' বলে তারা খুব চেঁচাচ্ছে। দরজাটা ভেঙে ভেতরে ঢুকবার জন্যে তারা ঠেলাঠেলি করছে।"

চিকিৎসক বলিলেন, "তাদের চেঁচাতে দাও যত খুসি

তাদের জন্তে মাথা ঘামিও না। আমি তোমায় যা বল্‌ছি তা লেখ।"

আসন্নমৃত্যুর মুখে বসিয়া তাঁহাকে এ ভাবে হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া, ফরাসীরা তারিফ করিয়া হাসিতে লাগিল। কেরাণী কলম হাতে করিয়া লিখিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া বসিল।

গার্সিয়া নিমন্ত্রিতবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, দেখা যাক, কার কত কৃতিত্ব বেশী। যে যেমন ভাবে বসেছেন, তেমনি ভাবে ধরা যাক্‌। কাপ্তেন, আপনি পিরেনিস্ পার হবার পর কতগুলি স্প্যানিয়ার্ডের প্রাণবধ করেছেন?"

ফরাসীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাহবা বেশ! বেশ ফুর্ত্তি হবে।"

গার্সিয়া প্রথম যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিলেন, সেই ফরাসী কাপ্তেন সোজা হইয়া বসিয়া গোঁফ টানিতে টানিতে বলিলেন, "নিজের হাতে করে আমি দশ কি এগারো জন মেরেছি বলে ধরতে পার।"

ডাক্তার তাঁহার কেরাণীকে বলিলেন, "ঋণের দিকে এগারো লেখ।"

কেরাণী তাহাই লিখিয়া বলিল, "এগারো লিখিলাম।"

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "বেশ চলুক। শ্রীযুক্ত জুলিয়ান্, আপনি ক'জনকে মেরেছেন?"

"আমি ছ'জনকে মেরেছি।"

"সেনাপতি আপনি ক'জনকে মেরেছেন?"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি জন কুড়ির দফা নিকেশ করেছি বোধ হচ্ছে।"

তাহার পর পরে পরে কয়েকজন বলিয়া গেল "আমি আটজন", "আমি চৌদ্দজন", "আমি একজনকেও মারিনি", "আমি ঠিক বল্‌তে পারি না, চোখ বুজে গুলি চালিয়ে গিয়েছি।"

এইভাবে সবাই উত্তর দিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিডোনিও লিখিয়া চলিল।

সকলের নামে লেখা হইবার পর গার্সিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, এখন অন্ত সারে কি লিখতে হবে দেখা যাক। কাপ্তেন আবার আমরা আপনাকে দিয়েই শুরু করছি। ধরুন, এই যুদ্ধটা যদি আরও তিনবছর চলে, তাহলে আপনি আরও ক'জন স্প্যানিয়ার্ডকে মারতে পারবেন বলে বোধ হয়?"

কাপ্তেন বলিলেন, "সে কথা কি কখনও বলা যায়?"

গার্সিয়া বলিলেন,"একটু কষ্ট করে ভেবে দেখুন না?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আরও এগারো জন বলে লিখুন্।"

ডাক্তার বলিলেন, "বাঁ ধারের সারে 'এগারো' লেখ।" ক্যালিডোনিও তাহাই লিখিল।

গার্সিয়া যে ভাবে আগে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখনও সেই ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিলেন, "আপনি ক'জনকে?"

"আমি বোধ হয় পনেরো জনকে।"

"আমি কুড়িজনকে।"

"আমি 'একশ' জনকে, খুব কম হলেও।"

"আর আমি একহাজার জনকে।"

ফরাসীদের ভিতর এই ভাবে প্রায় সকলেই উত্তর দিল।

গার্সিয়া গূঢ় বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া বলিলেন, ক্যালিডোনিও, প্রত্যেকের নামে দশজন করে লিখে রাখ। আর এর পর যোগ করে দেখ।"

বেচারী ক্যালিডোনিওর তখন ভয়ে কালঘাম ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তবু প্রভুর কথা অবহেলা করিবার সাহস তাহার হইল না, আঙুলে গণিয়া গণিয়া সে যোগ দিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট সকলে নীরব থাকিবার পর কেরাণী বলিল, "একদিকে হচ্ছে ২৮৫, আর একদিকে ২০০।

গার্সিয়া বলিলেন, "তাহলে হ'ল, ২৮৫ জন হত এবং ২০০ জন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত। সব জড়িয়ে ৪৮৫ জন স্প্যানিয়ার্ডের জীবন নষ্ট হবে।"

তাঁহার গলার স্বর এমন গম্ভীর আর শোকাকুল যে, ফরাসীরা ভীতভাবে পরস্পরের মুখ দেখিতে লাগিল।

গার্সিয়া তখন মনে মনে আর একটা হিসাব করিতে ছিলেন। হিসাব শেষ হইবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমরা সকলেই বীর পুরুষ। আমরা

সবাই মিলে সত্তর বোতল মদ্যপান করেছি। কুড়িজনের ভিতর ভাগ করলে হয় এক এক জনের ভাগে সাড়ে তিন বোতল। বীর ভিন্ন এ পরিমাণ খেতে আর কে পারে ?"

এমন সময় সদর দরজা মড়্ মড় করিয়া উঠিল। কেরাণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তারা এইবার ঢুক্‌ছে।"

ডাক্তার দিব্য নিশ্চিন্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ক'টা বেজেছে ?"

ক্যালিডোনিও বলিল, "এগারোটা, কিন্তু আপনি কি দরজা ভাঙার শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছেন না ?

চিকিৎসক বলিলেন, "দরজা ভাঙুক, সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

ফরাসীরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "সময় ? কিসের সময় ?' কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, কেহই উঠিতে পারিল না। তাহারা বসিয়া বসিয়াই তরবারি খুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "তাদের ঢুক্‌তে দাও। আমরা অভ্যর্থনা করবার জন্তে তৈরি হয়ে আছি।"

নীচে এই সময় দোকানের শিশি বোতল ভাঙার শব্দ শোনা গেল এবং সিঁড়িতেও এক সঙ্গে অনেক লোকের পদধ্বনি শোনা গেল। সমবেত কণ্ঠে বিকট চীৎকার হইল, "ফরাসীর বন্ধুকে খুন করে ফেল।"

গার্সিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন। টেবিল ধরিয়া তিনি খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, যাহাতে আবার চেয়ারে বসিয়া না পড়েন। তাঁহার দৃষ্টিতে যেন আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছিল, বিজয়ী বীরের হাসি তাঁহার অধরে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার দেহ তখন আসন্নমৃত্যু ও উত্তেজনার আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি গভীর স্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন, "ফরাসী সৈনিকগণ! যদি আপনারা সকলে, বা আপনাদের মধ্যে কেউ, ২৮৫ জন স্বদেশবাসীর মৃত্যুর শোধ নেবার, বা ২০০ জন দেশবাসীকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার সুযোগ পান, যদি পিতৃপুরুষের অপমানিত আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারেন, ২৮৫জন বীরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন, ২০০জন ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করে জাতীয় সৈন্যদলকে সমৃদ্ধ করতে পারেন, তাহলে কি নিজের ছার জীবনের জন্ম বিন্দুমাত্রও মায়া করবেন ? বাইবেলে যে স্যাম্‌সনের গল্প আছে, তার মত কি আনন্দেই সৌধস্তম্ভ নিজের মাথার উপর টেনে ফেলে ভগবানের শত্রুদের সমাহিত করতে পারেন না ?"

ফরাসীরা যেন না বুঝিয়াই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কি বল্‌ছে ?"

ক্যালিডোনিও চীৎকার করিয়া বলিল, "তারা পাশের ঘরে ঢুকে পড়েছে।"

গার্সিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তাদের আস্‌তে দাও। বস্‌বার ঘরের দরজা তাদের জন্তে খুলে দাও। সকলে আসুক, এসে দেখুক, পাভিয়ার যোদ্ধার বংশধর কি করে মৃত্যুকে বরণ করে।"

ফরাসীরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যেন মৃত্যুকে মূর্ত্তিমান রূপেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিল। টেবিলের উপর হইতে তরবারি তুলিবার জন্ম তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বল হস্ত বারবারই বিফল হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন তরবারিগুলি টেবিলের কাষ্ঠের সঙ্গে অদৃশ্য শক্তিযোগে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এই সময় প্রায় পঞ্চাশজন স্ত্রী পুরুষ, ছোরা, তরবারি, পিস্তল প্রভৃতি লইয়া লোমহর্ষণ চীৎকার করিতে করিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

কয়েকজন স্ত্রীলোকই প্রথম ঢুকিয়াছিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "সকলকে খুন কর।"

গার্সিয়া ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, নিরস্ত হও।" তাঁহার কণ্ঠের তীব্রতায় ফরাসীরা আরও হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং দাঙ্গাকারীদের মনেও ভীতির উদ্রেক হইল। তাহারা ঠিক এমন ভাবে অভ্যর্থনা লাভ করিবে মনে করিয়া আসে নাই।

গার্সিয়ার কণ্ঠ ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ছোরাছুরি দেখাবার কোনো দরকার নেই। তোমাদের সকলের চেয়ে আমি জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্তে বেশী করেছি। আমি ফরাসীর বন্ধু

হবার ভাণ করেছি। তোমরা সকলে দেখছ এখানে ফরাসী দলপতিদের। এদের কুড়ি জনকে তোমরা স্পর্শ কোরো না। এদের আয়ু শেষ হয়েছে, সবাই এরা বিষাক্ত মদ্য পান করেছেন।"

গ্রামের লোকেরা ভয়ে বিস্ময়ে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিল নিমন্ত্রিত-দের ভিতর অধিকাংশই প্রাণশূন্য অবস্থায় বসিয়া আছে; তাহাদের মাথা বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, হাত শীতল ও কঠিন হইয়া আসিতেছে। অন্যদেরও মৃত্যু আসন্ন।

"গাসি য়া দীর্ঘজীবী হও," এই ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা চিকিৎসকের চারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গার্সিয়া আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। তিনি নত জানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ক্যালিডোনিও ওষুধের দোকানে আফিং আর বিন্দু মাত্র বাকি নেই সব খরচ হয়ে গেছে। অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে রেখো।

তখন তাঁহার প্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল যে, গার্সিয়া নিজেও বিষাক্ত মদ্য পান করিয়াছেন।

তাহার পর যে দৃশ্য দেখা গেল তাহা দর্শকদিগের মধ্যে জীবনে কেহ ভুলিতে পারে নাই। স্ত্রীলোকরাই গার্সিয়ার প্রাণবধ করিবার জন্য বেশী উৎসুক ছিল, তাহারাই এখন তাঁহার হত-চেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পুরুষেরা আলোগুলি তুলিয়া ধরিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একুশ জনের জীবন-প্রদীপই নিবিয়া গেল।

মৃত গার্সিয়ার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। দেশবাসীর আর্তনাদ, ও ধর্মযাজকের আশীর্বচনের মধ্য দিয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

পাঠান বৈষ্ণব—রাজপুত্র বিজুলী খাঁ

শ্রীঅমৃতলাল শীল

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে মথুরা হইতে বরাহক্ষেত্রে [সোরোঁ] গিয়াছিলেন; পরে বরাহক্ষেত্র হইতে গঙ্গার তীরে তীরে হাঁটাপথে প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। মথুরা ও বরাহক্ষেত্রের মধ্যে কোনও স্থানে তিনি পথশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। নিকটে গোপবালকেরা গরু চরাইতেছিল।

> আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
> শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল ॥ ১৬১
> অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।

প্রেমাবেশ তখনও ভঙ্গ হয় নাই,

> হেন কালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা ॥ ১৬৩

ইহাদের তরুণবয়স্ক প্রভু বিজুলী খাঁ একজন পাঠান রাজপুত্র। তাঁহার সহিত তাঁহার গুরু ছিলেন।

> সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
> কাল বস্ত্র পরে, তাতে লোকে কহে পীর ॥ ১৮৫

তীর্থযাত্রী গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে ধনবান্ ছিল, এখনও আছে। তাহারা প্রায়ই আপনার ধনরত্ন লুকাইয়া সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিত। তাহার সঙ্গীরা ধনের সন্ধান পাইলে তাহাকে ধুতুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া বা মারিয়া ফেলিয়া ধন অপহরণ করিত। এরূপ ঘটনা সেকালে সচরাচর ঘটিত, এখনও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। রাজপুত্র সন্দেহ করিলেন প্রভুর সঙ্গীরা সেইরূপে প্রভুর ধন অপহরণ করিবার জন্য তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে, অতএব তাহারা শাস্তির যোগ্য। রাজপুত্র প্রভুর সঙ্গীদের বন্ধন করিয়া প্রভুর চেতনালাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সচেতন হইয়া—

প্রভু কহেন ঠক নহে মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥ ১৮৩
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥ ১৮৪

লজ্জিত হইয়া রাজপুত্র প্রভুর সঙ্গীদের মুক্ত করিলেন। রাজ্যপুত্রের গুরু প্রভুর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার ও তর্ক আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে ঐ মুসলমান বিদ্বান তর্কে পরাজিত হইয়া, প্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর শরণ লইলেন। প্রভুও তাঁহাকে বৈষ্ণব ভক্তরূপে স্বীকার করিলেন।

রামদাস বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম॥ ২০৭

ইহার পর রাজকুমার বিজুলী খাঁও

কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায়॥ ২০৯
"পাঠান বৈষ্ণব" বলি হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥ ২১১। চরিতামৃত, অন্ত—১৮

এই পাঠান বৈষ্ণব বর্ণনা সম্বন্ধে আমার এক বন্ধু একবার এইরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন :—

১। কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজপুত্রের হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করিবার ঐতিহাসিক প্রমাণ চাই। হিন্দুদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ে মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইবার নিয়ম প্রচলিত নাই। এরূপ ঘটনা ঘটিলে ইতিহাসে তাহার কোন-না-কোন উল্লেখ নিশ্চয় থাকিত।

২। মুসলমান ভদ্রসমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে বা রাজপরিবারে, বিজুলী খাঁ নাম হয় না। অতএব গল্পটি কাল্পনিক, বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুর কীর্ত্তি প্রচারের জন্য গড়িয়া লইয়াছে।

আমার বন্ধুর আপত্তির উত্তর দিতে মুসলমান গ্রন্থকারদের ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস খুঁজিয়া নিম্নলিখিত সংবাদ পাইয়াছি।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন আগ্রা উত্তর-ভারতের মুসলমান-সম্রাটদের প্রধান রাজধানী। সম্রাট ছিলেন আফগান-বংশীয় নিজাম খাঁ সিকন্দর লোদী। তিনি এক হিন্দু স্বর্ণকার-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই রাজপুত্র অবস্থাতে উত্তর-ভারতে যত সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির পাইয়াছিলেন, সকলগুলি খুঁজিয়া ও বাছিয়া বাছিয়া ভাঙিয়া তীর্থস্থানগুলি বনজঙ্গলে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৮৯ সালে রাজ্যলাভ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যমধ্যে হিন্দুদের তীর্থগমন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজধানীর নিকট বলিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের উপর তাঁহার আক্রোশ বেশী ছিল। মথুরাতে কোনও যাত্রী যাইলে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইত; কোনও নরসুন্দর যাত্রীদের ক্ষৌর করিলে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। সেই সময় একজন ধর্ম্মভীরু বিদ্বান্ মৌলবী শাস্ত্রের আজ্ঞা দেখাইয়া সম্রাটকে প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মৌলবীকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু [সম্ভবতঃ বিদ্রোহের আশঙ্কায়] শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে [১৪৯৯ ঈশাব্দে] বুদ্ধন নামক একজন লক্ষ্ণৌবাসী ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে প্রচার করিত যে, উপাসনার প্রধান অঙ্গ ভক্তি, উপাসক হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে হিন্দু মুসলমান উভয় মতের উপাসনাই শ্রীভগবান স্বীকার করিয়া থাকেন, ভক্তিহীন উপাসনার কোনও মূল্য নাই। সম্রাট তখন সম্ভল নগরে, তিনি সেইখানে ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাঁহার সম্মুখে সমস্ত উত্তর-ভারতের মৌলবীদের সহিত বিচার করিতে বলিলেন। বিচার কিরূপ হইয়াছিল মুসলমান ঐতিহাসিক লেখেন নাই, কিন্তু ফল এই হইল যে, মৌলবীরা ফতোয়া [ব্যবস্থা] দিলেন :—"ব্রাহ্মণ যখন স্বয়ং স্বীকার করিতেছে যে, মুসলমান-মতে উপাসনা করিলেও ঈশ্বর তাহা স্বীকার করেন, তখন তাহাকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। না করিলে তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।" ব্রাহ্মণ আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন ও রাজাদেশে অম্লানবদনে মৃত্যু আলিঙ্গন করিলেন।

মহাপ্রভু ১৫১৫ ঈশাব্দের বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। মাঘ মাস আরম্ভ হইলে [জানুয়ারি ১৫১৬] বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া বরাহক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। মাঘ মাসের দশদিন থাকিতে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী স্নান করিয়াছিলেন। অতএব জানুয়ারি [১৫১৬] মাসের শেষে কোনও স্থানে পাঠান রাজপুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে প্রধান প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাঁহার জ্ঞাতি লোদী-বংশীয় ছিলেন। অবস্থাবশেষে অতি তরুণবয়স্ক অথবা শিশুরাও শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইত, রাজকার্য্য তাহাদের প্রতিনিধি নায়েব অথবা 'অতালীক' বা শিক্ষকরা করিত। তাঁহার সময়ে লক্ষ্ণৌর, অর্থাৎ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন বালক আহমদ খাঁ-বিন-মোবারক খাঁ লোদী। গুপ্ত সংবাদদাতার মুখে সম্রাট সংবাদ পাইলেন যে, আহমদ খাঁ আপনার কতকগুলি অনুচরসহ ইসলাম ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সম্রাট কুপিত হইয়া আহমদ খাঁর ভ্রাতাকে আজ্ঞাপত্র লিখিলেন যে, যদি কুমার আহমদ খাঁ তাহার কুকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আবার সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাকে অনুচরসহ বন্দী করিয়া আমার কাছে পাঠাইবে, আমি স্বয়ং শাস্তি দিব।

ঐতিহাসিক ফেরেশতা এই সংবাদটি সিকন্দর লোদীর সময়ের প্রবাদ শুনিয়া ১৫৯০ ঈশাব্দের কাছাকাছি পুস্তকে লিখিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—প্রবাদ এইরূপ বটে, কিন্তু কোন হিন্দু সম্প্রদায়ই মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না। তিনি এ সংবাদ কোনও পুস্তক হইতে সংগ্রহ করেন নাই। ১৫০৮ ঈশাব্দের সংবাদ মধ্যে প্রবাদ রূপে লিখিয়াছেন। এরূপ প্রবাদে সময়ের ঠিক থাকে না। প্রয়াগ ও কাশীতে অনেকে বলে যে, সিকন্দর লোদী রামনাম করিবার অপরাধে সাধু কবীরকে কাশী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কবীর মগহরা নামক স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ সনে তাড়াইয়াছিলেন সে-বিষয়ে আজকাল গবেষকরাও একমত নহেন। এই গল্প সম্বন্ধে এক "ঐতিহাসিক গল্পে" নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছি, কতদূর সত্য বলিতে পারি না।

আহমদ খাঁর সহচর ও অন্য রাজকর্ম্মচারীরা বেশ জানিতেন যে, সিকন্দর এরূপ অপরাধ ক্ষমা করিবার পাত্র ছিলেন না ও তাঁহার স্বয়ং শাস্তি দিবার অর্থ শিরশ্ছেদন। সকলে মিলিয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন কুমারের মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না, সিকন্দরের আজ্ঞা পরিবর্ত্তনের আর কোন আশাও যখন রহিল না, তখন একান্ত বাধ্য হইয়া সকল অনুচরসহ কুমারকে বন্দীরূপে রক্ষি-বেষ্টিত করিয়া আগ্রাতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও পথে যতদূর সম্ভব দেরি করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। আগ্রা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রক্ষীরা সংবাদ পাইলেন যে, সিকন্দর হঠাৎ পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন [২ ডিসেম্বর ১৫১৭]; ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম লোদী সিংহাসন লাভ করিয়াই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, প্রজারা আপনার ইচ্ছামত ধর্ম্ম পালন করিতে পারে; প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে রাজক্ষমতা হস্তক্ষেপ করিবে না। এই সংবাদ পাইয়া কুমারের রক্ষীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

অবশ্য এ বর্ণনাতে ইহা নিশ্চয়রূপে জানা গেল না যে, আহমদ খাঁ লোদী ও বিজলী খাঁ একই ব্যক্তি কি না, কিন্তু হওয়াও অসম্ভব নহে। দুই ঘটনাই সিকন্দরের সময়ের, বৈষ্ণবদের কথার সময় বা সন ও মাস নির্দ্দেশ করা সম্ভব, কিন্তু ফেরেশতা-উল্লিখিত প্রবাদের সময় ১৪৮৯ হইতে ১৫১৭র মধ্যে। সেকালের ধনবানদের ছেলেরা, যাহারা আট দশ জন অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া ভ্রমণ করিত, তাহারা প্রায়ই নবাব, মালিক বা শাহজাদা বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত। দিল্লীর উপকণ্ঠে এখনও লোদী-বংশীয় পাঠানদের বাস আছে। তাহারা বেশীর ভাগ সাধারণ শ্রমজীবী। তথাপি এখনও চার শতাব্দী পরে আপনাদের সম্রাট-বংশীয় শাহজাদা বলিয়া সম্মান দাবি করে, অতএব চরিতামৃতে রাজপুত্র শব্দ আছে বলিয়া বিজুলী খাঁকে নিশ্চয়রূপে সম্রাট-পুত্র বলা যায় না।

মুসলমান-সমাজে সাধারণতঃ যে-প্রকার নামকরণ করা নিয়ম তাহাতে বিজুলী খাঁ নাম হয় না, সে কথা সত্য,

কিন্তু সম্ভ্রান্ত আফগান-বংশেও কল্লু, মল্লু বল্লু, ইত্যাদি নাম ইতিহাসে দেখিতে পাই। সম্রাট সিকন্দরের পিতার নাম ইতিহাসে বহলোল লোদী, কিন্তু পিতৃদত্ত বাল্যনাম বল্লু; ঐ বল্লুর এক খুল্লতাত ছিলেন মল্লু। ইহা ছাড়া সকল সমাজেই বালক বা শিশুর রূপ গুণ দেখিয়া নানাপ্রকার উপনাম বা ডাকনাম রাখা হইয়া থাকে। স্বয়ং মহাপ্রভু অত্যন্ত গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম "গৌরাঙ্গ"। সম্ভবতঃ পাঠান-রাজপুত্র আহমদ খাঁর বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল বর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার ডাকনাম "বিজলী খাঁ" হইয়া থাকিবে।

আমার বিশ্বাস, বিজুলী খাঁ ও আহমদ খাঁ একই ব্যক্তি ও গল্পটি বৈষ্ণবদের কল্পিত নহে, সত্য ঘটনা।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৪১)

নিরঞ্জন বেশীর ভাগ সময় নিজের আপিস-ঘরেই এখন কাটাইয়া দিতেন। ইন্দু না আসা পর্য্যন্ত অবশ্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকটা সময়ই মেয়ের ঘরে কাটাইতে হইত, কিন্তু এখন আর পারতপক্ষে দোতলায় তিনি যাইতে চাহিতেন না। মায়ার অর্থহীন দৃষ্টি, পরিবর্ত্তিত মুখের ভাব দেখিলে তাঁহার বুকের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইত, এ যেন তাঁহার কন্যা নয়, কন্যার মুখোস্ পরিয়া কে সঙ্ সাজিয়া আসিয়াছে। সারাক্ষণই তাহার খবর লইতেন, প্রত্যেকবারেই আশা করিতেন সুখবর একটু কিছু শুনিবেন, প্রতিবারেই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইত। মায়া একইভাবে আছে শুনিয়াই তাঁহার মনে হইত দিনের আলো যেন কালো হইয়া গেল। কিন্তু সংসারে আশাই অবিনাশী, আবার দেখিতে দেখিতে মনের কোণে আশার অঙ্কুর জাগিয়া উঠিত, এখনও সময় যায় নাই, হয়ত আরও কিছুদিন পরেই পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। ডাক্তার মিত্র বলিয়াছিলেন, এ ধরণের যত ঘটনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহার ভিতর সকলেই কোনো-না-কোনো সময় লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছিল, মায়াই কি একমাত্র পাইবে না? এতবড় দুর্ব্বিষহ দুঃখের জন্য ভগবান কি নিরঞ্জনকেই বাছিয়া রাখিয়াছেন?

দেবকুমারের কথা মনে হইলে নিরঞ্জন সত্যই যেন বেদনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নিজের পুত্র-সন্তান ছিল না, ভ্রাতার পুত্রদের তিনি সাহায্য যথেষ্টই করিতেন, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক তাহাদের সঙ্গে তাঁহার অল্পই ছিল। অজয় বাড়ীতে থাকিত বটে, কিন্তু মাসে একদিনও নিরঞ্জনের সঙ্গে তাহার দেখা হইত কিনা সন্দেহ। দেবকুমারকে জামাতা রূপে পাইবেন, ইহা জানিবার পর তাহার প্রতি তাঁহার এমন একটা স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নিজেই তিনি ইহার আতিশয্যে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। চিরদিনের রুদ্ধ পুত্রস্নেহ এক নিমেষেই এই সুদর্শন যুবককে তিনি নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

মায়ার এই অভাবনীয় রোগ যেন নিরঞ্জনের সন্তান-স্নেহের দুটি অধিকারীকেই সমানভাবে আঘাত করিল। দেবকুমারকে কি বলিয়া তিনি সান্ত্বনা দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। তাহার দুঃখ যে কতখানি, তাহা অন্ততঃ বুদ্ধির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিতেন। যৌবনে প্রণয়িনীর প্রেমলাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার নিজের হয় নাই, কিন্তু পুরুষের মনে কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে এই জিনিষটির জন্য থাকে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। হতভাগ্য দেবকুমার যে এই অমৃতের স্বাদ

বুদ্ধ

শ্রীবরদা উকীল

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

পাইবামাত্র চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত হইতে বসিল, ইহার আঘাত যে কতখানি হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছে, তাহা নিরঞ্জন ঠিকই উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নিজের ঘরে বসিয়া কাগজ উল্টাইতেছিলেন, কাজ করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কাজে মন বসাইতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেবকুমার ঘরে ঢুকিতেছে। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত।

নিরঞ্জন একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেবকুমার, আমাকে কিছু বল্‌বে?"

দেবকুমার একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিবার শক্তিই যেন তাহার ছিল না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভাসবাবু কি আপনাদের কোনো আত্মীয়?"

নিরঞ্জন একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা জিগ্‌গেষ কর্‌ছ কেন? না, সে আত্মীয় নয় ঠিক্, তবে আমাদেরই গ্রামের ছেলে, আত্মীয়েরই মত।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি হয়ত অনধিকার চর্চ্চা কর্‌ছি। কিন্তু প্রভাসবাবুকে আর বেশী দিন এ বাড়ীতে থাক্‌তে দিলে তাঁকে দিয়ে মায়ার অনিষ্ট হবে।"

নিরঞ্জন ত আকাশ হইতে পড়িলেন। প্রভাসকে তিনি বাল্যকাল হইতে জানেন, অতি সচ্চরিত্র ছেলে সে, তাহাকে দিয়া মায়ার কি অনিষ্ট হইতে পারে? এ পর্য্যন্ত বিবাহও যে করে নাই, দেশের দশের কাজ করিবে বলিয়া, তাহার সম্বন্ধে দেবকুমারের এরকম ধারণা কেন হইল?

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমার এমন কথা মনে হ'ল বল ত? অনধিকারচর্চ্চা নিশ্চয়ই আমি মনে করতে পারি না, মায়ার ইষ্ট অনিষ্ট এখন ত তোমারই সকলের চেয়ে বেশী দেখ্‌বার কথা।"

দেবকুমার খানিক কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পরে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে মায়া নিজের অপ্রকৃতিস্থ মনের একটা খেয়ালে, তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তিনি জেনে শুনে সেটার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তিনি জানেন অসুখে পড়বার আগে মায়া আমার সঙ্গে এনগেজ্‌ড্ হয়েছিল, এখন যদি সেটা সে ভুলেই গিয়ে থাকে তাহলেও কোনো ভদ্রলোকের উচিত নয় এর সুবিধে নেওয়া।"

নিরঞ্জন কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। সত্যই যদি এইরূপ ব্যাপার কিছু ঘটিতেছে, তাহা হইলে প্রভাসকে আর এক দণ্ড এখানে রাখা যায় না। অবস্থাটা এমনিতেই যথেষ্ট জটিল, বাহিরের লোক মাঝে পড়িয়া সেটাকে আরও জটিল না করিয়া তুলিলেই ভাল। কিন্তু দেবকুমারের এখন যা মনের অবস্থা, তাহার কথা কি অখণ্ড সত্য বলিয়া মানিয়া লওয় যায়? হিংসার উগ্র রঙের ভিতর দিয়া এখন সে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখিতেছে, সামান্ত কথাবার্ত্তাকে প্রেমালাপ ভাবিয়া বসা তাহার পক্ষে কিছুই বিস্ময়কর নয়। তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কি প্রভাসকে কিছু বলা চলে?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমি এবিষয়ে এখনই খবর নিচ্ছি। সত্যি যদি এ রকম কিছু ঘটে থাকে, তাহলে প্রভাসকে বিদায় করতেই হবে। তবে তাকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, সে এ রকম নীচ ব্যবহার করবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এসব বিষয়ে ঠিক করে কিছু বলা শক্ত।"

দেবকুমার বলিল, "আপনি পিসিমাকে আর অজয়-বাবুকে জিগ্‌গেষ করে দেখ্‌তে পারেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই কর্‌ব। তুমি এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, যদিই এ ধরণের কোনো ভাব মায়ার মনে এসে থাকে, তাহলেও অসুখ সারবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার মন থেকে চলে যাবে।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিন ডাক্তার ওকে দেখে কি বল্‌লেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তিনি ত হিষ্টিরিয়ার কেস বল্‌ছেন। এরকম কতগুলো কেসের হিষ্ট্রি বল্‌লেন, অবিশ্যি ঠিক ওর মত একটাও নয়।"

দেবকুমার বলিল, "সারবার সম্ভাবনা আছে কিছু বল্‌লেন ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আছে বলেই ত বল্‌লেন। কিন্তু এ সব কেসের চিকিৎসা ত কিছু নেই, সেই হয়েছে মুস্কিল। সবই নেচারের উপর ছেড়ে রাখ্‌তে হয়। তিনি বল্‌লেন যেমন হঠাৎ স্মৃতি চলে গিয়েছে, তেমনি হঠাৎ ফিরেও আসতে পারে।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কিছুই কি করবার নেই ? তার প্রোগ্রেসকে হেল্প করবার জন্যে মানুষে কিছুই কর্‌তে পারে না ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমি যতদূর তাঁর কথা থেকে বুঝ্‌লাম, করবার কিছু নেই। তার স্বাস্থ্য ভাল রাখা, তার মন ভাল রাখা, এ সবের চেষ্টা অবশ্য করতে বললেন। তা করাও হচ্ছে যথাসাধ্য। তবে তার মনের এখন যা অবস্থা, তাতে কি তার ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না, কিছু বোঝাও যায় না।"

দেবকুমার বলিল, "অন্য কোথাও নিয়ে গেলে হয় না ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সেটা বারণ করছেন। পরিচিত লোকজনের মধ্যেই সারবার সম্ভাবনা বেশী। তোমায় যদি অল্পও মনে রাখত, তাহলে ঢের তাড়াতাড়ি সেরে উঠ্‌তে পার্‌ত। ডাক্তার সেই কথা বলছিলেন।"

দেবকুমার চুপ করিয়া রহিল। মায়া যে তাহাকে কিরূপে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়াছে, তাহা সে অল্প আগেই দেখিয়া আসিয়াছে, সেই জানার তীব্র বেদনায় তখনও তাহার বুকের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিতেছিল।

খানিক পরে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আসি তাহলে। আমি এখানে ঘন ঘন এলে যদি কোনও লাভ হয়, তাহলে আমি রোজ আস্‌ব। না হলে মায়াকে শুধু শুধু বিরক্ত করতে চাই না। মনে করতে না পারুক, আবার যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়, তাতেও খানিকটা লাভ আছে।"

নিরঞ্জনের সম্মুখে সে বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে তাহার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। মায়াকে সে হারাইতে পারিবে না, দৈব তাহাকে এমন বঞ্চনা কখনও করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হয়, আবার সে মায়াকে জয় করিয়া লইবে। তাহার পথে যে দাঁড়াইবে, তাহাকে নির্ব্বিচারে পদদলিত করিতে তাহার কিছুতেই বাধিবে না।

নিরঞ্জন বলিলেন, "ইন্দুকে দিয়ে মায়াকে জানাব এ কথা। তার মত হবে না বোধ হয়, তবু চেষ্টা করা ভাল। প্রভাসের কথাটাও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল।"

দেবকুমার উঠিয়া গেল। বাহির হইয়া যাইবার সময় আর মায়া বা প্রভাস কাহাকেও বাগানে দেখা গেল না।

নিরঞ্জন চিন্তিতভাবে উঠিয়া উপরে চলিলেন। দেবকুমারের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন ? প্রভাসকে সোজাসুজি বিদায় করিয়া দেওয়াই বা যায় কি প্রকারে ? অথচ পিতা হইয়া কন্যার আসক্তির বিষয়ই বা তিনি একজন যুবকের সহিত কি করিয়া আলোচনা করিবেন ? ইন্দুকে বলিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কি প্রভাসকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবে ? চিরদিন পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরে কাটাইয়াছে, এসব ব্যাপারে তাহারা একেবারেই অনভ্যস্ত।

তবু কিছু না করিয়া উপায় নাই। মায়ার ঘর হইতে তখনও অস্ফুট কথার স্বর শুনা যাইতেছিল। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "ইন্দু, আছিস্ না কি ?"

ইন্দু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আমায় ডাকছ মেজদা ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একবার নীচে চল্, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

মায়া উঁকি মারিয়া দেখিল, মুখেচোখে তাহার একটা অত্যুগ্র কৌতূহলের চিহ্ন। সদাসর্ব্বদাই তাহার সন্দেহ যে বাড়ীর সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কি যেন অভিসন্ধি করিতেছে। কিন্তু বাপের সম্বন্ধে তাহার সেই বহু পূর্ব্বের সঙ্কোচ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল, পারতপক্ষে নিরঞ্জনের কাছে সে ঘেঁষিত না। সুতরাং তাহার নামে কি কথা হয় তাহা জানিবার অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের ঘরেই বসিয়া থাকিতে হইল।

ইন্দুকে নীচের লাইব্রেরীর ঘরে লইয়া গিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "দেখ্ ইন্দু, তোকে আমি একটা কথা জিগ্‌গেষ করছি, ভাল করে ভেবে উত্তর দিস্। আজ দেবকুমার আমার কাছে এসে বল্‌লে,প্রভাসের ব্যবহার তার মোটেই ভাল বোধ হয় না, তাকে বেশী দিন এখানে থাকতে দিলে মায়ার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এরকম কথা কি তোর কোনো দিন মনে হয়েছে?"

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমিই তোমায় বলব ভাবছিলাম, মেজদা, তুমি নিজে জিগগেষ করলে ভালই হ'ল। প্রভাসের মনে কি আছে না আছে জানি না, চালচলন ত তার ভালই বলতে হয়। কিন্তু মায়ার মাথায় সর্ব্বনেশে খেয়াল চড়েছে, তার মন যেন সারাক্ষণ ঐদিকেই ঝুঁকে আছে মনে হয়। প্রভাস সেটা বোঝেও যেন মনে হয়। তার উচিত এখনি এখান থেকে সরে যাওয়া, কারণ, তার সঙ্গে মায়ার বিয়ে কোনো দিনই তোমরা দেবে না। কিসের আশায় যে বসে আছে, স-ই জানে। মায়ার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এলে সে কি আর দেবকুমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে যাবে? আমাদের গুষ্টির মেয়ে, কখনও তা করবে না।"

নিরঞ্জনের মুখের ভাব কঠিন হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "প্রভাস যদি মায়ার ভাবগতিক বুঝেও বসে আছে, তাহলে তার ব্যবহার ভাল বলতে পারি না। যাক্, এ বিষয়ে যা করবার তা আমি করব। মায়া যেন ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার কোনো সুবিধে না পায়, সেটা দেখিস্।"

ইন্দু বলিল, "তা সতর্ক ত সারাক্ষণই আছি, পাঁচজন মাঝে পড়ে গোলমাল পাকিয়ে তোলে, সেই ত হয় মুস্কিল। আজও বিকেলে অজয় বোকামী করে প্রভাসকে ডাকাডাকি না করলে, সে কাছে আসার কোনো সুবিধাই পেত না। যাক্, এর পর আর ভদ্রতার ধারও ধারব না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "থাক, অভদ্রতা করবার কিছু দরকার নেই, আমি আজ রাত্রেই তার সঙ্গে কথা বলব। পরের ষ্টিমারেই যাতে বিদায় হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝের দুটো দিন সাবধান থাকলেই হ'ল।"

ইন্দু আবার উপরে চলিয়া গেল। মায়ার ঘরের সামনে আসিতেই সে উত্তেজিতভাবে ছুটিয়া আসিয়া ইন্দুর হাত চাপিয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কি সব মতলব তোমরা আঁটছ শুনি?"

নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া অবধি ইন্দুর মনটা উষ্ণ হইয়াছিল। মায়া যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। ঠেলা মারিয়া মায়াকে সরাইয়া দিয়া, সে তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলিয়া উঠিল, "যা, যা, সব কথায় তোর দরকার নাকি? নিজের চরকায় তেল দিগে যা। লোকের হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছিস মুখপুড়ী, আবার তাদেরই দুষছিস্।"

বকুনি শুনা মায়ার অভ্যাস ছিল না। সে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া পিছাইয়া গেল। তাহার পর নিজেও বেশ খানিকটা তীব্রকণ্ঠেই বলিল, "আমি আবার কার হাড় জ্বালালাম? কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমার কথাতেও লোকে না থাক্‌লেই পারে?"

সে আর ইন্দুর কাছে দাঁড়াইল না। ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দু নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অন্যান্য দিন সে মায়ার ঘরেই শয়ন করিত। আজ রাগারাগি করিয়া তাহার শরীর মন ভাল লাগিতেছিল না। নিজেরই ঘরে মেঝের উপর একটা বিছানা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। মনে করিয়াছিল খানিক পরে মায়ার ঘরে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রভাস সেদিন কোকাইন লেকের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক রাত করিয়া ফেলিল। কিছুতেই তাহার আর ফিরিয়া বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বাড়ীর কেহই যে তাহাকে আর ভাল চক্ষে দেখে না, তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছিল। তাহা হইলে আর থাকার কি প্রয়োজন? ফিরিয়া গেলেই হয়? কিন্তু কি যেন বাধা মনের মধ্যে কেবলই খটকা লাগায়। যাইবার কথা ভাবিতে গেলেই মন বিমুখ হইয়া যায় কেন? তবে কি মায়ার কাছেই তাহার হৃদয় এতদিন পরে আত্মসমর্পণ করিল? তাহাও ত স্বীকার করিতে পারে না। অন্যের বাগ্‌দত্তা বধূর প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে মনে করিতে অনুশোচনায় তাহার মন ভরিয়া উঠে।

কিন্তু মায়া কি তাহার হৃদয়জগতে কোনোই বিপ্লব ঘটায় নাই? সে কি মায়াকে পুনর্ব্বার দেখিবার আগে যেমন ছিল, তেমনিই আছে? দেশের কল্যাণ, স্বদেশ-বাসীর কল্যাণ চিন্তাই কি তাহার মন জুড়িয়া আছে? তাহাই বা সে স্বীকার করিতে পারে কই?

ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আশা করিয়াছিল সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঠাকুর তাহার ঘরে টেবিলের উপর ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু গেটের ভিতর ঢুকিবামাত্র তাহার চোখ পড়িল দোতলায় মায়ার ঘরের জানলার উপর। মায়া জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। কি দেখিতেছে সে? কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে? নিজেকে আর উত্তেজিত করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। তাড়াতাড়ি সবলে মায়ার চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

নিরঞ্জনের ঘরের দরজা খোলা, সেখানেও আলো জ্বলিতেছে। তিনি তখনও শুইতে যান নাই। প্রভাসের পায়ের শব্দে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে, আগে খেয়ে এস।"

প্রভাস মনে মনে বলিল, "কি কথা তা ত বুঝতেই পারছি।" সে ঘরে ঢুকিয়া চাদর, ছড়ি রাখিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

খাওয়া শেষ হইতে-না-হইতেই নিরঞ্জন তাহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আজ যা বলব, তাতে কোনো রকম অফেন্স্ নিয়ো না। অবস্থার গতিকে পড়ে মানুষকে নানা রকম ব্যবহার করতে হয়। আমার মেয়ের অবস্থা ত দেখছ, তার সম্প্রতি সারবার কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। গ্রামে যে স্কুল করতে চাইছ, মায়ার মায়ের নামে, তা করতে পার, টাকা যা লাগে আমি দেব। মায়া সারবে এবং এসব বিষয়ে পরামর্শ করবে, তার আশায় বসে থাকা উচিত ব'লে আমার মনে হয় না।"

প্রভাস বুঝিল নিরঞ্জন তাহাকে বিদায় হইতেই বলিতেছেন, তবে কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন। সে বলিল, "আচ্ছা, তাহলে কালই শহরে গিয়ে প্যাসেজ বুক্ করবার চেষ্টা করব।"

নিরঞ্জন সস্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "সাধারণ সময় হ'লে তোমাকে ধরে রাখতাম যতদিন সম্ভব। এখন কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাধ্য হয়ে আমাকে এরকম অভদ্র হতে হ'ল। তুমি আশা করি কিছু মনে করবে না। কত রকম কম্প্লিকেশন্ যে দেখা দিচ্ছে তার সীমা নেই, কিভাবে যে সে-সবের সঙ্গে কোপ্ করব, তাও ভেবে পাই না।"

প্রভাস মুখে শুধু বলিল, "না অভদ্র কেন মনে করব? এ অবস্থায় যা দরকার তা ত আপনি করবেনই।" মনটা কিন্তু তাহার অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িল। অনেক-খানি যে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা এই বিদায়ের কথা উঠিবামাত্র বুঝিতে পারিল।

নিরঞ্জন উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। প্রভাস একবার বাহির হইয়া আসিল, ভাবিল বাগানে দু-এক পাক ঘুরিয়া আসা যাক্। ঘুম আসিতেছে না, মাথার ভিতরটা যেন দপ্ দপ্ করিতেছে।

বাহির হইবামাত্র সে চমকিয়া উঠিল। সিঁড়ির পাশে কে যেন লুকাইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। সিঁড়ির আলো তখন নিভান ছিল, তবু হলঘরের আলোতে প্রভাস তাহাকে খানিকটা দেখিতে পাইল। সে মায়া।

(৪২)

পরদিন সকালে উঠিয়াই প্রভাস শহরে চলিয়া আসিল। সারাদিনের মধ্যে তাহার আর ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। জাহাজে বার্থ ঠিক করা হইয়া গেলে, চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দিনটা কাটাইয়া দিবে, হোটেলে কিছু খাইয়া লইবে ইহাই স্থির করিয়াছিল। রাত্রে মায়াকে নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অবধি তাহার মনটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত বাড়ীর হাওয়া যেন রহস্যে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ অপ্রকৃতিস্থা তরুণী কি চায়, কাহাকে চায়? প্রভাসের প্রতি তাহার একটা তীব্র আকর্ষণ আছে বলিয়া মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু ঠিক

বুঝিতে পারে না। বুঝিবার কোনো উপায়ও নাই, প্রভাসের চোখের আড়ালেই মায়াকে রাখিবার জন্য সবাই যেন বদ্ধপরিকর। এত ভয় কেন তাহাকে? সত্যই এত ভয়ের কারণ কিছু কি ঘটিয়াছে? প্রভাস নিজের কাছে এখন অস্বীকার করিতে পারে না যে, মায়াকে সে অনেকখানি ভালবাসে। তাহার আশা একেবারেই নাই, তাই জোর করিয়া নিজেকে সে সংযত করিয়া রাখে, না হইলে সমগ্র হৃদয় দিয়াই সে ভালবাসিত। এ ভালবাসা পাগলিনী মায়াকে নয়; যে-মায়াকে দেখিয়া সে নারী সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মায়াকেই। কিন্তু এখন সে স্মৃতি হারাইয়াছে, বুদ্ধি হারাইয়াছে, তবু প্রভাসের অন্তরে তাহার আসন একই ভাবে বিরাজ করিতেছে।

প্রভাস জানিত, মায়াকে পাইবার কোনো আশাই তাহার সত্য সত্যই নাই। এখন কোনো কারণে মায়া হয়ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু স্মৃতি, বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবামাত্র দেবকুমারের প্রেম তাহাকে গ্রাস করিবে, প্রভাসের অস্তিত্বও সে ভুলিয়া যাইবে। এখনকার যে ভালবাসা, তাহা পাগলের প্রলাপ, নিদ্রিতার স্বপ্নের মতই অর্থহীন। তবু এইটুকুই ত জগতকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। মায়া তাহার কথা ভাবে, তাহাকে স্বামী রূপে চায়, এই কথা মনে হইবামাত্র প্রভাসের সমস্ত চেতনা যেন আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। বাস্তব জগতের জিনিষ এ নয়, ইহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। তবু ইহাকে এক মুহূর্ত্ত সে ভুলিতে পারে না। মায়া বলিতে এমন যাহাকে সে চোখের সম্মুখে দেখিতেছে, কালই সে নিশাশেষের স্বপ্নের মত শূন্যে মিলিয়া যাইতে পারে, পৃথিবীতে তাহার আর কোনো চিহ্নই থাকিবে না। কিন্তু এই মিথ্যা মায়া বাঁচিয়া থাকুক, ইহাই কি প্রভাস চায়? ছি, ছি, এত স্বার্থপর সে নয়। মায়ার ঘোরতর অমঙ্গলকে সে নিজের তৃপ্তির জন্য কখনই কামনা করে না। ঈশ্বর তাহাকে যেভাবে জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি দিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণভাবে আবার ফিরিয়া আসুক, প্রভাসের যা দুঃখ তাহা সে পুরুষের মত বহন করিবে।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে সারা শহর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জাহাজে বার্থ সহজেই পাইল, একজনের জায়গা পাইতে প্রায় কোনো কষ্ট হয় না। একবার নিরঞ্জনের আপিসে গিয়া খবরটা তাহাকে দিয়া আসিবে মনে করিল। কিন্তু তিনি হয়ত তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবেন, মনে করিয়া আর গেল না। দুই চারিটা ছোটখাট জিনিষ কিনিবার ছিল, বাড়ীর লোকদের জন্য। কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহা সে একেবারেই জানিত না। আধ ঘণ্টায় যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই কিনিতে তাহার চার পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

বিকালবেলা আর কিছু করিবার না পাইয়া একটা চীনা হোটেলে ঢুকিয়া ভাল করিয়া খাইয়া লইল। তাহার পর কাছেই একটা সিনেমা হাউস দেখিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। ছবিখানি ভালই ছিল, দেখিতে দেখিতে নিজের হৃদয়ের ভার অনেকখানিই যেন ভুলিয়া গেল।

ইন্‌টারভ্যালের সময় হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহার অনতিদূরেই দেবকুমার বসিয়া আছে। প্রভাসকেও সে দেখিতে পাইল, কিন্তু নিকটে আসিবার বা কথা বলিবার কোনো চেষ্টা করিল না। দূর হইতে শুধু একটা নমস্কার করিল। প্রভাসের মনটা আবার যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। চারিদিকে এত বেদনা কেন? কাহারও শান্তি নাই, সুখ নাই। দেবকুমারের মুখ দেখিয়া মনে হয়, নিরন্তর তাহার বুকের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছে। প্রভাসকে সে নিজের সর্ব্বপ্রধান শত্রু মনে করে, কিন্তু প্রভাসও ত গভীর দুঃখের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে। যে এই সকল দুঃখ বেদনার মূলে, সেই মায়ারই বা সুখ কোথায়? সেও ত আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভগবান একি অবস্থার সৃষ্টি করিলেন!

সন্ধ্যার পর নিতান্তই আর কিছু করিবার খুঁজিয়া না পাইয়া, প্রভাস ফিরিয়া চলিল। আর একটা দিন মাত্র মাঝে। তাহার পর এদেশ আর জীবনে কখনও সে দেখিবে না, এই মানুষগুলিকেও সম্ভবতঃ আর দেখিবে না। জীবনের একটা অঙ্কের এইখানে একেবারে যবনিকা-পতন। ইহার পরের জীবন তাহার কেমন হইবে কে জানে?

হয়েছে।” ঠিক এই কথাগুলি একেবারেই তাহার মনের কথা নয়, কিন্তু মায়াকে আর কি সে বলিতে পারে?

মায়া বলিল, “বাবার কথা শুনব? হিন্দুর ছেলে হয়ে আপনি আমাকে জাত ধর্ম্ম সব খোয়াতে বলেন? এর চেয়ে বিপদ আর আমার কি হ'তে পারে? সাধে কি বেহায়ার মত বেরিয়ে এসেছি?”

প্রভাস চুপ করিয়া রহিল। ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার প্রায় নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। কি করিয়া ইহাকে ফিরান যায়? মায়াকে ভালবাসিয়া, শেষে সে-ই কি তাহার নামে একটা মিথ্যা কলঙ্কের সৃষ্টি করিবে? এখানে বাঙালীর সমাজ যে কিরূপ তাহা সে জানে না, কিন্তু দেশের সমাজ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা উত্তম রকমই ছিল। সেখানে এই ধরণের কথা প্রচার হইলে তাহার যে কি অর্থ দাঁড়াইত, তাহাও সে জানে।

খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “তুমি বাড়ী ফিরে যাও মায়া, এমন সময় এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। লোকে শুনলে নিন্দা করবে।”

মায়া বলিল, “করুক গে। আপনি কথা দিন্ আমাকে ঐ ব্যারিষ্টারের হাত থেকে বাঁচাবেন, তা না হ'লে আমি যাব না।”

প্রভাস অনুনয়ের স্বরে বলিল, “আমাকে কেন এর ভিতর জড়াচ্ছ, মায়া? আমি ত কাল চলে যাচ্ছি, আমায় যেতে দাও, মিথ্যা তোমার নামে একটা অপবাদ সৃষ্টি করতে দিও না মানুষকে।”

মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, “আমি যাব না, আমি কিছুতেই যাব না।”

দূরে এই সময় মোটরের হর্ণ তীব্রস্বরে বাজিয়া উঠিল। দুইখানা গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। একটা অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল, একটা মায়া এবং প্রভাসের খানিকদূরে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

মায়া বলিল, “ঐ আমাকে ধরতে আসছে। আমি কি করব?”

প্রভাস হতাশভাবে বলিল, “করবার কিছুই নেই, ওদের সঙ্গে যাও। আমার যা করবার তা আমি করব।”

গাড়ী হইতে নামিয়া একজন লোক দ্রুতপদে তাহাদের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। প্রভাস চিনিল, দেবকুমার। পৃথিবীর আর যে-কোনো মানুষকে দেখিলে এই সময় প্রভাসের কিছু কম অপ্রতিভ লাগিত, কিন্তু দেবকুমারকে দেখিয়া সত্যই তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। দেবকুমার তাহাকে কি যে মনে করিতেছে, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে নিজে হইলেই কি অন্য কিছু মনে করিত? একমাত্র ভগবানের চক্ষে সে নির্দ্দোষ, কিন্তু মানুষের কাছে নিজের নির্দ্দোষিতা সে কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না।

দেবকুমার নিকটে আসিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিল, “বেশ জমিয়ে তুলছিলেন, কিন্তু আমার কথাটা বোধ হয় ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন্ নি, তাই প্লট্‌টা মাটি হয়ে গেল।”

প্রভাস কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। দেবকুমার বলিয়া চলিল, “আইনতঃ আমি এখনও আপনাকে শাস্তি দিতে পারি না, যদিও মর‍্যালি আমার অধিকার স্বামীর অধিকারেরই সমান। কিন্তু মায়ার সামনে কিছু করতে চাই না, পরে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। মায়া, এস।”

দেবকুমারকে দেখিয়াই মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া লেকের দিকে ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মাত্রের মধ্যেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রভাস এবং দেবকুমার দুইজনেই জলে নামিয়া পড়িল। দেবকুমার মিনিট খানিক পরে মায়ার অচেতন দেহ বহন করিয়া উঠিয়া আসিল। তারার আলোয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল, ব্যাকুল-ভাবে ডাকিল, “মায়া, মায়া!”

মায়া সম্পূর্ণ অচেতন, দেবকুমারের ডাকে কোনো সাড়া দিল না। নিজের বলিষ্ঠ বাহুতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া দেবকুমার মোটরের দিকে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, প্রভাসের দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রভাস কিছুক্ষণ অন্ধকারে একলা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চোখ অপমানে ও বেদনায় জলে ভরিয়া উঠিল। অন্ধকারেই কোথায় যে সে মিশিয়া গেল, তাহাকে আর দেখা গেল না। ক্রমশঃ

পথহারা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বোলো না বোল না বোলো না মিথ্যা, তাহারে ফিরিতে বোলো না আর,
আলেয়া-আলোয় যে ফিরেছে পথে, ফিরিবার পথ নাথ নাই যে তার।
আমার কণ্ঠ মিনতি করেছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না তুমি,
পথহারাদের পথে যে যায় সে পায়ের প্রান্তে পায় না ভূমি।

মুখ না ফিরায়ে সে শুধু হেসেছে, সে হাসি হুতাশে এসেছে ফিরি,
নীরব তীক্ষ্ণ তীরের মতন অন্ধকারের মর্ম্ম চিরি।
আকাশ-তারার কিরণ কেঁদেছে ধরার আঁচলপ্রান্ত চুমি,
রাত্রি কেঁদেছে, বাতাস কেঁদেছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না তুমি।

সন্ধ্যা তখনো হয়নি সেদিন, অন্ধকারের অনেক দেরি,
পাখীরা তখনো হয়নি আকুল কলকাকলীতে কুলায় হেরি,
সবে পশ্চিমে ফিরিছে সূর্য্য, সপ্ত রশ্মি যায়নি দেখা,
তখনো রজত গগনপ্রান্তে ফুটিয়া ওঠেনি রক্তরেখা।

সিক্তবসনা বধূরা সে পথে তখনো ফেরে নি কলসী-কাঁখে,
সহসা চমকি থমকি থামিল কে ও নির্জ্জন পথের বাঁকে!
কোথা ছিলে তুমি, কোথা ছিলে তুমি, গোপনচারিণী অদর্শনা,
বেলা পড়ে আসে, দু'দণ্ড আর, এত বিলম্ব, বিড়ম্বনা!

কোথা ছিলে তুমি হে নিষ্করুণা, কোথা ছিলে তুমি মমতাময়ী,
কোথা ছিলে তুমি দেবতা আমার, কোথা ছিলে চির-দয়িতা অয়ি,
কোথা ছিলে তুমি ওগো বিবাগিনী, কোথা ছিলে হায় জীবনাধিকা,
চিরপ্রতীক্ষা সফল করিয়া জ্বালাও জীবন-বহ্নি-শিখা।

কত জনপদে মুখর নগরে প্রান্তরে পথে বিজন বনে,
দূর দুর্গম গিরির বর্ত্মে ফিরেছি অধীর অন্বেষণে,
ফিরেছি ব্যগ্র ব্যাকুল হৃদয়ে, ফিরেছি আশায় আশঙ্কায়,
শষ্পশ্যামল নিরালা বীথিতে, আলোছায়া-বোনা বনচ্ছায়।

কাজল আঁখরে মাথার কাঁটায় কোথায় পাতার লেখনখানি,
অচেনা-চেনারে খুঁজিয়া বেড়াই, দেখিনি যাহারে তাহারে জানি,
মেঘের বরণ কেশের কলাপ, চাঁদের বরণ দেহের বিভা,
আকাশ-বরণ চোখের আভাস, সে যে সুন্দরী চন্দ্রনিভা।

স্বপ্নশিথিল অমল অঙ্গ তুলি, আরক্ত কপোল লাজে,
আধ আঁখি মেলি রূপসী কুমারী জাগে ঘুমন্ত পুরীর মাঝে ;
দূর দিগন্তে পথ হয় লীন, ঘন অরণ্য হয় না শেষ,
সাগর-পারের কন্তার লাগি দীর্ঘ যাত্রা নিরুদ্দেশ।

কেশের কুসুম কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি মৃদুল বসনবাস,
পত্রনিবিড় লতার বিতানে শুনেছি ঈষৎ দীর্ঘ-শ্বাস।
হেরিছি পথের চরণ-চিহ্নে অলক্তকের রক্তরাগ,
কনকচাঁপার ঝরা পাপড়িতে চাঁপা আঙুলের দেখেছি দাগ।

নীলাম্বরীর আগুনের পাড় ঝলমল করি উঠেছে দূরে,
সাগরের তীরে, তটিনীর তটে সন্ধানে তার মরেছি ঘুরে,
স্বর্ণ-ভালের সিঁদুরের টিপ সবুজে গোপনে রেখেছে রেখা,
পাতার আড়ালে ফুটিয়া উঠেছে কম কপোলের পত্রলেখা।

শ্রান্ত ধরণী, পন্থ সুদূর, তপ্ত বাতাস, প্রখর আলো,
রুদ্র ভানুর ক্রুদ্ধ লোচন, কঠিন মাটি এ কাঁকর কালো।
আহত চরণ, মুর্চ্ছিত মন, ঝি ঝি করে মাঠ, আকাশ ধু ধু,
রৌদ্রলীলায় স্বপ্ন মিলায়, চলেছি একেলা চলেছি শুধু।

বেলা বয়ে যায়, বেলা বয়ে যায়, ভেঙে পড়ে ঢেউ হৃদয়-কূলে,
ম্লান কুমুদের মুদিত মুকুলে ভ্রান্ত ভ্রমর ঘুমায় ভুলে।
কি হবে চলিয়া আপনা ছলিয়া না-ছোঁয়া ছায়ার পিছনে ছুটে,
নীড়হারা পাখী, ফিরে যা একাকী, নীরব নীড়ের বক্ষপুটে।

জাগে যৌবন-জোয়ারে আবেগ, হৃদয়ের গাঙে কলধ্বনি,
স্বপ্নে জাগরে ওঠে বার-বার কার আগমনী ছন্দ রণি,
কোমল কণ্ঠ ডাকে কোন্ দূরে, সারা বনভূমে নূপুর বাজে,
সাড়া পাই তার ফাল্গুন-বায়, সাড়া পাই তার প্রাণের মাঝে।

কেশের ভূষণ কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি কণ্ঠমালার মণি,
হরিণ-শিশুর ছোটার পিছনে শুনেছি চপল পায়ের ধ্বনি,
পেয়েছি দিব্য তনুর গন্ধে নবীন পদ্মমধু'র ঘ্রাণ
উষ্ণ মধুর মলয় প্রবাহে করেছি হরষে পরশ-স্নান।

এল এল সে কি, শিহরে বাতাস, হৃদয় আকুলি আকুলি ওঠে.
ঘুরে ঘুরে ফেরে লুব্ধ ভ্রমর, রাঙা সরণীতে পুষ্প ফোটে।
এ-পথ ও-পথ কোলাকুলি করে ওখানে পিয়াল গাছের ফাঁকে,
পরদেশী আলো লুকোচুরি খেলে সেই নির্জ্জন পথের বাঁকে।

গোধূলি-লগনে তোমায় আমায় পথের তীর্থে মিলন হ'ল,
কুণ্ঠা কাটায়ে অয়ি মায়াময়ী, স্বপ্ন-উতল নয়ন তোল,
স্বর্গ মাগিছে মাটির পরশ, মর্ত্ত্য মাগিছে স্বর্গভূমি,
তোমারে খুঁজেছি, তুমিও খুঁজেছ, তোমারে চেয়েছি, চেয়েছ তুমি।

দুটি নয়নের মদির দীপ্তি দু'নয়নে আজ লাগালো ঘোর,
কোথায় থাকিব, কোথায় রাখিব, কি করিব আমি, কি হবে মোর!
এ কি জাগরণ, এই কি স্বপন, এ কি হলাহল, এই কি সুধা,
এ কি মরণের পরমা তৃপ্তি, এ কি জীবনের অমর ক্ষুধা!

অধরে অধর করিল স্পর্শ, তড়িৎ ছুটিল শোণিত মাঝে
এ দেহযন্ত্র বাজিয়া উঠিল আগুনের বীণা যেমন বাজে।
গন্ধমদির বাতাস অধীর, আকাশ অথির আলোয় আলা,
তীব্র সুখের বেদনা বুকের গহনে জ্বালায় দহন-জ্বালা।

কুন্দ-ধবল জ্যোৎস্না-নিঝরে ঝরিছে অবিশ্রান্ত ধারা,
সুনীল আকাশ, সবুজ সাগর, শ্যামল বনানী আত্মহারা।
শাখায় শাখায় বকুল আকুল, কুঞ্জে কুঞ্জে যূথিকা বেলা,
অশোকে অশোকে লাল তরুবীথি, কাননে কাননে ফুলের মেলা।

"আজি পূর্ণিমা, আজি পূর্ণিমা, ঘেরা ঘরে থাকা আজ কি ভালো,
আমায় ডেকেছে সাগরের জল, আমায় ডেকেছে চাঁদের আলো।"
"তোমায় ডেকেছে আকাশের চাঁদ, তোমায় ডেকেছে সাগর-বারি,
তোমায় ডেকেছে সুদূরের পথ, আর কি ধরিয়া রাখিতে পারি?"

ঝিল্লীর সুর বাজে ঝিম ঝিম, নিঃঝুম রাত অন্ধকার,
আকাশে নাহিক তারার চিহ্ন, বিলুপ্ত জ্যোতি চন্দ্রমার।
অন্ধ উষর বন্ধুর পথ, ধূম্র-ধূসর গগনতল,
এমন গহন গভীর রাত্রে, যাত্রার নিলে কি সম্বল?

হায় পথহারা ব্যাকুল বালিকা, কি ঘোর তামসী, কোথায় তুমি!
গুমরি গুমরি কাঁদে বিভাবরী, লোটে সমীরণ চরণ চুমি।
যেয়ো না যেয়ো না ওদিকে যেয়ো না, ও পথ ভীষণ, ও দিক ভুল,
চলন্ত-শিখা নাচে বিভীষিকা, ছোটে জ্বলন্ত উল্কাকুল।

এস এস এস ফিরে এস তুমি, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না আর,
ও আলোয় পথ প্রদীপ্ত হ'লে ফিরিবার পথ অন্ধকার।
ওপথে যে যায় সে পথ হারায়, ওপথে যে যায় পায় না ভূমি
আর্ত্তকণ্ঠ কাঁদিয়া ফিরিছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না তুমি।

শব্দতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ইট - সং ইষ্টক > পালি ইট্‌ঠক।

ইটাল—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে হাটাল, হেঁটাল।

ইতু—সং ইন্দ্র > ব্রাহ্মী লেখে ইত্র > ইতু ? মিত্র > ইতু ?

নেংটি ইঁদুর—সর্বানন্দ লিঙ্গলী।

ইন্দ্র—বৈদিক ইন্দু = সোমলতা, সোমরস। ইন্দু + র = ইন্দ্র = সোমপায়ী।

ইরাণ—ফারসী ইরাণ শব্দটী ঈরান্ - রেজ (%) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ; পহ্লবী এরান্ - রেজ (%), আবেস্তা ঐর্যন বএজহ্, ঐর্যেনে বএজহে ; প্রাচীন-পারসীকে অঈরান, ক্যালডীয় অর্যান ; সংস্কৃত আর্য্যানাং বীজঃ = আর্য্যদিগের আদি বাসভূমি।

ইংরেজ—পর্ত্তুগীজ Ingles.

ইহা—সং এষঃ > প্রাং এস > অপং এহ > হিন্দী য়হ্, এ।

ইস্পাত - পর্ত্তু. Ispada

ইহুদী—হিব্রু ইব্‌রী ; আরবী য়হুদী। আরমিক জহুদ, ফারসী জহুদী।

ঈষলাঙ্গলা—সর্ব্বানন্দ লাঙ্গলিআ।

উখড়া—সং উৎ + √ খোট্ (ক্ষেপণে) > প্রাং উক্‌খোড়িঅ। হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

উগরা— * অপগলতি > ওগলায়।

উচ্ছুগ্‌গু, উচ্ছরগ—সং উৎসর্গ। বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৩১ পৃষ্ঠা। হাঁস কতগুলা দেন ঘাটে উচ্ছরগিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

উজোর—সং উজ্জ্বল > উজ্জ্বল, উজ্জোর।

উজাগর—উজ্জাগর = জাগরণ।

উজাড়—উজ্জ্বল > উজ্জড় = আলোকের সমস্ত বাধা সাফ, তা থেকে অর্থ - জনশূন্য ও বস্তুশূন্য। সং উজ্জ্বাল > প্রাং উজ্জাল > হিন্দী উজেড় = আলোকিত।

উড়নী—ওহাড়ণী পিহাণীএ।—দেশীনামমালা।

উড়ি-ধান—প্রাং উড়িদ, সর্ব্বানন্দ ওড়ী।

উড়ুস - সং উদ্দংশ, হিন্দী উড়িস্। গোপীচন্দ্রের গানে ওরস।

উতরোল—উৎ + তরল = চঞ্চল।

উৎপল—মুণ্ডারী উপল-বা = ভাসমান (প্লবমান) ফুল।

উদাম—সং উদ্দাম > মালদহে উদাম = উলঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গে উদলা।

উনিশ—সং উনবিংশতি > মাগধী প্রাকৃত উনবীসা।

উনা—ধাতু, তাপে গ'লে যাওয়া। উষ্ণ > পালি উণ্‌হ, উণহন, প্রাকৃত উণ্‌হ। সংস্কৃত শব্দে ষ্ণ > প্রাকৃতে ণ্‌হ, সিণ, সাণ হয়।

উপজ—উৎপন্ন > প্রাং উপজ্জ।

উপুড়, উপড়—সং উৎপৃষ্ঠ ? সং অবমূর্দ্ধা > ওমুড্‌ঢ > ওমুড় > উপুড় > উপড়।

-সং ঊর্দ্ধ > প্রাং উড্ড।

উবটন—সং উদ্বর্ত্তন > প্রাং উব্‌বটণ।

উবর—উদ্বর্ত্তিতঃ > প্রাং উব্বড়িও।

উত্তার—সং উত্তারয়তি। উদ্ধৃত (উৎ + ভৃ) > * উত্তরিত > প্রাং উত্তরিও।

উলট—প্রাং অল্লট্ট-পল্লট্ট ; উবল্লথ-পল্লথ < সং উপর্য্যন্ত-পর্য্যন্ত প্রাকৃতসর্ব্বস্বে উল্লট্ট (উদ্বর্ত্তন)। অল্লট্ট-পলট্টম্ অঙ্গ-পরিবর্ত্তে।—দেশী-নামমালা। গুজরাটী উথল-পাথল।

উলাড়—গোরুর গাড়ীর পিছনে ভার হ'লে গাড়ী উলাড় হয়। সং উল্ললতি > হিং উলাড়।

উল্লাল—উৎ + নম + অন = উন্নমন = উচ্ছ্বাস, সোহাগ, সৌভাগ্য, সুখ। প্রয়োগ কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকায় দ্রষ্টব্য। বুকে আরোপিয়া পদ করেন উল্লাল।—ঘনরাম। উৎ + লল (উৎক্ষেপ, কম্পন, উপসেবা, ক্রীড়া ইত্যাদি)।

উসাস—উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস > প্রাং উস্‌সাস।

উষ্কা-খুষ্কা—সং শুষ্ক > আবেস্তা ও প্রা-পার উষ্ক, ফারসী খুশ্ক্।

উর্মি—সং ঊর্মি > অবেস্তা বরেমি > সং উর্মি।

একটি—বৌদ্ধগানে একুড়ি।

একঠ্‌ঠা—সং একস্থ্য > প্রাং একঠ্‌ঠঅং > হিন্দী একঠ্‌ঠা।

একষট্টি—পালি একসট্‌ঠি।

একুটী, একুতী—কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

একুশ—একবিংশ > পালি একবীসা, একবীসতি, অর্দ্ধমাগধী একবীসা।

এগার—সং একাদশ > পালি প্রাকৃত হিন্দী এগারহ।

এত—প্রাং ইত্তিঅ, এত্তিঅ, এত্তঅ (ভাস, চারুদত্ত)।

এল—আসিল। সং আয়াত > * আয়াল > *আআল > মৈথিলী আএল, ঐলৈ। আগতক > আঅদঅ > আঅল > আল > এল।

আকুলক > প্রাং আউলক >* আলঅ > আল > এলো চুল।

এলায়—এখন। বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৩৩ পৃষ্ঠা—এলায় যদি আমি যাই জলক লাগিয়া। ঐ ত যম তাড়ুয়া তোক লইয়া যাবে বান্ধিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

এলেমান—ফ্রেঞ্চ Allemands (আল্‌মঁ) = জার্ম্মান জাতি।

এহি—অপভ্রংশ প্রাকৃত - এহ, এহি, এহী, এহ, এহু।

ঐত্তরেয়—আবেস্তা অত্রবণ্, অত্রবণ্ = ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা। সম্ভবতঃ আতর (অগ্নি) শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

ও—সংযোজক অব্যয়। হিব্রু আরবী উ বা ও ; ফার্সী উ (ও)। বৈদিক উত > প্রাং উঅ, উঅ > ও। চর্য্যাপদে হো, মধ্যযুগের বাঙলায় হো হ ও অ (হ সংযোগ সুখোচ্চারণের জন্য)। সং উত > প্রা - পার উতা > উআ > ফারসী উ বা ও। - সুনীতি-বাবু।

সর্ব্বনাম। সং অসৌ > প্রা° ওই। সম্বোধন-বাচক অব্যয়। বৈদিক হয়ে > অহে > ওহে > ও।

ওগ্‌রা—প্রা° ওগ্‌গর ভত্তা।—কর্পূরমঞ্জরী।

ওঁছা—অবচ্ছিত।

ওঝা—উপাধ্যায় > প্রা° উঅজ্‌ঝাঅ, ওজ্‌ঝাঅ। সিন্ধী রাঝো।

ওঠ—সং ওষ্ঠ > প্রা° ওট্‌ঠ।

ওড়না—অবগুণ্ঠং ওঢ়ণং।—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব।

ওত—মৈথিল ওত = আড়াল।

ওম—উষ্ম > পালি উন্‌হ > উম > ওম।

ওর—সং উর্ব্বক > প্রা° উদ্দক > পঞ্জাবী ওড়ক, পালি ওর।

ওলন্দাজ—ফ্রেঞ্চ Hollandaise (ওলান্দেজ্)।

ওস—সং অবশ্যায় > প্রা° ওস্‌সাঅ, পালি ওস্‌সাব। = শিশির।

ওস্তাদ—ফা° উ-স্তাদ [উ (= সে, তিনি) + সিতাদন (= দণ্ডায়মান থাকা, বহন করা), সিতায়দন = প্রশংসা করা)] = গুরু, জ্ঞানী, প্রশংসিত, দক্ষ। যাঁর কাছে দণ্ডায়মান থাকতে হয়, বা যাঁর প্রশংসা করতে হয় তিনি উস্তাদ।

ঔরংজীব—ফারসী ঔরঙ্গ্ < পহ্লবী অব্‌রঙ্গ = জাঁকজমক <- প্রা-পার. অবি-রঙ্গ <- সং অভিরঙ্গ (সমুজ্জ্বল)। জীব = সংস্কৃত?

সন্ন্যাসীর গল্প

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি বললুম, "আজ না হয় থাক, সন্ন্যাসী মশায়, অনেক রাত হয়ে—"

সন্ন্যাসী মশায় তাঁর কম্বলের বিছানাটা গুটিয়ে রেখে বললেন, "না চলুন, বাইরে জ্যোৎস্নায়, একটু গিয়ে বসি। আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা বোধ হয় হবে না, কাল আমি চলে যাব।"

ঘরের মধ্যে মশা বড় ভন্ ভন্ করছিল, গরমও খুব। বাইরে জ্যোৎস্নার ফিন্ ফুটছে, বাঁশঝাড়ের ডগার পাতাগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্ চিক্ করে জলছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি কাল চলে যাবেন, কিন্তু তাঁত তো এখানে খাটানো পড়ে রইল, শেখানোর কি হবে?"

বাইরের দালানে উঠবার মার্ব্বেল পাথরের ঠাণ্ডা সিঁড়ির ওপর জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে গিয়ে বস্‌লুম।

সন্ন্যাসী মহাশয় একটু অন্যমনস্কভাবে বাঁশগাছের মাথার দিকে চেয়ে রইলেন। প্রায় এক মিনিট আমার কথার কোনো উত্তর পেলুম না। তারপর বললেন, "তাঁত শেখানোর কথা বলচেন? ও আমি ঘুরে এসে শেখাবো। মাসখানেক পরেই আবার আস্‌চি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন আপনি কোথায় যাবেন?"

দেখলুম, তিনি আগের মত অন্যমনস্কভাবে বাঁশঝাড়ের মাথায় একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি চুপ করে রইলুম। রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি। কাল ভোর পাঁচটায় আমায় স্কুলে যেতে হবে, আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হলুম। রাত এত হ'ল তবু ঘুমবার নাম নেই।

লোকটাকে প্রথম হতেই আমার একটু অদ্ভুত ধরণের মনে হয়েছিল। রুক্ষ রুক্ষ বড় বড় চুল, দীর্ঘদেহ, মুখখানা আর চোখ দুটায় কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। যদিও রাত অনেক হয়েছিল, তার গল্প শুনবার লোভ আমি সামলাতে পারলুম না।

একটু প্রার্থনাসূচক স্বরে বললুম, "কোনো বিশেষ গোপনীয়—"

তিনি বললেন, "কিছু না, শুনবেন? আপনার আবার কষ্ট হবে না তো? অনেক রাত হয়ে গেল। ঘটনা এমন বিশেষ কিছুই না, তবুও—"

আমি বললুম, "বলুন।"

সন্ন্যাসী মহাশয় বলতে সুরু করলেন,—

"আমি গৃহত্যাগী আজ ত্রিশ বৎসর তা আপনাকে বলেছি। জীবনে আমি কখনও বিবাহ করিনি। আমার ছাত্রজীবন একটু একটু ক'রে আমার অজ্ঞাতসারে কবে সন্ন্যাসী জীবনে পরিণত হয়ে উঠেছিল, তা আমার মনে পড়ে না। কেশব সেন যখন রামকৃষ্ণ পরমহংসের দলে যায়া-আসা আরম্ভ করলেন তখন আমাদের—মানে ছাত্রদের কাছে, পরমহংসের খ্যাতি হঠাৎ বড় বেড়ে উঠলো। সেই থেকেই আমি পরমহংসের ভক্ত। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি দীক্ষা নিলাম তাঁর মৃত্যুর পর মা-ঠাকুরুণের কাছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মা ঠাকুরুণ—"

"পরমহংসের স্ত্রী। দীক্ষা নেবার পর সংসার ছেড়ে দিলাম। চোখের সাম্‌নে কোনো আদর্শ খাড়া করে তাই পাবার জন্যে সংসার ছেড়ে দিয়েছিলাম ব'লে মনে হয় না। একদল লোক আছে, যারা সংসারের বোঝা বইবার উপযুক্ত নয়। সংসারকে তারা ভয়ে দূরে রেখে দেয়। আমি এই দলভুক্ত সন্ন্যাসী, তুচ্ছ লোক। যাই হোক, দীক্ষামন্ত্র সম্বল করে জগতের একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল পথে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন আমার বয়স খুব বেশী নয়। তরুণ মনের ভাব ও কল্পনাগুলোকে ধুনির আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে বিকৃত ক'রে ফেল্‌লাম। দেখুন, একাজ বড় বিপজ্জনক, অনেকটা জুয়াখেলার মত। আপনি তো বিজ্ঞান পড়েছেন। হীরা কি ক'রে তৈরি হতে পারে তার থিওরী ত জানেন? কার্ব্বণ একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ আর চাপ পেলে দানা বেঁধে হীরা হ'তে পারে বটে, কিন্তু নকল হীরা তৈরি করতে গেলে সেই নির্দ্দিষ্ট চাপটুকুর অভাবে তা হয়ে পড়ে কালো কয়লা। দৈবাৎ কোনো বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে নির্দ্দিষ্ট চাপটুকু জুটে গেলে তাঁর কার্ব্বণ হয়ত দানা বেঁধে হীরা হ'য়ে যেতেও পারে, কিন্তু সে—ঐ যে বললাম জুয়াখেলার মত। আমাদের ভাগ্যে, অনেকদিন ধরে ধুনির আগুনে পুড়লাম বটে, কিন্তু দানা বাঁধবার সময় দেখলুম বাঁধলো কালো কয়লায়। আশপাশের এক আধজন ভাগ্যবান গৃহত্যাগী ভ্রাতা হীরা হয়ে জমে গেলেন কিনা সেই রাগে তার সন্ধান পর্য্যন্ত রাখলাম না—হিংসা!"

"যাক, এই ত্রিশ বছরের ইতিহাস আমার খুব অদ্ভুত। এর বেশীর ভাগ শ্মশানে শ্মশানে কেটেছে। ভয় জিনিষটাকে দূর করে দিয়েছিলাম। ক্ষুধাতৃষ্ণাকে অনেকটা হাতের মুঠার মধ্যে নিয়ে এসে ফেলেছিলাম। শীতগ্রীষ্মও গ্রাহ্য করিনি। বনের কালো কচু জানেন? অরন্ধনের দিন যার ডাঁটা সিদ্ধ করে খান। এই ত্রিশ বৎসরের জীবনে অনেক দিন ঐ যে কচুর ডাঁটা আমার একমাত্র খাদ্য ছিল। বিনা মসলায় খেয়েছি, নুন তেলও না দিয়ে, শুধু সিদ্ধ করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা জিনিষটা ক্ষুধার মত। ক্ষুধা যেমন মরে যায়, ও জিনিষটাও তেমনি আহুতি না পেলে মরে যায়। কাজেই এ—"

আমি বললুম, "এর সত্যতা তর্কসাপেক্ষ।"

সন্ন্যাসী মহাশয়ের মুখে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল। আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর বল্‌তে লাগলেন,—

"সেবার কার্ত্তিক মাসে যশোর জেলায় অত্যন্ত কলেরার মড়ক হ'ল। অনেক গ্রাম একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়লো। গবর্ণমেণ্ট ওষুধ ও ডাক্তার পাঠিয়ে অনেক জায়গায় ডাক্তারখানা খুলিয়ে দিলেন। শীতের মাঝামাঝি, শীতটা যেই একটু বেশী করে পড়লো, এদিকে মড়কও ক্রমে কমে গেল। যেই শীতকালের শেষে চৈত্রমাসের প্রথমে আমি যশোর জেলায় ঘুরতে ঘুরতে বাজিতপুরের শ্মশানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বাজিতপুর জানেন? যশোর জেলায়—নবগঙ্গার ধারে ঠিক বলা যায় না, কারণ গ্রাম থেকে নদী প্রায় তিন পোয়া পথ। নবগঙ্গা খুব বড় নদী নয়, জায়গায় জায়গায় টোকা পানা আর জল ঝাঁজির দামে একেবারে ভরে গিয়েছে। বাজিতপুর গ্রামের প্রায় দুই মাইল দূরে এই নদীর ধারে খুব বড় একটা তেঁতুল গাছ আছে। এই তেঁতুল গাছ কতদিনের তা কেউ বলতে পারে না। এর ডালপালা অনেকদূর জুড়ে থাকে। এরই আশেপাশে নদীর

ধারে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শ্মশান। চারিপাশের অনেকগুলো গ্রামের লোক এই শ্মশানে শবদাহ করতে আসে।

"সেখায় চৈত্র মাসের প্রথমে আমি যশোর জেলায় ঘুরতে ঘুরতে এই বাজিতপুরের শ্মশানে গিয়ে ধুনি জাল্‌লাম। অত-বড় শ্মশান আমি আর কখনও দেখিনি। পাশ দিয়ে নবগঙ্গা বয়ে যাচ্চে, ছোট্ট মেয়েটির মত, তীরের বন ঝোপের সঙ্গে হাসিখেলা করতে করতে, সহজ সরল ক্রীড়াশীল গতিতে। নদীর দক্ষিণ তীরে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। তারই পেছনে আরও প্রায় দেড় মাইল দূরে গ্রাম। নিকটে কোনো দিকে কোনো লোকালয় নাই। গত মড়কের সময় লোকে শবদাহ করে উঠতে পারিনি বোধ হয়, নদীর ধার থেকে তাই বড় তেঁতুলগাছটার তলা পর্য্যন্ত চারিধারে মড়ার মাথা ও কঙ্কাল ছড়ান পড়ে ছিল।"

"সেদিন কোন্ তিথি তা আমার ঠিক মনে পড়চে না, মোটের ওপর সেদিন সন্ধ্যার পরই অন্ধকার ভয়ঙ্কর ঘনিয়ে এল। আবলুস্ কাঠের মত কালো অন্ধকার। তেঁতুল গাছটার সর্ব্বাঙ্গে, দূর জঙ্গলের বুকের মধ্যে সেই অন্ধকারে চারিপাশে. আকাশে বাতাসে কেমন একটা পাথরের মত কঠিন নিস্পন্দ নির্জ্জনতা থম্ থম্ করতে লাগলো। নদীর ওপারের গাছপালাগুলো দেখতে হ'ল যেন শুধু একরাশ জমাট-পাকানো অন্ধকার। তেঁতুলগাছটার সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকী পোকা জলে সেই বিশাল অন্ধকার মাখানো গাছটার মূর্ত্তিকে আরও ভয়ানক ক'রে তুলেছিল। বিশাল আঁধারে শ্বাসরুদ্ধ প্রকৃতি কেবল একটু শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছিল সেই জায়গাটুকু দিয়ে যেখানটায় নবগঙ্গার মাঝ-জল নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় একটুখানি উজ্জল হয়ে উঠেছিল।

"এ রকম জায়গায় কখনও কাটিয়েছেন? এই রকম নির্জ্জন, শব্দহীন স্থানে মনের কোন্ রুদ্ধ দ্বার আপনা-আপনি খুলে যায়। লোকজন কেউ কোনদিকে নেই দেখে এই সব স্থানে লজ্জাকুণ্ঠিতা প্রকৃতিরাণী তাঁর মুখের আবরণ ধীরে অপসারিত করেন—যে সে-সময় এখানে থাকে সে-ই তা দেখতে পায়।

"প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল। শেষরাত্রের দিকে আমি বড় ক্ষুধা অনুভব করলাম। সেদিন সারাদিনমান আমি কিছুই খাইনি। ভিক্ষা করা অভ্যাস ছিল না, যে যা স্বেচ্ছায় দিয়ে যেত তাই খেয়ে প্রাণধারণ করতাম। লোকালয় থেকে বহুদূরে এ নির্জ্জন শ্মশানে আমায় আর কে কি দিয়ে যাবে? কাজেই সমস্ত দিন অনাহারে ছিলাম। কিন্তু অনেক রাত্রে ক্ষুধার যন্ত্রণা বড় বেশী হ'ল। তখন চৈত্র মাসের প্রথম পাকা তেঁতুলের সময়। ভাবলুম তেঁতুলতলায় গাছ থেকে নিশ্চয় তেঁতুল পড়ে থাকবে। হাসবেন না—তারপর রাতদুপুরের সময় সন্ন্যাসী-মশায় চললেন তেঁতুলতলায় তেঁতুল কুড়িয়ে খেতে। ধুনির একখানা জলন্ত কাঠ নিয়ে গেলাম, আলো পাবার জন্যে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটা টাট্‌কা চিতা, কারা সেদিন কাউকে দাহ করে গিয়েছিল। দেখলুম তারা একটা কলসীতে কিছু চাল ফেলে গেছে। চিতাপিণ্ড দেবার জন্যে নিয়ে এসেছিল, বোধ হয় বেশী হয়েছিল—ফেলে রেখে গেছে। চালসুদ্ধ কলসীটা নিয়ে এলুম। কলসীটার উপরটা ভেঙে ফেলে দিয়ে জল দিয়ে ধুনির আগুনে সেই চালগুলো চড়িয়ে দিলুম।

"ক্রমে রাত শেষ হয়ে এল। নদীর ওপারে অনেক দূরের গ্রামের বনগাছের পেছন থেকে চাঁদ উঠতে লাগলো। সে-ঝোপ আলো-আঁধারে অতি অদ্ভুত দেখতে হ'ল—একটা বহুদিনের সুপ্ত প্রকৃতি যেন তন্দ্রাজড়িত চোখ মেলেছে, কোন দূরদেশের নতুন বিবর্ত্তনের ইতিহাস-ভরা সৃষ্টির অস্পষ্ট আলোয়। এদিকে আমার ভাত হয়ে গেল, ভাত নামিয়ে রেখে বড় কমণ্ডলুটা নিয়ে নদীতে জল আনবার জন্যে গেলুম। শ্মশানের ধারে একটা ছোট ঘাট মতন আছে। শবদাহ করতে এসে লোকে সেই ঘাট থেকে কেউ জল নেয়, তার দু'পাশেই ঘন শর-বন। ঘাটে নেমে মাথা নীচু করে কমণ্ডলু ভর্ত্তি করছি, হঠাৎ শর-বনের ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে পেলুম ঘাটের বাঁ-ধারের শর-ঝোপের ও-পাশে সাদা মতন কেউ যেন নড়চে। মাথা তুলে শর-ঝোপের ও-পাশে চেয়ে দেখি সত্যিই কে যেন মাথা নীচু করে নদীর ধারে কি যেন কুড়িয়ে

বেড়াচ্চে। অত্যন্ত ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। খুব আশ্চর্য্যও হলুম। ভাবলুম্ এত রাত্রে কে এখানে আস্‌বে? এর কোনো দিকে লোকালয় নেই, সকলের চেয়ে নিকটে যে গ্রাম শুভরামপুর, তা এখান থেকে দেড় মাইল দূরে। এও সম্ভব নয় যে এত রাত্রে কোনো জেলে নদীর ধারে মাছ ধরতে এসেচে, আর যদিও আসে তো তার নৌকা কই? এত রাত্রে শ্মশানের ধারে মাছ ধরতে আস্‌বেই বা কে সাহস করে? পাড়াগাঁয়ের শ্মশান কেউ জমা রাখে না যে তাদের কেউ এসে রাত্রে শ্মশান চৌকি দিচ্চে। প্রথমটা একটুখানি সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। পরক্ষণেই দুর্ব্বলতা জোর কোরে ঝেড়ে ফেলে ভাবলুম—কি এমন? দেখিই না। শরবন ঘুরে ও-পাশে গিয়ে দেখলুম সত্যিই কে যেন মাথা নীচু করে বেড়াচ্চে, আমার থেকে তার দূরত্ব প্রায় পনর-ষোল হাত। হঠাৎ আমার পায়ের শব্দ শুনেই বোধ হয় সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। চাইতেই দেখলুম, যে ফিরে চাইলে সে পুরুষ নয়, রমণী। ধাক্কা খেয়ে আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি জোর করে পা বাড়িয়ে আরও খানিক এগিয়ে গেলুম। তখন বেশ চাঁদ উঠেছিল। কাশফুলের মত সাদা ধপ্ ধপে জ্যোৎস্না চারিদিক ধুয়ে দিচ্ছিল। দেখলুম রমণী তরুণী। কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা-টানা, মুখ বেশ খোলা। অত্যন্ত বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে কি জিজ্ঞাসা করব ভাবচি, এমন সময় সে বেশ সহজ সুরে বললে,—আমি ভেবেছিলাম এখানে কেউ থাকে না। তুমি কি এখানে থাকো? মেয়েটির গলার সুর শুনে আমার কি জানি কেন হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক মনে হ'ল। যেন আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, যেন আমি এইটাই আশা করছিলুম। আমি বললুম,—আমি সন্ন্যাসী মানুষ। শ্মশানে শ্মশানে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু তুমি এখানে কোথা থেকে কি করে এলে মা? সে বললে,—সত্যি সত্যি তুমি সন্ন্যাসী! তার কথার ভাবে অত্যন্ত বিস্ময়ের উপরেও আমার হাসি পেল। আমি বললুম—না হ'লে এত রাত্রে কি এখানে আর কেউ থাকে। কিন্তু তুমি কি একা এসেছ মা, তোমার সঙ্গে কেউ নেই?…দেখলুম আমার প্রশ্নের দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই, তিনি একটু মনোযোগের সঙ্গে শর-বনের ঝোপের জলের ধারে চেয়ে কি দেখছেন।

"জ্যোৎস্নার আলো তাঁর মুখে, সর্ব্বাঙ্গে পড়েছিল। চাঁপা ফুলের রঙের সঙ্গে সাদা গোলাপের আভা মিশলে যে-রকম রং হয় তাঁর গায়ের রংটা সেই রকম। মুখের গড়ন যে অত সুন্দর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। চোখ দুটায় কেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি—আর সে দুটা এত কালো যে কোথায় ভুরু শেষ হয়ে চোখের আরম্ভ হয়েচে তা যেন ধরা যায় না।

"হঠাৎ রমণী এমন করে আধখানটা ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন, যেন সেইটাই তাঁর লক্ষণীয় বিষয়। তাঁর দৃষ্টির রেখা ধরে চেয়ে দেখলুম, তাঁর দৃষ্টি বদ্ধ হয়ে আছে শর-বনের পাশের একটা কি সাদা জিনিষের ওপর। ভাল করে চেয়ে দেখলাম সেটা একটা মড়ার মাথা। তিনি তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন,—তুমিও তো এখানে থাক, আমার মণ্টুকে দেখেছ?… বললুম—মণ্টু, কে মা? তিনি বললেন,—মণ্টু, মণ্ট আমার খোকা।…তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলুম, এখন বেশ বুঝতে পারলুম, রমণী যিনিই হোন্, তিনি প্রকৃতিস্থা নন। বললুম,—এস মা আমার সঙ্গে, আমি ঐখানে তেঁতুলগাছের কাছে থাকি—আমি সব বল্‌ছি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সুরে বললেন,—তুমি, তুমি জানো? তুমি তাকে চিন্‌তে?—মণ্ট কে?…বললুম, মা, আমি এখানে নতুন এসেছি, আমি তো ঠিক জানতুম না। তুমি এস আমার সঙ্গে। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন।…বললুম,—মা, তুমি কোথা থেকে আসচো? তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে?…

"তিনি দেখলুম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আমার আসবাব-পত্র লক্ষ্য করছেন—কমণ্ডলু, ধুনি, কম্বল, ভাতের হাঁড়ি, পুঁথি। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন,—হ্যাঁগা এসব কি? তুমি কি বাড়ী যাও না? এখানেই থাকো? আমি বললুম,—আমার বাড়ী ত নেই মা। আমি এখানেই থাকি। তুমি বসো, দাঁড়িয়ে কেন মা?

"তিনি হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি বলব না, যাই, তাকে একটু খুঁজিগে। দেখলুম তিনি চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন, বললুম,—মা, আমি বল্‌চি তুমি এখানে বসো। আমি আগে সব শুনি। তারপর বরং·

"তাঁর মুখ আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বললেন,—আচ্ছা আমি বস্‌চি, তুমি বোধ হয় বলতে পারবে এই-খানেই সে কোথায় আছে, তাকে এইখানেই এনেছে কিনা? তিনি ধুনির ও-পাশে বসলেন।

"'ধুনির আলোয় ভাল করে তাঁর মুখ দেখলুম, মনে হ'ল জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব যতই জটিল হোক না কেন, যে শিল্পীর এসব সৃষ্টি, সে তুলি ধরেছিল বটে! তাঁর শুভ্র, সুগোল হাতের বালা ছুটি আর গলার সরু হারগাছটা আলোয় যেন জ্বলে উঠলো। নারীর সৌন্দর্য্য যে সৃষ্টির একটা কত-বড় ঐশ্বর্য্য, তা বেশ বুঝতে পারলুম।

"আবার জিজ্ঞাসা করলুম,—তোমার বাড়ী কোন্ গাঁয়ে, মা?...তিনি আঙুল তুলে বনের দিকে দেখিয়ে বললেন,—ওই যে ঐদিকে, শুভরত্নপুর।

"আমি বললুম,—মা, এ জায়গায় আসা কি ভাল? একা বেরিয়েছ কি ব'লে?

রমণী বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমি একা তো আসিনি। আমার মণ্টুকে তারা এখানেই এনেছে, তাই আমি এলাম তাকে খুঁজতে। তারা আমায় আসতে দেয় কি না? আমি লুকিয়ে এসেছি।

"আমি মনে করেছিলুম যে, ক'রে হোক ভুলিয়ে তাঁকে সকাল পর্য্যন্ত সেখানে আটকে রাখব, তারপর ভোর হ'লে যা-হয় করব। বললুম,—আস্‌তে দেয় না কেন? বারণ করে বুঝি? তিনি বললেন - বারণ করে? দেখবে, এই দেখ। তারপর আলোর কাছে হাত ছুটোর খানিকটা খুলে দেখালেন, দেখলুম কনুইয়ের খানিকটা ওপরে অমন সুন্দর চাঁপা ফুলের রঙের হাতে যেন কালো রক্ত ফেটে পড়ছে। বললেন,—দেখলে? বেঁধে রেখেছিল। আমি লুকিয়ে এসেছি—আমার এই-খানে কেটে গিয়েছে, আমি আমার মণ্টুর কাছে আসি, তাই ওরা—তারপর হঠাৎ যেন অভিমানে ফুঁপিয়ে জোরে কেঁদে উঠ্‌লেন।

"এক মুহূর্ত্তে আমার পুরুষ-হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে এই অসহায়া, নিপীড়িতা, শোকবিহ্বলা, দুর্ভাগিনীর ওপর পড়ল। আমি কি ব'লে সান্ত্বনা দেব তা বুঝতে পারলুম না।

বললুম,—মা, কেঁদো না—ছিঃ—কাঁদে না—

ছোট মেয়েকে যেমন করে সান্ত্বনা দেয়, তেমনি কথায় তাঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলুম।

তিনি আবার বললেন—ছেলের আমার কি বুদ্ধি! অসুখ হয়েছিল, তা পথ্যি করবে কি না? কবিরাজ মশায় তো ভাত খেতে বারণ করে দিয়ে গেলেন - ছেলে কেঁদে খুন ভাত খাবেই। আমি খই চটকে ডাল দিয়ে মেখে ভাত ব'লে নিয়ে গিয়েচি খাওয়াতে - হাঁ ছেলে তাই খাবে কি না? বল্‌চে, এ বুঝি মা ভাত? এ তো খই! এই বয়েসে এত বুদ্ধি। পুজোর সময় জামা কিনে দেওয়া হ'ল, নতুন জামা বাক্সে তোলা রয়েচে, বাছা মোটে বার-দুই গায়ে দিয়েছিল—

পরে চারিধারে চেয়ে চিন্তিত মুখে অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন—তাই তো এই রাত, এই অন্ধকার, দেখ তো ছেলে কোথায় গেল?

আমি সংসারী নই, এ ধরণের অদ্ভুত অবস্থায় কখনও জীবনে পড়িনি—আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম—কি ব'লে সান্ত্বনা যে দিই, মুখে আমার কোনো কথা যোগায় না। তবে একটা বুদ্ধি ভগবানই বোধ হয় আমার মাথার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন—আমি তাঁর ভুল ভাঙাবার কোনো চেষ্টাই করলুম না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা কথায় তাঁকে অন্যমনস্ক ক'রে রাখার চেষ্টা করছিলুম—আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পূব আকাশ ফরসা হ'তে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। চাঁদ ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে এল—নক্ষত্র মিলিয়ে যাচ্ছিল—দেখতে দেখতে ওপারের কষাড় ঝোপগুলো দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল—মেয়েটি খানিকক্ষণ থেকে কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। চারিধারে সেইটুকু মাত্র দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন চমকে উঠে একবার চারিদিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে

দেখ্‌লে, কি যেন একটা সে বুঝতে পেরে উঠচে না। পরে একবার আমার দিকে অবাক্‌ চোখে চেয়ে দেখলে, যেন আমাকে এর আগে আর কখনও দেখেনি, এইমাত্র যেন ঘুম ভেঙে উঠে দেখ্‌চে, তারপরই একটা অস্ফুট আওয়াজ করে তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করতে গিয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

আমি বললুম এতো রীতিমত রূপকথা। সন্ন্যাসী-মশায় তারপর তারপর কি হ'ল?

সন্ন্যাসী-মশায় বললেন—শেষটুকু রূপকথার মত নয়। শুনুন তারপরে। আমি তো মূর্চ্ছিতা মেয়েটিকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারিনে, কাউকে খবর দিতেও পারিনে। কলসীর জল মেয়েটির চোখে মুখে দিচ্চি, সেই সময় তেঁতুল-জঙ্গলের আড়ালে অনেক লোকের গলার আওয়াজ কানে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তারা বার হয়ে এল—আট দশজন লোক। পেছনে একটা পাল্কী, একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের যুবক, আর একটি পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমি তাঁদের চীৎকার করে ডাক দিলুম। তারা ছুটে এল। মেয়েটির অবস্থা দেখে বৃদ্ধটি তো ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠ্‌লেন—সকলে মিলে ধরাধরি করে মূর্চ্ছিতা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে পাল্‌কীতে তুললে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখে ব্যাপার যা শুনলুম তা সংক্ষেপে এই। বৃদ্ধের নাম রামনারায়ণ চৌধুরী, শুভরত্নপুরের জমিদার। মেয়েটি তাঁর বড় পুত্রবধূ। সঙ্গের যুবকটিই ওর স্বামী। গত কার্ত্তিক মাসের শেষে বৃদ্ধের পাঁচ বছর বয়সের একমাত্র পৌত্র কলেরায় মারা যায়। মাসখানেকের মধ্যে ভেবে ভেবে পুত্রবধূটির মস্তিষ্কবিকার ঘটে। দিনমানে কিছুই না, বেশ সহজ মানুষ, রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠ্‌তেন; যা তা বল্‌তেন, ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে চাইতেন। আরও বার-দুই এইভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁকে আটকে রাখা হ'ত। (বেঁধে রাখার কথা স্পষ্ট কিছু বললেন না অবশ্য)। কাল রাত্রে কি ভাবে কখন চলে এসেচেন তা কেউ জানে না, রাত তিনটার সময় ঘটনাটা ধরা পড়ে। তখন থেকেই সবাই খুঁজতে বার হয়েচে। আরও দুবার এর আগে এই শ্মশান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাই সবাই এই শ্মশানেই আগে এসেচে খুঁজতে।'

আমি আগ্রহের সুরে বললুম—তারপর?…

—তারপর আর কিছুই না, তাঁরা ওঁকে নিয়ে চলে গেল।

—আমি সেকথা জিগ্যেস্‌ করিনি। তারপর মেয়েটির কি হ'ল? এ কতদিন আগের ঘটনা বল্‌চেন?

—প্রায় আঠার-উনিশ বছর আগেকার কথা।

—তারপর আর আপনি বাজিতপুরে যান্‌নি? মেয়েটির কথা আর কিছু জানেন না?

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। খানিক-ক্ষণ পরে শান্তসুরে বললেন—তিনিই তো এখন এই বুড়ো ছেলের মা, তিনিই তো দেখ্‌চেন শুন্‌চেন। এই নবান্ন উৎসবে সেখানে গিয়েছিলুম, মা কি ছেড়ে দিতে চান? দু-মাস ধরে রাখলেন। আহা, মা আমার।

—আচ্ছা, এখন তিনি—

এখন তিনি বাজিতপুর জমিদার বাড়ীর অন্নপূর্ণা। পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা, ঘরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। অল্প-বয়সের সে রোগ অনেকদিনই সেরে গিয়েচে অবশ্য। কিন্তু মণ্টুকে এখনও ভুলতে পারেন নি—এখনও মাঝে মাঝে নাম করেন।

কথা শেষ করে সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে সামনের বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে আবার চেয়ে চুপ করে রইলেন।

ভারতে চলচ্চিত্র

শ্রীনলিনী রায়

চলচ্চিত্র শিল্প-হিসাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। আমেরিকার দেখা-দেখি রুশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এটা শিল্প-হিসাবে জেঁকে বসেছে। জীবনযাত্রায় এর প্রয়োজন থাকায় এবং এই ব্যবসায়ে শতকরা সাত শত টাকারও উপর লাভের অংশ বিতরিত হওয়ায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতগুলাও এটাকে সবদিক থেকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, শিল্পজগতে তাঁদের এই নূতন আবিষ্কারের ঢেউ এদেশেও এসে পৌঁছেচে। কলকাতা, রেঙ্গুন, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে অনেক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তারা চল্‌ছেও মন্দ নয়।

অপরাপর দেশের কথা বাদ দিয়ে ভারতে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করলে এই মনে হয় যে, অন্যান্য দেশের চাইতেও কম সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র এদেশে তার পাকা আসন গাড়্‌বে।

সিনেমা ফিল্ম তৈরি করার পক্ষে এদেশের আবহাওয়া সব দেশের চাইতে বেশী উপযোগী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশে এটা তৈরি করার জন্যে কৃত্রিম শীত ও তাপের প্রয়োজন হয়; কিন্তু প্রকৃতির কৃপার প্রাচুর্য্যে এদেশে আর ওসব হাঙ্গাম পোহাতে হয় না। একই ঋতুতে শীত আর তাপের তীব্রতা শুধু এদেশেই দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর প্রথম যুগের সভ্য মানুষের জন্মভূমি এদেশে। তাঁদেরই শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনস্বরূপ নানা জাতি ও ধর্ম্মের স্থাপত্যকীর্ত্তি, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উপবন, প্রাচীন দুর্গ পরিখা, মন্দির মসজিদ ধ্বংসস্তূপ, ইত্যাদিতে সুন্দরী পৃথিবী তাঁর প্রিয়তমা কন্যা, নির্ঝর হ্রদ নদনদী পরিপূর্ণা, গিরি সাগর আবেষ্টিতা, এই ভারতভূমিকে সাজিয়েছেন। আর সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে সুরু করে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্নরূপ গঠন বর্ণ ও আকৃতির মানুষ শুধু ভারতেই দেখা যায়। সিনেমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এদেশের প্রাকৃতিক এ-সব সুবিধাগুলি অন্য দেশে নেই, তাই অপরাপর দেশের মত ভারতে সিনেমা ফিল্‌ম তৈরি করা তত ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। শ্রমের দাম খুব কম ব'লে এদেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্যেও টাকা বেশী খরচ করতে হয় না। যে-কাজের জন্যে এদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মাত্র কয়েক টাকা পেয়ে থাকেন, ইউরোপ বা আমেরিকার শিল্পীরা, সেই কাজে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতনের চাইতেও অনেক গুণ বেশী দাবি করেন। এই গেল উৎপাদনের ব্যয়স্বল্পতার কথা।

লোক-সংখ্যার তুলনায়ও এদেশে প্রদর্শনী-ঘর খুব কম। আমেরিকার ১২ কোটী লোকের জন্যে ২০,৫০০, অষ্ট্রেলিয়ার ৬০ লক্ষের জন্যে ১,২১৬, ব্রিটনে ৪৭,১৪৬,৫০৬ লোকের জন্যে ৩,৭০০, জার্মানীর ৬২,৫৯২,০০০ লোকের জন্যে ২,২০০ এবং জাপানে ৮,৩৪৫,৪০০ লোকের জন্যে ১,০৫০টি সিনেমা-গৃহ আছে, আর আমাদের দেশের ৩২ কোটী লোকের জন্যে আছে—চার শ। এতদিন এদেশে বায়োস্কোপ্ দেখার আগ্রহ কম ছিল ব'লে এত অল্প সংখ্যক সিনেমা-গৃহ দিয়েই কোনো রকমে চলে যেত, এখন কিন্তু তা আর হচ্ছে না। চাহিদা বেড়েই চলেছে, জোগানও দিতে হচ্ছে খুব, অথচ ভাল দেশী ফিল্মের অভাব রয়ে গেছে প্রচুর।

বিদেশীর চাইতে দেশী ফিল্মের চাহিদা বেশী। তার কারণ প্রত্যেকেই তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাছাকাছি কাহিনী দেখ্‌তে শুনতে পছন্দ করে, সহজ মাতৃভাষায় লিখিত অংশ লেখা হয় বলেও দেশী ফিল্‌ম অধিক জনপ্রিয়।

এ কথা ইণ্ডিয়ান সিনেমা কমিটি রিপোর্ট অনুমোদন করেছেন। তাঁহাদের মতে ব্যবসাদারদের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে, খাঁটি ভারতীয় দর্শকদের কাছে ভারতীয় ফিল্ম দেখালে পাশ্চাত্য ফিল্‌ম দেখানোর চেয়ে বেশী লাভ করা যায়। ভারতীয় ফিল্‌ম তৈরি করা একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ফিল্‌ম ভাল হ'লে ফিল্‌ম উৎপাদন ব্যবসায়ীর প্রচুর লাভ হয়।

ভারতবর্ষ একটা আজব দেশ, এর পথেঘাটে সাপ, বাঘ, বনমানুষ, সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভেষ্টেড ইন্‌টারেষ্ট-ওয়ালাদের কৃপায় এ ধারণাটা বিদেশীদের অনেকেরই আছে। প্রাচীন সভ্যতা ইত্যাদির কথাও যে দু-চারজন জানতে না চান এমন নয়। তাই উৎসুক ও জ্ঞানপিপাসু, দু-দলই ভারতবর্ষকে খুব ভাল-ভাবে জানতে চায়। এ জানাটা ফিল্‌মের ভিতর দিয়েই সুন্দরভাবে হ'তে পারে ব'লে এ দেশী চলচ্চিত্রের বাজার বিদেশেও প্রচুর পরিমাণে আছে। এসব দেখে মনে হয় এ শিল্পটাকে মন প্রাণ দিয়ে গড়ে তুললে মানুষ হয়ত একদিন আমেরিকার অয়েল কিং, মাইন কিং দেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও চলচ্চিত্রের তুলনা হয় না। শিক্ষার কথা ধরা যাক। বাস্তব জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়, যথা—স্বাস্থ্যরক্ষা, পথঘাট পুকুর পরিষ্কার রাখার ফলাফল, মহামারীর প্রতিকার, শিশুমৃত্যু-নিবারণ, সন্তানপালন, খাঁটি ও ভেজাল খাদ্যের দোষগুণ, চরকা কাটা, তাঁত-বোনা, আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়েই অজ্ঞ জনসাধারণের মনে প্রবেশ করানো যায়। উন্নত ধরণের চাষ-আবাদের ব্যবস্থা, গো-পালন, মৌমাছি-পালন, হাঁস মুরগীর চাষ, শারীর বিজ্ঞান, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দেশ বিদেশের পুরাণ ও ইতিহাস, বিভিন্ন সামাজিক জীবনের তুলনামূলক আলোচনা, ইত্যাদি বিষয় সিনেমার সাহায্যে প্রচার করলে অনেক কাজ হয়। শতকরা দুজন লিখ্‌তে-পড়তে-জানা দেশে বর্ণমালা শিখিয়ে জাতীয় আন্দোলনে ও জাতীয় ভাবে দেশকে উদ্বুদ্ধ করা দুরাশা। গণচৈতন্য সম্পাদনে বায়োস্কোপই শ্রেষ্ঠ উপায়। রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্ব ও পরের অবস্থা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সত্যিকারের শিল্পীদের দিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হ'লে অপরাপর সহযোগী শিল্পের চাইতে এতে আনন্দ পাওয়া যায় বেশী। আবার থিয়েটারের চাইতেও সুন্দর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে ব'লে লোকের ঝোঁক সিনেমার প্রতি বেশী হয়। সময়ের অল্পতাও অধিক আকর্ষণের কারণ হ'তে পারে।

বিনা আনন্দে জীবনের স্ফূর্ত্তি হয় না। নিপীড়িত, নিগৃহীত, নিরানন্দ গরিব দেশে সস্তায় আমোদ পাওয়াও ত কম কথা নয়। তবে বায়োস্কোপের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, বিশিষ্টতা ইত্যাদির প্রচার করলে মেয়ো বিবির দল খুশী না হ'তে পারে।

আর একটা দিক ভাববার আছে, কোম্পানীর ফেল পড়া। কতকগুলি কোম্পানী ফেল হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, বেশীর ভাগ কোম্পানীই ব্যবসা ও নাট্যকলার দিক একই ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেন। তিনি আবার খুশীমত তাঁর প্রিয়পাত্র-পাত্রীদের যোগ্যতার চাইতেও দাম দেন বেশী। আবার কেউ কেউ ফিল্‌মে উপযুক্ত ব্যয় না ক'রে ফিল্‌মের টাকা দিয়েই অন্যান্য ব্যবসা সুরু করে দেন। এতে বিপদ হয় এই যে, সবগুলো ব্যবসাকেই অকালে মরতে হয়। অংশীদারদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গোলমালও ফেল্ পড়ার আর একটা কারণ। চলচ্চিত্রের অযোগ্যতার জন্যে ভারতে কোম্পানী উঠে যেতে বড় দেখা যায় নি। তবু একথা সত্যি বলতে হবে যে, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টারের অভাব আছে যথেষ্ট। কেবল কয়েকটা সিনেমা কোম্পানী গড়ার সখ চেগে উঠতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু ঐ বিদ্যে দিয়ে যে শিল্প সৃষ্টি হয় না, দুদিনেই সেটা ধরা পড়ে যায়। টেক্‌নিক জিনিষটা অত সহজে শেখা গেলে সকলেই সব শিল্প সৃষ্টি করতে পারত।

ডিরেক্টার কেবল শিল্পী হ'লে হবে না, তাঁর মোটামুটি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হওয়াও একটু প্রয়োজন। যুদ্ধদৃশ্যে

বোঝায় সর্ব্বদাই শত্রুপক্ষকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে যদি ব্যস্ত হন, তাহলে যুদ্ধটা অহিংস হলেও মানুষ খুশী হতে পারে না। শিবাজীর সৈন্যদল কাস্তে কি খুরপী নিয়ে স্বপক্ষ আক্রমণ করছেন কি বিপক্ষ আক্রমণ করছেন, তাও দর্শকদের বোঝা দরকার। যুদ্ধ, লাঠিখেলা, নাচ, চাষ কি কোদালপাড়া যা-ই দেখাতে চাই, সে সম্বন্ধে সবার আগে ডিরেক্টারের জ্ঞান প্রয়োজন।

উপযুক্ত নাট্যশিল্পী নিয়ে কোম্পানী গড়লেই হবে না। সঙ্গে চাই পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি। নাট্যশিল্পীরা দেখ্‌বেন এর নাট্যের দিক্‌টা, আর ব্যবসায়ীদের হাতে থাক্‌বে এর ব্যবসাটা, তাতেই কাজ হয় ভাল।

যোগ্য শিল্পী ইত্যাদির কথা বলছিলাম। এদেশে সাধারণতঃ শিল্পীরা আসেন অশিক্ষিত বা দুর্নামগ্রস্ত সম্প্রদায় থেকে। তাঁরা না-জানেন ভাল ক'রে নিজের সমাজকে, আর না-জানেন পরের সমাজকে, সমস্ত জিনিষের বাইরেটাই মাত্র দেখতে পান এঁরা, ভিতরে প্রবেশ করবার এঁদের শক্তি নেই। তাই অনুকরণও করেন শুধু বড় বড় চুল রেখে লাফ্‌ঝাঁপ দিয়ে চলাটাই। পরেরটাকে নিজের ক'রে নিয়ে নিজের রূপ দিতে পারাটাই তো সত্যিকারের রূপদক্ষ শিল্পীর বাহাদুরী। দেশীয় ফিল্‌মের ডিরেক্টারদের ইতিহাস-জ্ঞানের অভাবটা তাঁদের বোধ হয় সবচেয়ে বড় ত্রুটি। তাঁদের কল্যাণে তপস্যারত মুনিদের পিছন দিয়ে ই. আই. আর-এর রেলগাড়ী ছুটে যায়, মহাভারতের যুগের মহিলারা স্বচ্ছন্দে মুসলমানী পেশোয়াজ কিংবা ইউরোপীয় ব্লাউস প'রে দেখা দেন, সোফায় উপবিষ্ট শিবঠাকুরের পিছনে ঘড়িতে বারোটা বাজে, স্বয়ম্বরা সাবিত্রীর বয়স তাঁহার পিতামহীর সমানও মনে হয়। কত আর বলব? দেশীয় ফিল্‌ম দেখতে গিয়ে পুরোহিত ঠাকুরের খাবার-ঘরে ডিনার টেবিলের আয়োজন দেখে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কূটচক্রী রঘুপতিকে সিনেমা কোম্পানীর হাতে পড়ে গেঁজেল সন্ন্যাসীর রূপ নিতেও ত দেখা গেছে, কাজেই এ সম্প্রদায় দিয়ে আর যাই হোক—শিল্পসৃষ্টি হওয়া শক্ত। এই সকলের উপর আছে আসল বিদ্যা—ফোটোগ্রাফির জ্ঞানের অদ্ভুত অভাব। 'মেক্ অপ্' বা প্রসাধন-বিদ্যাটাও এঁদের কিছুকাল শেখা দরকার।

তবে আশা আছে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজেদের রুচিজ্ঞান ও সংযতসুন্দর আচারব্যবহার দিয়ে এ শিল্পটাকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন। তাঁদের কাছে না-হয় এটা art for art's sake-ই হ'ল। তাতেও দুর্ভাগা জাতটার অনেকখানি উপকার হবে।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৩)

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক আপিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভিড়—ঘণ্টাখানেক পথে হাটিলে হ্যাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইহাদের আপিস। অনেকগুলি ঘর ও ছুটো বড় হল

কর্মচারীতে ভর্তি। দিনমানেও ঘরগুলার মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিষ্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দ্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড় জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরণের চেহারা। বেশ ফরসা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকুরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা কি কাগজ টাইপ ছাপা মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল। দেবেনবাবু একখানা তুলিয়া লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া বিরক্তির সুরে বলিলেন—আঃ,তোমার টাইপিং-এর কাটাকুটি এখনও সারলো না!···টাইপ করতে করতে ঘুম আসে না কি? ··ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের ফাইলটা নিয়ে এসো দেখি—

নৃপেন বাহিরে আসিতেই ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের যদুগোপাল ফিস্‌ ফিস্‌ বলিল—কি হ'ল?

নৃপেন কোনো কথার উত্তর না দিয়া রিং হইতে চাবি বাছিয়া টেবিলের টানা খুলিয়া ফেলিল—নীচু হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একখানা লাল ফিতা-বাঁধা কাগজের ফ্ল্যাট ফাইল টান দিয়া বাহির করিয়া পুনরায় ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উস্‌খুস করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্তমুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ী যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ী কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ী গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে আপিস চলে কেমন করে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ করনি দেখ্‌চি—

এ আপিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নাই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্ব্বে কোনোদিন আপিসের ছুটি নাই। কি শনিবার কি অন্যদিন। কোনো পালপার্ব্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজায় একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করিতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্ম্মচারিগণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্যশ্লোকের উপদেশ মত চাকরিকে পুরোভাগে বজায় রাখিয়া ও ছুটিছাটা, অপমান অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক য়্যাও্ চৌধুরীদের মরগেজখানা টাইপ করেছিলে?

নৃপেন কাঁদকাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের আপিস্ থেকে তো পাঠিয়ে দেয় নি এখনও?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন্ করনি কেন? আজ সাতদিন থেকে বল্‌চি—কচি খোকা তো নও?···যা আমি না দেখ্‌বো তাই হবে না?

চাপরাশিকে ডাকিয়া বলিলেন—ইংলিশ ক্লার্ককে বোলাও—

নৃপেন বলিল—আজ্ঞে, অপূর্ব্ববাবু চা খেতে গিয়েছেন টিফিনের ঘরে। এই গেলেন—বলিতে বলিতে অপূ অভ্র-বসানো কাটা দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—আমায় ডেকেচেন?

—হাঁ, দেখুন তো, আপনার ফাইলে মল্লিক য়্যাও্ চৌধুরীদের চিঠিখানা আছে কি না? আর আজই একটা উত্তর ড্রাফ্‌ট করে ফেলুন গিয়ে—

—অরিজিনাল চিঠি রেকর্ডে পাঠানো হয়েচে। ও তো গত বছরের কার্ত্তিক মাসের চিঠি, বিশু বাবুকে দিয়ে রেকর্ড ফেরৎ আনাই—

নৃপেনের ছুটির কথা গোলমালে চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারী পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতে পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেরাণীরা বাহির হইল—অন্য অন্য কেরাণীগণ আরও ঘণ্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরাণী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়িতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোছেও না।

ফুটপথে পড়িয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ব্ব বাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার? একদিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব আপিস দেখুন গিয়ে ছুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েচে। তারা সব এতক্ষণ ট্রেণে যে যার বাড়ী পৌছে চা খাচ্ছে, আর আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচারটা বলুন দিকি?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচার বলে মনে কর,ভায়া, কাল থেকে এসো না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলেনি। ওঃ, খিদে যা পেয়েচে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি —হার্টের রোগ জন্মে গেল, ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ-দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন্। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরী হয়ে আসিনি। দোহাই দাদা—তাঁহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করাতে প্রবোধ মুহুরী খুব খুসি হইল না। বিরক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোক্‌রাদের কাছে কি কোনো কথা বল্‌তে আছে—আমি যাই, তাই বলি! হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে বলে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে?... হুঁ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতালা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছর খানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে।

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায়ই পর্য্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্য্য-ভরা রঙীন ভবিষ্যতের ছবি—স্বপ্নই থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠী খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতী পাশ করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া সব দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস্ হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার।

শতকরা নিরানব্বুই জনের যাহা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথানিয়মে সংসার যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরাণীগিরি, বাড়ীভাড়া, মেলিনস্ ফুড ও অয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুটনা কুটিতেছে স্বামীকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে! তার পর সে বঁটিখানা ও তরকারীর চুপ্‌ড়ী একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেচে, তবে অন্য দিনের তুলনায় বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসেনি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, বলে দিয়েচি বুধবারে মাইনে হ'লে আস্‌তে। তোমার আস্‌বার দেরী ভেবে এখনও আমি চা-এর জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌএরা এসময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েচে কেন বল তো? একটু বেঁধে দিও।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোনো প্রৌঢ়া কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হ'লে বাপু একশো টাকা বাড়ীভাড়া দিয়ে সায়েব পাড়ায় থাকো গে। আজ আমার মাথা ধরেচে, কাল আমার ছেলের সর্দ্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমরা ভাড়া নাও না, দাও না পঁয়ষট্টি টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্যি করে বাপু?

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেচে গাঙ্গুলী-গিন্নির সঙ্গে ?

অপর্ণা বলিল—নতুন করে বাধ্‌বে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলী-গিন্নিরও মুখ বড় খারাপ, হালদারদের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক একদিন গিয়ে বাটনা বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরের ভাড়াটে-দের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব অপু আসিয়া অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলের অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের এই সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা। কট্‌ কট্‌ করিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়ীটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেণ, সেখানে সারা বাসার তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জ্জনা, বাসি ভাত তরকারী পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়ীময় ময়লা ও আধময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে তোব্‌ড়ানো টিনের বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলো অপরিষ্কার, ময়লা পেনী বা ফ্রক্ পরা। অপুদের নিজেদের দিক্‌টা ওরই মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটা রজনী-গন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই একবৎসর এখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, মাধুর্য্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ার বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে। চোখের পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না শূকরপালের মত খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনী মধ্যে দিন দিন যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে তাহার।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতা থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকায় ভাড়ার এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অপর্ণা এই আলো হাওয়া-বিহীন স্থানেও শ্রী ছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্সপেট্‌রাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরা-টোপ্, জানালায় ছিটের পর্দা, বালিস মশারী সব ধপ্ ধপ্ করিতেছে, দিনে দু তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ীর উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বৌটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মত হইয়া আছে। মা সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে ও সময় পাইলে রুগ্ন স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলী-বৌএর ঝঙ্কার বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরীব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আঙুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড় ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অপর্ণা অন্যদিকে ভাল গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে আপিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনো জিনিষ নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সাম্‌নে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্য্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। আপিস আর বাসা, বাসা আর আপিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়ীতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার সাধ নিজের মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়ীতে বাস করা। আপিসে যখন কাজ না থাকে, তখন একখানা কাগজে

কাল্পনিক বাগান-বাড়ীর নক্সাটা আঁকে। বাড়ীটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দুধারে দুটো চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক্। রাঙা সুরকীর পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ও ল্যাভেণ্ডার ঘাসের পাড় বসান। বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়ীতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এই-সব ছেলেমানুষীতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। বলে শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাক্‌বে, জানালার জাফরীতে কি উঠিয়ে দেব বলো তো?

যে আমড়াতলীর গলির ভিতর দিয়া সে আপিস যায় তাহার মত নোংরা স্থান আর আছে কি-না সন্দেহ। ঢুকিতেই নাখোদা মুসলমানদের শুঁটকী চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখান দিয়া যায়? ফলের দোকানের পচা খড় বিচালী পথে ছড়ান, স্থানে স্থানে মাড়োয়ারীদের গরু ও ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দুবেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত। মনে মনে ভাবে শরৎ বাবুদের আপিসটা, কেমন ময়দানের ধারে গবর্ণমেণ্ট প্লেসে—সবুজ ঘাস গাছপালা চোখে পড়ে যেতে যেতে—খোলা আকাশও দেখা যায় আপিসের জানালা থেকে—ওখানে যদি আমার আপিসটা হত—এ আর পারিনে—

তাহা ছাড়া রোজ বেলা এগারটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা। আপিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহু কাল ধরিয়া তাহাদের খাকের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্ব্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধন বাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক কলমে বাইশ বছর হল বাবুদের এখানে—কোনো ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিও—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্ত্তা বেঁচে, গদী থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্ত্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট করে। বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চোদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোক্‌রা টাইপিষ্ট নৃপেনের। উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার ঘরে বসিয়া আছে কি-না। অপুর সঙ্গে টুলের উপর বসিয়া বলে এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন্ নি বুঝি, অপূর্ব্ববাবু—ছ'টা বাজে, আজ ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে ও-কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না নৃপেন বাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখিনি যে আজ কতদিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে এমন চমৎকার বিকেলটি, আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জেলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

সে মনে মনে অপরাহ্নের কবি।

মেঘমুক্ত রৌদ্রভরা দিনের দুপুর ঘুরিয়া গিয়া ছায়া যখন একটু বাঁকিয়া যাইত, তখন হইতে সন্ধ্যার প্রথম চাঁদ ওঠা পর্য্যন্ত যে সময়টা। অতীত দিনের জীবন এই সময়টুকুতেই ভরপুর হইয়া উঠিত। শ্যামল বনান্তস্থলী শিহরিয়া উঠিত কত কি অজানা ফুলের সম্মিলিত সুবাসে, আলকুসি ফলের দুলুনিতে, দুর্গাটুনটুনি পাখীর অর্থহীন অবাধ কাকলিতে, জীবনের আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতে চাহিত।

মাটির সঙ্গে সে যোগ অনেক দিনই সে হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলা তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক এক দিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্ণিসের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে, তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলতেছেন, মার্কারটা রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজ-বাবুর বন্ধু নীলরতন বাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন। অপুর মনে হয় তাহার জীবনের সব বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোনো অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে সব মাধুরীভরা মুহূর্ত্তগুলি যৌবনের কলকোলাহলে কোথায় গেল মিলাইয়া? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি। পাখী আর ডাকে না, ফুল ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেশে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ বাতাসকে তেতো করে না। নিশ্চিন্দি-পুর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে—বহু বহুকাল আগে।

জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে এতদিন শতদুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন, কর্ম্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে আপিসের বদ্ধজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মরগেজ, ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্বকেশ প্রবীণ ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সপিনা ধরানর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্ণিদের নামে বড় বড় চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মত অপরিষ্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা। সোনার বেনেদের বাড়ীর ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট আহ্লাদে ছেলে, তাদের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে কল্পনার অঙ্কুর। এই বয়সেই তারা এমনি পয়সা চিনিয়াছে, এক ক্লাসের বই পড়া হইয়া গেলে চাকরের হাতে পুরানো বইএর দোকানে বিক্রয় করিতে পাঠায়, মাহিনা দিবার সময় আবার ছাত্রের দাদা আগে রসিদটা লিখাইয়া ও সই করাইয়া লয়, দু তিন বার পড়িয়া দেখে, তারপর মাহিনা দেয়।

কেবল এক অপর্ণাই এই বদ্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। আপিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনোদিন হালুয়া, কোনোদিন দু চার খানা পরোটা, কোনোদিন বা মুড়ী নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত। ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল। এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকী, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দ্দা, এসব সংসার নয় অপর্ণা যখন বিশেষ-ধরণের শাড়ীটি পরিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে অপু ভাবে এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া, ওরই মুখের হাসি, বুকের স্নেহ যেন পরম আশ্রয়, নীড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

আপিসে বসিয়া সে এক এক সময় নানা স্থানের কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনী লেখে, দার্জ্জিলিং, সমুদ্র-ভ্রমণ, পুরী, কাশ্মীর। বালির কাগজে লেখে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে সে নানাদেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা ষ্টীমার কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে হাওয়াই দ্বীপে এস একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তীরাভিমুখী ঊর্ম্মিমালার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এল্ পাসো দেখ নাই? দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার মরুপ্রান্তরে চুণাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, সেখানকার শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও। শীতের শেষে বসন্তের ফুল প্রথম যখন ফুটিতে সুরু করে, তখন সেখানকার রৌদ্রদীপ্ত, স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য, ওয়ালোয়া হ্রদের তীরে মাজামা আগ্নেয়গিরির তুষারমণ্ডিত চূড়া, নীচের গিরিশ্রেণীতে উন্নত পাইন ও ডগ্‌লাস্ ফারের ঘন অরণ্য, হ্রদের স্বচ্ছ বরফ-গলা জলে তুষারকিরীটী আগ্নেয়গিরির প্রতিচ্ছায়ার কম্পন, উত্তর আমেরিকার ঘন, স্তব্ধ, নির্জ্জন আরণ্যভূমি, কর্কশ, বন্ধুর পর্ব্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত,

ফেনিল, পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বল্গা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেপ্‌ল্ গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান্ ও ভায়োলেট্ ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ - দেখ নাই এসব? এস এস।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন্ জ্যোৎস্না-লোকিত রহস্যময় কূলহীন স্বপ্নসমুদ্রের পারে, শুভ্ররাত্রে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগর-গুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাদের অপূর্ব্ব আহ্বান ভাসিয়া আসে। অপু ভাবে যাব যাব, রও না এই বছরটা, এই—নিশ্চয় হয় তো—। আপিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। তার মনের বড় সাধ, প্রাণের সাধ ওই রকম নির্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, মানুষের বাস নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটীরে, খোলা জানলা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজি, অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে, তারার আলোর উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে—কুটীরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড় লোকের টাকা আছে, কিন্তু জগতকে দেখিবার, জীবনকে বুঝিবার পিপাসা কই এদের? এ সিমেণ্ট বাঁধানো উঠান, চেয়ার, কৌচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই সৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকের আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন? তাহার যদি এ টাকা থাকিত? কিছুও যদি থাকিত, সামান্যও কিছু! অথচ ইহারা তো লাভক্ষতি ছাড়া আর কিছু শিখে নাই, বোঝে না, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভরা নোটের তাড়া।

এই আপিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মত, দুর্ব্বলের মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,—ফেনোজ্জ্বল সুরার মত জীবনের প্রাচুর্য্য ও মাদকতা তার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম অপূর্ব্ব হইবে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই তবে, কেন এমন হয়! দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দুবৎসর এখানে সে চাকুরি করিতেছে, পূজার পূর্ব্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিষ্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্সা আঁকিয়াছে, ভাড়া কসিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া, কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুসি হয়। মনকে বোঝায় এবার না হয়, আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবারে আপিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজ-কাল হইয়াছে বাড়ী ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকূল সময়সমুদ্রে যেন থৈ পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা দুই—ছ'টা। আর এক। হোক্ পায়রার খোপের মত বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা ও খাবার আনিল। এ সময়টা আধঘণ্টা সে স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়, আর সময় হয় না, এখনি আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাকে সব দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লালপাড় শাড়ীটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আল্‌তা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্ত্তিমতী

গৃহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্ম চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, দুজনে আজ মহারাণী ঝিন্দন আর দলীপসিংএর কথাটা পড়ে শেষ করে ফেল্‌বো।

বার দুই অপু তাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক্ হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পারে না। বাড়ী আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেচেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু আপিসের ছুটীর যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক্ না? তারপর আমি কার্ত্তিক মাসের দিকে না হয় দু চার দিনের জন্যে যাব? তা ছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এসময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এসময়টা বাপ মায়ের কাছে থাকা ভাল, ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েচেন।

—তা বেশ চল আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা নামা করতে হবে কি না? দাও তো ছাতাটা, ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চল কালই যাই।

হ্যাঁ, দ্যাখো, তুমি তো লাল আটা ছাড়া খেতে পার না, আমাদের ওখানে জাঁতার আটা পাওয়া যাবে না, অম্নি একসের আটা কিনে নিয়ে এস, সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ভুলো না যেন?

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্ন ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিণ্টু তাহাদের ঘরের এক কোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়ীশুদ্ধ হৈ চৈ। অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিণ্ট গাঙ্গুলীদের ছোট খুকিকে নিয়ে গোলদিঘীতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও বুঝি চীনে বাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েচে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকি নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারী তো নবুমী পাঁটার মত কাঁপচে আর মাথা খুঁড়চে আমি পিণ্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েচি, নইলে ওর মা ওকে আজ একেবারে গুঁড়ো করে দেবে। আর গাঙ্গুলী-গিন্নী যে কি কাণ্ড করচে জানই তো, তাকে তুমিও একটু দেখ না গো!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন কানে গেল। ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সব্বনাশ হল গো মা, ওগো, তাই আপদেরা বিদেয় হয়েও হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, বলিল—পিণ্ট খেয়েচে কিছু?

—খাবে কি? ও কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষচে, আহা ওর কোনো দোষ নেই, ও কিছুতে নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, আর তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ!

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকিকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ীর নম্বর, রাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনষ্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ী আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিয়েচে ভালই হল, আহা বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি করেই গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষেচে গো! মানুষ মানুষকে এমনও বল্‌তে পারে! কাল না কি এখান থেকে সব বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েচে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্চি, আমার তো আসতে এখনও চার পাঁচ দিন দেরী। ততদিন ওঁরা রুগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধে হবে না, আমি না হয় এই পাশেই বরদা বাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌঠাকরুণকে। আমি বুঝি, অপর্ণা। আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিলেন—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলিনি, অপর্ণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটি সিকি-

পয়সা নেই আমাদের,সেখানকার দু-একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—যাতে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল-ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। একদিন কি বিপদ হ'ল জানো, আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—আচ্ছা, বলব এখন অন্য সময়। গরীব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই—কাল সকালেই ওঁরা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিণ্টুর মা খুব কাঁদিল। এ বাড়ীতে বিপদে আপদে অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাঁধা, টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো, সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিণ্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিণ্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চিঠি দিও ভাই, দুটো দু-ঠাঁই ভালয় ভালয় হয়ে গেলে আমি মায়ের বাড়ী পুজো দেবো।

ঘরের চাবী পিণ্টুর মায়ের কাছে রহিল।

(ক্রমশঃ)

ভিয়েনার নব্য ছায়ানাট্য

মেরী, জোসেফ ও যীশু

ছায়ানাট্য বা পুতুল-নাচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই অতি প্রাচীন আমোদের উপায়। ইংলণ্ডের রাস্তাঘাটে আজ পর্য্যন্তও মাঝে মাঝে "পাঞ্চ ও জুডির" নাচ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও বিশ বৎসর আগে পর্য্যন্তও এই ধরণের পুতুল নাচ প্রায়ই দেখা যাইত। এখন অনেকটা বিরল হইয়া আসিয়াছে, তবু বোধ করি একেবারে লোপ পায় নাই।

কিন্তু এই সকল প্রাচীন পুতুল নাচকে সৌন্দর্য্য ও কারুকৌশলের দিক হইতে বর্ত্তমান যুগে যে নূতন ধরণের পুতুল নাচের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে তাহার

যীশুর জন্মকথা

মেষপালকদের অভিনন্দন

ম্যাজিদের পূজা

রাজকন্যার মুক্তি

রাজকন্যা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় ড্রেগনের হাতে বন্দিনী

চীন দেশীয় মান্দারিন ড্রেগনকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছেন

সামুরাই ও ড্রেগনের যুদ্ধ

বুদ্ধের দ্বারা ড্রেগন পরাভূত ও রাজকন্যা শাপমুক্ত

সহিত মোটেই তুলনা করা চলে না। এই নূতন পুতুল নাচের প্রবর্ত্তক ভিয়েনার একজন শিল্পী। তাঁহার নাম রিচার্ড টেশনার। ইনি পুরাতন পুতুল নাচের অনুকরণে নূতন পালা রচনা করিয়া ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পুতুল তৈরী করিয়া এই প্রাচীন আমোদটিকে শিল্প-হিসাবে সার্থকতা দিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এ-বিষয়ে বিশেষ

সার্থকতাও লাভ করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে যে চিত্রগুলি প্রকাশিত হইল উহাই তাহার প্রমাণ।

রিচার্ড টেশনারের জন্ম জার্মেনীর কার্লস্‌বাডে, তিনি শিক্ষালাভ করেন প্রাগ সহরে এবং বর্ত্তমানে ভিয়েনাতে বাস করিতেছেন। তিনি একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর এবং কারিগর। তিনি নিজের হাতে ওয়ালপেপার, কার্পেট, ট্যাপেষ্ট্রি প্রভৃতি তৈরী করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার তৈরী পুতুল যে শিল্পকৌশলে অতি সুন্দর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

টেশনারের পুতুলগুলি পুরানো ছায়ানাচের পুতুলের মত উপর হইতে তারের সাহায্যে চালান হয় না। ইহাদের প্রাণদানের পদ্ধতিটা কিছু স্বতন্ত্র। কতকগুলি কাঠিকে জোড়াতাড়া দিয়া ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে চলৎশক্তি দেওয়া হয়। ফলে তাহাদের গতিবিধি আর একটু গাম্ভীর্য্যও ধীরতা লাভ করে। নেহাৎ মেরুদণ্ডহীন নাচের পুতুলের চলাফেরার মত দেখায় না।

একটা অন্ধকার ঘরে বসিয়া আকাশের তারা দেখার মত এই নাচ দেখিতে হয়। একটা সুদূর আলোকিত জগতে পুতুলগুলি আবির্ভূত হইয়া মনে কেমন একটা ক্ষীণ বিষাদের রেখা টানিয়া দেয়। কাঠের কিংবা মোমের পুতুলে ভাস্করশিল্প যে প্রাণ অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে ক্ষণিকের জন্য চেতনাময় জগতে ফিরাইয়া আনিয়া এই শিল্প মায়াজাল রচনা করে।

বুদ্ধের জীবনের একটি কল্পিত গল্প লইয়া টেশনারের একটি অতিসুন্দর ছায়ানাট্য রচিত হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে এক অভিশপ্ত রাজকন্যা একটা ড্রেগনের কবলে বন্দিনী। এই বিকটাকার ড্রেগনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা, এমন কি নাসারন্ধ্রেরও কম্পন সৃষ্টি টেশনারের শিল্পের একটা গুপ্ত রহস্য। দ্বিতীয় দৃশ্যে এক চীনা মান্দারিন আইন ও যুক্তির প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইয়া রাজকন্যার মুক্তির সপক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়া একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ ড্রেগনকে পড়িয়া শুনাইতেছে। কিন্তু ড্রেগন নির্ব্বিকার। মান্দারিনকে খেলাচ্ছলে দুই চারিটা আঘাত করিয়া, দুই চারিবার হাই তুলিয়া সে শান্ত রহিল। তারপর রাজকন্যাকে মুক্তি দিবার জন্য বাহুবলে দর্পিত এক জাপানী সামুরাই দেখা দিল, কিন্তু সেও পরাভূত হইয়া ড্রেগনের উদরস্থ হইল। পরিশেষে রাজকন্যা অভিশাপ মুক্ত হইলেন বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। বুদ্ধের প্রথম প্রবেশ ছায়ার মত—দৃশ্যের শেষে একবার মাত্র পূর্ণ আলোকে দেখা দিলেন।

টেশনারের আর একটি নাট্য যীশুর জন্মকাহিনী লইয়া। মেরী ও যীশুর মাথার উপর যে আলোকচক্র দেখা যাইতেছে তাহার রচনা-কোশল অতি আশ্চর্য্য। অতি সূক্ষ্ম সোনার তার দিয়া সেগুলি তৈরী। তারগুলি ইচ্ছানুযায়ী সময়ে সময়ে আলোক প্রতিফলিত করে, মাঝে মাঝে আবার করেও না। তাই সে-গুলিকে প্রকৃত আলোকচক্রের মত দেখায়। এই নাট্যের শিল্পচাতুর্য্যের আর একটি নিদর্শন যোশেফের নিজের গায়ের জামা খুলিয়া মেরীর বসিবার স্থান বিছাইয়া দিবার ভঙ্গিটি। আর একটি দৃশ্যে রাজা-রাজড়া, পণ্ডিতগণ, মেষপালক প্রভৃতি একে একে যিশু ও মেরীর সম্মুখে নত হইয়া তাঁহাদের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন।
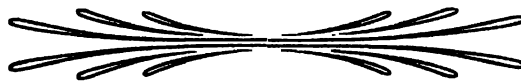
দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১১] বলিদ্বীপ—মুণ্ডুক

সোমবার, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭।—

বাতুঙ্ থেকে উত্তর-মুখো হ'য়ে, তারপরে একটু পূবে পাহাড়ের মধ্যে এই মুণ্ডুক শহর। শহর নয়, একটি বড়ো গ্রাম ব'ললেই হয়। কতকগুলি বড়ো বড়ো গ্রাম ছুঁয়ে আমাদের মুণ্ডুক যাবার পথ—শেষের দিকে আধেকের উপর পথ হ'চ্ছে পাহাড়ে' দেশ দিয়ে। একখানা গাড়ীতে আমরা চ'লেছি—কবি, সুরেনবাবু আর আমি,—আর একখানায় আমাদের মালপত্র। পূর্ব্বেকার মতন সেই মনোরম দৃশ্য—নয়নাভিরাম সবুজের খেলা, আর সুন্দর বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষদের গমনাগমন। বাকেরা, ক্রেউএস, ধীরেনবাবু—এঁরা সোজা উত্তরে Batoeriti বাতুরিতি বলে একটা জায়গায় গেলেন, মুণ্ডুকের থেকে আরও পূবে পাহাড়ের মধ্যে; সেখান থেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চমৎকার হাঁটা পথ হ'য়ে এঁরা একদিন পরে মুণ্ডুকে এসে আমাদের সঙ্গে মিল্‌বেন। মুণ্ডুকের পশ্চিমে বলিদ্বীপের যে অংশ যবদ্বীপের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সে অংশটা জঙ্গুলে' আর পাহাড়ে'; লোকের বসতি সেখানে কম। কিন্তু মুণ্ডুক পর্য্যন্ত যে পথটা দিয়ে আমরা যাই, সে পথটায় লোকের বাস বেশ। খড়ের চালে ছাওয়া শান্তিপূর্ণ গ্রাম, আর মাঝে মাঝে মন্দির, এ-সব প্রচুর চোখে প'ড়ল।

পথে কি একটা গাঁয়ের বাজারের ধারে আমাদের মোটর থাম্‌ল। সবে সমতল ক্ষেত্র ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌ছি। দেখি, সেই বাজারে খুব ম্যাঙ্গোষ্টীন ফল বিক্রী হ'চ্ছে। ঈষৎ টকরস-যুক্ত এই মিষ্ট মুখরোচক ফল, লোভ হ'ল—প্রায় দু ঝুড়ি আমরা কিনে ফেললুম। দাম মনে হ'ল খুবই শস্তা। সারা পথ আমরা—অন্ততঃ আমি—খুব এই ফল খেতে খেতে গেলুম।

মাঝেকার খানিকটা পথ খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে; সেখানটায় একটু শীত-শীত ক'রতে লাগল। রাস্তা খুব চমৎকার, চারিদিকে ঘন সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে খুব বাঁশ-ঝাড়। এক জায়গায় একটা একটা ঝরনা উঁচু পাহড়ের গা ব'য়ে একেবারে রাস্তার ধারেই প'ড়ে একটা ছোটো পাহাড়ে' নদীর সৃষ্টি ক'রেছে, সেখানে আমাদের মোটর দাঁড় করালে। আমরা নেমে ঝরনার সুশীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে একটু স্নিগ্ধ হ'লুম। মোট নিয়ে যাচ্ছে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় লোক, তারা ঝরনার ধারে মোট নামিয়ে জিরুচ্ছে। কতকগুলি মালবাহী টাট্টু নিয়ে যাচ্ছে, টাট্টুর পিঠের বোঝা সমেত জীন খুলে দিয়ে ঝরনার এক পাশে টাট্টুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর সেখানে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত টাট্টুগুলি দুপুর বেলায় হিম-শীতল ঝরনার জলে দিব্যি আরামে স্নান ক'রছে। দেখে আমাদেরও স্নান ক'রতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল।

এই পাহাড়ে' অঞ্চলে বিস্তর কফি বাগান আছে দেখলুম। মুণ্ডুকে পউছে বাকে আর ক্রেউএস্-এর কাছে শুনলুম, এই সব কফি বাগানের মালিক হ'চ্ছে স্থানীয় বলিদ্বীপীয় লোকেরাই—বিদেশী ডচেরা নয়। দেশ দখল ক'রেছে বটে, কিন্তু ডচেরা দেশের উপসত্ত্ব সবটুকু নিচ্ছে না, তাদের সব গ্রাস করবার দরকার হয় নি; দেশের লোকেরাই এই ছোট্ট দ্বীপটাতে তার exploitation ক'রছে। কফি বাগান ক'রে আধুনিক কালের উপযোগী একটা কৃষি ব্যবসায়ে যে বলিদ্বীপীয়েরা হাত দিয়েছে, আর তাতে বিদেশীরা এসে তাদের ঘরের মধ্যে জেঁকে ব'সতে পারে নি, এটা বলিদ্বীপীয়েদের কার্য্যকুশলতার একটা খুব বড়ো প্রমাণ ব'লতে হবে।

জঙ্গল, থরে থরে পাহাড়ের গা কেটে ধানের ক্ষেত, কফি বাগান, এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের খানিকটা

পাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেতের স্তর
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

উৎরাই পথে নামতে হ'ল, তারপরে ডান দিকে অর্থাৎ পূবদিকে একটা বাঁক নিয়ে আধ ঘণ্টাটাক পথ আবার চড়াইয়ে গিয়ে আমরা মুণ্ডুক্-এ পৌছুলুম। দশটায় বাছুঙ ছেড়েছিলুম, দেড়টায় মুণ্ডুকে পৌছুলুম। একটা চওড়া চড়াই পথের দুধারে মুণ্ডুক শহর বা গ্রাম। ইটের আর কাঠের ইমারত অনেকগুলি। ঢালা লোহার রেলিং, আর ঢেউখেলানো টিনের ছাতের ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ীর সামনে বা বাড়ীর হাতার মধ্যে মোটর দেখলুম। মোটকথা, শহরের বাহ্য দৃশ্য দেখে মনে হ'ল, স্থানীয় লোকেরা লক্ষ্মীমন্ত। তবে কাঁচা পয়সা হাতে এলে অনেক সময়ে যেমন একটা রুচির চেয়ে খরচ বিষয়ে দরাজ হাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানেও তেমনি হ'য়েছে ব'লে মনে হ'ল।

শহরের বড়ো সড়কের প্রায় শেষে—তার পরে আর মোটর চলবার পথ নেই—মুণ্ডুকের পাসাংগ্রাহান। আমরা সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হ'লুম। পূর্ব্ব থেকেই মান্দুরকে খবর দেওয়া হ'য়েছিল।

মুণ্ডুকের পাসাংগ্রাহান বা ডাক বাঙলাটী চমৎকার জায়গায় অবস্থিত। বাড়ীটির একদিকে ফুলবাগানে প্রচুর গোলাপ ফুটে র'য়েছে, আর গাঁদা, আর জবা। একটী ঝরনার কাকচক্ষু জল মস্ত বড়ো এক চৌবাচ্চাকে সর্ব্বদা পূর্ণ রেখে চৌবাচ্চার নল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই চৌবাচ্চায় ইচ্ছে ক'রলে সাঁতার কেটেও স্নান করা যায়। বাড়ীর চারিদিকে পাহাড়ের মালা, বাড়ীর সামনে দূরে পর্ব্বতগাত্রের উদার সরল রেখাপাত। বাড়ীর পিছনদিকে নীচেই একটা গভীর উপত্যকা, নানা রকম গাছের চুড়ো দেখা যায়, মাঝে মাঝে দু একটি ঘর বাড়ী; গাছপালার ভিতর থেকে বসত বাড়ীর রান্না-বান্নার ধোঁয়ায় মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। একদিন দুপুরে নীচের উপত্যকাথেকে টুংটাং ক'রে গামেলানের ধ্বনি আস্‌ছিল। সরু মোটা নানা আতোদ্য ধ্বনি মিলে বাঁশীর মতন একটা বেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর একটানা ধ্বনির রেশ টুংটাং তালের পিছনে শোনা যাচ্ছিল,—এমনি উদাস করা ব্যাপার যে কি আর ব'লবো; ঠিক যেন মস্ত বড়ো দীঘীর ও-পার থেকে কোনও মন্দিরের সন্ধ্যারাত্রিকের ঘড়ি ঘণ্টা কাঁশর আর গম্ভীর-নিনাদী শাঁখের ধ্বনির

মুণ্ডুক্ শহর—বাঁয়ে পাসাংগ্রাহান্
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

সমাবেশের মতন আমার মনকে মোহগ্রস্ত ক'রে তুল্‌ছিল।

পাসাংগ্রাহানের সামনে অবধি এসে যে মোটর-চলা পথটা শেষ হ'য়েছে, পায়ে-চলা পথে পরিণত হ'য়েছে, সেই পায়ে-চলা পথ ধ'রে আরও উঁচুতে পাহাড়ের গা দিয়ে সুরেনবাবু আর আমি বিকালে একটু বেড়াতে গেলুম। রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে একটি পাহাড়ে' নদী উদ্দাম ফেনিল নৃত্য-ভঙ্গীতে নীচে চ'লে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কৃষাণদের ঘর, আর দু একটা বড়ো বড়ো বাড়ীও চোখে প'ড়ল। প্রায় সব বাড়ীতে মস্ত বাঁশের খাঁচার মতন চুবড়ীতে ঢাকা লড়াইয়ে' মোরগ, তাদের সু-উচ্চ আওয়াজে পার্ব্বত্য গ্রামটী মুখরিত। কুকুরের দল আমাদের দেখে কোথাও কোথাও ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌ল, আর গ্রামকন্যাদের চকিত দৃষ্টি থেকেও আমরা বঞ্চিত হ'লুম না। খানিকটা ঘুরে আমরা বাসায় ফিরলুম। সন্ধ্যা হয়-হয়, পাহাড়ে' জায়গা, আমাদের বেশ একটু শীত-শীত ক'রছে। কিন্তু এখানে বলিদ্বীপীয়দের দেখলুম, এদের পরিধেয় সেই দক্ষিণ বলির সমতল ভূমিরই মতন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সেই রকম খালি গা। পাহাড়ে' নদীটীতে যথারীতি গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আস্‌ছে, বৈকালিক স্নান বা গা ধোয়া সার্‌তে আস্‌ছে।

সন্ধ্যায় পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা হ'ল। মিস্ মেয়োর বই 'মাদার ইণ্ডিয়া' তখন সপ্তাহ কতক হ'ল বিলেতে বেরিয়েছে, আর তা নিয়ে হৈ চৈ-এর সূত্রপাত হ'য়েছে। 'নিউ-স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে, মিস মেয়োকেই সমর্থন ক'রে, আর সঙ্গে সঙ্গে মিস মেয়োর মিথ্যা কথা উদ্ধার ক'রে রবীন্দ্রনাথ শিশু-বিবাহের পক্ষপাতী, এ-রকম ইঙ্গিতও করা হ'য়েছে; আর তাঁর মত ব'লে এমন সব কথা বলা হ'য়েছে যা যে কোনও সাধারণ উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষেও বলা লজ্জাকর। আমরা ব'ললুম, তাঁর তরফ থেকে এ সব কথার একটা প্রতিবাদ বেরুনো উচিত। কবি অনিচ্ছুক হ'লেও এই সমালোচনার একটি উত্তর লিখতে রাজী হ'লেন। 'মাদার ইণ্ডিয়া' তিনি বা আমরা কেউ তখনও দেখিনি। বলিদ্বীপে মুণ্ডুকে ব'সে তাঁর লেখা এই সমালোচনার উত্তর যথাকালে ইউরোপে

'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্ডেন' পত্রে আর দেশে নানা পত্রে বা'র হ'য়েছিল।

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৬ই।—

বিকাল তিনটের দিকে ধীরেন বাবু, ড্রেউএস্ আর বাকেরা বাতুরিতি থেকে এসে পৌঁছুলেন। এঁরা অতি সুন্দর পাহাড়ে' পথ ধ'রে সারা সকাল আর দুপুর হেঁটেছেন, জিনিস-পত্র যা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সব একটা টাট্টুর পিঠে ক'রে এনেছেন। বাতুরিতি থেকে মুণ্ডুক্ আস্‌তে হ'লে তিনটী হ্রদের ধার দিয়ে আস্‌তে হয়—Bratan ব্রাতান, Boejan বুইয়ান, আর Tamblingan তামব্লিঙান। ড্রেউএস্ ব'ললেন, পথে একটা হ্রদের ধারে একঘর তথা-কথিত মুসলমান বলিদ্বীপীয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল এদের একটা ছেলে খানিক পথ ওঁদের সঙ্গে আসে, ছেলেটি মালাই ভাষায় ড্রেউএসের সঙ্গে কথা কয়। এরা পূর্ব্ব-বলি থেকে এসে এখানে জমী নিয়ে বসবাস ক'রছে। ড্রেউএস তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে মুসলমানদের কলমার আরবী মন্ত্রটা জানে কিনা; সে ব'ল্‌লে যে সে জানে বটে, কিন্তু সে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রবে না, কারণ ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলটী বিশেষ ক'রে দেবতার স্থান; দেবতারা ঐ বিদেশীয় মন্ত্র শুনে রুষ্ট হ'তে পারেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে আমরা কালকের মতন পাহাড়ে' পথ ধ'রে অনেকটা বেড়িয়ে এলুম। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে বিরাট বিশাল বনস্পতির আর অন্য গাছের বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ধার বেয়ে পথ চ'লেছে। এখানকার বনানী একেবারে আদি যুগের। এক জায়গায় একটা ঝরনা এসে প'ড়ছে, খানিকটা গভীর জায়গায় জল জ'মে একটা ছোটো পুখুরের সৃষ্টি হ'য়েছে; গহন বনে তার আশ-পাশ ঢাকা,—কচু-জাতীয় গাছে, নানা রকমের বড়ো বড়ো fern-এ, বাঁশে, কলাগাছে; খালি এক দিকে উঁচু পাহাড়ের গা ব'য়ে ঝম-ঝম শব্দে ঝরনার জল নীচে প'ড়ছে, পুখুরটার অন্য ধার দিয়ে এই জল বেরিয়ে গিয়ে মুণ্ডুকের রাস্তার পাশের নদী হ'য়ে নীচে চ'লে গিয়েছে। এখানে দেখি, ঝরনার জলের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে দুটী টাট্টু ঘোড়া স্নান ক'রছে। ঘোড়াকে পাহাড়ের ঝরনায় নাওয়ানো দেখ্‌ছি এ দেশের একটী রীতি।

কাছেই এক জায়গায় পাহাড় ঢালু গায়ে নীচে এক গভীর তরু-বহুল উপত্যকা ভূমিতে নেমে গিয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো গাছ—মহাদ্রুম ব'ললেই হয়—কাটা হ'চ্ছে; এমন বড়ো বড়ো গাছের কুঠারের হাতে অপমৃত্যু দেখে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয়; দেখে মনে হয়, দু তিন শ' বছর লেগেছিল এই এক একটা গাছের এই রকম বিশাল মূর্ত্তি ধ'রে উঠতে, কিন্তু দুদিনে মানুষ তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে। একটা 'বৃক্ষহত্যা' কাণ্ড চ'লেছে—আমার মনে হ'ল, একটা বড়ো প্রাণীকে মারার মতন এই রকম ক'রে গাছ কেটে মেরে ফেলাও যেন একটা পাতক। কিন্তু মানুষের চাষ আবাদের জন্য খালী জমীর আবশ্যক, তাই গাছকে স'রতে হবে। এই সব জমীতে শুন্‌লুম কফীর আবাদ হবে।

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৭ই।—

সকালে মুণ্ডুকের ডাকবাঙলায় বেশ চুপচাপ ভাবে কাটানো গেল। 'নিউ-স্টেট্‌স্‌ম্যান্'-এর সমালোচনার উত্তর কবি লিখে ফেলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্ডেন্'-এ ছাপাবার জন্য পাঠানো হবে। দুপুরের ভোজনের সময়ে দেখি, প্রায় জনাদশেক ওলন্দাজ মেয়ে পুরুষ মোটরে আর ঘোড়ায় ক'রে এসে উপস্থিত। এরা ঐ দিনই চ'লে গেল।

বেলা তিনটের দিকে সুরেন বাবু আর আমি মুণ্ডুকের বড়ো রাস্তা ধ'রে বেড়াতে বেড়াতে প্রায় মাইল দেড় দুই উৎরাই পথে নেমে Banjoeatis বাঞ্‌-আতিস নামে একটি বড়ো গ্রামে এসে পঁউছুলুম। ধুতি পরে আমরা চ'লেছি; আমার হাতে একটি বাঁশের লাঠি, আর সুরেন বাবুর কাছে ক্যামেরা। পথের ধারে একটি বেশ বড়ো বাড়ীর সদর দরজায় একটী ছোকরা আর একটী আধা বয়সী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। ছোকরাটীর পরণে হাফ-প্যান্ট, কোমরে রঙীন সারংটা জড়ানো, গায়ে একটা সাদা শার্ট; স্ত্রীলোকটীর গায়ে মালাই কোট। ছেলেটী সিগারেট খাচ্ছিল।

মুণ্ডকের পথে (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

এদের ইচ্ছেটা যে আমাদের সঙ্গে কথা কয়। আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম, ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম। এরা আমাদের দেখে অবাক্—কোন দেশের লোক, কেন এসেছি, সব শুন্‌তে চাইলে। এদের সঙ্গে সমানধর্ম্মা শুনে ভারী খুসী হ'ল। এরা ব'ললে যে বাঞ্জ্‌আতিস গ্রামে দাহ হ'চ্ছে, তবে খুব ঘটার ব্যাপার নয়। সুরেনবাবু এদের ছবি নিলেন। খুব হাসি মুখে এরা আমাদের বিদায় দিলে।

বড়ো রাস্তার দুধারে বাঞ্জ্‌আতিস গ্রামের সারি সারি বাড়ী। এ গ্রামটিও বেশ সম্পন্ন ব'লে বোধ হ'ল। প্রায় সব বাড়ীতেই উঁচু কাঠের মাচার উপরে ধানের মরাই; কাঠের মরাইগুলি, তাতে সুন্দর সুন্দর নানা রঙীন চিত্র আঁকা। কতকগুলিতে স্ত্রী দেবতা মূর্ত্তি আঁকা, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে, শুন্‌লুম সেগুলি শ্রীদেবীর। দু একটা মোটরের 'গারাজ'ও আছে। রাস্তায় যে সব লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের সঙ্গ নিলে; আমি দু' চার জনের সঙ্গে আলাপ ও যথাসম্ভব ক'রতে লাগলুম। আমরা হিন্দু ব'লে সকলেরই প্রীতি-মিশ্র বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে উঠলুম। এরা আমাদের

বাঞ্জ্‌আতিস্-এর দাহ-স্থানে সমাগত ব্যক্তিগণ (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত

সঙ্গে ক'রে দাহ স্থানে নিয়ে গেল। অনেকগুলি মেয়ে পুরুষ ব'সে আছে। কতকগুলি চিতা, তার মধ্যে একটিই যা একটু বড়ো। সবগুলিই জ'লছে। ছোটো খাটো দু একটা 'ওয়াদাঃ' র'য়েছে, তবে উবুদ-এর মতন ব্যাপারটা মোটেই বিরাট নয়। একটি সুশ্রী ছোকরা আর একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটির উপর ব'সে আছে, ইঙ্গিতে তাদের অনুমতি পেয়ে সুরেন বাবু তাদের ছবি নিলেন। আমাদের সঙ্গে ক'রে এনেছিল যারা তারা এখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমাদের পরিচয় দিলে। জনতার সামনে ভারতের নদনদীর আর দেবতাদের আর রামায়ণ মহাভারতের পাত্রপাত্রীর নাম উচ্চারণ ক'রে আমাদের সমানধর্ম্মিত্ব জাহির ক'রতে হ'ল। আমরা কিছুক্ষণ প'রে ফিরলুম। সঙ্গের লোকেরা প্রস্তাব ক'রলে, গ্রামে এক বিদ্বান্ পদণ্ড আছেন, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যদি দেখা করি। আমরা সানন্দে রাজী হ'লুম।

পদণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বড়ো রাস্তার ধারেই এঁর বাড়ী। 'নাছ-দুয়ার' বা রথ্যাদ্বার অর্থাৎ সদর দরজা পার হ'য়ে একটু বাগান মতন, তার পরেই বাড়ীর আঙিনা। খুব খোলা জায়গায় খান কতক ঘর, একটা ঘরের সামনে একটু খোলা দর-দালান, এই দালানে একটা তক্তাপোষ পাতা। ঘরের মেজে সিমেণ্টের। সমস্তটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণের বাড়ী যেমন হওয়া উচিত। দালানের দেয়ালে খানকতক সেকেলে হাতে-আঁকা চীনে ছবি। দালানের তক্তা-পোষের উপরে একখানা মাদুর বিছানো। আমরা তক্তাপোষের উপরে ব'সলুম, সঙ্গের লোকেরা আঙিনার মাটিতে বা দালানের সিমেণ্টের মেজেতেই ব'সে গেল।

গৃহস্বামী পদণ্ড মহশয় তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, যে দর-দালানের তক্তাপোষের উপরে আমরা ব'সলুম তারই লাগোয়া ঘরের ভিতরে। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এল। লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারা, সুদর্শন গৌরবর্ণ পুরুষ, প্রৌঢ় যুবাবস্থায়, মুখে সামান্ত একটু গোঁফ দাড়ি, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, পরণে বেগুনে রঙের একখানা 'কাইন' বা কটিবস্ত্র। ঘুমের জড়তা কাটেনি, বাইরে এসে আমাদের দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। সঙ্গের লোকেরা পরিচয় দিলে যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে আগত পদণ্ড। এই পদণ্ডটী দেখলুম কেবল দেশভাষাই জানেন, মালাই জানেন না। তখন মালাই-জানা আর একজন পদণ্ডকে ডেকে আনতে গেল। ইতিমধ্যে বাড়ীর আর প্রতিবেশী গৃহের মেয়েরা আমাদের দেখবার জন্য জড়ো হ'ল। ইট বা'র করা অনুচ্চ ব্যবধান-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পাশের একটা বাড়ীর ক্রিয়া-কলাপ লোকজনের চলা-ফেরা সব দেখা যাচ্ছিল। এরা সকলেই অতি সুশ্রী, তন্বী, গৌরী, আর বলিদ্বীপের প্রাচীন পদ্ধতি মতন আবরণ-বিরল এদের বেশ ভূষা; অসঙ্কোচে এসে, ব'সে বা দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগ্‌ল, আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল। দু একজনের কোলে দু একটা অতি সুন্দর শিশু—গলায় মোহরের মালা, মাথা কামানো।

বলিদ্বীপের ভদ্রাসন বাটীর 'নাছ-দুয়ার'
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

আর একজন পদণ্ড এলেন। ইনি বয়সে বৃদ্ধ; পরণে লাল আর সবুজ রেশমি ফুল কাটা ধুতি, চাদরখানা বুকে বাঁধা, মালাই বলেন, বেশ বুদ্ধিমান লোক ব'লে মনে হ'ল। এর নামটী হচ্ছে Pedanda Ngoerah 'পদণ্ড ঙুরাঃ'। আমার স্বল্প পুঁজির মালাই নিয়ে কথা কইবার চেষ্টা

ক'রলুম। ভারতবর্ষ কত দূরের দেশ, আমাদের দেশে পুরাণ বর্ণিত নগর নদী পর্ব্বত প্রভৃতি কোথায় কোথায় আছে, আমাদের ভাষা কি, অক্ষর কি রকম, লঙ্কাদ্বীপ কোথায়, আমাদের দেশে যেতে কতদিন লাগে; ইত্যাদি কথা ম্যাপ আর ছবি এঁকে আর অক্ষর প্রভৃতি লিখে দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলুম। এদেশে শিষ্ট ভাষায় মধ্যম-পুরুষে 'আপনি' ব'লে উল্লেখ না ক'রে, 'মহাশয়,' 'শ্রীচরণ' ইত্যাদির মতন শব্দ ব্যবহার করে; 'আপনার কাছে নিবেদন এই যে' না ব'লে ব'লবে, 'পাদুকায় নিবেদন এই যে'; আর এই রকম ব্যবহারের ফলে আমাদের সংস্কৃত padocka 'পাদুকা' শব্দ এদেশে 'আপনি' পদবাচ্য হ'য়ে প'ড়েছে। আমার প্রতিও এইরূপ 'পাদুকা' প্রয়োগও হ'চ্ছিল; আর আমার হাতে দণ্ড ছিল, আর জাতিতেও ব্রাহ্মণ, সুতরাং 'পদণ্ড' বা দণ্ড-ধারী আখ্যাও জুটে গিয়েছিল। এঁদের সঙ্গে আধ ঘণ্টাটাক কাল এই ভাবে কাটিয়ে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে প'ড়লুম।

পথে একখানা চ'লতি লরী পাওয়ায়, বাঞ্জআতিস থেকে মুণ্ডুক চট্‌পট্ ফেরা গেল।

রাত সাড়ে আটটায় স্থানীয় একজন পুঙ্গব তিনজন অনুচর সহ কবির দর্শনের জন্য হাজির হ'লেন। সুশ্রী যুবক; কবি আসছেন কাগজে প'ড়েছেন, এত শীঘ্র তাঁর দেশের কাছে এসে প'ড়বেন সে ধারণা ক'রতে পারেন নি: তাঁর মুণ্ডুকে অবস্থানের কথা, পাসাংগ্রাহানে টেলিফোন আছে পাসাংগ্রাহানের মান্দুরের কাছে ফোন ক'রে জেনেই, নিজের মোটরে চ'লে এসেছেন দেখা ক'রতে। 'পাদুকা' ব'লে কবিকে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ ক'রতে লাগলেন। ইনি ডচ জানেন, মালাইও জানেন। ক্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। এই পুঙ্গবটী নিজের পরিচয় দিলেন—আমার খাতায় নিজের নামটী লিখে দিলেন—Ida Gede Soanda, Poenggawa district Bandjar ইড গডে সোআন্দা, বাঞ্জার জেলার পুঙ্গব'। ব'ললেন যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল। কতকগুলি খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। কাল-ই আমরা মুণ্ডুক থেকে বুলেলেঙ হ'য়ে বলিদ্বীপ ত্যাগ ক'রছি শুনে আপশোশ ক'রতে লাগলেন। এঁরও মহাভারতের পুরো আঠারো পর্ব্ব চাই। আদি পর্ব্বের 'গোধর্ম্ম' ব'লে কি অংশ আছে,—কথাটী আমরা ভালো বুঝতে পারলুম না—সে বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলেন। অনুলোম

নৌকায় করিয়া জাহাজে চড়া—সামনে টপী মাথায় সুরেন বাবু
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

প্রতিলোম বিবাহ হওয়া উচিত কি না, যজ্ঞোপবীত-ধারণের রীতি কি—এই সব বিষয়েও প্রশ্ন হ'ল। হলাণ্ড-প্রবাসী যবদ্বীপীয় কবি আর পণ্ডিত Noto Soeroto 'নত-সুরত' কর্ত্তৃক লিখিত শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় বিষয়ে ডচ পুস্তক, আর শ্রীযুক্তা আনী বেসান্তের রচিত যোগ ও পুনর্জন্ম বিষয়ে ছোটো দুখানি ইংরিজী বইয়ের ডচ অনুবাদ—সুরাবায়ার সিন্ধী বণিক শ্রীযুক্ত লোকুমলের দেওয়া বইয়ের মধ্য থেকে— আমি এঁকে দিলুম। আমার ঠিকানা ইনি নিলেন। সংস্কৃত পড়াবার জন্য ভারতবর্ষ শিক্ষক আসতে পারে শুনে ভারী খুশী। এই রকমে খানিক আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে রাত সওয়া নটায় পুঙ্গব সোআন্দা বিদায় নিলেন।

[১২] বুলেলেঙ—বলিদ্বীপ থেকে বিদায়।

বৃহস্পতিবার ৮ই সেপ্টেম্বর।—

সকালে মুণ্ডুক-থেকে বুলেলেঙ যাত্রা। বুলেলেঙ-এ দুপুরে জাহাজ ধ'রে যবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হবে

শিব

বলিদ্বীপীয় ছায়ানাটকে ব্যবহৃত মহিষ চর্ম্ম নির্ম্মিত মূর্ত্তি

সুরেন বাবু, ধীরেন বাবু, ভ্রেউএস্, আমি আমরা আগে একখানা গাড়ী ক'রে বেরিয়ে প'ড়লুম, কবি পরে বাকে-দের সঙ্গে আসবেন। এবার শেষ বারের জন্য ব'লিদ্বীপের অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে চ'ললুম। মুণ্ডুক-থেকে পশ্চিমে খানিক, তারপর উত্তরে গিয়ে আমরা সমুদ্রের

জাহাজে গোরু তোলা
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

ধারে প'ড়লুম—সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে পূব মুখো বুলেলেঙ পর্য্যন্ত পথ। পাহাড় ছাড়িয়ে সমতল সমুদ্রের ধারে পথ। ক্রমাগত কাঁচা পাকা ধানের ক্ষেত, না'রকল গাছ, আর বাঁ দিকে নীল, ঘন নীল সমুদ্র। প্রভাতের চোখ-ঝল্সানো আলোয় সমস্ত উদ্ভাসিত, সমুদ্রের হাওয়ায় রোদ্দুর ততটা কড়া ব'লে বোধ হ'চ্ছিল না।

বেলা দশটায় বুলেলেঙ-এ পঁউছুলুম। জাহাজের আপিসে গিয়ে আমাদের টিকিট আর ক্যাবিন ঠিক ক'রে নেওয়া হ'ল। হাতে এখন ঘণ্টা দুই সময়। ভ্রেউএস্ বুলেলেঙ থেকে রাজধানী সিংহরাজায় গেলেন, আমরা বাজারে একটু ঘোরাঘুরি ক'রলুম, স্থানীয় মণিহারী জিনিস পাই কিনা দেখবার জন্য। পাতিমার কথা আগে ব'লেছি; তার বাড়ীতে গিয়ে আমরা কিছু জিনিস নিলুম। দেড়শ' গিলডার দামের, হাতলে সোনার রাক্ষসমূর্ত্তি-যুক্ত সেকেলে একটা ক্রীস বা তলওয়ার দেখালে, বড় লোভ হ'চ্ছিল সেটার জন্য, এমনিই চমৎকার কাজ তার। সুরেনবাবু এদেশের জরীর কাপড় নিলেন। মোষের চামড়ায় নিপুণ হাতে কাটা, রঙচঙে wajang ওয়াইআং বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত একটা চতুর্ভুজ শিবের মূর্ত্তি আমি কিনলুম। টুরিস্ট্-এজেণ্ট রুস্ভেল্ট-এর আপিসে গিয়ে কিছু ফোটোগ্রাফ কিনলুম। তারপরে জাহাজ-ঘাটায়। বেলা সাড়ে এগারোটা,

বুলেলেঙ-এ জাহাজ থেকে বলিদ্বীপের দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

তখনও কবি বুলেলেঙ্-এ এসে পৌঁছন নি—এদিকে বারোটায় জাহাজ ছাড়বে। এমন সময়ে বলি-লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কারন সাহেবের সঙ্গে কবি এসে পৌঁছুলেন,—রেসিডেণ্ট স্বয়ং তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছেন।

আমরা নৌকো ক'রে জাহাজে চ'ড়লুম। ছোটো জাহাজ, নাম Van Neck 'ফান-নেক'। K. P. M. কোম্পানীর জাহাজ, কবিকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মানিত অতিথি রূপে, আর আমাদের সকলকে আধা ভাড়ায়। জাহাজ বারোটায় না ছেড়ে ছাড়লে সেই বিকেল পাঁচটায়। এই কয় ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল তুলতে লাগ্‌ল। প্রায় চার শ' গোরু যাচ্ছে এই জাহাজে, যবদ্বীপে, লাল লাল গোরুগুলি, বেশীর ভাগ নাক ফোঁড়া, চাষের কাজে

লাগ্‌বে বোধ হয়। কপিকলে গোরুগুলিকে নৌকা থেকে জাহাজে তুলতে লাগ্‌ল। জাহাজের যাত্রীদের কাছে বিক্রী করবার জন্ত পাতিমাণ্ড তার শিল্পদ্রব্যের পসার এনে ডেকের উপর সাজিয়ে ব'সে গেল।

বিকালে জাহাজ ছাড়্‌ল। বলিদ্বীপের সবুজ পাহাড় আর তার নারিকেলকুঞ্জ ক্রমে দূর হ'তে দূরতর হ'তে লাগ্‌ল। পশ্চিম থেকে অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মিগুলি পাহাড়ের উপরের গাছপালার শীর্ষদেশকে স্বর্ণাভ হরিৎবর্ণের ক'রে তুলেছে। আমাদের পক্ষ-কালের বলি-ভ্রমণ একটা মনোহর স্বপ্নবৎ মনে হ'তে লাগল; যেন এ পৃথিবী ছেড়ে কিছু দিনের জন্ত প্রাচীন ভারতের কল্পলোকের মধ্য দিয়ে আমরা বিচরণ ক'রে এসেছি। কাল সকালে যবদ্বীপে পৌছুবো, আমাদের দ্বীপময়-ভারত পর্য্যটনের তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে; কিন্তু এত সুন্দর দেশ, সুন্দর নরনারী, মনোহর প্রতিবেশ—বোধ হয় আর চোখে প'ড়বে না।

প্রবর্দ্ধমান সন্ধ্যার অন্ধকারে আর দূরত্বে ক্রমে বলিদ্বীপের পাহাড়ের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, অদৃশ্য হ'য়ে এলো। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিপূত ঐ দেশ দর্শনের সৌভাগ্য কি আবার হবে?

ক্রমশঃ

দেশবিদেশের কথা

বাংলা

স্বর্গীয়া কুমারী প্রেমমালা সিংহ—

কুমারী প্রেমমালা সিংহ বি-এ, কুমিল্লার স্বর্গীয় গুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি কানপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষ ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের প্রভাবে তিনি ছাত্রী, অন্য শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ, এবং বিদ্যালয়ের ভৃত্য প্রভৃতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মধুর স্বভাবের গুণে তিনি সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। তিনি যখন কানপুর যান, তখন প্রথম প্রথম ভৃত্যেরা তাঁহাকে মেমসাহেব বলিত। তিনি তাহা পছন্দ করিতেন না, "দিদি জী" সম্বোধন পছন্দ করিতেন। পরে তাহারা এই নামেই তাঁহার উল্লেখ করিত। বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়া সার্ব্বজনিক বিষয়েও তাঁহার উৎসাহ ছিল। কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তখন শ্রীমতী প্রেমমালা স্বেচ্ছাসেবিকাদের ভাইস্-ক্যাপ্টেনের কাজ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কানপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে নানা প্রকারে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা হইতেছে, তিনি সুগায়িকা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে কানপুর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেমমালা সঙ্গীত শ্রেণী খোলা হইতেছে। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে পারদর্শিতার জন্য তাঁহার নামে প্রতি বৎসর প্রাইজ দেওয়া হইবে। কানপুরে বাঙালী ছেলেদের বিদ্যালয়েও তাঁহার নামে একটি প্রাইজ দেওয়া হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি প্রাইজ তাঁহার নামে প্রতিবৎসর দিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। ছাত্রীরা তাঁহার নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিবার জন্য টাকা তুলিয়াছে। তিনি যে সব রকম বহি ভালবাসিতেন, এই লাইব্রেরীতে তাহা রক্ষিত হইবে। তদ্ভিন্ন ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের হলে রাখিবার জন্য তাঁহার একটি তৈলচিত্র উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছে। বিদ্যালয়ের জীবনশিক্ষয়িত্রী ইহার ফ্রেমটি স্বয়ং অলঙ্কৃত করিয়া দিবেন।

স্বর্গীয়া প্রেমমালা সিংহ

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লার হাউস্ অফ্ কেবারার্স-এর কর্ম্মে

নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল পরে বোম্বাই-এর ডিনশ পেটিট মিল্‌স্‌-এ ও আমেদাবাদে অশোক মিল্‌স্‌-এ থাকিয়া তিনি বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তাহার পর ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে State Technical Scholarship লইয়া টেক্সটাইল কেমিষ্ট্রি অধ্যয়ন করিবার জন্য বিলাতে গমন করেন

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলেজ অফ্‌ টেকনোলজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে 'Associate of the Manchester College of Technology', 'B. Sc (Tech)' ও 'M.Sc (Tech)' উপাধি লাভ করিবার পর ক্রমে ক্রমে তিনি ইংলণ্ডের টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট ও সোসাইটি অফ ডায়ারস্‌ অ্যাণ্ড কলারিষ্টস্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য হন। এই বিষয়ে অধিকতর পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি ইংলণ্ডে ক্লেটন অ্যানিলিন কোম্পানী ব্রিটিশ অ্যানিলিন কোম্পানী, স্কটিশ্‌ ডায়ারস্‌ লিমিটেড্‌ প্রভৃতি রঞ্জন শিল্পের যৌথ কোম্পানীগুলিতে কর্ম্ম করেন।

বয়ন ও রঞ্জন শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি ইউরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি নানা প্রদেশের বয়ন বিদ্যার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আর্থিক জরীপের প্রচেষ্টা—

গ্রাম বা ইউনিয়নের আর্থিক জরীপের জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এক প্রশ্নপত্রের খসড়া তৈরী করিয়াছেন। এই প্রশ্নপত্র অবলম্বন করিয়া যিনি সকলের চেয়ে ভাল "জরীপ" পাঠাইতে পারিবেন তাঁহাকে পরিষৎ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিবেন।

এই জরীপের নিয়মাবলী নিম্নলিখিত রূপ :—

১। এই জরীপে দুটি ভাগ থাকিবে। প্রথম ভাগে প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে হইবে; দ্বিতীয় ভাগে প্রথম ভাগে গৃহীত তথ্যরাজি হইতে নিজ তত্ত্ব বা গবেষণার ফল সন্নিবিষ্ট হইবে।

(ক) প্রত্যেক পরিবার বা ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্যগুলি নিজ হাতে যথার্থতঃ পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

(খ) তথ্য ও তত্ত্ব একত্রে পরিষদের নিকট বিচারার্থ পাঠাইতে হইবে।

২। কোন কল্পিত ব্যক্তি বা পরিবারের কাহিনী অথবা কোন ব্যক্তি বা পরিবারের অপ্রকৃত তথ্য গ্রাহ্য হইবে না। খাঁটি সত্য কথা চাই। উত্তর সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে এক সপ্তাহ মধ্যে জবাব দেওয়া চাই।

৩। যে কেহ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

৪। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রার্থী ব্যক্তিকে আগামী ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে হইবে।

(১) নাম। (২) পেশা। (৩) কোন গ্রামে বা সহরে কতদিন আছেন। (৪) কতদূর পড়াশুনা হইয়াছে। (৫) গ্রামে কত পরিবার ও কত লোক আছে। পরিবার বা লোকানুপাতে প্রশ্নপত্র পূরণ করিয়া পাঠাইবার জন্য ২০শে চৈত্র সকলের নিকট ডাকযোগে পাঠান হইবে।

৫। আগামী ২৫শে মধ্যে শ্রাবণের মধ্যে এই "জরীপ" নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ
১০৭, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য "জরীপ" ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা পরিষদের হইবে।

৬। আগামী আশ্বিনমাসের 'আর্থিক উন্নতি'তে পুরস্কৃত ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইবে। টাকা কার্ত্তিক মাসের শেষে প্রেরিত হইবে।

৭। পরিষদের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য :—সহর, বা গ্রাম বা সহরের অংশ বিশেষ ধরিয়া জরীপ করিলেও চলিবে। কিরূপ জরীপ করা হইয়াছে তাহা জানাইতে হইবে।

কবিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা—

১। এই পুরস্কারের নাম—"কবিতা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার।"

২। দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে—প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকা। লিরিকের জন্য একটি, অপরটি গাথার (Ballad) জন্য।

৩। বর্ত্তমান ১৩৩৭ সালে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মৌলিক রচনা হইতে পুরস্কারযোগ্য কবিতা নির্ব্বাচিত হইবে।—

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা, উত্তরা, উপাসনা, নবশক্তি ও বিজলী।

৪। ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই বিভিন্ন কাগজে পুরস্কৃত রচনা ও তাহার রচয়িতার নাম প্রকাশ করা হইবে।

৫। উপযুক্ত কাব্য-রসিকের হাতে নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইবে।

৬ বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবির কবিতা প্রতিযোগিতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

৭। পুরস্কার-যোগ্য কবিতার অভাবে, পুরস্কার পর বৎসরের জন্য গচ্ছিত থাকিবে।

সত্যাগ্রহের জন্য দণ্ডিতা মহিলা

শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার

শ্রীযুক্তা ইলা সেন

ঔর্বাগ্নি

...আমরা যে-অগ্নি জ্বালি, কাষ্ঠ-তৃণাদি ইন্ধন না পাইলে সে-অগ্নি জ্বলে না। ঔর্বাগ্নি নিরিন্ধন।...

প্রত্ন-মানব তিনটি নিসর্গজ অগ্নি অবগত ছিল। একটি ভূমিতে জাত, ভৌম অগ্নি; একটি অন্তরিক্ষে জাত, বিদ্যুদগ্নি; অপরটি দিব্যলোকে শাশ্বত অগ্নি, সূর্য।...ভৌম অগ্নি দ্বিবিধ। একটি শৈলের সন্ধিপথে নির্গত দাহ্য বাষ্প। কখন কখন ভৌতিক কারণে সে বাষ্প প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সে অগ্নি-স্থানকে জ্বালামুখী বলে। অপরটি আগ্নেয়গিরির অগ্নি। এই অগ্নি যুগান্তকারী কালানল ও সংবর্তক নামে খ্যাত ছিল।

ভূমণ্ডলে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে। কিন্তু অধিকাংশ গিরি সমুদ্রের দ্বীপে কিংবা সমুদ্রের নিকটস্থ ভূখণ্ডে বিদ্যমান। এশিয়া মহাদেশে কামাট্‌কাস্‌কা হইতে দক্ষিণে জাপান, ফিলিপাইন, সিলিবিস, যব সুমাত্রা হইয়া আন্দামান দ্বীপের প্রায় শত মাইল পূর্বে বঙ্গসাগরে বারেণ ও নরকোন্দম দ্বীপ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির সারি চলিয়া আসিয়াছে। আগ্নেয়গিরি হইতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প দ্রবীভূত অশ্ম (পাথর), এবং অশ্ম ও ভস্ম, এই ত্রিবিধ দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়। জলীয় বাষ্প দূর হইতে ধূমবৎ দেখায়। অশ্ম দ্রবের প্রচণ্ড তাপে গিরিমুখ জ্বালামালী মনে হয়। জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে পতিত হয়, এত যে মনে হয় সে গিরি জলপান করিয়াছিল। অন্তর গিরি হইতে অশ্মদ্রব উদ্‌গীর্ণ হয়। হইলে তাহা গিরির মুখের চতুর্দিকে শিখর নির্মাণ করে। দ্রব নির্গত না হইলে অশ্ম ও ভস্ম দ্বারাও গিরি নির্মিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি-বাতাসে তাহা দীর্ণ হইয়া পড়ে। শিখরও প্রায়ই ছিন্ন-শির হয়। কদাচিৎ শিখর হয় না। মধ্যস্থলে বিল অবশ্য থাকে। গিরিপার্শ্বেও বিবর থাকে। বয়সে আগ্নেয়গিরি ত্রিবিধ। কতকগুলি মৃত, উদ্‌গারের বয়স গত হইয়াছে; কতকগুলি সুপ্ত, কখন্ জাগিয়া উঠিবে বলিতে পারা যায় না; অপরগুলি জাগ্রত, সর্বদা ধূমায়মান।

ঋগ্বেদের ঋষিরা ত্রিবিধ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সূর্যাগ্নি সকল দেশেই সুলভ, কিন্তু সকল দেশেই বজ্রপাত হয় না. এবং সকল দেশেই ভৌম অগ্নি বিদ্যমান নাই। পুরাণ-মতে ঋষ ধাতুর অর্থ গতি হইতে ঋষি শব্দ উৎপন্ন। আদ্যকালে ঋষিরা যাযাবর ছিলেন। তখন তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে আসেন নাই। তখন তাঁহারা স্বদেশে স্বর্গে বাস করিতেন। তাঁহারা কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিলেন। শিলায় শিলা লেগে বিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কিন্তু কাষ্ঠের অরণি-জাত অগ্নি অক্লেশে শুষ্ক তৃণে সংক্রামিত করিতে পারা যায়। বোধ হয় এই হেতু তাঁহারা অগ্নি উৎপাদনের এই উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাত অগ্নিকে 'কুমার' বলিতেন। অগ্নি বিনা অন্ন পাক হয় না। সে অগ্নির যে নানা বিশেষণ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। শীতকালে অগ্নি-সেবন সুখকর; রাত্রিকালে বৃকাদি হিংস্র-পশু হইতে অজ-মেষ-গবাদি রক্ষা করিতেও অগ্নি চাই। অতএব অগ্নি পরমদেব; তিনি ত্রিধা মূর্তিতে ভূমিতে, অন্তরিক্ষে ও আকাশে বিরাজিত।

ঔর্বাগ্নি বা ভৌমাগ্নি অবশ্য বিস্ময়াবহ। পুরাণে ইহার উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে। হরিবংশের দুই অধ্যায়ে দুই উপাখ্যান আছে। ৪৫ অধ্যায়ে এক উপাখ্যান আছে। এটি মৎস্য পুরাণে অবিকল আছে। উপাখ্যানটি এই,—সত্য যুগে বৃত্রাসুর বধের পর দেবাসুরে তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল। অসুরদিগের নাম দানবও ছিল। দানবেরা মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিল। দেবরাজ তামস অস্ত্র দ্বারা রণভূমি তমসাবৃত করিয়া ফেলিলেন। সে অন্ধকারে কে দেবসৈন্য কে দানবসৈন্য নির্ণয় হইতে পারিল না। তখন ময়দানব মায়া দ্বারা যুগান্তকারী ঔর্বাগ্নির তুল্য উগ্র অগ্নি সৃষ্টি করিল। সে অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর হইল, কিন্তু দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইলেন, দেবরাজ বরুণকে সে অগ্নি নির্বাপিত করিতে অনুরোধ করিলেন। বরুণ বলিলেন, এই অগ্নি জল দ্বারা নির্বাপিত হইবার নয়। পূর্ব কালে ঊর্ব-ব্রহ্মর্ষির তপঃপ্রভাবে নিখিল জগৎ সন্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন দেব, ঋষি, মুনি এবং দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপু, ঊর্ব ঋষিকে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, ঋষিবংশের মধ্যে আপনার বংশ নির্মূল হইতে চলিল। আপনি একা, আপনার পুত্রাদি নাই...।" ঊর্ব উত্তর করিলেন, তিনি কৌমারব্রত বনবাসী. তাঁহার ত গৃহস্থাশ্রম নয়। আর, যদি অপত্য চাই, ব্রহ্মা মানসী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় দেহ হইতে পুত্র উৎপাদন করিবেন। অনন্তর ঊর্ব স্বীয় ঊরু অগ্নিতে নিবিষ্ট করিয়া এক কুশ দ্বারা ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার ঊরু ভেদ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নিশিখা উদ্‌গত হইল। এই অগ্নি ঊর্বের পুত্র, ঔর্ব। উৎপন্নমাত্র পুত্র পিতাকে বলিলেন, "আমি ক্ষুধায় পীড়িত, আমায় ত্যাগ করুন, আমি জগৎ ভক্ষণ করি।" তখন ব্রহ্মা আসিয়া ঊর্বকে বলিলেন, "তুমি সর্বলোকহিতকামনায় তোমার পুত্রের তেজ ধারণ কর, সমুদ্রের বদনস্বরূপ বড়বা-(অশ্বা) মুখে ইহার বাস, এবং জল ইহার হবিঃ-স্বরূপ অন্ন হইবে। তোমার এই পুত্র কালান্তক অনল হইবে।" হিরণ্যকশিপু এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ঊর্বের অনুরক্ত শিষ্য হইল। ঊর্ব প্রীত হইয়া দানবেশ্বরকে বিনা ইন্ধনজাত অগ্নিরূপ মায়া দান করিলেন। তাহার জীবদ্দশা পর্যন্ত ইহার প্রভাব থাকিয়া পরে বিলুপ্ত হইবে। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবরাজ চন্দ্রকে হিম বর্ষণ করিতে বলিলেন। সে হিমে দানবেরা নিপীড়িত হইতে লাগিল।

এই উপাখ্যান হইতে পাইতেছি—(১) ভূ-পৃষ্ঠের ঊরু সদৃশ কোন দীর্ঘ পর্বতে ঔর্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় এই পর্বতের নাম ঊর্ব ছিল। সেই হেতু তৎপুত্রের নাম ঔর্ব। অরণি-মন্থন না করিলে 'কুমার' জন্মিতে পারে না; এই হেতু মন্থনের ব্যপদেশ। তা ছাড়া বিলও চাই। (২) পরে সেরূপ অগ্নি সমুদ্রের কোন দ্বীপের গিরিতে দেখা গিয়াছিল। সে গিরির আকার অশ্বমুখতুল্য, ছিন্ন-শিরঃ শিখর। (৩) বোধ হয় ঔর্বের দেশে জল-বর্ষণ হয় না হিম-বর্ষণ হয়। (৪) পৌরাণিকেরা কথিত উপাখ্যানের কালের পৌর্বাপর্যে অবহিত হইতেন না। কিন্তু ঔর্ব যে অতি প্রাচীন কালের ঘটনা, তাহা 'সত্যযুগ' দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সত্যযুগ, পাঁজির সত্যযুগ নয়। বুঝিতে হইবে ত্রেতাযুগের পূর্বে। 'তারকাময় সংগ্রাম,' এই নাম হইতেই প্রকাশ, সে-সংগ্রাম আকাশে যজ্ঞ-পুরুষ বা কাল-পুরুষ নক্ষত্রে ঘটিয়াছিল। সে আমি

ছয় হাজার বৎসর পূর্বের কথা। সে কালেও সে দেশে হিরণ্যকশিপু দানবও ছিল।

হরিবংশের আর এক অধ্যায়ে (১০ম অঃ) ঋষির আর এক কর্ম পাইতেছি। এটি নানা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজ-চক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বাহু নামে রাজা ছিলেন। তিনি দ্যূত-পানাদি-ব্যসনাসক্ত ও অধার্মিক ছিলেন। শক যবন পারদ পহ্লব কাম্বোজ, এই পাঁচ জাতি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ জাতির সহিত সমবেত হইয়া বাহুকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। বাহু পত্নী সহ অরণ্যে পলায়ন করেন। দুঃখ ক্লেশে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী যাদবী তখন অন্তর্বত্নী ছিলেন। ভৃগুবংশজ ঔর্বের আশ্রমে বাহুরাজ-পুত্র সগরের জন্ম হয়। ঔর্ব সগরকে বেদশাস্ত্র অধ্যাপন করিয়া মহাঘোর আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। সগর সে অস্ত্রবলে পিতৃবৈরী পার্বত্য-ম্লেচ্ছ জাতিকে ক্ষাত্রধর্ম-বিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের অশ্ব পূর্বদক্ষিণ ভাগের সমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রবিষ্ট ও অদৃশ্য হইল। সগরের ষষ্টি-সহস্র পুত্র সে ভূমি খনন করিতে গিয়া কপিলরূপ বিষ্ণুর চক্ষুঃ-সমুখ তেজে চারিজন ব্যতীত সকলেই দগ্ধ হইল। পরে সগরের পৌত্রের পৌত্র ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

এই বৃত্তান্ত হইতে পাইতেছি, ঔর্ব ভৃগুবংশীয়, এই হেতু তিনি ভার্গব, এবং তাঁহার আশ্রম গান্ধার দেশের উত্তরে কিংবা পশ্চিমে ছিল। সে কালের গান্ধার, রামায়ণে নাম গন্ধর্বদেশ, বর্ত্তমান কাবুলদেশ।

সগর রাজার গুরু ঔর্ব, আর ভৌমাগ্নির ঔর্ব এক ছিলেন না। পুরাণ-পাঠকালে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ পরাশর প্রভৃতি নাম গোত্র-নাম। পূর্বকালে নাম ও গোত্র, অর্থাৎ প্রকৃত নাম ও বংশ নাম, এই দুই দ্বারা মানুষ চিনিতে পারা যাইত। বিখ্যাত বংশের ঋষিদের প্রকৃত নাম বলিবার প্রয়োজন হইত না, গোত্র নাম জানিলেই সমকালিক লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিত।

ঔর্ব এক গোত্র-নাম। প্রথম ঔর্ব এক ভৃগুর পৌত্র। কিন্তু ভৃগু এত পুরাতন যে তাঁহার পিতার নাম জানা ছিল না। হুতাশন হইতে তাঁহার জন্ম কল্পিত হইয়াছিল, কেহ অঙ্গিরারও জন্ম জানিত না। তাঁহার জন্ম অঙ্গার হইতে। যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, হুতাশন ও অঙ্গার হইতে উৎপত্তিরও সেই অর্থ। অর্থাৎ ভৃগু অগ্নি-উৎপাদনের, এবং অঙ্গিরা অঙ্গারে অগ্নি-রক্ষার উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বর্ণের মূল গোত্র বিবেচনা করিলেও ভৃগু ও অঙ্গিরা সমকালীন বলিতে পারা যায়। মহাভারতে শান্তিপর্বে (২৯৬ অঃ) আছে, মূল গোত্র চারিটি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু।

...বোধ হয়, এই চারি বংশ পিতৃভূমি প্রথম ত্যাগ করিয়া ইরাণে আসিয়াছিলেন। পরে আর তিনটি আসিয়াছিলেন। এই সাত বংশ পরে সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এই সপ্ত বংশ হইতে সপ্ত গণিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বায়ুপুরাণে (৬৫ অঃ) দেখিতেছি, ভৃগুর উত্তমবংশীয়া দুই ভার্যা ছিলেন, একটি হিরণ্যকশিপুর কন্যা, অপরটি পুলোমার কন্যা। তৎকালের দুই দানব রাজার কন্যা। ভার্গববংশে শুক্রের জন্ম। এই প্রাচীন সম্বন্ধহেতু তিনি অসুরদিগের গুরু হইয়াছিলেন। অঙ্গিরা (অঙ্গিরস্) বংশ হইতে আঙ্গিরস-বৃহস্পতি। ইনি দেবগণের গুরু ছিলেন। দুই-ই নীতিবেত্তা ও ধনুর্বেদ-কর্ত্তা ছিলেন। সগর-গুরু ঔর্ব শিষ্যকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইনিই এই অস্ত্রের আবিষ্কারক।

এই ঔর্ব কখন ছিলেন? যখন সগর রাজা ছিলেন। ইঁহার কাল-নির্ণয় কঠিন নহে। বৈবস্বত নামে এক ঋষি ছিলেন। পরে তিনি এক মনু হন। তাঁহার নয়টি পুত্র ছিল। এক পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু বংশের ভূ-পালগণ আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিতেন। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশের ভূ-পালগণের নাম আছে। দুই দশ-জনের নামে ও পর্যায়ে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় বড় একটা নাই। বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকু হইতে সগর ৩৮, বৃহদ্বল ৯৬, এবং ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা সুমিত্র ১২৩ পুরুষ। বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ নামে শূদ্র রাজা দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করেন। সেই সময় ইক্ষ্বাকুবংশের সুমিত্র ও কুরুবংশের শেষ রাজা ক্ষেমক বিনষ্ট হন। অতএব বৃহদ্বল হইতে সগর ৯৬−৩৮=৫৮ পুরুষ পূর্বে ছিলেন। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ (রাজ্যকাল নহে) গণিলে ৫৮×৩০ =১৭৪০ বৎসর। যদি খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১২৫০+১৭৪০=২৯৯০, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ত্রিসহস্রাব্দে সগর ছিলেন। উপরি-উক্ত পুরুষ-গণনা হইতে ভারতযুদ্ধ-কালও পাইতেছি। বৃহদ্বল হইতে সুমিত্রকে ধরিয়া ২৮ পুরুষ, অর্থাৎ ২৮×৩০=৮৪০ বৎসর। খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনিই নন্দবংশ ধ্বংস করেন। পুরাণমতে নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব আদি নন্দ মহাপদ্ম খ্রীঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে সুমিত্রকে নিহত করেন। অতএব ৮৪০+৪২৫=১২৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। (সূক্ষ্ম গণনায় ১২৬১।)

ইক্ষ্বাকুবংশের আরম্ভকালও পাইতেছি। সুমিত্র পর্যন্ত ১২৩×৩০ =৩৬৯০ বৎসর। সুমিত্র ৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। অতএব ইক্ষ্বাকু খ্রীঃ পূঃ চতুঃসহস্রাব্দে ছিলেন। *

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ চতুঃসহস্রাব্দ স্মরণীয় কাল। এই কালে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ণ, এবং মূলা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইত। মূলা নামের সার্থকতা এই। ইক্ষ্বাকুর কালে বৈবস্বত মনুর কাল। বৈবস্বত মনু হইতে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ। (এই মনু নামক কাল-পরিমাণ বর্ত্তমান পাঁজির নয়)। ইনি সপ্তম মনু। তাঁহার পূর্বে ছয় মনু-কাল গত হইয়াছিল, এইরূপ স্মৃতি ছিল। ছয় মনুতে ১৭০০ বৎসর। আমার অনুমানে, এই সময় আর্যগণ ইরাণে বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ের ইতিহাস প্রায় কিছুই নাই, দুই চারিটা শ্রুতিমাত্র ছিল। সে শ্রুতি-পরম্পরা যে কাহিনীতে পরিণত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই। পৌরাণিকেরা এক মন্বর কালের ঘটনা অন্য মনুতে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুরাণের মনু-গণনা হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত পাইতেছি। জ্যোতিষিক নিদর্শন হইতেও খ্রীঃ পূঃ ষট্-সহস্রাব্দের পূর্বের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। দক্ষ প্রজাপতি এই কালে ছিলেন।

আমরা কথায় কথায় ইরাণে চলিয়া গিয়াছি। এদিকে ভারতে সগর-পুত্রগণ কপিল ঋষির অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ

---

* বিষ্ণুপুরাণ মতে শ্রীরামচন্দ্র ৬২ পুরুষ, বায়ুপুরাণ মতে ৬৪ পুরুষ। দুই মতেই বৃহদ্বল ৯৪ পুরুষ। অতএব ভারত যুদ্ধের ৯৪−৬৩=৩১ পুরুষ=৯৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, অর্থাৎ ১২৫০+৯৩০= ২১৮০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে।

লিখিয়াছেন, "তিনি শরৎকালের নির্মল আকাশস্থিত সূর্যের ন্যায় তেজঃ দ্বারা সকল দিক অনবরত উদ্ভাসিত করিতেছিলেন।" এখানে জিজ্ঞাস্য, এই উপাখ্যান দ্বারা গঙ্গা অবতরণের প্রয়োজন-কল্পনা, না সত্য সত্য কোন নিসর্গজ-অগ্নির উৎপত্তি-ব্যাখ্যা। এই অগ্নি পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে দেখা যাইত। স্থানটি বঙ্গসাগরের কূলে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে। বর্তমানের বালুময় দেশে ভৌম-অগ্নির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পুরাণ মানিলে তখন গঙ্গা নদী সবে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছিলেন। সে স্থান রাজমহলের নিকটে। বোধ হয়, সেখানে এক জ্বালামুখী ছিল, সেটি কপিল ঋষি। রাজমহল হইতে বীরভূম পর্যন্ত অনেক উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। পূর্বকালে এখানে একটি আগ্নেয়-গিরি ছিল। কোলগং রেল ষ্টেশন হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে ও অল্প পূর্বে তিন-পাহাড়ীর পশ্চিমে এই গিরি অবস্থিত। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তাহার অগ্ন্যুদ্গার অসম্ভব নয়। তখন যে পূর্ববঙ্গ সাগর প্লাবিত ছিল তা নয়। পূর্ব্ববঙ্গ বরং উচ্চ ছিল। সাগরের একটা বিস্তীর্ণ খাড়ী রাজমহল পর্যন্ত থাকিলেই সেখানে সাগর-সঙ্গম। সগর রাজার সময়েই যে জ্বালামুখী থাকিতে হইবে,তাহাও নয়। পরবর্ত্তী কালে গঙ্গার মাহাত্ম্য-প্রচারের সময় কপিল ঋষির দর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সে কোন্ কালে তাহা বলিবার উপকরণ নাই। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশ যে বহু পূর্বকালেই আর্যগণের বিদিত ছিল,তাহার প্রমাণ আছে। রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র অনু। তাঁহার এক বংশধর, তিতিক্ষু, পূর্বদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে বলির জন্ম। বলির রাজধানী গঙ্গাতীরে ছিল। ইঁহার ঔরস পুত্র ছিল না। এক অন্ধ ঋষি দ্বারা তাঁহার পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে। প্রথমে অঙ্গ, পরে কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ। এই পাঁচ দেশ নামে তাঁহারা খ্যাত ছিলেন। অর্থাৎ 'অঙ্গাধিপ' নামে 'অধিপ' যোগ করা হইত না। নামগুলি আর্যদিগের প্রদত্ত। হয়ত রাজমহলের কাছে গঙ্গার বঙ্ক (বাঁক) হইতে বঙ্গ নাম। রাজমহলের পশ্চিমে অঙ্গ, পদ্মার উত্তরে পুণ্ড্র, গঙ্গা ও পদ্মার মাঝে বঙ্গ, বঙ্গের ও গঙ্গার পশ্চিমে সুহ্ম, এবং সুহ্মের পশ্চিমে কলিঙ্গ। কলিঙ্গ দেশ নর্মদা পর্যন্ত ছিল। ভারতযুদ্ধের অঙ্গাধিপ কর্ণ হইতে বলি ১৮ পুরুষ ঊর্দ্ধে। অতএব ১২৫০+(১৮×৩০)=১৭৮০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশে আর্যগণের যাতায়াত আরম্ভ বলিতে পারা যায়। এই বলি, দৈত্য বলি নহেন, কিন্তু আর্যক্ষত্রিয়ও ছিলেন না। তাঁহার বংশ বালেয় ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত ছিল। (মৎসপুরাণ)

ত্রিপুর-দাহ উপাখ্যানের উৎপত্তিও কি এক জ্বালামুখীতে? মহাভারতে (কর্ণ পর্ব, ৩৫ অঃ), হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে যে বর্ণনা আছে, কিয়দংশও সত্য হইলে তাহা রোমাঞ্চকর। নর্মদাতটে মহেশ্বর পর্বতের নিকটে অমরকণ্টক পর্বতে বাণ নামে এক ভীষণ অসুর ত্রি-পুর, তিনটি নগর, নির্মাণ করিয়া বাস করিত। কিন্তু আশ্চর্য, সে ত্রিপুর স্বীয় তেজে গগনে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিত (এই উৎপাত কি হইতে পারে?)। দেব ও ঋষি ভয়ে বিহ্বল হইয়া রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ব্যাপার ভয়ানক, রুদ্রকে সহস্র বৎসর চিন্তা করিতে হইয়াছিল। রুদ্র এক শর দ্বারা পর্বতের তিনটি শাখা বিদ্ধ করিলেন। ফলে 'সম্বর্তক' বায়ু বহিতে লাগিল, অগ্নি ধাবিত হইল, শিখর পুড়িয়া গেল, পাদপ উদ্যান গৃহ নরনারী জ্বলিতে লাগিল। এ যেন বিসুবিয়স গিরির ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পী ও হরকুলিনী নগরদ্বয়ের ধ্বংস। ত্রিপুরের দুইটি পুর বিনষ্ট হইয়াছিল। সেখানে রুদ্রকোটি ও জালেশ্বর শিব আছেন। এ কি তাঁহাদের অধিষ্ঠানের হেতুস্বরূপ ত্রিপুর-দাহ? কে জানে। অতি পুরাকালে দক্ষিণাপথ আগ্নেয় অগ্ন-দ্রবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইয়াছিল। কিন্তু সে কালের তুলনায় হিমালয় যে শিশু। ভারতবর্ষের ভূমি-বিদেরা সে আগ্নেয় প্রলয়ের অলজ্য সাক্ষী পান নাই। হয়ত পূর্বকালে এখানে ওখানে দুই একটা অগ্নি-মুখ ছিল।

মহাভারতে (আদি, ১৭৮-১৮১ অঃ) একটি জ্বালামুখীর বর্ণনা আছে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বৈরিতা চিরপ্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট করিয়াছিলেন। একটি শক্তির, পত্নীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। ইনি রাক্ষস দ্বারা পিতৃ ও পিতৃব্যদিগের বধ শুনিয়া রাক্ষসবধ-সত্র অনুষ্ঠান করেন। বশিষ্ঠ ঋষি পৌত্রের ক্রোধানল প্রশমিত করিলেন। সেই যজ্ঞে সঞ্চিত অগ্নি উত্তরে হিমালয় পার্শ্বে মহাবনে নিক্ষিপ্ত হইল। সেখানে অদ্যাপি সে অগ্নি পর্বে পর্বে রক্ষঃবৃক্ষ অশ্ম ভক্ষণ করিতে দেখা যায়।

কিন্তু হিমালয়ের আগ্নেয়গিরি নাই, পূর্বকালেও ছিল না। কোন জ্বালামুখী হইবে। পঞ্জাবে এক জ্বালামুখী তীর্থ আছে। কাংড়ার নাম জ্বালামুখী। অথবা স্থাননির্দেশে ভুল হইয়াছে। কারণ জ্বালামুখী থামিয়া থামিয়া জ্বলে না, অশ্ম ভক্ষণও করে না। হিমালয়ের পশ্চিমে বলিলে ঊর্বপর্বত পাইতাম। হিমালয়ের পশ্চিমে ইহার অর্থ, হিমালয়ের সমসূত্রে নয়।

বশিষ্ঠ ঋষি পরাশরের ক্রোধ শান্তি নিমিত্ত ঔর্ব-উপাখ্যান শোনাইয়াছিলেন। পূর্বকালে কৃতবীর্য নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ভার্গবদিগের যজমান। রাজা এক যজ্ঞ সমাপনান্তে পুরোহিতদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তির পর তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের অর্থাভাব ঘটে। তাঁহারা ভার্গবদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন ভার্গব ভূমিগর্ভে ধন নিক্ষিপ্ত, কেহ ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন, কেহ বা অল্প স্বল্প ক্ষত্রিয়দিগকে দান করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা ক্রোধান্ধ হইয়া ভার্গবদিগকে সবংশে বধ করিলেন, গর্ভস্থ শিশুও রক্ষা পাইল না। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ হিমালয়ে পলায়ন করিলেন। এক ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়ভয়ে স্বীয় ঊরুদেশে গর্ভধারণ করিলেন। আর এক ব্রাহ্মণী ভয়ে ক্ষত্রিয়দিগকে নির্জনে সে গুপ্ত গর্ভ বলিয়া দিলেন। ক্ষত্রিয়েরা আসিলে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর ঊরু বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইল। তাহার তেজে ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হইয়া গেল। তখন তাহারা ব্রাহ্মণীর পদানত হইল, এবং ভার্গব ঔর্বের প্রসন্নতায় দৃষ্টি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ঔর্বের ক্রোধ শান্ত হইল না, সর্ব-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। পিতৃগণ আসিয়া বুঝাইলেন। ঔর্ব স্বীয় তেজ মহাসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। সে অনলজ্বালা উদ্গারী মহৎ অশ্বশিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্র জল পান করিয়া থাকে।

এই উপাখ্যান হইতে পাইতেছি, বহু পূর্বকালে পারস্য দেশে ভার্গবেরা ঔর্বাগ্নি দেখিয়াছিলেন। তদন্তর সে অগ্নি সমুদ্রে অশ্বমুখ নামক আগ্নেয়গিরিতে দেখা গিয়াছিল। আরও পাইতেছি, ঊর্ব ঋষির অপত্য বলিয়া ঔর্ব নাম হয় নাই, ঊরু হইতে জাত বলিয়া নাম ঔর্ব। অবশ্য মানুষের ঊরু হইতে পারে না; ঊরু-সদৃশ পর্বত বুঝিতে হইতেছে। সংস্কৃত কোষে 'ঊরু' 'উরু' দুইটি শব্দ আছে। 'উরু', অর্থে বিস্তীর্ণ; স্ত্রীলিঙ্গে 'উর্বী' পৃথিবী। কিন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ উকার ভেদ সকলে করিতেন না। ঊর্বের পুত্র, ঔর্ব। হ্রস্ব উকারও আছে। 'উর্বরা', 'ঊর্বরা' দুই বানানই পাওয়া যায়। অতএব ঊরু অর্থে পর্বতও আসিতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো দ্বীপে বড়বা দৃষ্ট হইয়াছিল? রামায়ণে (কি। ৪০ অঃ) সে দ্বীপের নাম আছে। সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর (অনার্য, মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন, "পূর্বদিকে সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ ও সুবর্ণ-দ্বীপ (সুমাত্রা) অন্বেষণ

করিবে। ব্রহ্মা জলৌঘ-সাগরে ঔর্ব ঋষির কোপজ তেজঃ দ্বারা সর্বভূতভয়াবহ বৃহৎ বড়বামুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।'

পূর্বে দেখিয়াছি, মালয় দ্বীপের নিকটস্থ সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে। ইং ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যস্থিত সমুদ্রে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎক্ষেপ হইয়াছিল। শিখরের এক পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুই তিন বৎসর পর্যন্ত তাহা হইতে উদ্গত ভস্ম সূক্ষ্ম রজোরূপে আবহে দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ গিরিকে অশ্বমুখ মনে করা স্বাভাবিক বটে। প্রাচীনকালে সাদৃশ্য দেখিয়া নামকরণ হইত। বড়বা অর্থে অশ্বমুখা কৃতি দ্রব্য বুঝাইত। সংস্কৃত সাহিত্যে নামকরণের এই রীতির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও আছে, ইদানী আমরা সেই রীতি ভুলিয়া যাইতেছি। "দ্বারে দ্বারে সিংহ আছে" বলিলে বুঝি সিংহ-মূর্তি আছে। বড়বা শব্দে অশ্বা, ও অশ্বমুখাকার দুই-ই বুঝায়। অশ্বা পুত্র প্রসব করে, অশ্ব করে না। এই হেতু বড়বা স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার এক নাম বামী, যে বমন করে, উদ্গীরণ করে। "ত্রিকাণ্ডশেষ" কোষে (১২শ খ্রীষ্ট শতাব্দের পূর্বের) বড়বাগ্নির অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে একটি নাম 'বাণিজ'। বাণিজ শব্দের প্রচলিত অর্থ, বণিক। বোধ হয় তাহারা বড়বাগ্নির বৃত্তান্ত প্রচার করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে জ্বালামুখী আছে, আগ্নেয়গিরি নাই। শোনা যায়, ইং ১৭৫৬ সালে পণ্ডিচেরীর নিকটস্থ সমুদ্রে আগ্নেয় উৎক্ষেপে একটা চড়া জাগিয়াছিল। পরে সেটা নিমগ্ন হইয়াছে। আরাকান প্রদেশের নিকটস্থ রামড়ি দ্বীপে কর্দম-গিরি আছে। কখন কখনও তাহা হইতে ধূমও নির্গত হয়। কিন্তু সেটা বড়বা নয়। হিমালয়ে নাই। নিকটবর্তী দেশের মধ্যে বেলুচিস্থানের পশ্চিমে পারস্যে দুইটি আছে। এক পর্বতের উত্তরে একটি, দক্ষিণে অপরটি। দক্ষিণেরটির নাম কু-ই-বস্মন্, বসমনের (ভস্মনের ?) পর্বত, ১১।১২ হাজার ফুট উচ্চ। এটি এখন সুপ্ত। উত্তর-দিকটির নাম কু-ই-তফ্তন্, জ্বলন্ত পর্বত, ১৮ হাজার ফুট উচ্চ (অবশ্য পর্বতপাদ হইতে এত নয়)। এটি জাগ্রত। ইহাতে তিনটি শৃঙ্গ আছে। বোধ হয় এই পর্বত ঔর্ব উপাখ্যানের উক্ত এবং ভস্মন গিরিতে ঔর্বাগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল। আরও বোধ হয় এককালে এই পর্বতের নিকটে ভার্গবদিগের বাস ছিল। ইরাণের মধ্যে উত্তম স্থানও বটে। রাজা কৃতবীর্য হৈহয়-বংশীয় ছিলেন। সগর রাজার উপাখ্যানে পাইয়াছি, হৈহয় জাতির আদি বাস কাবুল। কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য-অর্জুন নামে খ্যাত। ইনি জব্বলপুরের দক্ষিণে নর্মদাতটে মাহিষ্মতী পুরী করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কৃতবীর্যের মৃত্যুর পর ইনি মধ্য-ভারতে আসিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হৈহয় স্বদেশেই ছিলেন। ভার্গববংশ তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। অতএব এই উপাখ্যানেও পাইতেছি, ভার্গবদিগের বাস বর্তমান ভারতসীমার পশ্চিমে ছিল। বস্তুতঃ পারস্য পর্যন্ত ভারতের সীমা ছিল। বেলুচিস্তানে সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ পর্যন্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। ইহারই পশ্চিম পারে ঔর্ব পর্বত।

কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের স্বদেশ হইতে একেবারে ইরাণের উক্ত পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে আসেন নাই। বোধ হয় প্রথমে ইরাণের পশ্চিমোত্তর ভাগে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কাস্পীয়ান হ্রদ অধিক দূরে নয়। এই হ্রদের দক্ষিণে একটি, পশ্চিমে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। দক্ষিণেরটি ঋষিদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেটি বড়বা নয়। তাঁহারা কি যবদ্বীপেই প্রথমে বড়বা দেখিয়াছিলেন? পারস্যসাগরে বড়বা নাই। পূর্বদিকে মাদাগাস্কার দ্বীপে ছিল, এখন উহার অদূরদ্বীপে আছে। লোহিত-সাগরেও ছোট ছোট দ্বীপে ছিল। ঋষিগণ নানা দিগ্‌দেশে গিয়াছিলেন। হয়ত সেখানে বড়বা প্রথম দেখিয়াছিলেন।...

বায়ুপুরাণ দেখি। লিখিত আছে (৩৮ অঃ), "সুবক্ষ ও শিখী শৈলের অন্তরালে এক বিস্তীর্ণ শিলাতল আছে। উহা নিত্য তপ্ত মহাঘোর, দুস্পর্শ, রোমহর্ষণ, সর্বপ্রাণীর অগম্য, সুদারুণ। উহার মধ্যস্থলে ত্রিংশৎ যোজনব্যাপী সহস্র-সহস্র জ্বালাময় সুদারুণ বহ্নিস্থান আছে। সে অগ্নি অনিন্ধন। সেখানে দেব হুতাশন সর্বদা জ্বলিতে-ছেন, তিনি লোক-সম্বর্তক অনল।" বর্ণনাটি ভৌমাগ্নির। জ্বালা-মুখীর বোধ হয় না। বিশেষতঃ সম্বর্তক নাম আছে। সম্বর্তক অগ্নি, প্রলয়কালীন অগ্নি। এইরূপ সম্বর্তক মেঘ, প্রলয়কালীন জলবর্ষী মেঘ। দেশটি কোথায়? সুবক্ষ ও শিখীশৈলের অন্তরালে। এই দুই পর্বত কোথায়? কৈলাস পর্বতের পশ্চিম দিকে। কৈলাস কোথায়? হিমালয়ের পশ্চিমে ও উত্তরে। বোধ হয় বর্তমান নাম মীর পঞ্জাল। কৈলাসের পশ্চিমে বলিলে, পুরাণে পশ্চিম রেখায় বুঝায় না। শিখী, যাহার শিখা, চূড়া আছে। পারস্যের কু-ই-তফ্তন্ ত্রিশিখ। কৈলাসের পশ্চিমে আর কোন সুদারুণ অগ্নিস্থান নাই।

মহাভারতে লিখিত আছে (ভীষ্মপর্ব, ৭ অঃ), "মাল্যবান্ পর্বতের শিখরদেশে সম্বর্তক নামক কালাগ্নি নিরন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।" কিন্তু মাল্যবান্ পর্বত কোন্‌টি? এখানে বলা আবশ্যক, এক প্রাচীন কালে তৎকাল-জ্ঞাত পৃথিবী চতুর্দ্বীপা ও চতুঃসাগরা মনে করা হইত। তখন 'পামীর' সানুদেশ মেরু, এবং পরে ইলাবৃত হইয়াছিল। ইলাবৃত, চারি পর্বতে বেষ্টিত। মেরুদেশের পশ্চিমের পর্বতটি মাল্যবান্। ভাস্করা-চার্য্য ইহাকেই মাল্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। তদনুসারে মাল্যবান্ দীর্ঘ হইয়া হিন্দুকুশের সহিত মিলিয়া আফগানিস্থান ভেদ করিয়া পারস্যের পূর্বসীমা দিয়া সাগর-নিকটবর্তী হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ লিখিয়াছেন, (১১৩ অঃ), মাল্যবান্ পর্বত পশ্চিমদিকে সাগর পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার পশ্চিমে কেতুমাল দ্বীপ। অতএব পারস্যের আগ্নেয়গিরি।

দ্বিতীয় উল্লেখ বড়বার। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, (৪৬ অঃ) "চক্র, বলাহক, ও মৈনাক শৈল আয়ত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে পড়িয়াছে। চক্র ও মৈনাকের মধ্যে সম্বর্তক নামে অগ্নি আছে। সে অগ্নি সমুদ্র-জল পান করে। ইনি বড়বামুখ শ্রীমান ঔর্ব।" এটি যে সমুদ্রপায়ী বড়বানল, তাহা স্পষ্ট আছে। কোথায়? মৈনাক পর্বতের নিকটে। যে সকল পর্বত দীর্ঘ হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট, তাহাদের নাম মৈনাক। বড়বা সমুদ্র-নিমগ্ন অগ্নি নয়, মৈনাকও সমুদ্রনিমগ্ন পর্বত নয়। সমুদ্র-নিমগ্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার উপরে দেখা যাইবে না। পৌরাণিক বলিতেছেন, কিম্পুরুষ বর্ষের (তিব্বতের) মহানদী সকল পূর্বদিকে লবণ-সাগরে পড়িয়াছে। তার পর বারটি পর্বতের নাম করিয়া বলিতে-ছেন, এই সকল পর্বত লবণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকলের একটির বিশেষ নাম মৈনাক। ত্রিপুরা, আরাকান, টেনাসিরম্, মালয়, সুমাত্রা, বর্ণিও প্রভৃতির পর্বতগুলি দক্ষিণে সমুদ্রে প্রবিষ্ট। বোধ হয় মৈনাকটি আরাকান পর্বত। আর মনে হয়, এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। পূর্বকালে পশ্চিমে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল, তেমনি পূর্বদিকে মালয়দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। ইহার পরে ভারতবর্ষের নিকটস্থ ও

সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত অনেক অন্তর-দ্বীপ ভারত-দ্বীপ নামে আখ্যাত ছিল। বড় দ্বীপের নিকটস্থ ছোট ছোট দ্বীপকে অনুদ্বীপ বলিত। বহু ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশিষ্ট বর্হিণ দ্বীপ (মার্গুই দ্বীপপুঞ্জ)। তারপর অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ (যবদ্বীপ), মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ, এই ছয় ও বর্হিণ দ্বীপ, এই সাত ভারত-দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের বর্ণনায় সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ এই। দেশের নাম যে কত পরিবর্তন হয়, তাহা এই সকল নামে দেখা যাইতেছে। মলয় ও যম বা যব, এই দুইটি চিনি ত পারা যাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৎস্যপুরাণকার এখানে বড়বার অস্তিত্ব শোনেন নাই। বায়ুপুরাণও শোনেন নাই।

কিন্তু আর একস্থানে দেখিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ লিখিয়াছেন (৪৯ অঃ), শাল্মল দ্বীপে মেঘবর্ণ মহিষ পর্বত আছে। সেখানে বারিজ মহিষ-অগ্নি বাস করে। মৎস্যপুরাণ লিখিয়াছেন (১২২ অঃ), কুশদ্বীপে মেঘবর্ণ মহিষপর্বত আছে। ইহা হরি-পর্বত নামেও খ্যাত। সেখানে মহিষ নামক জলজ অগ্নির নিবাস। এখানে দেখা যাইতেছে, দুই পুরাণেই পর্বতের বর্ণনা এক। কিন্তু একে শাল্মলদ্বীপে, অন্যে কুশদ্বীপে বলিয়াছিলেন। পর্বতটিতে আগ্নেয়গিরি আছে, এবং কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণস্থ গিরিটি মনে হয়। এটি এলবারুর পর্বতের অঙ্গ। এই দেশ শাল্মল ও কুশ, দুই দ্বীপেই বলা যাইতে পারে। আর একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। মহিষ পর্বত বারিজ অগ্নিস্থান হইলেও ইহাকে বড়বা বলা হয় নাই। হয়ত ইহার আকার বড়বা তুল্য নয়।…

(ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩৩৭) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

—

সমাজ-গঠনে শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজনীয়তা

…আমাদের মায়েরা অনেকেই জানেন না কিভাবে শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখা যায়, কিভাবে তাকে প্রথমে ছোটখাটো রোগের—যা পরে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে,—হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এ-সব ভেবে দেখ্‌লে নারী-শিক্ষার প্রয়োজন কতখানি, তা সহজেই বুঝা যায়। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেক পরিমাণেই মায়ের উপর নির্ভর করে।…

বস্তুতঃ সন্তানের দেহ ও মনকে মানুষের মত ক'রে গড়ে তুল্‌তে নারীর প্রয়োজনই বেশী। ইউরোপের তুলনায় আমাদের এ দেশের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কত বেশী, তাহা মৃত্যু-বিবরণী পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এর প্রধানতম কারণ শিশু-পালন সম্বন্ধে মায়ের অনভিজ্ঞতা।…

আমাদের সমাজে মায়েদের এত বেশী পর্দানশীন করে রাখা হয়েছে যে, তাঁদের কাছে সুস্থ শিশু আশা করা বাতুলতা মাত্র।…

আমাদের দেশে, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে, সমাজের শ্রেষ্ঠ রত্ন শিশু আলো-বায়ুহীন ক্ষুদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে; কারণ অনেকেই প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে একটা যেমন-তেমন ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়। তার উপর অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির দরুণ গোঁড়ামির জীবন্ত-মূর্ত্তি অশিক্ষিত ধাইয়ের সন্তানপ্রসবের জ্ঞানের অথবা অজ্ঞানতার উপর নারীকে তার জীবনের ভীষণ পরীক্ষার সময় ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের শুশ্রূষার অধীনে মলিন দুর্গন্ধ বিছানায় শুয়ে প্রসূতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ, শিশুকে অন্ততঃ প্রথম চল্লিশ দিন কাটাতে বাধ্য হ'তে হয়। এমনিই তো নারীর জীবনীশক্তি নানা প্রকারে ক্ষীণ হয়ে থাকে; তার উপর সন্তান-প্রসবের পর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। জন্মাবার পর শিশুর জীবনীশক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে; এই সময়টাতে মায়ের ও শিশুর—উভয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকে; সুতরাং এ সময়ে পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতা অতিশয় প্রয়োজন।…

আমরা অনেক সময়ে ইংরেজ শিশুদের স্বাস্থ্য দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। আমাদের শিশুর চেয়ে তাদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ কি? ইংরেজ-শিশুর মা শিক্ষিতা; সন্তানের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের মায়ের অপেক্ষা তারা অনেক বেশী অভিজ্ঞ।…

নারীকে মূর্খ করে রাখাতে জাতির মায়েরা আজও যে সন্তান-পালন শিখ্‌তে পারছেন না, এ-শুধু মাতৃজাতির পক্ষে লজ্জাকর নয়, দেশের ও সমাজের পক্ষেও বড় লজ্জার বিষয়।…

বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষিতা নারী নাই, এ-কথা বল্‌লে বোধ হয় বেশী অত্যুক্তি হয় না। অথচ বাংলার মুসলিম সকলেই যে অশিক্ষিত, এ-কথা বলা ভুল। শিক্ষিত ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী অশিক্ষিত,—এমন মিলন সুখের হওয়ার আশা বাতুলতামাত্র। আমরা বুঝতে পারলেও ভুলে থাকতে চেষ্টা করি, সাংসারিক জীবনে শিক্ষিত স্বামীর শিক্ষিত স্ত্রী হওয়া কতখানি প্রয়োজন।…আমি একথা অস্বীকার করতে চাইনে, যে, নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে। কিন্তু মাতৃত্ব তার পূর্ণতার একটি মাত্র অলঙ্কার, কিন্তু তার পূর্ণতার প্রধান অলঙ্কার তার নারীত্ব, যা দিয়ে সে আনন্দ দিতে পারে।…স্ত্রী-হিসাবে নারীর কর্ত্তব্য শুধু স্বামীর ভোগ্যবস্তু হয়ে থাকাই নয়। একটা intellectual happines-(জ্ঞানবৃত্তির আনন্দবিধানই) দেওয়াই তাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় এত কম, যে, আর্ট ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই; আর অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, এ-সব বিষয়ে তো 'ক' অক্ষর গো-মাংস বললেই চলে। বিবাহিত নারীর প্রধান কর্ত্তব্য স্বামীর যাতে কৌতূহল, তাতে কৌতূহলী হওয়া, তার বিফলতার সময় উৎসাহ দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা, তার আলোচনার বিষয়ে যোগ দেওয়া, সর্ব্বোপরি তার জীবনের প্রধান আদর্শকে সফল করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করা। এগুলির অভাব ব'লেই নারীর ভিতরে প্রকৃত চিত্তবিনোদনের খোরাক পাওয়া যায় না, এবং আমার বিশ্বাস, এইজন্যেই আমাদের সমাজে নরনারীর বিবাহিত জীবন এত একঘেয়ে ও অসুখী।…অনেকেই হয়ত মনে করেন যে, মেয়েলোক শিক্ষিত হ'লে সংসারের কাজ করতে চাইবে না, সংসারের কাজে তাদের মন বসবে না, তারা বিবিয়ানায় মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি অনেক অশিক্ষিত বড়লোক ও দরিদ্র নারীর গৃহ দেখেছি;—বড়লোক অশিক্ষিত গৃহিণী কম বিবিয়ানা চান না, বরং একটু বেশীই চান! জলটুকু পর্য্যন্ত নিজেরা গড়িয়ে খেতে চান না, অন্যের সেবা করা তো দূরের কথা। সুগৃহিণী তো তাঁরা মোটেই নন, উপরন্তু কুড়েমির জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কোন কাজকর্ম্ম না করাতে, কেবল বসে ও শুয়ে থাকাতে, শরীরটিও অনেকের বাতে বা অন্যান্য রোগে পঙ্গু করে ফেলে। তাঁরা যদি সমাজের লোকের নিকট ক্ষমার্হ হন, তবে সুশিক্ষিতা নারীরা যদি সংসারের প্রতি টানটা একটু কমই দেখান, তাঁরাই বা কেন ক্ষমা পাবেন না? তবে এটাও ঠিক যে, শিক্ষিতা নারী কুড়েমির প্রশ্রয় অত বেশী দিতে পারেন না; কারণ শিক্ষা তাঁদের ভিতর এমন একটা প্রেরণা ও পিপাসা জাগায় যে, তাঁদের কখনই দিনরাত বিছানায় শুয়ে কাটাতে দেয় না। তাঁরা হয়ত তেমন সুগৃহিণী হন না, কিন্তু অন্ততঃ সমাজসেবায়, নারী-শিক্ষায়, বা রাজনৈতিক বিষয়ে, একটা কিছু নিয়ে জীবনটা তাঁরা কাজের মধ্যে কাটাতে চাইবেনই।…

...আমাদের মেয়েদের মাতৃগৃহেই বলুন, আর স্বামীর গৃহেই বলুন, এতখানি পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় যে, তারা কেবল সংসারে পরের একটা গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইউরোপে ১৪।১৫ বছরের কোন ছেলে বা মেয়েই কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকে না, বা থাকতে চায় না। নরনারী সমানভাবে শিক্ষিত হয়, সমানভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়; কাজেই সেখানে প্রম-বিভাগ ব'লে জিনিষটা খুব কমই দৃষ্ট হয়, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত লোকদের ভিতর। সেখানে ছেলেমেয়ে সমানভাবে একসঙ্গে এক আপিসে, এক কার্য্যে স্কুল কলেজে কাজ করছে এবং উপার্জ্জন করছে। এই কারণে সেখানে আমাদের মত গরীব কেউ নেই। আজীবন পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকাতে নারীর আত্মসম্মান তো নেই-ই, উপরন্তু সংসারে একটা বিরাট অভাবের আমদানি হয়েছে। পুরুষকেই কেবল চাকুরী ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে আর নারী তার সহধর্ম্মিণী মাত্র, কিন্তু সহকর্ম্মিণী হবেন না, এমন হীন আকাঙ্ক্ষা নারীর মন থেকে শিক্ষার প্রভাবে দূর করতে পারলে আজ আমাদের সমাজেও অর্থের অভাবে এত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত না, এবং অকালে আত্মহত্যার দৃষ্টান্তও দেখা যেত না।...

আমরা ভুলে যাই, ছেলেমেয়েকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে মানুষ করা যেমন বিজ্ঞান-বিগর্হিত, তেমনিই আবার নৈতিক জ্ঞানের অভাবসূচক। এ তত্ত্ব ইউরোপের বড় বড় মনোবিজ্ঞানবিদরা আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁরা sex complexএর (নারী পুরুষ ভেদ সম্বন্ধে সজ্ঞানতার) প্রধান কারণ কি তা দেখিয়ে নারী-পুরুষের একত্র শিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন করছেন। আমি নিজেই অনেক জায়গায় স্কুলে ছেলেমেয়েদের এক-সঙ্গে পড়তে দেখেছি এবং নিজেও পড়েছি। শৈশব থেকেই যদি স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে শিক্ষা পায়, খেলা করতে পায়, তাহ'লে তাদের sex complexএর অনেক সমস্যারই সমাধান হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও কম হয়—একটা স্বাস্থ্যময়, পবিত্রতাময় আবহাওয়া গড়ে উঠতে পারে। মনোবিজ্ঞান এই বলে। এ শুধু কথার কথা মাত্র নয়—হাতেকলমেও আজ ইউরোপে এর সুফলের অনেকটা পরিচয় পাওয়া গেছে।...আমরা নীতির দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের হুকুম ব'লে মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে একত্র পড়তে, খেলা ও কাজ করতে দেওয়া দূরে থাকুক, তাকে অন্তঃপুরের সীমার বাইরেই আনতে চাই নে। কাজেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেই পর্দ্দা যাবে, এই ভয়ে উপযুক্ত শিক্ষারও ব্যবস্থা করিনে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এতে কেবল নারীর শরীর ও মনের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিনে, সমাজে নানা পাপের ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজের পথ প্রশস্ত করে দেই।...

সমাজসেবকদের এক্ষণে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কাজ করতে হবে। নারীর মানসিক বৃত্তির বিকাশের পথ মুক্ত করে না দিতে পারলে সমাজের সেবা অপূর্ণ থেকে যাবে। যদি নারী-বৃত্তিগুলো চেপে রাখা হয়, তবে একদিন সেগুলো ফেটে বেরোবেই—এই হচ্ছে তাদের প্রকৃতি, এবং এর এমন একটা প্রতিক্রিয়া আসবে, যে, তখন তা সামলান দায় হয়ে পড়বে।...

(সওগাত—কার্ত্তিক, ১৩৩৭) ফজিলতুন্নেসা

বলিদান

একরামুদ্দিন

১

"বাপজান, আমার বিবাহের জন্য এখন ব্যস্ত হইবেন না। আপনি আমার জন্য যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, তিনি আমার যোগ্য নহেন।" চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা সখিনা পিতা আমীর সাহেবের নিকট অস্পষ্টস্বরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া লজ্জাবনতমুখী হইলেন। আমীর সাহেব ক্ষুদ্র একটি বালিকার মুখে এই কথা কয়েকটি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এতটুকু মেয়ে বলে কি!

আমীর সাহেবের জন্ম অভিজাত বংশে। তিনি আরবী ভাষাবিৎ একজন বড় মৌলানা। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ নবাব সরকারে কি একটা বড় কাজ করিতেন। তাঁহাদের সেই বংশ হইতে অনেকগুলি ঘর হইয়া এখন চারি পাঁচটা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা বংশগৌরবে বাংলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইঁহারা নিজেদের ভায়াদদের মধ্যে ছাড়া অপর কোন বংশে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন না। যাঁহারা নিজ ভায়াদদের বংশে পাত্র বা পাত্রীর অভাবে অপর বংশে পুত্র বা কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মান নষ্ট হইয়াছে। যে ভায়াদগণের বংশগৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁহারা নষ্টগৌরব জ্ঞাতিদের অভিজাত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিয়াছেন।

মৌলানা আমীর সাহেব বংশগৌরবে অক্ষুণ্ণ।

তাঁহার পিতা অভিজাত সম্প্রদায়ে পাত্র না পাইয়া কন্যা মুন্না বিবিকে চিরকুমারী রাখিয়া গিয়াছেন। মুন্নার বয়স এখন প্রায় ষাট বৎসর। আমীর সাহেবের ঘরে গৃহিণী-পণা করা ছাড়া তাঁহার অন্য কিছু কাজ নাই। তিনি বহু যত্নে এবং বহু চেষ্টায় আমীর সাহেবের সংসার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, না হইলে এতদিনে আমীর সাহেবের বিষয়সম্পত্তি সমস্ত মহাজনের ঘরে ঢুকিত।

আমীর সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমীনা বিবির বয়স যখন বার বৎসর তখন অভিজাত সম্প্রদায়ে কোনো পাত্রই ছিল না। কাজেই তাহারও ভাগ্যে চিরকৌমার্য্যই ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এমনি দিনে অভিজাত বংশের একজনের গৃহে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। আমীর সাহেবের আশা হইল যে, বোধ হয় আমীনার ভাগ্যলিপির চিরকৌমার্য্য এইবার ঘুচিবে। আমীনা শিশু বালকটি অপেক্ষা বার বৎসরের বড় হইলে কি হয় তাহার সহিত বিবাহে আমীনার ত আইবুড় নাম ঘুচিবে, বংশের গৌরবও অক্ষুন্ন থাকিবে।

সেই দুগ্ধপোষ্য বালকের দশ বৎসর বয়সে বাইশ বৎসরের পূর্ণযৌবনা আমীনার শুভ-পরিণয় হইল। আমিনার আইবুড় নাম ঘুচিল এবং শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলের সম্মান অক্ষুন্ন রহিল।

প্রথমা কন্যা আমীনা বিবি ত উদ্ধার হইয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়া কন্যা সখিনা বিবির উদ্ধারের উপায় না খুঁজিয়া পাইয়া আমীর সাহেব বড়ই চিন্তান্বিত ছিলেন। সখিনা বিবির বয়ঃক্রম যখন ত্রয়োদশ বৎসর তখন একদিন ষাট বৎসর বয়স্ক জব্বার সাহেবের স্ত্রীর হঠাৎ কাল হইল। আমীর সাহেবের আশা হইল এইবার তবে সখিনা বিবির ভাগ্যও প্রসন্ন হইয়া উঠিবে। জব্বার সাহেবের বংশগৌরব এখনও বজায় আছে। সখিনা বিবি বালিকা বধূরূপে তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিবে এবং স্বামীর বংশগৌরবের দীপ্তিতে পিতৃগৃহও আলোকিত করিবে। আমীর সাহেব বিপত্নীক, কাজেই অন্দর হইতে তাহার প্রস্তাবে কোন আপত্তি উঠিবার কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু যে দিক হইতে কোনো আপত্তির কথা তিনি স্বপ্নেও মনের মধ্যে স্থান দেন নাই, সেই দিক হইতে আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সখিনা বিবাহের কি জানে? সখিনার উদ্ধারের জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, আর সেই সখিনাই বিবাহে আপত্তি তুলিতেছে!

২

আমীর সাহেব ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ভগ্নী মুন্না এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা আমীনাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি সৎপাত্রে সখিনার বিবাহের ঠিক করিতেছি, ইহা তোমরা জান। ভাগ্যে জব্বার সাহেবের পত্নীর কাল হইয়াছিল, নচেৎ অভিজাত বংশে আর এমন পাত্র ছিল না যে, তাহার সহিত সখিনার বিবাহ হয়। জব্বার সাহেবও যথেষ্ট আত্মত্যাগ দেখাইয়া এই বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন। সখিনার বিবাহে আমি পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কারএবং পাত্রকে এক হাজার টাকার ঘড়ি চেন পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার হইয়াছি। সমস্তই প্রস্তুত, এমন সময় মেয়েটার কথা দেখ না! সে আমাকে বলে কি না যে, যে-পাত্র তাহার জন্য স্থির করিয়াছি, সে তাহার যোগ্য নহে—সে বিবাহ করিবে না। বংশগৌরবে জব্বার সাহেবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘর আর দ্বিতীয় নাই। কোন আক্কেলে সে বলে যে পাত্র তাহার যোগ্য নহে। সে সেদিনকার মেয়ে, এখনও তাহার গায়ে আঁতুড়-ঘরের গন্ধ যায় নাই, সে বিবাহের কি জানে? বড় লজ্জার কথা! কখনও শুনি নাই যে, মুসলমানের ঘরের মেয়ে নিজের বিবাহে মতামত প্রকাশ করে। তোমরা তাহ'কে ডাকিয়া বুঝাইয়া বল। আমি তাহার কোনো কথা শুনিব না, জব্বার সাহেবের সহিতই তাহার বিবাহ দিব।"

আমীনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মুন্না বলিল, "বলিলেই হইল যে বিবাহ করিব না? যখন ছাগল ছানাকে কোরবানি দেওয়া হয়, তখন সে কি নিজের ইচ্ছায় গলা বাড়াইয়া দেয়? এমন মহাপুণ্যের কাজ ত ছাগলছানার হাত পা ধরিয়া মুখ বাঁধিয়াই করা হয়। সখিনাকে তাহাই করা যাইবে। কোনো চিন্তা নেই। কোরবানি দেওয়ার সময় ছাগলের মতামত আবার কে জিজ্ঞাসা করে?"

আমীনা কিছু বলিল না। পিসি বিদ্রূপ করিতেছে কি না ভাবিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমীর সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ বোন্‌, ঠিক বলেছ, সে ছেলেমানুষ—সে কি জানে?" এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন এবং জব্বার সাহেবের সহিত সখিনার বিবাহে কিরূপে উভয়েরই বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাত দিনের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। দুইটি বড় বংশের সম্মান অটুট থাকিবার এমন বন্দোবস্ত হওয়ায় অভিজাত সম্প্রদায় আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

৩

আজ সখিনার বিবাহ। আলোকমালায় সমস্ত গ্রামখানি সুসজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এত আলোকের মধ্যেও একজনের মনের অন্ধকার দূর হয় নাই—সে সখিনা। সখিনার মনে সুখ নাই। ঘরের ও পাড়ার মেয়েদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও সে কোনো বস্ত্রালঙ্কার পরে নাই। পোষাকও প্রতিদিনের চেয়ে এতটুকু জমকালো নয়। একটা ঘরের এক কোণে বসিয়া সে অবিরত চক্ষু মুছিতেছে।

পাত্র আসিয়া বিবাহ-সভা উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রুতে বিবাহ-সভায় যেন আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। অনেকে বলিতেছে, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা সখিনাকে এই পক্ক দীর্ঘশ্মশ্রুর আড়ালে বড়ই সুন্দর দেখাইবে। পাত্র মাঝে মাঝে হাসিয়া কথা কহিতেছে—পরিপক্ক শ্মশ্রুর মধ্য হইতে তাহার শুভ্র দন্তরাজির ছটা বাস্তবিকই দর্শকগণের মন মুগ্ধ করিতেছে।

দেন-মোহর ধার্য্য করিবার সময় বড় গণ্ডগোল লাগিয়া গেল। আমীর সাহেব জিদ্‌ ধরিলেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে কখনও তাঁহার বংশে দেন-মোহর ধার্য্য হয় নাই। তাঁহার মায়ের যাট হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্য্য হইয়াছিল এবং তাঁহার এক কন্যার পঞ্চাশ হাজার টাকা হইয়াছে। পাত্র কহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কখনও ত্রিশ হাজার টাকার অধিক দেন-মোহর হয় নাই, সুতরাং তিনি ত্রিশ হাজার টাকার অধিক দেন-মোহরে সম্মত হইতে পারেন না।

শেষে উভয়পক্ষের একজন মুরুব্বী চল্লিশ হাজার টাকা দেন-মোহরে উভয়পক্ষকে স্বীকার করাইলেন। দেন-মোহরের অর্দ্ধেক টাকা বস্ত্রালঙ্কারে আদায় হইল এবং বাকী অর্দ্ধেক টাকা কন্যার ইচ্ছামত দিতে হইবে।

দেশপ্রথা এবং মুসলমান শাস্ত্র মত বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহে কন্যার এজেন্‌ বা সম্মতি লইতে হয়। এজেন লইবার জন্য একজন উকীল এবং দুইজন সাক্ষী আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যার নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কোনো উকীলও সাক্ষী হন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কন্যার মাতুল উকীল এবং কন্যার দুইজন খুল্লতাত সাক্ষী হইয়াছেন। পাত্রী বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার কিছুই পরে নাই শুনিয়া উকীল সাহেব বলিলেন, "পাত্রী বস্ত্রালঙ্কার না পড়ুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। চোখের জল ফেলুক, তাহাতেই বা কি ক্ষতি? কেবল আমার প্রস্তাবের উত্তরে একটা হুঁ দিক্‌।"

পাত্রী নিরুত্তর। সুস্পষ্ট ভাষায় দুইবার তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু সে একবারও উত্তর দিল না। রমণীদের মধ্যে যাঁহারা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "মুখে হুঁ নাই বলুক, একটা পান দিলেই সম্মতি দেওয়া হইবে। যাহারা মুখে হুঁ বলে না, তাহারা একটা পান দিলেই সম্মতি ধরিয়া লওয়া হয়। উকীল সাহেব তাহাতে মত দিলেন। তিনি বলিলেন, "তাই হোক্‌, একটা পান দিলেই আমি এজেন দেওয়া ধরিয়া লইব।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কেহ কন্যাকে পান দেওয়াইতে পারিলেন না।

তখন উকীল সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি এই শেষবার প্রস্তাব করিতেছি। এবার উত্তর না পাইলে বিবাহ-সভায় কাজী সাহেবের নিকট যাইয়া বলিব, "পাত্রী এজেন দেয় নাই।" উকীল সাহেব তৃতীয়বার আমজদ জব্বার সাহেবের সহিত সখিনা

বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এবার সখিনা বিবি স্পষ্টভাষায় উত্তর দিলেন, "না।" "সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল," বলিয়া বর্ষীয়সী রমণীগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উকীল সাহেব ও সাক্ষীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া আমীর সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "সখিনার বয়স এখনও পনর বৎসর হয় নাই, সে এখন অপ্রাপ্তবয়স্কা। মুসলমান শাস্ত্রে বিধান আছে, পাত্রী অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলে তাহার এজেনের দরকার হয় না, পিতার এজেনেই তাহার বিবাহ হইবে। তোমরা বিবাহ-সভায় কাজী সাহেবের নিকটে গিয়া বল, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার পক্ষে আমি পিতা বিবাহে এজেন দিতেছি। তাহা হইলই বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইবে।" তাহাই হইল। পিতার এজেনে সখিনা বিবির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

৪

শুভবিবাহ শেষ হইবার পরই আমীর সাহেব বাটীতে আসিয়া সখিনা বিবিকে বলিলেন, "আমার সম্মতিতে তোমার শুভবিবাহ সমাধা হইয়াছে। আর ছেলে-মানুষী জেদ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া প্রস্তুত হও। পাত্রের সহিত শুভদৃষ্টির পর স্বামী-গৃহে যাইতে হইবে।"

সখিনাকে আর বস্ত্রালঙ্কার পরিবার জন্য জিদ করিতে হইল না। সে আপনি উঠিয়া চক্ষের জল মুছিয়া শুষ্কচক্ষে নববধূর বস্ত্রালঙ্কার পরিতে আরম্ভ করিল। তখনও তাহার মুখখানি দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

পাত্রের সহিত শুভদৃষ্টির পর সখিনা বিবি স্বামী-গৃহে যাইবার জন্য পাল্কীতে উঠিল। পাল্কীতে চড়িবার জন্য কাহাকেও বলপ্রয়োগ করিতে হইল না। অনেকে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণে মেয়ের সুবুদ্ধি হইয়াছে। স্বামী কি ধন মেয়ে ক্রমেই বুঝিতে পারিবে।"

সখিনা বিবি পাল্কীতে চড়িয়া স্বামী-গৃহে চলিল।

৫

স্বামী-গৃহে সখিনা বিবির এক রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোরের বেলা সখিনা বিবি একা বাহিরে আসিয়া জব্বার সাহেবের ভগ্নী তমন্না বিবির নিকট কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "আসুন, আপনার ভাইসাহেব কেমন হইয়া গিয়াছেন, দেখিবেন আসুন।"

তমন্না বিবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া দেখিলেন, জব্বার সাহেব মৃতবৎ বিছানায় পড়িয়া আছেন, ডাকিলে উত্তর দিতেছেন না এবং নড়িতেছেন না।

তাড়াতাড়ি একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "বিবাহের উত্তেজনায় রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় হঠাৎ পক্ষাঘাতে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।"

আমীর সাহেবের নিকট তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠানো হইল। তিনি এই দুঃসংবাদ পাইয়াই জামাতার গৃহে আসিলেন। তিনি কহিলেন, "সখিনার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়া গেল। যা হোক তার আইবুড় নাম ত ঘুচিল।" সখিনা বিবি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া শুষ্কচক্ষে স্বামিগৃহে আসিয়াছিল। একদিনের পর আভরণহীনা হইয়া আবার শুষ্কচক্ষে পিতৃগৃহে চলিল।

গোলন্দাজের শ্রবণেন্দ্রিয়—

যুদ্ধকার্য্যে উড়ো জাহাজের ক্ষমতা দিনে দিনে এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার সমস্যা সকল দেশের পক্ষে একটা বিষম গুরুতর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্টিলারির একটি বিশিষ্ট বিভাগ উড়ো জাহাজ হইতে আত্মরক্ষার কাজে ব্যাপৃত—তাহার নাম anti-aircraft বিভাগ। বহু দূরে থাকিতেও এরোপ্লেনের আওয়াজ ধরিবার জন্য ফ্রান্সে নীচের ছবিতে প্রদর্শিত যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে আওয়াজ ধরা পড়িলে এরোপ্লেনের দূরত্ব এবং উচ্চতা বলিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন খবর বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই। তবে এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ২০ মাইল দূরের এরোপ্লেনের আওয়াজও এই কলের দ্বারা ধরিতে পারা যায়। এই জাতীয় কল অবশ্য ইতিপূর্ব্বেও তৈরী হইয়াছে, কিন্তু এই যন্ত্রটির বিচিত্র রচনা সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

পাখার দ্বারা চালিত রেলগাড়ী—

সম্প্রতি জার্ম্মানী হইতে একটি নূতন যানের আবিষ্কারের খবর আসিয়াছে। যানটি কার্য্যকারিতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এরোপ্লেনের গতিবিধি ধরিবার নূতন যন্ত্র
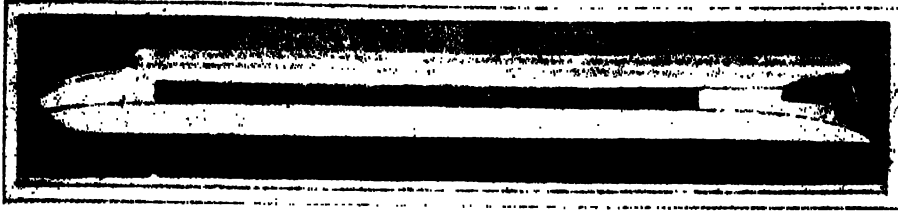
"জেপেলিন" রেলগাড়ী

ইহা এরোপ্লেনের মত পাখার দ্বারা চালিত। কিন্তু রেলগাড়ীর মত লাইনের উপর দিয়া চলে। মাটির উপর এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্ত ইহা তৈরী। পরীক্ষায় ইহা ঘণ্টায় ১১৪ মাইল চলিয়াছিল। এই গাড়ীর আবিষ্কর্ত্তার নাম ফ্রাণ্টস্ ক্রুকেনবেয়ার্গ।

গাড়ীটির পাঁচটি কামরা—তাহাতে ৪০ জন যাত্রীর স্থানসঙ্কুলান হয়। গাড়ীটি দেখিতে একটা সাদা রং-এর অতিকায় সিগারের মত। ইহার প্রপেলার অর্থাৎ পাখাটি পশ্চাতে অবস্থিত। ৪০০ হর্স-পাওয়ারের একটি পেট্রোল ইঞ্জিন ইহাকে ঘুরায়। এই ঘোরার দরুণই গাড়িটি চলিতে আরম্ভ করে। গাড়ীটাকে রেলের উপর রাখিবার জন্ত পাখার পুপটা কতকটা উপর দিকে তুলিয়া দেওয়া দরকার হইয়াছে। এরূপ না করিলে এরোপ্লেনের মত সেও উড়িবার চেষ্টা করিত।

উপরে—পাখার দ্বারা চালিত রেলগাড়ীর সম্মুখের দৃশ্য
মধ্যে—প্রপেলার ও পিছনের দৃশ্য
নীচে—পাশের দৃশ্য। মাঝের দরজা দিয়া যাত্রীরা উঠা-নামা করে

সত্তর দেশের কাঠে তৈরী টেবিল —

মিশিগানের মে বেরি স্যানিটেরিয়ামে সত্তর দেশের কাঠ একত্র

সত্তর দেশের কাঠে তৈরী টেবিল

করিয়া সাত বছরের পরিশ্রমে এই টেবিলটি তৈরী হইয়াছে। নির্ম্মাতার নাম জর্জ্জ হাথাওয়ে। ইনি বিগত যুদ্ধে অঙ্গহীন হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। টেবিলখানি এখন প্রদর্শনের জন্ত বষ্টনে পাঠান হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

ভারতের সাম্যবাদ—শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সামাজিক সাম্যের মূল কোথায়, এ সাম্য কি ভাবে লাভ করা সম্ভব এবং প্রাচীন ভারতেই বা এ সাম্য কি ভাবে লাভ করার চেষ্টা হইয়াছিল, এই গ্রন্থের কতকগুলি প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। সতীশবাবু বলেন—প্রাচীন ভারতে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছিল বর্ণধর্ম্মের দ্বারা। বর্ণধর্ম্ম বলিতে বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহুল জাতিভেদ বুঝায় না—বুঝায়, ন্যায় এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কেবলমাত্র জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিটি বিশেষ বিভাগকে। এই বিভাগ অনুসারে সমাজের কাজকে এক এক বর্ণের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ গণ্ডি টানা হইয়াছে কেবল জীবিকার্জ্জনের সম্পর্কেই। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে জীবিকার্জ্জন করিয়া তারপর সেবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ অন্য বর্ণের কাজ করে অর্থাৎ শূদ্রও যদি জাতি বিভাগ অনুযায়ী কাজের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া লোকহিতের জন্য বা আত্মোন্নতির জন্য ব্রাহ্মণোচিত কাজে হাত দেয়, তবে সত্যকার বর্ণধর্ম্মে তাহা কোথাও বাধে না। বর্ণধর্ম্মের এই অর্থ যে তাঁহার মনগড়া নয়—ইহাই যে বর্ণধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত অর্থ, গীতার কতগুলি শ্লোকের দ্বারা সতীশবাবু তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে তিনি ইটালী, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূহের সামাজিক সাম্যের আদর্শকেও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ইউরোপের এই চেষ্টার মূলে রহিয়াছে জোরজবরদস্তি। রাজশক্তি জোর করিয়া সমস্ত ভেদ ভাঙিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সাম্যই যেখানে কাম্য, সেখানে জোরজবরদস্তির কোনো স্থান নাই। নির্লোভ না হইলে স্থায়ী সাম্যের সন্ধান মিলিতে পারে না। তাই ইউরোপে আজ যে সাম্যবাদের ধুয়া উঠিয়াছে তাহাতে উন্মা আছে, আদর্শে পৌঁছিবার সাধনা নাই; তাহার ভিতর দিয়া শক্তিমানের দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবার সুযোগ দেখা দিয়াছে, তাহাতে বাস্তবিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ ধরা পড়ে নাই।

ইউরোপের 'সোসিয়ালিজম' ভারতের মনে যে একটা দোলা জাগাইয়াছে এবং দেশের অনেকগুলি লোকের মনও যে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এ কথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তাই একটা অনুকরণের স্পৃহা, একটা ভাঙিবার স্পৃহাও আজ দেখা দিয়াছে। সতীশবাবুর এই প্রবন্ধগুলি দেশের এই নবরব্ধ মতের প্রতিবাদ। ইউরোপের স্রোতে গা ভাসাইয়া কোনও লাভ নাই—এই কথাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সংস্কারের বিরোধী নহেন যদি সে সংস্কার ভারতীয় আদর্শের অনুগামী হয়। সতীশবাবু বর্ণধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকে মানিবেন না। কিন্তু তিনি এই পুস্তকে যে-সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে। ভাঙা সহজ কিন্তু গড়া কঠিন। সুতরাং ভাঙিবার আগে যাহা আছে তাহা সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া যায় কি না, তাহা ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। প্রবন্ধগুলি লইয়া আলোচনা করিলে, বাংলা দেশ উপকৃত হইবে বলিয়া মনে করি।

রা. ব.

লোহাগড়া কাহিনী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল প্রণীত। মূল্য তিন টাকা।

লোহাগড়া যশোহর জেলার মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম। ইহা নড়াইল মহকুমার অধীন। লোহাগড়ার নাম সম্বন্ধে গ্রন্থকার এবং ভূমিকা-লেখক প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় অনুমান করেন, যে, প্রাচীন কোন দুর্গ হইতে ইহার নাম লোহাগড়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও বিখ্যাত বীর পার্শ্ববর্ত্তী জয়পুরে রণজয় করিয়া সেই বিজয় নগরীর উপকণ্ঠে লোহাগড়ায়—গড় ও অস্ত্র কারখানা (লোহা) স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে প্রধান বাধা এই যে, এ অঞ্চলে সীতারাম ছাড়া পূর্ব্বে কোনও স্বাধীন রাজার সংবাদ ইতিহাস প্রদান করেন না। দ্বিতীয়তঃ, গড়া শব্দটি অন্য কোনও স্থলে গড়ের সংস্রবে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। রামগড়, প্রতাপগড়, শক্তিগড় প্রভৃতি নামের 'গড়' কোনও স্থলে গড়ায় পরিণত হইতে দেখা যায় না। আমার মনে হয়, লোহাঘরা বা ঐরূপ কোনও শব্দ হইতে লোহাগড়ার নাম আসিয়া থাকিবে। পল্লীকাহিনী পল্লীগ্রামবাসী মাত্রেরই আনন্দের বস্তু। লোহাগড়া এবং তন্নিকটস্থ গ্রামের অনেক কথা এই পুস্তকে আছে। বর্ত্তমান এবং অতীত বহু ব্যক্তি ও স্থানের পরিচয় ও চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। লোহাগড়া বৈশ্যবারুজীবীদিগের একটি প্রধান স্থল। তাঁহাদেরই বংশাবলীর পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থখানির অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে। অতীত কাহিনী, কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেও গ্রন্থকার ত্রুটি করেন নাই। পল্লীর উৎসব, পল্লীর গীতবাদ্য, পল্লীর আচার-ব্যবহার—যে সমস্ত ব্যাপারে স্থান-বিশেষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়—তৎসমস্তই গ্রন্থকার বিশেষ যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ যত হয় ততই ভাল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

পাটের কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা।

এই ছোট বইখানিতে পাটের চাষ হইতে শেয়ারের বাজার

পর্য্যন্ত পাট সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ বিষয়ই নির্ম্মলবাবুর নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত, তাই বর্ণনাগুলি বেশ বাস্তব ও সহজবোধ্য হইয়াছে। বই-খানিতে অর্থনীতির কূট প্রশ্ন ও সমস্যার সমাবেশ কিছু নাই, অথচ বালক ও প্রবীণ সকলেরই জানিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই এক স্থানে পুস্তিকাখানির তাড়াতাড়ি প্রকাশের লক্ষণ রহিয়া গিয়াছে। যেমন ৩৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারার শেষ অংশে ভ্রমক্রমে ১০ টাকা দর স্থলে ৭ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। ফলে গ্রন্থকারের একচেটিয়া দরের আলোচনা পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোটের উপর বইখানি খুব সময়োপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

বহ্নিশিখা—উপন্যাস—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীঅজিত শ্রীমানী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৩২৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ের মলাট, রূপালি হরফে নাম লেখা। মূল্য দুই টাকা।

গল্প, উপন্যাস, নাটক ও শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া সৌরীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন prolific লেখক। তাঁর রচনা স্রোতোধারার মত অবাধে অবলীলায় বহিয়া চলে—তার মধ্যে কষ্টকল্পনা বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। আলোচ্য উপন্যাসখানিতেও রচনার সেই প্রাঞ্জলতা বর্ত্তমান।

কলিকাতা শহরে জুয়াচোরের অভাব নাই—সমাজের সকল স্তরেই তারা বিরাজ করে। সকলের শিক্ষা-দীক্ষা সমান না হইলেও সকলেই বুদ্ধিজীবী। খবরের কাগজ মারফৎ তাদের অভিনব কীর্ত্তি-কলাপ প্রায়ই আমরা শুনিতে পাই। তেমনি এক জুয়াচোর দলের নকল কুমার-বাহাদুর—এক শিক্ষিত সুদর্শন বাঙালী যুবক 'বহ্নি-শিখা'র নায়ক। তার নাম গিরিজা। সে ও তার বন্ধু শ্যামল, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হওয়ায়, কতকটা যেন অভিমানভরে এই অন্যায় কাজে নামিয়াছে।

শিকারের খোঁজে কলিকাতা আসিয়া দুই বন্ধু ঘটনাচক্রে এক অতি-আধুনিক শিক্ষিত তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল। এই সম্প্রদায়ের সভ্যদের ছবি খুব বাস্তব হইয়াছে—এমন কি কোনো কোনো 'চরিত্র'কে চেনা-চেনা মনে হয়। ইহাদের হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা, চিন্তাধারার মধ্যে নূতনত্ব আছে—হাসির উপাদানও কম নাই। গিরিজা এই দলের সংস্রবে আসিয়া দুটি নারীর স্নেহ ও প্রেম লাভ করে; এবং তার ফলে মন নিরাময় হইয়া উঠিলে অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ন্যায়পথে জীবনযাপনে উদ্‌যোগী হয়।

গল্পের নায়ক গিরিজার চেয়ে তার বন্ধু ও সহকারী শ্যামল ভাল ফুটিয়াছে। উভয়েরই সরস মন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মার্জ্জিত রুচি—তাদের উপর রাগ বা বিরক্তি আসে না। তারা adventurous হইলেও eminently lovable—আর দুজনের মধ্যে যে ভালবাসা, তা অকৃত্রিম ও মধুর।

আলোচ্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ চরিত্র মায়া—নিঃসন্দেহ সে-ই উপন্যাসের নায়িকা। মায়া মন মুগ্ধ করে—সুন্দর tragic figure! বইয়ের আগাগোড়া তার ছবি উজ্জ্বল হইয়া আছে। প্রেমাস্পদের সুখের জন্য তার সকরুণ আত্মবিলোপ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ না করিয়া পারে না।

বইখানির নির্ভুল পরিষ্কার ছাপা প্রশংসার যোগ্য।

যাযাবর—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত এবং কলিকাতা ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅভয়হরি শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৭৮ পৃষ্ঠা, রূপালি হরফে নাম লেখা কাপড়ের প্রচ্ছদ, দাম পাঁচ সিকা।

আলোচ্য গ্রন্থ উপন্যাসের ছদ্মবেশে ছোটগল্পের সংগ্রহ। ভূমিকায় লেখা আছে—"এই উপন্যাসখানি বিভিন্ন নামে ও আংশিকভাবে 'কালি-কলম', 'কল্লোল', 'উত্তরা' ও 'বঙ্গবাণী'তে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল।"

লেখা মন্দ নয়, কিন্তু গল্পগুলি দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন—ইংরেজীতে যাকে বলে 'thin'। ওরই মধ্যে গৌরীর গল্পে একটু গল্পত্ব আছে। যতদূর জানি, "যাযাবর" নবীন লেখকের প্রথম বই—কালক্রমে উপলব্ধি আরও গভীর হইলে তাঁর রচনার উৎকর্ষ বাড়িবে আশা করি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্তের সম্বন্ধ—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ সং ৮৬।

'রক্তের সম্বন্ধ' ও 'খেয়ালী' দুটি বড় গল্প আছে। লেখকের ভাষাটি বেশ মিষ্ট। দু-চার কথায় ব্রজেশ্বরীর চরিত্রটি ভারী সুন্দর ফুটিয়াছে। 'খেয়ালী' গল্পটিই বেশী ভাল লাগিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাচ ও মণি—মৌলভী একরামুদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক মোহসিন এণ্ড কোং, ৬৬।১-এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উপন্যাসখানি সুবৃহৎ। নানারূপ ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে গল্পটিকে ঘোরালো করা হইয়াছে। সকল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া না উঠিলেও, গল্পের স্রোত অব্যাহতভাবে বহিয়া যাওয়ায় পাঠকের নিকট উপন্যাসখানি কৌতূহলোদ্দীপক হইবে। সুশীলার চরিত্রে বিলাতী গভর্ণেস্ এবং প্রভাবতীর চরিত্রে বিলাতী এড্‌ভেঞ্চারেসের ছাপ পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের মত উদার এবং রচনারীতি প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে তাঁহার রসিকতা বিশেষ উপভোগ্য। বইখানির গল্পাংশ চিত্তাকর্ষক। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আমরা লেখকের সাম্প্রদায়িকতাহীন সহৃদয়তার প্রশংসা করি।

কালু সর্দ্দার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত এবং এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

ইহা ছেলেমেয়েদের উপন্যাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। বইখানি রূপকথা-জাতীয়। গল্পের সাবলীল প্রবাহ রূপকথার প্রাণ। রূপকথা আপনি ঘোরালো হইয়া উঠে, ইচ্ছা করিয়া গল্পের মোড় ঘুরাইতে হয় না। বইখানিতে কিন্তু বার-বার এই চেষ্টার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এই চেষ্টা না ফুটিয়া উঠিলে ছেলেদের কাছে গল্পটি সম্পূর্ণ উপভোগ্য হইয়া উঠিত। 'সে বললো' না 'সে বললে'? 'জিজ্ঞাসা করলো' না 'জিজ্ঞাসা করলে', 'দেখলো' না 'দেখলে'? মনে হয় চলিত বাংলার ক্রিয়ার রূপ সুনির্দ্দিষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে, বিশেষত শিশু-সাহিত্যে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সুধা—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আট আনা।

বইটির ছাপা ও বাঁধন মন্দ নহে; কিন্তু ভিতরের বস্তু চলনসই। ইহা একখানি পদ্য-পুস্তক। পদ্যগুলিতে অনেক নীতি-কথার অবতারণা করা হইয়াছে। পদ্যে গল্পচ্ছলে নীতিকথা বলিবার রীতি আছে, কিন্তু আলোচ্য পদ্যগুলিতে তাহা গল্পচ্ছলে বলা হয় নাই। পদ্যগুলি ছোট ছোট। এরূপ জিনিষ আধুনিক কালে চলিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, পদ্যগুলিতে ছন্দ ও মিলের দোষ আছে। তবে কয়েকটি পদ্য, ছন্দে মিলে ও ভাবে মন্দ হয় নাই।

স্নেহধারা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। লিলি বুক কোম্পানী, ২৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

কবিতার বই। ইহাতে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির স্নেহ-প্রীতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা আছে। কবিতাগুলি আধুনিক কালোপযোগী ছন্দে ও ভঙ্গীতে রচিত না হইলেও, বহুস্থলে বেশ আন্তরিক-ভাব-পূর্ণ। তবে লেখকের মনে রাখা উচিত, তাঁহার ব্যবহৃত ছন্দ বাংলা সাহিত্যে ক্রমে ক্রমে অচল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে।

পথের বাঁশী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র। ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

কবিতা-পুস্তক। এই পুস্তকের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। ভাবে ছন্দে ও ভাষায় কবিতাগুলি ভাল হইয়াছে,—কয়েকটি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

একালের দৈত্য ও পরী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল সম্পাদিত। প্রকাশক—ম্যাক্‌মিলন্ এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

এই ছোট বইখানিতে কয়েকটি বস্তু-বিজ্ঞানের জটিল কথা চিত্তাকর্ষক ক'রে বলা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা দৈত্য ও পরীর অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী যেমন আগ্রহ করে শোনে, তেমনি এই বইখানির আলোর পরী, সূর্য্যলোকের পরী, খনির পরী, কাচ পরী, বাষ্পদৈত্য, বাতাস ও জোয়ার দৈত্য প্রভৃতির কথাও তারা খুব আগ্রহসহকারে পড়বে ও সেই সঙ্গে অনেক জ্ঞানলাভ করবে। বইখানির পরিকল্পনাটি সুন্দর, ভাষা সরল ও মনোরম। ছাপা প্রভৃতিও ভাল। কয়েকখানি ছবিও আছে। এই বই প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে দেওয়া উচিত।

কলাম্বাস—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত, বি-এ, বি-টি প্রণীত। প্রকাশক—ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য ১।০

এই বইখানিতে কলম্বসের জীবনী, তথা আমেরিকা-আবিষ্কারের কথা, ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক'রে লেখা হয়েছে। আমেরিকা আজ এত বড়, কিন্তু চারশ বছর আগে তার অস্তিত্বও কেউ জানতো না। এই দেশের আবিষ্কার কাহিনী গল্পের মতোই মনোরম, আর যিনি এই দেশ আবিষ্কার করে গেছেন, তাঁর জীবনী যে-কোনো বীরপুরুষের জীবনীর মতই শিক্ষা ও আদর্শপূর্ণ। কলম্বসের জীবনীতে সবচেয়ে একটি বড় জিনিষ এই পাওয়া যায় যে, শুধু কেবল সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় থাকলে জগতে কত বড় কাজই না মানুষ করতে পারে! উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকলে সুযোগ ও সম্পদ আপনিই এসে পড়ে। এই ধরণের বই আমাদের এই দরিদ্র দেশের ছেলেমেয়েদের খুব বেশী করে পড়ান দরকার।

বইখানি পুরু কাগজে বড় টাইপে পরিষ্কার ক'রে ছাপা, ১১ খানি সুন্দর ছবি আছে। কাপড়ের মজবুত বাঁধা। মলাটের ছবিটিও সুন্দর। ছেলেমেয়েদের বই এই রকম পরিপাটী হওয়াই উচিত।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—ডাঃ শ্রীঅজিতশঙ্কর দে। হোমিওপ্যাথিক সার্ভিং সোসাইটী (ইণ্ডিয়া), ৫ নং ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরানগর, কলিকাতা। ৪৮ পৃঃ, মূল্য ।৶০ মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে সুচিকিৎসক হইতে হইলে কি কি গুণের অধিকারী হওয়া উচিত ও কোন্ কোন্ দোষ বর্জ্জন করিতে হইবে লেখক তাহার আলোচনা করিয়াছেন। অল্প কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি ইহা ছাড়া রোগী পরীক্ষা করিবার সময়ে যে যে বিষয় চিকিৎসকের জানা প্রয়োজন, তাহাও বিশদভাবে লিখিয়াছেন।

চিকিৎসা-বিদ্যার্থীদের ও তরুণ চিকিৎসকদের এই পুস্তক পাঠে জ্ঞানলাভ হইবে।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধনা ও পরমানন্দ—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৫৩-বি মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে লেখক সাধনার বিভিন্ন স্তর ও তাহাদের ক্রম ধারাবাহিক-ভাবে বিশদ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং কেমন করিয়া সাধনার সিদ্ধি, অর্থাৎ আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে তাহা পুঁথিগত বিদ্যা ও নিজের সহজাত জ্ঞানের দ্বারা সহজভাবে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এই দুরূহ কার্য্যে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে মনে হয়, লেখক শুধু পণ্ডিত নহেন, ভক্তও বটে। আমাদের বিশ্বাস, বইখানি আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনেও তৃপ্তি দিতে পারিবে। আমরা সচরাচর সাধনা ও আনন্দ সম্পর্কিত যে-ধরণের বই দেখি এটি তাহা হইতে অন্য ধরণের। সহজ বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া শুধু তত্ত্বকথার সমাবেশ ইহাতে নাই।

স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ছাপার ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে বইখানি সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

—স

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রশান্ত,

ছেলেবেলার কথা তোমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে? যখন আমরা উচ্চপ্রাইমারীতে পড়্তাম—ননীদের লিচু-বাগানে চড়িভাতি করতাম, ডাম্বেল সাহেবের কুঠীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে গাম্‌লেটের সন্ধানে যেতাম, কাছ্‌নীর বিলে পদ্মের চাক খেতে যেতাম? খুব সম্ভব বছরে একবারও তোমার সে-সব কালের ও-সব কথা মনে পড়ে না। কেন-না, তোমরা হচ্ছ কাজের মানুষ। তাই তোমাদের কারবার হচ্ছে বর্ত্তমান নিয়ে। বর্ত্তমানের দুর্ব্বার তাগিদে তোমাদের মনের ও প্রাণের কোনখানেই কোনো অবসর নেই। তোমাদের মর্ম্মসঙ্গীত "আগে চল, আগে চল ভাই," ততটা নয় যতটা হচ্ছে "শুধু চল, শুধু চল ভাই।" তাই তোমাদের একটা বাজার দর আছে, যার দাবি আমরা কোনো বাজারেই করতে পারি নে—বৌবাজারেও নয়, বড়বাজারেও নয়। আমরা হচ্ছি আল্‌সের দলের লোক। তাই আমরা তোমাদের জগতে চিরকালই একটু হসন্তের মত হয়ে থাকি। অর্থাৎ অর্দ্ধ-উচ্চারিত অবস্থায়। কাজের লোক যারা তারা বাস করে বর্ত্তমানে, আর আল্‌সে দলের লোক যারা তারা বাস করে হয় অতীতে, নয় ভবিষ্যতে। তাই তোমরা যেমন বাস কর বর্ত্তমানে, আমরা তেম্‌নি বাস করি হয় অতীতে নয় ভবিষ্যতে। গভীর সত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু আমরাই সত্যিকার কালে বাস করি। কেন-না, আমরা ত্রিকাল বলি বটে, কিন্তু আসলে কাল হচ্ছে মাত্র দুটি এক অতীত আর এক ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ব'লে কোনো কাল নেই। ওটা হচ্ছে একটা চিহ্নবিশেষ। আসলে ও বস্তুটি হচ্ছে অনাদি কালের উপর একটি অসীম সরল রেখা—অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নেই। এই সরলরেখারই একদিকে অতীত ও অন্যদিকে ভবিষ্যৎ। এই অসীম সরল রেখা ক্রমাগত সরছে, অতীতকে বাড়িয়ে ও ভবিষ্যৎকে কাছে এনে।

সুতরাং একথা বললে নেহাৎ ভুল হবে না যে, তোমাদের জীবনটাই হচ্ছে আসলে মায়া—তোমরা যারা স্রেফ্ বর্ত্তমানে বাস কর। কেন-না, যারা স্রেফ্ বর্ত্তমান কালে বাস করে তারা কোনো কালেই বাস করে না। কারণ বর্ত্তমান ব'লে কোনো কালই নেই।

সে যা হোক্ সেই ছেলেবেলায় আমরা যখন পাঠশালায় পড়তাম, তখনও 'বিজ্ঞান রীডারের" আমদানি হয় নি। তখনও শিশুদের কচি মন ও কোমল মস্তিষ্ক নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞান দিয়ে পরিপক্ক ক'রে তোলবার আয়োজন সুরু হয় নি। তখনও ছোট ছোট পড়ুয়াদের পাঠ্যজীবন—

> পেয়ারা হে কি গুণ তোমার
> কাঁচা খাই ডাঁসা খাই পাকার ত কথা নাই;
> সব তাতে তৃপ্তি রসনার।

এমন একটি রিয়ালিষ্টিক রসপূর্ণ রচনায় সরস হয়ে উঠত। যদিও উক্ত রচনার রচয়িতার দৃষ্টি বা স্মৃতি-শক্তির একটু দোষ না ধরে আমরা পারতাম না। কেন-না, ওর দ্বিতীয় লাইনটি আসলে হওয়া উচিত—

> কাঁচা খাই, পাকা খাই, ডাঁসার ত কথা নাই,

তবেই ওটা নির্ভুল রিয়ালিষ্টিক হয়ে ওঠে।

যা হোক্, ছেলেবেলার কথা তোমার মনে না পড়ুক আমার মাঝে মাঝে পড়ে। আর তখন ভাবি সে বয়েসে কত কম উপাদানেই না কত বেশী খুশী হয়ে উঠবার সামর্থ্য ছিল। আর সে খুশীর মধ্যে কোনখানেই একটুকু কালো ছায়ার আভাসের আভাসও থাকবার উপায় ছিল না। সে খুশী ছিল যেমন স্বতঃ, তেমনি সহজ, তেমনি অবিমিশ্র। আজ মনপ্রাণচিত্তের প্রসার বেড়েছে, অহং-এর পাকা ভিত্তি গড়ে উঠেছে, জগতটা কত বৃহৎ হয়ে

উঠেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত নেই—কিন্তু কোথায় সেই অদ্বিতীয় বস্তু যা সমস্তকে উজ্জ্বল করে, সহজ করে—কোথায় সেই খুশী যা সব কিছুকেই অপ্রয়োজনীয় ক'রে তোলে, আবার সব-অপ্রয়োজনীয়কেই অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে—কোথায় সেই খুশী হবার সহজ সামর্থ্য যা মানুষের বহির্জগতের সঙ্গে তার অন্তর্জগতের যোগ রক্ষা ক'রে ক'রে চলে? ঐ একমাত্র বস্তু যা মানুষকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে না এই সৃষ্টির বিরুদ্ধে, যার গুণে "মায়াময়মিদং অখিলং"; মানুষের চোখে সুন্দর লাগে—যা মানুষের মনকে সরস রাখে—প্রাণকে সজীব করে! আজ জীবনের উপকরণ দশ গুণ, শত গুণ, হাজার গুণ বেড়ে গেছে, কিন্তু সেই বস্তুর সাক্ষাৎ দিনান্তে আর একবারও মেলে না।

কিন্তু আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। মানুষের বৃহত্তর জীবনের দিক থেকেও দেখি যে তার সভ্যতা তার মনের সুখশান্তিকে বিসর্জ্জন দিতে চলেছে। যে সুখ, যে শান্তি আদিম মানুষের জীবনে অতি সহজ, অতি সত্য ছিল, আজ আর আমরা তার দেখা সহজে পেতে পারি নে। কিন্তু আদমের স্বর্গ থেকে পতন হয়েছিল বলেই মানুষ আপনার পূর্ণ পরিচয় পেল।

সে যা হোক্, সেই পাঠশালে যখন শুভঙ্করীর "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে" মুখস্থ করতুম তখন "নবপাঠ" না "চারুপাঠ" না-কি এম্নি একটা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম একটি গল্প—যে-গল্পের ব্যাপারটা ছিল উদরের সঙ্গে হাত পা ইন্দ্রিয়াদির ঝগড়া। হাত পা ইত্যাদির অভিযোগ ছিল এই যে, তারা সবাই খেটে খেটে মর্‌বে আর পেটটা বসে বসে খাবে এ কিছুতেই হ'তে পারে না। সুতরাং তারা করল ধর্ম্মঘট উদরকে জব্দ করবার জন্যে। এই ধর্ম্মঘটের শেষ ফল যে কি হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আজ আর তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌বার প্রয়োজন নেই।

ছেলেবেলায় যা পাঠ্যপুস্তকে পড়া গেছে আজ জীবননাট্যে তারই অভিনয় দেখছি। তবে এ ঝগড়া উদরের সঙ্গে হাত পা ইত্যাদির নয়—এ ঝগড়া হচ্ছে মাথার সঙ্গে হাতের। শোনা যাচ্ছে মানুষের মাথাটা না-কি অতিরিক্ত বিলাসী। সে না-কি দিব্যি কেশকলাপে কেশরঞ্জন তৈল মেখে বসে থাকে, আর কি সব নানা সম্ভব অসম্ভব খোয়াব দেখে—যার সঙ্গে চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি জীবনের মহাপ্রয়োজনীয় বস্তুপুঞ্জের কোন সম্বন্ধই খুঁজে বের করা যায় না। সুতরাং ওটাকে অর্থাৎ মাথাটাকে সায়েস্তা করা দরকার। মাথাটা যে এমন খোসখেয়ালী বিলাসী হয়ে উঠ্‌ল, তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাকে প্রাধান্য দেওয়া ও প্রচুর অবসর দেওয়া। তাই হাত আজ বল্‌ছে—হে মাথা, আমি তোমার প্রাধান্য আর স্বীকার করব না এবং তুমি যাতে আর তেমন অবসর না পাও তার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে। মানুষের দেহে তোমার বৃদ্ধি আকাশের দিকে এবং আমার বৃদ্ধি মাটির দিকে বটে—কিন্তু মাটিই ত বাস্তব, মাটিই ত মানুষের কল্যাণের, মাটিই ত মানুষকে স্নিগ্ধ শ্যামল স্নেহ দিয়ে ঘিরে আছে—তারপর হাতের যদি কবিত্ব এসে যায় তবে হয়ত বলে—

> "মাটি গো মাটি, পথের মাটি, প্রাণের মাটিরে
> দেহের ক্ষুধা মিটাও তুমি, বাঁধ গো পা'টিরে"

তারপর সবার শেষ সিদ্ধান্ত ক'রে হাত বলে—হে মাথা, আমি তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

বলা বাহুল্য, এ ঝগড়া হচ্ছে মানুষের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মকাণ্ডের—এ ঝগড়া হচ্ছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের।

কিন্তু জ্ঞানকে বাদ দিলে যে কর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাবে, ব্রাহ্মণের অভাব হ'লে যে সমাজের সম্পদ ও স্বাস্থ্যের কথা দূরে থাক্, তার জীবন রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে উঠবে, এটা আজকার দিনে এম্নি একটা সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য যে, এ নিয়ে তোমার কাছে লম্বা বক্তৃতা দেওয়া আসলে তোমার বুদ্ধির উপরই কটাক্ষ করা হবে। অবশ্য আমি এখানে পৈতেধারী ব্রাহ্মণের কথা বলছি না, বল্‌ছি গুণ-কর্ম্মে ব্রাহ্মণের কথা। অথচ রাজনৈতিক রেষারেষিতে বুদ্ধির পাঠটি জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো কোনো গণতান্ত্রিক পাণ্ডা ঐ সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যটিকে আজ বল্‌ছে ঘোড়ার ডিম!

কেউ বল্‌ছে, সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে, সবাই মনে প্রাণে শূদ্র হ'য়ে ওঠা। কেউ বল্‌ছে, মানুষের জীবনের একমাত্র মহত্ত্ব হচ্ছে—তার শারীরিক শ্রম। এদের কথা বিশ্বাস করলে মান্‌তে হ'য় যে, যে-কাঠুরিয়া বন থেকে কাঠ কেটে হাটে গিয়ে বিক্রি করে তাঁর শক্তি একটা অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু যে-শক্তি মানুষকে বুদ্ধত্ব পাইয়ে দেয়, সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার!

এদের বিচার অনুসারে ইংলণ্ডের বিস্তৃত কয়লার খনির যে কোনো টম্ হ্যারি—ধর—ডীন ইঞ্জের চাইতে শ্রেষ্ঠ, কেন-না টম্ হ্যারি পৃথিবীর পঞ্জর থেকে সমাজকে সরবরাহ করে নিরেট বাস্তব কয়লা, আর ডীন ইঞ্জের দান কেবল তাঁর ফাঁকা চিন্তার শব্দ কোলাহল। কিন্তু মানুষের শারীরিক শ্রমের মধ্যে কিছুই অসম্মানের বা অগৌরবের নেই একথাটাই সত্যি—শারীরিক শ্রম যে মানুষের চিন্তার চাইতে মহত্তর এ-কথা সত্যি নয়। আসলে শারীরিক শ্রম সেই অনুপাতে মহৎ হ'য়ে ওঠে, যে অনুপাতে তাতে মিশেছে মানুষের চিন্তার, তার আত্মার গভীরতম চেতনার অবলেপ। তাই, পাথর ভেঙে রাস্তা তৈরি করে যে তাকে আমরা বিশেষ কিছুই বলি নে—বড় জোর বলি ঠিকাদার, কিন্তু যে পাথর কেটে তাজমহল তৈরি করে তাকে আমরা বলি শিল্পী। মানুষের জীবিকা অর্জ্জন হচ্ছে তার প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আদিম মানুষ তা করত বন্য পশুর মাংসে। তারপর এলো কৃষিকর্ম্ম। এই কৃষিকর্ম্মকে আমরা বন্য পশু হননের চাইতে মহত্তর বলি, কেন-না কৃষি-কর্ম্মের সঙ্গে মিশেছে মানুষের চিন্তা, তার বুদ্ধির কৌশল। কৃষিকর্ম্ম ও বস্ত্রবয়ন মানুষের সভ্যতার প্রথম সোপান, কেন-না ঐ খান থেকে বিকাশ লাভ করেছে তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। ঐ খান থেকে সে স্বভাবকে স্পষ্টভাবে ছাড়িয়ে উঠেছে। ঠিক ঐ কারণেই আজ আমরা তাঁতির হাতের তাঁতের চাইতে বিরাট কাপড়ের কলকে অভিনন্দিত করি। কেন-না, সেই কলের পিছনে রয়েছে মানুষের অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, তার বুদ্ধির বৃহত্তর কুশলতা, তার আত্মার স্পর্দ্ধা। সমুদ্রে পাল-তোলা জাহাজ যেতে দেখেছ? ভারী চমৎকার লাগে দেখতে। যেন রূপকথার এক বিহঙ্গম উড়ে চলেছে কোন্ রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে কোন্ রাজকুমারীর উদ্দেশে। এই পাল-তোলা জাহাজের পাশে ষ্টীমারকে দেখায় যেমন বৃহৎ তেমনি জবড়জঙ্গ। কিন্তু পাল-তোলা জাহাজ সুন্দর হোক্, তা সমুদ্রকে তেমন বশ করতে পারেনি যেমন করেছে ষ্টীমার। এই ষ্টীমারের উপর থেকে মানুষ রাজা ক্যানিউটের মত—Ocean! roll back thy waves—বল্‌ছে না বটে, কিন্তু একথা সে আজ স্পষ্টই বলছে—হে সাগর, তোমার তরঙ্গ ও তুফান সত্ত্বেও আমি আমার গন্তব্যস্থানে পৌছব—পৌছব - পৌছব।

তোমার মনে আছে কি, একদিন হাওড়া ষ্টেশনে একটা বিরাটকায় এঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবং তুমি বলছিলে যে, এই এঞ্জিনের প্রতি তোমার প্রাণের একটা বিরাট টান আছে। সেদিন তোমার কথা শুনে আমার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। এমনি একটা কালো ভুরমুশ ধোঁয়া-ওড়ানো কর্কশ শব্দ-করা যন্ত্রের উপর যার প্রাণের টান হতে পারে, সে যে একটা নিতান্ত আটপৌরে ধরণের মানুষ, সেকথা তোমাকে বলিনি বটে, কিন্তু আমার তা মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ সেই টানের অর্থ বুঝি এবং তাতে মানুষ আটপৌরেও হয়ে যায় না। এঞ্জিনের প্রতি টান এই জন্যে যে, ওটা মানুষের মানস-পুত্র—তার শক্তির বৃহত্তর প্রতীক। মানুষের কাব্য-কলা-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের পিছনে যা আছে এই এঞ্জিনের পিছনেও তাই আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রতিভা—তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির কেরামতি। ষ্টীমার মানুষের শক্তির বৃহত্তর প্রতীক। তাই মানুষের মধ্যে যে একটি 'হিয়ারো' আছে, একটি বীর আছে, সেই বীরের সঙ্গে এই জবড়জঙ্গ ষ্টীমারেরই সহজ সম্বন্ধ। এখন কালো ধোঁয়া-ছাড়া ষ্টীমারকে পাল-তোলা জাহাজের মতই সুন্দর ক'রে তোলা যায় কি না জানিনে—যদি যায় ত ভালই—কিন্তু যদি তা না যায় ত তবুও মানুষ বলবেই—এই ষ্টীমারকেই আমার চাই, কেন-না আমি মনে প্রাণে শক্তি, আমি

শক্তির পূজারী—(বনমালা গলে বংশীবাদন ত্রিভঙ্গঠাম মদনমোহন যে-রকম মোহনই হোক্ না কেন, ভীষণা মূর্ত্তি মুণ্ডমালিনী স্বক্কনীরঞ্জিত কালীই আমার উপাস্য।) শক্তির জন্য সুন্দরকে ত্যাগ করতে মানুষের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। যদিও এ-কথা নিশ্চিত যে, এমন কোনো একটা স্থান আছেই, যেখানে শক্তি ও সুন্দর সহজ সম্বন্ধে মিলিত হয়েছেই।

সে যা হোক্, মানুষ শক্তির পূজারীই হোক্ বা সুন্দরের পূজারীই হোক্—এবং মানুষের পক্ষে এ দুয়ের পূজাই সত্য—এ-পূজার পুরোহিত মানুষের পেশীসমূহ নয়. এ হচ্ছে তার মস্তিষ্ক—এর বোধন তার দেহে নয়,তার মনে—এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা তার কর্ম্মের সামর্থ্যে নয়, তার চিন্তার প্রাচুর্য্যে। কেন-না, চিন্তাই কর্ম্মের জন্মদাম করে। এই কারণেই জোয়ান কাবুলিওয়ালার চাইতে রোগা পি-সি রায়ের মূল্য বেশী। আজ ভীমসেন যদি কেবল এক গদা হস্তে এসে গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে এই ব'লে আস্ফালন করে—

> এই গদাঘাতে ভাঙি' ইংরেজের উরু
> কাড়ি নিব স্বরাজ-শাবকে—

তবে আমাদের মন-নদীতে যে-রসের জোয়ার আসবে সেটা হচ্ছে নিছক কৌতুক-রস। দেহের পেশীর শক্তিই যদি মানুষের শেষ আশ্রয় হ'ত, তবে পিরামিড্‌ও তৈরি হ'ত না, তাজমহলও গড়ে উঠত না। অবশ্য গণতান্ত্রিক বলতে পারে যে, পিরামিড বা তাজমহল তৈরি বা নাই-ই হ'ল, তাতে কি আসে যায়। তবে তার উত্তরে বলি যে, দেহের পেশীর শক্তিই যদি মানুষের শেষ আশ্রয় হত তবে প্রলেটারিয়েটেরও অভ্যুত্থান হ'তে পারত না। পেশীর শক্তি জড় শক্তি, বন্দুক বেয়নেটের শক্তি চিন্তার শক্তির পিছনে পিছনে চলে ব'লেই 'হোয়াইট আর্ম্মি' 'রেড আর্ম্মি' হয়ে ওঠে। প্রলেটারিয়েটরা যে উঠেছে সেটা প্রলেটারিয়েটদের শক্তিতে নয়—উচ্চতর বর্ণের চিন্তা-বিপ্লবে।

আসলে মৌর্য্যবংশ যে শূদ্রবংশ সেটাও একটা কথার কথা—একটা বাহিরের ব্যাপার। যে মুহূর্ত্তে চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে ক্ষত্রিয়। রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ আর লর্ড সল্‌স্‌বেরি বা লর্ড বিকন্‌স্‌ফিল্ড-এর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। শূদ্রের অভ্যুত্থান যদি প্রকৃতই হয়, তবে সে নিশ্চয়ই শূদ্র-শক্তি বা শূদ্র-প্রকৃতির বলে নয়। কেন-না, শূদ্র মানেই হচ্ছে পরবশ। শূদ্র যে মুহূর্ত্ত থেকে আত্মবশ হতে চায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে আর সে শূদ্র নয়। শূদ্র যদি প্রকৃতই সমাজ পরিচালনা করতে চায় তবে তাকে সে সামর্থ্য অর্জ্জন করতে হবে। আর সে সামর্থ্য অর্জ্জন করতে হ'লে তাকে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব বর্জ্জন করলে কিছুতেই চলবে না। তাকে বর্জ্জন করতে হবে শূদ্রত্বকে। কেন-না, সমাজ-সম্বন্ধে কতকগুলি মূলতত্ত্ব আছে যা দেশভেদে বা যুগভেদেও অপরিবর্ত্তনীয়। কি সে তত্ত্ব তা বলছি।

যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে, যে-কোন অবস্থাতেই হোক্ না কেন, সমাজের আমরা দেখতে পাই দুইটি অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যকরণীয় ব্যাপার। এই দুইটি আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ। অর্থাৎ যে-কোন সমাজের প্রয়োজন আছে ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে,সমাজের এই আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ কিছুতেই সুচারুরূপে ও 'এফেক্‌টিভলি' হ'তে পারে না—যদি-না নানা বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা যায়। এইখানেই আবির্ভাব হল ব্রাহ্মণের। প্রস্তর কেটে যে ধারাল অস্ত্রে পরিণত করা যায় এই আইডিয়া যার মাথায় এল সে ব্রাহ্মণ—অন্নং বহু কুর্ব্বীত এ-ও ব্রাহ্মণের বাণী। প্রলেটারিয়েটরাও সমাজের ভার নিয়ে জ্ঞান বীর্য্য ও অন্নকে এড়িয়ে চলত পারবে না। কেন-না আমি পূর্ব্বেই বলেছি ও তিন বস্তু দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদেও সমাজের পক্ষে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রলেটারিয়েটদেরও সমাজপতি হয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সৃষ্টি করতেই হবে। অর্থাৎ শূদ্র যদি সত্যি সত্যিই সমাজপতি হয়ে ওঠে তবে আর সে শূদ্র থাকতেই পারবে না। বাধ্য হয়ে তাকে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব অঙ্গীকার করতে হবে। নইলে সে সমাজকে কল্যাণের পথে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবে না—না পারবে আত্মরক্ষা করতে, না পারবে আত্মপুষ্টি করতে। Down with the tyrants-এর সঙ্গে Down with intellect

—Down with prowess—Down with economics এ-কথা চীৎকার করা চল্‌বে না। আর আজকাল এটা ত একটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, prowess বা economics-এর পিছনে intellect জিনিষটা প্রচণ্ড রকমে কার্য্যকরী হয়ে রয়েছে। সৈন্যবাহিনীর পিছনে ল্যাবরেটরি, কল-কারখানা, কৃষির পিছনে বৈজ্ঞানিক রুদ্ররূপে ও কল্যাণ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে দণ্ডায়মান। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ দুয়েকেই ধারণ করে আছে ব্রাহ্মণ। কাজেই Down with the intellectuals—Down with the commodity called brain—এ-কথা বলার অর্থ হবে এই যে, আমরা আজ আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প।

এ-সব কথা তোমার আমার কাছে স্পষ্ট, কিন্তু লাল ঝাণ্ডা ওড়ানো গণতান্ত্রিক পাণ্ডাকে কি এসব কথা বোঝানো যাবে? 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কিন্তু এ কোন্ মানুষ? গণতান্ত্রিক বলছে,—এ মানুষ সে মানুষ নয়, যে আপনার চিন্তা দ্বারা দুরতিক্রম্যকে অতিক্রম ক'রে ক'রে চলেছে—যে আপনার চেতনার দ্বারা আপনাকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেছে—যে তাজের স্বপ্ন দেখেছে—পিরামিডের অস্তিত্ব অনুভবে ধারণ করতে পেরেছে—যে আকাশ-বাতাস জয় করেছে—নিসর্গকে বস করেছে। না, এ-মানুষ সে-মানুষ নয়। এ-মানুষ হচ্ছে সেই মানুষ, যে ধূলিতলে পড়ে আছে, যার চিন্তা নিজেকেও স্পষ্ট ক'রে ধরতে পারে নি—যার একমাত্র মূলধন শারীরিক মেহনৎ, পেশীর শক্তি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আজ বলছেন, সৃষ্টির ক্লাসে 'লাষ্ট বয়' যে, তারই পাওয়া উচিত 'ফার্ষ্ট প্রাইজ'। গণতান্ত্রিক বলছে-বিশ্বরচয়িতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিকশিত-বুদ্ধি মানুষ নয়, তা হচ্ছে বিরাটকায় মেগাথিরিয়াম। অর্থাৎ সে বলছে মানুষের পরিপূর্ণ অর্থ, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, তা আইষ্টাইন বা জগদীশ বসুর মধ্যে নেই,—আছে তা ডেম্পসী বা রামমূর্ত্তির মধ্যে। গণতান্ত্রিক বলতে চায়, ভগবানের দশ অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার বুদ্ধও নয় শ্রীকৃষ্ণও নয় বা শ্রীরামচন্দ্রও নয়, তা হচ্ছে বরাহ বা নৃসিংহ।

আশা করি এতগুলো 'অর্থাৎ'-এ তুমি হাঁপিয়ে উঠবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্য মানুষ কি কোনদিনও কিষ্কড় সিং ও পি-সি রায়কে একই সিংহাসনে বসিয়ে একই পুষ্প-চন্দনে পূজা করবে? করবে না—অন্ততঃ যতদিন সে জানবে যে পি-সি রায় গায়ের জোরে কিষ্কড় সিং-এর সঙ্গে পারবেন না বটে, কিন্তু তাঁর ল্যাবেরেটরীতে এমন পদার্থ আছে যার মুষ্টিখানেকে শক্ত কিষ্কড় সিংকে একেবারে শক্তুতে পরিণত করে ফেলা যায়। শক্তু কথাটার মানে দেখতে তোমাকে আবার অভিধান খুলতে না হয়—ওর মানে হচ্ছে ছাতু। আর এই যে মুষ্টিখানেক পদার্থ বিশেষ লাভ হয়েছে কেমন করে?—তা লাভ করেছে মানুষ গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে—তার চিন্তার শক্তিতে, তার তপস্যার বলে।

আমাকে ভুল বুঝো না। আমি এ-কথা বলছি না যে, প্রলেটারিয়েট যারা, শূদ্র যারা, তাদের উন্নততর—শ্রেষ্ঠতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শিক্ষা-দীক্ষার আমোদ-প্রমোদের কোনই প্রয়োজন নেই। কিংবা এরা বেশী শিক্ষা পেলে কিংবা এদের জীবনে বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন হ'লে সমাজ-গঠন একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমি বলছি এই কথা যে, শূদ্র যতদিন শূদ্র, ততদিন এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা সে কিছুতেই করতে পারবে না, এবং যে-অবস্থায় পৌঁছলে শূদ্র তা করতে পারবে সে অবস্থায় তাকে আর শূদ্র বলা চলবে না, এবং সে অবস্থায় তার স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, শারীরিক শ্রমের চাইতে মানসিক শ্রমের মূল্য প্রকৃতই বেশী—নানা দিক থেকে। প্রথমতঃ মানসিক শ্রমই শারীরিক শ্রমের জন্ম দেয়, দ্বিতীয়তঃ মানুষের মানব-জন্মের শ্রেষ্ঠ অর্থটা রয়েছে তার মানসিক শ্রমের মধ্যে। তাই সমাজে শিক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার যত সর্ব্বব্যাপী হয়ে উঠবে,ততই সমাজ-অন্তরে চিন্তার ভাবুকতার শিল্প বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদির জন্য উচ্চ সিংহাসনের আয়োজন হ'তে থাকবে। কেন-না মানুষ যত শিক্ষিত ও স্বচ্ছন্দ হবে তত সে মনোজগতে ভাবজগতের ব্যাপারগুলোর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করবার অধিকারী হবে এবং সময় ও সুযোগ পাবে। মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক গতি আছে—স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, বাহির থেকে অন্তরে, সুনির্দ্দেশ্য থেকে অনির্দ্দেশ্যে, বাস্তব থেকে স্বপ্নে। চাই কেবল সেই মনের উদ্বোধন।

আর এই উদ্বোধন হ'তে পারে শিক্ষায় ও দীক্ষায়। মনের এই উদ্বোধন হলেই দেখা যাবে যে, মানুষ তার আশু প্রয়োজনের তাগিদকে ছাড়িয়ে উঠেছে। তখন সে বুঝবে যে, যেটা সবার চাইতে স্পষ্ট সেইটেই সবার চাইতে প্রধান নয়। কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে, শিক্ষার যত প্রসার বাড়বে ততই আমাদের দলের লোকের জয়জয়কার হবে—আমাদের দলের লোক, অর্থাৎ যারা মানুষের মস্তিষ্ককে মানুষের পেশীর চাইতে উঁচুতে স্থান দেয়। সুতরাং প্রলেটারিয়েট্‌রা শিক্ষায় দীক্ষায় সভ্যতর ভব্যতর হ'য়ে উঠুক—এর বিরুদ্ধ মত আমাদের হতেই পারে না। একমাত্র অশিক্ষিত বর্ব্বরকে দিয়েই 'ভ্যাণ্ডালিজ্‌মে'র কাজ চলে, শিক্ষিত সভ্য মানুষের দ্বারা নয়। একটা গুর্খা পুলিস যা করতে পারে, তুমি আমি তা পারিনে।

এতক্ষণ আমি যা বলেছি সে কেবল সমাজ-শাসন সমাজ-পোষণ সমাজ-রক্ষা ইত্যাদির দিক্ থেকে। কিন্তু এর চাইতে একটা বড় দিক আছে। যেটা মানুষের বৃহত্তর দিক। এই বৃহত্তর দিকটার কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ ক্রমাগত আপনাকে প্রকাশ ক'রে ক'রে চলেছে। বিশ্বমানবের প্রগতির কথাটা যদি নাই-ই মানা যায়, তার গতির কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এই যে গতি, এই গতির মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব-মানবের মানব-সভ্যতার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা, বড় অর্থটা, অবশ্য জড়ের চাইতে জীবকে যদি বড় ব'লে স্বীকার করা যায়—যা আমরা সবাই করি। এখন এই যে গতি—যা মানব-সভ্যতার বড় অর্থ, প্রকৃত তাৎপর্য্য—এই গতিকে গতি দান করছে মানুষের কি? তার হাত নয়, তার মস্তিষ্ক। অর্থাৎ তার শারীরিক শ্রম নয়, তার চিন্তার শক্তি। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটে হুলুস্থুল প'ড়ে যায়। কিন্তু সারা পৃথিবীর ভাবুকরা, intellectuals যারা, তারা যদি ধর্ম্মঘট করে, তবে কি ব্যাপার দাঁড়ায় সেটা একবার কল্পনা করবার চেষ্টা কর। সে যা হোক্, বিশ্ব-মানবের যতদিন এই গতি থাক্‌বে, ততদিন মানুষের মস্তিষ্ককে লাষ্ট ক্লাসে ফেলে দিতে চাইলেও তা লাষ্ট ক্লাসে প'ড়ে থাক্‌বে না। সে একদিক দিয়ে না এক-দিক দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। আসলে সমস্ত ইতিহাস যদি অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে দেখ, তবে দেখবে যে, সমাজে যেখানে যেখানে বিপ্লব ঘটেছে, সেখানে সেখানেই ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, সমাজপতিরা সেখানে মস্তিষ্কের শক্তি হারিয়েছে, সুতরাং গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষোড়শ লুইয়ের ফ্রান্স, আবদুল হামিদের তুরস্ক, দ্বিতীয় নিকোলাসের রাশিয়া বা আমাদের স্মৃতিচঞ্চুদের হিন্দুসমাজ—এ সকলেরই ভেতরের কথাটা হচ্ছে এই যে এদের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের চিন্তাশক্তিও গিয়েছে, imaginationও গিয়েছে। সেই দুটি বস্তুই মানুষের গতিদান করে। কাজেই এমন মানুষের দরকার হয়েছিল, যারা হবে more dynamic. আমরা বাহিরের দিক থেকে বল্‌ছি বটে, ফ্রান্সে অভিজাত গিয়ে বুর্জ্জোয়া এল, বা রাশিয়াতে রাজা গিয়ে গণ এল, বা আমাদের হিন্দুসমাজে স্মৃতিচঞ্চু গিয়ে Ph. D. বা M. Sc. এল, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে দেখছি কেবল এক বস্তু গিয়ে আর এক বস্তু এল—মস্তিষ্কহীন গিয়ে চিন্তাবীর এল—অর্থাৎ জড় গিয়ে চৈতন্য এল—স্থাবরত্ব গিয়ে গতিশীলতা এল। সুতরাং dignity of labour যত উঁচুতেই স্থাপন করা যাক না কেন, মস্তিষ্ক তারও উঁচুতে আপনার স্থান করে নেবেই নেবে।

এই সব কথা মনে করেই আশা করি এ-কথা ভাবা চলে যে, গণতান্ত্রিক আজ যে রকম ক্রুদ্ধই হোক্ না কেন, হাতে মাথা-কাটা কিছুতেই চল্‌বে না—মাথা কেশকলাপে কেশরঞ্জন তেল মেখে বসে থাকলেও নয়। মাথার যদি অভাব হয় তবে সবার আগে অকর্ম্মণ্য হবে হাত।

সুতরাং মাভৈঃ—রাজতন্ত্রই হোক বা গণতন্ত্রই হোক্, ফ্যাশিজম্‌ই হোক বা বলশেভিজম্‌ই হোক, এদের মাথায় যারা থাক্‌বে তারা হবে মাথাওয়ালা লোক। অর্থাৎ এ পৃথিবীর সভ্য-সমাজে চিরকাল জয় জয়কার হবে হাতের নয়, মাথার—দেহের নয়, মনের—জড়ের নয় চৈতন্যের।

আমার এই প্রকাণ্ড গবেষণাময় পত্র পড়ে তোমার মাথা ধরবে না এই আশা ক'রে আজ এইখানে শেষ দাঁড়ি টানছি।

ইতি—

তোমার হসন্ত

প্রকৃতি ও মুসলমান

মোতাহের হোসেন, বি-এ

১

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ অস্বীকার করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। ঋতুপর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে বার বার একটি অতিথি আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হচ্ছে, তাকে বরণ ক'রে নেওয়ার উপরই নির্ভর করছে আমাদের জীবনের সত্যিকার আনন্দ।

কিন্তু, মানুষ আজ এতটা বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে যে, প্রকৃতির স্পর্শ এখন আর তার অন্তরে কোনো স্থর-সঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি তার কাছে এখন একটা মৃত জড়পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, মানুষের সমাজের দিকে চাইলে আজ স্বতঃই মনে হয়, আকাশের আলো, বনানীর শ্যামলিমা, আর কুসুমের লালিমা বিধাতার এক বিরাট ব্যর্থ সৃষ্টি।

প্রকৃতির অন্তর-তলে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত যে গোপন প্রাণ-গঙ্গা-ধারা, তারই তরঙ্গের তালে যে মানুষের হৃদয়-গঙ্গাও আন্দোলিত, সে কথা আমরা একেবারে বিস্মৃত হয়েছি। পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের সুপ্ত-প্রেমকে জাগ্রত করে না, শ্রাবণ শর্ব্বরী হৃদয়ের ক্রন্দসীকে ব্যথিয়ে তোলে না, আর বসন্তের দখিণ হাওয়াকে দক্ষিণা না পেয়েই আমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিতে হয়।

এমনি চরম বস্তুতান্ত্রিকতার দিনে যদিও আয়োজনের মাত্রা প্রয়োজনের চাইতে ঢের বেশী বেড়ে যাচ্ছে, তবুও মানুষের প্রাণের আনন্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে না মোটেই। কেন না, মানুষ ভুলে গেছে; আনন্দ অন্তরের জিনিষ, বাইরের সরঞ্জাম তা-বৃদ্ধি করতে পারে মাত্র, সৃষ্টি করতে পারে না। অন্তরকে আনন্দিত ও সরস রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্বের কীট-পতঙ্গ, তৃণ-লতা, সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা। তা করলেই দেখতে পাব, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতির আনন্দোৎসবে আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে, আর সেই নিমন্ত্রণে আমাদের হৃদয়ও আনন্দের অতিশয্যে আত্মহারা হ'য়ে নৃত্য করছে।

সমস্ত জিনিষের মধ্যে হৃদয় প্রসারিত ক'রে দিয়ে তা থেকে রস যেন আন্‌তে পারছিনে ব'লেই আজ আমরা দীন—আনন্দহীন, আর আমাদের অন্তরের দীনতা ও আনন্দহীনতাই বাইরে নানা আকারে প্রকটিত। তাই, বাইরের দিক থেকে এই দৈন্য দূর করবার চেষ্টা বৃথা, চেষ্টা করতে হ'বে অন্তরের দিক থেকে। এই অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশীর প্রণয়-প্রসাদ লাভ করতে পারলে, হয়তো শত দুঃখের মাঝেও, আমাদের অন্তর-লোকে আনন্দের কমল ফুটে উঠত—যে আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েও সার্থক, যার জন্য সুখ-আরামের পেলব শয্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকার যুগে এসব কথা বলা আর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে শ্রোতার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলা একই কথা।

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে একদিন কবি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন,

"The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers:
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon."

কালধর্ম্মে আজ সমস্ত জগতই বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু বাংলার মুসলমান-সমাজ বস্তুহীন হ'য়েও এই বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে যতটা এগিয়ে গেছে, যা এদেশের অন্য কোন সমাজই ততটা পারে নি। কি ধর্ম্ম-ব্যাপারে, কি সমাজ-ব্যাপারে, কি জীবনের ভোগ-বিলাসিতায়, আমরা সর্ব্বদাই স্থূলতার পূজা ক'রে আসছি। ধর্ম্ম আমাদের অনুভূতিহীন পদ্ধতি-সর্ব্বস্ব;

সমাজ আমাদের অতিরিক্ত আদব-কায়দার চাপে স্ফূর্ত্তিহীন; আর জীবন আমাদের মোটা বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম-বোধ আমাদের অন্তর্হিত; ধর্ম্ম-ভীতির নিবিড় অন্ধকারে আমরা দিশেহারা। এমনি দুর্দ্দশার দিনে গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার মত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর ভাষায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে,—

"Wordsworth, Muslim hath need of thee,

কেন-না, তাঁর মত একজন দৃষ্টিমান ঋষি হয়ত দরদীর মতো আমাদের জীবনের স্থূলতার নিন্দা ক'রে আমাদিগকে কিছুটা প্রকৃতি স্পর্শানুরাগী ক'রে তুলতে পারতেন।

কিন্তু, দুঃখ এই যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর মত লোক হয়ত আমাদের সমাজে টিঁকে থাকতে পারবেন না। কারণ, সমাজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অতৃপ্তির সুর আমরা মোটেই সহ্য কর্ত্তে পারিনে, সমাজের সাফাই গানেওয়ালা আদমীই আমাদের প্রিয়। 'আমাদের সব ভাল, আমাদের সমাজ-জীবন নিষ্কলুষ,' এহেন অহমিকাপূর্ণ বাণীর উদ্গাতাকেই আমরা নেতৃস্থানীয় বলে বরণ ক'রে নিই। কিন্তু এ সমস্ত উক্তি যে আমাদের উপকারের চাইতে সর্ব্বনাশই করছে বেশী, সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। এই ঘুম-পাড়ানি গানের মাদকতাগুণেই আজও আমরা সুখে দিবানিদ্রা যাচ্ছি। 'আমাদের যা আছে তাই যথেষ্ট, আমাদের সমাজের পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক,' এই অহঙ্কার-বোধই আজ আমাদের প্রগতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজের সমাজের গুণ গাইতে গিয়ে অন্য সমাজের নিন্দা-প্রচারেও আমরা পঞ্চমুখ। পর-দোষালোচনায় আত্ম-সংশোধন হয় না, আত্ম-দোষালোচনায়ই হয়, এই সাধারণ সত্যটুকু বুঝবার মত শক্তিও আমাদের নেতাদের নেই—এমনি দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়েছি আমরা! ধর্ম্মান্ধতার কড়া মদ পান করিয়েই নেতৃবর্গ সহজে আমাদের বাহবা লাভে সক্ষম; সুতরাং সমাজের জন্য, কি মানসিক কি শারীরিক, সর্ব্বপ্রকারের কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম হ'তেই তাঁরা চিরমুক্ত। Necessity is the mother of invention অভাবই নব সৃষ্টির জনয়িত্রী; কিন্তু আমাদের অভাব-জ্ঞানই নেই, সুতরাং নবসৃষ্টির আশাও সুদূর পরাহত। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে আমাদের এই যে অতিরিক্ত সন্তুষ্টি, এই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, দুঃখ এই যে, বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু পীড়া অনুভব করেন, এহেন ব্যক্তি আজ আমাদের সমাজে খুবই বিরল।

আমাদের জীবনের রসহীনতার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে সেখানে সরসতার নির্ঝর বহাতে পারেন এহেন ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবির্ভূত হন নি। হ'লে বোধ হয় সমাজের চেহারা অন্য রকম হ'ত। তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের নিকট থেকে তাঁরা কি প্রকার সম্ভাষণ পেয়েছেন, এক শ্রেণীর মাসিক ও সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টালেই তা সহজে বুঝতে পারা যায়। তাই ব'লে সমাজের বিপক্ষতায় ভীত হ'য়ে তাঁদের ব'সে থাকলে চলবে না। কেন-না, Public calamity is a mighty leveller, আর দুর্গতি আমাদের যখন চরমে এসে পৌঁছেছে, তখন যত শক্তিহীনই হই না কেন আমরা, আমাদের স্বীয় কাজটুকু ক'রে যেতেই হবে, শক্তিমানদের আগমনের অপেক্ষায় থাকলে শুধু সময়-ক্ষেপই হবে।

৩

নীরসতাই নিষ্ঠুরতার জন্মভূমি, আর আমাদের জীবনে যে নিষ্ঠুরতার লীলা চলছে, নীরসতাই যে তার মূলে রস জুগিয়ে আসছে সে কথা বলা বাহুল্য। যত ভাল বীজই উপ্ত হোক না কেন, রসহীন শুষ্ক ভূমি কখনও কিছু উৎপাদনক্ষম নয়। আমাদের জীবনে শিক্ষার বীজ কোনো ভাল ফল ফলাতে পারছে না, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে, চিত্ত-ভূমির রসহীনতাই তার প্রধান কারণ।

আমাদের উৎসবগুলি আনন্দহীন। বৎসরে দু-বার ঈদ আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয়। কিন্তু এক জিহ্বার রস ছাড়া আর কোনো রসই তারা ক্ষরণ করতে পারে না। আর করবেই বা কি ক'রে, সমাজের যাঁরা

শ্রীবৃদ্ধিশীর সেই আলেম সম্প্রদায়ই যে অতিরিক্ত puritanism-এর চর্চায় রসহীন, শুষ্ক, প্রসন্নতার প্রীতির ছাপ তাঁদের চেহারায় নেই,—সেখানে সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় একটা রুক্ষতা আর অপ্রসন্নতার ভাব। তরুণদের প্রতি এঁদের একটুও মমত্ববোধ থাকলে হয়ত এই উৎসবগুলি সঙ্গীতে শোভায় সত্যিকার উৎসবে পরিণত হ'ত। কিন্তু, সে আশা করা অনেকটা আগ্নেয়-গিরির নিকট জল ভিক্ষার মতই নিষ্ফল।

প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের পানে চাইলে আজ স্বতই মনে হয় তাদের উৎসবগুলি কত সজীব, কত আনন্দময়।

হিন্দুরা বিশ্বপ্রবিষ্ট সগুণ ব্রহ্মেরও পূজা করে থাকে। Transcendant যিনি তিনি Immanent-ও, সসীম অসীমেরই একটা খণ্ড প্রকাশ, এই ধারণা তাদের আছে। সুতরাং প্রকৃতির স্পর্শের মধ্য দিয়ে ভগবানের স্পর্শলাভ করা হিন্দুদের নিকট একটা ধর্ম্ম-ব্যাপার বলেই বিবেচিত হয়। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে যে রসধারা তাতে অবগাহন ক'রে চিত্তকে সরস করে তোলার আর্ট তারা জানে।

মুসলমান তার জীবন সরস ক'রে তুলতে চাইলে আজ তাকে এ-দিকটা সাদরে গ্রহণ ক'রে নিতে হবে। অন্যের অনুকরণ করছি, এই বোধের লজ্জাটা যেন আজ আর তাকে ম্রিয়মাণ ক'রে না তোলে; কেন-না 'নিবে আর দিবে মিলাবে মিলিবে,' এই হ'ল আজকার যুগের মন্ত্র। আর বহু বছর ধরে পাশাপাশি বাস ক'রেও উভয়ে উভয়ের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হ'ব না, এই ধারণার মত অদ্ভুত দ্বিতীয় ধারণা কিছু আছে কি না সন্দেহ। পারিপার্শ্বিককে বঞ্চনা ক'রে চল্‌তে পারে এক মৃত যে সে-ই, জীবন্ত ব্যক্তি তার চারদিককার আবহাওয়া থেকে রস গ্রহণ ক'রেই জীবন্ত। অবশ্য প্রতিপক্ষের এখানে আপত্তি হ'তে পারে, Pantheism ত একেবারে অনিন্দ্য মতবাদ নয়; সুতরাং একে আমাদের জীবনে গ্রহণ করবার এতটা আগ্রহ কেন? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, কোন ismই ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়; সব ism এরই ভাল মন্দ দিক আছে। সুতরাং Pantheism'এর বেলায়ও তার মন্দ দিকটা, অন্য কথায় তার নীচের তলার Paganism-টা বাদ দিয়ে, তার ভাল দিকটা গ্রহণ করতে বললে আশা করি আমার ঘোর অন্যায় হবে না।

আর একটা কথা, এই Pantheistic ভাবটা মুসলমানের জীবনে একেবারে নতুনও নয়। পারস্যের সুফী কবিদের জীবনে এ রকম প্রভাব ছিল না। সাধারণের ইসলাম ও ও সুফীর ইসলামের পার্থক্যটা কি, দার্শনিক লেখক বরকত উল্লাহ্ সাহেবের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ "সুফীমত ও বেদান্ত" হ'তে খানিকটা উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করছি। তিনি বল্‌ছেন,—

"ইসলাম যেখানে বলে 'এক আল্লাহ্ ভিন্ন দ্বিতীয় আল্লাহ্ কেহ নাই,' সুফী যেখানে বলেন, "এক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই নাই।' সুফীর আল্লাহ্ সপ্ততল আকাশের উপরে সত্তর হাজার পর্দায় ঘেরা থাকে না। তিনি সুফীর অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন। শুধু তাঁর একার অন্তরে নয়, জগতে যা-কিছু আছে, সকলের ভিতরই সেই পরম সত্তা স্পন্দন দিতেছে।"*

এই উক্তিটি কি বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে না? সুতরাং শুধু Carpenter God-এর নীরস পূজায় মত্ত না থেকে রসস্বরূপ চৈতন্যময় আল্লাহ্‌র পূজায় মুসলমানের কি আপত্তি হ'তে পারে, আমার জানা নেই।

প্রকৃতিকে অবজ্ঞা না ক'রে তার থেকে রস টেনে জীবনকে সরস করে তোলাই আমাদের কর্ত্তব্য। চিত্তের এই সরসতার উৎস থেকেই সৃষ্টি হবে আমাদের সাহিত্য দর্শন আর শিল্প। পাখীর কাকলি, কুসুমের গন্ধ আজ আমাদের জীবনকে আকুলিত করে তুলুক, আর সপ্ত রঙের মেঘের মেলা আমাদের চক্ষে রূপের অঞ্জন বুলিয়ে দিক্। তাহলেই দেখতে পাব, আমাদের কাছে জীবন মধুময়, জগৎ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমার এই কথাগুলোকে হয় ত আমার কেজো বন্ধু অতিরিক্ত কাব্য বলে উড়িয়ে দেবেন। তাঁকে তাই বলে রাখ্‌ছি, একটু কাব্যের আমেজ ছাড়া জীবনের আনন্দই যে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। বলতে কি, মানুষের জীবনটাই একটা কাব্য; সুতরাং জীবনের রসহীনতার চর্চ্চা করা আর মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করা একই কথা। আর এটা সমন্বয়ের যুগ, সুতরাং কেজো লোককে করতে হবে

* "বার্ষিক, সওগাত"—দ্বিতীয় বর্ষ।

রাত-ভিখারী

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ

১

রাত-ভিখারীর কান্না ওঠে গলির মাঝে ওই,
বিজনপথে নাই কোনো জন রাত-ভিখারী বই !
আঁধার কুটিল রাস্তা হ'তে
কান্না ওঠে করুণ স্রোতে।
সেই সুরেতে মন যে কাঁদে উদাস হয়ে রই।
রাত-ভিখারীর কান্না শুনি গলির মাঝে ওই !

২

রাত-ভিখারী চল্‌ছে কেঁদে,—গাইছে কত গান ;
কাঁকর-কুচি পাষাণ-আঁটা, কাঁদে পথের প্রাণ।
চল্‌ছে কেঁদে আপন মনে,
ব্যথা শোনায় জনে জনে ;
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার,—নেই কিছু আজ দান।
পথের উপর যায় যে বহে একলা দুখের বান !

৩

দিনের আলোয় খঞ্জ, কালা, কুষ্ঠরুগী আর
অলিগলির মোড়ে মোড়ে দেখি হাজার বার ;
ওদের করুণ কান্নাকাটি
শুনি, তবু কান না পাতি।
মর্ম্ম বুঝি রাত-ভিখারীর গভীর বেদনার।
চোখের কোণে উপ্‌ছে ওঠে অশ্রু-পারাবার !

৪

ওদের কি গো নেই বেরুতে দিন-দুপুরের মাঝ ?
দিন্ দুনিয়ায় এ যে রে ভাই সৃষ্টিছাড়া কাজ !
কাঁদ্‌তে ওদের এমনি ক'রে,
কে শেখাল ? কি মন্তরে ?
আঁধার রাত্তি ক্ষণে ক্ষণে খসিয়ে ওঠে আজ !
কেউ দেখেছে এমন ধারা দিন্ দুনিয়ার মাঝ ?

৫

রাত্রি যখন নিদ্রামগন, রুদ্ধ সকল ঘর,
রাত-ভিখারী বাহির হ'ল তখন পথের 'পর।
দিনের হাটের এত শেষে
বাহির হ'ল কি উদ্দেশে ?
কান্না শুনে ভিক্ষা দিতে ভোলে যে অন্তর !
আঁধার পথের পথিক যে জন কোন্‌খানে তার ভর ?

৬

দিন্-ভিখারী দিনের আলোয় ভিক্ষা হাঁকে হায়,
রাত-ভিখারী কান্না শোনায় বিজন বেদনায় !
কণ্ঠ কাঁদে ভিক্ষাছলে,
ভাসায় সবায় চোখের জলে ;
আদিম যুগের মনের কথা পথে পথেই গায়।
হারিয়ে-যাওয়ার বেদন-বাণী ওই যে শোনা যায় !

৭

হারিয়ে-যাওয়ার নীরব বাণী শুনে যে চম্‌কাই !
দো-তলার এই ঘরে শুয়ে উদাস হয়ে যাই।
ধরণী কার প্রতীক্ষাতে
ঠায় দাঁড়িয়ে নিঝুম রাতে,
হাত বাড়িয়ে নেবে তুলে—প্রহর গণি তাই।
আপন ব'লে আঁকড়ে ধরি—নাই কিছু আজ নাই !

৮

বেদন বুকের গুমোট ভাষায় ওই ডাকে ফের শোন্ ;
কান্না অত শোনায় কারে ? পথ আজি নির্জ্জন !
আমার ঘরের জান্‌লা তলায়
কান্না ওঠে,—মন যে গলায় ;
ব্যথার চেয়ে ভয় যে কেমন ভরিয়ে তোলে মন !
শূন্য পথের এক্‌লা পথিক ঐ কাঁদে ফের শোন্।

৯

ভাব্‌ছি শুয়ে,—এই সড়কে চলি ত দিনরাত,
কতই চেনা—শতেক কাজে কতই যাতায়াত !
তবু ভাবি আজকে রাতে
রাত ভিখারীর কান্না সাথে
পথের ওপর কি ভয়ানক মরণ ছায়াপাত।
দু' পাশের দুই বাড়ীর মাঝে শ্মশান অকস্মাৎ !

১০

গৃহবাসীর গোপন সুখে সাধ্‌ল কে রে বাদ।
মুখর বধূর মুখ থেমে যায়—মরণ অবসাদ !
কাহার করুণ আর্ত্তনাদে
ঘরের পাষাণ দেওয়াল কাঁদে ?
জমাট বাঁধন্ পাথর নড়ে !—একি আর্ত্তনাদ !
ভাঙ্‌ল আজি মুখর বধূর রাত্রি জাগার সাধ !

১১

পূর্ণিমারাত, একাদশী —আজকে তিথি কোন্ ?
এই তিথিতেই বাহির হবে, এ যে ভীষণ পণ!
ভাবি,—যেন, ওর ওই সুরে
চলে গেছি অনেক দূরে,
অনেক দেখা পথের শেষে কোন্ সে অদর্শন ?
সকল গানের শেষের কলি—বুকভাঙা বেদন !

১২

রাত-ভিখারীর রাত কাঁপানো ঐ যে করুণ ভাষ,—
অনন্তেরি গোপন দুখের বেদন-পরকাশ !
জাগিয়ে তোলে এই পৃথিবীর
চির-যুগের কান্না গভীর !
জাগিয়ে তোলে ব্যথিত্ বুকের মৌন ইতিহাস,
রাত-ভিখারীর রাত কাঁপানো ঐ যে করুণ ভাষ।
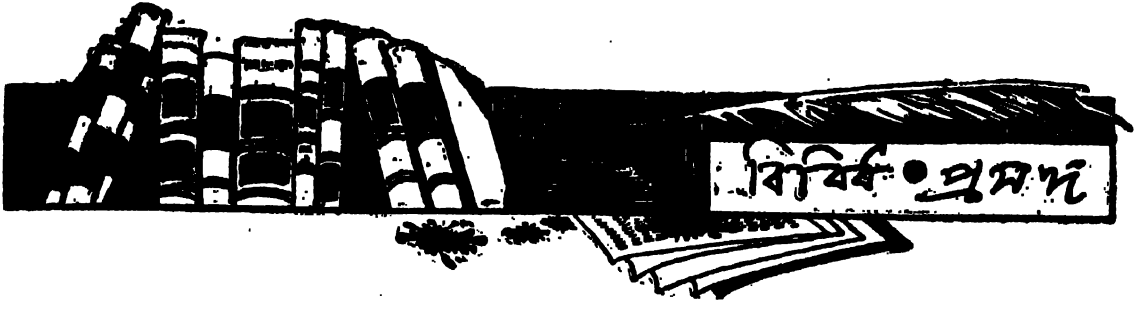
জীবনযাপনের নূতন সরকারী উপায়

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ শাসনের পলিসি বা নীতি এরূপ চমৎকার আকার ধারণ করিয়াছে, যে, অনেক সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জেলে যাওয়া ব্যতীত জীবনধারণের অন্য কোন উপায় বেশী দিনের জন্য অবলম্বন করিতে হইতেছে না; তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ জেলে যাইতে হইতেছে।

—

বিঠলভাই পটেলের কারামুক্তি

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেলের স্বাস্থ্য জেলে অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই খালাস দিয়া সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। তিনি গুজরাটের মানুষ। অথচ তাঁহাকে প্রথমে কয়েদ করিয়া রাখা হয় পঞ্জাবের অম্বালা জেলে। সেখানে পীড়িত অবস্থায় তাঁহার যথোচিত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হয় নাই। তখন তাঁহাকে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোইম্বাটুর জেলে বদলী করা হয়- গুজরাটের কোন জেলে নহে! সেখানেও তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় এবং যথোচিত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রার্থনা, তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া লোকহিতব্রত পালনে আবার প্রবৃত্ত হউন।

—

সর্দ্দার পটেল বন্দী

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল যেমন কারামুক্ত হইয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহার ভ্রাতা সর্দ্দার পটেল নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইনি যখন কারামুক্ত হইবেন, তখন বা তাহার পূর্ব্বে হয়ত তাঁহার ভ্রাতা বিঠলভাই আবার বন্দী হইবেন!

—

"সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ"

সাহিত্য ও চিন্তার অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আজকাল বাংলা কোন মাসিক কাগজেই ভাল করিয়া সাহিত্য সমালোচনা হয় না। তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখা পড়িলে তাহা বুঝা যায়। ইহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে, যদি প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ "সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ পান। রবীন্দ্র-পরিষদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুটি প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে সুবর্ণ পদক এবং রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বহি পুরস্কার দিবেন। "যে-কোন কলেজের ছাত্র ও রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্ট এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন।" প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন ২৭শে মাঘ; পাঠাইবার ঠিকানা—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১০৪ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কিংবা রবীন্দ্র-পরিষদের সম্পাদক, ষ্টুডেণ্টস্ কমন-রুম, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

—

জার্ম্মেনীতে চিত্রাঙ্গদার অভিনয়

জার্ম্মেনীর মূনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রেরা দরিদ্র জার্ম্যান ছাত্রদের সাহায্যার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়

উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা বাংলায় হইলেও জার্ম্মান্ শ্রোতৃবর্গ কথোপকথনের স্বরলালিত্য, অভিনেতাদের ভঙ্গী, এবং বাংলা গান এবং ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অভিনয়ের গুণে আখ্যানটি এতটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, অভিনয় আর এক রাত্রি করিতে হইয়াছিল।

ম্যুনিকের জার্ম্মান-সমাজের বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। বাঙালী ছাত্রেরা জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জার্ম্মান-পরিবারসমূহে যে সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এই অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় এত ভাল হইয়াছিল, যে, ম্যুনিকের একখানি কাগজ ইহা যে, সৌখীন অভিনেতাদের অভিনয়, পেশাদারদের নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তথাকার অন্য একটি কাগজে লেখা হইয়াছে, যে, এই অভিনয় দ্বারা এশিয়া ও ইউরোপকে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

—

"সামরিক আইন, কিংবা—"

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল তথাকার ভারতীয় লিবার‍্যাল বা উদারনৈতিকদের মুখপত্র। মিষ্টার উইলসন তাহার সম্পাদক। তিনি এখন ছুটি লইয়া, "গোল-টেবিল" বৈঠকে "প্রতিনিধি" হইয়া যে-সব ভারতীয় লিবার‍্যাল গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহ-যোগিতা করিতে নিযুক্ত আছেন। তিনি প্রায়ই উক্ত বৈঠক সম্বন্ধে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি এই মর্ম্মের একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, "শুনা যাইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারত গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে এই আতঙ্কজনক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে হয় সামরিক আইন জারী করিতে হইবে, কিংবা গোলটেবিল বৈঠকে রাষ্ট্রীয় প্রগতিসূচক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।" মিঃ উইলসনের টেলিগ্রামের কোন সরকারী প্রতিবাদ আমরা দেখি নাই। অবশ্য, কোন কথার প্রতিবাদ না হইলেই যে তাহা নিশ্চয়ই সত্য, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু উইলসন সাহেব যদি ঠিক খবর পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার মানে এই দাঁড়ায়, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট সত্যাগ্রহ দমন করিবার নিমিত্ত সামরিক আইন ছাড়া অন্য সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন; সুতরাং এখন দুই উপায়ের একটি অবলম্বন করিতে হইবে—(১) সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সামরিক আইন জারী করিতে হইবে, কিংবা (২) সত্যাগ্রহীরা যাহাতে সন্তুষ্ট হন গোলটেবিল বৈঠকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

—

ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষের মুক্তি

পেশাওয়ারের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষের গত বৎসর মে মাসে ফৌজদারী বিধির সংশোধন অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ড হইয়াছিল। এই দণ্ড যে বে-আইনী হইয়াছিল, লাহোরের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক ট্রিবিউন এবং হিন্দু হেরাল্ড তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছিলেন। এত দিন পরে আপীলে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইয়াছেন। ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে কলেজে প্রবাসীর সম্পাদকের ছাত্র ছিলেন। তাহার পর বোম্বাই গিয়া তথাকার সরকারী মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার হন। তাঁহার বাড়ী হুগলী জেলার ইলসোবা-মোণ্ডলাই গ্রামে। অনেক বৎসর হইল তিনি একবার বিনা বিচারে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার নির্দ্দোষিতা উপলব্ধ হওয়ায় তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া পেশাওয়ারে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন। এবারও তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বদেশপ্রেমিক মুসলমানদের উপর তাঁহার খুব প্রভাব আছে, ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত অপরাধ।

—

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক কন্‌ফারেন্স

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটগৃহে গত ২রা জানুয়ারী নিখিল-ভারত অর্থনৈতিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন

আরম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের মিণ্টো অধ্যাপক ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণের অন্য অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেন, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্টের সামরিক বিভাগের ব্যয় দশ বৎসরের মধ্যে কুড়ি কোটি টাকা কমাইয়া ফেলা উচিত। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, যে, জীবনধারণের জন্য আবশ্যক দেশের সব জিনিষেরই দাম যখন কমিয়া গিয়াছে তখন সিবিল সার্বিসের কর্ম্মচারী-দের বেতনের হার এখন কমাইয়া দেওয়া উচিত। যদি রাজনৈতিক কারণে এখন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের বেতন কমান সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে তিনি বলেন কেবল ভারতীয় কর্ম্মচারীদেরই বেতন কমান হউক। বেতন কমান উচিত, আমাদেরও তাহা মত বটে। কিন্তু তিনি বেতন কমাইবার যে কারণ দেখাইয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। জিনিষপত্রের দর কমিয়াছে বলিয়া যদি বেতন কমাইতে হয়, তাহা হইলে সেই কম দর দীর্ঘ-কালস্থায়ী হইবে কি না, বিবেচনা করিতে হইবে। ইউরোপীয় সিবিলিয়ানদের বেতন না কমাইয়া কেবল দেশী সিবিলিয়ানদের বেতন কমাইলে, তাহাতেও আপত্তির কারণ ঘটিবে। স্বেচ্ছায় কেহ অল্প বেতন লইলে বা বিনা বেতনে কাজ করিলে তাহাতে তাঁহার সম্মান বাড়ে। নতুবা সচরাচর লোকে কম বেতনের লোককে কম যোগ্য মনে করিয়া থাকে। দেশী কর্ম্মচারীরা কম বেতন পান বলিয়া তাঁহাদের যোগ্যতা কম, এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া ঠিক্ নয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দেশী সিবিলিয়ানদের খরচ ইংরেজদের চেয়ে কম নয়। কাহারও কাহারও বেশীও হয়। কারণ, একদিকে তাঁহাদিগকে বিলাতী ধাঁচে থাকিতে হয়, অন্য দিকে ভারতীয় প্রথা অনুসারে আত্মীয়স্বজনকেও টাকা দিতে হয়। ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইবার প্রধান কারণ এই, যে, এই পরাধীন দরিদ্র দেশের ঐ সকল কর্ম্মচারী আমেরিকার মত ধনী স্বাধীন দেশের তদ্রূপ পদস্থ লোকদের চেয়ে বেশী বেতন পান। এদেশের গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্ব আমেরিকার তুলনায় অনেক কম এবং এদেশে জীবনধারণের ব্যয় আমেরিকার জীবনধারণের ব্যয় অপেক্ষাও অনেক কম; সুতরাং উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতনও কম হওয়া উচিত। জাপানের লোকদের মাথা-পিছু গড় আয় ভারতীদের চেয়ে বেশী, জাপানের মোট রাজস্বও ভারতের রাজস্বের চেয়ে বেশী; অথচ জাপানের প্রধান মন্ত্রীর মত রাজপুরুষেরও বেতন ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ে কম। প্রকৃত কথা এই যে, ভারতবর্ষে উচ্চ পদগুলির বেতন ইংরেজদের খাঁই অনুসারে এবং তাহাদিগকে ঘুষ লওয়া হইতে বিরত রাখিবার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলে বেতনের হার কখনই এত বেশী রাখিবে না, রাখিতে পারিবে না।

প্রমথ বাবু যে বলিয়াছেন, যে, এ সময়ে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিলে লোকের মনে অসন্তোষ বাড়িবে এবং ভারতবর্ষে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে তদনুসারে কাজ চালান বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, তাহা সত্য কথা।

—

সেন্সসের বিরুদ্ধাচরণ

শীঘ্রই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে। দশ দশ বৎসর অন্তর ইহা হইয়া থাকে। কংগ্রেস আইন অমান্য করিতে এবং সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করিতে বলিয়াছেন, অতএব সরকারী সেন্সসের বিরোধিতা করা উচিত, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোথাও কোথাও লোকসংখ্যা গণনার বন্দোবস্তে কংগ্রেস-ওয়ালারা বাধা দিতেছেন। নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কিংবা তাহার কোন নিখিল-ভারতীয় কমিটি সেন্সসে বাধা দিতে বলিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কংগ্রেসের এরূপ কোন সিদ্ধান্ত থাকিলেও আমরা এবিষয়ে বাধাপ্রদান-নীতির বিরোধী। সত্য বটে, লোকসংখ্যা গণনায় ভুল থাকে, এবং সেন্সসের অপব্যবহারও গবর্ন্মেণ্ট করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষে, বাস্তবিক যত ভাষা আছে, যত জাতি ও জা'ত (caste) আছে, যত "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" লোক আছে, তাহাদের সংখ্যা এমন ভাবে সেন্সসে লেখা হইয়া আসিয়াছে, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের

একত্বের অভাব এবং বৈসাদৃশ্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বিদেশী লোকদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। ইংরেজরা এই ধারণার সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেন্সসের সুব্যবহার আমরা অনেক করিতে পারি, এবং বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা আমরা করিতে পারি ও করিয়াছি। স্বরাজ্য স্থাপিত হইলেও সেন্সসের আবশ্যক হইবে।

এই সকল কারণে আমরা সেন্সস হইতে দেওয়ায় আপত্তি করি না। কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা অনিষ্টকর, তাহার সংশোধন করা নিশ্চয়ই উচিত। প্রধানতঃ পঞ্জাবে এই চেষ্টা হইতেছে, যে, হিন্দুদিগকে যেন নিজেদের জা'ত লেখাইতে বাধ্য করা না হয়। "আমি হিন্দু" ইহা লেখানই যথেষ্ট; কোন্ জা'তের হিন্দু তাহা বলিতে কেন মানুষকে বাধ্য করা হইবে? মানুষকে জা'ত লিখাইতে বাধ্য করিবার মধ্যে যে অন্যায় ও অপমান আছে, তাহার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বঙ্গে যেমন জাতিবিশেষের লোকেরা হয়ত মদ বিক্রী করিত এখন করে না, তেমনি পঞ্জাবের আহ্‌লুওয়ালিয়া এবং পশ্চিমের জায়সবাল ও কালোয়াররা হয়ত আগে সবাই মদ বিক্রী করিত, এখন অনেকেই করে না। এখন এই সমস্ত লোককে পূর্ব্বপুরুষদের পেশা লিখাইতে বাধ্য করা লাঞ্ছনা বিবেচিত হইবে। বোম্বাই অঞ্চলের এবং উত্তর-ভারতের পার্ব্বত্য কোন কোন শ্রেণীর লোকদের নারীদের বেশ্যাবৃত্তি জা'ত ব্যবসা ছিল। এখন কিন্তু অনেকে তাহা করে না। সুতরাং জা'ত ব্যবসা লিখাইতে সকলকে বাধ্য করা অন্যায়। জা'ত মানা মুসলমানদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অথচ সেন্সসে তাহাদিগকে নানা জা'তে বিভক্ত করা হয়। ইহাও অন্যায়। অনেক মুসলমান ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

সেন্সসে বাধা দিলে একটা কুফল এই হইবে, যে, যাঁহারা বাধা দিবেন, তাঁহারা প্রায় সবাই হিন্দু; সুতরাং হিন্দুদের সংখ্যা কম করিয়া লেখা হইয়া যাইবে। তাহাতে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দাবি খর্ব্ব করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে, অথচ লোকসংখ্যা গণনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ কেহ করিতে পারিবেন না। ১৯২১-এর সেন্সসের সময়ও লোকসংখ্যা গণনায় এক শ্রেণীর রাজনৈতিকরা বাধা দিয়াছিলেন, ১৯১১ সালের সেন্সসে বঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২,০৯,৪৫,০৭৯ এবং ১৯২১ সালের সেন্সসে তাহা কমিয়া হয় ২,০৮,০৯,১৪৮। লোকসংখ্যা গণনায় বাধা দেওয়া এই হ্রাসের একটা আংশিক কারণ নহে, ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি?

আমরা এইরূপ গুজব শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও সম্প্রদায়-বিশেষের লোকদিগকে নিজেদের পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী করিয়া লিখাইতে প্ররোচিত করা হইতেছে।

—

সিপাহীদিগকে ভোটের অধিকার দিবার প্রস্তাব

"গোলটেবিল" বৈঠক সম্পর্কে উহার এক কমিটি, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার কিরূপ যোগ্যতা অনুসারে কাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে, বিবেচনা করিতেছেন। সেই উপলক্ষ্যে পঞ্জাবের স্যার মোহম্মদ শফী বলিয়াছেন, সৈন্যদলের সিপাহীদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া উচিত। সৈনিকদের আলাদা করিয়া ভোট দিবার অধিকার কোন দেশে আছে কি না, আমরা অবগত নহি। ভারতবর্ষে তাহা থাকিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। স্যার মোহম্মদ শফীর এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ সুস্পষ্ট। ভারতীয় সেনাদলে পঞ্জাবী মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী। সেই জন্য তিনি এই উপায়ে নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভোটদাতার সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে চান।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কোন কোন প্রদেশে স্থাপিত হইবার পর—বিশেষতঃ সিপাহী-বিদ্রোহের পর—ইংরেজদের অধীন সেনাদলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতি হইতে কিরূপ অনুপাতে সিপাহী সংগৃহীত হইবে, তাহা বরাবর এক ছিল না। অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগে যে যে প্রদেশ, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতি হইতে যত সিপাহী লওয়া হইত, এখন তাহা লওয়া হয় না; অনুপাতের

হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়াছে। এমনও হইয়াছে, যে, আগে যে প্রদেশ বা জাতি হইতে সিপাহী লওয়া হইত, এখন তাহা হইতে মোটেই লওয়া হয় না। এই যে কোন কোন প্রদেশ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও জাতি হইতে সিপাহী আগেকার চেয়ে কম বা বেশী লওয়া কিংবা স্থলবিশেষে একেবারেই না লওয়া, ইহা সেই সেই প্রদেশের সম্প্রদায়ের ও জাতির যুদ্ধে পটুতা, অপটুতা বা পূর্ণ অযোগ্যতা অনুসারে নির্দ্ধারিত হয় নাই, পরন্তু ইংরেজ-সরকারের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যে-যে প্রদেশ ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং জাতির সিপাহী ভারতীয় সৈন্যদলে বেশী তাহারাই সকলের চেয়ে ভাল যোদ্ধা, যাহাদের সিপাহী কম তাহারা নিকৃষ্ট যোদ্ধা, এবং যে-যে প্রদেশ বা জাতির সিপাহী নাই তাহারা একেবারেই যুদ্ধ করিতে অক্ষম, এরূপ বলিবার জো নাই।

অতএব, সিপাহীদিগকে যদি ভোট দিবার অধিকার দিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম করা উচিত, যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে সিপাহী সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা না করিলে, সিপাহীদিগকে ভোটাধিকার দেওয়ার মানে হইবে, সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুসারে কোন কোন প্রদেশ, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও জাতিকে বেশী বা কম ভোটাধিকার দেওয়া, এবং এই উপায়ে রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহে তাহাদের প্রভাব কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি বা হ্রাস।

সকলেই জানেন, এক এক প্রদেশে যেমন যেমন শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখান হইতে সিপাহী সংগ্রহ কমান বা বন্ধ করা হইয়াছে, এবং শিক্ষায় অনগ্রসর অঞ্চল সকল হইতে সিপাহী সংগ্রহ বাড়ান হইয়াছে। অতএব সিপাহীদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়ার মানে কার্য্যতঃ হইবে, শিক্ষায় অনগ্রসর অঞ্চলের লোকদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাবশালী করা। শিক্ষায় অনগ্রসর লোকেরা ইংরেজদের প্রভুত্বে বাধা দেয় না। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে ভাল নয়।

সকল প্রদেশ হইতে সিপাহী লওয়া উচিত

অন্যান্য কারণেও সকল প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভার দেশের সকল প্রদেশের ও শ্রেণীরই উপর থাকা উচিত। তাহা না থাকিলে কোন কোন প্রদেশ ও শ্রেণীর একটা অকারণ অহঙ্কার ও প্রাধান্য জন্মে এবং অন্যান্য প্রদেশ ও শ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সৈন্যদলে যে সকল প্রদেশের যথেষ্টসংখ্যক সিপাহী নাই, ইহা সাইমন রিপোর্টে ভারতবর্ষকে স্বশাসন ক্ষমতা না-দিবার একটা কারণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অথচ, এরূপ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ ইংরেজ-সরকারই দায়ী। যাঁহারা এই কথার প্রমাণ চান এবং ভারতীয় সেনাদলের সিপাহী সংগ্রহ বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা দেখিতে চান, তাঁহারা ১৯৩০ সালের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার জুলাই ও সেপ্টেম্বর সংখ্যা এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় তাহা দেখিতে পাইবেন।

যুদ্ধ করিয়া মানুষ মারিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। কিন্তু মানব সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় সব জাতির ন্যায় ভারতবর্ষেরও বহিঃশত্রু আছে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের অন্তঃশত্রুও আছে। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে, বাধা না-দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে ভারতীয়েরা সম্মত হইবে না। সেই জন্য তাহাদের যুদ্ধ শিখিয়া রাখা দরকার। কোন জাতি যদি যুদ্ধ করিতে না চায়, তাহা হইলেও যুদ্ধ-শিক্ষায় কিছু উপকার আছে। ইহাতে নিয়মানুগত্য, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস, দেহ ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভ্যাস, যখন-তখন মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার অভ্যাস ইত্যাদি জন্মে। যুদ্ধশিক্ষার মন্দ দিক্‌ও আছে। তাহা এখানে দেখাইতেছি না। তাহা নিরাকৃত করা যায়।

উপরে লিখিত কারণসমূহের জন্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক লোককে যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

লাঠি উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু বস্তুতঃ সমর্থকদের সংখ্যা পঁচাত্তরও নহে। কারণ একটি সংশোধক প্রস্তাব হইয়াছিল; তাহার সমর্থকদিগকে বাদ দিতে হইবে।

সমগ্র-এশিয়া শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

কাশীতে সমগ্র-এশিয়া শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হয়। এরূপ একটি কন্‌ফারেন্সের আইডিয়া যাঁহার বা যাঁহাদের মাথায় আসিয়াছিল, তাঁহারা প্রশংসার্হ; কিন্তু ইহার উদ্যোক্তারা যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কেন-না, এশিয়ার অধিকাংশ দেশ হইতে কোন প্রতিনিধি আসেন নাই, সামান্য দুই এক জন লোক চীন ও জাপান হইতে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষেরও সব প্রদেশ হইতে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক ও অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নেতৃস্থানীয় বহু অধ্যাপক কন্‌ফারেন্সে যান নাই—যদিও এলাহাবাদ হইতে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গিয়াছিলেন।

উদ্যোক্তারা যদি এমন কোন ভারতীয়ের নামে এশিয়ার সব দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইতেন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষের বাহিরেও সুপরিচিত, তাহা হইলে ফল ভাল হইতে পারিত। তাহা না করিয়া তাঁহারা এমন এক জন লোককে সম্পাদক করিয়াছিলেন যিনি দক্ষ শিক্ষক হইলেও যাঁহার নাম তাঁহার প্রদেশের বাহিরে প্রসিদ্ধ নহে।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু যখন টেলিগ্রাম করিয়া জানা গেল যে, তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরিবেন না, তখন জগদীশচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজী না হওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্বাস্থ্য কেমন আছে সন্ধান লওয়া হয়। তাঁহাকেও না পাওয়ায় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। তিনি বাগ্মিতার সহিত মৌখিক একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বিলম্বে নির্ব্বাচিত হওয়ায় অভিভাষণ লিখিবার সময় তিনি পান নাই।

সমগ্র-এশিয়ার কন্‌ফারেন্স আইডিয়াটি যত বড়, জিনিষটি কাজে সেরূপ হয় নাই। এমন একটি বড় সুযোগ ও আইডিয়ার ক্ষুদ্র পরিণতি দুঃখের বিষয়। কনফারেন্সটি যে আশানুরূপ হয় নাই, যোগ্য লোকদের এরূপ মত

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্

পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। এ বিষয়ে একটি চিঠি হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিব চিঠিখানি বা তাহার কোন অংশ ছাপিবার জন্য লিখিত হয় নাই। যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাও বলা দরকার, তিনি প্রতিনিধি হইয়া কাশী যান নাই, প্রতিনিধি হইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।

"অল্‌-এশিয়াটিক কনফারেন্স আমাদের ভাল লাগে নি। জিনিষটা আসলে যত বড় তেমন কিছুই হয় নি। অল্‌-এশিয়াটিক্ কিছু হচ্ছে ব'লে বোধই হচ্ছিল না। ইণ্টেলেকচুয়েল দিক্ থেকে কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না,… প্রদর্শনীতে দেখবার বিশেষ কিছুই ছিল না। আমরা প্রদর্শনী দেখে নিরাশ হয়েছি। শুধু চীন থেকে

এক জন চৈনিক চিত্রকর এসেছিলেন—তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী খুব ভাল লেগেছে।

"যুযুৎসু দেখাতে যারা গিয়েছিল, তাদের যুযুৎসু সকলেরই খুবই ভাল লেগেছিল।"

তাহারা লাহোরে মহিলা কন্‌ফারেন্সে যুযুৎসু দেখাইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

—

মুস্লিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

মুস্লিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবার বারাণসীতে হইয়াছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের পৌত্র হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ ডক্টর রস মাসুদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনি বা আমি ইহা পছন্দ করি বা না-করি, পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত থাকার বিরুদ্ধে আর্থিক ও অন্যান্য যে সব শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহা এত প্রবল যে, বিনা আশঙ্কায় এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা যায়, যে, ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথার মৃত্যু নিশ্চিত।" তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন :—

"ভারতবর্ষ যদি কেবল একটি ভাষা ও একটি কাল্‌চ্যার বা কৃষ্টির দেশ হইত তাহা হইলে আমাদের দেশের বহু সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। কিন্তু তাহা যখন নয় এবং যখন আমরা মুসলমানেরা বিশ্বাস করি, যে, অতীতের মত ভবিষ্যতেও আমাদের কৃষ্টি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মহতী সেবা করিতে পারিবে, তখন আমাদের দেখা উচিত, যে, আমরা যে বৈচিত্র্যসম্পদ দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনকে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত না করে।

"জীবনের মুসলমান আদর্শসমূহের সংরক্ষণের মানে এ নয়, যে, যাহাদের আদর্শ অন্য প্রকার, আমাদিগকে তাহাদের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি এবং আজ যত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি তার চেয়ে বেশী কখনও করিতাম না, যে, বিদ্বেষের ভিত্তির উপর স্থায়ী কিছু গড়িয়া তোলা যায় না। অধিকন্তু যে সম্প্রদায়ের নিজের উপর বিশ্বাস আছে ও যাহা নিজেদের কৃষ্টিকে খাঁটি মনে করে, তাহা তাহার প্রতিবেশীদের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিবার অভ্যাস অবলম্বন করে না।

"আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের ইহা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করা উচিত, যে, আমরা হিন্দু সভ্যতার নিকট হইতে তত পাইয়াছি যত আমরা তাহাকে দিয়াছি। যিনি যাহাই বলুন, চিন্তা-জগতেই হউক বা ললিতকলা ও শিল্পের জগতেই হউক, আমাদের জীবনের হিন্দু উপাদানই আমাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসী মুসলমানদিগ হইতে পৃথক্ করিয়াছে।"

—

শ্রীমতী কমলা নেহরু

বস্তুতঃ কয়েকটি পরিবারের কোন-না-কোন ব্যক্তি

শ্রীমতী কমলা নেহরু

জেলে না থাকিলে যেন সরকারী জেল বিভাগ অচল হয়, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে!

মহাত্মা গান্ধী জেলের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। এখন

তাঁহার এক বা দুই পুত্র জেলে। মালবীয় পরিবারের দুই বা তিন জন (তন্মধ্যে একজন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের পুত্র) জেলে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পঞ্চম বার জেলে গিয়াছেন। তাঁহার পিতা দুই বার জেলে গিয়াছিলেন, তাঁহার এক ভগিনী এক বার। তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী জেলে গিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতি আগে হইতেই জেলে আছেন। এখন তাঁহার পত্নী জেলে গিয়া নিজের সহধর্ম্মিণীত্ব অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর বাস-গৃহ আনন্দ-ভবনের কেবল দুই জন জেলে যান নাই—পণ্ডিত মোতীলালের গৃহিণী পিতামহী শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু এবং তাঁহার পৌত্রী বালিকা ইন্দিরা।

বঙ্গে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও তাঁহার পত্নী জেলে আছেন।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

—

পাটনায় ঐতিহাসিক কমিশন

সরকারী ও অন্য ঐতিহাসিক দলীল ও কাগজপত্র আবিষ্কার ও রক্ষা এবং তৎসম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিশন কয়েক বৎসর হইল গঠিত হইয়াছে। ইহা আধা-সরকারী গোছের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ইহার কৃতিত্ব ও সার্থকতা আছে। ইহার একটি বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। এবার পাটনায় স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতির ও অন্য অনেকের সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

—

ঢাকায় দার্শনিক কংগ্রেস

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন এবার ঢাকায় হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়াডিয়া সভাপতি মনোনীত হন। মহাত্মা গান্ধীর নানা উক্তিতে ও তাঁহার জীবনে ভারতবর্ষীয় দর্শন কি নূতন বিকাশলাভ ও মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিল। দার্শনিক কংগ্রেসের এই অধিবেশনে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। রুশিয়ায় যে কম্যুনিজম্ বা সাধারণ স্বত্বস্বামিত্ববাদকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তদ্বিষয়ে একদিন তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশ্য তর্কবিতর্ক প্রধানতঃ বস্তুবিচ্ছিন্ন (abstract) চিন্তা, শোনা কথা ও পড়া কথার ভিত্তির উপরই চলিয়াছিল।

—

পাটনায় প্রাচ্য কন্‌ফারেন্স

পাটনায় এবার ভারতবর্ষীয় ওরিয়েণ্টাল বা প্রাচ্য কনফারেন্সেরও অধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক

শ্রীকাশীপ্রসাদ জায়সবাল

ব্যারিষ্টার কাশীপ্রসাদ জায়সবাল ইহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রায়বাহাদুর হীরালাল ইহার সভাপতি মনোনীত হন। এই অধিবেশনেও সভাপতিদের বক্তৃতা ছাড়া অনেক সারবান্ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

—

নাগপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত অধিবেশন নাগপুরে হইয়াছিল। সরকারী নৃতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিওয়েল উহার সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি বিবর্ত্তনবাদ ও জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

—

মৌলানা মোহম্মদ আলীর পরলোকযাত্রা

মৌলানা মোহম্মদ আলীর মৃত্যুতে সাধারণতঃ ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত

মৌলানা মোহম্মদ আলী

হইল। তিনি ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপনের জন্ম এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে সেই স্বরাজে একটি প্রভাবশালী স্থান দিবার নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও আচরণে সব স্থলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত না হইলেও ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য, যে, তিনি ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি জ্ঞানে ভালবাসিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আফগানরা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমার মৃত দেহের উপর দিয়া আসিতে হইবে", অর্থাৎ তিনি তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ম প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাঁহার অসঙ্গতির কারণ, তিনি এক একটি রাজনৈতিক মতিবিশিষ্ট মানুষকে রাষ্ট্রের য়ুনিট বা একক মনে না করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একক মনে করিতেন। আধুনিক গণতন্ত্রবাদ এই মতের সমর্থন করে না।

আর একটি কারণ এই, যে, তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা মানুষ ছিলেন, যখন যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বলিতে ভয় পাইতেন না—আগে কি বলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া কোন কথা বলিতে নিরস্ত হইতেন না। তিনি যোদ্ধপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লণ্ডনে যে-সব মুসলমান নেতা এখন দরকষাকষি করিতেছেন, তিনিও কতক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেও, তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের এক জনও ভারতবর্ষের জন্ম বা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার মত দুঃখের বোঝা বহন করেন নাই। তাঁহার মত হৃদয়বান্ এবং লিপিদক্ষতায় ও বাগ্মিতায় তাঁহার সমকক্ষ তাঁহারা একজনও নহেন।

তিনি ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায়, চিকিৎসকদের পরামর্শের বিরুদ্ধে, কর্ত্তব্যবোধে বিলাত গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, স্বরাজ পাইলে ভারতবর্ষে ফিরিবেন, দাস-ভারতে আর পদার্পণ করিবেন না। কাজেও তাহাই হইল। তিনি আর আসিলেন না।

তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারের জন্য আসি নাই, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইবার জন্য আসি নাই—আসিয়াছি ভারতবর্ষের নিমিত্ত স্বাধীনতালাভের জন্য।" তিনি বুঝিতেন, কোন্‌টা সকলের চেয়ে বড় জিনিষ।

—

দেশে দাস, বিদেশে 'স্বাধীন মানুষ' !

ভারতভৃত্য সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বাক্যের দ্বারা এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা দেশের সেবা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখন জেলে যান নাই, লাঠির ঘা কীল চড় কান-মলা খান নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে লঘুতার সহিত জেল ও লাঠির ঘায়ের উল্লেখ করা সোজা। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যে, তাঁহার মত একজন গণ্যমান্য লোক

খেলো ও অপ্রকৃত কথা বলেন। তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। বিলাতে সম্মান দেখাইবার একটা প্রথা, কোন-না-কোন শহরের ফ্রীডম্ অর্থাৎ উহার পৌর অধিকার কাহাকেও দেওয়া। তাঁহাকে সেই শহরের ফ্রী ম্যান অর্থাৎ স্বাধীন মানুষ বলা হয়। সম্প্রতি একটি সভা করিয়া এডিনবরা শহরের পৌরত্ব ভূপালের নবাব এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছে। দাস-দেশের কোন ব্যক্তির স্বাধীন দেশের কোন নগরের পৌরত্বের খেতাব প্রাপ্তির মধ্যে যে অনভিপ্রেত উপহাস আছে, তাহা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উপলব্ধি না করিয়া বরং আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাহাতে দুঃখ করা বৃথা। তিনি বলিয়াছেন, "একথা বলিলে কোন গুপ্ত কথা অকালে ব্যক্ত করা হইবে না, যে, আমাদের একটি সব-কমিটির চেয়ারমহয্য বলিয়াছেন, গোলটেবিল কন্ফারেন্সের আগামী পূর্ণ অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে যাহা বলিবেন তাহাতে ভারতীয় লোকদের মনোবাঞ্ছা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি অনেক দূর পর্য্যন্ত হইবে।" ইহা ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে আটখানা হউন, আমরা হইতেছি না।

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, "বিধাতাকে ধন্যবাদ, আয়ার্ল্যাণ্ডের মত উপায়ে নহে, কিন্তু আলোচনা, রফা, পরস্পর বুঝাপড়া এবং আপোষের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লব্ধ হইতে যাইতেছে।" আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডের অবলম্বিত উপায় পছন্দ করি না। সুতরাং তাঁহার কথিত উপায়ে হইলে ত ভালই। তিনি যদি তাহা হইতেছে বিশ্বাস করেন করুন; আমরা করি না। তিনি শেষে এই কথা বলিয়াছেন,

"সেণ্ট জেম্স্ প্রাসাদে আজ গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায় লিখিত হইতেছে। কতিপয় কারাদণ্ড ও কতিপয় লাঠির ঘা ছাড়া অন্য কিছু ব্যতিরেকে কেমন করিয়া একটি দীর্ঘ সংগ্রামের সুখকর পরিসমাপ্তি হইল, সেই কাহিনী ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উপকারের জন্য তাহাতে লেখা থাকিবে।"

ইহা তিনি বিশ্বাস করুন, তাহাতে আপত্তি করি না; আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা "কতিপয় কারাদণ্ড ও কতিপয় লাঠির ঘা" কথাগুলি অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে করি।

শেক্সপীয়্যারের রোমিও ও জুলিয়েট নাটকে যে আছে, "He jests at scars that never felt a wound" "যে কখনও আঘাত অনুভব করে নাই, ক্ষতচিহ্ন তাহার উপহাসের বিষয়" তাহা ইংরেজীতে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাহা জানেন।

গায়ে যাহাতে একটুও আঁচড় না-লাগে, সেই রূপ সাবধানতার সহিত আমরাও চলি, পৌরুষের কোন দাবি আমাদের নাই। ইহাও আমরা মনে করি না, যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতসন্তানগণ এখনও খুব বেশী স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু নিজের কামরায় সুখাসীন হইয়া কিংবা সুন্দর একটি হলে আরামে দাঁড়াইয়া ইহা বলাও অশোভন মনে করি, যে, কেবল অল্পসংখ্যক লোক জেলে গিয়াছে বা লাঠির প্রহার খাইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হাজার কি অল্পসংখ্যক? তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক—কয়েক লক্ষের কম হইবে না—লাঠি দ্বারা প্রহৃত হইয়াছে। সেই সংখ্যা কি অল্প? কারাদণ্ড ও লাঠির ঘা ছাড়া কি আর কিছু ভারতবর্ষে ঘটে নাই? কেহ মরে নাই, সর্ব্বস্বান্ত হয় নাই, লাঞ্ছিত অপমানিত হয় নাই? বিলাতে কি কোন খবরই পৌঁছে না? না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মত লোকেরা চোখ কান বুজিয়া থাকেন?

যদি কারাদণ্ডের ও লাঠির ঘায়ের সংখ্যা বাস্তবিক খুব কমই হইয়া থাকে, এবং ভারতীয়েরা আর কোন প্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলেও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ত প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে, শুধু আলোচনা, রফা, পরস্পর বুঝাপড়া ও আপোষের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লব্ধ হইতে যাইতেছে না, কারাদণ্ড ও লাঠির ঘা খুব বেশী না হইলেও কাহাকেও কাহাকেও অল্প কিছু সহ্য করিতে হইয়াছে—যদিও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি বাক্যের দ্বারাই কাজ হাসিল করিতেছেন।

—

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা ও চিত্রপ্রদর্শনী

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা বিষয়িণী একটি সচিত্র ও সুমুদ্রিত পুস্তিকা এবং তথায় তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে অন্য একটি সুন্দর সচিত্র পুস্তিকা পাইয়াছি। অভ্যর্থনার পুস্তিকাটির মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় সোনালী কালিতে মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যপরায়ণ নটরাজ-শিবের মূর্ত্তির ছবি মুদ্রিত আছে। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যার গোড়ায় যে কবিতাটি আছে, তাহার ইংরেজী অনুবাদ কবির হস্তাক্ষরে পুস্তিকার মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে, এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় কবির হস্তাক্ষরে বাংলা কবিতাটির প্রতিলিপি আছে। ঐ কবিতাটি আমরা পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাণলক্ষ্মী" কবিতাটির সঙ্গে এক মোড়কে পাইয়াছিলাম। পুস্তিকাটির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের চেহারার একটি পেন্সিলে আঁকা ছবির প্রতিলিপি, অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যদিগের নাম, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কবির একটি ইংরেজী লেখা এবং শান্তিনিকেতনের চারিটি ছবি আছে।

চিত্রপ্রদর্শনীর পুস্তিকাটিতে কবির একটি আধুনিক ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি, ডক্টর আনন্দ কে কুমারস্বামীর লেখা ভূমিকা, কবির আঁকা চারিটি ছবির প্রতিলিপি, এবং "চিত্রের ভাষা" সম্বন্ধে তাঁহার একটি ছোট ইংরেজী লেখা আছে।

—

মুসলমানেরা সকলে পৃথক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি চান না

গবর্মেণ্টের বাছাই করা যে কয়জন মুসলমান তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়া ইংরেজদিগকে ও তাহাদের খবরের কাগজ ও সভার বেতার টেলিগ্রাফ দ্বারা জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন, যে, ভারতীয় মুসলমানরা সকলেই কেবলমাত্র মুসলমান ভোটদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি চান; অন্য কোন প্রকার নির্ব্বাচনে তাঁহারা রাজী হইবেন না। কিন্তু যে-সকল মুসলমান সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচন চান না। তাঁহাদের মধ্যে আব্বাস তৈয়বজী, ডাক্তার আনসারী, প্রভৃতি বিখ্যাত লোক আছেন। তদ্ভিন্ন, বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার আলী ইমাম, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ সৈয়দ হাসান ইমাম, মামুদাবাদের মুসলমান মহারাজা, মৌলবী মুজিবর রহমান প্রভৃতি নেতারা পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে বিলাতে তার করিয়াছেন। স্যার মুহম্মদ শফী প্রভৃতি পার্থক্যাভিলাষীদের মধ্যে কেহই বিদ্যাবুদ্ধি, সামাজিক পদমর্যাদা বা উচ্চ রাজকার্য্য করা বিষয়ে ইঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহেন। ইঁহাদের মতে পৃথকনির্ব্বাচন অমঙ্গলকর ও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য মৌলবী মুহম্মদ য়াসীন প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী মুসলমান গোলটেবিলের মুসলমান সভ্যদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাঙালী মুসলমান মহিলাদের সভার শ্রীমতী সোফিয়া খাতুন প্রমুখ প্রায় আশী জন সভ্য পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। পঞ্জাবের একদল মুসলমানের পক্ষ হইতেও এইরূপ প্রতিবাদ বিলাতে গিয়াছে। আসাম হইতে শ্রীহট্ট জেলার জমীদার এবং তথাকার আঞ্জুমানের সভাপতি খাঁ বাহাদুর এক্রিম্-উর-রাজা পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পক্ষে ভারতসচিবকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ হইতেও এইরূপ প্রতিবাদ গিয়াছে।

পৃথক্-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গোলটেবিল বৈঠকের মুসলমান সভ্যদের ও ভারতবর্ষের কোন কোন মুসলমানের দৃঢ়তার কারণ সম্বন্ধে নানা গুজব খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। গুজবগুলা বাদ দিলেও একটা কারণ সুস্পষ্ট। যাঁহারা মিঃ জিন্নার পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রভৃতি ১৪ দফা দাবির সমর্থন করেন, তাঁহারা জানেন, হিন্দুদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয় দল যে-কোন সদুপায়ে হউক, যে-প্রকার স্বার্থত্যাগ এবং দুঃখভোগ দ্বারাই হউক,

স্বাধীনতা লাভ করিতে ব্যগ্র। পার্থক্যবাদীরা এই সুযোগে দরকষাকষি করিয়া যতটা সম্ভব নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চান। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাদের দাবি গ্রাহ্য হইলেও তাহা ত টিকিবে না। উক্ত বৈঠকের মীমাংসা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের এবং পূর্ণ স্বরাজের অনুকূল না হইলে কংগ্রেস তাহার বিরুদ্ধে লড়িতেই থাকিবেন।

এখন দু একটা গুজবের কথা বলি। গোলটেবিল বৈঠকের লোকদের বিলাত যাত্রার সময় অনেক কাগজে এই খবর বাহির হয়, যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য স্যার ফজলী হোসেনের পরামর্শ বা সুপারিশ অনুসারে সাধারণতঃ তাঁহার দলের মুসলমানরাই গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে হিন্দুদের কোন কথা না-শুনিতে এবং ইংরেজদের কথা শুনিতে বলিয়া দিয়াছেন; কেন-না, হিন্দুদের বন্ধুত্ব অপেক্ষা ইংরেজদের অনুগ্রহ অধিকতর লাভজনক। এই খবরের কোন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ আমরা দেখি নাই।

আর একটি গুজব এই, যে, শফী আগা খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তি ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এক দলের দ্বারা চালিত হইতেছেন। এই দলের প্রভাবের অধীন লোকেরা ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে বৈঠকের মুসলমান সভ্যদিগকে পৃথক নির্ব্বাচনাদি বিষয়ে দৃঢ় থাকিতে একাধিকবার তার করিয়াছে।

জিন্না প্রভৃতি পার্থক্যবাদীদের সম্বন্ধে ভারত-গবন্মেণ্টের ইংলণ্ডপ্রবাসী ইংরেজ কর্ম্মচারীদের পক্ষতাবার কিছু পরোক্ষ প্রমাণও আছে।

মর্নিং পোষ্ট বিলাতী রক্ষণশীল দলের একটি নামজাদা কাগজ। ইহার ভারতবর্ষীয় সংবাদদাতা মাসাধিক পূর্ব্বে দিল্লী হইতে এই সংবাদ পাঠান, যে, হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী হেগ সাহেব (যিনি এখন গোলটেবিল সম্পর্কীয় কাজে বিলাতে নিযুক্ত আছেন) লণ্ডন হইতে দিল্লীতে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, যে, "সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিষ্পত্তির কোন আশা নাই, যেহেতু প্রতিনিধিদের—বিশেষতঃ মিঃ জিন্নার—অসম্ভব রকম ভাবগতিক দেখা যাইতেছে।" ইণ্ডিয়া অফিস মর্নিং পোষ্টে এই সংবাদ দেখিয়া প্রতিবাদ করেন ও বলেন, যে, হেগ সাহেব এ রকম টেলিগ্রাম পাঠান নাই। তাহা সত্ত্বেও মর্নিং পোষ্টের সংবাদদাতা বলিতেছেন, যে, তাঁহার প্রেরিত সংবাদে সত্য আছে।

পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যর্থতা ও অনিষ্টকারিতা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে, ভারতীয় যাঁহার ধর্ম্ম যাহাই হউক, মোটের উপর সব ধর্ম্মের ও জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ ও মঙ্গলা-মঙ্গল এক এবং পরস্পরের সহিত জড়িত। এই জন্য ধর্ম্মভেদে প্রতিনিধিভেদের আবশ্যক নাই। যদি বলেন, যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় থাকিবে না, তাহার অনিষ্ট হইবে; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যথেষ্টের মানে কি? সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী কিংবা অন্ততঃ সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি না দিলে তাহাদের অমূলক আশঙ্কা দূর হইতে পারে না। কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে অন্য সকলের সমান বা বেশী প্রতিনিধি দিবার দাবি কি ন্যায়সঙ্গত? সংখ্যাভূয়িষ্ঠেরা কি দোষ করিল, যে, তাহাদের অধিকার খর্ব্ব করা হইবে? সংখ্যালঘিষ্ঠদের আশঙ্কা অমূলক এই জন্য বলিতেছি, যে, বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি বা অনিষ্ট করিবার জন্য সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হিন্দুরা কোনও আইন প্রণয়ন করায় নাই, করাইবার চেষ্টাও করে নাই।

সম্প্রদায় নির্বিশেষে যোগ্যতম লোকেরা সকল সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচকদিগের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, এবং সকল প্রতিনিধিই সকল সম্প্রদায়ের লোকের মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমাদের আদর্শ। সকল প্রতিনিধি তাহা করেন না, জানি; কিন্তু যে-আদর্শের অনুসরণ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল হয়, তাহার কথাই আমরা বলিতেছি। এই আদর্শের অনুসরণ দ্বারাই জাতীয় একতা ও সংহতি

বর্দ্ধিত হয়। এক-একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা আলাদা আলাদা নির্ব্বাচিত তাহাদের প্রতিনিধি থাকার কুফল এই, যে, অন্য সব প্রতিনিধি ঐ সকল সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়েন, তাঁহারা ভাবেন, ঐসব সম্প্রদায়ের ত আলাদা প্রতিনিধি রহিয়াছে, যাহা করিবার তাহা তাঁহারাই করুন। কিন্তু সম্মিলিত নির্ব্বাচন হইলে প্রত্যেক প্রতিনিধির উপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নির্ব্বাচকের দাবি থাকে। যে-কোন প্রতিনিধি কোন বিষয়ে উদাসীন হইবেন, তাঁহাকে যে-কোন নির্ব্বাচকের তাগিদ দিবার অধিকার থাকিবে। সম্মিলিত নির্ব্বাচনের আর একটি গুণ উল্লেখযোগ্য। ইহার দ্বারা সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম্মান্ধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির নির্ব্বাচনে কতকটা বাধা পড়ে। কোন একটি সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবেই, এরূপ বাঁধিয়া দিলে তাহার অনিষ্ট করা হয়। ধরুন নিয়ম করা হইল, কোন একটি প্রদেশে ৪৭ জন হিন্দু প্রতিনিধি থাকিবেই বা ৫২ জন মুসলমান প্রতিনিধি থাকিবেই। তাহার ফল এই হইবে, যে, কোন সময়ে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রার্থীদের তুলনায় হিন্দু বা মুসলমান প্রার্থীদের কেহ কেহ কম যোগ্য হইলেও তাহারা নির্ব্বাচিত হইবে। কিন্তু যদি অবাধ সম্মিলিত নির্ব্বাচনের রীতি থাকে, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ-প্রার্থী লোকদিগকে কেবল নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যোগ্যতম হইলে চলিবে না, প্রশস্ততর ক্ষেত্রে যোগ্যতম হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই যুক্তি সত্ত্বেও আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের নিমিত্ত পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রয়োজন স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু চিরকালের বা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনের আমরা বিরোধী। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ কোন সম্প্রদায় (যেমন পঞ্জাবে ও বঙ্গে মুসলমানরা) যদি পৃথক্ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন, এবং তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি চান, তাহারও সমর্থন করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, যদি মুসলমান বাঙালীরা বলেন, "যেহেতু আমরা সংখ্যায় বেশী অতএব আমরা মোট প্রতিনিধিসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর প্রতিনিধি চাই," তাহার উত্তরে বলিব, "আপনারা যোগ্যতার জোরে সম্মিলিত নির্ব্বাচনে সমুদয় সভ্যপদ যদি দখল করেন, তাহাতেও আপত্তি করিব না।" গণতন্ত্রের নিয়মই এই, যে, নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে যাহারা বেশীসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে, তাহারা কিছুকালের জন্য দেশের কাজ চালাইবে, তাহার পর আবার নির্ব্বাচন হইবে। তখন হয়ত অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে। কেবল সংখ্যার জোরে মুসলমানেরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যপদ পাইলে তাহা দেশের পক্ষে হিতকর হইবে না; কারণ দেশসেবায় ও পরার্থপরতায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ইহা কোন কার্য্যক্ষেত্রেই এখনও প্রমাণিত হয় নাই। মুসলমানদের বা অন্য কাহারও প্রভাবশালী হইবার ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে, মন্দও নহে। আমরা কেবল ইহাই চাই, যে, সকলেই যোগ্যতা এবং দেশের সেবার দ্বারা প্রভাবশালী হউন। তাহাই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর।

পার্সীরা সংখ্যায় ভারতবর্ষে মোটে এক লক্ষ। অথচ যোগ্যতা ও লোকহিতৈষণার গুণে তাহাদের প্রভাব কত বেশী!

কেবল সংখ্যার জোরে কোন লোকসমষ্টিই বরাবর আরামে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। এক সময়ে হিন্দুরা ত মুসলমানদের চেয়ে এখনকার চেয়েও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ছিল। তখন তাহাদের কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত হইয়া মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব হইল, কোন্ গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব অনুসারে? তার পর মুসলমানদের চেয়েও সংখ্যায় কম ইংরেজদিগকে কোন গোলটেবিল বৈঠক রাজত্বের সনন্দ দিয়াছিল?

—

বঙ্গে হিন্দু মুসলমান

হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, অনুদারতা, সংকীর্ণতা একেবারেই নাই বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না।

ইহা বলিলেও সত্য হইবে না, যে, বাঙালী হিন্দুরা লোকহিতকর যাহা কিছু করিয়াছে তাহা বাঙালী মুসলমানদের হিতচিন্তা মনে রাখিয়া করিয়াছে। কিন্তু মৌলবী মুহম্মদ য়াসীন, যে, বলিয়াছেন, যে, "হিন্দুরা আমাদের শত্রু নহে, কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু," ইহা কার্য্যতঃ সত্য কথা। তিনি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতির সময় হিন্দু দাতাদের ও কর্ম্মীদের জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে হিতকর্ম্মের দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। বাঙালী হিন্দুরা দেশে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও অর্থ দান করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাহা অসাম্প্রদায়িক ভাবে করা হইয়াছে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক তাহা হইতে উপকার পায় ও পাইতে পারে।

মুসলমানদিগকে গঞ্জনা দিবার জন্য আমরা কিছু বলা অনুচিত মনে করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার, যে, কার্য্যগত অসাম্প্রদায়িকতা ও পরার্থপরতায় বাঙালী হিন্দুদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ ও অনুকরণ তাঁহারা করিলে সমগ্র বাঙালী জাতির ও তাঁহাদের উপকার হইবে।

—

মুসলমান বাঙালীদের একটি হিতকর চেষ্টা

কয়েক বৎসর হইল মুসলমান বাঙালীরা দুর্ভিক্ষাদিতে বিপন্ন মুসলমানদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা প্রশংসনীয়। ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে কেন্দ্রীয় খাদেম্-উল-ইন্সান সমিতি" (কেন্দ্রীয় নিখিল-মানবসেবক সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল বিপন্ন নরনারীর সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা আরও অধিক প্রশংসনীয়। খবরের কাগজে দেখিতেছিলাম, করটিয়াতে মুসলমান ও হিন্দু সভ্য লইয়া গঠিত এইরূপ অন্য একটি সমিতি কার্য্য করিতেছে।

—

হিন্দুসভার প্রতি বঙ্গীয় হিন্দুদের কর্ত্তব্য

(গণ্ড)গোল টেবিল বৈঠকের কতকগুলি হিন্দু সভ্যের প্রকাশ্য সম্মতি বা গুপ্ত সায় ক্রমে বঙ্গের হিন্দু মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতভেদের মীমাংসা করিবার ভার সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত আগা খাঁর হাতে দেওয়া হইতে যাইতেছিল। উক্ত হিন্দু সভ্যেরা গণতান্ত্রিক রীতির বিরুদ্ধ ও জাতীয় একতা বৃদ্ধির পরিপন্থী পৃথক্ নির্ব্বাচন এবং মুসলমান বাঙালীদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় স্থায়ীভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি দানে সম্মত হইতে যাইতেছিলেন। এই দুই অনিষ্টাশঙ্কার বিরুদ্ধে বঙ্গের কংগ্রেসের-লোকেরা বিলাতে কোন প্রতিবাদ টেলিগ্রাফ করেন নাই, তাঁহারা কোন প্রতিবাদ সভার আয়োজনও করেন নাই; যে-হেতু তাঁহারা (গণ্ড)গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু অনিষ্ট সম্ভাবনায় বাধা দেওয়া কাহারও-না-কাহারও ত কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য বঙ্গের হিন্দুসভার কর্ম্মীরা পালন করিয়া প্রকৃত ন্যাশন্যালিষ্টের অর্থাৎ স্বাজাতিকের কাজ করিয়াছেন। প্রতিবাদের টেলিগ্রাম প্রেরণ, প্রতিবাদ সভা আহ্বান, প্রভৃতি তাঁহাদের উদ্যোগেই হইয়াছে। ইহার দ্বারা তাঁহারা হিন্দুদেরই কল্যাণ করিয়াছেন, এমন নয়; গণতান্ত্রিক রীতি এবং প্রকৃত ন্যাশন্যালিজমের (স্বাজাতিকতা বা জাতীয়তার) রক্ষার সাহায্যও ইহার দ্বারা হইয়াছে।

বঙ্গের হিসন্দুভা বঙ্গের কল্যাণের জন্য আরও অনেক কাজ করিয়া থাকেন। অথচ লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এই, যে, ইহার চাঁদাদাতা বাঙালী সভ্যের সংখ্যাখুব কম। এতদিন ইহার কাজ কতিপয় মাড়োয়ারী বণিকের সাহায্যে চলিয়া আসিতেছিল। ব্যবসাতে মন্দা পড়ায় সে সাহায্য আর পাওয়া যাইতেছে না। হিন্দু বাঙালীদের হিন্দুসভার সভ্য হওয়া এবং চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

বঙ্গের শক্তিহীনতার কারণ

বাঙালীরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী হইলেও অনেক

সরকারী কমিটিতে হয় বাঙালী সভ্য মোটেই থাকে না কিংবা যথেষ্টসংখ্যক থাকে না। গোলটেবিল বৈঠকে যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী সভ্য মনোনীত হয় নাই। উহার কোন কোন সব-কমিটিতে বাঙালী মোটেই নাই। বাংলা দেশে যত মুসলমান আছে, অন্য কোন প্রদেশে তত মুসলমান নাই; অথচ গোলটেবিল বৈঠকে অন্য কোন কোন প্রদেশ হইতে বাংলার চেয়ে বেশী মুসলমান সভ্য লওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসের কমিটিগুলিতে পর্য্যন্ত বাঙালীর প্রতি উপেক্ষার পরিচয় কখন কখন পাওয়া যায়। ভারতীয় লিবার্যাল বা উদারনৈতিকদের মধ্যেও বাঙালী লিবার্যালদের প্রভাব কম। বাংলা দেশকে সরকারী ও বেসরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা বঙ্গের শক্তিহীনতার পরিচায়ক। এই শক্তিহীনতার অনেক কারণ থাকিতে পারে। আমরা দু-একটির উল্লেখ করিতেছি।

একটি কারণ, বাংলা দেশের লোকসমষ্টির মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অধিক অংশ অনগ্রসর। জীবনের সকল বিভাগে বঙ্গের যাহা কৃতিত্ব, তাহা বলিতে গেলে কেবলমাত্র অর্দ্ধেকের কম হিন্দু বাঙালীদের কৃতিত্ব। অন্য প্রধান অংশ যে মুসলমান বাঙালীরা, তাহাদেরও কৃতিত্ব যদি ইহার সহিত যুক্ত হইত, তাহা হইলে বঙ্গের শক্তি ভাল করিয়া অনুভূত হইত। অতএব, মুসলমান বাঙালীদের কুসংস্কার অজ্ঞতা প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টা মুসলমান অমুসলমান সকল বাঙালীর করা উচিত। মুসলমান বাঙালীরা পঙ্গু থাকিলে বাংলা দেশ যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

বঙ্গের শক্তিহীনতার আর একটি কারণ বাংলা দেশে পর্দ্দার আতিশয্য—বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে। উৎপীড়ন ও কুৎসা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নারী-প্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাহায্যে সেই চেষ্টা ক্রমশঃ সফল হইতেছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মসমাজের পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের আত্মোৎসর্গ বেশী বই কম নয়। বৃহত্তর প্রাচীন হিন্দুসমাজের আরও অধিকসংখ্যক মহিলা ইহাতে যোগ দিয়াছেন। কোন কোন জেলায় পল্লীগ্রামের নিরক্ষর মহিলারাও যেরূপ দেশভক্তি ও সাহসের পরিচয় দিতেছেন, তাহা বিস্ময়কর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে হিন্দু খৃষ্টিয়ান পার্সি প্রভৃতিদের মধ্যে পর্দ্দা নাই। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে পর্দ্দা মানেন না, তাঁহাদের মহিলারা প্রভাত ফেরীর দল বাহির করেন। সভাসমিতিতে, শোভাযাত্রায় বোম্বাইয়ে যেমন হাজার হাজার মহিলা দেখা যায়, বঙ্গে তাহা অসম্ভব।

অনেকে এসব কেবল হুজুক বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। আমরা তাহাতে সায় না দিলেও, যদি তাহা মানিয়া লই, তাহা হইলেও বলিতে চাই, যাহা হুজুক নয় তাহাতেও বাংলা দেশ পিছাইয়া পড়িতেছে। নারীশিক্ষায়, নারীদের দ্বারা লোকহিতকর কার্য্যে, এবং পুরুষ ও নারীর সমবেত চেষ্টায় লোকহিতকর কার্য্যে বাংলা দেশ অগ্রগণ্য নহে। যেখানে নারীর শক্তি ও কৃতিত্ব কম, সেখানে পুরুষেরও কম, সমগ্র সমাজেরও কম।

বঙ্গের শক্তিহীনতার আর একটি কারণ, হিন্দু বাঙালী-দের অধিকাংশ সেই সব জা'তের লোক যাহাদিগকে অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়, ইতর প্রভৃতি মনে করার ও বলার অপরাধ আমরা নিত্য করিয়া থাকি। হিন্দুদের এই অধিক অংশ অনগ্রসর। মুসলমানদের মধ্যে অতি অজ্ঞ দরিদ্র এবং অতি অধম ব্যক্তিও মুসলমান বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে। "নিম্নশ্রেণীর" হিন্দুদের হিন্দু বলিয়া গৌরব করিবার কি কারণ আছে? হিন্দুসমাজের কতকগুলি লোক তাহার অধিকাংশ লোকের মাথার উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে অথচ হিন্দুরা শক্তিমান্ থাকিবে, ইহা দুরাশামাত্র। প্রত্যেক মানুষ মানুষের মত ব্যবহার ও সৌজন্য পাইতে অধিকারী। ইহা তোমার আমার দয়া নহে; ইহা সকলের অধিকার। হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যতা আদি দোষ সমূলে বিনাশ করিয়া সকলকে মানুষের অধিকার না দিলে আরও দুর্ব্বল হইবে।

কংগ্রেসওয়ালাদের দুই দলের দলাদলি বঙ্গের শক্তি-হীনতার আর একটি কারণ। তাহাদের বিবাদ সত্যসত্যই মিটিয়া গিয়া থাকিলে ভাল।

—

"বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান"

"বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান" প্রবন্ধের চিত্র ও অঙ্কগুলিতে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী। "ভদ্র" নামধারী ব্যক্তিদের ইহা অবজ্ঞার উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ইহা মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শক্তিশালিতার একটি কারণ। যে লোকসমষ্টি কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী থাকে এবং মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাহাদের বল ক্ষয় না হইয়া বাড়িতে থাকে।

—

ভোটের ও চাকরীর যোগ্যতা কমান

এখন যেরূপ যোগ্যতা অনুসারে মানুষ ভোট দিতে বা চাকরি পাইতে পারে, তাহা অনেক স্থলে মুসলমানদের পক্ষে অমুসলমানদের চেয়ে কম। ইহাতে মুসলমানদের অনিষ্টের কারণ এই, যে, তাহাদিগকে আপাত লাভের মোহে ফেলিয়া তাহাদের যোগ্যতা বাড়াইবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বল করা হয়। অমুসলমানদের ক্ষতি এই হয়, যে, তাহারা যোগ্যতার অনুরূপ ন্যায্য ব্যবহার পায় না এবং তাহাদিগকে পরোক্ষ ভাবে বলা হয়, "তোমরা মুসলমান হও।" গোলটেবিল বৈঠকের একটি সব্‌কমিটিতে উক্তরূপ কমবেশী যোগ্যতার ব্যবস্থায় অনেকে মত দিয়াছে। ইহার প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী হ্রাস

অনেক বৎসর ধরিয়া আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিক ছুটিতে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে নানা কথা লিখিয়া আসিতেছি এবং তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্বার্থান্বেষী লোকের কটূক্তি ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু মাসিক ছুটিতে লিখিত কোন কোন দোষত্রুটি চুপি চুপি সংশোধিতও হইয়াছে। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ্য ভাবেও কিছু সংশোধন করিতে হইতেছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে টাকা ছিল, তখন অনেক কর্ম্মচারী রাখিয়া ও অন্য ভাবে টাকার অপব্যয় হইয়াছে। এখন আয় কমিয়াছে, গবন্মেণ্টও হাত গুটাইতেছেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইতেছে।

আর্টস্ এবং বিজ্ঞান দুটা বিভাগের দুজন সেক্রেটারীর কোন আত্যন্তিক প্রয়োজন কোন কালে ছিল না; এখন টাকা না থাকায় দুজনের জায়গায় একজন করা হইতেছে। উপর্য্যুপরি তিন তিনবার প্রশ্নপত্র বাহির হইবার পর, যেন রেজিষ্টারের কাজ ভয়ানক বাড়িয়া যাওয়াতেই তাহা ঘটিয়াছে এই জন্য পরীক্ষা-কণ্ট্রোলারের একটা ব্যয়বহুল ডিপার্টমেণ্টই বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন ঠিক্ তাহা উঠাইয়া না দিলেও ক্রমশঃ রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা ও কাজ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

"গরীবের কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে।"

—

সৈন্যদলের ভারতীয়তাপাদন

যাহা ভারতবর্ষের, যাহার জন্য ভারতবর্ষকে টাকা দিতে হয়, তাহা ভারতীয় হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া যাহা স্বভাবতঃ ভারতীয় হওয়া উচিত এমন অনেক জিনিষকে কার্য্যতঃ ভারতীয় করিবার কথা উঠে যথা ভারতবর্ষের সৈন্যদল।

ইহাকে ইংরেজ গবন্মেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদল বলেন না—বলেন, দি আর্মী ইন্ ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষস্থিত সৈন্যদল। অথচ ইহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করি আমরা। যাহা হউক, ভারতবর্ষে স্বশাসন-বিধি প্রবর্ত্তনের বিরোধী ইংরেজরা বরাবর বলিয়া আসিতে-ছিল, "তোমরা নিজের দেশ নিজেরা রক্ষা করিতে পার না; আমরা গোরা সৈন্য দি, কালা সিপাহীদের চালাইবার জন্য শাদা সেনানায়ক দি, তবে তোমাদের দেশ রক্ষিত হয়; আগে তোমরা দেশরক্ষায় সমর্থ হও, তখন স্বরাজের দাবি করিও।" তাহার উত্তরে ভারতীয়েরা বলিয়া আসিতেছে, "তোমরাই ত আমাদিগকে সেনানায়ক হইতে দাও না, এবং সব প্রদেশের লোকদিগকে সিপাহী

হইতে দাও না। যুদ্ধ-শিক্ষার সুযোগ দিয়া আমাদিগকে দেশ রক্ষার ভার দাও।" এই দাবির বিরুদ্ধে নূতন নূতন বাজে আপত্তি তোলা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এখন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা অন্য পথ ধরিয়াছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, "কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমীনিয়ন একা একা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অথচ তোমরা তাহাদিগকে স্বশাসন ক্ষমতা দিয়াছ; আমাদের বেলায় কেন অন্য রূপ নীতি অবলম্বন কর?" ভারতীয়দের মুখের এই কথাটি যেন কাড়িয়া লইয়া ব্রিটিশ মন্ত্রী মিঃ টমাস সেদিন গোলটেবিল বৈঠকের ডিফেন্স (অর্থাৎ দেশরক্ষা। সব-কমিটির এক অধিবেশনের সভাপতিরূপে বলিয়াছেন, "Complete Indianization was not necessary as a preliminary to the attainment of responsible government," "প্রজাদের কাছে দায়ী গবর্মেণ্ট স্থাপনের আগে সৈন্যদলের সম্পূর্ণ ভারতীয়তাপাদন আবশ্যক নহে," এবং নজীর স্বরূপ বলেন, "the Dominions were still dependent on the British Navy for protection," "ডোমীনিয়নগুলি এখনও তাহাদের রক্ষার জন্য ব্রিটিশ রণতরী বিভাগের উপর নির্ভর করে।"

মন্ত্রী মিঃ টমাসের এইরূপ উক্তিতে আমাদের অসতর্ক হইয়া পড়া উচিত নয়। তাঁহার কথা, ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয়দিগকে শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত সেনানায়কত্ব না-দিবার একটি ছল মাত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয়দের যুদ্ধশিক্ষার জন্য নূতন বৃহত্তর আয়োজন কি করেন, আগে দেখা যাক্।

—

বঙ্গের রাজস্ব হ্রাস

সরকারী প্রেস অফিসারের একটি বর্ণনা-পত্র অনুসারে এ বৎসর বঙ্গের রাজস্বে ৮৭,৬৬,০০০ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। রাজস্বের কোন্ দফায় শতকরা কত টাকা কম পড়িবার সম্ভাবনা তাহা নীচের ফর্দে দেখান হইল।

জমীর খাজনা	৯.০৮
আবকারী	৪২.৫০
ষ্ট্যাম্প	২৬.৩৫
রেজিষ্ট্রেশন	৯.০০
অরণ্য	৩.৭৯
আমোদ প্রমোদ ও বাজী রাখার উপর ট্যাক্স	২.০৫
বিচার	২.৩৪
	৯৫.৪১

আবকারীর আয় হ্রাস মানে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস, এবং ষ্ট্যাম্পের আয় হ্রাস মানে প্রধানতঃ মোকদ্দমা হ্রাস। কোনটাই দুঃখের বিষয় নহে।

—

আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে গণনাথ সেন

মহীশূরে এবার ভারতীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলনের একবিংশতম অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন তাহাতে সভাপতি রূপে সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি তাহাতে এই প্রচলিত ধারণার সতেজ প্রতিবাদ করেন, যে, যে-সকল ঋষিকে আয়ুর্বেদের উদ্ভাবক মনে করা হয়, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, জ্ঞানের সম্পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিলেন, এবং আয়ুর্বেদের অঙ্গহানি না করিয়া তাহার কোন পরিবর্দ্ধন বা উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর নহে। তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান, যে, ঋষিরা নিজেদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং মূল চরক ও সুশ্রুত সংহিতার অনেক মূল্যবান্ অংশ হারাইয়া গিয়াছে। অন্যান্য কথার পর তিনি আয়ুর্বেদের সংস্কার ও উন্নতিসাধন চেষ্টার প্রস্তাব করেন।

—

বাবুরাও গেন্নুর আত্মোৎসর্গ

বোম্বাইয়ের বাবুরাও গেন্নু বিদেশী কাপড় বোম্বাই মোটর লরী থামাইবার জন্ত তাহার সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি মোটর চাপা পড়িয়া নিহত হন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সকল ধর্ম্মের লক্ষাধিক লোক যোগ দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের চেষ্টা নূতন উৎসাহের সহিত চলিতেছে। তাঁহার মৃত্যুর অনভিপ্রেত পরোক্ষ কারণ স্বরূপ একটি কথা বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মারে দেখিলাম। বোম্বাইয়ের একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা না করিয়া বলেন,"চলন্ত মোটর লরীর সামনে আত্মনিক্ষেপ করিয়া, পিকেটারদের নিজেদের অকপটতা প্রমাণ করা উচিত।" রিফর্ম্মারের প্রবীণ সম্পাদক লিখিয়াছেন, "আমরা যখন এই লঘুতাপ্রসূত উক্তির রিপোর্ট পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম ইহার ফলে গুরুতর কিছু ঘটনা ঘটিবে।" দুঃখের বিষয় তাহা ঘটিয়াছে।

বাবুরাও গেন্নু ছিলেন একজন অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক। তিনি (দ্বিজেতর) কামাটি-জাতীয়। অথচ তাঁহার শব-বহন সব জাতির লোকে করিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে একান্ত লোকাভাব না হইলে স্ত্রীলোকেরা শ্মশানে শব লইয়া যান না। এক্ষেত্রে শববাহীর অভাব ত ছিলই না—আধিক্যই বরং ছিল। তথাপি মহিলারাও তাঁহার শব বহন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, বোম্বাইয়ের "যুদ্ধ মন্ত্রণাসভার" নেত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা হজরৎ নাম্নী এক সম্ভ্রান্তা ব্রাহ্মণমহিলা শ্রীমান্ বাবুরাওয়ের চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন। ইহাও গোঁড়া হিন্দুরীতির বিরুদ্ধ।

স্বাজাতিকতার প্রবল তরঙ্গাঘাতে অনেক প্রাচীন অনাবশ্যক সংস্কার বিনষ্ট হইতেছে ও হইবে।

—

ঢাকায় দীপালি প্রদর্শনী

কলিকাতায় নারীশিক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি যেরূপ কাজ করেন, ঢাকায় দীপালি সঙ্ঘ কতকটা সেইরূপ কাজ করেন। এই সঙ্ঘের নারীশিক্ষা মন্দিরে গত ডিসেম্বর মাসে মহিলাদের প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর সংস্রবে ছাত্রীদের সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা, আবৃত্তির প্রতিযোগিতা প্রভৃতি হইয়াছিল। বিবাহিতা বালিকারাও কোন কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। চরখা ও টেকোর প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল। শেষ দিনে লাঠি ও ছোরা খেলার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

এই সব অনুষ্ঠান প্রশংসনীয়, এবং নারীদের জীবনকে বৈচিত্র্য ও আনন্দে পূর্ণ করে এবং তাঁহাদের শিক্ষার সহায়তা করে।

—

বোম্বাইয়ের ইউরোপীয়দের রাষ্ট্রীয় মত

বোম্বাইয়ের এংলোইণ্ডিয়ান দৈনিক টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ সম্বন্ধে বে-সরকারী ইউরোপীয়নদের মত জিজ্ঞাসা করেন। প্রায় এক হাজার জন মত দিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৮১৮ জন ডোমীনিয়ন ষ্টেটসের পক্ষে এবং ১৬৫ জন বিরুদ্ধে মত দেয়।

বোম্বাই অঞ্চলে সত্যাগ্রহ ও বিদেশীবর্জ্জন খুব প্রবল বলিয়া সেখানে বেশীর ভাগ ইউরোপীয় ডোমীনিয়ান ষ্টেটাসের পক্ষে মত দিয়া থাকিবে।

—

মস্‌জিদের সম্মুখে সঙ্গীত

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি স্থলেমান এবং ইয়াং একটি মোকদ্দমার রায়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, ব্যক্তিগত ভাবে এবং হিন্দুসমাজের সভ্য হিসাবে, মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া সঙ্গীত সহকারে শোভাযাত্রা করিবার অধিকার হিন্দুদের আছে; কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের আদেশ মানা দরকার; স্থানীয় ঐতিহ্য ও দেশাচারের সহিত এই অধিকারের কোন সম্পর্ক নাই।

—

মেথরের কাজ

জাতিবিশেষকে হাত দিয়া পায়খানা সাফ করিতে বাধ্য করা ঠিক নয়। এই ঘৃণ্য প্রথা দূর করিবার ভাল উপায় এরূপ পায়খানা নির্ম্মাণ যাহাতে জলের সাহায্যে আপনা আপনিই ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায়। ইউরোপে পল্লীগ্রামেও এই প্রকার ব্যবস্থা আছে। এদেশেও পল্লীগ্রামে তাহা করা যাইতে পারে, কিংবা মাটীতে পরিখা কাটিয়া ব্যবহারান্তে তাহা মাটী দিয়া বুজাইয়া দেওয়া চলে। এই প্রকারে লোকালয়ের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন সকল জাতির লোকেরই করা উচিত। নিজের নিজের চোখ মুখ নাক কান পরিষ্কার করিলে বা গাত্র মার্জ্জন করিলে যেমন দোষ হয় না, নিজের অন্ত প্রকার ময়লা পরিষ্কার করিলেও সেইরূপ দোষ হয় না।

উৎকৃষ্ট আধুনিক পায়খানা কিছু ব্যয়সাধ্য বটে। কিন্তু যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহাতে ব্যয় ধর্ত্তব্য নহে। কন্যার বিবাহ দেওয়া হিন্দু সমাজে খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু তাহা সকলেই একান্ত কর্ত্তব্য মনে করে। সমাজের মেথর জাতির উন্নতির জন্য যে ব্যয় আবশ্যক, তাহাও কন্যার বিবাহ দেওয়ার ব্যয়ের চেয়ে কম দরকারী নহে।

শান্তিনিকেতনের কোন কোন গৃহে এখন আর মেথর খাটার প্রয়োজন নাই; উৎকৃষ্টতর আধুনিক ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ হইতে পারে।

জেলে মেথরজাতীয় কোন কয়েদীর জেলের বাহিরে বৃত্তি ও অভ্যাস মেথরের মত না হইলেও তাহাকে পায়খানা সাফ করিতে বাধ্য করা হয়। ইহা অত্যন্ত ঘৃণ্য জবরদস্তী। সব জেলে ময়লা পরিষ্কার করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

—

দু-কামরা ব্যবস্থাপক সভা

প্রকাশ, যে, গোলটেবিল বৈঠকের প্রাদেশিক শাসনবিধি কমিটির রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, যে, বঙ্গ, আগ্রা-অযোধ্যা, এবং বিহার-উৎকলের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দুটি কামরা থাকিবে, কারণ এই তিন প্রদেশে উহার সপক্ষে মত প্রকাশিত হইয়াছে; অন্য কোন প্রদেশের মত দু-কামরা ব্যবস্থাপক সভা প্রবর্ত্তনের অনুকূল হইলে তবে তাহা তথায় প্রবর্ত্তিত হইবে। দুটা কামরাওয়ালা ব্যবস্থাপক সভার মানে এক কামরায় সাধারণ প্রতিনিধিরা বসিবেন, অন্যটাতে জমীদার ও ধনিকরা বসিবেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরা সব দেশেই বেশী রক্ষণশীল হইয়া থাকেন—যে-সব পাখীর লেজ ভারী ও লম্বা তাহারা উড়ে কম। ভারতবর্ষে জমীদার ও ধনিকদের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের হুকুম চালাইবার সুযোগ বেশী আছে। অতএব দু-কামরা ব্যবস্থাপক সভার মানে এই দাঁড়াইবে, যে, সাধারণভাবে নির্ব্বাচিত অগ্রসর ও নির্ভীক প্রতিনিধিরা যাহা করিতে চাহিবেন, রক্ষণশীল জমীদার ও ধনিক প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে। যে-তিন প্রদেশে দু-কামরা কৌন্সিল হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে জমীদার যেমন অনেক, রায়তদের অসন্তোষও তেমনি। গণতান্ত্রিকতার স্রোতের মুখে গবর্ন্মেণ্ট জমীদার ও ধনিক রূপী ভারী ভারী বস্তা ও পাথরের বাঁধ বাঁধিতে চান। বাঁধ টিকিবে কি? ঐরাবত গঙ্গার স্রোত আটকাইতে পারিয়াছিল কি?

বাংলা, বিহার-উৎকল, এবং আগ্রা-অযোধ্যার জনমত কখনই দু-কামরার অনুকূল নয়। সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য নিযুক্ত প্রাদেশিক কৌন্সিলগুলির কমিটি হয়ত অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া থাকিবে, কিন্তু ঐ কমিটিগুলা জনগণের, এমন কি কৌন্সিলগুলির নির্ব্বাচিত সভ্যদেরও প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল না। তাহাদের মতকে জনমত মনে করা মহা মূর্খতা বা মহা ভণ্ডামি।

—

"লাঠির নিম্নস্থিত ভারতবর্ষ"

বিলাতের নিউ লীডার কাগজের সম্পাদক ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড সাহেব ভারত ভ্রমণ করিয়া দেখে

ফিরিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত ১০ই ডিসেম্বরের নিউ ইয়র্কের নিউ রিপাব্লিক কাগজে "ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি লাঠি" (লাঠির নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষ) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

—

প্রধান মন্ত্রী কি বলিবেন

প্রবাসীর এই সংখ্যা বাহির হইয়া যাইবার পর প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ভারতের ললাটে কি লিখিতে চান বলিবেন। সুতরাং অনুমান করিয়া সে বিষয়ে কিছু লিখিব না। তাহার অপেক্ষায় লর্ড রেডিঙের বক্তৃতারও কোন সমালোচনা করিব না ; কেবল বলিব, উহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। আশ্চর্য্যের বিষয়, লণ্ডনে বসিয়া স্যার সুলতান আহমদ কল্পনার জোরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ লর্ড রেডিঙের বক্তৃতায় ইলেক্‌ট্রিফয়েড অর্থাৎ (তাড়িতস্পৃষ্টের মত) পুলকিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনা। তবে ইহা সত্য, যে, ঐ বক্তৃতা দ্বারা কেহ নৈরাশ্যে ইলেক্‌ট্রোকিউটেড্‌বৎ মৃত বা মৃতপ্রায়ও হয় নাই। কারণ ভারতীয়দের ভাগ্য ঈশ্বরের নীচেই তাহাদের নিজের হাতে।

গ্রামের পথে
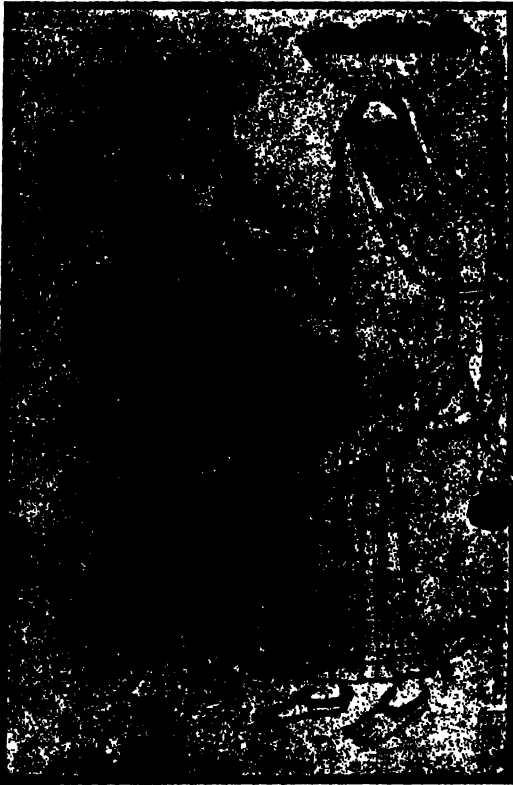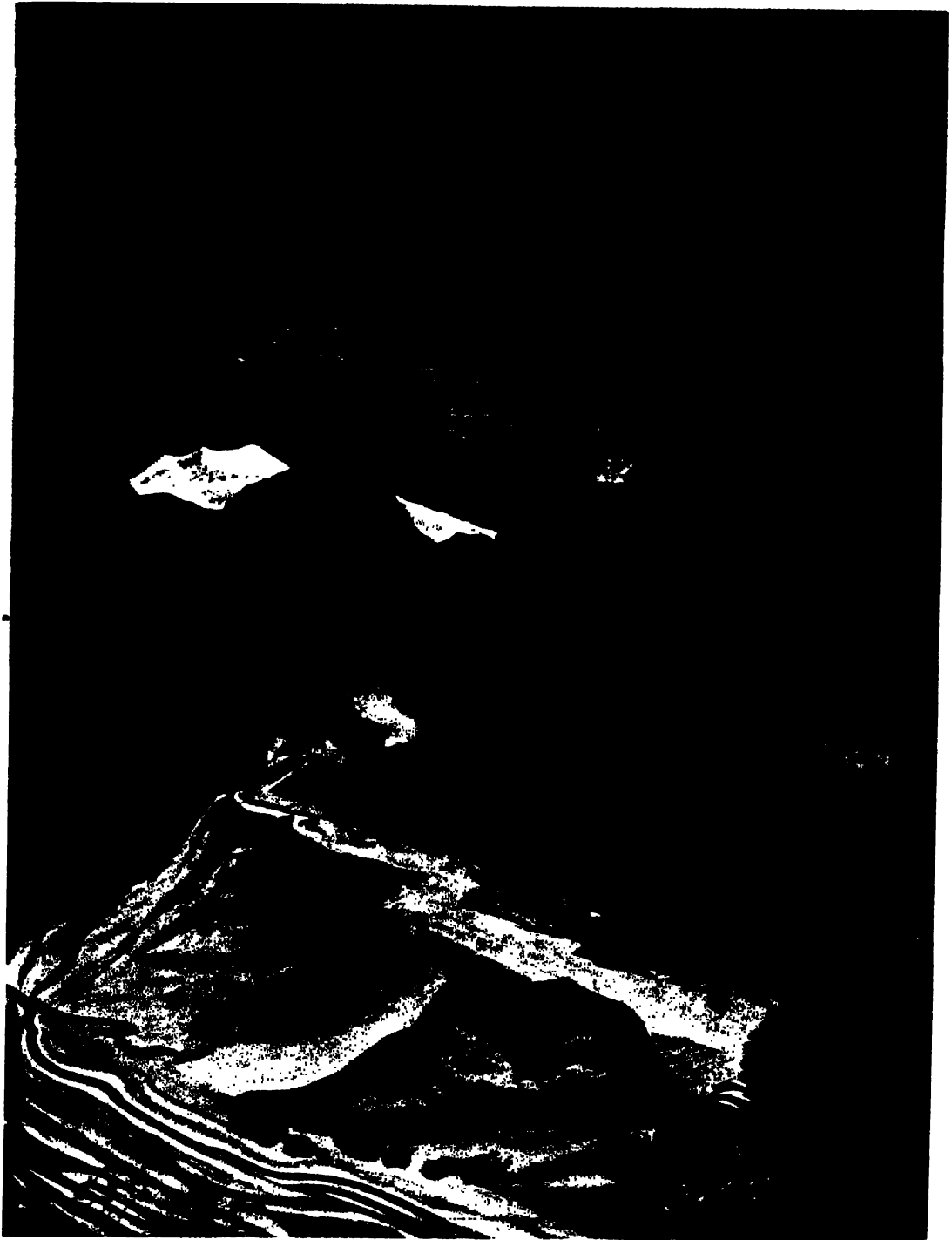
শ্রীসবিতা দেবী কর্তৃক অঙ্কিত

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হিমালয়ের পথে

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩৭

৫ম সংখ্যা

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

রাণী, মস্কৌ থাকতে তোমাকে আর প্রশান্তকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড় বড় চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কিনা কি জানি।

বার্লিনে এসে এক সঙ্গে তোমার দু'খানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেচে। সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কি রকম উৎসুক হয়ে উঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য। কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্য্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলি ভাবচি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েচে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখা-শোনা—ওদের সব নালিশ উঠেচে আমার কানে। আমি জানি ওদের মত নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে, সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বল্লেই হয়। তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা এদেশের লোক ব'লে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড় একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রিয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হ'লে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দিলেন যে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ ব'লে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেচেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এই রকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্চে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজে চালানো সহজ, কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক,

একথা বলবা মাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ সুরু হয় সেই মুহূর্ত্তে। সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কনফারেন্সে পল্লীসম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি—শুধু শব্দ নয় পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েচে—কিন্তু দেশের যে উপরি তলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্ত্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েচে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট রেখে সাহিত্য-চর্চ্চা করছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন একথা কাউকে ব'লে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্র হচ্চে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চ্চা আজ থেকেই সুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হ'ল—আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সঙ্কল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্চে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দুবেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিশের খাতায় তার নাম উঠেচে। তারপর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্ব্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র ক'রে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমীতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পর মুহূর্ত্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখ-ভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে-বাড়ীতে থাকতুম, তার বারান্দা থেকে দেখা যায় ক্ষেতের পর ক্ষেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো ক্ষেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে, চলে যায়। এই রকম ভাগ করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেচি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র ক'রে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্ব্বোধ, এত বড় ব্যাপার করে তুলতে পারবো কি করে! আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব তাহলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কি? এমন কাজের চালনা-ভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব—সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই। কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগেছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে-শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেচে, আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করেনি, তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ঘটে গেছে,—শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তা-বোধ পুথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুথির পাতার পর্দ্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পারে না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এই জন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকেই স্বভাবত বাদ

পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলচে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেন-না ধার দেওয়া, তার সুদ কষা, এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের কাছেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তাহলে কোনো বিপদ্ নেই। বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েচে; কিন্তু এই অভাবের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেন-না কেরাণী তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্গতি। সেই জন্যে উমেদারীতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্বোধণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে বাঁধা হাতা দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি যে বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কি-না এতদিন এই কথাই ভেবেচি। মনে করেছিলুম সমাজের একটি চির-বাধাগ্রস্ত তলা আছে সেখানে কোনো কালেই সূর্য্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সে জন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগা উচিত কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্ত্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না, কারণ যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাইনে, তাদের জন্যে যে-কিছুই করা যেতে পারে একথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এই রকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম, শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেচে। ভেবেছিলুম, তার মানে ওখানে পল্লী পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে বড়-জোর দ্বিতীয় ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী হয়েচে। ভেবেছিলুম ওদের তথ্যতালিকা নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্য্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেচে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ তের বছর পার হ'ল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চল্‌তে হয়েচে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্ব্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জ্জনায় দুর্গম। যে-আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য—বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে শক্তিহীন। এইজন্যে কোনো মতে পেটের ভাত বিক্রি করে চল্‌চে এদের উদ্যোগ-পর্ব্ব। অথচ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে-অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য্য। কেন না আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেচে। মনে আছে এরাই লীগ্ অফ্ নেশন্‌সে অস্ত্রবর্জ্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেন-না নিজেদের প্রতাপ বর্দ্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্চে জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নসম্বলের উপায় উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক ক'রে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, লীগ্ অফ্ নেশন্‌সের সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ

কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না কিন্তু শান্তি চাই বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এই জন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতিভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল—কতলোক মরেচে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবে মাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র অবস্থা সঙ্কুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলেচি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেচে তারা একজনও সৌখীন নয়, সমস্ত শহর আট-পৌরে কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোষাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া—যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কি রকম বদল হয়েচে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্‌তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া-ঢাকা পড়ে' নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষরে হাৎড়ে বেড়াতে শিখেছে এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হ'ল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই। নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের মনে পড়ল। মনে হ'ল আরব্য উপন্যাসের যাদুকরের কীর্ত্তি। বছর-দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মত অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্ম্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েচে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা-পুরুৎদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে, যারা এদের জুতো পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথা-পদ্ধতির বদল হয়নি, যান বাহন চরকা ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বস্‌ত। আমাদের দেশের ত্রিশকোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূত কালের, চেপে ধরেচে তাদের দুই চোখ্—এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কি করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারত-বাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেচে এমন আর কাকে করবে বল? অথচ যে-সময়ের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহু-প্রশংসিত law and order ছিল না।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয়নি কিম্বা স্কুলের ইনস্পেক্টরের মত এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয়নি "কান"-এ "সোনা"য় এরা মূর্দ্ধণ্য ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কৌ শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষ্যে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছুদিনের মত থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল। সে রকম কথাবার্ত্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন কমিশনের জবাব দিতে পারব। আর কিছু নয় এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি সবই হতে পারত কিন্তু হয়নি—না হোক্ আমরা পেয়েছি law and order. আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের

দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মত অতি কুৎসিত অতি বর্ব্বর ভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েচে। কতবার আমি ভেবেছি আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মত ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এ-রকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কি রকম তোলপাড় করচে, জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেই রকম দুঃখ পাচ্চ। সে ঘটনার উপর সরকারী চুণকামের কাজ হয়েচে কিন্তু এরকম সরকারী চুণকামের যে কি মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তাহলে কোনো চুণকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনো দিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্চে সরকারী ধর্ম্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। যাহোক তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেচে, এবার প্রশান্তর চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৩০।

কল্যাণীয়েষু,

সুরেন, পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কি রকম উদ্যোগ চলচে সে কথা তোমাকে লিখোচ। আজ দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

উরাল পর্ব্বতের দক্ষিণে বাষ্‌কিরদের বাস। জার-এর আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতই ছিল। তারা চির উপবাসের ধার দিয়ে দিয়েই চলতো। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড় রকমের কাজ করবার মত শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা ছিল আগেকার আমলের ধনী জোৎদার, ধর্ম্মযাজক এবং বর্ত্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হ'ল না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটেরা যদি-বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষবাসের ব্যবস্থা ছারখার হয়ে গেল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিক মত সুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবল বেগে গড়ে উঠতে লাগ্‌ল। এর আগে বাষ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্ব্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্ম্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শিখ্‌বার জন্যে ছুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল সুরু হয়েচে। বর্ত্তমানে বাষ্‌কিরিয়াতে ছুটি আছে সরকারী থিয়েটার, ছুটি ম্যুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌর-গ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading-room), ত্রিশটি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষ্যে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তাছাড়া হাজার হাজার কর্ম্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো শ্রুতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্‌কিরদের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষ্‌কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখ। উভয় পক্ষের ডিফিকাল্টিজেরও তুলনা করা কর্ত্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে যতগুলি রিপাব্লিক হয়েচে তার মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজ্‌বেকিস্তান সবচেয়ে অল্পদিনের। তাদের পত্তন হয়েচে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবসুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ।

এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে ক্ষেতের অবস্থা ভাল নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ। এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization. বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হচ্চে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্ব্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড় সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েচে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন ষ্টেশন বসেচে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চলচে। যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্যরুশিয়ার বড় বড় কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশীচালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগলাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখ্‌চে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে, তার তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি, জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড় বড় মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশী।

আপাতত মাথাপিছু পাঁচ রুব্‌ল্‌ ক'রে শিক্ষার খরচ পড়চে। এদেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েচে, ইঁদারার কাছাকাছি যেখানে বহুপরিবার মিলে আড্ডা করে সেই রকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্যে শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েচে। সেখানে সম্প্রতি একশো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্চে, বার তের বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস কমিটি। স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে দেখা হয়, সমস্ত মহলগুলি (compartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা পরিষ্কার আছে কি-না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তার জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্য-বিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্ত্তব্য হচ্চে দেখা—ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি-না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষ-সভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষ-সভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর কারও সঙ্গে বিবাদ হ'লে অধ্যক্ষ-সভা তার তদন্ত করে; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য। এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান বাজনার সঙ্গৎ হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্চে। দুশোর বেশী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েচে। তা ছাড়া জল এবং জমি ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হ'ল তাতে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির ক্ষেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েচে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাঁসপাতাল খোলা হয়েচে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় বলচেন,

"However, there is no occasion to rejoice on that fact, since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed, and as regards the doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the

reader that Turcmenistan, being on a very low level of civilization, has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages, had produced the desired effect."

তুর্কমেনিস্তানের মত মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১০০টা হাঁসপাতাল স্থাপন ক'রে এরা লজ্জা পায়—এমনতর লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই ব'লে বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর ডিফিকল্টিজ দেখতে পেলুম, সেগুলো নড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখতে পাইনে কেন? সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্ব্বে আমারও মনে দেশের জন্তে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মত সাহস চলে গিয়েছিল।• খৃষ্টান পাদ্রীর মত আমিও ডিফিকল্টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েচি—মনে মনে বলেচি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কি জানি কতকাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা, আমাদের কলুষের আবর্জ্জনা নড়াতে। সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেচে, স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখলুম এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মত বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে—কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেচে। এতদিন পরে বুঝতে পেরেচি আমাদের ঘড়িও চলতে পারত কিন্তু দম দেওয়া হ'ল না। ডিফিকল্টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে দুটি একটি অংশ উদ্ধৃত করে চিঠি শেষ করব :—

"The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Muhammedans into colonies, destined to supply raw material to the central Russian markets."

মনে আছে অনেক কাল হ'ল, পরলোকগত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় একদা রেশম-গুটির চাষ প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশম-গুটির চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যতবার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেচেন ততবারই ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়েছেন বাধা।

"The agents of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Muhammedans and Armenians were systmatically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these wo nations at times assumed the form of massacres."

হাঁসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার করেচেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারেন নি :—

"It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny : for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed."

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা প্রকাশের চলন নেই, গৌরব প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা স্বীকারের উপলক্ষ্যে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে সমস্ত তুর্ক-মেনিস্তানে শিক্ষার জন্য জন-পিছু পাঁচ রুব্‌ল খরচ হয়ে থাকে। রুব্‌লের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুব্‌ল বলতে বোঝায় সাড়ে বার টাকা। এই বাবদ কর আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়ত আছে, কিন্তু সেই কর আদায় উপলক্ষ্যে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি ৮ই অক্টোবর ১৯৩০।

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত]

—

কল্যাণীয়েষু,

সুরেন, তুর্কোমেনদের কথা পূর্ব্বেই বলেচি, মরুভূমি-বাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট।

সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সেখানে কি কি বিদ্যায়তন স্থাপনের সঙ্কল্প করেচে তার একটা ফর্দ্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning w th October 1st 1930, the new budget year a number of new scientific institu ions and Institutes will be opened in Turcomania, namely:

1. Turcomen Geological Committee.
2. Turcomen Institute of Applied Botany;
3. Institute for study and research of stock breeding:
4. Institute of Hydrology and Geo-physics
5. Institute for Economic Research:
6. Chemico-Bacteriological Institute and Institute of Social Hygiene.

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia. In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started: Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museums of the Revolution. In addition the construct on of an observatory, State Library, House of published books of science and culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has comp'eted the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cu tural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed Altog ther 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village.

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত]

বিচিত্রা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেনেটোলা মেসের বাসিন্দেদের সে পাড়ায় বিগ্রহ ব'লে খ্যাতি ছিল। মেসটাকে কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্রও বলতেন, যেহেতু সেটা ছিল সমন্বয় মন্দির,—আপিস, আদালত, বেকার, ব্রোকার, টেলার, ফেলারের (ফেল্ হওয়া ছেলের) ফেডারেশন্।

তাঁহাদেরই দ্বাদশটি বিগ্রহ পূজাবকাশে সখের সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। বোধ হয় ঐটাই এখন মায়ের বাৎসরিকের বিনিময়ে ব্যবস্থা। ঠেকেছেন এসে—কাশীর গঙ্গার পশ্চিম তীরে, একটি দ্বিতলের হল-ঘরে। বাড়ীটি কোনো বড় লোকের, অধুনা বে-মেরামৎ। গা-ঢেলে কিছুদিনেই কোনো প্রসিদ্ধ স্তূপে দাঁড়িয়ে যাবার আভাসও দিচ্চে—গবেষকদের খোরাক যোগাবার সদিচ্ছা পোষণ করচে। ধর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকই সৎকর্ম্মে। রমেশ গর্ভ-গবেষক, সে ইতিমধ্যেই তার ভাবী-নামকরণ করেছে—অ-সারনাথ, এবং দ্বারেও সেটা কয়লা দিয়ে দেগে দিয়েছে।

অজীর্ণ-জীর্ণ মনিন খুব উত্তেজনাপূর্ণ আওয়াজে বলতে বলতে এসে ঢুকলো, "বুঝলে, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় শরীরটা বেশ বাগিয়ে, মনটা তাজা করে নিতে হবে। ষ্টম্যাক্ বেশ প্যাক্ করে খাওয়া চাই। এখন সেরেফ্ আনন্দ আর আহার। মেসের মুখে মারো ঝাড়ু। সেই ওলমুখো দেদো দামোদর ঠাকুর বেটার শ্রীবদন কিছুদিন যে আর দর্শন করতে হবে না এইটাই পরম শান্তি। বেটা নাগাড় নটেশাকের কাঁড়ি গিলিয়ে গিলিয়ে নাড়ী বরবাদ ক'রে দিয়েছে! এখন দেখে নিও—খিদেও যেমন চন্‌চন্ ক'রে বাড়চে, রক্তও তেমনি সন্ সন্ বেগ ধর্‌চে। কি বল?"

মনিনের হাতে ছিল একাংশ-ধ্বংস একটা মুড়ো-শশা, অপর হস্তে লবণ। বদন চর্ব্বণ-চঞ্চল।

মুকুল ব্যাকুলবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বললে, "হঠাৎ এটার এত ফূর্ত্তি চাগলো কিসে! পেটে তো গাঁদালের ঝোল তলায় না, আজ যে ধামারের বোল শোনায়! আবার শশা পাকড়েছে দেখছি? ফিরবে না, না-কি?"

"নাঃ—ও-রকম 'ডিটারমিণ্ড' (মরিয়া) ব্যকাল

সঙ্গে রাখা একদম সেফ (সুবিধে) নয়,—তা বলচি। ওকে সরাও,—কাল ছ-ছ খানা ডালপুরী আর এক থাবা জ্যাভো কুমড়ো-ঘণ্ট মেরেছে। মরবে নিশ্চয়ই। তার পর ভবিষ্যৎ বিভীষিকাটা ভাবো। মণিহারা মণিপিসির ফোঁসফোঁসানির ঠ্যালায় মেস ছাড়তে হবে—দেখে নিও! কিন্তু অমন মেসও আর জুটবে না। বৃহস্পতি একাদশে ভর না করলে অমন স্বম্বর মেলে না;—সাত মাসে সাড়ে তিন টাকা—আর তাগাদা-পিছু এক কাপ চা পেয়ে, কোন্ বেটা বুদ্ধিমান থাকতে দেবে বল তো!"

'হিয়ার, হিয়ারে'র পর অভয় থামলো।

সে-কথায় কান না দিয়ে মনিন তার বাঁ-হাতটা লম্বা ক'রে দিয়ে, ডান হাতের চেটোটা চিৎ ক'রে ধরলে। বললে, "এটা সোমবার নয়, শনিবারও নয়—তাজা কিউকম্বার আর এই মাতৃভূমিজ পবিত্র লবণ। বুঝলে না? ফ্রুট-সল্ট চালাচ্ছি! তোমাদের Eno-র নয়—খোদ মেনোর; আহার ওষুধ দু-ই। কনেকটিকট্ পড়লেই হয় না, কনেক্ট করে মুখস্থ করতে হয়।" (সঙ্গে সঙ্গে শশায় কামড় !)

সকলে ভ্রেভো দিয়ে অভয়ের দিকে চাইলে।

অভয় পরাজয় স্বীকার করবার পাত্র নয়, বললে, "অকস্মাৎ যখন এত বাড়্, সত্যিই ও চল্লো। ওদের ওটা হেরিডিটারি। আমাদের গ্রামেই ওদের বাড়ী,—ওরা তিন-পুরুষ তীর্থে মরে আসছে। ওর জ্যেঠা চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে পড়ে চুরমার! খুড়ো ত্রিবেণী-সঙ্গমে এমন ডুব মারলেন, যে আর উঠলেন না। মাতুল ছিলেন পরম বৈষ্ণব, তাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে বাঁদরে বিশ্রী রকম কামড়ে বৈকুণ্ঠে দিয়েছে। ওই বলুক, সত্যি কি না। ও এখনও যখন রয়েছে—নয় চুনারে চল, নয় ওর সঙ্গ ছাড়। এখানে থাকলে নিদেন ওকে ষাঁড়ে নেবে। দেখে নিও···

মনিন বাধা দিয়ে বললে, "অভয়দা মাভৈঃ, সো-দিন্ চলা গিয়া। জানেন তো, গাড়ুই ছিল যার অবয়বের অস্থির একাংশ, আজ তিন দিন তার অশৌচ।"

ইতিমধ্যে দুটি আগন্তুকের আবির্ভাব কেউ লক্ষ্য করেনি।

একটি—আবলুসী-নলচের 'মডেল'; মুখখানি চুনারের কলকের মত 'চিকি,' এবং তেল-চাঁচে (clean shavingএ) চকচকে। বাঁ-হাতে লেদারের ছোট একটি সুট-কেস। আধ-পোড়া-বাঁকারির মত কবজিতে—রিষ্ট্‌ওয়াচ্। ধপ্‌ধপে সার্টের ওপর সিল্কের সরু কারে চাবিটা বুকপকেটে বিশ্রাম করচে। ডান হাতে চাঁদির কণ্ঠি-পরা বেতের ছড়ি। পায়ে টাইশুদ্ধ পম্প-সু। ইনি বিশুদ্ধ মকরধ্বজের এজেন্ট্, বার্থ-কন্‌ট্রোলের দুষ্প্রাপ্য দাওয়াইও রাখেন।

দ্বিতীয়টির ঘোলাটে রং, ভোলাটে ভাব, উদাস দৃষ্টি, অন্যমনস্ক হাসি। আধ-ময়লা সার্ট, দরজি বোতাম বসিয়ে দিলেও, তা ব্যবহারের মর্জ্জি নেই। পায়ে ভেলভেটের ভুরু টানা স্যাণ্ডাল্। বুক-পকেটে ক্লিপ-আঁটা দু-দুটো ফাউণ্টেন্-পেন্। চোখে 'আউল্-আই' চশমা। স্বয়ং—সাহিত্যিক, উর্ব্বর ঔপন্যাসিক। পয়সা-ওলা অতীত পিতার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। বাণী সেবায় অধুনা ফতুর। নাম সোনালীভূষণ···

ঢুকে পড়ে উভয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অভয়ের তখন বক্তৃতায় মধ্যাহ্ন—আধ্যাত্মিক অধ্যায় চল্‌ছে।

"মনিনের মাসির কথাটা ভুললে যে তারা;—পুণ্যবতী সে বছর 'সাগরে' গিয়ে দক্ষিণ-রায়ের সেবায় যে লেগেছিলেন! ওদের যে পেল্লেয়ে পুণ্যের সংসার। ওকে পুলিসের জেম্মা ক'রে দেওয়াই ভাল। যা ভাল হয় কোরো, কিন্তু সত্বর।"

সকলে সবিস্ময়ে চাইলে এবং সানন্দে বলে উঠলো "একি,—সহসা ব্ল্যাক্-প্রিন্স (অন্নদাবাবু ওই নামেই আত্মজ্ঞ পরিচিত) কোথা থেকে? অ্যাঃ—unexpected bargain (অভাবনীয় আমদানী) যে! বসুন বসুন,—আর ইনি?"

"সে কি, ওঁকে চেন না! এই দুর্দ্দিনে বাংলা দেশের অর্দ্ধেক স্ত্রীপুরুষ ওঁর বই পড়েই বেঁচে আছে। হাতে করলেই একবেলা বেশ অনাহারে কেটে যায়, পেটও জ্বলে না, চুলোও জ্বলে না! গরীব দেশের এতবড় উপকার আর কেউ করেছেন ব'লে আমার তো জানা

নেই।—ঔপন্যাসিক সোনালী বাবু গো! গোর থেকে তুলে আনচি—তাজমহলে বসেছিলেন…"

যে যে-অবস্থায় ছিল, শুনে সটান দাঁড়িয়ে উঠে, "অ্যাঃ—সোনালীবাবু! উঃ কি সৌভাগ্য" ব'লে ঝুঁকে এলো।

"উঃ—আপনার রিসেণ্ট 'শশা-বিচি' কি splendid production (চমৎকার সৃষ্টি); মালিনীর 'ক্যারেক্টার'টা (চরিত্র)—উঃ আপনিই সোনালীবাবু?"

রমেশ রিসার্চ-স্কলার,—কাশী এসে সহসা একটা কিছু পেয়ে গেছে, মাথা খুঁড়েও যা এতদিন মেলে নি। Ph.D. আর রোকে কে? সে এককোণে বসে পেছন ফিরে কলম্ টেনে চলেছিল। সবটাই মাথায় হুটোপাটি করে এসে গিয়েছে, বার ক'রে দিতে পারলেই—মার দিয়া। বিষয়টা বান-ডেকে আসায় কলম পেছিয়ে পড়ছিল। রমেশ তাই প্রত্যেক শব্দের প্রথম আর শেষ অক্ষরের মধ্যে ড্যাশ দিয়ে চলেছিল। অর্থাৎ notwithstandingএ n—g বসিয়ে যাচ্ছিল। nothingএও তাই। Thronesএ t—s, towardsএও t—s, তবুও মগজের যোগান সামলাতে পারছিল না।

কিন্তু 'সাহিত্যিক' সংজ্ঞাটা গঙ্গার ইলিসের মত 'ক্যাচি', চট্ ক'রে কামড়ে ধরে—বাঙ্গালী মেয়েপুরুষকে টানে। রমেশও থাকতে পারেনি—উঠে এসেছিল। ভীষণ আগ্রহে ব'লে বসলো—'ছাতে ছাতে' বইখানা আপনারই লেখা? উঃ কি powerful hand (বীর বাহু)—পড়ে পর্য্যন্ত নীচে আর থাকতে পারি না! থাকবেন তো? এই বাসায়ই থাকুন না!—এলুম ব'লে, বসে কথা না কইলে সুখ হবে না"

ফিরে গিয়ে তাডাতাড়ি কাগজ গোছাতে গোছাতে—"এটা কি লিখলুম! Towels না tomatoes? Tomatoesই হবে, থাক্ এখন…"

নিবারণের ওপর বাসার কর্ত্তৃত্বভার। নিউমার্কেটে তার দরজির দোকান, নিজে সে 'কাট' সিদ্ধ (best cutter) সাহিত্য-বাতিক তার নেই। সাহিত্যিক দেখেই সে জলে গিয়েছিল,—"যত হাবাতে জোটানো, সামলায় কে? 'ছাতে ছাতে'-গুরুপুত্তুর এসে তো হাজির হলেন! সার্টের বে-ডউল cut, পাঞ্জাবী কি টেনিস বোঝবার জো নেই। না দেয় বোতাম, যত বাজে মক্কেল! আজকাল ওই ফ্যাশান চলে না'কি?"

তার ওপর রমেশ যখন বললে—"নিবারণ-দা, বুঝলে জলখাবারটা চট্—ক্ষীরমোহন আর চমচম। কিছু কিম-ও আনিও, বুঝলে! একজন সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক ভাগ্যলব্ধ, বুঝলে!"

নিবারণ তখন তুষের আগুন! বললে, "বুঝেছি বই কি, কিন্তু সম্ভ্রান্তদের দ্বারা আক্রান্ত হবার 'প্রভিসন' (ব্যবস্থা) বজেটে ছিল না। ব্ল্যাক প্রিন্স বয়সে বড়, তাঁর কথাটাই আজ রাখ না? কাজের কথাটায় কান ছিল কি? ওঁর 'ছাতে ছাতে' না-হয় 'শশা বিচি'—যা হয়, একখানা খুলে ব'স না, এ বেলাটা বেশ সহজেই কেটে যাবে, চুলো জ্বালতে হবে না—না ক্ষীরমোহন আনতে! উনিও কত খুশী হবেন…"

অতুল কেরাণী, বিবাহের পর কবিতাও লিখেছে—সে উপস্থিত ছিল। নিবারণের নীরস কথাটার আঘাত তাকেও লাগলো। পরিবারের গয়না বাঁধা দিয়ে ভদ্রতা রাখতে কোনো দিনই তার বাধেনি। শাঁখা দু'গাছার জোরেই তিনি বৈধব্যের বিপক্ষে যুঝচেন।

'আমিই আন্‌চি' ব'লে সে বেরিয়ে গেল। নিবারণ চেঁচিয়ে ব'লে দিলে,—"দুজনের মত।"

আহত রমেশ কথা না কয়ে ভাবতে ভাবতে ফিরল—"দোকান করলে মানুষ ভদ্রসমাজ থেকে নেবে যায়। সার পি-সি রায়ের মাথা সারশূন্য হয়েছে—তাই তিনি দেশটাকে মাড়োয়ারী বানাতে চান, সর্ব্বনাশ করবেন দেখচি!"

মিনিট-পাঁচেক পরে রমেশ ফিরে এসে দেখে, নিবারণ চা পাঠিয়ে দিয়েছে,—অতুল চমচম্ নিয়ে হাজির। হল-ঘর মুখর।

রমেশের মনটা অনেকখানি নেবে গিয়েছিল, সে-ভাবটা কেটে গেল।

ব্ল্যাক্-প্রিন্স্ চমচম্ চালাতে চালাতে বললেন,—"যে খুঁজে তোমাদের বার করেছি, কড়কির পাহাড় হ'লে পরেশ পাথর বেরিয়ে পড়তো। দুঃখ নেই—এও আমাদের রত্নলাভই ঘটেছে। তার চেয়ে বড় লাভ,—চল্লিশ বছরে

পড়ে আজ অভয়ের মুখে 'তিন পুরুষ' যে কা'কে বলে সেটা শুনতে পেলুম—amalgum (ঘণ্ট) of জ্যেঠা, খুড়ো and মাতুল,—অবশ্য মনিনের। এটা প্রকাশ করতে রবিবাবুও পেছিয়েছিলেন। অভয় কিন্তু নির্ভয়!

হাসি পড়ে গেল।

অভয় অপ্রতিভভাবে—'আমার বলার উদ্দেশ্য' বলতেই, ব্ল্যাক্-প্রিন্স্ বললেন, "থাক্।"—

—"কিন্তু মনিনের জন্যে তোমরা এত ভাবচো কেন বল তো? স্বীকার করি ও একটা dangerous item (ফাঁড়া-বিশেষ), বিশেষ ক'রে pleasure-trip-এর পক্ষে—(আনন্দ অভিধানে। তবে ওর heredity (বংশের ধারা) যদি না চাগায়! I mean—পুণ্যসঞ্চয়ের ছুরভিসন্ধি। জেনে—ওর আর মার নেই। ডালপুরী যখন তলিয়েছে, যমপুরীর এলাকা ও পেরিয়েছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই শ্রীমান।"

"কি রকম?" ব'লেই সকলে সাগ্রহে উৎকর্ণ।

"বলচি, আগে একটা বিড়ি ধরাই।"—

—'হ্যাঁ, সে আজ বাইশ বছর আগের ঘটনা। দিন কাটাবার একটা আড্ডা ছিল, বেঁটে মাষ্টার সেটাও তখন ঘুচিয়ে দিয়েছেন,—ইস্কুলকে নিরাপদ করবার জন্যে! কিন্তু ক্লারিওনেট তো কেড়ে নিতে পারলেন না! ইস্কুলের সকলেই শিষ্য, তারা যাবে কোথা! তিনি শিক্ষা দেন আমি দীক্ষা দি। বেশ ফুর্ত্তিতে কাটতে লাগলো। স্বদেশী মুড়ি জিনিষটা বড় ভালবাসতুম, সেটা কিন্তু পেটে সইত না—মনোকষ্টের মধ্যে ছিল ওই। সহসা একদিন এক দাস্তেই চোস্ত করে শুইয়ে দিলে; বুঝলুম তৃতীয়ে ঠিক্ চিতেয় দেবে। মুড়ির কথাটা মনে পড়লো—মরার বাড়া গাল নেই—আর ভয়টা কিসের, এমন মওকা আর মিলচে না।

সময় সংক্ষেপ। চট্ ক'রে এক কোঁচড় মুড়ি তেল নুন মেখে নিয়ে মাঠে চলে গেলুম, লঙ্কা আর মুলো সংযোগে সবর উড়িয়ে দিয়ে, আকণ্ঠ পুকুর জল টেনে, সেইখানেই গা ঢাললুম,—ওঠবার শক্তিও ছিল না।

ঘুম ভাঙলো রাত ৯টায়, শরীর একদম ঝরঝরে! এক ধাক্কায় দুই লাভ ঘটল, প্রাণ পেলুম, কলেরার ওষুধ ও পেলুম। উপার্জ্জনের কোনো উপায়ই ছিল না—ভগবান দিয়ে দিলেন।

দেশ তখন কলেরা ক্যাম্পে দাঁড়িয়েছে, ভাবলুম—রুগী-পিছু পাঁচ নিলেই টেবিল হারমোনিয়ম কিনতে আর ক'দিন লাগবে!

হরে ছিল মায়ের এক ছেলে এবং আমার সাকরেদ। তার হ'ল কলেরা। মনটা খারাপ হয়ে গেল ফার্ষ্ট কেস্, কিন্তু ওর কাছে তো কি নিতে পারব না। যাক্, ওটা ব্রহ্মাকেই দেওয়া গেল। সেও জানত আমি সেরেছি এবং দেবতার দেওয়া দাওয়াইও পেয়েছি।

মাঠে নিয়ে গিয়ে যেই ঔষধ প্রয়োগ—১৫ মিনিটে তার প্রাণও বিয়োগ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে হরে মরে গেল—আমিও বাবার বাক্স ভেঙে সেই রাতেই বোম্বাই-মুখো। নান্যঃ পন্থা।

শুনে সোনামণিবাবু শিউরে উঠলেন, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন। প্রিন্স ব'লে চললেন, "সেই পর্য্যন্ত আমার পেটের দোষ সাফ্ সেরে গেছে,—রাস্তায় ভুট্টা আর চিনেবাদামই আমার খাদ্য। কেবল অপয়া হরে মরে অমন ওষুধটার পয়া করে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে আমারও! —মনিনের জন্যে তোমরা কিছুমাত্র ভেব না।"

সকলে অবাক হয়ে শুনছিল গোপাল বললে, "তা হলে নরহত্যাও..."

—"আরে মায়ের এক ছেলে, সে মরতই, আমাকেই কেবল দেশত্যাগী করে গেল! এই যে ডাক্তারেরা রোজ ছুচোখো মারচে আর মোটর কিনচে;—কপাল রে কপাল! মোটরের হার বাড়াতেই ত মৃত্যুর হার বেড়েছে—দেরি হয় না—ছুঁয়েছে কি নিয়েছে! রাস্তাগুলোও গেল—লোকও গেল! হিঁদুর সংখ্যা আর কমাচ্চে কা'রা?"

আধকপালে অবগুণ্ঠনে একটি স্ত্রীলোক এক থাল গরম জিলিপি এনে সকলের সামনে ধরে দিয়ে বিনীত স্বরে বললেন, "কিছু জল খান, আমার একটু দেরি হবে। বাজারে টাটকা ইলিস মাছ দেখতে পেয়ে নিয়ে এলুম কি-না। এ জিলিপিও তিরখুঁতের, অন্যত্র মেলে না। আপনারা বেড়াতে এসেছেন, খাবেন না?"

মনিন সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'খুব খাবো—খুব খাবো, বেশ করেছেন, আমাদের তো সব জানা নেই, আপনি…"

মৃদুহাস্যে 'বেশ তো' ব'লে তিনি চলে গেলেন। অভয় প্রিন্সের দিকে চেয়ে বললে, "দেখলেন, আপনি অভয় দিলে কি হবে, ওরে দেবতাতে টেনেছে। কেবল খাই খাই…"

প্রিন্স ও কথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "উনি?"

নিবারণ বললে, "ব্রাহ্মণের মেয়ে, এইখানেই থাকেন। আমাদের রেঁধে খাওয়াচ্ছেন;—বড় ভাল। কিন্তু 'বিল'-এ (bill-এ) না পিলে শুকিয়ে দেন।—রোসো রোসো আগে—"এই ব'লে, চারখানা জিলিপি তুলে নিয়ে "ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাঁর তো আরও বেলা হবে—দিয়ে আসি—"

সকলে একবাক্যে ব'লে উঠলো,"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—"

গোপাল বললে, "শুভাংসি বহুবিঘ্নানি, আগে দিয়ে এসো দাদা।"

নিবারণ জিলিপি নিয়ে চলে গেল।

কেউ বললে, "সোনার মেয়ে কি-না, প্রগাঢ় নিষ্ঠা!"

কেউ—"কাশীতে ওই-ই কাজ করলে!"

কেহ—"নারীর মর্য্যাদা-রক্ষা শিষ্টাচারের প্রথম সোপান।"

ইত্যাদি নির্ম্মম প্রশংসাবাদের সঙ্গে জিলিপির স্বাদ গ্রহণ চলতে লাগলো।

জিলিপি এবং বাক্য দু-ই ছিল বেশ উপভোগ্য।—তর, তম-টার বিচার অনাবশ্যক।

নিজের প্রশংসা শুনতে নেই। নিবারণ এসে কেবল জিলিপিই পেলে এবং খেলে। ভালই হ'ল।

বৈকালে কোথায় কোথায় বেড়াতে যেতে হবে, কি কি দেখতে হবে, এই সব কথাই আরম্ভ হ'ল।

রমেশ বললে, "যেখানেই যাওয়া যাক্, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিন্তু একবার অহল্যাঘাট হয়ে আসতেই হবে। সোনালীবাবুকে পেয়েছি—তাঁর অপিনিয়নটা…"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সম্বন্ধে?"

"আছে, শুনতেই পাবেন। উনি কিন্তু যেতে চান 'সঙ্কট-মোচনে'।

হরেন বললে, "সে আর আমরা কে না চাই—এর মধ্যে বেসঙ্কট আর কে? এই ক'টা দিন বাদেই তো ফিরতে হবে, এত শীগ্‌গির কি পাওনাদার বেটারা মরবে!"

নেপেন বললে, "শুনেছি তিনি খুব জাগ্রত, তা হ'লেও দিনে দিনেই যেতে হবে কিন্তু। রাতে আর কে-না ঘুমোন, দেবতারও চুল ধরতে পারে, কি জানি বাবা, যে ভাগ্য!"

অভয় বললে, "মনিনকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া চাই-ই। থাকলে…"

মনিন কথা কইলে, "আচ্ছা, আপনার 'অভয়' নাম রেখেছিল কে? বাপ মা তো এতবড় ভুল করেন না।"

প্রিন্স বললেন, "আর কথাটি কয়ো না অভয়।"

পরে, কব্‌জি-ঘড়ি কাৎ করে—"ইস বারোটা বাজে যে, নাইবে না? তিন দিন আজ পেঁড়াপার্ব্বণ চলেছে, ছুটি অন্ন দিয়ে ধন্য হও;—ওদিকে ইলিস মাছের গন্ধ পাড়াটাকে বাদশা-বাগ বানিয়ে দিয়েছে—আর অপেক্ষা করা সইবে না।"

সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন।

এমন সময় ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত সুরেশ এসে উপস্থিত। সে সাউথ গেট (দক্ষিণদ্বারী) বীমা কোম্পানীর এজেন্ট,—শিকারে বেরিয়েছিল।

"উঃ, তেষ্টায় ছাতি ফাটচে," (জিলিপির থালা দৃষ্টে) "এ কি, এক টুকরোও রাখনি যে দেখচি।"

ধনেশ বললে, "টেক্স্ দারোগা আর বীমার এজেন্ট যেখানেই যায় আদরের সীমা থাকে না; এমন অভদ্র কে আছে যে মুখমিষ্টি না-করিয়ে ছেড়েছে! কবার মেরেছ বলো!"

সুরেশ,—"আচ্ছা বাবা 'রস বৈ সঃ-ই' সই।" খানিকটে রস-সংযোগে এক গেলাস সরবৎ টেনে ফেলে "আঃ—বাঁচলুম" ব'লে সুরু করলে, "এটা দেখচি এজেন্টের আড়ৎ, যাকে ধরি সেই বলে 'পালটি-বদলে রাজি আছি'। এ শুকনো দেশ—শিষ্ট নেই!"

হাসি পড়ে গেল,—'তার পর ?'

—"হিতবাক্য সকলকেই শোনালুম। শেষ বললুম, এখানে 'ভৃগু' যখন রয়েছেন আপনাদের তো খুব সুবিধে। একবার দেখিয়ে পাওনাটা Whole life (ওপারে) Endowment (এপারে) বা Paid up policy (দায়-খালাসী) যা ভাল বোঝেন তাই ক'রে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। ভৃগুদর্শনী আমাদের কোম্পানীই দেবে। দেখচি কোনো ঘুঘু ভৃগুতেও ঘেড়ায় না! করবে কি, অনেকেই যে ছত্রপতি—ছত্রই ভরসা। যাক্—বসে থাকলে তো চলবে না—যাই মাথা মুড়োবার জায়গাটা কাছেই, কাল একবার প্রয়াগটা ঘুরে আসি।"

নেপেন বললে, "এখন চলো—গঙ্গাস্নান ক'রে নিজের মাথাটা তো ঠাণ্ডা করো।"

ব্রাহ্মণ-কন্যা সুগন্ধি তৈলের একটা বোতল ঠক্ ক'রে সামনে রেখে চলে যাচ্ছিলেন,—নিবারণ বললে, "এ কোথা থেকে এলো—কার ?"

প্রিন্স বললেন, "কার আবার কি ;—এসে যখন গেছে ও আমাদেরই। চলো..."

'বলুন তো আপনি'—ব'লে, তিনি আর দাঁড়ালেন না, হাসিমাখা চোখে চলে গেলেন।

সকলেই নিবারণের দিকে চাইলে।

নিবারণ বললে, "এর পয়সা সাজার-তবিলে নেই ;—তা ব'লে দিচ্চি।"

"তা কি জানি না, ও তুমিই দেবে।"

"না—ঠাট্টা নয় নেপেন।"

তেল মেখে তেলের সুখ্যাতি করতে করতে সকলে বেরিয়ে পড়লো।

রান্নাঘরের দোরে এক জোড়া চাপলি-চটি রয়েছে দেখে নেপেন বললে, "এ কার চটি ? যারই হোক্, আমি পরে চললুম।"

"যান না—ও আপনাদেরই। দয়া ক'রে ফেলে না এলেই হ'ল।"

বামাম্বর রন্ধনশালা থেকেই এলো। নেপেন সবিস্ময়ে—"ওঃ, আমি মনে করেছিলুম......"

"এখনও তাই মনে করুন না। ভুল হবে না!".

"না, আমার যে আবার হারানো রোগও আছে।"

"যতই থাক, আমাদের চেয়ে বেশী নয়, আপনি প'রে যান।"

নিবারণ বোধ হয় কিছু ভুলে গিয়েছিল। ঢুকেই বললে, "কি হে এখনও দেরি করছো কেন ? এ কি, এ চটি যে..."

"হ্যাঁ তোমারই, তা একবার পরলুমই বা।"

নিবারণ আর কথা বাড়ালে না, বা বাড়াতে সাহস পেলে না। "বেশ, এখন যাচ্ছ কি,—না আমিই এগুই ?"

"তবে আর ফিরলে কেন,—চলো।"

* * *

স্নানান্তে নেপেন রান্নাঘরের সামনে চটি খুলতে খুলতে বললে, "হারাইনি—এই রইলো।"

ঠাকরুণ দ্বারের কাছে উঠে এসে হাসতে হাসতে বললেন, "এই যে ঠিক আছে। আমি তো বলেছিলুম আপনারা হারান না,—বদলান..."

তার পর সোরগোল আর ইলিস মাছের ঝোল অম্বল এক সঙ্গেই চললো। চিনিপাতা দধিটা নিবারণ স্বয়ংই বিতরণ করলে। ব্রাহ্মণ-কন্যার যত্নআত্তিতে সকলেই দেড়া চালান দিয়ে বসলো। প্রশংসার প্রস্রবণ বয়ে গেল।

এতক্ষণে মাথা তুলে ব্রজেশ্বর স্নেহস্বরে বললে, "কই তুমি বসলে না, নিবারণ ?"

নেপেনের মন ঘোলাচ্ছিল, সে বললে, "সে কি, ম্যানেজার বসবে কি ? তোমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান তো খুব। এইবার যাও ভাই আর দেরি করো না—রান্না ঘরে ব'স গিয়ে। ঠাকরুণ..."

স্বহস্ত-প্রস্তুত একখানা পান আর বাদলরামের বাস্ত-জরদা পেস্ ক'রে দিয়ে ঠাকরুণ চলে গেলেন।

ব্ল্যাক-প্রিন্স বললেন, "এই দরদী জাতটা না থাকলে জগতটা একদিনেই আলুনী মেরে যেত। ভোজনটা কেবল পশুর মত চর্ব্বণেই শেষ হ'ত। এই যে স্নেহযত্ন, ওটার মধ্যে কোনদিন এতটুকু খাদ পাবে না। হোটেলের 'খানা' দাড়ি বয়ে আসে—এ আসে নাড়ি বয়ে। নাও, এখন সব একটু গড়াও—আর বসবার বল নেই।"

অভয় বললে, "তা ঠিক, এখন শুয়ে শুয়ে বিড়ি আর bed talk চলুক।"

রমেশ সোনালীবাবুকে নিয়ে বারাণ্ডায় বৈঠক বসালেন।

খাতা হাতে দেখে ব্রজেশ্বর বললে, "সর্ব্বনাশ করলে, সাহিত্যিক খসড়া খোলেন যে,—শোনাবেন না কি?"

নেপেন চমকে উঠলো, "বল কি! কলকেতা ছেড়েও যে রেহাই নেই! সব চোখ বোজো চোখ বোজো। অভ-দা কবে আর কাজে লাগবেন—নাকটা ডাকান। ওতে দু'কাজ হবে, এখন সেরে রাখলে রাতে আমরা একটু ঘুমুতেও পাবো।

সকলে হাসি-মুখ চোখ বুজলে।

—"নাঃ, আমাদের ফাঁড়া কেটে গেছে। রোজাকেই ভূতে ধরেছে। শুনছ না—ইংরিজি। রমেশের রিসার্চ চলেছে। সাহিত্যিক এবার বুঝতে পারবেন, নিরীহ বন্ধু-বান্ধবদের কি পীড়াটাই দেন। তার আস্বাদ একটু উপভোগ করুন!"

অভয়ের নাক-ডাকা সুরু হয়েছে দেখে সকলেই চোখ বুজলে।

ওদিকে রমেশ সোনালীবাবুকে তার 'থিমটা' শোনাতে গিয়ে বিষম বিপদে পড়ে গেল। প্রতি লাইনেই হোঁচট খায়। এমন সাটে সেরেছে যে সবটাই মাঠে মারা গেছে। দীম্, ডিমে দাঁড়িয়ে গেছে। শেষ নিজেই বিরক্ত হয়ে বললে, "থাক, লেখাটা রাত্রে ঠিক্ ক'রে রাখবো, কাল শুনবেন।"

সোনালীবাবুর ঢুল ধরেছিল, বললেন, "সেই ভাল। ও এখন কতবার কাটতে হবে! If you have the theme, the padding comes easy enough—বাঘ শিকারটাই শক্ত, তারপর খড় ভরে বৈঠকখানা সাজাতে কতক্ষণ।"—মনে মনে বললেন, "আঃ, বাঁচলুম!"

"নিবারণের লক্ষণ-ভোজন শেষ হয় না যে!"—নেপেন কোনমতে চোখ বুজতে পারলে না।

চারটে না বাজতে হালুয়া আর চা প্রস্তুত। সকলে উঠে পড়লো। "হস সেবাশ্রম, সঙ্কটমোচন, অহল্যা-ঘাট আর কখন দেখা হবে!"

"একদিনেই তো সব উঠে যাবে না,"—ঠাকরুণ সূক্ষ্ম কণ্ঠের সুমিষ্ট রেখাপাতে ব'লে চলে গেলেন।

—সকলের কানে যেন পায়রার পালক বুলিয়ে দিলে। —"ঠিকই তো—এ তো রথযাত্রা নয় যে মাসীর বাড়ী পর্য্যন্ত দৌড়। এসব পরজন্মের জন্যেও ফেলে রাখা যায়,—কায়েমী মাল। নাও চলো, আজ সঙ্কটমোচন হয়ে সঙ্কট সাম্‌লে আসা যাক। এতে তো আর দ্বিমত হবার সম্ভাবনা নেই,—ওখানে সকলেরই টিকি বাঁধা।" এই ব'লে সকলে হালুয়া আর চা চট্ ক'রে সেরে নিয়ে উঠে পড়লেন।

রমেশ একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, বললে, "সোনালীবাবুর বড় ইচ্ছা ছিল অহল্যাঘাটে যাবার।"

ব্ল্যাক-প্রিন্স বললেন, "আরে সে-হল্লা বার মাসই বজায় থাকবে, ওটি বিশ্বনাথের 'টাক্-ফিল্ম্'।"

সকলে বেরিয়ে পড়লো।

যে-যার জোড় খুঁজে নিয়ে কথা কইতে কইতে চললো। নিবারণের সঙ্গী হ'ল নেপেন—অযাচিত এবং অপ্রিয়ও। সোনালীবাবুকে পেয়ে রইল রমেশ,—স্থান নিলে সবার পশ্চাতে এবং ফোটাতে লাগলো ডিম্—theme.

সঙ্কটমোচনের এলাকায় ঢুকে সোনালীবাবু ব'লে উঠলেন, "বাঃ, এ স্থানটি দেখচি কোলাহলের বাইরে। কি শান্ত নিরালা। এইখানে বসে অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই চাই না।"

অভয় বললে, "কিন্তু এই শান্তি ভঙ্গ করবার লোক যে বাড়ীতে আমদানি করে রেখে আসা হয়েছে মশাই—সহ বিবিধ 'প্যাটার্ণের' পঙ্গপাল। একমাত্র ভরসা বুধি প্রাইটে,—পাঁচ-পো করে দেয়। বাতে ভুগছি, হারাম-জাদাদের জন্যে আপিন ধরবার উপায় নেই। সেই অক্ষৌহিণী সেনাসহ তিনি সবেগে এসে পড়লে আর খোর-পোষ দাবি করলে, তখন শান্তি খুঁজতে হবে গঙ্গাগর্ভে।"

হরেন বললে, "অভয়-দা খেমা দাও, দেবস্থানে আবার

ওসব অলক্ষ্ণে কথা কেন মনে করিয়ে দাও। তা হ'লে আর বাইরে বেরিয়ে পড়েছ কি দুঃখে! দেখছি প্রতিপদটা সেই অগস্ত্যেরই একচেটে ছিল। কতবার তো প্রতিপদ দেখে বেরুলুম,—কি-বারেই কি ফিরতে হয়!"

একজন সেবায়েৎ বললে, "বাবুজি, যাঁর যো কামনা আছে চাইলে লিন্, সঙ্কট থাকে তো ছুটিয়ে লিন্। হামি দরোয়াজা খুলিয়ে দিচ্চি।"

দরজা খোলবার আগেই দালানে সব ভক্তিভরে গড়াগড়া সাষ্টাঙ্গ হলেন···

শ্রীকণ্ঠ বললে, "বাবা সবই জানো—তবু বলা ভাল—অধিকন্ত ন দোষায়। কুক্ষণে কুমীরে পেয়েছিল বাবা, দেড় টাকা মাইনে বাড়লো দেখে, কুমীরের চামড়ার সেই স্যুটকেস্‌টা ৫৭ টাকায় নিয়ে ফেললুম। সাত টাকা ফেলেও দিয়েছি, তবু বেটার তাগাদা মেটে না! তেত্রিশ টাকা মাইনের আর দিলে জরদা, চা-সিগারেট ছাড়তে হয় বাবা। আপনিই বলুন, তাতে ভদ্রসমাজে থাকা যায়? সোনার বোতাম জন্মের মত বাঁধা দিয়েছি! এই কটা দিনের জন্যে প'রে আসবো ব'লে একবার চাইলুম, ছোটলোক দিলে না। সে স্যুটকেস পড়েই রয়েছে বাবা—আরশোলা আর ইঁদুরে ওপরটা এমন দাগি করে দিয়েছে, সে'দিকে আর চাইতে পারি না। তার মধ্যে কেবল ক্লারিওনেটটি পড়ে আছে। তাতে ফুঁ দিলেই সাতাশ টাকা পাওনার সুর শুনিয়ে শিউরে দেয়। একটা উপায় করে দাও বাবা, পাওনাদার বেটারা আর না খেঁচকায়। কবে নোটিশ দেবে,—সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকি। কানাড়া বাজাতে গিয়ে কখন পূরবীতে এসে পড়ি! এমনি মনের অবস্থা,—সে তো তুমি জানচই। এই দেখ না বাবা—ভদ্রসমাজে যখন যা ঢেউ ওঠে, ভদ্রলোকের ছেলে—তা তো করতেই হয়। আসবার সময় ১১ টাকায় এই এক জোড়া নিতেই হ'ল।—এই পাহারাওলারা যা পায়ে দেয় তারিরই এই শীর্ণ সংস্করণ—একটু চাঁচা-ছোলা।"

সুরেশ প্রার্থনা জানালে, "তুমি আর কি-না জানো প্রভু, কোন্‌টাই বা জানাবো, তিন-তিনটে রাস্তা ছাড়তে হয়েছে বাবা। যাদের দোকানে চুল ছাটচুম—কেউ সতের টাকা পাবে, কেউ আট, কেউ ছ' টাকা! এই দেখ না চুলের অবস্থাটা; শশে নাপতেতে আবার রিভাট করতে হয়েছে, দেখচো তো বেটা কি ক'রে দিয়েছে! হেজেলিন কবে ফুরিয়ে গিয়েছে—শিশি ধুয়ে দাড়িতে বুলিয়ে মনে শান্তি আনতে হয়। অধিক কি বলবো বাবা, ভিনাসের ছবিখানা কিনে বাঁধাতে পারিনি; আট টাকা চায়। এক মাস সিগারেট খাইয়ে এক নতুন ইয়ং দোকানদারের দয়ায় বাঁধিয়ে, ঘরে টাঙিয়েছিলুম। একদিন গিয়ে দেখি—খোলার চাল চুইয়ে, ময়লা জল পড়ে তার মহিমা মাটি ক'রে দিয়েছে। অশিক্ষিতা পরিবারের কৌশ কত,—ছবি এসে পর্য্যন্ত ওপর দিকে চাইতেন না। দেশে আর্টের তো এই কদর! সে দেশের কি ভালাই আছে? সে মরুকগে, এখন কৃপা ক'রে অবৈধ শাস্তাগুলোর ব্যবস্থা ক'রে—অবাধ ক'রে দাও বাবা। তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। প্রয়াগে যাচ্ছি—পাঁচটা মাথা যেন মুড়তে পারি।"

বিনয় সবিনয়ে জানালে, "ঠিক বলচি বাবা, তুমি না রাখলে দেশে ফিরতে পারব না। আজ ছ' বছর হ'ল পত্নীর হার-ছড়া বাঁধা দিয়ে 'ফটো-ক্যামেরা' কিনি। সতীশের মুখে দার্জ্জিলিং যাবার সুবিধে হ'ল কি-না; পাড়াগেঁয়ের মত 'উইদাউট ক্যামেরা' যাওয়াও তো যায় না! ভদ্রোচিত একটা স্যুটও বানাতে হ'ল,—সত্তর দিতে হবে, হোম-স্পান কি-না।

—"টাইগার হিলে ষ্ট্যাণ্ড বসিয়ে ফোকাস ঠিক করছি, এমন সময় এক দমকা হাওয়ায় ক্যামেরা গেল খড্ডে। হার তো গিয়েই ছিল,—ক্যামেরাও গেল। তুমি তো দেখেই থাকবে। আমাকে কেন বাঘের পেটে দিলে না বাবা! সেই তো বাঘিনীতে খাবে! এখন শরণাগতের উপায় করে দাও বাবা, বাড়ীতে ঢোকবার জো নেই।"

রমেশ তার আবিষ্কার সম্বন্ধে জানালে ও মানত করলে।

অর্থাৎ এ কাজে কেউ কম গেলেন না। সকলকে হারিয়ে দিলেন সোনালীবাবু, যেহেতু তিনি উঠে কোঁচার খুঁটে বার-বার চোখ মুছলেন। দেখে সকলে

পরিমল্ ভারি ক্ষুণ্ন হয়ে গেল। এক ফোঁটা চোখের জল ফেললেই হ'ত।

ব্ল্যাক-প্রিন্স বললেন, "ওটা বাড়ীর জন্যে থাক্।"

নিবারণ সকলের শেষে উঠলো।

নেপেন যেন মুখিয়ে ছিল, নিবারণকে বললে, "নাম জানতে? বেনামী সঙ্কল্প হয় না।"

নিবারণ কথা কইলে না। কেবল বিরক্তভাবে তার দিকে তাকালে।

পাণ্ডা প্রণামী চাওয়ায় সকলেই দু-এক পয়সা দিলে, সোনালীবাবু একটি সিকি দিলেন।

তারপর প্রত্যাবর্ত্তন। সোনালীবাবু উদাসভাবে বললেন, "এ স্থান থেকে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না।"

রাত আটটার পর সব বাসায় ফিরলেন। সোনালীবাবুর সদাই একটা বিষন্ন উদাস ভাব দেখে, সেই সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠতেই ব্ল্যাক-প্রিন্স বললেন, "অতবড় সাহিত্যিক এনে হাজির করে দিলুম, তোমরা ওঁর কাছে কিছুই শুনতে চাইলে না? একপ্রকার অপমান করা নয় কি, নিজেদেরও অরসিক প্রমাণ করা।"

অভয় বললে, "আমিও সে কথা ভেবেছি, কিন্তু উনি যে-রকম বিষন্নমুখে থাকেন, সাহস হয় না।"

দ্বিজেন বললে, "ওঁদের চিন্তা কত, সব সময়ই মাথা ঘোরাই। বোধ হয় মনে মনে একটি ট্রাজেডি টেনে চলেছেন।"

নেপেন বললে, "তা ছাড়া রমেশ ওঁকে যে বেফাঁক দখল ক'রে ফিরছে। ওকে 'থিসিস' শোনাচ্ছে।

শেষ স্থির হ'ল—আজ তাঁর কাছে কিছু শুনতেই হবে। সুবিধাও হ'ল; বাসায় উপস্থিত হবার পর, ঠাকরুণ করুণ সুরে শুনিয়ে দিলেন, "হাঁটুনি ত কম হয়নি—এক কাপ ক'রে চা আর এই সামান্য কিছু মুখে দিন, খেতে একটু রাত হবে।"

এই ব'লে, এক থাল বাদাম পেস্তা আখরোট আর কিস্‌মিস—কয়েকটি গোলমরিচ মিশ্রণে জাফরাণের সম্বরা দিয়ে ঘিয়ে ভেজে দিয়ে গেলেন। সুগন্ধে মগজ ভরে গেল।

সুরেশ বললে, "সবই বাবার কৃপা, সঙ্কটমোচন বোধ হয় যেওয়া থেকেই সুরু করলেন, জাগ্রত দেবতা,.. আর ভয় নেই।"

নিবারণ ব্যাজার হয়ে ঠাকরুণকে বললে, "আপনাকে এসব বাড়াবাড়ি করতে কে বলেছিল? অমনি তো আর হয়নি,—খরচ আছে, সেটা......"

ঠাকরুণ সে কথা গায়ে না মেখে বললেন, "খরচ ছাড়া আর কোন্ কাজ হয় বলুন? আমোদ ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছেন,—(নিম্নকণ্ঠে) শমন দিয়ে তো কেউ টেনে আনেনি। না এলেও তো চলতো। গরীব দুঃখী—যা জানি ইচ্ছে থাকলেও তার ব্যবহার করবার উপায় তো নেই! আপনাদের দৌলতেই করে-কম্মে সাধ মেটাই। আপনারা আমোদ ক'রে খেলেই সার্থক মনে করি।"

তাঁর গলা ধরে এসেছিল। ব্ল্যাক্-প্রিন্স বললেন, "নিবারণ ম্যানেজার, ওর কর্ত্তব্যটা ও আমাদের শুনিয়ে সেরে নিলে,—ওকি সত্যি কিছু বলেছে! আপনি দুঃখিত হবেন না—বরং যা-যা ইচ্ছে হয় নিশ্চয়ই ক'রে খাওয়াবেন।"

তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

নেপেন নিবারণকে বললে, "যাও হে, আবার ন কিছু ক'রে বসেন।"

সোনালীবাবু কথা কইলেন, "যা এলো ওর বস্তু অংশটাই সুধু উপভোগের নয়, ওর মধ্যে মায়েদের পার্ট, রমণী-হৃদয়ের নিভৃত সত্তার পরিচয় ওর প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে।'

প্রিন্স বললেন, "সেটা অস্বীকার করবার কি উপায় আছে! মুখ বেইমানী করলেও—প্রাণ মাথা হেঁট করিয়ে ছাড়ে।—ইস্ থালার মাল যে মনিনের দখলে!"

সকলে সচেতন হয়ে মেওয়া-মিক্‌শ্চারে মন দিলেন।

প্রিন্স সোনালীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে কিছু শোনবার জন্যে আমরা সকলেই উৎসুক। কি ক'রে এত অল্প দিনের মধ্যে এমন অসীম শক্তি অর্জ্জন ক'রে সমগ্র দেশের ভক্তি আকর্ষণ করলেন, তার ইতিহাস আপনার মুখে শুনতে পেলে আমরা কৃতার্থ হব। জীবনী তো বেরুবেই, কিন্তু কবে আছি কবে নেই—"

ইত্যাদি সাগ্রহ অনুরোধ এড়াতে না পেরে সোনালীবাবু উদাস হাসি টেনে বললেন, "শোনবার মত কিছু নয়—মামুলি কথা। ওটা রোগ ছাড়া অন্য কিছু নয়,—আপনা আপনিই বাড়ে। ম্যালেরিয়া বলা চলে। তবে ওর সঙ্গে বায়ুবৃদ্ধি দেখা দিলে কল্পনায় শ্রীবৃদ্ধিটা সহজেই হয়। সেটা সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। আমাদের এটা ম্যালেরিয়া। সমালোচকেরা কুইনিন চালিয়ে মাঝে মাঝে দাবিয়ে বা দমিয়ে দেন। তাতেও যার না যায়, তাকে উপবাসে ছাড়ায়। উপবাসই সাহিত্যিকদের চরম ব্যবস্থা। ঐটাই উপকারে লাগে। আমার এখন সেই ষ্টেজ্ চলেছে। ওটা না থাকলে দেশের সমূহ শঙ্কা ছিল,......"

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন,—খেতে ডাক পড়লো।

"আচ্ছা—এসে হবে" ব'লে সকলে উঠে পড়লেন।

অভয় বললে, "বাঃ, যেন আয়ুর্বেদ শুনছিলুম—"

রমেশ বললে, "কি ইণ্টারেষ্টিং! সাহিত্যিক একেই বলে,—একেবারে ওর সাইকলজি থেকে সুরু করেছেন,......"

আহারের ব্যবস্থা দেখেই সব অবাক। কি পরিচ্ছন্নতা! বসবার আগেই তৃপ্তি এসে যায়, ঘ্রাণে ক্ষুধা টেনে আনে।

পেতলের বাঁলতি-হাতে ঠাকরুণ পাতে যা দিলেন—তা পোলাও। বললেন, "ঠাণ্ডাটা বড্ড পড়েছে, তাই চারটি ঘি-ভাতই করেচি।"

নিবারণ মাথা তুলতেই ব্ল্যাক্-প্রিন্স বললেন, "খবরদার, আজকের খরচ আমার।"

ঠাকরুণ সহসা সুমধুর বামাকণ্ঠে বললেন, "কাট-ছাঁট ভাল করতে পারাই তো ওঁর ধর্ম্ম। আজ কিন্তু বেশী পড়ে'ন,—আমরা গেরস্তের মেঁয়ে,—estimate exceed করেনি,—" কথাটা ব'লে ফেলেই সলজ্জে রান্নাঘরে দ্রুত গিয়ে ঢুকলেন।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওই করলে। মুখ-ফোটাবার মত ফাঁক পেলে না। যা মুখে পড়ে সবই যে অপ্রত্যাশিত স্বাদু!

ব্ল্যাক্-প্রিন্স বললেন, 'সত্যি ক'রে বোলো—এরকম all round splendid (সর্ব্বাংশে সুন্দর) রান্না কখনও উপভোগ করেছ কি না! নধু খানসামার খুন্তু-মার্জ্জিত প্লেটের পুডিং পেটে কম পড়েনি। এর শ্রদ্ধা যত্ন স্বাদ যেন প্রত্যেক জিনিষকে পবিত্র ক'রে দিয়েছে।"

সুরেশ বললে, "মাংস খাবার জন্যে অনেক পয়সা খরচ করেছি, 'গ্র্যাম ফেড্' এনে দিয়েছি, খেয়েচি কিন্তু ঝালের ঝোল,—না ঝোয়াদ, না ·"

ঠাকরুণ বোধ হয় শুনছিলেন, মুখদে' ইংরিজি বেরিয়ে যাওয়ায় লজ্জায় আসতে পারছিলেন না। থাকতে পারলেন না, ঘি-ভাত নিয়ে চলে এলেন,—বলতে বলতে, "ও-সব কথা বলবেন না—বেইমানী হয়। তাঁদের শ্রদ্ধা যত্ন, সাদ্দিকি যে আর কোথাও মেলে। সে আপনারা বুঝবেন না। ঠাকুর-দেবতার ঘরে পেঁজ তো চলে না—তাই বোধ হয়···পেঁজ ভালবাসেন বুঝি?"

নেপেন একটা কথা ক'বার তরে মরছিল, বললে, "আপান দিলেন কেন? কি ক'রে জানলেন, যে আমরা খাই?"

কবজিটা দিয়ে মাথার কাপড়টা টেনে ঠাকরুণ বললেন, "না দিলে ওই ঝালের ঝোলের সার্টিফিকেট (জিভ কেটে) মিলতো তো! ওটা আমাদের বুঝে নিতে হয়। 'ভূতু'রও বলতে সাহস হবে না যে আপনারা হবিষ্যি করেন! আপনাদের উপোসী রাখবো না-কি?—কি দেবো বলুন!"

অভয় সভয়ে বললে, "মাংস ধ্বংস করচি তো কম নয়,—আর চাইলে পাবো কি?"

"ওমা সে কি কথা!" ব'লে তিনি ছুটে মাংস আনতে গেলেন।

"এ মেয়েটি কে!" সকলের মুখেই এই ভাব ফুটে উঠলো।

'কার কি চাই—চেয়ে নেবেন, সব জিনিষই আছে"—বলতে বলতে এসে মাংস 'রিপোর্ট' করলেন।

শরৎ বললে, "দোষ কিন্তু আমাদের নয়, আপনার; এ রান্না এ যত্ন শ্বশুরবাড়ীতেও কেউ পায় না।

—"দেশে ওই মর্মান্তিক কথাটা সকলেই কয়, ওই তুলনাই দেয়; তাতে বনেদের কতখানি অপমান করা হয়, তাদের কতটা লাগে, সেটা কেউ ভাবে না! তাদের স্নেহ, তাদের যত্ন কেউ দেখতে পায় না। বাদ সাধে বটে অবস্থায়,—অন্তরটা তো দেখাবার জিনিষ নয়।"

চলে গেলেন,—শেষের মৃদু স্বরটা সকলের কানে আর প্রাণে লজ্জা আর ব্যথার সুরে বাজতে লাগলো।

সোনালীবাবু চোখের জল রূমালের ছলনে সামলালেন, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এই ভাগ্যবঞ্চিতা, ছন্মা, সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে নয়!

* * * *

ক্রমে ফেরবার দিন এগিয়ে এল। ঠাকরুণের সে সহাস ভাব মিলিয়ে আসতে লাগলো, শরতের সাদা মেঘের ফিকে ছায়ার মত ঈষৎ মলিন। দু-একটি কথা যা ক'ন—নিতান্ত আপনার লোকের মত।

খেতে বসে কথা-প্রসঙ্গে অভয় বললে, "আমাদের যে অর্দ্ধেক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে-বাঁধা—পরীক্ষা সামনে। কেউ রিসার্চে রয়েছে, তাই ফেরবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

"আ মরি মরি!—এই-সব রত্নদের (নিঃশ্বাস পড়লো)—আ মরি মরি,—"

"তা হোক, পড়া ছাড়েন নি তো? ভুলে যান, মনে রাখবেন না, ভাল হবে। ভালয় অভালয় তফাৎ তো ওইখানেই।—এই তো বুদ্ধিমানের কাজ!"

এই রকম দু-চারটে কথা মাত্র।

তার পর দেখা-শোনা সারতে সকলেই ব্যস্ত।

আজ ফেরবার দিন। 'টুথ-ব্রাশ' (দাঁত-ঝাড়ু) আর পেষ্ট্ ঘষে, শেভিং সরঞ্জাম নিয়ে সব বসে গেলেন। শেষ—তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে রেখে স্নান ক'রে এসে খেতে বসলেন।—মাছের ঝোল, মাছ ঝালদে', মাছের অম্বল, দই।

ঠাকরুণ বললেন, "আজ সব সাদাসিদে।"

ব্ল্যাক্-প্রিন্স বললেন, "কদিন প্যাঁজ মাংস আর গরম মশলার পর এ যেন আজ অমৃত লাগছে—শান্তিজল পড়চে। শরীরে একটা ঝাঁঝ বেরুচ্ছিল,—জুড়িয়ে দিলেন।"

মনিন গোগ্রাসে গিলছিল, বললে, "খেয়েনি—আবার তো উদরের ভার সেই দামোদরের ওপর!"

আহারাদির পর পান খেয়ে সব 'কোব্‌রা' বার করে জুতোর সেবায় মন দিলেন। দু'ঘণ্টা পরেই বেরুতে হবে।

ঠাকরুণ বললেন, "এখনও ঢের সময়, একটু গড়িয়ে নিন—

—"অনেক অপরাধ, অনেক বাচালতা ক'রে থাকব, ভগ্নী ভেবে ক্ষমা করবেন। নানা কারণে মনে মাথায় ঠিক থাকে না।"

তাঁর চোখ জলে ভরে এল। শেষের কথা-কয়টি যেন ব্যথায় টন্ টন্ করছে। সকলকে কাতর ক'রে দিলে।

ব্ল্যাক-প্রিন্স তাড়াতাড়ি বললেন, "সে কি, তোমার আবার অপরাধটা কোথায় হয়েছে?—

—'আমরা বিদেশে এসেছি,—বাসায় রয়েছি, এ কথা একবার মনেও আসতে দাওনি। এমন নিশ্চিন্তে তো কোথাও কোনবারই থাকিনি;—এত যত্ন কোথাও পাইনি।"

"জগতে আমার এই শোনাটুকুতেই সুখ" ব'লে,দু'হাত এক করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "আর তো কোনো কাজ নেই—আমি এইবার চললুম।"

—দ্রুত চলে গেলেন।

নিবারণ চেঁচিয়ে ব'লে দিলে, "আমাদের বেরুতে তিনটে, দেরি করবেন না। ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন, হিসেবটা………"

সরলা তখন একটি গলির মধ্যে।

* * *

সাড়ে চারটে আন্দাজ ট্রেন ছাড়বে, তিনটে বেজে গেল। ঠাকরুণের যে দেখা নেই! বাড়ীর রক্ষক রামজি ছুটে ডেকে এনে দিলে।

আর তো অপেক্ষা চলে না। নিবারণ সব ঘরগুলো দেখে নিতে গিয়ে দ্যাখে—রান্নাঘরে কাপড়-বাঁধা একটি

চেঙারি রয়েছে, তাতে যথেষ্ট লুচি (তখনও গরম) কপির ফুল ভাজা, বেগুন ভাজা, নুন লঙ্কা আর আঁব-সন্দেশ!

সকলে দেখে অবাক্! কেউ তো বলেনি! কিন্তু তিনি কই?

বাড়ীর রক্ষক বললে, "তিনি তো আর আসবেন না,—চিত্তরঞ্জন-পার্কে গিয়েছেন।"

"তাঁর পাওনা যে··· · ·· "

রক্ষক হেসে বললে, "সরলা মাঈতো কিছু নেন না; দরকার থাকলে চেয়ে নিতেন। আপনারা আর দেরি করবেন না ··"

সে কি কথা!

"তাঁর পাওনাটা তুমি রাখ না রামজি,—দিয়ে দিও।"

"বাপ রে!"

উপায় নেই—সময়ও নেই। বেরিয়ে পড়তে হ'ল। গোধোলিয়ার মোড়ে—লোকের ভিড়। জাতীয়-পতাকা, আর সুমধুর ছন্দে—বন্দে মাতরম্।

এইখানেই গাড়ির আড্ডা।

মহিলাদের প্রসেশন্। লোকে লোকারণ্য। সর্ব্বাগ্রে পতাকা-হস্তে—'পতাকা-পেড়ে' টক্‌টকে লাল শাড়ি-পরা এক সুন্দরী যুবতী—চার দিকে যেন একটা পবিত্র প্রভাব বিকীরণে সকলকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছেন!

তাঁরা না-কি গ্রেপ্তার হয়ে চকের থানায় চলেছেন। তিনি একটি প্রৌঢ়াকে দেখতে পেয়ে, আঁচল থেকে রিং-সুদ্ধ চাবি খুলে ছুঁড়ে দিলেন। প্রৌঢ়া তুলে নিয়ে চোক মুছলেন।

নেপেন ব'লে উঠলো—'তিনিই তো!'

প্রৌঢ়া শুনতে পেয়ে বললেন, "কাকে খুঁজচো বাবা,—ও আমাদের সরলা,—এই করেই গেল!"

"উনি যে আমাদের কাছে টাকা পাবেন; কদিন·· "

"আ আমার পোড়া কপাল,—ও কি টাকার জন্যে···"

সকলের মুখেই অস্ফুট প্রশ্ন প্রকাশ পেলে—"তবে?"

প্রৌঢ়া বললেন, "বাবা, আমাদের সব কথা কি তোমরা বুঝতে পার—না, আমরাই তা বলতে পারি। ও ছিল এক সব-জজের মেয়ে। বেথুনে পড়তো,—ছুটো পাস্!—

—"সে-সব কথা শুনে আর কি হবে। বাপ-মা দু-ই নেই, কেবল কাশীর বাড়ীখানি আছে,—তারই একখানি ঘরে থাকে। গরীব দেখে বাকি অংশ আমাদের থাকতে দিয়েছে। ভাড়া নেয় না।"

"ওর স্বামী?"

"সে কথা কবার মত নয়। কপাল!—

—"যেখানে সেবার কাজ সেইখানেই সরলাকে পাবে। জগতে—বয়সে বড়রা এখন ওর মা-বাপ, সমবয়সীরা—ভাই-বোন, ছোটরা ছেলেমেয়ে। সংসারে মেয়েদের কত বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা,—কত সাধ থাকে, তা তো তোমাদের বোঝাতে পারবো না বাবা। সেইটে ওর দপ্ করে নিবে গেছে!—

—"তোমাদের কথাও কাল বলছিল,—'সব ভদ্র সন্তান, কোনো গোলমালে নেই, নিজেদের নিয়েই থাকেন। দেশের এতবড় একটা বিক্ষেপ—বিক্ষোভ,—তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। দিশি-বিদেশী ব'লে কোনো বিকার নেই। প্রকাশ না করলেও দেশের সম্মান রক্ষা ক'রে চলেন—রংয়ে। বোধ হয় নিরুপায় ব'লেই সেটা প্রকাশ্যেই ধারণ করেন। একখানা সংবাদপত্র বাসা ঝেঁটিয়ে একদিনও মেলেনি। বেশ দেশ-নির্লিপ্ত।'—খুব সুখ্যেত করছিল বাবা।—

—"লেখাপড়া জানা ভায়েদের সঙ্গ পাবার জন্যে টে যায়, তাদের সেবা করতে, দুটো কথা শুনতে, দুটো কথা কইতে। কোনো সাধই তো মেটেনি! যাক্ এখন কতদিনের জন্যে চল্‌ল জানি না।"—এই ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে, বিমল সহাস মুখে সরলা দুহাত তুলে কপালে ঠেকালেন।

ব্যথা আর লজ্জা মাথা হেঁট ক'রে দিলে, মুখ নীচু ক'রে নমস্কার জানাতে হ'ল।

বিস্ময়-স্তম্ভিত সোনালীবাবুর মুখ থেকে অসম্বিত অস্ফুট স্বরে বেরুল—"মা ধা হবেন।"

একজন তাড়া দিলে, "চলো—এখন ট্রেন পেলে হয়।"

পুরাণে কাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১। পুরাণ-পাঠের প্রয়োজন

আমি পুরাণ পড়িতে পড়িতে এক একবার ভাবি, সংস্কৃত বহু গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, যদি মহাভারত ও পুরাণও লুপ্ত হইত, ভারতী প্রজা কি রসধারা জীবিত থাকিত। "মানব জমীন্" অন্নপান দ্বারা সরস হয় না। যে জাতির পুরাবৃত্ত অজ্ঞাত, সে-জাতির স্থিতি-রক্ষার উপায় কি থাকে? যাহারা স্বকৃষ্টি ত্যাগ করিয়া পরকৃষ্টি গ্রহণ করে, তাহারা কেমনে সুখী হয়? যে গাছের মূল ছিন্ন, উৎপাটিত, সে গাছ কিসে বাঁচে? কে জানে।

বৈদিক পণ্ডিত বলিবেন, "কেন, বেদ থাকিলেই সব থাকিত। বেদই পুরাবৃত্ত।" কিন্তু বেদ যত মহামূল্য হউক, তিন প্রধান কারণে ইহার দ্বারা পুরাণের অভাব পূরণ হইত না। (১) বেদ বোধগম্য নয়; যত মুনি তত বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ বুঝি। এক কালে ও এক দেশে বেদ প্রণীত হয় নাই। সেরূপ হইলে নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারিত না। (২) একদেশে ও কালে প্রণীত হইলেও কেবল শ্রুতি-গ্রন্থ বলিয়াও ব্যাখ্যা সোজা হইত না। অন্য দেবদেবীর কথা থাক, বেদের ইন্দ্র কে, অদ্যাপি বুঝিতে পারি নাই। আমি বেদ পড়ি নাই, বেদপাঠ আমার সাধ্য ছিল না। কিন্তু যাহারা সারা জীবন পড়িয়াছেন, বুঝাইয়াছেন, তাহাদের ব্যাখ্যাও বুঝিতে পারি না। পুরাণে আছে, "যিনি বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ চারি বেদ পড়িয়াছেন, কিন্তু পুরাণ পড়েন নাই, তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণ হইতে বেদজ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। যিনি অল্পশ্রুত, তাঁহাকে বেদ ভয় করেন, যেন প্রহার করিতে আসিতেছে।" (৩) বেদ যে বহু পূর্ব্বকালে উচ্চারিত হইয়াছিল। কেহ বেদের আদিকাল বলিতে পারিবে না। যে যে মন্ত্র আধুনিক সেও যে তিন চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন! মধ্যের যোগ-সূত্র না পাইলে বেদ ইতিবৃত্ত হইতে পারে না। মহাভারত ও পুরাণ সে সূত্র টানিয়া আনিয়া ব্যবধান হ্রাস করিয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন যোগ-সূত্র বলিয়াই মহাভারত ও পুরাণও সব বুঝিতে পারি না। সমগ্র মহাভারত বুঝাইয়া বলিবার পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। সেকালের অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগ না হইলে মহাভারত বুঝিতে পারা যায় না। পুরাণ বুঝিতেও অত বিদ্যাই চাই। প্রত্যেক পুরাণ-আরম্ভে, "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥" নারায়ণ বুঝিলাম, সরস্বতী বুঝিলাম। কিন্তু "নরোত্তম নর" কে? এক মতে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি ছিলেন; এক মতে নর—অর্জুন; নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ; এক মতে নর-নারায়ণ দুই দেব, দুই পূর্ব-দেব। এক মতে নর—নর-রূপী নারায়ণ, প্রত্যেক মানুষে যে নারায়ণ বিদ্যমান। বোধ হয়, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ওঁ বাগ্দেবী, এই তিনের জয় উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত পুরাণের মহামহোপাধ্যায় সম্পাদক ও বঙ্গানুবাদক নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী, এই পাঁচকে পৃথক্ প্রণাম করিতে বলিয়াছেন।

নারায়ণ কখনও মীনরূপ, কখনও বরাহরূপ, কখনও নৃসিংহরূপ, আর কখনও বা গোপীবল্লভরূপ ধরিয়াছেন,—সব বুঝিতে পারি না। যদি বলি, পুরাতন কালের লোকগুলা অতিপ্রাকৃত রহস্যে বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পুরাণকারকে অবিবেচক বলিতে হয়। তিনি বহুস্থানে বলিয়াছেন, "আমি এইরূপ শুনিয়াছি। কোথাও লিখিয়াছেন, "দেখিয়াছি।" পুরাণ ধর্মশাস্ত্রের শাখা, একথা বিস্মৃত হইতে পারা যায় না।

আরও সোজা কথায় আসি। পুরাণকারেরা যুগ ও মনু দ্বারা বৎসর সমষ্টি করিতেন। কিন্তু সে যুগ ও মনু

বর্ত্তমান পাঁজির বুঝিলে কাল যে নিরবধি, তাহাই স্মরণ হয়। দীর্ঘতমা ঋষি সহস্র বর্ষ তপস্যা করিলেন। সে বর্ষ ৩৬৫ দিনের হইতে পারে কি ?

পুরাণ পড়িতে পড়িতে এইরূপ কত জিজ্ঞাসা আসিয়া পড়ে, তাহার সংখ্যা নাই। নব্যশিক্ষিতেরা পুরাণ অশ্রদ্ধেয় মনে করেন, পুরাণ mythical stories। কিন্তু জল্পনাই বা হইল, পুরাকালের জল্পনাও যে ইতিহাসের অঙ্গ। দেশ-বিদেশের উপকথা শুনিতে কৌতুক বোধ করি, মানব-মনের লীলা-চাতুর্য দেখাই ত ইতিহাস।

আমি মাত্র চারি পাঁচখানা পুরাণ দেখিয়াছি, সব বুঝি নাই; কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছি, পুরাণ আমাদের দেশের পুরাবৃত্তই বটে। এখানে বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণু-পুরাণ হইতে কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করিতেছি। এই তিন পুরাণ ধরিবার হেতু আছে। তিনই পঞ্চলক্ষণ। সে পাঁচ লক্ষণ এই,—আদি সৃষ্টি, পরবর্তী সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত। অমরকোষে পুরাণের এক নাম 'পঞ্চলক্ষণ'। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই কোষ পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল, অমর-সিংহ ও বরাহমিহির সমকালীন। আমার বিবেচনায় অমরকোষ ইহার দুই তিন শত বৎসর পূর্বে, বোধ হয়, মগধে প্রণীত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পুরাণের পঞ্চলক্ষণ অমরকোষের পূর্বেই মান্য ও গণ্য হইত। পঞ্চলক্ষণ পুরাণ আরও আছে, কিন্তু এই তিনে ঋষিবংশ ও প্রাচীন ও অপ্রাচীন রাজবংশ যেমন আছে, অন্য পুরাণে তেমন নাই। ভাগবত পুরাণেও কিছু কিছু আছে। কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে এত আবশ্যক হইবে না।

২। পুরাণত্রয়ের স্বরূপ

বায়ুপুরাণ

বায়ুপুরাণ কোন্‌খানি ? প্রশ্নটা নূতন ঠেকিবে, কিন্তু পুরাণের নামে ভুল হইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের নাম এই,—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। অষ্টাদশ পুরাণের এই এই নাম অনেক পুরাণে আছে। ইহার মধ্যে বায়ুপুরাণ নাম নাই। কিন্তু মৎস্য ও নারদীয় পুরাণে 'শৈব' স্থানে 'বায়বীয়' লিখিত আছে। অর্থাৎ শিব-পুরাণ ও বায়ুপুরাণ এক। কিন্তু শিবপুরাণের যে পুরাতন লক্ষণ আছে, সে লক্ষণের শিবপুরাণ না কি পাওয়া যায় না। "বঙ্গবাসী"র শিবপুরাণ ঠিক সে পুরাণ নয়। ইহার মধ্যে এক "বায়বীয় সংহিতা" আছে। কিন্তু শিবপুরাণের লক্ষণ মেলে না। "এসিয়াটিক সোসাইটি" ও "বঙ্গবাসী" যে বায়ুপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রায় মিলিয়া যায়। শিবপুরাণে রেবামাহাত্ম্য ও গয়ামাহাত্ম্য ছিল, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ছিল না। কিন্তু "সোসাইটি"র বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকায় বসুজ মহাশয় এই ভ্রম দেখাইয়া "সোসাইটি"র বায়ু-পুরাণের সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে দুকথা শোনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারাই প্রথমে ভুল করেন নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভাবি রাজবংশ নাই, কিন্তু বায়ুপুরাণে আছে। এই রাজবংশ নূতন যোজিত নয়। সে যাহা হউক, প্রকাশিত বায়ুপুরাণ মূলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইলেও নূতন যোজনার পর বায়ুপুরাণ নামে খ্যাত হইয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে "বঙ্গবাসী"র বায়ুপুরাণ যথেষ্ট হইবে। "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" বলিলে বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" বুঝিতে হইবে।

বায়ুপুরাণ বায়ু-প্রোক্ত শৈবপুরাণ। এই বায়ুপুরাণ কখন্ প্রথমে উক্ত হইয়াছিল, তাহা পরে পুরাণ হইতে বলিতেছি। কিন্তু সে আদিরূপে নূতন কিছু কিছু যোজিত হইয়াছে। মগধের গুপ্তবংশ পর্যন্ত রাজাদিগের নাম আছে। ইহা হইতে বুঝিতেছি, বায়ুপুরাণের বর্ত্তমান সংস্করণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই ভাবি রাজবংশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে নাই, বায়ুপুরাণের এক পুথীতেও নাই। অতএব এই অংশটির জন্য সমগ্র বায়ুপুরাণ আধুনিক বলা যাইতে পারে না। পুরাতন মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হইলে মন্দিরটি নূতন বলা চলে না।

যে পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য যত অধিক, সে পুরাণ তত আধুনিক বলা যাইতে পারে। বায়ুপুরাণে এই সকল মাহাত্ম্য নাই বলা চলে। পুরাণখানি নর্মদার উত্তরে মালবদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

মৎস্যপুরাণ

এই পুরাণের বক্তা মীন, শ্রোতা মনু। তথাপি পুরাণখানি শৈব। ইহাতে বহু ব্রত-ও দান-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রাজার প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় আছে। এই এই বিষয় ছাড়িয়া দিলে এই পুরাণে ও বায়ুপুরাণে এত সাদৃশ্য আছে যে, মনে হয় যেন এক আদি পুরাণ হইতে দুইখানির সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয়, পুরাণখানি বোম্বাই অঞ্চলে কোনও রাজার নিমিত্ত বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়াছিল। ইহাতেও ভাবি রাজবংশের উল্লেখ আছে। তথাপি ইহার অধিকাংশ আরও প্রাচীন। বায়ু ও মৎস্য পুরাণ ভারতের পশ্চিম দেশের এবং পুরাকালের বলিয়া এই দুই পুরাণে সুমাত্রা দ্বীপের বড়বার উল্লেখ নাই। (পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" "ঔর্বাগ্নি" দেখুন।)

বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ বৈষ্ণবপুরাণ। ইহা ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম চারি অংশ বায়ুপুরাণের তুল্য। ইহাতে ব্রত ও তীর্থ-মাহাত্ম্য নাই। পঞ্চম অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। ষষ্ঠ অংশে মোট আটটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ের বিষয় প্রথম চারি অংশে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত। বোধ হয় আদি বিষ্ণুপুরাণে প্রথম চারি অংশ ছিল ; পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরে যোজিত। পরে এই অনুমানের হেতু দেওয়া যাইবে। কিন্তু পরে যোজিত হইলেও নারদপুরাণের পূর্বে যোজিত। নারদপুরাণ মতে বিষ্ণুপুরাণের উত্তর ভাগের নাম বিষ্ণুধর্মোত্তর। অতএব বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরাণ, পূর্ব্ব-ভাগমাত্র। বিষ্ণুপুরাণেও ভবিষ্য রাজবংশ আছে। এই পুরাণ ব্রহ্মাবর্তে খ্যাত হইয়াছিল।

৩। পুরাণত্রয়ের আদি প্রণয়ন কাল।

বায়ুপুরাণ কখন্ কথিত হইয়াছিল? পুরাণের আরম্ভে লিখিত আছে, 'যখন নৃপতি-সত্তম বিক্রান্ত অনুপম-তেজঃ অধিসীমকৃষ্ণ ধর্মানুসারে পৃথ্বী শাসন করিতেছিলেন, তখন নৈমিষ্যারণ্যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বতী নদীতীরে নষ্টরজঃ শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় ঋজু সংশিতাত্মা সত্যব্রতপরায়ণ ঋষিগণ যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া এক দীর্ঘসত্র আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত পৌরাণিকোত্তম মহাবুদ্ধি সূত লোমহর্ষণ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার সুভাষিত শ্রবণে শ্রোতৃগণের লোমহর্ষ হইত। এই হেতু তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হইয়াছিল। তিনি বেদব্যাসের ত্রিলোক-বিশ্রুত ধীমান্ মেধাবী শিষ্য ছিলেন। তাঁহাতে 'পুরাণ বেদ' ও 'বিপুল মহাভারত' প্রতিষ্ঠিত ছিল। যিনি সেই সত্রে 'গৃহপতি' (বৈশ্যযজমান) ছিলেন, তিনি ইঙ্গিত হইতে ঋষিগণের ভাব দেখিয়া লোমহর্ষণকে বলিলেন, "দেখ, তুমি ইতিহাস ও পুরাণ নিমিত্ত মহাবুদ্ধি ভগবান্ ব্যাসের উপাসনা করিয়াছ। এখানে উপস্থিত ধীমান্ ঋষিগণ পুরাণ-শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন। ইঁহারা নানা গোত্র ইঁহারা স্ব স্ব বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমরা যজ্ঞারম্ভের পূর্বে তোমায় স্মরণ করিয়াছিলাম।"

এখানে এই বিক্রান্ত রাজার নাম অধিসীমকৃষ্ণ পাইতেছি। কিন্তু অন্যত্র তাঁহার নাম অধিসোমকৃষ্ণ আছে। এই পুরাণের কেবল এই এক স্থানে নয়, পরে ৯৯ অধ্যায়ে (৬৩৬ পৃঃ) লিখিত আছে, "সম্প্রতি ধর্মাত্মা মহাযশা অধিসীমকৃষ্ণের পৃথ্বী-শাসনকালে, দৃষদ্বতীর তীরে আপনাদের [ঋষিদের] দুশ্চর দীর্ঘসত্রের দুই বৎসর অতীত হইয়াছে।" পুনশ্চ একটু পরে, "অধিসীম-কৃষ্ণঃ সোঽয়ং সাম্প্রতম্ পৌরবান্ নৃপঃ" পুরুবংশের অধিসীমকৃষ্ণ সাম্প্রত নৃপতি।

অধিসীমকৃষ্ণ কে? উক্ত অধ্যায়ে পাইতেছি, রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, তস্য পুত্র শতানীক, তস্য পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তস্য পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ। অর্থাৎ পরীক্ষিতের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-বৎসরে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। অতএব তদনন্তর এক শত বৎসর পরে বায়ুপুরাণ কথিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল, এই পুরাণ দ্বাদশ শতাব্দে প্রথম প্রণীত হইয়াছিল।

কিন্তু এই যে নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল-সাধ্য সত্র ও অবসরকালে পুরাণ-শ্রবণ, একথা মৎস্য পুরাণেও লিখিত আছে। এই পুরাণে ("বঙ্গবাসী"র সংস্করণ, ৫০ অঃ, ১৮১ পৃঃ) প্রায় বায়ুপুরাণের ভাষায় লিখিত আছে, "অধিসোমকৃষ্ণের রাজ্য-শাসনকালে আপনারা [ঋষিরা] দৃষদ্বতীর তীরে দীর্ঘসত্র করিতেছেন।" এই পুরাণের এক স্থানে আছে, রাজা শতানীককে শৌনক যযাতি-চরিত শোনাইয়াছিলেন।

যাঁহারা পৌরাণিক "যুগ" কল্পনা করিয়া সব পুরাণ এক কোঠে ফেলিয়াছেন, তাহারা পরীক্ষিতের কালেও পুরাণ-প্রণয়ন শুনিলে আরও আশ্চর্য হইবেন। বিষ্ণুপুরাণ ("বঙ্গবাসী"র সংস্করণ, ৪।২০ অঃ, ২৮৭ পৃঃ) পরীক্ষিত পর্যন্ত আসিয়া লিখিতেছেন, "যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্‌ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তিধর্ম্মেন পালয়তীতি"— যিনি সম্প্রতি এই ভূমণ্ডল অখণ্ডিত ধর্মানুসারে পালন করিতেছেন। বায়ু ও মৎস্য পুরাণ অধিসীমকৃষ্ণের পর ভবিষ্যকালের, বিষ্ণুপুরাণ পরীক্ষিতের পর ভবিষ্যকালের রাজ বর্ণন করিয়াছেন। লিখিতেছেন,যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ—"এখন যিনি রাজা তাঁহার চারি পুত্র হইবে। জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয়, তস্য পুত্র শতানীক, তস্য পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তস্য পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ" ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে,পরীক্ষিতের কালে, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত, জনমেজয়কালে ভারত-ইতিহাস, শতানীককালে পুরাণের কিয়দংশ, এবং অধিসোমকৃষ্ণকালে বায়ু ও তদনন্তর মৎস্য পুরাণের আদি কথিত হইয়াছিল।

পুরাণ-বক্তার পরিচয় লওয়া যাউক। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, (৩।৪,৬) বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিতে বসিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত, এই চারি জন 'বেদ পারগ'কে 'শ্রাবক' করেন। অনন্তর তিনি সূতজাতীয় লোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য করেন। (সূতজাতি সঙ্করবর্ণ, বেদে অধিকারী ছিল না।) ঐ সকল শিষ্য হইতে বহু শিষ্য হইয়াছিলেন। লোমহর্ষণের ছয় শিষ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিন শিষ্য লোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত সংহিতা অবলম্বনে এক একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। অতএব একখানি হইতে পুরাণ-সংহিতা চারিখানি বলিতেছেন (৩।৬), সেই চারি সংহিতা করিয়া বিষ্ণুপুরাণ।

বেদব্যাস ভারত-সংহিতা ও পুরাণ-সংহিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রথিত সংহিতা এখন পাইবার উপায় নাই। কিন্তু মূল সংহিতাকার এক হওয়াতে মহাভারতে ও পুরাণের বাক্যে অবশ্য মিল ছিল, এবং মূল সংহিতার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণেও অবশ্য মিল থাকিবে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, তিন পুরাণেই কতকগুলি বিষয় সাধারণ; যেমন ব্রহ্মার সৃষ্টি, ঋষিবংশ, রাজবংশ, ভূগোলবর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রবর্ণন, মন্বন্তর-বর্ণন, ইত্যাদি। দেখিতেছি, তিন পুরাণেই পরস্পর ঐক্য আছে। না থাকিলে তিনেরই এক মূল অনুমান করিতে পারা যাইত না। অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয় অন্ততঃ বেদব্যাসের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

সহজেই প্রশ্ন উঠে, বেদব্যাস তাঁহার পুরাণ-সংহিতার উপকরণ কোথায় পাইলেন। পুরাণ-কথা অল্প নয়, অল্পকালের নয়। ইহার উত্তর পুরাণেই আছে। ব্যাস একজন ছিলেন না। ব্যাস নাম, উপাধি। কালে কালে যুগে যুগে ব্যাস জন্মিয়াছিলেন, বেদসংহিতা ও পুরাণ-সংহিতা করিয়াছিলেন। শেষ-ব্যাস, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। ইঁহার পর ব্যাস আর আবির্ভূত হন নাই। অন্ততঃ কেহ ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতএব দ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বের সংহিতা, মুখেই হউক আর লেখাতেই হউক, পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতেছি, ইহার বক্তা পরাশর, দ্বৈপায়নের পিতা; শ্রোতা পরাশর-শিষ্য মৈত্রেয়।

কিন্তু এখানে একটা তর্ক উঠিতেছে। পরীক্ষিতের কালে দ্বৈপায়নের পুত্র থাকিবার কথা, দ্বৈপায়ন থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তখনও জীবিত ছিলেন কি? ভাগবত পুরাণের প্রথম শ্রোতা পরীক্ষিত, বক্তা দ্বৈপায়ন-পুত্র শুকদেব। ইহাই ত ঠিক। শুকদেবের সময়ে লোমহর্ষণ ছিলেন; কিন্তু তিনি পরীক্ষিতের পৌত্রের কালে, অধিসীমকৃষ্ণের কালে,

পারেন না।* এই তর্কের উত্তরও সোজা। প্রথম কথা, দ্বৈপায়ন ব্যাসই প্রথম সংহিতা করেন নাই, তাঁহার পিতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বৈপায়ন যে সংহিতা করিয়াছিলেন, সেই সংহিতাই তাঁহার শিষ্য শিষ্যানুশিষ্য প্রচার করিয়াছেন। দুই একখানা আরও প্রাচীন সংহিতা রহিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে মূল বিষ্ণুপুরাণের আধার একখানা। সেখানা দ্বৈপায়নের পিতা পরাশর করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা, সেকালের বিদ্বানেরা সত্যশীল ছিলেন। তাঁহারা যশের তরে পরের দ্রব্য না বলিয়া লইতেন না, পুরাতনে কিছু পরিবর্তন ও কিছু নূতন যোজন করিয়া আপনার অর্জিত বলিয়া প্রচার করিতেন না। যদি সংহিতার মূল পরাশর, তাহার যত সংস্করণ হউক, যত লোপ ভ্রংশ প্রক্ষেপ অন্তঃ-স্থাপন হউক, পরাশরই কর্তা থাকিতেন। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকর্তার সত্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি এত প্রখর ছিল যে, আপনাকে গুরুর নামে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কেবল পুরাণে নয়, সকল শাস্ত্রেই এই। পরাশর বর্তমান বিষ্ণুপুরাণ বলেন নাই, তাঁহার কোনও শিষ্যানুশিষ্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু পরাশর আদি, সেহেতু তিনিই বক্তা। সে শিষ্য পরীক্ষিতের কালে থাকিবেন, আশ্চর্য কি?

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, পুরাণকার পরীক্ষিতের ও অধিসোমকৃষ্ণের নাম করিয়া আপনাকে পুরাতন মানাইতে গিয়াছেন। "এ একটা ছল। বেদব্যাস কি আঠারখানি পুরাণ বলিয়াছেন?" ইহার উত্তর, তিনি আঠারখানির মূল বলিয়াছেন। এই হেতু তিনিই কর্তা হইয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণের বর্তমান সংস্করণ একজনের দ্বারা হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতেছি, পরাশর বক্তা। তিনি বশিষ্ঠের নিকট শুনিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে দেখিতেছি, নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মুনি সূতকে বলিতেছেন, "তুমি পুরাণ কহিয়াছিলে, আমরা আবার তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" বায়ুপুরাণ বলিতেছেন, "আমি সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের মুখে শুনিয়া বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ বলিতেছি।" মৎস্যপুরাণের কিয়দংশ, জগৎসৃষ্টি অংশ, এত প্রাচীন যে তাহা মীনরূপধর বিষ্ণুর কথিত। এইহেতু নাম মৎস্যপুরাণ। বায়ুপুরাণে তিনি বায়ু। অর্থাৎ কোন্ পুরাকালে কত বায়ুর বিদ্যমান ছিল, কে জানে।

* বস্তুতঃ পরীক্ষিতের কালে ব্যাস শিষ্য লোমহর্ষণ গত হইয়াছিলেন। এক সত্রে লোমহর্ষণ পুরাণ শোনাইতেছিলেন, বলরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত। ঋষিগণ দণ্ডায়মান হইলেন, সূত হইলেন না। বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সূতকে নিহত করিলেন। লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা।

৪। পুরাণত্রয়ের জ্যোতিষিক কাল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৎসরে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রস্বরূপ। এই কালের সবিশেষ আলোচনা এক পৃথক প্রবন্ধে করা যাইবে। ইতিমধ্যে পুরাণত্রয়ের কালবিচার নিমিত্ত জ্যোতিষিক নির্দেশ অবলোকন করি। এই নির্দেশ তিন পুরাণেই এক। এইহেতু কেবল বায়ুপুরাণ গ্রহণ করিলেই চলিবে।

(ক) অশ্লেষার্দ্ধে দক্ষিণায়ন

তিন পুরাণেই সম্বৎসরাদি পঞ্চবর্ষে যুগ ধরা হইয়াছে। (বায়ু ৫০ অঃ, ২৬৬ পৃঃ, ২৭০ পৃঃ)। "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে" এই যুগের উৎপত্তি। বৈদিক যজ্ঞকর্মের বিহিত কাল ছিল। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, বিষুব, অয়নে যজ্ঞ করা হইত। অয়নান্ত কালে পশুযাগ অবশ্য কর্তব্য ছিল। এইহেতু দুই অয়নের অন্ত না জানিলে চলিত না। বৈদিক কালের শেষকালে "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ" রচিত হইয়াছিল। ইহাতে আবশ্যক দিন গণিবার সূত্র আছে। এই সূত্র-পুস্তিকা এমন দেশে প্রণীত, যে দেশে পরম দিবা ১৮ মুহূর্ত (৩৬ দং) হইত। অর্থাৎ সে দেশের অক্ষাংশ ৩৫°, পেশবারের কিছু উত্তরে, হয়ত গান্ধারে কাবুলে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পাঁজিতে রবির উত্তরায়ণ হইতে বর্ষারম্ভ, এবং উত্তরায়ণ দিনে রবি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ও দক্ষিণায়ন দিনে অশ্লেষার মধ্যভাগে থাকিত। সেকালে সৌরমাস ছিল না; চান্দ্রমাস, তিথি, নক্ষত্র, এই তিন দ্বারা বিষুব ও অয়নান্ত বা বর্ষারম্ভ গণিতে হইত। পঞ্চবর্ষে যুগ, অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে মাঘীশুক্ল প্রতিপৎ দিবসে উত্তরায়ণ, এবং

শ্রাবণ শুক্ল সপ্তমীতে দক্ষিণায়ন হইত। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে ও অন্যান্য শ্রৌতসূত্রেও এই পাজি।

এই তিন পুরাণেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পাঁজি ধরা হইয়াছে। পরমদিবা ১৮ মুহূর্ত বলাও হইয়াছে। মহাভারতের দুই তিন স্থানে কাল-গণনা আছে। সে গণনাও এই পাঁজি মতে করা হইয়াছে। অতএব মহাভারত ও এই তিন পুরাণ কিম্বা তিন পুরাণের আদি, "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে"র পরে প্রণীত হইয়াছিল। কত পরে তাহা অন্য প্রমাণে বাহির করিতে হইবে।

বৈদিক কালের ইতিহাস অন্ধকার গুহায় নিহিত। কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে দুই চারিটি দীপ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ" নিকটতম দীপ। এই হেতু ইহার কাল-নির্ণয়ে অনেকে যত্নবান্ হইয়াছেন। এককালে অশ্লেষার্দ্ধে রবির দক্ষিণায়ন হইত, এ কথা গর্গ, বরাহমিহির প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কত বৎসর পূর্বে হইত, তাহা লিখিয়া যান নাই। বরাহ-মিহির লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি পুনর্বসু নক্ষত্রে হইতেছে।" প্রত্যেক নক্ষত্র চারি পাদে বিভক্ত। পুনর্বসুর কোন্ পাদে, বরাহ বলেন নাই। মনে করা হয়, তৃতীয় পাদে। কিন্তু পুনর্বসুর অর্দ্ধাংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে হইতে পারে। একখানা পাঁজি দেখিলে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্র-বিভাগের নাম পাওয়া যাইবে। ১-এ অশ্বিনী শেষ, ২-এ ভরণী শেষ, ৩-এ কৃত্তিকা শেষ, ইত্যাদি। অশ্লেষা ৯-এ শেষ। অতএব অশ্লেষার্দ্ধ, অঙ্কে ৮৷৷; পুনর্বসুর তৃতীয় পাদ, অঙ্কে ৬৸০। অতএব বরাহের সময়ে অয়ন ৮৷৷০ নক্ষত্র হইতে ৬৸০ নক্ষত্রে, ১৸০ নক্ষত্র পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছিল। সেকালে অয়নবেগ বর্তমান অপেক্ষা কিছু মৃদু ছিল, হারাহারি বৎসরে ৫০ বিকলা ধরা যাইতে পারে। তদনুসারে ১° অংশ পিছাইতে ৭২ বৎসর, এক নক্ষত্র বিভাগ (১৩°২০´) পিছাইতে ৯৬০ বৎসর এবং এক পাদ (৩°২০´) পিছাইতে ২৪০ বৎসর লাগিত। ১৸০ নক্ষত্র পিছাইতে ১৬৮০ বৎসর লাগিয়াছিল। অনুমান করা হয়, বরাহ ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিয়াছেন, অতএব—১৬৮০+৪৯৯= -১১৮১ অব্দে "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ' রচিত হইয়াছিল। (ঋণ- (-) চিহ্ন দ্বারা খ্রীষ্ট-পূর্ব, এবং ধন- (+) চিহ্ন দ্বারা খ্রীষ্টপর অব্দ বুঝিতে হইবে)।

বোম্বাইর শ্রীযুত কেতকর এই গণনায় আপত্তি তুলিয়া নানাযুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন, ধনিষ্ঠা নামে ধনিষ্ঠা 'নক্ষত্র-বিভাগ' না বুঝিয়া ধনিষ্ঠা 'তারা' বুঝিতে হইবে! (১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষ")। ধনিষ্ঠা 'তারা' ধরিয়া সূক্ষ্ম গণিত করিলে -১৪৩৫ অব্দ পাই। অন্য এক কারণে -১৪৪০ অব্দ মনে হয়।

এই দুই গণনায় ২৫৯ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, বরাহের নক্ষত্র-চক্রের আদি অজ্ঞাত। তিনি অশ্লেষার অর্দ্ধ বলিয়া পুনর্বসুরও অর্দ্ধ মনে করিয়া থাকিতে পারেন। অর্থাৎ তাহার 'সাম্প্রত' যে কবে, তাহা জানা নাই। তাঁহার পূর্বে+২৯৯ অব্দ মনে করিবার হেতু আছে। অর্থাৎ+৫০০ অব্দ না ধরিয়া+৩০০ অব্দ ধরিতে বাধা নাই। এই অব্দ ধরিলে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ = -১৩৮১ অব্দে হয়।

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল যে -১১৮১ অব্দের পূর্বে, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এই পাজির পরে হইয়াছিল। এই যুদ্ধ -১২৬১ অব্দে হইয়াছিল। অতএব বেদাঙ্গ-পাঁজি ইহার পূর্বে প্রণীত বলিতে হইবে। একটা সোজা প্রমাণও আছে। এখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রায় আরম্ভে রবির দক্ষিণায়ন হইতেছে। যেদিন রবি আর্দ্রা প্রবেশ করে, সেদিন অম্বুবাচী। ৫-এ আর্দ্রা আরম্ভ। অতএব বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল হইতে এখন অয়ন ৮৷৷০-৫=৩৷৷০ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছে। ৩৷৷০ নক্ষত্র পিছাইতে ৩৩৬০ বৎসর গিয়াছে। ইহা হইতে বর্তমান ইং ১৯৩০ সাল বাদ দিলে -৩৩৬০+১৯৩০= -১৪৩০ অব্দ পাই। অতএব বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ প্রণয়ন কাল যে -১৪৪০ অব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(খ) কৃত্তিকায় বিষুব

পুরাণে পুরাবৃত্ত আছে। যে সময়ে যে পুরাণ প্রণীত, তাহার বহু পূর্বকালের কথা আছে। কল্প, মন্বু, যুগদ্বারা সে কাল ব্যক্ত করা হইয়াছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। এখন অন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেখি।

তিন পুরাণেই নক্ষত্রদ্বারা বিষুবস্থিতি জ্ঞাপিত হইয়াছে। মহাবিষুব হইতে ৬৮০ নক্ষত্র দূরে দক্ষিণায়ন, ১৩।০ নক্ষত্র দূরে অপর বিষুব, জল-বিষুব, এবং ইহার ৬৮০ নক্ষত্র দূরে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। অশ্লেষার্দ্ধে দক্ষিণায়ন হইলে ৮।০-৬৮০=১৮০ নক্ষত্রে, ভরণীর তৃতীয় পাদান্তে, বিষুব হইত। ইহার পূর্বে অবশ্য কৃত্তিকার আদ্যে, এবং তৎপূর্বে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে, ইত্যাদি ক্রমে মহা-বিষুব হইত।

তিন পুরাণেই প্রায় একই ভাষায় লিখিত আছে, কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষুব হইত। "যখন সূর্য কৃত্তিকার প্রথম পাদ গত হন, তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ পাদে জানিবে। যখন সূর্য বিশাখার তৃতীয় পাদে বিচরণ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শীর্ষে জানিবে। মহর্ষিরা তখন বিষুবৎ বলেন। সূর্য দ্বারা বিষুব জানিবে, এবং চন্দ্র দ্বারা কাল (মাস) লক্ষ করিবে। যেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়, সেদিন বিষুব। এটি পুণ্য কাল।"

এখানে পাঁচটি তথ্য পাইতেছি। (১) নক্ষত্র দ্বারা দুই বিষুবের স্থিতি, (২) পূর্ণিমাতে রবি শশীর স্থিতি, (৩) বিষুবদিনে পূর্ণিমা, (৪) নক্ষত্রের পাদ (৩°২০´) ন্যূনতম বিভাগ, (৫) পূর্ণিমা হইতে মাস। বুঝিয়া দেখি। ২।০ অঙ্কে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্ত। এখানে বিষুব হইত। সূর্য হইতে ১৩। নক্ষত্র দূরে চন্দ্র থাকিলে পূর্ণিমা হয়। অতএব বিষুবদিনে ২।০+১৩।০=১৫৮০ নক্ষত্রে, বিশাখার তৃতীয় পাদ গতে, চন্দ্র থাকিত। এই নক্ষত্রে জলবিষুব থাকিত। পুরাণ ইহাই লিখিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন, বিশাখার তৃতীয় পাদে বিষুব হইবার সময় চন্দ্র ১৫।০ —১৩।০=২ নক্ষত্রে, কৃত্তিকার শীর্ষদেশে থাকে। বস্তুতঃ না থাকিলে পূর্ণিমা হইতে পারে না।

একবার কৃত্তিকার শীর্ষ, পর বার কৃত্তিকার প্রথম পাদান্ত বলাতে বুঝিতেছি, দুই কালের কথা পরে পরে বলা হইয়াছে। পুরাণেই নালিকা ও শঙ্কুর উল্লেখ আছে। নালিকা (নলাকার ঘটী-যন্ত্রবিশেষ) দ্বারা দিবামান মাপিলেই বিষুব ও অয়ন দিন, এবং শঙ্কু দ্বারা ঐ দুই এবং রবি-নক্ষত্র জানিতে পারা যায়। অতি পুরাকালে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তকালে দুরস্থ চিহ্ন বেধ দ্বারা রবির অয়ন-নিবৃত্তি ও বিষুব-প্রবেশ নির্ণয় করা হইত। তখন রবি-নক্ষত্রও দেখা হইত। এই সোজা উপায় থাকিতে পশ্চিম দেশীয় বিদ্বানেরা মনে করিয়াছেন, এই দুই কর্ম দুষ্কর, প্রাচীন আর্যদিগের সাধ্য ছিল না। তাহাদিগের দূরবীক্ষণ-সহিত মান-যন্ত্র ছিল না। পণ্ডিতদিগের এই সন্দেহের কারণ বুঝি। যিনি 'মোটর' ব্যতীত গমনাগমন করেন না, তিনি পায়ে হাঁটিতে ভুলিয়া যান। কিন্তু যে হাঁটিতে পারে, সে গ্রামের আইলে আইলে যাইতে চিন্তা করে না।

কৃত্তিকায় পূর্ণিমা হইলে কার্ত্তিকী, এবং বিশাখায় হইলে বৈশাখী পূর্ণিমা। অবশ্য প্রতিবৎসর পূর্ণিমা-তিথিতে বিষুব হইত না, কিন্তু তদ্দ্বারা বিষুবদিন স্মরণ রাখিতে পারা যাইত। আমরা এখন কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব করিয়া এই পূর্ণিমার প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। আমরা বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসব করি না বটে, কিন্তু এই দিন কূর্মাবতার, এবং ইহার পূর্বদিন নৃসিংহাবতার গণিয়া আসিতেছি। আদ্যকাল হইতে পূর্ণিমান্তমাস চলিতেছিল। 'পূর্ণিমা' শব্দের অর্থই পূর্ণমাস। "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের" কালে অমান্তমাস আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থাৎ মাসের আরম্ভ পনর দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন দুই গণনাই চলিতেছে।

পূর্বে দেখা গিয়াছে "বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে"র কালে, অর্থাৎ —১৪৪০ অব্দে ভরণীর তৃতীয় পাদান্তে বিষুব হইত। ইহার ।০ নক্ষত্র, ২৫০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ —১৪৪০—২৪০ =—১৬৮০ অব্দে, কৃত্তিকার আদ্যে বিষুব এবং তৎকালে ২+৬৮০=৮৮০ অশ্লেষার তৃতীয় পাদান্তে দক্ষিণায়ন হইত। কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বিষুব হইবার সময় ২।০+৬৮০=৯ অশ্লেষান্তে বা মঘাদ্যে দক্ষিণায়ন হইত। মঘাদ্যে দক্ষিণায়ন আরও অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে। শ্রীযুত কেতকার মৈত্র্যুপনিষদে ইহার উল্লেখ পাইয়াছেন। মঘাদ্যে দক্ষিণায়ন হইত, এখন প্রায় আর্দ্রাদ্যে হইতেছে। মঘাদ্য ৯ নক্ষত্র হইতে আর্দ্রাদ্য ৫ নক্ষত্রে আসিতে ৪ নক্ষত্র, অথবা —৩৮৪০বৎসর গত হইয়াছে। অতএব —৩৮৪০+১৯৩০=

–১৯১০ অব্দে কৃত্তিকা পাদান্তে বিষুব হইত। পুরাণকার সেকালের কথা লিখিয়াছেন। এটি বৈদিক কালের দ্বিতীয় দীপ। এই দীপের ২৪০ বৎসর পরের দীপও পাইতেছি।

যদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে বৎসর ধরা হইত, তদনুসারে পাঁজি গণিবার সূত্রও ছিল। বোধ হয় বরাহের "বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত" সেই সূত্র। ইহার আরম্ভ –১৯০৫ অব্দে ছিল। (*Hindu-Aryan Astronomy* by Bhagwandas Pathak.)

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, অশ্লেষার্দ্ধ ও মঘাদ্য, এই দুই দীপ বর্তমান নক্ষত্র-বিভাগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই বিভাগে অশ্বিনী-নক্ষত্র আদি ধরা গেল। এককালে কৃত্তিকা যে আদি নক্ষত্র গণ্য হইত, জ্যোতিষ-সংহিতায় ও পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। যদি আদি, তাহা হইলে ষড়্‌তারক কৃত্তিকা, আদি বুঝিতে হইবে। এই তারার পশ্চাতে কিম্বা অগ্রে শূন্য আকাশে আদি স্থির হইতে পারে নাই। ষড়্‌তারক কৃত্তিকায় বিষুব হইত, এই ঘটনা ধরিয়াই মহাভারতে ও পুরাণে ষণ্‌মাতৃক কার্ত্তিকেয়র জন্ম-উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় 'কুমার' নামেও খ্যাত। কালিদাস এই কুমারের জন্ম লিখিয়াছেন। এই নবকুমার বিষুব বটে, বিষুবদিনের যজ্ঞাগ্নিও বটে। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দেখুন)। গণিত করিলে দেখি, –২২০০ অব্দে কৃত্তিকা 'তারা'য় বিষুব হইত। বিষুব হইতে ৯০° অংশ (৬৸০ নক্ষত্র) দূরে দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। প্রায় এইস্থানে উজ্জ্বল মঘাতারা বিদ্যমান আছে। কেহকর ঠিক লিখিয়াছেন, দক্ষিণায়ন চিনিতে ঋষিগণের কষ্ট না হয়, বিধাতা যেন এই ভাবিয়াই কৃত্তিকা হইতে মঘাতারাকে ৯০° অংশ দূরে বসাইয়াছেন। -২৩০০ অব্দে মঘাতারায় দক্ষিণায়ন হইত, এবং রবির দক্ষিণপথ পিতৃযান নামে খ্যাত হইয়াছিল। মঘার অধিপতি পিতৃগণ হইবার কারণ এই। অতএব কৃত্তিকা "তারা"য় বিষুব বলায় যে কাল, মঘা "তারা"য় দক্ষিণায়ন বলাতেও প্রায় সেই কাল। এটি বৈদিক কালের তৃতীয় দীপ, এত উজ্জ্বল যে, বাক্‌-প্রপঞ্চে ও সন্দেহের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইবার নয়। এই দীপেরও পূর্বের দীপ পুরাণে আছে; কিন্তু দুই একটি ব্যতীত রূপকে আবৃত। সে আবরণ উন্মোচিত হইলে সে সকল দীপও দপ্‌-দপ্‌ জ্বলিতে দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় অনেক দীপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বিষুব, অশ্বিন্যাদি হইতে গণিলে -১৯০০ অব্দে পাই। কৃত্তিকাদি হইতে গণিলে, কৃত্তিকায় -২২০০ অব্দে, এবং পাদ-নক্ষত্রে, অর্থাৎ -২৪০ বৎসর পূর্বে, -২২০০-২৪০ = -২৪৪০ অব্দ পাই। বৃদ্ধ-গর্গ এক বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। "বৃহৎ-সংহিতা"র বৃদ্ধ-গর্গমতে বরাহ লিখিয়াছেন, "যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বী-শাসনকালে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। শকাব্দে ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের অব্দ হয়।" অর্থাৎ সে অব্দের আরম্ভ -২৪৪৯ অব্দে। -৩১০২ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ। অতএব কলির + ৩১০২ – ২৪৪৯ = + ৬৫৩ বর্ষগতে, অর্থাৎ ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, এই অব্দে যুধিষ্ঠির ছিলেন। তখন মঘায় দক্ষিণায়নও বটে। ইহা হইতে অনেক অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

(গ) মেষান্তে বিষুব

উপরে সংশয়ে পড়া গিয়াছে। অশ্বিনী হইতে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্ত, না কৃত্তিকা হইতে এক পাদ শেষ? পুরাণকার এই সংশয় নিরাস করিয়া লিখিয়াছেন, "মেষান্তে চ তুলান্তে চ" রবির উদয়কালে দিবা ১৫ মুহূর্ত এবং রাত্রিও ১৫ মুহূর্ত হয়। অর্থাৎ বিষুব হয়। অশ্বিনীর আদিতে মেষের আদি। অতএব মেষান্তে বলা, আর কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বলা, একই অর্থ।

এতদ্দ্বারাও অবশ্য একই কাল পাওয়া যায়। এখন মীনের ৭° অংশে মহাবিষুব হইতেছে। অতএব মীনের -২৩° + মেষের -৩০° = –৫৩° অংশ অন্তর ঘটিয়াছে। -৫৩ × ৭২·২ = –৩৮২৭ বৎসর। ইহা হইতে + ১৯৩০ বৎসর কাটিয়া দিলে —৩৮২৭ + ১৯৩০ = –১৮৯৭, বা

–১৯০০ অব্দে মেষান্তে বিষুব হইত। ইহাকেই দ্বিতীয় দীপ বলিয়াছি।

পুরাণকার মেষান্তে বিষুব লিখিয়া সংশয় দূর করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পুরাণকার আদি পুরাণকার নহেন। পরবর্ত্তী কালের এক পুরাণ-সংশোধক এই একটি অনাবশ্যক শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে ঠিক এই স্থানে বিষ্ণুপুরাণ "মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ" লিখিয়া পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই। কারণ কৃত্তিকার প্রথম পাদ কদাপি মেষাদি হইতে পারে না। সেস্থান বৃষাদি। যখন মেষাদি রাশি সংজ্ঞা চলিতেছিল, তখন সংশোধক মহাশয় শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন। সে কোন্ কাল, পরে দেখিতেছি। মৎস্যপুরাণে এইরূপ যোজনা অনেক আছে, বিষ্ণুপুরাণে এই অংশে রাশি সংজ্ঞা প্রচুর বসিয়াছে। এইরূপ, আরও অনেক গ্রন্থে দুই কালের উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, মূল গ্রন্থের এক কাল, আর পরবর্ত্তী সংশোধকের অপর কাল। স্মৃতিতে এইরূপ দুই কালের উল্লেখ আছে। সেকালের সংশোধকেরা পুরাতন রাখিয়া নূতন জুড়িতেন, পুরাতন মুছিয়া ফেলিতেন না। এই সত্যনিষ্ঠার জন্য আমরা এক এক পুরাণে দুই তিন কালের উল্লেখ পাইতেছি। কথাটা স্মর্তব্য।

(ঘ) গ্রহ ও বীথী

ঋষিগণ রবিশশীর দ্বারা কালমান করিতেন; অন্য পাঁচ গ্রহের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু জানিতে কৌতূহল হয়, তাঁহারা কোন্ কালে তারা-আকার পঞ্চগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের মত দেওয়া গিয়াছে। সহজেই বুঝি, শুক্র গ্রহ প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা যেমন উজ্জ্বল, তেমন ইহার স্বভাবও বিচিত্র, সূর্য্যাস্তের পরে কিংবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, কতকদূরে বিচরণ করে, কখনও মধ্য আকাশে আসে না। বৃহস্পতি বৃহৎ-তেজা ও গতিশীল। ইহার আবিষ্কারও কঠিন ছিল না। এক কালে পুষ্যাতারার নিকটে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে গুরু-পুষ্যা যোগ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তদনন্তর কৃত্তিকা তারার সহিত বৃহস্পতির সম্বন্ধ ঘটে। এইখানে তারা-হরণ উপাখ্যানের উৎপত্তি। মঙ্গল গ্রহের প্রাচীন নাম লোহিত, লোহিতাঙ্গ। অপর নাম 'কুমার'। ইনি প্রজাপতির পুত্র। বৎসরকে প্রজাপতি বলা হইত, অগ্নিও বলা হইত। হয়ত মঙ্গল কৃত্তিকাকালে আবিষ্কৃত। শনি, ছায়া-সুত। স্বর্ভানু, রাহু যে ছায়া, তাহা পুরাণেও আছে। বোধ হয় কোন সূর্য্য-গ্রহণ সময়ে শনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বুধ, 'তারা' ও চন্দ্রের পুত্র। এই তারা, কৃত্তিকা। এইহেতু বুধের এক নাম 'কুমার' আছে। এই পঞ্চগ্রহের মধ্যে ভৃগুবংশীয় এক ভার্গব দ্বারা শুক্র, অঙ্গিরাবংশীয় এক আঙ্গিরস দ্বারা বৃহস্পতি, এবং বহু পরে ভরদ্বাজ-বংশীয় ভরদ্বাজ দ্বারা মঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শনি ও বুধ ঋষিবংশীয় হইতে পারে নাই।

কারণ কি? বোধ হয় বহুকালান্তরে এই দুই গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শনি, শনৈশ্চর, এত মন্দ-গতি যে তারা বলিয়া ভ্রম হয়। বুধ সহজে দৃশ্য হয় না। বুধ কি সর্ব্বশেষে আবিষ্কৃত? বায়ুপুরাণ হইতে এইরূপ মনে হয়। এই পুরাণ লিখিতেছেন (৫৩ অঃ), "নক্ষত্র, সূর্য্য ও গ্রহ, সর্ব্বদেবের আশ্রয়; এই হেতু ইহাদিগকে 'দেবগৃহ' বলে। সূর্য্য সৌরস্থানে, সোম সৌমস্থানে, শুক্র শৌক্র-স্থানে, বৃহস্পতি বৃহৎস্থানে, মঙ্গল লোহিতস্থানে, শনি শনৈশ্চর স্থানে থাকে।" এখানে বুধের নাম নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও নাই। পুরাণে কি পাঠলোপ হইয়াছে? আর ঠিক সন্দেহ স্থানে? পুনশ্চ লিখিত আছে, "চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্য্য বিশাখায়, চন্দ্র কৃত্তিকায়, শুক্র পুষ্যায়, বৃহস্পতি পূর্ব্বফল্গুনীতে, মঙ্গল পূর্ব্বআষাঢ়ায়, 'সমুৎপন্ন' হইয়াছিলেন।" এখানেও বুধের উল্লেখ নাই। 'সমুৎপন্ন' অর্থে আবিষ্কৃত নয়, দৃষ্ট বুঝিতে হইবে। এখানে তিনটি তথ্য পাইতেছি। কোন এক বিখ্যাত কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রবি ১৬, চন্দ্র ৩, শুক্র ৮, বৃহস্পতি ১১, মঙ্গল ২০, শনি ও রাহু ২৭ নক্ষত্রে ছিল। (২) সে পূর্ণিমা চাক্ষুষ মন্বন্তরে হইয়াছিল। (৩) বোধ হয়, তখন বুধ জানা ছিল না।

উক্ত পূর্ণিমা এত প্রসিদ্ধ কেন হইল, এবং কেনই

বা সে রাত্রির গ্রহ-স্থিতি লিপিবদ্ধ হইল ? কে জানে। প্রথম রাত্রে মঙ্গল ও শনি এবং শেষরাত্রে শুক্র ও বৃহস্পতি দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণিমারাত্রে বুধ দৃশ্য হইতে পারে না। রাহু-স্থান না জানিলে গ্রহণ গণিতে পারা যায় না। বোধ হয় গ্রহণ গণিবার কোন চক্র জানা ছিল। বুধ গ্রহের এক নাম রৌহিণেয়, কোন এক কালে রোহিণী ও বুধের সমাগম হইলে বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সে সমাগম পূর্ণিমার রাত্রে হইতে পারে না। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, এক প্রাচীন স্মৃতির ছিন্ন সূত্র পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের কাল দেখি। বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কাল প্রায় –১৩০০ অব্দ। বৈবস্বত মনু সপ্তম, চাক্ষুষ ষষ্ঠ। চারি বৎসরে যুগ, একাত্তর যুগে মনু হইত। ২৭ যুগে ২৭×৪ =১০৮ বৎসর। ৭১ যুগে ৭১×৪=২৮৪ বৎসর। অতএব –১৩০০ অব্দের ১০০ বৎসর পূর্বে, –১৪০০ অব্দে চাক্ষুষ মনু শেষ, এবং প্রায় –১৭০০ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কৃত্তিকার আদ্যে বিষুবের যে কাল পাইয়াছি, তাহার সহিত এই কাল মিলিয়া যাইতেছে। চাক্ষুষ মনুর পূর্বে পঞ্চম মনু, রৈবত মনু। তাঁহার কালে কৃত্তিকা-পাদান্তে বিষুব হইত। পূর্বে এই কাল –১৯০০ অব্দ পাইয়াছি। আরও দ্রষ্টব্য, পুরাণকার চাক্ষুষ মনুর কালে রবি সোম শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতির নক্ষত্র বলিয়া "ইতি শ্রুতিঃ" লিখিয়াছেন। কোন্ শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, বৈদিক পণ্ডিত খুঁজিয়া দেখিবেন। দেখা যাইতেছে, শ্রুতিতে শনি ও রাহু ছিল না। ইহা সম্ভব বোধ হয়। পুরাণের পরবর্তী সংশোধক অবশ্য বুধ আনিয়াছেন. কিন্তু কোন্ গ্রহের পর কোন্ গ্রহ অবস্থিত, তাহা বলিতে গিয়া একস্থানে ভুলও করিয়াছেন। গতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, বুধাদি পঞ্চগ্রহ "কামচারী।" অর্থাৎ তখনও গ্রহ-গণিত অজ্ঞাত ছিল। প্রথমে চান্দ্রমাস ও নক্ষত্রমাস নিরূপিত হইয়াছিল। এই দুই পরিমাণ এত সূক্ষ্ম হইয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার সংশোধন আবশ্যক হয় নাই। পরে রবির অয়ন ও বর্ষকাল। কিন্তু বর্ষ পরিমাণ করিয়া চান্দ্রমাসের সহিত মিলাইতে বহুকাল গত হইয়াছিল। চন্দ্রের ও সূর্যের মধ্য-গতি জানা পড়িল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের স্থান এক নক্ষত্র-পাদ পর্যন্ত গণিতে পারা গেল। পঞ্চতারা গ্রহ 'কামচারী,' মধ্যগতিও মানে না। আকাশের কোন্ স্থানে কখন্ আছে, তাহা মোটামুটি জানিবার নিমিত্ত তিন তিন নক্ষত্রে এক 'বীথী' (৪০°), এবং তিন বীথীতে এক মার্গ (১২০°), এইরূপ ভাগ হইয়াছিল ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ," ২৬৭ পৃঃ)। প্রথম বীথী কেহ কৃত্তিকা, কেহ ভরণী, কেহ অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই "কেহ কেহ" অবশ্য তিনকালের লোক ছিলেন। কালক্রমে গ্রহ-গণিত আসিল, রাশি ও অংশ আসিল, বীথী-গণনা উঠিয়া গেল। উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রাচীন নক্ষত্র ও নক্ষত্র-পাদ অদ্যাপি চলিতেছে। বিশেষতঃ জাতক-গণনায় এই দুই বাঁধা পড়িয়াছে, রাশির নবাংশ অর্থাৎ নক্ষত্র-পাদ গণনা দ্বারা না-কি ঠিক ফল মেলে।

(ঙ) রাশি-নাম

পুরাণে যে কত পুরাকালের বৃত্তান্ত আছে, তাহার আভাস দেওয়া গেল। কত পরবর্তী কালের আছে, তাহার জ্যোতিষিক নির্দেশ দেখা যাউক।

বায়ু ও মৎস্য পুরাণে মেষান্তে ও তুলান্তে লিখিবার সময় মেষবৃষাদি রাশি ভাগ অবশ্য চলিতেছিল। রাশিভাগ এ দেশের নয়। এ দেশে ইহার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোন কোন রাশির মূর্তি-কল্পনা এ দেশের বটে, বিদেশেরও বটে। রবিপথ ১২ ভাগ করিয়া রাশি-ভাগ। আমাদের চন্দ্রপথ ২৭ ভাগ করিয়া নক্ষত্র-ভাগ এবং ১০৮ ভাগ করিয়া নক্ষত্র-পাদ ভাগ। 'মাস', তিথি, নক্ষত্র দ্বারা লৌকিক ও যাজ্ঞিক সকল কর্মের দিন নির্ণীত হইত, এখনও হয়। কিন্তু 'মাস' নাম দ্বারা ঋতু বুঝিতে পারা যায় না, এখন কোন্ ঋতু চলিতেছে, পরে কোন্ ঋতু আসিবে, তাহা না জানিলে

জীবন যাত্রা-নির্বাহ দুষ্কর। এইহেতু ঋষিগণ ঋতু সম্বন্ধী বা আর্ত্তবমাসও গণিতেন।*

উত্তরায়ণে তপস্-তপস্য শিশির, মধু-মাধব বসন্ত, শুক্র-শুচি গ্রীষ্ম। দক্ষিণায়নে নভস্-নভস্য বর্ষা, ইষ-উর্জ্জ শরৎ, সহস্-সহস্য হেমন্ত। সূর্যের অয়ন ও বিষুবদ্বারা এই দ্বাদশ ঋতুমাস নিরূপিত হইত। ইহাতে সায়ন নিরয়ন বিচারের প্রয়োজন হইত না। বোধ হয়, এই ঋতুমাস নাম প্রচলনের পূর্বে যখন অয়ন গতি লক্ষ্য হয় নাই, তখন দ্বাদশ সৌরমাস বুঝাইতে দ্বাদশ আদিত্য নাম হইয়াছিল। পৌরাণিকেরা দ্বাদশ আর্ত্তবমাসে দ্বাদশ আদিত্য সূর্য-রথে অধিষ্ঠিত কল্পনা করিতেন। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু পুরাণ মতে বসন্তে ধাতা ও অর্যমা, গ্রীষ্মে মিত্র ও বরুণ, বর্ষায় ইন্দ্র ও বিবস্বান্‌, শরতে পর্জ্জন্য ও পুষা, হেমন্তে অংশ (বা অংশু) ও ভগ, শিশিরে ত্বষ্টা ও বিষ্ণু (বা জিষ্ণু)। পুরাণের কালে দ্বাদশ আদিত্য প্রায় নিরর্থক হইয়া, দুই একটা নামের পর্যায় ভঙ্গ হইয়াছিল। এই যে লিখিতেছি, এখন বর্ষা পড়িয়াছে, সেকালে বলা হইত এখন ইন্দ্র আদিত্য, কিম্বা নভস্ মাস। এক এক আদিত্য অবশ্য ২৷০ নক্ষত্র ভোগ করিতেন। এত ভাগ থাকিতেও দেশে মেষবৃষাদি রাশিভাগ নূতন আসিয়াছিল। যবন জ্যোতিষীরা ফল-জ্যোতিষে ও গণিত-জ্যোতিষে বিখ্যাত ছিল। গ্রহ-গণিতের জন্য যত না হউক, ফল গণিতের জন্য আমাদের জ্যোতিষীরা যবনাচার্যের নিকট ঋণী হইয়াছিলেন। সে ঋণ খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বে ও অত বৎসর পরে চলিয়াছিল। ইহার প্রমাণ 'বৃহজ্জাতক' নামক ফল-গ্রন্থের ভট্টোৎপলের টীকায় আছে। মেষবৃষাদির যাবনিক সংজ্ঞা সংস্কৃত হইয়া গিয়াছে। অন্য প্রমাণও দেওয়া যাইতে পারে। অশ্বিনী 'তারা'তে বিষুব হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে মেষের আরম্ভ। −১৮৩ অব্দে অশ্বিনী 'তারায়' বিষুব হইয়াছিল।* অতএব ইহার পূর্বে রাশিচক্রের মেষ আদি কল্পনা হইতে পারে নাই। অতএব যে সকল গ্রন্থে রাশি-নাম আছে, সে-সকল গ্রন্থ −২০০ অব্দের পরবর্তী বলিতে পারি। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে মাত্র একটি স্থানে মেষান্তে ও তুলান্তে নাম আছে। এটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাশিনাম দ্বারা সূর্যগতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণের কোন কোন অংশ নূতন হইয়া গিয়াছে। জম্বু দ্বীপাদি বিভাগেও ইহার প্রমাণ আছে।

যদি বা রাশি-বিভাগের কিছু সার্থকতা আছে, রবি সোমাদি সপ্তবার ভাগে কিছুমাত্র নাই। ইহার মূল, ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস। বার ভুলিয়া গেলে এমন কোন নৈসর্গিক উপায় নাই যে, তাহার উদ্ধার হইতে পারে। সাত দ্বারা পক্ষ (১৫ দিন) সমান ভাগে বিভক্ত হয় না, মাস হয় না, বৎসর হয় না। সপ্তবার ভাগ অবৈজ্ঞানিক। অতি পূর্বকালে পক্ষভাগ কত কত দিনে করা হইত বলিতে পারি না। হয়ত অষ্টক গণিয়া দুই ভাগ করা হইত। সে কারণে অষ্টকের আদর হইয়াছে। পরবর্তীকালে 'পঞ্চরাত্র' (পঞ্চাহ) গণা হইত। এই ভাগ বৈজ্ঞানিক, পক্ষ, মাস, ও বৎসরের দিন-সংখ্যা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য। সেদিন পড়িতেছিলাম, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের ইঙ্কাজাতির পূর্বপুরুষেরা পঞ্চাহ দ্বারা মাস ভাগ করিত। বর্ত্তমান রুষ-সভা সপ্তাহ ত্যাগ করিয়া পঞ্চাহ ধরিয়াছেন।

---

* কালিদাসের 'মেঘদূতে' 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' 'নভস্' কাল পড়িয়াছিল। অর্থাৎ তখন চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপৎ, এবং ঋতুতে বর্ত্তমান আষাঢ় মাস। এইদিন দক্ষিণায়ন ও অম্বুবাচী আরম্ভ। একটা বিশেষ দিন না হইলে এমন মাস, তিথি, ঋতু দেওয়া হইত না। চান্দ্র আষাঢ়, সৌর শ্রাবণ। অর্থাৎ সৌর ১ শ্রাবণ দক্ষিণায়ন হইত। বরাহের কালে এইরূপ হইত। এইরূপ "কুমারসম্ভবে" (৩য় সর্গ) 'সহস্ররাত্রী' হইতে পাইতেছি, বর্ত্তমান সৌর মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইত। এখন ২২ দিন পূর্বে হইতেছে। অতএব কালিদাস+৫০০ অব্দের পূর্ব্বে ছিলেন না। যদি বরাহের অব্যবহিত পূর্বের পাঁজি ধরি, তাহা হইলে+৩০০ অব্দের পূর্বে কদাপি ছিলেন না।

* অশ্বিনী 'তারা'র "কদম্ব" ধরিলে −৪৫০ অব্দে তাহাতে বিষুব হইয়াছিল। এ যাবৎ সকলেই "কদম্ব" ধরিয়াছেন। আমিও "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে কদম্ব ধরিয়া কাল নির্ণয় করিয়াছি। পাঁচ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত কেতকরের চিত্রাপক্ষ বিচার করিবার সময় এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়, এবং তাঁহার সহিত আমার বাদ-প্রতিবাদ হয়। তিনি চিত্রা ও অন্যান্য তারাঘটিত আলোচনায় কদম্ব ধরিয়াছেন। আমি সে মত মানিতে পারি নাই। আমি চিত্রা-পক্ষ মানি, কিন্তু চিত্রার "ধ্রুব" লওয়া হইত, "কদম্ব" নয়। এখানে এ বিষয় উত্থাপিত করিয়া রাখিলাম।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' (-৩০০ অব্দ) সপ্তবার ভাগ নাই, পঞ্চরাত্র ভাগ আছে। সপ্তবার যবনকল জ্যোতিষের অঙ্গস্বরূপ এদেশে আসিয়াছে। বোধ হয়, রাশিভাগ যত সহজে স্থান পাইয়াছিল, বারভাগ তত শীঘ্র পায় নাই। কারণ এদেশে পূর্বাবধি রাশি-ভাগের মূল ছিল, বার-ভাগের মূল ছিল না। এই হেতু মনে হয়, এদেশে খ্রীষ্টের প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দে বার-গণনার আরম্ভ হইয়াছে। বায়ুপুরাণের কুত্রাপি রবিসোমাদি বার নাই, বার-ব্রতও নাই। বিপুল মহাভারতের কুত্রাপি রাশিও নাই। অমরকোষে রাশি আছে, বার-সংজ্ঞা নাই।

উপরে দেখা গেল, তিন পুরাণের জ্যোতিষিক অংশের আদি এক। ভূগোল-বর্ণনেও প্রায় তাই। বায়ুপুরাণের গয়ামাহাত্ম্য ও বিষ্ণুপুরাণের ভূগোল-বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ছাড়িয়া দিলে, দুই পুরাণই প্রাচীন। -১০০০ অব্দ হইতে -২০০ অব্দ পর্যন্ত কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত হইলেও প্রাচীন। মৎস্যপুরাণে প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রায় সমান অংশ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন অংশ বায়ুপুরাণের তুল্য প্রাচীন। পুরাণত্রয়ের বয়স তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি, (১) প্রাচীন কাল হইতে -১০০০ অব্দ, (২) -১০০০ অব্দ হইতে -২০০ অব্দ, (৩) -২০০ অব্দ হইতে +৪০০ অব্দ।

সংসার-নাট্য

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

এই শহরের একান্তে দরিদ্র গৃহস্থগণের একটি পল্লীর যবনিকা উঠ্‌লো। পট উত্তোলন করার পর দেখা গেল, সেই চিরপরিচিত মুখগুলি অর্দ্ধাহারে শীর্ণ, অযত্নে বিবর্ণ, দুরবস্থায় ম্লান এবং অন্তরের দৈন্যে আজও জীবনকে তারা নিতান্তই অপমান ক'রে চলেছে।

গুটি দশেক গৃহস্থকে নিয়ে এই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে কোলাহলের আর শেষ নেই। যবনিকা যখন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হ'ল, তখন নূতন একতলা বাড়িটির নীচের তলায় দুখানি ঘর সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত পথের নবাগত দুটি স্বামী-স্ত্রী এসে সেই ছোট্ট বাড়িটিতে বাসা বেঁধেছে। চির-নূতনের বেশে চিরপুরাতনের খেলা সেই থেকে হয়েছে সুরু। কিন্তু সেই দুটি চঞ্চল জীবনের ধারা বয়ে এসে এদের এই অবরুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, মুমূর্ষু প্রাণগুলিকে সজীব করতে পেরেছে কি-না তা এখনও জানা যায়নি।

ঘরে আসবাবপত্র একরকম নেই বললেই হয়। দেয়ালগুলি সাদা,ছবি টাঙিয়ে তাদের জর্জ্জরিত করা হয়নি। মেঝের ওপর দুখানি নতুন খাট, জামা-কাপড় রাখবার একটি বাক্স,ছোট একটি টেবিলের ওপর খানকয়েক বইয়ের সঙ্গে একখানি আয়না, বুরুশ, সরু-দাঁড়া চিরুণী একটি, আলতার শিশি ও সিঁদুরের কৌটো। ঘরের একপাশে নিত্য প্রয়োজনের কতকগুলি আসবাব—বাসন-কোসন, চায়ের সরঞ্জাম, মশলা-পাতি, চাল-ডাল—বাস্, ওই পর্যন্তই। এ ছাড়া অনাবশ্যক সৌখিনতার বোঝায় ঘর দুটির নিশ্বাস রোধ করা হয়নি।

দামিনীর মাথার ঘোমটা টেনে সরিয়ে দিলে দেখা যাবে সে ছোট মেয়ে। সীতেশ স্বামী না হ'লে তাকে আবার ইস্কুলে পাঠানো চল্‌তো।

'ষ্টোভে' রান্না চড়িয়ে এসে দামিনী 'লুডো' খেল্‌তে বসে। সীতেশ ভুলে যায় স্নান করবার কথা।

'কাল আমাকে মিথ্যে করে হারিয়ে দিয়েছিলে।— ওকি, ওকি হ'ল? ছুঘর যে এগিয়ে নিয়ে গেলে? উঃ কী জোচ্চোর!'

'কই ? কোথায় জোচ্চুরি ? আমায় গালাগাল ?—' সীতেশ তার একটা কান ধ'রে টেনে দিল।

কানটি একটু একটু ক'রে লাল হয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ দামিনীর রক্ত গরম হয়ে গেল। খপ্ ক'রে সীতেশের মাথার এক মুঠি চুল সে টেনে ধর্‌ল—'মার্‌লে যে ? আমার লাগে না ?'

সীতেশ একটা হাত দিয়ে 'লুডো' ছড়িয়ে দিল। দামিনী অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। স্বামী উঠে এই সুযোগে পালাল। এই লুডোর প্রতি দামিনীর মমতা সীতেশের মমতার চেয়েও বেশী। স্বামীর সে আজ আর রক্ষা রাখবে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে বেতের ছড়িটি সে হাস্‌তে হাস্‌তে খুঁজতে থাক্‌ল—'দাঁড়াও যাচ্ছি, আমার গায়ে হাত তোলা তোমার বার কচ্ছি গিয়ে।'

ছড়ি নিয়ে বাইরে এসে দেখলে, মোটা একটা লাঠি হাতে নিয়ে স্বামী বীরদর্পে দণ্ডায়মান।

দামিনী তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ক'রে বললে—'আর কান ধরবে অমনি ক'রে ?'

'বেশ কর্‌বো'—বলেই সীতেশ আবার দৌড়। দামিনী ছুটল পিছু পিছু।

তারপর আবার সন্ধি হ'ল। যে-চোখে দামিনী শাসন করে, সেই চোখেই সে আনে মায়া। তারই হ'ল জিৎ।

দামিনী রান্না করে, সীতেশ বসে কুটনো কুটতে। খেতে বসে তরকারী ঠিক সমান ভাগ হ'ল কি-না এই নিয়ে দুজনে বাধায় কলহ। কিন্তু দামিনী যখন ঘর ধোয় সীতেশ বসে বাসন মাজতে।

বিকাল বেলা তাদের বেড়াতে যাওয়া চাই-ই চাই। আল্‌তা-পরা দুখানি পা চটি জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে সাজ-সজ্জা ক'রে এসে দামিনী বলে—'চল।'

সীতেশ দরজায় লাগাল চাবি-তালা। তারপর ছড়িটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দুজনে বেরিয়ে পড়্‌ল। সরু গলিটি পার হবার আগেই বাঁ-হাতি পুরানো বাড়িটির নীচের একখানি অন্ধকার ঘরের একটি জান্‌লা পার হতে হয়। অন্য দিনের মত আজও সেই জান্‌লার দিকে নজর পড়তেই দামিনী একটুখানি হেসে বল্‌ল—'আজ বায়স্কোপে যাব, নতুন ছবি এসেছে তাই।'

একটি কুমারী বয়স্থা মেয়ে। গায়ে জামা নেই, ময়লা একখানি কাপড় প'রে ঠিক এমনি সময়টিতে সে জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়ায়। রূপ তাকে বিধাতা দেন্ নি, অবস্থার দৈন্য সে মুখখানিকে আরও কুৎসিত করেছে। দামিনীর কথার জবাব সে দিতে পার্‌ল না, শুধু একটুখানি হাস্‌ল—নিজের মুখের হাসি তার অন্তরের অন্ধকারকে ঈষৎ আলোকিত ক'রে আবার মিলিয়ে গেল।

রাস্তায় পড়ে সীতেশ বল্‌ল,—'পথে বিপদ না ঘটে !'

অন্যমনস্ক হয়ে দামিনী বল্‌ল—'কেন বল ত ?'

'ওই অযাত্রা মুখ দেখে বেরোনো—'

দামিনী চঞ্চল, ছেলেমানুষ, কিন্তু হৃদয়হীন নয়। মানুষের গোপন নিষ্ঠুরতা তার সহজেই চোখে পড়ে। বল্‌ল,—'ছি ! কি বল্‌ছ তুমি ?'

সীতেশ কথা বলার কোনো দায়িত্ব নেয় না। বল্‌ল,—'দূর ! তাই কি আর বল্‌ছি, তোমার বীণা-বন্ধু খুব ভাল মেয়ে।'

যে-কাঁটাটি ফুট্‌লো সেটি আবার গেল উঠে। দামিনী আবার সারা রাস্তা মুখরিত ক'রে চল্‌ল।

যতদূর পর্য্যন্ত স্বামী আর স্ত্রীকে দেখা যায়—জান্‌লার গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথাটা হেলিয়ে বীণা সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

একটি অস্পষ্ট কুয়াসা-ম্লান সন্ধ্যা। আশপাশের খোলার চালগুলি এরই মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে। শীতের শ্রীহীন হাওয়াকে এড়াবার জন্য সন্ধ্যার আগেই আশপাশের দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেছে।

কপাট দুটি আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে বীণা ভেতরে চলে' গেল। নীচেটা তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রুগ্ন মা ছিলেন রান্নাঘরে গায়ে-মাথায় একখানা পশ্‌মী র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে। বল্‌লেন—'আগুন-তাতে এসে বোস্ বীণা। যে ঠাণ্ডা, সারাদিন জল ঘেঁটে হাত-পাগুলো তোর যা হয়েছে ! আয়।'

বীণা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন,—'এত ঠাণ্ডা, গায়ে জামা দিস্‌নি ? মরবি যে !'

বীণা মৃদু-কঠিন কণ্ঠে বল্‌ল—'চুপ কর, কেউ শুন্‌তে পাবে, আছে না কি কিছু যে গায়ে দেব ?'

রাত্তে অনাবশ্যক তেল খরচ ক'রে আলো জ্বালার হুকুম নেই। যে-ঘরে ভাঁড়ারের জিনিসপত্র ও এক ধারে ঘুটে-কয়লা থাকে, বীণা সেই ঘরে ঢুকে নিজের বিছানার ধারটিতে চুপ ক'রে বস্‌ল। দিন তার কোনো রকমে কাটে, কিন্তু রাতের বেলা তার মন ওঠে একটু একটু ক'রে জেগে। শুয়ে, বসে, পাশ ফিরে জেগে জেগে সময় আর কাট্‌তেই চায় না। রাত্রির অন্ধকার তার ঘর আর বাহিরকে একেবারে সমান ক'রে দেয়। বীণার অবরুদ্ধ, অ-স্বচ্ছ বন্দী-মনের যতকিছু চিন্তা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের রূপ নিয়ে ঘরের চারিদেকে উড়ে উড়ে বেড়ায়।

উদ্দেশ্যহীন আশাহীন একটি জীবন !

বাপ আসেন সারাদিন পরিশ্রম ক'রে। তিনি যে কেরাণী তা তাঁর মুখেই প্রমাণ। তাঁর গাম্ভীর্য্য হচ্ছে রাগ, স্পষ্ট কথা হচ্ছে কলহ, শাসন হচ্ছে কটূক্তি, আর তাঁর পিতৃত্বটা আর স্বামীত্বটা হচ্ছে পাপ। খগেনবাবুর অনেক গুণ ! রবিবারের সমস্ত দিনটা বীণা একেবারে তটস্থ হয়ে থাকে।

খগেনবাবুর আগমন, বিশ্রাম, আহার এবং তামাকু সেবনের গণ্ডগোলটা চাপা পড়ে পাশের বাড়ীর হৈ-চৈতে।

'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই—এ বাছা শাস্তরেই আছে।'

'তা ব'লে মাথা ফাটাফাটি হবে মা, তুমি বল কি ? বৌ মানুষ গিয়ে ভাসুরের মুখের ওপর বাপান্ত ক'রে এল ! কান-ভাঙানিতে কি-না হয়, যে মা পেটে ধ'রে এত বড়টা করলে তারই গলা টিপে সেদিন—'

'নিজের বেলা আঁটিসুঁটি ! ও সিঁদুর তোর কপালে কিছুতে থাক্‌বে না, যদি আমি বামুনের মেয়ে হই, সোয়ামির হাঁড়িতে যদি একদিনের তরেও চা'ল দিয়ে থাকি—'

'ঘা-ঘাউলির ঘর, এ আর নতুন কি দেখ্‌বে মা, নিজের ছেলের পাতে মা, দুখানা মাছ পড়ে, ছোট বো'র ছেলে খায় ভাজার কাঁটাটুকু,—আলোটা আড়াল ক'রে বাছাদের খাওয়াতে বসে।'

'এই কীর্ত্তি, বুঝ্‌লে পিসি, দজ্জাল বৌটার এই কীর্ত্তি আর কি চাপা থাক্‌বে তুমি ভাব ?'

'আরে রামোঃ, ঐ সীতেশ ছোঁড়ার বৌটার কথা ত ? আর বলিস্‌নে বাছা। ছি মা ছি, পাড়া-বেড়ানির লজ্জা-সরম কি এতটুকু আছে গা ? স্বামী ছোঁড়া ত ভেড়ুয়া, বাজারও করাচ্ছে, বাসনও মাজাচ্ছে, এবার পরনের কাপড়খানাও না কাচিয়ে নিলে বাঁচি ! এখনকার মেয়েরা তাও পারে !'

একটা নির্লজ্জ হাসির ঝড় সেই অদৃশ্য অশিক্ষিত মজলিসটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

রাত হয়েছে। হাত-পাগুলো এখনও গরম হয়নি বটে। বীণার স্তিমিত তন্দ্রার ঘোর কি যেন সাড়াশব্দ পেয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। ও বাড়ীর সেই ছেলেটি এতক্ষণে ফিরেছে। সম্প্রতি কলেজ ছেড়ে ছেলেটি দেশের কাজে নেমেছে। তার গলার আওয়াজ যেন বৃহৎ পৃথিবীর সাড়া আনে !

'বুঝলে মা, তুমি বিশ্বাস করবে না বল্‌লে, সমস্ত দেশটায় আজ মেয়েরা এনেছে উৎসাহের জোয়ার। ধরা পড়েছে কত শুনবে ? দু-হাজারের ওপর। মেয়েদের আর সেদিন নেই !'

'সে কি রে ! মেয়েদের এমন ক'রে দড়ি খুলে দেওয়া ?'

'ওই ত তোমাদের দোষ ! তোমরা নিজেদের শক্তিকে চেন না। দুটো পা নইলে সমাজ চল্‌বে কেমন ক'রে ? মেয়েরা এতদিনে বুঝেছে যে আমরা তাদের বেঁধে রাখিনি, নিজেদের জালেই এতদিন তারা জড়িয়েছিল।'

এ যেন নূতন দেশের কথা, এ যেন কোন্ দূর সাগরের স্বপ্ন—অন্ধকার ঘরের ফাটলে এ যেন একটি তীব্র সূর্য্যরশ্মি !

কাঠের পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে বীণা এতক্ষণ সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মনে হ'ল, এগুলি ত মুখের কথা মাত্র ! যে-মেয়েরা আজ পথে গাড়ী ঘোড়া বাঁচিয়ে চল্‌তে শিখেছে, সে মেয়ের সংখ্যা কতগুলি ? কিন্তু যাদের মূঢ় মূক জীবনে সামান্য বর্ণপরিচয়ও হ'ল না, পৃথিবীর পটে যে কোনো দাগই টান্‌ল না, দারিদ্র্য

ও দুরবস্থার তলায় যার সমস্ত সম্ভাবনাই গেল তলিয়ে, যার মহত্ব ও সদ্‌গুণ আত্মপ্রকাশের কোনো পথই পেল না, আপনি কি সে মেয়েদের খোঁজ পেয়েছেন?—উঁচু গলায় যদি বীণা এগুলি বলতে পারত!

'তুমি দেখবে মা, এই যে মেয়েরা জাগছে, এরাই হবে ওদের সকলের চেয়ে বড় শত্রু। মেয়েদের স্বাধীনতা যে সমাজের পক্ষে কতখানি স্বাস্থ্যের লক্ষণ তা আমাদের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা ভাল করেই জানে। এবারের এই আন্দোলন, এই পীড়ন, এই অরাজকতা সার্থক হয়েছে নারী-জাগরণের মধ্যে।'—আনন্দে উচ্ছ্বাসে যুবকটির মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল।

হায় রে জাগরণ! একটি মাত্র প্রদীপের কাছে বসলে কি জগতের সমস্ত অন্ধকারকে ভুলে যেতে হয়? সংখ্যায় যে মেয়েরা বেশী, তাদের যে আজও বিবাহের পাত্র জোটেনি, তারা যে পায় পিতার অনাদর, মাতার স্বার্থপরতা, তারা যে পায় স্বামীর অবহেলা, পরিজনের লাঞ্ছনা। যে বৃহৎ নারী-সমাজের কাছে আজও দিনের আলো পৌঁছয় নি, সেই অনড় অচল কোটি কোটি অবলা মাথায় নিয়ে আছে যত কিছু পাপ, যত শাস্ত্রের শাসন, যত কলহ, যত গ্লানি, প্রাণধারণের যত কিছু সঙ্কীর্ণতা—কিন্তু থাক্, বীণা কতটুকুই বা বোঝে!

যুবকটির শক্তি এবং সাহস-বিস্তৃত দেহ আপাদমস্তক খদ্দরে ভূষিত। সাংসারিক অবস্থা তার ভালই, দেশে বেশ আয় আছে। জাতে ব্রাহ্মণ, বীণাদেরই সশ্রেণী, বৃদ্ধা মা তার বিবাহের চেষ্টা করছেন।

রাতে বীণার চোখে ঘুম আর আস্‌তেই চায় না। প্রথমত, শীতকালের বিরুদ্ধে লড়বার মত গরম কাপড় কিছু নেই; দ্বিতীয়ত, আহারে রুচি থাকাটা তার অভ্যাস-বিরুদ্ধ। সহানুভূতি দিয়ে, মমতা দিয়ে, বেদনা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে কতবার সে সংসারের অবস্থাটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু না—এখন তার ইচ্ছা করে, দুই ধারালো নখে সংসারের এই সরমের আবরণটা ছিঁড়ে ফেলে সে চীৎকার ক'রে ওঠে, বেঁচে থাকার নাম ক'রে এমন শোচনীয় জঘন্য মরণকে আর আঁকড়ে ধরে থাকতে পারিনে। তার ইচ্ছা করে বৃহৎ জগতের রাজপথে নেমে গিয়ে লোক জড়ো ক'রে বলে,—এই যা তোমরা দেখছ, এ সত্যি নয়, আমাদের যাতনা আমাদের দুঃখ কোথায় তা তোমাদের জানা নেই, আমাদের অকল্যাণ, আমাদের অভিশাপ তোমাদের চোখে পড়ে না,—তোমাদের এ সৌখীন দেশপ্রেম উচ্ছন্নে যাক্।—হায়রে, যদি বলতে পারত!

বীণার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। সত্য কথা বলতে কি, জ্ঞান হওয়া থেকে আজ পর্য্যন্ত বাপকে সে ভাল চোখে দেখতে পারল না। লোকটা ভীরু, কটুভাষী, কুরুচিসম্পন্ন, অশিক্ষিত, জ্ঞান ও সদ্বিবেচনার দিক থেকে ভদ্রসমাজের অযোগ্য। পিতার প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধাই নেই। মা হচ্ছে চিররুগ্ন, কদাকার, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী, স্বার্থপর—মাকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। পিতামাতার পরিচয় হচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক!

আবার সকাল হ'ল। গত রাতের উত্তেজনার কথা ভেবে লজ্জায় বীণা শিউরে উঠ্‌ল। ছি ছি, নিজকে এত বড় অপমান সে করল কেমন করে? গা হাত পা'য় তার ব্যথা, শরীর অবসন্ন, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। মন যেমন নিরুৎসাহ, তেমনি উদ্দেশ্য-হীন। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে।

পিতা বলেন—'এত বেলা অবধি ঘুম? রাত জেগে বই পড়া আমার কাছে চলবে না,—দিন দিন ত রোগা বাদুড়ের মতন চেহারা হচ্ছে, আর কিছুদিন বাদে পাত্তর জুটবেও না—মুখে আগুন মেয়ের।'

মাতা বলেন,—'মাথার চুল ত আদ্ধেক গেছে উঠে, কাল যারা দেখ্‌তে আস্‌বে, ও-রূপ তাদের কাছে বার করবি কেমন করে আবাগি?'

সকালবেলা বাসনগুলি একত্র করে বীণা মাজতে বসে। সে কোনো প্রতিবাদ করে না।

•

দুপুরবেলা খানিকটা সময় মেয়েদের হাতে কোনো কাজ থাকে না। দামিনী লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বামুন-বাড়ির দোতলায় উঠ্‌ল.

সুমুখে যিনি বসেছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে সে

বল্‌ল,—'বড় পিসিমা, আপনি না-কি আমার নিন্দে কর্‌ছিলেন ?'

মেয়েদের জটলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। পিসিমা বল্‌লেন,—'নিন্দে আর কি বাছা, তুমি সোয়ামি নিয়ে ঘর করছো, ছেলেপুলে নেই, অবস্থা স্বচ্ছল—আমাদের কি চোখ টাটায় না ?'

সবাই নানা শব্দের নানা হাসি হেসে উঠল। পিসিমা বল্‌লেন—'তা পরে বলি শোন্ বাছা, তুইও শুনে যা, দুর্গাদাসের বৌ-এর গুণ বেরুচ্ছে দিন দিন। মিট্‌মিটে ভান্ মা, ভেতরে ভেতরে গজদের খনি, সোয়ামির পকেট্ থেকে দেখ্-সাক্ষেত্‌ সেদিন পয়সা চুরি করল। ওমা, কি হবে মা !'

উকীল বাবুর স্ত্রী বললেন—'ঘরের বৌকে সাবধান হতে হয়। কালো চাটুয্যের বড়মেয়ে ভাসুরের কি একটা কথায় হেসে উঠেছিল ব'লে এ জন্মে তাকে কেউ ঘরে নিল না—এত বড় আস্পদ্দা ?'

দামিনী অবাক হয়ে বল্‌ল,—'কি আশ্চয্যি !'

'আশ্চয্যি কি না ? তোর দিকে চেয়ে যদি কোনো পরপুরুষ হাসে ?'

'হাসলেই বা ! তাতে কি হ'ল ?'

এত বড় সহজ কথার আর কোনো প্রতিবাদ নেই ! মেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এ ছুঁড়ি বলে কি ?

দামিনীর অন্তরে যে খোলা আকাশের হাওয়া বয় ; অরণ্যের নিভৃত আনন্দ সেখানে গুঞ্জন করে ; উদয়াস্ত সেখানে আলোর খেলা। দামিনীর জীবন জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ নয়।

'উঠি পিসিমা'—ব'লে দামিনী আর সেখানে বসল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনের যে মন্তব্য—সেটা যে তার কানে যায় না তাই রক্ষে।

এ-দরজা থেকে সে আবার ও-দরজায় গিয়ে উঠল। সামনে অল্প একটুখানি রোয়াক, বাঁ-দিকে কলতলা। দালান পার হতেই একটি মেয়ের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা। দামিনী জিজ্ঞাসা করল—'কেমন আছেন রে ?'

মেয়েটির মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। শুধু ঘাড় নাড়ে। দেখতে দেখতে তার চোখে জলের ধারা নেমে এল।

'ভাল নেই ? ডাক্তার কি বলেন ?'

পাশের ঘরে কাশির শব্দ হতেই মেয়েটি আবার ছুটে চলে গেল।—

আসন্ন শোকের ছায়ায় বাড়িটি থম্ থম্ করছে। দারিদ্র্যের একটি রিক্ত রূপ চারিদিক থেকে যেন জানাচ্ছে নেই নেই, কিছু নেই ! দামিনীর যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। ও-পাশে দালানের একধারে একটি মাত্র ছেলে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রতিদিন এই সময়টায় একেবারে অচেতন হয়ে থাকে। শাশুড়ীর পা পুড়ে গিয়ে তিনি শয্যাগত। একটি মাত্র দেওর তার চোর-স্বভাবের জন্য অনেক দিন থেকেই বাড়িছাড়া। মাঝে মাঝে আসে, এটা-ওটা হাত সাফাই ক'রে আবার পালিয়ে যায়।

বউটি যখন আবার বেরিয়ে এল তখন সে আর দামিনীকে দেখতে পেল না। নাম ধরে দুবার ডেকে যখন বুঝলে সত্যিই দামিনী পালিয়ে গেছে, তখন সে একটি নিঃশ্বাস ফেললে। সে নিঃশ্বাস যে কি বলল তা শুধু সেই নিঃশ্বাসই জানে।

বেলা তখন অনেকখানি গড়িয়ে এসেছে। পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে দামিনী ডাকল,—'বড়-মা ?'

'কে রে, ক্ষুদে-বৌ ? আয় !'

দামিনী ঘরে ঢুকে গিয়ে বল্‌লে,—'বাঃ, এই যে সুরেন-দা, একেবারে লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে ব'সে ! দেশের কাজে নেমে আবার যে মায়ের আঁচলের তলায় ?'

সুরেন হো হো ক'রে হেসে উঠল। বল্‌ল,—'মুখে যে খুব দেখ্‌ছ, জেলে যেতে পার ? তোমার মতন কত মেয়ে আজকাল—'

দামিনী বল্‌ল,—'দূর, আমার মতন একটিও নেই, আমাকে নিয়ে চল ত দেখি, পিকেটিং ক'রে বিলিতি কাপড়ের বাজার একেবারে বন্ধ করে দেবো।'

বড়-মা বল্‌লেন,—'সীতেশ কি করছে ?'

দামিনী বল্‌ল,—'হাড় ভাজা ভাজা করছিল এতক্ষণ,

এবার ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম। ভারি দাঘেলে, বড়-মা।'

'আ পোড়ারমুখী!'

দামিনী হাসি থামিয়ে দম্ নিয়ে বল্‌ল,—'আচ্ছা বড়-মা, তোমার ছেলেটি এমনি করে বয়ে যাবে তুমি বল্‌তে চাও?'

সুরেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। বড়-মা বল্‌লেন,—'কেন বল্‌ত রে?'

দামিনী এক চোট হেসে বল্‌ল,—'দেশের কাজে এই যে দলে দলে ছেলে নাম্‌ল, এর কারণ কি জান?'

'কি?'

'মনের দুঃখে! তোমরা এদের বিয়ে দিলে না, একটা উপায় দেখলে না, একটা হিল্লে করলে না, এরা কি করে বল ত?'

মুখ চোখ রাঙা করে সুরেন বল্‌ল—'বৌদি না হ'লে তোমাকে আস্ত রাখতাম না। ভারি হিতৈষী!'

'আমি একটা উপায় ঠাউরেছি, বড়-মা'—গলা নামিয়ে দামিনী বল্‌ল,—'এদের বীণার সঙ্গে সুরেনদার বিয়ে দাও।'

ওদিকের সিঁড়ির ধারে বীণা ছিল দাঁড়িয়ে। হরিণ যেমন দূরের বাঁশীর আওয়াজ শোনে, বীণা শুন্‌ছিল তেমনি নিশ্চল হয়ে। হঠাৎ তার কানে আগুনের মত দামিনীর কথাগুলো ঢুকতেই তার রুগ্ন দেহ সে আঘাত সইতে পারল না। তার সেই কদাকার মুখখানি দেখতে দেখতে কেমন বিকৃত হয়ে এল, সমস্ত দেহটির খিল্ খুলে গিয়ে থর থর করতে লাগ্‌ল, মাথায় উঠ্‌লো রক্ত—মনে হ'ল, এত বড় সম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন তার জীবনকে যে দুর্ব্বহ ক'রে তুলবে! ধীরে ধীরে সে যখন সেখান থেকে উঠে চলে গেল তখন তার দেহের অর্দ্ধেকটা অচেতন হয়ে এসেছে।

সুরেন মাথা হেঁট ক'রে রইল। বড়-মা বল্‌লেন—'আশ্চয্যি ও মেয়ে। এইটুকু বয়সে কত সহাই করল! কাল যে কাণ্ডটা হ'ল তা কোনো ভদ্রঘরে কখনও হয় না মা। মা হয়ে বাপ হ'য়ে এত বড় অপমান যে পেটের মেয়েকে করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।'

দামিনী বল্‌ল,—'কেন বড়-মা?'

'কেন? এদেশে মেয়ে হওয়া যে পাপ! তার চেয়ে বড় পাপ যদি সে বিয়ের যুগ্যি হয়!—কাল একবারটি সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল…ছেলেমানুষ, সকল সময় কি সাবধান হতে পারে? সমস্ত দিন খেটে খেটে সারা হয়, ওপরে উঠেছিল একটু নিশ্বেস ফেল্‌তে…পড়ে গেল বাপের চোখে মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা ওর মা বাপের স্বভাব কি না…'

সুরেন আরক্তমুখে বল্‌ল,—'সে কি লাঞ্ছনা! মা ধরল ঝাপ্‌টে আর বাপ…দেখে এসো বৌদি, গায়ে এখনও দড়া দড়া দাগ পড়ে আছে।'

'নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তি বড় মা? এ বীণা সইল?'

সুরেন ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। বড়-মা বল্‌লেন,—'নির্দ্দোষী ত নয় মা, সুরেনের মতন ছেলে যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ির দিকে তাকানো যে দেশ-সেবার চেয়েও বড় পাপ!'

দামিনীর চোখ দুটি ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে।

শীতের রাত। সন্ধ্যা হতেই দামিনী একটি একটি ক'রে সমস্ত জান্‌লা দরজাগুলি বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। সীতেশের জন্যই ভয়, নইলে তার শীত একটুও লাগে না। সে বাজি রেখে এখুনি চৌবাচ্ছায় ডুব দিয়ে স্নান ক'রে আস্‌তে পারে। একটি ধূপ এতক্ষণ জলে এবার শেষ হতে আর দেরি নেই। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। ঘরের দু'দিকে দুটি বিছানার ওপর ব'সে দুজনে গল্প করছিল।

'ছোট বেলা থেকে দুজনে এক সাথে মানুষ হ'ল, বুঝলে দামিনী, বিয়ের পর আটদিনের মধ্যে মেয়েটি মাথার সিঁদুর মুছ্‌লে, স্বামীর 'ইন্‌সিওরের' দরুণ কিছু টাকাও পেল সে—বেশ এ পর্য্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু দিন যায়—ছোটবেলার ভালবাসার সাথীটিও বড় হয়ে একটি বউ ঘরে আন্‌ল—'

লেপের ভেতর থেকে মুখ সরিয়ে দামিনী বল্‌ল,—'তার পর?'

'তারপর দুনিয়ায় যেটি সবচেয়ে বড় সত্যি, স্ত্রীকে ঘরে এনে ছেলেটি মেয়েটিকে তাচ্ছিল্য করল, তাও

সয়—কিন্তু তখন আর সইল না দামিনী, যখন ভালবাসার ভাণ দেখিয়ে বিধবার টাকাগুলি ছেলেটি ঠকিয়ে নিল। আজ দেখলাম বিধবাটি মেজদিদির বাড়ি ভিক্ষে করতে এসেছেন।'

দামিনী বলল—'ওর চেয়েও ভাল গল্প শোনো: মণ্টুবাবুর বউ—ওই গো, যার সেদিন বিয়ে হ'ল—ফিরিওলার কাছ থেকে তিনটি পয়সার রসমুণ্ডি ধার করে কিনেছিল, সেই নিয়ে বাধল ঝগড়া, বড় বোন কি যেন বলেছিল, ভাই গিয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা দিল ঠুকে, মা আর সইতে না পেরে ছোটছেলেকে ডাকলেন······তারপর লাঠালাঠি······'

'সত্যি, কাদের বাড়ি? তারপর?'-সীতেশ গিয়ে দামিনীর পাশে বিছানায় বসল।—'কি হল দামিনী তারপর?'

'বলছি।'—ব'লে দামিনী গায়ের ওপর গরম র‍্যাপারটা টেনে দিয়ে বলল,—'বড়বোনের কপাল গিয়েছিল কেটে, ছোটভাই মণ্টুবাবুর বাঁ-হাতখানি ভেঙে দিলেন, মা ঠেলা খেয়ে রোয়াক থেকে পড়ে গেলেন, বুড়ো মানুষ, হয়ত পক্ষাঘাত হবে····· তারপর পুলিস এল ······তারপর আর বলা চলে না!'

'কেন?'

'আচ্ছা, শেষটাও শোনো। বউটার চরিত্র-দোষ প্রমাণ ক'রে তবে না-কি পুলিসের হাতে সবাই রেহাই পেল। দারোগা ছুবার লাঠি ঠুকে কিছু ঘুষ নিয়ে গেল!'

বলা বাহুল্য, সমস্ত গল্পগুলিই প্রতিবেশীগণের সত্য ঘটনা থেকে গৃহীত।

রাত হয়েছিল গভীর। পশ্চিম দিকে যে চন্দ্র অস্ত গেছে তারই ক্ষীণ আভা এসে পড়েছিল জানলার ঝিলিমিলির ভেতর। এত রাতেও এই ছুটি স্বামী-স্ত্রীর চোখে ঘুম ছিল না। আশপাশে অশিক্ষিত দরিদ্র নরনারীর যে কদর্য্য জীবনযাত্রা চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তাদের কথা বাদ দিয়ে এদের আলোচনার আর কিছুই থাকে না। চারিদিকের পঙ্কিলতার মাঝখানে এই ছুটি নরনারী যেন পদ্মের মত ফুটে উঠেছিল।

সীতেশ আবার উঠল। এদিকের বিছানার কাছে সরে এল, বলল—'বিলাসবাবুর ছোটভায়ের কাহিনী শুনেছ ত,—এই ত আজ সকালবেলা ওর সঙ্গে—আঃ আবার উঠছ কেন? থাক, আমি তোমার কাছে বসছিনে!

দামিনী হেসে বলল—'হাঁ, কি হ'ল বল না?'

'আগে আমায় বসতে দাও?'

'এসো।'

বসতে গিয়ে সীতেশ শুয়ে পড়ল। দামিনী উঠে এসে একটি জানলা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল। রজনী অন্ধকার। বীণাদের ছাদের মাথায় দপ্ দপ্ ক'রে একটি শুকতারা জ্বলছে। দামিনীর মনে হ'ল রাতের এ দৃশ্য সত্য নয়, রূঢ় দিবালোকে যা দেখা যায় তার চেয়ে স্পষ্ট আর কিছু নেই। অন্ধকারের যে সৌন্দর্য্য, সে মোহ মনকে পথহারা করে।

'একি আবার উঠে এলে? না ঘুম পাড়ালে শুমুবে না?'

সীতেশ বলল,—'এটা না ব'লে আর পাচ্ছিনে মিনি,······বিলাসবাবুর ছোটভাই ইন্দ্রর চাকরি ছিল না, জান ত? তবু বুড়ো মা মরবার আগে দিল তার বিয়ে। আহা বেচারা, বৌকে খাওয়াতে পারে না, রোজগার যে একেবারেই নেই! সমস্ত আত্মীয়স্বজনের দরজা একে একে গেল বন্ধ হয়ে······এবার স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দ্র বেরোলো পথে! কোথায়? এক-একটি বন্ধুর বাড়িতে স্ত্রীকে ফেলে সে দিনের পর দিন উধাও হয়ে থাকে, লজ্জায় আর ফিরে আসতে পারে না। এমনি ক'রে বহু বন্ধুর আঁস্তাকুড় সে ঘুরে বেড়ালো। এমন দিনে তার আর একটি সন্তান আসন্ন হয়ে এল একে সে খাওয়াবে কেমন ক'রে? স্ত্রীর কাছে কেবলই বলে—ও মাস থেকে একটি চাকরির স্নবিধা হয়েচে। স্ত্রী বিশ্বাস ক'রে দিন গোণে, শেষে বুঝলে উপার্জ্জন করা তার স্বামীর ভাগ্যে নেই। স্বামী আবার হ'ল উধাও। ফিরে যখন এল, শুনলো তার স্ত্রী এক দাইয়ের বাড়ীতে। ছুটতে ছুটতে গেল সেখানে। দাই বলল,—কাল তার হয়ে গেছে, প্রসব হ'তে সে পারেনি, আপনি এতদিনে

খবর নিতে এলেন ? ঢোক গিলে বল্‌ল,—আমার চাকরি হয়েছে তাই বল্‌তে এসেছিলাম !'

দামিনী মুখের একটা শব্দ ক'রে উঠলো, সীতেশের কাঁধের ওপর মাথা রেখে বল্‌ল,—'আর আমি শুনতে পারিনে, আর বলো না তুমি !'

সীতেশ বল্‌ল—'এদের বাঁচাবার কি কোনো উপায় নেই দামিনী ?'

বেলা চারটে বাজে।

শীতের বেলা, এরই মধ্যে বাড়ির মাথায় রোদ উঠেছে। কোনো কোনো ঘরের কর্তা বাঁধাকপি হাতে ক'রে এরই মধ্যে বাড়ির ভেতর এসে ঢুকছেন।

দামিনীর ঘর আজ জম্‌-জমাট। মেঝের একধারে আহারের প্রচুর আয়োজন থরে থরে সাজানো। সীতেশ চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছে, এইবার জল গরম করবে। ওধারের খাটের ওপর দামিনী, আর তারই হাতের মধ্যে হাত রেখে বীণা কাঠ হয়ে বসে রয়েছে। দামিনীর পীড়াপীড়িতে সীতেশের সঙ্গে সে অনেকবার কথা বল্‌বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। যে-আলাপ নিষ্প্রয়োজনের সে-আলাপের শিক্ষা তার হয় নি ।

এমন সময় সুরেন এসে ঝড়ের মত ঘরে ঢুক্‌ল।—'বৌদি,কোথায় কি আছে দাও ভাই তাড়াতাড়ি, তোমার নেমন্তন্ন না রাখলে হয়ত বা—'

দামিনী বল্‌লে—'বাঃ, বেশ সুরেনদা'—খুব তুমি, বেশ লোক যা হোক, সেই কখন বেলা তিনটের সময় আসবার কথা !'

সীতেশ বল্‌ল,—'নেমে এসে দাও না কানটা মলে, টু পিড্‌।'

'যা যা, তুই আর বকিস্‌ নি, বুঝলি, তুই থাম, এ বোয়ের আঁচল ধরে ঘোরা নয় ছ্যানয়াটা অনেক বড় !'

'ওরে দেখ্‌ গাধা, হাটে হাঁড়ি তা হলে ভাঙ্‌বো ? মেয়েদের এই আন্দোলনে তোর মেলামেশা কেন তাহলে বল্‌ব খুলে ওই বীণার কাছে ? টু পিড্‌, দিনে পাঁচ সাতটা নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ানো, সেটাও কি দেশের কাজ ?'

দামিনী খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল।

সুরেন বল্‌ল—'তা হ'লে বসি, তোর এখানকার নেমন্তন্নটাও ভাল ক'রে খেয়ে যাই—বৌদি, তুমি তা গান শোনাবে বলেছিলে।'

—'নিশ্চয়ই, এসো সুরেনদা, তার আগে বীণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,—ওকি, এত লজ্জা কেন রে নে মুখ তোল, এ আমার সুরেনদা……'

বীণা মুখ তুল্‌তে পারল না, সহজ হতেও পারল না, পাথরের মত শীতল ও কঠিন হয়ে বসে রইল অপরিচিতের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা বল্‌তে হয়, ভদ্র সমাজে কেমন ক'রে মিশতে হয়—এ ত তার জানা নেই ! সমস্ত মুখখানি তখন তার অবরুদ্ধ বেদনায় ও অশ্রুজলে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

সুরেন বল্‌ল,—'থাক্‌, আলাপের জন্য আর এত ব্যস্ত,—নাও তুমি গান ধর বৌদি—ওই যে, দেবো হারমোনিয়মটা এগিয়ে ?'

'দাও।'

সুন্দর কণ্ঠের গান যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন প্রত্যেক বাড়ির জান্‌লাগুলো গেল খুলে। সবাই দেখল ক্ষুদে-বৌর ঘরে মজলিস বসেছে। সীতেশ নিজে সমস্ত আহারাদির বন্দোবস্ত করেছে। ছেলেপুলেদের ডেকে সবাইয়ের হাতে দিল মিষ্টান্ন। দামিনীর আজ জন্মদিন। ও-বাড়ির বড় পিসিমা সুমুখের জানলা খুলে এত বড় অনাচারের দৃশ্যকে প্রশ্রয় দেননি, পিছনের খোলা জান্‌লাটির সুমুখে তিনি স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে এ কালের অধোগতির কথা ভাবতে লাগলেন। দামিনীর গানের আওয়াজ তীরের মত তাঁর কানে বিঁধতে লাগল।

আসর সেদিন ভাঙবার পর বীণা যখন বাড়িতে গিয়ে ঢুকল, ভিতরে তখন ঝড় উঠেছে।

এই কথা ও কাহিনীর শেষের দিকটা না শুন্‌লেই হয়ত ভাল হ'ত।

দামিনী আর সীতেশ ইতিমধ্যে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে গিয়েছিল নবদ্বীপে ওদের মামার বাড়ি। ফিরে এসে দামিনী যখন পাড়ার আবার সকলের সঙ্গে দেখা করতে গেল, তখন আর কেউ তাকে আমল দিল

না। সেজদিদি মুখ ফিরিয়ে উঠে গেলেন। নিরুপমা বল্‌ল,—'ছেলেমানুষী করবার সময় আমাদের নেই।' যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সেই বউটি বল্‌ল,—'বন্ধুর মতন তোমার সঙ্গে কথা বলতাম, তোমার পেটে পেটে এত গুণ? আমার শাশুড়ী দেখে ফেলবেন ভাই, আমি চললাম!'

দামিনী বল্‌ল,—'কেন ভাই, কি দোষ করলাম?'—কিন্তু তার কথা তখন শোনে কে!

বড়-মা শুনিয়ে দিলেন—এটা গেরস্থ বাড়ি বাছা, ভদ্দরলোকের মেয়ে-ছেলে নিয়ে বাস করি। এ কাণ্ডটা তোমার জন্তেই হ'ল মা। তুমি আর এ বাড়িতে—'

সকল দরজায় মাথা ঠুকে দামিনী ফিরে এল।

কিন্তু ঘটনাটা শুনতেই হ'ল তাকে একদিন।

'বাপের মুখে আর কথাটি নেই, অবাক কাণ্ড, এমন কোথাও দেখা যায়?'

'তাই বটে,—আহা, মায়ের প্রাণ, কাঁদবে না গা? বল কি তুমি? যতই নাতি-ঝ্যাটা করুক, পেটের মেয়ে ত বটে!'

'কিন্তু যতই মিটমিটে ভান হোক পিসিমা, বীণা-মেয়ের সাহস কম নয়!'

'তা আর নয় বাছা, গায়ে তেল ঢেলে আগুন জালিয়ে দিল, যাকে বলে, দগ্নে দগ্নে মরা!'

'আর ধৈর্য্যও কম নয়, দেখলে ত মামী, টুঁ শব্দটি করলে না—তা আহা, বাপের কষ্ট বুঝেছিল ছুঁড়ি, টাকার জন্তে বাপ বিয়ে দিতে পারে না,—আর সে ত বলেই গেল মরবার সময়, বাপের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল—'আর যেন মেয়ে হয়ে না আসি!'

'কিন্তু আদিখ্যেতা করলে ওই ছোঁড়া, ওই সুরেনটা, লাথি মেরে বেড়া ভেঙ্গে ছুটল সোমত্ত মেয়ের গা থেকে আগুন নিবোতে! পাগল আর কি, সাহসও কম নয়, হাত দিয়ে আগুন নিবোনো যায়? তেম্‌নি হয়েছে, মজাটা বাছাধন টের পেয়েছেন,—দুটি হাত পুড়িয়ে ছোঁড়া এখন হাঁসপাতালে! ছুঁড়িও নাকি শুনলুম, মরবার সময় ওই ডাকাত ছোঁড়ার পা'র ধুলো মাথায় নিয়েছিল! কি হবে মা, যাব কোথায়, নাটুকেপনা করা এখনকার মেয়ের রীত!'

'সুরেনের মা'র কথা বুঝি শোননি বড়দি? বল্‌লে, আমি ডাকাতের মা সেই আমার ভাল!'

'ও চণ্ডালি মাগির কথা আর বলিস্‌নে ভাই। মাগি বলে কি-না, ছেলে আমার যেদিন জেলে যাবে সেদিন আমার ষষ্টিপূজো হবে সার্থক।'

দরজার কাছ থেকে সীতেশ দামিনীর হাত ধ'রে টেনে আন্‌ল। দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল,—'ওকি, শোনো, অমন ক'রে তাকিও না—দামিনী শুনচ?'

'উঁ?'

কোলের কাছে তাকে বসিয়ে সীতেশ বল্‌ল,—'এত বড় আত্মহত্যার তুমি প্রশংসা করলে না দামিনী? বেঁচে থাকা যে তার পক্ষে আত্ম অপমান!'

দামিনী নির্জীবের মত শুধু বল্‌ল,—'তাই ত!'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আর এক পর্ব্ব বাকি!

এই ক্ষুদ্র পল্লীটিতে সেই পাপ, অমঙ্গল, গ্লানি, অকল্যাণ, জীবনের সহস্র অপমান একই প্রবাহে বয়ে চলেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতি দিবসের যে প্রাণধারণের বিকৃত উৎসব—তার উপকরণ শুধু পর-নিন্দা, কটূক্তি, কদাচার, কলহ, সন্দেহ শত লক্ষ দৈন্তের অলজ্জ আড়ম্বর!

কিন্তু যে নিষ্পাপ, যে সরল, যে সহজ, যে সৌন্দর্য্যময়, ফুলের মত যে আপনার আনন্দে ফুটে উঠে সুগন্ধ বিস্তার করেছিল, তাকেও এই পাপের মূল্য দিতে হ'ল।

দামিনীর না-কি চরিত্রদোষ! সুরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার গোপন রহস্য তাদের চোখে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল, যেদিন শুনল দামিনী হাঁসপাতালে খাবার নিয়ে তাকে দেখতে গেছে। অবৈধ প্রণয়াসক্তি না হ'লে ঘরের বৌ এমন অদম্য সাহস সঞ্চয় করে কোথা হ'তে?

সীতেশ শুধু বল্‌ল,—'মন্দ নয়, আমার বদনাম ত আগেই রটেছে. বীণাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো হয়েছিল তার কারণ তোমার প্রতি আমার মোহ নেই। মোহ থাকলে কি আর তোমায় এত স্বাধীনতা দিই!'

দামিনী নিঃশব্দে বসে রইল।

সীতেশ বলল—'কিন্তু চল দামিনী, এখানে আর না—চল চলে যাই কোথাও। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে যে!'

দামিনী মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল,—'তাই চল। এখানে থাকলে আমাদের ঘরও হয়ত ভেঙে যাবে! চল!'

* * * *

গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা যায়—একটি একটি ঋতু ঘুরে ঘুরে পার হয়ে যায়। যারা ছিল এবং যারা নেই তাদের কথা কেউ মনেও করে না। সূর্য্য আলো বিকীর্ণ করে, রাতে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, আকাশে ওঠে তার গাছে ফোটে ফুল ও ফল—কিন্তু তাদের কি! মাটি নীচে যারা জালে জড়িয়ে থাকে, উপরের পৃথিবী খবর তারা রাখবে কেন? পাপের স্বভাব সৌন্দর্য্যে ভুলে থাকা!

গলির এ-মোড়ে দামিনীর ঘর খালি পড়ে থাকে গলির ও-মোড়ে বীণার ঘরে কেউ প্রবেশ করে না ও-জানলাটি তাকিয়ে থাকে এ-জানলাটির দিকে। করেছে সুন্দর জীবনের তপস্যা, ও করেছে আত্মহত্যা সাধনা!

নৈপুণ্য

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

একদা নিপুণ হাতে,
মানুষ গড়িল তার অসিফলকের তীক্ষ্ণঘাতে
প্রস্তরের সুন্দর মূরতি;
জ্বালি' দীপারতি
কহিল সে, "এ মোর দেবতা, এর নাম
'জাতি' রাখিলাম।"
তারপর আপনার নৈপুণ্যেরে বহু বাখানিল।

সারা নিশি দিশে দিশে সঘনে হানিল
জয় জয় রব। ফুলমালা-দীপালি-চন্দনে,
নৃত্যগীত-মহোৎসবে, শঙ্খঘণ্টা-বাঁশীর বন্দনে
ধীরে রাত সারা হয়।—পূর্ব্বাকাশ-তীরে
হোমাগ্নি-শিখায় ঢালে নিশা তার শেষ আহুতিরে
তমিস্রার পাত্র শূন্য করি'।

সহসা সে নিশাকাশ ঘন ঘন উঠিল শিহরি'
ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনে। দিশে দিশে
চক্রের ঘর্ঘর সনে হুঙ্কার-উল্লাস যায় মিশে।
গুরু গুরু জয়ভেরী, ডঙ্কানাদ, কোদণ্ড-টঙ্কারে
আরতি-শঙ্খের ধ্বনি মগ্ন করি' জাগে অহঙ্কারে
মহা কলরোল।—ওঠে রব,
"বাহির-অঙ্গনে আজি সমবেত দেবতারা সব,
নরের পূজার অংশভাগী,
আজিকার যজ্ঞভাগ লাগি'।"
তিনজন তাঁরা,
যুযুধান-বেশী যুদ্ধ, ক্রুর ঈর্ষ্যা, ভয় ভয়হারা।
এ তিনের মাঝে
যুদ্ধের হুঙ্কার গিয়ে ত্রিভুবনে বাজে।

নিমেষে থামিল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, খর-করতাল,
মৃদঙ্গ-রণন, নৃত্যগীতোৎসব। কূটবুদ্ধি-জাল
বহু ছলে বিস্তারিয়া, বহুতর প্রিয়ভাষে তুষি'
ঈর্ষ্যা ও ভয়েরে তারা জয় করি' নিল। পরে
যুদ্ধেরে করিল রুদ্ধকণ্ঠ বুদ্ধিহারা।

তারপর উৎসবের দ্বারে দ্বারে উঠিল পাহারা,
শস্ত্রাগার শূন্য করি' ভরি' দিল পূজা-উপচারে
পুনরায় শঙ্খঘণ্টা কোলাহল চৌদিকে প্রচারে
নূতন হর্ষের বার্ত্তা। শান্তিমন্ত্র-গীতে
তিন দেবতারে তারা বসাইল একটি বেদীতে
—জাতি, ঈর্ষ্যা, ভয়, -
এর নাম "আন্তর্জাতিকতা" তা'রা কয়!
দিকে দিকে জয় জয় রবে মিলি' সঘনে হানি
আপনার নৈপুণ্যেরে পুনরায় বহু বাখানিল

কুকি সংস্কার সমস্যা

শ্রীলালতুদাই রায়

যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা আজ বুঝি ভাঙিল। জাগরণের ললিতরাগিণী আজ সারা ভারতময় ধ্বনিত হইতেছে। মানবসভ্যতার আদি জনক ভারত সত্যই জাগিল কি?

বিশ্বনিয়ন্তার নির্দ্দেশ,—উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি। সবল দুর্ব্বল, উন্নত অবনত, কাহারও ক্ষমতা নাই এ নিয়তির গতিরোধ করে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদি সময় আসিয়া থাকে তবে ভারত জাগিবেই। তার এ গতি কোনো শক্তিই রোধ করিতে পারিবে না। ভারতের বিরাট দেহে সত্যই প্রাণের চেতনা জাগিয়াছে। তাই বুঝি দুর্গম পার্ব্বত্য দেশেও জাগরণের একটু সাড়া আজ পাওয়া যাইতেছে।

গতানুগতিক জীবনযাত্রায় কুকিরা আজ সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। ভাল হইবার, উন্নতি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা, আজ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। উন্নতির পথে ছোট বড় ভারতের সকল জাতিই চলিবে, আর কুকি জাতি বসিয়া থাকিবে, তাহা হইতে পারে না। তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। চলিবে, তাহাদের চলিতেই হইবে। হয়ত অন্যান্য জাতির বহু পশ্চাতে তাহারা চলিবে। তাহাদের যাত্রাকে নিয়মিত, সংযত, শুদ্ধ করিতে কেহ যদি না আসে, তবুও তাহারা চলিবে। পথে, অপথে, কুপথে তাহারা চলিবে। হয়ত নিজে কষ্ট পাইবে, পরকেও বহুদিন কষ্ট দিবে।

কুকি সমাজও বিরাট হিন্দুসমাজের একটি ক্ষুদ্র, উপেক্ষিত অঙ্গ নয় কি? শরীরের যে নগণ্য অংশটি আজ কাহারও চোখে পড়িতেছে না, বিষাক্ত হইলে তাহাই হয়ত মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কুকিরা পূর্ব্বে যে-ভাবে ছিল, সে-ভাবে থাকিলেও দেশের দিক হইতে তত ক্ষতিকর হইত না। কিন্তু বিদেশী ধর্ম্ম, হাবভাব, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করাতে দেশের পক্ষে একটু ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে সন্দেহ নাই। ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত আর একটি খ্রীষ্টান সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যেদিন ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সেদিন দেশের নেতারা স্বপ্নেও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, বহুশতাব্দীর পর ইহাই দেশের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতে পরস্পরবিরোধী বহু ধর্ম্ম আছে, কিন্তু কোথায়? হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত ব্যাপার কখনও ত ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় নাই। ইহার কারণ ধর্ম্ম নয়। যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, তাহারা ভারতীয় সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আর একটি ভাব, আর একটি সভ্যতা গ্রহণ করাতেই তাহাদিগকে এত শতাব্দী পরেও এদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারা যাইতেছে না। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, ভারতের যেখানেই লোকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, সেখানেই ধর্ম্মের নামে পাশ্চাত্য ভাবই গ্রহণ করিতেছে/বেশী। ইহার বিষময় ফল আজ হউক, আর বহু শতাব্দী পরেই হউক, একদিন ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং শুধু কুকি কেন, দেশের প্রত্যেক অনুন্নত, অবজ্ঞাত জাতিকে আজ টানিয়া লইতে হইবে। আজ যাহাকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছ, অন্যেরা তাহাই সযত্নে কুড়াইয়া তোমার মারণ অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে না কি?

কুকি জাতির প্রকৃত সংস্কার কি ভাবে হইতে পারে, তাহাই আজ আলোচনা করিব। যে-কার্য্যটি গ্রহণ করিতেছি, আমি জানি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনধিকারী। জাতির ইতিহাস বা বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করা বরং যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তির উপায়

আবিষ্কার বা ব্যবস্থা বিধানের ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের সমস্যাগুলি আমি কি ভাবে দেখিতেছি শুধু তাহাই দেশের মনীষিগণের নিকট নিবেদন করিতেছি। কুকি জাতির সমস্যাগুলির সমাধান ও উন্নতির একটি উপায় করিবেন,—সমাজের নেতৃগণ, এই আশাতেই আমার এ অসাধ্য বেসুরা গলায়ই গান ধরিয়াছি।

কুকি জাতির কি হওয়া উচিত, তাহা অনেকটা পরিষ্কার বুঝা যায়, বলা যায়। কিন্তু কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহাতেই যত গোলমাল। আদর্শ টি বলা যায়, কিন্তু উপায়-নির্দ্ধারণই কঠিন। "ভারতীয় থাকিয়া, ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম লাভ করা, ভারতের আরও পাঁচটি জাতির মত উন্নতি করিয়া সমাজের একটি অঙ্গরূপে পরিণত হওয়া" ;—আদর্শ টিকে এই ভাবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে এই আদর্শে পৌঁছানো যায় তাহাই সমস্যা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আলোচনা করিব। সুধীগণ প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

কুকিরা দলে দলে খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ করিতেছে, তাহাতেই হিন্দুসমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতেই যত উৎপাতের উৎপত্তি। কুকিদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান বেশী ছিল না বলিয়াই তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে আবার একটু ভাল করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিলেই কুকিরা আবার হিন্দু হইয়া যাইবে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। কুকিদের মধ্যে পূর্ব্বে যে-ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার বিশেষ কোনো উন্নতি হইয়াছে, ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না। খ্রীষ্টান কুকিদের মধ্যে এরূপ অসংখ্য লোক বাহির করিয়া দিতে পারিব, যাহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনীটি পর্য্যন্তও জানা আবশ্যক মনে করেন নাই। কুকি খ্রীষ্টানদের হাজারের মধ্যে একজনও শুধু ধর্ম্মের জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই।

পাশ্চাত্য ভাবের একটা মোহ আছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের একটা চটক আছে। তাহাতেই বহুলোক ভুলিয়া যায়। তার উপর খ্রীষ্টান হইলে চাকুরি পাওয়া যায়, সাহেব হওয়া যায়, সম্রাটের একজাতি হওয়া যায়, সরকারের কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার, হাকিমরা খাতির করেন, (অন্ততঃ লোকে এরূপ মনে করে), অসুখে, বিপদে পাদ্রী ও মেমসাহেব প্রাণপণে সাহায্য করেন, মাঝে মাঝে প্রসাদী হ্যাট, কোট, বুট বা রুমালটিও পাওয়া যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে (বিশেষভাবে বিবাহ ইত্যাদিতে) স্বাধীনভাবে চলা যায়, এমন কি যে বাঙালী বাবুরা শহরে গেলে আমাদিগকে ঘরেই তুলেন না, খ্রীষ্টান হইলে তাঁহারাই চেয়ার দেন, গুড মর্নিং করেন। কুকিদের মধ্যে একটি যথার্থ পিপাসা আজ-কাল দেখা যায়,—তাহা বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা। পাহাড়ে মিশনরী বিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিদ্যালয় নাই। খ্রীষ্টান না হইলে পড়িতে পাইবে না বলিয়া, শুধু পড়ার জন্যই প্রতিবৎসর শত শত বালক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এতগুলি সুবিধা সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়াই লোক দলে দলে খ্রীষ্টান হইতেছে। ইহাতে কুকিদিগকে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। বরং যাহারা এত সব সুবিধা প্রলোভন সত্ত্বেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে না, শুধু তাহাই নহে, অজস্র পদে পদে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াও স্থির আছে, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

পাশ্চাত্য ভাবকে বাহন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম যেদিন কুকিদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কুকিরা সেদিন নিজেদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মবিশ্বাস দিয়া উহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, অসহায় হইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল না, তাহারা দিন দিনই হাস্যাস্পদ, লাঞ্ছিত উপেক্ষিত হইয়া সমাজের এক কোণে স্থান লাভ করিল। আমাদের কোনো ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকাতে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক লোক সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা ছিল, ধীরে ধীরে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম কেন পালন করিব ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই আসে উঠিত না। পিতামহ

আমরা ভক্তি করি, মান্ত করি, সেবা করি। কেন করি —এ প্রশ্ন কোনো ছেলের মনে হয় না। সেইরূপ জগতের পিতাকে মান্ত করা, পূজা করা সকলেরই অবশ্যকর্তব্য, আর ইহাই ধর্ম। কুকিদের মধ্যে বেশী না হইলেও কয়েকজন পরম ধার্ম্মিক সাধু ভক্তের নাম শুনা যায়। তাঁহাদের ভক্তির ও ত্যাগের নানা গল্প আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আজকাল এ সব অসত্যতা। ধর্মের চিন্তাধারাটিও আজকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি কোনো কারণে দূরবর্ত্তী একটি কুকি গ্রামে গিয়াছিলাম। রাত্রিকালে উপস্থিত গ্রামবাসীর মধ্যে হিন্দুধর্মের কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করিতেছিলাম। সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমার কথা শ্রবণ করিলেন। তারপর শ্রোতাদের পক্ষ হইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"আমি কোন্ মিশনের পাদ্রর? আমার বেতন কত? আমার মিশনের ধর্মগ্রহণ করিলে কি লাভ হয়?" অর্থাৎ কোনো মিশনের প্রচারক না হইলে আমি ধর্মালোচনা করিব কেন, আর ধর্মে আমার স্থান কত উচ্চে তাহা আমার বেতন জানিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে; 'কি লাভ হয়', এর অর্থ,—খ্রীষ্টান হইলে যেরূপ সুবিধা সুযোগ পাওয়া যায় এবং যথেচ্ছা জীবনযাপন করিয়াও অবহেলে স্বর্গে যাওয়া যায়, সেইরূপ পাওয়া যায় কি না। শ্রোতৃগণ আমার উত্তর শুনিয়া সেদিন একটু মনঃক্ষুণ্ণই হইয়াছিলেন। আমরা কি ভাবে ধর্মের ভাব গ্রহণ করি ও তাহার ভাল-মন্দ বিচার করি, পাঠকগণ এই চিত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই ঘটনার পর হইতে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাকে তাহা একটু অন্তভাবে করিতে হয়।

জগৎপিতা ধর্ম হইতে আজ নির্ব্বাসিত। বৈধ অবৈধ যে প্রকারেই হউক, যে-প্রচারকের প্রভাব বেশী, খুব সাহেবের মত থাকেন এবং শহরে গেলে খাতির পান, তাঁহার ধর্মই ত প্রকৃত ধর্ম। ঠিক ঠিক প্রচারকের বিলাস-দ্রব্যগুলার স্বর্গ হইতে প্রভু যীশু সরবরাহ করেন। যাহার আমরা ধারণা হইয়া যায়, তাহার ধর্ম নিশ্চয়ই ভাল নয়। তাহার ধর্ম সত্য হইলে তিনি স্বর্গ হইতে বিলাসের দ্রব্যগুলি পান না কেন? ধর্মের নামে এই পাগলামী দেখিলে যেমন হাসি পায়, কুকিদের অশিক্ষা ও সরল বিশ্বাস দেখিলে দুঃখও হয়।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ছাড়া শুধু প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যেই বহু সম্প্রদায়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কোনো চাকুরি, বিবাহ বা অন্তবিধ সুবিধা পাইয়া খ্রীষ্টান হয়। কিছু দিন পর ঝগড়া বিবাদ করিয়া ব অন্ত সম্প্রদায়ে বেশী সুবিধা পাইয়া এ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্ত সম্প্রদায়ে গিয়া আবার "কনভার্টেড" হয়। আবার ত্যাগ করে আবার অন্ত সম্প্রদায়ে যায়। এক ব্যক্তিই একবার এই পাদ্রীর খ্রীষ্ট ধর্মে আবার অন্ত পাদ্রীর খ্রীষ্টধর্মে এইরূপ বহুবার "কন্‌ভারর্টেড" হয়। হাস্তকর খেলা! ইহাদিগকে আমি 'যাযাবর-ধর্মী' বলি। আমাদের মধ্যে এরূপ যাযাবর-ধর্মী লোকের অভাব কোথাও নাই। বাকি সবই গড্ডলিকা-ধর্মী।

পাদ্রী সাহেবরা শুধু যে আমাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন, তাহা নহে। প্রাইভেট ভাবে প্রায় সকলেই একটু একটু কারবারও করেন। যথালাভ! চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,"যার যে স্বভাব তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না"......হয়ত চাণক্য পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের পার্ব্বত্য অঞ্চল বিলাতী মাল কাটতির বড় চমৎকার স্থান। বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ, সিগারেট, পোষাক ও নানা প্রকার বিলাসদ্রব্যের কাটতি আমাদের মধ্যে বড় বেশী। আমি নিজে কোনো পাদ্রী সাহেবকে দোকান খুলিয়া বসিতে দেখি নাই; তবে লোকে বলে,—এই সব ব্যাপারে পাদ্রী সাহেবদের না-কি বিশেষ হাত আছে, এবং ইহাতে তাহারা বেশ দু'পয়সা নয়, দু'শ পয়সাই উপরি-রোজগার করেন। আবার পাহাড় হইতে কিছু কিছু কাঁচা মালও না-কি কেহ কেহ বিদেশে রপ্তানি করেন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মদ খাইতেন। আমরা কিন্তু এসব বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমরা মদ খাই না, চা খাই। চিনি দিয়া চা? নাই গড্! এত

কালা আদমীরা খাতা হ্যায়। আমরা স্যাকারিন দিয়া চা খাই। আমাদের এক খ্রীষ্টান দলপতির মেয়ের বিবাহে প্রায় ৪০ পাউণ্ড চা সিদ্ধ হইয়াছিল। এই সব ব্যাপারে কি ভাবে চা তৈয়ারী হয় ও খাওয়া হয়, তাহা একটু বলি; শিখিয়া রাখিলে পাঠকগণের উপকার হইবে। পনের বা কুড়ি সের জল ধরিতে পারে এরূপ পাত্রে একসঙ্গে জল ও চা দিয়ে ফুটান হইতেছে। যখনই যার ইচ্ছা হইতেছে, তিনিই এক কাপ (গামলা) কয়েক বিন্দু স্যাকারিন দিয়া টুক্ টুক্ করিয়া উদরসাৎ করিতেছেন। যতক্ষণ পর্যান্ত চা নিঃশেষ না হয়, ততক্ষণই নীচে জ্বাল দিয়া অনবরত উহা ফুটানো হইতেছে। সব নিঃশেষ হইলে তৎক্ষণাৎ নূতন জল ও চা তাহাতে নিক্ষেপ করা হইতেছে। সমস্ত দিনই এইভাবে চা ফুটানো ও পান হয়। আমাদের অসভ্যেরা এখনও নেটি মদ ছাড়িতে পারিল না, এজন্য আমরা সাহেবেরাও লজ্জায় মরি। আমাদের এমন উপাদেয় চা না খাইয়া ইহারা এখনও উৎসবাদিতে মদ খায়। সেরূপ নেশা না হইলেও মদ—মদই; তাতে আবার নিজের তৈরি। যদি বিলাত হইতে বিলাতী বোতলে আসিত তবে না হয় বুঝিতাম। কবে ইহাদের সুমতি হইবে? যাহারা আমাদের সত্য ধর্ম্মে আসে তাহারা কখনও (প্রকাশ্যে) মদ খায় না। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে-না-হইতেই আমরা সিগারেট অভ্যাস করি। বাল্যকাল হইতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করাতে, আমাদিগকে এ বিষয়ে আজকাল কেহই প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিতে পারিবেন না।

ভারতের সর্ব্বত্রই আজকাল লোকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা নিন্দনীয় মনে করে। আমাদের এই-সব বালাই নাই। আমরা এখনও সিগারেট খাই ও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করি শুনিয়া যদি কোন পাঠক হাস্য করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি জানেন না যে, সব ভারতবাসীর মাতৃভূমি ভারত নয়। পুরুষাদিক্রমে ভারতে বাস করিলেও, ভারতীয় রক্তে ভারতীয় মাটিতে শরীর গঠিত হইলেও, ভারতীয় ভাষায় কথা বলিলেও, বহু কোটী ভারতবাসীর মাতৃভূমি সুদূর পশ্চিম দেশে। সেইরূপ আমাদের মাতৃভূমিও এদেশে মনে করা আমরা অপমানজনক বলিয়া মনে করি। যাহারা এখনও সত্য ধর্ম্মে আসে নাই, সেই অসভ্য কালা কুকিদের মাতৃভূমি ভারতেই বটে। তবে এদের সংখ্যা দিন দিনই কমিতেছে। আগামী দশ-পনের বৎসর মধ্যে ইহাদের সকলকেই আমরা সভ্য করিয়া ফেলিতে পারিব বলিয়াই আশা পোষণ করিতেছি।

শুধু ধর্ম্মের জন্য কুকিরা যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত এবং সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই যদি সব উৎপাতের শান্তি হইত, তবে বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের মতবাদ ও অনুষ্ঠানগুলির এমন চমৎকার আকর্ষণী-শক্তি আছে, যে, তাহা প্রত্যেক খাঁটি ধার্ম্মিক লোকেরই মন আকর্ষণ করে। আমার মত একটি লোকই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সহজেই এই উচ্ছৃঙ্খল জাতির গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু ব্যাপার এত সহজে হইবার নহে। ধর্ম্মটি গৌণ কারণ, অন্যান্যগুলিই মুখ্য।

কুকিদের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়। পরমহংসদেবের উপদেশে যে উত্তম বৈদ্যের কথা আছে, কুকিদের জন্যও আজ এইরূপ উত্তম বৈদ্যের দরকার। বিকারের রোগী,—যাহা কুপথ্য তাহাই খাইতে চায়, যাহা ঔষধ তাহাকে মনে করে বিষ, চিকিৎসককে মনে করে শত্রু। যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা কিছুতেই করিতে চায় না, যাহাতে অনিষ্ট হইবে তাহাই তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এরূপ রোগীকে যিনি বুকে হাঁটু দিয়া জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ান, নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহার চিকিৎসা করেন, প্রাণরক্ষা করেন, তিনিই উত্তম বৈদ্য, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। কুকিদের জন্য আজ এইরূপ উত্তম বৈদ্যেরই দরকার হইয়াছে। আমাদের সমগ্র জাতি এখনও মহা অন্ধকারে। যাহারা একটু চক্ষু মেলিয়াছে তাহারাও একরূপ প্রভাব প্রতিপত্তিহীন। আমরা আজ এমন বন্ধু চাই, যিনি শুভ পথে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন, এমন চিকিৎসক চাই, যিনি বুকে হাঁটু দিয়া এই অনিচ্ছুক বিকারের রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রাণ ভক্তেরা আমাদের প্রতি-

বেশী মণিপুরী জাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মণিপুরীগণ শিক্ষায়, আচার-ব্যবহারে আজ এদিকের সমুদয় পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা বিশেষ উন্নত। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইতে পারিয়াছিল, আজ কি তাহা হইতে পারে না?

অখ্রীষ্টান কুকিদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল নিজকে হিন্দু মনে করিলেও সমগ্র কুকি জাতি নিজকে হিন্দু বলে না। হিন্দু-সভ্যতা সামান্য ভাবেও কুকিদের মধ্যে যদি না গিয়া থাকে তবে হিন্দুদের এই-সব ধর্ম্মানুষ্ঠান কুকিরা কোথায় পাইল? আমার মনে হয়, কুকিদের মধ্যে যখন হিন্দু-সভ্যতা প্রবেশ লাভ করে তখন হিন্দুরাও নিজকে হিন্দু বলিতেন না। তারপর কোনো কারণে হয়ত হিন্দু সমাজের সঙ্গে কুকিদের যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেক মন্ত্রের আগে বৈদিক প্রণব আছে। গত প্রবন্ধের শিবের মন্ত্রে পাঠকগণ বৈদিক মন্ত্রের একটুক ছায়া অনুভব করিতে পারিবেন।

সত্যই হিন্দুধর্ম্ম কুকিদের মধ্যে প্রচার করা উচিত। কিন্তু কিভাবে করা যায়? খ্রীষ্টধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্মের মত কোনো বিশেষ জীবন বা বিশেষ মতবাদের উপর হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত নয়। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে অনেক জিনিষই বুঝায়। তাহার উপর হিন্দুধর্ম্মের মতবাদ ও আচার-আচরণ অধিকারী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকলের জন্য এক জামা, এক জুতা, এক টুপীর ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মে থাকিত, তবে এত চিন্তার কারণ ছিল না বটে।

খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টানী আবহাওয়ায় গঠিত, খ্রীষ্টানী আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত, বিদেশী আদবকায়দায় শিক্ষিত। হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠান, উৎসব, আনন্দ, এদের চোখে পৌত্তলিকতা, অসভ্যতা, পাপ। জন্ম হইতে বিকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া শুনিয়া এই সকলের প্রতি ইহাদের অতি কুৎসিত ধারণা। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অখ্রীষ্টান কুকিদের ধারণাও খুব আশাপ্রদ নহে। হিন্দুধর্ম্মের অর্থ—বাঙ্গালীর ধর্ম্ম। বাঙ্গালীদের নিকট আমরা সর্ব্বদাই ঘৃণা ও অবজ্ঞা লাভ করিয়াছি। পাহাড়ে গেলে যে বাবুরা আমাদের ঘরে অকাতরে অন্ন গ্রহণ করেন, শহরে গেলে তাঁহারাই আমাদিগকে একটু স্থান দেন না বা চিনিতেই পারেন না। ব্যবসায়ে বাঙালীদের নিকট হইতে আমরা সর্ব্বদাই প্রবঞ্চনা লাভ করিয়াছি। লেখাপড়া জানি না বলিয়া উকিল-মোক্তারবাবুরাও আমাদের নিকট হইতে যথেচ্ছা আদায় করিতে ছাড়েন না। আপিসের বাঙালী পিয়ন পেয়াদা আমাদের ঘরে গিয়াও যদি যথেচ্ছা অত্যাচার করে তবে ধর্ম্মাবতার দেশের হাকিমবাবুরা তাহা বুঝিতে বা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। দেশী হাকিমরা সুবিচার কি অবিচার করেন, এসম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না, তবে ইহাদের প্রতি কুকিদের ধারণা ভাল নয়। কুকিরা মনে করে দেশী হাকিম অপেক্ষা সাদা হাকিম, ডেপুটী কমিশনার বা জংলী সাহেব কুকিদের প্রতি ঢের বেশী সুবিচার করেন। বাঙালীর প্রতি কুকিদের এই ধারণা কতক আপনা আপনি হইয়াছে—বাকি অন্যদের চেষ্টাকৃত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। আজকাল খ্রীষ্টান হওয়াতে আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই সদয় ব্যবহার পাইতেছি এবং শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকেরা অখ্রীষ্টান কুকিকেও আজকাল বেশ আদর যত্ন ও সাহায্য করিতেছেন। অশিক্ষিত লোকদের একবার যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা সহজে যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালীদের সম্বন্ধে কুকিদের এই ধারণা যাইতেও একটু সময় লাগিবে।

পক্ষান্তরে মিশনরীদের নিকট আমরা কি পাইয়াছি? মিশনরীরা আমাদের গ্রামে যাইতেছেন, আমাদের আপদ বিপদে, রোগে সাহায্য করিতেছেন। আমাদের কোন সুবিধা করিবার জন্য দরকার হইলে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতেছেন। আমাদের ভাষা শিখিয়া আমাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতেছেন। আমাদিগকে ভালবাসেন। সভ্য হওয়া (বিলাসিতা) শিক্ষা দিতেছেন। সর্ব্বোপরি মিশনরীরা কত বড় লোক হইয়াও আমাদের সঙ্গে মিশেন। (বড় লোকের প্রমাণ, কত বড় বাংলোতে দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া বাস করেন)। মিশনরীদের প্রতি কুকিদের অধিকাংশের এই ধারণা। বাস্তবিকই মিশনরীদের অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা

প্রশংসার বস্তু। যথার্থ কি ভাবে আদায় করিতে হয় ইহারা তাহা ভালরূপেই জানেন।

হিন্দুধর্ম,—বাঙালীর ধর্ম। খ্রীষ্টধর্ম—মিশনরীদের ধর্ম। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কুকিরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে এবং হিন্দুধর্ম, দুরন্ত বাঙালীর ধর্ম হইতে সহস্র গজ দূরে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে,—ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাঙালীর হাত হইতে বাঁচাও গেল, মহামান্য সম্রাটের এক জাতিও হওয়া গেল।

তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুধর্ম যেমন প্রচার করা খুব দরকার, তেমন শক্তও। যদি মিশনরীদের মত লোককে "কন্‌ভার্ট" (শুদ্ধি) করা যায়, চাকুরি দেওয়া যায়, কমিশনের ব্যবস্থা হয়, খ্রীষ্টান হইলে যে-সব সুবিধা ভোগ করা যায়, সেগুলি বা তদ্রূপ আরও কিছু পাওয়া যায়, তবে অনেকেই হিন্দু হইতে আসিবে। আজকাল অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নূতন কিছু চাহিতেছে। শুদ্ধির যেরূপ ব্যাখ্যাই করা যায় না কেন,—আমাদের কাছে উহা পরিচিত বস্তু, 'কনভার্সন'। সুতরাং আমাদের নিকট ইহা একটি বিশেষ খেলো বস্তুই হইবে। দুই একজন ভাল লোক ইহাতে আসিতে পারে বটে, বাকি সবই আসিবে যাযাবর-ধর্ম্মী। বেতন একমাস বন্ধ থাকিলেই অন্যত্র চলিয়া যাইবে। এই দিকে মিশনরীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারাও শক্ত। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম কেন, কোনো ধর্ম্মই এভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে কোনো সমাজেরই স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না।

কুকিদের উন্নতির জন্য কেহ কেহ শুদ্ধি আন্দোলন করিতে বলেন, কেহ মন্ত্রদীক্ষা দিতে চান, কেহ অস্পৃশ্যতা-বর্জন, কেহ পৈতা-গ্রহণ, কেহ অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে বলেন। কেহ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের নিকট হইতে "কুকিরা হিন্দু" এই কথা লিখাইয়া লইতে পরামর্শ দেন। এগুলির একটি, দুইটি বা সবগুলি অথবা অন্যবিধ উপায়েই কুকিদের যথার্থ উন্নতি হইবে, তাহা আমার পক্ষে বলা শক্ত। সর্ব্বত্র আশানুরূপ সফলকাম না হইলেও শুনিয়াছি, শুদ্ধি আন্দোলন ভারতের বহু স্থানে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে ইহা সফলকাম হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা ও কুকিদের অবস্থা একরূপ কি-না জানি না। শুদ্ধির খুব ভাল ব্যাখ্যা করিলেও কুকিরা ইহাকে খদ্দরের কোট প্যাণ্ট ছাড়া কিছুই মনে করিবে না। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের গুণে ধর্ম্মের নামে আমাদের মধ্যে রীতিমত খেলা চলিতেছে। ফল একটু কম হউক বা দেরীতে হউক, তবুও আমার মনে হয়, ভারতীয় ধর্ম ভারতীয় ভাবেই প্রচার করা উচিত। খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে-পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্মপ্রচার করেন সেই সব পদ্ধতি নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চাই কি, কোনো বেতনভোগী প্রচারক যেন পাহাড়ে ধর্ম প্রচার করিতে কখনও না আসেন। ফল একটু বিলম্বে হইলেও গোড়া হইতে ঠিক প্রাচ্যভাবে কাজটি সাবধানতার সহিত আরম্ভ করিতে হইবে। বলা যাইতে পারে, কুকিরা ত নিরক্ষর, ইহারা প্রাচ্য, পাশ্চাত্য কি বুঝিবে। নিরক্ষর বলিয়াই ত আরও বেশী সাবধানতার দরকার। এ-ভাবে কাজটি আরম্ভ করিলে মিশনরীরা কিছুতেই ইহাতে প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ পাইবেন না।

আমাদের মধ্যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের কোনো হাঙ্গামা নাই। খ্রীষ্টান, অখ্রীষ্টান এক পরিবারে বাস করে। বাঙালীরা বা অন্য কোনো সমাজ কুকিদের হাতে খাইবেন বা কুকিদের সহিত মেয়ের বিবাহ দিবেন, এরূপ কোন দাবি কুকিরা করে না। দেশের বিশেষ সম্প্রদায় বা কয়েকজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কুকিদের জলগ্রহণ করিলেই কুকিরা খুব উন্নতি করিল, কুকিরা এরূপ মনে করে না। ভিন্ন সমাজ কুকিদের সঙ্গে আজ যে ব্যবহার করিতেছেন, শুদ্ধি করিলে তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হইবে, মনে করি না। লোকসংখ্যায় কুকিরা খুব নগণ্য নহে। কুকিদের যাহা দরকার তাহা কুকিদের মধ্য হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। একবার উপযুক্ত হইয়া গেলে, কোনো ভিন্ন সমাজের উপর একান্ত নির্ভর করার কিছু আবশ্যকতাও থাকিবে না এবং ইহাই প্রকৃত সংস্কার।

কুকিরা একে নিরক্ষর, তাহাতে আবার সভ্যসমাজের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সম্পর্কবিহীন। ইহাদের মানসিক অবস্থা যতদিন না যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে, ততদিন ইহাদের

মধ্যে কোনো প্রকার সংস্কার সম্ভবপর হইবে কি? মন্ত্রদীক্ষা, দেবদেবীর পূজা-উৎসবে একজন দুইজন আকৃষ্ট বা উপকৃত হইতে পারে, কিন্তু ব্যাপকভাবে এগুলির দ্বারা ভাল না হইয়া এখন খারাপই হইবে। হিন্দুধর্ম কৃষ্টির ধর্ম। কোনো একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলে অথবা প্রচারকের রেজিষ্টারীতে নাম লেখাইলেই হিন্দু হওয়া যায় না। হিন্দু কৃষ্টি যে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়া আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতে একটি সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে। সাময়িক উত্তেজনা-গুলির আর একটি দিক আছে—তাহা বিষময় প্রতিক্রিয়া। আজকাল আমাদের মধ্যে বহুলোক খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুভাবে জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদিগকে শুদ্ধি বা এরূপ কিছু আমরা কখনও করি নাই,—ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে ইহার কোনো আবশ্যকতাও ত অনুভব করিতেছি না।

শুদ্ধি বা এরূপ কোনো আন্দোলনের বিরোধী আমি মোটেই নই। তবে আমার মনে হইতেছিল ব্যাপক-ভাবে কুকিদের মধ্যে এই-সব আন্দোলনের সময় এখনও আসে নাই। আমি যাহা বুঝিতেছি তাহাই অভ্রান্ত সত্য বা একমাত্র পথ, আমি এরূপ মনে করি না। আমি নিজে একজন কুকি এবং আমি কিছুদিন যাবৎ কুকি জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা ও চিন্তা করিতেছি। আমার চিন্তাধারাতে প্রকৃত পন্থা নির্ণয়ে যদি কিছুমাত্রও সহায়তা হয়, তবেই কৃতার্থ মনে করিব। আমি কোনো বিশেষ মতবাদের বা অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, বিরোধী বা গোঁড়া বলিয়া মনে করি না। সাকার হউক, নিরাকার হউক, যে-কোনো ভারতীয় ধর্মই হউক না কেন, আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য আমি ভারতীয় সমুদয় ধর্মকেই হিন্দুধর্ম মনে করি। দেশ কাল ও পাত্রবিশেষে প্রত্যেক ধর্মই সত্য ও সমান। "একমাত্র আমার ধর্মই সত্য এবং অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা" এরূপ কথা আজকালকার যুগেও যিনি প্রচার করিবেন, তিনি হাঁটিয়ে কিছুদিন বায়ুপরিবর্তন করিয়া আসিলে তাঁহার পক্ষে ও দেশের পক্ষে প্রভূত মঙ্গল হয়। আমরা চাই আদর্শটি লাভ, তাহা যে প্রকারেই হউক। যিনিই ইহার প্রকৃত পন্থা নির্দেশ করিয়া আমাদের মহৎ উপকার করিবেন, তিনি সত্যই আমাদের পরম বন্ধু।

সংস্কার দুই প্রকার—স্থায়ী বা নিরপেক্ষ সংস্কার, সাময়িক বা আপেক্ষিক সংস্কার। যে-সংস্কারের দ্বারা মানব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, মানব,- মানব হয়, তাহাই স্থায়ী সংস্কার। ইহা সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে সমান ও অপরিবর্ত্তনীয়। মদ্য মাংস ত্যাগ বা গ্রহণ, বাল্যবিবাহ দেওয়া বা বন্ধ করা, পতিত জাতিকে স্পর্শ করা বা না-করা, মহিলাগণকে পর্দ্দার ভিতরে রাখা বা না-রাখা, অথবা পর্দ্দা সহ-ই বাহির করা—এগুলি সম্বন্ধে কোনো সনাতন নিয়ম হইতে পারে না। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এগুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এগুলির নাম আপেক্ষিক সংস্কার। এগুলি মূল সংস্কারের বিঘ্ন বা সহায়ক মাত্র। কিন্তু অনেকেই এগুলিকে মূল সংস্কার ভাবিয়া ভুল করেন।

ভারতের হিন্দুসমাজগুলির মধ্যে কোথাও মৎস্যাহার চলে, কোথাও তাহা অভক্ষ্য। কেহ শ্যালীকে বিবাহ করেন, কেহ তাহা মহাপাপ মনে করিয়া মামাতো বোনেরই পাণিগ্রহণ করেন। কেহ জাতিভেদ মানেন, কেহ মানেন না। কেহ কুক্কুট বা শূকর মাংস পরিতৃপ্তির সহিত আহার করেন, কাহারও নিকট তাহা অতি নিষিদ্ধ। অধিকাংশ লোকেরই নিজের আচারপদ্ধতির সম্বন্ধে একটু গোঁড়ামি থাকে। কিন্তু সংস্কারক যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি হইতে মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। একবার কয়েকজন মৌলবী পাহাড়ীদের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিতে যান। গ্রামবাসীর নিকট, ইস্‌লামের একমাত্র সত্যতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে বহুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া তাঁহারা গ্রামবাসীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কুকিরা বলিল,—"আমরা শূয়র ছাড়িতে পারিব না, সুন্নৎ করিতে পারিব না। এ দুটি ছাড়া মুসলমান করিতে পার ত কর।" মৌলবীরা তোবা তোবা বলিয়া সেদিন-যে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, আর পাহাড়মুখী হন নাই।

শূকর মাংস খাইয়া ও সুন্নৎ না করিয়াও যদি মুসলমান হইবার চালিস থাকিত, তবে হয়ত বহু পার্ব্বত্যবাসীকে আজ মুসলমান দেখা যাইত।

শিক্ষার অভাবই আজ কুকিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভাব। কুকিরা নিজেও এই অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিতেছে। মিশনরী বিদ্যালয় ছাড়া পাহাড়ে অন্য কোনো বিদ্যালয় নাই। মিশনরীরা বেশী শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করেন না। অবশ্য মিশনরীরা বৃত্তি দিয়া বৎসর বৎসর গুটিকতক বালককে হাই স্কুলে পাঠান। তাহারা পরে মিশনরীদের পাস্তর বা ডাক্তার কম্পাউণ্ডার হয়। যদি কুকিদের মধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার ভার ভারতীয়দের উপর দেওয়া যাইতে পারিত তবে যথার্থ কাজ হইত। নিজেরা না বলিলেও কুকিরা হিন্দুই। এই হিন্দু আত্মবোধ কুকিদের মধ্যে জাগাইতে হইবে। প্রাচীন কীর্ত্তিতে গৌরবে ভারত জগতের শীর্ষস্থানে, ভারতে বাস করিলেও, ভারতের লোক হইলেও ভারতের মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করেন না। ভারতের মহাপুরুষদের পূতজীবনী, বীরদের কীর্ত্তিকাহিনী, পৌরাণিক ধর্ম্মকথা, আর্য্যদের যশোগাথা কুকিদের মধ্যে প্রচার করিতে পারিলে কুকিদের যথার্থ উপকার হইত।

ব্যাপকভাবে সমগ্র কুকি জাতির একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা,—বাংলা ভাষা শিক্ষা করা। বাংলা শিখিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও মামলা-মোকদ্দমার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয় এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকিবে। আর একটি মজার কথা যাহারা চেষ্টা করিয়াও সামান্য বাংলা শিখিতে পারিয়াছে, তাহারা খৃষ্টান হয় না কেহ কেহ বলেন, এই কারণেই মিশনরীরা তাহাদের বিদ্যালয়ে বাংলা শিখাইতে বড় নারাজ। ব্যাপকভাবে বাংলা শিক্ষা দিতে পারিলে কুকিদের যথার্থ উপকার হইত। বাঙালীদের কুকিরাজ্যে প্রবেশ একপ্রকার নিষেধ। কিন্তু বাংলা শিক্ষারূপ পন্থাদ্বারা বাঙালীরা সহজেই কুকিদের মনোরাজ্য জয় করিতে পারিবেন। বাংলার মত একটি উন্নত ভাষার মানসিক সম্পদের অধিকারী হইতে পারিলে বাস্তবিকই কুকিদের উন্নতি হইত। দেশী সমস্ত নষ্ট করিয়া বিদেশী প্রবর্ত্তনের জন্য মিশনরীদের একটি অত্যধিক ঝোঁক আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কুকিভাষার কোনো নিজস্ব বর্ণমালা নাই। মিশনরীগণ রোমান বর্ণমালায় কুকি-ভাষার বই ছাপিতেছেন ও প্রচার করিতেছেন এবং তাহাদের বিদ্যালয়েও এইরূপ শিক্ষা দিতেছেন। বাংলা অক্ষরে কুকিভাষা ভাল লেখা হয়। বাংলা অক্ষরে লিখিলে জাত যাইত না-কি? বাংলা অক্ষরে কুকিভাষায় বাংলা শিক্ষার জন্য ও অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক আমি প্রস্তুত করিয়াছি। জানি না কতদিনে উহা মুদ্রাযন্ত্রে শোধিত করিয়া উঠিতে পারিব। রোমান বর্ণমালা খাসিয়া পাহাড়ের মত আমাদের মধ্যে এত প্রচার এখনও হয় নাই। মাত্র বাইবেল ও দু-একখানা চার্চ্চের গানের বই প্রকাশিত হইয়াছে এখনও চেষ্টা করিলে বর্ণমালা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলা যাইতে পারে।

পরিশেষে, শিলচর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উল্লেখ না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই আশ্রম কুকিদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শিলচর একটি ক্ষুদ্র শহর, তাহার আশ্রম খুব বড় নয়। আশ্রমের সঙ্গতি অনুসারে তাঁহারা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের সমুদয় জাতি বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ। আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস আছে। তাহাতে কয়েকটি বাঙালী ও কুকি ছাত্র থাকিয়া স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করে। খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান যাহারাই একবার এই আশ্রমের সংস্পর্শে গিয়াছে সকলেই আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীদের যত্নে ও উদারতায় আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছে। শুধু এই আশ্রমের জন্যই আমাদের খ্রীষ্টান কুকিরা আজকাল ভাবিতে শিখিয়াছে—"জগতে শুধু খ্রীষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম নহে।"

এই আশ্রমের কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দোষ, নিরপেক্ষ গঠনমূলক বলিয়াই আমরা মনে করি। এদিকের কুকিদের মধ্যে এই আশ্রমের একটি বিশেষ প্রভাব দেখা যায় আশ্রমের ছাত্রাবাসে বালকেরা বিদ্যালয়ের লেখাপড়া

১। সপরিবারে একজন দেশী পাত্রী সাহেব। ইনি কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে ধর্ম্ম দান করেন।

২। পাঁচ বৎসর বয়সের কুকি খ্রীষ্টান বালক সিগারেট অভ্যাস করিতেছে।

৩। মিশনরীদের অধীন থাকিয়া এই কয়টি পার্ব্বত্যজাতীয় বালক শিলচর হাইস্কুলে পড়াশুনা করিতেছে।

৪। পাহাড়ে মিশনরীদের একটি বাংলো।

৫। পাহাড়ে একটি কুকি গ্রাম।

৬। একটি কুকি-বৃদ্ধ দেশীয় বাঁশের হুঁকায় তামাক খাইতেছে। তাহার হাতে শিকারের বর্শা।

৭। শিলচর রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনটি কুকি বালক।

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতেছে, ভারতীয় পোষাক, খাদ্য, আদবকায়দায় অভ্যস্ত হইতেছে। বাঙালী ও কুকিবালকেরা একসঙ্গেই বাস করিতেছে। শুধু বালকেরা নয়, বালকদের অভিভাবক আত্মীয়কুটুম্বরাও আশ্রমে গেলে বিশেষ আদরযত্ন পাইয়া থাকেন। ইহাতে বাঙালীর প্রতি কুকিদের কুধারণা দূর হইয়া ক্রমশঃ একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিতেছে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিলচর রামকৃষ্ণ আশ্রমে পদার্পণ করিয়া, কুকি বালকদের মধ্যে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি প্রবাসীতে দুইবার এই আশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। আজকাল চারিদিক হইতে বহুসংখ্যক কুকিবালক এই আশ্রমে আসিবার জন্য আবেদন করিতেছে। কিন্তু আশ্রমের অর্থসামর্থ্য সেরূপ না থাকাতে তাঁহারা বেশী ছাত্র রাখিতে পারেন না। এই ছাত্রাবাসের কার্য্য-প্রণালীটি বড় সুন্দর। প্রত্যেক বৎসরই কয়েকটি বালক সেখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে যাইতেছে, আবার নূতন ছাত্র তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সর্ব্বদা আশ্রমে বাস করাতে কুকি-বালকদের চরিত্র, চালচলন অতি-মার্জ্জিত ও চমৎকার হইয়া উঠিতেছে। আমি নিজেও শিক্ষা সম্বন্ধে এই আশ্রম হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। গত পৌষ মাসের ভারতবর্ষে দেখিলাম খাসিয়া পাহাড়েও এই রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলি ভাল কাজ করিতেছে।

আমাদের বিপদ আসন্ন, উপায়ও নাই। তাই এই রামকৃষ্ণ আশ্রমের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া আমি দেশবাসীর নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। এই রামকৃষ্ণ আশ্রম যেভাবে কার্য্য করিতেছেন, সেই ভাবেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে আশু-কল্যাণ আশা করা যায়।

আমার পূর্ব্ব দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর হইতে বহুব্যক্তি আমাকে পত্রদ্বারা নানা উপদেশ, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়াছেন। সকলের উত্তরই অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। কেহ কেহ আমাকে লিখিয়াছেন,—আমার লেখার ভাষা না-কি চমৎকার এবং ইহা আমার নিজের লেখা কি-না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি কি বলিব? লেখার পরীক্ষা দিবার জন্য বা কোনো রকম বাহাদুরী করিবার জন্য আমি প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করি নাই। আমার লেখার ভালমন্দ ও ক্ষমতার বিচার না করিয়া পাঠকগণ কুকিদের কথা ভাবিতেছেন দেখিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।

কুকিদের সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা এখানে শেষ করিলাম। অরণ্যবাসী হইলেও আমি রোদন করিতেছি দেশের মহাপ্রাণ মনীষিগণের নিকট। এই নিরাশ্রয়, কুপথগামী, নাবালক জাতি দেশবাসীর নিকট হইতে তাহাদের মুক্তির সন্ধান অচিরেই পাইবে,—এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না কি?

ব্রুসেলে শতবার্ষিকী উৎসব

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেন

এই উৎসবের কথা বলিতে হইলে আমাকে প্রথমত বেলজিয়মের ইতিবৃত্তের গোড়ার কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পঞ্চম চার্লস্ স্পেনের রাজা ও জার্ম্মেনীর সম্রাটরূপে সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডে প্রভূত পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বেলজিয়মকে "প্রভাঁস বেলজিক্" বলা হইত। পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে উহা অষ্ট্রীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু তাহার পরে আবার ফরাসীদের অধিকারে চলিয়া যায়৷ তার পর ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় হইলে বেলজিয়ম নেদারল্যাণ্ডস্ অর্থাৎ হল্যাণ্ডের অধীনে আসে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হল্যাণ্ড-রাজ উইলিয়মের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেলজিয়মের প্রধান নগরী ব্রুসেলে খুব বিরাট আয়োজন হয়। কিন্তু বেলজিয়মের জনসাধারণ হল্যাণ্ড-রাজের শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। আর্থিক ও ব্যবসায় বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা এবং উচ্ছৃঙ্খল-শাসনই এই রাজদ্রোহিতার কারণ। ষড়যন্ত্র-কারিগণ প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিতা করিবার জন্য একটা উপলক্ষ্য মাত্র খুঁজিতেছিল এবং এই জন্মোৎসব ব্যাপারই উহা যোগাইয়া তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রদান করিল।

তুইদিনব্যাপী উৎসবের কথা জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু উৎসবের প্রথম দিন আর একটি নূতন বিজ্ঞাপনের উপর জন-সাধারণের দৃষ্টি পতিত হইল। প্রতি রাস্তায়, আলোকস্তম্ভ-সমূহে, বৃক্ষশাখায়, অট্টালিকার প্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে লিখিত সেই রঙীন বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে লেখা ছিল :—

"Aujourd'hui—grand-bal. Demain—feu d'artifice Apres demain—revolution."	অদ্য বল-নাচ; আগামী কল্য বাজি-পোড়ান; পরশ্ব বিপ্লব।

উৎসবের দিন এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন যদিও জন-সাধারণের ও রাজকর্ম্মচারীদের মনে বিশেষ কোনো সন্দেহ আনিতে পারে নাই এবং যদিও রাজকর্ম্মচারীরা ইহাকে পাগলের বা দুষ্ট লোকের কাজ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তবুও অধিকাংশের মনেই একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। সকলে তখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা—নাচ, গান, আমোদ-আহ্লাদ সর্ব্বত্র অফুরন্তভাবে চলিতে লাগিল। অপূর্ব্ব আলোকমালায় বিভূষিত সমস্ত শহরের কোথাও বিষাদের ছায়া পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রথম দিন বেশ কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনও ভাল ভাবেই গেল। তার পর তৃতীয় দিনও যখন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, তখন মানুষের মনে বিন্দুমাত্রও যা সন্দেহ ছিল তাহাও দূর হইয়া গেল। ক্রমে চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, ষষ্ঠ দিন, এক সপ্তাহ সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল; তখন ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন প্রচার নিশ্চয়ই কোনো পাগলের কর্ম্ম বলিয়া সকলের ধারণা হইল এবং অবশেষে উহার আলোচনা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই ২১এ সেপ্টেম্বর সকলের ভীতি জন্মাইয়া এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া বিপ্লবীদের কামান রয়েল পার্কে গর্জ্জিয়া উঠিল। ২১এ হইতে ২৩এ পর্য্যন্ত ঐ পার্কে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং ইহারই কয়েকদিন পরে আণ্টোয়ার্পে আর একটি খণ্ডযুদ্ধে ডাচ-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া বেলজিয়ম হইতে বিতাড়িত হয়। এই যুদ্ধই বেলজিয়মের স্বাধীনতা আনয়ন করে। অতঃপর ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্ত্তৃক রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথম লিওপোল্ড বেলজিয়মের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই বেলজিয়মের প্রথম স্বাধীন রাজা।

লিওপোল্ড রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বেলজিয়ম অধিকার করিবার জন্য ডাচ-সৈন্য আবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ব্রুসেলের অতি

১। আর্কাদ দ্য স্যাকান্তেনেয়ার
২। রাজপ্রাসাদ
৩। গ্রাঁ প্লাস—ব্রুসেল
৪। প্যালে দ্যে জুস্টিস্
৫। একটি মিছিলের দৃশ্য
৬। সমুদ্রতীর—অস্টেণ্ড্
৭। লাকেন্ উদ্যান
৮। একটি রাস্তা

নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বেলজিয়ম-রাজ ফ্রান্সের শরণাপন্ন হন। তদনুসারে কয়েক সহস্র সৈন্য প্রেরিত হয়। এই ফরাসী সৈন্যের আগমন-সংবাদ পাইয়া ডাচ সৈন্য আর অগ্রসর হইল না এবং কিছুদিন পরে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইহাই হল্যাণ্ডের শেষ চেষ্টা। ইহার পর হইতে আজ শত বৎসর ধরিয়া বেলজিয়ম স্বাধীন।

প্রথম লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর ১৮৬৫ অব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় লিওপোল্ড নামে বেলজিয়মের সিংহাসনে

সাঁকান্তেনেয়ার—রাত্রের দৃশ্য
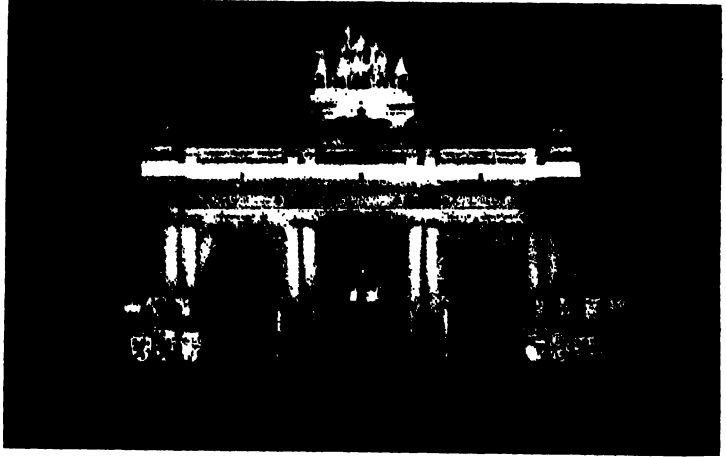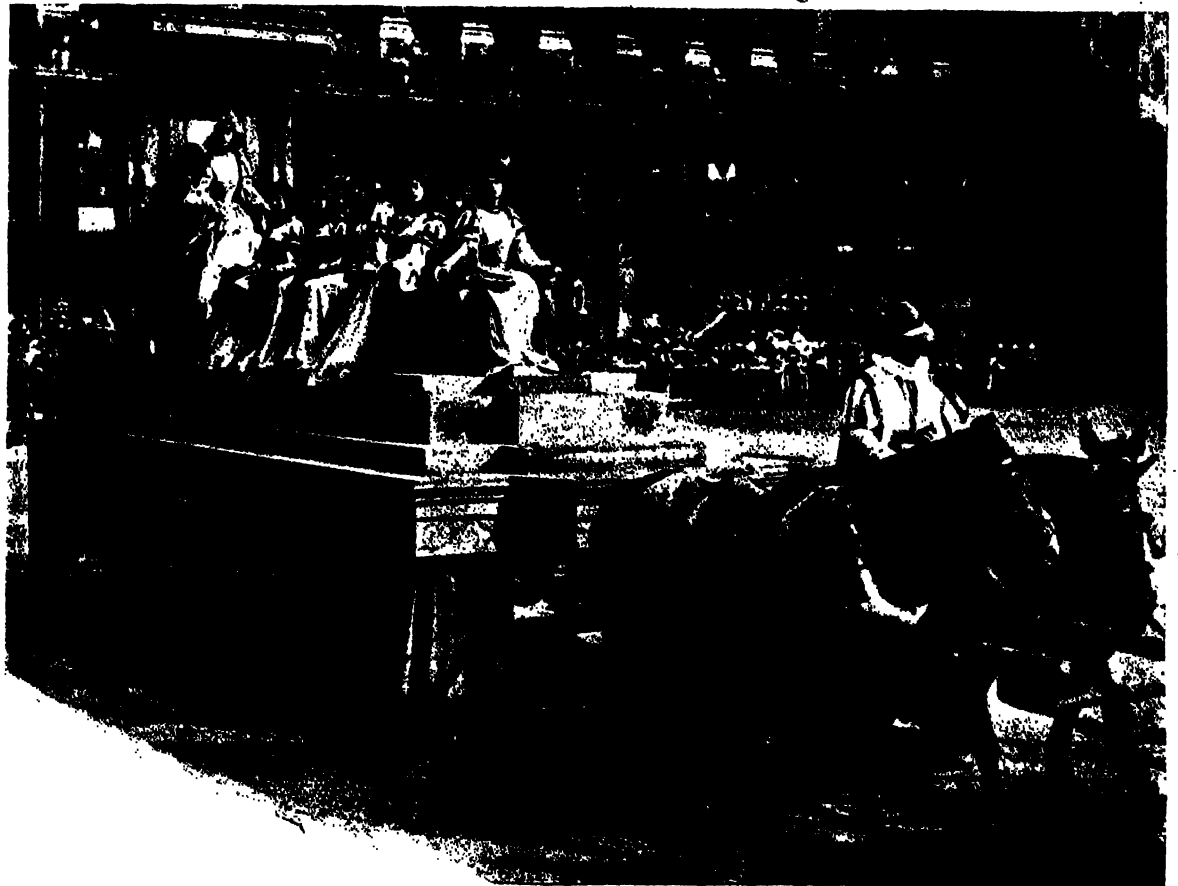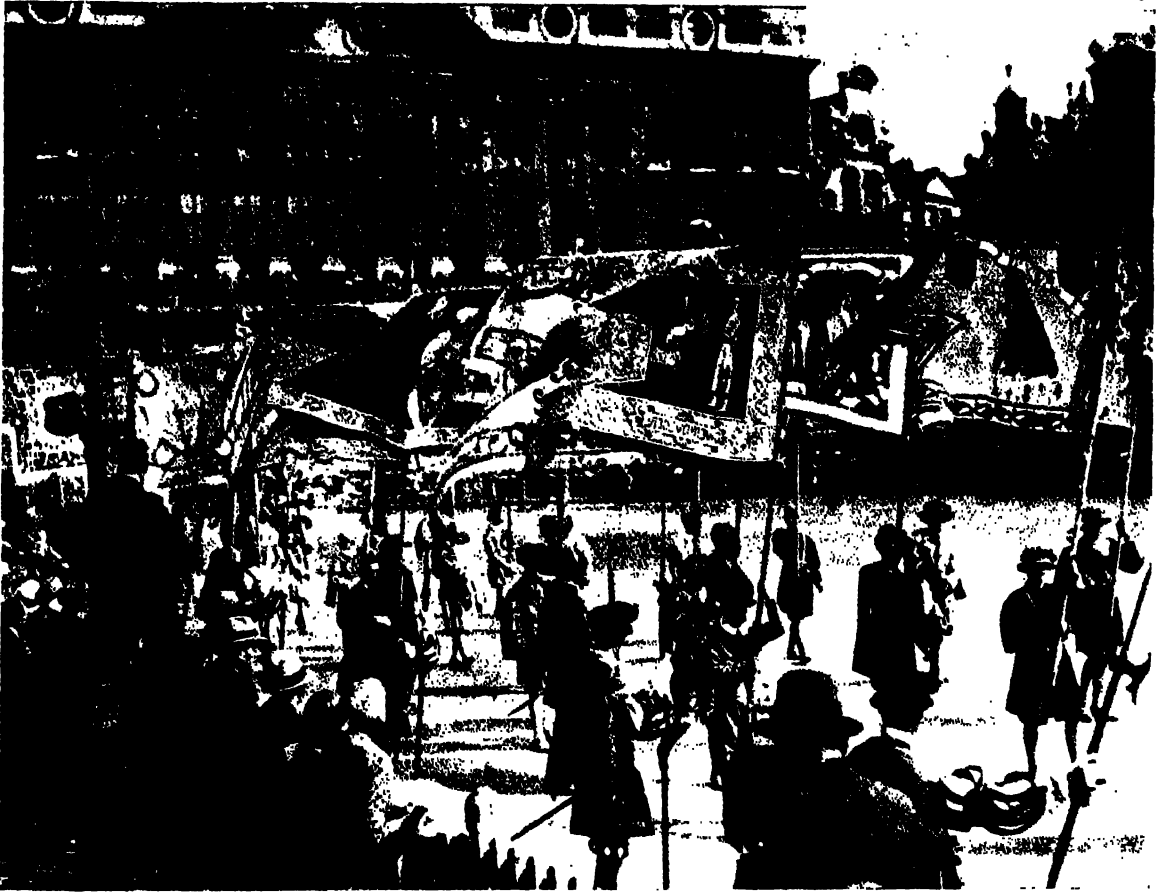
স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

অধিষ্ঠিত হন। রাজা হইয়া ইনি প্রথমত রাজ্য বিস্তৃতির দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তৎপর বহু লোক-হিতকর কার্য্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে আফ্রিকার কঙ্গো দেশ বেলজিয়মের অধিকারে আসে। "অধিকার" কথাটি এখানে যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিতেছে না, কারণ এই কঙ্গো দেশ বেলজিয়ম-রাজের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। তিনি উহা নিজ অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন। বেলজিয়মের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি তাহা বেলজিয়ম-বাসিগণকে উপহার দেন। কঙ্গো দেশের মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ বেলজিয়মের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতিবিধান করে এবং এখনও করিতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কঙ্গো বেলজিয়মের উন্নতি ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। দ্বিতীয় লিওপোল্ডই বিশ্ববিখ্যাত "Palais du Justice" নির্ম্মাণ করেন। ইহা সমগ্র ইউরোপের মধ্যে বৃহত্তম অট্টালিকা। অ্যাণ্টোয়ার্পের বন্দরকে তিনি আরও বৃহৎ আকার দান করেন এবং বহু বুলভার (দুই পার্শ্বে সারি সারি বৃক্ষসমন্বিত বিস্তৃত রাজবর্ত্ম) নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ব্রুসেল্‌সকে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে প্রধান ও সুন্দরতম রাজধানী করিয়া তোলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উৎসব হয় এবং তাহার স্মরণার্থ Cinquantenaire নির্ম্মিত হয়। স্যাঁকাস্তেনেয়ার কথাটির অর্থ পঞ্চাশ বৎসর। বেলজিয়মের ইতিহাসে
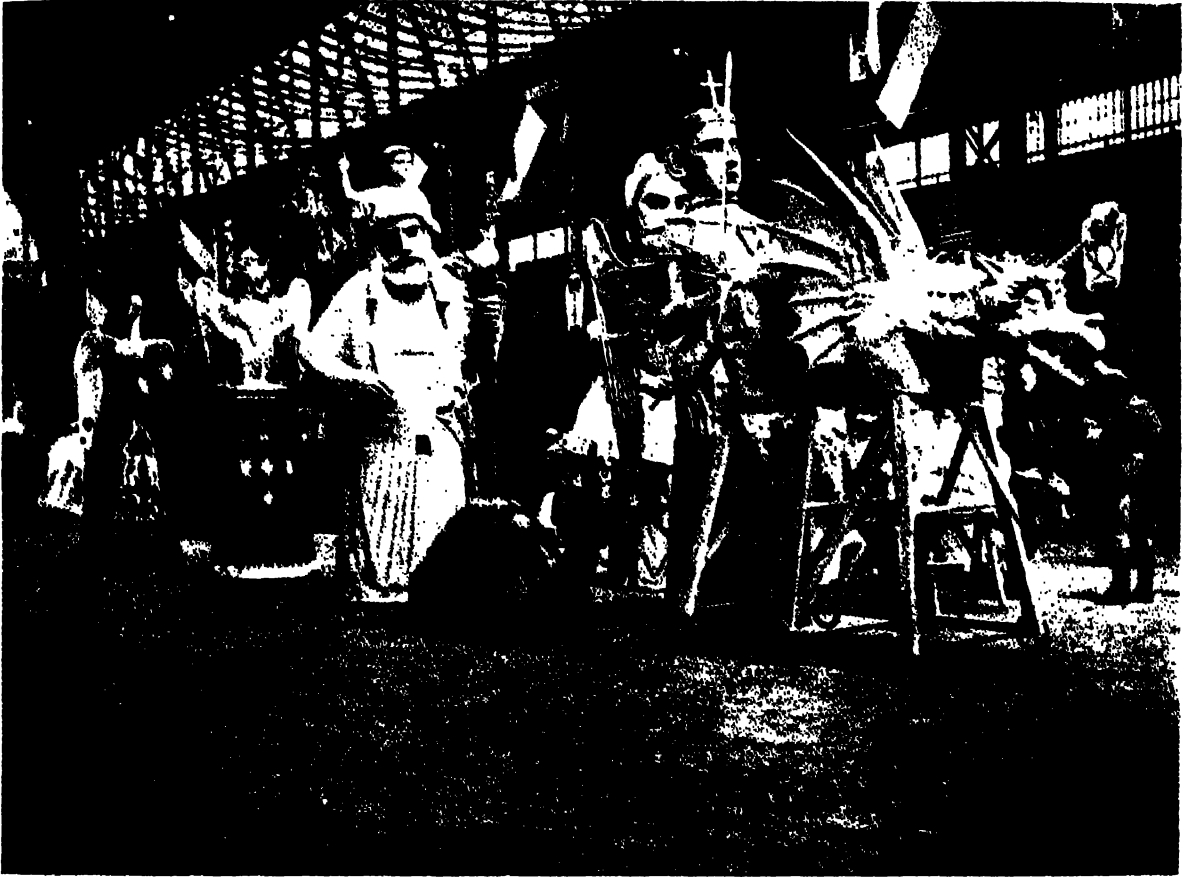
স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

দ্বিতীয় লিওপোল্ড চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কোনো এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমাহত হইয়া নিহত হন। সুতরাং দ্বিতীয় লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর (১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৯) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্বার্ট বেলজিয়মের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনিই বেলজিয়মের রাজা। এই দেশের শতবর্ষের ইতিহাস দুই চারি কথাতেই শেষ করিলাম।

বেলজিয়মের "স্বাধীনতার শতবার্ষিকী" উৎসব রাজধানী ব্রুসেল নগরে বর্ত্তমানে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। শিক্ষার্থী-হিসাবে এই সময়ে এখানে অবস্থিতি করা হেতু আমি এই বিরাট উৎসব দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

এই উৎসবের জন্য ব্রুসেলকে নববধূর ন্যায় নানাবিধ অলঙ্কার ও মাল্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। সাজসজ্জার প্রধান উপকরণ পুষ্পমাল্য ত আছেই, উপরন্তু অগণিত জাতীয় পতাকার মাল্য, বিজলী আলোকের মাল্য এবং রঙীন কাগজের মাল্যাদি উৎসবের সুষমাবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বত্র একটা প্রবল উদ্দীপনা জাগাইয়া দিয়াছে। বড় বড় রাস্তার সঙ্গমস্থলের মধ্যভাগে বিরাট কাষ্ঠস্তম্ভ নানারূপ কারুকার্য্যসমন্বিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া মস্তকে প্রকাণ্ড জাতীয় পতাকা বহন করিতেছে। প্রতি অট্টালিকার বাতায়নে
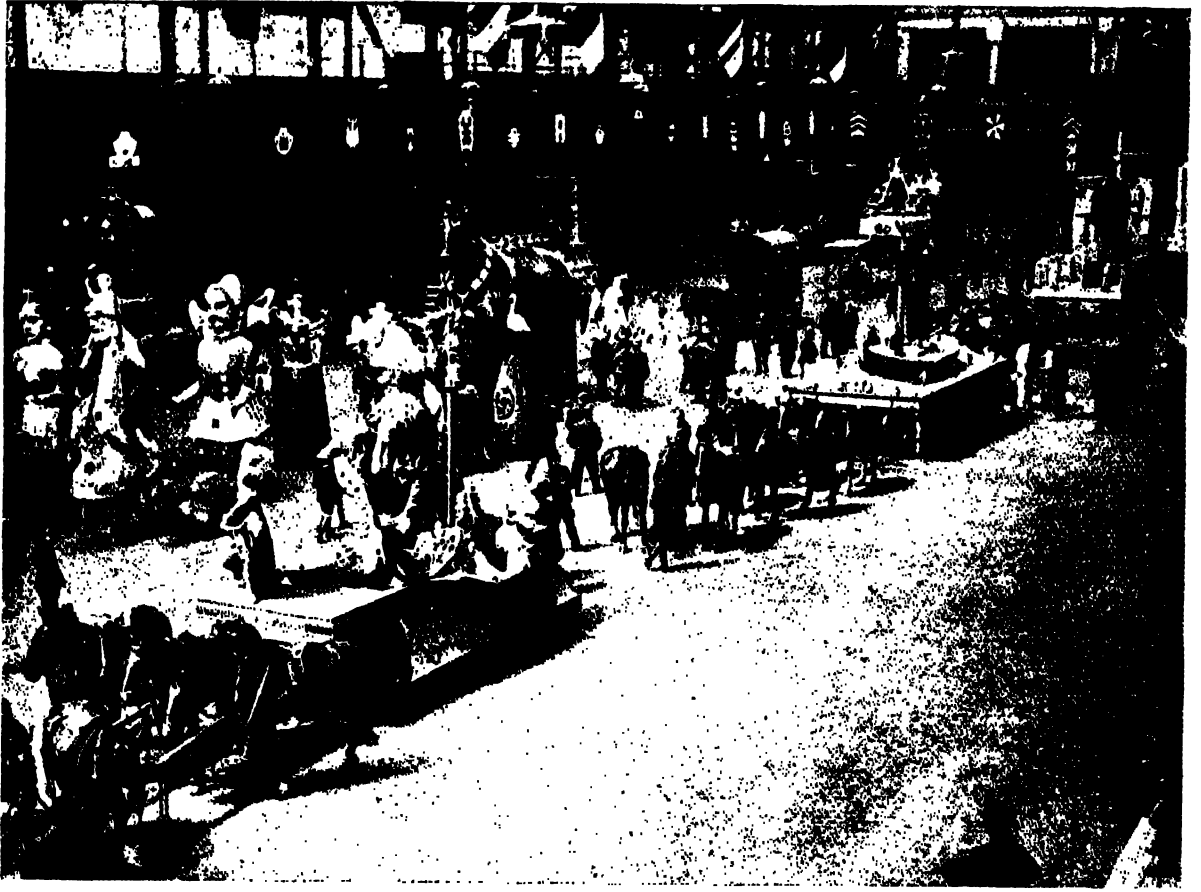
স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

মনোমুগ্ধকর পুষ্পনিচয়ের শোভন-সন্নিবেশ দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। দিবাপেক্ষা রাত্রিকালে উহাদের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পায়। বিচিত্র আলোকে আলোকিত পথ ও সৌধসমূহ, রেডিও নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত ও ঐকতানবাদ্য, বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ, এই সমস্ত উৎসবটিকে প্রকৃতই আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। ৪ঠা আগষ্ট হইতে আলোক দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৩০) শেষ পর্য্যন্ত এই প্রকার আলোকমালায় শহরটিকে আলোকিত রাখা হইবে।

৪ঠা আগষ্ট তারিখেই উৎসবের প্রথম মিছিল বাহির হয়। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ও কলিকাতার জেলেপাড়ার সঙের সহিত ইহার কতকটা তুলনা চলে। জন্মাষ্টমীর মিছিলের ন্যায় এই মিছিলে নানা-প্রকার চৌকী বা গ্যালারি প্রদর্শন করা হয়। বেলজিয়মের এক এক বিভাগ হইতে এক একটি চৌকী এই প্রদর্শনীতে বাহির করা হইয়াছে।

প্রথম দিন আমার বন্ধুবর মিঃ রুডলফ ক্রেভ ও তাঁহার ভগিনী মিস মার্গা ক্রেভের সহিত আমি এই মিছিল দেখিবার জন্য বাহির হইতে বেশ একটু দেরি করিয়া ফেলিয়াছিলাম। রাস্তায় আসিয়া চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে প্রথমত একরূপ হতাশ হইতে হইল। মিছিল উপলক্ষে ব্রুসেলের লোকসংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে; প্রতি বিভাগ হইতে ছোট বড় সব রকম লোকই এখানে আসিয়াছে। অনেকে বেলা ১২টার সময় হইতে জায়গা

স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

দখল করিয়াছে। আমরা যখন বাহির হইলাম তখন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। তখন ভাল ভাল সকল স্থানই দখল হইয়া গিয়াছে। যেখান হইতে মিছিল ভাল করিয়া দেখিতে পারি আমরা এমন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। মিঃ ক্লেভ্ এবং আমি কয়েকদিন পরেও এই মিছিল দেখিতে পাইব, কারণ উহা আরও আট দশবার প্রদর্শিত হইবে এবং আমরা দু'জনেই ব্রুসেলে অবস্থিতি করি। কিন্তু মিস্ ক্লেভ থাকেন বার্লিনে—এখানে মাত্র দু-এক দিন অবস্থান করিবেন। সুতরাং তাঁহার এবার মিছিল দেখা না হইলে আর দেখা হইবে না। তিনি শুধু এই মিছিল দেখিবার মানসেই সুদূর জার্ম্মেনী হইতে এখানে আসিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে উহা দেখাইতে না পারিলে বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে। খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া মতলব স্থির করিলাম। আমাদের ইউনিভারসিটির ফিলম কেমেরাটি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার নিকটেই ছিল। আমরা তখন "ফার্ষ্ট বেল্‌জ" নামক একটি ঐতিহাসিক ফিল্‌ম তুলিতে ব্যস্ত ছিলাম এবং আমাদের ষ্টুডিও আমার বোর্ডিং বাড়ির খুব নিকটেই ছিল বলিয়া আমার কাছে ক্যামেরা ইত্যাদি রাখা হইত। আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ঐ ক্যামেরাটি লইয়া আসিলাম এবং তারপর তিন জনে মিলিয়া এক চৌরাস্তায় উপস্থিত হইলাম। আমি আমার ইউনিভারসিটি কার্ড এবং ক্যামেরাটি একজন সার্জ্জেন্টকে দেখাইয়া বলিলাম, "পারি কি?" তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গীদিগের প্রতি একটু জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি তাঁহার একটু কাছে গিয়া এক চক্ষু

স্বাধীনতা উৎসবের মিছিল

টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আমারই সঙ্গীরা।" আর কোনো বাধা বা অসুবিধা রহিল না।

আমরা তখন রাস্তার ভিড় হইতে সরিয়া গিয়া একটি আলোকস্তম্ভের বাঁধানো বেদীর উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। ঐ স্থানটি ছবি তুলিবার পক্ষে অতি চমৎকার। তখন আমার খুবই দুঃখ হইল; কারণ আমার ক্যামেরায় এক ফুট পরিমাণ লম্বা ফিল্‌মও ছিল না। কিন্তু ফিল্‌ম না থাকিলেও আমাকে অনবরত কেমেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ছবি তুলিবার অভিনয় করিতেই হইবে, নতুবা সেখানে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিবার এমন সুন্দর সুযোগ আমাদের কিছুতেই হয় না। আমার এই ছবি-তোলার ব্যাপারটি বেশ আমোদজনক হইয়াছিল। প্রথমেই সার্জেণ্ট সাহেবকে আমার ক্যামেরার সম্মুখ দিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলাম। তিনি তদনুসারে সম্মুখভাগে আসিয়া একটুখানি অঙ্গভঙ্গী করিয়া গেলেন এবং পরে ক্যামেরার রেঞ্জের বাহিরে গিয়া আমার দিকে তাকাইয়া একটুখানি হাসিলেন। বুঝিলাম মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফিল্‌মে ছবি উঠাইবার সখ কাহারও কম নয়। আমার ক্যামেরার সম্মুখে কোনো চৌকী আসিলেই শত শত বিম্বাধর হইতে হাসির ঝরণা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণেরই "Cinema star" হইবার আগ্রহ বেশী। তাহাদের মধ্যে একজন স্থূলাঙ্গিনীর অভিনয় একটু উল্লেখ-যোগ্য। তিনি আমার ফিল্‌ম ক্যামেরা দেখিয়া এতই উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন যে, শুধু হাসির ঝরণা বিলাইয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—দুই হাতে চুম্বন ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক মহিলা

তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। সেই মহিলাটি এত মোটা ছিলেন যে, আমি তাহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। অতিরিক্ত স্থূলদেহের পার্শ্বে দুইটি হস্ত আবার অতিরিক্ত ছোট। ঘাড় বলিতে আধ ইঞ্চি আছে কি-না সন্দেহ।

এইভাবে প্রথম দিনের মিছিল দেখা হইল। ইহার পরের মিছিলের দিন আমাদের ইউনিভার্সিটি হইতে ছবি তুলিবার আদেশ হইল। কয়েকটি চৌকীর নাম আমার মনে আছে। তাহা এই :—"Civilization of Congo", "the Moon", the Rainy Season", "Omegau" ইত্যাদি। তার পরে "কর্টেজ লুমিন" অর্থাৎ আলোকিত মিছিল বাহির হইল। তাহাতে "the Golden Electricity", "Television," "To-day and Yesterday" প্রভৃতি অনেকগুলি চৌকী প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সমস্ত মিছিল সর্ব্বপ্রথমে ব্রুসেলে প্রদর্শিত হয় এবং পরে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয় এই উৎসব আজিও শেষ হয় নাই। আগামী ২১এ সেপ্টেম্বর প্রধান উৎসবের দিন—ঐ দিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিছিল বাহির হইবে।

এই উৎসবের জন্য বেলজিয়মের প্রতি প্রদেশ হইতেই দুই-একটি করিয়া চৌকী প্রেরণ করা হইয়াছে। সেগুলি একদিনে দেখানো অসম্ভব বলিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে—শেষ মিছিলের দিন ২৮এ সেপ্টেম্বর। মিছিলের প্রত্যেকটি চৌকীরই একটু ইতিহাস আছে। আমার সবগুলি জানা নাই।

তিনকড়ি-চরিত

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা

তিনবারের বার জেল খাটিয়া যখন তিনকড়ি বাহির হইল তাহার পূর্ব্বেই তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন বুড়ী মাসী ধনমণি জলে ডুবিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছিল। ফটকের বাহিরে বন্ধু মদন ময়রার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া তিনকড়ি আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। ফটকের জমাদার হাঁকিল, "ভাগো হিয়াসে!" উল্লাসে বাধা পাইয়া তিনকড়ি দুই পাটি দাঁতের সহিত বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি জমাদারকে প্রদর্শন করিয়া সদর রাস্তায় উঠিয়া আসিল। জমাদার রাগে জ্বলিয়া বদ্ধমুষ্টি হইয়া ছুটিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সহসা পিছনে জুতার শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—ইন্‌স্পেক্টার সাহেব! অগত্যা জমাদার রাম-ভরোস সিং তিনকড়ি বেহারার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি হজম করিয়া অন্তরে জ্বলিতে লাগিলেন।

ইহার পর দুই বন্ধুতে গোপন পরামর্শ হইয়া সাব্যস্ত হইল যে, অতঃপর আইনসঙ্গতভাবে জীবনযাপন করাই সুযুক্তি।

২

শীতের প্রভাব। ছোট শহরের বাজার, বাজারের পাশ দিয়া নদী। নদীটির ধারে বাঁধানো বটগাছের তলায় তখনও সাধুদের ধুনী জ্বলিতেছে। তিনকড়ি সেখানে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল। জটাধারী প্রভু চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "কেয়া বাবা?"

জেলের মধ্যে তাহার কয়েদী বন্ধু ভজন পাঁড়ের সহিত তিন বৎসর একত্র বাসের ফলে হিন্দী ভাষার সহিত তিনকড়ির একরূপ পরিচয় হইয়াছিল, সে দুই হাত জোড় করিয়া জটাধারী বাবার পায়ের কাছে মাথা

ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল, "অধম হ্যায়। অশরণ হ্যায়—"

জটাধারী প্রভু একমুঠা ছাই লইয়া তিনকড়ির কপালে মাখাইয়া দিয়া কহিলেন, "জীতা রহো!"

সমবেত সাধুরা "সীতারাম! সীতারাম!" বলিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন। তিনকড়ির দীক্ষা হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় জটাধারী বাবা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, তিনকড়ি যুক্তকরে শুনিতেছিল। দুইজন সাধু কোনো মাড়োয়ারীর গদী হইতে সেদিন কিরূপ সিধা আসিয়াছে তাহারই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল এবং দুইটি বালক সাধু দিস্তাখানেক আটার রুটী ঘৃতসিক্ত করিতেছিল। উপদেশ শেষ করিয়া সাধু বাবা কহিলেন, "দুনিয়ামে ইয়ে অমৃত হ্যায় বাবা।" ভক্ত তিনকড়ি ঘৃতসিক্ত রুটীর দিস্তার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া ভক্তি-সরস কণ্ঠে কহিল, "হাঁ বাবা।"

৩

দিন-পাঁচেকের মধ্যেই তিনকড়ি বুঝিল যে, আইন-সঙ্গতভাবে জীবন যাপন করিবার শিক্ষা তাহার একরূপ আয়ত্ত হইয়া গেছে। প্রথম দিন বহুদিন-কার অনভ্যস্ত অভ্যাসটি প্রভুর সেবা জোগাইতে জোগাইতে তিনকড়ি ঝালাইয়া লইল। প্রথম প্রথম গঞ্জিকার গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হইতেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা-নাগাদ সেটা সহিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন এক ভক্ত গুজরাটী ঠিকাদার রেলের একটা নূতন পুলের ঠিকা লইয়া জটাধারী বাবার কাছে ভাগ্য-গণনা করাইতে আসিয়াছিলেন। সে-সময় তিনকড়ি উপস্থিত ছিল। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে জ্যোতিষ-বিদ্যায় তাহার প্রচুর জ্ঞান জন্মিয়া গেল। তৃতীয় দিন চটকলের কুলীর দলের ছুটি ছিল। তাহারা তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়া সন্ধ্যায় প্রভুর নিকট সীতারামজীর ভজন শুনিতে আসিয়াছিল। জটাধারী বাবা "যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম" এই দোঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিন টাকা সাড়ে দশ আনা প্রণামী বুঝিয়া লইলেন। তিনকড়ি দোঁহাটি কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া বুঝিল যে কাজ চলিবার মত সীতারাম-তত্ত্ব তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। চতুর্থ দিন তিনকড়ি শিখিল জটাতত্ত্ব। নদীতে স্নান করিবার সময় একটি বালক জটাধারীর জটা অকস্মাৎ স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া পুঁটুলি খুলিয়া ভেড়ার লোম বাহির করিল ও তাহাতে আঠা ও ময়দা জুড়িয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই হাত লম্বা এক জটা বানাইয়া ফেলিল। পঞ্চম দিন জটাধারী প্রভু অতি সঙ্গোপনে কিরূপে তামা সোনা হইতে পারে, এ-সম্বন্ধে এক মাড়োয়ারী ভক্তকে উপদেশ দিতেছিলেন। এই ভক্তটি মাসাধিক কাল হইতে 'সিদ্ধাই' লাভের আশায় প্রভুর পিছু লইয়াছিলেন। তিন-কড়ি কান পাতিয়া জটাধারী বাবার উপদেশ শুনিল। প্রভু স্বর্ণপ্রস্তুত-প্রণালী কহিয়া চাঁদির টাকাকে মোহর করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। তিনকড়ি শুনিয়া বুঝিল যে প্রভুর নিকট আরও শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিলে অতি শীঘ্রই যেখান হইতে আসিতেছে সেখানেই ঢুকিতে হইবে, অতএব সে দল ছাড়িল।

দল ছাড়িল রাত্রে। অনেক বিদ্যাই প্রভু তাহাকে শিখাইয়াছিলেন। সে তাহার বহুকালের অধীত বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রভুকে দিয়া গেল। প্রভু তখন সশিষ্য গভীর সুপ্তিমগ্ন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনকড়ি উঠিল। প্রভুর মৃগচর্ম্ম ও চিমটা, একটা কমণ্ডলু ও একখানা কম্বল সংগ্রহ করিয়া কাঁচির সাহায্যে বাবার দীর্ঘ জটাটি কাটিয়া লইল। পরে খানিকটা বিভূতি বাবার পায়ে ঠেকাইয়া তাহাই কপালে মাখিয়া তিনকড়ি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

৪

পরদিন প্রভাতে গতরাত্রির তিনকড়ি বেহারা বাবা হনুমানদাস রূপে রামনগরের পথে বাবলাতলায় বসিয়া রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছিলেন আর মনে পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। এই রামনগরেই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনকড়ি বন্ধনদশায় পড়িয়াছিল। অপরাধটি সামান্য, পথে চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনকড়ি রামনগরের দেবালয়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। তখন রাধারাণীজীর ভোগের সময়। পূজারী-ঠাকুর দেবালয়ে একথালা ফুলকো লুচি বিগ্রহের সম্মুখে

রাখিয়া তরকারী আনিতে গিয়াছিলেন, এই অবসরে ক্ষুধিত তিনকড়ি থালাখানি লইয়া প্রস্থান করিল। ভোজন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় ঠাকুরবাড়ীর পুকুরপাড়ে সে ধরা পড়িল। দেবালয়ের সেবায়েৎ গিরিশ চাটুয্যের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইয়া গেল যে, তিনকড়ি রাধারাণীজীর কণ্ঠহার খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে অবিশ্বাস করিবার হেতু ছিল না এবং আরও দুইবারের ছাপ ছিল, কাজেই তিনকড়ি এবার তিন বৎসরের মত জেলে ঢুকিল। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবার রাধারাণীজী ও তাঁহার সেবায়েৎ উভয়কেই দেখিয়া লইবে এ কথাও সকলকেই জানাইয়া গেল।

বাবা হনুমানদাস ভাবিতেছিলেন, আর তাঁহার মগজে বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মত প্রতিহিংসা সাধনের নানা-প্রকার উপায় গজাইয়া উঠিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে বাবা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহাদেওজীর ভজন গাহিতে গাহিতে রামনগরের পথ ধরিলেন।

৫

দেবালয়ের সম্মুখে অত্যন্ত ভিড়। তীর্থের কাকের মত অতিথিরা প্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া। তাহাদের সম্মুখে ছোট একখানা চৌকিতে বসিয়া সেবায়েৎ গিরিশ চাটুয্যে আলবোলা টানিতেছিলেন। তাঁহার গলায় তুলসীর কণ্ঠী, মাথায় টাক, নাকে রসকলি; পরণে বাসন্তী রঙের একখানি গরদ ফুল-কোঁচা দিয়ে পরা। চাটুয্যে মহাশয়ের চারিটি স্ত্রী যথাক্রমে নিঃসন্তান অবস্থায় বিষ্ণুপাদপদ্মে বিলীন হইবার পর হইতেই তিনি কণ্ঠী লইয়াছিলেন এবং প্রতিবেশী পীতাম্বর ঘোষালের কন্যাকে পঞ্চম পক্ষে সহধর্ম্মিণী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মেয়ের বাপের মত ছিল, কিন্তু মেয়েটি তখন ফার্ষ্ট বুক শেষ করিয়া সেকেণ্ডবুক পড়িতেছিল। প্রস্তাব শুনিয়া মায়ের কাছে কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবার ভয় দেখাইল, কাজেই প্রস্তাবটি চাপা পড়িয়া গেল। ইহার পরও দিনকয়েক ঘোষালের বাড়ির পাশ দিয়া স্নান করিতে যাইবার পথে গিরিশ চাটুয্যে সুর করিয়া গীতগোবিন্দ গাহিতে গাহিতে যাইতেন। কিন্তু দেবালয়ের দুধের জোগানদার নিমাই তাহার একটি বিধবা শ্যালিকাকে ঘর-সংসার দেখিবার জন্য আনিবার পর হইতে গিরিশ চাটুয্যে স্থির করিলেন যে বৃদ্ধ বয়সে আর বিবাহ করিয়া সংসারের মায়াজালে জড়াইবেন না। নিমাইয়ের শ্যালিকা মধুমালতী ওরফে মাধি রীতিমত গিরিশ চাটুয্যের নিকট হইতে কাশ্মীরী জর্দ্দা, পানবাহার, বৃন্দাবনী শাড়ী, সোনার সুতায় গাঁথা তুলসীর মালা প্রভৃতি ইহলোক ও পরলোকের পাথেয় উপঢৌকন লইত, কিন্তু চাটুয্যে মহাশয়ের নিকটে ঘেঁষিত না। রাধারাণীজীর ভোগের অর্দ্ধেক লুচী মাধির জন্য বরাদ্দ ছিল। মাধির বাপ শাক্ত শুনিয়া বাজারের কালীবাড় হইতে প্রতি শনি-বার একটি করিয়া ছাগমুণ্ড নামাবলীতে জড়াইয়া চাটুয্যে মহাশয় নিমাইয়ের বাড়িতে পাঠাইতেন, কিন্তু তাহাতেও মাধি টলিল না। তুকতাক করিয়া মাদুলী বাঁধিয়া মোহনমন্ত্র প্রভৃতি জপ করিয়াও গিরিশ চাটুয্যে ফল পাইলেন না। তাঁহার বর্ত্তমান দুঃখের কারণ ছিল ইহাই। এই দুঃখ ঘুচাইতে তিনি একবার 'কামরূপ কামিক্ষে'র দেশে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন যে, সে দেশে এমন সব সাধু আছেন যাঁহারা মন্ত্রে ইচ্ছামত যাহাকে তাহাকে বশ করিয়া ফেলেন। কি জানি যদি লাগিয়া যায়—

ঠিক এই সময় তেঁতুলগাছের আড়াল হইতে বাবা হনুমানদাস বাহির হইয়া আসিয়া গিরিশ চাটুয্যের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তার পরে চাটুয্যে মহাশয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "হোগা।"

কথাটি দৈববাণীর মত চাটুয্যে মহাশয়ের কানে বাজিল। তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোগা, বাবা!"

বাবা হনুমানদাস নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "পূরণ হোগা।"

সহসা গিরিশ চাটুয্যের সন্ন্যাসীর প্রতি পরম ভক্তির উদয় হইল। বাবাকে বসিতে আসন দিয়া প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "বাবা, আজ এই ঠাকুরবাড়ীতেই—"

বাবা ধীর ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মুঠিভর ছাতু ঔর এক লোটা পানি—ঔর কুছ্ নেহি।"

বাবার তিতিক্ষায় চাটুয্যে মহাশয় আরও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া গললগ্ন-নামাবলী হইয়া বার-বার বলিতে লাগিলেন, "মা রাধারাণী, কাঙালের উপর এতদিন বাদ কি দয়া হল মা ?"

৬

পালঙ্কে শয়ান অবস্থায় বাবা হনুমানদাস মালা জপ করিতেছিলেন। গিরিশ চাটুয্যে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া দুই-তিনবার কাশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি জ্যোতিষ জান্‌তা হায় ?"

বাবা উত্তরে একটু মৃদু হাসিলেন। হাসি দেখিয়া চাটুয্যে মহাশয় বুঝিলেন যে. জ্যোতিষ-বিদ্যাটা বাবার কাছে একটা সামান্য ব্যাপার। অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে পুনরায় গিরিশ চাটুয্যে বলিলেন, "বাবা, আমার ললাট্‌মে—"

বাবা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "সব কুছ্‌ হায়, লেকিন্‌—"

গিরিশ চাটুয্যে সভয়ে কহিলেন, "লেকিন্‌ কি বাবা ?"

বাবা গিরিশ চাটুয্যের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন. "করম চাহি বাচ্চা, করম চাহি।"

ইহার পর বাবা হনুমানদাস গিরিশ চাটুয্যের জীবনের ঘটনাবলী স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বলিতে বাবার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ, তাহার বন্ধু মদন ময়রা রামনগরেরই অধিবাসী এবং দীর্ঘদিন এই দেবালয়ের ভৃত্য ছিল। গিরিশ চাটুয্যে সম্বন্ধে সকল তথ্য বাবা তাহার নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। নিজের জীবনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে গিরিশ চাটুয্যের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল। বাবা যখন শেষে চাটুয্যে মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষিত নারীর নাম পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলেন, তখন আর তিনি ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না. বাবার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তুমি সবই জান বাবা। এতদিনের সেবায় আমার ফল ফলেছে! রাধারাণীজী কৃপা করেছেন। মায়ের দয়ায় তোমায় পেয়েছি। এ চরণ আর ছাড়ব না!"

বাবা হনুমানদাস নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, "হোগা"।

"কব হোগা বাবা ? তুমি তো মনের কথা জান বাবা। তার জন্যে আমি জলমে ঝাঁপ, সাপের গর্ত্তমে হাত—"

বাবা বাধা দিয়া কহিলেন, "সবুর বাচ্চা! সবুর! বড়ি মেহনৎ। যাগ জপ ঔর বৃন্দাবন কুণ্ডলী—" বলিয়া বাঞ্ছাপূরণের জন্য আবশ্যক ক্রিয়াদির একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিয়া গেলেন। চাটুয্যে মহাশয় আগামীকল্যের যাগযজ্ঞাদির সরঞ্জাম যোগাড় করিতে চলিলেন।

এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছেন শুনিয়া মাধি সন্ধ্যাকালে বাবাকে দেখিতে আসিল। ডাকিলেও মাধি আসে না অথচ আজ না ডাকিতেই আসিয়াছে দেখিয়া চাটুয্যে মহাশয় মনে মনে হাসিলেন—বাবার কৃপা হইয়াছে। তাহার পর একটু রসিকতা করিবার উপক্রম করিতেই মাধি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বাবার ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। বাবা ধ্যানস্তিমিতনেত্রের পাতা একটু তুলিয়া অপাঙ্গে আগন্তককে দেখিয়া লইলেন, আগন্তুক কে তাহাও চেহারা দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং বুঝিলেন যে, গিরিশ চাটুয্যের মোহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। মাধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবাকে দেখিতেছিল। ধ্যান ভাঙলে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়া মাংতা ?"

মাধি একটু মুচকি হাসিয়া বাঁ-হাতের তালু বাবার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া কহিল "অদেষ্ট—"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হোগা। সোনাদানা হীরা-জহরৎ ললাটমে তুম্‌হারা—"

সোনাদানা হীরা-জহরতের কথা শুনিয়া মাধির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাবা তাহা দেখিলেন। তখন বাবা বাংলা ও হিন্দী মিশাইয়া মাধিকে ভরসা দিলেন যে, এখান

হইতে বিদায় হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই প্রচুর সোনাদানা তাহাকে দিয়া যাইবেন। তবে বাবার হুকুম-মত কাজ করা চাই। মাধির বুক ডুরডুর করিতেছিল, কথা না কহিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া সম্মতি জানাইয়া সে চলিয়া গেল। আশু সোনাদানা প্রাপ্তির ভরসায় মনটা প্রফুল্ল ছিল, যাইবার সময় গিরিশ চাটুযোকে একটা প্রণামও করিয়া গেল। গিরিশ চাটুয্যে মনে মনে হাসিয়া কহিলেন —"এখনও তো বৃন্দাবন কুণ্ডলীই বাকি আছে, কাল বাদ পরশু 'তু' বল্‌তেই —"

সন্ধ্যায় বাবা হনুমানদাস একবার ময়রাপাড়া ঘুরিয়া তাঁহার বন্ধু মদন ময়রার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

৭

ভোরের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া প্রভাত হইতে গিরিশ চাটুয্যে যাগযজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত আয়োজন অতি সন্তর্পণে এবং গোপনে করিতে হইবে এই আদেশ ছিল, কাজেই আপনাকেই সমস্ত করিতে হইতেছিল। মধ্যাহ্নে উপবাসী চাটুয্যে মহাশয় বাবাকে ভূরিভোজন করাইয়া 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' করিবার ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। বাবার আদেশমত মাধি আসিল। বাঞ্ছিতাকে সর্ব্ব অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া তিন হাজার আটচল্লিশবার বাবার প্রদত্ত মন্ত্র সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জপ করিতে হইবে। বাবা সমস্তই মাধিকে বুঝাইয়া দিলেন। মাধি প্রথমে মিহি রকমের একটু আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু গিরিশ চাটুয্যের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীগণের পুঞ্জীকৃত অলঙ্কার দেখিয়া তাহার চোখ ঝল্‌সাইয়া গেল, সে আর কথা কহিল না। নিরাপত্তিতে অলঙ্কারমণ্ডিত হইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যে একবার বাবা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় মাধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গয়না ফিরিয়ে নেবে না তো?"

বাবা জানাইলেন যে, তাঁহার হুকুম-মাফিক চলিলে গয়না চিরকালের জন্ম তাহারই থাকিবে। মাধি খুশী হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গিরিশ চাটুয্যে উপবাসে অবসন্ন হইয়া ঢুলিতেছিলেন। বাবা তাঁহাকে ঝাঁকি দিয়া কহিলেন, "গণপতিনাথ কা চরণামৃত পিয়ে লেও বাচ্চা।" চাটুয্যে মহাশয় সসম্ভ্রমে চরণামৃতের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' জপের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাবা সাড়ম্বরে তাঁহার কানে বীজমন্ত্র দান করিলেন এবং রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে চাটুয্যে মহাশয় ও মাধিকে দেবালয়ের পশ্চাতে আশশেওড়ার ঝোপের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া আসিলেন। ঝোপের মাঝখানে খানিকটা স্থান 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' যজ্ঞের জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। গিরিশ চাটুয্যে মহাশয় পদ্মাসনে বসিয়া মাধির দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্র ভুল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এমন সময় বাবা আসিয়া উভয়কে মুখোমুখী দুই আসনে বসাইয়া জপের প্রণালী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

৮

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। মাধি আঁচল দিয়া মশা তাড়াইতেছিল আর মাঝে মাঝে গলার সাতনরটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। চাটুয্যে মহাশয় নিমীলিত নেত্রে ঢুলিতে ঢুলিতে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্রজপ করিতে-ছিলেন। জপ যখন দেড় হাজারের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন গণপতিনাথের চরণামৃতের প্রসাদাৎ নিদ্রাবিষ্ট হইয়া চাটুয্যে মহাশয় মাধি গোপিনীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া গেলেন। মাধি চাটুয্যে মহাশয়কে জাগাইতে যাইতেছিল এমন সময় কে পিছনের ঝোপের মধ্য হইতে কহিয়া উঠিল, "চুপ!"

মাধি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, স্বয়ং বাবা! বাবা পরিষ্কার বাংলায় কহিলেন, "চেঁচিও না! চৌকীদার শুনলে এখুনি বেঁধে থানায় নিয়ে যাবে। গয়না-চুরির ফ্যাসাদে পড়বে—"

মাধি হতভম্ব হইয়া কহিল, "তবে?"

"চলে এস।" বলিয়া বাবা একরূপ তাহাকে টানিয়াই পথে লইয়া আসিলেন।

গভীর অন্ধকার। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু একখানি

গরুর গাড়ী পথে দাঁড়াইয়াছিল। বাবা মাধিকে তুলিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। মাধি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, চৌকীদারের ভয়ে কথা বলিতে পারিল না। মদন ময়রা ষ্টেশনের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে মাধি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জাত ভাল তো ?"

তিনকড়ি মিঠাস্বরে কহিল, "তুমি কি জাত আগে বল।"

মাধি বলিল, "বামুনের সোনা গায়ে দিয়ে আর মিছে কইব না, আমরা জেতে বেহারা!"

তিনকড়ি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আমরাও তাই গো। বাবা তারকনাথ মিলিয়ে দিয়েছেন!" তারপর ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বেই দুইজনের পরিচয় হইল জীবনের সুখদুঃখের সমস্ত কাহিনীই উভয়ে উভয়কে বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িবে না বলিয়া বাবা তারকনাথের নামে উভয়েই শপথ করিল।

ভোরের দিকে গিরিশ চাটুয্যে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, সালঙ্কারা মাধি রাধারাণীজীর চৌকীতে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, আর তিনি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বাঁকা হইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, সেই সময় বরিশাল একস্‌প্রেস মাধি ও বাবা হনুমান দাসকে লইয়া শিয়ালদা ষ্টেশনে প্রবেশ করিল

* * * *

কোথায় বাবা হনুমানদাস আর কোথায় তিনকড়ি বেহারা! কেহই আর এখন নাই। তবে বৌবাজারের মোড়ে 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্দেশ' লেখা যে দোকানের সাইনবোর্ড দেখা যায় সে দোকানের মালিকের নাম শ্রীযুত তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্দেশ বলিয়া তাঁহার সন্দেশের চাহিদা খুব। পণ্ডিত মহাশয়েরাও সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার সন্দেশ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বাড়ুয্যে মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী মাধবী সুন্দরীরও দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তি। আলুটোলার মোড়ে স্বব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া 'মাধবী মনোহর' নামে বংশীধর বিগ্রহ তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের বাল্যবন্ধু শ্রীমৎ মদনানন্দ স্বামীর উপর বিগ্রহের সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

পৌষ পূর্ণিমা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পূর্ণিমা-অতিথি এসে দাঁড়াইল তোরি গৃহদ্বারে
নিঃশব্দ চরণপাতে, শীতসিক্ত সন্ধ্যার আঁধারে।
দ্বিধাভরা স্মিত হাসি মৌনমুখে—মিলে কি না স্থান—
হিম-অবরুদ্ধ গৃহে কে রাখিবে অতিথির মান!

স্বর্ণচম্পকের মতো বর্ণ হ'তে ঝরিছে অমিয়,
দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে উড়িছে উদার উত্তরীয় ;
বিন্দু বিন্দু পত্রলেখা উদ্ভাসিত দীপ্ত গণ্ডতটে,
সুশুভ্র চন্দনটিপ সুপ্রসন্ন ললাটের পটে।

পুঞ্জে পুঞ্জে কুরুবক হেসে উঠে কানন ভরিয়া,
বিকসিত ইন্দুমল্লী রচে অর্ঘ্য ঝরিয়া ঝরিয়া ;
কাঁদে কৃষ্ণ বনস্থলী কা'র রূপ স্মরি' আজি ফিরে ?
আঁখিপাতে সেই অশ্রু ঝরি' উঠে নিশীথ-শিশিরে'!

ওরে অন্ধ, ওরে ভীত, ঘুচাইয়া জড়ত্ব-কালিমা,
একবার চেয়ে ছাখ্—সৌন্দর্য্যের নাহি আজ সীমা।
দ্বার খুলে' দে রে ত্বরা, সসম্ভ্রমে নে রে ওরে ডেকে,—
হেলায় ফিরে না যেন এ অতিথি গৃহপ্রান্ত থেকে।

বন্ধ কর্ অভিনয়, নিবায়ে দে, দীপ নিবায়ে দে,
সুশুভ্র শয্যার 'পরে বাহুপাশে নে রে তারে বেঁধে' ;
শুচিতার শুভ্রমূর্ত্তি—আনন্দের পুণ্য পদতলে
হৃদয়ের শূন্যভাণ্ড ভরে' নে রে মিলনাশ্রু জলে।

এ তিথি রবেনা কাল, অতিথি-পথিক যাবে ফিরে',
সৌন্দর্য্যের পূর্ণচন্দ্র মিলাইবে অমার তিমিরে—
বিস্মৃতির অন্তরালে। এ সৌভাগ্য থাকে যতক্ষণ,
অমৃতের তীর্থস্নানে সিক্ত করে' নে রে দেহমন।

ক্ষীরোদ সমুদ্র ছাড়ি' এল লক্ষ্মী ধরণীর তীরে
বহু ভাগ্যফলে যদি—এ রাত্রি নিষ্ফল নাহি ফিরে।
শ্বেত শতদলমালা দুলিছে যা দ্যুলোকে ভূলোকে—
সে পবিত্র পরশন বুলায়ে নে অন্তরের চোখে।

পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ, ডি

সমগ্র রাজপুতানায় এবং উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গের ঘরে ঘরে, হিন্দু মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নির্ব্বিশেষে চিতোর-লক্ষ্মী পদ্মিনীর নাম সুপরিচিত। শিক্ষিত বাঙালী টড-রচিত রাজস্থানের ইতিহাস (১৮২৯ খৃঃ), কিংবা কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' পড়িয়া চমৎকৃত হইবার অন্যূন দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাংলার নিরক্ষর মুসলমানগণ কবি আলাওলের "পদ্মাবতি পুথি" শুনিয়া সন্ধ্যায় কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত জীবনের অবসাদ ভুলিয়া আসিতেছে। সম্রাট শের শা'র রাজত্বকালে মুসলমান কবি ও সাধক মালিক মহম্মদ জ্যায়সী ৯৪৭ হিজরীতে (১৫৪০ খৃঃ) অযোধ্যা প্রদেশের কথিত-হিন্দী ভাষায় "পদ্মাবত" কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর চিতোর-অধিকার (২৬ আগষ্ট, ১৩০৩) হইতে জ্যায়সীর কাব্য-রচনার কাল পর্য্যন্ত ২৩৭ বৎসরের মধ্যে কোনো কাব্য বা ইতিহাসে পদ্মিনীর উল্লেখ আছে বলিয়া অদ্যাবধি জানা যায় নাই। কিন্তু পদ্মাবত রচনার পর হইতে এই কাব্যের বহুল প্রচারে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ফলে উত্তর-ভারতের নিভৃত পল্লীতেও পদ্মিনী উপাখ্যান প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম পাদে রোসাঙ্গ বা আরাকানের রাজসভায় মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ-নিবাসী আলাওল বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে জ্যায়সীর হিন্দী "পদ্মাবত" অনুবাদ করেন। একালে ইংরেজীতে না লিখিলে তাহা যেমন সহজে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করিতে পারেন না, মোগল-যুগেও তেমনি ফার্সী ভাষায় লিখিত না হইলে, 'খুলাসাৎ-উৎ-তবারিখ' প্রণেতা সুজান রায় ভাণ্ডারীর মত "শিক্ষিত" হিন্দুরাও মহাভারত, হরিবংশ বুঝিতে অক্ষম ছিলেন। হিন্দী ভাষা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে রায় গোবিন্দ মুন্সী পদ্মাবত-কাব্য ফার্সী গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ইহার নাম 'তুহ্‌ফাৎ-উল-কুলুব'। এই উপাখ্যান অবলম্বনে কবি হোসেন গজনবী 'কিস্‌সা-ই-পদ্মাবত' নামক ফার্সী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মীর জিয়াউদ্দীন্ ও গোলাম আলী পদ্মাবত-কাব্য উর্দ্দু কবিতায় অনুবাদ করেন।

কালক্রমে অলীক জনশ্রুতি ও মনোরম কবি-কল্পনা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। আবার কোথাও বিলুপ্তপ্রায় প্রকৃত ইতিহাসের ক্ষীণধারা জনশ্রুতির পঙ্কিল প্রবাহে মিলিত হওয়ায় অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ইতিহাস মানব-সমাজের 'বায়েৎ-উল্-মাল্' বা সাধারণ কোষাগার; ইহার অক্ষয় ও অফুরন্ত ভাণ্ডারের উপর দার্শনিক, চিত্রকর, কবি, কথা-শিল্পী, সকলেরই সমান অধিকার। ইঁহাদের সকলকেই ইতিহাসের দারস্থ হইতে হইয়াছে, ইতিহাসও ইঁহাদের হাতে পড়িয়া কলগ্রহ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। দার্শনিক হিমালয়ের উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে বা তাহার অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তাসোপান হইতে পৃথিবীর বক্ষে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য,—শুধু মানুষে মানুষে নয়, জাতিতে জাতিতে নয়, মহাদেশের সহিত মহাদেশের, প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ দেখিয়া থাকেন। সাধারণ ঐতিহাসিক হয়ত শুধু অসির ঝনৎকার, পশুবলের সংঘর্ষ দেখিতে পান; কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টি সূক্ষ্মতর—তিনি দেখিতে পান যে, পরস্পর যুধ্যমান পশুবলের পশ্চাতে সভ্যতা ও চিন্তাধারার শাশ্বত বিরোধ রহিয়াছে। পুরাবৃত্ত ও দর্শনের মিলনে আমরা ইতিহাস-বৃক্ষের সর্ব্বোত্তম ফলস্বরূপ রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পাইয়াছি। কিন্তু দার্শনিকের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা একটি কোকিলের ডাক শুনিয়াই কার্ত্তিককে চৈত্র জ্ঞান করেন। চোখ খুলিয়া হেমন্ত-সন্ধ্যায় ঘন কুজ্ঝটিকা দেখিবার

প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। ইহাদের ভুল সহজে ধরা যায়।

চিত্রকর পদ্মিনীকে ব্লাউজ পরাইলে ক্ষতি নাই; কেন-না, ঐতিহাসিক বুঝিতে পারেন উহা রতন সেনের পদ্মিনী নয়। কিন্তু কবি ও কথাশিল্পী ইচ্ছা করিলে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণকে সাত ঘাটের জল খাওয়াইতে পারেন। কালিদাস বলিয়াছেন "সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ"; তেমনই কবি ইতিহাসের ক্ষীরসমুদ্র হইতে এক ঘটী দুধ লইয়া তাহাতে হাজার কলসী জল ঢালিয়া দেন; ঐতিহাসিক নামের এক ঝুড়ি হাড় লইয়া একটি মহাকাব্য উপহার দেন। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসটাও প্রায় স্ত্রী-চরিত্র-বর্জ্জিত যাত্রার মত ছিল—দু-একটা রাজিয়া বা এলিজাবেথ বহু শতাব্দীর ব্যবধানে হঠাৎ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকেন। মানব-সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বাদ দিয়া ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না—সর্ব্ব যুগে, সর্ব্বত্র পুরুষের কর্ম্মপ্রেরণার পশ্চাতে নারী রহিয়াছেন। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নারীরও একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেটা নেপথ্যে,—ঐতিহাসিক পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। ফলে ইতিহাস নিতান্ত নীরস। কবি ও কথা-শিল্পীরা শুষ্ক মালঞ্চে ফুল ফুটাইলেন; বিশ্ব-সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত করিয়া সংযুক্তা পদ্মিনীর সৃষ্টি করিলেন এবং কোনো ঐতিহাসিক-চরিত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া পাঠকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইলেন। কাব্য পরবর্ত্তীকালে জনশ্রুতির সৃষ্টি করিল। ঐতিহাসিকেরা আরও বহু শতাব্দী পরে উদ্ভূত হইলেন; তাঁহারা সন্দেহ করিলেন কাব্যটির মূলে জনশ্রুতি "ঐতিহাসিক" মাত্র রহিয়াছে। তাঁহারা সরল বিশ্বাসে নিপুণতার সহিত কাব্যের ডালপালা ছাঁটিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস গড়িয়া তুলিলেন; কিন্তু সর্ব্বশেষে সত্যেরই জয় হয়।

পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তা, পৃথাবাঈ, প্রভৃতি আর বাস্তব-রাজ্যে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যপানের সহিত চন্দ্রগুপ্তের মা মুরার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে জানিলাম, তিনি আর ঐতিহাসিক জগতে নাই—মরজগতে কোনকালেই ছিলেন না। মুদ্রারাক্ষস নাটকের টীকাকার ঢুণ্ডীরাজ* চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে তাঁহার মাতা [বিমাতাই বটে] বৃষলী মুরাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদ্রূপ আমাদের মনে হয় ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসে মিবার-রাজ রতন সিংহের মৃত্যুর (১৩০৩ খৃঃ) ২৩৭ বৎসর পরে রাণী পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর জন্ম, বিবাহ ও সহমরণ কবি জ্যায়সীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাঠ্যাবস্থায় আমরা রাণা লাক্ষসিংহ বা লখমসীর কাকা ভীমসিংহকেই পদ্মিনীর স্বামী বলিয়া জানিতাম। এ বিষয় লইয়া আমাদের সঙ্গে মুসলমান প্রতিবেশীদের ঝগড়া হইত; কেন-না, তাঁহাদের পদ্যাবতি পুথিতে আছে পদ্মিনীর স্বামী রতন সেন। আমরা ভাবিতাম, টড সাহেবের ইংরেজী রাজস্থানের রাজসংস্করণের কাছে কি বটতলার পুথি দাঁড়াইতে পারে? আধুনিক সময়ে কবিরাজ শ্যামলদাসজী বিপুল পরিশ্রমে দুই হাজার পৃষ্ঠায় মিবারের ইতিহাস লিখিলেন; কিন্তু উহা মহারাণার মর্জ্জি মাফিক না হওয়ায় ঐতিহাসিক নির্ব্বাসিত হইলেন—তাঁহার ইতিহাস রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। তিনি টডের 'রাজস্থান'-রচনার (১৮২৯ খৃঃ) ৩৬৮ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণা কুম্ভকর্ণের সময়ে লিখিত কুম্ভলগড়ের (বাংলায় কমলমীর বলিয়া পরিচিত) শিলালিপি (বি. ১৫১৭—৫৮=১৪৬১ খৃঃ) এবং ঐ সময়কার রচিত একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্ কাব্য হইতে প্রমাণ করিলেন ভীমসিংহ লাক্ষসিংহের কাকা নহেন,—পিতামহ† এবং

* "রাজ্ঞঃ পত্নী সুনন্দাসীজ্জ্যেষ্ঠান্যা বৃষলাত্মজা।
মুরাখ্যা সা প্রিয়া ভর্ত্তুঃ শীললাবণ্যসংপদা।
... ...
মুরা প্রসূতং তনয়ং মৌর্য্যাখ্যং গুণবত্তরং।"
(Quoted in Ojha's *Hist. of Rajputana*, i. 59.)

† ভীমসিংহ লাক্ষসিংহের কাকা নহেন,—পিতামহ।

তস্মাৎ ভুবন সিংহস্তাৎজো ভীমসিংহনৃপঃ
তত্তনুজো জয়সিংহস্তনুজো লাক্ষসিংহনামাসীৎ॥
(একলিঙ্গমাহাত্ম্যং, রাজবর্ণন অধ্যায়)

অর্থাৎ ভুবনসিংহ
|
ভীমসিংহ
|
জয়সিংহ
|
লাক্ষসিংহ

আলাউদ্দীনের সময়ে সমর সিংহের পুত্র রত্নসিংহ * রাজা ছিলেন। মহারাজা যশোবন্তের দেওয়ান মারবাড়বাসী মুহ্‌নোৎ নৈনসী নিজের "খ্যাত" বা ইতিবৃত্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রতন সিংহ পদ্মিনী-ব্যাপারে আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। নৈনসীর মৃত্যুকাল (১৬৭১ খৃঃ) এবং টডের রাজস্থান রচনার (১৮২৯ খৃঃ) মধ্যবর্ত্তী সময়ে, খুমাণ রাসোর গ্রন্থকার এবং মিবারের চারণেরা রত্নসেনকে ভুলিয়া গেলেন এবং পদ্মিনীকে ভীমসিংহের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। চিতোর-দুর্গে সরোবরের মধ্যস্থলে একটি জীর্ণ মহল ছিল। লোকে উহাকে পদ্মিনী-মহল বলিত। মহারাণা সজ্জন সিংহ ঐ জীর্ণ মহলের সংস্কার করাইয়া চিতোরের অলীক অপবাদ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একখানি বিলাতী আয়না লটকাইয়া রাখিয়াছেন। যে-গুহায় পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত-রমণীরা আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, টড সাহেব সেগুলি দেখিয়াছেন। আমরাও দেখিয়াছি এবং তেমনই বিশ্বাস করিয়াছি,—যেমন আমাদের মেয়েরা দিল্লী গেলে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে যান, এবং শের শার তৈরি পুরানা কিল্লার মধ্যস্থিত ইংরেজ-আমলের শিব-মন্দিরকে কুন্তীপূজিত শিবের স্থান বলিয়া মনে করেন।

কবিরাজ শ্যামলদাসজী বিশেষ বিচার না করিয়া আবুল-ফজল ও ফিরিশ্‌তায় পদ্মিনী-উপাখ্যান যেরূপ আছে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত স্কুলপাঠ্যপুস্তকে পদ্মিনীর স্বামী হইলেন রাবল রতন সিংহ। গল্পটির অসংবদ্ধতা দেখিয়া এবং পূর্ব্বাপর বর্ণিত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াই বোধ হয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাব্যস্ত করিলেন যে, পদ্মিনী-উপাখ্যানটা মেকী—ঐতিহাসিক নয়। রাজপুতানার ঐতিহাসিক ঋষিকল্প মনস্বী মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁহার হিন্দী ভাষায় লিখিত বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই উপাখ্যানটির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,—

"ইতিহাসের অভাবে লোকেরা পদ্মাবত কাব্যকেই ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে মানিয়া লইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদ্মাবত আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ গল্প। কয়েকটি ঐতিহাসিক কথাকে ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত; যথা, রতন সেন (রত্নসিংহ) চিতোরের রাজা ছিলেন, পদ্মিনী বা পদ্মাবতী তাঁহার রাণী, এবং আলাউদ্দীন দিল্লীর সুলতান ছিলেন; আলাউদ্দীন রতন সেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চিতোর অধিকার করেন। ইহা ছাড়া বাকি কথাগুলি কেবল উপাখ্যানটিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে।......পদ্মাবতের উপাখ্যানের সঙ্গে ফিরিশ্‌তার বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় তাঁহার বর্ণনার মুখ্য আধার পদ্মাবতের কাহিনী। ফিরিশ্‌তা উহাকে কিছু অদলবদল করিয়া ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পদ্মিনীকে রতন সেনের স্ত্রী না বলিয়া 'কন্যা' বলিয়াছেন।......কর্ণেল টড্ কথাগুলি মিবারের ভাটদের কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাটেরা আবার উহা জায়সীর পদ্মাবত হইতে লইয়াছে। ভাটদের পুস্তকে সমর সিংহের পর রত্নসিংহের নাম না থাকাতে টড সাহেবই ভীমসিংহের সহিত পদ্মিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছেন।......পদ্মাবত, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা, এবং টড্ সাহেবের রাজস্থানে লিখিত কথাগুলির যদি কোনো মূল [ভিত্তি] থাকে তবে তাহা এইটুকু মাত্র—যথা, ছয় মাস অবরোধের পর আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন। চিতোরের রাজা রত্নসিংহ এই যুদ্ধে লক্ষ্মণ সিংহ ইত্যাদি অনেক সামন্তের সহিত মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী পদ্মিনী অন্যান্য পুরমহিলার সহিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন; এইরূপে চিতোর কিছুদিনের জন্য মুসলমান অধিকারে আসিল। বাকি সমস্ত কথাই কাল্পনিক।"*

গৌরীশঙ্করজী বলিতে চান—গোরা বাদল, ডুলী বেহারা, রতন সিংহের হাতে হাতকড়ি, আলাউদ্দীনের কারাগার, কিছুই ছিল না; সিংহল দ্বীপও ছিল না, ছিলেন শুধু পদ্মিনী। বিচার প্রমাণের অগ্নিতাপে আলাউদ্দীন, রতন সেন, লাক্ষসিংহ ও তাঁহার আট পুত্র ছাড়া সবই কল্পনা-বাষ্পরূপে উড়িয়া গেল। তবে পদ্মিনীই বা থাকিবেন কেন? শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী না-কি এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া মহামহোপাধ্যায়কে চিঠি লিখিয়াছিলেন, কোনো জবাব পান নাই। চিতোরের আকাশ বাতাসে যাঁহার পুণ্য স্মৃতি রহিয়াছে, যাঁহার কীর্ত্তি

---

* স (=সমরসিংহঃ) রত্নসেনং তনয়ং নিযুজ্য
স্বচিত্রকূটাচলরক্ষণায়।
মহেশপূজাহতকল্মষৌঘঃ
ইলাপতিস্বর্গ পতির্বভূব।
খুঁ (খুঁ) মাণ বংশঃ। বংশ্যঃ) খলু লক্ষ সিংহ—
স্তস্মিন্ গতে দুর্গবরং ররক্ষ।
কুলস্থিতিং কাপুরুষৈর্বিমুক্তাং
ন জাতু ধীরাঃ পুরুষাস্ত্যজন্তি।
—একলিঙ্গমাহাত্ম্যং; রাজবর্ণন অধ্যায়, শ্লোক ৭৭—৮০। (Quoted in Ojha, i. 484).

* রাজপুতানেকা ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯১, ৪৯৩-৯৪।

চিতোরকে বহু শতাব্দী ধরিয়া সতীত্বের মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে, সেই চিতোর-লক্ষ্মীকে ইতিহাস হইতে বিদায় দিতে মিবারের অন্নজলপুষ্ট বৃদ্ধের মনে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদতুল্য কষ্ট হইবে,—ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পদ্মাবত-রচনার, অর্থাৎ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো ইতিহাস, কাব্য কিংবা চারণ-কথার দ্বারা পদ্মিনীর অস্তিত্ব প্রমাণ না হয়, ততদিন ইতিহাস-বিজ্ঞানের বিচারধারা মানিয়া আমরা বলিব—পদ্মিনী মালিক মহম্মদ জ্যায়সীর কল্পনা-দুহিতা, সত্যকার রাণী নহেন।

রতন সিংহের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁহার হিন্দী রাজপুতানার ইতিহাসে রাণাবত মহেন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উদয়পুরের দরীবার অপ্রকাশিত শিলালেখের প্রতিলিপি* উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শিলালেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, রতন সিংহের পিতা সমর সিংহ ১৩৫৮ বিক্রম সম্বতের মাঘ মাসের শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং রতন সিংহের রাজ্যারোহণ কাল ১৩৫৮ বিক্রম সম্বত মাঘ মাস হইতে ১৩৫৯ বি. স. মাঘ মাসের মধ্যবর্ত্তী কোনো সময়ে নির্দ্ধারিত করা যায়। কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি স্বরচিত 'তারিখ-ই-আলাই' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"সোমবার ৮ই জমাদি-উস্‌সানী হিঃ সঃ ৭০২ [বি. স. ১৩৫৯ মাঘ শুক্লা নবমী—২৮এ জানুয়ারি, ১৩০৩] তারিখে সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লী হইতে সসৈন্য চিতোর-অভিমুখে যাত্রা করেন। ছয় মাস অবরোধের পর সোমবার ১১ই মহরম ৭০৩ হিঃ (বি. স. ১৩৬০ ভাদ্রপদ শুক্লা চতুর্দ্দশী = ২৬এ আগষ্ট ১৩০৩) চিতোর-দুর্গ হস্তগত হয়।"

আমীর খসরু মিবারের রাজার নামোল্লেখ করেন নাই; পদ্মিনী, গোরা বাদল ইত্যাদি কাহারও কোনো উল্লেখ নাই।*

আলাউদ্দীনের চিতোর-বিজয়ের একমাত্র চাক্ষুষ বর্ণনা আমীর খসরুর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তিনি একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। পদ্মিনী উপাখ্যানের মত সরস কাব্যের উপকরণ হাতের কাছে থাকিলে তিনি যে দেবল দেবী খিজর খাঁ পরিণয়ের মত কবিতা রচনা করিবার লোভ সংবরণ করিবেন, এ কথা মনে হয় না। তোগ্‌লকদের সময়েও কবি জীবিত ছিলেন। তখন নিঃসঙ্কোচে তিনি পদ্মিনী-উপাখ্যানের ইঙ্গিত কোনো প্রকারে করিতে পারিতেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাণী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে আলাউদ্দীনের রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি অন্ততঃ ১৩৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার কাকা আলা-উল-মুল্‌কের মুখে (ইনি আলাউদ্দীনের সময় দিল্লীর কোতোওয়াল ছিলেন) আলাউদ্দীনের রাজত্বের অনেক কথাই শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বারাণী আলাউদ্দীনের স্তাবক নহেন, বরং নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি পদ্মিনীর কথার ইঙ্গিত, কিংবা রতন সেন, লাক্ষ-সিংহ, গোরা বাদল কাহারও উল্লেখ করেন নাই।†

* "সম্বত ১৩৫৯ মা[ঘ] সুদি বুধদিনে অদ্যেহ শ্রীমেদপাটমণ্ডলে সমস্তরাজাবলীসমলঙ্কৃতমহারাজকুলশ্রীরতন সিংহদেবকল্যাণ বিজয়রাজ্যে তন্নিযুক্তমহং শ্রীমহনসীহ সমস্তমুদ্রাব্যাপারাণি পরিপন্থয়তি...।" (Ojha, i. 482*n*.)

রাবল রতন সিংহ বোধ হয় এক বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাটদের খ্যাতে তাঁহার রাজত্বকালের মন-গড়া সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ ভাটেরা নিজেদের পুস্তকে বাপ্পা রাবলের রাজ্যারোহণকাল বি. স. ১৯১ লিখিয়াছেন—যাহা প্রকৃতপক্ষে ৭৯১ বি. স.। সুতরাং প্রকৃত তারিখে ও ভাটদের নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ছয়শত বৎসরের তারতম্য। এই ৬০০ বৎসরকে মিবার-রাজবংশে যত রাজার নাম জানা আছে তাহাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও নামের অকুলান হওয়ায় রাবল রতন সিংহের পূর্ব্বতন শাখার ঊর্দ্ধতন ১০ পুরুষকে তাঁহার নামের পশ্চাতে বংশাবলীভুক্ত করা হইয়াছে (Ojha, i. 508).

* তিনি শুধু বলিয়াছেন—The Rai fled, but afterwards surrendered himself, and was secured against the lightning of scimetar......After having ordered the massacre of thirty thousand Hindus, he bestowed the government of Chitor on his son Khizr Khan, and named the place Khizrabad..." (Elliot and Dowson, iii. 77.)

† তিনি লিখিয়াছেন—The Sultan then led forth an army and laid siege to Chitor, which he took in

আমীর খসরু ও জীয়াউদ্দীন বারাণীর বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয়, আলাউদ্দীন একবার ছাড়া দুইবার চিতোরে যান নাই। তাঁহাদের চক্ষে চিতোর-বিজয় আলাউদ্দীনের দেবগিরি-অভিযান কিংবা রণথম্‌ভোর-অধিকারের মত একটা বিশেষ স্মরণীয় বা রোমাঞ্চকর ঘটনা নহে। তাঁহারা রণথম্‌ভোর-পতি হামীর চৌহানের নাম ও বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রতন সেন কিংবা লাক্ষসিংহের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। আমীর খসরু লিখিয়াছেন, চিতোরে ত্রিশ হাজার হিন্দু কতল হইয়াছিল। অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ সদাশয় আকবরও চিতোর-দুর্গ অধিকারের পর উক্তসংখ্যক কৃষকের প্রাণবধ করিয়াছিলেন; তাহাদের অপরাধ দুর্গ-রক্ষায় তাহারা সাহায্য করিয়াছিল। আমীর খসরু জৌহর-ব্রতেরও উল্লেখ করেন নাই। তবে জৌহর-ব্রত রাজপুতদের মধ্যে প্রায়ই হইত; সুতরাং ইহা অনুমানসিদ্ধ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমীর খসরু আলাউদ্দীনের নিমক্ খাইয়া সুলতানকে বেকুব বানাইতে সাহস করেন নাই; সেই কারণেই ভুলীর ব্যাপারটা চাপা দিয়া থাকিবেন। কিন্তু কাফেরের ধাপ্পা-বাজীর ইঙ্গিত করিয়া দু-দশটা গালাগালি দেওয়ার পক্ষে কোনো বাধা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় না। তিনি শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তারও কোনো উল্লেখ করেন নাই। চিতোর-দুর্গে পদ্মাবত-কথিত একটা বিরাট ভোজ যদি আলাউদ্দীনের সম্মানার্থ রতন সেন সত্যই দিতেন, তাহা হইলে কবি বাদ পড়িতেন কি-না সন্দেহ। আমীর খসরু একজন রাজপুত-প্রধানের পলায়ন ও পরে আত্মসমর্পণ করার কথা লিখিয়াছেন। এই অজ্ঞাতনামা 'রায়'কে তিনি চিতোরের রাজা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার মিবারভ্রমণ এবং স্থানীয় লোকদের সহিত অবাধ মেলামেশার সুযোগ হইলে হয়ত তাঁহার এ ভ্রম দূর হইত; তিনি মিবার-যুদ্ধে রাজপুত-পক্ষের আরও অনেক সংবাদ পাইতেন। যিনি পলায়ন করিয়াছিলেন তিনি যে শিশোদিয়ার সামন্ত রাণা লাক্ষ-সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র অজয় সিংহ তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অজয় সিংহ আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়া শেষে প্রবলপ্রতাপ দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এটা অবিশ্বাস্য নয়। আলাউদ্দীন বিদ্রোহী শত্রু মাত্রেরই জীবন্ত অবস্থায় চর্ম্মোৎপাটন করিতেন না। তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকিলে তিনি দেবগিরি-রাজ রামদেবের মত লোককে দানের দ্বারা বশীভূত করিয়া মিত্র করিয়া লইতেন। সুতরাং আত্ম-সমর্পণ করিয়াও অজয় সিংহ বাঁচিয়াছিলেন, এটা নিতান্ত আশ্চর্য্য নয়। তবে রাবল রতন সিংহের কি ভাবে মৃত্যু হইল? রাবল রতন সিংহের মৃত্যুর প্রায় দেড় শত বৎসর পরে মহারাণা কুম্ভকর্ণের সময় (১৪৩১—১৪৬৮ খৃঃ) মিবারের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু "একলিঙ্গমাহাত্ম্যম" কাব্য প্রণেতাও সে-সময়ে রাবল রতন সিংহের মৃত্যুর কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। এ-সম্বন্ধে মিবারে জনশ্রুতিমাত্রও প্রচলিত থাকিলে কবি কখনও কেবল "তস্মিন্ গতে" বলিয়া নিবৃত্ত থাকিতেন না। যদি তাঁহার বীরত্ব ও মৃত্যু উল্লেখ করিবার মত কিছু হইত, তবে অসীম শৌর্য্য ও শস্ত্রপূত হইয়া সপ্ত পুত্রের সহিত লাক্ষসিংহের বীরগতি প্রাপ্তির ন্যায়, রতন সিংহ সম্বন্ধেও কোন ঘটনার অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত আলাউদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও রতন সেনের গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে কোনো জনশ্রুতি মহারাণা কুম্ভের সময় প্রচলিত থাকিলে একলিঙ্গমাহাত্ম্যে অন্ততঃ একটা ছল-ঘাত শব্দ যে আমরা পাইতাম তাহা নিঃসন্দেহ। কুম্ভের মৃত্যুর ১২

---

a short time, and returned home.···The Sultan now returned home from the conquest of Chitor where his army had suffered great loss in prosecuting the siege during the rainy season. They had not been in Delhi a month···when the alarm arose of the approach of the Mughals. The accursed Targhi, with thirty or forty thousand horse came on ravaging and encamped on the banks of the Jamuna··· After this very serious danger, Alauddin awoke from his sleep of neglect. He gave up his ideas of campaigning and *fort-taking*, and built a palace at Siri···" (Elliot and Dowson, iii. 189, 191.)

বৎসর এবং আলাউদ্দীনের চিতোর অধিকারের ২৩৭ বৎসর পরে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী পদ্মাবত কাব্যে লিখিয়াছেন :—রাজা রতন সিংহ যখন দিল্লীতে আলাউদ্দীনের কারাগারে বন্দী, তখন রতন সিংহের পূর্ব্ব-শত্রু কুঁভনৈর বা কুম্ভলমীর-অধিপতি রাও দেবপাল পাদ্মনীর কাছে দূতী পাঠাইয়া অশোভন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গোরা বাদলের বীরত্বে কারামুক্ত হইবার পর তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কুম্ভলমীর আক্রমণ করেন এবং দেবপালের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হইয়া চিতোরে প্রাণত্যাগ করেন। অথচ কুম্ভলমীর দুর্গ তৈয়ারী হইয়াছিল রাবল রতন সিংহের মৃত্যুর অন্ততঃ ১৬০ বৎসর পরে! সুতরাং দেবপালও নিশ্চয়ই কবির কল্পনা-প্রসূত। জ্যায়সীর প্রায় ৮০ বৎসর পরে ফিরিশ্‌তা গবেষণা করিয়া (এই বাতিকটার কথা ঐতিহাসিক নিজ-মুখে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন) জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ডুলীতে চড়িয়া পলাইয়া আসিবার পর রাজা রতন সেন আলাউদ্দীনের রাজ্যে এমন উপদ্রব সুরু করিয়া দিলেন যে, সুলতান নিরুপায় হইয়া শাহজাদা খিজর খাঁকে আদেশ করিলেন যেন রাজার ভাগিনেয়ের হস্তে চিতোর-দুর্গ সমর্পণ করিয়া দিল্লীতে চলিয়া আসেন।* শাহজাদাও তাহাই করিলেন। অথচ প্রামাণ্য ইতিহাসে "পাথুরে প্রমাণ"† আছে যে মুসলমানেরা গিয়াস-উদ্দীন তোগলকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত চিতোর-দুর্গ ত্যাগ করে নাই; সেখানে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সেতু, মক্‌বরা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিল। যিনি মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি রাবল রতন সিংহ নহেন; পরন্তু লাক্ষসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহের পুত্র চন্দানীর গর্ভজাত সুপ্রসিদ্ধ বীর হামীর। সম্ভবতঃ ১৩২৩-১৩২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জালোরের সোন্‌গড়ে চৌহান মালদেব তোগ্‌লকদের অধীনস্থ সামন্তরূপে চিতোর গড় জাগীর-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। রতন সিংহ সম্বন্ধে ফিরিশতার জ্ঞান কতদূর ছিল, ইহা হইতেই ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিতে পারেন।

টডের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মুহ্‌নোৎ নৈনসীর (১৬১১-১৬৭১ খৃঃ) "খ্যাত" বা ইতিবৃত্তে পদ্মিনী-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে "রতনসী"র মৃত্যুর উল্লেখ আছে। রাবল রতন সিংহ কে ছিলেন, সে বিষয়ে নৈনসীর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। তিনি রতন সিংহকে এক জায়গায় সমরসিংহের পুত্র, আবার অন্যত্র অজয় সিংহের পুত্র এবং ভড় (ভট্ট—বীর) লখমসীর (লক্ষ্মণ সিংহ) ভাই বলিয়াছেন। মিবারের ইতিহাস কি ভাবে ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছিল, নৈনসীর পরস্পরবিরুদ্ধ মতই তাহার সূচনা করিতেছে। লক্ষ্মণ সিংহ ও অজয় সিংহের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ তিনি বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। টড্‌ যখন রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-ক্ষেত্রে অজ্ঞানতার অমাবস্যা। তিনি চারণদের 'খ্যাত' হইতেই প্রধানতঃ তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজপুতানার প্রত্যেক স্থানে দুই শ্রেণীর চারণ ছন্দোবদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যাহারা রাজা ও সামন্তগণের দরবারে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যশ গান করিয়া ভিক্ষা করে তাহাদিগকে "বড়বা", এবং যাহারা রাণী ও ঠাকুরাণীদের কাছে অন্তঃপুরে বিভিন্ন বংশের রাণীদের দানশীলতা, সতীত্ব-গৌরব ও শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী গান করিয়া ভিক্ষা করে তাহাদের "রাণী-মংগা" বলে। এই উভয়শ্রেণীর

---

* "Thus by the exertion of his ingenious daughter, the Rajah effected his escape, and from that day continued to ravage the country then in possession of the Mahomedans. At length, finding it of no use to retain Chittoor, the king ordered the Prince Khizr Khan to evacuate it and make it over to the nephew of the Rajah .." (Briggs, i. 363).

† ১। গম্ভীরী নদীর উপর একটি সুদৃঢ় সেতু আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। সেতুর নির্ম্মাতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিলে বুঝা যায় যে ইহা মুসলমানদেরই প্রস্তুত। গৌরীশঙ্করজী অনুমান করেন, এই সেতু খিজর খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। (রাজপুতনেকা ইতিহাস, পৃ. ৪৯৬, পাদটীকা)।

২। চিতোরের বাহিরে একটি মক্‌বরায় ৭০৯ হিজরী, ১০ জিলহিজ তারিখযুক্ত একখানি শিলালিপিতে "Abul-Mazaffar Sikandar San"কে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে। "আবুল মুজাফর সিকিন্দর সানী" আলাউদ্দীন খিলজির উপাধি। (ঐ, পৃ. ৪৯৭ পাদটীকা)।

৩। চিতোর-দুর্গে তোগ্‌লক্‌ খাঁ'র প্রশংসাসূচক একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (ঐ, পৃ. ৫০১ পাদটীকা)

চারণদের রচিত কাহিনীগুলির নাম 'খ্যাত'—এগুলি প্রায়ই রাজস্থানী অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত 'খ্যাত' রাজপুতানার ইতিহাসের প্রধান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতিহাসিক টডও অধিকাংশস্থলে এই সমস্ত খ্যাতকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ও সমসাময়িক সাহিত্যাদির দ্বারা নানা রাজবংশের বংশাবলী, রাজাদের রাজত্বকাল যতই নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হইতে লাগিল ততই খ্যাতগুলির প্রতি পণ্ডিত-সমাজের শ্রদ্ধা কমিতে লাগিল। রায়বাহাদুর মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা এই শ্রেণীর শতাধিক খ্যাত প্রত্নতত্ত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাটদের খ্যাত-সমূহে বিক্রম সম্বত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অধিকাংশ নাম, সম্বত ইত্যাদি কৃত্রিম ও কাল্পনিক, সুতরাং বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি অনুমান করেন যে, ভাটদের প্রাচীন খ্যাত হয়ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা পরবর্ত্তীকালে উহা নূতন করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিংবা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিক্রম সম্বতের ষোড়শ শতাব্দীর পরে এ সমস্ত খ্যাত রচিত হইতে সুরু করিয়াছে।* সুতরাং এ ক্ষেত্রে জায়সীর সময়ে পদ্মিনী-বিষয়ক জনশ্রুতির স্বরূপ কি ছিল এবং তাহার মূলই বা কি, নির্ণয় করা সুকঠিন। টড যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহা চারণদের "প্রাচীন" কাহিনী নহে। চারণেরা উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া, পদ্মাবতকে ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিয়া এক অদ্ভুত কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল,—এই কাহিনী টড্ সাহেব "খুমান রাসা" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"From Rahup to Lakumsi, in the short space of half a century nine princes of Chitore were crowned...(i. 243). Lukumsi succeeded his father in S. 1331 (A. D. 1275). Beemsi was the uncle of the young prince, and protector during his minority. He had espoused the daughter of Hamir Sank (Chohan) of Ceylon, the cause of woes to the Seesodias. Her name was Pudmini. The Hindu bard recognizes the fair, in preference to fame and love of conquest, as the motive for the attack of Alauddin, who limited his demand to the possession of Pudmini. At length he restricted his desire to a mere sight of this extraordinary beauty, and acceded to the proposal of beholding her through the medium of mirrors. Relying on the faith of the Rajput he entered Chitore slightly guarded, and having gratified his wish, returned, ... He had an ambush, Beemsi was made prisoner, hurried away to the Tartar camp, and his liberty was made dependent on the surrender of Padmini...... [the dooli story] The choicest of the heroes of Cheetore met the assault. With Gorah and Badal at their head, animated by the noblest sentiments...For a time Alla was defeated in his object, and the havoc they made in his ranks, joined to the dread of their determined resistance, obliged him to desist from the enterprize."

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যে-কয়েকটি ভুল রহিয়াছে, তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। রাহপ হইতে লাক্ষসিংহ পর্য্যন্ত কেহই মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। কর্ণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেমসিংহ হইতে মিবার-সিংহাসনাধিকারী রাবল শাখা এবং রাহপ হইতে শিশোদে নামক জাগীরের সামন্ত রাণা-শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিবারপতি মহারাবল রত্নসিংহের মৃত্যুর পর লাক্ষসিংহ চিতোর-বাহিনীর সেনাপতিরূপে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের রাজ্যারোহণের সময় তড় লখমসী বালক ছিলেন না। তিনিই "মালবেশ-গোগাদেবজৈত্র লক্ষসিংহ।"* মালবপতি গোগা-ই ফিরিশ্‌তা-কথিত গোগা—যিনি ব্রিগ্‌স্ সাহেবের অনবধানতায় "কোকা" হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক লক্ষ সিংহ সম্বন্ধীয় ভুলের জন্য শুধু টড্ বা সমসাময়িক চারণেরা দায়ী নহেন। কেন-না জগদীশের মন্দিরস্থ শিলালিপি (বি. ১৭০৮); একলিঙ্গজীর মন্দিরস্থ শিলালেখ (বি. ১৭০৭); এবং মহারাণা রাজসিংহের আদেশে তৈলঙ্গবাসী ভট্ট মধুসূদনের পুত্র রণছোড় কর্ত্তৃক লিখিত ২৪ সর্গাত্মক রাজপ্রশস্তি মহাকাব্য—যাহা রাজসমুদ্র সরোবরের তীরে

---

* *History of Rajputana*, in Hindi, i. 22.

* Ranpur Inscription, dated S. 1499; Bhavnagar Inscriptions, p. 114. (Ojha. i. 512.)

২৫খানা বড় বড় শিলাখণ্ডে খোদিত হইয়াছিল এবং আজও বিদ্যমান আছে—তাহাতে শিশোদে রাণাদের সমস্ত পূর্ব্বপুরুষগণকে মিবার-রাজবংশের সামিল করা হইয়াছে। বংশাবলীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য শিলালেখ মহারাণা কুম্ভের সময় লিখিত কুঁভলগড়ের শিলালিপি (বি. ১৫১৭); ইহাতে রত্নসিংহের পরে লক্ষসিংহ, অরিসিংহ এবং হমীরের নাম দেওয়া হইয়াছে (Ojha, i. 519.)

পরবর্ত্তী ভাটদের খ্যাতে রতন সিংহ লুপ্ত হইলেও পদ্মিনী রহিয়া গেলেন। তবে তাঁহারা লক্ষ্মণ সিংহের সহিত রাণীর বিবাহ না দিয়া লক্ষ্মণ সিংহের পিতামহ ভীমসিংহকে খুল্লতাত বানাইয়া তাঁহার সহিত কেন পদ্মিনীর সম্বন্ধ স্থির করিলেন? বোধ হয় তাঁহাদের এটুকু স্মরণ ছিল যে, লক্ষ্মণ সিংহ ব্যতীত আর একজন প্রধান ছিলেন—যিনি পদ্মিনীর স্বামী এবং চিতোর-যুদ্ধে মারা গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সিংহের পিতামহও চিতোর রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন;* সেজন্য তাঁহাকেই পদ্মিনীর স্বামী বলিয়া খাড়া করা হইয়াছে। টড-লিখিত অবশিষ্ট বিবরণ জ্যায়সীর পদ্মাবতের ছায়া মাত্র।

যে-কাব্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পদ্মিনী উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ করেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ দেওয়া হইল।

গন্ধর্ব্ব সেন সিংহল দ্বীপের অধিপতি। তাঁহার দেশে দুঃখ দারিদ্র্য কুরূপ নাই; শীত-গ্রীষ্ম নাই—বারমাসই বসন্ত ঋতু বিরাজমান। তথাকার স্ত্রীমাত্রই পদ্মিনী-জাতীয়া—কেহ কুবলয়দলকান্তি; কেহ বা চাম্পেয়গৌরী। রাজা গন্ধর্ব্ব সেনের একমাত্র সন্তান পদ্মাবতী—রূপে গুণে অতুলনীয়া। উদ্ভিন্নযৌবনা রাজকন্যার ব্যথার ব্যথী ছিল একটি পোষমানা শ্রুতিধর শুক—নাম হীরামন। বর অনুসন্ধানে পিতার ঔদাসীন্য দেখিয়া পদ্মাবতী হীরামনকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিলেন। সিংহলদ্বীপ পার না হইতেই হীরামন ব্যাধের ফাঁদে পড়িয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হইল। চিতোরের এক ব্রাহ্মণ-বণিক লাভের আশায় মূলধন খোয়াইয়া দেশে ফিরিতেছিল, সে হীরামনকে ক্রয় করিয়া চিতোরে লইয়া গেল। চিত্রসেনের পুত্র চিতোর-রাজ রতনসেন হীরামনকে লক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া রাণী নাগমতীর মহলে রাখিলেন। নাগমতীর কপাল ভাঙিল। রতন সেন হীরামনের কাছে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া ষোল হাজার রাজপুত্রের সঙ্গে যোগীবেশে সিংহলযাত্রা করিলেন। উড়িষ্যার উপকূলে কলিঙ্গরাজ গজপতি তাঁহাকে সসম্মানে জাহাজে করিয়া সিংহলদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। সিংহল-রাজ্যে পৌঁছিয়া সশিষ্য কপট-যোগী রতন সেন মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল পূজার ছলনায় রাজকুমারী যখন বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে মহাদেবের মন্দিরে যাইবেন সেই সময় উভয়ের শুভদৃষ্টি হইবে। বসন্ত পঞ্চমীর দিন সখী-পরিবৃতা পদ্মাবতী শিবালয়ে চলিলেন। দূর হইতে প্রথম দর্শনেই রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যোগীর কিছুতেই সংজ্ঞা লাভ না হওয়ায় রাজকুমারী স্বহস্তে যোগীর অঙ্গে চন্দন অভিষেক করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে মূর্চ্ছা ভাঙিবার সম্ভাবনা আরও কম হওয়ায় পদ্মাবতী যোগীর বক্ষঃস্থলে চন্দন দিয়া লিখিয়া দিলেন—"যোগী! তোমার ভিক্ষালাভের উপযুক্ত যোগাভ্যাস হয় নাই, যখন ফল-প্রাপ্তির সময় আসিল তখন তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে।"

প্রেমের ফাঁপরে পড়িলে সাধুও চোর হয়,

---

* উদয়পুরের আট মাইল উত্তরে চীরবা নামক গ্রামে একটি মন্দিরে ৫১ শ্লোকযুক্ত একখানি শিলাপ্রশস্তি আছে। উহার তারিখ বি. সং. ১৩৩০ কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ (১২৭৩ খৃঃ), অর্থাৎ রত্নসিংহের পিতা সমরসিংহের রাজত্বকালে লিখিত। চাণ্ডেরড় বংশোৎপন্ন মদন—যাহার পূর্ব্বজেরা পুরুষানুক্রমে চিতোরের শহরতলীর তলারক্ষ বা কোতোয়াল ছিল—পাপক্ষয়ার্থ নির্ম্মিত শিবমন্দিরে এই প্রশস্তি যোজনা করিয়াছিলেন। উহাতে লেখা আছে:—

বিক্রান্তরঙ্গং সমরেখ রঙ্গঃ সপত্নসংহারকৃতপ্রযত্নঃ।
শ্রীচিত্রকূটস্য তলট্টিকায়াং শ্রীভীমসিংহেন সমং মমার॥
(চীরবা-শিলালেখ, শ্লোক ২৬। ওঝা ১ম, পৃ. ৪৭৩)

সমর সিংহের পিতা তেজসিংহের সময় সম্ভবতঃ ধোলকার বাঘেল-বংশীয় রাণা বীর ধবলের পুত্র বীসলদেব মিবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে চিতোরের শহরতলীর কোতোয়াল মদনের বড় ভাই রত্ন শ্রীভীমসিংহ দেবের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ রাবলশাখা মিবারের রাজা হইলেও কনিষ্ঠ রাণা-উপাধিধারী শিশোদিয়া সামন্তগণ বোধ হয় 'পুরুষানুক্রমে' রাজ্যের 'প্রধান'-পদে নিয়োজিত হইতেন। এই প্রশস্তির অন্য এক শ্লোকে আছে "শ্রীভীমসিংহ পুত্র প্রাধান্যং প্রাপ্য রাজসিংহোয়ং" ইত্যাদি (ওঝাকৃত রাজপুতানেকা ইতিহাস, ১ম, পৃ. ৪৭৩ দ্রষ্টব্য)।

পদ্মিনী-মহল

রাজপুত্রও সিঁধ কাটে। একদিন সিঁধ কাটিয়া পদ্মাবতীর মহলে প্রবেশ করিবার সময় রতন সেন ধরা পড়িলেন। ঘরজামাই হইয়া কিছুকাল সিংহলদ্বীপে বাস করিবার পর হঠাৎ তাঁহার নাগমতীর কথা মনে পড়িল। সংসারাসক্তির আকর্ষণে তিনি মোক্ষধাম ত্যাগ করিয়া পার্থিব রাজ্য চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন। একদিন পদ্মাবতী অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষাদান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার অনুপম রূপরাশি রাঘব-চেতন নামক এক পাপিষ্ঠের চোখে পড়িল। রাঘবের কাছে পদ্মিনীর সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জী চিতোর আক্রমণ করিলেন। পদ্মিনীর বিনিময়ে রতন সেনকে চন্দেরী রাজ্য দিবার প্রস্তাব করিয়া আলাউদ্দীন দূত পাঠাইলেন। লাঙ্গুলমর্দ্দিত সিংহের ন্যায় মিবার-রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "জীবন্ত সিংহের শ্মশ্রু-উৎপাটনে কে সাহসী হইয়াছে? যদি গৃহের গৃহিণীই ত্যাগ করিতে হয় তবে চিতোরই কি, চন্দেরী রাজ্যই বা কি?"

"জো পৈ জাই ঘরনি ঘর কেরী
কা চিতউর কা রাজ চঁদেরী।" পদ্মাবত, পৃঃ. ২৪২

এদিকে রাজা রতন সেনের সাহায্যার্থ তোঁবর পঁবার গহলোৎ, বাঘেলা, চৌহান, চঁদেল, গহরবার, পুরিহর ইত্যাদি রাজপুতগণ চিতোরে উপস্থিত হইল। মুসলমান-সেনা আট বৎসর দুর্গ অবরোধ করিয়াও শত্রুপক্ষের কিছু মাত্র বলক্ষয় করিতে পারিল না। এমন সময়ে সুলতানের কাছে সংবাদ পৌঁছিল পশ্চিমী হরেবগণ (পীতবর্ণ মোগল)—যাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আবার দিল্লীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। আলাউদ্দীন ছলনা করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। গোরা প্রভৃতি সামন্তগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া রতন সেন

মিত্রভাবে আলাউদ্দীনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাজপ্রাসাদে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দিকে সরোবর-বেষ্টিত আকাশস্পর্শী সুরম্য পদ্মিনী-মহলের প্রতি সুলতানের সতৃষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। অপ্সরাতুল্য ষোড়শ সহস্র দাসীকে দেখিয়া আলাউদ্দীন জ্ঞানহারা হইলেন। রাঘবচেতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইঁহাদের মধ্যে পদ্মিনী কে? ভোজের পর রাজা ও সুলতান শতরঞ্চ খেলায় বসিলেন। রাঘবের নির্দ্দেশ-মত সুলতান গৃহস্থিত সুবৃহৎ দর্পণের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। রাজা খেলার নেশায় নিবিষ্ট মনে বাজিমাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সুলতান শুধু খেলার ভাণ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ধ্যান ও চঞ্চল দৃষ্টি ছিল দর্পণের দিকে। আলাউদ্দীনের দূতী অন্তপুরঃস্থিতা পদ্মাবতীকে কোনো রকমে ভুলাইয়া মহলের জানালার কাছে আনিবার জন্য বলিল,—

> বাদ্‌শাহ দিল্লী কর কিত চিতউর মহঁ আব।
> দেখি লেহু, পদমাবতি! জেহি ন রহৈ পছিতাব॥

অর্থাৎ—দিল্লীশ্বর পুনর্ব্বার চিতোরে আসিবেন না। পদ্মাবতি! তাঁহাকে একবার দেখিয়া লও, যেন পরে আপশোষ না করিতে হয়।

অপরিচিত ব্যক্তিকে দর্শনের স্ত্রীসুলভ ঔৎসুক্য-প্রণোদিত হইয়া পদ্মাবতী বিশ্রব্ধচিত্তে ঝরোকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উঁহার বিপরীতদিকস্থ দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া আলাউদ্দীন গালিচার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। রাজা এ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতিথির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ধূর্ত্ত রাঘব রাজাকে বুঝাইয়া দিল, "সুলতানের সুপারীর নেশা লাগিয়াছে।"* সকলে ধরাধরি করিয়া আলাউদ্দীনকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিল। পরদিন সকালবেলা বিদায়-কালে সুলতান কথা বলিতে বলিতে রাজাকে চিতোরের সাত দরজার বাহিরে লইয়া আসিলেন। আলাউদ্দীন প্রথম দরজায় খেলাৎ একশত তুর্কী ঘোড়া তেইশটি হাতী ও দরবারী পোষাক, দ্বিতীয় দরজায় বাদশাহের খাস সওয়ারী ঘোড়া, তৃতীয় দরজায় বহুমূল্য রত্ন, চতুর্থ দরজায় কোটি মুদ্রার সামগ্রী, পঞ্চম দরজায় হীরার জোড়ি (কুণ্ডল?), ষষ্ঠ দরজায় মাণ্ডু-রাজ্য, সপ্তম দরজায় চঁদেরী-রাজ্য দিলেন। দুর্গের পাদদেশে অবতরণ করিয়া শার্দ্দূল নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজা রতন সেন শৃঙ্খলিত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন; চিতোরে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অবসর বুঝিয়া রাজা রতন সেনের শত্রু কুঁম্ভলমীর অধিপতি রাও দেবপাল পদ্মাবতীকে বিপথগামিনী করিবার উদ্দেশ্যে দূতী পাঠাইল। নিরুপায় রাণী গোরা ও বাদলের কাছে গেলেন। বীরদ্বয় রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। [গোরা বাদল কে ছিলেন তাহা পদ্মাবতে নাই। তাঁহারা যে পদ্মিনীর পিতৃকুলের লোক, সে-কথা টডই বলিয়াছেন। পদ্মাবত কাব্যপাঠে অনুমান হয়, তাঁহারা চিতোরের সামন্ত ছিলেন]।

গোরা-বাদলের নেতৃত্বে রক্ষীবেষ্টিত ষোলশত পালকী চিতোর-দুর্গ অতিক্রম করিয়া দিল্লী অভিমুখে চলিল। পদ্মিনীকে অঙ্কগত বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন তখন সুখ-স্বপ্নে বিভোর। রাণীর চতুর্দ্দোল হইতে এক কর্ম্মকার বাহির হইয়া দিল্লী-কারাগারে বন্দী রতন সেনের হাত-পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিল। গোরা বাদল প্রাণ দিয়া রাজাকে উদ্ধার করিলেন। চিতোরে পৌছিয়া রতন সেন পত্নীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবপালকে আক্রমণ করিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রতন সেন আহত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন—নাগমতী ও পদ্মাবতী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া জলন্ত চিতায় আহুতি দিলেন। এদিকে আলাউদ্দীনও সসৈন্য দুর্গের বাহিরে হানা দিলেন।

> জৌহর ভয়ি সব ইস্তিরী, পুরুষ ভয়ে সংগ্রাম।
> বাদশাহ গঢ় চুড়া চিতোর ভা ইস্‌লাম॥

অর্থাৎ স্ত্রীরা জৌহর প্রবেশ করিল ও পুরুষেরা রণ-শয্যায় শায়িত হইল। বাদ্‌শাহ দুর্গশৃঙ্গে পদার্পণ করিলেন। চিতোর দার-উল-ইসলামে পরিণত হইল।

পদ্মাবত কাব্য পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা "রাম-চরিতে"র ন্যায় ঐতিহাসিক কাব্য নহে; মুদ্রারাক্ষসের মত দশ আনি ছয় আনি ঐতিহাসিক নাটকও নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্যায়সী আলাউদ্দীনের রাজ্যকালে

---

* "রাঘব কহা কি লাগি সোপারী।
লেই পৌঢ়াবহি সেজ সঁবারী॥"
(পদ্মাবত, না. প্র. পৃ. ২৮৪)

মোঙ্গল-আক্রমণ, রণথম্ভোর-বিজয় ইত্যাদি ঘটনার সহিত সুপরিচিত হইয়াও রতন সেনের বাপের নামটা কি জানিতে পারেন নাই? বোধ হয় এ সময়ে লোকে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল। কাব্যের উপসংহারে কবি সংসারের অনিত্যতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

কাহাঁ সুরূপ পদ্মাবতী রাণী?
কছু না রহি জগ রহি কহানি॥
ধন্ন সোই ইহ কীরতি জাসু।
ফুল মরে পর মরে না বাসু॥

—কোথায় সেই রূপবতী রাণী পদ্মাবতী? পৃথিবী হইতে তাঁহার কাহিনী ছাড়া সব স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। যাঁহারা কীর্ত্তিমান্ তাঁহারাই ধন্য (কীর্ত্তি যস্য স জীবতি)। ফুল শুকাইয়া যায়; কিন্তু সুবাসটুকু কালের বাতাসে বিলীন হয় না।

তবে কি সত্যই জগতে জ্যায়সীর সময়ে পদ্মিনী-বিষয়ক কোনো কাহিনী ছিল? নতুবা সারা হিন্দুস্থান থাকিতে কবি চিতোরে স্থাননির্দ্দেশ করিলেন কেন? ইহার কারণ আছে। মুসলমান আক্রমণের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বার-বার ডুবিয়াও চিতোর বাত্যাতাড়িত সরসীবক্ষে পদ্মের ন্যায় নিজের সত্তা বজায় রাখিয়াছিল। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে চিতোর মুসলমান-রাহু-মুক্ত হইয়া হিন্দু স্বাধীনতার শেষ আশ্রয়স্বরূপ সগৌরবে আত্মরক্ষা করিতেছিল। সেজন্য কবি বলিয়াছেন,—

হৈ চিতউর হিন্দুনহ কৈ মাতা।
গাঢ় পরে তজি জাই ন নাতা॥

—চিতোর হিন্দুগণের জননী, বিপৎপাতে সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না।

স্ত্রীবেশে যোদ্ধাদের গোপনে শত্রু-দুর্গে পাঠাইয়া দুর্গ-অধিকারের কথা প্রাচীন ইতিহাস ও কাব্যে থাকিতেও পারে। কিন্তু রোহ্‌তাস-দুর্গ অধিকারের সময় শের শা এই কাজটা মুসলমান-যুগে সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শের শা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ডুলির মধ্যে পাঠান-যোদ্ধা পাঠাইয়া রোহ্‌তাস-দুর্গ অধিকার করেন; ইহার দুই বৎসর পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জ্যায়সীর পদ্মাবত রচনা আরম্ভ হয়। হিন্দুরাজার সদাশয়তা, লোভী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর চক্রান্ত, শের শার বিশ্বাসঘাতকতা, ইত্যাদি সমসাময়িক ঘটনা। ইহা হইতে জ্যায়সী রতন সিংহের বন্ধনমোচনের গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

জ্যায়সীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ঐতিহাসিক আবুল-ফজল। তাঁহার বর্ণিত কাহিনী পদ্মাবত হইতে গৃহীত হইলেও কোনো কোনো অংশে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আবুল-ফজল পদ্মিনীর নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন,—*Sultan Alauddin Khilji farman-rawan i-Delhi shanidand ke Rawal Ratan* Si *marzuban-i*-Mewar *Padmini e darad* [Sultan Alauddin Khilji, ruler of Delhi, heard that Rawal Ratan Si chief of Mewar possessed *a most beautiful woman.—Ain-i-Akbari*, ii. 269]

জ্যারেট সাহেব 'পদ্মিনী' শব্দের ভাবার্থ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন 'a most beautiful woman'। আবুল-ফজল বলিতেছেন, "দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী শুনিলেন মিবার-রাজ রাবল রতনসীর একটি পদ্মিনী ছিল—অর্থাৎ একজন পদ্মিনী-জাতীয়া স্ত্রী ছিল। পদ্মিনী নারীর পর্য্যায়-বিশেষ। মূল ফার্সী হইতে রতনসীর পদ্মিনী নামক একজন স্ত্রী ছিল কিংবা তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মিনী ছিল, এমন অর্থ হয় না। যেমন, অমুক বাবাজীর কাছে একটি পঞ্চমুখী আছে বলিলে বুঝিতে হইবে তাহার একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ আছে—পঞ্চাননী স্ত্রী নয়। যাহা হউক, ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কোনো অজ্ঞাত জনশ্রুতির পদ্মিনী-জাতীয়া স্ত্রী হইতে পদ্মিনী বা পদ্মাবত রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

মালিক মহম্মদ জ্যায়সী নিজেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন হয়ত তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে; রূপকচ্ছলে তিনি সুফী-সাধনার যে গূঢ় তত্ত্বগুলি পদ্মাবত-কাহিনীতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগের লোকে উহা ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করিবে। তাই তিনি কাব্যের উপসংহারে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

চৌদহ ভুবন জো তর উপরাহীঁ
তে সব মানুষ কে ঘট মাহীঁ॥
তন চিতউর, মন রাজা কীন্হা।
হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনী চীন্হা॥
গুরু সুআ জেই পন্থ দেখাবা।
বিনু গুরু জগত কো নিরগুণ পাবা?
নাগমতী ইহ দুনিয়া-ধন্ধা।
বাঁচা সোই ন এহি চিত বন্ধা॥

রাঘব দুত সোই শৈতানূ।
মায়া অলাউদ্দীন সুলতানূ।
প্রেমকথা এহি ভাঁতি বিচারহু।
বুঝি লেহু জো বুঝৈ পারহু।

—"সপ্ত পাতাল সপ্ত স্বর্গ রূপ চৌদ্দ ভুবন যাহা কল্পিত হইয়াছে ঐ সমস্তই দেহঘটেই বিদ্যমান (যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে)। মনুষ্য দেহই চিতোর, ইহার রাজা মন বা রতন সেন। চিত্ত-কমল সিংহলদ্বীপ—যাহা হইতে পদ্মিনী-রূপী বুদ্ধির উদ্ভব। শুক (হীরামন তোতা), মার্গ দর্শক গুরু। গুরু বিনা জগতে কে নির্গুণ পরব্রহ্মকে পাইতে পারে? নাগমতী (পদ্মাবতীর সপত্নী) এই দুনিয়ার ধাঁধা বা সংসারাসক্তি; যাহার চিত্ত ইহার নাগপাশে বাঁধা পড়ে নাই, সে-ই রক্ষা পাইয়াছে। রাঘবদূত যে পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা করিয়া আলা-উদ্দীনকে চিতোর আক্রমণে প্ররোচিত করিয়াছিল, সে-ই শয়তান বা মার। মায়াই সুলতান আলাউদ্দীন—যিনি পদ্মিনী-রূপী বুদ্ধি বা শুদ্ধাভক্তিকে আবিল ও কলুষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই প্রেম-কাহিনী এরূপই বিচার্য্য; যিনি পারেন বুঝিয়া লইবেন।"

জ্যায়সী যদি আজ কবর ছাড়িয়া টডের রাজস্থান পড়িতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই বলিতেন "হায়! উল্টা বুঝিলি রাম।"

রাজপুতানার চারণ-ঐতিহাসিকদের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যান সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন বুন্দীর চারণ ও সভাকবি মিশন সুরজমল। হাড়ারাজ্য বুন্দী ও কোটার "খ্যাত" হইতে তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে; "তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা" প্রভৃতি প্রধান প্রধান মুসলমান ইতিহাসও তিনি পড়িয়াছিলেন। কোটা বুন্দীর খ্যাতে পদ্মিনী-উপাখ্যানের উল্লেখ থাকিলে তিনি যে কোনো ইঙ্গিতমাত্র করিবেন না, এরূপ অনুমান করা কঠিন। তাঁহার বর্ণনার কোনো কোনো অংশে ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও উহা বিশেষরূপে সমালোচিত হইবার যোগ্য।

বংশ-ভাস্কর পাঠে জানা যায়, রনথম্ভোর দুর্গ আলা-উদ্দীন কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পর রাও হম্বীর চৌহানের পুত্র রতন সিংহ মিবার-রাজ লক্ষ্মণ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সিংহ রতনসিংহকে তাড়াইয়া দিতে কিংবা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমান-সেনা চিতোর আক্রমণ করে। হাড়ারাজ সমরসিংহ ভয়ে সুলতানকে বহু উপহার ও ভোজন-সামগ্রী দিয়া তাঁহার শরণাগত হয়। বহু হিন্দুরাজা বাধ্য হইয়া মুসলমান-সেনার সাহায্যার্থ আসিয়াছিল; উহার মধ্যে ৮৪ জন মারা যায়। তিন বর্ষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সিংহ ঘোরতর রণে সবংশে নিহত হইয়াছিলেন; কেবলমাত্র অজয়সিংহ শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করেন। এ যুদ্ধে কুমার অরিসিংহ হিঙ্গলু হাড়া, ও বল্লন নামক ক্ষত্রিয়বীর অনেকবার নৈশ আক্রমণ করিয়া অসীম শৌর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

ইহাতে পদ্মিনীর নামমাত্র নাই; ডুলীর গল্পও নাই। বংশ-ভাস্করের "বল্লন"ই বোধ হয় বাদল-সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির মূল। গোরার নাম ইহাতে নাই। টড-কথিত জনশ্রুতি অনুসারে গোরা ভিন্ন রাজ্যের লোক; জ্যায়সীর মতে মিবারের সামন্ত। বংশভাস্করের হিঙ্গলু গহ্‌লোৎ কিংবা চিতোরের সামন্ত নহেন; তিনি হাড়া-বংশী সাহায্যকারী সর্দ্দার। চিতোর-দুর্গের উপর হিঙ্গলু আহাড়ার মহল বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভাটেরা আহাড়াকে হাড়া বলিয়া ভুল করায় বুন্দীর বংশাবলীতে উহার নাম ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে 'আহাড়া' মিবারের পূর্ব্ব রাজধানী আহাড় নামক স্থানোৎপন্ন গহ্‌লোৎ বংশের এক শাখা—যাহা এখনও ডুঙ্গরপুরে রাজত্ব করিতেছে। হিঙ্গলু (হিংগোলো) আহাড়া ডুঙ্গরপুরের সর্দ্দার ছিলেন; মহারাণা কুম্ভকর্ণের সময় রাও যোধার সহিত যুদ্ধে মারা যান; তাঁহার ছত্রী যোধপুরের নিকট বালসমন্দ সরোবরের উপর এখনও অবস্থিত আছে।* হিংগোলোর বীরত্ব বোধ হয় গোরা-সম্বন্ধীয় কথার সৃষ্টি করে নাই। গৌর নামে একজন বীরপুরুষ বি. ১৫৪৫ (১৪৮৯ খৃঃ) অর্থাৎ পদ্মাবত-রচনার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাণা কুম্ভের পুত্র রায়মলের রাজত্বে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কুম্ভের অপর পুত্র পিতৃহন্তা "উদা"র প্ররোচনায় মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজী চিতোর অবরোধ করেন। এই যুদ্ধে বীরবর গৌর এক দুর্গশৃঙ্গ হইতে প্রত্যহ মুসলমানদিগকে

* Ojha, ii. 560.

আক্রমণ করিয়া অনেক শত্রু ধ্বংস করেন। এইজন্য মহারাণা রায়মল উক্ত শৃঙ্গের নাম গৌরশৃঙ্গ রাখিয়াছিলেন। শূরশ্রেষ্ঠ গৌর ম্লেচ্ছরুধিরস্পর্শ-পাপ স্বর্গ-গঙ্গায় ধৌত করিবার জন্য পরলোকগমন করেন।*

ঐতিহাসিকের অরণ্যে রোদন মাত্রই সার। শুনিতেছি, বর্ত্তমানে মিবারের চারণেরা জ্যায়সীর হীরামন তোতাটিকে উড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানে শাস্ত্রোক্ত হংসকে বসাইয়াছে।

*"কশ্চিদ্গৌরো বীরবর্য্যঃ শকোঘং যুদ্ধেযুধ্যন্ প্রত্যহং সংজহার।
তস্মাদেতন্নাম কামং বভার প্রাকারাংশশ্চিত্র কূটৈকশৃঙ্গং॥
*　　*　　*　　*
নিঃশেষীকর্ত্তু মমিচ্ছু র্ব্রজতি সুরসরিদ্বারিণি স্নাতুকামঃ॥
(See Ojha, ii. 640 *n.*)

মেয়ের মান

শ্রীসীতা দেবী

গঙ্গাচরণের সংসারটা ছিল নিতান্তই সাদাসিদা বাঙালী সংসার। তাহার ভিতর আশ্চর্য্য সুখ আনন্দও কিছু ছিল না, নিদারুণ দুঃখযন্ত্রণাও কিছু ছিল না। বাড়িতে বিধবা মা, স্ত্রী এবং দুইটি কন্যা। আপিসে দশটা পাঁচটা খাটুনি, মাসান্তে পঞ্চাশ টাকা মাহিনা এবং পাড়াতে তাসখেলার সঙ্গী দুই চারিজন। মাসের ত্রিশটা দিন, বৎসরের বারোটা মাস, একই তালে ছন্দে কাটিয়া যাইত, বৈচিত্র্য বলিয়া কোথাও কিছু ছিল না। গঙ্গাচরণ ইহাতেই সুখী ছিলেন, গৃহিণী সুরবালাও মোটের উপর অসুখী ছিলেন না। কেবল মেয়ের জন্ম দিতেছেন বলিয়া, শাশুড়ীর নিকট মাঝে মাঝে গঞ্জনা লাভ করিতেন বটে, তবে সেটাকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। শ্বশুরশাশুড়ীর সংসারে অমন একটু আধটু সব মেয়ের অদৃষ্টেই জোটে, তা মোটের উপর শাশুড়ী-ঠাকরুণ মানুষ মন্দ ছিলেন না। স্বামীরও বিশেষ দোষত্রুটি কিছু ছিল না; সংসারের খোঁজখবর বড়-একটা রাখিতেন না বটে, তেমনি বদখেয়ালও কিছু নাই। মাহিনার টাকা, দেশের জমিজমার আয় সব নিঃশেষে মায়ের হাতে তুলিয়া দেন, হাতখরচ বলিয়াও কিছু রাখেন না।

মেয়ে দুটি, হিরণ্ময়ী আর কিরণময়ী, ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছিল, একটি দশ বৎসরের আর একটি আট বৎসরের। গঙ্গাচরণের মায়ের এই একটা বিষয়ে দুঃখের অবধি ছিল না, তাঁহার একটি মাত্র ছেলে, বউয়ের ত দেখ যায় মেয়ে ভিন্ন কিছুই হইল না। তিনিও ত বুড়ী হইয়া পড়িয়াছেন, নাতির মুখ না দেখিয়াই কি মরিবেন?

কিন্তু ভগবান তাঁহার এ দুঃখও ঘুচাইয়া দিলেন। আট বৎসর পরে সুরবালা আবার সন্তানের জননী হইলেন, এবার কোলে আসিল খোকা। এমন সুন্দর ছেলে, দেখিলে দুই চক্ষু যেন জুড়াইয়া যায়। ঠিক যেন কনকচাঁপার কুঁড়ি। যে দেখিল সে-ই দশমুখে প্রশংসা করিল। কিন্তু মেয়েরা প্রায় সকলেই মন্তব্য করিল, "বেটা ছেলের এত রূপের কি-ই বা দরকার ছিল? মেয়ে দুটির একটির যদি এই চেহারা হ'ত, তাহলে বিয়ের ভাবনা আর ভাবতে হ'ত না, লোকে যেচে নিয়ে যেত। তা মেয়ে দুটিই ত হল শ্যামবর্ণ।"

সত্যই মেয়ে দুটির পাশে খোকাকে দেখিলে এক মা বাপের সন্তান বলিয়া বোধ হইত না। বুড়ী ঠাকুরমা ত নাতি কোলে করিয়া আনন্দে দিশেহারা হইয়া যাইতেন, তাঁহার আর ঠাকুরের কাছে চাহিবার কিছু ছিল না। মা কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া ছেলেকে আদর করিয়া যান, এমন কি গঙ্গাচরণের সংসারের ঔদাসীন্যই অনেকটা যেন কমিয়া গিয়াছে। আপিস হইতে ফিরিয়াই খোকার ডাক পড়ে, খোকার দিদিরা আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে আনিয়া পিতার দরবারে হাজির করে। নিজেরা যে স্নেহ যে আদর হইতে তাহারা বঞ্চিত, শিশু ভ্রাতার ভিতর দিয়া তাহা যেন উহারাও হৃদয় ভরিয়া পান করে। নিজেরা চিরদিন

অবহেলা, অনাদরে পালিত, কিন্তু সেটা তাহারা বিধির বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু ঘরের মেয়ে, খাইতে পরিতে পায়, নিতান্ত ঝাঁটা লাথি না খায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। ভাল একটা বিবাহ দিতে পারিলেই মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য পুরাপুরি করা হইল, এ ভিন্ন তাহাদের বিষয়ে ভাবিবার বা করিবার যে কিছু আছে তাহা কেহই স্বীকার করে না।

খোকার ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন হইল, নাম হইল অনঙ্গমোহন। আদর যে-পরিমাণে সে পাইল, তাহা রাজপুত্রের ভাগ্যেও জোটে না, তবে আয়োজনের দিকে অবশ্য অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল, কারণ তাহার পিতা দরিদ্র। ছেলে দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং শিশুসুলভ হাবভাবে বেশী করিয়া পিতামাতার হৃদয় কাড়িয়া লইতে লাগিল। দুরন্তপনা, অবাধ্যতার তাহার সীমা ছিল না, কিন্তু ঐগুলিই তাহার মনোহারিত্ব আরও যেন বাড়াইয়া তুলিত। ঘর-সংসারের জিনিষ সে ভাঙিয়া-চুরিয়া শতখান করিত, কিন্তু মা ঠাকুরমার কাছে কখনও উঁচু গলার কথাটি শুনিত না। বেটাছেলে দুরন্ত ত হইবেই! তাহার উৎপাত যেন বালগোপালের লীলার মতই তাহাদের হৃদয় বিগলিত করিত। বোনেদের সে মারিয়া ধরিয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কিন্তু তাহাদের ইহাতে কাঁদিবার জো ছিল না। হিরণ বা কিরণের চোখের জল আসিয়া পড়িলে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। ঠাকুরমা ক্যানকেনে গলায় তখনই গালাগাল সুরু করিতেন, "আ মোলো, রকম দেখ না? ভাই একটু গায়ে হাত তুলেছে, অমনি চোখে জল এসে পড়ল? মেয়েছেলে এমন অধৈয্য হ'লে চলে? এর পর কত লাথি ঝাঁটা খেতে হবে। আর কত সাধের এক ভাই, তার উপরও মেয়ের মায়া নেই।" বালিকাকে তখনই চোখের জল মুছিয়া ফেলিতে হইত, না হইলে মায়ের চড় পিঠে পড়িয়া, আরও কান্নার খোরাক জুটাইয়া দিত।

অনঙ্গমোহন ক্রমে ঘরের গণ্ডী ছাড়াইয়া গেল। ইহার পর পাড়াপ্রতিবেশীও কিছু কিছু তাহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইতে লাগিল। ছেলেটিকে দেখিতে ঠিক শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মত, কিন্তু সাদৃশ্যটা ঐখানেই শেষ। এত বড় দুষ্ট, শয়তান ছেলে পাড়ায় আর দুটি ছিল না। পাড়ার লোকে অবশ্য সব সময় মা ঠাকুরমার ভয়ে চুপ করিয়া থাকিত না, দশ ঘা দিয়া দুই ঘা অন্ততঃ অনঙ্গকে খাইয়া আসিতে হইত। কিন্তু ছেলে তাহাতে দমিবার পাত্র নয়, বাহিরে যতখানি শাস্তি পাইত, ঘরে আসিয়া মা বোনের উপর তাহার শোধ তুলিয়া লইত। দুনিয়াটা যে বিশেষ করিয়া তাহার লীলারই জন্য প্রস্তুত, এই বিশ্বাস খোকার ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল। এখানে স্বজাতীয়ের হাতে মাঝে মাঝে চড় ঘুষি খাইতে হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতি যে কেবলমাত্র পুরুষজাতির সেবাযত্নের জন্য সৃষ্ট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বাড়িতে তাহারা পুরুষ দুইটি এবং স্ত্রীলোক চারিটি, দিনরাত্রের মধ্যে ঘণ্টা পাঁচ ছয় ঘুমের সময় ভিন্ন,নারীগুলির কেবল এক ধ্যান, এক কার্য্য—কি করিয়া এই শাপভ্রষ্ট দেবতা দুইটিকে সুখে রাখা যায়, আরামে রাখা যায়। তাহারা তৃপ্তির হাসি হাসলে নারীদের জীবন সার্থক হইয়া যায়, তাহারা বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলে উহাদের জীবনের আর কোনো অর্থই থাকে না। আর কিছু বুঝিবার আগে এই কথাটা খোকা অনঙ্গমোহন বেশ ভাল করিয়াই বুঝিল।

তাহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন বড়দিদি হিরণের বিবাহ হইয়া গেল। পয়সাকড়ি জমানো কিছুই ছিল না। মেয়ের বিবাহ বিনা খরচে হইবার ব্যাপার নয়, কাজেই গঙ্গাচরণকে জমিজমা বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করিতে হইল। যাহার জন্য এতটা করিতে হইল, তাহার উপর রাগ হওয়াও একটু স্বাভাবিক। হিরণ ইচ্ছা করিয়া কন্যা-জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং বরপণ দিয়া কন্যার বিবাহের নিয়মও সে প্রবর্ত্তন করে নাই, তবু সে যখন টাকা খরচের উদ্বেগের এবং অপমানের উপলক্ষ্য তখন গালাগালি খানকটা খাইলই। সঙ্গে সঙ্গে কন্যার জন্ম দেওয়ার জন্য তাহার মাতাও কিছু কিছু বাক্যসুধা পান করিলেন এবং কনিষ্ঠ কিরণও যে বাপের গলায় ছুরি দিবার জন্য অস্ত্র শানাইতেছে তাহা অনেকবার করিয়া শুনিল। খোকা গালাগালিগুলি ভাল করিয়া শিখিয়া রাখিল এবং গাল কেন যে দেওয়া হইতেছে, তাহাও এক রকম বুঝিয়া লইল।

কিরণ কিন্তু বাপের গলায় ছুরি না দিয়াই বছর দুই পরে পার হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষের বর একটি জুটিয়া গেল। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সে ব্যক্তির উচ্চ ধারণা ছিল না এবং ঘরভরা ছেলে মেয়ে অসামাল হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই দেনাপাওনা লইয়া কোনো গোলমাল না করিয়াই সে বিবাহ করিয়া বসিল। গঙ্গাচরণ এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন। দুই বোন চলিয়া যাওয়ায় অনঙ্গমোহনের আদরযত্নের একটু ক্রটি হইতে লাগিল। ইহাতে সে বিষম চটিয়া গেল। মাকে গাল দিল, ঠাকুরমার শনের নুড়ির মত চুল ধরিয়া টানিয়া বুড়ীকে অস্থির করিয়া তুলিল। বই শ্লেট সব নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া রাগ করিয়া পাঁচ ছয় দিন আর স্কুলেই গেল না। গঙ্গাচরণ ছেলেকে শাসন করিতে আসিয়া শুনিলেন, স্কুলের সময় খোকাকে খালি ডাল আর মাছ ভাজা দিয়া ভাত দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সে স্কুলে যায় নাই।

গঙ্গাচরণ রাগিয়া বলিলেন, "চব্বিশটা ঘণ্টা বসে বসে কি কর বল্‌তে পার? একটা ত ছেলে, তাকেও ঠিক সময় খেতে দেবার ক্ষমতা নেই? সে-ই যদি না খেল, তবে রাঁধ কিসের জন্তে? নিজেরা শূওর-পেটে গিল্‌বে ব'লে?"

সুরবালা দোষ মানিয়া লইলেন। আজ হঠাৎ তাঁহার চিরকালের অনাদৃতা মেয়ে দুইটির জন্ত মন কেমন করিয়া উঠিল। তাহারা থাকিতে কোনোদিন কাজে এদিক-ওদিক হয় নাই। বেশীর ভাগ কাজ ত তাহারাই করিত, তিনি শুধু উপর উপর তত্ত্বাবধান করিতেন। বাছারা কোনোদিন একটা কথা মুখ ফুটিয়া বলে নাই, চিরদিন নীরবে গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া গিয়াছে। মনে মনে বলিলেন, "ছেলেকে ত সবাই মিলে মাথায় তুলে রাখ্‌ছি, ছেলে স্বর্গে বাতি দেবে।" কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, মুখ ফুটিয়া বলিবার ভরসা ছিল না। ছেলের সেবার যাহাতে ক্রটি না হয়, সেদিকে বেশী করিয়া দৃষ্টি রাখিলেন।

অনঙ্গমোহনের রূপ ছিল যথেষ্ট, বুদ্ধিও কিছু কিছু আছে দেখা গেল। পড়াশুনার উৎপাত তাহার ছিল না বলিলেই চলিত, কিন্তু ক্লাসে সে পড়িয়া থাকিত না। গঙ্গাচরণ তাসের আড্ডায় গর্ব্ব করিতেন, "ছোঁড়া যদি দিনে এক আধ ঘণ্টাও পড়ত, তাহলে তার ফার্ষ্ট হওয়া আট্‌কায় কে? একেবারে বই হাতে করে না, তবু ক্লাস প্রোমোশন ত পেয়ে চলেছে।" কথাগুলা অনঙ্গমোহনের কানে কোনোমতে পৌঁছিয়াই গেল, নিজের সম্বন্ধে ধারণা তাহার আরও দুই ধাপ উপরে উঠিয়া গেল।

ইহার পর দিন কাটিয়া চলিল। দুই চারিটা সংসারিক ঘটনা ভিন্ন গঙ্গাচরণের পরিবারে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বৃদ্ধা মাতা মারা গেলেন, কিরণ বিধবা হইয়া বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিল এই পর্য্যন্ত। অনঙ্গের স্বভাবচরিত্র বা চেহারার বিশেষ কিছু বদল হইল না। কোনোমতে বই-বিশেষ হাতে না করিয়াও, সে দ্বিতীয় বিভাগে মাট্রিকুলেশন্ পাস করিয়া গেল।

ইহার পর কলেজে পড়ার পালা। অনঙ্গ জেদ ধরিল সে কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়িবে। গঙ্গাচরণ কলিকাতার আপিসে কাজ করিয়া চুল পাকাইলেন, কিন্তু হাওড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবার মতলব কোনোদিন তাঁহার হয় নাই। বাড়ি ভাড়াটা কম, আর এই বাড়িতে তাঁহার পিতা আমরণ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইহাই ছিল বাড়িটার প্রধান গুণ। সুতরাং অতখানি পথ যাওয়া-আসা করা যতই কষ্টকর হোক্, তাহার বিরুদ্ধে মনে মনেও তিনি আপত্তি করেন নাই। কিন্তু নূতন রাজার, নূতন ব্যবস্থা। অনঙ্গ মুখে বলিল, "অতটা পথ রোজ যাওয়া আসা করা আমার দ্বারা হবে না। ঐ রকম সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরতে হ'লে দুদিনে আমি মারা যাব।" গঙ্গাচরণ বলিলেন, "তা বল্‌তে পারে, ওর অভ্যেস্ ত নেই? আমাদের কষ্টের শরীর সয়ে গেছে।"

সুরবালার ছেলে সম্বন্ধে ধারণা তত উচ্চ আর ছিল না। মাকালফলের রূপ যতই মনোহর হউক, তাহার ভিতরের খবর চিরকাল চাপা থাকে না। বিধবা কিরণের সঙ্গে ছেলে কুব্যবহার করিত, ইহাও মাঝে মাঝে তাঁহার অসহ্য লাগিত। স্বামীর কথায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার যা সয়েছে, ছেলেরও তা সইবে। মেসের খরচ তাঁর আস্‌বে কোন্ চুলোর থেকে?"

গঙ্গাচরণ বলিলেন, "যে চুলো থেকে সব-কিছু আসে। জমিজমা বাঁধা দিয়েও ওকে মানুষ করতে হবে। ওর জন্যেই ত সব। ও ভাল করে পাস করলে, তখন ওর উপার্জ্জন খায় কে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা মরলে পরে বিধবা মেয়েটা কি পথে বস্‌বে ? দেশের ঘরখানা থাক্‌লেও সেখানে সে মাথা গুঁজে থাক্‌তে পারত, না হয় ধান ভেনে খেত। সেটাও ঘুচিয়ে 'দচ্ছ ?"

গঙ্গাচরণ বলিলেন, "অত ভাবতে গেলে সংসারে কোনো কাজ করা চলে না, হাত পা বাঁধা হয়ে পড়ে। খোকা কি বোনকে দুমুটো খেতেও দেবে না ?" সুরবালা বলিলেন, "বোনকে যা খেতে দেবে, তার ত নমুনা নিত্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি। রোজ মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে করে, আদ্ধেক্ দিন তার পেটে ভাত যায় না। হতভাগীর কপালই মন্দ, না হ'লে ভাইয়ের লাথি ঝাঁটা খেতে আবার এই বাড়ি ফিরে আসে ?"

গঙ্গাচরণ চটিয়া বলিলেন, "ছেলের কিছুই ত তুমি ভাল চক্ষে দেখ না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ত ছেলে, তার নিন্দে তোমার মুখে রাত দিন লেগে আছে। যখন হয়নি তখন ত ছেলের জন্যে দুচোখে ধারা বইত।"

সুরবালা বলিলেন, "যাক্ গে, কথা বাড়িয়ে লাভ কি ? দাও গে যাও জমি বাঁধা। কিরণের কথা আগেই বা আমরা কি ভেবেছি, যে এখন ভাবতে বসব ? লোহা-সিঁদুর বজায় রাখবার পথ ত আমরা জেনে শুনে বন্ধ করেছি। তেকেলে বুড়োর হাতে মেয়েটাকে দিয়ে দিলাম, তার অদেষ্টে সুখ হবে কোথা থেকে ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "অদৃষ্টে না থাক্‌লে সুখ কিছুতে হয় না, মানুষকে দুষ্‌তে যাওয়া বৃথা। দ্বিতীয় পক্ষের বউও ড্যাঙ ড্যাঙ্ করে সিঁদুর মাথায় নিয়ে চলে যায়, আবার প্রথম পক্ষের বউও বিধবা হয়। যার যা ভাগ্যলিপি। আর একটা কথা ভেবে দেখ্‌ছ না। আমার ছেলে যদি বি-এ অবধি পাস করে যায়, তাহলে তার মত যোগ্যপাত্র বাজারে বেশী থাক্‌বে না। ছেলের বিয়ে দিয়েই জমিজমা সব ছাড়িয়ে নিতে পারব।"

রান্নাঘরে উনুনের আঁচ বহিয়া যাইতেছিল, কিরণের আজ আবার একাদশী, কাজেই গৃহিণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। কিরণ ঘর হইতে কখন উঠিয়া আসিয়া ইহারই মধ্যে তরকারি চড়াইয়াছে, না হইলে অনঙ্গের খাওয়ার সময় সব রান্না হইয়া উঠিবে না। তাহা হইলে বাবা এবং ভাই মিলিয়া মায়ের যা আপ্যায়ন করিবে, তাহা তাহার জানাই ছিল।

মা ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আবার মরতে এলি কেন এখানে ? তখন না বারণ করে গেলাম ?"

কিরণ বলিল, "ঘরে বসে কেবল ঝগড়াই করছ, এ দিকে আঁচ যে বয়ে যায় ? তারপর খোকা যখন হেনস্তা করবে, তখন ত কাঁদতে বস্‌বে ?"

সুরবালা বঁটিখানা টানিয়া বসিয়া গেলেন। মেয়েকে বলিলেন, "করে করবে, তুই যা ত! যে কটা দিন আমি আছি, একাদশীর দিনটা আর আগুনতাতে পুড়তে এস না।"

কিরণ খানিক দূরে সরিয়া বসিল, তাহার পর বলিল, "তুমি যাবার পরও যদি ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব, এ সংসারে আর থাকবো না।"

সুরবালা বলিলেন, "মিথ্যে নয় বাছা, কি যে তোর দশা হবে, ভেবে আমার আর মুখে ভাত রোচে না।"

কিরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আর এখন ভেবে কি হবে মা ? বাঙালী ঘরের বিধবা তার জন্য আবার ভাবনা।"

মা উত্তর দিবার কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না, মেয়েও উঠিয়া গেল।

অনঙ্গমোহন কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতার মেসে চলিয়া আসিল। বাড়ির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। এখানে তাহার মত আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত ছেলের ডানা মেলিবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল। কলেজের মেসে কি পরিমাণ খরচ হয়, তাহা গঙ্গাচরণের ঠিক জানা ছিল না, কাজেই ছেলে টাকা চাহিলে সাধ্য মতে তিনি দিতে ত্রুটি করিতেন না।

অনঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া ভাব করিল যত-সব উপর-চালাক মুখফোঁড় ছেলের সঙ্গে। থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিয়া, কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির মুখ উজ্জ্বল করিয়া অবসর-মত পড়াশুনা একটু আধটু করিয়া তাহার দিন বেশ কাটিতে লাগিল। রবিবারে বাড়ি যাইতে বলিলেই তাহার মাথায় বাজ পড়িত। সেই দিনটা ছিল তাহার চিত্তবিনোদনের দিন, সেটাকে এমনভাবে মাঠে মারা যাইতে দিতে সে কিছুতেই রাজী ছিল না।

বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার দুরন্তপনা, গুণ্ডামি অনেকটাই কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজের সুখ ও সুবিধা ভিন্ন আর কিছু সে ভাবিতেই পারিত না। অতিশয় ইন্‌টেলিজেন্ট ছেলে না পড়িয়াও টপাটপ পাস করিয়া যায় এই সুনামটা বজায় রাখিবার জন্য রাত্রে তাহাকে লুকাইয়া খানিকটা পড়িতে হইত, দিনের বেলাটা অবশ্য ফুর্ত্তি করিয়াই সে কাটাইয়া দিত। বড় ছুটির দিনগুলা প্রথম বৎসর বাধ্য হইয়া মা বাপের কাছেই কাটাইতে হইল। দ্বিতীয় বৎসর গরমের ছুটিতে শরীর খারাপের অজুহাত করিয়া সে দার্জ্জিলিং পলায়ন করিল। অবশ্য বাপকে বেশী ভোগায় নাই। নানারকম ফন্দি ফিকির করিয়া, ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করিয়া সে লুইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়মে একটা ফ্রী সিট সংগ্রহ করিল এবং ইণ্টার ক্লাসেই চলিয়া গেল। অবশ্য আবশ্যকীয় শীতবস্ত্রের জোগাড় করিতে সুরবালার হাতের রুলি জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। এবার তাঁহার শাঁখা সম্বল হইল, বাকি গহনা বিক্রী করিয়া হিরণের বিবাহের পর জমি ছাড়ান হইয়াছিল।

ছুটিটা তাহার বড় আনন্দে আরামে কাটিল। একে-ত খাওয়া শোয়ার এমন নবাবী ব্যবস্থা, যে তাহাতে অনঙ্গের মত সুখী প্রকৃতির প্রাণী খুশী না হইয়াই পারে না। তাহার উপর এমন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, রাস্তায় ডিগবাজী খাইলেও কেহ খুঁৎ ধরিবার নাই। অনঙ্গ মনে মনে ভাবিল, "লোকে যে কেন হোম সিক হয়, আমি কিছু ভেবেই পাই না, আমার ত বাড়ির থেকে যত দূরে যাই, তত ফুর্ত্তি বাড়ে।" একটা মাস তাহার যেন একটা দিনেরই মত দ্রুতগতিতে কাটিয়া গেল।

নিজের রূপ এবং বুদ্ধির প্রশংসা শুনিতে না পাইলে অনঙ্গের মোটেই সুবিধা হইত না, সবই তাহার কাছে বিস্বাদ লাগিত। সৌভাগ্যক্রমে সেটাও তাহার অভাব হইল না। স্যানিটেরিয়মে বৃদ্ধগোছের বাঙালী ভদ্রলোকের রীতিমত ভিড়, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই এই অতি প্রিয়দর্শন যুবকের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কথাবার্ত্তায় পরের চিত্ত আকর্ষণ করিতে অনঙ্গের জুড়িদার কমই ছিল, এই ক্ষমতাটাও সে কাজে লাগাইবার বেশ সুযোগ পাইল।

প্রথম কয়দিন সে বেড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাহার চারিদিকে কাহারা বাস করিতেছে, সে-খোঁজ বিশেষ করে নাই। ক্রমেই চারিদিকে তাহার নজর পড়িতে লাগিল। অনঙ্গ আবিষ্কার করিল যে, কেবল বৃদ্ধ বাঙালী বাবুই এখানে নাই, অন্যরকম মানুষও অনেকগুলি আছে। অতি নিকটেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পরিবার লইয়া আছেন। তিনি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুটি ছেলে মেয়ে। মেয়েটি বেশ বড়, দেখিলে বছর কুড়ি বয়স মনে হয়, ছেলেটি অনেক ছোট, বারো-তেরো বৎসরের বেশী হইবে না।

মেয়েটি দেখিতে কিছু সুন্দরী নয়, রং ত রীতিমত কালোই। তবে মুখে বেশ একটি সতেজ শ্রী আছে। শরীরে বা মুখে কোথাও জড়তার লেশমাত্র নাই, বেশ সপ্রতিভ আর কর্ম্মিষ্ঠা। তাহাকে অনঙ্গ কোনো সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিত না। মা বাপকে সে শিশুর মত যত্ন করিত, তাঁহাদের সেবার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। বাকি সময় ভাইকে পড়াইত, সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইত এবং মেঘলা সন্ধ্যায় প্রায়ই এস্রাজ বাজাইয়া বাপকে গান শুনাইতে বসিত। গলাটা মন্দ নয়, তবে একেবারে খুব যে চমৎকার তাহাও নয়।

রূপ জিনিষটার দাম ছিল অনঙ্গের কাছে সকলের চেয়ে বেশী। বিশেষ করিয়া নারীর মধ্যে রূপ ভিন্ন আর কোনো জিনিষ যে লক্ষ্য করিবার মত থাকিতে পারে, তাহা সে মনেই করিত না। পিতামাতা তাহার বিবাহ দিয়া অনেক টাকা লাভ করিতে চাহেন, তাহা সে জানিত। কিন্তু যে-মেয়ের রূপ তাহার রূপকেও হার মানাইতে না

পারিবে, তাহাকে কখনই সে বিবাহ করিবে না, ইহা সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; দশ হাজার টাকা দিলেও না। আজকাল সকলে যে মেয়েকে লেখা-পড়া শিখায়, গান বাজনা শিখায়, তাহা সে জানিত, ইহাতে তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু এগুলিকে খুব বেশী প্রয়োজনীয়ও সে বোধ করিত না। সবই ত পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য? কিন্তু যে-মেয়ে কালো কুৎসিৎ, সে হাজার শিক্ষিতা হইলেও তাহার কিই বা মূল্য? এই ছিল তাহার মোটের উপর ধারণা। অবশ্য কোনো শিক্ষিতা মেয়ের সহিতই সে এ পর্য্যন্ত মিশিবার সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু এই মেয়েটি সুন্দরী না হইলেও অনঙ্গের দৃষ্টিকে বড় বেশী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার নাম ধাম পরিচয়, সবই দুই চারি দিনের ভিতর সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। মেয়েটির নাম মৈত্রেয়ী রায়, থার্ড ইয়ারে পড়ে। তাহার পিতা অখিলচন্দ্র রায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এখন পেন্‌সন্ লইয়াছেন। বয়স তত হয় নাই, কিন্তু শরীর অসুস্থ। তাঁহার পত্নীও অসুখে ভুগিতেছেন। ছেলেটির নাম সন্তোষ, সে ফোর্থ ক্লাসে পড়ে, হেয়ার স্কুলে। তাহার সঙ্গে অনঙ্গ চট্ করিয়া ভাব করিয়া লইল।

মৈত্রেয়ীর বয়স অনঙ্গের সমানই হইবে, কিন্তু সে এক ক্লাস উপরে পড়ে জানিয়া অনঙ্গের মনটা প্রথমে একটু পীড়িত হইয়া উঠিল। তাহার পর নিজেকেই সান্ত্বনা দিল যে মেয়েদের ত দিনরাত বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন কর্ম্ম নাই, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি তাহাদের? সুতরাং মুখস্থ বিদ্যার জোরে চট্‌পট্ পাস করিবে সে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ছেলেরা সারাদিন রাত অত পড়িতে পারে না। কিন্তু জেনারেল নলেজ নিশ্চয়ই মৈত্রেয়ীর চেয়ে অনঙ্গের বেশী আছে। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার ইচ্ছাটা ক্রমেই অনঙ্গের প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

আলাপ পরিচয় হইতেও খুব বেশী দেরি হইল না। সন্তোষের সঙ্গে অনঙ্গ এমন ভাব জমাইয়া তুলিল যে, সে চব্বিশ ঘণ্টাই দিদি এবং মা বাবার কাছে অনঙ্গ-বাবুর গল্প করিতে লাগিল। অনঙ্গকে তাঁহারাও অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কারণ তাহার চেহারাটা বাঙালী ঘরের ছেলের পক্ষে একটু অতিরিক্ত রকম ভাল ছিল। মৈত্রেয়ী প্রায়ই দেখিত সে যখন গান গায় কিংবা সন্তোষকে লইয়া বারান্দায় পড়াইতে বসে, তখন অনঙ্গ কোনো একটা ছুতায় নিকট দিয়া কেবলই যাওয়া-আসা করে। ক্রমে মৈত্রেয়ীরও অভ্যাস হইয়া গেল, গাহিতে বসিলেই সে একবার তাকাইয়া দেখিয়া লইত অনঙ্গ কাছে আছে কি না।

এ অবস্থায় যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল। মৈত্রেয়ী দেখিল সে এই অপরিচিত যুবক সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। কে এ, কোথায় এর ঘরবাড়ি, কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে, কিছুই সে জানে না। কেন সে জানিয়া শুনিয়া এমন বেদনার পথে পা বাড়াইতেছে? সে সুন্দরী নয়, অনঙ্গ রূপবান্, সে কি কখনও মৈত্রেয়ীকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবে? মৈত্রেয়ীর মা বাবা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন? মৈত্রেয়ী নিজেকে ধিক্কার দিল। চিরদিন সে অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছে যে, বিবাহ করিয়া বসিয়া বসিয়া স্বামীর অন্ন ধ্বংস করা তাহার আদর্শ নয়, সে নিজেকে সর্ব্বরকমে গড়িয়া তুলিবে, নিজের কার্য্যের পথ নিজে খুঁজিয়া লইবে। এখন সে কি না সামান্য প্রলোভনেই পথভ্রষ্ট হইতে চলিল? তাহার আরও লজ্জা করিতে লাগিল এইজন্য যে, অনঙ্গের দিক হইতে কোনো উৎসাহই প্রকাশ পায় নাই, সে-ই কি নারী হইয়া প্রথমে হৃদয়দান করিয়া বসিবে? প্রতিদানে হয়ত অপমান ভিন্ন কিছুই জুটিবে না। মৈত্রেয়ী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনঙ্গের আগ্রহ কিন্তু দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। মৈত্রেয়ীকে সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল কি-না বলা শক্ত, তবে তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার, তাহার হৃদয়জগতে স্থান পাইবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল। এতদিন তাহার জীবনে নারীর কোনো স্থান ছিল না, তাহারা কেবল

দাসীর মত পুরুষের সেবা করিবে ইহাই সে ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ঘরে মা-বোনের যে রূপ সে দেখিয়াছে, এই মেয়েটির রূপ তাহা হইতে অনেকখানিই বিভিন্ন। এ যেন পুরুষের সমকক্ষ, এ যদি কাহারও সেবা করে তাহা অনুগ্রহ করিয়া করিবে, অবনত হইয়া নহে। ইহাকে মাথা হেঁট করাইবার, কাঁদাইবার ইচ্ছাও যেন অনঙ্গের মনে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছিল, অবশ্য সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল না।

সন্তোষের কল্যাণে শীঘ্রই তাহার আলাপ করিবার সুযোগ জুটিয়া গেল। সকাল বেলা চা খাওয়া শেষ করিয়া সে সবে বেড়াইতে বাহির হইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় সন্তোষ ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। বলিল, "অনঙ্গবাবু, আজ বিকাল চারটায় আমাদের ওখানে চা খাবেন, বেরিয়ে যাবেন না কিন্তু।"

মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া, মুখে একটু ঔদাসীন্যের ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আজ তোমাদের ওখানে কি?"

সন্তোষ বলিল, "আমার জন্মদিন আজ। কলকাতায় থাকতে আমার সব বন্ধুদের নেমন্তন্ন করি, এখানে ত আপনি আর বঙ্কুদা ছাড়া আর কেউ বন্ধু নেই, তাই আপনাদেরই নেমন্তন্ন করছি।"

অনঙ্গ বলিল, "আচ্ছা যাব," বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। মনটা তাহার আনন্দ আর উত্তেজনায় কানায় কানায় ভরিয়াছিল। আজ হয়ত মৈত্রেয়ীর সহিত আলাপ হইবে, সে কি অনঙ্গের চেহারায়, মার্জ্জিত কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হইবে না? তাহার হয়ত অনেক ছেলের সঙ্গে আলাপ আছে, অনঙ্গকে হয়ত বিশেষ ভাল কিছু লাগিবে না। তবু অনঙ্গ চমক লাগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তাহার চেহারাটা অন্ততঃ সাধারণ বাঙালী যুবক অপেক্ষা অনেকটাই ভাল, তাহা মৈত্রেয়ী স্বীকার না করিয়াই পারিবে না।

চায়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া কোনো জন্মে অনঙ্গের অভ্যাস ছিল না। নিঃসম্পর্কীয়া মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও সে কোনোদিন করে নাই। বসিয়া বসিয়া সে মনে মনে কেবলি নিজেকে তালিম দিতে লাগিল; কি সে বলিবে, কেমন করিয়া চলিবে ফিরিবে। কিরূপ পোষাক করিয়া যাইবে তাহাও স্থির করিয়া রাখিল। অবশেষে বেলা এগারোটায় সন্তোষের জন্য একটা ফুটবল কিনিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

চারটা আর বাজিতেই চাহে না। অনঙ্গ ত অস্থির হইয়া উঠিল। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে আর ঘর-বাহির করিতে করিতে বেলাটা কোনোমতে কাটিয়া গেল। তিনটা বাজিতে-না-বাজিতেই সে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে আরম্ভ করিল। চারিটা যখন বাজিল তখন অনঙ্গ প্রায় বিবাহের বরের মত সাজিয়া ফিট্‌ফাট হইয়া বসিয়া আছে। নিজেই যাইবে, না সন্তোষের জন্য অপেক্ষা করিবে তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় সন্তোষ আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া হিড়্‌হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

বসিবার ঘরে বেশী লোক ছিল না, মৈত্রেয়ী ও তাহার বাবা এবং একটি অপরিচিত যুবক, অনঙ্গ বুঝিল এইটিই বঙ্কুদা। সন্তোষের মা পাশের ঘরে জলখাবার গুছাইতেছিলেন, তিনি তখনও আসেন নাই।

অনঙ্গ ঘরে ঢুকিতেই অখিলবাবু বলিলেন, "এস বাবা, তুমি যদিও আমাদের অচেনা, তবু সন্তোষের কাছে গল্প শুনে শুনে অনেক কালের পরিচিত বলেই মনে হয়।"

অনঙ্গ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সামনে যে চেয়ারখানা পাইল তাহাতেই বসিয়া পড়িল। তাহার বড় অপ্রতিভ লাগিতেছিল, কোনো শিক্ষিতা মেয়ের এত কাছে কোনোদিন সে আসে নাই। পাছে কোনো রকম বোকামী করিয়া বসে এই ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার কান দুটা ক্রমেই লাল হইয়া উঠিতেছিল।

মৈত্রেয়ীকে আজ তাহার চক্ষে রীতিমত সুন্দর লাগিল। মনে মনে স্বীকার করিল যে, রংকালো হইলেও মানুষ সুন্দর হইতে পারে। সে যে কি রং-এর পোষাক, কি গহনা পরিয়াছিল, তাহা অনঙ্গের অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বিশদ ভাবে ধরা পড়িল না, কিন্তু সব জড়াইয়া একটা সহজ শ্রীর অনুভূতি তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অখিলবাবু যখন বলিলেন, "এইটি আমার

মেয়ে মৈত্রেয়ী, তখন সে থামিয়া থতমত খাইয়া নমস্কার করিতেই ভুলিয়া গেল। মৈত্রেয়ী নমস্কার করিবার পর সে কোনোমতে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইল।

তাহার এই সলজ্জ অপ্রতিভ ভাবটা মৈত্রেয়ীর কেমন একটু ভাল লাগিল। অনঙ্গ যদি খুব বেশী সপ্রতিভ ভাব দেখাইত মৈত্রেয়ী তাহা হইলে হয়ত আরও পিছাইয়া যাইত। কিন্তু এই যুবকটি একেবারে নব্য সমাজে মেলামেশা করিতে অনভ্যস্ত বুঝিতে পারিয়া, মৈত্রেয়ী সাহস করিয়া নিজেই যাচিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

অনঙ্গের কাছেই একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই প্রথমবার দার্জ্জিলিং এসেছেন?"

অনঙ্গ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগছে? সব জায়গায় বেড়ান হয়ে গিয়েছে?"

অনঙ্গ যতই চেষ্টা করিতেছিল, বেশ সহজ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলিবে, ততই তাহার কথা বাধিয়া যাইতেছিল এবং কপাল ঘামিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কথা না বলিলেও নয়, প্রথম দিনই যদি মৈত্রেয়ী তাহাকে একটা ভ্যাবাগঙ্গারাম স্থির করিয়া লয়, তাহা হইলে কোনো দিনই অনঙ্গ সম্বন্ধে তাহার শ্রদ্ধা হইবে না। অনেক চেষ্টায় নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল, "ভালই লাগছে। দেখবার জায়গা সবই প্রায় দেখেছি।"

দুঃখে ক্ষোভে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। একটা এমন কথাও কি তাহার মনে আসিতে নাই, যাহাতে মৈত্রেয়ী তাহাকে একটু স্মার্ট মনে করে?

এমন সময় বঙ্কু নামক যুবকটি আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। বলিল, "নিজেই বিনা পরিচয়ে আলাপ করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনাকে কলকাতায় অনেকবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন বলুন ত?"

অনঙ্গ কলেজ ক্লাশ মেস সব কিছুর ঠিকানা দিয়া দিল। স্বজাতীয় এক জন শ্রোতা পাইয়া এই বারে তাহার মুখ খুলিয়া গেল। মৈত্রেয়ী মাকে সাহায্য করিবার জন্ম মাঝে উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অনঙ্গ অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছে, রীতিমত চালাক ছেলে। তাহার সামনে চা জলখাবার রাখিয়া বলিল, "চাটা খেয়ে নিন, অনেক দেরি হয়ে গেল।"

অনঙ্গ মৈত্রেয়ীকে দেখিয়া থামিয়া গেল এবং বঙ্কুর দেখাদেখি খাইতে লাগিয়া গেল। চা খাওয়া শেষ হইতেই বঙ্কু বলিল, "আমি কিন্তু আজ আর বসতে পারব না, মাসিমা, বড় জরুরী য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। নিতান্ত সন্তোষ রাগ করবে বলে এলাম।"

সে চলিয়া গেল। অনঙ্গ দেখিল মৈত্রেয়ী নিকটেই বসিয়া চা খাইতেছে, এখন কিছু কথা না বলিলেই নয়। অনেক ভাবিয়া বলিল, "আপনি কোথায় পড়েন?"

মৈত্রেয়ী হাসিয়া বলিল, "বেথুনেই পড়তাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়ে স্কটিশচার্চ্চে ঢুকেছি।"

অনঙ্গ ভাবিল কেন ছাড়িয়া দিল, জিজ্ঞাসা করা যায় কি? থাক কাজ নাই, যদিই সে বিরক্ত হয়? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে বেশ ভাল পড়ান হয়, না?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "মন্দ নয়, তবে নিজের যদি পড়ায় মন থাকে, তা হলে সব কলেজই প্রায় সমান।"

অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মেয়েরা কি ছেলেদের চেয়ে বেশী ষ্টুডিয়াস্?"

মৈত্রেয়ী বলিল, "তা কি করে জানব? মেয়েরা সবাই ত এক রকম নয়, ছেলেরাও বোধ হয় নয়।"

এমন সময় মৈত্রেয়ীর মা আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কিছুই ত খেলেনা বাবা। ও ঘরে ব্যস্ত ছিলাম, কিছু দেখতে পারিনি। মিষ্টিগুলো ফেলে রেখেছ কেন? আরো চা নাও, খাও!"

অনঙ্গের মনে হইল, ইনি ঠিক হিন্দুঘরের মা-মাসীর মতই। কিন্তু মৈত্রেয়ী পাছে তাহাকে পেটুক মনে করে এই ভয়ে সে কিছুতেই আর খাইতে রাজী হইল না। গৃহিণীর সহিত দুইচারিটা কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

সারারাত তাহার ঘুমই হইল না। যতই মৈত্রেয়ীর চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়, ততই উহা যেন

নর্তকী

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট্স্-এর

জনৈক-ছাত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা
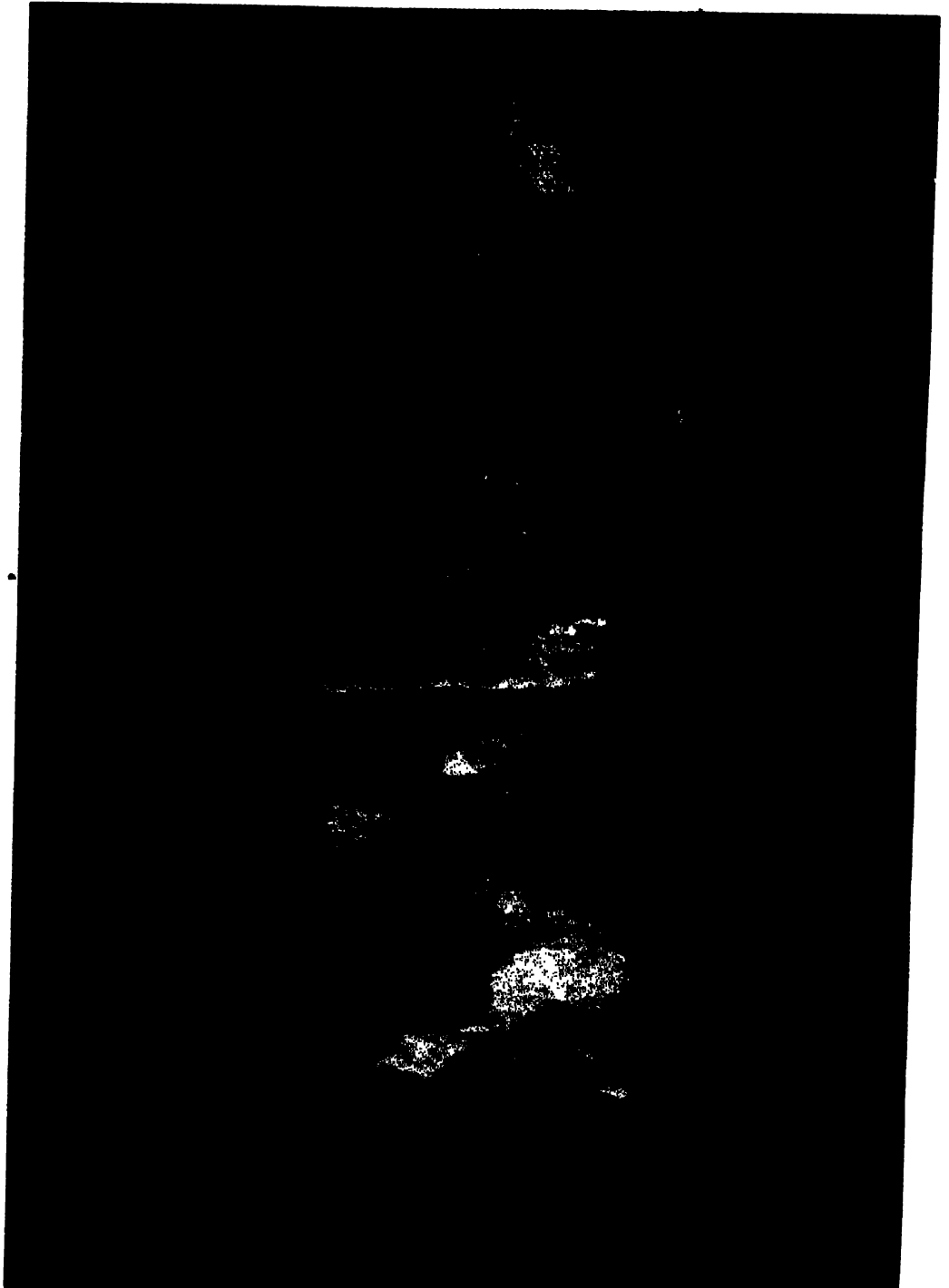
তাহাকে বেশী করিয়া পাইয়া বসে। নিজে কি কি বোকামি করিয়াছে, তাহা গণনা করিতে করিতে অনঙ্গের প্রায় চোখের জল আসিয়া পড়িল। নিজেকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে একটা রূপহীনা মেয়ে তাহাকে কি ভাবিল, তাহাতে কি-ই বা আসিয়া যায়? কিন্তু বুদ্ধিতে যাহা বুঝিল, হৃদয়কে তাহা বুঝাইতে পারিল না। সেই কালো মেয়েটির চোখে কি করিয়া উচ্চাসন পাইতে পারে, তাহার নানা-প্রকার উপায় চিন্তা করিতে করিতেই রাত কাটিয়া গেল।

পরদিন হইতে অনঙ্গ অনন্তকর্ম্মা হইয়া মৈত্রেয়ীর সঙ্গে পরিচয়টা জমাইয়া তুলিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। যতক্ষণ ঘরে থাকিত, কি ভাবে কি কথা বলিবে, কেবল তাহার রিহার্সাল দিত। এত ভাল করিয়া দিত, যে, সত্যই ভুলচুক আর তাহার বেশী হইত না। কথায় কথায় মৈত্রেয়ী একদিন বলিল, "আমাদের দেশে ত পার্লামেণ্ট নেই, নইলে আপনার বেশ ভাল কেরীয়ার হত।" আনন্দের আতিশয্যে অনঙ্গ সেদিন যেন জগৎকে সোনার রঙে রঞ্জিত দেখিল।

মৈত্রেয়ীর প্রতি সে নিজের অজ্ঞাতসারেই অল্পে অল্পে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু নিজের জন্য তাহার কোন ভয় ছিল না। সে জানিত ইহা নিতান্তই ছুটির দিনের খেলা, ছুটি ফুরাইবামাত্র সে নিজের পথে যাইবে, মৈত্রেয়ীও তাহাই করিবে। আর কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ না-ও হইতে পারে। তাহাতে কি সে খুব একটা বেদনা বোধ করিবে? তাহা ত মনে হয় না। এ বেশ একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল, বন্ধুদের ভিতর তাহার মান ইহাতে আরও অনেকখানি বাড়িবে। কিন্তু মৈত্রেয়ীর জীবনে এই দিনগুলির স্মৃতি কি দুঃখবেদনা যে বহন করিয়া আসিবে, তাহা ভাবিবার সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিত না। তাহারা ত যাচিয়া আলাপ করিয়াছে সুতরাং কোনো কিছুর জন্য অনঙ্গকে দায়ী করিতে গেলে চলিবে কেন? সকালে বিকালে বেড়াইবার সময়, অনঙ্গ প্রায়ই এখন মৈত্রেয়ীদের দলে জুটিয়া যাইত। অখিলবাবু এবং তাহার স্ত্রী দুজনেই অসুস্থ মানুষ, ধীরে পিছনে পিছনে আসিতেন; সন্তোষ, মৈত্রেয়ী এবং অনঙ্গ হন্ হন্ করিয়া আগে চলিত। বেশী উঁচু কোথাও উঠিতে হইলে তাঁহারা নীচেই বসিয়া পড়িতেন, ছেলেমেয়েরা উঠিয়া যাইত। মৈত্রেয়ীর হাতে সর্ব্বদাই একটা ছড়ি থাকিত, কখনও বা সে নিজে সেইটার সাহায্যে উপরে উঠিত, কখনও মাকে দিত।

মৈত্রেয়ীর জীবনে এই দিনগুলি একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও অনুভূতি বহন করিয়া আনিল। সে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়া দিনগুলি কাটাইতেছিল। বাস্তব জগৎটা তাহার মনোজগতের কাছে ছায়ার মত বোধ হইত। নিজের মন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই সময় চলিয়া যাইত। দিনে দিনে বেশী করিয়া সে এই প্রিয়দর্শন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভাল করিয়াই বুঝিত, কিন্তু নিজেকে দমন করিতে পারিত না। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। অনঙ্গও ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্থির করিয়া বলা যায় না। তাহা ছাড়া সে ভিন্ন সমাজের মানুষ, শুধু তার পছন্দ অপছন্দে হয়ত কিছুই আসিয়া যাইবে না। তাহার নিজের পিতা মাতাও মত করিবেন কি-না সন্দেহ, তবে করিতেও পারেন। অনঙ্গকে এখন যোগ্য পাত্র বলা যায় না বটে, কিন্তু কোনোদিনই কি সে যোগ্য হইবে না? মৈত্রেয়ী অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। এইরকম কত শত চিন্তা যে নিরন্তর তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত, তাহা সে ভিন্ন কেহই জানিত না।

সেদিন সকালবেলা বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা অনেক দূর নামিয়া গিয়াছিল। অখিলবাবু এবং মৈত্রেয়ীর মা ভরসা করিয়া বেশী দূর নামেন নাই। সন্তোষ আগে আগে ফার্ণ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অনঙ্গ হঠাৎ বলিল, "ছুটিটা ত শেষ হয়ে এল।"

মৈত্রেয়ী বিষণ্ণভাবে বলিল, "হ্যাঁ, আমরা ত পরের সপ্তাহেই যাব।"

অনঙ্গ বলিবার আর কিছুই যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। খানিক পরে বলিল, "দুজনেই আমরা কলিকাতায় থাকি, অথচ আলাপ হল বিদেশে এসে। কলিকাতাটা

সত্যিই মরুভূমি, সেখানে কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

মৈত্রেয়ী একটু হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছা থাকলে বেশ খুঁজে পাওয়া যায়।"

অনঙ্গ বলিল, "শুধু ইচ্ছাতেই ত সব হয় না, উপায়ও ত থাকা চাই।"

মৈত্রেয়ী এ কথাটার নিজের মনোমত অর্থ ধরিয়া লইল, কিন্তু সন্তোষ তখনি একরাশ ফার্ণ লইয়া আসিয়া হাজির হওয়াতে, আর কোনো কথা বলিবার সুবিধা হইল না।

অনঙ্গ স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া সারিয়া, একটু বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই কলিকাতা গিয়া আর কি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাহার দেখা হইবে, হইবেই বা কোথায়? এক যদি অখিল বাবু অনঙ্গকে তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিতে দেন। কিন্তু বিদেশে মানুষ যতখানি দিল্ খুলিয়া মেলামেশা করে, স্বস্থানে ফিরিয়া গেলে, আর তাহা করে না। তাঁহাকে একবার বলিয়া দেখিবে না-কি? কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা করিয়া শেষে বিপদে পড়িবে না ত? গল্প উপন্যাসে ত কত রকম পড়া যায়। আচ্ছা, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়া কি সম্ভব? হইলেও কি সে খুব খুশী হয়? ভাবিয়া কিছু সে ঠিক করিতে পারিল না। মৈত্রেয়ী যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার দেরি হয় নাই এবং ইহাতে তাহার আত্মপ্রসাদের সীমা ছিল না। কিন্তু সেও কি মৈত্রেয়ীকে ভালবাসে? বোধ হয় না, বন্ধু এবং পূজারিণীরূপে তাহাকে জীবনে রাখিতে পারিলে অবশ্য সে খুশী হয়, কিন্তু নিজে তাহাকে হৃদয় দান করিতে চায় না। কলিকাতায় গিয়া পরের কথা পরে ভাবা যাইবে স্থির করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিকালে আর সন্তোষদের দলে ভিড়িল না। আপন মনে জলাপাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। বড় একটা পাথরের উপর বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়া দিল। অনেক কিছু আজ ভাবিয়া স্থির করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই স্থির করা হইল না। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অন্যদিন এই সময় মৈত্রেয়ী এস্রাজ বাজাইয়া গান করে, আজ দেখিল তাহার ঘরের দরজা বন্ধ। অনঙ্গ কারণটা বুঝিতে পারিল না, নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ঢুকিয়াই প্রথম তাহার চোখ পড়িল, একখানা চিঠির উপর, তাহার টেবিলের উপর দোয়াত-চাপা অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহাকে আবার এখানে কে চিঠি লিখিল? অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মৈত্রেয়ী লিখিয়াছে।

"আমাদের পরশু যাওয়াই স্থির হল। আমাদের ঠিকানা—নং আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীট। আমাদের পরিচয়টা এইখানেই শেষ হয়ে যায়, তা আমি চাই না, মনে হয় আপনিও চান না, তাই জানালাম। কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ী এলে খুব খুশী হব। কাল সারাদিন জিনিষ গোছানো নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌ব, হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বল্‌বার সুবিধা হবে না তাই চিঠিতে জানালাম।"

মৈত্রেয়ী।

চিঠি পড়িয়া অনঙ্গের বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। মেয়েটি দেখি একেবারেই হৃদয় হারাইয়া বসিয়াছে। না হইলে নিজেই আগে চিঠি লেখে? চিঠিখানা যত্ন করিয়া সে বাক্সে রাখিয়া দিল, পরে কাজে লাগিবে। তাহার পর উত্তর লিখিতে বসিল। উত্তরটা এমন হওয়া চাই যাহাতে নিজেকে ধরা না দেওয়া হয়, অথচ মৈত্রেয়ীর মনে তাহার ছবিটা আরও গভীর হইয়া ফুটিয়া ওঠে। অনেক ভাবিয়া সে লিখিল।

'আপনার চিঠি পেলাম। এইটাই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাইছিলাম, কিন্তু মুখে চাইতে সাহস করিনি। এখানের পরিচয় এখানেই যদি শেষ হত, তা হলে সে দুঃখ আমি জীবনে ভুলতে পারতাম না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কাল সকালেই আমি গিয়ে দেখা করে আসব। আমিও শীগ্‌গিরই চলে যাব, এখানে আর আমার ভাল লাগ্‌বে না।'

অনঙ্গ।

চিঠিখানি অনেকবার করিয়া পড়িয়া তাহার বেশ

পছন্দ হইল। সেখানা মুড়িয়া রাখিয়া, তখন সহপাঠী এবং পরমবন্ধু অমৃতকে চিঠি লিখিতে বসিল। সমস্ত মনের প্রাণের কথা লিখিতে লিখিতে চিঠিখানা প্রকাণ্ড হইয়া গেল। এদিকে খাবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। এই জিনিষটিতে অনঙ্গের রুচি ছিল অসাধারণ, তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। চাকরকে মাঝপথে দেখিয়া বলিল, "দেখ হে, আমার টেবিলের উপর দুখানা চিঠি রয়েছে, ডাকের খাম যেখানা, সেটা ডাকবাক্সে ফেলে দাও, আর শাদা খামটা অখিলবাবুদের ঘরে দিয়ে এস।" চাকর চলিয়া গেল। খাইয়া দাইয়া অনঙ্গ ঘরে আসিয়া দেখিল চিঠিগুলি নাই। তাহার চিঠি পাইয়া মৈত্রেয়ী মনে মনে না জানি কি ভাবিতেছে, তাহাই আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে অনঙ্গ ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালেই সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ বেড়াইয়া, কিছু ফুল কিনিয়া আনিয়া সে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা করিবে। আর একটা দিন মাত্র ত, এই-টারই যথাযোগ্য সুব্যবহার করিতে হইবে। যখন বাহির হইয়া যাইতেছে তখন সন্তোষ দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন, একলা একলা?"

অনঙ্গ বলিল, একটু দরকার আছে, ম্যল ঘুরে জিনিষ দু-একটা কিনে ফিরব।"

ম্যল ঘুরিতে ঘুরিতে রোদ উঠিয়া পড়িল। অবজারভেটরি হিল-এর পথের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া সে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। ফুল লইয়া গিয়া মৈত্রেয়ীকে সে কি বলিবে? তাহার বাবা মা যদি আবার সব জানিতে পারিয়া অনঙ্গকে চাপিয়া ধরেন, তাহা হইলেই বিপদ। অল্প বয়সী মেয়েকে ইচ্ছামত চালান যায়, কিন্তু বুড়ো বুড়ীর হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া শক্ত।

হঠাৎ রাস্তার দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। কে ঐ মেয়েটি দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে? মৈত্রেয়ী, না? মৈত্রেয়ীই বটে, সেই চলন, সেই পরিচিত কমলা রং-এর শালের শাড়ী, সেই হাতে ওয়াকিং ষ্টিক্ পর্য্যন্ত। বেশী উচুতে উঠিতে হইলেই মৈত্রেয়ী এই ছড়িটি লইয়া যাইত ইহার জন্য বন্ধুবান্ধব সকলে তাহাকে ক্ষেপাইত। অনঙ্গ গা ঝাড়া দিয়া ঠিক হইয়া বসিল। মেয়েটি একেবারেই মজিয়া গিয়াছে, না হইলে এমন করিয়া ছুটিয়া আসে? এখন ইচ্ছা করিলে অনঙ্গ তাহাকে যে দিকে খুসী চালাইতে পারে। কিন্তু আর যে সময় নাই।

মৈত্রেয়ী কাছে আসিয়া পড়িল। অনঙ্গ দেখিল তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত। মনে মনে ভাবিল, তা হইতেই পারে, এই সকল ব্যাপারে মেয়েরা সর্ব্বদাই বেশী বিচলিত হয়।

মৈত্রেয়ী সামনে আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একলাই বেরিয়েছেন যে?"

মৈত্রেয়ী গম্ভীর মুখে বলিল, "একলা বেরনোই আজ দরকার ছিল।"

অনঙ্গ একটু বিস্মিত হইল। এতখানি গম্ভীর হওয়ারই কি দরকার ছিল? অন্ততঃ অনঙ্গের সামনে ত হাসা যায়? একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

এতক্ষণ পরে মৈত্রেয়ীর মুখে হাসি দেখা দিল।

কিন্তু সে হাসিটাও যেন কেমন কেমন। বেশ কঠিন সুরে বলিল, "চিঠি পেয়েছি বই কি। তার উত্তর দিতেই ত এলাম।"

অনঙ্গ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল মাত্র, সে হাতের ছড়ি দিয়া সজোরে তাহার মুখে আঘাত করিল। "বাপরে" বলিয়া চাদরে মুখ চাপিয়া ধরিয়া অনঙ্গ সেইখানে বসিয়া পড়িল। চাদরটা দেখিতে দেখিতে রক্তের ছোপে ভরিয়া উঠিল। একজন বাঙালী বৃদ্ধ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ভীত দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত মানুষ দুইটির দিকে চাহিয়া যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, "এই আপনার চিঠির উত্তর। দুঃখের বিষয় আপনি আমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটা আমি পাইনি, পেয়েছি অমৃতকে লেখা চিঠিটা

তাড়াতাড়িতে, খামের ঠিকানা অদলবদল হয়ে গিয়েছিল। অনঙ্গবাবু, আমি কালো এবং খ্যাঁদা বটে, কিন্তু কালো হাতেও জোর থাকে এবং খ্যাঁদা মেয়েরও আত্মমর্য্যাদা থাকে, সেটা বুঝে রাখা ভাল। আমাকে নিয়ে মাছের মত খেলাবার ইচ্ছা আপনার ছিল, না? কিন্তু আমরাও বাঁদর ট্রেন করবার যোগ্যতা রাখি। যে রূপের এত গর্ব্ব আপনার, সেটার একটু খুঁৎ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে একটু সাবধান হতে পারবেন, আয়নার দিকে চাইলেই। চললাম।"

মৈত্রেয়ী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তাহার চোখে যে জল ভরিয়া উঠিল, তাহা দেখিবার কোনো মানুষ সেখানে ছিল না।

অনঙ্গ সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। মেসে গেল না, হাওড়ায় বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

মা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওমা, সর্ব্বনাশ, একি হয়েছে রে?"

অনঙ্গ বলিল, "পাথরের উপর আছাড় খেয়ে কেটে গেছে মা।"

রবীন্দ্র-বন্দনা

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অতন্দ্র রজনী শুধু ধরণীর আবিষ্ট নয়নপানে চাহি,
নিঃশব্দে গণিতেছিল কাকলী-কল্লোল! কে উঠিল অবগাহি,
বৈশাখ-বন্ধুর বেশে,—তমসার বক্ষ হ'তে গৌরবী সে রবি,
জ্যোতির কমলবাহী!—গানে গানে তরঙ্গিল অধীর
জাহ্নবী!

বুদ্বুদ বিচূর্ণ হ'ল মর্ম্মান্ত-হরষে; নীলকান্ত পারাবার,
আপন মহিমা গেল ভুলি! বেদনায় বিবর্ণ সে মণিহার,
বক্ষে নিল টানি! রাগিণী ধরিল কায়া স্বপন-গহনে,
চেতনার প্রান্ত হ'তে! প্রণাম থমকি গেল যেন অন্যমনে।

তারি তরে বুঝি কোন্ ইন্দ্রাণীর বরমাল্য যুগ যুগ ধরি
সঞ্চিত রয়েছে আজো। কবে শুনেছিনু তা'র চঞ্চল বাঁশরী,
উন্মনা-প্রান্তর-শেষে, বেণুবন-শিহরিত মুখর নূপুরে।
প্রতি-পরমাণু তা'র, বিশীর্ণ কেশর-ঝরা অস্ফুট অঙ্কুরে,
পরাগে, রেণুতে যেন পরতে পরতে আছে মিশি! তারি দল
চূড়া করি বাঁধিয়াছে রক্তিম ললাটে। স্বচ্ছ শুভ্র শতদল
হাসি যেন মানসের জলে! অশ্রুভারে নমিত চাহনি,
অন্ধকারে, শিশিরে শিহরে যেন! এলোকেশী রূপসী রজনী,
তারকায়, পদধ্বনি শোনে যেন কা'র!—যা'রে সে
ফিরায়ে দেছে,
কি নিষ্ঠুর অপমানে! কানে কানে আসি, তা'র কে
যেন কয়েছে
'আসিবে সে রাজবেশী কোনোদিন! অঘ্রাণের উদ্‌ভ্রান্ত
সমীরে,
আজো তবু সে-যৌবন-মাল্যবধূ, প্রতিরাতে ঝুরিছে
শিশিরে।

মহেন্দ্রের অভিযানে,—প্রতিদিন প্রভাতের অরুণ-পাখায়,
কে যেন বর্ণিয়া যায় নীল আলেপন! দূরে,—শিরীষ-শাখায়,
শিরায় শোণিতে কাঁপে সুর! রহি রহি বাজি উঠে করতাল,
প্রান্তরের তীর-প্রান্তে পথ-বৈরাগীর। দাড়িম্ব, শিমুল, শাল,
আম্রবন-কুঞ্জবীথি মন্ত্র জপে সুগম্ভীর, নীরব বন্দনে।
সাজিল মাধবী নারী বর্ণগীতি-রঙ্গিমায় সুরভি-চন্দনে।
যে-রজনী সূর্য্য-বিরহিতা, তারি ভাষা পড়িয়াছি স্বর্ণাক্ষরে,
প্রভাতের রক্তিম লজ্জার রাগে। সুন্দরের মন্দির-চত্বরে,
জ্যোতির আলিম্প আজো আঁকি যায় বনলক্ষ্মী
অরূপ-কুসুমে।
নবীন মঞ্জরীজল দেবীর তুলসী-মঞ্চে নিত্য যায় চুমে,
সন্ধ্যার আবীর-বর্ণে, কম্পিত শ্যামলশোভা —
ঊর্দ্ধে বিস্তারিয়া!

নির্ব্বাকের বাণী-রূপ, দিল আসি রাখী ডোর স্বহস্তে বাঁধিয়া,
মানবে করিয়া মুগ্ধ! শুভ্র যূথী পড়ে আছে মন্দির-দুয়ারে,
অশ্রুর শিশিরে ম্লান! দূরে নীল ছল ছল যমুনার পারে,
সিক্ত বায়ুশ্বাসে আজো কাঁদি উঠে মর্ম্মরের
সোপান-বেদিকা।
নিদ্রিত মাটির ঘরে জাগি' আছে নয়নের শান্ত দীপশিখা,
নির্নিমেষ! ঊর্দ্ধে জাগে আকাশের সীমাহীন সুনীল প্রসার,
কুণ্ঠিতা কল্পনা-বধূ, রোমাঞ্চিয়া খুলে দেয় গুণ্ঠন তাহার!
যে-গান গুঞ্জরি উঠে রজনীর কম্পমান অস্ফুট কমলে,
তারি ছন্দে, লিখিলে সূর্য্যের লেখা। কি সে মহা
প্রতিভা-কৌশলে,
গৌরব দানিলে তারে! উন্মত্ত সে ধূর্জ্জটির পিঙ্গল জটায়,
জাহ্নবী-তরঙ্গ-ধারে ভরি দিলে নৃত্যলোল রশ্মির ছটায়,
স্তম্ভিত অম্বর-ধরা! গোধূলির ছায়াশীর্ণ, স্পন্দহীন গ্রাম,
স্বপ্নে মোরে নিল টানি? —তারি ধ্যানে লহ মোর
নিঃশেষ প্রণাম!

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনিলে আমাদের রক্ষণশীল দেশবাসী ভীত হইয়া পড়িত। ছেলেদের মত মেয়েদেরও যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথম মনে করাইয়া দিলেন স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা নহে। তিনি লিখিলেন,—

"স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

বিদ্যাসাগর কর্ম্মী। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি জানিতেন, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ভিন্ন দেশবাসী এক পা-ও অগ্রসর হইবে না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" পুত্রের মত কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিতে এবং শিক্ষা দিতে হইবে। শাস্ত্রবচনকে মূলমন্ত্র করিয়া বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে ব্রতী হইলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খৃষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধু-রূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে একজন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক-রূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দুইপাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগষ্ট, ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ডালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল এবং বঙ্গের ছোটলাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১৮৫৬, ১২ই আগষ্ট তারিখের পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোটলাটকে লিখিলেন:—"কমিটির সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্ব পরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় দিকে বাংলা দেশে ছোটলাট হ্যালিডে সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর। হ্যালিডে তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিলেন। এ কাজ কত কঠিন সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।...

নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজ এলাকাভুক্ত চারিটি জেলায় ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।

১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারতসরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী সাহায্যদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে

পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১৮৫৬, ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোটলাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

১৮৫৮, ৭ই মে তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে একান্ত বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য-সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে।...

১৮৫৮, নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ-সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্ত তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন। ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ রায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন।...

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪, জানুয়ারি মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।

মিস মেরী কার্পেণ্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, একথা সুবিদিত। মিস কার্পেণ্টার কলিকাতা পৌঁছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন্ সাহেব বীটন-বিদ্যালয়ে মিস কার্পে-ণ্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।...

একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন-বিদ্যালয়েই একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্ত মিস কার্পেণ্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম-এম, ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্ত লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন;...

১৮৬৭, ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘপত্রে বাংলার ছোটলাট স্যর উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোটলাটকে লিখিলেন,—

"আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন-বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্ত মিস কার্পেণ্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্যলাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোনমতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগারো বছরের বিবাহিতা বালিকাদেরই বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরূপ সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।...

"মেয়েদের শিক্ষার জন্ত স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয় তাহা আমি বিশেষ জানি,—একথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ-প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকর করিবার জন্ত আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনোই নিশ্চয়তা নাই এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোনমতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।... (১ অক্টোবর ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা সরকার মিস কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজনসাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল ও বীটন স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্ত মিসেস্ ব্রিটশে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন (২৭ জানুয়ারি, ১৮৬৯)। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কমিটির সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির দক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্ত ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না।

শেষে কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও বীটন-বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নর্ম্মাল স্কুলটি সফলতা লাভ করিল না। পরবর্তী ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল উহা তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। ১৮৭২, ৩১এ জানুয়ারির পর হইতে ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল।

বঙ্গলক্ষ্মী—মাঘ, ১৩৩৭　　শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

বাংলায় হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগ

...তবকাৎ-ই-নাসিরীর বিবরণ হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, মহম্মদ খিল্‌জি লক্ষ্মণাবতীর চারিদিকের খানিকটা জায়গায় বেশি অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই; গঙ্গাতীর হইতে উত্তর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত তাঁর দখলে আসিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়ের অন্তর্গত লখনোর জায়গাটিও তিনি দখল করিতে পারেন নাই; সুতরাং মহম্মদ খিল্‌জির সময়ে সমস্ত বাঙলার দেশের অতি সামান্য অংশ মাত্র মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল; বাকি সমস্ত অংশই হিন্দুদের হাতেই ছিল—কিন্তু কোন্ বংশের কোন্ রাজার হাতে ছিল তা আমরা নিঃসন্দেহে জানি না; সম্ভবতঃ সেন রাজাদের হাতেই ছিল। মিন্‌হাজ বলেন, লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া সাঁকনাৎ ও বঙ্‌দেশে চলিয়া গেলেন। বঙ্‌ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গ বুঝি; কিন্তু সাঁকনাৎ বলিতে কোন্ জায়গা বোঝায় জানি না—নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোনো জায়গা হইতে পারে।

লখ্‌নৌতীর চতুর্থ মালিক গিয়াস্‌-উদ্দীন ইবজই (১২১১-১২২৬ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম গঙ্গার দক্ষিণতীরে উত্তর রাঢ়ে সেন রাজাদের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মুসলমানের অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত লখ্‌নোর নগর হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী লখ্‌নৌতীর ও বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত দেবকোট পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং দেবকোট হইতে লখ্‌নোর পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গা এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গা মাত্রই সে-সময়ে মুসলমানের অধীন ছিল এমন মনে করা যায়। দক্ষিণ রাঢ় ও বাঙ্‌লার বাকী সমস্ত অংশই হিন্দু রাজার অধীন ছিল বলিয়া অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই।

উত্তর রাঢ়েরও সমস্ত অংশ সে-সময় পর্য্যন্ত বিজেতার করতলগত হয় নাই; কারণ মুগীস্‌-উদ্দীন য়ুজবক্‌-এর (১২৪৬-১২৫৭ খৃঃ) আমলেই নবদ্বীপ সর্ব্বপ্রথম স্থায়ীভাবে বিজিত হইয়াছিল।...আর দিল্লীর সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন বল্‌বনের পৌত্র রুক্‌ন্‌-উদ্দীন কৈকাউস্‌-এর (১২৯১-১৩০২ খৃঃ) আমলেই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম পরহস্তগত হয়। কাজেই দেখিতেছি, মহম্মদ খিল্‌জির বাঙ্‌লায় পদার্পণের পর আরও প্রায় একশো বছর সপ্তগ্রাম মুসলমানের অধীন হয় নাই। কিন্তু এই এক শো বছর সপ্তগ্রাম কোন্ হিন্দু রাজভুক্ত ছিল, কোন্ হিন্দু রাজার দুর্ব্বল হাত হইতে কৈকাউস্ সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লইলেন তা আমরা জানি না।...নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রাম উভয়ই উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত এবং মুসলমান-বিজেতার প্রথম আবির্ভাবের পর নবদ্বীপ অধিকৃত হইতে লাগিয়াছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর, এবং সপ্তগ্রাম অধিকৃত হইতে প্রায় একশো বছর লাগিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ় কবে হিন্দুর হস্তচ্যুত হইল তা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ইলিয়াস্‌-শাহী বংশের রুক্‌ন্‌-উদ্দীন বারবক্ শাহের (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ) আমলেই সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গে তুর্কীর আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

সমগ্র রাঢ় ও দক্ষিণ বঙ্গ যেমন একদিনে তুর্কীর পদানত হয় নাই; শতাধিক বৎসরব্যাপী সংগ্রামের ফলে বাঙলার ঐ অংশ বিজেতার হস্তগত হয়, তেমনি সমস্ত উত্তর বঙ্গ বা বরেন্দ্র প্রদেশও তুর্কী বিজেতারা একদিনেই দখল করিতে পারে নাই। মহম্মদ খিল্‌জি দেবকোট অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু বরেন্দ্রের প্রধান নগর বর্দ্ধনকোট বিজিত হইতে আরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়াছিল—কারণ নবদ্বীপ-বিজেতা মুগীস্‌-উদ্দীন (১২৪৬-৫৭ খৃঃ) প্রথম বর্দ্ধনকোট জয় করিয়াছিলেন, মুদ্রার সাক্ষ্যে ঐতিহাসিকেরা এই অনুমান করেন।...মহম্মদ খিল্‌জির আগমনের পর হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাস একেবারেই অন্ধকারময় নয়।

মিন্‌হাজ বলেন যে, লক্ষ্মণসেন মহম্মদ খিল্‌জির নবদ্বীপ আক্রমণের পর পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান এবং সেখানে গিয়া অনতিকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমরা শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থ হইতেই জানিতে পারি যে, উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের সপ্তবিংশতিতম সংবৎসরে ও ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃঃ) সমাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, অন্ততঃ ১২০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র বিশ্বরূপসেন অন্ততঃ চৌদ্দ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপসেনের পর তাঁর ভাই কেশবসেনও অন্ততঃ তিন বছর পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপসেনের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের আর-এক পুত্র মাধবসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিতরূপে কিছুই বলিতে পারি না। যাহা হোক্, কেশবসেন যে অন্ততঃ ১২২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে জানিতে পারি যে, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের রাজধানী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে; কিন্তু উভয়েই "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" এবং "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাতেই মনে হয় যে, লখ্‌নৌবতীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভূভাগ ছাড়া গৌড়ের অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য অংশে বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের আধিপত্য অব্যাহতই ছিল এবং এই উপলক্ষে লক্ষ্মণাবতীর যবন অর্থাৎ তুর্কী মালিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইত।

বঙ্‌ বা বঙ্গদেশের সেন রাজ্যের সঙ্গে যে লখ্‌নৌতীর তুর্কী মালিকদের সর্ব্বদাই লড়াই হইত, তার প্রমাণ আমরা মিন্‌হাজের তবকাৎ হইতেই জানিতে পারি। খৃঃ ১২১১ হইতে ১২২৬ অব্দ পর্য্যন্ত গিয়াস্‌-উদ্দীন ইবজ্‌ লক্ষ্মণাবতীর মালিক ছিলেন। তিনি দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁকে অনেক সময় লক্ষ্মণাবতীর সুলতানও বলা হয়। তিনি যথার্থই একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং মিন্‌হাজ বলেন যে, তিনি লক্ষ্মণাবতীর পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি হইতে কর আদায় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কর-দাতা রাজ্যগুলির মধ্যে তবকাৎ-ই-নাসিরীতে বঙ্‌ বা বঙ্গরাজ্যের উল্লেখও আছে। এই সময় বঙ্‌-রাজ্যে কে রাজত্ব করিতেছিলেন জানিবার জন্য ঐতিহাসিকের মনে স্বতঃই ঔৎসুক্য হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন অন্ততঃ চৌদ্দ বছর (আনুমানিক ১২০৬-১২২০ খৃঃ) এবং

তারপর কেশবসেন অন্ততঃ তিন বছর (১২২০-২৩ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর কে পূর্ব্ববঙ্গের রাজা হইলেন তাহা এখনও স্থির করিয়া বলা যায় না।...আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কেস্থসেনের (অর্থাৎ কেশবসেনের) পর সুরসেন বা সদাসেন নামে এক রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আইন-ই-আক্‌বরীর উপর খুব নির্ভর করা যায় না; কারণ তাহাতে অনেক ভুল রহিয়াছে। তথাপি আইন-ই-আকবরীর সুরসেন এবং তাম্রশাসনের সূর্য্যসেন যদি এক হয় তবে মনে করা যাইতে পারে যে, কেশবসেনের পর সূর্য্যসেন কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।...

গিয়াস্‌-উদ্দীন ইবজের দ্বিতীয় অভিযানের কয়েক বছর পরই পূর্ব্ববঙ্গে তৃতীয় তুর্কী অভিযানের আভাস পাই। লক্ষ্মণাবতীর তুর্কী মালিক সৈফ-উদ্দীন ঈবকের (১২৩১-৩৩ খৃঃ) জীবন-বৃত্তান্তের প্রসঙ্গে মিন্‌হাজ বলিতেছেন যে, উক্ত মালিক লক্ষ্মণাবতীর শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিয়া খুব বীরত্বের পরিচয় দেন এবং বঙ্‌-দেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) হইতে কতকগুলি হাতী অধিকার করিয়া দিল্লীর রাজদরবারে পাঠাইয়া দেন। দিল্লীর সুলতান (আল্‌তামাস) ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁকে য়ুখান-তৎ উপাধি দেন। তার পর সৈফ-উদ্দীন কয়েক বছর শাসন-কার্য্য চালাইয়া ৬৩১ হিঃ (১২৩৩ খৃঃ) অব্দে মারা যান। আনুমানিক ১২৩১ খৃঃ অব্দে সৈফ-উদ্দীন কর্তৃক সেন-রাজ্য আক্রমণের সময় কোন্ সেনরাজা বিক্রমপুর অথবা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন, সে বিষয়েও ইতিহাস অন্ধকারময়।...

অতঃপর বঙ্‌-দেশের সেনরাজ্যের বিরুদ্ধে চতুর্থ তুর্কী-অভিযান ঘটিয়াছিল ১২৫৮ খৃঃ অব্দে। ঐ সময়ে লক্ষ্মণাবতীর মালিক ছিলেন ইর্জ্জুদ্দীন বল্‌বন্ নামক জনৈক তুর্কী সর্দ্দার। মিন্‌হাজ লিখিতেছেন যে, ৬৫৭ হিঃ অব্দে (১২৫৮ খৃঃ) ইর্জ্জুদ্দীন বল্‌বন্ যখন বঙ্‌-রাজ্য আক্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন সে সময় তাজউদ্দীন্ আসলান্ খাঁ নামক জনৈক তুর্কী সর্দ্দার অতর্কিতভাবে আসিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া বসিলেন। ইর্জ্জুদ্দীন বল্‌বন্ তখন বঙ্‌ আক্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আসলান্ খাঁর সহিত যুদ্ধে বন্দী ও পরে নিহত হইলেন। এই ঘটনা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে, সুযোগ পাইলেই পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজ্য আক্রমণ করা যেন লক্ষ্মণাবতীর তুর্কী মালিকদের একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিন্‌হাজ তুর্কী মালিকদের বঙ্‌-রাজ্য আক্রমণের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেন নাই। তিনি শুধু প্রসঙ্গ-ক্রমেই চার বার পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই চার বার ছাড়াও যে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্য আরও বহুবার তুর্কী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইর্জ্জুদ্দীন বল্‌বনের পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণের সময় (১২৫৮ খৃঃ)...পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশই রাজত্ব করিতেছিল।...

অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ পাই জিয়াউদ্দীন বরনীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে। এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পাই যে, লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মুগীস্-উদ্দীন তোগ্রল খাঁ দিল্লীর সুলতান্ গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সুলতান্ বল্‌বন্ তোগলের বিদ্রোহ দমন করার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে বাঙলাদেশে উপস্থিত হন এবং কিছুকালের মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়া সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুলতান বল্‌বন্ ও দনুজরায়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা হইল যে, বিদ্রোহী তোগ্রল খাঁ নদীপথে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে দনুজরায় তাঁকে আটকাইবেন। সুলতান বল্‌বনের সহিত দনুজরায়ের এই সাক্ষাৎ-কারের তারিখ ৬৮১ হিঃ অর্থাৎ ১২৮৩ খৃঃ অব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১২৮৩ খৃঃ অব্দেও পূর্ব্ববঙ্গ লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসকদের অধীন হয় নাই।...

চন্দ্রবংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের সময় হইতে কেশবসেনের সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুরই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। দশরথদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই সে-সময়ও (আনুমানিক ১৩৮৩ খৃঃ) বিক্রমপুরই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁকে সোনার গাঁ বা সুবর্ণগ্রামের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই বোধ হয় ইতিহাসে সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ এবং এই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববাঙলার প্রধান নগররূপে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কোন্ সময় হইতে কিরূপে বিক্রমপুরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল তা জানা যায় না।...

দশরথদেব-কর্তৃক পরাভূত সেন-রাজা কে ঠিক বলা যায় না,—তিনি মধুসেন নিজেও হইতে পারেন অথবা মধুসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কেহ হইতে পারেন; কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, দশরথদেব কর্তৃক গৌড় সিংহাসন অধিকারের কিছুকাল পরেই ১২৮৩ খৃঃ অব্দের পরে) মধুসেন সেনবংশের পক্ষ হইতে দশরথের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন এবং পরিশেষে ১২৮৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন্ সময়ে দনুজমাধব দশরথদেবকে পরাভূত করিয়া গৌড়রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন; কারণ, ১২৮৯ খৃঃ অব্দে দেববংশীয় কোন রাজার পরিবর্ত্তে মধুসেনকেই গৌড়ের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।...

প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া বিক্রমপুরের সেন-রাজবংশ হিন্দুর স্বাধীনতাকে বিজেতার কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুর চিরন্তন সুযোগ প্রতীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া যখন দারুণ আত্মকলহে পূর্ব্ববঙ্গের রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখনই রুক্‌ন্-উদ্দীন কৈকাউস লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণের প্রায় শতাব্দীব্যাপী আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে সফল করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলেন।

মধুসেনই বাঙলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা; তাঁর পর হইতে বাঙলার হিন্দু-স্বাধীনতা চিরকালের মত অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। তবে পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব আবার কিছুকালের জন্য বাঙলায় হিন্দু স্বাধীনতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাও আবার ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত বাঙলার আকাশকে চমকাইয়া দিয়া চকিতের মধ্যেই অধীনতার অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া গেল।

পঞ্চপুষ্প শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

"গোধর্ম্ম"

বর্ত্তমান বর্ষের মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "দ্বীপময় ভারত" প্রবন্ধের ৫২৯ পৃষ্ঠায় দেখিলাম:— "আদিপর্ব্বের 'গোধর্ম্ম' ব'লে কি অংশ আছে,—কথাটা আমরা ভাল বুঝতে পারলুম না—সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।" উক্ত বিষয় মহাভারতের, আদিপর্ব্বে আছে:—৺প্রতাপচন্দ্র রায়ের সম্পাদিত মূল, ১০৪ অধ্যায়, শ্লোক ২৪; শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সংস্করণ, ৯৮ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক। এই স্থলে নীলকণ্ঠ-কৃত "ভারত ভাবদীপ টীকা" ও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-কৃত "ভারতকৌমুদী টীকা" উক্ত কথার অর্থ দিয়াছেন।

শ্রীবিমলাচরণ দেব

মণিপুরী ও কুকি জাতি

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্রসংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুত লালতুদাই রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কুকি, লুসাই ও মণিপুরী একই জাতি। শারীরিক গঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাষাতে এত সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে স্পষ্টই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।"

শারীরিক গঠন সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের এরূপ উক্তি সমুদয় মণিপুরী জাতির প্রতি প্রযোজ্য নহে। মণিপুরীরা মিশ্র জাতি; তাহাদের মধ্যে যেমন অনার্য্য আছে, সেরূপ আর্য্যও অনেক আছেন। ঐতিহাসিক ব্রাউন সাহেব বলেন—মণিপুরীদের মধ্যে কেহ কেহ অনেকটা আর্য্য ছাঁচের চেহারাবিশিষ্ট; ইউরোপীয়দের শারীরিক গঠন যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের, মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক গঠনও সেরূপ বিভিন্ন প্রকারের; কাল-পিঙ্গল রঙের চুল, পিঙ্গল চক্ষু, ফরসা রং, উন্নত নাসা ও গোলাপী গণ্ডবিশিষ্টা স্ত্রীলোক প্রায়শঃ দেখা যায়।"
এরূপ মন্তব্যদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মণিপুরীদের মধ্যে আর্য্য ছাঁচের চেহারাবিশিষ্ট অনেক লোক আছেন; কিন্তু কুকি লুসাইদের মধ্যে এরূপ চেহারার লোক সচরাচর দেখা যায় না। সুতরাং লালতুদাই রায় মহাশয়ের এরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য মাত্র।

তিনি ধরিয়া লইয়াছেন—মণিপুরীদের মধ্যে মাত্র একটি ভাষা প্রচলিত; কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা প্রচলিত, যথা—মৈতের ভাষা ও বিষ্ণুপুরী ভাষা। মৈতের ভাষা রাজভাষা ও অধিকাংশ মণিপুরীরা ঐ ভাষাতেই আলাপ করে; বিদেশীরা ঐ ভাষাকে মণিপুরীদের একমাত্র ভাষা মনে করিয়া নানা প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি বিষ্ণুপুরী ভাষা সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিতেন, তবে দেখিতেন—বাংলা তথা সংস্কৃতের সহিত ঐ ভাষার কতদূর সাদৃশ্য। বলা বাহুল্য ঐ ভাষার জননী সংস্কৃত বা প্রাকৃত এবং উহা বাংলা ও অসমীয়া ভাষার ভগিনী। মৈতের ভাষা সম্বন্ধে বিদেশীদের মন্তব্য ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। এই ভাষায় যতগুলি পার্ব্বত্য ভাষার শব্দ আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আছে। উহার কাঠামো সংস্কৃত বা প্রাকৃত—নাগা কুকির ভাষা নহে। সুতরাং এই ভাষার সহিত লুসাই বা কুকি ভাষার কতক সাদৃশ্য থাকিলেও মূলে উহা অনার্য্য ভাষা নহে—চারিদিকে নাগাজাতির অবস্থানহেতু পার্ব্বত্য ভাষার অনেক শব্দ উহাতে প্রবেশ করিয়াছে মাত্র। অতএব ভাষার দিক দিয়াও মণিপুরীদিগকে কুকি-লুসাইর জাতি বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—"মণিপুরীরা এক সময়ে বোধ হয় বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হইয়া যান।... তাঁহাদের বর্ত্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতিনীতি দৃষ্টে মনে হয় যে, ইঁহাদের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর "অনর্পিতচরী" উন্নতোজ্জ্বল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদের সহজসিদ্ধ। মনে হয়, ইঁহারা চিরদিন এমনই সহজ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন।"*

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যায়, মণিপুরীরা এক সময়ে বৌদ্ধ ছিল এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে শিক্ষাদীক্ষা ও আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নত ছিল। তাঁহাদের নিজস্ব লিপি ও "পুরাণ" নামক অতি প্রাচীন সাহিত্য উক্ত ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বেও ছিল। সার্ব্বজনীন শিক্ষা চিরদিনই প্রচলিত। সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বেও কুকি-লুসাইদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় তাহারা ঢের বেশী উন্নত ছিল। তবে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা পূর্ব্বে হিন্দু-আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং বাঙালী প্রভৃতি প্রতিবেশীদের চক্ষে হেয় ও অসভ্য পদবাচ্য হইয়াছিল। এই কারণেই বিদেশীরা ঐ সময়ের ইতিহাস ভ্রমবশতঃ মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। লালতুদাই রায় মহাশয়ও যে ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের ফলেই যে কুকি-লুসাই অপেক্ষা মণিপুরীরা বেশী উন্নত হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার সিংহ

* "সত্তর বৎসর"—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৪।

বংশানুক্রমিতা—ফরাসী দার্শনিক রিবোর De la Hérédité গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ২৲।

যে-সকল উপায়ের দ্বারা ভাষা পুষ্টিলাভ করে, বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ তাহাদের অন্যতম। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরই ইংরেজী ভাষার সহিত পরিচয় থাকায় ইংরেজীতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনেকে হয়ত স্বীকার করিবেন না, কিন্তু ফরাসী গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রিবোর De la Hérédite' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। রিবো একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলিয়া সুধীসমাজে প্রসিদ্ধ। Heredity বা বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতামত বাঙালী পাঠকের জানিবার সুবিধা হইল। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হইলে পদে পদে পরিভাষার অভাবে কষ্ট পাইতে হয় এবং অনুবাদককে অনেক সময়েই পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হয়। পরিভাষা সব সময়ে শ্রুতিমধুর করা দুরূহ। পরিভাষার দোষে ও মূল গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করায় অনুবাদে প্রসাদগুণের অভাব হইয়াছে। হরিনাথবাবু প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, রিবোর গ্রন্থে বংশানুক্রমিতার অনেক নূতন তথ্যের উল্লেখ নাই, এ কারণে তাঁহার পুস্তকের তেমন আদর না হইতে পারে। গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদ যথেষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। পাঠক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুস্তকখানি পড়িলে অনেক কৌতূহলপ্রদ বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

নূতনের সন্ধান—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত। ১৫২ পৃষ্ঠা, দাম ১।০ টাকা।

সুভাষবাবুর "নূতনের সন্ধান" পড়িলাম। ভালই লাগিল। ১৯২৭ সালের মধ্যভাগে মান্দালয় জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছাত্র ও যুব-আন্দোলন সম্পর্কীয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইংরেজী ও বাংলায় সুভাষচন্দ্র জাতীয় নবজাগরণের যে আভাষ দিয়াছিলেন এবং ভারতীয় চিন্তাধারায় যে নূতনের স্রোত আনয়নে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরত সুভাষচন্দ্রের মুক্তির আদর্শ কিরূপ সর্ব্বতোব্যাপী তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জ্জনও সূচিত করে।" জাতীয় জীবনের যত দিক দিয়া প্রকাশ হইতে পারে, স্বাধীনতার আংশিকরূপ ততগুলি। এই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সমগ্র জাতীয় শক্তি, বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে এবং আমাদের মাতৃজাতিকে প্রকৃত শক্তিস্বরূপিণী করিতে হইবে। যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে, কিন্তু সমাজের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিবে—অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব আনিবে না, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। আমাদের এই শত-ছিন্ন-যুক্ত পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ কোনোদিন হইবে না। পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে।

সুভাষচন্দ্রের মুখে নূতন পন্থা সন্ধানের এই বার্ত্তা শুনিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। বস্তুতঃ বইখানির মধ্যে অনেক কথাই রহিয়াছে যাহা শুধুমাত্র বাংলার তরুণ নেতার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহার পূর্ব্বে বাংলার ও বাহিরের অন্যান্য নবীন কর্ম্মীর মুখেও ইহা শুনিয়াছি। দুঃখের কথা এই যে, শুধুমাত্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মুখের কথা না হইয়া যদি এই আদর্শ ও কর্ম্ম-প্রণালী ইঁহাদের মনের কথা হইত, তাহা হইলে কি বাংলা, কি অন্যত্র, রাষ্ট্র ও ছাত্র-আন্দোলনে অহেতুকী কলহ ও আত্মম্ভরিতার স্থান থাকিত না।

সুভাষচন্দ্রের বইখানির বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্যও উপভোগ্য বটে। এইরূপ সুললিত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সুভাষবাবুর রচিত অন্যান্য পুস্তকের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

শকুন্তলা—মহাকবি কালিদাসের পদাঙ্কানুসরণে—শ্রীঅপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

নাটকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে এবং বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনে শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহার রচিত নাটকগুলি বাঙ্গালী জনসমাজে সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে আদৃত। সম্প্রতি ইঁহার অনূদিত শকুন্তলা নাটক-খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। কালিদাসের শকুন্তলার মত একখানি শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য-সৃষ্টির ভাল অনুবাদ থাকা যে-কোনও ভাষার পক্ষে গৌরবের কথা। শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর অনুবাদ বাহির হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষা এইরূপ একখানি ভাল অনুবাদ লাভ করিল। যে দুইটী গুণ থাকিলে কোনও অনুবাদ-গ্রন্থকে ভাল বলা যায় সে দুটী গুণ শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর শকুন্তলায় দেখিতেছি; ইহা মূলানুসারী, এবং মূলের রস যথাযথ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মূল গ্রন্থ রচয়িতার উক্তিকে অবিকৃত রাখিয়া তন্নিহিত রস ও ভাব-প্রবাহকে ভাষান্তরে ফুটাইয়া তোলা—এইখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। প্রত্যেক ভাষার স্বকীয় ও স্বতন্ত্র একটী বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই অনুবাদের সার্থকতা। বাঙ্গালায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকালে সাধারণতঃ অনুবাদকগণ সে বিষয়ে অবহিত হন না, এইহেতু প্রায়ই সংস্কৃত

নাটকাদি সাহিত্যগ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া প্রীতি লাভ করা যায় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর অনুবাদে সাধারণতঃ মূলের ভাব ও ভাষার সহিত অতি প্রশংসনীয়রূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। শকুন্তলার শ্লোকগুলির অনুবাদ বহুস্থলে ভাষায় ও রীতিতে একটু সেকেলে ধরণের হওয়ায় মনে হয় এগুলিতে একটা চমৎকার সৌন্দর্য্য আসিয়া গিয়াছে; এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভার" সংস্কৃত শ্লোকগুলির অনুবাদের কথা মনে না করিয়া থাকা যায় না। এই সেকেলে, অর্থাৎ দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা কবিতার ঝঙ্কারটী পাওয়ায়, একটী সারল্য-মিশ্র কলাকৌশলের আভাস শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, এবং এই রূপে কালিদাসের সংস্কৃতের আভিজাত্য বাঙ্গালা ভাষাতেও যেন আসিয়া গিয়াছে।

নাটকের প্রধান সার্থকতা তাহার অভিনয়োপযোগিতায়। কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নাটক অভিনয়ে প্রায়ই জমে না; যেমন মুদ্রারাক্ষস নাটক; পাঠ করিয়াই তাহাদের রস আস্বাদ করিতে হয়। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা—কি অভিনয়ে, কি পাঠে, উভয় প্রকারেই আমাদের চিত্তকে মোহাবিষ্ট ও পুলকিত করে। মূল শকুন্তলার এই উভয়বিধ গুণ শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবুর অনুবাদে মিলিবে।

"এই অনুবাদে বঙ্গদেশীয় পাঠ অনুসৃত হইয়াছে।

বইখানির ছাপা পরিপাটী এবং বাঙ্গালাদেশে ইহার বহুল প্রচার হওয়া উচিত।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা—দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাঃ শ্রীঅজয়কুমার সরকার, এম-বি, ডি পি-এইচ্ প্রণীত। সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড, ফরিদপুর, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩২+২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ মাত্র।

লেখক অনেকদিন হইতে ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসারের কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। তিনি সুলেখক,—সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁহার লিখিত সারগর্ভ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক, বসন্ত ও পাণিবসন্ত রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—রোগনির্ণয়, রোগের ক্রমবিকাশ, রোগবিস্তার নিবারণের উপায়, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মচারী ও টীকাদার প্রভৃতির কর্ত্তব্য, রোগীর শুশ্রূষা, তৈজসপত্রাদির শোধন ব্যতীত টীকা দেওয়া সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও দেশীয় মতে চিকিৎসা ও ইংরেজী চিকিৎসা প্রভৃতি বহু বিষয় লিখিয়া তিনি প্রভূত পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পরিশিষ্টে বঙ্গদেশীয় গোবীজের টীকাদান-বিষয়ক আইনও (Bengal Act V of 1880) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বসন্তরোগের আধুনিক চিকিৎসা হাঁসপাতালের বাহিরে এখনও তাদৃশ আদৃত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, বসন্তরোগ সম্বন্ধে আমরা এখনও অনেক ভ্রান্ত মত পোষণ করি। ফলে বসন্ত রোগীর চিকিৎসার ভার এখন পর্য্যন্তও অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের উপর ন্যস্ত করিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজন নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহাদের ধারণা যে, আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত নব্য চিকিৎসকগণ এই সাংঘাতিক রোগের কোনো চিকিৎসাই জানেন না। অথচ হাতুড়িয়াগণ যে-সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিলে প্রত্যেক শিক্ষিত লোক বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ প্রকারে চিকিৎসিত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বসন্ত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা হইতে বিশেষ কম হয় না।

এই পুস্তক পাঠে বসন্ত রোগ, টীকা দেওয়া ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া লেখক দেশের উপকার করিয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে তিনি এই প্রকার পুস্তক লিখিয়া দেশবাসীর মঙ্গলবিধান করিবেন।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কলেরা চিকিৎসা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত এবং কলিকাতা, ২০ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন হইতে মৈত্র এণ্ড সন্সের শ্রীঅজয়কুমার মৈত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৸০।

কলেরা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা ও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কলেরা রোগের ইতিহাস, ইহার বিস্তৃতি ও সংক্রমণ, কোন্ বীজাণু হইতে এই রোগের উৎপত্তি এবং কোন্ কোন্ শারীর যন্ত্রের উপর ইহা কিরূপ ক্রিয়া করে ও ঐ সকল যন্ত্র কিরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, লেখক এই সকলের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের বিভিন্ন মতামত বিবৃত করিয়াছেন। কলেরা সদৃশ অন্যান্য রোগ হইতে ইহার পার্থক্য কি, কিরূপে রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হয় তাহাও দেখাইয়াছেন। কলেরা চিকিৎসায় কার্য্যকরী হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলির বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী উক্ত ঔষধগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও পার্থক্য যেরূপ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহা প্রথম শিক্ষার্থীকেও বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্যনিয়ম পালন করিয়া কলেরা রোগের আক্রমণ কি ভাবে প্রতিরোধ করা যাইতে পারে সেই সকল মতামত সন্নিবেশিত না থাকায় চিকিৎসা-প্রণালীর বিবরণ কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার এলোপ্যাথিক হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া অনেক স্থলেই অযথা নিন্দাবাদ না করিলে ভাল করিতেন। মোটের উপর ইহাতে কলেরা সম্বন্ধীয় সকল তথ্য বিশদভাবে থাকায় এবং গ্রন্থকারের ও স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের কলেরা চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়ায় বইখানি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দে

লাইব্রেরী-আন্দোলন ও শিক্ষা-বিস্তার—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ও "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ" কার্য্যালয়, ৬ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৫৬ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট। মূল্য লাইব্রেরী পক্ষে ১৲ ও সাধারণ পক্ষে ১৷০ মাত্র।

শিক্ষাই স্বাস্থ্য, সুখ ও সভ্যতার সোপান। লোকশিক্ষাপ্রচারে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত হইয়াছে। লাইব্রেরীর সাহায্যে ইস্কুল কলেজের চেয়েও সহজে এবং অল্প খরচে জনসাধারণ শিক্ষা পাইতে পারে। সুখের বিষয়, আমাদের দেশেও সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে, যদিও তাহার পরিচালনা-পদ্ধতির অনেক সংস্কার আবশ্যক। আমেরিকার আদর্শে

বরোদায় লাইব্রেরী-পরিচালনার চেষ্টা কিছুকাল হইতে চলিতেছে। যতদূর জানি, লাইব্রেরী-আন্দোলন বরোদায় যতটা অগ্রসর হইয়াছে, ভারতবর্ষে আর কোথাও তেমন নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক দেশবিদেশের লাইব্রেরী-আন্দোলনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং তাহার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিয়া পাঠক-সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রচুর আলোচনার প্রয়োজন আছে। সুশীলবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলে গত দশ বৎসরে লাইব্রেরী-আন্দোলন ক্রমে ভারতব্যাপী হইয়া উঠিতেছে।

ইস্কুল কলেজ ও সাধারণ পাঠাগারে এই বই অপরিহার্য্য হইবে। ইহা সর্ব্বাংশে সময়োপযোগী হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ 'মুখবন্ধ' লিখিয়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা পড়িয়া পাঠক উপকৃত হইবেন।

বইখানি ভাল কাগজে পাইকা হরফে পরিষ্কার ঝরঝরে ছাপা—পড়িতে কষ্ট নাই।

যাত্রী—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও লেখক কর্ত্তৃক ১৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়বাংশিত ৪২ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। রচনা বিশেষত্ববর্জ্জিত—কোথাও কবিতা হইয়া ওঠে নাই। লেখক 'নিবেদন' করিয়াছেন—সাহিত্যিক বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও উৎসাহে এই বই ছাপাইয়াছেন। লেখক বা তাঁহার 'সাহিত্যিক' বন্ধুদের রসবোধের প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ষিক শিশুসাথী—(১৩৩৭ সাল) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত এবং ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

এখানি পঞ্চম বার্ষিক শিশুসাথী। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী হইতে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লেখা এই ছেলেদের বার্ষিকীখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। কবিতা গল্প গাথা রূপকথা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী স্বাস্থ্যনীতি এবং জীবনচরিত প্রভৃতি নানাবিধ রচনা শিশু এবং কিশোরদের মনকে আকর্ষণ করিবে। প্রচ্ছদপটখানি প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের আঁকা। আরও অনেক সুদৃশ্য ছবি আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

বঙ্গের মহিলা কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত এবং ৬৫ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা ও ২৪-বি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি সুদৃশ্য। ছাপা বাঁধাই ও কাগজ ভাল। এবং রচনা হিসাবে বইখানি সুপাঠ্য। এইরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যোগেন্দ্রবাবু সেই অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু বইখানি পূর্ণাঙ্গ হইলে আমরা আরও সুখী হইতাম। বঙ্গের মহিলা-কবিদের কথা বাংলা সাহিত্যের এক অতি-প্রয়োজনীয় অধ্যায়। ইহার গুরুত্ব অধিক বলিয়াই এ-সম্বন্ধে আলোচনাকালে একদিকে যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অন্যদিকে সতর্ক গবেষণা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের মহিলা কবি বলিতে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ কবিই বোঝায়। কিন্তু পুস্তকখানিতে প্রাচীন স্ত্রী-কবিদের মধ্যে রামী চন্দ্রাবতী আনন্দময়ী ও গঙ্গাদেবী—এই চারিজনকে মাত্র পাইলাম। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে চারিজন মাত্র মহিলা কবি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ দুর্ভাগা। কিন্তু বাংলাদেশ এমন দুর্ভাগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রাচীন কালে সত্যই কি নারী কবির এত অসদ্ভাব ছিল? বিশ্বাস করি, পদাবলীর মধ্যে এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুসন্ধান করিলে নারীনামের ভণিতাযুক্ত আরও অনেক পদ পাওয়া যাইতে পারে। যেমন, গৌরাঙ্গে পরম ভক্তিমতী নীলাচলবাসিনী 'শিখি মাহিতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।'

'মাধবী দাসীতে কয়, অপরূপ গোরা রায়
ভট্টগৃহে করল প্রবেশ।'

শুধু পদাবলী কেন, প্রাচীন এবং অনতিপ্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলে নারীকবিদের কিছু কিছু রচনার সাক্ষাৎ মিলিবেই। এস্থলে কবিওয়ালাদের কালের যজ্ঞেশ্বরীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখিকাদের নাম এবং তাঁহাদের কাব্যের আলোচনা পাঠ করিলে একটু সন্দেহ হয়, যেন গ্রন্থকার পুরাণো 'সাহিত্যে'র ফাইলই বিশেষভাবে দেখিয়াছেন। পুরাতন সকল মাসিক ও সাময়িক পত্রই ভাল করিয়া দেখা দরকার। 'চারুকুসুমাঞ্জলি' রচয়িত্রী চারুলতা ঘোষ বিক্রমপুর-নিবাসিনী। 'বনপ্রসূন' রচয়িত্রী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের সমসাময়িক। ইনিই প্রথম 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র উত্তরে 'বাঙ্গালীর বাবু' লেখেন। 'বনপ্রসূনে'র সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' (১২৮৯) লিখিতেছেন, "সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদের মধ্যে এমন শূরবীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত 'বাঙ্গালার মেয়ে' নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালী মেয়ে আজি কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র।" গ্রন্থে ইঁহাদের নামের উল্লেখ নাই। আমরা শুধু হাতের কাছে যে নামগুলি পাইলাম সেইগুলি দিলাম। যথেষ্ট পরিমাণ মাল-মসলা সংগ্রহ না করিয়া গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিলে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত এই ধরণের গ্রন্থ অতীতের ভিত্তির উপর স্থাপিত করা উচিত। রচনার স্থায়িত্ব সেই ভিত্তির দৃঢ়ত্বের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক। অনুপাত-বোধ ঐতিহাসিকের রচনাকে সুসঙ্গত করে। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানিকে পূর্ণতাদানের চেষ্টা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। এইরূপ পুস্তকের প্রথম সংস্করণে পূর্ণোৎকর্ষ আশা যায় না। রচনা প্রাঞ্জল। এবং কয়েকটি কবির কাব্য-সমালোচনায় গ্রন্থকার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে যতটুকু সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠকসমাজের নিকটে নিবেদন করিয়াছি। সর্ব্বত্রই বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে—তাহাদের ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব দেখিয়াছি। কারাঙ-আসেমের রাজার বলিদ্বীপীয় শিল্পীদের দ্বারা ছবি আঁকানো, এবং সিমেণ্টে বলিদ্বীপীয় ঢঙে মূর্ত্তি ঢালাই করিয়া নিজ গৃহে ব্যবহার; সর্ব্বত্রই মহাভারতের সমগ্র পর্ব্ব সম্পূর্ণ পাইবার আকাঙ্ক্ষা; 'পদণ্ড' ও 'পুঙ্গব'দের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চার পুনরুদ্ধারের জন্য ইচ্ছা; পৌরাণিক নাটকের লোকপ্রিয়তা; শবদাহ ও শ্রাদ্ধে প্রাচীনকালের মতই ঘটা করা; দেশে নানা ধর্ম্মোৎসব;—এ সমস্তই ইহাদের নিজ সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রাণের টানের পরিচায়ক। কিন্তু কেবলমাত্র অন্ধ আবেগের দ্বারা কিছু হয় না; প্রাণের টানকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সুদৃঢ় ও সার্থক করা যায়। বলিদ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে বিচারশীল, তাই তাহাদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সুখের বিষয়, এই সংস্কৃতি আলোচনা বিষয়ে ডচ্ রাজা ও বলিদ্বীপীয় প্রজা উভয়ের মধ্যে পূরা সহযোগ দেখা যাইতেছে। ডচ্ জাতি ভাষায় এবং কতকটা রক্তে ইংরেজদের জ্ঞাতি; বাণিজ্য- ও রাজ্য-বিস্তারে ইহারা ইংরেজদের মতনই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং জ্ঞানের চর্চ্চায় ইহারা ইংরেজদের চেয়ে কোনও অংশে কম নহে—বরঞ্চ ইংরেজ অপেক্ষা ইহারা জারমানদের মত বেশী করিয়া জ্ঞানের সেবক। দ্বীপময় ভারতের নৈসর্গিক ও মানবকৃতিমূলক উভয়বিধ সংস্থা ডচ্ সরকারের উৎসাহে ডচ্ পণ্ডিতেরা অতি সুন্দরভাবে চর্চ্চা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয় বা আধুনিক সভ্যতার যেটা প্রধান অনুপ্রাণনা—জানিবার জন্য কৌতূহল—তদ্দ্বারা ডচেরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, এই কৌতূহলের ফলেই ইহাদের দ্বারা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন কথা লইয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা।—এবং এই গবেষণার ফলে আমরাও উপকৃত; আমাদের আত্মপরিচয় ঘটাইতে ডচ্ জাতির অনুসন্ধিৎসা কম সাহায্য করে নাই। আমাদের ভারতকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে যে ভারতের বাহিরেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—ভারতের সীমা যে কেবল জম্বুদ্বীপ বা আজকালকার Indiaকে লইয়াই নহে—এই জ্ঞান আংশিক ভাবে ডচ্ পণ্ডিতদের আলোচিত দ্বীপময় ভারতের কথা হইতে আমরা লাভ করিয়াছি।

বলিদ্বীপে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কতকগুলি স্থানের অভিজাত ও পণ্ডিত সমাজে একটু সাড়া পড়িয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার আগমনে বহুশত বৎসর পরে আবার যেন নূতন করিয়া ভারত ও বলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ভ্রমণের পরে এ যোগসূত্রকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তাদৃশ কোন চেষ্টা হইতে পারিল না। আমরা নিজের দেশেই নানা দিকে বিপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, উদ্বেগপূর্ণ; এইরূপ ক্ষেত্রে এইপ্রকারের যোগ-স্থাপনের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা না হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। কিন্তু তথাপিও এবিষয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অংশ হিসাবে কিছু দৃষ্টি আমাদের রাখা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের পরে, ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ ও চীনা ভাষাবিৎ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি বলিদ্বীপে যান। ইনি সেখানকার পদণ্ডগণের নিকট হইতে বহু সংস্কৃত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বলি হইতে

ফ্রান্সে ফিরিবার পথে ইনি কলিকাতায় আসেন, শান্তিনিকেতনেও যান। ইঁহার নিকটে এই সব মন্ত্র দেখি। বড়ই আনন্দের কথা, এগুলির শুদ্ধ পাঠ সহ তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন; শুনিতেছি বড়োদা হইতে 'গায়কবাড় প্রাচ্য পুস্তকমালা'-য় শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বলিদ্বীপে ও যবদ্বীপে অবস্থান কালে কতকগুলি ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। ইঁহারা একপ্রকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া বলিদ্বীপের সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে Dr. R. Goris খোরিস-এর কথা আমার বলি-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আর একজন পণ্ডিত হইতেছেন Dr. W. A. Stutterheim ষ্টুটারহাইম,—যবদ্বীপে ইঁহার সহিত আলাপ হয়। এবং তৃতীয় পণ্ডিত একজন হইতেছেন Dr. Pigeaud পিঝো। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন আছেন। দেখিয়া আনন্দ হইয়াছিল, যেমন একদিকে ডচ্ সরকার ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনি বলির পুঙ্গব ব রাজারাও সাহায্য করিতেছেন। বলি ও লম্বক দ্বীপদ্বয়ের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ—ঐ দুই দ্বীপ লইয়া যেন একটী জেলা, জেলার রেসিডেণ্ট বা প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত L. J. J. Caron কারন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বলি-ভ্রমণের পরে একবৎসরের ভিতরে ডচ্ সরকারের ও বলিদ্বীপীয়গণের মিলিত চেষ্টায়, উক্ত দ্বীপের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্ম ও সাধারণ সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং যথা-সম্ভব বলিদ্বীপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ও উন্নতিশীল করিবার জন্য একটি পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু বলিব।

বলিদ্বীপীয়দের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কারনের সহানুভূতি ও প্রীতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিগত ১৯২৮ সালের জুনমাসে ইঁহারই চেষ্টায় বলিদ্বীপে একটী সভা আহূত হয়, এই সভায় স্থির হয় যে F. A. Liefrinck লীফ্রীঙ্ক্ ও Dr. H. Neubronner van der Tuuk ফান্-ডের্-ট্যুক্ এই দুই জন ডচ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটী স্থায়ী সংস্থান প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এই দুই পণ্ডিত বলিদ্বীপীয় ইতিহাস,সামাজিক রীতিনীতি, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য লইয়া প্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন, এই বিষয়ে তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। যে সংস্থান স্থাপিত হইবে, স্থির হয় যে তাহাতে মুখ্যতঃ বলিদ্বীপীয় প্রাচীন তালপাতার পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সংস্থান কেবল পুঁথি-সংগ্রহ কার্য্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না—স্থানীয় সংস্কৃতির সকল দিকই ইহাতে আলোচিত হইতে বাধ্য। এই সভা বা পরিষৎ স্থাপন করা স্থির হইল—যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে দ্বীপময় ভারতের কথা লইয়া গবেষণা করিতেছেন যে সকল ডচ্ পণ্ডিত, তাঁহারা তো প্রথম হইতেই যোগদান করিলেন, তাঁহারা এখন এই সভা লইয়া সম্পূর্ণ শক্তির সহিত কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন বলিদ্বীপের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ডচ্ সরকার হইতে যথাযোগ্য আর্থিক সহায়তাও পাওয়া গিয়াছে। এই সভা যেন বলিদ্বীপের পক্ষে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বা এশিয়াটিক্-সোসাইটী-অভ্-বেঙ্গল-এর মত একটা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রাচীন পুঁথির ও ভাস্কর্য্য এবং অন্য শিল্পের নিদর্শন সংগৃহীত হইতেছে, এবং পণ্ডিতদের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই সভা এখন গৃহ পাইয়াছে, ইহার নামকরণও হইয়াছে। বলিদ্বীপের রাজধানী সিংহরাজায় একটা ছোট কিন্তু বেশ কার্য্যোপযোগী বাড়ী সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে; আগুন লাগিলেও পুড়াইতে পারিবে না এমন একটা ঘর এই বাড়ীতে আছে, সেখানে সংগৃহীত পুঁথিগুলি রাখা হয়। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেদার্ল্যাণ্ড্স্-ইণ্ডিয়ার লাটসাহেব শ্রীযুক্ত De Graeff ডে-গ্রেফ্ এই পরিষৎ-গৃহ সাধারণের জন্য উদ্মোচন করেন। উহার স্থাপনের বৎসর—খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৮শে ১৮৫০ শকাব্দ (বলি ও যবদ্বীপে আমাদের শকাব্দ ব্যবহৃত হয়) 'চন্দ্রসংকাল' রীতিতে চিত্রের দ্বারায় গৃহের দ্বারদেশে অঙ্কিত হইয়াছে—আমাদের 'একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ'র মতন;—মানুষ (১), হাতী (৮—অষ্টদিগ্‌গজ), বাণ (৫—পঞ্চবাণ) ও মৃত দেহ (০—শূন্য)—এই কয়টী চিত্রে ১৮৫০ শক জ্ঞাপিত

হইয়াছে। প্রবেশ-তোরণের দুই দিকে সীতা ও রামের মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের

'লীফ্‌রিঙ্ক্‌-ফান্‌-ডের-ট্যুক্ কীর্ত্তি'-র প্রবেশ-দ্বার

নাম-করণ হয় ডচ্ ভাষায়—Stichting Liefrinck Van der Tuuk—ডচ্ শব্দ Stichting 'স্‌টিখ্‌টিঙ্'-এর অর্থ 'প্রতিষ্ঠান'। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নামে বলিদ্বীপীয় ভাব দিবার জন্য একজন বলিদ্বীপীয় রাজার প্রস্তাবে (ইনি হইতেছেন I Goesti Poetoe Djlantik, ই গুস্তি পুতু জিলাণ্টিক, বুলেলেঙের জমীদার) ডচ্ শব্দের পরিবর্ত্তের বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব্যবহৃত Kirtya 'কীর্ত্ত্যা' শব্দটী গৃহীত হইয়াছে; এই শব্দটী আমাদের সংস্কৃত 'কীর্ত্তি' শব্দেরই বিকার—বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে 'কীর্ত্তি' শব্দের ব্যবহার নাই, ইহাদের ভাষায় শব্দটী দাঁড়াইয়াছে 'কীর্ত্ত্যা' বা 'কীর্ত্ত্যো'। এখন প্রতিষ্ঠানটীর নাম এইরূপ হইয়াছে Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk—অর্থাৎ 'লীফ্‌রিঙ্ক্‌-ফান্ ডের্ ট্যুক্ কীর্ত্তি'।

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 'কীর্ত্তি'-তে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুঁথি সংগ্রহ চলিতেছে, এবং গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলি প্রণয়নে ডচ্ ও বলিদ্বীপীয় পণ্ডিতেরা মিলিয়া কাজ করিয়াছেন; 'কীর্ত্তি'-তে যে ভাবে সংগ্রহ সংরক্ষণ অনুসন্ধান ও অনুশীলন চলিতেছে, সে সম্বন্ধে এগুলি হইতে একটা ধারণা করা যাইবে। এতাবৎ 'কীর্ত্তি'-র Mededeelingen বা অনিয়মিত সাময়িক পত্রিকা দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে; Kidung Pamancangah নামে একখানি বলিদ্বীপীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রোমান অক্ষরে ডচ্ টীকা টিপ্পনী সমেত C. C. Berg কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; এবং দুই খণ্ডে Dr. Stutterheim প্রকাশ করিয়াছেন বলিদ্বীপের Pedjeng পেজেঙ রাজ্যের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুর বিবরণী ও চিত্রাবলী (Oudheden van Bali—Het oude Rijk van Pedjeng)—প্রথম খণ্ডে প্রাপ্ত বস্তুর বর্ণনা, প্রাচীন লেখের সম্পাদন, ও বলিদ্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আছে; এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রায় ১৩০ খানি চিত্র ও নক্সা। (এই প্রবন্ধে ডক্টর ষ্টুটারহাইমের বই হইতে গৃহীত প্রাচীন বলিদ্বীপের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইল; এগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।)

ডক্টর খোরিস্ 'কীর্ত্তি'-র পুঁথি সংগ্রহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, এবং তিনিই ইহার প্রাণ-স্বরূপ। সমগ্র বলি ও লম্বকে পুঁথির জন্য রীতিমত অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রাচীন পুঁথি পাইলে 'কীর্ত্তি'-তে সংগৃহীত তো হইতেছে, এতদ্ভিন্ন নিয়মিত ভাবে প্রাচীন পুঁথির নকলও করিয়া রাখা হইতেছে। পুঁথি সমস্ত তাল-পাতার, লোহার লেখন দিয়া খুদিয়া খুদিয়া লেখা; উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের পুঁথির মত। আবার সচিত্র পুঁথিও পাওয়া যায়—উড়িষ্যার মত, তালপাতার উপরে ঐ লোহার লেখন দিয়া আঁচড় কাটিয়া অতি সুন্দর ছোটো চিত্রে ভরা পুঁথি বলিদ্বীপে খুব আছে। এই সব সচিত্র পুঁথিরও নকল হইতেছে, এবং এজন্য 'কীর্ত্তি'-কর্ত্তৃক চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খোরিস আমায় চিঠি লিখিয়া-ছেন, পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—'কিভাবে আমি পুঁথি-সংগ্রহ করিতেছি জানেন? বলিদ্বীপে প্রায় চল্লিশজন 'পুঙ্গব' বা রাজা আছেন; প্রথমতঃ 'কীর্ত্তি'-র পক্ষ হইতে তাঁহাদের অনুরোধ করিয়া পাঠাই যে তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে কাহার কাছে কি পুঁথি আছে তাহার যেন একটী তালিকা করিয়া পাঠান। এই সকল তালিকা হইতে কতকগুলি পুঁথির নাম বাছিয়া ...

পরে নির্ব্বাচিত পুঁথির তালিকা পুঙ্গবদের কাছে প্রত্যর্পিত হয়। তাহার পরে কোনও সময়ে কোনও অঞ্চল বিশেষে

'কীর্ত্তি'-র পুঁথি-শালা

গিয়া নির্ব্বাচিত পুঁথিগুলি আনাইয়া একত্র করিয়া লই, এবং সেগুলি নকলের উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য 'কীর্ত্তি'-তে লইয়া আসি। সম্পূর্ণ থাকিলে এবং ভালো করিয়া লেখা হইলে, বলিদ্বীপের নানাস্থানে ভাল পুঁথি-লেখক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কাছে অনুলিখনের জন্য পাঠাইয়া দিই, 'কীর্ত্তি'-র তহবিল হইতে তাঁহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। নকলের পরে, মূল পুঁথিগুলি মালিকদের নিকটে ফেরত পাঠানো হয়, এবং নকল গুলি 'কীর্ত্তি'-র পুঁথি-শালায় রক্ষিত হয়।······আমরা প্রথমটায় চাই—যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ একটী পুঁথির সংগ্রহ করিয়া তোলা। তাহার পরে আবশ্যক,—প্রথম, বলিদ্বীপীয় ও প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের একটী নূতন ও উপযোগী তালিকা রচনা করা ; দ্বিতীয়তঃ—যে বইগুলি আবশ্যকীয় বা মূল্যবান্, ডচ অনুবাদ ও টিপ্পনীর সহিত রোমান অক্ষরে শীঘ্র শীঘ্র সেগুলিকে ছাপাইয়া ফেলা। যতগুলি পারা যায় মূল্যবান্ পুস্তক (বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক) ধরিয়া ছাপাইবার পক্ষে এই-ই হইতেছে প্রশস্ত সময়।'

প্রথম সংখ্যা Mededeelingen বা সাময়িক পত্রিকায় 'কীর্ত্তি'-র সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ (ইনি বলিদ্বীপীয়, ইঁহার নাম Njoman Kadjeng ঞোমান্ কাজেঙ্) ডচ্ ভাষায়, বলিদ্বীপীয় পুঁথির শ্রেণী বিভাগ ব্যপদেশে বলিভাষার সাহিত্যের একটি প্রাথমিক দিগ্‌দর্শন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণী বিভাগে বলিদ্বীপীয় গ্রন্থনিচয়কে তিনি ছয়টী মুখ্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন ; (১) বেদ—বেদ অর্থে মন্ত্র ও পূজার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পুঁথি ; (২) আগম—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি গ্রন্থ লইয়া ; (৩) Wariga বারিগ—জ্যোতিষ, দেবতাদের উপাখ্যান, ব্যাকরণ, ছন্দ, 'স্মর-তন্ত্র' এবং 'উসদ' (অর্থাৎ 'ঔষধ' বা চিকিৎসা-বিদ্যা), ও অন্যান্য বিদ্যা ; (৪) ইতিহাস—ইহার অন্তর্গত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ,—গদ্যে ('পর্ব্ব') ও পদ্যে (Kakawin 'ককবিন্') ; ও প্রাচীন যবদ্বীপের রাজকাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য ; (৫) Babad 'ববদ্' বা গদ্য ইতিহাস ; ও (৬) 'তন্ত্রি' বলিদ্বীপীয় ভাষায় কামন্দক প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রের অনুবাদ, এবং নীতিবিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মৌলিক রচনা। এই

বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি (ভারত-বলি যুগের)

বলিদ্বীপের পুরাতন পটের অংশ

দুইটি দৃশ্য ১। অশ্বারোহী রাজা, ২। মৃতের জন্য বিলাপ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ছয়টি মুখ্য শ্রেণী ও তাহাদের উপশ্রেণীতে ৯০০এর উপর বিভিন্ন পুঁথির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্তই বলিদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি। এতদ্ভিন্ন বলিদ্বীপে সংস্কৃত পুঁথি (বলি বা যবদ্বীপীয় অক্ষরে লেখা) কিছু কিছু আছে। কারেঙ-আসেম-এ অবস্থান-কালে সেখানকার রাজার কাছে তান্ত্রিক দর্শন ও সাধন-সম্বন্ধে একখানি পুঁথি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইরূপ আশা করা যায় যে খুব অসাধারণ কোনও সংস্কৃত বই বলিদ্বীপে না পাওয়া গেলেও, মূল্যবান্ বা অজ্ঞাত বা লুপ্ত কোন ছোটখাট বই মিলিতেও পারে।

শিব (ভারত-বলি যুগ)

সাময়িক পত্রিকাটীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'কীর্ত্তি'র পুঁথি-সংগ্রহের একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মূল ও অনুলিপন দুইয়ে মিলিয়া ২৫০এর উপর পুঁথি ইঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কতক পুঁথি লম্বকদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। লম্বকদ্বীপ বলির পূর্ব্বেই। এখানকার লোকেদের Sasak 'সাসাক্' বলে। ইহারা বলিদ্বীপীয়দের জ্ঞাতি-স্থানীয়, কিন্তু এখন ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বলিদ্বীপীয়েরা লম্বক জয় করিয়া সাসাক্‌দের উপর রাজত্ব করিত। 'সাসাক' ভাষার পুঁথিও সংগৃহীত হইতেছে।

নারী-মূর্ত্তিময় পয়ঃ-প্রণালী (প্রাচীন-বলি যুগ)

পুঁথি সংগ্রহের ভার যেমন ডাক্তার গোরিস গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্নদ্রব্য-সংগ্রহ ও প্রাচীন কেপ উদ্ধার এবং প্রাচীন স্থান খুঁড়িয়া আবিষ্কারের ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইমের উপরে। যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি একজন সর্ব্বত্র সমাদৃত বিশেষজ্ঞ। ইঁহার নানা পুস্তক ও প্রবন্ধাদি আছে। যবদ্বীপে সুরকর্ত্ত নগরে ইনি একটী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এখানে যবদ্বীপীয় ছেলেমেয়েদের বিশেষভাবে যবদ্বীপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়. এই বিদ্যালয়টী যবদ্বীপের Arts Universityতে ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইবে আশা করা যায়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার 'দ্বীপময় ভারত'যবদ্বীপ প্রসঙ্গে বলিব। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইমের 'চিত্রে যবদ্বীপের ইতিহাস' বইখানিতে বহু প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও

অন্য শিল্প বস্তুর সাহায্যে যবদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার একটা ধারণা করাইয়া দেয়। এই বইখানি বাতাবিয়া হইয়া ডচ্, মালাই, যবদ্বীপীয় ও ইংরেজী—এই কয়টা বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কীর্ত্তি'-র মারফৎ ইনি বলিদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত করিতেছেন। পেজেঙ-নামক স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই লেখগুলি বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ও শৈব এবং শাক্ত মন্ত্র ও পূজা পদ্ধতি লইয়া। বৌদ্ধ 'যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভাবা' মন্ত্র আছে; আবার বিকৃত সংস্কৃতে অন্য মন্ত্র বা নমস্কার আছে;—যথা, 'নমঃ ত্রয়সর্বতথাগত তদপগন্তং জল জল ধমধা আল সংহর সংহর আয়ুঃ সংসাধ সংসাধ সর্বসত্ত্বানাং পাপং সংতথাগত সমন্তা ষ্ণীথ বিমল শুদ্ধ স্বাহা।' কতকগুলি লেখ বেশ বড়; অধিকাংশই ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায়। অনেকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয়বিধ ধর্ম্মের। বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ, শিব, দেবী মহিষমর্দ্দিনী, গণেশ ইত্যাদির মূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন বলিদ্বীপীয় রাজা রাণী প্রভৃতিরও মূর্ত্তি আছে, মণ্ডনশিল্পের অঙ্গীভূত নারীমূর্ত্তিও আছে। যবদ্বীপে যে রীতির মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, এগুলি সেই রীতির; তবে বলিদ্বীপের বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইমের বইয়ে তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম ফল স্বরূপ এই মূর্ত্তিগুলির চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসী এবং হিন্দুর পক্ষে এই বইয়ের চিত্রাবলী আনন্দের সহিত স্বীকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইম বলিদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামো দিয়াছেন। বলিদ্বীপের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনি তিনটী মুখ্য যুগে বিভাগ করিয়াছেন; (১) ভারত-বলি যুগ, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতক পর্য্যন্ত; এই যুগের পূর্ব্বেকার কোনও লিপি বা লেখ এ-যাবৎ বলিদ্বীপে পাওয়া যায় নাই; এই সময়ের শিল্পে ভারতীয় প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট, এ সময়ের শিল্প সমকালীন যবদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যেরই মতন; (২) প্রাচীন-বলি যুগ, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতক পর্য্যন্ত; এই সময়ে বলিদ্বীপীয়দের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতেছে দেখা যায়; (৩) মধ্য-বলি যুগ, খ্রীষ্টীয় ১৩শ—১৪শ শতক; ও তৎপরে (৪) নবীন বা অর্ব্বাচীন বলি যুগ। প্রদর্শিত চিত্রগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা (প্রাচীন-বলি যুগ)

'কীর্ত্তি' পরিষৎ বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তি আলোচনার জন্য যাহা করিতেছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তি আংশিক ভাবে ভারতের বলিয়া, আমরাও তাহার দাবী করিতে পারি। বলিদ্বীপের লোকেরা, সংস্কৃত-ভাষা যাহার বাহন সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মকে এখনও মানিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমাদের রিক্‌থ কাল-ধর্ম্মে কোথাও আর অবিকৃত নাই—না বলিদ্বীপে, না ভারতে; তবে ভারতে যোগসূত্র অবশ্য কখনও ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু বলিদ্বীপেও কতকগুলি বিষয় এখনও সুরক্ষিত আছে, ইহা নিশ্চিত। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ জানিতে হইলে এই জিনিসগুলিরও চর্চ্চা অপরিহার্য্য হইবে। 'কীর্ত্তি' এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ইহার

কর্ত্তব্যভারে আমাদেরও অংশ গ্রহণ করা উচিত। বহির্ভারতের বা বৃহত্তর ভারতের কথা হইতে আমাদের প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে অনেক খবর জানিতে পারিব। ভারতবাসীর পক্ষে এই জন্য 'কীর্ত্তি'-র সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা ও ইহার সহায়তা করা উচিত। অবশ্য 'কীর্ত্তি' হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভাষা (ডচ্, মালাই, বলিদ্বীপীয়) আমরা বুঝিব না; কিন্তু দ্বীপময় ভারতের সহিত ভারতের যোগ আলোচনা করিতে গেলে এই সকল ভাষা (অন্ততঃ ডচ্) অপরিহার্য্য হইবে।

'কীর্ত্তি' যে কেবল বলিদ্বীপের প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ ও প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, তাহা নহে। মৃত অতীতকে লইয়া যে অনুসন্ধান, তাহাকে জীবিত বা আধুনিক কালের জন্যও সার্থক এবং কার্য্যকর করাও ইহার উদ্দেশ্য। বলিদ্বীপীয় ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞান প্রচার করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুখ্যতঃ, বলিভাষায় একখানি নিয়মিত সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করা হইবে। এইরূপে 'কীর্ত্তি' বলিদ্বীপের সংস্কৃতির পুনর্জাগৃতি বিষয়ে সহায়ক হইবে। যদি এই কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ডচেরা আসিয়া

রাণী বা রাজপুত্রীর মূর্ত্তি (মধ্য-বলি যুগ)

গণেশ (মধ্য-বলি যুগ)

বাস্তবিকই বলিদ্বীপের উন্নতি করিলেন, এবং বলিদ্বীপীয়দের জন্য এই 'কীর্ত্তি' পরিষৎ ডচ্ জাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান হইল। 'ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি'—ধর্ম্মদান অন্য সব দানকে জয় করে; নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন যদি বলিদ্বীপীয়েরা করিতে পারে, তাহাতেই তো তাহাদের জাতির ধর্ম্ম রক্ষা হইল। এই

ম্পর্কে ডাক্তার গোরিস আমায় লিখিয়াছেন (১৯৩০ সালের জুলাই মাসে):—'আর একটা কথা শুনিয়া আপনি খুশী হইবেন, আমরা শীঘ্রই বলিভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিব। ইহাতে বলিদ্বীপের সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের আলোচনা থাকিবে। পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ হইতেছে, এবং বহু সহযোগী (ইঁহারা সকলেই বলিদ্বীপীয়) ইতিমধ্যেই তাঁহাদের সাহায্য দানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের প্রবন্ধও পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশীর ভাগ গ্রাহকেরা চাহেন যে মাসিকখানি বলিদ্বীপের অক্ষরেই মুদ্রিত হয়। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে আংশিক ভাবে এই অক্ষরে মুদ্রণ করা হইবে। অক্ষরের জন্য ইতিমধ্যে হলাণ্ডে অর্ডার পাঠানো হইয়াছে। বোধ হয় মাস দুইয়ের মধ্যে এই নূতন মাসিক প্রকাশিত হইবে—বলিভাষায় ও মালাইয়ে—বলিভাষার অংশ খানিকটা বলিদ্বীপীয় অক্ষরে ছাপানো হইবে (বাকীটুকুন রোমানে)।' শ্রীযুক্ত খোরিস আরও লিখিতেছেন—'আজকালকার বলিদ্বীপীয়েরা সত্যকার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেত ঔৎসুক্য পোষণ করে—ওদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) প্রাচীন ধর্ম্ম, সভ্যতা ও শিল্প যাহা বিদ্যমান আছে সে সম্বন্ধে জানিতে চাহে। সুতরাং হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক অভিমত—বলিদ্বীপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান—বিষয়ে সত্যসত্যই এদেশের লোকেদের খুব উৎসুক দেখা যায়।'

'কীর্ত্তি'-তে ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত খোরিস সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। চারি জন বলিদ্বীপীয় ছাত্র খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। গীতার ডচ্ অনুবাদ আছে, বলিভাষায়ও মূল সংস্কৃত সহ তাহার অনুবাদ প্রকাশ, আশা করা যায় এই 'কীর্ত্তি' হইতেই হইবে। ইহাদ্বারা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রন্থের সহিত বলিদ্বীপীয়দের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। অন্যান্য সংস্কৃত বইয়েরও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ডচেদের সাহায্যে বলিদ্বীপীয়েরা নিজেরাই লাগিয়া গিয়াছে; আর আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত শিক্ষক পাঠাইবার কথা চাপা পড়িয়া গেল, সম্ভবপর হইল না। যিনি এ বিষয়ে বলিদ্বীপীয়েদের মধ্যে কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে তন্ত্র জানিতে হইবে, এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া যাইতে হইবে। ওখানে রামায়ণ মহাভারত বুঝে, পূজা হোম বুঝে,—কিন্তু আর্য্যসমাজী বা অন্য কোন আধুনিক মতবাদ উহারা বুঝিবে না। এখনই কোনও আধুনিক ভারতীয় মতবাদ বলিদ্বীপীয়েদের

চতুর্মুখ মূর্ত্তি (চতুঃকায়), শিবের ত্রিনেত্র, বিষ্ণুর শঙ্খ ও ব্রহ্মার পুস্তক সহ (মধ্যবলি যুগ)

মধ্যে প্রচার করিতে গেলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইে উহাদের দেশে যে ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সংস্কৃি বিকাশ হইয়াছে, তাহাকেই পূর্ণভাবে মানিয়া লই

তাহারই মধ্য দিয়া আমাদের উভয় জাতির সংস্কৃতির ও ধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শ ও সত্যগুলিকে শিক্ষা দিতে পারা যায়। খ্রীষ্টান মিশনরীদের মতন আলোকদানের স্পর্দ্ধা লইয়া, Superiority Complex-এর বশবর্ত্তী হইয়া বলিদ্বীপে সংস্কৃত-শিক্ষক যেন না যান। যাওয়ার অন্তরায়ও অনেক। ডচ্ সরকারের অনুমোদন না হইলে কিছুই হইবে না; এবং মালাই ও বলিভাষায় তথা ডচে কিঞ্চিৎ জ্ঞানও দরকার। মোট কথা—Historical Sense বা ইতিহাস-বোধ যাঁহার নাই, এমন ব্যক্তি কোন উপকার করিতে পারিবেন না।

বলিদ্বীপে ইংরেজী জানা দুই চারি জন শিক্ষিত লোক আছেন। ডাক্তার খোরিস লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই পাইলে ইহাদের সাহায্যে উপযোগী পুস্তক বা প্রবন্ধ বলিভাষায় বা মালাইয়ে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করা যায়—ইহাদ্বারা বলিদ্বীপীয়গণ ভারতবর্ষে তাহাদের হিন্দুভ্রাতৃগণ যে যে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বা জ্ঞান-সাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে খবর পাইবে। এই সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে বা সম্পূর্ণ অনুবাদে বলিভাষার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে, এবং যে পুস্তক বা প্রবন্ধ হইতে এই সকল অনুবাদ বা সার-সংকলন গৃহীত হইবে, তাহার পূর্ণ উল্লেখ থাকিবে।'

পাটনায় বিগত নিখিল-ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্গণের (ষষ্ঠ) সম্মিলনীতে 'কীর্ত্তি'-র কার্য্যাবলীর প্রতি আমাদের দেশের প্রাচ্যবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সম্মিলনীতে 'কীর্ত্তি'-র প্রতি স্বাগত ও অভিনন্দন বাণী জ্ঞাপন করিয়া এবং 'কীর্ত্তি'-র সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ভারতের তাবৎ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনাকারী মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ জানাইয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'কীর্ত্তি'-র সহিত পুস্তকাদি বিনিময়ের ব্যবস্থা তাবৎ মণ্ডলী করিতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'কীর্ত্তি'-র বাৎসরিক চাঁদাও বেশী নহে—টাকা আটনয়ের অধিক হইবে না। ইহার ঠিকানা—Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk, Singaradja, Bali, Netherlands India. আশা করি ভারতবর্ষ হইতে যথাযোগ্য সাহায্য লাভে এই নবীন পরিষৎ বঞ্চিত হইবে না।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

৪৩

দেবকুমার মায়াকে লইয়া ফিরিয়া আসিবামাত্র সমস্ত বাড়িতে সাড়া পড়িয়া গেল। নিরঞ্জন অন্য একটা গাড়ীতে কন্যার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাকে খবর দিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন চাকর সাইকেল চড়িয়া বাহির হইয়া গেল। ইন্দু, আয়া, চাকরবাকর সকলে ভিড় করিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মোটরের দরজা খুলিয়া দেবকুমার নামিয়া পড়িল। ইন্দুকে সামনে দেখিয়া বলিল, "পিসীমা, মায়া ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ওঁকে এখনি উপরে নিয়ে যেতে হবে।"

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "ওমা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল? কি রোগেই যে ধরল মেয়েটাকে, আবার একটা ভালমন্দ কি হয় কে জানে", তারপর গাড়ীর কাছে আসিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া সে একেবারে শিহরিয়া উঠিল।" দেবকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ যে ভিজে চুবচুব করছে? জলে পড়ল কি করে?"

দেবকুমার একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "সবই

বল্‌ছি, আগে ওঁকে উপরে নিয়ে যেতে দিন, না হলে ঠাণ্ডা লেগে শেষে নিউমোনিয়া হয়ে দাঁড়াবে।"

ইন্দু আর আয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলিল, মায়ার বিছানা এবং কাপড়চোপড় ঠিক করিতে। দেবকুমার আবার মায়াকে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। উত্তেজনায় তখন তাহার নিজের শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু মনের জোরে সে নিজেকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মায়ার জন্ত যাহা যাহা করিবার তাহাতে ত্রুটি না হয়, তাহার পর তাহার নিজের যাহা হয় হইবে। এই কয়েকটা দিনের মধ্যে তাহার জীবনের উপর দিয়া এমন প্রলয় ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে, পৃথিবীর উপরেই তাহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছিল। তবু কুহকিনী আশা তাহাকে বিশ্রাম দেয় কই? হয়ত সে আলেয়ারই পিছনে ছুটিতেছে, কিন্তু থামিবার উপায় তাহার নাই।

মায়ার মুখ তখনও দেবকুমারের বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে। সে একবার সেই অপূর্ব্বসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। মায়াই বটে, কিন্তু এই কি তাহার প্রেয়সী, তাহার প্রেমময়ী মায়া? সে কি আর এ জগতে আছে? কোনোদিনই কি আর সে ফিরিয়া আসিবে? না, ইহার পর এই মায়ার ছদ্মবেশধারিণী মরীচিকাই তাহাকে অসহ্য জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে।

কিন্তু অত ভাবিবার সময় নাই। সে মায়াকে বহন করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মায়ার ঘরে ঢুকিয়া, তাহার অচেতন দেহ শয্যায় ন্যস্ত করিয়া বলিল, "পিসীমা, শীগ্‌গির এঁর ভিজে কাপড়চোপড় সব ছাড়িয়ে দিন। আমি নীচে গিয়ে ডাক্তারকে আস্‌বার জন্তে টেলিফোন্ করছি। আপনার মেজদাও এখনই এসে পড়বেন, তাঁকে ডাক্‌তে লোক গিয়েছে।"

ইন্দুর অনেক কথাই ঠোঁটের ডগায় আসিয়া জমা হইয়াছিল, কিন্তু দেবকুমার তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ না দিয়াই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। ইন্দু এবং আয়া মিলিয়া তখন অচেতন মায়ার শুশ্রূষায় লাগিয়া গেল। কিন্তু মায়ার জ্ঞান ফিরিয়া আসার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

ইন্দু একটু ভীতভাবে বলিল, "হ্যাঁরে আয়া, মেয়ে ত একেবারে চোখও চায় না? ডাক্তার এলে যে বাঁচি।"

আয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিল, "ডরোনা পিসীমা, আচ্ছা হয়ে যাবে। আগেও এই রকম হ'ল।"

এমন সময় নীচে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মিনিট দুই পরেই নিরঞ্জন উপরে উঠিয়া আসিলেন। দেবকুমারও উপরে আসিল, কিন্তু সে মায়ার ঘরে প্রবেশ করিল না।

নিরঞ্জন আসিয়া মায়ার পাশে বসিলেন। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একবারও চোখ চায়নি না কি?"

ইন্দু বলিল, "না মেজদা। এইভাবেই আছে। ডাক্তার এখনই আস্‌বে কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আস্‌তে ত বলে দিয়েছি। যাক্, ভয় পাস্‌নে, সেবারেও অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ ছিল। অন্ত কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলেই ঢের। আচ্ছা, বোস্ এখানে, আমার দেবকুমারের সঙ্গে একটু কথা আছে।"

দেবকুমারের সঙ্গে ইন্দুর অনেক কথা ছিল, কিন্তু মায়াকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে সে ভরসা পাইল না। অগত্যা বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন দেবকুমারকে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি কাপড় ছেড়ে নাও, আমি আপিস-ঘরেই আছি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবকুমার আসিয়া আপিস-ঘরে ঢুকিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "বোসো। মায়াকে তুমি কোথায় পেলে?"

দেবকুমার বলিল, "লেকের ধারে।" নিরঞ্জন-জিজ্ঞাসা করিলেন, "জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন, কিছু বুঝতে পারলে? বেশীক্ষণ জলে ছিল না ত?"

দেবকুমার বলিল, "না, বেশীক্ষণ জলে ছিলেন না, পড়বামাত্র তুল্‌তে পেরেছিলাম। কেন যে জলে ঝাঁপিয়ে

পড়লেন, তা ঠিক জানি না। বোধ হয় আমি ডাকাতে ভয় পেয়েছিলেন।"

নিরঞ্জন একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাস সেখানে ছিল ?"

দেবকুমার সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় গেল ?"

দেবকুমার বলিল, "তা বলতে পারি না, আমি তখন মায়াকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিলেন। দেবকুমার বলিল, "আমায় একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, আপনার ড্রাইভারটাকে বলে দেবেন। এত রাত্রে আর বাস্ বা টেক্সি কিছুই পাওয়া যাবে না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "রাত্রে আর নেই বা গেলে ? আমি তোমার বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি। ডাক্তার আসুক, সে আবার কি বলে দেখি। যা অস্বাভাবিক অসুখ, কখন কি টার্ণ নেবে তার ঠিকানাই নেই। হয়ত রাত্রেই জ্ঞান হবে, তখন তোমায় দরকার হতে পারে।"

দেবকুমার বলিল, "বেশ, আমি তাহলে বাবাকে ফোন্ করে দিই," বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন প্রভাস সম্বন্ধে কি করা যায়। সে যাহাই করিয়া থাকুক, সে তাঁহার গৃহে অতিথি এবং এক দেশের এক গ্রামের মানুষ। সে কোনো অপরাধ করিয়াছে বলিয়াও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কন্যাকে সে ভালবাসে, মায়া অন্যের বাগ্‌দত্তা জানিয়াও ভালবাসে, ইহাই তাহার অপরাধ। কিন্তু এই ধরণের অপরাধ অনেক মানুষেই করে এবং তাহার জন্য তাহারা শাস্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পায় না।

কিন্তু দেবকুমারকে তিনি কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। সে যে প্রকৃতির ছেলে, তাহাতে এখনই প্রভাসকে তাহার সাম্‌নে আসিতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হইবে না। বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেলে সেটা অত্যন্তই অশোভন ব্যাপার হইবে। দেবকুমারের দৃঢ়বিশ্বাস্ যে প্রভাস অপরাধী। সে যে অপরাধী নয়, তাহা প্রভাস স্বয়ং বা নিরঞ্জন কেহই প্রমাণ করিতে পারিবেন না। পারে একমাত্র যে, ভগবান তাহার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছেন, কোনোদিন সে জ্ঞান পূর্ণভাবে ফিরিবে কি-না তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরে সমস্ত রাত ছেলেটা কি করিয়া থাকিবে ? তাহার একেবারে খোঁজ না করাটা বড়ই অমানুষের কাজ হইবে। কাল সকালে ত সে যাইবেই, এই রাত্রির কয়েকটা ঘণ্টা তাহাকে কি কোথাও আশ্রয় দেওয়া যায় না ? প্রভাসকে তিনি শৈশবাবধি দেখিতেছেন, সে যে কোন কু-অভিসন্ধিতে মায়াকে লেকের ধারে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তাহা ছাড়া মায়ার সহিত দেখা করিবারও ত তাহার কোনো উপায় ছিল না, সে এসব অভিসন্ধি করিবে কিরূপে ?

অনেক ভাবিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং নিজের ড্রাইভারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে গাড়ী লইয়া আবার লেকের ধারে যাইতে বলিলেন। প্রভাসকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে একেবারে শহরে তাঁর আপিস-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। তাহার জিনিষপত্র সকালে সেখানে পাঠাইয়া দিলেই চলিবে। ড্রাইভার গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দেবকুমার এই সময় ফিরিয়া আসিল। বসিয়া বলিল, "ডাক্তারের ত এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এখনই এসে পড়বে, এতখানি দূর আসবে, এক মিনিটের নোটিসেই ত আসতে পারে না ? বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সেবারেও অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ ছিল।"

দেবকুমার চুপ করিয়া রহিল। সেই অসহনীয় পুলকময় দিন, সেই অসহ্য যন্ত্রণাময় রাত্রির স্মৃতি তাহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মানুষ হইয়া সে সেইদিনটাতে অমরাবতীর স্বাদ পাইয়াছিল, নরকের স্বাদও পাইয়াছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই দিনটা কখনও তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে না।

বাহিরে মোটরের হর্ণের শব্দ শুনিয়া নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "এল বোধ হয়, দেখি।" দেবকুমারও তাঁহার পিছন পিছন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল আবার ? কোনো নূতন টার্ণ নিয়েছে নাকি ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, এখন পর্য্যন্ত জ্ঞান হয়নি।"

ডাক্তার বলিলেন, "চলুন, দেখি উপরে।" নিরঞ্জন বলিলেন, "চলুন। দেবকুমার তুমিও এস।"

দেবকুমার মনে মনে নিরঞ্জনের সুবিবেচনার অনেক প্রশংসা করিয়া উপরে চলিল। মায়ার শয়নকক্ষে ঢুকিতে তাহার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল। সে বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার মায়াকে খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখন ত ঘুমিয়ে আছেন মনে হচ্ছে। একবারও কি তাকান নি ?"

ইন্দু খাটের ওপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "একবার মাত্র তাকিয়েছিল, কিন্তু তখুনি আবার চোখ বুজে ফেল্‌ল।"

ডাক্তার বলিলেন, "থাক্, এখন ঘুমতেই দিন, ডিস্টার্ব করবেন না। আমার ত মনে হচ্ছে না, ভয় পাবার কোনো কারণ আছে। আমি আবার সকালে এসেই খবর নেব। ভালই থাকবেন বোধ হয়।"

দেবকুমার কথাটা শুনিতে পাইল, কিন্তু আশা করিতেও তাহার ভয় করিতেছিল। এতখানি দুঃখের অবসান কি এত সহজে হইতে পারে ?

ডাক্তার নামিয়া চলিলেন। ইন্দু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "রাত ত এক পহর হয়ে গেল, এখন অবধি কারও খাওয়া-দাওয়া নেই। মেজদা চল, দেবকুমার তুমিও এস। মায়ার কাছে আয়া খানিক বসুক, আমি তোমাদের খাইয়ে আসি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তুই কি রাত্রে কিছু খাবি না ?"

ইন্দু বলিল, "রাতে খাওয়া ত অভ্যেস নেই। সন্ধ্যের সময় জলটল খেতাম, তা আজকের গোলমালে কিছু হয়ে ওঠেনি। এখন আর কিছু খাব না, রাত্তিরে তাহলে বড় অসোয়াস্তি লাগবে, ঘুম হবে না।"

সকলে নীচে খাইবার ঘরে গিয়া বসিলেন। ছোক্‌রা এবং ঠাকুর মিলিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের উত্তেজনার পর, কথা বলিতে কাহারও বিশেষ ইচ্ছা করিতেছিল না। দেবকুমার খালি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি হঠাৎ এসে জুটলাম, কম পড়বে না ত ?"

নিরঞ্জন শুধু বলিলেন, "না, কম কেন পড়বে ? খাবার ত দু-তিনজনের মত রয়েছে।" যাহার জন্য অতিরিক্ত রান্নাটা হইয়াছিল, তাহার কথা মনে করিয়া তাঁহার মনটা একবার কেমন করিয়া উঠিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মানুষটা গেল কোথায় ? তাহার কোনো একটা বিপদ আপদ হইলে চিরদিন তাহার জন্য নিরঞ্জনের একটা অনুশোচনা থাকিয়া যাইবে।

একরকম নীরবেই সকলে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নিরঞ্জন চাকরকে ডাকিয়া দেবকুমারের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। তাহার পর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি শুতে যাচ্ছি, বড় বেশী ক্লান্ত লাগছে। আজ তুই মায়ার ঘরেই থাকিস্। কিছু দরকার হ'লে তখুনি আমাকে খবর দিস্, ঘুমিয়ে আছি ব'লে যেন বসে থাকিস না।"

ইন্দু বলিল, "তা ডাকব বৈকি ? অসুক-বিসুখের সময় কি আর অত বিচার করলে চলে ?" সেও উপরে উঠিয়া গেল।

দেবকুমার তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিল। ঘুম তাহার একেবারেই আসিতেছিল না। উপরের তলা হইতে কোনো সাড়া পাওয়া যায় কি-না, তাহারই আশায় নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সে উৎকর্ণ হইয়া ছিল। কি যে সে আশা করিতেছিল, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু উপরতলা হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দেবকুমার বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিরঞ্জন তাঁহার মোটর না ফেরা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেও পারিতেছিলেন না। প্রভাসের জন্য একটা দুশ্চিন্তা তাঁহার লাগিয়াই ছিল। মোটর যখন ফিরিল, তখন রাত প্রায় একটা। নিরঞ্জন তখনও জাগিয়া

ছিলেন। মোটরের শব্দ শুনিবামাত্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ড্রাইভারের কাছে যে খবর পাইলেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। সে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়াও প্রভাসের কোনো চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। গাড়ী রাখিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়াও দেখিয়াছে। কিন্তু কোথাও খোঁজ পায় নাই। তবে ফিরিয়া আসার মুখে তাহার পরিচিত একটা লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সে অনেকরাত্রে শহর হইতে মদ খাইয়া ফিরিতেছিল। তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছে, একজন বাঙালীকে সে শহরের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। ড্রাইভার খানিকদূর গাড়ী লইয়া গিয়াও কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। মাতালের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাও সে বলিতে পারে না।

নিরঞ্জন অগত্যা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাত্রির ভিতর আর কিছু করিবারও উপায় নাই। মায়া যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে সকালে ষ্টীমার ঘাটে একবার খোঁজ করিবেন। না হইলে তাহার জিনিষপত্র সেখানে গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিবেন, ড্রাইভার তাহাকে খুঁজিয়া পাইলে দিয়া আসিবে।

শুইতে যাইবার আগে একবার উপরে গিয়া মেয়েকে দেখিয়া আসিলেন। সে তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত। ইন্দু নীচে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারও চোখে ঘুম নাই। একখানা ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বুড়ী আয়া প্রবল নাসিকাধ্বনি-সহকারে নিদ্রা যাইতেছে।

নিরঞ্জন কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

(৪৪)

ইন্দু অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত থাকায় তাহার নিদ্রা গভীর হইতে পারে নাই, ঘুমের মধ্যে সে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল, নানা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল।

একবার স্বপ্ন দেখিল, বাড়িতে সে এবং মায়া ভিন্ন কেহই নাই। মায়া প্রাণপণে জান্‌লা দিয়া লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, ইন্দু তাহাকে টানিয়া রাখিবার জন্ত ধস্তাধস্তি করিতেছে। স্বপ্নের ভিতরেই তাহার মানসিক উত্তেজনা এত বেশী হইয়াছিল যে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "যাক্, ওটা স্বপ্নই, কিন্তু যা পাগল নিয়ে কারবার, সত্যি হতেই বা কতক্ষণ? জান্‌লাগুলা বন্ধ করে দিই বাপু।"

সে উঠিয়া জান্‌লাগুলা বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। একটা জান্‌লা বন্ধ করিতেই বড় বেশী শব্দ হইল। "ইস্‌ মেয়েটা না উঠে পড়ে" বলিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই সে দেখিল মায়া সত্যই উঠিয়া পড়িয়াছে। শুধু ঘুমই যে তাহার ভাঙিয়াছে তাহা নয়, সে যেন অত্যন্ত ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দু তাড়াতাড়ি মায়ার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে? ভয় পেয়েছিস্ না কি?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, তুমি এখানে কি ক'রে এলে?"

ইন্দু একটু অবাক হইয়া বলিল, "আমি ত এখানেই আজ শুয়েছিলাম, তুই তখন ঘুমিয়েছিলি তাই জান্‌তে পারিস্ নি।"

মায়া কেমন একভাবে ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রেঙ্গুনে হঠাৎ এসে জুটলে কি ক'রে তাই জিগ্‌গেষ করছি। কাল অবধি ত তোমার আসার কোনো খবর পাইনি?"

ইন্দু এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু বুঝিতে পারিল। মায়ার আবার একটা কিছু মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এতদিন যে ইন্দু এখানে আছে, রোজই তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইতেছে, তাহা মায়া মনে করিতে পারিতেছে না। কিন্তু কি করিয়া একথা সে মায়াকে বুঝাইবে? বুঝাইতে গেলে আরও কিছু বিপদ ঘটিবে না ত? ইন্দু কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মায়া ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ

বলিল, "ঘরটা কেমন যেন অগোছাল আর নোংরা ঠেক্‌ছে। কি যে একটা হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। পিসীমা, দেখ ত মায়ের ছবিটার পিছনের ফিতে ঢিলে হয়ে গিয়েছে কি না?"

ইন্দু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কই না, ফিতে ত ঠিক আছে। ফিতে আল্‌গা হ'লে ছবিখানা ত ঝুলে পড়ত?"

মায়া বলিল, "আমার সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগ্‌ছে। আয়া কোথায়? তাকে ডাক ত?"

ইন্দু তাড়াতাড়ি গিয়া আয়াকে ঠেলা মারিয়া তুলিয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিতেই মায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "দিন দিন তুই কি হচ্ছিস্ বল্ দেখি? ঘরদোরের কি ছিরি হয়েছে? আমি একদিন যদি না দেখি, অমনি সব জিনিবপত্র লণ্ডভণ্ড। তোকে দিয়ে কাজ চালান দেখ্‌ছি দায় হয়েছে।"

আয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। হঠাৎ কোথাও কিছু নাই, দিদিমণি তাহাকে এমন বকিতে আরম্ভ করিল কেন? কিন্তু সে বেশীক্ষণ চুপ থাকিবার মানুষ নয়। কাংসকণ্ঠে বকিতে আরম্ভ করিল, "আরে হাম্ কা কর না? তুম্‌হি ত ঘরমে ঘুষনে নাহি দেতা, তো কৈষসে ঘর সফা কর না?"

মায়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "যা যা ষাঁড়ের মত চীৎকার কর্‌তে হবে না। আর তুই-সুদ্ধ এখানে এসে জুটেছিস্ কেন? বাড়িসুদ্ধর কি আর শোবার জায়গা ছিল না?"

ইন্দু দেখিল ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। মায়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না এবং তাহাতে বেশী করিয়া বিরক্ত হইতেছে। সে নিজে যখন ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবে না, তখন অন্য কাহাকেও ডাকা উচিত। নিরঞ্জনকে ডাকিবার জন্য বাহির হইতে যাইবে এমন সময় মায়া বলিল, "আচ্ছা পিসীমা, কি ক'রে তুমি হঠাৎ এসে জুটলে বল না? কাল ত তোমার আসবার দিন ছিল না?"

ইন্দু বলিল, "আমি সব ভাল করে গুছিয়ে বল্‌তে পারব না বাছা, আমি তোর বাবাকে ডেকে আন্‌ছি, সেই সব গুছিয়ে বল্‌বে।"

মায়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "বাবাকে ডাকবে? আচ্ছা ডাক।" আয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই, আমার ব্লাউস, পেটিকোট আর শাড়ী দে ত? ঘুম আর হবে না, একেবারে কাপড় ছেড়ে নিই, চারটে বেজে গেছে বোধ হয়।"

আয়া বলিল, "পিসীমা, চাভি দেও ত।"

মায়া তাড়া দিয়া বলিল "চাবি কি হবে? কাল বিকালে যে কাপড় পরেছিলাম, সেগুলো কি হ'ল? আর এমন চমৎকার শাড়ীখানাই বা আমার অঙ্গে উঠ্‌ল কখন? সবই কি অদ্ভুত!"

ইন্দু বলিল, "তোকে কি ক'রে যে কি বোঝাব জানি না, তুই ভাব্‌ছিস কাল শুতে গিয়েছিলি, মাঝরাতে জেগে উঠেছিস, তা মোটেই নয়। মাঝে অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। আমি গুছিয়ে বল্‌তে পারব না ব'লেই না মেজদাকে ডাক্‌তে চাইছিলাম।"

মায়া খাট ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। আল্‌নার কাছে গিয়া সেখানে যে-সব কাপড়-চোপড় দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। বলিল, "তা হবে, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে তা বুঝতেই পারছি। তুমি বাবাকেই ডেকে আন পিসীমা, আমার বড় অসোয়াস্তি লাগ্‌ছে।"

ইন্দু বাহির হইয়া গেল। মায়া চাবি লইয়া আলমারী খুলিয়া নিজের প্রয়োজনমত কাপড় বাহির করিতে লাগিল। আয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে কি সব গণ্ডগোল পেকে উঠেছে বলত? কি হয়েছিল?"

আয়া গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিল না, খালি বলিল, "বেমার গির গিয়া আম্মা।"

মায়া আর কিছু না বলিয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া ফিরিয়া দেখিল, নিরঞ্জন ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন।

দ্রুতপদে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বল দেখি বাবা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না? আয়া বলছে আমার অসুখ করেছিল, কই আমার ত কিছু মনে পড়ছে না?"

নিরঞ্জন কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি মা, বেশী একসাইটেড হয়ো না, বেশী মনও খারাপ কোরো না। ভগবানের কৃপায় আমাদের দুঃখের দিন হয়ত কেটে গেল। তুমি বোসো।"

মায়া ইজি চেয়ারে গিয়া ব'সিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "মা, তোমার ঘুমতে যাবার আগে কোনো বিশেষ ঘটনা কি মনে পড়ে?"

মায়ার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল, তাহার পর মুখখানা একেবারে শাদা হইয়া গেল। বলিল, "মনে পড়ে বাবা। এক্‌সেল্‌সিয়ার থেকে ফিরে এসে খাটের উপরেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল মায়ের ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে ছবিখানা যেন বেরিয়ে নেমে আসছে, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না।"

নিরঞ্জন দেখিলেন, মায়ার হাত কাঁপিতেছে, গলার স্বরও কাঁপিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভয় পেয়োনা মা, জগতে অনেক জিনিষই ঘটে, যা আমরা এক্‌সপ্লেন করতে পারি না। কিন্তু ভয়ের কি আছে? তোমার মা সংসারে তোমাকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন, তাঁকে দিয়ে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না।"

মায়ার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিরঞ্জন কি যে বলিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মায়াকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে দেওয়া উচিত, কিন্তু বুঝাইতে গেলে সে কি মনে বেশী ব্যথা পাইবে? যাহাই হউক, তাহাকে এই সংশয়ের দোলায় দুলিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। তিনি মনস্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐটা দেখবার পরেই তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞান হয়নি। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখা গেল তোমার 'মেমারি' অনেকখানি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, রেঙ্গুনে যে কয় বৎসর কাটিয়েছ, তার কোনো স্মৃতি তোমার নেই।"

মায়া তড়িৎস্পৃষ্টের মত চম্‌কাইয়া সোজা হইয়া বসিল। দারুণ বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় তাহার মুখের চেহারাই অন্যরকম হইয়া গেল। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বাবা, কিছু মনে ছিল না? আমাকে নিয়ে তাহলে চল্‌ত কি ক'রে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি করে আর চল্‌বে, মা? খুবই ডিফিকাল্‌টী হত। তোমার ধারণা হয়েছিল, তোমার মায়ের মৃত্যুর পরে সবে তুমি এখানে এসেছ, সেইভাবেই তুমি চল্‌তে, কথা বল্‌তে। তোমাকে দেখ্‌বার লোক ছিল না ব'লে তখন ইন্দুকে আনালাম।"

মায়া কিছু বলিল না, নিরঞ্জন একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "তার সঙ্গে প্রভাসও এসেছিল।"

মায়া নিরুৎসাহভাবে বলিল, "প্রভাসদা আস্‌বে বলেছিল বটে, ইস্কুলের বিষয় আলোচনা ক্‌র্‌তে।" আর প্রভাসের বিষয় সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

খানিক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখানকার কাউকেই কি আমি চিন্‌তে পারতাম না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না মা।"

মায়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার ভাবান্তরের কারণ নিরঞ্জন ঠিকই বুঝিতে পারিলেন, ইন্দুকে বলিলেন, "আর ত রাত নেই, এর পর একটু চা টা খাওয়ার ব্যবস্থা করলে হয়।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুর, ছোক্‌রা সবাই উঠেছে বোধ হয়, না উঠে থাক্‌লেও তুলে দিচ্ছি। আয়া, চল্‌ত আমার সঙ্গে।" আয়া অন্য ঝি-চাকরদের বকিবার কোনো সুযোগ কোনোদিন ছাড়িত না, সে মহোৎসাহে ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইন্দু বাহির হইয়া যাইতেই মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এইরকম অবস্থায় আমার কতদিন গিয়েছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "দেড় মাসের বেশী হয়ে গেছে মা, দু'মাস প্রায় হতে চল্‌ল।"

মায়া আর কিছু বলিল না। কি যেন বলিবার

ইচ্ছায় তাহার ঠোঁট বার-বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু পিতার সম্মুখে সঙ্কোচ বোধ হইল বলিয়াই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কিছু বলিতে পারিল না।

পূর্ব্বের আকাশ ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল, এখন তাহাতে প্রথম অরুণরেখা দেখা দিল। নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি তাহলে নীচে যাই মা, তুমি ঘুমতে চাও কি? না, তোমারও চা দিতে বল্‌ব?"

মায়া বলিল, "আমার ঘুম আর হবে না বাবা, তুমি যাও, আমি একটু পরে গিয়ে চা খাব।"

দেবকুমার যে এখানে আছে, সে কথা কন্যাকে বলা উচিত কি-না, নিরঞ্জন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিছু পরে বলা যাইবে ভাবিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

মায়া অনেকক্ষণ একইভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া জানলা দিয়া একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিল। লোকজন এখনও বিশেষ কেহ উঠে নাই, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রীর ছবির নীচে দাঁড়াইল। ছবি এখন ছবি মাত্র। সত্যই কি মায়া কিছু দেখিয়াছিল, না সকলই তাহার কল্পনা, তাহার চোখের ভ্রম? পরলোকবাসিনীর কাছে সে যে প্রার্থনা জানাইয়াছিল, তাহার উত্তর কি এই ভীষণ আঘাতের ভিতর দিয়াই পাইল? এর পর মায়া কোন্ পথে যাইবে?

কিন্তু যাইবার পথ স্থির করিবার ভার কি আর তাহার হাতে আছে? নিয়তিই কি পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় নাই? দুই মাসের মধ্যে সে দেবকুমারকে চিনিতে পারে নাই, তাহাকে সামনে দেখিয়া, কি বলিয়াছে, কি করিয়াছে, কিছুই তাহার মনে নাই। এমন কিছু করিয়া থাকিতে পারে, যাহার আর প্রতিকার নাই। এমন কিছু বলিয়া থাকিতে পারে, যাহার জন্ত দেবকুমার আর তাহাকে ক্ষমা করিবে না। সে কোথায়, তাহা সে জানে না। পিসীমা দেবকুমারকে চেনেন কি-না মায়া জানে না, কি করিয়া সে তাহার কাছে খোঁজ করিবে? পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করা যায়, কিন্তু তিনি কি কন্যার সঙ্গে দেবকুমারের কি সম্পর্ক তাহা জানেন? মায়া নিজে তাঁহাকে জানাইবে বলিয়া, দেবকুমারকে বলিতে বারণ করিয়াছিল। নিরঞ্জন যদি এ বিষয়ে কিছুই না জানেন, তাহা হইলে মায়া অকস্মাৎ দেবকুমারের খবর জানিতে চাহিলে অত্যন্তই বিস্মিত হইবেন। মায়া ভাবিয়া পাইল না, কি সে করিবে। অথচ তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া একটা তীব্র বেদনা জ্বলিতে লাগিল, কিছুতেই সে স্থির হইতে পারিল না। স্মৃতি ফিরিয়া পাইল সে বটে, কিন্তু তাহার বিগত জীবনের যাহা পরমতম, প্রিয়তম ঐশ্বর্য্য, তাহাই যদি হারাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আর স্মৃতি না ফিরিলেই পারিত?

অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল, আয়াকে জিজ্ঞাসা করিবে। বুড়ী যাহা হউক, একটা কিছু খবর দিতে পারিবে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া, সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। আয়া বোধ হয় রান্নাঘরেই আছে, কিংবা খাবার ঘরেও থাকিতে পারে। হল পার হইয়া সে খাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় আপিস ঘরের পাশের ঘরখানার দরজা খুলিয়া গেল। মায়া পিছন ফিরিয়া তাকাইল, তাহার পর দেওয়াল ধরিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেল। দরজা খুলিয়া যে বাহিরে আসিল, সে দেবকুমার।

মায়ার ঘুম ভাঙার কথা, বা স্মৃতি ফিরিয়া পাওয়ার কথা, দেবকুমারকে নিরঞ্জন বলেন নাই। সে তখন ঘুমাইতেছিল, জাগিবার পর বলিলেই চলিবে ভাবিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবকুমার হঠাৎ যেন চারিদিকে জাগরণের উত্তেজনার একটা সাড়া পাইয়া আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ এই রাত্রিশেষের আধ আলো, আধ অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী মায়াকে দেখিয়া সেও বিস্মিত চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কি তাহার করা উচিত ঠিক বুঝিতে পারিল না। একবার নাম ধরিয়া ডাকিয়া যে অঘটন ঘটাইয়াছে, ফিরিয়া সেইরূপ কিছু করিতে তাহার আর ভরসা হইল না।

তাহাকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, মায়ার পায়ের নীচের মাটি যেন টলিতে আরম্ভ করিল। দেবকুমার তাহা হইলে সত্যই মায়াকে হৃদয় হইতে বিদায় দিয়াছে? এতদিন পরে, এত অসহ্য বিচ্ছেদের পর আজ তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু মায়াকে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। এই কি তাহাদের ভালবাসার পরিণাম হইল? ইহারই বেদনা উপভোগ করিবার জন্য কি ভগবান তাহাকে বিস্মৃতির সাগর হইতে টানিয়া তুলিলেন?

দেবকুমার চাহিয়া দেখিল, মায়ার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে সে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। বিবেচনা হিতাহিতজ্ঞান সব ভুলিয়া, দ্রুতপদে মায়ার কাছে গিয়া, তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মায়া, একলা কেন তুমি নেমে এসেছ?"

মায়া কোনও মতে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগে তাহার যেন চেতনা ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। দেবকুমারের বুকের উপর মাথা রাখিয়াই সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'তুমি আমাকে ভুলে যাওনি?"

দেবকুমার যেন নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আরও সবলে তাহাকে বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে জিজ্ঞেস করছ তুমি? আমাকে চিন্‌তে পেরেছ?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "আমাকে কোথাও নিয়ে চল, আমার ঢের কথা জান্‌বার আছে, তোমাকে বল্‌বার আছে।"

দেবকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল, "বাগানে চল, সেইখানেই সবচেয়ে ইন্‌টারাপশেন-এর সম্ভাবনা কম।"

দেবকুমারের হাত ধরিয়া কম্পিত পদে মায়া হলের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানে চলিল। নিরঞ্জন তখন হাত মুখ ধুইয়া, খাইবার ঘরে যাইবার জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন, মায়া এবং দেবকুমারকে দেখিয়া তিনি আবার পিছাইয়া গেলেন। ভাবিলেন, "এই সবচেয়ে ভাল হ'ল। দেবকুমারের মুখে শুন্‌লেই তার আঘাত সকলের চেয়ে কম লাগবে।"

বাগানের ভিতর একটা লোহার বেঞ্চিতে দুইজনে আসিয়া বসিল। মায়ার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া দেবকুমার বলিল, "মায়া, তোমাকে প্রথম যেদিন নিজের ব'লে জেনেছিলাম, সেদিনকার আনন্দের চেয়েও আমার আজকার আনন্দ বেশী। মৃত্যুর পার থেকে যেন তুমি আবার আমার বুকে ফিরে এসেছ।"

মায়া বলিল, "সব আমি তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে চাই। আর কারও কাছে শুনবার সাহস আমার নেই। ভগবান এইটুকু দয়া আমাকে করেছেন যে স্মৃতি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তোমাকে আমি পেয়েছি। বেশী দেরি হ'লে আমি বাঁচতাম না। এতবড় ভয়ানক শাস্তি আমার কেন হ'ল জানি না; কিন্তু তুমি যখন আমাকে ভুলে যাওনি, আমি সহ্য করবার শক্তি পাব।"

দেবকুমার মায়াকে নিজের একান্ত কাছে টানিয়া আনিয়া, দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি জান্‌তে চাও বল?"

ক্রমশঃ

আন্‌দ্রে অভিযান—

১৮৯৭ সালে সুইডেনের পর্য্যটক সালোমন অগষ্ট আনাড্রে বেলুনে

বেলুন ধ্বংস হইবার পর আনাড্রের ক্যাম্পের দৃশ্য (জুলাই ১৮৯৭)

আন্‌দ্রের সঙ্গিগণ আন্‌দ্রে কর্তৃক নিহত একটি ভালুকের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন

আনাড্রের বেলুনের ধ্বংসাবশেষ

উত্তরমেরু যাত্রা করেন, কিন্তু ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি কি ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হন, তাহা এতদিন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু গত বৎসর উত্তরমেরুর নিকটে তাঁহার দেহ ও জিনিষপত্র আবিষ্কৃত হয়। এই সকল জিনিষের সঙ্গে তাঁহার কোডাক ক্যামেরাটিও পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ফিল্মে আনাড্রের শেষ দিনগুলির অনেকগুলি ছবি তোলা ছিল। সেইগুলি এতদিন পরে 'ডেভেলাপ' কা[illegible] বেলুন ধ্বংস হইবার পর আনড্রে ও তাহার সঙ্গিগণ কি ভাবে চি[illegible] তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলে ও ষ্টীমারে অনেক দিন পরে চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুসী। অপর্ণাও পল্লী-গ্রামের মেয়ে, শহর তাহারও ভাল লাগে না। অতটুকু ঘরে জীবনে কোনোদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! সে নদীর ধারের মুক্ত আলো-বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে, এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম,—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষী, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসিখুসী, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থার দারিদ্র্য ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে সব কথা অপু বলে নাই, তাহার বলিতে লজ্জা করে, সে সব বলিয়াছে প্রণব। না খাইয়া যে কেহ কষ্ট পায়, অপর্ণার একথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখকষ্টের সন্ধান সে জানে না। সে মনে মনে ভাবে এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। লইয়া ...নেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খ... হইতে ...লবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না ...পু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নি... আসিয়া ...ছে লিখিয়া লইয়াছিল। লাগিয়াছে

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বেড়াইয়া ...ইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ জানা খুব ...

অপু হয়ত বর্ষার জলে ভিজিয়া আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত তালের বড়া ভাজা হচ্চে বুঝি! তুমি জান্‌লে কি করে—বা রে!...

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুক্‌না কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এস না, ওখানেই বসে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—অপুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়েরই মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী। বার্দ্ধক্যের কর্ম্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে। ...খাটিয়া যাইবে? দেখিয়া মনে হয় এ কাহারও মা ... মনে হয়। বোন্। জীবনে এই

তাহাদের মঙ্গলহ...

* *

...আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিল মুরারী জীবন পুষ্ট হইয়া... বাসায় বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। তাহার?

...কে দেখিয়া অপু খুব খুসী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি। বাস্‌রে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে! কার মুখ দেখে না জানি আজ সকালে—

মুরারী খামে আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোনো কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল মুরারীর মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অপর্ণা নেই? মুরারী নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল?

আন্‌দ্রে অভিযান—

১৮৯৭ সালে সুইডেনের পর্য্যটক সালোমন অগষ্ট আন্‌দ্রে বেলুনে হয়। এই সকল জিনিসের সঙ্গে তাঁহার কোডাক ক্যামেরাটিও পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ফিল্মে আন্‌দ্রের শেষ দিনগুলির অনেক-

বেলুন ধ্বংস হইবার পর আন্‌দ্রের ক্যাম্পের দৃশ্য (জুলাই ১৮৯৭)

আন্‌দ্রের সঙ্গিগণ আন্‌দ্রে কর্ত্তৃক নিহত একটি ভালুকের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন

আন্‌দ্রের বেলুনের ধ্বংসাবশেষ

উত্তরমেরু যাত্রা করেন, কিন্তু ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি কি ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা এতদিন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু গত বৎসর উত্তরমেরুর নিকটে তাঁহার দেহ ও জিনিষপত্র আবিষ্কৃত গুলি ছবি তোলা ছিল। সেইগুলি এতদিন পরে 'ডেভেলাপ' করিয়া বেলুন ধ্বংস হইবার পর আন্‌দ্রে ও তাহার সঙ্গিগণ কি ভাবে ছিলে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলে ও ষ্টীমারে অনেক দিন পরে চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুসী। অপর্ণাও পল্লী-গ্রামের মেয়ে, শহর তাহারও ভাল লাগে না। অতটুকু ঘরে জীবনে কোনোদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! সে নদীর ধারের মুক্ত আলো-বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে, এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম,—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষী, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসিখুসী, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থার দারিদ্র্য ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে সব কথা অপু বলে নাই, তাহার বলিতে লজ্জা করে, সে সব বলিয়াছে প্রণব। না খাইয়া যে কেহ কষ্ট পায়, অপর্ণার একথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখকষ্টের সন্ধান সে জানে না। সে মনে মনে ভাবে এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। ৎ দিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খ ভালবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিঃ কাছে লিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয় হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনা

অপু হয়ত বর্ষার জলে ভিজিয়া আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত তালের বড়া ভাজা হচ্চে বুঝি! তুমি জান্‌লে কি করে—বা রে!…

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুক্‌না কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এস না, ওখানেই বসে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—অপুর বুকটা ছাৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়; মায়েরই মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী। বার্দ্ধক্যের কর্ম্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে।
দেখিয়া মনে হয় এ কাহারও মা
বোন্। জীবনে এই
তাহাদের মঙ্গলহে
জীবন পুষ্ট হইয়াে
তাহার?

কৌতুক দেখিবার জন্ত অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলা বৌ, ঘোমটা খোল, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশ্‌টা চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারী হাসিমুখে অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারী বলিল,—তোমরা যাও, এইখানের হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জেঠাইমা কিন্‌তে বলে দিয়েচেন। এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারী নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা, তুমি কি? দাদার সাম্‌নে ওইরকম করে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাব্‌লে বল তো দাদা—ছিঃ। পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কক্‌খনো যাবো না, কক্‌খনো না, থেকো একলা বাসায়!

—ব'য়েই গেল! আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কি না? আমি নিজে মজা করে রেঁধে খাব।

শাই খেও। আহা হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত

ঁধুনী!

। প্রথম যেদিন

ব আলুনী?

শাদী তুমি,

কারণ নয়, নদীতীরে ঝুপ্‌সি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র, নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

* * *

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে ফুলশয্যার সেই পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের বকের পালকের মত শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব পুরাতন স্মৃতি, কোথায় যেন এই ধরণের সব পুরানো দিনের কত জ্যোৎস্না-ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্ কুঁড়ে ঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য্য এই যে এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা এখন অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

যাইবার পূর্ব্ব রাত্রে অপর্ণা স্বামীকে নানাবিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিল। স্বামীর উপর এমন একটা মায়া হয়! এক এক দিন সে ঘুমন্ত স্বামীকে দেখিয়াছে, ভারী সুন্দর, ভারী পবিত্র, দেখায়। মনে হয় এ মানুষ কখনও কোনো খারাপ কাজ করিতে পারিবে না। দেবতার মতই দেখায় বটে। সত্যই মা বলে পটের মুখ, পটে আঁকা ঠাকুর-দেবতার মত মুখ।

কাল সকালের কোন্ স্টীমারে যাওয়া? রোজ আপিস হইতে আসিয়া যেন মোহনভোগ করিয়া খাওয়া হয়। পিন্টুর মাকে সে বার বার করিয়া বলিয়া আসিয়াছে, সে-ই করিয়া দিবে। ঘি যেন একটু বেশী করিয়া খাওয়া য়। এখন তো খরচ কমিল, বেশী ছেলে পড়ানোর কার নাই। আর জানালার পর্দ্দাগুলা গিয়াই যেন র বাড়ি—এখন আর সাবান দিয়া কে কাচিবে, র বাড়িই ভাল।

দিন সকালে চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার খা হইল না। অপুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় রিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকেও যে বলে একবার ডাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা

কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারীর ছোট ভাই বিশু বলিল—আস্‌বার সময় দিদির সঙ্গে দেখা করে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাঁটার টানে যশাইকাটির বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। একথা সে জানিত না। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি-এস্‌-সি পাস করিয়াছে। অপুর বাসায় দেবব্রত তিন চারিদিন আসিল, দুই বন্ধুতে পুরাণো দিনের নানা গল্প। কি মুস্কিল, বৌদিদির সঙ্গে দেখাটা হইল না! এতদিন পরে ঠিক কি না এই সময়েই···অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য্য ঠেকিল, আনন্দও হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘরপাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে। দেবব্রত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তাছাড়া তার পিসেমশায় খুব বড়লোক—কলিকাতায় বাড়ী, নিজের ছেলেপিলে নাই, তিনিই তাহাকে বিদেশে পাঠাইতেছেন।

মাস দুই তিন বড় কষ্টে কাটিল। আজ একবছরের অভ্যাস—আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখিয়া কর্ম্মক্লান্ত মন শান্ত হইত। আজকাল এমন কষ্ট হয়! বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্দ্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা মোকদ্দমা চলিতেছে, অনেক দিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভারী ভাল লাগিয়াছে জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে এখন। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্রই দেয়, কিন্তু পত্রখানার কোনো জবাব আসিল না—দুদিন চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়েছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানারকম স্বপ্ন দেখে,—অপর্ণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশীদিন বাঁচব না, মনে নাই?···সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?···আমার মনে কে বল্‌তো—যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে আপিসে গেল না, চাকুরীর মায়া না করিয়াই স্যুট্‌কেশ গুছাইয়া বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ীর পত্র পাইল। সকলেই ভাল আছে। যাক্‌—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অপর্ণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে! কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা।' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে? কি অদ্ভুত কথাই সব যে মনে হয়।

*　　*　　*

শনিবারে আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিল মুরারী তাহার বাসায় বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুসী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি। বাস্‌রে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে! কার মুখ দেখে না জানি আজ সকালে—

মুরারী খামে আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোনো কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল মুরারীর মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অপর্ণা নেই? মুরারী নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হল—সাড়ে ন'টার সময়—

জ্ঞান ছিল ?

—আগাগোড়া। ছোট কাকীমার কাছে চুপি চুপি না-কি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার করে জানাতে। তখন ভালই ছিল। হঠাৎ ন'টার পর থেকে—

ইহার পরে অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইত সে তখন স্বাভাবিক স্বরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া। মুরারী বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্ব্বকে কি করে খবরটা শোনাব, সারা রেল আর ষ্টীমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য্যি হয়ে গেলাম, আমায় বল্‌তে হল না—ওই খবর টেনে বার করলে।

মুরারী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই ? সে কথা মুরারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই। কে জানে, হয়ত নাই।

১০

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি আপিসে গিয়াছিল, আপিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বৃদ্ধ সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন-মশায়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখ-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া লইয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী! কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান দিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে বৌমা ? তা মা আমার একটু হাসলেন—বলি তা থাক্, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক্। স্নানটা না হয় ন'টার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিস মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটী করে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েচেন—আহা কি নরম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী,—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পরে আসিলেন গাঙ্গুল-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন নাই। আধ-ঘোমটা দিয়া ইনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন যে হবে তা তো কখনো জানিনি, ভাবিনি—কাল আমায় আমার বড়ছেলে নবীন বল্‌চে রাত্তিরে, যে, মা শুনেচ এই রকম, অপূর্ব্ব বাবুর স্ত্রী মারা গিয়েচেন এই মাত্তর খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করিনি। আজ সকালে আবার বাঁটুল বল্‌লে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আস্‌ব কি, বাবা, দুই ছেলের আপিসের ভাত, বাঁটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলির কারখানায় কাজ, ছুটো নাকে মুখে গুঁজেই দৌড়োয়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা, সাহেব বলেচে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে রেখে ওর মা মারা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা—সবারই ও কষ্ট আছে, মরণকে তো আর—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা ? বলে—

বজায় থাকুক্ চুড়ো বাঁশী
মিল্‌বে কত সেবাদাসী—

একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করো না কেন ?··· তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এরা লোক ভালো তাই এসে এসে বল্‌চে। কিন্তু আমায় একা কেন একটু থাক্‌তে দেয় না ? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভাল। এরা কি বুঝ্‌বে ?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বারান্দার যে কোণে ফুলের টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন্ বিন্ করিতেছে। অন্য দিন সে এই সময় আলো জ্বালে, ষ্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়াই রহিল···একমনে সে কি একটা ভাবিতেছিল···গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া

উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে, এখানে থাকিলে এই সময় সে ষ্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে ?

পিণ্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, মা আপনাদের কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস কল্লে—

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—ঘরে কে পিণ্টু ? তোর মা ?……ও! বৌ-ঠাকরুণ ? বলিতে বলিতে সে উঠিয়া গিয়া দেখিল পিণ্টুর মা ঘরের মেজেতে ষ্টোভ মুছিতেছে। বৌ ঠাকরুন, তা আপনি আবার কষ্ট করে কেন মিথ্যে—আমিই বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিণ্টুর মা ষ্টোভ জালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিণ্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পরে নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেজেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিণ্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখনও বড় দুর্ব্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে একটু আধটু গোলদীঘিতে বেড়াইতে যান, নীচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইহারা থাকে। পিণ্টুর এক মামা আজকাল নিয়মিত মাসিক সাহায্য করাতে ইহাদের পূর্ব্বতন দুরবস্থা আজকাল আর নাই। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যেই দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিণ্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে আপিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরের বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি ষ্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদীঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট ? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিণ্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিণ্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদিঘীতে বেড়াতে নিয়ে যাবে ?…একটা ফুলের চারা তুলে আনব, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে—পাৎলা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখতে। খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক'খানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিনে খিদেও তো পেয়েচে।

মেয়েটির নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ করুন, মন্দ কি। ওরে পিণ্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

—থাক্ থাক্ ঠাকুরপো, ওকে আমি আলাদা দিচ্ছি। কেটলিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায়, ঠাকুরপো ?

—সত্যি আপনি বড় কষ্ট করচেন, বৌ-ঠাকরুন—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিণ্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ও-রকম বলচেন কেন ? আপনারা আমার যা উপকার করেচেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয় ?…কিন্তু আমার সে বল্‌বার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি করি বলুন। পাছে আমি রুগী সাম্‌লে মেয়েকে খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে আপিসে গেলেই পিণ্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত।

কথা শেষ না করিয়াই পিণ্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল, ইহার সঙ্গে অপর্ণার কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।

সারাদিন অপু কাজেকর্ম্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনই একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত,

খাতাপত্রে গল্প, কবিতা লিখিত—কাজ ফাঁকি দিয়া অন্ত বই পড়িত। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুর পর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া বেড়ায়, সারাদিনের কাজ দু'ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা…অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে… লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী! অপুর মনে হইয়াছিল—ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা যেন রাণীর মত …এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমায় খাবার করে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোনও লুচি ভাজতে জানে না,—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান্ না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবারকষ্ট হয়—না? অপু ডাকিয়া বলে—ও নিধু বাবু, এদিকে আসুন একবার, রেকর্ড থেকে আর বছরের নাথের বাগান বস্তীর ফাইলটা নিয়ে আসুন তো।

ম্যানেজার একদিন ডাকিয়া বলেন—অপূর্ববাবু, আপনার শরীরটা বড় রোগা হয়ে পড়ছে, আপনি দিন-কতক একটু হাওয়াটা বদ্‌লে—আমাদের পুরীর বাড়িটা এখন খালি আছে, যদি সেখানে যেতে চান্ তো বলুন, মাসখানেকের জন্তে ঠিক করে দি—নায়েবকে না হয় একখানা পত্র লিখে দি, কি বলেন?

আঃ! কেন ওসব কথা বার বার মনে করিয়া দেওয়া! সে তো এখানে বেশ কাজ করিতেছে, কাহারও তো কোনো অনিষ্ট করিতেছে না—এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রাণপণে খাটিয়া যাইতেছে—তবে কেন ও সব?

কিন্তু পিণ্টুর মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে অপর্ণার কথা হয়, তখন ভাল লাগে। মনে হয় অপর্ণার কথা এ আরও বলুক, আরও শুনি। কোনো সান্ত্বনার কি সহানুভূতির কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না, শুধু অপর্ণার গুণের কথা…সে তাহার সম্বন্ধে কি ভাবিত, সে কথা…

কি বিরাট শূন্যতা…কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে… কখনও না, কাহারও দ্বারা না…সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ, ধূসর বালুকাময় বহু বিস্তীর্ণ মরুভূমি!

মাসখানেক পরে পিণ্টুর মা চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় লইল। পিণ্টুর বাবা বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছেন, দুইজনেই আত্মীয়ের মত নানা সান্ত্বনার কথা বলিয়া গেল। পিণ্টুর মা বলিল—কখনও ভাই দেখিনি, ঠাকুর-পো। আপনাকে সেই ভাই-এর মত পেলুম, কিন্তু করতে পারলুম না কিছু—দিদি বলে যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যই আমি ভাই পেয়েচি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিণ্টুদের জিনিষপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল…ডালা, কুলো, ধামা, বঁটি, চাকী, বেলুন। পিণ্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজী নয়— অপু বলিল—কি হবে বৌদি, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্তি হবে তবুও।

পিণ্টুরা চলিয়া গেলে বাসা যেন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা বেলাটা একা কি করিয়া কাটানো যায়? অপর্ণার চিন্তায় কাটান যায় বটে, কিন্তু তাহাতে এক এক সময় যেন বুকে কিসে এফোঁড়ে ওফোঁড় করিয়া তীক্ষ্ণ শলা চালাইয়া দেয়—ক্ষণকালের জন্ত দেহ মন অসাড়, অবশ করিয়া ফেলে; সুতরাং নির্জ্জনে কাটান একরূপ অসম্ভব। মায়ের মৃত্যুর পর তো এতটা হয় নাই? মায়ের কথা তবু ভাবিতে পারা যাইত, ইহার কথা আদৌ মনে আনিতে পারা যায় না কেন?

* * *

সারা শীতকাল ও গ্রীষ্ম কাল ধরিয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে কত বার লোক আসিল। অপর্ণার মায়ের চক্ষু দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে কি একবার যাইবে না?…অপু হঠাৎ নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে—সে চিরকাল কোমল হৃদয়, অপরের দুঃখ কখনও সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অপর্ণার মায়ের কষ্ঠ শুনিয়া সে এতটুকু বিচলিত হইল না।

কিন্তু তাহার নিজের ছেলে? তাহাকেও তো সে দেখে নাই—সেজন্যেও কি যাইবে না সে? অপু পত্রের জবাবও দেয় না…

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গত দশ এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিণ্টুরা চলিয়া যাওয়ার পরে বাসাও আর ভাল লাগে না, অপর্ণার সঙ্গে বাসাটার এতখানি জড়ানো যে এবার শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিবার পরে আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে বাসায় প্রায়ই রাত্রে থাকে না, চার পাঁচ রাত্রের মধ্যে তিন রাত্রি সে কাটাইল শেয়ালদা ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীর বসিবার স্থানের একটা বেঞ্চির উপর শুইয়া, একদিন কাটাইল কখনও সে এপর্য্যন্ত যাহা করে নাই—সারারাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিয়া। একদিন পাশের এক মেসের বাসায় থাকিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, সর্ব্বত্র অপর্ণার সেবাহস্তের চিহ্ন—যেদিকে চাওয়া যায়। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলী-গিন্নী তাঁহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘমাসে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা। অবশেষে অপু অতিষ্ঠ হইয়া মাসের শেষে বাসা উঠাইয়া দিল।

নিকটের একটা গলির মধ্যে একতালায় একটা ঘর দশ টাকায় পাওয়া গেল। নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্ব্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে গিয়া কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জ্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া ওঠে। পাষাণ-ভারের মত দারুণ নির্জ্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি শুধু ঘরে নয়, পথেঘাটে, আপিসেও তাই- মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দুচার জন বন্ধু আছে বটে, কিন্তু ওসব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্ব্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে সব আগ্রহ-ভরা দিন গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে, তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ বন্ধুর পেটেণ্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও তুমি?…আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখী'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন্ পাওনাদার এল, বসো বসো।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি। খবরের কাগজ বিজ্ঞাপনের দেনার দরুণ—ছোট আদালতে নালিশ করে ছিলে, পরশু এসে বাক্সপত্র আদালতের বিলিফ্ সিল করে গিয়েচে—তোমার কাছে বল্‌তে কি, এবেলার বাজার খরচটা পর্য্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাটি হোক্, মান অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েচে এমন ভাল মানুষ, সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?…

—রামোঃ—পান্‌সে লাগে, ঘোর পান্‌সে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে, স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভালমানুষ, যা বল্‌চি তাই করচে—সংসারের এই কষ্ট, হয়তো একবেলা খাওয়াই হল না—মুখে কথাটি নেই। কাপড় নেই,—তাই সই, ডাইনে বল্লে, তখ্খুনি ডাইনে, বাঁয়ে, বল্লে বাঁয়ে—নাঃ, অসহ্য হয়ে পড়েছে। বৈচিত্র্য নাই রে ভাই। পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর উপর রাগ করে কাঁচের গ্লাস, হাত্‌বাক্স দুম্‌দাম্ করে আছাড় মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হল, ভাবলাম হায় রে, আর আমার কি

কপাল!—না হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বল্‌চি ভাই—এরকম পানসে ঘরকন্না আর আমার চল্‌চে না—বিলিভ মি—অসম্ভব!...ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব?...একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পার?...

কেন আবার বিয়ে করবে না কি?...একটা পার না খেতে দিতে—তোমার দেখচি সুখে থাক্‌তে ভূতে—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখ্‌চি একেবারে ব্যর্থ হল, মনের কোনো সাধই মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘট্‌ত তা হলে দ্বন্দ্বও হত—বুঝ্‌লে না?...মিল নেই ভাই বেশ শান্তি আছে—অর্থাৎ passionate মনোভাব কোনোপক্ষেই নেই আর কি। কে, টেঁপি?...এই আমার বড় মেয়ে—শোন্, তোর মার কাছ থেকে দু'টো পয়সা নিয়ে দুপয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, আর অমনি চাএর কথা বলে দে—

—আচ্ছা মরণের পরে মানুষে কোথায় যায় জান? বল্‌তে পার?

—ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি করে তাড়ান যায় বল্‌তে পার? এখুনি কাবুলীওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠার টাকা ধার নিয়েচি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়। দু হপ্তার সুদ বাকী, কি যে আজ তাকে বলি?...কাউণ্টেলটা এলো বলে—দিতে পার দুটো টাকা ভাই?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি বেশ বেগুণি এনেচিস্—না না, আমি খাব না, তোমরা খাও, আচ্ছা এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিল। লীলা কি এখানে আছে? একবার দেখিয়া আসিবে? প্রায় একবৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মাম্‌লা করিয়া লীলার পৈতৃকসম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্দ্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়া একবৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেহারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল, মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি? কেন, সে-কথা কিছু বাবুর জানা নাই? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড় এঞ্জিনিয়ার, বিলাতফেরৎ—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড় লোকের ছেলে—এদের সমান বড়লোক। কেন বাবুর কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি যায় নাই?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ।

—ও আচ্ছা আচ্ছা—না আর বসবো না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এ রকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো। জামাই এঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্দ্ধঅন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

ক্রমশঃ

মহিলা সংবাদ

পশ্চিম ভারতের সত্যাগ্রহী মহিলাবৃন্দ

[বোম্বাইয়ের ভ্যানগার্ড ষ্টুডিও'র সৌজন্যে]

শ্রীমতী হংসা মেহ্‌তা

বামদিকের উপরের ছবি—
কুমারী পেরিন ক্যাপ্‌টেন, ইনি বোম্বাইয়ের 'ওয়ার কাউন্সিল্‌"-এর নেত্রী ছিলেন

নীচের ছবি —
শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী অন্তর, ইনি 'কংগ্রেস বুলেটিনে'র:সম্পাদিকা ছিলেন

শ্রীমতী কমলাবেন সোনাওয়ালা

শ্রীমতী শান্তাবেন পাটেল
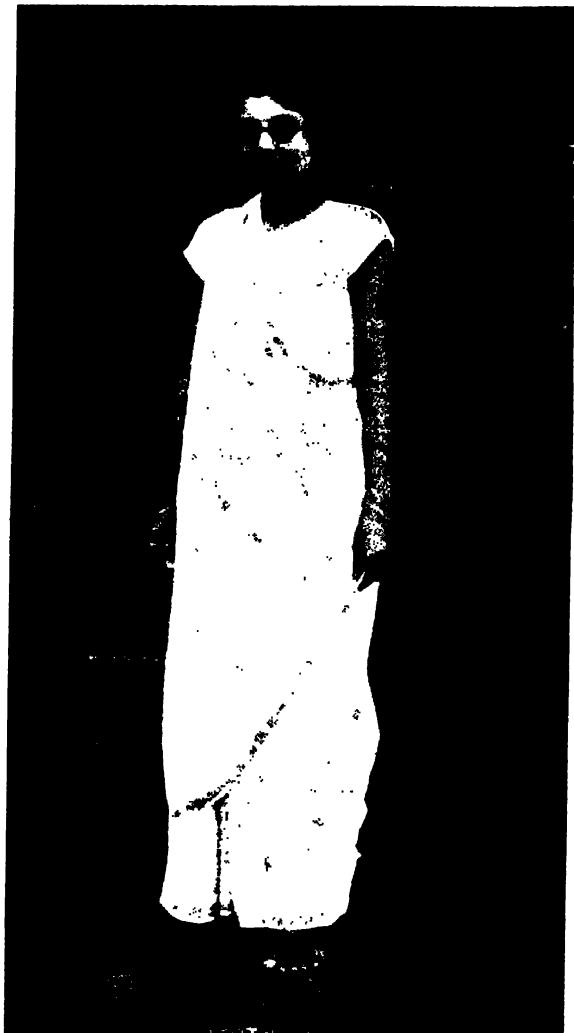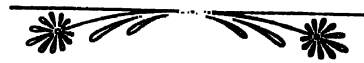
শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী

বামদিকের উপরের ছবি—শ্রীমতী রামীবেন কাম্‌দার

বামদিকের নীচের ছবি—শ্রীমতী সুমতি ত্রিবেদী

শ্রীযুক্তা অমৃত কুঙার

শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ গোখ্‌লে

নিখিল-এসিয়া নারীসম্মেলন—লাহোর

নারীসম্মেলনের সভ্যবৃন্দ

শ্রীমতী লক্ষ্মীবেন স্বরাজ বল্লভদাস

শ্রীমতী লীলা সৈয়দ

নিখিল এসিয়া নারীসম্মেলন—লাহোর

সম্মেলনের সাধারণ দৃশ্য

শ্রীমতী উর্ম্মিলা মেহ্‌তা

শ্রীমতী ত্রিশূলা দেবী

শ্রীমতী নীরবালা দীক্ষিত

শ্রীমতী গঙ্গাবেন পাটেল
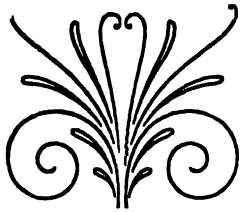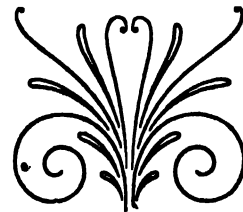
নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

পশ্চাতের উঁচু টেবিলের মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাইতেছে

পল্লীসেবা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদে অনন্ত স্বরূপকে বলেচেন "আবিঃ", প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে, "আবিরাবীর্ম্ম এধি"। হে আবি আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্ম্মোদ্যম থেকে অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্চে মানুষের ধর্ম্ম-সাধনা। অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেচে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেচে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্ত্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু নিজেব ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্তাকে নিরন্তর উদ্ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে,—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প কিছুতেই সুখ নেই। তাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না—বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে ত্যাগের শক্তিতে প্রেমের বিস্তারে কর্ম্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে মহতী বিনষ্টিঃ—সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয় আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্চে ভূমাকে প্রকাশ। মানুষের ভিতরকার যে "নিহিতার্থ", যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলচে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এই জন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেচে, সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বল্‌তে চাচ্চে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্য্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পর যুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা আর একটা সামাজিক। এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েচেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয় সেইখানেই বর্ব্বরতা। সেই বর্ব্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ডভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোট সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল সভ্য মানবের লক্ষ্য। উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই—ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্ব্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে

ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্ম্মের নামে, কর্ম্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেচে সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্ম্মকে আঘাত করে, সেই হচ্চে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সভ্যতাবিলাসের কারণ সন্ধান করলে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায় সে হচ্চে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েচে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেচে;—তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েচে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা করচে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ অন্য দেশের চেয়ে আরও যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটেচে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। একথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারাই এপারে ওপারে এদেশে ওদেশে আনাগোনা দেনা পাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্যকালের অপথ। বর্ত্তমানে তাই ঘটেচে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যালাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে থাকে সে সব হ'ল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে, তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান বিশ্বাস আচার অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ওদিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতী করে, ডাক্তারী করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে, চারদিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ। যে স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্ম্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে ত মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যাঁরা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন সব লোকের মধ্যেও দেখা যায় সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, সেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে ব'লে ওঠেন কিছু করা চাই, কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি ব'লে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েচে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মত ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্য্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চারদিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে-চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতই ভীরু। আঙিনা পর্য্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশু-শিক্ষারই যোগ্য—অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো

ভাষা শেখবার সুযোগ নেই সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চির শিশুর মতই গণ্য করা হয়েচে। তারা কোনোমতেই পূরো মানুষ হয়ে উঠবে না অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পূরো মানুষের অধিকার লাভ করবে চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি। জ্ঞান-লাভের ভাগ সম্বন্ধে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড় অনশনের ব্যবস্থা আর কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেচি। ইংরেজী হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা আর ইংরেজী ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হ'তেই পারবে না এও বলা তাই। এই উপলক্ষ্যে এ কথা মনে রাখা দরকার, যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেচে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক ব'লে এক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বল্‌তে আমরা যা বুঝি সে হচ্চে ভদ্রলোকের দেশ। গণসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে। ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোট। তারা নিজেও সেটা স্বীকার ক'রে নিয়েচে। বড় মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট ক'রে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই। রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই-কিছু বলি না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি না কেন—আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্ম্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোট ক'রে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি—কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্চে দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচাত্তর পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা একদেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্বলত তার এক অংশে অল্প তেল অপর অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিটমিট করে জ্বল্‌ত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এই রকমই ছিল। তাদের মর্য্যাদা সমান নয় কিন্তু তবুও তারা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েচে একদিকে জল গিয়েচে আর একদিকে, তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হ'ল ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প বিদেশ থেকে, তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনের শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে জ্বলে নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক—সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই—নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তাহলে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়—সেই চেষ্টা নিয়তই চল্‌চে।

আর এক শ্রেণীর বাতি আছে—তাকে বলি বিজ্‌লি বাতি। তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত অদীপ্তের ভেদ নেই—এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চল্‌চে না—কিন্তু কোথাও কোথাও সুরু হয়েচে—এর যন্ত্রটাকে পাকা ক'রে তুল্‌তে হয়ত এখনও অনেক ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়ত দেউলে হয়ে যেতেও পারে—কিন্তু পশ্চিম মহাদেশে এইদিকে একটা ঝোঁক পড়েচে সে কথা আর গোপন ক'রে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্চে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে এই রকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়চে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্মে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট ব'লে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই,—আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান,—তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়—এমন কি, যে কামনা যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েচে। কিন্তু যারা মা ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েচে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেচি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েচি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্য্যন্ত আমাদের নেই। আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্‌স্‌, এথ্‌নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের—পাশের গ্রামের লোকের আচার-বিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে ক'রে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার "মূভ্‌মেণ্টের" পূর্ব্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েচেন,—আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা মূভমেণ্ট চলে আসচে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিতসাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই—কেন-না তাতে পরীক্ষাপাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে,—সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা ক'রে রক্ষা করবার যোগ্য—কিন্তু ওরা ছোটলোক। সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত,—ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজের তা লোপ পেয়ে গেছে ব'লে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনও আছে—কিন্তু ওরা ছোটলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন কি, সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়ত এ সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্চে—কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের ক্ষতি বলেই গণ্য করি নে—কেন-না, বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই। কবি বলেচেন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে।" তিনি এইভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী—অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা ব'লে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই ক'রেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানেই সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানে এই গ্রাম কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ উদ্বোধনের যজ্ঞ করেচি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এতে কতটুকু কাজই বা হবে? স্বীকার করতেই হবে তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু তাই ব'লে লজ্জা করব না। কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনও আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা ক'রে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ং—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।
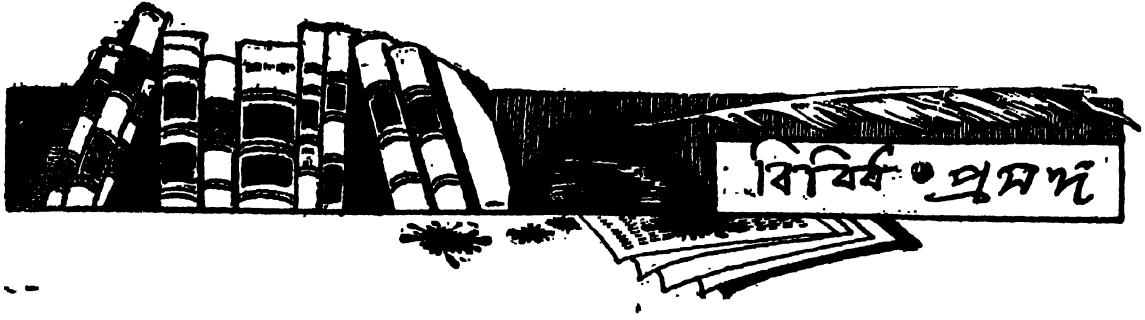
দুধে জল, না জলে দুধ ?

কথিত আছে, এক গৃহস্থ একজন গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু, সত্য কথা বল ত, তুমি কত দুধে কত জল দাও?" গোপপুত্র রসিক লোক ছিলেন; উত্তরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল আমি কত জলে কতটুকু দুধ দি।"

গণ্ডগোলটেবিল বৈঠকের শেষ পুরা অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজি ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতবর্ষকে যে প্রকারের স্বায়ত্তশাসন দিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে ঐ গল্পটি মনে পড়ে। ব্রিটিশপক্ষের লোকেরা বলিতেছেন, ভারতবর্ষের লোকদিগকে স্বায়ত্তশাসনরূপ দুগ্ধই দেওয়া হইয়াছে—কেবল তাহারা পেটরোগা শিশু বলিয়া দুধের সঙ্গে ব্রিটিশায়ত্ত ক্ষমতা-রূপ কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কালক্রমে যখন সহ্য হইবে, তখন তাহাদিগকে কেবল খাটি দুধই দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ পক্ষের একদল লোক বলিতেছেন, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতীয়দিগকে আপাততঃ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং ব্রিটিশপক্ষের হাতে কেবল ততটুকু ক্ষমতা রাখা হইয়াছে যতটুকু রাখা ভারতেরই মঙ্গলের জন্য আবশ্যক। অন্য ব্রিটিশ দল বলিতেছেন, ভারতীয়দিগকে সব বা প্রায় সব ক্ষমতাই দেওয়া হইয়া গিয়াছে, ব্রিটিশ ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিল। অবশ্য, ব্রিটিশ পক্ষের এই সব কথার মধ্যে ভারতীয়দিগের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায় থাকিবার সম্ভাবনা আছে। "ভারতীয়দিগকে প্রায় সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে," কিম্বা, "হায় হায়! ভারতে ব্রিটিশজাতির কোন প্রভুত্বই রহিল না, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য আদিরও সর্ব্বনাশ হইতেছে," ইত্যাদি বিলাপধ্বনি হইতে ভারতীয়েরা বুঝুক যে, তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে বসিয়াছে, এই রকম একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। দুই ব্রিটিশ দলের মধ্যে ঝগড়া কতটা বাস্তবিক ও আন্তরিক, কতটাই বা রঙ্গমঞ্চে যুধ্যমান দুই দল অভিনেতার অভিনয়, তাহা বলা কঠিন।

যাহা হউক, ব্রিটিশ একদল বলিতেছেন, ভারতীয়দিগকে সামান্য জল মিশান খাটি দুধ দেওয়া হইয়াছে; অন্য দল বলিতেছেন, একেবারে খাটি দুধটুকু নিঃশেষে তাহাদিগকেই দিয়া ব্রিটিশ জাতির জন্য কিছু রাখা হয় নাই। আমাদিগকে এখন স্থির করিতে হইবে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যাহা দিবেন বলিয়াছেন তাহার মধ্যে দুধ কত জল কত।

ভারতীয়দের মধ্যে মডারেট অনেকে (সকলে নহে) মনে করেন, অনেকটা দুধে অল্প জল মিশান হইয়াছে। ভারতীয় অন্য রাজনীতিজ্ঞেরা মনে করেন, অনেকটা জলে অল্প দুধ মিশান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রধান প্রধান বিষয়ে আসল ক্ষমতা ব্রিটিশজাতি নিজের হাতে রাখিতে চাহিতেছে; কেবল ছোটখাট কোন কোন বিষয়ে ভারতীয়দিগকে ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমাদেরও মনে হয়, জলে দুধ মিশাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। জলে ততটুকু দুধই মিশাইবার ইচ্ছা যাহাতে তরল দ্রব্যটির রংটা দুধের মত হয়। অর্থাৎ পরায়ত্ত শাসনে কেবল ততটুকু স্বায়ত্তশাসন মিশান হইবে, যাহাতে মিশ্র জিনিষটার চেহারা নয়নভুলান স্বরাজের মত হয়।

—

অবস্থান্তর ঘটিবার সময়

মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে-শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা হইতে

স্বায়ত্তশাসনে পৌছিতে কিছু সময় লাগিবে। অবস্থান্তর ঘটিবার এই যে সময়, এই সময়ের জন্ম কতকগুলি ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারাল নিজের হাতে রাখিবেন। সেই ক্ষমতাগুলির বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই অবস্থান্তর ঘটিবার সময়টির দৈর্ঘ্য বিবেচ্য। এই কাল কত দীর্ঘ হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে জানা দরকার, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে, না অনির্দ্দিষ্ট হইবে। যদি ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বলেন, উহা বেশী লম্বা হইবে না, তাহাও কখনই সন্তোষকর মনে করা যাইতে পারে না। ঠিক কত দীর্ঘ হইবে, জানিতে চাই। দুই চার শতাব্দী, এক শতাব্দী, পঞ্চাশ বৎসর, বিশ পঁচিশ বৎসর, দশ বৎসর, পাঁচ বৎসর, না এক বৎসর?

সময়টা একটা অনাবশ্যক সর্ত্ত নহে। কালক্রমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব লুপ্ত হইবেই, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবেই। যদি ব্রিটিশজাতি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে রাজী হন, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কারণ, তাহা হইলে ভারতেতিহাসের অতীত সব ঘটনা সত্ত্বেও ভারতীয়েরা ব্রিটিশ জাতির প্রতি মনের মধ্যে অনুকূলভাব পোষণ করিতে পারে। কিন্তু যদি ইংরেজরা, যতদিন সম্ভব, ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রভুত্ব আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান, তাহা হইলে এই অনুকূলভাব পোষণ করা সম্ভবপর হইবে না।

বড়লাটের হস্তে রক্ষিত রাষ্ট্রীয় বিষয়

বড়লাটের হস্তে কি কি রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ভার থাকিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ই বা ব্যবস্থাপকসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে যাইবে, তাহা ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। মোটামুটি একটা আভাস দিয়াছেন বটে। সেই আভাস হইতে আশা ও আরাম পাওয়া যায় না।

দেশরক্ষার ব্যবস্থার উপর ব্যবস্থাপক সভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। সৈন্যদল-সম্পর্কীয় কোন বিষয়সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা কিছু বলিতে পারিবেন না। সৈন্যদলের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে বা ভিতরে যুদ্ধাদির জন্য যত ব্যয় হইবে, ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বড়লাট তাহা তাঁহার ইচ্ছামত লইবেন। ব্যবস্থাপক সভার মঞ্জুরীর উপর তাহা নির্ভর করিবে না। বর্ত্তমান সময়ে সকলের চেয়ে বেশী খরচ হয় সামরিক বিভাগে। ভারতীয় যত রাজনৈতিক দল আছে, সব দলেরই অভিযোগ এই, যে, সামরিক বিভাগের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হওয়ায়, ভারতবর্ষের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক অনেক রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোটেই করা হয় না, কিম্বা খুব সামান্য পরিমাণেই হয়। এই অসন্তোষকর অবস্থা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, কিম্বা দুই চারি বৎসরের জন্যও থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। সামরিক বিভাগের ব্যয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপক সভার আলোচ্য এবং তাহার মঞ্জুরী অনুসারে হওয়া উচিত।

সামরিক বিভাগটি অবস্থান্তর ঘটিবার সময়ের জন্যও কেন ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীর হাতে যাইবে না, তাহাও বিচার্য্য।

ভারতীয় সৈন্যদলের প্রধান ও অধস্তন অফিসাররা সব ইউরোপীয় বলিয়া যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত কার্য্যগত (practical) জ্ঞান ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাহারও নাই, বা অল্প লোকেরই আছে—পুঁথিগত জ্ঞান কাহারও কাহারও থাকিতে পারে। গবন্মেণ্ট এইজন্য বলিতে পারেন, ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী এমন মন্ত্রী ভারতীয়দের মধ্যে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে যিনি সামরিক বিভাগের ভার লইবার যোগ্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ইংরেজরা যে আপত্তি করে তাহা ঠিক বলিয়া মানিয়া লইলে চলিবে না। স্বাধীন দেশ সকলে সামরিক বিভাগের কর্ত্তা কাহারা হয়, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

সভ্যতম দেশ সকলে সামরিক বিভাগ সম্বন্ধে এই নীতি সমীচীন বলিয়া গৃহীত, যে, যদিও যুদ্ধ ঘোষিত হইলে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিই যুদ্ধ চালাইবেন, কিন্তু সামরিক বিভাগ থাকিবে অসামরিক (সিবিল) কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে। এই কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হইবেনই, এমন কোন নিয়ম নাই। ইংলণ্ডেও এই নীতি অনুসৃত

হইয়া থাকে। লর্ড হলডেন একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু ইহা ইংলণ্ডে সর্ব্ববাদিসম্মত, যে, তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। গত জগৎজোড়া যুদ্ধে ইংলণ্ড যাহা করিয়াছিল এবং মিত্র দেশ সকলের সাহায্যে যাহা করিয়া জয়ী হইয়াছিল, তাহা মিঃ লয়েড জর্জের কর্তৃত্বেই করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ নহেন। ভারতবর্ষে সামরিক বিভাগ গবর্ণর-জেনা-র‍্যালের হাতে রাখা হইবে বলা হইতেছে। ভারতের কোন কোন বড়লাট যোদ্ধা ছিলেন বটে। অনেকেই কিন্তু যোদ্ধা ছিলেন না। গবর্ণর-জেনার‍্যাল স্বয়ং সামরিক বিভাগের সব কাজ দেখিবেন শুনিবেন না, করিবেন না; কোন কোন ইংরেজ কর্ম্মচারীর এবং ইংরেজ প্রধান সেনাপতির পরামর্শ ও সাহায্য লইবেন।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা বড়লাটের মন্ত্রী হইবার যোগ্য, তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ নহেন বলিয়া যুদ্ধমন্ত্রী হইবার উপযুক্ত নহেন, এই আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে। ইংলণ্ডে যেমন, এখানেও তেমনি সামরিক বিভাগ অসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন থাকা উচিত। ইংলণ্ডে যেমন এখানেও তেমনি এই কর্তৃপক্ষীয় লোক বা লোকেরা স্বয়ং যোদ্ধা না হইলে ক্ষতি হইবে না। গবর্ণর-জেনার‍্যালের হাতে সামরিক বিভাগের ভার থাকিলে তিনি যেমন ইংরেজ সেনাপতি বা অন্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সাহায্য ও পরামর্শ লইয়া থাকেন, ভারতীয় কেহ যুদ্ধমন্ত্রী হইলে তিনিও তাহা করিতে পারিবেন। যুদ্ধ ঘোষিত বা আরব্ধ হইলে এখন যেমন ইংরেজ সেনাপতিই যুদ্ধ চালান, ভারতীয় যুদ্ধমন্ত্রীর আমলেও তিনিই সেইরূপ যুদ্ধ চালাইবেন।

অবশ্য এখানে এই আপত্তি উঠিবে, যে, ইংরেজ প্রধান সেনাপতি বা অন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী ইংরেজ বড়-লাটের সহিত (সাহায্যদান পরামর্শদান রূপ) যে সহযোগিতা করেন এবং তাঁহাকে যেমন উপরওয়ালা বলিয়া মানেন, ভারতীয় যুদ্ধমন্ত্রীর সহিত সেরূপ সহযোগিতা মানিবেন না। এই আপত্তির উত্তরে বলা আবশ্যক, ভারতবর্ষের দাবি এবং ন্যায্য অধিকারই এই, যে, ভারতবর্ষের সব ব্যাপারে ভারতীয় লোকেরাই প্রভু ও কর্ত্তা হইবেন। ইংরেজ জাতি ও গবর্ন্মেণ্ট যদি এই দাবি মানেন, তাহা হইলে অমুক বিভাগের কর্ত্তা ভারতীয়েরা হইতে পারিবেন, অমুক বিভাগের হইতে পারিবেন না, ইহা বলিলে চলিবে না। যে-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্থাৎ কর্ত্তা ভারতীয় হইবেন, সেই বিভাগের সব কর্ম্মচারীকেই তাহাকে উপরওয়ালা বলিয়া মানিতে হইবে। যিনি না মানিবেন, তিনি ইংরেজ হউন, ভারতীয় হউন, বা অন্য কোন জাতির হউন, তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বরাজ স্থাপিত হইতে কত সময় লাগিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং দীর্ঘ না হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় অবস্থান্তর ঘটিবার এই সময় (transition period) যদি দু-এক বৎসর হয়, তাহা হইলে সেই সময়ের জন্য গবর্ণর জেনার‍্যালের হাতে সামরিক বিভাগ থাকিতে পারে। সময় তদপেক্ষা দীর্ঘ হইলে এই বিভাগের ভার অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কোন ভারতীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হওয়া দরকার। তাহা করিতে হইলে, যত শীঘ্র সম্ভব সমুদয় সৈন্যদলের জন্য লেফটেন্যান্ট, কাপ্তেন, মেজর, লেফটে-ন্যাণ্ট-কর্ণেল, কর্ণেল, জেনার‍্যাল প্রভৃতি পদের জন্য ভারতীয়দিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য কয়েক জন ভারতীয়কে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সামরিক বিভাগ ভারতীয়দের হাতে না আসিলে যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র ভারতীয়দিগকে যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া কার্য্যতঃ হইবে না। গোলটেবিল বৈঠকের দেশরক্ষা সব-কমিটির চেয়ারম্যান টমাস সাহেব বলিয়াছেন, যে, ভারত-বর্ষে যুদ্ধশিক্ষা দিবার কলেজ শীঘ্র স্থাপন করিয়া তাহাতে যথেষ্টসংখ্যক ভারতীয়কে শিক্ষিত করিলেও

তাঁহাদের শেষ ব্যক্তির পেন্সান লইয়া ইংলণ্ডে যাইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর লাগিবে। সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে না-গেলে পঁয়ত্রিশ বৎসরেও সৈন্যদল কেবলমাত্র ভারতীয়ের দ্বারা চালিত হইবে না।

এবং সৈন্যদল ইংরেজদের হাতে যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষ নামে স্বরাজ পাইলেও পরাধীন থাকিবে।

সামরিক বিভাগের ভার ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে না আসিলে আর একটি অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তনও হইবে না। ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য সিপাহী-সংগ্রহ বর্ত্তমানে প্রধানতঃ পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখ এবং নেপালী গুর্খাদিগের মধ্য হইতে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষকে নিজেদের শাসনাধীন রাখিবার জন্য ইংরেজরা এই দেশের নানাপ্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও জাতির লোকদের মধ্যে সামরিক ও অসামরিক (martial and non-martial) এইরূপ একটা কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। অথচ, দূর অতীত কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজদের আমলেও প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই অল্পাধিক সিপাহী-সংগ্রহ কোন-না-কোন সময়ে করা হইয়াছে। আজ যাহাদিগকে অসামরিক জাতি বলা হইতেছে, এই প্রকার সিপাহীদের সাহায্যেই গবর্ন্মেণ্ট স্বাধীন শিখ গুর্খা ও পঞ্জাবী মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

দেশরক্ষার ভার কোন দুই-একটি প্রদেশের বা অঞ্চলের,কোন দুই-একটি জাতির হাতে থাকা উচিত নয়। কয়েকটি প্রদেশ বা জাতির উপর তাহা থাকিলে তাহাদের ক্ষমতা ও অহঙ্কার বাড়ে, অপরেরা ভীরু বলিয়া কথিত হয় এবং সঙ্কটকালে যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া যায় না। এখন বলিতে গেলে ভারতবর্ষ প্রথমতঃ ইংরেজের অধীন এবং তাহার নীচে পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখ গুর্খার অধীন। সিপাহী-সংগ্রহের বর্ত্তমান প্রথা প্রচলিত রাখিলে ভারতবর্ষ যদি বা ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়, তথাপি তথাকথিত "সামরিক" জাতিদের অধীন থাকিবে। এই অধীনতার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে, দেশের সকল অঞ্চল, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতি হইতে সিপাহী সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

সকল অঞ্চলের, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও জাতির লোকদের সৈনিক হইবার অধিকার আছে। সৈন্যদলের ব্যয় ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জাতির লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এই ব্যয়ের কতক অংশ সিপাহীরা এবং তাহাদের হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি বেতন ও ভাতা বাবদে পায়। সামরিক বিভাগ কেবল দুই-একটি জাতি ও অঞ্চলের লোকেরই আয়ের উপায় হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ট্যাক্স সমগ্র ভারতবর্ষ দেয়, সুতরাং বেতনাদি বাবদে তাহার কিয়দংশ ফেরত পাইবার অধিকার ভারতবর্ষের সব জায়গার লোকদেরই আছে। অবশ্য সিপাহী হইবার মত লম্বাচৌড়া মজবুত শরীর ও স্বাস্থ্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রত্যেকেরই চাই, যাহারা সিপাহী হইতে চায়।

—

বড়লাটের হাতে অন্যান্য "রক্ষিত" বিষয়

বিদেশ সম্বন্ধীয় সব ব্যাপার বড়লাটের হাতে ন্যস্ত আর একটি "রক্ষিত" বিষয় হইবে। অন্তর্জাতিক সমুদয় চুক্তি, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশ এবং ভারতীয় দেশী রাজ্যসমূহের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কথাবার্ত্তা চালান ও বন্দোবস্ত করা এই "রক্ষিত বিষয়টি"র অন্তর্গত। এ পর্য্যন্ত এই রকম যত কাজ হইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ গ্রেট বিটেনের স্বার্থের ও প্রভুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি এবং কখন কখন বদনামও হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কারখানার শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য তাহারা প্রত্যহ ও প্রতি সপ্তাহে মোট কত ঘণ্টা কারখানার কাজ করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু এবিষয়ে কোন নিয়ম হইলে তাহা সব দেশের—অন্ততঃ বহু কারখানাবিশিষ্ট প্রচুর পণ্যদ্রব্যোৎপাদক সব দেশের —প্রতি প্রযুজ্য হওয়া উচিত। লীগ্ অব নেশ্যন্সের সহযোগে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এইরূপ

একটি বিধি প্রণীত হয়। অবিলম্বেই ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংরেজ গবর্মেণ্ট তাহাতে সায় দেন। কিন্তু তাহার আগে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, বা তাহার অনেক বৎসর পরেও ইংলণ্ড এবং অন্য ইউরোপীয় বহু পণ্য-দ্রব্যোৎপাদক দেশ ঐ ব্যবস্থা নিজ নিজ দেশে চালাইতে প্রস্তুত হন নাই।

আফিং উৎপাদন, বিক্রী ও সেবনের জন্য ভারতবর্ষের একটা বদনাম আছে। চীনে আফিং চালাইবার জন্য গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের ব্যয়ে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ঔষধার্থ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের নিমিত্ত ভিন্ন আফিং উৎপাদন ও বিক্রী যাহাতে কোন দেশে না হয়, সেইরূপ অন্তর্জাতিক ব্যবস্থা করাইবার জন্য আমেরিকা জেনিভাতে বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ক্যাম্বেল নামক একজন ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে (!!!) আমেরিকার এই চেষ্টার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। অথচ ভারতবর্ষের লোকেরা নেশার জন্য আফিং উৎপাদন, বিক্রী ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

লীগ্ অব্ নেশুন্সে অন্তর্জাতিক নানা ব্যাপারের আলোচনা ও ব্যবস্থা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাধীন দেশ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ডোমীনিয়ন অর্থাৎ স্বশাসক রাষ্ট্রগুলি এই লীগের সভ্য। (বোধ হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি ভোট বাড়াইবার জন্য) ব্রিটিশ মন্ত্রীরা ভারতবর্ষকেও ইহার সভ্য করিয়া লইয়াছেন। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এই সব দেশের যে-সকল প্রতিনিধি মনোনীত হন, জেনিভায় তাঁহাদিগকে লইয়া লীগের অধিবেশন হয়। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা সেই দেশের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। কিন্তু অন্য সব দেশের গবর্মেণ্ট ও অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে সেরূপ পার্থক্য নাই, যেরূপ পার্থক্য ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট ও অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে আছে। এইজন্য অন্যান্য দেশ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিরা সেই সব দেশের লোকদের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগের মত্ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে যে-সব প্রতিনিধি লীগে যান, তাঁহারা গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি, আমাদের নহে। যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের বাহ্য রাষ্ট্রীয় বিষয় সকলের ভার বড়লাটের হাতে থাকে, ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী কোন ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও এখনকারই মত লীগে যাইবার জন্য এরূপ লোক নির্ব্বাচিত হইবে, যাহারা ইংরেজ গবর্মেণ্টের মতানুবর্ত্তী কিন্তু ভারতীয় লোকমত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। তাহা হইলে, তাহারা লীগের সভায়, এখনকারই মত, এমন কোন কোন বিষয়ে মত দিবে যাহা ভারতীয় লোকমতের বিরুদ্ধ। অথচ ভারতবর্ষকে লীগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ খুব বেশী টাকা দিতে হয়। টাকা দিবার বেলায় ভারতবর্ষ, যে-সব দেশ লীগের সভ্য, তাহাদের মধ্যে ষষ্ঠস্থানীয়, অথচ লীগে ভারতবর্ষের লোকদের মত-প্রকাশের কোন অধিকার ও সুযোগ নাই। লীগকে তাহার সভ্য প্রধান প্রধান দেশ কত অর্থ দেয়, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি। চাঁদার পরিমাণ স্বর্ণ-ফ্রাঙ্কে দেওয়া হইল।

এক হাজার স্বর্ণ-ফ্রাঙ্ক বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে প্রায় ১,০৬৭ টাকার সমান।

রাষ্ট্র	বার্ষিক চাঁদা
গ্রেট ব্রিটেন	৩,৩৬৯,১০৫
ফ্রান্স	২,৫৩৪,৮৫০
জার্ম্মেনী	২,৫৩৪,৮৫০
ইটালী	১,৯২৫,২০২
জাপান	১,৯২৫,২০২
ভারতবর্ষ	১,৭৯৬,৮৫৬
চীন	১,৪৭৫,৯৮৮
স্পেন	১,২৮৩,৪৬৮
কানাডা	১,১২৩,০৩৫
পোল্যাণ্ড	১,০২৬,৭৭৪
আর্গেণ্টাইন	৯৩০,৫১৪
চেকোস্লোফাকিয়া	৯৩০,৫১৪
অষ্ট্রেলিয়া	৮৬৬,৩৪১
হল্যাণ্ড	৭৩৭,৯৯৪

এই প্রকার নানা কারণে ভারতবর্ষের বাহ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সকলের ভার নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপক সভার নিকট

দায়ী ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে অর্পিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা অন্তর্জাতিক সমুদয় ব্যাপারে এবং ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্বন্ধ বিবেচনার সময় ভবিষ্যতে এখনকারই মত, ব্রিটেনেরই স্বার্থ ও মত বিবেচিত হইবে, ভারতবর্ষের লোকমত ও মঙ্গলামঙ্গল বিবেচিত হইবে না। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, স্বরাজসঙ্গতও নহে।

—

দেশের শান্ত অবস্থা রক্ষা

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন, সঙ্কটকালে দেশের শান্ত অবস্থা রক্ষার ভারও বড়লাটের হাতে থাকিবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে আবশ্যক ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমানেও বড়লাট দেশে শান্তিরক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। তাহা জারি করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হয় না। এই সব অর্ডিন্যান্স নানাদিকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা লোপ বা হ্রাসের এবং পুলিস ও অন্যান্য অধস্তন কর্ম্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়নের কারণ হইয়াছে। আমাদের কাগজগুলিতে এবং অন্যান্য কোন কোন কাগজে দেখান হইয়াছে, যে, অর্ডিন্যান্সগুলি জারি করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল না ও নাই। তাহাদের দ্বারা গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতেছে না।

বর্ত্তমানে নানাদিকে ভারতীয় লোকদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় লোপ বা হ্রাস করিবার এবং বড়লাটের অনভিপ্রেত হইলেও, পুলিসের দ্বারা নিগ্রহের পরোক্ষ উপায় সৃষ্টি করিবার যে ক্ষমতা আছে, ভবিষ্যতে তাহা বড়লাটের হাতে রাখিবার আমরা বিরোধী। ভারতবর্ষে শান্তি থাকা ভারতীয়দের পক্ষে যত দরকার, তত আর কাহারও পক্ষে নহে। সুতরাং শান্তিরক্ষার ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতেই থাকা উচিত।

—

সংখ্যান্যূনদের অধিকার রক্ষা

মিঃ র‍্যামজি ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সংখ্যান্যূন সম্প্রদায় সকলকে কন্সটিটিউশ্যান অর্থাৎ মূল রাষ্ট্রীয় বিধিদ্বারা যে-সকল অধিকার দেওয়া হইবে, তাহারা তাহা ভোগ করিতে পাইতেছে, না বঞ্চিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য এই বিষয়টি-সম্বন্ধেও বিশেষ ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকিবে। ভবিষ্যতে প্রত্যেক বড়লাট সদাশয় ভদ্রলোক হইবেন কিম্বা হইবেন না, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ধরিয়া লওয়া যাক, যে, প্রত্যেকেই খুব সাধুপুরুষ হইবেন। কিন্তু বড়লাট ত তাঁহার সব ক্ষমতা পরিচালন স্বয়ং স্বহস্তে করেন না, অন্য লোকেরা তাঁহার নামে করে। তাহারা সকলেই ভেদনীতি অবলম্বন না করিয়া, কেবল সংখ্যান্যূনদের মঙ্গলচিন্তাই করিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তদ্ভিন্ন, যদি তাহারা সকলেই ভাল লোক হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় লোকদের প্রতিনিধি-সমষ্টি অপেক্ষা ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষের সংখ্যান্যূন শ্রেণী জাতি বা সম্প্রদায় সকলের অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা আমরা স্বীকার করি না; কারণ ইহা সত্য নহে। ভারতবর্ষের সংখ্যান্যূন লোকসমষ্টি সকলের মধ্যে, যাহাদিগকে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় অবনত বলা হয়, তাহাদের মত দুরবস্থা অন্য কোন লোকসমষ্টির নাই। নাগপুরে এই সকল শ্রেণীর লোকদের সমগ্রভারতীয় যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহাতে তাহাদের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডক্টর আম্বেদকর (গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য) স্বীয় অভিভাষণে বলেন, যে, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ করিয়া কিছু করেন নাই। অন্য দিকে ইহা সত্যবাদী কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, যে, অতীতে এই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত লোকগুলির প্রতি হিন্দুসমাজের ব্যবহার সাতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমানে নেতারা তাহাদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। তাহাদের উন্নতির জন্য বেসরকারী নানা চেষ্টা হইতেছে এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্য একাধিক হিন্দু নেতাই আইন করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকার কোন প্রয়োজন নাই। বরং এরূপ ক্ষমতা বিদেশী কাহারও হাতে রাখার দ্বারাই

পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্রু

শেষ অসুস্থতার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে গৃহীত প্রতিকৃতি

সপরিবারে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু

পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু
জবাহরলালের বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর

মোতীলাল
১৯০৫ সনের প্রতিকৃতি

সংখ্যান্যূন সমষ্টিসকলের মনে এই সন্দেহ জাগাইয়া রাখা হইবে, যে, তাহাদের স্বদেশবাসী সংখ্যাভূয়িষ্ঠ লোকদের চেয়ে বিদেশী লোকেরা তাহাদের অধিক হিতকাঙ্ক্ষী। বাস্তবিকই সরকারী বিদেশী লোকেরা তাহাদের বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে সে-কথা স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি হইত না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। সুতরাং বিদেশীর হাতে তাহাদের অধিকার রক্ষার ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে চাই না, এবং পরোক্ষভাবে ভেদবুদ্ধির ও ভেদনীতির প্রশ্রয় দিতে চাই না।

—

আর্থিক বিষয়ের দায়িত্ব

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যাপার সম্বন্ধেও কার্য্যতঃ বড়লাটের হাতেই প্রায় সব ক্ষমতা রাখিতে চান। তাহা না করিলে না-কি জগতের বাজারে ভারতবর্ষের বাজারসম্ভ্রম থাকিবে না। ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আসল কথা এই যে, গ্রেট ব্রিটেনের লোকদের এবং ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের স্বার্থরক্ষার জন্যই এরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে। গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের নামে অনেক শত কোটি টাকা ঋণ করিয়াছেন। অধিকাংশ ঋণের মহাজন ইংরেজ। গবর্ন্মেণ্টের ভয় এই যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার হাতে আর্থিক ক্ষমতা গেলে ভারতীয়েরা এই সব ঋণ অস্বীকার করিয়া বসিতে পারে। সব ঋণই অস্বীকার করা হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কংগ্রেস পক্ষ হইতে ইহাই বলা হইয়াছে, যে, কোন্ কোন্ ঋণ বাস্তবিকই ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে, তাহা কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হউক। ইহা ন্যায্য কথা। যাহা হউক, গবর্ন্মেণ্ট যাহাই করুন, শীঘ্র বা বিলম্বে এরূপ বিচার হইবেই, এবং যে ঋণ ন্যায়তঃ ভারতের পরিশোধ্য নহে, তাহা ভারতবর্ষ অস্বীকার করিবেই।

বিনিময়-নীতি, সরকারী ঋণগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ও বড়লাটের হাতে রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা ইহার বিরোধী। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অর্থনীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, যে, এক টাকা ১৮ পেনীর সমান, গবর্ন্মেণ্ট বিনিময়ের এই হার স্থির করিয়া দেওয়ায় ভারতীয়দের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি এবং ইংরেজদের লাভ হইয়াছে। এই কারণে, মহাত্মা গান্ধীও এই দাবি করিয়াছেন, যে, টাকাকে ষোল পেনীর সমান বলিয়া হার ধার্য্য করা হউক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে "রিভার্স কাউন্সিল্‌স্" দ্বারা ভারতবর্ষের অন্যূন চল্লিশ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। বিস্তর ক্ষতি যে হইয়াছিল, তাহা পার্লেমেণ্টে স্বীকৃতও হইয়াছিল।

সরকারী ঋণগ্রহণের ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকিলে, অতীত কালের মতই, ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষের হিত ও প্রয়োজন অপেক্ষা ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধি ও স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রধানতঃ বা মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রহণ অনিবার্য্য হইবে।

—

প্রধান শাসকের হাতে ক্ষমতা রক্ষা

প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন, দেশের প্রধান শাসকের হাতে কতকগুলি ক্ষমতা সব স্বাধীন দেশেই আছে, এবং ভারতীয়েরা নিজেরা যদি ভারতবর্ষের জন্য মূল রাষ্ট্রবিধি রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও প্রধান শাসকের হাতে এরূপ ক্ষমতা রাখিতেন। ইহা সত্য কথা, কিন্তু আংশিক সত্য মাত্র। স্বাধীন দেশ-সকলের যে-সব মূল রাষ্ট্রবিধি রচিত হইয়াছে, তাহা তথাকার লোকেরা নিজে করিয়াছে, সুতরাং অনাবশ্যক কোন ক্ষমতা তাহারা প্রধান শাসকের হাতে দেয় নাই। ভারতীয়দিগকে তাহাদের রাষ্ট্রবিধি রচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। তখন তাহারাও কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষমতাই প্রধান শাসকের হাতে রাখিবে। আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। স্বাধীন দেশ-সকলের প্রধান শাসকের নাম রাজা, সম্রাট, প্রেসিডেণ্ট (দেশপতি) বা অন্য যাহাই হউক, তিনি তাহাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয়। অন্য কোন দেশের স্বার্থচিন্তা বা স্বার্থরক্ষা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, সুতরাং তিনি ভুল করিলেও স্বদেশের জন্যই ভুল করেন। ভারতবর্ষকে যে কন্‌ষ্টিটিউশ্যন দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বড়লাট ইংরেজই হইবেন; ভবিষ্যতে যদি কখন কোন ভারতীয়কে বড়লাট করা হয়, এমন লোককে করা হইবে যিনি ইংরেজের খুব

অনুগত, সুতরাং বড়লাট স্বভাবতই সাধারণত এমন কিছু করিবেন না যাহাতে ব্রিটেনের ক্ষতি হইতে পারে। আমরাও যে ব্রিটেনের ক্ষতির জন্য ক্ষতি করিতে চাই, তাহা নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক বলিয়া ভারতবর্ষের ক্ষতি করিয়া ব্রিটেনের লাভ করিতে হয়। এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে। ব্রিটেনের এইপ্রকার লাভ বন্ধ না করিলে ভারতের মঙ্গল নাই। সুতরাং ভারতের মঙ্গল করিতে করিতে ব্রিটেনের অস্বাভাবিক ও অন্যায্য লাভ বন্ধ করা রূপ ক্ষতি অনিবার্য্য। ইংরেজ বড়লাটেরা এই প্রকারে ব্রিটেনের ক্ষতি করিতে রাজী হইবেন না।

সৈন্যদলের জন্য অত্যন্ত বেশী খরচ হয়। বড়লাটের হাতে উহার ভার থাকিলে ঐ খরচ কমিবে না এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য আবশ্যক ব্যয়ও যথেষ্ট করা চলিবে না।

ফৌজদারী দণ্ডবিধির ও কার্য্যবিধির কতকগুলি ধারা, পুলিস আইনের কোন কোন ধারা, বড়লাটের অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতা এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারা ভারতীয়দের স্বাধীনচিন্ততা দমন এবং স্বরাজ-লাভ চেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মান অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। স্বশাসক ভারতকে এই সব ধারা রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অর্ডিন্যান্স করিবার ক্ষমতাও লুপ্ত বা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে;—বিশেষতঃ যদি ইংরেজকেই বড়লাট নিযুক্ত করিবার প্রথা বিদ্যমান থাকে। যদি আমাদের স্বরাজ এরূপ আকার ধারণ করে, যে, আমরাই দেশের প্রধান শাসককে নির্ব্বাচন করিতে পারিব, তাহা হইলেও প্রধান শাসকের হাতে অনিয়ন্ত্রিত বেশী ক্ষমতা রাখা হিতকর ও বাঞ্ছনীয় হইবে না।

—

প্রাদেশিক গবর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা

প্রদেশগুলির সমুদয় আভ্যন্তরীণ বিষয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী এবং তাহার সভ্যসমূহ হইতে মনোনীত মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হইবে। কেবল সমগ্র ভারতীয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্রীয় ভারত গবর্মেণ্টের এলাকাভুক্ত থাকিবে।

কিন্তু "ন্যূনতম" কতকগুলি "বিশেষ ক্ষমতা" প্রাদেশিক গবর্ণরদের হাতে থাকিবে। অসাধারণ বিশেষ অবস্থায় প্রদেশের শান্ততা রক্ষার নিমিত্ত, এবং আইন দ্বারা সংখ্যান্যূনদিগকে ও চাকর্যেশ্রেণীসমূহকে (পাব্লিক সার্ভিস সমূহকে) যে অধিকার দেওয়া হইবে সেই সব অধিকার গ্যারাণ্টি করিবার অর্থাৎ ভোগের নিশ্চয়তা উৎপাদনের নিমিত্ত, গবর্ণরদের এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হইবে।

বড়লাটের হাতে সমস্ত দেশের শান্ততা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা রাখিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, প্রাদেশিক গবর্ণরদের হাতে তদ্রূপ ক্ষমতা রক্ষা সম্বন্ধেও সেইরূপ কথাই বলিতে হয়। তাহার পুনরুক্তি করিব না। শান্তিরক্ষার অজুহাতে অধস্তন কর্ম্মচারীরা যাহা করেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

সংখ্যান্যূনদের অধিকার রক্ষার নিমিত্ত বড়লাটের হাতে বিশেষ ক্ষমতা রাখার বিরোধী আমরা যে-সব কারণে, প্রাদেশিক গবর্ণরদের হাতে সেইরূপ ক্ষমতা রাখারও বিরোধী তদ্বিধ কারণে। তাহারও পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

চাকর্যেদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণর-দিগকে বিশেষ ক্ষমতা দিবার চিন্তাটা ইংরেজ রাজপুরুষ ও বেসরকারী লোকদের মনে উদিত হইবার কারণ, ইংরেজ চাকর্যেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা—অন্ততঃ প্রধানতঃ তাই। দেশী সরকারী চাকর্যেদের দশা স্বরাজ বা আংশিক স্বরাজের আমলে কি হইবে, তাহার জন্য সরকারী বা বেসরকারী ইংরেজদের মাথাব্যথা হইবার কোন স্বাভাবিক কারণ নাই। অবশ্য এখন গবর্মেণ্ট পুলিসের কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সকলেরই খ্যাতি রক্ষা ও বৃদ্ধির এবং অর্থাগমের দিকে মন দিয়া থাকেন; কারণ তাহারা গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। স্বরাজের আমলে এরূপ কোন কারণে দেশী কোন শ্রেণীর চাকর্যেদের কথা ভাবিবার প্রয়োজন হইবে না।

আমাদের বোধ হয়, ভারতীয়দের হাতে প্রাদেশিক সমস্ত ক্ষমতা আসিলে কোন শ্রেণীর বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা ইংরেজ বলিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার, তাহাদের

ক্রমিক বেতন বৃদ্ধি বা পেন্সন বন্ধ করিবার বা কমাইবার চেষ্টা হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে নূতন কন্‌ষ্টিটিউশ্যনের বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতে বলা হইতে পারে এবং কেহ স্বরাজের প্রতিকূল আচরণ করিলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া দোষ প্রমাণিত হইলে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইতে পারে।

নূতন মূল রাষ্ট্রবিধি জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাজ অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ অসামরিক সব শ্রেণীর চাকরিতেই বিদেশী লোকের নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। এমন যদি হয়, যে, কোন বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় আপাততঃ নাই, তাহা হইলে তিন বা পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে যোগ্য কোন কোন বিদেশীকে তাহাতে নিযুক্ত করিয়া ঐরূপ কাজের জন্য ভারতীয় যুবকদিগকে ভারতে বা বিদেশে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তদ্ভিন্ন, এখন দেশী ও বিদেশী চাকরোদের বেতন যাহা আছে, তাহা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া নূতন যাঁহারা চাকরিতে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের বেতনের হার স্বাধীন দেশ সকলের চাকরোদের বেতনের তুলনায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। স্বাধীন দেশ-সকলে মানুষের নিজের ও পরিবারবর্গের সুস্থ শরীরে জ্ঞানোজ্জ্বল মন লইয়া ও নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার খরচ কত এবং ভারতবর্ষেই বা ঐরূপ খরচ কত, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন স্থির করিতে হইবে। স্বাধীন দেশসকলে এইরূপে বাঁচিয়া থাকিবার খরচের চেয়ে বেতন যে পরিমাণে বেশী আমাদের দেশে জীবনধারণের ব্যয় অপেক্ষা বেতন তার চেয়ে বেশী হওয়া অনুচিত হইবে, কারণ আমরা দরিদ্র জাতি।

পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু

ভারতবর্ষের এই সঙ্কট সময়ে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর মত একজন বয়োবৃদ্ধ, প্রবীণ, বিচক্ষণ ও সাহসী নেতার তিরোভাব সাতিশয় শোকাবহ ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী রহিয়াছেন, অন্যান্য নেতাও আছেন, কিন্তু পণ্ডিত মোতীলালের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারেন, এরূপ কেহ নাই।

তিনি স্কুল কলেজে লেখাপড়া বেশী কিছু করেন নাই, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষাও দেন নাই। অন্য একটি সরকারী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। ক্রমে হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতে তিনি য়্যাডভোকেট হন। আমি যখন ১৮৯৫ সালে এলাহাবাদের একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া এলাহাবাদ যাই, তখনই পণ্ডিত মোতীলাল তথাকার হাইকোর্টের প্রধান তিন চারি জন উকীলদের মধ্যে একজন। নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি আইনব্যবসায়ীদের মধ্যে এই উচ্চ স্থান অধিকার করেন।

তিনি প্রথম প্রথম জীবনের অধিকাংশ সময় অর্থউপার্জ্জনে এবং সুখভোগেই যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল, তখন তিনি স্বদেশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে লাগিয়া গেলেন। শুধু নিজে লাগিলেন না; তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যারা, এক জামাতা—সকলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

তিনি সাহসী ও স্বাধীনচিত্ত পুরুষসিংহ ছিলেন। স্বরাজ যে লব্ধ হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। যদি যুদ্ধের পথেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে তাঁহার বেশী সময় লাগিত না—তিনি আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহারে সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ ও সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় অহিংস-সংগ্রামেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি শান্তিনিকেতন হইতে ফ্রী প্রেসকে তাঁহাদের অনুরোধ অনুসারে প্রেরিত আমার * নিম্নমুদ্রিত শ্রদ্ধানিবেদনে ব্যক্ত করিয়াছি :—

"Pandit Motilal Nehru has left us the legacy of an unconquered spirit in the hour of India's spiritual triumph."

* ফ্রী প্রেস ভ্রমক্রমে ইহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাণী" বলিয়া ছাপাইয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ফ্রী প্রেসকে কোন বাণী পাঠান নাই, একটি দৈনিক কাগজে পাঠাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর জীবনচরিত নানা দৈনিক কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাহা এখানে বিবৃত করিবার স্থান ও সময় নাই। সর্ব্বসাধারণ যাহা অবগত নহেন, এরূপ দু-একটি কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

সুখভোগের, আরামের, বিলাসের জীবন হইতে ত্যাগের ও সাদাসিধা জীবনের মধ্যে তিনি আসিয়া পড়েন। এই পরিবর্ত্তন কত বড়, তাহা বুঝাইবার জন্ত একটি আখ্যান যথেষ্ট হইবে।

কলিকাতার উকীল ও দানবীর রাসবিহারী ঘোষ খুব ধনী লোক ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাহা তাঁহার সার্ব্বজনিক নানা কাজে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দান হইতেই অনুমিত হইবে। ঘোষ মহাশয় কখন কখন ওকালতী উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ যাইতেন এবং পণ্ডিত মোতীলালের বাড়িতে অতিথি হইতেন। বলা বাহুল্য সেখানে পরম সমাদরে ও আরামে থাকিতেন। পণ্ডিতজী কলিকাতায় অনেকবার আসিয়াছিলেন; ঘোষ মহাশয়ের জীবদ্দশাতে হয়ত অনেকবার তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিবেন। একবার পণ্ডিতজীর কলিকাতায় আসিবার কথা হওয়ায় ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে নিজের বাড়িতে থাকিতে নিমন্ত্রণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টের উকীলদের লাইব্রেরীতে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "মোতীলাল আসিতেছেন, আমার বাড়িতে থাকিতে তাঁহার কষ্ট হইবে।" তাহা শুনিয়া অন্ত উকীলরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতে ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগকে জানান, যে, তাঁহারা জানেন না মোতীলালের আনন্দ-ভবনে আরাম ও বিলাসের কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, সেইজন্ত অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছেন।

কথিত আছে, পণ্ডিতজী যখন স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেন নাই, তখন তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের পরিচ্ছদ ধৌত হইবার জন্ত প্যারিসে প্রেরিত হইত। সেই মোতীলালের খদ্দর-পরিহিত মূর্ত্তি কম উজ্জল দেখাইত না।

পণ্ডিতজী খুব রসিক লোক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস ভলাণ্টিয়র হওয়া যখন বেআইনী বলিয়া গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়, তখন পণ্ডিত মোতীলাল অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ভলাণ্টিয়র সহ দণ্ডিত হইয়া লক্ষ্ণৌ জেলে প্রেরিত হন। সেখানে প্রচুর আহার্য্যের আয়োজন ছিল। বয়ঃকনিষ্ঠেরা এরূপ উৎসাহ ও আমোদের সহিত এত বেশী খাইত, যে, পণ্ডিতজী পরিহাস করিয়া তাহাদিগকে বলেন, "ওহে, তোমরা এত বেশী খাইও না; নইলে সরকার বাহাদুর আর তোমাদিগকে জেলে পাঠাইবেন না!" তিনি নিজেও কিন্তু বেশ ভোজনে নিপুণ ছিলেন।

সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের লেখা "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ" বহির মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশ উপলক্ষ্যে যখন আমাদিগকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়, তখন কেহ কেহ আমাদিগকে হাইকোর্টে আপীল করিতে বলেন। আমার তাহা করিবার ইচ্ছা ছিল না। যাহা হউক, সেই সময়ে পণ্ডিতজী তাঁহার পুত্রবধূর চিকিৎসা উপলক্ষ্যে একবার কলিকাতা আসেন। তখন আমি তাঁহার সহিত দেখা করি, এইরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করায় আমি মাজিষ্ট্রেটের রায়টা লইয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সহিত তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। হোটেলে তাঁহার কামরায় তাঁহার সহিত দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "So you have got it!" তাহার পর আমি তাঁহাকে রায়টা দিলাম। তিনি তাহা ভাল করিয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইবার পর হাসিয়া বলিলেন, "As a lawyer, I would not advise you to appeal. As a politician I should like you to appeal." তাহার পর বলিলেন, আপীলে মাজিষ্ট্রেটের রায় উল্টিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম, নাই বলিলেও চলে।

তাঁহার সহিত আমার দুইবার পত্রব্যবহার হইয়াছিল। তাঁহার একবারের চিঠি ও টেলিগ্রামের কেবল দু-একটি কথার উল্লেখ করিব; তাহাতে তাঁহার মুক্তহস্ততার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অধুনালুপ্ত তাঁহার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক দৈনিক কাগজ যখন এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত ও স্থাপিত হইবার কথা হয়, তখন তিনি আমাকে উহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিবার জন্ত দীর্ঘ চিঠি লেখেন।

কোন কোন কারণে ঐ চিঠির উত্তর দিতে আমার বিলম্ব হওয়ায় তিনি একটি লম্বা টেলিগ্রাম পাঠান। চিঠি ও টেলিগ্রাম দুয়েরই লেখা ছিল, "Name your own salary"—"আপনার বেতন আপনি নিজেই স্থির করিবেন।"

তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি প্রথমে মাস-তিন এলাহাবাদে থাকিয়া কাগজটা চালাইয়া দিয়া যান। তাহার পর কলিকাতাতেই থাকিতে পারেন; মধ্যে মধ্যে আসিবেন, কাগজের পলিসি ডিরেক্ট করিবেন, কিন্তু কোন সময়েই আপনাকে প্রত্যহ লিখিতে হইবে না। ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইলে গুরুতর বিষয়ে লিখিবেন।" ইহাও বলেন, "I have the ambition to bring back *The Modern Review* ultimately to the city where it was born.' তিনি এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ করিলেও চাকরি করিবার ইচ্ছা না থাকায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে পারি নাই।

অন্য পত্রব্যবহার হইয়াছিল গত বৎসর। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই অনুরোধ করেন, যে, সমুদয় ভারতীয় ন্যাশন্যালিষ্ট খবরের কাগজ যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; কারণ গবন্মেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুব সীমাবদ্ধ করিয়া প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছিলেন। সব কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আমার আপত্তি ছিল। তাহা সম্মানসহকারে তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তাহার উত্তর তিনি দিয়াছিলেন। কি উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তাহা এখন বলিব না। তাঁহার পত্রখানি আমি রাখি নাই, কিন্তু অত্যাবশ্যক কথাগুলি মনে আছে। আমার প্রত্যুত্তর তিনি পাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যে শেষ উত্তর দেন, তাহা আমি পাই নাই। তাহা পুলিসের হস্তগত হয়, এবং তাঁহার বিচারের সময় আদালতে তাঁহার দস্তখত প্রমাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাকে লিখিত এই শেষ চিঠিটি পুলিসের হাতে দেখিয়া তিনি আদালতে মুচকি হাসি হাসিয়াছিলেন।

তিনি কয়েকবার জেলে যান। শেষের দিকে যখন একবার তাঁহাকে দয়া করিয়া জেল হইতে খালাস দিবার কথা হয়, তখন তিনি বলেন, "আমি চাই না, যে, আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করা হয়।"

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার পর, যখন বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ ও স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের সঙ্কল্প অসহযোগীরা করেন, তখন শুনিয়াছি তাঁহার নিজের পরিধেয়ই দশহাজার টাকার ভস্মীভূত হয়। পরিবারবর্গের পরিধেয় কত টাকার পুড়িয়াছিল জানি না।

এলাহাবাদে আনন্দভবনের হাতা বিস্তীর্ণ। সাবেক আনন্দভবন এখন স্বরাজভবন নামে পরিচিত ও পুলিসের হস্তগত। তাহা তিনি কংগ্রেসকে দান করিয়াছিলেন। অতবড় ঘরবাড়ি ও হাতা রক্ষা করিবার মত আয় দেশ-সেবায় আত্মোৎসৃষ্ট পুত্র জবাহরলালের থাকিবে না বলিয়া তিনি বলিতেন, পুত্রের জন্য একটি কুটীর (cottage) নির্ম্মাণ করাইয়াছেন! উহাই বর্ত্তমান আনন্দভবন।

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু মহাশয় স্বদেশের কেবল রাষ্ট্রীয় মুক্তিই চাহিতেন না। কেবল তাহা চাহিলেও যে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন ব্যতিরেকে তাহা পাওয়া যাইবে না, ইহা তিনি জানিতেন। এইজন্য তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কলিকাতায় তাঁহার অভিভাষণে "গঠনমূলক" কার্য্যতালিকায় সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। তিনি কেবল মতে নহে, কার্য্যেও সমাজসংস্কারক ছিলেন। লাহোরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে "জাত-পাত-তোড়ক" (জাতিভেদ ও পংক্তিভেদের উচ্ছেদসাধক) কন্‌ফারেন্সে জাতিভেদের উচ্ছেদের সমর্থন করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "আমার বয়স এখন ৬৯; ১৮ বৎসর বয়স হইতেই আমি জাতিভেদ ও পংক্তি-ভেদ না মানিয়া চলিতেছি।"

তিনি সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় ভাবের উচ্ছ্বাস থাকিত না। যাহা বলিতেন, যুক্তির সহিত বিশদভাবে বলিতেন।

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর মৃত্যুতে শোকের চিহ্নস্বরূপ এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য নানা স্থানে নানা জনে নানা রূপ আচরণ ও ব্যবস্থা করিবেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রেরাও তাহা করেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ছুটি দেওয়াকে তিনি ভাল মনে করেন না। আমাদের ইহার উপর এইটুকু বক্তব্য আছে, যে, হবিষ্যান্ন-গ্রহণের জাতীয় প্রথা আমাদের পরিত্যাগ করিবার কোন হেতু নাই।

—

ইংরেজদের স্বার্থসংরক্ষণের প্রস্তাব

গোলটেবিল বৈঠকের কাজ কতকগুলি সাব-কমিটির দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভাবে করা হইয়াছিল। সংখ্যান্যূনদের জন্য কি কি ব্যবস্থা হওয়া দরকার, তাহা ঠিক করিবার জন্য যে সাব-কমিটি হয়, তাহার রিপোর্টের চৌদ্দ ধারাটির মুসাবিদা নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে :—

"At the instance of the British commercial community the principle was generally agreed to that there should be no discrimination between the rights of the British Mercantile community, firms and companies trading in India and the rights of India-borns and that an appropriate convention based on reciprocity should be entered into for the purpose of regulating these rights. It was agreed that the existing rights of the European community in India in regard to criminal trials should be maintained."

এই ধারাটির তাৎপর্য্য এই, যে, ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের ও ভারতীয়দের অধিকারে কোন পার্থক্য থাকিবে না, এবং ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচারে তাহাদের এখন যে-সব বিশেষ অধিকার আছে, তাহা রক্ষিত হইবে।

ভারতবর্ষের পণ্যশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য ইংলণ্ডে কিরূপ শুল্ক বসাইয়া ও আইন করিয়া নষ্ট করা হয়, তাহা সংক্ষেপে বামনদাস বসু মহাশয়ের "রুইন্ অব্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্" পুস্তকে লেখা আছে। ভারতবর্ষেও কোম্পানীর আমলে যাহা করা হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের কোন সত্য ইতিহাস পড়িলে তাহা হইতে জানা যাইবে। ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের মহারাণীর হাতে আসে, তখন ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যশিল্প ধ্বংসের পথে এতটা অগ্রসর হইয়াছিল, যে, বিলাতী ব্যবসাদার ও বিলাতী পণ্যদ্রব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া কোন আইন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের, খনি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন বিক্রী এবং রেলে পাঠাইবার, আরণ্য বৃক্ষ, লতাতৃণাদি আহরণের, চা কফি রবারের বাগান করিবার, বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানী রপ্তানী করিবার, রেলে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার, ব্যাঙ্কের ও অন্যান্য নানা রকমের সুবিধা দিবার ক্ষমতা যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে আছে, তাহারা ইংরেজ হওয়ায় এবং গবর্ন্মেণ্টও ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট হওয়ায় ইংরেজরা ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে খুব বেশী সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ এবং ভারতীয় জাহাজের দ্বারা যাত্রী ও মাল বহন কোম্পানীর আমল হইতে নানা বাধা বশতঃ খুব কমিয়া আসিয়াছে। এ বিষয়ে চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয়েরা আর পূর্ব্ব অবস্থায় পৌছিতে পারিতেছে না।

এখন যদি ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য, পণ্যদ্রব্যের কারখানা, ভারতীয় জাহাজ, ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে সেই সব বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, যাহা ইংরেজদের কারবার আদি এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদি এখন বিলাতী জিনিষসকলের উপর সেইরূপ বেশী পরিমাণ শুল্ক বসান হয় যেরূপ শুল্ক বিলাতে ভারতীয় জিনিষের উপর একদা বসান হইয়াছিল, এবং যদি এখন ভারতীয় জাহাজসকলকে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলেই ভারতে বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বরাজ স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষ দারিদ্র্য-দশা হইতে আবার স্বচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। নতুবা রাষ্ট্রীয় স্বরাজ ফাঁকা কথা মাত্র হইবে।

অসাম্যের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া ইংলণ্ডকে ধনী করা হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষে কেবল মাত্র ভারতবর্ষের লোকদিগকে এমন কতকগুলি অধিকার দেওয়া চাই, যাহা বিদেশীরা ভোগ করিতে পাইবে না। নতুবা প্রকৃত সাম্য স্থাপিত হইতে পারিবে না। দুজন লোকের মধ্যে একজন আর

একজন লোককে গর্ত্তে পতিত দেখিয়া যদি বলে, অতঃপর তোমার আমার অবস্থা ও অধিকার সমান অর্থাৎ বর্ত্তমানবৎ হওয়া চাই, তাহা হইলে সেরূপ সাম্য কেমন অদ্ভুত শুনায়! সেরূপ সাম্যের ফল এই হইবে, যে, গর্ত্তে পতিত ব্যক্তি গর্ত্তেই থাকিবে, এবং অপর ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে যেখানে সেখানে গিয়া যদৃচ্ছা ধনসম্পদ আহরণ করিতে পারিবে। আমরা ইংরেজদিগকে তাহাদের স্বদেশে গর্ত্তে ফেলিতে চাহিতেছি না। আমরা কেবল এই চাহিতেছি, যে, আমাদের দেশে আমরা গর্ত্ত হইতে উঠিয়া খাইবার পরিবার, সভ্য সমুন্নত জীবনযাপন করিবার মত বিত্ত আহরণ যেন করিতে পারি, এবং সমানভাবে বা পরোক্ষভাবে (প্রতিযোগিতার দ্বারা) কোন বিদেশী তাহাতে বাধা দিতে যেন না পারে, প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই কোন-না-কোন সময়ে প্রয়োজনমত স্বদেশী বাণিজ্য ও শিল্পকে রক্ষা করিবার ও উৎসাহ দিবার জন্ত বৈদেশিকদের প্রতিযোগিতা হইতে তাহাকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা করিবার অধিকার আমরা লাভ করিতে না পারিলে, আমরা যেমন পরাধীন আছি তেমনি পরাধীনই থাকিয়া যাইব। দারিদ্র্যও আমাদের ঘুচিবে না।

ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের সময় যে বিশেষ অধিকার তাহাদের আছে, সেইরূপ অধিকার ইউরোপীয়েরা জাপান চীন তুরস্ক পারস্ত প্রভৃতি দেশে বলপূর্ব্বক ভোগ করিত। কিন্তু ঐসব দেশ যেমন যেমন প্রবল ও প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়াছে, তেমনি তথায় তাহাদের ঐ প্রকার তথাকথিত "অধিকার" লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সব দেশে ইংলণ্ডীয় আইন, ইংলণ্ডীয় বিচারপ্রণালী এবং ইংলণ্ডীয় রীতিতে শিক্ষিত বিচারক ছিল না ও নাই। তথাপি ইউরোপীয়দের "অধিকার" লুপ্ত হইয়াছে। কারণ স্বাধীন যাহারা, তাহারা অন্ত কোন দেশের মানুষ মাত্রকেই শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্বীকার করিয়া আত্মাবমাননা করিতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা আমাদের অপমানের বিষয়। স্বরাজলাভের চেষ্টার মূলে কারণীভূত ও প্রবর্ত্তক যে সব ভাব আছে, বিদেশীদের সহিত সাম্য স্থাপন করিয়া আত্মাবমাননা হইতে মুক্তিলাভ তাহার মধ্যে অন্যতম। অসাম্যের অপমান যদি থাকিয়াই যায়, তাহা হইলে "স্বরাজ" কথাটা লইয়া আমরা কি করিব?

—

সাইমনের জিত

সাইমন কমিশনের সভ্যদিগকে, অন্ততঃ স্তার জন সাইমনকে, যাহাতে গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য করা হয়, তাহার জন্য বিলাতে আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ন্মেন্টের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা চতুর লোক বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই। ইহাও বলা হইয়াছিল, যে, ঐ বৈঠক স্বাধীন বৈঠক হইবে, অর্থাৎ সাইমন কমিশনের রিপোর্টে বা তাহার উপর ভারত গবর্ন্মেন্টের বিস্তৃত মন্তব্যে যে-সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, গোলটেবিল কন্‌ফারেন্স সেই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বা তাহার দ্বারা চালিত হইতে বাধ্য থাকিবে না। ভারতবর্ষে মডারেট নেতাদের মধ্যে সাইমন কমিশন বর্জ্জনে স্তার তেজ বাহাদুর সাপ্রু সকলের চেয়ে বেশী জিদ ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্যতঃ যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাইমনেরই জিত হইয়াছে এবং তাহা বুঝিতে না পারিয়া কিম্বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার নিমিত্ত ডাঃ সাপ্রু প্রভৃতি গোলটেবিল-ওয়ালারা তাহাকে নিজেদেরই কৃতিত্ব ও জিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকে ইংরাজীতে নিয়তির পরিহাস বলে।

সাইমন কমিশন যতগুলি রিজার্ভেশ্যন চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ যতগুলি রাষ্ট্রীয় বিষয় ও তৎসম্বন্ধীয় ক্ষমতা ইংরেজ গবর্ন্মেন্টের অর্থাৎ বড়লাট ও তাঁহার পরিষদদের হাতে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার ইহুদী ধর্ম্মভাই লর্ড রেডিঙের সকৌশল চেষ্টায় কার্য্যতঃ তৎসমুদয়ই বড়লাটের হাতে রাখিবার প্রস্তাব গোলটেবিল বৈঠকের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। একদিকে কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্ন্মেন্টের কার্য্যে মন্ত্রীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী করিবার সিদ্ধান্ত ভেল্কী বা কথার কথা মাত্র হইবে;

অন্য দিকে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুসলমান ও অমুসলমান ভারত, ইংরেজশাসিত ভারত ও দেশী নৃপতিদের দ্বারা শাসিত ভারতে বিভক্ত হইবে। তাহার উপর আবার ব্যবস্থাপক সভাগুলা ছুটা করিয়া কামরাতে (চেম্বারে) বিভক্ত হইবে। একটাতে বসিবেন জমিদার ও ধনীরা, অন্যটাতে বসিবেন "সাধারণ" লোকদের প্রতিনিধিরা। ব্যবস্থাপক সভার প্রথম কামরা দ্বারা দ্বিতীয় কামরাকে বাগে রাখা হইবে। এই প্রকারে বিভক্ত ও হৃতশক্তি ভারতের উপর বিলাতী সামরিক আপিস, বৈদেশিক আপিস, ইণ্ডিয়া আপিস, লণ্ডনের ব্যাঙ্কারগণ, ল্যাঙ্কেশায়ারের তন্তুবায়কুল ও অন্যান্য শায়ারের অন্যান্য কারখানাওয়ালারা, এবং জাহাজওয়ালা ইঞ্চকেপ ও অন্যান্য ব্রিটিশ বণিকেরা বর্ত্তমান সময়ের চেয়ে অধিক নিশ্চিন্তভাবে ভারতশাসন করিবে। এইরূপ শাসন দ্বারা শোষণেরও সাহায্য হইবে। অবশ্য, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা ঘটিবেই এমন নয়। যদি গোল-টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ অনুসারে কাজ হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমেরিকার লোকমত অনেকটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া পড়ায়, আমেরিকার চোখে ধূলা দেওয়ারও প্রয়োজন হইয়াছে। মেকি ফেডারেশ্যন ও মেকি য়্যাসেম্ব্লী দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে।

ইহা সত্ত্বেও "বুদ্ধিমান্" অনেক ভারতীয়কে লর্ড রেডিং প্রভৃতি বোকা বানাইতে পারিয়াছেন, এবং যাঁহারা নিজে বোকা বনিয়াছেন, তাঁহারা আবার অন্য ভারতীয়-দিগকে নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টা করিবেন। পোষা হাতী ভিন্ন স্বাধীন আরণ্য হস্তী ধরা যায় না।

—

ব্রহ্মদেশ পৃথক্করণ, ও ফেডারেশ্যন

ব্রহ্মদেশীয় লোকদের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সঙ্কল্পের মধ্যে আর্থিক দুটি উদ্দেশ্য আছে। ব্রহ্মদেশ ২,৩৩,৭০৭ বর্গ মাইল, বাংলাদেশ ৭৬,৮৪৩ বর্গ মাইল। বঙ্গের তিনগুণ বড় ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা মোটে ১,৩২,১২,১৯২ অর্থাৎ বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এই বৃহৎ দেশের বহুমূল্য খনিজ, আরণ্য ও কৃষিজাত সম্পত্তি ব্রহ্মদেশীয়েরা এখন নিজেদের হস্তগত করিতে খুব কমই পারিতেছে, কিন্তু কালক্রমে পারিবে। তাহার পূর্ব্বেই ইউরোপীয়েরা তাহা যথাসম্ভব গ্রাস করিতে চায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা এখনও জাগে নাই, তাহাদের লোকমত এখনও প্রবল হয় নাই; তাহারা ইউরোপীয়দের কোন অভিসন্ধি ও কার্য্যের ভাল করিয়া প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ। ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের দেশ যুক্ত থাকিলে ভারতীয়দের দ্বারা অন্ততঃ এই প্রতিবাদের কাজ কতকটা হইতে পারে। তা ছাড়া, ভারতীয়েরা সামান্য ভাবে হইলেও ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করে। ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিবার ইহা একটি কারণ।

ইংরেজদের যে-সব জাহাজ ভারত-সাম্রাজ্যের উপকূলের নিকট দিয়া যাত্রী ও মাল বহন করে, ভারতীয় বন্দরগুলি হইতে ব্রহ্মের বন্দরে যাতায়াত তাহাদের একটি প্রধান লাভের উপায়। এই উপকূল বাণিজ্য কেবল ভারতীয়দের একচেটিয়া করিবার নিমিত্ত আইন করাইবার চেষ্টা হইতেছে। সেরূপ আইন হইলে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে জাহাজ চালাইয়া ইংরেজরা লাভ করিতে পারিবে না, কারণ এখন ব্রহ্ম ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু উহাকে যদি ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য আইন ব্রহ্মদেশযাত্রী জাহাজের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারিবে না; সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে জাহাজ চালাইবার লাভজনক ব্যবসা ইংরেজদের হাতে থাকিতে পারিবে। ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিবার ইহা দ্বিতীয় প্রধান আর্থিক কারণ।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিলে ইংরেজদের প্রভুত্ব রক্ষার একটি উপায়ও পরোক্ষভাবে অবলম্বিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ-শাসিত ব্রহ্মদেশ সম্বলিত ভারতবর্ষের আয়তন ১০,৯৪,৩০০ বর্গ মাইল, এবং দেশী রাজ্যগুলির মোট আয়তন ৭,১১,০৩২ বর্গ মাইল; অর্থাৎ

দেশী রাজ্যগুলির আয়তন ব্রিটিশ ভারতের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ। ব্রহ্মদেশের আয়তন ২,৩৩,৭০৭। ইহা ব্রিটিশ ভারত হইতে পৃথক্ হইয়া গেলে ও বাদ পড়িলে ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ৮,৬০,৫১৩ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উহার আয়তন দেশী রাজ্যগুলির প্রায় সমান হইয়া যাইবে। ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যাও, ব্রহ্মের লোকসংখ্যা বাদ পড়িলে, কমিয়া যাওয়ায় এখন ব্রিটিশ ভারতের ও দেশী রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যায় যত বেশী তফাৎ আছে, তত বেশী তফাৎ থাকিবে না। সুতরাং দেশী রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতকে একত্র করিয়া ফেডারেটেড ভারতবর্ষ গঠন করিয়া তাহার জন্য যে ফেডারেল এসেম্ব্লী স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে দেশী নৃপতিরা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবার দাবি করিতে পারিবেন। তাঁহারা বলিতে পারিবেন, "আমাদের রাজ্যগুলি আয়তনে প্রায় ব্রিটিশ ভারতেরই সমান, এবং আমাদের প্রজাদের সংখ্যাও ব্রিটিশ ভারতের লোকসমষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অতএব এসেম্ব্লীতে আমরা উহার অর্দ্ধেক, অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সভ্য আমাদের প্রতিনিধি রূপে পাঠাইতে অধিকারী।" অতএব এই এসেম্ব্লীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি দেশী রাজ্যের নৃপতিরা পাঠাইবেন। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের রকম ।৵০ আনা ৪ পাই মুসলমানেরা চাহিয়াছেন। তাঁহারা তাহা না পাইলেও, হয়ত সিকি পাইবেন। তাহা হইলে এসেম্ব্লী ($\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$) অর্দ্ধেক সভ্য দেশী নৃপতিদের ও মুসলমানদের প্রতিনিধি হইবেন। ইঁহারা অনেকটা ইংরেজদের মতানুবর্ত্তী হইবেন। তা ছাড়া ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের ও ফিরিঙ্গীদেরও জনকতক প্রতিনিধি থাকিবে; তাঁহারাও ইংরেজ গবর্মেণ্টের মতানুবর্ত্তী হইবেন। সুতরাং ভারতীয় অধিকাংশ লোকের যাহা মত, তাহাকে জয়যুক্ত করা এরূপ এসেম্ব্লীতে সহজ হইবে না।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। গোলটেবিল বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, এসেম্ব্লীর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে এসেম্ব্লীর মোট সভ্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দেওয়া চাই। কিন্তু অর্দ্ধেক, অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ, সভ্য সর্ব্বদাই গবর্মেণ্টের ও মন্ত্রীদের পক্ষে থাকিবার কথা। সুতরাং গবর্মেণ্টের প্রিয় ও ধামাধরা কোন মন্ত্রী-সমষ্টিকে তাড়ান দুঃসাধ্য হইবে। এইজন্যই আমরা গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবানুযায়ী এসেম্ব্লীকে ও লোকপ্রতিনিধিসমূহের নিকট মন্ত্রীদের দায়িত্বকে মেকি বলিয়াছি।

—

কংগ্রেস ও গোলটেবিলের প্রস্তাবসমূহ

কংগ্রেসের নেতারা যাহাতে গোলটেবিলের প্রস্তাব-সমূহ সম্বন্ধে অবাধে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করিতে পারেন, তাহার জন্য বড়লাট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদিগকে জেল হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও মুকুন্দরাম রাও জয়াকর তাঁহাদিগকে তারযোগে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের বক্তব্য না-শুনা পর্য্যন্ত কংগেস-নেতারা যেন গোলটেবিলের নির্দ্ধারণসমূহ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ না করেন। এখন তাঁহারা বিলাত হইতে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখন শীঘ্রই সকলের সম্মিলিত আলোচনা হইবে। আলোচনার ফলে কংগেস-নেতারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু জেল হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর ইতিমধ্যেই মহাত্মা গান্ধী যাহা বলিয়াছেন এবং অন্য কোন কোন নেতাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয়, কংগ্রেস-নেতারা গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহকে "স্বাধীনতার সার অংশ" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সিদ্ধান্তগুলা স্বরাজের ছায়া বটে, কিন্তু কায়া নহে।

গোলটেবিলের প্রস্তাবগুলি শান্তভাবে বিবেচনা করিবার ব্যাঘাতও রহিয়াছে। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী এখনও কারাগারে বন্দী রহিয়াছেন, এখনও পুলিস লাঠি চালাইতেছে, এখনও তাহাতে পুরুষ-নারী বালক-বালিকা আহত হইতেছে। পিকেটিঙের জন্য এখনও

অনেককে জেলে পাঠান হইতেছে। দমন ও নিগ্রহ নীতির অনুসরণ বন্ধ না করিলে, অন্ততঃ স্থগিত না রাখিলে, কেমন করিয়া সন্ধির সর্ত্ত আলোচিত হইতে পারে?

—

বড়লাটকে মহাত্মা গান্ধীর চিঠি

খবরের কাগজে দেখিলাম, মহাত্মা গান্ধী পুলিসের অত্যাচারের বাছা বাছা ছয়টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বড়লাটকে চিঠি লিখিয়াছেন, এবং এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, তিনি এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত করান। শুনা যায়, বড়লাট রাজী হইলে গান্ধীজী স্বয়ং সাক্ষী উপস্থিত করাইবেন। গবর্ন্মেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি-না, এই প্রস্তাবে বড়লাট রাজী হওয়া-না-হওয়া হইতে গান্ধীজী তাহা বুঝিতে পারিবেন।

—

লাঠি ও স্বাধীনতা-ঘোষণা দিবস

গত স্বাধীনতা-ঘোষণা দিবসের উৎসব উপলক্ষ্যে যে-সব সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল, তাহার উপর কোথাও কোথাও পুলিস লাঠি চালাইয়াছিল। কলিকাতায় এইরূপ লাঠি-প্রয়োগে মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্য অনেক ভদ্রলোক এবং অনেক ভদ্রমহিলাও আহত হইয়াছেন। অধিকন্তু সুভাষবাবু পুলিসের হুকুম অমান্য করিয়া সভা ও মিছিল করা এবং দাঙ্গা করা অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সুভাষবাবু পুলিসের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি দাঙ্গা করিতে গিয়াছিলেন, ইহা কি পুলিসের লোকেও বিশ্বাস করে?

—

লাহোরে সমগ্র ভারতের ও সমগ্র এশিয়ার নারীদের কন্‌ফারেন্স

প্রবাসী মাসিক কাগজ হইলেও ইহার কিয়দংশে খবরের কাগজের ন্যায় চলতি রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি। কখন কখন এমন-সব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে, যে, সংক্ষেপে কিছু লিখিয়াও তাহাদের সবগুলির সম্বন্ধে লেখা হয় না। আজকাল সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে সামান্য কিছু লিখিতে গিয়াও সময় ও পাতা ফুরাইয়া আসিতেছে। সেই জন্য অরাজনৈতিক কোন কোন অতীব প্রয়োজনীয় ঘটনা সম্বন্ধেও কিছু লিখিতে পারিতেছি না।

লাহোরে সমগ্র ভারতের নারীদের এবং সমগ্র এশিয়ার নারীদের কনফারেন্স দুটি এইরূপ ঘটনা। এই দুটি কন্‌ফারেন্স নারীদের জাগৃতির পরিচায়ক।

ভারতমহিলাদের কন্‌ফারেন্সে মান্দ্রাজের ডাক্তার শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্‌ডী সভানেত্রীর কাজ করেন। তিনি মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী দমন ও নিগ্রহনীতির প্রতিবাদকল্পে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজের ঘৃণ্য দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে আইন করাইয়াছেন এবং শিশুদের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতমহিলাদের কন্‌ফারেন্সে অনেকগুলি হিতকর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

বহুবিবাহ প্রথা ও নারীদের অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল করিবার চেষ্টা করা হউক। প্রত্যেক প্রদেশে পতিতা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম স্থাপনের চেষ্টা করা হউক; নারী ও বালিকাদিগকে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার ব্যবসা বন্ধ করিবার চেষ্টা হউক; বেশ্যালয় বন্ধ করিবার আইন হউক এবং যেখানে এরূপ আইন আছে সেখানে আইন অনুসারে কাজ করাইবার জন্য মহিলা অফিসার নিয়োগ করা হউক; এই কন্‌ফারেন্স দৃঢ় বিশ্বাস করেন, যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ম্যুনিসিপালিটী ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিনিধি সভাসমূহে, শিশুদের ও নারীদের ইষ্টানিষ্ট যাহাদের সহিত জড়িত এরূপ কমিশন ও কমিটি সমূহে যথেষ্টসংখ্যক নারী প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক;

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে এই অনুরোধ করা যাইতেছে, যে, তাহারা নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু আইনের বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ ভাবে সংশোধন করা হউক যাহাতে উহা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হয়; মুসলমান নারীদের অধিকার সম্বন্ধে কোরাণে যাহা ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমান মুসলমান লোকাচারের পরিবর্ত্তে তাহা প্রচলিত করা হউক; নগর ও গ্রামসমূহের অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়া তাহার উন্নতি করা হউক; শ্রীযুক্ত বসুখম্ চেট্টি "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়"দের অভাব অভিযোগ দূর এবং অন্য সকলের সহিত সমানাধিকার স্থাপনার্থ যে বিল পেশ করিয়াছেন, কন্‌ফারেন্স তাহা সমর্থন করেন; সমুদয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আদি স্থানীয় প্রতিনিধি সভাকে ও মহিলাসমিতিসমূহকে কন্‌ফারেন্স অনুরোধ করিতেছেন, যে, তাঁহারা যেন প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং তদর্থে সিনেমা, চলন্ত লাইব্রেরী প্রভৃতির আয়োজন করেন; সকল শ্রেণীর ও জাতির বালিকাদিগকে যেন একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে পরস্পরকে বুঝিবার সুবিধা হয় এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির একতা সর্ব্বত্র নারীসমাজে লক্ষিত হয়; কন্‌ফারেন্স বালক ও বালিকাদের বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তিদানের বিরোধী, এবং সর্ব্বত্র কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ শাস্তিনিষেধক আইন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তখন জেলে থাকিলেও, সমগ্র এশিয়ার নারীদের কন্‌ফারেন্সের তিনিই সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। পারস্য দেশের এক মহিলার প্রস্তাবে এই নির্ব্বাচন হয়। তাহার পর কন্‌ফারেন্সের এক এক দিনের অধিবেশনে এক এক দেশের কোন মহিলা সভানেত্রীর কাজ করেন।

এই কন্‌ফারেন্সে অনেকগুলি অতীব প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। কতকগুলির বিষয় নীচে উল্লিখিত হইতেছে।

বালকবালিকাদের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা; সন্তানদের অভিভাবকত্বে এবং সম্পত্তির উপর নারীদের সমান অধিকার; স্কুলসমূহে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের নেতাদের জীবনচরিত ও উপদেশ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান, যদ্দ্বারা সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়; জাপান ভিন্ন এশিয়ার অন্য সব দেশকে স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য এবং দেশী চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে গবেষণাগার স্থাপনার্থ অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ; সকল দেশে দেশের লোকদের নিকট সম্পূর্ণরূপে দায়ী গবর্মেণ্ট স্থাপন।

ইহা ব্যতীত নানা দেশে বিবাহ-প্রথা ও নারীদের অধিকার সম্বন্ধে সেই সেই দেশের প্রতিনিধিস্থানীয়া মহিলাদের দ্বারা কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা হয়। জাভা হইতে দুটি মহিলা আসিয়াছিলেন; কিন্তু কন্‌ফারেন্সের কার্য্যের সহিত কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলার যোগ থাকায় তাঁহারা কন্‌ফারেন্সে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে অস্বীকার করেন।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর যে বিভাগে কৃষির, পল্লী-স্বাস্থ্যের ও নানাবিধ গ্রাম্য কুটীরশিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে এবং পল্লীগ্রামগুলিকে আবার শ্রীসম্পন্ন ও আনন্দময় করিবার প্রযত্ন হইতেছে, তাহা সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতনে অবস্থিত। গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে মাঘ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনিকেতনে উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়াছিল এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনীও বসিয়াছিল। প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মী ও ছাত্রেরা নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

বয়ন-বিভাগে যতরকম ধুতি শাড়ী ছিটের কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সতরঞ্চ, গালিচা, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কি প্রকারে আসন, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা প্রদর্শনীক্ষেত্রে দেখান হয়। তুলা পাঁজ করিবার, টানা দিবার এবং

অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী দেখান হইয়াছিল। পল্লীগ্রামসকলের উন্নতি বিধানের জন্য যত প্রকার কাজ করা হইতেছে, রঙীন ছবির সাহায্যে তাহা বুঝান হয়। এইরূপ বাটটি ছবি প্রদর্শনীর চালার দেওয়ালে ঝুলান ছিল। পল্লীসংগঠন বিভাগের ব্রতী বালকদের নানাপ্রকার সংগ্রহ দেখান হয়। বহুবিধ বন্য ও উদ্যানজাত ফুল নাম ও ব্যবহার সহ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিলাম। ইহা উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ, চিকিৎসক, কবি, উদ্যানরচনাকারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের কাজে লাগিবে এবং অন্যেরাও ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন। আর একটি সংগ্রহও বেশ ভাল, এবং তাহা লাভজনকও হইতে পারে। একটি বড় মোটা কাগজের খাতার পাতায় অনেক রকমের কাপড়ের নমুনার টুকরা, দাম, উৎপত্তিস্থান প্রভৃতি সহ আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রতী বালকদের তৈরি কাঠের জিনিষ, আসন, ঝাড়ন, তাহাদের অঙ্কিত বীরভূম জেলার মানচিত্র ও তাহাতে মেলার ও তীর্থের স্থান প্রভৃতির সমাবেশ, এবং বীরভূম জেলার নানাবিধ তথ্যপূর্ণ হস্তলিখিত পুস্তক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের দ্বারা উৎপন্ন নানাবিধ তরকারীও বেশ হইয়াছিল।

পল্লী-বিভাগের মহিলা সমিতির নানাপ্রকার সূচের কাজ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপ কাজ করিয়া কয়েকজন অন্তঃপুরিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। কাজগুলি সুন্দর বলিয়া অনেক বিক্রীও হইয়াছিল।

কর্ম্মকার-বিভাগে গৃহস্থালীর জন্য আবশ্যক নূতন রকমের লোহার চুল্লী প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। এই বিভাগে গ্রামের দশজন ছেলে শিক্ষা পাইতেছে।

গালার তৈরি অনেকগুলি জিনিষ এবং লাক্ষালিপ্ত (lacquered) কাঠের বাক্স, টেবিল, আয়নার ফ্রেম প্রভৃতি খুব সুন্দর হইয়াছে। শ্রীনিকেতনের চর্ম্মকার-বিভাগে সুন্দর চামড়া কষ হইতেছে এবং চামড়ার মনিব্যাগ, চেয়ারের গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

নূতন নূতন ডিজাইনে বাঁধা পুস্তকও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এবারকার ব্রতী বালকদের বার্ষিক সম্মিলনীতে বীরভূম জেলার মোট ১২টি দলের ৩০০ জন বালক যোগ দিয়াছিল। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিযোগিতা করিয়াছিল এবং যোগ্যতম বালকেরা পুরস্কার পাইয়াছিল। (১) সংগ্রহ ও তথ্যসংগ্রহ—(ক) ফুল, (খ) নানাপ্রকার কাপড়ের নমুনা, (গ) বীরভূম জেলার তথ্য। (২) হাতের কাজ—(ক) বয়ন, (খ) কাঠের কাজ। (৩) খেলাধুলা—(ক) ড্রিল (আদেশগুলি সব বাংলায় দেওয়া হয়); (খ) তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ; (গ) সন্তরণ; (ঘ) বাধা অতিক্রম করিয়া দৌড়; (ঙ) অন্যান্য খেলা; (চ) টেকো দ্বারা সুতা কাটা।

ইহা ছাড়া শ্রীনিকেতনের ব্রতী বালকেরা লাঠি ও ছোরা খেলা, পোল ও আইরিশ ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি দেখাইয়াছিল। এ বৎসর ব্রতী বালকদের প্রতিযোগিতায় শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের দল মোটের উপর সর্ব্বপ্রথম হওয়ায় ব্রতী বালকদিগের পতাকা লাভ করে। ২৫শে মাঘ রাত্রে শ্রীনিকেতনের ব্রতী বালকদল রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" নাটক অভিনয় করিয়া সমবেত জনগণকে পরিতৃপ্ত করে।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাঘ সংখ্যার ৬০৫ পৃষ্ঠার "পথহারা" নামক কবিতাটির দ্বিতীয় পংক্তিতে মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ "নাথ" কথাটি বসিয়া গিয়াছে। কথাটি উঠিয়া যাইবে। লাইনটি হইবে, 'আলেয়া-আলোয় যে ফিরেছে পথে ফিরিবার পথ নাই যে তার।'

রাজকুমারী

প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
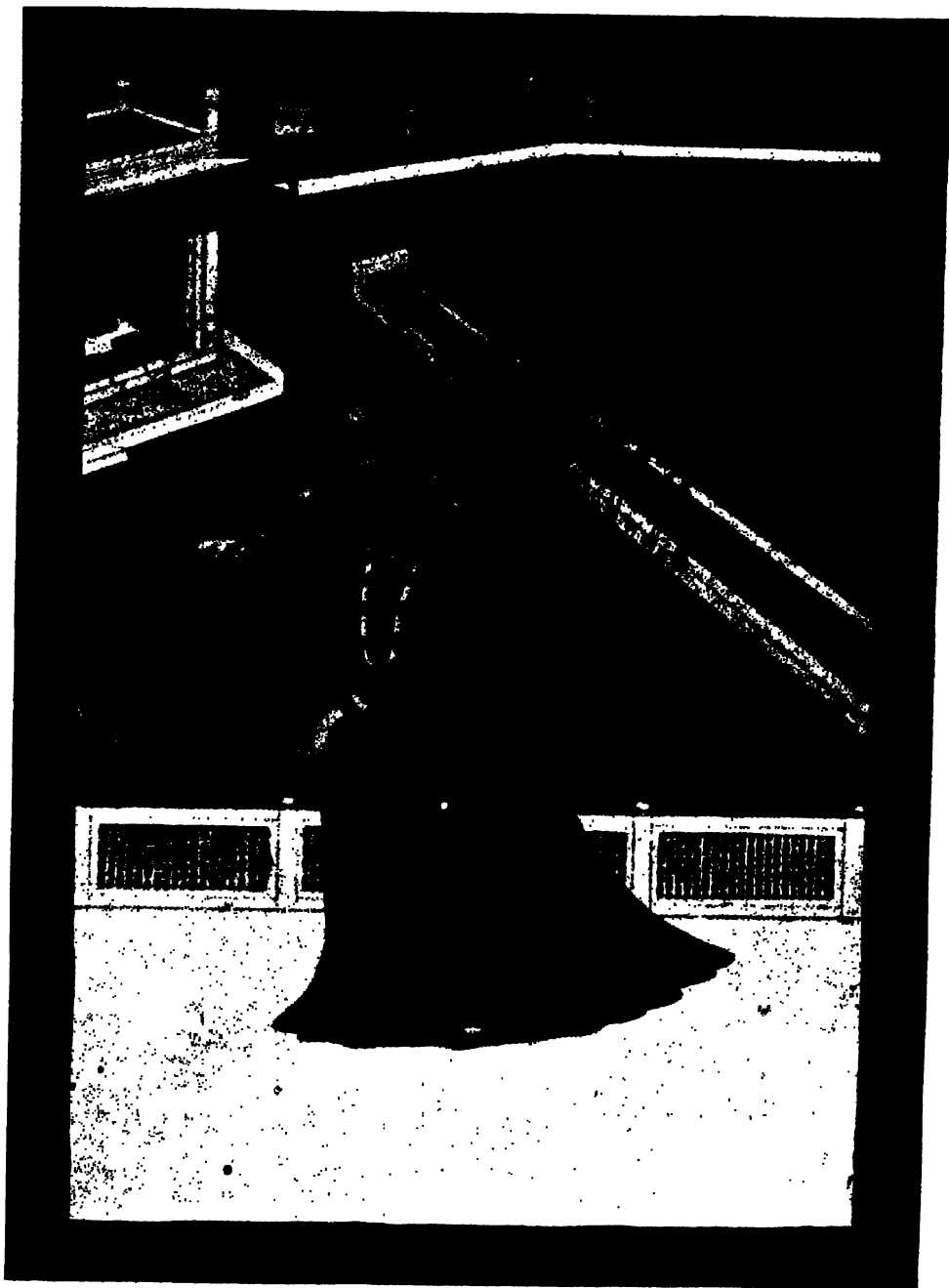
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাংলার প্রাণবস্তু

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বিয়ের রাতে বরযাত্রীরা এসে পৌছলেন না। তখন সমাজপতিরা সবাই বা'র হলেন গ্রামের মধ্যে বিরোধ করতে অক্ষম গোবেচারী রকমের মানুষ কে আছে তাকে ধর-পাকড় ক'রে কোনো মতে দায়টা উদ্ধার করা যায় কি না তাই দেখতে। যোগ্যতার বিচার তখন আর করা চলে না। আপনারা সবাই আমাকে ঠিক সেই ভাবেই ধরেছেন। যোগ্যতার বিচার করবার অবসর আপনাদের নেই; আর এটাও জানেন যে. আপনাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত সামর্থ্য আমার নেই।

যে উৎসবক্ষেত্রের সেবায় আমাকে আপনারা ডাক দিয়েছেন সেখানে সমাগত মুক্ত সব বড় বড় পণ্ডিতজনের—ভারী ভারী সব গ্রন্থওয়ালা মানুষের দল। ভাগ্যের বিপাকে দিনে দিনেই আমাকে গ্রন্থের জগৎ থেকে সরে যেতে হচ্ছে দূরে। জীবনের আরম্ভ করেছিলাম গ্রন্থেরই জগতে এবং গ্রন্থকেই জেনেছিলাম জীবনের শেষ লক্ষ্য। কিন্তু ঘটনার দুর্বিপাকে যে-পথে এগিয়ে গেলাম সে পথের সন্ধান গ্রন্থে তো কিছুই নেই। মঠে আখড়ায় সাধু ভক্তদের কাছে ছেঁড়াখোঁড়া যা-কিছু লেখা মেলে তাও সব অশিক্ষিত সাধকদেরই বাণী—সামান্য একটু লিখতে যাঁরা জানেন তাঁরাই লিখে রেখেছেন। নিরক্ষর গ্রন্থহীন মানুষের পথে ঘুরে ঘুরে আপনাদের মত পণ্ডিতজনের দরবারের দাবি যে আমি খুইয়ে বসেছি। তাইতো বড় সঙ্কোচে আমাকে এখন কথা কইতে হয়।

এই মণ্ডলীতে সঙ্কোচ হলেও আমার নিজের মনের মধ্যে কোন খেদ নেই। কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হ'ল মানুষকে ঠিক ক'রে জানা ও মানুষকে ঠিক ক'রে জানানো। শুধু গ্রন্থ দিয়েই কি মানুষের অন্তরের সব কথা মানুষ ধরতে পেরেছে? মানুষের আশা আকাজ্ঞা, সাধনা সিদ্ধি, সুখ দুঃখ, প্রেম অনুরাগ, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম ধর্ম্ম, স্খলন পতন, বিদ্রোহ নিষ্ফলতা, একি সবই গ্রন্থে ধরা দিয়েছে? তার ইতিহাস বা কাল্‌চ্যারের কতটাই বা গ্রন্থে মেলে? য়ুরোপে যে সেখানকার মানুষের নানাবিধ তত্ত্ব এত বেশী করে গ্রন্থে ধরা দিয়েছে, তবু সেখানে নিজেদের আরও ভাল ক'রে জানবার জন্তে মানুষের আরও কত আগ্রহ? সাধারণ লোকের গান, গল্প, নৃত্য,

কলা, রীতি, নীতি, প্রভৃতির খোঁজে নিরন্তর কত নরনারী আপনাদের ঢেলে দিয়েছেন, কত বড় বড় মহাপণ্ডিত সে জন্যে নিজেদের মহামূল্য জীবন সব ভরপুর উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন! আর তাঁদের কি চমৎকার সংগ্রহ-নীতি ও কি অপূর্ব্বভাবে তার সব প্রকাশ, তা দেখলে এদেশে আমাদের তাক্ লেগে যায়! ক্রমাগতই সেখানে মানুষের কত কত তত্ত্ব যে গ্রন্থে ধরা দিচ্চে তা ব'লে শেষ করা যায় না, তবু সেখানে মানুষের সন্ধানে মানুষের মধ্যে নিরন্তর কত খোঁজই ক্রমাগত চলছে।

আর আমাদের দেশে মানুষের কতটুকু সন্ধানই বা গ্রন্থে ধরা দিয়েছে? কত বড় এই দেশের পুরানো ভাণ্ডার! কত এর চিন্তার সম্পৎ! কত বিচিত্র এর কামনা সঙ্কল্প ও সিদ্ধি! কত গভীর সব বাণী ও ভাবব্যক্তি! মানুষে কি তার কিছুরই সন্ধান করবে না? জ্ঞানের শেষ লক্ষ্যই তো হ'ল মানুষ—গ্রন্থ পুঁথি এ সব তো মাত্র উপায়? সেই পুঁথিতেই বা সন্ধান আছে কতটুকু? প্রাচীন মুদ্রা, মন্দির, মূর্ত্তি, লিপি, শাসন—যা যেখানে মেলে সব কিছুরই খোঁজে দলে দলে লোক লেগে থাকুক, লেগে থাকাই দরকার। কিন্তু মানুষই যে সবার উপরে, সেই কথাই কি মানুষ একেবারে থাকবে ভুলে? এতে যদি খ্যাতির সম্ভাবনা না থাকে তো না-ই থাক্। বহু লোক যদি অখ্যাতই থাকে তাতেই বা ক্ষতি কি? প্রবালদ্বীপের কত স্তরই তো না-দেখা কীট-মণ্ডলের অজ্ঞাত অখ্যাত দেহ-উপহারে তৈরি। উপরের দেখা স্তরে আর তার কতটুকু অংশ?

ঘটনাক্রমে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের এই নিরক্ষর স্তরের মধ্যে নিহিত ঐশ্বর্য্যের একটু সন্ধান পাই। তার পর বিদ্যার ও পুঁথির সব সুসজ্জিত মন্দির ছেড়ে এই ধুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটিয়েছি। পুঁথি তখন হ'তে আমার গৌণ হয়ে গেল। যদিও সাংসারিক আশ্রয় হিসাবে পুঁথিপত্রকে ছাড়তে পারা গেল না, তবু অন্তরের সব রসধারা চললো তখন থেকে অন্য পথে। যে-সব নিরক্ষর আউল বাউলের মধ্যে তখন হ'তে আমার চলা-ফেরা সুরু হ'ল, তাদের আমি আমার এই দুঃখের কথা জানিয়েছি। আমার ভিতরে বাহিরে এই দ্বন্দ্বের কথা বলেছি; তাতে তাঁরা হেসে বলেছেন, "আমাদের দ্বন্দ্বটা ঠিক তোমাদের না হলেও ভিতর-বাহিরের এমন অনৈক্য, এমন ফরাকৎ ভাব আমাদের বেশ জানা আছে। এই-ই তো আমাদের 'পরকীয়' ভাব। সাংসারিক হিসাবে যিনি রাধার স্বামী তিনি কি রাধার জীবনের সকল ব্যাকুলতা পরিপূর্ণ করতে পারেন? ব্যাকুল করেছে যাঁর বাঁশী তাঁকে যে রাধার চাইই। দুনিয়ার সর্ব্বত্র দেখ্‌বে বাবা, খেতে পরতে চলতে ফিরতে সংসারের আশ্রয় বিনা চলে না; তবু সবার মনপ্রাণ ব্যাকুল করেছে সেই অজানার বাঁশী। তাঁকে না পেলে এই খেয়ে প'রে চলে ফিরে এই যে আরামের জীবন তার আগাগোড়াই মনে হয় বৃথা।"

বিনয় করতে গিয়ে এমন কি অযোগ্যতা জানিয়েও নিজের কথা যদি এখানে বেশী বলতে যাই তবে সেটা শোভন হবে না। কারণ, আপনারা তো সে-সব কথা শোনবার জন্যে আমাকে ডেকে আনেন নি। আমার শক্তি যতই কম হোক, আমার সঙ্গে এখানে মালমশলা, উপকরণ ও সময় যত কমই থাকুক, বাংলার বিভাগে যখন হুকুম করে আমাকে বসিয়েছেন তখন বাংলার কথা বলতেই আমায় চেষ্টা করতে হবে।

দেশের যে গভীর স্তরে দেশের প্রাণবস্তুটি নিহিত থাকে দীর্ঘকাল সেখানে বিচরণ করে এইটুকু বুঝেছি যে, বাংলার সাধনার ধন হ'ল 'সহজ মানুষ'। শাস্ত্র নয়, বেদ নয়, প্রথা নয়, নিয়ম নয়—মানুষই হ'ল তার সাধনার লক্ষ্য। এই মানুষের পরিচয় মেলে—ভাবে, প্রেমে। ব্যবহারে বা সামাজিক প্রভৃতি কোনো কৃত্রিম উপায়ে সে পরিচয়টি মেলে না। বরং প্রয়োজন ও ব্যবহারের তামসিক বাধায় মানুষের সহজ সাত্ত্বিক স্বরূপটি আরও আড়ালে পড়ে যায়।

সহজ হতে পারেন নি ব'লে বাংলার এই প্রাণবস্তুর সন্ধান শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের লোকেরা বড়-একটা পান নি; বেদ শাস্ত্র আচার নিয়মের কৃত্রিম বাঁধন ছাড়িয়ে যদি সহজই না হ'তে পারলেন তবে সেই সহজ মানুষের দেখা তাঁরা পাবেন কি করে? বাউল যে বলেছেন:—

"যদি ভেটবি সে মানুষে।
তবে সাধনে সহজ হ'বি, তোরে যাইতে হবে সহজ দেশে।"

এই যে সহজকে পাবার ব্যগ্রতায় বাংলা দেশের কত

সাধনধারাই যে কত মলিনতার মধ্যেও নেবে গেছে—তা কি ব'লে শেষ করা যায়? প্রবৃত্তির বেগে মানুষ কি ভুল করেই ভেবেছে এই কাম ও প্রবৃত্তির পথে ভেসে চলাই বুঝি সহজ পথ। বার-বার তাই কত কত সাধনাই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তবু কি এই পথে সাধনার কখনও বিরাম ঘটেছে? এই কারণে এই সাধনার জগতে এই বিপদটাই ছিল বাংলার প্রধান সমস্যা।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাম্প্রদায়িক আচারবিধিবন্ধন-ভারপ্রপীড়িত মানবচিত্তকে রুসো প্রভৃতি মনীষীদের দল যখন বললেন, "এই সব কৃত্রিমতা পরিহার ক'রে চল ফিরে প্রকৃতির স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে" (to back to nature), তখন সেই বিপ্লবে কি সাধনার কম ব্যভিচার ঘটেছিল? আজও পৃথিবীর নানা দেশে যে মহত্তর নব নব আদর্শের জন্য নানা রকমে বিপ্লব চলেছে তাতে কি মানুষের কম দুর্গতির কথা শোনা যায়? ফরাসী বিপ্লবের সহজবাদে কৃত্রিমতার অত্যাচারের বিরুদ্ধেই ছিল বিদ্রোহ। এদেশের সহজবাদেও সে যুগের অন্যায় শাস্ত্র ও বিধি-বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাব যে না ছিল তা নয়, তবে এদেশে সহজবাদীরা প্রধানতঃ চেয়েছেন নিত্য শাশ্বত সহজ সত্যেরই সাধনা করতে। সাময়িক প্রয়োজনের চেয়ে চিরন্তন ধর্ম্মের সহজ আদর্শটাই তাঁদের ধ্যানের মধ্যে ছিল বেশী পরিমাণে।

যেখানেই মানুষ কোনো মহামূল্য সম্পদের সন্ধান পায়, তারই আশেপাশে এমন কত শোচনীয় দুর্গতি ঘটে। এমন কি কোনো সোনা হীরা বা রত্নখনির কথা কেউ বলতে পারেন যার আশেপাশে দুরাশার মোহে মুগ্ধ বহু বহু লোকের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা না ঘটেছে? বিদেশের সন্ধানে, বাণিজ্যের সন্ধানে, এমন কি তীর্থের সন্ধানে মানুষের যে যাত্রা, তারও আশেপাশে কত করুণ কাহিনীই না সঞ্চিত! শুধু কি ধর্ম্মের ও সাধনার যাত্রাপথেই তার ব্যতিক্রম ঘটবে? বরং এই অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে মানুষের অন্তরের অন্বেষণের ব্যাকুলতা। হাজার নিষ্ফলতা, হাজার দুর্গতিসত্ত্বেও বাংলার সাধকেরা সহজের পথে যাত্রা করতে ছাড়েন নি। এই সাধনাকে অন্তরের মধ্যে যাঁরা যতখানি বুঝতে পেরেছেন তাঁরা ঠিক সেই পরিমাণে এই দেশের সাধনার ধন সেই প্রাণবস্তুটির সাক্ষাৎলাভ করেছেন।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের সব কৃত্রিম অভিমান ঠেলে ফেলে দিতে পেরেছিলেন বলেই তো চণ্ডীদাস মানব ধর্ম্মের এই মহামন্ত্রটি উচ্চারণ করতে পারলেন—

> "শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই মানুষের রহস্য বুঝতে হ'লে মানুষের মধ্যেই সন্ধান করতে হয়। সহজের খবর রাখে সহজ মানুষেই। শাস্ত্রে পুঁথিতে গ্রন্থে সে রহস্য ধরা পড়বে কেমন করে?

বাউল নিতাইয়ের কাছে এই তত্ত্বের পুঁথিপত্রের সন্ধান করলে তিনি বললেন—"বাবা, কারু সংসারের হিসেবের খাতা দেখে কি তার প্রাণের খবর কখনও মেলে? তার সুখ-দুঃখ, তার প্রেম-স্নেহ, রাগ-বিদ্বেষ এ সব কি কখনও জমাখরচের খাতায় ধরা দেয়?"

মানুষের উপরের উপরের ভাসা ভাসা খবরেরই সব সংগ্রহ মেলে পুঁথিতে। মানুষের আসল খবর তো চলে আসচে মানুষের মধ্য দিয়েই।

এই-সব কারণেই বাংলা দেশের এই মর্ম্মের কথা ভারতের অন্য অংশের বেদ ও শাস্ত্রপন্থী আচারনিয়মনিষ্ঠ ভদ্রজনেরা কোনো দিনই বুঝে উঠতে পারেন নি। বাংলার বৈশিষ্ট্যের এই গোড়ার কথাটি দুই এক কথার মধ্যে এখানে একটু বলা দরকার।

আমাদের দেশে ঝড় আসবার কোণ হ'ল উত্তর-পশ্চিম বা বায়ুকোণ। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণটা হ'ল তেমনি ভাববিপ্লবের কোণ। সুপ্রাচীন কালের ঐতিহাসিক দলিলে বঙ্গমগধের নাম যা পাওয়া যায় তখন হতেই ওখানে গোঁড়া ধর্ম্ম ও সনাতন প্রথার বাঁধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলে আসচে। ভারতের ঐ উত্তর-পূর্ব্ব কোণেই বৌদ্ধ জৈন ও নানা শ্রেণীর বেদবিদ্রোহী তৈথিক মতবাদীদের স্থান; এখানেই নাথ নিরঞ্জন, যোগী প্রভৃতি মতবাদীদের উদ্ভব; এখানেই গোপীচাঁদের গাথায়, আউল বাউলের গানে, বৈষ্ণবের কীর্ত্তনে, বৈদিক ধর্ম্ম ও আচারের শাসন কালে কালে খণ্ডিত হয়ে এসেছে।

উত্তর-ভারতের রাজতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রভাবও এখানে প্রতিহত হয়েছে বৃজি বৈশালী লিচ্ছবি আদি দলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে। শুধু রাষ্ট্রে বা সমাজে নয়, এখানকার মানুষেরা শাস্ত্র বা সনাতন প্রথাকে কোনো ক্ষেত্রেই অন্ধভাবে মেনে চলতে ছিল নারাজ। যতটুকু মানবার তাও মেনেছে তারা যুক্তিবিচারে ক্রমাগত পরখ্ করে। পুরনো বিধান কি সনাতন আচার মনে করেই তারা কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে থাকেনি। তাই এদেশে ভূতবাদ বা অতীতের অনুসরণের চেয়ে হেতুবাদ বা যুক্তিবাদেরই পসার ছিল বেশী। যুক্তি ও ন্যায়ের এই দেশ। অদ্বৈতবাদকেও এদেশে বিচিত্র ক'রে নেওয়া হয়েছে ত্রিগুণতত্ত্ব ও পুরুষপ্রকৃতি-বাদ দিয়ে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যাঁরা তখনকার কালের রক্ষণশীল সনাতনপন্থী, তাঁরা যুক্তিপন্থী স্বাধীনচিন্তাকে মনে করতেন সর্ব্বনেশে, তাই সেদিনে বঙ্গমগধে গেলেই ছিল প্রায়শ্চিত্তের বিধান। এখানকার আর্য্যদেরও তাই সবাই মনে করতেন ব্রাত্য বা আচারভ্রষ্ট, তা অথর্ব্ববেদে ব্রাত্যদের যতই মহিমা ঘোষিত হোক্ না কেন। এই অঞ্চলের লোক-প্রচলিত পালি মাগধী প্রভৃতি ভাষা যে তাঁদের সুনজরে পড়েনি তাও বোধ হয় এই কারণে। শাস্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ছিল অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এখানকার লোকের সে-সম্বন্ধে কোনো মোহই ছিল না। তাঁরা যুক্তিবিচারে নিজেদের প্রচলিত ভাষায় নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করে চলতেন। এজন্য রক্ষণশীল পণ্ডিতের দল এই সব প্রাকৃত জনের ভাষার প্রতি কতকটা ঔদাসীন্য আর হয়ত কতকটা বিদ্বেষভাবও পোষণ করতেন। ভদ্র ও পণ্ডিতজনেরা যাই মনে করুন না কেন, ঐ সব নাথ যোগী প্রভৃতি মতবাদীরা কিছুতেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেন নি। তাই পরে পুনরুত্থিত হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁদের স্থান হ'ল হেয়। এজন্য মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি দলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েও নিজেদের একগুঁয়েমি তাঁরা ছাড়েন নি। তাই সকল সমাজেই তাঁদের স্থান ছিল সঙ্কীর্ণ হেয় ও তাঁদের বুদ্ধির প্রতি ছিল সবারই অবজ্ঞা।

তবু গৌড়বঙ্গের চিন্তা ও সাধনার যা মৌলিকতা তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এই সব প্রাকৃত জনগণের মধ্যে, যাঁদের পণ্ডিতেরা মনে করতেন নিরক্ষর 'ছোট' লোক। গোঁড়া সমাজ-ব্যবস্থা তখনকার দিনের যে-সব শ্রেণীকে ভাল ক'রে অঙ্গীভূত ক'রে নিতে পারেনি, তারাই হ'ল এসব ছোট লোক। নিরক্ষর বলেই এদের ভাষা ছিল পণ্ডিত জনের উপেক্ষিত, আর পাণ্ডিত্যের আওতার বাইরে ছিল বলেই এদের মুক্ত ভাষা ও সহজ জীবন হয়ে উঠলো স্বাভাবিক ভাববিকাশের অনুকূল। শাস্ত্রের চাপে এদের বুদ্ধি নিজ সহজ লীলাটুকু হারায়নি। অন্তরের এই সহজ লীলাটুকু ছিল বলেই এক সময় নাথ নিরঞ্জন যোগপন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বাংলা দেশকে ভাবস্রোতে প্লাবিত করতে পেরেছিল। পরে বৈষ্ণব যুগেও তাদের সহজ ভাবের শক্তি বৈষ্ণব সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আশ্চর্য্য একটি শক্তি ও গতি ছিল ওদের এই সহজ ভাবের সাধনায়। এই ভাবটি বাংলার ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যেই বদ্ধ রইল না; ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগে ভারতের সর্ব্বত্রই নানা ভাবের সাধনার মধ্যে সেই সহজ ভাবধারার প্রভাব দেখা দিল।

প্রাচীন নাথ যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেকেরই বৃত্তি ছিল বস্ত্রবয়ন। এঁদের মধ্যে যাঁরা পরে বিজেতা মুসলমান সমাজভুক্ত হয়ে পড়লেন তাঁরাই হলেন জোলা। কাশীর নিকটে হলেও সাধকশ্রেষ্ঠ কবীরের জন্ম এই জোলারই বংশে, এই কথাটা ভেবে দেখবার মত। তাঁর অনুবর্ত্তীদের অনেকে আরও পশ্চিমাঞ্চল-বাসী, যেমন দাদূজী, রজ্জবজী প্রভৃতি; তাঁরাও ছিলেন জাতিতে তুলার পিঞ্জারা অর্থাৎ জোলারই প্রায় কাছাকাছি শ্রেণী। বাংলার এই-সব নিরক্ষর ছোটলোকেরা তাদের শাস্ত্রাচারবহির্ভূত স্বাভাবিক সাধনার প্রভাবকে কতখানি দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত ছড়াতে পেরেছিল, তার একটু আভাস মেলে কবীর দাদূ রজ্জবজী প্রভৃতির সাধনার ইতিহাস হ'তে উত্তর-পশ্চিম রাজপুতানা সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের মরমিয়াদের সাধনার ভাষায় গৌড়বাংলার নাথ যোগীদের ভাষার

স্পষ্ট ছাপ আছে। দাদূ তো এই নাথ যোগীদের পন্থে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দীর্ঘকাল ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যটন করেছেন। দাদূপন্থীদের ভক্তবাণী সংগ্রহে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরখনাথ, চর্পটনাথ, হালীপাব (হাড়িফা), গোপীচান্দ প্রভৃতির বহু বহু পদ সংগৃহীত আছে। ('দাদূপন্থী সাহিত্য'—২য় পৃষ্ঠা, চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী) এখনও নারায়ণা প্রভৃতি মঠে সে সব মেলে।

দিল্লীর মুসলমানবংশীয় বাউল য়ারী সাহেবের শিষ্য ছিলেন বুল্লা সাহের। গাজীপুরের ভুরকুড়া গ্রামে তাঁর স্থান এখনও আছে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। তাঁর 'শব্দসার' ভক্তদের খুব আদৃত গ্রন্থ। তাঁর লেখায় পাই, "পূর্ব্ব দেশের এলেন একজন, আপনা হতেই তিনি ব্রাহ্মণ, আপনি হলেন তিনি অবধূত। অপার অনন্ত ব্রহ্ম জানেন সেই ব্রাহ্মণ, তিনি এলেন আমার গৃহাঙ্গণে। পরমতত্ত্ব নিয়ে আপনি করলেন পূজা, সহজ অসীম তত্ত্বের গাইলেন তিনি গান। রজোগুণ, তমোগুণ, সত্ত্বগুণ দিলেন তিনি সরিয়ে, তনুমন দুই-ই বসলেন হারিয়ে, গগনমণ্ডলে তিনি চাখলেন হরিরস, কচিৎই কেউ বুঝবে এই রহস্য।"

> পূরব দেশকা আপুহিঁ বঁভনা
> আপু ভয়ল অবধূতা।
> অপরং পার ব্রহ্ম জমান বঁভনা
> আয়ো হমার গৃহ অংগনা।
> পরমতত্ব লে পূজি আপুহিঁ
> সরল গাবৈ অনহদ ততনা।
> রজগুণ, তমগুণ, সতগুণ সারল
> হারল তনুমন দোউ
> গগনমণ্ডল মেঁ হরিরস চাখল
> বুঝৈ বিরলা কোউ।

কবীর প্রভৃতি ভক্তদের লেখায় তো নাথপন্থী বহু প্রশ্নোত্তরী কথায়-কথায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁদের হেঁয়ালীগুলিও সব নাথপন্থের হেঁয়ালী। গোরখনাথের হেঁয়ালী বা ধাঁধা মনে ক'রে এগুলির নাম রাখা হয়েছে "গোরখ ধংধা"। এই "গোরখ ধংধা"ই হ'ল শেষে "গোলোক-ধাঁধা।"

আমি শুধু বাংলার সহজপন্থীদের দেবার কথাই বলছি। তাঁদের নেবার কথা তো কিছু বলি নি। তাঁরা জীবন্ত ছিলেন ব'লে যেমন দিয়েছেন নিশ্চয় তেমনি নিয়েছেন। কবীর প্রভৃতি অসীম-তত্ত্ব রসিকের কাছে আউল বাউলরা নিয়েছেনও ঢের। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণব ও ভক্তিবাদীদের কাছেও পেয়েছেন অনেক কিছু। সে অনেক খবর পাওয়া যায় বাউলদের পূর্ব্ব গুরুদের নমস্কারে। আজ সে-সব কথা বলবো না। দেবার কথাই বলবো, হয়ত অন্য প্রসঙ্গে নেবার কথাও উঠতে পারে, কিন্তু আজ নয়। বাংলার সহজ প্রাণের প্রকাশই হ'ল দেওয়ায় ও নেওয়ায়; শাস্ত্রজ্ঞানহীন ছোট-লোকরা সহজেই দিতে পেরেছেন, নিতেও পেরেছেন, কারণ তাঁদের তো কোনো কৃত্রিম বাধাবন্ধনের বালাই কিছু ছিল না।

বাংলার মরমের ভাবটি কেন আত্মপ্রকাশ করল এই সব "ছোটলোকদেরই" ভিতর দিয়ে সেই কথাটা আরও একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখবার। ভদ্র ও উচ্চশ্রেণীর লোকদেরই সাধারণতঃ দেশের প্রতিনিধি মনে করা হয়. কিন্তু পাণ্ডিত্য শাস্ত্র ও আচারের মিথ্যা অভিমান তাঁদের হৃদয়মনকে এত শুষ্ক ও প্রাচীন-প্রথাবদ্ধ করে রেখে দেয় যে, তাঁদের অন্তরের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক সত্যের লীলা শক্তি ও গতি কিছুই থাকে না। অন্তত প্রাচীন বাংলার সহজ ভাব-সাধনার জগতে ভদ্রলোক ও পণ্ডিতেরা নেতার স্থান অধিকার করতে পারলেন না। বেদে শাস্ত্রে যাঁদের অধিকার নেই, আচারনিয়মে তীর্থে মন্দিরে যাঁদের স্থান নেই সহজ মানবীয় ভাব ও সাধনাই সেই সব সাধারণ লোকের একমাত্র আশ্রয়; সেই সব নিরক্ষর সহজ সাধারণ লোকের মধ্যেই গিয়ে বর্ত্তাল দেশের ভাব ও সাধনায় নায়কতা। মানুষের জয়ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সহজ ভাবের অসীম শক্তিধারাও হয়ে গেল উন্মুক্ত।

অনেকেরই মনের ভাবটা এই যে যত শক্তি ও ভাবধারা তা থাকবে সমাজের উচ্চস্তরে। তাঁরা ভুলে যান যে বৃষ্টি হয়ে গেলে তার অল্প অংশই বয়ে চলে মাটির উপর দিয়ে, অধিকাংশই নেবে যায় মাটির গভীর নীচের সব স্তরে। সেই অদৃশ্য সঞ্চয় হতেই ক্রমাগত বৃক্ষলতা অরণ্যের মূলে প্রাণরস এসে পৌঁছতে থাকে। তৃষিত

বৃক্ষলতা বনস্পতি সেই গভীর অতলেই তাদের "মূলাঞ্জলি" দেয় পাঠিয়ে। দাহতাপের ফলে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকেও খুঁড়তে খুঁড়তে নেমে যেতে হয় সেই গভীর স্তরে।

মানুষের ভাবসম্পদও তো অধিকাংশই সঞ্চিত থাকে তার 'গভীর অতলে'—অর্থাৎ তার সাব্-কনশ্যাস্ স্তরে। ব্যক্তির ন্যায় জাতির ভাবসম্পৎও প্রচ্ছন্ন থাকে তার 'গভীর অতলে', তার অপ্রত্যাশিত নিম্নস্তরে। প্রয়োজন-মত সেই গভীর অতলে নেবে যাবার শক্তিটি লাভ করাই হ'ল সাধনা। তাই বাউলরা বলেন :—

"আছে তোরই ভিতর অতল সাগর
তার পাইলি না মরম।
তার নাই কূলকিনারা শাস্ত্রধারা
নিয়ম কি করম।"

শাস্ত্রাচারের আগুনে যিনি নিজ সহজবুদ্ধিকে যে পরিমাণে পুড়িয়ে মেরে বসে আছেন মানুষের সহজবুদ্ধির উপর তাঁর সেই পরিমাণেই বিশ্বাসের অভাব।

মানবীয় ভাবে সহজ চিন্তায় দীক্ষিত স্বাভাবিক জীবনে এই যে মানুষের জয়ঘোষণা তা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল গৌড়বাংলার সাধনায়। তাই এখানকার লোক যখন পূজার জন্ম দেবদেবীর প্রতীক খুঁজছে তখনও অন্যান্য প্রদেশের মত নোড়ানুড়িতে খানিকটা তেল সিন্দুর না মাখিয়ে মানবীয় ভাবের প্রতিমায় দেবদেবীর পূজা করছে। জৈন বৌদ্ধরা যে মানবদেবতার মানবীয় প্রতিমার কাছে সবাইকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শেখালেন, তাঁদেরও আরম্ভ এই উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেই।

মানুষ যে বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে সমান তা বলতে গিয়ে উপনিষৎ বলেছিলেন—

"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষো হৃদয়-আকাশঃ"
অর্থাৎ, যত বড় অসীম বিশাল এই বাহিরের আকাশ তত বড়ই এই অন্তর-হৃদয়ের আকাশ। (ছান্দোগ্য ৮-১-৪)

তবু সেই বাণী হয়ে গিয়েছিল পুরনো, তাকে আবার জাগিয়ে তুললেন গৌড়বাংলার সহজপন্থী বাউলরা। তাঁরা বললেন,

"যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

মানুষ যে বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে সমান, এ কথাতে মানুষের উপর কি গভীর শ্রদ্ধা, কত বড় বিশ্বাস ফুটে উঠেছে!

কবীর যে বললেন—

"খেল ব্রহ্মাণ্ডকা পিণ্ডমে দেখিয়া"

ইত্যাদি বাণী, তারও মূলে সেই সহজপন্থীদেরই বাণী। এই মুক্ত মানবতার জয়গান তখনকার দিনে বাংলার সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার বৈষ্ণবমতের মধ্যেও শাস্ত্রের চেয়ে বাউল মতের প্রাধান্য। মহাপ্রভু যদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণবমত নিয়েই বসে থাকতেন, তবে তাঁর পূর্ব্বে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কেশব ভারতী প্রভৃতি সাধকজনসেবিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত তাঁর ভক্তিবাদও পণ্ডিত ও ভদ্রজনেরই মধ্যে বদ্ধ থাকতো। সহজ ভাবের সাধক নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনেই ধরা পড়ে মহাপ্রভুর অসামান্য প্রতিভা। তাই চৈতন্যচরিতামৃত যে পরিমাণ বৈষ্ণব গ্রন্থ সেই পরিমাণেই বাউল। বাউল ভাব না জানিলে তাহার বহু স্থানই দুর্ব্বোধ্য। এই বাউলরা নিজেদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটি তীর্থমন্দির বা ঠাকুরঠোকর প্রভৃতি কিছুরই কাছে বিকিয়ে দেয়নি। তাই চিরদিন ভদ্র আচার-নিষ্ঠ দলের তারা চক্ষুশূল। এই ঝগড়া বহুকালের পুরনো।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বঙ্গ মগধের ভাষাকে বলা হয়েছে পাখীর কিচির-মিচির। তার মানে এখানকার এই মুক্ত ভাবকে ভারতের অন্যান্য ভাগের লোকরা তখনকার দিনেও পছন্দ করেন নি। তাদের আচার ম্লেচ্ছোচিত, তাদের ভাষাও কাজেই ম্লেচ্ছিকেরই মত, তাই বলতে গিয়ে একেবারে পাখীর কিচির-মিচিরই বলা হয়েছে। যাক্, এই পাখী বলার একটা সার্থকতা আছে। বাংলার সাধকরা ছিলেন পাখীরই মত বাধাবন্ধহীন। ভাবের অনন্ত আকাশে ও কর্ম্মের প্রশান্ত ভূমিতে সর্ব্বত্রই তাঁদের গতি ছিল বাধাবন্ধহীন।

বাংলার যে শিল্প সত্যই তাঁর নিজস্ব, তাতেও দেখি অলঙ্কারের স্বল্পতার সঙ্গে ভাবের গভীরতা। বাংলার 'ছত্রমুখ' মূর্ত্তিগুলির মধ্যে তাই দেখি মানবীয় ভাবের সঙ্গে দেব ভাবের গভীরতম অথচ সহজ যোগ, অলঙ্কারের

বাহুল্যে তা আচ্ছন্ন বা আড়ষ্ট নয়। এই ভাস্কর্য্যের কথা বলা হ'ল ব'লে মনে করবেন না যে ইটপাথরেই বুঝি বাংলার প্রাণবস্তুর চরম বিকাশ। বাংলার অতীত ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্য নেই একথা বলা চলে না। তবু বাংলার সহজ ভাবের আশ্রয় তার অতীতের ইটপাথরের বা কোনো রকমের সঞ্চয়স্তূপ নয়। বর্ত্তমানের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকেই তার আশার সাগ্রহ মুক্ত দৃষ্টি। ভারতের অন্য সব প্রদেশ সত্য যুগেরই পূজায় রত, কলিকালে বাস করেও কলির প্রতি তাঁদের অসীম অবজ্ঞা। কিন্তু বাংলার বাণী হ'ল—

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ-সার।"

অতীতকে অগ্রাহ্য ক'রে এমন সাহসে বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার বাণী অন্যত্র দুর্লভ। অতীতের ধ্বংসস্তূপ আঁকড়ে পড়ে থাকবার মত মনের ভাব তার নয়। খুব সম্ভব তার আপন ভূমির কাছে এই দীক্ষাটি সে পেয়েছে। বছর বছর প্লাবনে তার পুরনো সব সঞ্চয় একেবারে ধুয়ে-মুছে গিয়ে নূতন পলিমাটিতে সে একেবারে নবীন হয়ে ওঠে। পুরনোর ক্ষতি সে শতগুণে পুষিয়ে নেয় তার ভূমির উপচীয়মান নবীন উর্ব্বরতায়। বর্ত্তমানের ফলশস্যভারে ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তার আর বিনষ্ট প্রাচীন সঞ্চয়স্তূপের জন্য শোক করবার অবসর নেই। চিন্তার ক্ষেত্রেও তার সব ভরসা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে। এখানকার নিত্য-নব-প্রাণে-জীবন্ত ভূমির ইঙ্গিতটি বেদশাস্ত্রানুযায়ী ভদ্রজনেরা ধরতে পারলেন না। এই দীক্ষাটি নিতে পারলেন তাঁরাই যাঁরা নিতান্ত ছোটলোক, এই ভূমিরই সন্তান। যাঁদের কথা অথর্ব্বে উচ্চারিত হয়েছে মহী সূক্তের "মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ" (অথর্ব্ব ১২,১,১২) এই বাণীতে। এই দীক্ষার সাহসে এরা মন্দির হ'তে ঠাকুরঠোকর উঠিয়ে দিয়ে বসালেন এনে মানুষকে। তাঁদের সাধনা হ'ল বিশ্বের সঙ্গে যোগ। তার থেকেও বড় কথা নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও যোগস্থাপনা।

এই জন্যেই বাংলা দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের গোঁড়ামি অনেকটা কম হবার কথা। তবু যা-কিছু আছে তা এখানকার [illegible] গোঁড়া সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততি আর তাঁদের শিষ্য-সেবক পরম্পরাই হয়ত তার বাহন। আর সেই গোঁড়াশ্রেণী প্রায়ই ভদ্র ও পণ্ডিতী দলের। এই নিত্য প্রাণরসে জীবন্ত ভূমির সঙ্গে তাঁদের ঠিক খাপ খায় নি; কাজেই তাঁরা এখানে তেমন একটা কিছু ভাব-সম্পদও গড়ে তুলতে পারেন নি। বাইরের ইঙ্গিতের দীক্ষায় অন্তরের সম্ভাবনাকে ফলিয়ে তোলবার মত সহজ সাধনা তাঁদের তো নয়।

যারা ছোটলোক, শাস্ত্রে আচারে তাদের বাঁধে নি। কাজেই তারা সংস্কারমুক্ত। জীবনের সহজ গতির ইঙ্গিতের মধ্যে সাধনার গভীর আদর্শের সন্ধান তারাই পেয়েছে। জীবনের সহজ ইঙ্গিতগুলির দীক্ষা অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছেন বলেই এ যুগে বাংলা দেশে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতি ভদ্রবংশীয় হয়েও অন্তরের গভীরতার সন্ধান পেয়েছেন।

এঁরাও তো কেউই কৃত্রিম শাস্ত্রানুশাসনের উপাসক নন। ধর্ম্ম ও সাধনার জগতে এঁরা সবাই নব নব সাহসিক পন্থা ও ভাবের প্রবর্ত্তক। এঁরা অনেক সময় শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শাস্ত্র এঁদের ব্যবহার করতে পারে নি।

সহজ সাধনার ক্ষেত্রে বাংলার এই সাধনা অতুলনীয়। সর্ব্ববিধ মানব-সম্বন্ধের রসে দেবতাকে একেবারে ঘরের মানুষ করে নিতে এঁদের একটুও সঙ্কোচ নেই। দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রীতি মাধুর্য্যাদি কোনো ভাবকেই এঁরা বাদ দেন নি। মাতা হ'তে প্রেয়সী পর্য্যন্ত সকল ভাবেই আরাধ্য দেবতাকে সাধক ভাবতে পেরেছেন। মানুষ যে বিশ্বের সঙ্গে সমান, তার অন্তরের দেবতাই যে বিশ্বের দেবতা, সে কথা এঁদের গোরখনাথ হ'তে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ—সব সাধকেরই বাণীতে সমানভাবে চলেছে। বিশ্বসার তন্ত্রের অন্তর্গত রুদ্রযামলে গুরুগীতায় গুরুকে প্রণাম করবার বেলায় বাণী হ'ল—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ", কাজেই তাঁকে বলতেই হ'ল—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ," যেহেতু

নাথপন্থী যোগপন্থী প্রভৃতি মতের সর্ব্বত্রই এই স্বাধীন মতবাদ দেখতে পাই। বাংলার তন্ত্রশাস্ত্রেও এই স্বাধীন মতবাদ বহু স্থানে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তাতেও বাংলার বাউলদের কুললো না। এদেশের আউল বাউলেরা এমন একগুঁয়ে যে এতদূর স্বাধীন এ সব মতবাদও "বৃথা বন্ধন" ব'লে অনেক অংশেই দিলেন উড়িয়ে।

বাউলরা বলেন, "নাথযোগীরা অনন্ত শূন্যকে ভরতে চাইলেন 'চিৎ' দিয়ে আর 'সুখ' দিয়ে; তা কি সে ভরে? তাই শেষে আমাদের আনতে হ'ল প্রেমকে। অমনি সুখ হয়ে গেল আনন্দ। আর সৎ না হ'লে চিৎ হয় কিসে? তাই 'সতে চিতে আনন্দে' ভরপূর যে প্রেম তাতেই পূর্ণ হয়ে উঠলো সেই অনন্ত শূন্য। সেই পরিপূর্ণ শূন্য নিয়েই আমাদের কারবার। সুখ বড় ছোট কথা, অনন্তের অন্তর কি তাই দিয়ে ভরে? ছোট বলেই কথায় কথায় সে হয়ে উঠে মলিন, তাই জন্মমৃত্যু, দিনরাত্রি, সূর্য্য-চন্দ্র যোগ করতে গিয়ে তাঁরা বুঝলেন শুধু 'চন্দ্রভেদ'। শূন্যেই তখন চললো সুখরতি। ক্ষুদ্র ভাব নাবলো গিয়ে মাটিতে। সবই দাঁড়াল এই মাটির দেহের ব্যাপার। তাইতে কি সাধনা কখনও এগোয়? সুখকে কর আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে হোক তার যোগ, দেখবে সব হয়ে উঠবে শুদ্ধ মুক্ত।"

নাথযোগীরা বললেন, "এই জগৎ হ'ল 'দয়ায় সৃষ্টি'! এমন বিশ্বচরাচর কি ভিক্ষায় মেলে? মন হয়ে ওঠে ভিখিরী; তাই প্রেমের কথা আর ভাবতেই সাহস হয় না। সৃষ্টির মূলে যদি প্রেমই না হয় তবে তার সঙ্গে আমার সমানে সমানে কেমন ক'রে হবে প্রেমলীলা? আর তাই যদি না হ'ল তবে আর কিসের জন্যে করবো সাধনা? আলখ নিরঞ্জন না-কি হলেন আদি। দুর্ভর হ'ল আদি অনন্তের ভার, তাই তাঁকে হ'ল মরতে। মরে পচে গলে তিনি হলেন চুরাশি ভাগে চুরাশি সিদ্ধা! অনন্তের না-কি আবার ভার! ভার তো হয় সব ক্ষুদ্রের। কলসী জলের ভারে পড়ি ভেঙে। সাগরের আবার ভার কি? এই মরা পচা গলা সিদ্ধারা দেবেন কোন্ সিদ্ধি? যেমন সিদ্ধা তেমনি সব সিদ্ধপীঠ, তাও মরা পচা শক্তির বারায় খণ্ড।"

"যে অনাদির দুর্জ্জয় ভার, তাঁর আবার নেই শক্তি। সেই শক্তির নেই আবার গতি; তাই তাঁকে আবার দিতে হ'ল গঙ্গা। 'আদ্যা-গঙ্গা,' 'গতি-শক্তি' দুই নিয়ে জটায় তবে অনাদি হলেন যোগীন্দ্র যোগেশ্বর। তালি দিয়ে দিয়ে চললো যোগেশ্বরের যোগসাধনা! প্রেমের সন্ধান পেলে কি হয় আর এত সব দুর্গতি? সৃষ্টি রাখতেই হবে, তাই শিবশক্তির চাই মিলন। তাই "নরে নরে হলেন হর, নারীরূপা শিবা।"

"এমনি করে তবে চললো পুরুষপ্রকৃতির মিলন। তাই এই ভবে যাঁরই উদ্ভব তিনিই শিব কি শিবা। এমন করেই শিবে শিবায় চলছে নিত্য সৃষ্টি!"

"ভবে যত নরনারী ভব আর ভবানী" [তুলনীয়—"তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা"—মহানির্ব্বাণ ১০, ৮০]।

"অন্তরের ধ্যানই ছিল যোগ। শ্বাসের অরূপ মালায় ধ্যান মন্তর যদি হয় যুক্ত, নিরন্তর চলে তবে অজপা জাপ, শ্বাসে শ্বাসে এগিয়ে চলে তবে মনের ধ্যান। কূলকিনারাহীন ভবের সাগরে ভেসেছে যে মানব তরী, এই শ্বাসে শ্বাসে সহজ রূপে চলে সে এগিয়ে; তাই তো বলে

"মনের নাও পবনের বৈঠা অকূল সাগরে"

"মন পবনের এই যোগ আনন্দের যোগ, সহজ ভাষায় ইহাই মনপবনের রতি।"

"যোগানন্দে হয় সাধনা, নয় তো টাইনে টুনে।
চিত্তে রতি মন-পবনের, বাহ্যে না কেউ জানে।"

"কিন্তু এই সাধনাও করে তুললো বাহ্য! সাধনা যখন হয় বাহ্য, তখনই আচার অনুষ্ঠান নিয়ম রীতের জগদ্দল ভারে সব যায় তলিয়ে।

"তখন বেদ শাস্ত্র হোম নিয়ম ধূপ দীপ নৈবেদ্য জল দেবতা মন্দির সব এসে দাঁড়ায় ভিড় ক'রে। তখন যা পারি আর যা না পারি সবই লোভের কাঙালপনায় আনতে হয় সব জুটিয়ে। তখন ঠাকুর চাই, পূজো চাই, হোম চাই, এমন কি পৈতেটাও চাই। পৈতে যদি না জোটে তবে তামার পৈতে দিয়েও দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। এই তামা জান? এই তামা গোরখনাথ

আনলেন নেপাল থেকে। নেপালও যা তামাও তা।* এই নেপালী পৈতের সঙ্গে এলো দাক্ষিণের তুলসী আর পশ্চিমের গঙ্গা। ত্রিদোষ ঘটলো তখন তার তামা তুলসী গঙ্গাজলে।

"এই তামার আবার জাত আছে? আমাদের দীক্ষা লোহা তামার নয়, সে দীক্ষা পরশমণির। তার জাত নেই। মৃণ্ময় ছুঁয়ে তা দেয় চিন্ময় করে। এদের চার জাতের তামার চার রকমের পণ্ডিত বসবেন চার দুয়ারে; এলো সবই। জাতও এলো পণ্ডিতও এলো, তবু বসে থাকতে হ'ল দুয়োরে। ভিতরে স্থান নেই! অন্তরে তো নেই-ই। একবার কুট্‌লি মাথা তো হয়ে পড়তে হ'ল ঢেঁকী, তাও যদি ধান থেকে চাল পারতো করতে!"

এই অন্তরের খবর পেল দীন দুঃখী আউল বাউলরা। তাদের না আছে 'পণ্ডিত' হবার সাধ, না আছে দেবতা, পৈতা যাগ যজ্ঞ পূজা হোমের সাধ। তারা সহজ হয়ে খুঁজলো সহজ পথ। প্রেম ছাড়া আর সহজ কৈ? এই প্রেম দিয়েই ভরে উঠলো তাদের সব শূন্য; আর ঘুচে গেল সব আবর্জনার রাশ।

কাজেই দেখা যায় বাউলরা না মেনেছে বাইরের কোনো বৃথা বন্ধন, আর না মেনেছে ভিতরের কোনো অর্থহীন আচার। এই স্বাধীন সহজ বুদ্ধিই তাদের বৈশিষ্ট্য। এই ধনেই বাংলা দেশ মহাধনী।

এই যুগে ভারতের নানা প্রদেশে যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস চলেছে, তাতেও বাংলার বৈশিষ্ট্যটি ধরা যায়। অন্যান্য জায়গায় দেখি এই প্রয়াসের মধ্যে সংস্কারার্থী হয়েও নেতৃগণ একটু মূলে আশ্রয় খুঁজেছেন বেদে শ্রুতিতে। বাংলা দেশের সংস্কারপ্রবর্ত্তকেরা শ্রুতি অতি সুন্দররূপে ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু শ্রুতি বা শ্রৌত কোন আচারাদিকে সংস্কারের মূল-ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করেন নি। অভ্রান্ত বেদ ও শাস্ত্রবাদ, অভ্রান্ত প্রাচীনাচার একেবারেই দিয়েছেন উড়িয়ে। হয়ত সে জন্য সংখ্যা-হিসেবে তাঁরা অন্যান্য প্রদেশের সংস্কারার্থীদের সঙ্গে সমান হতে পারেন নি।

এই রকম বেপরোয়া ভাবে থাকার দরুন অনেক দুঃসাহসিক কাজে এই ভারতে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়েচে বাংলা দেশই। তার মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার নবশিল্পীদের কথা। উল্লেখযোগ্য। যখন এই পথে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন, তখন সারা ভারতবর্ষ ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে, যদিও সে বিরুদ্ধতার এখন অনেকটা অবসান হয়ে আসচে।

শাস্ত্র ও লোকমতের প্রতি এই যে বেপরোয়া দুঃসাহসিকের ভাব, তা সবার ততটা নাও থাকতে পারে। তাই ভারতের নানা অংশে যাঁরা সবার সঙ্গে রক্ষা করে র'য়ে স'য়ে এগিয়েছেন তাঁরা অনুবর্ত্তী পেয়েছেন অনেক বেশী। ফলাফল বিচার না ক'রে, দলে লোক হবে-কি-না-হবে সে বিবেচনা না ক'রে, শুধু যুক্তিতে বিচারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করে দুঃসাহসে সেইদিকে ছুটেছে বাংলার অনেক বেপরোয়াদল। এই রকম বেহিসাবী দুর্দ্দান্তপনার চোটে বাংলা দেশে বড় বড় মণ্ডলী বড় বড় দল গড়ে উঠবার তেমন সুযোগ ঘটেনি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ক্রিয়াকর্ম্মে যাগযজ্ঞেও পুরোহিতেরই প্রাধান্য। বাংলার অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচারেরই মুখ্যতা। বাংলার বিবাহাদিতে স্ত্রী-আচার কি চমৎকার ও সুন্দর। অন্যান্য স্থানে স্ত্রী-আচারের সে সুকুমার সৌন্দর্য্যকলা দুর্লভ! সেখানে স্ত্রী-আচারে দেখি "ধূসর, মূসর, তাক" প্রভৃতিরই প্রাদুর্ভাব। বর এলে তাকে "ধূসর" অর্থাৎ গোগাড়ীর বলদ বাঁধবার কাষ্ঠদণ্ড মুষল ও চরখার লোহার শঙ্কু প্রভৃতি দেখিয়ে আচার করা হয়। বাংলারও এমন পরম সুন্দর স্ত্রী-আচারগুলিও দিনে দিনে চলেছে লুপ্ত হবার পথে।

অন্যান্য প্রদেশের দুর্দ্দান্ত ও অশ্লীল হোলী উৎসবের মত উৎসব এদেশে দুর্লভ। এখানকার ষষ্ঠী, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ভাদু, ঝুলন, গোপোৎসব, জন্মাষ্টমী, মনসার ভাসান, আগমনী, দুর্গাপূজা, বিজয়া, কোজাগরী, দীপান্বিতা, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী, রাস, কার্ত্তিকপূজা, ইতু, পৌষলা, শ্রীপঞ্চমী, দোল, বাসন্তী, চড়ক, নীল, গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসব যাগযজ্ঞের চেয়ে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ, অনেক বেশী মানবীয় ভাবে ভরপুর। মেয়েদের

* যোগশাস্ত্রে ও রসশাস্ত্রে তামার এক নাম 'নেপাল'।

যমপুকুরিণী, তুষ তুষালী, মাঘমণ্ডল প্রভৃতি ব্রত ও ব্রতকথা একেবারে সহজ জীবনযাত্রার কথা। চড়ক, নীলপূজা, গম্ভীরার যে নৃত্যগীত তাহাতে বাংলার উদ্দাম প্রাকৃত উল্লাসেরই প্রকাশ। আরতিতে ধূপদীপ নিয়ে মেয়েদের যে বরণ, তাতে নৃত্যকলার গভীরতম সব লীলা মূর্ত্তিমান হয়ে এসেছে। দিন দিনই এ সব দুর্লভ হয়ে আসছে। এখন এ সব দেখতে হলে সুদূর পল্লীতে যেতে হয়; সেখানেও আধুনিকতা গিয়ে এ সব অনুপম জিনিষকে নিত্য আক্রমণ করছে।

ব্রতকথার মধ্য দিয়ে এখানে মেয়েরা ভাষাকে এক অপরূপ সৌকুমার্য্য দিয়ে এসেছেন। এই সব ব্রতকথায়, ছড়ায়, উপকথায় ও রূপকথা প্রভৃতিতে ভাষার যে অনুপম ছন্দলীলা তাতে গদ্যকথাও কাব্য হয়ে উঠেছে। একান্তই প্রাকৃত জনের অন্তরের ভাষা ব'লে বাংলা কখনও ভারতের অন্যান্য প্রাকৃতের মত ব্যাকরণগত লিঙ্গ বচন প্রভৃতি অশেষবিধ বাঁধন মেনে উঠতে পারে নি।

বাংলার ছন্দ কখনও সংস্কৃত ছন্দের দাস্য করতে রাজী হয় নি। গুজরাত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দেই ভাষায় কবিতা লেখা হয়েছে। এই সবেমাত্র তাঁরা বাঁধন খসাতে আরম্ভ করেছেন, যদিও সে বাঁধন এখনও বেশীর ভাগ খসেনি। গুজরাতে এখন চেষ্টা চলছে ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধাঁচে কবিতা লেখা যায় কিনা। এ সব বিদ্রোহের মধ্যে বর্ত্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রভাবের কথা ভুললে চলবে না। ওদেশের সেকেলে লোকেরা তো সোজাসুজি দুঃখ করেন যে, "বাংলা দেশের মেয়ে ও ছেলেদের মধুর নামে আমাদের দেশ ছেয়ে ফেললো ও পুরনো নাম সব লোপ হয়ে যাবার যোগাড়। আর হ'ল বাংলার কাছা, বাংলার কোঁচা, খোলা মাথা, বাঙালী সজ্জা আমাদের সদর অন্দর সর্ব্বত্র এসে জুড়ে বসতে সুরু করেছে।"

বাংলা ভাষার মধ্যেই যে তার নিজস্ব একটি স্বরভঙ্গী, উচ্চারণের ঝোঁক ও যতি আছে, তাই হ'ল তার ছন্দের ভিত্তি। এই ছন্দলীলার ওস্তাদ হলেন বাংলার বাউলরা। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দের এই লীলা ধরা পড়ে বাংলার পটের নাটের গোরখী ও ত্রিনাথের গানে, তার আরজায় তরজায় যোগীগীত ও চবুজায়, তার কাচে নীলে গাজনে ভাসানে, তার রয়ানী মঙ্গল মালসী ভাটিয়ারীতে, তার জাঁক সারী ঝুমুর ও খেমটায়, তার ছন কবি লাটুতে ঘাটুতে, তার পাঁচালী কীর্ত্তন আউল বাউলে, বিহু হোলী বোল্‌বাঈ গম্ভীরায়, তার রাসে যাত্রায় লীলা আগমনীতে। এ ছাড়া আরও যে কত রকম প্রাকৃত ছন্দ গাথা আছে তা এখানে বলে শেষ করা অসম্ভব। 'আরজা'র পাশে থাকায় 'তরজা'র মূলের কথাটাও ধরা পড়ে যাচ্ছে।

পরবর্ত্তী পীর গাজী জঙ্গ, সাঈ উজ্‌কিহ দরবেশী মুরসিদা প্রভৃতি গানেরও এই ছন্দই প্রাণ। এই-সব ছন্দ অনুসারেই বাংলার তাল। কাজেই বাংলার প্রাকৃত তালগুলি উত্তর-ভারতের সংস্কৃত তালের সঙ্গে মেলে না। বরং তার কতক মিল আছে তামিল মালাবার প্রভৃতি দ্রাবিড়ি তালের সঙ্গে। এই-সব ছন্দ ও তালের সঙ্গে তার নৃত্যেও ছিল একটি বিশিষ্টতা। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অল্পদিন পূর্ব্বেও তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যেত; এখন দিন দিনই তাহা দুর্লভ হয়ে আসছে; রক্ষা না করলে কিছুদিন বাদে তার আর চিহ্নমাত্রও থাকবে না। মণিপুর ত্রিপুরায়ও আধুনিকতার ঢেউ গিয়ে তাকে আক্রমণ করচে।

গানেও বাংলা দেশ আর্য্য সঙ্গীতগুরুদের শাসন সব ক্ষেত্রে মান্‌তে রাজী হয় নি। তার সুরের লক্ষ্য ও দৃষ্টি অন্তরের ভাব প্রকাশেরই দিকে। ভদ্রবংশের বৈঠকে ওস্তাদদের শাসন কতকটা চলে এসেছে, কিন্তু প্রাকৃত জনের ভাবপ্রাঙ্গণে তার তেমন পসার ঘটেনি। পণ্ডিত জনেরা এই সব নৃত্যগীতের সুর ও তালকে দেশী নাম দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাংলার গানেও কথা সুর কেউই কারও প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয় নি। হরগৌরীর মত দুই-ই দুয়ের যোগে হয়েছে সমৃদ্ধ। এই-সব বিচিত্রতার মধ্যেই গঙ্গা ও যমুনা ধারার মত বাংলার সঙ্গীত ও সাহিত্যের যোগ ঘটেছে এবং এই যোগক্ষেত্রেই বাংলার ভাবঐশ্বর্য্যের সন্তোষ-ক্ষেত্র। এই মুক্ত ক্ষেত্রে বসেই বাংলার অন্তরাত্মা বিশ্বাত্মাকে প্রেমের যোগে ডাক দিয়েছে। যোগের

এই উৎসবে রঙ্গেই বাংলার শিল্পকলা ও তার প্রাণের সর্ব্ববিধ প্রকাশ রঙিয়ে উঠেছে।

বিধাতা বিশেষ ক'রে কেন বাংলা দেশকেই এই যোগের সিদ্ধপীঠ করলেন তা ভাববার বিষয়। আর্য্যদের তাড়ায় আর্য্যপূর্ব্ব কত জাতিই এসে বাংলার এই জলময় ভূভাগকে আশ্রয় করেছিল! তার পর এলো বেদপন্থী ও বেদাচারবহির্ভূত নানা রকমের আর্য্য। এই উর্ব্বরা সুজলা সুফলা অরণ্যময় যোগ-ভূমিতে কোনো দলই কোনো দলকে নিঃশেষ করতে প্রবৃত্ত হ'ল না। সবাই রয়ে গেল আপন আপন ভাবে। তাই নানা জাতির একত্র বাসে ভবিষ্যতে যে গভীর সব সমস্যার সৃষ্টি হ'ল, তার একমাত্র সমাধান হ'ল এই যোগ। যে যোগ-ধারা এই-সব নানা দলকে গেঁথে উপরে উঠতে সক্ষম সেই তো পৌছতে পারবে ব্রহ্মকমলের অসীম শাশ্বত অমৃতধামে। কায়াযোগেরও মূল কথাটি এই। নাথ পন্থে নিরঞ্জন পন্থে এই কথাটিই সর্ব্বত্র প্রচার হয়েছে।

আরও একটি কথা। নানা ক্ষীণ ধারার যোগে গঙ্গার এই বিশালতা। এই বিশাল ঐশ্বর্য্যভার নানা ধারার যোগে লব্ধ, তাই আবার নানা পথে পথে বিচিত্র ধারায় চলেছে অসীম সাগরের সন্ধানে। গৌড়বাংলার এই সুবিশাল গঙ্গাভূমিতেই যদি যোগের সাধনা পীঠ না হয় তবে হবে আর কোথায়? এই জলপথের দেশে সব পথের সঙ্গেই সব পথের যোগ। এই পথের ইঙ্গিতই কি বাংলার তার জীবনে কম কাজ করেছে?

বাংলার যোগপীঠ যেমন বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যসাধনের অনুকূল, তেমনি আর এক দিকে ব্যক্তিত্ববিকাশেরও চমৎকার অবকাশ এইখানেই। এখানে বাড়ি বলতে বুঝায় চারদিকে বাগানঘেরা একখানি ভদ্রাসন। তারই সমষ্টি হ'ল গ্রাম। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পল্লী বা গ্রাম বলতে বুঝায় রাস্তার দুই ধারে গায়ে গায়ে লাগা গৃহের সার। এরূপ পল্লীতে গৃহের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না। গৃহ যেন একটা সমষ্টির একটা অংশ। বাংলার গৃহ তার নিজের বিশিষ্ট রূপটি পল্লীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। তারই কোলে বাঙালীর পায়। কিন্তু বৈশিষ্ট্য মাত্রকেই চলতে হবে যোগের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। বৈশিষ্ট্য না থাকলে যোগের কোনো অর্থই নেই। আবার যোগ বিনাও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির বিরোধী প্রলয়ের আঘাত মাত্র। যোগ ও বৈশিষ্ট্য যেন 'বাগর্থাবিব,' একে অন্যকে নিয়ে সার্থক। আজকের দিনে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য উঠেছে যোগকে অতিক্রম ক'রে। একঝোঁকা ভাবই হয়েছে দেশে নানা দুর্গতির মূল। কিন্তু এ তো তার সহজ ভাব নয়।

একদিকে এখানে বিশ্বের সঙ্গে যোগ, অপর দিকে ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ। এই উভয়ের মধ্যে প্রেম ও সম্বন্ধটি ধরতে পারলেই বাংলার ভাব ও সাধনার মূল উৎসে গিয়ে পৌছনো যায়। এই উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বাংলার নাথপন্থ যোগী নিরঞ্জন মতের সাধকেরা এবং আউল বাউলরা এত উচ্চ আদর্শ ও এত গভীর ভাবসম্পদের দীক্ষা সর্ব্বত্র দিতে পেরেছিলেন। এঁরা এক-দিকে শাস্ত্রাচারকে অগ্রাহ্য ক'রে আত্ম-সাধনার জয়গান করেছেন, আবার আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার যোগ সাধনার প্রয়োজনের কথাও সর্ব্বত্র ঘোষণা করেছেন।

এঁরা বলেন, নিজের অন্তরস্থিত বৈষম্যগুলিকে সামঞ্জস্যে পরিণত করবার জন্যেই যোগের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সূচী যেমন নানা রত্নকে বিদ্ধ ক'রে এক সূত্রে গেঁথে ফেলে, যোগও তেমনি মানুষের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ভাবকে সুসঙ্গত করে তোলবার উপায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবচক্র বা পথকে বেধ ক'রে যে ঐক্যসূত্রে সহস্রদল কমলের অমৃত রসপান, তাই হ'ল কায়াযোগের গোড়ার কথা। কায়াযোগের প্রাচীন গুরুই বাংলা দেশ।

এঁদের এই যোগ সাধনার উপায়ের মধ্যেও বেশ একটু বিশিষ্টতা আছে। মানুষের উপরেই এঁদের ভরসা। তাই বেদ শাস্ত্র প্রথা সব অগ্রাহ্য করে গুরু ও সাধকদেরই এঁরা স্বীকার করেন। গুরু আবার এঁদের মতে নানা ইঙ্গিতে পথের সন্ধান মাত্র দেন, কিন্তু তার সাধনাকে বা ব্যক্তিত্বকে চেপে মারেন না। সাধকের অন্তরকে জাগ্রত করাই গুরুর কাজ। যোগযুক্ত সাধক আত্ম-

গুরুও এদেশে একাধিক হতে পারেন; যিনি জ্ঞান দেন তিনিই গুরু। চৈতন্যচরিতামৃতে ছয় গুরু; বাউলদের কেউ কেউ বলেন—"গুরু অগণন।" বাংলার বাইরে সাধনার জগতে এমন বহুগুরুবাদ ভয়ঙ্কর কথা।

এক ভাবের ভাবুক সাধকদের মধ্যে একজন যদি তাঁর আদর্শ হারিয়ে ফেলেন তবে সবারই কাজ হ'ল তাঁকে জাগিয়ে তোলা। এমন অবস্থায় গুরু মৎস্যেন্দ্র-নাথকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর শিষ্য গোরখনাথ। এমন দুঃসাহসিক, এমন অদ্ভুত আচার আর কোথাও ঘটা সহজ নয়। শিষ্যও না-কি আবার গুরু!

এই অতুলনীয় সাহস এই সহজ স্বাধীনতা বাংলায় এখন দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। এখনকার নানাবিধ শিক্ষার সব গ্রন্থ পড়ে যেমনি সবাই পণ্ডিত হয়ে উঠচেন, তেমনি কেউ হয়ে যাচ্ছেন প্রাচ্যবিধির দাস, কেউ বা হচ্চেন প্রতীচ্য বিধির গোলাম। স্বাধীন ভাবে কেউই নূতন নূতন জ্ঞানকে আপনার ক'রে নিতে পারছেন না। এখনকার দিনের এই স্বাধীনতার জন্য বহুবিধ আস্ফালনের মূলেও যে কতখানি অস্বাধীন মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভাল ক'রে দেখবার বিষয়। কাজেই এখানে এখন দিন দিনই প্রাণের সেই সহজ স্বাধীন ভাব ও প্রকাশের বিলয় ও বিধ্বংস চলেছে। এমন ভাবে যদি কিছুকাল চলে তবে আর এই দেশের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের ও ভাব-ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্র থাকবে না।

বাংলার সেই পুরাতন ভাব-ঐশ্বর্য্যের যা-কিছু অবশেষ এখনও আছে তা দেখতে পাই নিরক্ষর দীনহীন আউল বাউলদেরই মধ্যে। এরাই সেই পুরাতন সাধন-সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আধুনিকতার আক্রমণে এদেরও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। খাঁটি গভীর ভাবের বাউল অতিশয় দুর্লভ হয়ে চলেছে। এখনকার দিনের বাজারের সস্তা ফরমাস গাইতে গিয়ে বাউলরা এখন স্বদেশী গান, দেশী শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে পদ, বড়জোর দেহতত্ত্ব ও পারমার্থিক রেলগাড়ী ও ষ্টিমারের গান করে বেড়াচ্ছে। সেই পুরাতন সব গম্ভীর পদ, ভাবপদ, অনুরাগপদ সবই এরা হারিয়ে বসেছে। দুই একজন এখনও যা আছে তাদের বৈরাগী বাউলদের মেলায় মাঝে মাঝে দেখা যেত। এখন সব স্থলেতে বিনা কষ্টে জাতীয় সাহিত্যসংগ্রাহক দলের খাতা-পেন্সিলের আক্রমণে তারাও সব সেখান হতে গা ঢাকা দিচ্চে। বাউলদের পদ সংগ্রহ করতে হলে সহজ রসের রসিক হয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরতে হবে। সস্তায় কিস্তী মারা চলবে না।

বাংলার প্রাণবস্তুর সত্যিকার পরিচয় এখনকার দিনে দিতে হ'লে এ সব দীনহীন আউল বাউলদের পদ ও পরিচয়ই দিতে হবে। বাংলার ভদ্র ও উন্নত আর সব সম্প্রদায়ই কোনো-না-কোনো সূত্রে বাইরের বিধি বিধান ও ভাবের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। এরাই শুধু নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু এতকাল পর্য্যন্ত কোনো মতে বজায় রেখেছে। নেবার মত জিনিষ এরা বাহির হতেও নিয়েছে; তবু কোথাও নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু খুইয়ে বসে আত্মঘাত করে নি। অথচ এদের বৈশিষ্ট্যের ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও কি বিশাল গভীর ও অসাম্প্রদায়িক ভাব! জাতি সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমত প্রভৃতির কোনো গণ্ডীই এদের উদার দৃষ্টিকে কিছুমাত্র সঙ্কীর্ণ করতে পারেনি।

সকল সীমার অতীত সহজ মানুষই এদের সাধনার ধন। সেই সহজ মানুষকেই এঁরা খুঁজে বেড়িয়েছে। জগতে নানা স্থানে যে এখন সহজ মানব ধর্ম্মের জন্য সন্ধান বসছে সেই দরবারে হয়ত কোনোদিন বাংলার সেই সব পুরাতন পদ ও সাধনার খোঁজ পড়বে। তাই এই আউল বাউলরা পৃথিবী থেকে লোপ হয়ে যাবার আগে তাদের সত্যিকার গভীর সব পদের যা-কিছু মেলে তা সংগ্রহ করে রাখতে হবে, তাদের পরিচয় যতটা সম্ভব জেনে রেখে দিতে হবে।

বাউলরা না লিখে রাখে তাদের কোনো পদ, না রেখে যায় তাদের কোনো পরিচয়। পুঁথিতে অক্ষরে তাদের ভরসা নেই। তাদের যা-কিছু ভরসা মানুষে। তাই মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সব যেতে বসেছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে নদীর তীরে এক খালের মুখে উপবিষ্ট এক বাউলের কাছে চমৎকার অনেক সব পদ শোনা গেল। তার কিছুই লেখা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কেন

কিছুই লিখে রাখ না, তোমাদের কোনো পরিচয় কেন তোমরা রেখে যাও না?"

তখন ভাঁটা, খালে শুধু তখন কাদা। গরজী দুই এক জন তাতেই নৌকো ঠেলে ঠেলে চলেছে। বাউল তাই দেখিয়ে বললেন, "বাবা, এই যে গরজের চোটে নাও ঠেলে এরা চলেছে, এদের চিহ্নই পড়ে থাকবে এই কাদায়। এদের এই চলাটাই কি সহজ? সহজ চলা চলেছে দেখ নদীতে যে সব ডিঙ্গী চলেছে পালে। তাদের কি বাবা কোনো চিহ্ন রইল পিছনে? আমরা যে বাবা সহজের পথিক, আমরা চিহ্ন রেখে যাই কেমন ক'রে?"

এই-সব আউল বাউলরা পুঁথির শাস্ত্রের ধার ধারেন না, পণ্ডিতজনেরা এঁদের করেন অবজ্ঞা, এঁরাও রাখেন না পণ্ডিতদের কোনো তোয়াক্কা। বরং বেশ রসিকতার সঙ্গেই তাঁদের দেন উড়িয়ে। শস্যের গোলায় মাঝে মাঝে নেংটে ইঁদুর ঢোকে। তখন যদি তার উপরে শস্যের ভার এসে পড়ে তখন চাপে সে মারা গিয়ে শুকিয়ে তার মধ্যেই পড়ে থাকে। এমন একটি শুট্‌কে নেংটে ইঁদুরকে দেখিয়ে রজ্জবজী বলেছিলেন, "আহা বেচারা যেন পণ্ডিত! জ্ঞান-রাজ্যের মত খাদ্যের রাজ্যে ঢুকলো খেতে, কোথায় তা খেয়ে হজম ক'রে হবে পুষ্ট, না তারই চাপে মরে শুকিয়ে আজ ওর এই দশা।"

পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও দুরূহ ভাষার বেড়া দিয়ে "অনধিকারী" "অপাংক্তেয়" লোক-জনকে তাঁদের তত্ত্ব-বাদের বাইরে রাখেন ঠেকিয়ে। বাউলদের তো আর সংস্কৃত বা দুরূহ ভাষা নেই। তারা তাই বেড়া দেন দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর। বাউল নিতাইকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, "কেন আমাদের পদগুলি হেঁয়ালীতে ইসারায় অন্ধিতে সন্ধিতে এত ঢাকা? বাঘের মত জোর তো নেই বাবা, তাই শজারুর মত থাকতে হয় কাঁটিয়ে। ওই গুলোই আমাদের কাঁটা। সংসার শুদ্ধই এই ভাব। প্রাণের জন্যে ফলায় ফসল। বাইরের শত্রুর থেকে বাঁচাবার জন্তে দিতে হয় আবার কাঁটাগাছের বেড়া। সে কাঁটা না যায় খাওয়া, না যায় পরা, না লাগে আর কোনো কাজে। ভাব অনুরাগের বস্তু যে জন না বোঝে, না মানে, না শ্রদ্ধা করে, সে-ই যদি আবার এসে বসে অনুরাগী যুগলের মাঝে, তবে কি হবে তাদের গতি? সরে বসবার ঠাঁইটুকুও যদি তাদের না থাকে তবে কথা বলতে হবে এমন ভঙ্গীতে যে, ওই ব্যক্তি আপনা হতে যাবে উঠে। যদি তাতেও সে না উঠে, তবে যা-কিছু বলা তা চালাতে হবে সাঁধে ইসারায় হেঁয়ালীতে। রসের রসিকদের জন্যে যদি রেখে যেতে হয় কোনো পদ তবে তাতে এমন একটু অসম্ভবের সন্ধি দেব রেখে, যে সে শুনেই বুঝে নেবে যে এর বাইরে কিছু নেই, এর ঢুকতে হবে ভিতরে। খোলার উপর ছোবড়া বলেই তো নারকেলের ভিতরে ঢুকতে হয় বাবা।"

সহজ পথের পথিক হলেও তাই এদের হেঁয়ালীতে কথা কইতে হয়। তা এসব পদও এরা লিখে পুঁথিতে সঞ্চয় করে রাখে না। শাস্ত্রের হাতে মার খেয়ে খেয়ে শাস্ত্রের উপর ওদের ধরে গেছে বিষম বিতৃষ্ণা। আবার পাছে সঞ্চয় করে করে ওরাই আর একটা শাস্ত্র গড়ে তোলে তাই ওদের ভয়। বলে, "এক শাস্ত্র ভেঙে বেরিয়ে এলাম কি আর এক শাস্ত্র গড়ে তুলতে?" আসল বাউলরা তাই না লেখে কোনো পুঁথি, আর অন্যকে যদি দেখেছে বসেছে তাদের পদ লিখতে, তবে যায় ভড়্‌কে। তাই মাঝে মাঝে যে-সব বাউলিয়া পুঁথি মেলে, বুঝতে হবে তাতে আছে সব ভাসা ভাসা তত্ত্ব; নয় তো সহজ সব সাধনার বিকার। খাঁটি গভীর পদ সেখানে পাবার আশা দুরাশা।

পুঁথির মধ্যে সঞ্চয় না করলেও এঁদের মনের মধ্যে থাকে অনেক অনেক পদের ভাণ্ডার। কোনো কথার প্রসঙ্গ উঠলেই এঁরা তার জবাব দেন গানে। ঠিক প্রসঙ্গ-মত একটা-না-একটা পদ এঁদের মনে এসে পড়বেই। সাদা কথায় বড়-একটা জবাব এঁরা দেন না। গানেই কেন জবাব দেন একবার জিগ্যেস করায় কেন্দুলীতে বাউল হরিদাস বলেছিলেন, "আমরা পাখীর জাত কি না, তাই মাটিতে হাঁটতে শিখিনি বাবা, জানি শুধু উড়ে চলতে।"

বেদ শাস্ত্র হ'ল এদের মতে প্রাচীন সব মহোৎসবের এঁটো পাতার সঞ্চয়। এঁরা বলেন, "ভবিষ্যতে যে আবার মহোৎসব হতে পারে এই ভরসা যাদের নেই তারাই তো

সব এঁটো পাতা কুড়িয়ে রেখে দেয় স্তূপ করে। মহোৎসব ক'রে তুলবার ভরসা নেই, কেবল এঁটো পাতা কুড়িয়েই অহঙ্কার। কার কত বেশী স্তূপ, কার কত বড় স্তূপ! এই নিয়েই দেমাক। এরই উপর পড়ে দিন-রাত শেয়াল কুকুরের মত চলচে পরস্পরে শুধু কামড়া-কামড়ি।"

কি আশ্চর্য্য! বাংলার বাউলদের মত রাজস্থানের বাউল রজ্জবজীও একেবারে এই কথাই তিনশ' বছর আগে বলে গেছেন। "উৎসবের পরে এঁটো পাতাগুলোরই যখন হয়ে উঠে ময়লা আবর্জ্জনার স্তূপাকার সঞ্চয়, তখন কুত্তায় কুত্তায় তারই উপর ঘিরে ঘিরে চালাতে থাকে হুজ্জত হুল্লড়, মারামারি কামড়াকামড়ি। মহাপুরুষের মহোৎসব যখন হয়ে যায় শেষ, জীবনযোগের যখন ঘটে অবসান, তখন আসে সব ক্ষুদ্র মানুষের অবসর। যত নীচপ্রাণেরা কামড়াকামড়ি ক'রে ক'রে তখন লড়তে মরতে থাকে।"

"জ্যোনার পছি পও লোঁকা কূড়া কচ্চর ঢের
কুত্তে কুত্তে লড়ি মরে, হুজ্জত হুল্লড় ঘের।
মহা পুর্খ জগন গয়া জব জীবন যোগ উগান।
খুর্দ নরোঁকা মৌকা আয়া, লড়ে মরে নীচ প্রাণ।"

সহজ বললেই আমাদের দেশে অনেকে বোঝেন সহজের নামে কতকগুলি বিকার যা আমাদের দেশে সহজের নামেই গেছে চ'লে। সে হ'ল সহজের অতিশয় মলিন রূপ। সাধনাতে সবচেয়ে বড় কথাই হ'ল সহজ। কবীর, নানক, রবিদাস, দাদূ প্রভৃতি সবাই নিজেদের সহজ পথেরই পথিক বলেই পরিচয় দিয়ে গেছেন। সহজ সাধনার বহু বাণীও তাঁরা প্রত্যেকেই রচনা করে গেছেন। দাদূর শিষ্য ভক্ত সুন্দরদাস তাঁর 'সহজানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন—"না কোনো কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডে, না কোনো বিশেষ কল্পনায়, না সাম্প্রদায়িক কোনো অনুষ্ঠানে ঘটে মানুষের সিদ্ধি।" (সহজানন্দ, ৩) "সহজেই ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্ত করে সহজ সমাধির মধ্যে হবে ডুবতে। সহজেই অন্তরের মধ্যে আপনি তখন চলতে থাকবে ভগবানের নাম, কৃত্রিম কোনো রকম জপজাপের থাকবে না কিছুই প্রয়োজন।" (সহজানন্দ, ৪) "সেই সহজ নিরঞ্জনই সবার মধ্যে, সহজের যোগভূমিতেই সব সাধকজন সম্মিলিত; শঙ্করাদি সাধকও এই সহজ পথেরই পথিক। সহজের পথেই সনক শুকদেবাদি সব ভক্তগণ" (সহজানন্দ, ১৯)

সহজ নিরঞ্জন সব মেঁ সোঈ।
সহজৈ সন্ত মিলৈ সব কোঈ।
সহজৈ শংকর লাগে সেবা।
সহজৈ সনকাদিক শুকদেবা।

—সহজানন্দ, ১৯

"ভক্ত সোজা ভক্ত পীপা সহজের আনন্দেই সমাহিত।
সাধক সেনা সাধক ধনা সহজের রসই করেন পান।
ভক্ত রবিদাস সহজেরই সেবক, গুরু দাদূরও আনন্দ
এই সহজ মতে।" —সহজানন্দ, ২৩

সোজা পীপা সহজি সমানা।
সেনা ধনা সহজৈ রস পানা।
জন রৈদাস সহজকৌ বংদা।
গুরু দাদূ সহজৈ আনন্দা। —(সহজানন্দ, ২৩

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সুন্দরদাসের জন্ম।

কবীর তো সহজ সম্বন্ধে বিস্তর বাণী রেখে গেছেন। তার কোথাও একটু মলিনতা নেই। বাউলরাও বলেন—

"সহজ হওয়া নয় রে সহজ
তাতে, দিবানিশি চাই সাধনা।"

সহজ পেয়েছেন বলেই মতবাদের বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণমতে এঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, যেখানে খালি দ্বন্দ্ব, খালি ঝগড়া, তা সে হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক। একবার প্রেমতলী হয়ে গৌড়ের দিকে যাবার পথে জলাঙ্গীর কাছে সাদী খাঁর দীয়াড়ের নিকটে সাঁই দরবেশী বাউল একদলের সঙ্গ পাওয়া গেল। তাঁদের এক গান শোনা গেল:—

(মোর) বাইতে তো চায় না রে মন মক্কা মদীনা।
(এই যে) বন্ধু আমার আছে, আমি রইরে তাঁরি কাছে
(আমি) পাগল হৈতাম ঘুরে রইতাম
তারে চিনতাম রে যদি না।
(আমার) নাই মন্দির কি মসজেদ,
নাই পূজা কি বকরেদ।
তিল তিলে মোর মক্কা কাশী
পলে পলে সুদিনা।

এই গানের রচয়িতার সময় গুরুপরম্পরা ধরলেও প্রায় দু'শ বছর দাঁড়ায়।

ভগবানের ডাক মানুষের কাছে আসে, কিন্তু সেই ডাক শুনে মানুষ যে সহজে তাঁর দিকে এগিয়ে চলবে তার কি জো আছে? সম্প্রদায়ের যত কৃত্রিম বাধা করে তার গতিরোধ। তাই দুঃখ ক'রে বাউল মদন বলছেন—'সহজে যদি বা পথ চিন্‌তো, ধর্ম্মেই করেছে সর্ব্বনাশ। যে ধর্ম্মে ডুবে মানুষ জুড়াবার করে আশা তাতেই লেগেছে আগুন। এখন উপায় কি?'

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
(তোমার) ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।
ডুইবা যাতে অঙ্গ জুড়ায়,
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বল্‌তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়
অভেদ সাধন মরলো ভেদে॥
তোর দুয়ারেই নানান্ তালা
পুরাণ কোরান তস্‌বী মালা
ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা
কাইন্দে মদন মরে খেদে।

মদনও বেশ পুরাতন পদরচয়িতা।

সম্প্রদায়ের পথ হ'ল সকলের সস্তায় চলবার ফেরবার পথ—তা আবার বিধি বিধান রীত নিয়ম ক্রীড্ ঢেলে দিয়ে পাকা করা। তাতে কি নবীন প্রাণের তৃণাঙ্কুর গজাতে পারে? সে বাঁধা পথ বন্ধ্যা। সে পথে যাঁরা চলেন তাঁরা জীবন্ত সহজকে পান না। ভয় ছেড়ে যদি এ সব বাঁধন খসাতে পারা যায় তবেই এ সব মরম রসের দর্শন মিলতে পারে।

গতাগতের বাংধা পথে
আজার না যাস কোনো মতে॥
রীতে পথেই চলেন যারা
জ্যান্তা সহজ পা (য়ে)ন কি তাঁরা?
নিয়ম রীত ছাড়ায়্যা গেলে।
মরম রসের দরশ মেলে।
কয় 'বলা' ভয় ছাড়রে 'বিশা'।
খসলে বাঁধন মিলবো দিশা।

পদরচয়িতা বিশা (বিশ্বনাথ?) জাতিতে ভূঞিমালী, কৈবর্ত্ত বলার (বলরামের?) শিষ্য। প্রায় আড়াই শ' বছর পূর্ব্বকার মানুষ।

এই বিশাই আবার বলছেন যত সব সম্প্রদায়িক রীতি বা নিয়ম বা ক্রীড্, সে সবই হ'ল পূর্ণ সত্যের একটি একটি ভাঙা অংশ। এই ভাঙা অংশগুলিই মহা ভার। এক কলসী জল মাথায় নিয়ে দাঁড়ানো কঠিন অথচ ভরপুর সাগরে ডুব দিলে কোনো ভয়ই নেই। ভাঙা সাধনাই শক্ত বাঁধন। আধা সত্যই পরম বাধা। যে চিন্তামণিহার শোভা-সৌন্দর্য্যের সার, তার থেকে যদি ভাব ও চিন্তাটুকু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে তার বাকী অংশটুকু হয়ে ওঠে বজ্রের মত কঠিন বাঁধন। কাজেই তাঁদের মতে পূরা সাধন সাধতে গেলে আর কিছুরই ধার ধারতে নেই।

পূরা সাধন সাধছ যদি
ধরিছ না আর কোনো ধার।
ভাঙ্গা সাধন বিষম বাঁধন
আধার বাধার নাইরে পার।

*　　*　　*　　*

আমার চেন্তামণি হার
যদি হারায় চেন্ত তার
তবে এমন বান্ধন বান্ধতে পারে
(যে) ছাড়ায় সাধ্য কার?
যখন অবোধ বিশা
না পাছ দিশা
তখন পূরা সাধন করিছ সার
(সেই সহজ সাধন করিছ সার)।

সমাজে থাকতে গেলেই "নিয়ম রীতের" বাঁধন আছে। কাজেই সে-সব এড়াবার উপায় কি? সন্ন্যাস নেবার সময় তাই সবাই নিজের শ্রাদ্ধ করে বের হন। অর্থাৎ তখন তাঁর সামাজিক জীবনের অবসান (সিভিক্ ডেথ্) ঘটলো, কাজেই আর তো কোনো দায় তাঁর রইল না। বাউল ও সুফীদের মধ্যেও জ্যান্তেই মরণ বা 'ফানা' তাই আছে। বাউলরা এজন্যেই হন 'বাউল' বা পাগল। পাগলের তো আর কোনো সামাজিক দায় নেই। এই জন্যেই সহজ পথের সাধনায় বের হ'তে গিয়ে এদের বাউল হ'তে হয়। বাউল নরহরি তাই গাইলেন—

তাই তো বাউল হৈনু ভাই।
লোকের বেদের ভেদ বিভেদের
আর তো দাবি দাওয়া নাই।
নাই হাকম হকম জুলুম নেম (নিয়ম) রীতি
নিজানন্দে চলি সদাই আত্মভাব প্রীতি
প্রেম যোগেতে নাইরে বিয়োগ
সবার সাথে নাচি গাই ॥

পাগল বলেই হোক, জ্যান্তে মরেই হোক, মানবজীবনের মহা সত্যটি পেয়ে যেতেই হবে। মানবজীবন একটা কত বড় সুযোগ। এত বড় সুযোগ পেয়ে কি শুধু কতকগুলি "নিয়মরীত" মেনেই এই পৃথিবী থেকে চলে যাব? মনের এই দারিদ্র্য হ'তে বাঁচতেই হবে। তাই নাথ যোগী বাউল আদ্যনাথ বলেন—

যদি ভেটবি সে মানুষে।
তবে, সাধনে সহজ হবি
তোর যাইতে হবে সহজ দেশে ॥

এই মানুষতত্ত্বই হ'ল বিশ্বের সারতত্ত্ব। বিশ্বনাথই পরিপূর্ণ বিশ্ব, তিনিই ভাবের মানুষ, তিনিই সহজ, তাঁতেই সবার চরম সার্থকতা। তাঁকে পেতে হ'লে কৃত্রিম কিছুই হবে না করতে; হ'তে হবে শুধু সহজ। কারণ মানুষের মধ্যেই সব আছে। বিশ্বের যা-কিছু সত্য সবই আছে মানুষে। তার বাইরে গেলেই নানা মিথ্যা নানা কৃত্রিম বন্ধন। এই মানুষেই চরম সাধনা, মানুষেই চরম সিদ্ধি। বাউলদের আদি কথাও এই মানুষ, অন্ত কথাও এই মানুষ! বিশার গুরু বলা তাই বলেন—

আদ্য অন্ত এই মানুষে
বাইরে কোথাও নাই।
আচার বিচার ধোকা বাজী
ভুলিছ নারে তাই।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে
ঘুরায় কেবল নানান টানে।
যোগে যাগে তীর্থে স্নানে
(সেই) সহজ মানুষরে হারাই ॥
জা(ই)তের পা(ই)তের পরদা ঢাকা
(তাই) মিথ্যা অন্ধ হইয়া থাকা।
(তাই) সহজ মানুষ দেয় না দেখা
(তারে) সহজ বিনা কেমনে পাই ॥
ধ্যান জ্ঞান প্রেম যোগানন্দ
মানুষ ন(া)ইলে কেবল ধন্দ
সিদ্ধি সাধন রস আনন্দ
মানুষ ছাড়া কিছুই নাই।

নিরক্ষর মূর্খ ছোটলোকদের মুখে এমন সাহসে এমন সহজে এমন গভীর ক'রে মানুষের জয়গান জগতের মহা মহা পণ্ডিতদের কাছ থেকেই কি খুব বেশী শোনা গেছে? অথচ এই বাণীই হ'ল বাংলার সহজ বাণী, তার নিরক্ষর প্রাকৃতজনের মুখে উচ্চারিত। এই মন্ত্রই তার সাধনার বীজমন্ত্র। এই হ'ল বাংলার প্রাণবস্তু।

[১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পাটনা ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের বাংলা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ; প্রথমে মৌখিক বলা হয়, পরে লিখিত]

বঙ্গে বর্গী

স্যর যদুনাথ সরকার

(১)

ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বাংলা দেশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে অতুলনীয়। এখানে বিহার বা আগ্রার মত কৃষককে কঠিন পরিশ্রমে কূয়া হইতে জল তুলিয়া অথবা সুদূর নদী ও বাঁধ হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া ক্ষেতে দিতে হয় না। প্রতি বৎসর বর্ষার স্রোত জমির উপর পলিমাটি বিস্তার করিয়া দেয়। বাংলায় চাষের কাজে মানুষের চেষ্টা বা খরচ আবশ্যক নাই বলিলেও চলে; প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে এখানে জমিতে যেন আপনা হইতেই প্রচুর ফসল জন্মায়; গ্রামে গ্রামে কত গাছ নানা রকমের সুমিষ্ট ফল দান করে; এই জলের দেশে অসংখ্য নদীপুকুর মাছে ভরা। বাংলা দেশে খাদ্য প্রচুর; দিনরাত্রে কখনও পাহাড়ে-দেশের মত অসহ্য শীত অথবা মরুভূমির মত অসহ্য গরম হয় না বলিয়া লোকের কাপড় ও বাড়িঘর যৎসামান্য হইলেই চলিয়া যায়। এইরূপ অবস্থার ফলে জনসংখ্যা অবারিত-ভাবে বাড়িয়া যায়, রাজা জমিদার ও বণিকের হাতে অগণিত ধনরত্ন সঞ্চিত হয়। সত্য বটে, মাঝে মাঝে প্রকৃতির রোষে প্রলয় বন্যা অথবা মড়ক আসিয়া এক এক বৃহৎ অঞ্চলের বাড়িঘর চাষবাস মানুষ ও ধন মুছিয়া লোপ করিয়া দেয়, কিংবা প্রজাবিদ্রোহ, রাজায় রাজায় দ্বন্দ্ব, শান্তিভঙ্গ ও অরাজকতা ততোধিক ধনজন ধ্বংস করে। কিন্তু আবার যেই একছত্র প্রবল রাজশক্তি আসিয়া খাড়া হয়, সুশাসন ও শান্তি দেখা দেয়, অমনি "মূর্চ্ছিত পীড়িত দেশ" জাগিয়া উঠে,—কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐশ্বর্য্য ও জনসংখ্যা বাড়িয়া অতীতের ক্ষতি পূরণ করিয়া ফেলে, তাহার সব ভীষণ চিহ্নগুলি লোপ করিয়া দেয়।

বঙ্গবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান শত্রু এই শান্তিভঙ্গ, এই প্রাধান্যের লোভে নেতায় নেতায় লড়াই এবং রাজশক্তিকে লঙ্ঘন। অতি পূর্ব্বে পাল-রাজবংশের আদিপুরুষ এক বিজয়ী সেনাপতি এইরূপ "মাৎস্য-ন্যায়" হইতে বাংলা দেশকে রক্ষা করেন। কিন্তু হিন্দু-সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঠানযুগে আমাদের দেশে সেই খণ্ডরাজ্য, সেই স্বার্থে অন্ধ স্ব স্ব-প্রধান দলপতিদের বিদ্রোহ ও অন্তর্বিবাদ, সেই রাজহত্যা ও নগর লুণ্ঠন আবার দেখা দিল; বাহিরে বাংলার নাম হইল "সদা বিদ্রোহের দেশ"।

(২)

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করিয়া দেশময় একছত্র রাজত্ব ও একই শাসন স্থাপিত করিলেন, অশান্তি হইতে বাংলা বাঁচিল, পালযুগের মতই আবার ধনজন সাহিত্য কলা দ্রুত বাড়িতে লাগিল। "এই মুঘল রাজকীয় শান্তি" বঙ্গদেশে নবযুগ আনিয়া দিল। সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মুঘল সুবাদার (অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা)-দের মধ্যে অনেকেই অতি ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ বীর পুরুষ ছিলেন; তাহার ফলে বাংলা দেশের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত গেল। এদেশের সহিত ইংরাজ ডাচ্ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে দুই-তিনগুণ বাড়িয়া উঠিল। শুধু ইংরাজ কোম্পানীই ১৬৬৮ সালে পৌনে-তিন লক্ষ টাকার মাল বাংলা দেশ হইতে রপ্তানী করেন, আর তাহার বার বৎসর পরে (১৬৮০ খৃষ্টাব্দে) বার লক্ষ টাকার! [এক পাউণ্ডকে ঐ যুগে আট টাকার সমান ধরা হইত।] সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক কাসিম-বাজারেই ইংরাজ ডচ্ ফরাসী এই তিন জাতির সাহেবরা বৎসরে দেড় হাজার রেসমের তাঁতীকে দাদন দিয়া কাজে লাগাইয়া রাখিতেন। এইরূপে ইউরোপীয় বণিকগণ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বঙ্গে শিল্পদ্রব্য ও অন্যান্য

পণ্যের উৎপত্তি অনেকগুণ বাড়াইয়া দিলেন, আমাদের অসংখ্য কারিগর ও চাষী কাজ পাইল, এবং বিনিময়ে বিলাত হইতে প্রেরিত টাকা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

(৩)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলার রাজস্ব মুঘল বাদশাহের একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুদূর দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধ আওরংজীব পঁচিশ বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে বিব্রত, মারাঠাদের লুণ্ঠনে ও জাঠবিদ্রোহে দেশ উৎসন্ন, রাজকোষ শূন্য, সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের তিন বৎসরের বেতন বাকী, রাজপরিবারে অন্নাভাব। এরূপ অবস্থায় শুধু বাংলার সুদক্ষ প্রভুভক্ত দেওয়ান (কার্য্যতঃ সুবাদার) মুর্শীদ কুলী খাঁর প্রেরিত বাংলার খাজনা তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিল। বৎসর বৎসর ঐ টাকা আসিবার পথে ক্ষুধার্ত্ত মুঘলরাজ এবং সিপাহিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিত। এমন উপকারী দেওয়ানের বিরুদ্ধে আওরংজীব কাহারও কথা শুনিতেন না; মুর্শীদ কুলী খাঁর নালিশের ফলে তিনি নিজ প্রিয় পৌত্র শাহজাদা আজীম-উশ্-শান্‌কেও ধমকাইয়া পাটনায় বদলি করিয়া দিলেন (১৭০৩)।

আর মুর্শীদ কুলী খাঁও কড়াহাতে দেশময় দুষ্টের দমন ও শান্তি স্থাপন করিয়া ফেলিলেন, জমিদারদিগের দেয় খাজনা ঠিকমত আদায় করিতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে পুরাতন অকর্ম্মণ্য বাকী-খাজনার জন্য দায়ী জমিদারদিগকে "বৈকুণ্ঠে" (অর্থাৎ বিষ্ঠাপূর্ণ কুণ্ডে) আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়া অথবা তাহাদের জমিদারী নূতন কর্ম্মঠ লোকদের হাতে দিয়া রাজস্বের ক্ষতি বন্ধ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলা কতকটা আফঘানিস্থানের মত ছিল, সেখানকার স্থানীয় প্রধানগণ সম্রাটের শাসন প্রায়ই মানিত না, কোন নির্দ্দিষ্ট হারে অথবা নিয়মিতভাবে খাজনা দিত না, সুবাদারকে যাহা পাইতেন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু মুর্শীদ কুলী ঐ দুই প্রকাণ্ড ও উর্ব্বর জেলায় দৃঢ় রাজশাসন স্থাপন করিয়া, দক্ষ বাধ্য এবং সৎ নূতন লোককে ওখানকার জমিদারী বিলি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া ফেলিলেন, এবং তাহা বৎসর বৎসর ঠিক আদায় হইতে লাগিল। আজকালকার ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট এই সময় রেগুলেশন ডিষ্ট্রিক্ট হইল।

বাংলা প্রদেশের নির্দ্দিষ্ট সরকারী খরচ বাদে যে খাজনা বাঁচিত তাহা বৎসর বৎসর (কখনও বা দুই বৎসর পরে) দিল্লীর বাদশাহের নিকট পাঠানো হইত। ইহার পরিমাণ এক কোটি টাকা বা কিছু কম বেশী হইত। মুঘল সাম্রাজ্যের আর কোন সুবা হইতে রাজ-কোষে এত টাকা এত নিয়মিতভাবে আসিত না। এজন্য ভারতময় বাংলার নাম হইল "স্বর্ণভূমি।" পরে এই খ্যাতি আমাদের সুখের কারণ হয় নাই।

২১ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ শাসন করিবার পর মুর্শীদ কুলী খাঁ ৩০এ জুন ১৭২৭ সালে মারা গেলেন। তিনি নামে সুবাদার, কিন্তু কাজে স্বাধীন নবাবের মতই ছিলেন; নিয়মিতভাবে রাজস্ব পাঠাইতেন, আর দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রদেশে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দিন খাঁ ইহার পর বার বৎসর বাংলার নবাব ছিলেন; ইনিও নিয়মিতভাবে সঞ্চিত খাজনা বাদশাহকে পাঠাইতেন। মুর্শীদ কুলী খাঁর সরকারী উপাধি ছিল "জাফর খাঁ নসিরী," কিন্তু মিরজাফরের সঙ্গে গোলমাল হইতে পারে বলিয়া আমরা তাঁহাকে বরাবর মুর্শীদ কুলীই বলিব। শুজা খাঁর জামাতার নামও মুর্শীদ কুলী ছিল, কিন্তু আমরা এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার উপাধি "রুস্তম জং" দ্বারা নির্দ্দেশ করিব। সিয়ার-উল্-মুতাখ্‌খরিন ও ইংরাজ কুঠির চিঠি পড়িবার সময় পাঠক এই কথাগুলি মনে রাখিবেন।

(৪)

কিন্তু শুজা খাঁর মৃত্যুর সময় (১৩ মার্চ ১৭৩৯) দিল্লীতে মহা বিপ্লব ঘটিল। পারস্যের রাজা নাদির শাহ এক যুদ্ধে বাদশাহকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া রাজধানী অধিকার করিলেন (দিল্লী প্রবেশ ৮ মার্চ)। তাহার পর তিনি সম্রাট ও দেশের বড়লোকদের পীড়ন করিয়া

অগণিত ধনরত্ন লুটিয়া, রাজধানীর নাগরিকদের হত্যা করিয়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুবাগুলি সন্ধিসূত্রে লইয়া, পারস্তে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু দিল্লী-সাম্রাজ্যে আর না রহিল প্রাণ, না রহিল মান। শক্তি ও ধন খ্যাতি ও একতা হারাইয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল; প্রদেশ-গুলি স্বাধীন বা পরের অধিকৃত হইতে লাগিল।

মানুষের, এমন কি গাছের, যখনই জীবনীশক্তি হ্রাস হয়, যখনই হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনই তাহার প্রথম চিহ্ন দেখা দেয় হাত পা অবশ হইয়া, দূরের ডালগুলি সজীবতা হারাইয়া। তেমনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যখন দুর্ব্বলতা রক্তহীনতা আক্রমণ করে,প্রথমেই সীমান্তের প্রদেশগুলি পৃথক হইয়া যায়—হয় তাহাদের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, না-হয় অন্য রাজারা সেগুলি জয় করেন। নাদির শাহ দিল্লী-সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডে যে মরণের ঘা দিয়া গেলেন তাহার ফলে সীমান্তের সুবা গুজরাত, কর্ণাটক, বাংলা ও পঞ্জাব (পরে মালব ও অযোধ্যা) ক্রমে ক্রমে বাদশাহের হাত হইতে বাহির হইয়া গেল; আর সেই সঙ্গে তাহারা মুঘল-শান্তি হারাইল, যুদ্ধ হত্যা ও লুণ্ঠনের নিত্য লীলাভূমি হইল।

(৫)

শুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সর্‌ফরাজ খাঁ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব হইলেন। তিনি যুদ্ধ ও শাসন দুই কাজেই অপারগ; দিবারাত্রি মালাজপে ব্যস্ত থাকিতেন, অথচ এত কাঁচা বুদ্ধি যে কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারিতেন না। শুজা খাঁর প্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দক্ষতম কর্ম্মচারী ছিলেন দুইজন,—হাজী আহমদ (বাংলার দেওয়ান) এবং হাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলীবর্দ্দী খাঁ (বিহারের সহকারী সুবাদার)। ইহারা সরফরাজের ঈর্ষার পাত্র হইলেন; নূতন নবাবের নূতন পরামর্শদাতারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ঐ দুই ভাইয়ের ক্ষমতা কমাইতে না পারিলে তাঁহারা কিছুদিন পরে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া নিজেই নবাব হইবেন। সরফরাজ দুই ভাইয়ের হাত হইতে সরকারী সৈন্য সরাইবার এবং তাঁহাদের পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন,—তাঁহার কুব্যবস্থার ফলে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সব জানিয়া আলীবর্দ্দী সসৈন্যে বাংলায় আসিলেন এবং গিরিয়ার নিকট সর্‌ফরাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া (১০ এপ্রিল ১৭৪০) নিজে নবাব হইলেন।

কিন্তু ইহা হইতেই বিজেতার বিপদের সূত্রপাত হইল। সম্রাটের হুকুম অনুসারে তাঁহার বাধ্য কোন কর্ম্মচারী যদি এক প্রদেশের শাসনভার লয়, লোকে সহজে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না, কারণ সে নিজে কোন অবৈধ কাজ করে নাই, বাদশাহের আজ্ঞা পালন করিয়াছে মাত্র; তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাদশাহ দায়ী। কিন্তু যে-সেনাপতি ন্যায্য শাসনকর্ত্তাকে হারাইয়া নিজবলে সিংহাসন দখল করে, আর তার পর বাদশাহকে টাকা পাঠাইয়া নিজ অবৈধ কাজটিকে মঞ্জুর করাইয়া লয়, সে নিজের বিরুদ্ধে একটি মহা বিপদজনক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া দেয়। অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিরাও মনে করিতে থাকে যে উহাকে মারিয়া সিংহাসনে বসিতে পারিলে, পরে বাদশাহকে টাকা পাঠাইলেই সব দোষ কাটিয়া যাইবে, এবং তাহারা ন্যায়সঙ্গত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যখন সর্ব্বোচ্চ রাজ্যশক্তির দুর্ব্বলতা বা নৈতিক অধোগতি হয়, তখনই প্রদেশে প্রদেশে অবিরাম বিদ্রোহ খুন ও অশান্তির পথ খুলিয়া যায়।

(৬)

আলীবর্দ্দী নবাব হইবামাত্র মৃত সর্‌ফরাজের বৈমাত্রেয় ভগিনীর স্বামী মুর্শীদ কুলী রুস্তম জং উড়িষ্যায় নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, এবং বঙ্গদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য লইয়া কটক হইতে বালেশ্বরে অগ্রসর হইলেন। ডিসেম্বর মাসে আলীবর্দ্দী নিজ রাজধানী হইতে সেদিকে রওনা হইলেন; কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া দুই পক্ষ মুর্চ্চা খুঁড়িয়া ওৎ পাতিয়া থাকিয়া এবং দু-একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধে কাটাইলেন। পরে বালেশ্বর শহরের বাহিরে ফুলওয়ারির ময়দানে, ৩রা মার্চ্চ ১৭৪১ সালে, রুস্তম জং পরাস্ত হইয়া সুরত বন্দরের এক জাহাজে চড়িয়া একা

মসুলিপটনে পলাইয়া গেলেন। আলীবর্দ্দী কটক অধিকার করিয়া তথায় নিজ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদকে নায়েব-সুবাদার পদে বসাইয়া, মুর্শীদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু আগষ্ট মাসে রুস্তম জঙের জামাতা মির্জা বকর আলী মারাঠাদের সাহায্য লইয়া হঠাৎ আক্রমণে কটক অধিকার করিয়া নায়েব-সুবাদারকে পরিবারসহ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। আলীবর্দ্দী মহা চিন্তায় পড়িয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যায় গেলেন, এবং মির্জা বকরকে পরাস্ত করিয়া নিজ জামাতা কন্যা ইত্যাদির উদ্ধার করিলেন। বকর আলী দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গিয়া মারাঠাদের মধ্যে আশ্রয় লইলেন (নভেম্বর ১৭৪১)।

আর একদিকেও মারাঠাদের বঙ্গে আসিবার পথ খুলিয়া গেল। পাটনায় আলীবর্দ্দীর প্রতিনিধি বিহারের দক্ষিণ প্রান্তে জঙ্গল-পর্ব্বতভরা রামগড় (বর্ত্তমান হাজারিবাগ জেলা), পালামৌ, শরিষাকুটুম্বা প্রভৃতির রাজা-জমিদারদের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হইলেন; তাহারা নবাবকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চিম পাশে হাতের কাছে নাগপুর হইতে মারাঠাকে বিহার আক্রমণ করিতে ডাকিয়া আনিল, পথঘাট দেখাইয়া রসদ দিয়া সাহায্য করিল।

(৭)

মারাঠাশক্তি হঠাৎ এক পা ফেলিয়া ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত হয় নাই। অন্যান্য সমস্ত বিজেতা জাতির মত তাহারা নিজদেশ হইতে অল্প দূরে দূরে আড্ডার পর আড্ডা (military base) স্থাপন করিয়া রীতিমত পদে পদে অগ্রসর হইয়াছিল। এক আড্ডায় নিজ শক্তি দৃঢ় না করিয়া সেখান হইতে অতি দূরে কোথাও বেশী দিনের জন্য অভিযান পাঠাইত না। কোন প্রদেশ বা শহর অধিকার করিবার জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী শেষ আড্ডা হইতে রওনা হইত, এবং বাধা পাইলে বা পরাস্ত হইলে সেই পিছনের আড্ডায় ফিরিয়া আশ্রয় লইত, কিংবা তথা হইতে সৈন্যসাহায্য চাহিয়া পাঠাইত। যতই তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইত ততই আড্ডাগুলি বৎসর বৎসর আরও দৃঢ়, আরও ধনজন খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এই প্রণালী ভিন্ন কোন জাতিই দূরদেশ জয় করিতে পারে না। মারাঠারা দাক্ষিণাত্য হইতে বাহির হইয়া বিশ বৎসরের মধ্যে (১৭৩০-১৭৫০) পশ্চিমে গুজরাত, পূর্ব্বে কর্ণাটক, উত্তরে মালব ও বুন্দেলখণ্ড দখল করিয়া ফেলিল। শাহু রাজার রঘুজী ভোঁসলে নামক সেনাপতি নাগপুর জয় করিয়া তাহাকে বঙ্গবিহার আক্রমণের স্বাভাবিক আড্ডা করিয়া তুলিলেন, কারণ নাগপুর প্রদেশ হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গোণ্ডওয়ানা ও ছোট নাগপুর দিয়া সহজেই দাক্ষিণ-বিহারে, আর ঠিক পূর্ব্বে গিয়া পাচেট হইয়া বর্দ্ধমান মুর্শীদাবাদ জেলায়, অথবা দক্ষিণে ঝুঁকিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশের অগণ্য পথ আছে। বঙ্গবিহার-উড়িষ্যার নবাব ইহার কতগুলি একসময়ে রোধ করিতে পারেন? এই নাগপুরের আড্ডা হইতে একদল মারাঠা অশ্বারোহী ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে কাশী জেলায় প্রবেশ করে, এবং তিনটি বড় শহর লুটিয়া মে মাসে ফিরিয়া যায়। তখনই লোকে ভয় করিতে লাগিল যে, উহারা হয়ত মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত আসিবে (*F. R.*)। কিন্তু সে বৎসর তাহারা শুধু পথ চিনিয়া গেল, অতদূর অগ্রসর হইল না।

এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই বর্গীর হাঙ্গামা এক রাজা কর্ত্তৃক অপর রাজার দেশ অধিকার করার মত নহে। মারাঠা-সৈন্য শুধু দেশ লুটিতে এবং চৌথ আদায় করিতে আসিত, আর পথের ধারের যত রাজদ্রোহী বা ডাকাত দলপতি লুঠের ভাগ পাইবার আশায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। ফলতঃ, মারাঠা-সৈন্য যত সব বিদ্রোহী লুণ্ঠনপ্রিয় ও শান্তিভঙ্গকারী লোকদের পক্ষে আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল; তাহারা যতই অগ্রসর হইত স্থানীয় এই সব শ্রেণীর লোকের সাহায্যে তাহাদের দলপুষ্টি হইত। স্বয়ং শিবাজীর সুরৎ এবং কর্ণাটক অভিযানে এইরূপ ঘটনা ঘটে; বঙ্গবিহারের গৃহশত্রু ভোঁসলেকে ডাকিয়া আনিল।

(৮)

১৭৪১ সালের শেষে কটক পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া তথাকার শাসনকার্য্যে গোছমিছিল করিয়া দিয়া, আলীবর্দ্দী খাঁ পথে শিকার করিতে করিতে ধীরে ধীরে নিজ রাজধানীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৪২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বর্দ্ধমান জেলায় পৌছিলেন। এমন সময় রঘুজী ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত পঁচিশ হাজার মারাঠা-সৈন্য লইয়া ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়া পাচেট ও ময়ূরভঞ্জ জমিদারীর মুখে মেদিনীপুর জেলায় অবাধে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের গতি অতি দ্রুত এবং পথে তাহাদের বাধা দিবার কেহ ছিল না বলিয়া, যখন নবাব এই আক্রমণের সংবাদ প্রথম পাইলেন, তখন মারাঠা-সৈন্য তাঁহার শিবির হইতে একদিনের পথমাত্র দূরে পৌছিয়াছে। এই সময় আলীবর্দ্দীর অবস্থা মহা সঙ্কটময়। তিনি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, কারণ উড়িষ্যা-বিজয় শেষ হওয়ায় অধিকাংশ সৈন্যকে বিদায় দিয়াছেন এবং অনেককে নিজের অগ্রে মুর্শীদাবাদে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তিনচারি হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচহাজার বন্দুকধারী পদাতিক রক্ষী মাত্র ছিল। নবাব অমনি মুবারক-মঞ্জিল হইতে একদিনের পথ অগ্রসর হইয়া বর্দ্ধমান শহরের এক পাশে পৌছিলেন; মারাঠা-সৈন্য অপর পাশে পৌছিয়া (১৫ই এপ্রিল, ১৭৪২) লুঠ ও ঘরপোড়ান আরম্ভ করিয়া দিল। দুই পক্ষে ছোটখাট লড়াই হইতে লাগিল। ভাস্কর পণ্ডিত দশলক্ষ টাকা পাইলে চলিয়া যাইবেন বলিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী যুদ্ধ করা স্থির করিলেন। এই যুদ্ধে আফগান সৈন্যগণের অসন্তোষ ও অবাধ্যতার ফলে নবাবের নিজের ও সৈন্যদলের সমস্ত সম্পত্তি শিবির প্রভৃতি মারাঠারা লুটিয়া লইল, অনেক লোক মারা গেল, এবং রক্ষীসহ তিনি নিজে শত্রুদ্বারা ঘেরা হইয়া পড়িলেন। দিনের পর দিন সৈন্যদলের সকলকে অনাহারে কাটাইতে হইল। কিন্তু অদম্য সাহসের ও স্থিরতার সঙ্গে আলীবর্দ্দী, একদিকে মারাঠাদের বাধা দিয়া, অপরদিকে আফঘান সেনাপতিদের মন সন্তুষ্ট করিয়া, দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ায় পৌছিয়া প্রাণ ও মান বাঁচাইলেন। এখান হইতে মুর্শীদাবাদ দু-দিনের পথ। মারাঠারা পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্থান, রাজধানীর শহরতলী পর্য্যন্ত লুঠ করিতে লাগিল। বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হইল; ইহা অনেক বৎসর ধরিয়া চলিবার পর অবশেষে অবসন্ন বৃদ্ধ নবাব উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদের একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

(৯)

বঙ্গের ইতিহাসের এই ঘটনাটির বিস্তৃত কাহিনী রচনা করিবার প্রধান উপাদান (১) সিয়ার-উল্-মুতাখ্‌খরিন, (২) বাংলার ইংরাজ বণিকদের বিলাতে প্রেরিত পত্র [এগুলি মহামূল্যবান্, এবং তারিখ আদিতে সিয়ারের ভুল সংশোধন করিবার পক্ষে সাহায্য করে], (৩) সলিমুল্লা রচিত তারিখে-বাঙ্গালা [গ্লাড্‌উইন্ কর্ত্তৃক ইহার ইংরেজী অনুবাদ, যাহার ২য় সংস্করণ বঙ্গবাসী প্রেস ছাপিয়াছে, সম্পূর্ণ ও সঠিক নহে, মূল ফার্সী গ্রন্থ দেখা আবশ্যক], (৪) আখ্‌বারাৎ অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহের দরবারের সংবাদ, [১৭৪৩ সালের ৩৫ দিনের (এপ্রিল-মে) কাগজ প্যারিসে পাইয়াছি, এগুলি পেশোয়া বালাজী রাও-এর বঙ্গে আগমনের অমূল্য বিবরণ ও তারিখ দেয়], (৫) নাগপুর-কর ভোঁসলের হকিকৎ, মারাঠী ভাষায় [ইহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা কম।], (৬ ও ৭) বাংলা "মহারাষ্ট্রপুরাণ"— এবং সংস্কৃত এক ছোটকাব্য 'চিত্রচম্পূ' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছাপা (সা-প-পত্রিকা, ১৩ খণ্ড এবং ৩৫ ভাগ)।

দীপশিখা ও তৈল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সংসারে চারিটি প্রাণী। চাকুরি এক দেশী মিলে— বিদেশী ম্যানেজারের অধীনে। সপ্তাহান্তে যে ক'টি টাকা হাতে আসে, তাহাতে সংসার একপ্রকার চলিয়া যায়। সুতরাং চিত্ত নিরুদ্বিগ্ন।

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড মিল—নূতন একটা শহরের সৃষ্টি করিয়াছে।

মিলের সুতীব্র কর্কশ বাঁশী—গ্রামের বুকে প্রতি প্রত্যূষে দ্বিপ্রহরে ভূমিকম্পের সময় শঙ্খ-ধ্বনির মত বাজিয়া উঠে। ভূমিলক্ষ্মী অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠেন। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ জলস্রোতের মত অবাধে ইহার বিরাট জঠরে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হয়।

প্রত্যূষে বাঁশীর ডাকে ঘর ছাড়িয়া তাহারা উধাও হইয়া যায়, দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসে। রাঁধা-খাওয়ার জন্য ছুটি ঘণ্টা অবসর। তারপর আবার যাত্রা। অপরাহ্নে যখন পুনরায় গৃহমুখী হয়,—মুখের ক্লান্তির উপর একটু হাসি বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। রাত্রির সুদীর্ঘ প্রহরগুলি তাহাদের একান্ত নিজস্ব।

রাত্রির প্রসন্ন হাস্য আবার দিনের আলোয় মলিন হইয়া আসে। দীর্ঘ দিনমান দুর্ভর সুদীর্ঘ প্রহরগুলি লইয়া কর্মক্ষেত্রে বিভীষিকা বিস্তার করে। তবু চিন্তাহীন শ্রমের সঙ্গে তাহাদের মিতালী অচ্ছেদ্য।

বিভূতিকে কলম চালনা করিয়া খাতায় অঙ্কপাত করিতে হয়। হাতের আঙুলগুলি বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিলেও নিবৃত্ত হইতে চাহে না। পশ্চাতের ক্ষুদ্র সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত তাহাকে আলস্য হইতে রক্ষা করে। কর্তব্যের বাঁধা-ধরা ঘণ্টাগুলির উপরও দু-এক ঘণ্টা সে আলস্যকে জোর করিয়া শাসন করে। বাড়ি আসিয়া একটা মাদুরের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশের তারা গোনে না, চাঁদের শোভাও দেখে না, শুধুই চক্ষু মুদিয়া আরাম উপভোগ করে। তাহার নিমীলিত নয়নের উপর শুভ্র কিরণ-লেখা শৈশবের মাতৃস্নেহের মত নিতান্ত অযাচিত ভাবেই শীতল স্পর্শ বুলাইতে থাকে।

দিন যায়। বিভূতির কুঞ্চিত কালো চুলের সযত্নরচিত তরঙ্গ বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে—দুই একটি শুভ্র বিন্দু এখানে-ওখানে ফুটিয়া উঠিয়া বয়সের বিজ্ঞতা ঘোষণা করিতেছে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর এই যন্ত্র-দানবের জঠরে থাকিয়া সে আজ ভারতের আদর্শ কেরাণী।

মংলু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া দেখিল,—হাজিরাবাবু গেট বন্ধ করিয়া দিতেছেন। কাতর চোখে মিনতি ভরিয়া সে কহিল,—"বাবু মাপ কিজিয়ে। আজ নিয়ে সাত দিন লেট হোবে।"

বিভূতি খাতার উপর ঝুঁকিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি দেখিতেছিল। মুখ তুলিয়া মংলুর পানে একবার চাহিল। পাণ্ডু অধরে এতটুকু ক্ষীণ হাসি,—দুই কোটরগত চক্ষে আতঙ্ক ও অবসাদ-মিশ্রিত ম্লান দৃষ্টি, দুর্বল পা দু'খানি অতিশীর্ণ দেহের ভারটুকুও বহিতে অক্ষম—থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গেটের দুয়ার ধরিয়া কোনোমতে সে পতনশীল দেহটাকে খাড়া করিয়া করুণা ভিক্ষা করিতেছে

এমন প্রত্যহ কতশত আসে। মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা,—চক্ষু ভিক্ষাভারে নম্র, কণ্ঠ কাকুতিতে পরিপূর্ণ। যন্ত্র-দানবের এ সকলে দৃকপাত করিলে চলে না। ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিতে সে এখানে অবারিত করুণার ভাণ্ডার লইয়া বসে নাই।

ঐ মংলু যখন প্রথম আসে—সে বেশীদিনের কথা নহে—দেহে তার ছিল অমিত ক্ষমতা, বক্ষে দুর্জয় সাহস ছুটি পেশীস্ফীত বাহুতে অজস্র কর্মক্ষমতা।

পূর্ব্বে যন্ত্রের অঙ্গসেবা করিবার জন্য দুজন লোক নিযুক্ত ছিল। মংলু আসিয়া সাহেবকে জানায়, কিছু বেশী টাকা মাহিনা পাইলে সে একাই অনায়াসে ঐ কর্ম্ম চালাইয়া দিতে পারিবে। বিদেশী ম্যানেজার মাহিনার উপর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিয়া মংলুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর কর্ম্মও সুশৃঙ্খলে চলিয়া যায়।

যন্ত্র-দানবের অঙ্গসেবা করিতে করিতে মংলুর অমন যে লৌহকঠিন দেহ তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। মাত্র পাঁচটি টাকার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে জীবনের আয়ু-হবি কালের অনলে আহুতি দিয়া সে একদিন যন্ত্রদানবের পায়ের তলায় অচৈতন্য হইয়া লুটাইয়া পড়ে।

সেই মংলু স্বাস্থ্য-সম্পদ হারাইয়া কোনো এক নিম্নতম বিভাগে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তখন সপ্তাহে পাইত সওয়া আট, এখন পায় চার। যান্ত্রিকেরা মানুষের মর্য্যাদা ক্ষমতার অনুপাতেই দিয়া থাকেন। এ মাসে লেট হইয়াছে ছয় দিন, অর্থাৎ ষোল টাকা হইতে বারো আনা পয়সা জরিমানা-স্বরূপ বাদ যাইবে।

লেটের টাকাটা লাভের সঙ্গে জমা হয় না,—জমা হয় আনন্দের খোরাকে। সাম্বৎসরিক বিরাট উৎসবে—বাইনাচ যাত্রা থিয়েটার ভোজখানায় দু-একটি অত্যুজ্জ্বল আনন্দময় রাত্রির পরমায়ু যোগাইতে এই ফণ্ডের উৎপত্তি। দুঃখের এমন বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস আনন্দের তুফানে তর তর করিয়া ভাসিয়া যায়, মন্দ কি!

বিভূতি মংলুর পানে চাহিয়া একটু হাসিল এবং দারবানকে গেট বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিল। মংলুর দু' আনা বাৎসরিক আনন্দের পরমায়ুকে পরিপুষ্ট করিল।

পশ্চাতে আরও কয়েকজন পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইজন লেট গেট দিয়া ঢুকিয়া বিভূতির পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"হরি কিষণ সিং,—ইয়াকুব।"

বিভূতি তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল, "দেখ হরিকিষণ, ইয়াকুব—তোমরা রোজই লেট কর।' কোন দিন সায়েব জানতে পারলে আমারই গর্দ্দানা নেবে। যে সব লোক হয়েছে আজকাল—জাগিয়ে দিতে কতক্ষণ।"

ইয়াকুব মুচকি হাসিয়া বলিল,—"কি করি বাবু, হয়ে ওঠে না। আর গরীব মানুষ দু' টাকার বেশী—"

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বিভূতি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা—আচ্ছা সে ঠিক ক'রে নেব। তবে মাসের মধ্যে অন্তত দশটা দিন ঠিক সময়ে আস্‌বি, বুঝলি? নইলে যে দায়িত্বের কাজ!"

তাহারা চলিয়া গেল। মংলুর ষোল টাকার মধ্যে এ বন্দোবস্ত চলে না, অগত্যা সে ম্লানমুখে লেট লেখাইয়া আপনার জায়গায় গিয়া বসিল।

বিভূতির কার্য্যে সাহেব ম্যানেজার খুব সন্তুষ্ট। কুড়ি বৎসর ধরিয়া অসংখ্য দরিদ্র অনাথের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস শুনিতে শুনিতে সে শুনিবার অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ চাখিয়া দেখে ম্লান শীর্ণ রুক্ষ মুখগুলি,—দৃষ্টির মধ্যে হৃদয়বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে না। যেমন করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীর সম্মুখে ঝড় ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ বজ্র মহাপ্রলয়ের নৃত্য অবাধে বহিয়া গেলেও তাঁর চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করিতে পারে না, তেমনি তাহার প্রতিদিনের কঠোর সাধনা তাহাকে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নিস্পৃহ করিয়া দিয়াছে। এই ধ্যানের ফলস্বরূপ সে বিশ বৎসরে পঞ্চাশটি টাকা লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এমন সৌভাগ্য নাকি আর কাহারও হয় নাই।

প্রত্যহ প্রত্যূষে এক কাপ গরম চা, খানিকটা হালুয়া, ফুলকা দুখানা লুচি ও একটু তরকারি খাইয়া সে আপিসে আসে। কলের বাঁশী বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী থাকে। দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া তোলা জলে স্নান ও চর্ব্বচোষ্য আহারান্তে নিদ্রা। গ্রীষ্মকাল হইলে স্ত্রীকে শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতে হয় এবং অন্যকালে ব্যজন অভাবে পদসেবা। অপরাহ্নে আবার একদফা পরিচর্য্যার পালা। মিছরির সরবৎ বা ডাবের জল। বাহিরের রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া গড়গড়ার কলিকা চাপাইয়া নলটি মুখে তুলিয়া দেওয়া ও পানের ডিবাটা শিয়রের কাছে আধখোলা ভাবে রাখিয়া—পারিলে একটু বাতাস করা—নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে। স্ত্রী সে পরিচর্য্যাটুকু করে।

একটি পুত্র ও একটি কন্যা; কিন্তু তাহাদের দুধের খরচ জামাকাপড়ের ফর্দ্দ ও আবদারের বহরও সামান্য নহে। এজন্য খণীস্ত্রীকে সদাই তটস্থ হইয়া এ সকলের উৎসমূলে নিয়ত সলিল সেচন করিতে হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই পরিচর্য্যার সমারোহ চলে। তারপর বিশ্রাম। কিন্তু কয় ঘণ্টার জন্যই বা! অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পাট-ঝাঁট সারিয়া পুনরায় তাহাকে স্বামী-দেবতার ভোগের আয়োজন সুসম্পন্ন করিতে হয়।

ক্ষুদ্র সংসারটি এইরূপে নিরুদ্বিগ্নে চলিয়া যায়। সেদিন দ্বিপ্রহরে ম্যানেজার ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বোস, কদিন থেকে একটা কথা শুনছি। অনেকগুলি লোক নাকি রোজ লেট হয়?"

বিভূতি লম্বা সেলাম জানাইয়া বলিল,—"হ্যাঁ স্যর, তাদের নাম তো লেট বইয়ে উঠিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই।"

ম্যানেজার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"তা ছাড়া আরও অনেক আছে যাদের নাম লেট বইয়ে ওঠে না।"

বিভূতির মুখ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল; কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে সে তাহা সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, —"ও সব মিছে কথা স্যর। যারা লেট হয়, তাহা হিংসে ক'রে আপনাকে লাগিয়ে গেছে।"

ম্যানেজার বলিলেন,—"আচ্ছা যাও, ওসব কথা আর যেন না শুনি।" বিভূতি গমনোদ্যত হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন,—"ভাল বোস, সে কাজের কি হ'ল?"

ইঙ্গিতটা বিভূতি বুঝিল। একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "দশ টাকা কবলে ছিলাম স্যর,—রাজী হয় কই! পাজী—ছোটলোক!"—ম্যানেজার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—"ননসেন্স! একটা কুলি-কমিনা,—আচ্ছা—আচ্ছা—যাও। হাঁ, দেখ বোস, তোমার পার-সন্যাল ফাইলে একটা গুড রিমার্ক দিয়েছি। কাজটা হওয়া চাই।"

লম্বা সেলাম জানাইয়া বিভূতি বলিল,—"আচ্ছা।" নিজের জায়গায় বসিয়া সে মহা আস্ফালন আরম্ভ করিল। যত সব ছোটলোক বেইমান! পিপীলিকার পাখা উঠিয়াছে, দাঁড়াও, এই তেজ ভাঙিতে কতক্ষণ।

ইয়াসিন তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, ক্রোধটা গিয়া পড়িল তাহার উপর। উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, —"ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে?"

ইয়াসিন বাবুর রক্ত চক্ষু দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"হুজুর, ভৈরবের জরু কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ভারী দুর্ব্বল সে, তাই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

মুখ খিঁচাইয়া বিভূতি বলিল,—"ডাক্তার! ডাক্তার এসে কি করবে? এ সব বিট্‌কেলমি—সখের মুচ্ছো!"

—"না বাবু, আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেল—"

—"ফের জবাব! যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা। মুচ্ছো না ভাঙে—দিচ্ছি কুলি ডাকিয়ে গেটের বাইরে পাঠিয়ে।"

ইয়াসিন ফিরিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে আর একজন কুলি আসিয়া সংবাদ দিল—স্ত্রীলোকটির এখনও চৈতন্যসঞ্চার হয় নাই।

বিভূতি আদেশ দিল,—উহাকে ধরাধরি করিয়া মিলের বাহির করিয়া দেওয়া হউক এবং সেখান হইতে অবস্থা বুঝিয়া মিল হসপিটালে পাঠাইতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল—স্ত্রীলোকটির চৈতন্য আর ফিরিয়া আসে নাই।

কয়েক মাস হইতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। দুর্ব্বল হৃদযন্ত্র সহসা অচল হইয়া গিয়াছে।

তখন ছুটির বাঁশী বাজিতেছে। দলে দলে কারামুক্ত বন্দী উৎফুল্ল মুখে বাহিরে আসিতেছে। সংবাদটা শুনিয়া কেহ 'আহা' বলিল, কেহ নীরবে গেট পার হইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ব্ববৎ হাসি-গল্প করিতে করিতে পথের প্রান্তে মিলাইল।

বিভূতি স্মরিয়া সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিল,—"যাক্, ভালই হ'ল। মেয়েটা না পারত খাট্‌তে, না ছিল দেখ্‌তে শুনতে ভাল। দেখ সর্দ্দার, এবার শক্ত দেখে একটা লোক নিও।"

শিরসঞ্চালন করিয়া হাসিমুখে সর্দার বলিল,—"হাঁ, বাবু। আমারই ঘরে আছে—কাল নিয়ে আসব। দুটো লোকের কাজ সে একা ক'রবে।"

বিভূতি বাড়ি আসিয়া দেখিল—প্রতিদিনের মত রোয়াকে জল ঢালিয়া মাদুর পাতিয়া দেওয়া হয় নাই। জামা জুতা ছাড়িয়া সে রুক্ষকণ্ঠে হাঁকিল,—"কি লক্ষী-ছাড়া কাণ্ড সব! এখনও—"

ত্রস্তা স্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"লখিয়ার সঙ্গে একটু কথা কইতে দেরি হয়ে গেল।"

বিভূতি অপ্রসন্নমুখে বলিল,—"কে সাত পুরুষের কুটুম লখিয়া যে, তার সঙ্গে কথা না কইলে চলছিল না! ও সব ছোটলোক মাগীদের কেন ঢুকতে দাও বাড়িতে?"

স্ত্রী চাপা গলায় বলিল,—'আহা দুঃখী—দুঃখু জানাতে আসে। ওর স্বামী মংলুর নাকি কদিন লেট হয়েছে—টাকা কেটে নেবে! তাই বলতে এসেছিল। রোগা ছেলেটার বার্লির পয়সা—"

বারুদের স্তূপে আগুন পড়িল। বিভূতি গর্জ্জন করিয়া কহিল,—"ওঃ ভারী আমার দরদীরে! যাক্ না সায়েবের কাছে,—এখানে কেন? যে নিয়ম করেছে—বলুক্ না তাকে গিয়ে! যত সব—" বলিয়া একটা অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া গা ধুইতে লাগিল।

স্ত্রী জল ঢালিয়া রোয়াক মুছিয়া মাদুর বিছাইয়া দিল ও কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। লখিয়া ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছিল।

সে রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীতে মান-অভিমানের খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। রাত্রির আহার-পর্ব্ব মিটিয়া গেলে স্ত্রী বারান্দায় মাদুর বিছাইতেই বিভূতি কক্ষমধ্য হইতে ডাকিয়া বলিল,—"ওখানে কেন?"

অভিমানিনী কোনো উত্তর না দিয়া শুইয়া পড়িল।

বিভূতি খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া এক সময় বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল,—"এটা কি ভাল হচ্ছে! কি এমন বলেছি যেরাগ হ'ল!"

তথাপি উত্তর নাই।

একটু রুষ্ট হইয়া উচ্চকণ্ঠে সে কহিল,—"ভাল জালাতনেই পড়লুম যাহোক। বলি. হাঁ—না, যা হয় একটা বল. সারাদিন খেটেখুটে রাত্তিরে এ সব সহ্য হয় না।"

এবার স্ত্রী উত্তর দিল,—"আমাদের আর রাগ দুঃখু কি বল! বাঁদীর মত এসেছি—গতর জল ক'রে খাটছি। যেদিন দেহ আর বইবে না, দিও বিদেয় ক'রে অনাথ আশ্রম-টাশ্রমে।"

বিভূতি অল্প হাসিয়া বলিল,—পাগল দেখ! বলি কি এমন বললুম?"

স্ত্রী উত্তর দিল,—"কিছু না, যাও শোও গে। খুব ভোরে আবার উঠতে হবে। একটু না ঘুমুলে দেহ বইবে না যে!"

বিভূতি একটু অপ্রতিভ হইয়া কোমল কণ্ঠে কহিল,—"বুঝি সবই, কিন্তু দেখছ ত মাইনের বহর। হাতে মাথতে কুলোয় না,—একটা যে ঝি রাখব—"

অবশ্য উপরির টাকাটা স্ত্রীর হাতে না দিয়া বরাবর সে পোষ্টাপিসে জমা দিয়া আসিত। এ বিষয়ে স্ত্রী বিন্দু-বিসর্গ জানিত না।

স্বামীর কোমলস্বরে স্ত্রীর অভিমান টুটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"চল, তোমায় একটু বাতাস করি। সারা রাত্তির না ঘুমুলে বড় কষ্ট হবে।"

আপিসে সেদিন গান্ধী-আন্দোলনের আলোচনা চলিতেছিল। বক্তা ছিল বিভূতি, তাহার সহকারী ও অন্য বিভাগের একজন পককেশ বাবু।

সেই বাবুটি, নাম হরিশবাবু, কহিলেন,—"আর ত পারা যায় না, বিভূতিবাবু। রোজ রোজ হৈ—চৈ, দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে দিলে।" বিভূতির সহকারীর নাম কমল। বয়স অল্প।

সে কহিল, "কেন হরিশ-দা, কি হ'ল?"

হরিশবাবু মুখে একটা হতাশাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"আর মশাই, স্বদেশী স্বদেশী ক'রে দেশটা যে উচ্ছন্নে দিলে। আজ অমুক, কাল তমুক—কাঁহাতক হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত সামলানো যায়? সিগারেট কোম্পানী তো শুনছি অনেককে একমাসের নোটিস দিয়েছে। যদি এক মাসের মধ্যে বিক্রী না বাড়ে ত এতগুলি লোকের

খতম। আমার সম্বন্ধী ত কেঁদে এসে বললে, জামাইবাবু, কি হবে?"

ইহার মর্ম্মব্যথাটুকু বুঝিতে পারিয়া কমল রহস্য করিয়া কহিল,—"কেন ভগ্নীপতির মিল রয়েছে, ভাবনা কি?"

এ কথায় রুষ্ট হওয়া উচিত। হরিশবাবু কিন্তু হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের রক্ত গরম, চাকরির থোড়াই কেয়ার কর।"

কমল বলিল,—"তিনিও শুনেছি অবিবাহিত। বয়স পঁচিশ, তবে ভাবনা কি?" হরিশবাবু বলিলেন, —"নাঃ, তার আর ভাবনা কি, চাপবেন ত আমারই স্কন্ধদেশে!" বলিয়া দারুণ দুঃখে তিনি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—"আপনি কি বলেন, বিভূতিবাবু! দাদার অবস্থা সসেমিরে ক'রে তুলেছে।"

বিভূতি গম্ভীরভাবে কহিল,—"সত্যি, এ অন্যায়। যা হবে না তা নিয়ে কেন মাথা কোটাকুটি! আমাদের অল্প বিদ্যে, এর চেয়ে কোথায় কে বেশী মাইনে দিয়ে রাখবে? ওরা জাত ভাল, দুটো মিষ্টি কথায় অনেক কাজ আদায় করা যায়।" কমল বলিল,—"চাকরিই যে আমাদের চিরকাল করতে হবে তার মানে কি?"

বিভূতি বলিল,—"না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? এক কাঠা জমি নেই যে চাষ করব। আর চাষ করবার শক্তি কোথায়?" হরিশবাবু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"যা বলেছেন বিভূতিবাবু, লাখো কথার এক কথা।" কমলের পানে ফিরিয়া বলিলেন,—"ওরে ভাই সবই জানি। একদিন ঘরে চাল না থাকলে কেউ ডেকে খবর নেয় না। কেন মিছে হ্যাঙ্গামা! স্বরাজ এলে আমাদের কি বল, ঘুচবে অন্নবস্ত্রের সমস্যা?" বলিয়া আপন মনে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কমলের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নম্র দৃঢ় স্বরে কহিল,—"এত বড় একটা আন্দোলনকে অমন হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেবেন না আপনারা। কেরাণীরা সব চেয়ে হতভাগ্য তা মহাত্মাজী জানেন। জানেন বলেই তাদের বাদ দিয়ে রেখেছেন।"

সহসা বিভূতির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে সে কহিল,—"আপনি খদ্দর প'রে আসেন ব'লে কাল ম্যানেজার সায়েব বলছিলেন, 'ও সব স্বদেশীয়ানা বারণ ক'রে দিও, বোস।' কথাটা ভাল নয়, তাই সাবধান ক'রে দিলাম।" বলিয়া সেখানে আর ক্ষণমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

কমল হরিশের পানে চাহিয়া কহিল,—"এ অপরাধের শাস্তি কি হরিশ-দা?" হরিশবাবু আপন স্বভাবসিদ্ধ নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমরা ত বুড়ো হ'য়ে মরতে চলেছি, আমাদের কি, এইবেলা একটু হুঁস ক'রে চ'লো ভাই। সাবধান হয়ে না চলতে পারলে দুকূল যাবে।" কমল ম্লান মুখে কহিল,—"কূল আর কোথায়, দাদা, যে যাবে। আমাদের তো—

"নাহি তল—নাহি তীর
মৃত্যুসম স্থির নীর—সদা বিরাজে।"

হরিশবাবু বলিলেন,—"যা ভাল বোঝ, কর। কবিত্বে পেট ভরে না ভায়া, বুঝেছ?"

কমল হাসিয়া বলিল,—"এ পেট ছাইপাশেও ভরে দাদা, চিরকাল ভ'রে এসেছে।"

ঝড় উঠিলে নদীর বক্ষ উদ্দাম হইয়া উঠে। তার দোলায় ছোট-বড় সকল তরণীই দুলিতে থাকে। মিলের মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ঝড়ের পূর্ব্বাভাস ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সদা-বিনীত জোড়হস্ত মানুষগুলির মাথা যেন কিসের সাহসে সোজা হইয়া গেল, কুণ্ঠিত পদধ্বনি সহজ হইয়া আসিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর তাহারা বেশ সোজাভাবেই দিতে লাগিল।

বিভূতি কঠোর নীতি অবলম্বন করিল। ইহাতে আপাততঃ সুফল লাভ হইলেও ভবিষ্যৎ ভরসাময় বলিয়া বোধ হইল না। কালবৈশাখীর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বজ্র-বিদ্যুত ঝঞ্ঝা-ভরা ধূসর স্তব্ধ মেঘের অন্তরখানি কি যেন কিসের প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহু শিহরিতে লাগিল।

কমল বিভূতিকে বলিল,—"হাওয়ার গতি ফিরে গেছে বিভূতিবাবু! একটু সাবধান হয়ে কাজকর্ম্ম ক'রবেন।"

বিভূতি ত রাগিয়াই আগুন। অসহিষ্ণু, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তোমায় অত ফোপরদালালি করতে হবে না। কালকের ছেলে, উপদেশ দিতে এসেছ আমায় ?"

তাহার রাগ দেখিয়া কমল চলিয়া যাইতেছিল। বিভূতি তাহাকে ডাকিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"দেখ, সেদিন বারণ ক'রে দিয়েছি খদ্দর প'রে মিলে এসো না, তা তুমি শোন নি। জান—এর কি ফল হ'চ্ছে ?"

কমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—"কি ?"

বিভূতি অগ্নিময় দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া কহিল,—"কুলিরা যে মুখের উপর চোটপাট করে, কিসের জোরে ? ঐ খদ্দরের জোরে। দেখনি কত কুলি ওই মোটা ক্যাটকেঁটে জামা গায়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সামনে দিয়ে চলে যায় ! যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। ছোটলোক সব মনে করে—"

বিরক্ত হইয়া কমল কহিল,—"কিন্তু দোষ কি ওরা ছোটলোক ব'লেই। চিরকাল মাথা নীচু ক'রে চলেছে ব'লে ? হেঁট হয়েই থাকতে হবে ! এই আলো-বাতাসকে আমরা যেমন উপভোগ করি—ওরাই বা তা না ক'রবে কেন ? কেন ওরা আমাদের পলকা জাত বাঁচিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে দিয়ে চলবে ?"

ধৈর্য্যচ্যুত বিভূতি চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"কমল !"

কমল বিস্ময়বিমূঢ়ের মত তাহার অগ্নিজ্বালাময় মুখের পানে চাহিল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিভূতি বলিল,—"আমি বলছি, কাল থেকে যদি খদ্দর ছেড়ে না এস, আর ঐ সব লম্বা লম্বা বুলি আওড়াও ত ফল ভাল হবে না। শেষকালে দুঃখ ক'রো না যে বিভূতিবাবুর এই কাজ !"

কমল একটু ম্লান হাসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—'দাসত্বের এই পলকা সুতোয় বেঁধে যখন-তখন চোখ রাঙাবেন না, বিভূতিবাবু। আপনাদের হয়ত মায়া বেশী হয়ে গেছে, মোটা মাইনে। আমাদের পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি—"

মুখ বিকৃত করিয়া বিভূতি বলিল,—"কেয়ার কর না ? তা এতই যদি ডোন্টো কেয়ার কর, তবে চাকরির আগে দুবেলা এসে পায়ে তেল মালিশ করতে কেন ?"

হাসিয়া কমল কহিল,—"হয়ত দিল্লীকা লাড্ডুর দশা হয়েছিল, তাই। দেখছি, ও জিনিষের দু পিঠই সমান।"

বিভূতি কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিল না। তেমনই রুষ্টস্বরে কহিল,—"যাও কাজ করগে। কিন্তু সাবধান।"

কমল হাসিয়া ললাটে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া ঊর্দ্ধপানে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন কমলের খদ্দরের পাঞ্জাবীর পানে চাহিয়া বিভূতির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কোনো বাক্যব্যয় না করিয়া সে সাহেবের ঘরে চলিয়া গেল।

তিনটার সময় কমল ফিরিয়া দেখিল টেবিলের উপর একখানি সাদা চিরকুটে সাহেব কি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পড়িয়া বুঝিল—গোলামীর স্বর্ণ জিঞ্জীর খসিয়া পড়িয়াছে।

চিরকুটখানি বিভূতির টেবিলের উপর রাখিয়া বেশ হাসিমুখে কমল বলিল,—"ধন্যবাদ।" তারপর ধীরে ধীরে গেটের বাহির হইয়া গেল।

বিভূতি যেমন একমনে কাজ করিতেছিল, তেমনই নিবিষ্ট চিত্তে কলম চালনা করিতে লাগিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না।

হরিশবাবু আসিয়া হাসিমুখে বিভূতিকে বলিল,—"শুনলুম সব। মতিচ্ছন্ন ছোঁড়াটার ! যাক ; হরি হে—তোমারই ইচ্ছা।"

বলিয়া একটি হাই তুলিয়া ডান হাতে কয়েকটা তুড়ি দিয়া বিভূতির পানে চাহিয়া কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিলেন হয়ত।

বিভূতি মুখ তুলিল না, কথাও কহিল না। নির্ব্বিকার-চিত্তে খাতায় অঙ্কপাত করিতে লাগিল।

হরিশবাবু পুনরায় একটা হাই তোলার সঙ্গে কয়েকটা তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিলেন,—"তাহ'লে ওর জায়গায় লোক একজন চাই ত। তা সেদিন ব'লছিলুম না ব্যাটারা স্বদেশী ক'রে সব গোল্লায় দিলে। আহা ! অমন ভাল আপিস এককথায় উঠে গেল ! কত লোকের যে অন্ন গেল। দেবে কি ব্যাটারা কোনো সন্ধান নিয়ে তাদের মুখে এক মুঠো তুলে ? সব স্বদেশী ক'রছেন, গুষ্টির পিণ্ডি ক'রছেন !"

বিভূতির এই দীর্ঘ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা ভাল লাগিতেছিল না। একটু নীরস কণ্ঠে সে কহিল, 'যান, আপনার জায়গায় গিয়ে বসুন। এখুনি সায়েব আসবেন।'

—"সায়েব!" বলিয়া ভীত ত্রস্ত নয়ন নিমেষে চারিদিকে বুলাইয়া লইয়া তিনি দ্রুত কণ্ঠে বলিলেন, "তবে চল্লুম।"

খানিক অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ও খপ্ করিয়া বিভূতির কলমসুদ্ধ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখিস দাদা,—অনাথ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।"

বিভূতি মুখ তুলিতেই তিনি তেমনই করুণা বিগলিত দ্রুত কণ্ঠে বলিলেন,—"ছোঁড়াটার চাকরি গেছে—আমার সম্বন্ধীর। তার কথাটা—" বলিয়া অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথাটা শেষ না করিয়াই একরূপ ছুটিতে ছুটিতে আপন জায়গায় আসিয়া বসিলেন।

হৃদয়ের মধ্যে দুটি রাজ্য। দুটির শাসনই সারাক্ষণ অন্তরের মধ্যে চলিতে থাকে। নিম্নের রাজ্যে আজ ঊর্দ্ধের একটি কিরণরেখা তির্য্যক্‌গতিতে আসিয়া খানিককটা অন্ধকারকে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। সেই আলোকোদ্ভাসিত নগ্ন অন্ধকারের পানে চাহিয়া বিভূতি বারম্বার কিসের লজ্জায় কুণ্ঠায় অবসাদে ভাঙিয়া পড়িল।

সেদিন অপরাহ্ণে বাড়ি আসিয়া সে স্ত্রীকে অকারণে তীব্র ভর্ৎসনা করিল, মেয়েটিকে গালি দিল, ছেলেটিকে একটা চড় মারিয়া হুলস্থুল বাধাইয়া তুলিল।

বারান্দায় মাদুরের উপর শুইয়া আজ সে চক্ষু মেলিয়া অন্ধকার নিশীথের শোভা দেখিতে লাগিল।

—"বাবুজী বাড়ি আছেন?"

—"কে, হীরা সিং? আচ্ছা, এদিকে এসো।"

হীরা সিং বাটীর মধ্যে আসিয়া পৈঠার উপর উপবেশন করিল।

বিভূতি পাশ-বালিশটার উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"খবর কি সর্দ্দার?"

হীরা সিং হতাশা ভরে অনেক কথাই বলিল। তাহার মোটামুটি অর্থ এই—মিলের সকল কুলিই ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শীঘ্র একটা ধর্ম্মঘট হইলেও হইতে পারে। এখন হইতে খুব সাবধানে কাজ করিতে না পারিলে অচিরে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। চাই কি, মিল বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে।

বিভূতি সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে কি ভাবিল। পরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোমার দেশ কোথায় সর্দ্দার?"

—"বিলাসপুর।—"

—"সেখানে অনেক কুলি পাওয়া যায়, না?"

—"যায়। কিন্তু বাবু, তাদের আনতে গেলে অনেক সময় যাবে। তার পর, মারের ভয় আছে।"

বিভূতি হাসিয়া বলিল,—"ইংরেজ-রাজত্বে মারে কোন্ শালা—সে ভয় নেই। শোন, কালই তুমি দেশে চলে যাও, সেখানে গিয়ে যত পার লোক জোগাড় কর। এখানে যেদিন দেখব ব্যাটারা কাজে আসছে না, সেই দিন তোমায় টেলিগ্রাম করব। তুমিও গুছিয়ে নিয়ে চলে আসবে।"

তথাপি হীরা সিং ইতস্তত করিতে লাগিল।

বিভূতি তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ভয় কি? আমরা পুলিস খাড়া করে চারিদিক পাহারা দেওয়াব। তুমি বিনা ভয়ে চলে আসবে।" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—"তোমার আলো আছে ত? চল, একবার সায়েবের বাংলোয় ঘুরে আসি গে।' একটা পাকা পরামর্শ হওয়া ভাল।"

যাইতে যাইতে হীরা সিং বলিল,—"কিন্তু বাবু, এমন ক'রে কতদিন চলবে?" বিভূতি অন্ধকারের মধ্যে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বিভূতি বলিল,—"কি জান সর্দ্দার, যে আলো একবার জ্বলেছে—আর কি তা নেবে? পিদীমের শিখা যতক্ষন জ্বলবে—তেল সলতেও ততক্ষণ যোগাতে হবে। কত যাবে, কত আসবে, পিদীম অমনিই জ্বলবে।"

শিখা জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়া বিভূতি অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিল। নিজের কর্ম্ম-ক্ষমতায় আত্ম-প্রসাদে চিত্ত উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—দিনের গ্লানির আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। ঊর্দ্ধজগতের রশ্মিরেখা নিম্নজগতের নিদারুণ প্রহারে মূর্চ্ছাহত হইয়া মিলাইয়া গেল।

সামান্য ইন্ধন পাইয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অল-যোগান্তে একটা সিগারেট ধরাইয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে বিভূতি মিলের গেটে যাই আসিয়াছে, অমনি পশ্চাত হইতে কে একজন তাহার মুখের সিগারেটটি টপ করিয়া তুলিয়া লইল ও হাতে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিয়া বিনীত সেলাম করিয়া মাপ চাহিল।

অসহ্য ক্রোধে তাহার পানে চাহিয়া বিভূতি চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হারামজাদা শূয়ার কী—"

তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাস্ কর।"

বিভূতি পাগলের মত হইয়া গেটের মধ্যে ঢুকিয়া দারোয়ানকে আদেশ দিল,—উহার কান ধরিয়া জুতা মারিতে মারিতে মিলের সীমানা হইতে দূর করিয়া দাও।

আদেশ পালন করাটা শক্ত হইয়া পড়িল। কারণ, একে দুইয়ে অনেকগুলি লোক আসিয়া উহার চারিপাশে জড়ো হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

একটি মাত্র জয়ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া যে-যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল ও সমস্বরে জয়কীর্ত্তন করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বিভূতি কাঁপিতে কাঁপিতে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে আর কোনো ধ্বনি বাহির হইল না।

হরিশবাবু আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"ছি ছি! কি ক'রলেন বলুন দেখি, বিভূতিবাবু? কুলি ক্ষেপিয়ে মিলটা বন্ধ ক'রে দিলেন?"

বিভূতি তাঁহার পানে চাহিয়া ভাবহীনের মত বলিল, —"আমি বন্ধ করলুম?"

হরিশবাবু তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না ত কি? গাল দেবার কি দরকার ছিল?"

বিভূতি ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল,—"আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি। এর জবাবদিহি করতে হয় সায়েবের কাছে করব। বজ্জাত ব্যাটারা তলে তলে সব মতলব ঠিক ক'রে রেখেছিল! আচ্ছা—আমিও বোস কায়েত, দেখি জব্দ করতে পারি কি না! দুটি দিন, মাত্তর দুটি দিন, না খেতে পেয়ে খিদের জ্বালায় আপনি ছুটে আসবে।"

বিভূতি উঠিয়া সাহেবের ঘরে গেল।

সাহেবের মেজাজ সেদিন ভাল ছিল না। খুব একটা কড়া ধমক দিয়া তিনি বিভূতিকে বলিলেন,—"এখন উপায়? মিল বন্ধ হ'লে ওরা আগে তোমায় কুকুরের মত গুলি ক'রে মা'রবে।"

বিভূতির সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

মুখে আস্ফালন করিয়া কহিল,—"কাল ত জানিয়েছি আপনাকে। হীরা সিং দেশে চলে যাক, সব গোল চুকে যাবে।"

সাহেব পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন,—"না, নতুন কুলি আনালে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'তে পারে। আমি নোটিস দিচ্ছি, যে তিনদিনের মধ্যে কাজে না আসবে তার জবাব হয়ে যাবে। গরীব লোক—চাকরির ভয়ে আপনি আসবে।"

তাহাই হইল। গেটের মাথায় নোটিস-বোর্ড ঝুলাইয়া দিয়া বিভূতি সকাল সকাল বাড়ি ফিরিল।

বাড়ির দুয়ারে কমল দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বিভূতির অকস্মাৎ মনে হইল, এই লোকটাই সব গোল-যোগের মূল। কাল উহার চাকরি গিয়াছে, আজ কুলি ক্ষেপিয়াছে এবং ঐ হতভাগাটা মজা দেখিবার জন্য তাহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাল কথা, সাহেবকে বলিয়া উহার শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা করিলে হয়ত অচিরেই এই গোলযোগের নিষ্পত্তি হইবে।

বিভূতি দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া কমল ডাকিল,—"শুনুন, শুনুন, বিভূতিবাবু, ও বিভূতিবাবু!"

অগত্যা বিভূতি দাঁড়াইল।

কমল তাহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"খুব সাবধান, আপনাকে মারবার জন্ত জনকতক কুলি ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করছিল। একটু দেখে-শুনে চলাফেরা করবেন।"

খপ্ ক'রে কমলের বুকের নিকটে জামাটা ধরিয়া বিভূতি বলিল,—"বটে! তুমিও বুঝি ওই দলে?"

কমল মৃদু হাসিল। ধীরস্বরে বলিল,—"যে মারে সে কি সাবধান ক'রে দিতে আসে, বিভূতিবাবু।"

বিভূতি উত্তেজনায় আপনার শক্তির মাত্রা বিস্মৃত হইয়াছিল। কমলের জামা ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—'তোমায় পুলিসে দেব। হতভাগা গুণ্ডা কোথাকার, ভয় দেখাতে এসেছ!"

কমল একটুও রুষ্ট হইল না। তেমনি মৃদু হাসিতে হাসিতে বিভূতির হাতে অল্প একটু চাপ দিয়া অনায়াসে জামার প্রান্তটা মুক্ত করিয়া ধীরস্বরে বলিল,—"গরীবের জামার উপর অত অত্যাচার করবেন না বিভূতিবাবু। গায়ে দু'ঘা মারুন—সে বরং সহ্য হবে।"

কমলের পেশীস্ফীত বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ পাইয়া বিভূতি দ্বিতীয়বার আর সেদিকে হাত বাড়াইল না। কোনো উত্তরও তাহার মুখে আসিল না। অক্ষম রোষে অন্তরে অন্তরে জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।

কমল বলিল,—"আমার কর্ত্তব্য, ব'লে গেলুম। যদিও আপনি আমার চাকরি খেয়েচেন, তবু—তবু এ আমার কর্ত্তব্য।"

বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

বিভূতি পথপ্রান্তে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার চোখ দুইটা অকস্মাৎ জলিয়া উঠিল,—দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—"আচ্ছা।"

তাঃপরে আর বাংলোর দিকে গেল না—বাড়ি ফিরিল।

আজও রোয়াকে মাদুর বিছানো ছিল না—ফরসীতে সাজা তামাকও অভিমানে পুড়িতেছিল না।

রাজ্যের জমা করা ক্রোধ আসিয়া পড়িল বাড়ির এই অনিয়মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর। বজ্রকণ্ঠে সে হাকিল,—"লতা!"

পত্নী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিভূতির অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা শুনিবার ধৈর্য্য বিভূতির ছিল না। যেখানে অধিকারের মাত্রা পূর্ণতরভাবে বিদ্যমান, সেখানে ধৈর্য্যের বাঁধন রাখা মূর্খতা মাত্র। বিভূতি সজোরে পদাঘাত করিয়া তাহার সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল। সারাদিনকার পুঞ্জীভূত রোষ এতক্ষণে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল, তাহার জের চলিল সারা রাত্রি ধরিয়া।

নিজের নিষ্ঠুর আচরণে অনুতপ্ত হওয়ার দরুন নহে, অচৈতন্ত পত্নীর মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া ও রাজদ্বারে আপনার পরিণাম ভাবিয়া বিভূতিকে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল।

অতি প্রত্যুষে হতভাগিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

প্রভাতের পিঙ্গলালোক দেখিয়া অভ্যাসবশতঃ সে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু তলপেটের মধ্যে সহসা টন্ টন্ করিয়া উঠিল—মাথাটা ঘুরিয়া গেল। নিতান্ত অসহায়ের মত বালিশে শ্রান্ত মাথাটি রাখিয়া সে চক্ষু মুদিল।

প্রভাতে কিছু না খাইয়া শুকমুখে বিভূতি আপিসে চলিয়া গেল।

আপিসে কাজ বিশেষ ছিল না। অতবড় মিলটায় মাত্র পনের-ষোল জন বাঙ্গালীবাবু আসিয়াছিল। তাহারা কলম ধরিতেই জানে, যন্ত্র-দানবের আহার্য্য যোগাইতে পারে না।

নোটিসের পানে তাকাইয়া সাহেব বলিলেন,—"আর দু'দিন দেখব, তারপর, হীরা সিংকে বিলাসপুরে পাঠানো যাবে। কি বল বোস?" বলিয়া আপনার মোটরে গিয়া উঠিলেন।

বিভূতি সমবেত শুষ্ক মুখগুলির পানে চাহিয়া বলিল,—"মিল বন্ধই থাক, আর যাই হোক, আমাদের কিন্তু রোজ হাজির দিয়ে যেতে হবে। জানেন ত চাকরির বাজার, একবার গেলে—"

একবাক্যে ঘাড় দোলাইয়া সকলে সম্মতি দিল।

তার পরদিনও একভাবেই কাটিয়া গেল।

বিভূতি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হীরা সিংএর বস্তীর অভিমুখে চলিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র জলস্থল ঢাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে কয়েকটি তারা উঠিয়াছে—চাঁদ উঠে নাই। নদীর একটা দিক উঁচু,—ভাজনের দিক বলিয়া। অপর তটে বহুদূর পর্য্যন্ত শুভ্র বালুরাশি বিছানো,—অন্ধকারের আবছায়ায় চক্ চক্ করিতেছে। বালুপ্রান্তরের পারে নিবিড় বন-কুন্তল-রাজি এলাইয়া ছোট্ট গ্রামখানি ইহারই মধ্যে নিষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিভূতি উচ্চ তটভূমি দিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সহসা অন্ধকারের মধ্যে দুইজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভূতির চিন্তা টুটিয়া গেল। চমকিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল,—"কে ?"

তাহারা কোনো উত্তর না দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তারপর, নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা ক্ষীণ আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল এবং একমুহূর্ত্ত পরে জলে স্থলে তেমনি অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

* * * *

দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র—কূল নাই, সীমা নাই। তরঙ্গের পর মত্ত তরঙ্গ পাক খাইয়া গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন সারা পৃথিবী এই দুর্নিবার জলস্রোতে পরিপ্লাবিত হইয়া রূপ, সৌন্দর্য্য শব্দ স্পর্শ হারাইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে!

সহসা তরঙ্গশীর্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। জলধির মধ্যস্থলে জাগিয়া উঠিল—একখণ্ড শ্যামলভূমি। তিনি যেন অমৃতরূপিণী রমা,—প্রসন্ন হাস্যে মঙ্গলাশীষ বিলাইয়া, তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্কপ্রায় অধরে পিপাসা পরিতৃপ্তির অমৃত বিন্দু ঢালিয়া, ছুটি করে সৃজন লীলাপদ্ম লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। শুভ্র ফেনতরঙ্গ তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া দূরে দূরে সরিয়া গেল। ভূমিলক্ষ্মীর বিভূতি বাড়িতে লাগিল।

রুক্ষ প্রান্তরে প্রথমে অর্ঘ্য রচনা করিল নব-অঙ্কুরিত দূর্ব্বাদল। তারপর, একে একে তরুলতা, পর্ব্বত, নদী—তাহার প্রান্তরে নব নব সম্পদ্ রচনা করিয়া মাকে মহান্ ঐশ্বর্য্যে রূপশালিনী করিয়া তুলিতে লাগিল। কাননে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী আসিয়া কূজন আরম্ভ করিল,—বনে বনে জীবনধারণের জন্য ফলবান বৃক্ষসকল ফলভারে অবনত হইয়া কাহাদের ক্ষুধাতৃপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আকাশের বর্ণ নীলের সুষমায় ভরিয়া গেল। চারিদিকের সীমা-নির্ণয় করিয়া তিনজন উঠিলেন। সমুদ্রের রক্তময় তরঙ্গ-দ্যুতিতে কি যেন সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়া দূরে—দূরে—আরও দূরে—সমুদ্র সরিয়া গেল। তটপ্রান্তে অহরহ তাহার ভগ্ন তরঙ্গের বন্দনা-গীতি নন্দিত হইতে লাগিল। সেই সুবিস্তীর্ণ ভূমিতে অসংখ্য পর্ব্বত মরুভূমি নদী অরণ্য দেশ মহাদেশ—কত কি আত্মপ্রকাশ করিল।

সর্ব্বশেষ সৃষ্টির কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে আসিল—মানব।

সেই হইতে জল-কল্লোল ভূমিলক্ষ্মীর পরমায়ু-প্রদীপে নিরন্তর তৈল প্রদান করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া নব নব শ্রীসৌন্দর্য্য দান করিতেছে। ভূমি জোগাইতেছে অরণ্য পর্ব্বত নদী নির্ঝরের পরমায়ু। অরণ্য পর্ব্বত নদী মিলিয়া রচনা করিতেছে শস্যসম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার। মানব আসিয়া উহাদের পরমায়ু ও কণা লইয়া আপনার জ্ঞানবিদ্যার শুভঙ্করী খুলিয়া বিজ্ঞান গণিতের অনুশীলনে জীবনকে সুন্দর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

পৃথিবীর তৈলবিন্দু লইয়া তাহারা নূতন পৃথিবীকে পরমায়ু দিতেছে।

এই নূতন জগতে মানুষের বুকের তৈলবিন্দু পোষণে যাহার পরিপুষ্টি, সে ওই নদীতীরের বিরাট বিশালকায় যন্ত্র-দানব।

তাহার ক্ষুধালেলিহ জিহ্বা হইতে অহরহ লালসার অগ্নি নিঃসৃত হইয়া গ্রাম নগর জনপদ হইতে শক্তি শোষণ করিতেছে,—তাহাদের দগ্ধ করিতেছে,—এবং ঐ ভস্মরাশির বিশাল রূপে সাজাইয়া রাখিতেছে মানবের যত-কিছু অনাবশ্যক অপ্রয়োজনের বিলাস-সম্ভার।

মানুষ ইচ্ছা করিলে ওই সৃষ্টিকে আর প্রতিরোধ

করিতে পারে না। তাহার স্বাচ্ছন্দ্য জাত বনফলমূলে পরিপুষ্ট জীবন সেই পুরাকালের আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে চাহে এখন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিতে। সে চাহে কর্ম্ম-জগতে আপন ক্ষুদ্রত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে। সে চাহে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সিন্ধুর বুকে, পর্ব্বতের দুরারোহ শৃঙ্গে, মরুভূমির তৃষাতপ্ত বক্ষে,—অরণ্যের শ্বাসশূন্য অন্তর্দ্দেশে নব নব আবিষ্কারের প্রেরণায় মাতিয়া থাকিতে। তাই যন্ত্র-দানবকে সে সাথী করিয়া লইয়াছে।

এ দানবের প্রয়োজনের শেষ নাই। ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। একদা যুগান্ত পরে জাগিয়া উঠিয়া সেই যে বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়াছে লক্ষ কোটি জীবরক্তধারা পান করিয়াও তাহার সে ক্ষুধা মিটিল না। কর্কশ কণ্ঠে সে প্রতিনিয়ত চীৎকার করিতেছে—দাও, আরও দাও। বর্ষ—যুগ—শতাব্দী চলিয়া যায়, তথাপি তার আহুতি চলিতেছে। কোন্ মহাযজ্ঞের পবিত্র হোম-শিখা—কি পুণ্যময় কাম্যফল শেষ আহুতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য ইহার অতৃপ্তির আগুন নিবাইয়া দিবে, কে জানে?

একদল যাইতেছে অন্যদল আসিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। মত্ত বায়ুর ফুৎকারে কয়েক মুহূর্ত্তে তাহাদের পরমায়ু নিঃশেষ হইতেছে, আবার আসিতেছে। তাহাদের ক্ষুদ্র পরমায়ু-দীপে তৈল দান করিতে এই বৃহৎ দীপের জীবন-শিখাকে প্রতিনিয়ত পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

জগৎ জুড়িয়া চলিয়াছে এই দীপ-শিখার নিষ্ঠুর অচঞ্চল পরিহাসপূর্ণ নৃত্য।

* * * *

ভোঁ ভোঁ-ও-ও, স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

বিভূতি তাড়াতাড়ি চক্ষু মেলিয়া উঠিতে গেল, পারিল না।

মাথায় দারুণ বেদনা, চক্ষু চাহিতে কষ্ট হয়।

অনেকখানি রৌদ্র জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে পায়ের কাছে কে একজন বসিয়া কোমল করে পরিচর্য্যা করিতেছে। মাথায় পাখা লইয়া কাহার শ্রমক্লান্তিহীন কর অবিরাম ব্যজন করিয়া চলিয়াছে।

স্বপ্ন নাই, তবু বিভূতির মনে হইল দীপের রশ্মিটিকে ম্লান হইতে না দিবার ইহাও একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এই সংসারের প্রদীপ তাহার আহুতি লইয়া জ্বলিতেছে। তাই সংসারের জন্য তাহার পরিজনেরা তাহার জীবন-প্রদীপটিকে সযতনে রক্ষা করিতে চাহে।

বিভূতি হাঁফাইয়া উঠিল। চক্ষু মুদিয়া ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল,—"আমি কোথায়?"

কে উত্তর দিল,—"আপনার বাড়িতে।"

বিভূতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"কে, হীরা সিং?"

মৃদু সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল,—"না, আমি কমল।"

বিভূতি একবার মাথা নাড়িয়া অল্প একটু হাসিল। এখনও স্বপ্ন চলিতেছে নাকি? কিন্তু উত্তরও ত মিলিতেছে। পুনরায় সে প্রশ্ন করিল,—"মিলের বাঁশী বাজে কেন?"

উত্তর আসিল,—"দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়েছে ব'লে।"

উত্তেজিত বিভূতি প্রশ্ন করিল,—"মিল চলছে? হীরা সিং বিলাসপুর যায় নি? সায়েব, সায়েব—"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল,—"আপনি চুপ ক'রে থাকুন। একটু ঘুমোন, নইলে অসুখ বাড়বে।"

বিভূতি ছটফট করিতে লাগিল।

—"আমায়—আমায় আপিস যেতে হবে। হোক বন্ধ, যেতে হবে। শালারা ধর্ম্মঘট করেছে, আমিও দেখব—"

কমল ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"আর মিলে যেতে হবে না, আপনি চুপ ক'রে ঘুমুন।' মা, ওষুধটা এক দাগ ঢেলে দিন ত।"

ঔষধ খাইয়া বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

সে তখন স্বপ্নেও মনে করে নাই—চার দিন হইল সে আঘাত পাইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে ও কমলের সাহায্যে বাটী আসে। চার দিনের পর এই মাত্র সে প্রথম চক্ষু চাহিল ও কথা কহিল।

মিল খুলিয়াছে। সর্দ্দারকে বিলাসপুর যাইতে হয় নাই। তিন দিনের দিন অন্নগতপ্রাণ কুলিরা দলে দলে

আসিয়া যোগদান করিয়াছে এবং কার্য্যক্ষতির ভয়ে সাহেব হরিশবাবুর শ্যালককে বিভূতির পদে নিযুক্ত করিয়া হরিশবাবুর দারুণ দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন।

বিভূতিকে সাহেব ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু হরিশবাবু তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিলেন, অতর্কিত আঘাতে সে চিরদিনের জন্য কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি নূতন কর্ম্মিষ্ঠ লোক নিয়োগ করিয়াছেন।

যন্ত্র-দানব কর্ম্মের মূল্যে স্নেহ ভালবাসার পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে।

ভোঁ—ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজিতে লাগিল।

বিভূতি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে?

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম যেদিন ঝাঁপ দিয়েছি এই মানুষের স্রোতে
মা প্রকৃতির স্নেহকোমল শ্যামল বক্ষ হ'তে
সেদিন হঠাৎ সজল চোখে অভিমানের ভরে
চিরদিনের বন্ধুরা মোর সবাই গেল সরে'।
সেদিন হ'তে পাইনি সময় দেখ্‌তে মেলে আঁখি
কোন্ বনে কোন ঋতু এল,—কোন্ গাছে কোন্ পাখী
ধূপছায়া আর আলো আঁধার - সকাল সাঁঝের ছবি
আমার কাছে এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল সবি;
অন্ধকারের তারা গেল—জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ।
প্রাণের নদীর দুকূল বেঁধে মানুষ দিল বাঁধ।
লুকিয়ে গেল আমার কাছে নিখিল বসুন্ধরা,
রাত্রিদিবা হ'ল কেবল মানুষ দিয়ে ভরা।
কেবল চিন্তা - কেবল কার্য্য,—কেবল কোলাহল,
শত্রু, মিত্র, তর্ক, দ্বন্দ্ব—চলল অবিরল।

হঠাৎ যেদিন রাগের মাথায় স্রোতের থেকে তুলে
মানুষই ফের বন্দী ক'রে ফেললে আমায় কূলে
চারিদিকে পাঁচিল যেদিন উঠ্‌ল আকাশ ঘিরে
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা মোর সেদিন এল ফিরে।
চাঁদের আলো পড়্‌ল এসে লোহার শিকের ফাঁকে;
অঙ্গনেতে ডাকল পাখী কদমগাছের শাখে;
লাগ্‌ল ভালো আকাশজুড়ে আষাঢ় মেঘের মায়া;
লাগ্‌ল ভালো ভোরের আলো, রাতের কালো ছায়া।
বাইরে যা'রা ডুব দিয়েছে ভিতরে আজ হাসে;
কারার প্রাচীর ভেদ ক'রে কোন বনের বাতাস আসে!
আসে সে কোন্ পাগাড়পুরীর জলের কলগীতি!
রাঙ্গামাটির বুকে সে কোন্ শ্যামল শালের বীথি!
দীঘির জলে পদ্মপানা, নদীর জলে ভেলা;
বালুর চরে, ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যা সকালবেলা;
আসে সে কোন্ দূর সাগরের তরঙ্গগর্জ্জন;
পলাশ বনে কালবোশেখীর বিপুল আয়োজন;
নিশীথরাতের বাঁশী সে কোন্ সন্ধ্যারাতের শাঁখ;
দুপুর রোদে ছাতিমতলায় ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক;
আসে সে কোন্ বীণার ধ্বনি,—বৈতালিকের গান;
কোন্ প্রকৃতির প্রাণের প্রীতি—খেয়ালখেলার দান!
চোখের দেখা যাদের সাথে নয় আজি সম্ভব
মাঠের হাসি, ফুলের গন্ধ,—জলের কলরব;
তর্কদ্বন্দ্ব, ভালোমন্দ,—সবার অতীত যারা—
জ্যোৎস্নারাতের চাঁদ সে আমার আঁধার রাতের তারা!

৪ঠা শ্রাবণ
সেণ্ট্রাল জেল

লক্ষ্মী

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

২

শ্রী বা লক্ষ্মীকে আমরা বিষ্ণুর পত্নী বলিয়াই বুঝি লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর এই সম্বন্ধের সন্ধান বৈদিক যুগে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক সাহিত্যেও এই

সিরিমা দেবতা

ধারণার কোনও মূল পাওয়া যায় না। ভারদ্বাজ সূত্রেও বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর সম্পর্কের কোনও ইঙ্গিত নাই। তবে বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে ইহার একটু আধটু আভাস পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, শ্রী বা লক্ষ্মীর বিষ্ণু-পত্নীত্ব বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালের ব্যাপার। শ্রী বৈদিক যুগে ছিলেন তাহারও প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তবে তাঁহার রূপের বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। ভারহুত ভাস্কর্য্যে (pl. xxiii), 'সিরিমা দেবতা'র * প্রস্তরের একটী অতি সুন্দর ভগ্ন মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের। দেবীর দক্ষিণ হস্তটীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সিরিমা দেবতা—শ্রীমা দেবতা। সিরিমা পীবরস্তনী। ইফেসীয়দিগের ডিয়ানা দেবীর ন্যায় ইহার বক্ষে উৎপাদিকা শক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন এবং ইহাকে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করেন। আমাদের পুরাণেও শ্রীদেবী আছেন, পৌরাণিক সৌভাগ্যদেবী ও 'সিরিমা' কিন্তু ঠিক একই দেবতা ন'ন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে শ্রী=সিরী, লক্ষ্মী=লক্খী। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা শ্রীর অর্থ করিতেন—সৌন্দর্য্য, শোভা, সম্পত্তি। সুত্ত-নিপাতের নালক সুত্তের অষ্টম শ্লোকে ('দদ্দল্লমানং সিরিয়া অনোমবণ্ণং') এই অর্থে ইহার প্রয়োগ আছে। অন্যত্রও আছে। সৌভাগ্য, গৌরব, সমৃদ্ধি বুঝাইতেও শ্রীর বহুল প্রয়োগ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। 'রজ্জ-সিরী-দায়িকা দেবতা' বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যদেবী—সিরিদেবতা।†

* বৌদ্ধ 'শীল' গ্রন্থে 'সিরিমা'-পূজার কথা আছে।

† তাঁহাদের সৌভাগ্য সিরিধর (শ্রীধর); যে ব্রাহ্মণ সৌভাগ্য হরণ করেন তিনি—সিরিচোরব্রাহ্মণ। মর্য্যাদা বুঝাইতে আমরা শ্রদ্ধেয় নামের পূর্ব্বে শ্রী বসাইয়া আরও একটু বেশী শ্রদ্ধা দেখাইয়া শ্রীপাট, শ্রীধাম, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীহস্ত প্রভৃতি বলিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু ঠিক তাহাই করিতেন না। তাঁহাদের শুইবার ঘর জাতিবর্ণগুণকর্ম্ম নির্বিশেষে সিরিগব্ভ (শ্রীগর্ভ), কিন্তু শ্রীগর্ভে স্বামিস্ত্রীর বিবাদ হইলে সেই বিবাদের নাম হয় সিরিবিবাদ। আবার তোমার আমার শয্যা বা শয়ন—সয়ন, কিন্তু রাজারাজড়াদের শয়ন—সিরিসয়ন।

শ্রীদেবতার মূর্ত্তির বর্ণনা বৌদ্ধ সাহিত্যে না থাকিলেও ভাস্কর্য্যে আছে। ভারহুতের মূর্ত্তির পূর্ব্বে শ্রীদেবতার

একাদশ শতকের লক্ষ্মী
(দক্ষিণ-ভারত)

কোনও মূর্ত্তি কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে শ্রীদেবতার অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের একটী মূর্ত্তির চিত্র দেওয়া হইল। চিত্র রীজ ডেভিড্‌সের বৌদ্ধভারত গ্রন্থে আছে।

তারপর সাঁচীস্তূপে স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে কমলার একটী মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির অপর নাম গজলক্ষ্মী। ইনি পদ্মপীঠাসনে উপবিষ্টা। পীঠাসনটী পদ্মনালের উপর সংস্থিত। নালটী আবার একটী পদ্ম হইতে উঠিয়াছে। এই পদ্মটীর দুই পাশে দুটী পদ্ম। তন্মধ্যে একটী পদ্মের উপর দেবী পদ্মপীঠ হইতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। দুইটী হাতী শুঁড় দিয়া দেবীর মাথায় জল ঢালিতেছেন। প্রত্যেক হস্তীর চারিটী চরণ পদ্মের উপর সংস্থিত। দেবীর আশেপাশেও পদ্ম। সাঁচী স্থাপত্য-যুগের সময় হইতে বরাবর এমন কি আজ

কমলা বা গজলক্ষ্মী

পর্য্যন্ত এই প্রাচীন আদর্শে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি তৈরী করা হয়। সাঁচী স্তূপের মূর্ত্তিটাই গজলক্ষ্মীর প্রাচীনতম মূর্ত্তি। ইলোরার কৈলাস মন্দিরেও গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। দেবীর হস্তে পদ্ম এবং চারিটী হস্তী তাঁহার মস্তকে জল-সেচন করিতেছে।

মুদ্রায় লক্ষ্মী

বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের দেব-দেবীর স্থান বড় উচ্চ ছিল না। এই যুগের দ্বিতীয় পাদে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীগণ ভাস্কর্য্যে স্থান লাভ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মুদ্রায় শিব-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুদেব হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিনি

একজন পরম শৈব ছিলেন। তিনি যে মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত দিকে শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বাসুদেবের মৃত্যুর পর (খৃঃ ২২০ কুষাণদিগের প্রভুত্ব কমিয়া গিযাছিল। অবশ্য কণিষ্কের বংশধরগণ ৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাবুল উপত্যকা নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজাদের শাসনকালে প্রধানতঃ দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক প্রকার মুদ্রার বিপরীত দিকে শিবের মূর্ত্তি ছিল; আর এক প্রকার যে মুদ্রা ছিল তাহার উপরের দিকে সিংহাসনে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

এলাহাবাদে একটা ক্ষোদিত স্তম্ভ আছে। ইহাতে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে নর্ম্মদা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশজয় ব্যাপার শেষ করিয়া তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে সমুদ্রগুপ্তের অধীন রাজ্যগুলি পূর্ব্বে কুষাণদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। এখানে এক রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল, আর সেই মুদ্রায় "দণ্ডায়মান

উপরে কুষাণরাজ
নিম্নে আসীনা দেবী।
-ক্ষিণ হস্তে পাশ—
-ম হস্তে শৃঙ্গ

নৃপতি" ও "আসীনা . দেবীর"র মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। এই সকল মুদ্রার ও অনুকরণে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার প্রতিকৃতি লওয়া গৃহীত হইয়াছিল। নানালঙ্কার-ভূষিতা সিংহাসনাসীনা দেবীমূর্ত্তি সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের শাসনকালে অশ্বারূঢ়া দেবীমূর্ত্তির মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় দেবী যে ভাবে উপবিষ্টা তাহাতে ধনদা লক্ষ্মীদেবীর সমস্ত গুণই প্রকাশ পাইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা। পদ্মের উপরে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত। দক্ষিণ দিকে পরাক্রমের মূর্ত্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খৃঃ ৩৭৫-৪১৩) রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। মুদ্রার উপরে লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনের পরিবর্ত্তে পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা, অপর দিকে লক্ষ্মীদেবী অনুরূপ মূর্ত্তিতে সিংহের উপরে আসীনা। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে যে রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল প্রথম কুমারগুপ্ত (খৃঃ ৪১ -৪) ঠিক সেই রকম মুদ্রারই প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রার বিপরীত দিকে লক্ষ্মীদেবী ময়ূরকে আহার দান করিতেছেন এইরূপ ভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে।

গুপ্তবংশের শেষ রাজা স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খৃঃ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তিনি এক নূতন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মীদেবী, বাম দিকে রাজা স্কন্দগুপ্ত এবং মধ্যভাগে গরুড়। ব্রিটিশ-মিউজিয়মে কতকগুলি দুর্লভ মুদ্রা সংরক্ষিত আছে, সেগুলির উপরে ক্ষোদিত মূর্ত্তির সহিত গুপ্তরাজগণের মুদ্রাঙ্কিত মূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; আর এই সাদৃশ্য এত বেশী যে, উভয় পরিকল্পনা একই বিষয় হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করাও যাইতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রার পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষোদিত সিংহাসনাসীনা দেবীমূর্ত্তি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে প্রাপ্ত ধনুর্দ্ধারী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই ইণ্ডোসিথিয়ান মুদ্রাঙ্কিত-"অদ্রোখ্‌শো" মূর্ত্তির পরিকল্পনা হইতে গৃহীত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার উপরে অঙ্কিত দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ধনুর্দ্ধারী মূর্ত্তির সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে আসীনা দেবীমূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। শেষোক্ত দেবীমূর্ত্তি বহু শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতে স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রায় অঙ্কিত মূর্ত্তির আদর্শ পরিকল্পনা বলিয়া গৃহীত হইত। এই

মূর্ত্তির সহিত সিংহাসনারূঢ়া দেবীর, দণ্ডায়মানা দেবীর, অথবা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা দেবীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ, এই সমস্ত দেবীর এক হাতে পদ্ম ও অপর হাতে পাশ থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত এই দেবীমূর্ত্তিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। লক্ষ্মী সৌভাগ্যদেবী, পীতবর্ণা, পদ্মাসনে উপবিষ্টা। কখনও কখনও তিনি চতুর্হস্তা; তখন তাঁহার দক্ষিণ দিকের একটা হাতে জপমালা এবং বাম দিকের একটা হাতে পাশ থাকে; বরুণ ও শিবের হাতেও এই প্রহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের (৬০০-৬২৫ খৃঃ) মুদ্রায় শিব নন্দীর (বৃষের) উপরে হেলিয়া রহিয়াছেন, বামদিকের

শিব—শ্রী

উপরিভাগে চন্দ্র, দক্ষিণে শ্রী শ, নিম্নে জয়। লক্ষ্মী দেবী পদ্মোপরি উপবিষ্টা। উভয় পার্শ্বে হস্তী জল ঢালিতেছে; দক্ষিণ দিকে শ্রীশশাঙ্ক। তাম্রমুদ্রায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হস্তিদ্বয় দেবীর মস্তকে জল-সেচন করিতেছে। ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রমুদ্রায় এইরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় (*A. S. R.*, 1903-4. vol iii, pl xl, 7, 8, 10, 11, 13 দ্রষ্টব্য)। সমুদ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রার সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ফরিদপুরে এই রকম একটী তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বসাড়ে ১৯১২ সালে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ডিম্বাকার একটী বৃহৎ ও চমৎকার মুদ্রা আছে। আয়তনে ইহা ২ "২"×২"। ইহাতে লক্ষ্মী দেবী দুইটী হস্তীর সম্মুখে একটী নীচু বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন, আর ঐ হস্তিদ্বয় তাহাদের শুণ্ডোপরিস্থ কলসী হইতে তাঁহার মস্তকে জল-সেচন করিতেছে। দেবীর বাম ভাগে একটী বড় শঙ্খ। দক্ষিণ দিকেও কিছু আছে—কি ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। মুদ্রাটী সম্ভবতঃ চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকের। মুদ্রার নিম্নদেশে দুই ছত্র এইরূপ অঙ্কিত আছে :—

বিশালি নামকুণ্ডে কুমার।
মাত্যাধিকরণ (স্য।

পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত একটী তাম্রমুদ্রায় দুইটী সহচরীর সহিত লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। মুদ্রাটীর পরিধি চারি ইঞ্চি। সহচরীগণ গোলাকার পাত্র হইতে দেবীর মস্তকে জল-সেচন করিতেছে। বিপরীত দিকে একটী পদ্ম। তাম্রমুদ্রার ভাষা গুপ্ত রাজাদের শাসন-কালের। কনৌজের হিন্দুরাজগণ লক্ষ্মী মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে সুলতান মুহম্মদ বিন শাম লক্ষ্মীমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান ও মধ্য-ভারতে যে সমস্ত রাজপুত নরপতি রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ছিল। গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্য (১০১৫-১০৪০ খৃঃ) যে মুদ্রা প্রচলিত করেন তাহাতে লক্ষ্মী চতুর্হস্তবিশিষ্টারূপে অঙ্কিত আছেন।

স্থাপত্যে লক্ষ্মী

আমাদের শাস্ত্রের উক্তি, বিষ্ণু জগত্রাতা। বিষ্ণু নানাস্থানে নানা নামে পরিচিত। দক্ষিণভারতে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা মন্দিরগুলিতে নানাভাবে হইয়া থাকে। তাঁহার চারিটী বাহু, দুইটী চক্ষু; মস্তকে কিরীট এবং বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। উপরের হাত দুটীতে শঙ্খ-চক্র এবং নীচের দুটী হাতে গদা-পদ্ম। শ্রীবিষ্ণুর কণ্ঠে আজানুবিলম্বিত বনমালা। ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ দিকে বিরাজিতা থাকেন।

দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিতে শ্রীবিষ্ণুর নানামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনন্ত-নাগের পৃষ্ঠোপরি শ্রীবিষ্ণু নিদ্রিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত এবং বাম বাহুটী কিঞ্চিৎ উত্তোলিত। তাঁহার মেখলা নাভির নিম্নভাগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার কণ্ঠের বনমালা দক্ষিণ বাহু হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—

ইহাতে তাঁহার নিদ্রাবিষ্ট মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। অনন্ত-নাগের পার্শ্বে বিষ্ণুর পদমূলে নতজানু, বিষ্ণুর পূজার্চ্চনানিরতা লক্ষ্মীদেবীর সমুজ্জল মূর্ত্তি বিরাজিত। লক্ষ্মীর সম্মুখে নাগ-পার্শ্বে আরও দুইটী মূর্ত্তি আছে। এই দুইটী মূর্ত্তি ব্রহ্মা ও শিবের অথবা জয়া এবং বিজয়ার বলিয়া বোধ হয়।

অনন্ত-নাগের উপরে উপবিষ্ট মূর্ত্তির নাম বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ। জানু-গ্রন্থির উপরে বাম-হস্ত এবং নাগের মস্তকের উপরে মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে। পশ্চাতের বাহু দুটীতে শঙ্খ এবং চক্র বিরাজমান। মূর্ত্তিটী মণি-রত্ন-শোভিত এবং ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং পৃথ্বীর মূর্ত্তি। বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তির বামভাগে, পার্শ্বদেশে অথবা উরুর উপরে লক্ষ্মীকে উপবিষ্টা থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া তিনি বিষ্ণুর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার বামহস্তে পদ্ম থাকে। বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্মীর কটিদেশ-বেষ্টিত থাকে।

পদমপুর জমিদারীতে নরসিংহনাথের মন্দির আছে। সম্বলপুর জেলায় পদমপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। মন্দিরটীর মুখ পূর্ব্বদিকে, ইহাতে একটী সুবৃহৎ মন্দির আছে। 'জগমোহন' মণ্ডপের প্রাচীরগুলি পুনরায় প্রস্তুত হইয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আগে মণ্ডপটীর পূর্ব্বে, উত্তরে এবং দক্ষিণে দ্বার ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুইটী মাত্র দ্বার আছে, তৃতীয় দ্বারটী একেবারে রুদ্ধ। সেইজন্য পার্শ্বের প্রাচীরটী বিসদৃশ হইয়াছে। উত্তরদিকে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীদেবী পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ পদ সিংহাসনে এবং বাম পদ নিম্নে স্থাপিত একটী কাষ্ঠাসনের উপরে। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজন হইতেছে এবং দুইটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা পানপাত্র ধারণ করিয়া আছে। দক্ষিণ দিকের প্রাচীন মন্দিরের দ্বারের উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। ওড়িশার প্রাচীন মন্দিরে গজলক্ষ্মী দেখা যায়। কটকের প্রাচীন গুহায় এই প্রকার ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

মন্দিরের দ্বারেও গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকিতে দেখা যায়। (*Arch Sur. Rept*, p. 121, 122, 123)

ধর্ম্মনাথের (ধমনারের) মন্দির বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হইয়াছে কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে পশ্চাতের প্রাচীরে গদা, মালা, চক্র ও শঙ্খধারী কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ব-দ্বারের উপরে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী আছেন। বিষ্ণুর উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা এবং বাম-দিকের বাম হস্তে চক্র আছে। বাম দিকের হাতখানি লক্ষ্মীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছে, দক্ষিণ দিকের হাতখানি সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলা যায় না।

সোমপল্লীতে কয়েকটী তাম্রমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রধান মূর্ত্তিটীর নাম ছিন্নকেশবস্বামী, কৃষ্ণপ্রস্তরে ইহা সুন্দরভাবে ক্ষোদিত; প্রতিদিন ইহার পূজার্চ্চনা হয়। মন্দিরের পূজারীর গৃহে তিনটী তাম্রমূর্ত্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটী ছিন্নকেশবস্বামীর এবং অপর দুইটী লক্ষ্মী ও ভূদেবীর। কোন পর্ব্বোপলক্ষে ইহাদিগকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। উক্ত তীর্থস্থানের উপরে ইষ্টকের একটী (অধুনালুপ্ত) চূড়া আছে।

কমলা (গজলক্ষ্মী)
(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ)

পশ্চাদ্দিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রতিমা রাখিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র স্থানও নির্দ্দিষ্ট আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটী কমলা-মূর্ত্তি আছে;

কমলা পদ্মাসনের উপরে উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণপদ বিলম্বিত অবস্থায় একটী ইন্দুরের পৃষ্ঠের উপর রহিয়াছে। দেবী একটী করণ্ড মুকুট পরিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণদিকের উপরের হাতে অঙ্কুশ, নিম্ন হাতে অক্ষমালা, বামদিকের উপরের হস্তে চতুষ্কোণ হীরক-খচিত বস্ত্রখণ্ড। ললাটে তিলক বেশ স্পষ্ট। তিনি কর্ণপুর, কর্ণকুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর, নূপুর, কণ্ঠহার প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন। পথের উপরে দণ্ডায়মান দুইটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা পাত্র হইতে দেবীর মস্তকের উপরে জলবর্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণুর ত্রি-বিক্রম মূর্ত্তিতে লক্ষ্মী দক্ষিণদিকে এবং সরস্বতী বামদিকে দণ্ডায়মানা থাকেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এইরূপ একটী মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিতে লক্ষ্মী বাম হস্তে পদ্ম-নাল ধারণ করিয়া আছেন এবং সরস্বতী উভয়হস্তে বীণা লইয়া আছেন।

পরিষদে একটী চতুষ্কোণ তাম্রফলকে বেশ একটী সুন্দর ছবি দেখান হইয়াছে। ইহাতে বিষ্ণুর দশ-অবতারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। প্রথম চারিটী মূর্ত্তি চতুর্হস্তবিশিষ্ট, অবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলি দশহস্তবিশিষ্ট। ধনুকহস্তে রামের মূর্ত্তি পরশুরামের পূর্ব্বে ক্ষোদিত রহিয়াছে। বলরামের লাঙ্গল বেশ স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। দশমাবতার কল্কি অশ্বারোহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু পদ্মের উপরে উপবিষ্ট এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিষ্ণুর উপরিভাগে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে এবং নিম্নভাগে গরুড় আছেন। একটী ছোট লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেবী চতুর্হস্তবিশিষ্ট। উপরকার দুইটী হস্তে পদ্ম আছে, নিম্নের দুইটী হস্তে তিনি বরাভয় দান করিতেছেন। দেবী কর্ণকুণ্ডল, কণ্ঠহার, বলয় পরিধান করিয়াছেন।

আইহোলের দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে আমরা গজলক্ষ্মী-কে অধিষ্ঠিত দেখি। ঐ মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে তাঁহার বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হয়।

জয়পুরে (কাশ্মীর) রাজা জলোকার প্রতিষ্ঠিত একটী বড় বৌদ্ধবিহার ও একটী কেশবমন্দির ছিল। বৌদ্ধ-বিহারের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনে হয়। কেশবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে একটী ক্ষোদিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে। ফলকটীর দুই দিকই ক্ষোদিত এবং উভয় দিকেই লক্ষ্মী ও ভূমিদেবীর মাঝখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি সহজভাবে উপবিষ্ট দেখা যায়।

একটী মূর্ত্তিতে বিষ্ণু একানন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বামপার্শ্বে বীণাপাণি সরস্বতী। মূর্ত্তিটী অবন্তীপুরে পাওয়া গিয়াছে। অধুনা মথুরার প্রত্নতত্ত্বাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

অবন্তীপুরে শ্রীর আর একটী মূর্ত্তি দেখিবার জিনিস। ইহা উচ্চতায় ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চি। দেবী, দুইটী সিংহের উপরিস্থিত আসনে সহজভাবে আসীনা, আর দুইটী হস্তী তাঁহার মাথায় বারিপাত করিতেছে। তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে একটী অমৃত ঘট হইতে একটী পদ্ম উপরদিকে উঠিয়াছে। তিনি ইহার সপত্র বৃন্তটী বামহস্তে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটী বিল্বফল দেখা যায়। অবন্তীস্বামী মন্দিরের আবিষ্কৃত শ্রীমূর্ত্তির সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে। কাশ্মীরের ভবনমাণ্ডু ও ঐমকাম স্থানদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী একটী গ্রামে ঐরূপ একটী শিলামূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। ফুশে বলেন বৌদ্ধদিগের কুবের পত্নী হারীতির মূর্ত্তি হইতে এই লক্ষ্মী-মূর্ত্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

অবন্তীপুরের দেবমন্দিরে বিষ্ণু ও শ্রী ভূমিদেবীর মধ্যভাগে উপবিষ্ট আছেন দেখা যায়, আবার সিংহাসনের সম্মুখে দুইটী শুকপক্ষী আছে। এখানে বিষ্ণু কখনও চতুর্ভুজ, কখনও ষড়্‌ভুজ; কিন্তু দেবীদের প্রথামত দুইটী করিয়াই হাত আছে। আর শুকপাখীদের বিষয়ে
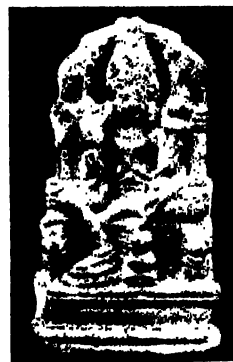
শ্রী-মূর্ত্তি (অবন্তীপুর)।

এইটুকু বলা চলে যে, দক্ষিণ ভারতের দুর্গা ও অন্যান্য দেবীদিগের হাতে প্রায়ই শুক দেখা যায়।

পৃঃ ৭০ (১৯১৫-১৬)

সহরি বহলোলে হিন্দু দেবালয়ের অনেকগুলি

হারীতি

ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ কয়েকটী ক্ষুদ্রায়তনের দেবমূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি সুন্দররূপে

শ্রী ও ভূমিদেবীর মধ্যভাগে বিষ্ণু

ক্ষোদিত; দেখিয়া খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে একটী সুস্পষ্ট লক্ষ্মী-মূর্ত্তি দেখা যায়।

ভীটায় বৈষ্ণবদিগের যে কয়েকটী মূর্ত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে লক্ষ্মী, গজ, শঙ্খ এবং চক্রের চিত্র পাওয়া যায়।

রংপুরে লক্ষ্মীর একটী মূর্ত্তি দেখা যায়, তিনি পদ্মপাণি ও বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে অবস্থিতা। তাঁহার দুইটি ভুজ। তিনি প্রথমত একটী পদ্মের উপর একটু উদ্ভট ভঙ্গীতে উপবিষ্টা। তাঁহার দুইদিকে দুইটী করিয়া সহচরী, তাঁহারা বিবসনা। ঠিক লক্ষ্মীর পার্শ্বেই যে দুইজন সহচরী আছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক হাতে একটী করিয়া কলসী ধরিয়া আছেন। আর দুইজন সহচরীর বামহাতে এমন কোন জিনিস আছে, যার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। পশ্চাদ্দিকে দুইটী হস্তীর নিদর্শন. দেখা যায়। উহাদের একটী লক্ষ্মীর দক্ষিণ পাশে তাঁহার মাথার কলসী হইতে জল-সেচন করিতেছে। অপরটী ঠিক ঐরূপ একটী কলসী লক্ষ্মীর বামদিকে অবস্থিতা একজন সহচরীর হস্ত হইতে শুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করিতেছে।

ও'সিয়ার মন্দিরটী যখন ব্যবহার হইত, তখন বহুবার ইহাতে চুনকাম পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই চুনকামের ফলে এখানকার অনেক মূর্ত্তির উপর এমন ঘন প্রলেপ পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে আর বুঝিবার যো নাই। প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের উপর গরুড়ের একটী মূর্ত্তি আছে। তাহার উপরিভাগে নবগ্রহ; এবং ঊর্দ্ধে কাণিসের নীচে নয়টী সারিবদ্ধ কোটর বা কুলুঙ্গী আছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই কোন-না-কোন মূর্ত্তি আছে, মধ্যবর্ত্তী কোটরের মূর্ত্তিটী লক্ষ্মী-নারায়ণের বলিয়া প্রতীতি হয়।

সম্প্রতি মসরুরের পর্ব্বত-ক্ষোদিত মন্দির খননকালে একটী সুন্দর লিণ্টেল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে লক্ষ্মীর অভিষেকের একটী অতি মনোরম চিত্র আছে।

শিবের সহিত দেবীর সম্বন্ধ আছে এ কথা বহুস্থান হইতে জানিতে পারা যায়। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সহিত দেবীপূজার সম্বন্ধ আছে। বিষ্ণুর সঙ্গিনীদের মধ্যে লক্ষ্মীই প্রধানা। সুধা লাভ করিবার আশায় দেবগণ যখন সমুদ্র মন্থন করেন, বহু দুর্ল্লভ দ্রব্য সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীও সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইনি পরে বিষ্ণুর পত্নী হ'ন। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে তাঁহার পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন। তিনি শ্রী, পদ্মা ও কমলা নামে পরিচিতা। তিনি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা এবং তাঁহার দুই হাতে পদ্ম আছে। তিনি পদ্ম-মালাতে বিভূষিতা.

ঢালিতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে দেবী কৃষ্ণবর্ণা; অংশুমদ্‌ভেদাগমে তাঁহার অনুরূপ বর্ণনা আছে। ইহাতে লক্ষ্মীর বর্ণ স্বর্ণ-হরিদ্রার মত হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কার পরিধান

সমুদ্রোত্থিতা পদ্মা (ইলোরা)

করেন। তাঁহার কর্ণে নক্র-কুণ্ডল। লক্ষ্মীর দৈহিক অবয়ব কুমারীর ন্যায়। তাঁহার আকৃতি মনোহর, ভ্রূ-যুগল অতীব সুন্দর, পদ্মের ন্যায় চক্ষু, মনোরম গ্রীবা এবং সুগঠিত কটিদেশ। তাঁহার মস্তকে বিবিধ অলঙ্কার, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বাম হস্তে বিল্ব ফল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত এবং চিত্তাকর্ষক। কটি-মেখলায় কলা-কৌশল থাকায় স্বভাব-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইলোরার গুহাভ্যন্তরে রাবণ কা খাইয়ের একটি চিত্র আছে। তাহাতে সপ্তমাতার মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

রাবণ কা খাইয়ের দৃশ্যে লক্ষ্মী (ইলোরা)

সপ্তমাতা, যথা—১। চামুণ্ডা - বাহন পেচক; ২। ইন্দ্রাণী —বাহন হস্তী; ৩। বরাহী—বাহন শূকর; ৪। লক্ষ্মী—বাহন গরুড়; ৫। কৌমারী—বাহন ময়ূর; ৬। মহেশ্বরী —বাহন বৃষ; ৭। ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী—বাহন হংস।

পরমাশ্ব

লক্ষ্মী—বৌদ্ধদের নিকট "পরিবারসম্পত্তি" এবং "প্রজ্ঞা"; ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন—সিরিপি 'পুঞ্‌ঞম্পি পঞ্‌ঞাপি'। তবে বৌদ্ধেরা কখন হিন্দুদেবতার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে চরণতলে রাখিয়া লাঞ্ছিত করেন। তাঁহারা গণেশের, ব্রহ্মার, দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন, লক্ষ্মীকেও বাদ দেন নাই।

পরমাশ্ব হয়গ্রীবের অপর একটি মূর্ত্তি।

"প্রত্যালীঢ়েন দক্ষিণপাদেকেন ইন্দ্রাণীং শ্রিয়ঞ্চ আক্রাম্য স্থিতম্, দ্বিতীয়দক্ষিণচরণেন রতিং প্রীতিঞ্চ, বাম-

পরমাশ্ব (বৌদ্ধ দেবতা)

প্রথমপাদেন ইন্দ্রং মধুকরঞ্চ, বামদ্বিতীয়পাদেন জয়করং বসন্তঞ্চ, ইত্যাত্মনং ধ্যায়েৎ।"

সাধনমালা A-280, Na-32. C-217-18

তিনি প্রত্যালীঢ় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণপদ দ্বারা ইন্দ্রাণী এবং শ্রীকে দলিত করিতেছেন এবং দ্বিতীয়পদ দ্বারা রতি এবং প্রীতিকে দলিত করিতেছেন; বামদিকের একটী পদ দ্বারা ইন্দ্র এবং মধুকরকে এবং অন্য বাম পদদ্বারা জয়কর এবং বসন্তকে দলিত করিতেছেন।

দীপ-লক্ষ্মী

দেবতাদের স্থানে দীপ দিবার রীতি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত। দীপগুলি যাহাতে কারুকার্য্যমণ্ডিত

হয় তজ্জন্য শিল্পিগণ বহুপ্রকার কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দক্ষিণ-ভারতে দীপে অনেক সময়ে লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্ত করিয়া দেখান হয়। তখন দীপের নাম হয়

দীপ-লক্ষ্মী

দীপ-লক্ষ্মী। এই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দীপগুলি লক্ষ্মীদেবীর দয়াশীলতার পরিচায়ক। উপাসকগণ মনে করেন যে, দীপগুলি দানের উপযুক্ত বস্তু। দক্ষিণ হস্তের পক্ষীটা একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য।

কম্বোজের অন্তর্গত Ang-Pou-এর একটা শিলালিপিতে (Inscrip. of Ang Chumik (667 A. D.); Corpus. 1, p. 67) পাওয়া যায় যে, জগতের মঙ্গলের জন্য হর ও অচ্যুত সম্মিলিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ইঁহাদের পূজার্চ্চনা সম্পূর্ণভাবে শৈব উপায়ে সম্পন্ন হয়। ভববর্ম্মা শম্ভু-বিষ্ণুর পূজা করিয়াছেন এবং উমা, লক্ষ্মী, ভারতী, ধর্ম্ম, মারুত এবং বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে যবদ্বীপের অধিবাসিগণ ইসলাম্ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, এখানেও অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল শ্রেণীর লোক রাক্ষস, ভূত এবং বিদ্যাধরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। এমন কি মুসলমানগণও বিশ্বাস করেন যে, লক্ষ্মী শস্য এবং সুখ-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মেও বহু দেবদেবীর পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে তারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী, তাঁহার সহচরী এবং তাঁহার নিজের মূর্ত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বহু গুণান্বিতা লক্ষ্মীদেবীও সেখানে পূজিত হইয়া থাকেন।

শৈবধর্ম্মের সহিত দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পরবর্ত্তী যুগের বৌদ্ধধর্ম্মেও মাডোনার মত একটা সুন্দর মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সীতা খুবই দানশীলা, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কাহারও শ্রদ্ধা পান না।

রাশিয়ার শিক্ষাবিধি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু

আশা, রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেচি এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েচে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধ কুঠুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এক কালের মরাগাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েচে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্ব্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করবে। আমাদের দেশের মতই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি একদিকে মূঢ় আর একদিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্চে প্রথা—পিতামহের আমলের চাকরের মত, সে কাজ করে কম অথচ কর্ত্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চল্‌তে হ'লে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চল্‌চে।

আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল অস্ত্রটা হ'ল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেচে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে-দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েচে, দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েচে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্চে বলরাম। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখেনি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মত সম্পূর্ণ দুর্ব্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেচে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব—আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্চে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীব-যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন ক'রে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না। এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেচে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করাবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্ব্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয়

আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেচি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জান্‌তে চাওয়ার সঙ্গে জান্‌তে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোন দিন জান্‌তে চাইতে শেখেনি,—প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে। আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করো কি ? সে বললে, জানিনে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বল্‌লুম জিজ্ঞাসা পরে ক'রো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে বলো। সে বললে আমি জানিনে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চ্চাই করে না—তাকে চালনা করা হয় সে চলে, আপন থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না। এরকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণতঃ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরও একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সেজন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা ক'রে থাকে আমরা উপরে থেকে কি বল্‌তে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মত নিরুপায় মন আর হ'তে পারে না।

এখানে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলচে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেচি। পায়োনিয়র্স কমুন ব'লে এদেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যে রকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স দল কতকটা সেই ধরণের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু'ধারে বালকবালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আস্‌তেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বস্‌ল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেচে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে ব'লে মনে হয় যেন সর্ব্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বল্‌লে, পরশ্রমজীবীরা (Bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্য্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।

একটি মেয়ে বল্‌লে "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাজ ক'রে থাকি যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য্য।"

আর একটি ছেলে বল্‌লে, "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড় তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হ'লে ছোট ছেলে-মেয়েরা বড় ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চ্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে এদের শিক্ষা কেবল পুঁথি

পড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে, চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত ক'রে এরা তৈরি ক'রে তুলচে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণরক্ষায় এদের গৌরববোধ। আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেচি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ব বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার,—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হ'তে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত ক'রে তোলবার চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম। একটা ছোট দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলা দেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেচি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড় কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হ'লে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হ'ত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা ব'লে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনো মতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে-জিনিষটাকে উদরস্থ করি সে-সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাশের মার্কার চেয়ে অনেক বড়।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কি?"

একটি মেয়ে বল্‌লে, "আমাদের কোনো শাসন নেই, কেন-না আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বল্‌লুম, "আর একটু বিস্তারিত ক'রে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্ব্বাচন করো? শাস্তি দেবার বিধিই বা কি রকমের?"

একটি মেয়ে বল্‌লে, "বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বল্‌লে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্ চুকে যায়।"

আমি বল্‌লুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্চে তা হ'লে তোমাদের উপরেও আর কারও কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে?"

ছেলেটি বল্‌লে, "তখন আমরা ভোট নিই—অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হ'লে তার উপরে আর কথা চলে না।"

আমি বল্‌লুম, "কথা না চল্‌তে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্যায় করচে তাহ'লে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি?"

একটি মেয়ে উঠে বল্‌লে, "তা'হলে হয়ত আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই—কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি।"

আমি বল্‌লুম, "যে একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্ত্তব্য কি প্রশ্ন করাতে বল্‌লে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায় সম্মান চায়, আমরা তার কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই, কি করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কি করে বুদ্ধিপূর্ব্বক করতে হয় এই সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস

করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বল্লে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য। কেন-না ঠিকমত ক'রে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বললে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্চে এদের পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প। ব্যাপারটা হচ্চে, এরা কঠিন পণ করেচে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে এরা যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের একধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেকদূর পর্য্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে—সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্যএশিয়ার অসিতচর্ম্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে ব'লে ভয় নেই ভাবনা নেই। এই কাজের জন্যে এদের প্রভূত টাকার দরকার—য়ুরোপীয় বড় বাজারে এদের হুণ্ডি চলে না—নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিন্‌চে, উৎপন্ন শস্য, পশুমাংস, ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্চে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েচে। এখনও দেড় বছর বাকী। অন্য দেশের মহাজনরা খুশী নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা কলকারখানা অনেক নষ্টও করেচে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেন-না সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেচে, এখনও দু'বছর বাকী। সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মত—নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী ক'রে ক্রমে ক্রমে কি পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করচে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। যারা জীবন-যাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহুকষ্টে কাল কাটাচ্চে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ ক'রে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ করে নেয়। এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে কোনো একদল লোক নয় দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্য দেশের বিবরণও এই রকম ক'রে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিশরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম—প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করচি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্কুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব। ওদের দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম—সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। একটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম, বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্চে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য্য-তালিকা অনুসারে পায়োনীয়ররা (পুরোযাত্রীদল) কারখানা, হাঁসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা,

সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পাইওনীয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারিদিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্ত্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোল। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মত লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশী পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়—আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে, গোঁয়ারের মত ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড় বড় রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মত ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্ব্বতন কালে আমীর ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় ক'রে ক'রে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুৎপাণ্ডাকে দিয়েচে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেচে তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না। আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলষ্টয়ের রিসারেক্সান। জিনিষটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। এংলো-স্যাক্‌সন চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিষ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ করচে একথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও। আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্ততঃ আমি ত এদের রুচির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারব না। রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কূয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল, কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার জেগেছিল। এই ত আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুৎ আলোর কারখানা, ক'জন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা ত ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে, সেখানে কৌতূহল দুর্ব্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি দেখে বিস্মিত হতে হয়—সেগুলো রীতিমত ছবি, কারও নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্ম্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই—আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও হয়ত পূরণ না হতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি—আরও দু চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে, বিশেষ এগোবে না তাও জানি—তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর, ১৯৩০।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

কালীমোহন, সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন

করা হয়েচে তার কিছু কিছু আভাস সুরেনের চিঠি থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্চি।

কিছুদিন হ'ল মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্যে একটি আরামবাগ খোলা হয়েচে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েচে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শত সহস্র শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েচে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়লো, মুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েচে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হ'ল, কত নতুন বাগান, শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হয়েচে। নানা রকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফুল ও সবজি উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হচ্চে তার নমুন', হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কি রুটি তৈরি হচ্চে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কি রকম হ'ত। তাছাড়া নানা তামাসা নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্যমেলার মত আর কি। পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোট ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্কলোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে ছেলেদের উৎপাত করো না। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার, সে থিয়েটারে ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা। এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছুদূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশু-রক্ষণী। মা বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোট শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (pavilion) আছে ক্লাবের জন্যে। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ খেলার ঘর আছে, কোথাও আছে মানচিত্র আর আছে দেওয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভাল কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কৌ পশুশালা বিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেচে, এই দোকানে নানারকম পাখী মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এই রকমের পার্ক খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্চে এই যে জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোল আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়—সকল অধ্যায়েই এরা আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কৌ শহর থেকে কিছুদূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট আপ্রাকসিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে—শস্যক্ষেত্র নদী এবং পার্ব্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড় বড় প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ, এছাড়া আছে সঙ্গীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা, এছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে। এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েচে—এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হ'ত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা নির্ম্মাণ যার প্রধান কর্ত্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তি নিকেতন—The Home of Rest। এই অল্‌গভো তারই তত্ত্বাধীনে। এমনতর আরও চারটে সানাটেরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ

প্রণালীতে এই রকম বিশ্রান্তি-নিকেতন স্থাপনের ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করচে।

আর কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমন ভাবে আর কোথাও চিন্তাও করেনি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কি রকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কি রকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে-পর্য্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে পর্য্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপমায়ের। বাড়িতে তাদের কি ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় ষ্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্ব্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত তাদের কাজের সময় পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্ত্তব্য করচে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কি রকম আছে, পড়াশুনো কিরকম চলচে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্চে, তাহলে বাপমায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপমায়েরই। এই রকম ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারী অভিভাবক বিভাগের।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল ত বাপমায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেন-না তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐ রকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্ট সাধারণেরই সুযোগ সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ ষ্টেটের। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্য কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না। যাই হোক মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মত ধরতে পেরেচে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফাশিস্তদেরই মত। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যক্তিকে দুর্ব্বল করে' সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলচে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মত ভাল ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনই চিরদিন পারে না। উপযুক্ত মত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চ্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেচে—ফাসিস্টদের মত নিয়তই তাকে পেষণ করেনি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্ত্তী ক'রে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা ক'রে তুলেচে তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চ্চা বন্ধ করেনি। যদিও সোভিয়েট নীতি প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেই বাহুবলকে খাড়া ক'রে রেখেচে তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়েনি এবং ধর্ম্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেচে। মনকে একদিকে স্বাধীন করে' অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেচে, মনের দিকে নয়—সাহস বেড়েচে কিন্তু চিন্তনশক্তি বাড়েনি। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা

বাড়িয়ে তুলচে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে পৌছব নিয়ুইয়র্কে। তারপরে আবার নতুন পালা। এরকম ক'রে সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসবার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হ'ল। ইতি ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষকে লিখিত]

—

কল্যাণীয়েষু

সুধীন্দ্র, ইতিমধ্যে দুই একবার দক্ষিণ দরজার কাছ ঘেঁসে গিয়েছি। মলয় সমীরণের দক্ষিণ দ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বল্‌লে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্ত্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল বলা যেতে পারে। যাই হোক যমদূতের ইসারা পাওয়া গেছে, ডাক্তার বল্‌চে এখন থেকে সাবধান হ'তে হবে। অর্থাৎ উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে—শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভাল-মানুষের মত আধ-শোওয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্চি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তারপরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কি তার আভাস পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম—বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়িনি অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়চে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড় লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব। সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের ব'লো এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে সুরু না করে যে বড় লাগ্‌চে—সে কথা বল্‌লেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলি চেষ্টা করচে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্চি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করিনে। বাংলা দেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, সেইটাই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেল্‌তে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা করো, নকল ক'রো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যারা পথে চল্‌চে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮শে অক্টোবর ১৯৩০।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত]

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

শতাব্দ ফিরিয়া যায় ভারতের ভাগ্যে কর হানি'
শতাব্দের পরে
পলে পলে বাড়ি ওঠে লক্ষ লক্ষ জীবনের গ্লানি
অবসাদ-ভরে।
জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে চাহি কা'র অনুগ্রহ-পানে
শত ব্যগ্র-আশা
আপন নিষ্ফল রোষে গর্জ্জি ওঠে তীব্র-অপমানে
অন্তরের ভাষা।

নীরবে মূর্চ্ছিয়া পড়ে বক্ষতলে ক্ষুধাক্লিষ্ট প্রাণ
নিত্য-উপবাসে
বহ্নির দহন-জ্বালা—পিপাসায় কোটি-কণ্ঠ-গান
রুদ্ধ হ'য়ে আসে।
কোনরূপে অন্তরালে রাখে ঢাকি গোপন-লজ্জা
জীর্ণ বস্ত্রখানি
ব্যাধির তাণ্ডব-নৃত্যে মৃত্যু-দূত নিয়ত জানায়
আপনার বাণী!

যেথায় জনম লভি হৃদয়ের প্রথম স্পন্দনে
হর্ষ ওঠে জাগি
বিপুল আকাঙ্ক্ষা সদা-উচ্ছ্বসিত হয় ক্ষণে ক্ষণে
যার স্নেহ লাগি,
যুগে যুগে পুণ্য পাপে যেথায় পবিত্র হ'ল দেহ
অমৃতের স্নানে
শাশ্বত আনন্দ লভি যেথা মুক্ত শান্তিভরা গেহ
অন্ত নাহি জানে—

আজি সেথা মানবের হিংস্র ক্রূর লুব্ধদৃষ্টি-তলে
জাগে হাহাকার
শীর্ণ শুষ্ক গণ্ড বাহি ঝরি ঝরি নামে অশ্রুজলে

শতদিকে শত-পাকে বাঁধে আজি কঠিন নিগড়ে
স্বাধীন-আত্মায়—
সঞ্চিত বৈভবরাশি হরি' লয়ে যায় দুই করে
তস্করের প্রায়!

দুর্দ্দিনের ঝঞ্ঝা-রণে ভারতের দ্বার হ'তে দ্বারে
যাদের আহ্বান
অপূর্ব্ব বারতা বহি চকিত করিল বারে বারে
মানস-পরাণ
তুমি তাহাদেরি মাঝে ল'য়ে এক চিরন্তন-বাণী
এলে ধীরে ধীরে
পরিপূর্ণ-রূপে তাহা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কিছু নাহি মানি
শুনালে জাতিরে!

সহস্র-বঞ্চনা যারা সহিয়াছে বর্ষ বর্ষ ধরি
নত করি আঁখ
ঘৃণ্যতম অত্যাচারে তিলে তিলে উঠেছে শিহরি
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্—
তোমার ইঙ্গিত লভি আজি তা'রা উঠিয়াছে জাগি
শোণিত-কল্লোলে—
ধমনী তরঙ্গি' ওঠে রন্ধ্রে রন্ধ্রে তপ্ত জ্বালা মাখি'
উচ্ছ্বসিত রোলে!

তোমার পতাকাতলে আজি সবে মিলি দলে দলে
এক মন্ত্র নিল,—
মানুষ রবে না আজি মানুষের দাস কোনো ছলে!
সবে উচ্চারিল।
যেই সত্য অধিকার হে ভারত! হারায়েছ কবে
মুহূর্ত্তের ভুলে
তাহারে ফিরায়ে আনি সন্তানেরা পুন তোমা লাগ

বাধা নাহি আনে শ্রান্তি, লাঞ্ছনায় নাহি ক্লেশ কা'র
অচল নির্ভয়
মৃত্যুর মূরতি হেরি গাহি ওঠে শুধু শেষবার
জীবনের জয়!
প্রচণ্ড পীড়নে নাহি মুছি যায় সহিবার সীমা
নিমেষের তরে—
প্রপীড়নে নাহি লেপে ললাটেতে কলঙ্ক-কালিমা
আপনার করে।

হে ঋষি! নির্দ্দেশ তব নিল বহি আপনার শিরে
সবে হাস্যমুখে
কুটিল ভ্রূকুটি-পানে আজি কেহ চাহিল না ফিরে
বরি' লয়ে দুখে!
রক্তের নিবিড় রঙে রাঙা হ'য়ে দীর্ঘ চলা পথ
ওঠে বারে বারে
তারি মাঝে পাদদল ছুটায়ে চলেছে যাত্রা-রথ
লক্ষ্যের দুয়ারে!

উন্মত্ত হইয়া ওঠে অন্তরের বঞ্চিত দেবতা
রুদ্র-তেজে জ্বলি
প্রবলের আস্ফালন—অন্যায়ের স্পর্দ্ধিত-ক্ষমতা
চাহে যেতে দলি।
তবুও নীরবে তা'রা সহিয়াছে সব নির্য্যাতন
আদেশে তোমার
অহিংসারে একমাত্র পন্থা বলি করেছে গ্রহণ
সত্য-সাধনার!

পশ্চাতে রয়েছে যারা দ্বিধা-ভরে—এই আজিকার
মুক্তি-মহোৎসবে
আপনারে ত্রস্ত করি কোণে কোণে রুদ্ধ করি দ্বার
লুকায়ে নীরবে—
তোমার প্রেরণা-বলে তারা আজি বাহিরায় ছুটে
টুটি সব ভার—
প্রসন্ন-মুখের পরে গরিমার দীপ্তি ফুটি ওঠে
সুন্দর উদার!

যে-স্বপ্ন হেরিলে তুমি জীবনের প্রতি প্রচেষ্টায়
হোক্ তা' সফল
প্রতি কর্ম্ম আজি তব সকলের যেন মুছি যায়
নয়নের জল।

হে ত্যাগী! যাদের ব্যথা নিলে তুমি আপনার করি
মরমের মাঝে
তাদের আনন্দ-গান নব সুরে উঠুক্ মুখরি
দিবসের কাজে!

হে মহান্! বিধাতার স্নিগ্ধ মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ সম
তুমি এলে হেথা
ঘনায়ে আসিছে তব বিজয়ের সে-লগ্ন পরম
হে পবিত্র-চেতা!
তোমারে অবজ্ঞা করি যারা আজি বিদ্রূপের শর
হানে বারে বারে—
তোমার জয়ের গানে তাহারাই হবে জর জর
আপন ধিক্কারে!

সকল কলহ ভ্রান্তি—ভারতের সব পরমাদ
ঘুচি যাক্ ধীরে
ধ্বনিয়া উঠুক্ পুন পল্লীপ্রান্তে শুভ শঙ্খ-নাদ
সন্ধ্যার মন্দিরে।
নির্ঝরের চলা-ছন্দে অশুহারা আনন্দের রেশ
হোক্ লক্ষ ধারা
তটিনীর কল-হর্ষে চাহিয়া রহুক্ নির্নিমেষ
আকাশের তারা!

তুষার-গিরির শৃঙ্গে প্রান্তরের উন্মুক্ত-ছায়ায়
বিকশিত বনে
পুষ্পের রক্তিম-গণ্ডে কণ্টকিত দাক্ষিণের বায়ে
বসন্ত-গুঞ্জনে
ঘাটে বাটে গৃহে গৃহে জীবনের বিচিত্র-মমতা
যেথা রহে ভরি
প্রতি আয়োজন হ'তে দাসত্বের ঘৃণ্য মলিনতা
যাক্ লাজে মরি!

জানি তব একদিন নিভে যাবে ক্ষীণ আয়ু-শিখা
কালের করালে
আপনারে বলি দিয়া পরাইল যারা জয়-টীকা
ভারতের ভালে
যাবে কোন্ আলো পারে সেই দীপ্ত সজীবের সনে
চলি পুণ্যক্ষণে
রবে যারা—যুগে যুগে তোমারে পূজিবে মনে মনে
নিভৃতে গোপনে!

হার-জিত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

শেখরের সহিত তাহার স্ত্রী অরুণার কলহ বাধিয়াছে। শাস্ত্রকাররা বলেন দম্পতিদের মধ্যে এ জাতীয় ঘটনা না-কি বিপজ্জনক নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন একটু চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে, কারণ অরুণা কথায় কথায় বলিয়া বসিল—"আমি চললাম বাপের বাড়ি—আজই।"

শেখর নিশ্চয় একটু ভয় পাইল, কথাটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্ত একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল, বলিল—"বেশ, তাই চল।"

কিন্তু ফল হইল উল্টা। স্ত্রী রসিকতার জবাব না দিয়া আরও গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর মণ্টু, ডলি কেউ সঙ্গে যাবে না। ভোগো,—কেন আমিই বা সর্ব্বত্র টাঙিয়ে নিয়ে বেড়াব কেন?"

শেখর বলিল—"না, ওদের মাসী তো আসচেই, ভালও বাসে। কথাটা আমার মনেই ছিল না। তা'হলে তোমার সঙ্গে যাবার আমারও আর তাড়াতাড়ি নেই।"

অরুণা আজ সকালে ছোট ভগ্নীকে আসিবার জন্ত তাহার শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিল। স্বামীর দিকে কড়া চোখে চাহিয়া বলিল—"আমি নেই অথচ সে এসে থাকবে? বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেল না-কি?"

শেখর ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিল—"আমি তো মনে করি তুমি থাকবে না বলেই তার থাকাটা আরও দরকার। একজন প্রতিভূ দিয়ে না গেলে আমারই বা—"

অরুণা আর শেষ করিতে দিল না, সংক্ষেপে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিল—"স্ত্রী আর দাসী নেই।"

শেখর বলিল—"না, আমি অভিভাবকের কথাই বলছিলাম। স্বামী এখনও নৌকাড়ুবি হ'য়ে আছে কি না, তার অষ্টপ্রহর একটি কর্ণধার না থাকলে—"

দেখা যাবে। এখন রসিকতা থাক্। আমি চললাম আজ। সেখানে ডাকতে গিয়ে যেন বেহায়াপনা না করা হয়। ঝি!"

"তার সূত্রপাত তো তুমিই ক'রচ। একে তো সেখানে যাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, ঝগড়ার সন্দেহ করবেই সব। তবু যেন গেলেই। তারপর তা'রা যদি দুদিন থাকবার জন্তে জিদ করে—তখন তোমার আমার ওপর টান ধরবে…চোখ রাঙালেই তো হয় না, সত্যি কথাই বলচি। আমার এই আকর্ষণের ক্ষমতাটাতে গৌরব আছে বটে, কিন্তু—"

অরুণা আরও জোরে ডাকিল, "ঝি! কানের মাথা খেয়েচিস্?"

ঝি আসিতেই ছিল। একটু পা চালাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা বলিল—"শোফারকে ডেকে দে নীচে, আর দেখ ডলি আর মণ্টুকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে রাখ, ওদের মামার বাড়ি যাবে।"

ঝি চলিয়া গেলে শেখর বলিল—"এই না অন্তরকম হুকুম হয়েছিল?"

"খুশী—এতে টিপ্পনীর কোনো দরকার নেই। যদি ভাল না লেগে থাকে—"

"না, মতটা যে কথায় কথায় বদলায় সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।"

"বদলাবার উদ্দেশ্য থাকলে বদলায়। যে-ছুটোর জন্তে টান তা'রা সঙ্গেই থাকবে—ব্যস্, নির্ঝঞ্ঝাট। আর কারুর জন্তে আমি ভাবি না, একটুও না। এইবারে ভুল ধারণাগুলো বেশ ভাল করে ভেঙে দিতে চাই। এই চাবির থোলো—সব জায়গার চাবি এতেই আছে। আর আমায় জ্বালাতন করবার কোনই দরকার নেই।"

টেবিলের ওপর চাবির গুচ্ছটা ঝনাৎ করিয়া আছাড়

শোফার নীচে দাঁড়াইয়া আছে। শেখর বিনীতভাবে বলিল—"কি বলব?"

"আমি বলতে জানি, উপকারে দরকার নেই।"

বারান্দায় গিয়া শোফারকে বলিল—"পাঁচটার সময় গাড়ী তোয়ের থাকবে, চন্দননগর যাব। দরোয়ানকেও তোয়ের থাকতে বল। আর সে চট্ করে বাগবাজারে সরীর বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসুক—বিশেষ কাজ থাকায় আমি চন্দননগর যাচ্ছি। আবার না এসে পড়ে, বরং দরোয়ানকে পাঠিয়ে দাও একটা চিঠি নিয়ে যাক্।"

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল শেখর চাবির গুচ্ছটা হাতে লুফিতে লুফিতে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল—"কি?"

শেখর সহজভাবে বলিল—"কই কিছু না তো।"

দ্বিগুণ সন্দেহে অরুণা বলিল—"নিশ্চয় কিছু, বলতে হবে।"

"আজ আমি হুকুমের বাইরে এসে পড়েচি, না?"

অরুণা রাগের উপর আবার অভিমান করিয়া বলিল—"ও, হ্যাঁ থাক।"

"তবুও দয়া ক'রে বলতে পারি।"

"কিছু দরকার নেই···উঃ, দয়া!"

"শুনলে যাওয়ার সখটা আর থাকতো না। অনেক হাঙ্গামা পোহান থেকে বাঁচা যেত—উভয় পক্ষেরই।"

অরুণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল। বোধ হয় এখানে 'হাঙ্গামা পোহান'র অর্থ কি হইতে পারে নিজের আন্দাজমত স্থির করিয়া লইল। তাহার পর বলিল—"থাক্ হাঙ্গামার ভয় আমি করি না—যার ভয় আছে সে সাবধান হোক্।"

"তা'হলে দয়া করে শোনই না হয়। আর কিছু নয়, কথাটা হচ্চে—"

"না, না, আমি দয়া করতে চাই না কাউকে। আমার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? আমি কি একটা মানুষের মধ্যে? তা'হলে কি আমার কথায় কথায় এত হেনস্থা হয়? দয়ামায়া যে-মানুষ জীবনে পেয়েচে কখন, সেই জানে দয়ামায়া কি। আমি কি কারুর কাছে কখন—"

অরুণা চক্ষে দিবার জন্য হাতে আঁচলের একটা কোণ তুলিয়া লইল। শেখর উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল, কারণ এ সব স্থলে কান্না নামিলে অনেকটা আশা, কিন্তু সে শান্তিজল বর্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দরোয়ান আসিয়া বাহিরে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা বলিল—"দাঁড়া, চিঠি দি।"

পাশের ঘর হইতে চিঠি লিখিয়া আনিয়া দরোয়ানের হাতে দিয়া তাহাকে দু-একটা উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

শেখর বলিল—"তা'হলে পাকা হ'য়ে গেল?"

অরুণা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল—"আমার সব কাজই পাকা।"

"কিন্তু চাণক্য বলেচেন—'দাম্পত্যকলহে চৈব' খুব পাকাপাকি হলেও নাকি—"

অরুণা সেইভাবেই বলিল—"চাণক্য ঠিকই বলেচেন—পুরুষেরা পায়ে পড়ে মিটিয়ে নেয়।" বোধ হয় কোনো বিশেষ দিনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বামীর পানে কটাক্ষ করিয়া বলিল—"কখন কখন পায়ে ধরেও।"

"কে পায়ে এসে পড়ে এইবার তার বড় রকম সাক্ষী রাখব—কথাটা মনে থাকে যেন।"

নীচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানায় টেবিলের দেরাজ হইতে টাইম-টেবলটা বাহির করিয়া একবার দেখিয়া লইল।

তিনটা-চল্লিশ হইয়া গিয়াছে। চারটা পাঁচ-এ একটা গাড়ী, সেটা পাইবার কোনো আশা নাই। তাহার পরের গাড়ীটা পাঁচটা-পনেরয়। অরুণার মোটর যদি পাঁচটার সময়ই ছাড়ে তো তাহার প্ল্যানটা আর খাটে না।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর টেবিলের উপর একটা নিষ্পত্তিসূচক আঘাত দিয়া অস্ফুটভাবে বলিল—"হয়েচে!"

উপরে গিয়া শোফারকে নীচের উঠানে ডাকিয়া পাঠাইল। অরুণাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল—"যেতে আসতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। গাড়ীটা ঠিক আছে তো?"

অরুণা আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইল।

মোটর জিনিষটা একেবারে ঠিক কখন থাকে না। শোফার একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"চলে যাবে হুজুর।"

অরুণা—"তাহলে—" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। শেখর তাহার কথা চাপা দিয়া বলিল—"চলে যাওয়াযায়ী নয়। খালি মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছ। এরা সব জিদ্ করচে বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে যেতে পারচি না। এখুনি বিশেষ কাজে বেরুতে হবে—বেশ করে ভেবে দেখ। কিছু হ'লে বাড়িতে যদি টেলিগ্রামও কর তো ঘণ্টা-ছয়েকের আগে আমি পাব না।"

এরূপ কথার উপর ছোটখাট খুঁৎ থাকিলেও প্রকাণ্ড হইয়া পড়ে; শোফার বলিল—"ব্রেকটা একটা চাকায় যেন একটু আলগা ধরচে, তাতে তো বিশেষ ক্ষতি নেই—আর খুলতে গেলেও ঘণ্টাদুয়েকের কমে হবে না।"

"পৌনে চারটে হয়েছে—পৌনে ছ'টা—ধর ছ'টাই," হিসাবটুকু সারিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"এক ঘণ্টা দেরি হ'লে মশায়ের রাগ পড়ে যাবার ভয় আছে কি? আমি তো ব্রেকটাকে বিশেষ ছোট বলে মনে করি না। সেদিন বউবাজারের মোড়ে যা কাণ্ড দেখলাম মনে হ'লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—একগাড়ী মেয়েছেলে-ঠাসা, হঠাৎ—।"

অরুণা ভয় চাপিবার চেষ্টা করিয়া সিধা শোফারকেই বলিল—"না, না, তুমি একবার খুলে ঠিকঠাক করে নাও—হোক গিয়ে একটু দেরি।"

শেখর অধর দংশন করিয়া অনেক কষ্টে হাস্যসংবরণ করিল। অরুণা অস্বস্তির সহিত প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাওয়া হবে বাবুর"—উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কখন আসা হবে?"

"দেখি কখন ছাড়ে, সেখানে তো জোর নেই নিজের।"

"কোন্‌খানে?"

"কোনখানেই নয়। যার নিজের স্ত্রীর ওপরেই জোর রইল না।"

ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া অরুণা উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"স্ত্রীর ওপর জোর না করতে পারলে বাবুরা সব হাপিয়ে ওঠেন। ইস্—জোর! জোরটা কিসের শুনি?"

"খোসামোদের।"

অরুণা হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগের সময় হাসিয়া ফেলাটা একটা পরাজয় বলিয়া রাগটা বাড়িয়াই যায়। তাই নিজেকে কষ্টে সংবৃত করিয়া লইয়া বেশীরকম চটাচটি করিবার জন্য বলিল—"যেখানে খুশী যাও, আমার দেখা আবার ছ'মাস পরে।"

শেখর ফিরিয়া বলিল—"ছ'ঘণ্টার মধ্যে সেধে দেখা করবে।"

অরুণা আরও রাগিয়া বলিল—"তাহ'লে ছ'বচ্ছরের ভেতর যদি এ-বাড়ি মাড়াই তো—"

শেখর বলিল—"আর ছ'ঘণ্টা পরে যদি ফিরে না আসতে হয় তো—"

অরুণা রাগে গস্ গস করিতে করিতে দুটা ঘর পার হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল—"দেখা যাবে!"

শেখর আর জবাব দিল না, বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

২

চন্দননগরে গঙ্গার ধারে বাড়িটা, পিছনে গঙ্গা, সামনে রাস্তা, বাড়ির সামনে খানিকটা বাগান।

শেখর আধ ঘণ্টা হইল আসিয়াছে। হাত পা ধুইয়া জিরাইয়া হঠাৎ এই অভ্যুদয় সম্বন্ধে শ্বশুরশাশুড়ীকে একটা মনগড়া কারণ দর্শাইল, খানিকটা একথা-সেকথা লইয়া গল্প করিল, তাহার পর বড় শ্যালিকাকে বলিল—"চল শচীদি, বাগানে একটু পায়চারি করি গিয়ে।"

শ্বশুর বলিলেন—"তার চেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে পার—হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে।"

রাস্তার দিকে থাকাই শেখরের দরকার, বলিল—"হ্যাঁ, তাও মন্দ নয়।"

কথার মধ্যে অনিচ্ছার রেশটি লক্ষ্য করিয়া শ্যালিকা বলিল—"তাহলেও বাগানটা একটু ঘুরে আসি এস; কতকগুলা নতুন গোলাপ বসান হয়েচে। একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স ম্রা আনিয়েচি এ তল্লাটে ওরকম নেই, না বাবা?"

আট নয় বছরের ছোট শালী মলিনা ভগ্নীপতির হাত ধরিয়া টানিতেই সুরু করিয়া দিল, বলিল—"আর আমার করবীর ঝাড়ও দেখবেন চলুন জামাইবাবু—গাছ আলো ক'রে আছে। বলতে হবে কারটা ভাল, হ্যাঁ। ম্যাগ্ গে, কাল আবার গোলাপ! প্রিন্স মানে তো রাজকুমার, আমি সে জানি—তা রাজকুমারই হোক্ আর কোটাল পুত্তুরই হোক্—কাল আবার না-কি ভাল হয়! কি পছন্দ দিদির! ম্যাগ্ গে—"

শচী লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছিল, মা মুখ ফিরাইলেন, পিতা বিশেষ কিছু না বুঝিয়াই সরল প্রাণে হাসিতে লাগিলেন। শেখর কথাটা আর বাড়িতে না দিয়া বলিল, —"চল তোমার করবী দেখি গিয়ে।"

হাসিতে আসিতে আবার মলিনা 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' সম্বন্ধে তর্ক তুলিতে যাইতেছিল, দিদি ধমক দিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই চুপ কর, ভেঁপো মেয়ে!" শেখরকে জিজ্ঞাসা করিল —"এত কাছে রয়েচ, মুখুজ্জে, অথচ মাঝে মাঝে যে এক-আধবার আসবে—"

শেখর, মলিনা যে কথাটি বলিতে যাইতেছিল তাহারই উত্তর দিল—"কি জানো গো মলিনা সুন্দরী, যে যে কে ভালবাসে তার কাছে—"

বড় শ্যালিকা রাগিয়া বলিল—"ঐ বাজে কথাই হ'ল বড় আর আমার প্রশ্নের বুঝি—"

ওর মধ্যেই তোমারও জবাব আছে দিদি, তোমার বোনের ভালবাসার অত্যাচারে আর বেরুবার জো আছে? কি চোখেই যে অধমকে দেখেচেন, দুদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই। অমনি জবাবদিহি কর—তাও যদি মনঃপূত না হ'ল তো কান্নাকাটি রাগ-অভিমান—"

"কই, এমন তো ছিল না। একটু আব্দারে বরাবরই ছিল বটে।"

"আজকাল হয়েছে। বন্ধুরা বলে—'Lucky dog, তোকে দেখে হিংসে হয়'—বলি—'ক্ষ্যামা দেও ভাই; একদণ্ড বাড়ি ছেড়ে বেরুবার জো নেই—এ ভালবাসা, না কোণঠাসা করে মারা?' "

শ্যালিকা ভগ্নীর এইরূপ আদর্শ অনুরাগ সমর্থন করিয়া দুঃখিতভাবে বলিল—"তোমাদের ভাই প্রাণ খুলে দিলে তোমরা সন্তুষ্ট হও না, আর সঙ্গোপনে দিলে তোমরা ত অনুভবই করতে পার না। ভালবাসা দেওয়ার আর উপায়ই বা আছে কি, স্ত্রী-বেচারিরা তো আর ভেবে পায় না।"

শেখর বলিল—"বুঝলাম শচীদি সব আমাদেরই দোষ ইট পাথরের মতন আমরা যে হৃদয়হীন, এ বদনামটা তো চিরদিনই আছে। কিন্তু ধর, এই এখানে এসেছি, কাজটা সারতে চার পাঁচদিন লাগবে। ভেবেচি রোজ যাওয়া-আসা না ক'রে এ-কটা দিন এইখানেই থেকে যাই। হঠাৎ তোমার বিরহিণী ভগ্নী বাড়ি ঘর দোর বন্ধ ক'রে সব নিয়ে এসে হাজির হলেন—ডব ডব করচে চোখ, মুখ ভার, কি রকম আতান্তরে পড়ি বলতো?"

শ্যালিকা হাসিয়া বলিল—"আমাদের তো লাভই ভাই। অনেকদিন দেখিনি তাদের. তোমাদের যদি কানের টানে মাথা আসে তো মন্দ কি?"

শেখর মাঝে মাঝে গোপনে রাস্তার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, বলিল—"তা সত্যিই তিনি যদি এসে হাজির হন তো আমি মোটেই আশ্চর্য্য হব না।"

মলিনা সব না বুঝিলেও দিদির আসিবার সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, প্রশ্ন করিল—"কিসে ক'রে আসবেন, জামাইবাবু, মোটরে?"

শেখর বলিল—"তিনিই জানেন। চাই-কি জ্ঞানশূন্য হয়ে 'হা নাথ—হা নাথ'—করতে করতে ছুটেও আসতে পারেন।"

মলিনা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করিয়া বলিল—"ও বাবা!"

দিদি তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"মর্ পোড়ারমুখী, দিদি কি তোর পাগল হয়েচে না কি?"

শেখর বলিল—"আমি ভাবচি যদি সত্যিই এসে পড়ে তো বাবা মা কি ভাববেন?"

"কি আর ভাববেন—বললেই হবে ওরা মোটরে বেড়াতে বেড়াতে এসেচে, তোমার রেলপথে একটু কাজ ছিল...কিন্তু কোথায় কি তার ঠিক নেই—মিছে মাথা ঘামান।"

"তার আসবার কথা তো তাঁদের বলা হয় নি।"

"ভুলে গিয়েছিলে—চল্ মালী, তোর করবী দেখাবি চল্…"

"আগে তোমার গোলাপ দেখুন—তুলে আনি একটা ?"

দিদি ধম'কাইয়া বলিল—"না !"

শেখর বলিল—"পরের জিনিষে এত লোভ কেন মলিনা ? ছিঃ"

মলিনা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"ওমা, দিদির জিনিষ বুঝি পরের জিনিষ হ'ল ? বুদ্ধি যা হোক্ !"

শেখর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং লজ্জিতা হইয়া পড়িলেও মলিনার দিদি না হাসিয়া পারিল না। বলিল—"কি হচ্ছে ছেলেমানুষের সঙ্গে ?"

শেখর বলিল—"খুব সলা দিলে তো দিদি—ওঁদের বলব—'ভুলে গিয়েছিলাম' ? নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এত ভুল, আর সে-স্ত্রী আবার ওঁদেরই মেয়ে—তার চেয়ে বললেই হয়—"

শচী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল—"দেখ দিকিন পাগলামি ! কে আসচে তার ঠিক নেই, ক্রমাগতই বাজে কথা। আমার বোনটিরই দোষ দিচ্চ, কিন্তু এসেছ পর্য্যন্ত তো দেখ্‌চি তাঁর কাছে মনটি পড়ে আছে ; টান কার বেশী তা তো বুঝতে পারলাম না।" বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া ক্রূরভাবে হাসিল।

কথাটা সত্য। মোটরের ভাবনাটা মনের মধ্যে জাঁকিয়া থাকায় শেখর যে ক্রমাগতই স্ত্রীর প্রসঙ্গ চালাইয়া আসিতেছে সে-বিষয়ে তেমন সতর্ক ছিল না, একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িল।

মলিনা ফুলের তোড়া বাঁধিতেছিল, গম্ভীর মুখে বলিল—"মা বলছিলেন না, দিদি—'আহা দুটিতে মনের বেশ মিল আছে—ভগবানের ইচ্ছেয়' ।"

শেখরের লজ্জার পালা পড়িয়াছে—

স্নেহভরে ভগ্নীর কাঁধে একটি হাত দিয়া দিদি বলিল—"আর বলছিলেন—মলিনারও ঐ রকম একটি মনের মিলের বর হয়—"

"ধ্যাৎ"—বলিয়া মলিনা মাথা নীচু করিল।

শচী বলিল—"চল, এবার গঙ্গার ধারে যাই—বাবা বোধ হয় ঐদিকে গিয়েই বসেচেন।"

মলিনা বলিল—"বাঃ, আর তোমার ব্ল্যাকপ্রিন্স দেখালে না—কি ক'রে বলবেন যে—"

সরলপ্রাণা ভগ্নী আর চতুর ভগ্নীপতি মিলিয়া সখের ফুল দেখাইবার মত তাহার আর অবস্থা রাখে নাই। শচী লজ্জিত ভাবে বলিল—"নাঃ, থাক্ গিয়ে।"

ভগ্নী আব্দার ধরিয়া বলিল—"না-না, দেখাবে চল ; আচ্ছা বাবু, আমি বলচি আমার হিংসে হবে না, ভয় নেই।"

দিদির ব্রীড়াভারাক্রান্ত চোখ দুটা অবাধ্যভাবেই একবার ভগ্নীপতির মুখের উপর পড়িল। চকিতে সে-দুটাকে ভূমিনত করিয়া বলিল—"পোড়ার বাঁদর মেয়ে।"

শেখর হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমার হিংসের ভয় করবেন না, মলিনা, উনি ভয় করচেন বোধ হয় আমাদের হিংসের।"

"না, আমি চললাম। তোমরা দুই রসিকে থাক।" বলিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া শচী আগাইয়া পা বাড়াতেই, উপস্থিতির একটা দীর্ঘ হর্ণ দিয়া গেটের সামনে একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল।

"কে এলো ?" বলিয়া শচী গ্রীবা ঘুরাইয়া দাঁড়াইল। মলিনা "ওমা, মেজদিদি যে !" বলিয়া আগে সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য বাড়ির দিকে ছুটিল। শেখর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"দেখলে তো দিদি ?"

শ্যালিকা রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিল। পরমুহূর্ত্তেই বলিল—"দাঁড়াও ভাই, আগে নামাই গিয়া ওদের" বলিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া গেল।

শেখর দু-একটা গাছের আড়ালে আড়ালে একটু গা ঢাকা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

শচী অরুণার কোল হইতে ডলিকে লইল, মণ্টুর হাত ধরিয়া নামাইল, তাহার পর ভগ্নীকে বলিল—"এস, অগ্রদূত তোমার হাজির।"

বুঝিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া—"সবাই ভাল আছো তো দিদি ?" বলিয়া ভগ্নীর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্ম প্রণত হইল।

এই সময়টিতে শেখর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মণ্টু "বাবা, বাবা! ওমা বাবা গো!" বলিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ডলিও মাসীর কাঁধ বাহিয়া বাপের কোলে যাইবার জন্ম ব্যগ্রভাবে দুটা কচি হাত বাড়াইয়া দিল।

অরুণা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বামী-স্ত্রীতে চোখোচোখি হইল।

৩

দুজনে দাঁড়াইয়া রহিল যেন বায়স্কোপের দুখানি ছবি,—মুখে রা নেই, উগ্র বিস্ময়ের ভাব মুখ এবং সমস্ত শরীর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিশেষ করিয়া শেখরের বিস্ময়টা চেষ্টাপ্রসূত বলিয়া আর্ট যেন তাহার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। লোকটির থিয়েটারে নাম আছে,—এই অরুণাই কত প্রশংসা করিয়াছে।

শেখরই প্রথমে কথা কহিল, প্রশ্ন করিল—"তুমি হঠাৎ!"

অরুণা বেচারীর মুখে কোনো কথাই জোগাইতেছিল না। অসহায়ভাবে বলিল—"হঠাৎ কি ?"

শেখর একবার বক্র ইঙ্গিতে শ্যালিকার পানে চাহিল। তাহার পর স্ত্রীর পানে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"না, ঠিক হঠাৎ না বটে। কিন্তু তোমায় অত ক'রে বারণ করে এলাম—"

স্ত্রী বিমূঢ়ভাবে বলিল—"কি বারণ ক'রলে ?"

মলিনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শেখর এবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—'এই দেখ মলিনা, একেই বলে জ্ঞানশূন্ত হওয়া—তোমায় এক্ষুনি বলছিলাম না—অর্থাৎ আমার আসবার কথায় তোমার দিদির মনটা এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, এক ঘণ্টা ধ'রে যে অত ওকে বোঝালাম সে-সব কথা একেবারেই মনে নেই।"

মলিনা আশ্চর্য্যে হাঁ করিয়া বলিল—"ও বাবা!—হ্যা দিদি ?"

অরুণা শচীর দিকে চাহিয়া বলিল—"কি ব্যাপার বল দিকিন দিদি ?"

শচী স্পষ্ট কিছু না বুঝিলেও কিছু একটা কৌতুকের আভাস পাইয়া বলিল—"ব্যাপার তোমরাই জান ভাই, এখন চল, বাবা মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পরে বোঝাপড়া হবে'খন।"

অরুণার চলিবার অবস্থাই ছিল না, কাৎরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি এখানে হঠাৎ যে ?"

স্বামী অবিচলিতভাবে বলিল—"এটা আমার শ্বশুর-বাড়ী"—যেন ভূতগ্রস্তের সঙ্গে কথা বলিতেছে, মেলা কথা বলিবার দরকারই নাই।

দুজনে মুখোমুখি হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। শেখরই মৌন ভঙ্গ করিল—"যাক্ যখন এসে পড়েছ, উপায় নেই। মেলা লজ্জা পেয়েই বা আর কি হবে,—দিদিকে অনেকটা ব'লে রেখেছি তোমার রোগের কথা—"

অরুণা সোৎসুক নেত্রে তাহার দিদিকে প্রশ্ন করিল—"কি রোগের কথা দিদি ?"

শেখর আবার কহিল—"তোমার গিয়ে, আসবার সময় চাবি কার কাছে···"

অরুণা গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল-"চাবি ?—চাবি তো তোমার হাতেই দিলাম তখন।"

শেখর ঈষৎ হাসিয়া মলিনার দিকে চাহিয়া কহিল—"দেখচ তো মলিনা ? স্বামীকে না দেখতে পেলে এই রকমই হয়। অবশ্য তোমাদের বোনের মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে দেখচি।"

স্ত্রীকে বলিল—"তুমি আসবার সময় আমার হাতটাই যে সেখানে ছিল না। অবশ্য মনটা কিছু কিছু ছিল, কিন্তু—"

অরুণা দিদির দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে কহিল-"কি রোগের কথা বলেচে, বল না দিদি ? আমি বাপু লোকের সঙ্গে আর পেরে উঠি না।"

দিদি তাহার হাতটা ধরিয়া হাসিয়া বলিল—"বলচি আগে চল্—ওদিকে বাবা মা এগিয়ে আসচেন, কি ভাবচেন জানি না—"

চলিতে চলিতে বলিল—"রোগ আবার কি ?—বাবুদের ওটুকু না হলেও দিশেহারা হন, অথচ ঠাট্টাও করা চাই। তুই একলাটি থাক্‌তে না পেরে চলে আসবি, সেই কথা আমায় বলা হচ্ছিল। তা এতে আর দোষ কি হয়েচে ? আর তা' ভিন্ন এসে ভালই করেছিস ভাই, আমায় একলা পেয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে—"

অরুণা গালে চারটি আঙুল চাপিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, স্বামীর দিকে সরোষ নেত্রে চাহিল, তাহার পর দিদির পানে ফিরিয়া বলিল—"ও হরি !—বুঝেচি। এতক্ষণ পরে সব কথা বুঝতে পেরেচি···কি মতলববাজ লোক ভাই !···এই জন্যেই বুঝি তখন বললে ছ'ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে ?"

শেখর শ্যালিকাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল—"কি করব শচীদি ?—যেরকম কাৎরানি, চোখের জল। কাজেই ব'লে আসতে হয়েছিল—আজ রাত্রেই ফিরে আসব—ছ'ঘণ্টার বেশী দেরি হবে না—একেবারেই কাছছাড়া হতে দেবে না—"

একটা কুটিল জবাব ঠোঁটে আসিল এবং কোনো সঙ্গত উত্তর দিতে না পারায় রাগের মাথায় অরুণা সেইটাই দিয়া বসিল,—বলিল "হ্যাঁ, ঠিকই তো,—একদণ্ড তোমাদের বিশ্বাস ক'রে ছাড়া চলে না, তোমরা এমনই—"

শেখর দুঃখের অভিনয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"ছিঃ, অরুণা, এটা একহিসেবে যে শচীদিদিকেও বলা হ'ল—কি মনে ক'রবেন উনি, বল দিকিন ?"

বিদ্রূপটা বুঝিতে না পারিয়া অরুণা বিস্ময়ে এবং ভয়ে চক্ষু বড় করিয়া কহিল—"ওমা, দিদিকে আবার কি বললাম ? দেখ দিকিন্ !"

দিদি বুঝিয়াছিল, ওদিকে বাবা মা কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আস্তে আস্তে বলিল—"তোরা একটু চুপ কর্ বাপু, মুখুজ্জের মুখের কোন আড় আছে যে ওর সঙ্গে তর্ক করচিস্ অরু ?"

মণ্টু গিয়া দিদিমার কোল দখল করিয়াছিল। অরুণার পিতা লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছিলেন, একটু দূর হইতেই বলিলেন—"বাঃ অরুণাও এসেছ ! —বেশ হ'য়েচে। কিন্তু কই, শেখর তো আমায় কিছু বল নি ?"

শচীই উত্তর দিল—"অরুর আসবার কোনো ঠিক ছিল না, বাবা, তাই বলেন নি। ওর এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিল—তাকে বিদায় ক'রে সময় থাকলে অরু মোটরে আসবে এই রকম কথা ছিল।"

এর পরে যে প্রশ্ন হইবে তাহার উত্তর শেখর পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখিল—"আমিও সঙ্গেই আসতাম। বিকেলে বস্তিবাটীতে একটু কাজ ছিল তাই আগেই বেরিয়ে পড়ি।"

তাহার জন্যই এই-সব মিথ্যার সৃষ্টি—বিশেষ করিয়া দিদির তরফ হইতে। অরুণা লজ্জায় যেন পা উঠাইতে পারিতেছিল না। স্বামীটি পূর্ব্বে আসিয়া আরও কি সব গাহিয়া রাখিয়াছে সে কথা ভাবিয়া সে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দিদির তো একরকম ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে স্বামীর টানেই পিত্রালয়ে আসিয়াছে—ছি-ছি !—সাংঘাতিক লোক—সব পারে !

কথাবার্ত্তার মধ্যে স্বামীর দিকে কখন মিনতির নরম চোখে চাহিয়া, কখন রাগের কড়া চোখ দেখাইয়া খুব সন্তর্পণে চালাইয়া গেল। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেও একটু-আধটু বেহায়াপনার ইঙ্গিত করিয়া দেওয়া ওর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। মনে মনে বলিল—"ঘাট হয়েচে বাপু, আর তোমার সঙ্গে লাগব না।"

জিরাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সকলে গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল। পিতা কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিলেন—জোলো হাওয়া তাঁহার লাগান মানা। মাতাও একটু পরে উঠিলেন। শেখর হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এইবার মুখ খুলিবার একটু সুযোগ পাইল।

কহিল—"আমাদের হিন্দুললনাদের সুখ্যাতি এতদিন ধরে যে কীর্ত্তিত হ'য়ে এসেচে—"

অরুণা একবার মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা, হ'য়ে আসুক্ গে, তুমি থাম।"

"না, তোমার আজকের এই পাতিব্রত্যের নিদর্শনটুকু দেখেও যদি সেটুকুর কদর না করি তো ঘোর অকৃতজ্ঞতা—"

অরুণা উত্যক্ত হইয়া বলিল—"ওগো আমি হার মানলাম, আমার ঘাট হয়েচে, আর দিদির সামনে বেহায়াপনা ক'রো না, তোমার পায়ে ধরি···"

শেখর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল ; আস্তে আস্তে—যেন নিজের মনেই বলিল—"পায়ে ধরাটা শুনেচি নাকি আমাদেরই একচেটে হয়ে গেছে।"

আজ বিকালেরই কথা।

অরুণা একটু আড়ে না চাহিয়া পারিল না। কথা-গুলো চাপা দেওয়ার জন্য বলিল—"আর তোমাদের অন্য কথা নেই, দিদি ?"

শচী বলিল—"মুখুজ্জে আজ আমাদের অতিথি। শুধু তোর চর্চ্চা করতেই যদি আজ পছন্দ হয়ে থাকে তো কি ব'লে নিরাশ করি বল ?"

অরুণা বলিল—"কেন, আমি তো এইটুকু এসেই—কথা কইবার অনেক পেয়েচি। এই জায়গাটার কথাই ধরা যাক্ না—কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না—খোলা গঙ্গার তীর—কি সুন্দর হাওয়া—আমার তো এই জায়গাটুকুর জন্যে—"

শেখর তাড়াতাড়ি বলিল—"তা ব'লে তুমি যেন আমাদের দুজনকে রেখে টপ্ ক'রে উঠে যেও না শচীদি। অরুণা সে ভেবে ব'লচে না নিশ্চয়···"

হাসিতে লাগিল। শচীও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অরুণা হঠাৎ থমকিয়া চাহিয়া দুজনের দিকে চাহিল, তাহার পর স্বামীর গূঢ় বিদ্রূপ বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় ও রাগে বলিয়া উঠিল—"না বাপু, আমি চললাম। কোন-খানে গিয়ে একটু সোয়াস্তি নেই। কে জান্‌তো বল, এখানেও আগে থাকতে এসে বসে আছে ?".

শেখর শ্যালিকার দিকে চাহিয়া বলিল—"ঐ কথাটি বোঝাবার জন্যে অরুণা কি রকম ব্যস্ত দেখ্‌চ শচীদি ? আমি তখনই ওকে বলেছিলাম—'যেও না, বড্ড লজ্জায় পড়ে যাবে।' কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বলে—সে আমি সামলে নোব'খন, কেউ বুঝতে পারবে না।"

অরুণা জ্বালাতন হইয়া বলিল—"বাবা, বাবা, তোমার কি লজ্জাসরম কিছু নেই গা ?"

শেখর কহিল—"খুব আছে। তবে কি-না আসল কথাটা যদি না ব'লে দি তো শচীদির মনে হতে পারে এদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। মিছিমিছি ভাবতে পারেন মুখুজ্জে বোধ হয় ঝগড়াঝাঁটি ক'রে চলে এসেছে, তাই বোনটি পিছনে পিছনে ছুটে এসেছে।"

অরুণা ভিতরে ভিতরে যেন জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার হার তো হইয়াছেই, যদি স্বীকার করিলে স্বামী অব্যাহতি দেয় তো সে রাজি। কিন্তু তাহার সুবিধা কই ? আর ইতিমধ্যে অসহায়ভাবে সে কত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিবে ?

স্বামীর কথায় দম্ভ করিয়া বলিল—"ইস্, ছুটে আসবে !" সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দিদির দৃষ্টি এড়াইয়া একবার সকরুণ মিনতির নেত্রে চাহিল।

স্বামী নিষ্ঠুর বিজেতারই মত হাস্যকুটিল দৃষ্টি দিয়া তাহার মৌন উত্তর দিল। এই সময় পরাজয়-স্বীকারের একটু সুবিধা হইল।

মলিনা, ডলি আর মণ্টুকে লইয়া অদূরে ছুটাছুটি খেলা করিতেছিল, ডলি কোল থেকে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। শচী মলিনাকে ধমক দিয়া ডলিকে তুলিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া গেল।

অরুণা একবার চকিতে দেখিয়া লইল আঘাত কিছু লাগে নাই। স্বামীর হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া বলিল—"আমি হার মান্‌চি গো, দয়ামায়া কি নেই একেবারে ?"

স্বরটা ভারী হইয়া উঠিল।

হাতটা ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া গেল। অনুযোগের সুরে বলিল—"কি রকম বেহায়াপনা করচ বল দিকিন্ তখন থেকে ?"

শেখর বলিল—"ফিরে যেতে রাজি তো ?"

"কখন ?"

শেখর হাসিয়া বলিল—"ছ'ঘণ্টা পরে !"

অরুণা অভিমান করিয়া বলিল—"এক্ষুনি চল না তার চেয়ে। বাবা মা'র সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তাও হয় নি, আমার আবার বাপের বাড়ি আসা !"

"বেশ, কখন্ যাবে তুমিই বল না হয়। কাল সন্ধ্যেয় ?"

"পরশু। অনেকদিন আসিনি।"

"এই কি হারের লক্ষণ ?"

অরুণা চোখের কোণে চাহিয়া বলিল—"ইস্, এক-জনের কাছে আমার হার আছে না কি ?"

শেখর একটু হাসিল, বলিল—"বেশ, তাই হবে; পরশুই রইল।"

মলিনা, মণ্টু, ডলিকে লইয়া শচী রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। গঙ্গার নৌকা ষ্টিমার দেখাইয়া ডলিকে ভুলাইতেছিল, এদিকে দম্পতিকে একটু সুবিধা করিয়া দেওয়াই বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া শেখর বলিল—"বড় চমৎকার জ্যোৎস্নাটি।"

স্ত্রী ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—"নাঃ, সে সব হবে না—দিদি এক্ষুনি যদি ফিরে চান ?"

শেখর পত্নীর কাছে একটু সরিয়া গিয়া তাহার কাঁধ স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"দিদি অত বড় বোকা নয়—এটা বেশ জেনো।"

বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

আমার এক বন্ধুর মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম যে, বহুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত দেশনেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু একবার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন,

—Are you one of those Bengalis who think that Bengal is first, Bengal is second, and Bengal is third ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমথবাবু নাকি বেশ একটু গর্ব্বের সহিতই জবাব দিয়াছিলেন,

—হাঁ, আমি ঐ জাতীয় বাঙালীই বটে।

আমি যে ভাবে দিলাম আসল কথোপকথন ঠিক সেই ভাবেই হইয়াছিল কি-না, সে অনুসন্ধান এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিমত হিসাবে এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করা আমার অভিপ্রেত নয়। এখানে প্রমথবাবু সমগ্র বাঙালী জাতির মুখপাত্র। বাঙালীদের সুমহান গৌরবে অনাস্থাশীল যে-কোন ভারতীয়ের প্রশ্নের উত্তরে যে-কোন বাঙালীমন্য ব্যক্তিও ঠিক এই একই উত্তর দিত, মাদ্রাজী বা মেড়ুয়াবাদীর নিকট তর্কে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের প্রাদেশিক স্বাজাত্যের অভিমানকে ক্ষুণ্ণ করিবার কল্পনা স্বপ্নেও তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইত না।

ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিবার মত। বাঙালী জাতি রূপে-গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, শৌর্য্য-বীর্য্যে ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি-না, সে-সম্বন্ধে বাহিরের লোকে তর্ক তুলিতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয় টলিবে কেন ? আমরা যে বড়, আমরা যে অগ্রণী, সে-কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি এবং সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেও বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করি না। সতর বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালী জাতিকে একটি আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই উক্তিটি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ বড়াই প্রবণতার আব্রু রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নহিলে নিজেদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ, কীর্ত্তি সম্বন্ধে অযথা বিনয়ের পরিচয় বাঙালীর লেখা বা বক্তৃতায় অন্ততঃ কোথাও পাইয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। শাস্ত্রী-মহাশয় পরের বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে বলিয়াছিলেন, হস্তিচিকিৎসাই আমাদের প্রথম গৌরব। এ-বিষয়ে অবশ্য আমরা বিশেষ কিছুই জানিতাম না। হয়ত বড় বেশী একটা গর্ব্বও অনুভব করি নাই। কিন্তু আমাদের গৌরবময় অতীতের এই অতি স্থূল কীর্ত্তিটির কথা ছাড়িয়া

দিলে অন্ত যে-কোন বিষয়ে পাওনা বা উপরি সম্বন্ধে আমরা নিতান্তই বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি এ-কথা বলিলে কি একেবারেই একটা মিথ্যা কথা বলা হইবে না ?*

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিব। বাংলা দেশের শিক্ষিত সাধারণের নিকট সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা" শীর্ষক কবিতাটি সুপরিচিত। বোধ হয় তাঁহাদের সকলেই এই কবিতাটি পড়িয়াছেন ও পড়িয়া পুলকিত হইয়াছেন। এই কবিতাটি শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিভাষণের বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত। উহাতে আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান কীর্ত্তির যে ফিরিস্তি আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ।

প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

> সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
> আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

এই বাঞ্ছিত ভূমিতে বাস করিয়া আমরা কি করিতেছি এবং করিয়াছি ? না,—(১) বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি ; (২) নাগের মাথায় নাচিয়াছি ; (৩) দশানন-জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি ; (৪) আমাদের ছেলে বিজয়সিংহকে দিয়া লঙ্কা জয় করাইয়াছি ; (৫) একহাতে মগকে ও অপর হাতে মোগলকে রুখিয়াছি ; (৬) আমাদের কপিলকে দিয়া সাংখ্যদর্শন লিখাইয়াছি ; (৭) আমাদের স্থপতিদের দিয়া বরোবুদোর নির্ম্মাণ করাইয়াছি ; (৮) শ্যামরাজ্যেতে ওঙ্কারধাম স্থাপন করাইয়াছি ; (৯) আমাদেরই কোন সুপটু পটুয়াকে দিয়া অজন্তায় আমাদেরই পট আঁকাইয়াছি ; (১০) মন্বন্তরে আমরা মরি নাই ; (১১) মারী লইয়া আমরা ঘর করিতেছি ; (১২) দেবতাকে আমরা আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছি ; (১৩) আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়াছি ; (১৪) বেতালের মুখের প্রশ্ন আমরা কাড়িয়া লইয়াছি—এমনি করিয়া ছত্রিশ দফা পর্য্যন্ত। তারপর ভবিষ্য পুরাণ—

> অতীতে যাহার সূচনা হয়েছে সে ঘটনা হবে হবে
> বিধাতার বরে ভুবন ভরিবে বাঙালীর গৌরবে।
> প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে লাগিবে না তার বেশী,
> লাগিবে না তাহে বাহুবল কিম্বা সুদৃঢ় মাংসপেশী।
> মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে,
> মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্ত বেণীর তীরে।"

সে শুভদিন আসুক, আমাদের বড়াইয়ের চোটে এখনও যাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হয় নাই, তাহাদের সকলেই শীঘ্র উদ্বাস্ত হউক, এ-কামনা আমরা সকলেই করি। কিন্তু এই দীর্ঘ তালিকার পর এক আকাশে ফুল ফুটানো ভিন্ন আমাদের কোন কীর্ত্তি যে অনুল্লিখিত থাকিয়া যাইতে পারে, এ-কথা হয়ত সকলের বিশ্বাস হইবে না। সত্যেন্দ্রনাথ তাহাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত কবিতাটিতে যে "বাহুবল ও সুদৃঢ় মাংসপেশীর" মায়া তিনি অতিকষ্টে কাটাইয়া ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহার লোভ আর সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাই দেখিতে পাই, শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিভাষণের তিন বৎসর পরে আবার তিনি লিখিতেছেন,—

> শক-হূণে আতঙ্ক মোদের কিসের তা ভাই বল্,
> রাক্ষসেদের লঙ্কা কেড়ে বানিয়েছি সিংহল।
> গঙ্গার আলে বসত করি আমরা বাঙালী
> যার নামে গ্রীক সৈন্য হঠাৎ সাহস-কাঙালী।
> কাশ্মীরেতে দুঃসাহসী নিশান উড়ালে
> রাজার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে গুঁড়ালে—
> কেশাগ্র কেউ নারল ছুঁতে চক্ষে হুতাশন
> মেঘের মতন আওয়াজ গলার বাঙালী পল্টন।...
> নামজাদা লাল পল্টনে ভাই তোরাই ছিলি শোন
> এম্পায়ারের ভিত গেড়েছে বাঙালী পল্টন।

কথায় আছে কবিরা নিরঙ্কুশ, ইতিহাস আবার একটু গুরুপাক, এবং আত্মশ্লাঘা ভদ্র-ইতর নির্ব্বিশেষে মানব-সন্তান মাত্রেরই সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং সত্যেন্দ্র-নাথের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া

---

* বাঙালীমনের একটি মহৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন, "বাঙালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙালীর একটি গুণ আছে, যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার জন্য সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙালীর আত্ম-বিশ্বাস আছে, বাঙালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙালী বর্ত্তমান বাস্তবজীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য করে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে।" (তরুণের স্বপ্ন, ... সংস্করণ, পৃ১৪)। ১৭ নম্বর ডোগ্‌রা রেজিমেণ্টের একটি ডোগ্‌রা রাজপুতের সহিত আমার পরিচয় ছিল। সে মেসোপটেমিয়ায় ও অন্যত্র বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে, তবুও তাহার মুখে কোনদিন ...ত্বের বড়াই শুনি নাই। আমার এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ...র নিকট এ ব্যাপারটার উল্লেখ করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "বড়াই করাও একটা আর্ট। ভারতবর্ষের সকল বর্ব্বর জাতিরই ...া আয়ত্তের মধ্যে নহে।"

এই সকল অশোভন ও হাস্যকর বড়াইকে অনেক প্রদেশ-প্রেমিক বাঙালী কবির অতিশয়োক্তি বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই চলিবে না। উহার উৎস আরও গভীর। এই বড়াই-প্রবণতা আমাদের উগ্র বাঙালীত্ব-বোধের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ও উহারই একটা প্রকাশ মাত্র। বাঙালী ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হউক আর না-ই হউক, বাঙালী যে বাঙালীই,—পঞ্জাবী নয়, বিহারী নয়, মারাঠা নয়, গুজরাটি নয়, মান্দ্রাজী নয়—বাঙালীর যে বাঙালী বলিয়াই একটা সত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙালীর যে বাঙালী হিসাবেই একটা ভবিষ্যৎ ও 'মিশন' আছে, এ-কথা কোন বাঙালী মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে না। প্রাদেশিকতা-বোধ তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত।

বিদেশী লেখকেরা প্রায়ই ভারতবর্ষের বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহু অসমন্বয়, বহু অনৈক্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহার কতকগুলি সত্য, কতকগুলি একেবারেই মিথ্যা, কতকগুলি আবার অতিরঞ্জিত। মিথ্যা ও অতিরঞ্জনাকে বাদ দিলেও বৈচিত্র্য যাহা থাকে তাহা হয়ত উপেক্ষা করিবার মত নয়। কিন্তু এই সব বৈচিত্র্যের সকলগুলিকে স্বীকার করিয়া লইলেও ভারতবর্ষের বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা, বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের পথে প্রকৃত বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এইরূপ বৈষম্য যতগুলি আছে, উহাদের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না। তাহার কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অগণিত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার ইচ্ছা বড়-একটা নাই। পঞ্জাব ও বিহার, কাশ্মীর ও গুজরাটের মধ্যে পার্থক্য বহু আছে, কিন্তু এই পার্থক্যবোধ এই সকল প্রদেশের লোকদের মনে সমগ্র উত্তরাপথের স্বাভাবিক ঐক্য ও ঐক্যবোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্ধ্র, তামিল, মলয়ালম, কনাড প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবাসীদের সম্বন্ধেও বোধ করি মোটামুটি ভাবে এই কথাটা বলা যাইতে পারে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু হইয়াছে বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কোন একটা জনসমষ্টির আভ্যন্তরীণ ঘনিষ্ঠতাবোধ ও অপর সকল ভারতবাসী হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার ইচ্ছাকে যদি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগের মাপকাঠি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলা দেশ যে ভারতবর্ষের একটি সুপরিস্ফুট বিভাগ হইয়া দেখা দিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ 'পজিটিভ,' 'নিগেটিভ' মাত্র নয়। তাই প্রাদেশিকতার দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী বাঙালীর চোখের সম্মুখ হইতে ভারতবর্ষকে যেমন করিয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে বোধ করি তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কিছুও করে নাই।

কথাটা হয়ত একটু ভাঙিয়া বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোথাও প্রাদেশিকতা নাই, এ রকম কোন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আজ আমি প্রচার করিতে আসি নাই। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে প্রাদেশিকতা আছে, "আসামীদের জন্য আসাম," "বিহারীদের জন্য বিহারী," "উড়িয়াদের জন্য উড়িষ্যা," "পাঞ্জাবীদের জন্য পঞ্জাব," এই সকল তীব্র চীৎকারই তাহার অতি জাজ্বল্যমান ও অপ্রীতিকর প্রমাণ। তবুও, বাংলা দেশের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনেক বিষয়েই গুরুতর প্রভেদ আছে। এক নামে ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এদুয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই আছে কিনা সন্দেহ। প্রথমেই দেখিতে পাই, বাংলা দেশের বিখ্যাত লেখক ও নেতারা প্রাদেশিক জাতীয়ত্বের প্রতি যতটা শ্রদ্ধাশীল, অন্য কোন প্রদেশের নেতারা ততটা ন'ন। বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত, সকল নেতৃস্থানীয় বাঙালীই বাঙালীত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের সকলেই প্রথমে বাঙালী পরে ভারতবর্ষীয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ একটু উদার, কেহ বা একটু বেশী অনুদার। কিন্তু এ-সকল বৈষম্য সত্ত্বেও, ইহাদের জাতীয়তার সঙ্গে [illegible]

মধ্যে যে প্রাদেশিকত্বটুকু সমানভাবে বর্ত্তমান, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, এমন কি বালগঙ্গাধর তিলকের মধ্যেও ততটুকু প্রাদেশিকত্বের ঝাঁঝ পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে অবাঙালী নেতারা বাঙালী নেতাদের অপেক্ষা অনেক বেশী খাঁটি ভারতবর্ষীয়। বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অন্যান্য প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য উহার অবলম্বনে। সত্যই হউক কিংবা কল্পিতই হউক, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্যকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অন্যান্য প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ সেরূপ কিছু করিতে পারে নাই। উহাদের অবলম্বন সাধারণতঃ সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থের বোধ। সেজন্য উহাদের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। শিখের স্বাতন্ত্র্যবোধ, মারাঠার স্বাতন্ত্র্যবোধ, অনাচরণীয় জাতিদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতীয় ঐক্যের পথে বাধা নয়, এ-কথা কেহ বলিবে ন। কিন্তু তবুও একটি একটি করিয়া প্রদেশ ধরিলে উহারা খণ্ড খণ্ড, বহুবিচ্ছিন্ন, সংখ্যাবলহীন ও অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী। বাঙালী প্রাদেশিক-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ নিজেদের পিছনে যে একটা অখণ্ড, বিরাট জনশক্তি আছে বলিয়া দাবি করিতে পারেন, এ সকল সম্প্রদায়ের নেতাদের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ঐক্যের দিক হইতে সেই সকল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব একটা ভাবনার বিষয় বটে, কিন্তু দুস্তর বাধা নয়।

এই ত গেল বাহিরের কথা মাত্র। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অন্যান্য প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য আরও গভীর। বাংলার বাহিরের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রধানতঃ দুইটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত—এক, ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসীদের স্থানীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি আসক্তি অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি, দ্বিতীয়তঃ, উহাদের আর্থিক স্বার্থ (অনেক সময়েই চাকুরী) রক্ষা করিবার ইচ্ছা। এই দুইটির প্রথমটির মূল অসাড় অতীতের, দ্বিতীয়টির স্বার্থবোধের মধ্যে। এই দুইয়ের কোনটাতেই প্রেরণা নাই, সঙ্কীর্ণতার লজ্জা আছে; তাই তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান যুগের ন্যাশনালিজমের দুর্দ্দম গতি রোধ করা অসম্ভব। তবে যে তাহারা এখনও টিঁকিয়া আছে তাহার একমাত্র কারণ উহাদের অস্তিত্বের সহিত বিদেশী শাসকের স্বার্থের যোগ। যে মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ রাজশক্তি উহাদের পিছন হইতে অপসৃত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বাংলা দেশের প্রাদেশিকত্ব সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। উহা স্বার্থবোধ মাত্র নয়, উহা একটা সজ্ঞান, পূর্ণবিকশিত জাতীয়ত্ববাদ। যে পাশ্চাত্য জাতীয়ত্ববাদ ভারতীয় জাতীয়ত্বের প্রাণরস জোগাইতেছে, বাঙালীত্বের উৎসও তাহাই। এ-দুয়েরই মুখ ভবিষ্যতের দিকে।

২

আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের নিকট মসিয় জুলিয়াঁ বাঁদার নাম পরিচিত কিনা বলিতে পারি না। ইনি এ-যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও চিন্তাবীর। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ সমালোচক মিঃ হারবার্ট রীড মসিয় বাঁদাকে বর্ত্তমান জগতের দুই তিন জন "Significant thinker"-এর এক জন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার La Trahison des Clercs নামক বিখ্যাত পুস্তকে বর্ত্তমান যুগের ন্যাশনালিজমের ধারা ও প্রকৃতির যে বিশ্লেষণ আছে, তাহার সহিত বাঙালী স্বাজাত্য-বোধের একটি আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাই। মসিয় বাঁদা যে-চারিটি জিনিষকে বর্ত্তমান জগতের জাতীয়ত্বের বিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই বাঙালীর প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যে উগ্রভাবে বর্ত্তমান। সেজন্যই আমাদের প্রাদেশিকত্বকে নিতান্তই একটা অবান্তর অথবা নগণ্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। উহার মধ্যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অনৈক্যের অপেক্ষাও অনেক বেশী বিপজ্জনক বিরোধের বীজ নিহিত আছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু বাঙালীই এ-সম্বন্ধে সচেতন ন'ন।

বর্ত্তমান যুগের ন্যাশনালিজমের আলোচনা করিতে গিয়া মসিয় বাঁদা প্রথমেই যে লক্ষণটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—তিনি বলেন এ-যুগের গণতান্ত্রিক জাতীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশী আবেগপ্রবণ (bien plus

purement passionnelles) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তও রাজা ও রাজ্য-শাসকগণ জাতিত্ব বলিতে প্রধানতঃ বুঝিতেন জাতির স্বার্থ—নূতন নূতন দেশ অধিকার, বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার অন্বেষণ, মিত্রলাভ। সেই স্বার্থান্বেষী জাতীয়ত্ব রূপান্তরিত হইয়া আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সর্ব্বোপরি একটা অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি (l'exercice d'un orgueil)। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই, ধারণা করিবার মত জ্ঞানও তাহাদের নাই, সুতরাং জাতীয়তা-বোধ হইতে তাহারা চায় শুধু জাতিত্বের গর্ব্ব, জাতিত্বের আনন্দ, ও জাতি হিসাবে তাহারা যে সম্মান লাভ করিয়াছে এবং আঘাতও পাইয়াছে তাহা লইয়া প্রতিক্রিয়া করিবার উত্তেজনা। এইরূপে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে গিয়া জাতিত্ববোধ শুধু জাতিত্বের অভিমানে পরিণত হইয়াছে।

নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য দাবি করিবার ঝোঁক, মসিয় বাঁদার মতে বর্ত্তমান যুগের জাতীয়তার দ্বিতীয় লক্ষণ। আজিকার দিনে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি শুধু পার্থিব সম্পদ, সামরিক শক্তি, সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ধনজনের গর্ব্ব লইয়াই সন্তুষ্ট নয়। তাহারা চায় ভাষায়, সাহিত্যে, কলায়, দর্শনে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে নিজেকে বিশিষ্ট বলিয়া দাবি করিতে ও এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটিতেই নিজেকে অপর সকল জাতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিতে। এক ধর্ম্মাবলম্বী আত্মার সহিত আর এক ধর্ম্মাবলম্বী আত্মার সংঘাত (l'affirmation d'une forme d'âme contre d'autres formes d'âme)—ইহাই এযুগের দেশ-প্রেমের অর্থ।

নিজের জাতীয়ত্বকে দেশের অতীতের মধ্যে অনুভব করিবার ও বর্ত্তমান যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাতির সনাতন আশা-আকাঙ্ক্ষা বলিয়া প্রচার করিবার আগ্রহকে—(de se sentir dans leur passé, plus précisément de sentir leurs ambitions comme remontant à leurs ancêtres, de vibrer d'aspirations "séculaires," d'attachements à des droits "historiques")—মসিয় বাঁদা বর্ত্তমান যুগের জাতীয়তার তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মনোভাবের বশে জাতীয় জীবন অথবা কর্ত্তব্যের ধারা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আজ আমরা কেবলমাত্র এই পথ ধরা উচিত, এই পথ ধরা উচিত নয়, এইটুকু বলিয়াই সন্তুষ্ট নই। আমরা দাবি করি, যে আমাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থাই জাতির জীবনের চিরন্তন ধারার অনুযায়ী। উহা আমাদের জাতির ললাট-যে ধারা আবিষ্কার করিয়াছে তাহারই সহিত উহার নিবিড় যোগ আছে, আমরা শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়াছি মাত্র।

জাতীয়তাবোধকে একটা 'মিষ্টিক' রূপ (un caractère de mysticité) দান, মসিয় বাঁদার মতে বর্ত্তমান যুগের ন্যাশন্যালিজমের চতুর্থ লক্ষণ। জাতীয়তাবোধ অতীতে একটা ঐহিক ব্যাপার মাত্র ছিল। আজ তাহা যুক্তিতর্কের অতীত একটা ধর্ম্মসাধনার মত জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ভিক্তর হ্যুগো হইতে মসিয় মোর্‌রা পর্য্যন্ত সকল ফরাসী লেখকই এক "déesse France," দেবী ফ্রান্সের কথা ঘোষণা করিতেছেন।

এই চারিটি সুরই আমাদের বাঙালী জীবনে কত সুস্পষ্টভাবে বাজিতেছে, তাহার সংবাদ গত পঁচিশ বৎসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার সহিত যাঁহার অতি সামান্য পরিচয়ও আছে তিনিই দিতে পারিবেন। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র দিব।

৩

বাঙালীত্বের গর্ব্ব, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙালীত্ববাদ, বাঙালীত্ব পূজা—এই চারিটি সুরের প্রথমটির সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী এই পর্দ্দায় একবার মুখর হইয়া উঠিলে তাহাকে নীরব করা কঠিন হইয়া উঠে। ১৯১৭ সনে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে জানে না।" ইহার পূর্ব্বে ও পরে চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা কম বিখ্যাত ও কর্ম্মকৃতী অনেক বঙ্গসন্তানও এই কথা বলিয়াই আবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা সে বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে ঠিক কি, সে-সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই। কিন্তু বাঙালীর যে একটা বৈশিষ্ট্য আছেই, এ-কথা সকলেই স্বীকার ও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ১৯১৭ সনে রংপুরের অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—

> বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে।...বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।

বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এই কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

বাংলা দেশের হিন্দুরা বহুশত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই সংস্কৃতির প্রভাব তাহাদের বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও কলার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহার একটা নিজস্ব ছাপ আছে, নিজস্ব প্রাণ আছে; একটা সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে......প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতে গিয়া আমি অন্য সম্প্রদায়ের ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের কথাও ভুলিতেছি না। আমি তাহাদের সকলকে জড়াইয়াই বলিতে চাই, বাংলা দেশের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

চিত্তরঞ্জনের পর ১৯১৯ সনে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বলিলেন,—

আমি এটা অনুভব করি যে, ভারতে বাঙালীর একটা বিশেষ সাধনা আছে। নব্যবঙ্গের আরম্ভকাল থেকেই তার একটি অপরূপ নব্যতা দেখা দিয়েচে। এই নূতন বাংলার সকল মহাপুরুষই নূতনকে অভ্যর্থনা করে নিতে ভয় পাননি।... যে মানুষ পুরাতনকেই একান্ত আঁকড়ে থাকে সে নিজেকে অবিশ্বাস করে। যে নিজেকে অবিশ্বাস করে, সে আপন চিত্তক্ষেত্রে ভালো করে চাষ দেয় না, পুরো ফসল ফলায় না। বাঙালী আপনাকে বিশ্বাস করেচে সে আপন ফসল ফলাচ্চে। তাই তার প্রতি ভারতের অন্য জাতিরও বিশ্বাস জন্মাচ্চে। বাঙালীর কাছ থেকে তারা কিছু পাবে একথা তারা স্বীকার করে।

তাহারা স্বীকার করুক আর না-ই করুক, আমরা যে ভক্তিভরে স্বীকার করি, তাহার প্রমাণ পাই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১৯২৫ সনের একটি রচনায়। সুভাষবাবু বলিতেছেন,—

বাঙালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাংলার স্থান সর্ব্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকে বহন করতে হবে।...

বাঙালীকে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্ত্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙালীকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, শৌর্য্য-বীর্য্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালীর আছে।*

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে।

এই যে আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের জাতীয় জীবনের অতুল সম্পদ, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে! সুভাষবাবু বলিতেছেন,—

অনেকে দুঃখ করে থাকেন বাঙালী মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙালী যেন চিরকাল বাঙালীই থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙালীর পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ।

ইহার তিন বৎসর তিন মাস পরে এই বাঙালী বৈশিষ্ট্যের নাম করিয়াই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলার যুবকবৃন্দকে অবাঙালীর নেতৃত্ব অস্বীকার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

বঙ্গভঙ্গ সেটেল্‌ড্ (settled) ফ্যাক্ট একদিন আন-সেটেল্‌ড্ (unsettled) হয়েছিল—সে এই বাঙ্গলা দেশে। সেদিন বাইরে থেকে কর্ত্তা আমদানি করতে হয়নি; বাঙ্গলার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন বাঙ্গলার নেতাদের হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক দেশেরই স্বভাব, প্রবৃত্তি, রীতি-নীতি, চাল-চলন বিভিন্ন। এ বিভেদ শুধু তার দেশের লোকেই জানে। এই জানার উপর যে কত বড় সাফল্য নির্ভর করে, বহুলোকেই তা ভেবে দেখে না।......তাইত দেশের লোকের হাতেই তার আপনার দেশের কাজের ধারা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। সাইমন সাহেবের দলেরও ঠিক এই ভুলই হয়েছিল, যখন একদেশ থেকে এসে তাঁরা আর এক দেশের constitution তৈরির স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলেন—এই কথাটা বাংলার যুবসমিতিকে ভেবে দেখতে আজ আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

বাংলা দেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য যখন গীতার দোহাই ও সাইমন কমিশনের উপমার প্রয়োজন হইল, তখন বাংলা দেশের আর বিচ্ছিন্ন হইবার কতটুকু বাকী তাহা বাস্তবিকই সূক্ষ্ম হিসাবের বিষয়।

---

* এই প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি গল্প না বলিয়া পারিলাম না। সে পাঁচ ছয় বৎসর আগেকার কথা। আমি এবং আমার একজন আত্মীয় একজন বিখ্যাত বাঙালী ঔপন্যাসিকের (ইঁহাকে এযুগের রেপ্রিজেন্টেটিভ বাঙালী বলিলে অন্যায় হইবে না) সঙ্গে বসিয়া আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। কথায় কথায় পঞ্জাব ও অমৃতসরের কথা উঠিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও কোন পঞ্জাবী জেনারেল ডায়ারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে নাই, সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লেখক মহাশয় পাঞ্জাবীদের কাপুরুষতার উল্লেখ করিলেন; তারপর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির দ্বারা কিছু হইবে না। যদি ভারতবর্ষের মুক্তি কোনদিন হয় তবে সে হইবে বাঙালীর চেষ্টায় এবং বাঙালীর মধ্যেও কয়েকটি মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকের চেষ্টায়।" আমাদের উগ্র প্রাদেশিকত্ব কত অনুদার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রতি কত অশ্রদ্ধাশীল হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "তরুণের আন্দোলন" শীর্ষক পুস্তিকাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এবারে বাঙালী প্রাদেশিকত্বের আর দুইটি লক্ষণের কথা। মসিয়া বাঁদা এক জায়গায় বলিতেছেন যে, সিয়েইয়ে যখন বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠান, তখন তিনি প্রাচীন 'গল'দের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আবার জাগাইয়া তুলিতেছেন, একথা মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই, বিসমার্কও বোধ করি শ্লেস্‌ভিক ও হলষ্টাইন অধিকার করিবার সময়ে প্রাচীন 'টিউটনিক অর্ডার'-এর কথা ভাবেন নাই। কিন্তু এ-যুগের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা শুধু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে লইয়াই সন্তুষ্ট নয়, তাহারা অতীতের মধ্যেও আপনার প্রকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়। বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্য-বোধের উপরও এই যুগধর্ম্মের প্রভাব যে সুস্পষ্ট, এই প্রবন্ধের গোড়াতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেটিই উহার যথেষ্ট প্রমাণ।

তবে ইউরোপের দেশগুলিতে ও বাংলা দেশে একটা বড় রকমের তফাৎ আছে। ইউরোপের অতীত সত্যকার একটা জিনিষ, আমরা যে অতীতের ছবিকে বর্ত্তমানের প্রেরণা করিয়া লইয়াছি উহা কল্পনামাত্র। মুসোলিনি যখন এ-যুগের ইটালীকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন আমরা তাঁহাকে লইয়া পরিহাস করিতে পারি, কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ইটালীর যে একটা যোগ আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বাংলা দেশের অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সহিত অজন্তার কোন সম্বন্ধ নাই, ৪৯ নম্বর বাঙালী রেজিমেণ্টও Gangarides বা লাল পল্টনের বিস্মৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইউরোপের বর্ত্তমান অতীতের সন্তান, আমাদের বর্ত্তমান অতীতের জন্মদাতা।

কিন্তু কল্পনা হউক আর যাহাই হউক, বর্ত্তমানে আমরা যাহা কিছু করিতেছি ও করিতে চাহিতেছি, তাহাদের সকলগুলিরই সূচনা অতীতে হইয়াছিল, বাঙালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের জীবন-ধারারই পূর্ণ বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি মাত্র,—এ-বিশ্বাস বাঙালী জাতীয়ত্বের খুব একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার ফলে মুসলমান আমলের 'সদা বিদ্রোহের দেশ' বাংলার সহিত এ-যুগের বিপ্লববাদী বাংলার একটা যোগসাধন করিতে করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি, সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলালকে বাঙালী মোহনলালে পরিণত করিয়াছি। বোধ করি, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের বর্দ্ধন উপাধিধারী ভদ্রসন্তানদিগকে প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের ও গুপ্তদিগকে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিহাস নয়। এ-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনেও বাংলা দেশের অবিনশ্বর আত্মারই যে পূর্ণপ্রকাশ হইতেছে, এ বিশ্বাস দেশবন্ধুরও ছিল। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

> এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া, ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শক্তি, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবনগৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—
>
> তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
>
> —সেই মাকে দেখিলাম, চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়, বুঝিলাম কেশবচন্দ্র কেন, কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

বাংলা দেশের অতীত যেন একটা আরসী মুকুর, লোকে উহাতে যাহা দেখিতে পায় তাহা তাহাদের নিজেরই মুখের ছায়া। দেশবন্ধুর আবেগময় দেশপ্রেম বাঙালীর সমস্ত ইতিহাসকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা বলিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল, বাংলা দেশের আর এক নব্যপন্থী দল উহার মধ্যে নিজেদের মতামতেরই পরিপোষক যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন। তবে চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যাহা ছিল আবেগমাত্র, এই বুদ্ধিমত্তাভিমানী দলের মধ্যে তাহা যুক্তির রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

বাঙালী আর্য্য কি অনার্য্য, বাংলা দেশ আর্য্য সভ্যতার দ্বারা কতটুকু প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, এ-সকল সমস্যা বাংলা দেশের ইতিহাসের পুরাতন প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ-যুগের লেখকগণ পর্য্যন্ত সকলেই তাহার অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের দিক হইতে এ সকল প্রশ্নের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

নির্দ্দেশের জন্য উহার সার্থকতা কতটুকু সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে। এই চিন্তাধারার সজ্ঞান গোড়াপত্তন বোধ করি করেন সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়। ১৯১৪ সনের সাহিত্য-সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন বাংলা দেশে "আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম এবং দেশীয় মাত্রা অনেক বেশী" এই অভিমত প্রকাশ করিলেন, তখন সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় তাহার উপর মন্তব্য করিলেন, "শাস্ত্রী-মহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক আর্য্য শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাঙালীর ইহকাল পরকাল দু-ই নষ্ট হইবে।" শাস্ত্রী মহাশয় ঠিক এই তথ্যটিই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ অভিভাষণটি এখন আমার হাতের কাছে নাই। তবে সবুজপত্রের অন্ততঃ যে ইহাই "মোদ্দাকথা", তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। সবুজপত্র ভাষায় ও সংস্কৃতিতে নূতনত্বের অগ্রদূত হইয়া দেখা দিয়াছিল। সে-সময়ে বাংলা দেশে ভাষাগত ও সামাজিক গোঁড়ামির প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল হিন্দুসভ্যতা ও আর্য্যামির প্রভাব। তাই সবুজপত্র নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া বাংলা দেশে আর্য্যামির ভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিভাষণের কিছুদিন পরেই সবুজপত্রে "অনার্য্য বাঙালী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। লেখক বলিলেন,—

> বাঙালী যে অনার্য্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে না। বছর দশেক আগে যখন রিজলি সাহেবের কেতাব বার হয়েছিল, তখন আমাদের অনেকের মন বিগড়ে গিয়েছিল—এবং কথাটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু কথাটাকে যে আর চাপা দেওয়া যায় না। সেদিন সাহিত্য-সম্মিলনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো স্পষ্টই বলে দিলেন যে, যদিও বা আমরা আর্য্য হয়ে থাকি, তবু অনার্য্য আমরা তার পূর্ব্বে এবং তার চেয়ে বেশী।...
>
> কিন্তু অভিমানের কথা এর মধ্যে কিছু নেই—বরং অনেকটা আশার কথা, অনেকটা সোয়াস্তির কথা আছে। এতকাল আমরা আর্য্য হবার বৃথা-চেষ্টায় কাটিয়েছি। আর্য্য-সভ্যতা যে আমাদের সভ্যতা, আর্য্য ইতিহাস যে আমাদের ইতিহাস, আর্য্যধর্ম্ম যে আমাদেরই সহজ ধর্ম, এই মিথ্যা কথার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের ঢের ভুগতে হয়েছে। আমাদের ধর্ম্ম যে অন্যরূপ, আমাদের স্বভাব যে খোট্টা, মারাঠা, জার্ম্মান, ইংরাজদের স্বভাব হতে ঢের স্বতন্ত্র—এর মধ্যে অনেকটা আরাম এবং শান্তি আছে।
>
> আর্য্যদের নীতিশাস্ত্র, আর্য্যদের System of Values বা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের পরীক্ষা করবার আর আমাদের দরকার নেই। আর্য্যদের কষ্টিপাথরে আর আমাদের আছাড় খেয়ে মরবার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই; এতে যে কত লাভ তা আর্য্য এবং অনার্য্যের স্বভাব একটু বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যাবে না।

এই মনোভাবকেই মসিয় বাঁদা *l'organisation intellectuelle des haines politiques* (the intellectual organization of *political hatreds*) বলিয়াছেন।

এখন বাকী রহিল শুধু আমাদের জাতীয়ত্বের মিষ্টিসিজমের কথা। উহার জন্য একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা হইতেই সেটি সংগ্রহ করিলাম।—

> বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টিস্রোতের বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙালী একটা বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্ত্তি, আমার বাঙলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর। আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

৬

এ-সকল সত্ত্বেও হয়ত অনেকে বলিবেন, শুধু এই কারণেই যে আমাদের ভারতপ্রীতি অন্য কোন প্রদেশের ভারতপ্রীতি অপেক্ষা কম, তাহা আমরা মানিতে পারি না। বাংলা দেশকে আমরা ভালবাসি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষকেও কি আমরা সমান ভাবেই ভালবাসিতে পারি না? কথাটা আমার মনেও জাগিয়াছে। ভারতবর্ষ আমাদের কাছে একেবারেই সত্য নয় একথা আজিকার দিনে আর বলা চলে না। চিত্তরঞ্জনের যে বক্তৃতা হইতে একটি জায়গা কিছু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য যদিও আমাদের কার্য্যপদ্ধতির প্রথম সোপান, তবু আমাদের ভুলিলে চলিবে না প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের উপরেও ভারতবর্ষের একটা ঐক্য আছে। এই বক্তৃতার দুই তিন দিন পরেই আবার তিনি বলিলেন,—"আমি আমার নিজের ব্যক্তিত্বকে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যকে অতিশয় ভালবাসি সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এমন কোন শাসনতন্ত্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা ভারতীয় জাতীয়ত্বের মহান আদর্শের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, তবে সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের একটা ব্যাপার হইবে।" (১৯১৭ সনের ১৪ই অক্টোবরের বক্তৃতা)। সেই সঙ্গে তিনি একথাটারও উল্লেখ করিলেন যে, একটা যুগ ছিল যখন—

> আমাদের জাতীয়ত্ব বাংলা দেশেই কেন্দ্রীভূত ছিল। আমাদের দৃষ্টি কিছুতেই বাংলার বাহিরে যাইত না। আমরা যেন বাংলাকেই পান করিতাম। প্রেমিক মাত্রেরই মত আমরা বাংলা লইয়াই মাতিয়াছিলাম। কিন্তু আজিকার জাতীয়ত্ব আরও বিস্তার-লাভ করিয়াছে। আজ আমরা আরও উদার হইয়াছি। আমরা

আবিষ্কার করিয়াছি যে, যদিও আমাদের সকল কর্মের পিছনে বাংলার প্রাণকেই থাকিতে হইবে, যদিও আমাদের সকল কাজে বাংলার আত্মাকেই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে হইবে, তবুও ইহার পরেও একটা বড় জিনিষ আছে, যাহাকে অবহেলা করা চলে না। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)।

এই ভারতীয় ঐক্যবোধ গত দশ বৎসরের আন্দোলনে আরও অনেকটা গভীর হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন, অন্ততঃ তাহার প্রকাশ্য উপলক্ষ্য, একটা প্রাদেশিক ব্যাপার মাত্র ছিল। অসহযোগ আন্দোলন একটা ভারতব্যাপী ব্যাপার। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধাচরণও তাহাই। গত বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের ত কথাই নাই। তাহা ছাড়া, এবারকার জাতীয় আন্দোলন যাঁহাদের কাছে প্রেরণা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই অবাঙালী। এই জিনিষটা দুই চারি জন 'ডাই-হার্ড' বাঙালীর অসহ বোধ হইলেও বাংলা দেশের জনসাধারণ ইহাতে আপত্তি ত করেই নাই, বরঞ্চ তাঁহাদের নেতৃত্ব শ্রদ্ধার সহিতই মানিয়া লইয়াছে। গত কয় বৎসরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতারা অনেকবার বাংলা দেশে আসিয়াছেন, বাংলা দেশের বহু নেতাও বাংলার বাহিরের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই মেলামেশা ও সহকর্ম্মিতার ফলে আজ বাংলা দেশে ভারতীয় ঐক্যবোধ অনেক বেশী প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে, সেই সঙ্গে বাঙালীর প্রাদেশিকত্বের ঝাঁঝও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বাংলা দেশে আজ একদল লোক দেখা দিয়াছেন যাঁহারা ভারতবর্ষকে বাংলা দেশ অপেক্ষা কম আত্মীয় মনে করেন না, যাঁহাদের কাছে ভারতীয় ঐক্য "অবহেলা-করিবার-মত-নয়" অপেক্ষাও অনেক বড় জিনিষ, যাঁহারা ভারতীয় ঐক্যকেই আমাদের একমাত্র অবলম্বনের বস্তু বলিয়া মনে করেন।

ইঁহাদের প্রভাব ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলা দেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয় আজ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিয়াছে। স্বদেশীযুগ, এমন কি ১৯১৯ সনেরও তুলনায় আজ আমরা অনেক বেশী ভারতীয়ত্বে আস্থাবান হইয়াছি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজিকার দিনেও আমাদের ভারতীয়ত্ববোধের অনেকগুলি অসম্পূর্ণতা আছে। সেগুলি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় ঐক্যের গোড়াপত্তনও হইয়াছে এ কথা বলাও বোধ করি সঙ্গত হইবে না। প্রথমতঃ, আমাদের এই নূতন মনোভাব এখনও একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক—বৎসর দশেকের—ব্যাপার মাত্র, এখনও উহা আমাদের ধাতস্থ বৎসরের ভারতব্যাপী আন্দোলন আমাদের প্রাদেশিকত্বকে আপাততঃ চাপা দিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু যখনই এই আন্দোলনের উত্তেজনা কমিয়া যাইবে, তখনই আবার উহা আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা, সে-কথা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে না। দ্বিতীয় কথা, আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা মন হইতে প্রাদেশিকতাকে আসলেই দূর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয়। এ বিষয়ে বাংলা দেশের যুবক ও প্রৌঢ়দের মধ্যে বেশ একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে। দু-চারিটি ব্যতিক্রমের কথা ছাড়িয়া দিলে যুবক বাঙালীরা প্রৌঢ় বাঙালীর অপেক্ষা অনেক বেশী কম প্রাদেশিক। নিজের প্রদেশকে খাটো করিতে দেখিলে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন, এটুকু প্রাদেশিক অভিমান তাঁহাদেরও আছে, কিন্তু অবাঙালী বাঙালীর উপর নেতৃত্ব করিতে আসিতেছে এ রকম কোন সংবাদ মাত্র পাইলেই তাঁহাদের কেহ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত অধীর হইয়া উঠিবেন একথা বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তৃতীয় কথা, আমাদের ভারতীয় ঐক্যবোধ এখনও বড় বেশী 'নিগেটিভ', এখনও উহা ইংরেজ-বিরোধ মাত্র, আজ পর্য্যন্ত তাহা কোন সুস্পষ্ট 'পজিটিভ', রাজনৈতিক আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন একচ্ছত্র, সুতরাং ইংরেজবিরোধও একচ্ছত্র। ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের জন্য অতি অস্পষ্ট একটা ফেডারেলিজম্ ভিন্ন অন্য কোন আদর্শ এখনও আমরা মনের মধ্যে খাড়া করিয়া তুলিতে পারি নাই। ভারতীয় ঐক্যবোধের এই রূপান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই ভারতবর্ষের একত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে না।

এই তিনটি কথা স্মরণ রাখিয়া যখনই আমরা বাঙালী মনের ভারতীয় ঐক্যবোধের প্রকৃত রূপটি ধরিতে চাই, তখনই দেখি, উহা ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির ঐক্যবোধ মাত্র, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম সেবিত বাস্তব ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ নয়। বরিশালের বক্তৃতায় বাঙালীকে ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়া দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন,—

আমরা ভুলিতে পারি না যে, ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র জাতিগুলি পরস্পর হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও অতীত ও আধ্যাত্মিকতার

ইহাদের সকলের মধ্যেই একটা বড় কেন্দ্রের সংস্কৃতির প্রভাব বর্ত্তমান। রামায়ণ মহাভারত যতটুকু আমাদের তাহাদেরও ততটুকু…প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্টতা আছে সত্য, তবুও তাহাদের সকলের উপরে একটা সাধারণ সংস্কৃতি আছে, যাহার মধ্যে এই সবগুলি প্রদেশ বিভিন্নতা সত্ত্বেও মিলনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।" (ইংরেজীর তাৎপর্য্য)।

ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই বাঙালীর ভারতীয় ঐক্যবোধ এই অপেক্ষাকৃত সহজ খাদে চলিতেছে। 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে রূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের মানসলোকেরই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বহুজাতি এক নেশুন নয়, ইউরোপীয় লেখকদের এই অভিযোগের উত্তরে যখন আমরা ভারতবর্ষের সত্যকার ঐক্যের প্রমাণ দিতে সচেষ্ট হই—তখনও আমরা যে একপ্রাণ ভারতবর্ষের ছবি আঁকি, সেও এই ভারতবর্ষই—ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড বা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত একীভূত একটা ভারতবর্ষ নয়। অবশ্য ভারতবর্ষ হয়ত প্রকৃত-প্রস্তাবেই এত নিবিড়ভাবে একীভূত নয় বলিয়াই ভারতীয় ঐক্যের আলোচনাকে আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হই। কিন্তু ইহার মধ্যে সুবিধার কথা ছাড়া অন্য কারণও আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যখন জাতীয়ত্বের ইউরোপীয় মাপকাঠিকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের জন্য তাহার একটা নূতন ও বৃহত্তর সংজ্ঞা আবিষ্কার করেন—বলেন, "The fundamental difference between European nationalism and Indian nationalism lies in the excessive emphasis of the one on territorial and the other on cultural unity", অথবা শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত মহাশয় যখন মিঃ গিলক্রাইষ্টের [illegible]কে খণ্ডন করিয়া ঋগ্‌বেদ ও নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সাহায্যে ভারতবর্ষের বৃহত্তর ঐক্যের রূপ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তখন আমার মনে হয় না, যে তাঁহারা শুধু তর্কে জিতিবার একটা সুযোগ খুঁজিতেছেন। ইহার প্রকৃত কারণ বোধ করি আমাদের জাতীয়ত্ববোধের অপূর্ণতা। আমাদের মনের, আমাদের দৃষ্টির, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চারিদিকে কোথাও যেন একটা প্রাচীর আছে, যাহার বাধা এড়াইয়া কিছুতেই আমরা ভারতবর্ষকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি না। যেমন স্বপ্নে আমরা দূর, অজানা দেশে চলিয়া যাই, কিন্তু সে দেশের বাহ্যিকরূপ যাহা দেখি তাহা আমাদের নিত্যদৃষ্ট, চির-পরিচিত জগতেরই অবিকল প্রতিবিম্ব, তেমনি কচিৎ কখনও আমরা যখন ভারতবর্ষের রূপকে প্রত্যক্ষ করি, তখনও আমাদের মনের মধ্যে ভারতবর্ষের যে ছবি ভাসিয়া উঠে, তাহা আমাদের বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনেরই জোড়া-তাড়া দেওয়া একটা ছবি।

আমাদের এই অক্ষমতার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধের সহিত আমাদের প্রাদেশিকত্ববোধের কোন অসামঞ্জস্যের অভাব। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দু দর্শন, সংস্কৃত কাব্য, ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনা, এ সকলকে গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে পঞ্জাবী, মারাঠা, খোট্টা, গুজরাটি, মান্দ্রাজী কাশ্মিরীর অবাঙালী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয় না। বিনা কষ্টেই আমরা রাম, লক্ষ্মণ, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বাঙালীর পোষাক পরাইয়া ফেলিতে পারি। তবুও এই সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধও জাতীয় ঐক্য-সাধনের একটা বড় উপায়। কিন্তু শুধু ইহারই উপর ভারতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না। ইহার দ্বারা একটা লীগ্ অফ্ ইণ্ডিয়ান নেশুনস্ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, একটা ইণ্ডিয়ান নেশুনের সৃষ্টি হইবে কি-না সন্দেহ।

৬

তাই, সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ থাকা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা, ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ হইতে একটু বিশিষ্ট থাকিবার আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর মন হইতে আজ পর্য্যন্তও মুছিয়া যায় নাই। এই জন্যই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন একটু বেশী বাংলাদেশ ঘেঁষা; আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাও একটু বেশী ফেডারেলিজ্‌ম্ পন্থী। জাতীয়ত্ব বলিতে যে আমাদের মনে প্রথমেই বাঙালী জাতীয়ত্বের কথা জাগিয়া উঠে তাহার বহু প্রমাণ আমরা বাঙালী লেখকদের রচনার মধ্যে পাই। চিত্তরঞ্জন আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "স্বদেশী সমাজে" মোটামুটি এই কথাটাই বলিয়াছিলেন। এই মনোভাবের ফলে আমরা শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের উপর বরাবরই খুব বেশী জোর দিয়া আসিয়াছি। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাদেশিক ব্যক্তিত্ব রক্ষাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর অন্য সব। এই ধারা সকল বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তারই ধারা। বাংলা দেশে এই চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্ত্তন বোধ করি করেন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, নানা কারণে স্বদেশী আন্দোলনের

সূত্রপাতের সময়ে ফেডারেল আদর্শ আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলেও উহার বীজ প্রথম হইতেই আমাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় নিহিত ছিল। তারপর ১৯০৯ সনে একটি বিলাতী পত্রিকায় তিনি তাঁহার মত প্রকাশ্য ভাবেই ব্যক্ত করেন, এবং ১৯১৬ সনে প্রকাশিত "Empire and Nationality" নামক পুস্তকে তাঁহার এই চিন্তাধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।* আমার মনে হয় পাল মহাশয়ের চিন্তাধারার দ্বারা দেশবন্ধু অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৯১৭ সনের ১৪ই অক্টোবর বরিশালে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার উপর পাল মহাশয়ের চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান।

চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তার কেন্দ্র ও অবলম্বন ছিল বাংলা দেশ। বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণবিকশিত করিয়া উহার সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিক সভ্যতার মৈত্রী সাধন—ইহাই ছিল তাঁহার সকল রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম্মের মূলমন্ত্র। তাই দেখিতে পাই, তিনি বলিতেছেন,—

*"১৯০৯ সনে পাল মহাশয় লেখেন"—"The Empire Idea is a reat idea, but the Federal Idea is greater. It reconciles the absolute autonomy of its members with the perfected unity of the whole. And India is the meeting place not of fluid tribal organizations ...but of perfected and fully developed nationalities ...and the growing Indian Nation will be a new type of nationhood, the real federated Nation."

"Empire and Nationality" নামক পুস্তকে তিনি লেখেন, "She (India) is too big, however, and much too diversified, to form one unit. The problem of self-government in India can only be solved through the evolution of some sort of federalism. The only conceivable form of the Indian State is that of a Federated union like that of the United States of America. In the various Indian provinces, with their respective provincial laws and administrations we have an excellent nucleus of the "State Governments of India."

পাল মহাশয়, চিত্তরঞ্জন এবং অন্যান্য অনেকেই ভারতবর্ষের ফেডারেলিজমের কথা বলিতে গিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উপমা দিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের মনে যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। যুক্তরাজ্যের ফেডারেলিজম্ একটা আইনগত ব্যাপার মাত্র। উহার সহিত প্রাদেশিক সভ্যতা বা জাতীয়তাবোধের কোনও সংস্রব নাই। আমাদের নেতাদের মনে ভারতবর্ষের ফেডারেল শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে ধারণ দেখিতে পাই তাহা অনেকটা কাউণ্ট কুডেন-হোভে কালের্গী ও মসিয়ঁ ব্রিয়াঁর ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অফ্ ইউরোপ, অথবা লীগ অফ্ নেশন্‌স্, অথবা ১৯২৬ সনের সংজ্ঞানুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিংবা তিনেরই সমষ্টির মত একটা জিনিষ।

আমাদের ঠিক কোন ধরণের স্বরাজের প্রয়োজন, এ প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া আপনাদের মনে কোন্ কথাটা সর্ব্বাগ্রে জাগে জানি না। আমার কি জাগে তাহা আমি আপনাদিগকে আজ বলিব। আমার মনে হয়, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রয়োজন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial autonomy)। এই কথাটা সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন, ইউরোপীয় বহু মনীষীও ব্যবহার করিয়াছেন। তাই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বলিতে আমি কি বুঝি, তাহা আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। এই কথাটার পিছনে মূল যে ধারণাটা আছে, ইউরোপীয় চোখ দিয়া তাহার বিচার করা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি চাই আমাদের জাতীয়তার দিক হইতে উহার অর্থ করিতে। এই দিক হইতে দেখিলে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাঙালী জাতি বাংলা দেশে শত শত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া একটা বিশেষ সংস্কৃতির বশবর্ত্তী হইয়াছে, একটা বিশেষ জাতীয় প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সেইজন্য বাংলা দেশের প্রাদেশিক রাষ্ট্রতন্ত্রকে বাংলার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।...উহাকে এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহার ভিতরে আমাদের ব্যক্তিত্বটুকু হারাইয়া না যায়। বাঙালীকে এই জিনিষটা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাচীন আদর্শ ও ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)।

চিত্তরঞ্জনের মতে ভারতীয় ঐক্য আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, ও পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলন আমাদের চরম লক্ষ্য। তবুও এগুলির মধ্যে মুখ্য কোন্‌টি, গৌণ কোন্‌টি তাহা বুঝিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না।

যে দেশীয়তার দাবি রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে নিজেকে এতটা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, তাহা যে সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও সুস্পষ্টরূপ ধরিয়া দেখা দিবে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। যে অলীকতার উল্লেখ করিয়া চিত্তরঞ্জন আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে বাংলার প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিয়াছিলেন, সেই অলীকতাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-মহাশয় সবুজপত্রে লিখিলেন,—

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে-মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাঙ্গলা দেশের সহিত, বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গসাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ এইরূপ লোক আমাদের সাহিত্য-সমাজে বিরল নহে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতাপ দুর্দ্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোন বস্তুবিশেষ নয়,—কিন্তু একটি নামমাত্র। এইরূপ স্বদেশপ্রীতির মূল—হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশী মনোভাব বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

তাই প্রমথবাবু বাংলা সাহিত্যকে বাংলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন,—

ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞামাত্র [illegible]

যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক ভাষার বন্ধনে এদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধন অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেন-না ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য, বাঙালীর খুব বড় একটা গর্ব্বের বস্তু ও বাঙালীত্বের খুব বড় একটা অবলম্বন। ইহা যে ভারতীয় ঐক্যের পথে একটা বাধা হইয়া উঠিতে পারে, এ-সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথের এক বন্ধু তাঁহাকে বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্ব্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে, ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা-ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা।'

এই যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার দাবি তখনও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, এখনও বোধ করি পারেন না। কোন বাঙালীর পক্ষেই তাহা সম্ভবপর নয়। দয়ানন্দ স্বামী বা মহাত্মা গান্ধী যে-ভাবে হিন্দীকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন, কোন বাঙালী তাহা পারিবে কি না সন্দেহ। হিন্দীপ্রচারের আন্দোলন তামিলভাষী মান্দ্রাজেও যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বাংলা দেশে তাহার শতাংশও পারে নাই। আমরা এত বেশী স্বাতন্ত্র্য-বাদী যে, আমাদের নিকট বাংলা ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় ভাষার বিশেষ কোন মূল্য নাই। আমরা ইংরেজী শিখি পেটের দায়ে, ফরাসী জার্ম্মান হয়ত শিখি সখ করিয়া, ভারতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য আর একটা ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার দাবি এখনও আমরা মানিয়া লই নাই। তাই, পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল সংস্কৃতির মিলন স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীতে ফরাসী ও জার্ম্মান শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু হিন্দী শিক্ষা দিবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই।*

* রবিবাসরের দ্বিতীয় বৎসরের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

ফ্রেস্কো

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

পাথর ইট বা সিমেণ্টের দেওয়ালে বালি ও চূণের পলাস্তারার (অস্তরের) উপর ভিজে থাকতে থাকতে যে ছবি আঁকা হয়, তার নাম ফ্রেস্কো।

মশলা চূণ বালি এবং পরিষ্কার পুষ্করিণীর জল—সংগ্রহ করিতে পারলে বৃষ্টির জল—সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বালি—নদীর বালি সব চেয়ে ভাল; যে বালি হাতের মধ্যে রেখে ঘস্‌লে কাঁচের গুঁড়ার মত শব্দ হবে সেই উপযুক্ত বালি। সমুদ্রের বালির প্রায়ই গোল দানা হয়; সে জন্য তাহা তত উপযোগী নয়।

চূণ—পাথুরে চূণ বা ঘুটিং চূণ উপযোগী। ঘুটিং চূণের বিশেষ গুণ, এতে তৈয়ারি বালিকাম শীঘ্র ফাটে না। তবে যে চূণ যেখানে সহজে পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করা চল্‌তে পারে। ঝিনুকের চূণও ব্যবহার

মশলা তৈরি করা

১। বালি—বালিটা সরু চালুনি দিয়ে ছেঁকে কাঁকর ও মাটি বেছে ফেলতে হবে।

২। চূণ—ভালো ফুটান চূণ হ'লে মিহি চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিলেই চলবে। ময়লা থাকলে ভিজাবার পর ছেঁকে শুকিয়ে নিতে হবে এবং তার পরে মিহি ক'রে গুঁড়া করতে হবে।

বালি ধুয়ে পরিষ্কার করলে আরও ভাল হয়। বর্ষার পর নদীর পরিষ্কার বালি সংগ্রহ করে রাখলে তাতে ধুলা মাটি কম থাকে। চূণটা ছয় সাত দিন ভিজিয়ে রাখলে আরও উপযোগী হয়।

ভিজে অবস্থায় মাঝে মাঝে একটা কাঠি দিয়ে ঘুঁটিয়ে দিবে, থিতোলে জলটা বদলে দিবে। তার পর

মশলার ভাগ—গুঁড়াচুণ একভাগ ও পরিষ্কার বালি দুভাগ। ভাল মিহি মার্ব্বেল-গুঁড়ো পেলে বালি ও মার্ব্বেল-গুঁড়া মিলিয়ে দুভাগ ও চুণ একভাগ।

মশলা মাখবার নিয়ম

কোদাল বা বড় কর্ণিক দিয়ে পরিষ্কার মেঝের উপর বা কাঠের পাটার উপর মশলা মাখবে। বালি বিছিয়ে তার উপর সামান্য জল ছড়া দিয়ে, কোদাল দিয়ে ঠাসবে। এইরূপ বার বার জল-ছড়া দিয়ে ঠেসে ঠেসে যখন বালির অবস্থা মাখনের মত হবে তখনই মশলা তৈয়ার হ'ল। মিস্ত্রিকে দিয়ে সামনে বসে থেকে মাখানো ভাল। কারণ, তাদের অভ্যাস-মত বেশী জল ঢেলে দিতে পারে। এইরূপ বেশী জল দিয়ে মাখলে অসমান ভাবে মশলা ভিজতে পারে।

এইরূপ মাখা মশলা পাকা ভাগাড়ে রেখে কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলে বর্ষাকালে উনিশ কুড়ি দিন ও টানের সময়ে দশ বার দিন কাজ করার মত থাকে। এই মাখা মশলা হ'তে প্রত্যহ দরকার-মত মশলা নিয়ে কাজ করা চলবে। তৈয়ারী মশলায় কাজের সময় উপর হ'তে আর জল দেওয়া চলবে না।

জমি প্রস্তুত করা

যে-দেয়ালে কাজ করবে সেটা নূতন হ'লে খড়ার (ইটের জোড়ের দাগ) মুখ পরিষ্কার ক'রে ঝাটা দিয়ে ঝেড়ে খড়ের ঝরনি দিয়ে জল-ছড়া দিবে। দেয়াল যখন জলে ভিজে আর জল টানবে না, তখনই কাজের উপযোগী হয়েছে জানবে। ইহার পর অল্প মশলা নিয়ে উসো করে ঐ ভিজে দেয়ালে বেশ করে ঘসে দাও ও সঙ্গে সঙ্গে ঝরনি দিয়ে জলের ছিটে দাও। এইরূপ চূণবালি দিয়ে অল্প ঘসে দিবার কারণ, পরে যে অস্তর লাগান হবে উহা কামড়ী হয়ে লাগবে বলে। পুরাণো দেয়াল হ'লে চূণবালি খুঁড়ে ইটের মুখগুলিও খড়াগুলি বার ক'রে ঝাঁট দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। যদি সুবিধা একপোচ কলি চূণ লাগিয়ে কাজ আরম্ভ করবে। হয় নোনা লাগা দেয়াল অনুপযোগী জানবে।

অস্তর লাগান—বালিকাম করার মত বড় কর্ণিক দিয়ে বালি ধরিয়ে পাটা মেরে উসো দিয়ে বেশ ক'রে ঘসে দিবে। কর্ণিক দিয়ে যেন মাজা না হয়। অস্তর লাগানো তলা হতে সুরু ক'রে উপরে গিয়ে শেষ হবে। উপর হতে অস্তর লাগানো সুরু করলে নীচে আস্তে আস্তে উপরের বালি শুকিয়ে যাবে। অস্তর অসমান হয়ে কোথাও কোথাও শুকিয়ে গেলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ শুক্‌না অস্তরে ও ভেজা জায়গায় রং লাগানোর মত রং ধরবে না। নীচে হতে সুরু ক'রে উপরে শেষ করাতে অস্তর সমান ভিজে থাকবে। শেষে লাগানো অস্তরের জল নীচে চুইয়ে এসে তলার দিক অনেকক্ষণ ভিজে রাখবে।

অস্তর দেয়ালে সমান হয়ে লাগানো হ'লে কোপা (পিটুলি) দিয়ে সারা জায়গা ধরে অথচ দ্রুতগতিতে পিটে যেতে হবে, লক্ষ্য রাখবে কোথাও বাদ না পড়ে। পিটার কাজ দ্রুত শেষ করলে আঁকার কাজ আরম্ভ শীঘ্র করা যাবে। অস্তর যতক্ষণ ভিজা থাকবে ততক্ষণ কাজের মেয়াদ জানবে। শুকালে কাজ বন্ধ করতে হবে। পিটা শেষ হ'লে যদি অস্তর উঁচু নীচু হয়ে পড়ে আবার একবার উসো দিয়ে সমান করে দিবে। অস্তর লাগানোর সব কাজটাই সাধারণ চূণবালি লাগানোর মত, তফাৎ হচ্ছে ত লাগাতে উপর হ'তে জলছিটা দেওয়া চলবে না, আর বালি লাগানো হ'লে কোপা দিয়ে সারা জায়গা পিটে দিতে হবে। কোপা দিয়ে ভাল করে পিটা হলে অস্তরটার উপর ভিজা ভিজা লাগবে, একটু অপেক্ষা করে কাজ সুরু করলেই হবে। বেশী ভিজে উঠলে পরিষ্কার পুরণো কাপড় দিয়ে জলটা শুষে নেবে।

রং তৈয়ার করার নিয়ম

সব রংই গুঁড়া চাই। সব রং দিয়ে চূণবালির উপর আঁকা চলে না। কতকগুলি রং চূণের তেজে দু-চারদিনে খেয়ে যায়। পাথুরে রং ও মাটির রংই প্রশস্ত। রাসায়নিক রং—যেমন নীল, ইত্যাদি। জান্তব রং আলতা ইত্যাদি; ধাতব সিন্দুর ইত্যাদি, এই সব রং চূণে খেয়ে যায়।

ফ্রেস্কোর যা যা রং আমরা ভারতবর্ষেই পাই, তার নাম নিয়ে একটি তালিকায় দিলাম।

১। গেরি—লাল গেরি বা সোনাগেরি, মেটেগেরি। সোনাগেরি মাদ্রাজে পাওয়া যায়।

২। এলামাটি (yellow ochre)—বেশ উজ্জ্বল দেখে নেবে।

৩। সবুজ পাথর (হরা পাথর—জয়পুরে পাওয়া যায়)।

৪। ভুষাকালি, হাড়পোড়া কয়লা, সাধারণ কয়লা।

৫। নীলা পাথরের গুঁড়া (লাজবর্দ)

৬। পোড়া মাটির রং (Burnt Sienna) জয়পুরে পাওয়া যায়।

ফ্রেস্কোর উপযোগী রং তৈয়ার করতে গেলে যতটা গুঁড়া রং ততটা গুঁড়া চূণ একসঙ্গে মিশিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে চিনেমাটির বা মাটির বাটিতে সাজিয়ে রাখ। যতটা রং কাজে লাগবে ততটা একটা চামচে ক'রে ভিন্ন চিনেমাটির বাটিতে নিয়ে যতটা রং তার পাঁচ ছয় গুণ জল মিশাও। রং গুলে দিলে জল উপরে থিতিয়ে থাকবে।

ফ্রেস্কোতে ঘন রং (পাতলা ক্ষীরের মত) লাগে না, পাতলা ঝোলের মত লাগে। কাজ করবার সময় একটা কাঠি দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুলিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক রঙের কিছু কিছু নমুনা ভিন্ন বাটিতে বা ছোট ছোট শিশিতে বন্ধ ক'রে রাখা চাই। ঐ দেখে ছবির গায়ের রং ধার্য্য হবে, শুক্‌না নমুনা রঙের শিশির গায়ে একটা নম্বর থাকা চাই, সেটা আবার ঐ রঙের ভিজা বাটির গায়ে লেখা থাকবে। কারণ রং ভিজান হ'লে সেটা কি রং আর চিন্‌বার উপায় থাকবে না।

তুলি—তুলি নরম লোমের ভাল। ইহাতে বালির উপরে রং লাগাবার সময় বালি না ঘাঁটিয়ে রং লাগানো যায়। বিলাতি "সেবেল" লোমের তুলি ভাল, জাপানি বা চীনা তুলি আরও ভাল। একটি দেড় ইঞ্চি চওড়া চেপটা তুলি ছবির জমি করবার পক্ষে ভাল, তা না পেলে একটি মোটা ক্যামেল্ লোমের তুলি হ'লে চলবে। আর দু কড়ে আঙুলের মত মোটা সেবেল লোমের তুলি এব তিন নম্বরের লম্বা লোমওয়ালা সেবেল লোমের তুলি লাইন টানবার জাপানি তুলি। ঐ সঙ্গে খানিক পরিষ্কার পুরনো কাপড় রাখবে। আঁকবার সময় হাতে রাখবে। মাঝে মাঝে তুলি পুছবার দরক হবে।

ছবি আঁকা—প্রথমে একটি পুরু কাগজের উপর ছবি রেখাপাত (outline drawing) ক'রে পরে একটি চ পুরু নরম কাপড়ের উপরে নক্‌সাটা (drawing) বিছি একটা সরু ছুঁচ খাড়াভাবে ধরে রেখাগুলি ছিদ্র ক ফেল। অবশ্য এই ছিদ্র-করা কাগজ ফ্রেস্কোর জমি তৈয় করবার পূর্ব্বে তৈয়ার থাকা চাই। এখন তৈয়ার-ক জমির উপর দুজনে ঐ ছিদ্রকরা কাগজটি যথাস্থা লাগিয়ে একটি সবুজ রঙের গুঁড়ার একটা পাতলে কাপ ছোট পুটুলি বেঁধে কাগজের ছিদ্র-করা রেখার উপর দিয়ে দিয়ে ড্রয়িংটা দেয়ালে তুলিয়া লও। সাবধা ছিদ্রকরা কাগজটা সরে না যায়।

রং লাগান—রং লাগাতে গেলে প্রথমে দেখ হবে বালির অস্তরটির উপর তুলি করে রং দিলেই সে ব্লটিং কাগজের মত শুষে নিচ্ছে কি না। অস্তরের এই গ্রহণ করবার অবস্থাটি ধরা দুএকটি দেয়ালে ছবি আঁক বেশ পরিষ্কার বুঝা যাবে, বলে বুঝানো বড় শক্ত। বালি এইরূপ অবস্থা যতক্ষণ থাকবে শিল্পী রং লাগাতে ব আনন্দ পাবে।

রং লাগানো সব সময়ই হালকা রং হতে সুরু ক'রে রং করতে হবে। সময় সময় একটি রঙের উপর অ একটি রং লাগিয়ে রং মিশিয়ে ভিন্ন রং করা যায়। এক চওড়া রঙের জমি একেবারেই যদি তুলি দিয়ে সমান লাগানো যায় তবে ফোঁটা বা হ্যাঁচকা লাইন দিয়ে চোস্ত করে নিতে হবে। একটা জায়গায় রং লাগা হ'লে তখনই সেটির উপর আবার রং নাও ধরতে পা ততক্ষণ অপর জায়গায় কাজ সেরে বালি আবার লাগাবার উপযুক্ত হলেই পূর্ব্বের জায়গায় কাজ করতে হবে।

ফ্রেস্কো আঁকতে গেলে শিল্পীর তুলি-চালনার কৌশল ভাল জানা থাকা আবশ্যক। তা না হ'লে তুলি অযথা ঘসড়ানোর দ্বারা বালির গা ঘোলা ঘোলা দেখাবে। ভাল পোঁচ দিয়ে আঁকা অভ্যাস থাকলে বালির গায়ে রেশমি কাপড়ের জলুস হবে। অনেক সময়ে একই তুলিতে দুটা রং নিয়ে কাজ করা যাবে। যেমন একটা মোটা সূক্ষ্মাগ্র তুলি পাতলা হলদে রঙে ভরে সেই তুলির ডগায় অল্প মোটা লাল রং লাগিয়ে টান দিলে দুটো রঙের বেশ মিলান হয়। ইহাতে রং ভুল লাগালে বদলান যায় না। পুঁছলে খানিকটা উঠে যায় বটে, কিন্তু ইহাতে বালিটা ঘসে যায় ব'লে বড় অপরিকার দেখায়। সেজন্য দৃঢ়হাতে একমনে কাজ করা উচিত। ব্যস্ত হ'লে ছবি নষ্ট হ'তে পারে, এমন কি ছবিতে ভুলক্রমে বা হঠাৎ যদি কিছু রং পড়ে যায় সেইরূপ রেখে দেওয়া পদ্ধতি। ছবিতে যে রঙের পোঁচ একবার লাগাবে সেটা দ্বিতীয়বার বদল করা মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হবে। সেইজন্য যিনি দেয়ালের উপর সোজাসুজি ভেবে রং না দিতে পারবেন তাঁকে পূর্ব্ব হ'তে ঐ সব রঙের একটা খসড়া তৈয়ার করতে হবে, এবং সেটা সামনে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। উপস্থিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কন-পদ্ধতি ফ্রেস্কোর উপযোগী মনে হয় ও চীনা-পদ্ধতি অনুসারে পোঁচ দিয়ে আঁকাও বেশ হয়। সাদা রং লাগাবার পর মোটে সাদা দেখায় না; তবে একটু শুকালে বুঝা যায়। সেজন্য সাদার মিলান শিল্পীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করছে। যদি কোথাও বিশেষ ভুল হয়ে পড়ে তবে সেই জায়গাটার অল্প বালি তুলে নূতন বালি লাগিয়ে কাজ করা ভাল। একটু বালির জোর থাকলে তত মারাত্মক নয়।

কাজের সময়—বর্ষার সময় অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলে। গ্রীষ্মের সময় খুব ভোর ছটা হ'তে কাজ সুরু ক'রে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাজ বেশ চলে। কাজ করতে করতে ছবি ছেড়ে বেশীক্ষণ যাওয়া মোটে চলে না। একলাগাড় কাজ করা চাই। বিশেষ দরকার পড়লে একটা মোটা কাপড় ভিজিয়ে নিঙড়ে অস্তরের উপর ঢাকা দিয়ে রাখলে মিনিট দশ-পনের অপেক্ষা করা চলে। সকাল ছটা হ'তে কাজ সুরু করতে হলে সাড়ে চারটা, পাঁচটা হ'তে বালির কাজ আরম্ভ করতে হবে। খুব ভরাট মিলান কাজ করতে হলে অল্প দেড়-দুই, ফুট জায়গাই একদিনের পক্ষে ভাল। ছবির একটি একটি জোড়ের মাথা অনুযায়ী বালি লাগানো ভাল। কারণ পরের দিনের কাজের সঙ্গে অল্প তফাৎ হওয়ায় একটা জোড়ের দাগ হয়ে পড়বে। এই ফ্রেস্কো পদ্ধতি আধুনিক ফ্রান্সের শিল্পী শ্রীযুক্ত Saint Hubert-এর নিকট হ'তে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী শিক্ষা করে আসেন, এবং আশ্রমের শিল্পীদের মধ্যে ইহার প্রচলন করেন।

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব (অংশ)

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব (অংশ)

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব (অংশ)

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৪৫)

চায়ের সব ব্যবস্থা করিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিতেছিল। হলঘরে নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল, "মেজদা, চায়ের জল এনেছে, তুমি যাও, আমি মায়াকে জিগ্‌গেষ করে আসি সে নীচে এসে খাবে, না উপরে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মায়া ত উপরে নেই, বাগানে বেড়াচ্ছে।"

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা একলা আবার কি করতে গেল? যা ত মেয়ের শরীর, কখন কি হয় তার ঠিকানা নেই।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "একলা যায়নি, দেবকুমার তার সঙ্গে গিয়েছে।"

ইন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে ডাকব না ওদের এখন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ডাক, একটু চা-টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিক। দেবকুমার এখন যেন চলে না যায়, তাকে দুপুরে এখানেই খেতে বোলো।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা।" সে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে চলিল। যাক্, মায়ার জ্ঞানবুদ্ধি যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন মানে মানে বিবাহাদি হইয়া আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলেই রক্ষা। যা সৃষ্টিছাড়া অসুখ, কখন কি যে হয় তাহার ঠিকানা নাই।

বাগানের মাঝামাঝি গিয়া সে মায়া এবং দেবকুমারের দেখা পাইল। তাহারা তখন বাড়ির দিকেই আসিতেছিল। ইন্দুকে দেখিয়া দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি পিসীমা, আমাদেরই খোঁজে আসছেন না-কি?" মায়ার মুখ বিষণ্ণ, গম্ভীর, সে কোনো কথা বলিল না।

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, চা খেতে ডাকতে আসছিলাম। আর দেখ বাবা, তুমি দুপুরেও এখানে খাবে, মেজদা বিশেষ করে আমায় বল্‌তে ব'লে দিলেন।"

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, তাহলে চা খেয়ে একবার শহর ঘুরে আসতে হবে, না হ'লে বাবা আবার বেশী ভাব্‌বেন। মায়ার খবরটাও তাঁকে একটু দেওয়া উচিত।"

মায়ার বিষণ্ণমুখে একটু যেন হাসির আভাস দেখা দিল। সে উপরে যাইবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া, দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি যাও ডাইনিং রুমে, আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আস্‌ছি।"

মায়া উপরে উঠিয়া যাইতেই ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ার সব কথা মনে পড়েছে ত বাবা?"

দেবকুমার বলিল, "হ্যাঁ তা পড়েছে, তবে যতদিন অসুস্থ ছিলেন, সে অবস্থায় কি বলেছেন, কি করেছেন, ভেবে বড় বেশী দুঃখ পাচ্ছেন।"

ইন্দু খাইবার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "সব কথা ওকে না বললেই হ'ল।"

দেবকুমার বলিল, "না শুনে যে ছাড়েন না, সেই ত হয়েছে মুস্কিল। যদি বল্‌তে না চাই, তাহলে সত্যি যা ঘটেছে তার দশগুণ কল্পনা ক'রে নিয়ে আরও বেশী ঘাবড়ে যান।"

মায়া উপরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া চুল বাঁধিয়া আবার নামিয়া আসিল। হলে আসিয়া দেখিল একতলার একটা ঘর হইতে বাক্স, বিছানা প্রভৃতি বাহির করা হইতেছে। কাহার জিনিষ বুঝিতে না পারিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কার জিনিষ রে?"

চাকর বলিল, "সেই যে প্রভাসবাবু ছিলেন, তাঁর।"

প্রভাসের কথা এতক্ষণ মায়া ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই ত, প্রভাস যে এখানে আছে, কিন্তু তাহাকে একবারও যে দেখা গেল না? একটু বিস্মিত হইয়াই সে

জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তার জিনিষপত্র বার ক'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?"

চাকর বলিল, "সাহেব সব মাল জাহাজঘাটে পৌঁছে দিতে বললেন।"

স্মৃতিলোপ হওয়ার পর প্রভাস এবং মায়ার ভিতর কি যে ঘটিয়াছিল, তাহা দেবকুমার মায়াকে কিছুই বলে নাই। শুনিলে মায়া অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জা পাইবে মনে করিয়াই বলে নাই। সুতরাং এইভাবে প্রভাসের চলিয়া যাওয়ার কোনো অর্থই সে খুঁজিয়া পাইল না। সে আসিয়াছিল, মায়ার সহিত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ করিতে, এতদিন মায়ার অসুস্থতার জন্য কিছু কাজ হয় নাই, সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াই ছিল। কিন্তু যেই মায়ার জ্ঞান, পূর্ব্বস্মৃতি সকলই ফিরিয়া আসিল, অমনি সে এমন অদ্ভুতভাবে পলায়ন করিতেছে কেন? মায়া একেবারেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু চাকরবাকরকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না, সুতরাং সে খাইবার ঘরেই গিয়া ঢুকিল।

নিরঞ্জন এবং দেবকুমার তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই বসিয়া ছিলেন। ইন্দু চায়ের পেয়ালাগুলিতে চিনি দিতেছিল। মায়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "পিসীমা, তুমি যাও, স্নান পূজো কর গিয়ে, নইলে ত জল মুখে দেবে না। আমি চা দিচ্ছি।"

ইন্দু চলিয়া গেল। মায়া নিপুণ অভ্যস্ত হস্তে চা পরিবেশন করিতে বসিয়া গেল। নিরঞ্জন হাসিয়া বসিলেন, "আজ আমার মায়ের 'অনারে' দু পেয়ালা চা খাব।"

মায়া বলিল, "তা খাও, আমারও নিজের 'অনারে' অনেক বেশী পেয়ালা খাওয়া উচিত, মাসখানেক ত খাইনি শুনছি।"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "শুধু নিজে যে খাওনি তা নয়, অন্যদেরও খাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছিলে।"

মায়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, প্রভাসদার জিনিষপত্র জাহাজঘাটে নিয়ে যাচ্ছে কেন? তিনি রাতারাতি গেলেন কোথায়?"

নিরঞ্জন একটু বিপদে পড়িয়া গেলেন। প্রভাস সম্বন্ধে সব কথা তিনি অন্তত মায়াকে খুলিয়া বলিতে পারেন না। অথচ সব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে, তাহার মনে একটা সংশয় এবং অশান্তি থাকিয়াই যাইবে। কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া, শুধু বলিলেন, "তাকে হঠাৎ চলে যেতে হ'ল, জিনিষ নিয়ে যেতে পারেনি, তাই সেগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত হঠাৎ যেতে হ'ল যে জিনিষও নিতে পারলেন না? কেন বাবা?"

নিরঞ্জন বিব্রতভাবে দেবকুমারের দিকে তাকাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "রোসো মা, আমি আগে চাকরটাকে ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তারপর তোমার কথার উত্তর দেব।" তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

দেবকুমার নিজের চেয়ার ছাড়িয়া মায়ার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার একখানা হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার বাবাকে কিছু জিগ্‌গেষ কোরো না লক্ষ্মী, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলব। ওঁকে জিগ্‌গেষ করলে শুধু শুধু অপ্রস্তুত করা হবে, উনি ত তোমায় সব খুলে বল্‌তে পারবেন না?"

মায়া ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এর ভিতরও কিছু মিস্‌ট্রি আছে নাকি?"

দেবকুমার তাহার ভয় দেখিয়া সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চল, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসা যাক। অমনি ভয়ে আধমরা হয়ে গেলে? তোমরা না পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি কর? অত ভয় পেলে কি কাজ করা যায়?"

মায়া বলিল "কেস্‌টা যে মোটেই সাধারণ নয়, কাজেই এখানে সাধারণ আইন খাটে না।"

দেবকুমার কথার উত্তর না দিয়া লাইব্রেরীর দিকে চলিল। মায়াও অগত্যা উঠিল, চাকরকে চায়ের বাসন উঠাইয়া ফেলিতে বলিয়া সেও দেবকুমারের পিছন পিছন আসিয়া লাইব্রেরীতে ঢুকিল। দেবকুমার তখন টেলিফোন করিতে ব্যস্ত, ইঙ্গিতে মায়াকে বসিতে বলিল।

মায়া একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া কাগজ উল্টাইতে

লাগিল। দেবকুমারের কনেকশান পাইতে দেরি হইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় 'ফোন্' করছ?"

দেবকুমার বলিল, "বাবার কাছে। প্রথমে ভেবেছিলাম একবার গিয়ে সব বলে আস্‌ব। কিন্তু তোমায় একলা রেখে যেতে এখন আর ভরসা হচ্ছে না। ভয়টয় পেয়ে এক কাণ্ড করে রাখবে।"

মায়া ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাওয়া যদি অদৃষ্টে থাকে তাহলে কি আর তুমি আটকাতে পারবে?"

দেবকুমার টেলিফোনে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই তাহার কথার উত্তর দিল না। বাহিরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল, মায়া বুঝিল প্রভাসের জিনিষপত্র রওয়ানা হইয়া গেল। প্রভাসকে লইয়া না-জানি আবার কি জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

দেবকুমার কাজ সারিয়া আসিয়া ইজিচেয়ারটার হাতের উপর বসিয়া বলিল, "এর পর সুরু করতে পার। কিন্তু প্রথমেই ব'লে রাখ্‌ছি আজ কিছু নিয়ে মন খারাপ করতে পারবে না। আজ আমাদের জীবনে সব চেয়ে আনন্দের দিন।"

মায়া বলিল, "আনন্দ কি নিরানন্দ তা এখনও ঠিক হয়নি।"

মায়ার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দেবকুমার বলিল, "অনেকক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে, যখন আমায় চিন্‌তে পেরেছ, তখনি।"

মায়া তাহার হাতের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা। কিন্তু আমি যা জান্‌তে চাই তা আমায় পরিষ্কার করে বল। আমার মন খারাপ হ'তে পারে ব'লে কিছু লুকিও না।"

দেবকুমার বলিল, "সব জানা এমনিই কি দরকার মায়া? দুজনে দুজনকে ফিরে পেয়েছি, দারুণ দুঃখের পরে, এইটুকু জানাই কি যথেষ্ট নয়? আজকের দিনটা কি যত দুঃখকষ্ট আর সংশয়ের কাহিনী শুনেই নষ্ট করতে চাও?"

মায়ার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবকুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে মায়ার মুখ তুলিয়া লইয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "ও কি মায়া? ফের চোখে জল? তাকাও দেখি আমার দিকে?"

মায়া অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেবকুমার তাহার চেয়ারের সামনে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহাকে নিজের বাহুবন্ধনে টানিয়া আনিল, তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "এইবার কাঁদ দেখি কেমন কাঁদবে? আমাকে যা কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্ছ তুমি, তা আর কি বলব? কেবল কান্না আর কান্না। যেন আমায় মনে পড়ে যাওয়াটা ভারী একটা ক্যালামিটী হয়েছে। ভুলে থাকলেই ছিল ভাল, না?"

মায়ার চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কোনো অবস্থায় তুমি সিরিয়াস্ হতে পার না, না? কি রকম যে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেল, সেটাকে তুমি হেসেই উড়িয়ে দিতে চাও? এ বিষয়ে ভাববার কিছু নেই?"

দেবকুমার বলিল, "ভাববার সময় ত চলে যাচ্ছে না। আজই সব ভাবনা ভেবে শেষ করতে হবে?"

মায়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "না লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করো না। সমস্ত ভাল করে না শুন্‌লে আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসছে না। আমার এতখানি আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন একটা ছায়া পড়ে রয়েছে।"

দেবকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বল্‌ছি। তোমাকে বলাই ভাল। সত্যি যা হয়েছে তার দশগুণ ভেবে বসে থাকবে তা না হ'লে। প্রভাসের এখান থেকে চলে যাওয়ারই কথা ছিল, জাহাজের টিকিটও কেনা হয়েছিল বোধ হয়। কিন্তু কাল রাত্রে একটা গোলমাল হওয়ায়, সে কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় চলে গিয়েছে। তোমার বাবা আন্দাজ করছেন যে সে ষ্টীমার ধরতেই যাবে, সেজন্য তার জিনিষপত্র হোয়ারফে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাত্রে কি গোলমাল হয়েছিল? আমাকে নিয়ে ত?"

দেবকুমার একটু ভাবিয়া বলিল, "বলতে হ'লে, সবটাই

বল, ভাল। তোমাকে লেকের ধার থেকে অজ্ঞান অবস্থায় আমি নিয়ে আসি, তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু সেখানে তুমি একলা ছিলে না, প্রভাসও ছিল।"

মায়ার মুখ শাদা হইয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দুজনেই আমরা লেকের ধারে গেলাম কি করে? আমাকে ত সারাক্ষণ আট্‌কে রাখা হ'ত, না?"

দেবকুমার বলিল, "একটু কোনো ফাঁকে ছাড়া পেয়েছিলে বোধ হয়। প্রভাসের সঙ্গে দেখা করতে তুমি ভয়ানক ইগার ছিলে, সেইজন্যেই প্রভাসকে তোমার বাবা চলে যেতে বলেছিলেন। আমি অবশ্য তাঁকে এ বিষয়ে আগে কয়েকটা কথা বলেছিলাম।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিলে? আমি সব ভাল করে বুঝতে পারছি না।"

দেবকুমার আবার আসিয়া মায়ার চেয়ারের হাতের উপর বসিল, বলিল, "ডিলিরিয়াম-এর অবস্থায় ত মানুষ খুন পর্য্যন্ত করতে পারে। তুমি তখন যা বলেছ বা করেছ, সেগুলোকে পাগলের প্রলাপের চেয়ে বেশী ইম্‌পরট্যান্স দেবার কোনো দরকার নেই। প্রভাস হয়ত গোড়ার থেকেই তোমাকে ভালবাসত, কিন্তু তুমি তা জানতে না। এখানে অসুস্থতার মধ্যে হঠাৎ তোমার মন খানিকটা তার দিকে গিয়েছিল ব'লে বোধ হ'ত। সে সেটারই এডভানটেজ নিচ্ছিল ব'লে মনে হওয়াতে আমি তোমার বাবাকে সে কথা বলেছিলাম। তাতেই তিনি প্রভাসকে চলে যেতে হিণ্ট দেন। ওকি মায়া, ফের?"

মায়া দেবকুমারের কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবকুমার তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া বলিল, "যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে কেন এত দুঃখ পাচ্ছ, লক্ষ্মী আমার? আর প্রভাস ত চলে গেছে, তার কাছেও কিছু তোমায় লজ্জা পেতে হবে না।

মায়া বলিল, "এত বড় দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে আর কোনো মানুষের হয়েছে ব'লে কখনও আমি শুনিনি। প্রভাসকে যতদূর জানি, পজিটিভলী অন্যায়, এমন কিছু সে নিশ্চয়ই করেনি। আমাকে ভালবাসত বলেও আমার কোনো-দিন মনে হয় নি। কিন্তু আমি ত মানুষ ছিলাম না তখন কি যে বলেছি, কি যে করেছি, তা ভাগবানই কেবল জানেন।"

দেবকুমার বলিল, "তবে তাঁর হাতেই বিচারের ভার ছেড়ে দাও না? মানুষে তোমায় দোষী করবে না, করবার অধিকার তাদের নেই। বিশেষ কিছু করবার বা বল্‌বার কোনো সুবিধাও তুমি পাওনি। সে থাকত নীচে, তুমি থাকতে উপরে, এবং তোমায় সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হ'ত। দু-একটা কথা যা বলেছ, তাও অন্যদের সামনে।"

মায়া বলিল, "লেকের ধারে আমি একলাই গিয়েছিলাম ত?"

দেবকুমার বলিল, "তা অবশ্য গিয়েছিলে, কিন্তু সেও ক' মিনিটের জন্যেই বা? তুমি বাড়িতে নেই জান্‌তে পারবামাত্র মোটরে ক'রে তোমায় খুঁজতে বেরনো হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমায় পাওয়া যায়। তোমাকে আমি ডাকাতে, তুমি ভয় পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে। তোমাকে তুলে আন্‌লাম, কিন্তু প্রভাসের আর তখন খোঁজ রাখতে পারিনি। রাগের মাথায় তাকে যা মুখে আসে, দুচার কথা বলেছিলাম, এখন তা মনে ক'রে কষ্ট হচ্ছে।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেচারা প্রভাসদা। More sinned against than sinning. কিন্তু সিন্-ই বা এর মধ্যে কার? শাস্তি পেলাম ত সকলেই, কিন্তু অপরাধটা কোন্‌খানে?"

দেবকুমার বলিল, "অপরাধ কারও নয়। নির্ব্বুদ্ধিতা যদি অপরাধ হয়, তা হ'লে প্রভাসের অপরাধ আছে জেলাসি যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমারও কিছু অপরাধ আছে। কিন্তু রোগ যেটা সেটা অপরাধ কিছুতেই হতে পারে না, সুতরাং তুমি কেন মন খারাপ করছ?"

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "জগতের নিয়ম। এখানে একের দোষে অন্যে দণ্ড চিরকাল পায়। খানিকটা পাওয়া হয়ে গেছে, আরও বোধ হয় অনেকটা বাকি আছে।"

দেবকুমার আবার তাহাকে নিজের আলিঙ্গনে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আর দণ্ড তোমাকে আমি কিছুতেই পেতে দেব না। ভালবাসার কি কোনো ক্ষমতাই নেই তুমি মনে কর?"

মায়া তাহার বক্ষে মাথা রাখিয়া বলিল, "আত্মহত্যাও ত মানুষে করে? আমি যে নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই আবার ডেকে আনব না তা কে বল্‌তে পারে?"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চিত করে জগতে কিই-বা বলা যায়? তবু ত মানুষ এখানে হাসে খেলে, ঘর বাঁধে, সংসার করে। ভিসুভিয়াসের নীচেই বাড়ি করে কি মানুষ থাকে না? যে বিপদ নাও ঘটতে পারে, তার ভয়ে আঁৎকে থাকলে কি মানুষ বাঁচতে পারে?"

মায়া বলিল, "যাক্ গে। আজকের মত ঢের শুন্‌লাম। এখন প্রভাসদা বেচারার কোনো একটা খবর পেলে বাঁচা যায়। তার কিছু অনিষ্ট হ'লে, আমি কোনো জন্মে সে কথা আর ভুল্‌তে পারব না।"

দেবকুমার বলিল,"অনিষ্ট হ'তে যাবে কেন? সে রকম মাথা-পাগলা ত তাকে লাগত না? আমার মনে হয় সে দেশেই ফিরে যাচ্ছে।"

মায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই যেন হয়। তুমি একটু বোসো। আমি কাল রাত থেকে মোটে রেস্ট পাইনি। স্নানটান করে একটু রিফ্রেশড্ হয়ে নিতে হবে।"

দেবকুমার বলিল, "আমিও তবে সেই চেষ্টাই দেখি।"

(৪৬)

কতকগুলি দিন একই ভাবে প্রায় কাটিয়া গেল। বাড়ির সবাই আনন্দে দিশাহারা, কিন্তু মায়ার মনে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছিল। আনন্দ করিবার মত জোর সে মনের ভিতর কিছুতেই পাইতেছিল না। ভবিষ্যতের দিকে যতই সে তাকাইত, মনে হইত, দারুণ একটা বিভীষিকা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একবার মায়া তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু সেই মহাভয় যেন তাহার জীবনপথে ব্যাঘ্রীর মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সুবিধা পাইলেই আবার অতর্কিতে আক্রমণ করিবে। ইহার করাল কবল হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন মায়ার নিষ্কৃতি নাই।

প্রভাসের জিনিষপত্র সেদিন জাহাজঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কোনো খোঁজ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। জিনিষগুলি নিরঞ্জন তাঁহার এক কলিকাতা-যাত্রী বন্ধুর মারফতে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেখান হইতে কেহ-না-কেহ সেগুলি গ্রামে পৌছাইয়া দিবে।

প্রভাসের খবর না পাওয়াতে মায়া আরও মুষড়াইয়া গিয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে এবং নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে, সে একটি মানুষের জীবনের সব সুখশান্তি যে অপহরণ করিয়া বসিয়াছে, ইহা সে কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। ইহার চেয়ে অধিক অনিষ্টও তাহার দ্বারা ঘটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য সমস্তক্ষণ তাহার মন অস্থির হইয়া থাকিত। এই সকল কথা লইয়া দেবকুমার ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে আলোচনা করাও তাহার সম্ভব ছিল না, কাজেই সন্দেহ, ভয়, সবই তাহার নিজের মনে চাপিয়া রাখিতে হইত।

মায়া কলেজ যাইতে এখনও আরম্ভ করে নাই। শরীরে বেশী পরিশ্রম সহিবে কি-না, তাহা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। সুতরাং এখনও কিছুদিন বিশ্রাম করাই ঠিক হইয়াছিল। রেঙ্গুনে শরীর ভাল না থাকিলে নিরঞ্জন তাহাকে লইয়া চেঞ্জে যাইবারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দু মধ্যে মধ্যে দেশে ফিরিবার কথা তুলিত, কিন্তু কোনো আমল পাইত না। নিরঞ্জন বলিয়াই রাখিয়াছিলেন, "আমার মা-লক্ষ্মীর বিয়ের আগে আর কোথাও নড়তে পারছি না। মেয়ে সামলাতে গিয়ে আমার কাজকর্ম্ম সব রসাতলে যেতে বসেছে।"

সেদিন সকালে মায়া লাইব্রেরীতে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিল। এই ঘরটি সব চেয়ে নিরিবিলি, সুতরাং এইটিই তাহার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। দেবকুমার আসিলেও সোজা এই ঘরে আসিয়া ঢুকিত।

ইন্দু মাঝে আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, বাণীর আইবুড়-ভাতের নেমন্তন্নে যাবি না-কি?"

মায়া বলিল, "না বাপু, কোথাও যাবার মত মন বা শরীর কিছুই আমার নেই।"

ইন্দু বলিল, "শোন কথা। একবার অসুখ করেছিল ব'লে এ জন্মে তুই আর বাইরে মুখ দেখাবি না?"

মায়া বলিল, "নাই বা দেখালাম? আমার মুখ না দেখালেও জগতের লোকের বেশ চলে যাবে।"

ইন্দু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল দেবকুমার। একটু হাসিয়া দেবকুমারকে সম্ভাষণ করিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দেবকুমার আসিয়া মায়ার সামনের টেবিলটার উপর চড়িয়া বসিল। বলিল, "জগতের অন্য লোকদের কথা বলতে পারি না, তবে একজনের কথা বলতে পারি যার তোমার মুখ না দেখলে কিছুতেই দিন কাটতে চায় না।"

মায়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা তাঁকে দেখা দেবার জন্যে ত আমাকে তাঁর বাড়ি যেতে হয় না, তিনিই এসে দেখা দিয়ে যান।"

দেবকুমার মায়ার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "চিরকাল তাঁকেই আসতে হবে? আপনি কখনও কি গিয়ে তাঁর ঘর আলো করবেন না?"

মায়া একটু গম্ভীর হইয়া গেল। কথা ঘুরাইবার জন্যই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভাসদার কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না?"

দেবকুমার বলিল, "আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার প্রভাসের কথা মনে হয়? আমাকে ত বেশ পরিষ্কার ভুলে যেতে পেরেছিলে, তাকে কি কিছুতেই ভুলতে পার না? সেই দেখছি আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান।"

মায়া মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন ওরকম বাজে কথা বল? সে বেচারা বেঁচে আছে কি না তাও জানা গেল না, তার জন্যে ভাবনা কি হয় না?"

দেবকুমার বলিল, "কি জ্বালা! এত ক'রে রসিকতার আর্টটাকে শান দিয়েছি, তুমি সেটাকে যে একেবারে মর্চে পড়িয়ে দিতে চাও? মুখ ভার ক'রো না আবার। প্রভাসের খবর কিঞ্চিৎ পাওয়া গিয়েছে, তাই ত এত সকাল সকাল হাজির হলাম।"

মায়া উৎসুকভাবে বলিল, "কি খবর বল না? ভাল খবর ত? সে কোথায় আছে?"

দেবকুমার এক লাফে টেবিল হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিল, "রোসো, রোসো! একসঙ্গে কত কথার উত্তর দেব? খবর ভালই, সে বেঁচে আছে এবং আকিয়াবে আছে।"

মায়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "হঠাৎ আকিয়াবে গিয়ে উঠল কি করতে?"

দেবকুমার বলিল, "তারও বোধ হয় তোমার মত পরিচিত জগতে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে নি, তাই কলকাতার জাহাজে না চড়ে, চাটগাঁয়ের জাহাজে গিয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে আমায় একখানা চিঠি লিখেছে, আজ সকালে পেয়েছি।"

মায়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমাকে কেন, এত লোক থাকতে?"

দেবকুমার বলিল, "সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে ব'লে। একজন ব্যর্থ প্রেমিকের মনোবেদনা আর একজন ব্যর্থ প্রেমিকই ভাল বুঝবে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ব্যর্থ প্রেমিকই বটে, কোনো কিছুতেই ব্যর্থ হওয়া তোমার কুষ্ঠিতে লিখেছে কি-না?"

দেবকুমার বলিল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কোনো কিছুতে সত্যিই যেন আমি ব্যর্থ না হই।"

মায়া বলিল, "তা ত হ'ল। এখন প্রভাসদার খবর কি বল ত?"

দেবকুমার বলিল, "আমার চিঠিটাতে যা খবর আছে তা ত দিলাম। সে আকিয়াবে সশরীরে আছে, এবং সেখানেই কিছুকাল থাকবে বোধ হয়। তবে আর একখানা চিঠি খামটার ভিতর এনক্লোজ করা ছিল, সেটা শ্রীমতী মায়ার নামে। তুমি যদি সুস্থ থাক এবং আমি যদি ভাল মনে করি, তাহলে সেটা তোমায় দিতে বলেছে। একবার ভাবলাম চিঠিটা গাপ্ করি, কিন্তু শেষ অবধি দিয়েই দিচ্ছি। আশা করি এতখানি বদান্যতার পুরস্কার পাব।"

মায়া উত্তর না দিয়া চিঠির খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রভাস লিখিয়াছে—

'মায়া,

তুমি আগে যেমন ছিলে, আবার তাই হ'তে পেরেছ, এই আশা নিয়ে আমি চিঠি লিখছি। দুর্ভাগ্য তোমাকে আর আমাকে কাছাকাছি টেনে এনেছিল, যদি ভগবানের কৃপায় সে দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে তোমার জীবনে আমার আর কোনো স্থান নেই। পৃথিবীতে আমার পরমতম সৌভাগ্যকে একদিন তোমার কঠিনতম দুঃখের মূল্যে পেতে চেয়েছিলাম, আজ সেই মহাপাপের শাস্তি ভোগ করছি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ শাস্তি আমার চল্‌বে, এই মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কোরো। দেশ, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, সব আমি ছাড়লাম, এই প্রায়শ্চিত্তের জন্যে। রাহুর মত অল্পক্ষণের জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম। আমি সরে গেলাম। তোমার অদৃষ্ট সকল দিক দিয়ে সুপ্রসন্ন হোক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

প্রভাস।'

মায়া চিঠিখানা দেবকুমারের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

দেবকুমার পড়িল, বলিল, "আমাকে আনচ্যারিটেবল ভেবো না, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য ছেলেটি অত্যন্ত নিউরটিক। একটা কমনসেন্স ভিউ নিলে ত পারত? একেবারে সব ছেড়েছুড়ে পালাবার কি দরকার ছিল? মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে, সে-গুলো আবার কালে তারা ভুলেও যায়।"

মায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "এমন জিনিষও ঘটে, যা কোনো দিন ভোলা যায় না।"

দেবকুমার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "পাগলামি ক'রো না, কেন ভুলতে পারবে না, নিশ্চয় পারবে।"

মায়া উত্তর দিল না। একটু পরে দেবকুমারের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

দেবকুমার ঘরের ভিতর মিনিটখানেক পায়চারি করিয়া বেড়াইল, তাহার পর মায়ার কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "মায়া, আমার একটা কথা রাখবে?"

মায়া বলিল, "বল কি কথা? রাখতে চেষ্টা করব।"

দেবকুমার বলিল, "তোমাকে আমি একেবারে নিজের ব'লে জান্‌তে চাই। আর দেরি আমি সহ্য করতে পারছি না। এতে তোমারও অনিষ্ট হচ্ছে, ব্রুড করবার বড় বেশী সময় পাচ্ছ। একবার ধরা দাও, তখন আর দুর্ভাবনা ভাববার এক মিনিট সময়ও আমি তোমায় দেব না।"

মায়ার মুখ আরক্ত, চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবকুমার অবনত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, তাহার দুই হাত সাদরে নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার বাবাকে বলবো মায়া?"

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "কাল সকালে আমি এর উত্তর দেব। একটা দিন আমাকে ভাববার সময় দাও।"

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, কিন্তু এত কি ভাববার আছে মায়া?"

মায়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভাববার কথা সব সময়েই থাকে।"

দেবকুমার বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মায়া উপরে চলিয়া গেল, নিজের ঘরে ঢুকিয়া প্রভাসের চিঠিখানা আর একবার ভাল করিয়া পড়িল। তাহার পর সাবিত্রীর ছবির দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, তোমার আশীর্ব্বাদ পাইনি, তা প্রথমেই বুঝেছিলাম।" সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সেদিন তাহার স্নানাহার কিছুই হইল না। ইন্দু আসিয়া ডাকাডাকি করিল, তাহার বাবা আসিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু মায়া উঠিলও না, খাইলও না। সন্ধ্যা হইতে বাগানে গিয়া বসিয়া রহিল, অনেক রাত্রে ঘরে আসিয়া শুইল।

সকাল হইতেই দেবকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দেখিল মায়া তখনও আসে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন দমিয়া গেল।

চাকর একটাকে ডাকিয়া বলিল, "দিদিমণিকে খবর দাও।"

মায়া নামিয়া আসিল। বেশভূষার কোনো পারিপাট্য নাই, মুখ মলিন, দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। দেবকুমার ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি মায়া? এমন চেহারা কেন? কি হয়েছে?"

মায়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার হবার মত সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি।"

দেবকুমার বলিল, "আমি জীবন থাকতে ছাড়ব না। আমার হাত ছাড়িয়ে যেতে তুমি পারবে?"

মায়া বলিল, "পারতে হবে। একজন মানুষের জীবন নষ্ট করেছি সে-ই যথেষ্ট হয়েছে। নিজের লোভের কাছে আর তোমাকে বলি দেব না।"

দেবকুমার মায়াকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মায়া, তাকাও ত আমার মুখের দিকে। তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে আমার উপকার করবে একথা মন থেকে বলতে পারছ?"

মায়া দেবকুমারের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইল। তাহার পর তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "বল্‌তে পারছি। কাল সমস্ত দিন সমস্ত রাত ভেবেছি, আমার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি তোমার জীবনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যা একবার ঘটে গেল, তা কি আবার ঘটতে পারে না?"

দেবকুমার ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে এমনি অপদার্থ মনে করছ যে তোমার একটু অসুখ করলেই আমি গলায় দড়ি দিতে দৌড়ব?"

মায়া বলিল, "না, তা একেবারেই মনে করি না। তোমার অবহেলাকে আমার কোনো ভয় নেই, তোমার ভালবাসাকেই ভয়। আমি জানি, আমি যতখানি ভালবাসা তোমার কাছে পেয়েছি, খুব কম মেয়ের অদৃষ্টে তা জোটে। কিন্তু এত ভালবাস্‌ছ বলেই তুমি 'সাফার' করবে ভয়ানক বেশী।"

দেবকুমার মায়ার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া গেল। তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া, অনেকক্ষণ জান্‌লা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার সাফারিং-এর জন্যে তুমি কিছুই কেয়ার ক'র না। তাহলে অনিশ্চিত একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় এমন ক'রে এমনি আমাকে বলি দিতে পারতে না। এই তোমার ভালবাসা, মায়া?"

মায়া চাহিয়া দেখিল, দেবকুমারের দুই চোখে জল চকচক করিতেছে। দারুণ বেদনায় তাহার হৃৎপিণ্ড যেন শতধা হইয়া গেল। দেবকুমারের জন্য তাহাকে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলে, হাসিমুখেই সে তাহা করিতে পারিত। তাহার চোখের জল মায়ার হৃদয়ে যেন অগ্নিশরের মত বিঁধিয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া সে দেবকুমারের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল,"আমাকে ক্ষমা কর। ও রকম ক'রে চেয়ো না আমার দিকে, তাহলে আমি আর এক দিনও বাঁচব না"

দেবকুমার তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার চোখে মুখে চুম্বন করিয়া বলিল,"এর পরও আমাকে ছেড়ে দিতে চাও? আমি অহঙ্কার করছি না মায়া, কিন্তু আমাকে ত্যাগ ক'রে তুমি কি বাঁচবে, না আমিই বাঁচব? নিজেদের অকারণ এরকম দুঃখ দিয়ে কি লাভ?"

মায়া বলিল, "হয় ত বাঁচব না, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করব, আমার এই রাক্ষুসে ভালবাসার হাত থেকে।"

দেবকুমার নিজের বাহুবন্ধন আরও নিবিড় করিয়া বলিল, "Too late my dear, এখন আর 'পারবে না' আমাকে ছাড়লে কিছুতেই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি এমন সম্পূর্ণভাবে গোল্লায় যাব তাহলে, যা তুমি কল্পনাও করতে পার না। স্বর্গ আর নরকের মোড়ে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাত যদি ছাড়, সোজা নীচে নেমে যাব, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না। যদি তোমাকে বুকে ক'রে রাখবার অধিকার দাও, তাহলে আমায় দ্বারা মানুষের মত কাজ জগতে এখনও হ'তে পারে।"

মায়ার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি আমায় বড় বিপদে ফেল্‌লে। আমি অনেক কষ্টে মন স্থির করেছিলাম। আমাকে ভুলে যেতে পারবে না? তুমিই না সেদিন বল্‌লে মানুষে সব ভুলতে পারে?"

দেবকুমার বলিল, "শুকুমারা বিদ্যে ফলাচ্ছ? আচ্ছা, তুমি যদি আমায় ভুলে এখনি আর একটা বিয়ে কর, তাহলে আমি ভুলতে রাজী আছি।"

মায়ার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিয়া, তাহার উত্তর দেবকুমারকে জানাইয়া দিল। দেবকুমারের মুখ বিজয়-গর্ব্বে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যাক দেখলে ত শেষ চেষ্টা করে? আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি তোমার নেই। অতএব ইন্‌এভিটেবল্‌ যা, তার কাছে মাথা নীচু ক'রে হার মেনে যাও। কি বল?"

মায়া বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও একটু। আমি আর একবার ভেবে দেখি।"

দেবকুমার বলিল, "ছাড়ব না। এইখানেই তোমার ভাবনা শেষ করতে হবে। আমার হাত ছাড়লেই যত আজগুবি খেয়াল তোমার মাথায় ঢোকে।"

মায়া বলিল, "সহ্য করতে পারবে, যদি আবার আমার মেমরী চলে যায়? যদি তোমায় না চিনি? যদি অন্যদিকে মন দিই?"

দেবকুমার বলিল, "সব সহ্য করতে পারব। কেবল তোমার হারানটা সহ্য করতে পারব না।"

মায়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, নিজের দণ্ড যখন নিজে মাথা পেতে নিচ্ছ, তখন আমি আর কি করব? ভগবান জানেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করেছি। তোমাকে অনেক দুঃখের হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম যদি এখন একটু দুঃখ দেবার শক্তি আমার থাকত। কিন্তু তোমার চোখের দিকে তাকালে আমার সব জোর মন থেকে চলে যায়। কিন্তু একটা কথা আমার রাখ।"

দেবকুমার মায়ার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কি কথা না জেনেই আমি কথা দিচ্ছি, কথা রাখব।"

মায়া বলিল, "আমাকে কিছুদিন সময় দাও। এর ভিতর মানুষের যতদূর সাধ্য তা ক'রে দেখব, নিজের জন্যে।"

দেবকুমারের মুখ একটু যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিল, "বেশ। I wont go back upon my word. আমিও যতটা পারি করব।"

মায়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল, বলিল, "তবে এখনকার মত বিদায়।"

দেবকুমার বলিল, "এখনকার মতই, সেটা মনে রেখো।"

নিরঞ্জন কিছুদিনের মত কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিতেছেন বলিয়া পরদিনই শহরে রটিয়া গেল, তিনি মায়াকে লইয়া ইউরোপ চলিয়াছেন।

জাহাজঘাটে দাঁড়াইয়া দেবকুমার নীচুগলায় বলিল, "নেক্‌সট্‌ ট্রিপটা আমাদের 'হনি মুন' ট্রিপ ত?"

মায়া বলিল, "আশা করতে ক্ষতি নেই।

সমাপ্ত

তুকারাম ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্র প্রদেশে তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তির আবির্ভাব হয়;—সমর্থ রামদাস, হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপক শিবাজী ও ভক্ত তুকারাম। ইঁহাদের মধ্যে তুকার জন্ম ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে, পুণা নগরীর নিকটে, ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে দেহু নামক গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম ছিল বাল্‌হোবা, কনকাঈ ছিলেন তাঁর জননী। তুকা, সাওজী, কান্‌হা—এই তিন সহোদর। তুকারাম্‌ জাতিতে ছিলেন শূদ্র, বাণিজ্য ছিল তাঁহার বৃত্তি। যে-বংশে তাঁহার আবির্ভাব, তাহা সাধু-সেবা ও বিঠোবা-সেবার জন্ম খ্যাত ছিল; সুতরাং ধর্ম্মভাবের মধ্যে তুকারাম বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের গতি একদিকে থাকে না। নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় আসিয়া মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে তাঁহার পিতামাতা স্ত্রী সকলেই প্রাণ হারান, সকল প্রিয়জনের বিয়োগই তাঁহাকে সহিতে হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই এই মহাদুর্ব্বিপাক! আমাদের অনেকের শ্মশান-বৈরাগ্য হয়, তবে তাহা বিদ্যুতের আভাসের মত নিতান্ত অস্থায়ী। তুকারামজীর বৈরাগ্য কিন্তু স্থায়ী হইল, জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল, এখন হইতে তিনি সাধন-ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরচিত এক অভঙ্গে তিনি জীবনের এই সময়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন; সে অভঙ্গের তাৎপর্য্য এই:—

'আমি জাতিতে শূদ্র, বৃত্তিতে বণিক্‌। আমার বংশে বিঠোবা-পূজা চলিয়া আসিতেছে। হে সাধুগণ! অশোভন হইলেও আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি। দুর্ভিক্ষে আমার ও দেশের সর্ব্বনাশ হইল, ভাগ্যক্রমে দেবমন্দির পড়িয়া গেল, বড়ই কষ্ট অনুভব করিলাম। শান্তি পাইবার জন্ম ভক্তদের ভজনগান অভ্যাস করিলাম। গুরুদের পাদোদক অতি পবিত্র মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলাম। সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। স্বপ্নে গুরু যে আদেশ দিলেন তাহাই গ্রহণ করিলাম। ভগবানের নামে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল। তখন বিঠোবার শরণ লইয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। ইহাই তুকার কথা; পাণ্ডুরঙ্গ যাহা বলান সে তাহাই বলে।'

ক্রমে দেশে সুদিন ফিরিয়া আসিল, তুকারামজী পুনরায় বিবাহ করিলেন। এই স্ত্রীর নাম জিজাঈ। পুত্র হইল, তবু সংসারে মন বসিল না; সাধুসেবা ও নির্জ্জনে সাধনভজন আরম্ভ করিলেন, স্বরচিত অভঙ্গ গাহিয়া তিনি নামপ্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ব্রাহ্মণেরা বিচলিত হইল, মম্বাজী নামে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একদিন একলা পাইয়া কাঁটাগাছে ফেলিয়া দেয় ও লাঠি লইয়া তাঁহাকে মারিতে থাকে। তথাপি ক্ষমাশীল তুকা তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মত ইঁহারও জীবনে অলৌকিক কাহিনীর অভাব নাই। ব্রাহ্মণেরা না-কি সভা করিয়া তাঁহাকে ডাকায় ও তাঁহার রচিত অভঙ্গের সংগ্রহ নদীতে ফেলিয়া দিতে বলে। তদনুসারে উহা পাথরে বাঁধিয়া নদীতে ফেলা হয়; তুকারাম অন্নজল ত্যাগ করিয়া মন্দির-দুয়ারে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, কিছুদিন পরে সে সংগ্রহপুস্তক নদীতে ভাসিয়া উঠিল!

ক্রমে তুকারামের নাম দেশে ছড়াইয়া পড়িল। শিবাজী মহারাজ সাধু সজ্জন বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার নাম শুনিয়া অষ্টাঙ্গ উপহার পাঠাইয়া দরবারে আসিবার জন্ম সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন। তুকারাম উত্তর পাঠাইলেন—স্বরচিত এক অভঙ্গে; তাহার সারমর্ম্ম এই—

"রাজদর্শনে সাধুর কি লাভ? একা থাকি, হরি ভজন করি, মাটীতে শুই, ভিক্ষান্নে উদর পূর্ণ করি। আনন্দ করিয়া ভগবানের নাম গাহিয়া দিন কাটাই। হে রাজন্! কষ্ট করিয়া তোমার কাছে যাই কেন? সর্ব্বদা পরোপকার কর, দুর্জ্জনকে দূরে রাখ। যে ব্যক্তি প্রকৃত দেশভক্ত, এমন লোক বাছিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর। যাহারা অসহায় তাহাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সবই জান, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া লাভ নাই।... ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না, সমর্থরামদাসের মধ্যে নিজেকে দেখ, তোমার জন্ম ধন্য। তুকা বলে, আমার কথা শোন, তোমার কল্যাণ হইবে।"

এই উত্তর পাইয়া শিবাজীর শ্রদ্ধা বাড়িল, তিনি স্বয়ং তুকারামজীর দর্শনে গেলেন। তুকারাম তখন নূতন এক অভঙ্গে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন:—"শিবাজী, শোন। রামদাসে স্থিরনিষ্ঠা রাখ। তিনিই তোমার গুরু, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। পাণ্ডুরঙ্গ তোমাকে রক্ষা করিবেন, তুমি একমাত্র রামদাসের শরণ লও।"

প্রায় আট হাজার অভঙ্গ রচনা করিয়া (অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়, কতকগুলি ব্রজভাষায়*) ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪১ বৎসর বয়সে (জ্ঞানকোশের মতে ১৫৭৩ শকে অর্থাৎ ১৬৫১ খৃঃ) তুকারাম পরলোকগমন করেন। শিবাজী ঐ বৎসরই সমর্থ গুরু রামদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধু-দত্ত উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

তুকারামের গুরু কে, ইহা লইয়া কিছু আলোচনা করিবার আছে। প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব্বে মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, চৈতন্যদেবই তুকারামের গুরু ছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত 'মাধুরী' নামক হিন্দী পত্রিকায় গত আশ্বিন সংখ্যায় তুকারাম ও শ্রীচৈতন্য, এই উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে,—বাংলার নিমাই মহারাষ্ট্র-সাধু তুকারামের মন্ত্রগুরু ছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে 'মাধুরীর' প্রমাণ নিয়ে পাঠকদের অবগতির জন্য দেওয়া গেল।

তুকার মনে গুরু পাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা আসিল, গুরু গুরু বলিয়া তিনি পাগলের মত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শূদ্রকে মন্ত্র দেওয়া অনুচিত মনে করিতেন। গুরু না পাইয়া সাধু শেষে পাণ্ডুরঙ্গজীর নিকট প্রার্থনা করেন,—তুমিই আমাকে দীক্ষা দাও। ভক্তের নিষ্ঠা দেখিয়া ভগবানের মন টলিল, বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ইহা লইয়া তুকারামের অভঙ্গ আছে, তাহার ভাবার্থ এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে দেওয়া হইয়াছে। অন্য একটি অভঙ্গের ভাবার্থ নিম্নরূপ:—

"গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়ার সময় গুরুদেব কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন, আমার নিকটে ভিক্ষা চাহিলেন, মাথার উপরে হাত রাখিলেন। হাত রাখিতেই আমার বাহ্য-জ্ঞান লোপ পাইল। আমাকে তিনি শ্রীরাঘব, কেশব ও শ্রীচৈতন্যের কথা শুনাইলেন। বাবাজী নিজের নাম বলিয়া দিলেন, রাম-কৃষ্ণ-হরির মন্ত্র দিলেন; মাঘী শুক্লা দশমী, বৃহস্পতিবার, তুকাকে গ্রহণ করিলেন।"

আর একটি অভঙ্গে 'গৌরহরি' বা শ্রীগৌরাঙ্গের নাম স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাঠকের অবগতির জন্য বঙ্গাক্ষরে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

কসে গুরু চে পায় বাপা কসে গুরু চে পায়। টেক ॥
স্বপ্নাত মলা দর্শন দিধলে ॥
মংত্র দীলে যাদোরায় ॥
রাম কৃষ্ণ হরী মংত্র দীধলে ॥
মন্ত কেলে গুরু রায় ॥ বাপা—॥ ১ ॥
মাঘ সুদী দশমী চে দিবসো ॥
কৃপা কেলা হরী রায় ॥
মংত্র দেতা সিদ্ধ ঝালো ॥
মন্ত ঝালো গুরুরায় ॥ বাপা——॥ ২ ॥
স্বপ্নে তুকোবা ঐকা জনা হো।
ভজা গুরু চে পায়।
লাল দাস কর জোড়ুনী সাঁগে।
ভজা গৌর হরী রায়। বাপা কসে গুরু চে পায়। ৩।

এই অভঙ্গ অনুসারে বলা যায় যে, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ তুকারামজীকে মন্ত্র দেন। কিন্তু সময় হিসাবে শ্রীগৌরাঙ্গ তুকারামের বহু বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; এই অসঙ্গতির সামঞ্জস্য কি ভাবে করা যায়? শিবাজী, রামদাস, তুকারাম সকলেই ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, সকলেরই আয়ুষ্কাল সুনির্দ্দিষ্ট।

* মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোশে 'তুকারাম' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

চৈতন্যদেবের সম্বতাদির উল্লেখ সমসাময়িক লিপিকার করিয়া গিয়াছেন। তুকারামজীর অভঙ্গও অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এবিষয়ে 'মাধুরী'র প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন—"কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে তিরোভাবের পরেও ভক্তজনকে দর্শন দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কবিরদাসজী ও হিতহরিবংশজী, এই উভয়ের মধ্যে সময়ের কত অন্তর, কিন্তু রস-প্রসঙ্গে ইঁহাদের আলাপ সুবিদিত। গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে স্বপ্নে তুকারামজীকে দর্শন ও মন্ত্র দেওয়া অসম্ভব কি ?"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোনও শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলে গুরুপরম্পরায় মহাপ্রভুকেই মন্ত্রগুরু বলাও ভক্ত তুকারামের পক্ষে সম্ভব; এই অনুমান সঙ্গত কি-না পাঠকবর্গ তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

মেঘ ও রৌদ্র

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত

অগ্রহায়ণ মাস। সবে ভোর হইয়াছে। শহরের লোক তখন জাগিয়াছে, জাগেও নাই। দুই একটি মাত্র দোকানের দরজা অর্দ্ধেক খোলা হইয়াছে।

ছোট দারোগা হাফিজুদ্দীন সাহেব রাত্রের ডিউটি সারিয়া একজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া থানায় ফিরিতেছেন। কনেষ্টবলের নাম রাম সিং। সুদূর মজঃফরপুর জেলা হইতে এই বাংলা মুলুকে নোকরিকা ওয়াস্তে আসিয়াছেন। নোকরিটা যে ভালমতই চলিতেছে, তাহা তাহার ভুঁড়ির পরিমাণ দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায়।

হঠাৎ একটা কেউ কেউ শব্দ শুনিয়া দারোগা সাহেব ঘাড় ফিরাইয়া চাহিলেন। রোগা পিটপিটে, সাদা-কালো, দোআঁশলা একটা কুকুর, তার পিছনে পিছনে মুক্তকচ্ছ এক ব্যক্তি ছুটিতেছে। বিরাট এক লম্ফ প্রদান করিয়া লোকটি কুকুরটার পিছনের পা দু'টি চাপিয়া ধরিয়া রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। কুকুরটা মুখ ফিরাইয়া একবার কামড় দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল।

লোকটি চীৎকার করিয়া বলিল—ওরে ন্যাপলা, শীগ্‌গির আয়! পটলা, আয় ত রে!—হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! মজাটা টের পাওয়াচ্ছি এবার।

ডাক-ডাকে ন্যাপলা পটলা নামধারী ব্যক্তিগণ বাহির হইয়া আসিল এবং অনাহূত আরও অনেকে কাপড় পরিতে পরিতে, চোখ মুছিতে মুছিতে রাস্তায় আসিয়া জমা হইয়া মুক্তকচ্ছ ব্যক্তির বীরত্ব দেখিয়া হাঁ করিয়া রহিল।

রাম সিং কনেষ্টবল দারোগা সাহেবকে বলিল—হুজুর, মালুম হোতা হৈ উধর কোই হল্লা মচা রহা হৈ।

হুজুরের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

লোকটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেপাল ও পটল দুইজনে কুকুরটির দুই কান সজোরে টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেচারা কুকুর শীতে ও ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ল্যাজটির উপর কোন অত্যাচারের আশঙ্কায় তাহা একদম পেটের নীচে চালান করিয়া দিয়াছে। লোকটির ডান হাতের একটি আঙুল দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ডান হাতটা তুলিয়া ধরিয়া সে সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—কুত্তাকা ছৌনা হাম লোককো একদম্ মেরে ফেলা হ্যায়।

দারোগা সাহেব ভিড় ঠেলিয়া লোকটির কাছে আসিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—এইও, হল্লা মৎ করো। কি হয়েছে? কিসের এত গণ্ডগোল? তুমি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? নাম কি তোমার?

লোকটি শশব্যস্তে একটা নমস্কার করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল—হুজুর, আমার নাম বংশীলোচন কর্ম্মকার সোনার কাজ করি, এই যাকে বলে সন্নকার। রূপো আমি ছুঁইওনে, আমাদের বংশেও কেউ রূপোর কাজ করেনি। হুজুর মা বাপ! একেবারে মেরে ফেলেছে, হুজুর!

দারোগা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গোঁফে

একটা চাড়া দিয়া বলিলেন,—চিল্লাও মৎ। হয়েছে কি খুলে বলো।

বংশীলোচন একবার কুকুরটার দিকে চাহিল। তারপর একবার নিজের রক্তমাখা আঙুলটার দিকে চাহিয়া বলিল—হুজুর, ঘুম থেকে উঠে একবার মাঠে গেছলাম। মাঠ থেকে এসে গাড়ুটা রেখে যেমনি ঘরে ঢুকব, অমনি,—কিছুর মধ্যে কিছু না, কোত্থেকে হতভাগা কুকুরটা এসে দিলে এই আঙুলটায় ক্যাক্ করে একটা কামড় বসিয়ে। একেবারে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল হুজুর! আঙুলটা একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়, করে দিয়েছে হুজুর! হুজুর মা বাপ, এর একটা বিহিত করুন, হুজুর।

হুজুর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—হুঁ! কার এ কুকুর?

বংশীলোচন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল,—জানিনে, হুজুর। হুজুর মা বাপ!

দারোগা সাহেব আর একবার গম্ভীর মুখে বলিলেন—"হুঁ।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ সব চলবে না। কুকুর-পোষার সখটা বের কচ্ছি। কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যাব। পিঠে দু' ঘা পড়লেই কুকুর-পোষার সখ মিটে যাবে। রাম সিং, দেখ ত কুকুরটা কার। শালাকে কান ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে একবার মজাটা টের পাইয়ে দি। কার এ কুকুর?

চারিদিকের জনতা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, ভিড়ের মধ্যে হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—এটা তো স্যর পুলিস সায়েবের কুকুর।

একটু চমকিয়া উঠিয়া দারোগা সাহেব কুকুরটাকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, কিছু যেন স্থির করিতে পারিলেন না। রাম সিং-এর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া যেন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তুমি কি বল?

রাম সিং তখন অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। দারোগা সাহেবের সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল,—বড়ী উমস মালুম হোতী হৈ, হুজুর, শায়দ বরসেগা।"

দারোগা সাহেব চট্ করিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন,—মালুম তো ঐসা হী পড়তা হৈ।

তারপর বংশীলোচনের দিকে ফিরিয়া কড়া সুরে বলিলেন—দেখ, এ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না, এতটুকুন্ একটা কুকুরের বাচ্চা তোমার মত বুড়ো ধাড়িকে কামড়ালো কি ক'রে! তোমার অমন হাঁড়িপানা মুখ দেখেই তো কুকুর ভয়ে এগোবে না। যাও যাও, কোত্থেকে আঙুল কেটে এসে এখন ন্যাকামো করা হচ্ছে। মিথ্যেবাদী কোথাকার! কষে দু' ঘা লাগিয়ে দিলেই ঠিক্ হয়! চলো, রাম সিং।

বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্য হইতে একজন লোক আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, বংশীর একটা কথাও বিশ্বেস করবেন না। ওটা একটা পাঁড় মাতাল। সারা রাত মদ খেয়েছে। ভোরবেলা কুকুরটা পথ দিয়ে যাচ্ছিল দেখে সেটাকে ধরে এনে কাঁধে করে কতক্ষণ ধেই ধেই করে নেচেছে। তারপর একটা সিগ্রেট এনে যাই কুকুরটার মুখে গুঁজে দিতে গেছে অমনি সেটা ওর আঙুলে ক্যাক্ করে একটা কামড় লাগিয়ে দিয়েছে। কুকুরের আর দোষ কি, হুজুর? মানুষকে অমন করলে মানুষও ওকে কামড়ে দিত! এই তো সেদিন—

বংশী বাধা দিয়া বলিল—হয়েছে, হয়েছে, তোর আর বক্তিমে কত্তে হবে না। তুই-ই কত ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির জানা আছে। গুলিখোর আবার এখানে বিদ্যে ফলাতে এসেছে। সিগ্রেট গুঁজব কিরে গাধা? সিগ্রেট কি এখন কেউ খায় নাকি রে?"

রাম সিং গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এইয়ো, হল্লা মৎ করো।

বংশী তর্ক ছাড়িয়া দারোগা সাহেবের দিকে ফিরিয়া লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর, বড়সাহেবের কুকুর আমি চিনি। এটা বড়সাহেবের কুকুর নয়।

—ঠিক্ তো?

—হাঁ, হুজুর।

চারিদিকের দুই চারিজন লোকও মাথা নাড়িয়া তাহার কথার সমর্থন করিল।

দারোগা সাহেব একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তাই তো বলি আমিও! এটা আবার একটা কুকুর! আর তাকে রাখবেন পুলিস সাহেব! কোন্ শূয়ার বলেছে এটা পুলিস সাহেবের কুকুর? পুলিস সাহেবের কুকুর তোমাদের মত কি-না, যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে! চল্ বংশী, থানায় চল্, এজাহার দিবি।

রাম সিং এতক্ষণ কুকুরটাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। সে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"হুজুর, এটা বোধ হয় সাহেবেরই কুকুর। কাল এমনি একটা কুকুর যেন তাঁর বাড়িতে দেখেছিলাম।

একজন কে বলিয়া উঠিল—আরে এটা যে পুলিস সাহেবের কুকুর সে ত সবাই জানে!

দারোগা সাহেবের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কতক্ষণ ভয়ানক ভাবে কাশিয়া কহিলেন—উঃ, কি শীত পড়েছে। সাধ্য কি দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলি! রাম সিং, কুকুরটাকে বড়সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাও। সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল্‌বে, কুকুরটা পথে পেয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

তারপর বংশীলোচনকে বলিলেন—"খুব হয়েছে খুব হয়েছে। ঐ মুগুরের মত কালো হাতটা উঁচিয়ে আর ন্যাকামি করতে হবে না। কি আমার বীরপুরুষ রে! কোথায় একটু আঁচড় লেগেছে, কি না লেগেছে, আর অমনি উনি একেবারে লাফাতে সুরু করে দিলেন। তোমার মাথাটা যে চিবিয়ে দেয়নি এই তোমার ভাগ্যি। দোষ করেছ নিজে, আবার তার তম্বি, দেখ না! যাও, যাও।

এই সময়ে একজন বলিয়া উঠিল—আরে এই যে পুলিস সাহেবের চাপরাসী করিম যাচ্ছে। ওকে ডাক্‌লেই ত হয়।

করিমকে আর ডাকিতে হইল না। ভিড় দেখিয়া সে নিজেই আসিয়া জুটিল।

একটি লোক ব্যগ্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—চাপরাসী সাহেব! এটা পুলিস সাহেবের কুকুর, না?

করিম একটু হাসিয়া বলিল—কে বল্‌লে? এটা ত বড়সাহেবের কুকুর নয়, এটা—

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—আরে, তাই বল করিম! আমিও ত বলি, এমন মরা কুকুর হবে বড়সাহেবের? আর এত জিজ্ঞাসাবাদেরই বা দরকার কি? দেখলেই ত বোঝা যায় এ কোনো উকীলবাবুর কুকুর। হাঃ হাঃ হাঃ!—যাক্, হাসির কথা নয়। এ কুকুর যে যাকে-তাকে কামড়াবে তা চলবে না। নিয়ে চল এটাকে গলায় দড়ি দিয়ে থানায়। তারপর কুকুরের সখওয়ালা বাবুদেরও দেখে যাবে।

করিম বলিল—এটা বড়সাহেবের কুকুর নয় বটে কিন্তু এটা তাঁর দোস্ত হন্‌সিং সাহেবের। তিনি যে কাল এখানে এসেচেন।

দারোগা সাহেবের মুখ আবার ফ্যাকাসে হইয়া গেল তিনি কোন রকমে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—কই, সাহেবের দোস্ত যে এসেচেন, তা ত আমি জান্‌তাম না। কদ্দিন থাক্‌বেন তিনি এখানে? তাঁর শরীর বেশ ভাল আছে ত? বেশ, বেশ। কেমন লোক সাহেবের দোস্ত? এ কুকুরটি বুঝি তাঁরই? বেশ বেশ।

দারোগা সাহেব কুকুরটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, মুখের ভাব হাসি-হাসি করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বলিলেন—কুকুরটি কিন্তু খুব শান্ত, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে। কেমন চুপ করে বসে আছে। কেমন চোখ দুটি! শীতে কাঁপছে! এ আবার এই লোকটার নাকি আঙুল কামড়ে দিয়েছে। যত সব কথা!

করিম দারোগা সাহেবের কোল হইতে কুকুরটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

দারোগা সাহেব বংশীলোচনের দিকে ফিরি[illegible] কহিলেন—ব্যাটার সাহস কত! সিগারেট গুঁজ[illegible] গিয়েছিলেন! ব্যাটা মাতাল! আবার ন্যাকামো [illegible] না! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাব্‌কে দিলে ঠিক হয়।*

---

* এই গল্পটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক লিখি[illegible]

"পুরাণে কাল"

ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'পুরাণে কাল' শীর্ষক যে অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া লেখকের অসীম বিদ্যাবত্তা এবং প্রতিভায় বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তাঁহার দুই-একটা কথা সম্বন্ধে অল্প কিঞ্চিৎ মন্তব্য-প্রকাশ করিব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীংচৈব ততো জয়-মুদীরয়েৎ। এই শ্লোকে যে জয় শব্দ আছে লেখক তাহার সাধারণ আভিধানিক অর্থ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, "ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বাগ্‌দেবী এই তিনের জয় উচ্চারণ করিতে হইবে।" উদ্ধৃত অংশের মধ্যে "এই তিনের' মূল, সংস্কৃত শ্লোকটার মধ্যে নাই। "জয়" একটি পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ পুরাণ এবং মহাভারত।*

অতএব, শ্লোকটীর অর্থ এই যে, "মহাভারতের কথা বা কোন পুরাণের কথা কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে নারায়ণ, নর ও সরস্বতীকে প্রণাম করিতে হইবে।" রামায়ণ, চণ্ডী, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র জয়ের অতীত নহে।†

এখানে অবান্তর ভাবে একটা বলিতে ইচ্ছা হয়। এই শ্লোকটা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা বড় অদ্ভুত হাস্যকর ব্যবহার করিয়া থাকেন। যখনই তাঁহারা মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করেন তখনই তাঁহারা এই শ্লোকটি পাঠ করেন—মনে মনে অথবা প্রকাশ্যরূপে নারায়ণ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। শ্লোকটি পুরাণ ও মহাভারত পাঠক বা কথকের প্রতি নির্দ্দেশ মাত্র। উহা পড়িবার প্রয়োজন কি? কোন নাটকে একস্থলে যদি "বেগে নটের প্রবেশ" এই নির্দ্দেশ বা stage direction থাকে, তাহা হইলে নটের অভিনেতা যদি দৌড়াইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার সময়ে বলেন, "বেগে নটের প্রবেশ," তাহা হইলে তাহাদের কার্য্য যেরূপ হাস্যকর হয়, মহাভারত ইত্যাদি পড়ার পূর্ব্বে শ্লোকটা পাঠ করিলেও সেই-রূপ হাস্যকর হয় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

তাহার পর শেষোক্ত "নর" যে কে, সে সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা যাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই শ্লোকটা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই "নরোত্তম নর" এখন যাহাকে হিউম্যানিটি বলে এবং বাইবেলে যাহাকে সন্ অব্ ম্যান্ বা মনুষ্যপুত্র বলে, তাহা অথবা তিনি হইতে পারেন না কি? বাইবেলের কোন ভাব যে হিন্দুশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ইতিহাস ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল।

কালিদাস সম্বন্ধে অতি অল্পাক্ষরে বিদ্যানিধি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কালিদাস যদি বাঙ্গালী হন এবং যেহেতু বাঙ্গালীরা সৌর বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে অর্থাৎ অম্বুবাচীর চারিদিন মাত্র পূর্ব্বে মেঘের সঞ্চার, সহস্যরাত্রী প্রভৃতি হইতে অধিক কিছু প্রমাণ হয় না। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন ইহার আভাস তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেকথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্গত নহে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

---

* নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।

অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতং তথা
বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রানি শিবধর্ম্মাশ্চভারত॥
কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদো যন্মহাভারতং স্মৃতং।
সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র! মানবোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
(ভবিষ্যপুরাণ)

† অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমং চ যন্মহাভারতং বিদুঃ
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

॥ ইতি ভবিষ্যবচনাৎ পুরাণাদিকং বা॥

দারোগা সাহেব একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তাই তো বলি আমিও! এটা আবার একটা কুকুর! আর তাকে রাখবেন পুলিস সাহেব! কোন্ শূয়ার বলেছে এটা পুলিস সাহেবের কুকুর? পুলিস সাহেবের কুকুর তোমাদের মত কি-না, যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে! চল্ বংশী, থানায় চল্, এজাহার দিবি।

রাম সিং এতক্ষণ কুকুরটাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। সে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"হুজুর, এটা বোধ হয় সাহেবেরই কুকুর। কাল এমনি একটা কুকুর যেন তাঁর বাড়িতে দেখেছিলাম।

একজন কে বলিয়া উঠিল—আরে এটা যে পুলিস সাহেবের কুকুর সে ত সবাই জানে!

দারোগা সাহেবের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কতক্ষণ ভয়ানক ভাবে কাশিয়া কহিলেন—উঃ, কি শীত পড়েছে। সাধ্য কি দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলি! রাম সিং, কুকুরটাকে বড়সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাও। সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল্বে, কুকুরটা পথে পেয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

তারপর বংশীলোচনকে বলিলেন—"খুব হয়েছে খুব হয়েছে। ঐ মুগুরের মত কালো হাতটা উঁচিয়ে আর ন্যাকামি করতে হবে না। কি আমার বীরপুরুষ রে! কোথায় একটু আঁচড় লেগেছে, কি না লেগেছে, আর অমনি উনি একেবারে লাফাতে সুরু করে দিলেন। তোমার মাথাটা যে চিবিয়ে দেয়নি এই তোমার ভাগ্যি। দোষ করেছ নিজে, আবার তার তম্বি, দেখ না! যাও, যাও।

এই সময়ে একজন বলিয়া উঠিল—আরে এই যে পুলিস সাহেবের চাপরাসী করিম যাচ্ছে। ওকে ডাক্‌লেই ত হয়।

করিমকে আর ডাকিতে হইল না। ভিড় দেখিয়া সে নিজেই আসিয়া জুটিল।

একটি লোক ব্যগ্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—চাপরাসী সাহেব! এটা পুলিস সাহেবের কুকুর, না?

করিম একটু হাসিয়া বলিল—কে বল্লে? এটা ত বড়সাহেবের কুকুর নয়, এটা—

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—আরে, তাই বল করিম! আমিও ত বলি, এমন মরা কুকুর হবে বড়সাহেবের? আর এত জিজ্ঞাসাবাদেরই বা দরকার কি? দেখলেই ত বোঝা যায় এ কোনো উকীলবাবুর কুকুর। হাঃ হাঃ হাঃ!—যাক্, হাসির কথা নয়। এ কুকুর যে যাকে-তাকে কামড়াবে তা চলবে না। নিয়ে চল এটাকে গলায় দড়ি দিয়ে থানায়। তারপর কুকুরের সখওয়ালা বাবুদেরও দেখা যাবে।

করিম বলিল—এটা বড়সাহেবের কুকুর নয় বটে, কিন্তু এটা তাঁর দোস্ত হর্‌সিং সাহেবের। তিনি যে কাল এখানে এসেচেন।

দারোগা সাহেবের মুখ আবার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কোন রকমে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—কই, সাহেবের দোস্ত যে এসেচেন, তা ত আমি জান্‌তাম না। কদ্দিন থাক্‌বেন তিনি এখানে? তাঁর শরীর বেশ ভাল আছে ত? বেশ, বেশ। কেমন লোক সাহেবের দোস্ত? এ কুকুরটি বুঝি তাঁরই? বেশ বেশ।

দারোগা সাহেব কুকুরটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, মুখের ভাব হাসি-হাসি করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বলিলেন—কুকুরটি কিন্তু খুব শান্ত, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে। কেমন চুপ করে বসে আছে। কেমন চোখ দুটি! শীতে কাঁপছে! এ আবার এই লোকটার নাকি আঙুল কামড়ে দিয়েছে। যত সব কথা!

করিম দারোগা সাহেবের কোল হইতে কুকুরটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

দারোগা সাহেব বংশীলোচনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—ব্যাটার সাহস কত! সিগারেট গুঁজতে গিয়েছিলেন! ব্যাটা মাতাল! আবার ন্যাকামো দেখ না! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাব্‌কে দিলে ঠিক হয়।*

---

* এই গল্পটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক লি[illegible]

"পুরাণে কাল"

ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'পুরাণে কাল' শীর্ষক যে অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া লেখকের অসীম বিদ্যাবত্তা এবং প্রতিভায় বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তাঁহার দুই-একটা কথা সম্বন্ধে অল্প কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীংচৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ। এই শ্লোকে যে জয় শব্দ আছে লেখক তাহার সাধারণ আভিধানিক অর্থ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, "ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বাগ্‌দেবী এই তিনের জয় উচ্চারণ করিতে হইবে।" উদ্ধৃত অংশের মধ্যে "এই তিনের' মূল, সংস্কৃত শ্লোকটার মধ্যে নাই। "জয়" একটি পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ পুরাণ এবং মহাভারত।*

অতএব, শ্লোকটীর অর্থ এই যে, "মহাভারতের কথা বা কোন পুরাণের কথা কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে নারায়ণ, নর ও সরস্বতীকে প্রণাম করিতে হইবে।" রামায়ণ, চণ্ডী, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র জয়ের অতীত নহে।†

এখানে অবান্তর ভাবে একটা বলিতে ইচ্ছা হয়। এই শ্লোকটা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা বড় অদ্ভুত হাস্যকর ব্যবহার করিয়া থাকেন। যখনই তাঁহারা মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করেন তখনই তাঁহারা এই শ্লোকটি পাঠ করেন—মনে মনে অথবা প্রকাশ্যরূপে নারায়ণ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। শ্লোকটি পুরাণ ও মহাভারত পাঠক বা কথকের প্রতি নির্দ্দেশ মাত্র। উহা পড়িবার প্রয়োজন কি? কোন নাটকে একস্থলে যদি "বেগে নটের প্রবেশ" এই নির্দ্দেশ বা stage direction থাকে, তাহা হইলে নটের অভিনেতা যদি দৌড়াইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার সময়ে বলেন, "বেগে নটের প্রবেশ," তাহা হইলে তাহাদের কার্য্য যেরূপ হাস্যকর হয়, মহাভারত ইত্যাদি পড়ার পূর্ব্বে শ্লোকটা পাঠ করিলেও সেইরূপ হাস্যকর হয় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

তাহার পর শেষোক্ত "নর" যে কে, সে সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা যাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই শ্লোকটা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই "নরোত্তম নর" এখন যাহাকে হিউম্যানিটি বলে এবং বাইবেলে যাহাকে সন্ অব্ ম্যান্ বা মনুষ্যপুত্র বলে, তাহা অথবা তিনি হইতে পারেন না কি? বাইবেলের কোন ভাব যে হিন্দুশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ইতিহাস ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল।

কালিদাস সম্বন্ধে অতি অল্পাক্ষরে বিদ্যানিধি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কালিদাস যদি বাঙ্গালী হন এবং যেহেতু বাঙ্গালীরা সৌর বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে অর্থাৎ অম্বুবাচীর চারিদিন মাত্র পূর্ব্বে মেঘের সঞ্চার, সহস্যরাত্রী প্রভৃতি হইতে অধিক কিছু প্রমাণ হয় না। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন ইহার আভাস তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেকথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্গত নহে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

---

* নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।

অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতং তথা
বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চভারত।
কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদো যন্মহাভারতং স্মৃতং।
সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র। মানবোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
(ভবিষ্যপুরাণ)

† অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমং চ যন্মহাভারতং বিদুঃ
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
॥ ইতি ভবিষ্যবচনাৎ পুরাণাদিকং বা ॥

বাংলা

বাঙালী বালকের আত্মোৎসর্গ—

শ্রীমান মোহিনীমোহন রায় ত্রিপুরা জেলার ধর্ম্মনগর গ্রামের শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার রায়ের পুত্র। গত বৎসর সে পাঠ ত্যাগ করিয়া আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়। প্রথমে সে কাঁথিতে গ্রেপ্তার হইয়া তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেপ্টেম্বরের

মৃত্যুশয্যায় মোহিনীমোহন

প্রথমভাগে মুক্তি পাইয়া সে পুনরায় আন্দোলনে যোগ দেয়। গত জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে সে মহিষবাথানের অন্তর্গত বাগু-নমাজ রাজস্ব বন্ধ করার কেন্দ্রে যায়। সেখানে গত ২৫এ জানুয়ারী তারিখ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাহার হাতে একখানি জাতীয় পতাকা ছিল। পুলিস সেই পতাকাখানি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। পতাকা রক্ষা করিবার চেষ্টায় সে আহত হয়। তাহাকে প্রথমে রাজার হাট থানায়, পরে বারাসত সাব জেল হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। বিচারাধীন অবস্থায় এই হাজতে আটক থাকা কালে ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার টাইফয়েড জ্বর হয় এবং ১৯এ ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটের সময় তাহার মৃত্যু হয়।

মোহিনীমোহনকে প্রথমাবধিই নির্জ্জন কক্ষে আটক রাখা হইয়াছিল এবং টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে কোন হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর। হয় নাই।

বারাসত জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮-২-৩১ তারিখে লিখিত পোষ্টকার্ডে পরদিন প্রাতে ৮টা ৩০ মিনিটের সময় সংবাদ পাইয়া শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ গুহ এবং তমালবিহারী পাল তাহাকে দেখিতে যান। তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মোহিনীর মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

ডার্টন কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জার্ম্মানী হইতে এক্স্‌-রে এবং ইলেক্‌ট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রাদি সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফি আসিয়াছেন। তিনি বার্লিনের সামটাস কোম্পানীর যন্ত্রপা

বিরাট কারখানায় বহুদিন যাবৎ কর্ম্ম করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইদানীং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেরূপ এক্‌স্‌-রে ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এরূপ বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে-সব ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার পাশ্চাত্য কারখানায় এ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছেন মণীন্দ্রবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন।

বায়োকেমিষ্ট্রী শিক্ষায় বাঙালী—

ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী ১৯০৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অনাসে প্রথম হইয়া বি-এস্‌-সি পাস করেন এবং

সপরিবারে ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তথা হইতে ১৯১৫ সালে কৃতিত্বের সহিত এম্‌-বি পাস করিয়া সেখানেই তিনি চাকুরি গ্রহণ করেন। কলেজ ও হাসপাতালের নানা বিভাগে বহুদিন কর্ম্ম করিয়া অমূল্যবাবু ফিজিওলজি ও বায়োকেমিষ্ট্রী বিভাগে উন্নীত হন। এই বিভাগে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে অধ্যাপনাবৃত্তি লাভ করেন এবং বায়কেমিষ্ট্রীতে বিশেষজ্ঞ হইবার নিমিত্ত এডিনবরায় যান। অতি বিখ্যাত অধ্যাপক বর্জার এবং ষ্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আট মাস এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সেখানকার রয়াল ইনফার্মেরীতে আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী অনুশীলন করেন। বিগত জানুয়ারী মাসে এডিনবরা রয়াল কলেজের এম্‌-আর-সি-পি পরীক্ষায় বায়োকেমিষ্ট্রী এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে অমূল্য-বাবু বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ যাবৎ যাঁহারা এম্‌-আর সি-পি পরীক্ষা দিয়াছেন, এই দুই বিষয়ে তিনি তাঁহাদের সকলের চেয়ে উচ্চস্থান অধিকার করেন। এই কারণে পরীক্ষকমণ্ডলীর নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান লাভ হইয়াছে। লণ্ডন ও বার্লিনে বায়োকেমিষ্ট্রী বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন।

অমূল্য-বাবু বিলাতে সপরিবারে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা দেবী গৃহকর্ম্মের অবসরে সেখানকার শিশু-স্বাস্থ্য ও শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ

মুসলমান সম্প্রদায় ও বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন—

বিগত ২১এ নবেম্বর বার্লিনের Deutsche Wirtschaftliche Gesellschaft-এ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক আলোচনা হয়। সেখানকার বহু খ্যাতনামা জর্ম্মান এবং বিদেশী এই আলোচনায় যোগদান করেন। ভারতবর্ষের তরফ হইতে সেখানে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত হাবিবর রহমান ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রহমান যাহা বলিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।—

"ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ খুবই আশাপ্রদ। তথাপি মাঝে মাঝে এদেশে কোন কোন সংবাদপত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করা হয় যে তাহারা ভারতের উপস্থিত স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দেয় না, পরন্তু এই আন্দোলন নষ্ট করার অভিপ্রায়ে ইংরাজের সহায়তা করে। ইহা কিন্তু নিছক মিথ্যা।" "জমায়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ" (The Organization of All-India Islamic Religious leaders) এক সময়ে ভারতীয় সকল মুসলমানকে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। এ-রকম শত শত উদাহরণ আমি দিতে পারি। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা কারারুদ্ধ হইতেছে—সে কিছু নূতন কথা নয়। পেশোয়ারে অনেক মুসলমান নিহত হইয়াছেন। স্বীকার করি এখনও অনেক মুসলমান আছে, যাহারা প্রভুত্বপ্রয়াসী ইংরেজদের খুব অনুগত। কিন্তু তাহাদের আমরা মুসলমান না বলিয়া ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান বলিব। ইহারা হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদ ক্রমাগত বাড়াইতেছে। ইহারা দেশদ্রোহী। ইহারা ধর্ম্মের নামে নিজেদের কিছু সুবিধা করিয়া লইতে চায় এবং তাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চায় যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের কোন সহানুভূতি নাই।

বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বিশেষ কোন দাবি করিতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে মুসলমানদের কোন বিশেষ স্বত্ব বা সুবিধা দেওয়ার আমি ঘোরতর বিরোধী, কারণ ইহাতে উভয় দলের মধ্যে দূরত্ব এবং বিচ্ছেদ চিরকালের জন্য বাড়িতে থাকিবে।

আমরা "ভারতীয় জাতি" গঠন করিতে চাই। ভারতবর্ষ ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত হইবে। তাহারা হিন্দু কি মুসলমান, সে প্রশ্ন এখানে উঠে না—উঠা উচিত নয়। দক্ষতা অনুযায়ী, হয় হিন্দু নয় মুসলমান, প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার বা আপত্তি করিবার কিছু নাই।

এদেশে সংবাদপত্রে আমরা চিরকাল সেই পুরাতন গল্প পড়ি যে ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা ও বহু জাতি-বিভাগ বিদ্যমান। আমরা ইহা জানি, এবং এ কথা কেবলমাত্র ইংলণ্ডই জোরগলায় বলে—প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে—যে বিদেশী বিধর্ম্মী শাসনেও হিন্দু মুসলমান বিরোধ কিছুমাত্র কমে নাই। কিন্তু এখানে আমরাও বলিতে পারি যে, বিদেশীশাসনে সে বিরোধ কখনও মিটিবে না। আজ যদি ভারত ইংলণ্ডের পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয়—তার পরেও যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সহিত বিবাদ করে—তবুও দেশের অবস্থা এখন যাহা আছে তা অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ হইবে না। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভারতবর্ষ একবার স্বাধীন হইলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে।

আমরা—হিন্দু-মুসলমান এক, আমরা বাঁচি একসঙ্গে—আমরা মরি একসঙ্গে। আমাদের দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা নিজেরাই তাহা সংশোধিত করিব।

মোতিলাল নেহ্‌রুর শ্রাদ্ধ-দিবসে কলিকাতা অক্‌টারলোনি মনুমেণ্টের পাদদেশে বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্র পাঠ করিতেছেন

ভারতীয়দের যথেষ্ট জার্ম্মানপ্রীতি আছে। লাহোরে 'জমিদার' নামক পত্রিকা কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেন; তাহাতে ভারতবাসীর জার্ম্মানদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ফলে ঐ পত্রিকাকে বেশ মোটারকম জরিমানা দিতে হয়। ভারতবর্ষে কোন জার্ম্মান পদার্পণ করিলে ভারতীয়েরা তাঁহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করে। আজও কোন জার্ম্মান বলিতে পারেন নাই যে, তিনি ভারতবর্ষে অতিথিসৎকার পান নাই। ভারতীয়দের কাছে তিনি যাহা পান জগতের আর কোথাও তিনি তাহা পান না। জার্ম্মানীর দ্রব্যসম্ভার ভারতবর্ষে আদরের সহিত গৃহীত হয়। ভারতবাসী এদেশে আসে জার্ম্মান ভাষা শিখিতে, জার্ম্মান সভ্যতার ও জার্ম্মান মনের পরিচয় পাইতে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, জার্ম্মেনী যেন ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার কথা ভুলিয়া না যায়। ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে সে অনেক রকমে তাহার সাহায্য করিতে পারে। ভারতবাসীও কৃতজ্ঞ—উপকারীর অপকার প্রাণান্তেও সে করিবে না।

সভার আর একটি দৃশ্য

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৩) যবদ্বীপ—সুরাবায়া

শুক্রবার, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭।—

জাহাজে একজন জারমান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি দ্বীপময় ভারতে অনেক দিন ধ'রে আছেন, এদেশের রীতি-নীতি ধর্ম্ম পুরাণ-কথা গল্প এই সব খুব চর্চ্চা ক'রেছেন, এ-বিষয়ে বইও লিখেছেন। বলিদ্বীপের নানা ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা সামাজিক রীতির কথা ব'ললেন। জারমান ডাক্তার Krause-এর বলিদ্বীপের উপর যে বই আছে—তাতে বলিদ্বীপের লোকজনের নানা ছবি আছে,—সেই বইয়ের দ্বারা বলিদ্বীপের অনিষ্ট হ'চ্ছে ব'লে তিনি মনে করেন,—টুরিস্টের দল এই বই দেখে বলিদ্বীপে আকৃষ্ট হ'য়ে আসছে, আর তাতে ক'রে বলিদ্বীপীয়দের একটা অবনতি ঘ'টতে সাহায্য ক'রছে।

সকাল আটটায় আমাদের জাহাজ Soerabaja সুরাবায়ার বন্দরে লাগ্‌ল। সস্ত্রীক সকন্যক ডচ্ ব্যারনটি সহযাত্রী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আর অন্য সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। জেটিতে কবিকে স্বাগত করবার জন্য খুব ভীড় হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাব, শ্রীযুক্ত লোকুমল, আর অন্যান্য ভারতবাসী ছিলেন—এঁদের কথা আগে ব'লেছি। সুরাবায়ায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে। পূর্ব্ব-যবদ্বীপে শূরকর্ত্ত নগরে Mangkoenogoro মঙ্কুনগরো উপাধি-যুক্ত এক রাজা আছেন। এখনকার মঙ্কুনগরো হ'চ্ছেন সপ্তম মঙ্কুনগরো। এঁর পূর্ব্বে যিনি মঙ্কুনগরো ছিলেন, তিনি এই রাজপদ ত্যাগ করেন। উপস্থিত তিনি সুরাবায়াতে বাস করেন, আর এঁরই অতিথি হ'য়ে আমরা সুরাবায়াতে ছিলুম। কেন ইনি পদত্যাগ করেন তা সঠিক জানতে পারি নি, তবে শুনেছিলুম, ডচ সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে এঁর মতের অমিল হ'য়েছিল। তবে এখন ডচেদের ব্যবহারে আর সুরাবায়ায় এঁর প্রতিষ্ঠা থেকে এই মতান্তরের কথা টের পাবার জো নেই। এই ষষ্ঠ মঙ্কুনগরোর পুত্র শ্রীযুক্ত Raden M Harjo Soejono (আর্য্য-সুযান)—ইনি জাহাজ ঘাটায় আমাদের আনতে গিয়েছিলেন। আগেকার বার এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল। Palmer laan বা তালবীথি নামে বড়ো রাস্তার উপর ১৯-২ সংখ্যক বৃহৎ বাড়ীতে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো বাস করেন, এখানে কবিকে আর আমাদের নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত ঝাবের লোকেদের সাহায্যে আমাদের মালপত্র জাহাজ থেকে উদ্ধার ক'রে আনা গেল। শ্রীযুক্ত সুযানের এক বন্ধুর সঙ্গে, আলাপ হ'ল, এঁর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত Soetomo সুতম।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা মহলে এঁদের বাড়ী। ঘরগুলি সাধারণতঃ একতালার, কতকগুলি ঘর দোতালার, হাল্‌কাভাবে তৈরী। একটি মহল আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। দ্রেউএস্ এক হোটেলে উঠলেন, বাকী সবাই এখানে রইলুম। সারি সারি কতকগুলি একতালার ঘরে আমরা থাকতুম—আর কবির জন্যে আলাদা মহলে দুতালা ঘর ঠিক করা ছিল। অতিথিদের জন্য ঘরগুলি সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিসে সুসজ্জিত, স্নানাদির ব্যবস্থা ও বাড়ীটাতে সুন্দর ছিল। আমাদের লাগোয়া শ্রীযুক্ত সুযানের বাসের মহল। মস্ত এক আঙিনা। তার ধারেই একটী ছোটো বাড়ী, তাতে গুটী কতক ঘর,—তারি একটী বড়ো ঘরে শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানা; আর এই ঘরগুলির সামনেকার আঙিনা-মুখী প্রশস্ত দালান বা রোয়াকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হ'ত; আর গাছের কেয়ারীর মধ্যে সিমেন্টের পথ করা গাছপালায় ঢাকা পাখীর ডাকে মুখরিত আঙিনার সামনে এই দালানটীর একটী পাশে ব'সে দুপুরবেলা শ্রীযুক্ত সুযানের স্ত্রী সেলাই-টেলাই ক'রতেন, বই প'ড়তেন, দাসদাসীদের কাজের তদারক ক'রতেন। এঁদের ছেলেপুলে অনেকগুলি—

শুটি আটেক হবে। এঁদের বড় ছেলের বয়স ষোলো বছর—শ্রীযুক্ত স্থবানের নিজের বয়স চৌত্রিশ—সুতরাং বাল্যবিবাহ এদেশে বেশ প্রচলিত আছে। এই ছেলেটি একটা ডচ্ ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে—তাই নিজ মাতৃভাষা যবদ্বীপীয় ভালো ক'রে চর্চ্চা ক'রতে পায় না; মালাই বলে, চল্‌তি যবদ্বীপীয় জানে যাকে Ngoko 'ঙক' বা 'তুই-তো-কারী ভাষা' বলা হয়), সাধু যবদ্বীপীয় যা রাজা-রাজড়ার ঘরে সম্মানিত লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে ব্যবহার করা হয়—যে ভাষাকে Kromo 'ক্রম' ভাষা বলে—সেটা ভালো ব'ল্‌তে পারে না। ক'লকাতায় দুই চারিটী ইংরেজ-বনা বাঙালীর ঘরে যেমন ছেলেরা ইংরেজিরই বেশী চর্চ্চা করে, ভাঙা হিন্দি বলে, বাঙলা বলে না, বা ভালো ব'ল্‌তে শেখে না—এ সেই রকম। Nationalismএর সঙ্গেও এ জিনিস বেশ চলে—যবদ্বীপেও তাই দেখলুম। ছোটো ছেলেপুলেগুলি বাড়ীতেই পড়াশুনা করে। খুব ছোটোগুলি কখনও কখনও আমাদের ঘরের বারান্দায় আস্‌ত, এদের দুচার জনের সঙ্গে আমরা ভাবও ক'রে নিয়েছিলুম। প্রত্যেক ছেলের পিছনে একজন ক'রে ঝি, এরা ছেলেদের নিয়ে একটু বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাকৃত।

কর্ত্তা বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর বাসগৃহ আর একটি মহলে।

যবদ্বীপের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রথম দিনেই হ'ল। রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য যবদ্বীপীয়েরা চেষ্টা ক'রছে—আমাদেরই মতন। এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটী হয় নি বটে, কিন্তু ভালো ভালো ইস্কুল অনেক আছে, সেখানে মোটামুটি একটা কার্য্যকর শিক্ষা মালাই আর ডচ্ ভাষার সাহায্যে ভদ্রঘরের ছেলেরা পায়, আর বিত্তর ছেলে হলাণ্ডে প'ড়তে যায়—আইন, ডাক্তারী, ইন্‌জিনিয়ারিং। ডচ্ ছাড়া ইংরিজি কি ফরাসী কি জারমান জানে, এমন শিক্ষিত যবদ্বীপীয় যথেষ্ট আছে। সম্প্রতি এখানেই কতকগুলি ইউনিভার্সিটী করবার চেষ্টা হ'চ্ছে। আমরা যেদিন প্রথম বাতাবিয়ায় পঁহুছুই, তার দুই এক দিন আগে সেখানে একটি বড়ো ডাক্তারী ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল—এটিকে অবলম্বন ক'রে এখানকার মেডিকাল-ইউনিভার্সিটী গ'ড়ে উঠবে। তেমনি আর কতকগুলি বড়ো বড়ো ইস্কুলকে অবলম্বন ক'রে এখানকার ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স, আর্ট্‌স্, এন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি দিক গুলি গ'ড়ে তোলা হবে। যা হোক, যবদ্বীপীয়েরা মোটামুটি ইউরোপীয় শিক্ষা পাচ্ছে; দ্বীপময় ভারতের অন্য অংশেও এই রকম সরকার কিছু কিছু অধিকার এদের দিয়েওছে। বাতাবিয়ায় লেজিস্লেটিভ-আসেম্ব্লি ক'রেছে—সেখানে সমগ্র দ্বীপময় ভারত থেকে প্রতিনিধি আসে। এই আসেম্ব্লির ক্ষমতা কতটুকুন, তা জানি না। যবদ্বীপীয়েরা স্বায়ত্ত-শাসন বা পূরো স্বরাজ চায়। এই স্বরাজ-চেষ্টা সমস্ত দ্বীপগুলির শিক্ষিত লোকেরা মিলিত ভাবে ক'র্‌ছে। সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের সরকারী ডচ নাম হ'চ্ছে Nederlandsch Indie; ওখানকার স্বরাজীদল এ নাম ব্যবহার ক'রতে চান না, তাঁরা বলেন, Indonesia—দ্বীপময়-ভারত; এই নামে Nederland শব্দ না থাকায়, এদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে না। আমাদের দেশকে খালি India না ব'লে, ক্রমাগত যদি British India বলা হ'ত, তা হ'লে আমাদেরও জাতীয় আন্দোলনে এই রকমের একটা নাম-সঙ্কট এসে যেত। দ্বীপময় ভারতের অনেক ডচ অধিবাসী, বিশেষ ক'রে ডচ্ আমলা-তন্ত্র, এই নাম শুন্‌লে বা লেখায় দেখলে চ'টে আগুন হয়—যদিও এর বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই। স্বরাজী দ্বীপময়-ভারতীয়েরা নিজেদের আর যবদ্বীপীয়, সেলেবেস-দ্বীপীয়, সুমাত্রা-দ্বীপীয় বলে না, তারা নিজেদের বলে Indonesian. ওখানে এই স্বরাজ-কামনার বিরোধী ডচেদের দল ও আছে—আমলা-তন্ত্র, ব্যবসায়ী, আখের ক্ষেতের চিনির কারখানার মালিক, চা-কর, কফি-কর প্রভৃতি,—আমাদের দেশের অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা যেমনভাবে 'স্বরাজ' 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি শব্দ শুনে ক্ষেপে হ'ত, এরাও Indonesia, Indonesian প্রভৃতি শব্দের উপর ও তেমনি ভার পোষণ করে। অথচ Indonesia নামটি ইউরোপীয়দের দেওয়া; Dutch East Indies, East Indian Archipelago, Malaysia, প্রভৃতি অবড়-জঙ্গ নাম সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায়,—আর

এই দ্বীপগুলি যে সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতবর্ষেরই অংশ সে-কথা সম্বন্ধে সকলেই সচেত থাকায়, এক-শব্দময় অথচ সুশ্রাব্য একটি নামের অভাব ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই অনুভব করেন। ডচ পণ্ডিত ও লেখক Douwes Dekker (যিনি Multatuli এই ছদ্মনামে নিজ লেখা প্রকাশ ক'রতেন) গত শতকের ষাঠের কোটায় 'দ্বীপময়-ভারত' অর্থে Insulindia নামটী প্রথম ব্যবহার করেন। তারপরে জারমান পণ্ডিত A. Bastian গত শতকের আশীর কোটায় দ্বীপ-অর্থে লাটিন insula শব্দের পরিবর্ত্তে গ্রীক nesos শব্দ দিয়ে Indonesia শব্দ সৃষ্টি ক'রে ব্যবহার ক'রতে থাকেন। এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত নামটী বৈজ্ঞানিক আর অন্যান্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ ক'রলেন। 'মালাই' ভাষা যে বৃহৎ ভাষা গোষ্ঠির শাখা, সেই গোষ্ঠির জন্য Indonesian শব্দ ব্যবহৃত হ'তে লাগল, আর এখন এই গোষ্ঠির ভাষা যারা বলে, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত লোক তারা সকলেই Indonesian শব্দ আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। [সভ্যতায় আর ধর্ম্মে প্রাচীনকালে যে-সব দেশ ভারতবর্ষেরই অংশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, যাদের নিয়ে 'বৃহত্তর ভারত' সেই-সব দেশের এই রকম সব নূতন-পুরাতন নাম-করণ বেশ হ'য়েছে ; আমাদের দেশ হ'ল India ; আফগানিস্থান হ'চ্ছে, India Meion বা India Minor অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভারত বা প্র-ভারত (যেমন Asia Minor)—এ নাম গ্রীক আর রোমানদের দেওয়া ; প্রাচীনকালের মধ্য-এশিয়ার নামকরণ এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ক'রেছেন Serindia, অর্থাৎ Seres বা চীনা আর ভারতের মিলনস্থান ; দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে Indochina, এখানেও ভারত আর চীনের সভ্যতার সম্মিলন—তবে মধ্য-এশিয়ার চেয়ে এখানে ভারতের প্রভাব বেশী ;—(খালি আনামীদের বাদ দিতে হয়, এদের চীনা ব'ললেই হয়।) Indochina-র অধীনে পড়ে কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন-চীন, লাওস, আনাম— আর শ্যাম আর বর্ম্মাকেও এর মধ্যে ধরা যায় ; আর মালাই-দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে হ'ল Insulindia বা Indonesia—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও এর মধ্যেই পড়ে।] যা হোক, Indonesian স্বরাজীদল নানা দিক দিয়ে কাজ ক'রছেন। দ্বীপময় ভারতের সব বড়ো শহরে এঁদের নানা প্রতিষ্ঠান আছে, ডাক্তারখানা আছে, ছাত্রাবাস আছে ; দেশের মুসলমান ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রেও এঁরা কাজ করেন। সাহিত্য-প্রচার, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, এ সবের মধ্য দিয়েও কাজ করেন ; ডচ আর রোমান-মালাই, এই দুই ভাষা ব্যবহার করা হয় ; তাতে ক'রে সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে এঁদের প্রভাব দেখা যায় ; মাঝে মাঝে আমাদের কংগ্রেসের আর জেলা আর প্রাদেশিক সম্মেলনের মতন সম্মেলনও আহ্বান করেন। এঁরা উপস্থিত কি কি জিনিস চান, তা আলোচনা করবার সুযোগ হয় নি ; তবে দেশী লোকে বেশী ক'রে সরকারী চাকরী পায় এটা একটা প্রধান কথা। শ্রীযুক্ত সুযান অন্যান্য শিক্ষিত যবদ্বীপীয়দের মতন এই স্বরাজদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; আর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুতম হ'চ্ছেন সুরাবায়ায় এই জাতীয় আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। সৌজন্যের অবতার, অতি সজ্জন এঁরা। ডাক্তার সুতম শুনলুম সরকারী চাকরী ক'রতেন, রাজনৈতিক মতভেদের কারণে চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। এইরূপ অসহযোগী ব্যারিষ্টার আর অন্য পেশার ভদ্রলোক এঁদের মধ্যে আছেন। সুরাবায়াতে এই স্বরাজীদের একটী চমৎকার প্রতিষ্ঠান আছে।—একটী লাইবেরী আর ক্লাব-ঘর ; এখানে এঁদের সভা-টভা হয়। একটী বেশ বড়ো বাড়ীতে এঁদের এই ক্লাব, ক্লাবটীর নাম—Indonesische Studieclub—অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতীয় অনুশীলন-সমিতি। শ্রীযুক্ত সিঙ্গিঃ (R. P. M. Singgih) নামে একটী ভদ্রলোক—এঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়েছিল—ইনি হ'চ্ছেন এর সেক্রেটারী। আজ সকালে স্থির হ'ল, পরশু রবিবার দিন বেলা দশটায় এই Studieclub-এ আমি ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবো। ইংরেজী থেকে মালাইয়ে কিংবা ডচে আমার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হবে।

দুপুর বেলা শ্রীযুক্ত যাষ তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন—যে ক'দিন আমরা থাকবো, সে ক'

এ এখানে থেকে আমাদের দেশের রান্না—ডাল ভাত শাক রুটী প্রভৃতি খাওয়াবে।

বিকেল তিনটেয় শহর দেখতে বেরুলুম—স্থানীয় শিল্পদ্রব্য আর 'কিউরিও'-র সন্ধানে; ভীষণ রোদ্দুর, দোকানপাট সব বন্ধ—সেই চারটের পর খুলবে। ট্রামে ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে শহরটায় খানিকটা ঘুরে এলুম।

বিকেল পাঁচটায় ছিল কবির সংবর্দ্ধনার জন্য স্থানীয় ভারতীয়দের আহূত এক সভা। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা ছিল। সুরাবায়ার রেসিডেণ্ট, স্থানীয় ব্রিটিশ ভাইস্-কন্সাল্, চীনের কন্সাল্, এঁরা সকলে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন করা হ'ল, শ্রীযুক্ত ঝাম অভিনন্দন-প্রশস্তি প'ড়লেন, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতির নিদর্শন-স্বরূপে হাজার-এক টাকার তোড়া দেওয়া হ'ল। উপস্থিত ভদ্রলোকেদের মধ্যে কেউ কেউ ব'ললেন—ইংরেজ ভাইস্-কন্সালের বক্তৃতাটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। নানা জাতির লোক এই সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। Hagopian নামে এক আরমানী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল; এঁরা দুপুরুষ ধ'রে এ অঞ্চলে চিনের আর অন্য জিনিসের কারবার ক'রছেন, দু'ভাইয়ে আপিসের বা গদীর মালিক,নানা দেশ ঘুরেছেন। আরমানী জা'তের সম্বন্ধেও কিছু খোঁজ-খবর রাখবার চেষ্টা ক'রে থাকি দেখে ভদ্রলোক ভারী খুশী। আমাদের বাড়ী যে রাস্তায়, সে রাস্তা Sukias 'সুকিয়াস্' নামে একটী প্রাচীন আরমানী পরিবারের নামের সঙ্গে জড়িত; ১৬৯০ সালে Job Charnock যোব চার্ণকের সঙ্গে ইংরেজদের ক'লকাতায় এসে অড্ডা গাড়বার অনেক আগে থাকতেই আরমানীরা বাণিজ্য-সূত্রে এখানে এসে বাস ক'রত,—১৬৩০ সালের এক আরমানী স্মৃতিফলকের লেখা থেকে জানা যায়—সমাধির উপরে স্থাপিত এই স্মৃতিফলকে এই কথা আছে যে ১৬৩০ সালে দানশীল বণিক সুকিয়াস্-এর পত্নী রেজাবাবে-র সমাধি,—এটী হ'চ্ছে ক'লকাতার ইতিহাস-সম্পর্কে সব চেয়ে প্রাচীন সমসাময়িক "পাথুরে' প্রমাণ।" ব্যবসায়-বিষয়ে এই আরমানীদের প্রভাব থেকে উত্তর ক'লকাতার একটী গঙ্গার-ঘাটের নাম 'আরমানী ঘাট'। এ সব কথা শুনে ভদ্রলোক খুবই আনন্দিত হ'লেন। বাস্তবিক, এই সব ইতিহাসে অজ্ঞাত আরমানী আর অন্য জাতির বণিকেরা সেকালে আন্তর্জাতিক শান্তি আর সহযোগিতার জন্য দূতের কাজ ক'রত; মানুষকে এক ক'রে তুলতে এদের কাজের গৌরব আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই।

সভাভঙ্গের পরে শ্রীযুক্ত লোকুমল নিয়ে গেলেন তাঁর দোকানে। 'কেম্বুড়-জেপুন' রাস্তাটীর নাম, এর দুধারে সিন্ধীদের রেশমের কাপড় আর মণিহারী জিনিসের কতকগুলি দোকান। বলিদ্বীপে যাবার সময়ে শ্রীযুক্ত লোকুমল বিতরণ করবার জন্য ডচ ভাষায় গীতা আর অন্য কতকগুলি বই দিয়েছিলেন, সেকথা ব'লেছি। বলিদ্বীপের হিন্দুদের কথা ইনি শুনতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে দুচার কথায় কিছু কিছু ব'ললুম। তারা যে ঠিক আমাদের মতন হিন্দু নয়, তাদের ইতিহাস আর মনোভাব যে অনেকটা স্বতন্ত্র—তবুও তাদের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি কাজ ক'রছে, এ-সব কথা বোঝাবার চেষ্টা ক'রলুম। লোকুমল জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তারা মাংস খায় কি না। পূজায় শূয়রের মাংস দেওয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজনে 'রোস্ট্ ডাক্' এ-সব শুনে তাঁর ভালো লাগ্‌লনা; আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা গোমাংস খায়, একথা শুনে তিনি ব'ললেন,—'কৈসে পতিৎ ভ্রষ্টাচারী হো গয়ে হৈঁ! বাবুজী, ইন্‌হেঁ ঐসী শিক্ষা দেনা চাহিয়ে, কি জিস্‌সে অপনে জীবন পর ইন্‌কী ঘৃণা হো জায়।'—আমি ব'ললুম - খবরদার না, এমন শিক্ষা যদি আমরা দিতে চাই, যাতে ক'রে এদের নিজেদের জীবনে ঘৃণা হ'য়ে যায়, তা হ'লে আমরা এদের হারাবো; হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা নিয়েই এদের সঙ্গে বা এদের মধ্যে কাজ ক'রতে হবে। তারপরে প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ নিয়েও কথা হ'ল। মোটের উপর, ভদ্রলোক স্বীকার ক'রলেন যে এদের সামাজিক সংস্কার দিকে, এদের চিরাচরিত রীতিনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত; অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত; সিন্ধু দেশে মুসলমানদের ছোঁয়া খেলে, বা পাশাপাশি চুলায় মুসলমানের সঙ্গে রুটী

পাকালে হিন্দুর জা'ত যায় না, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশে যায়, বা যেত—এসব কথার মধ্যে কোন্ নীতি আছে তাও ভেবে দেখার আবশ্যকতা ইনি স্বীকার ক'রলেন।

লোকুমল তার পরে কবির কাছে এসে তাঁর দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবার জন্য কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। কাল বিকালে ওখানে কবি চা খাবেন স্থির হ'ল। রাত্রে আহারের সময়ে শ্রীযুক্ত সুষানের এক বন্ধু এলেন। হলাণ্ডের Utrecht উট্রেখ্ট্ নগরে আর অন্যত্র পাঁচ বছর ছিলেন। ইনি বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত। খেতে খেতে এঁর সঙ্গে ফরাসীতে কথাবার্তা হ'ল। আহারের যবদ্বীপীয় আর ইউরোপীয় পদের সঙ্গে সঙ্গে ঝান্দের বাঁধুনীর তৈরী দেশী খাদ্য রুটী তরকারী হালুয়া এত দিন পরে অতি উপাদেয় লাগ্‌ল।

শনিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর।—

আজ সকালে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো, শ্রীযুক্ত সুষান আর তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সিজির সঙ্গে কবিকে আর আমাদের নিয়ে এক গ্রুপ ছবি তোলা হ'ল। তার পরে আমরা শহরে বেড়াতে আর শিল্প-দ্রব্য কিন্‌তে গেলুম। Inlandsch Kunst বা দেশীয় শিল্প ভাণ্ডারের একটা বড়ো দোকানে নানা জিনিসের সংগ্রহ দেখলুম। একটী ডচ মহিলা এই দোকানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের শান্তি-

সুরাবায়ায় রবীন্দ্রনাথ

উপবিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ, বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো

দণ্ডায়মান (বাম হইতে)—সুরেন্দ্রনাথ, প্রবন্ধকার, বাকে, সুষান, সিজি, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

নিকেতন বিদ্যালয়ের কলাভবনের জন্য আমাদের সংগ্রহ হ'চ্ছে শুনে Dr. Klaverweiden নামে একটী ডচ চিকিৎসকের কথা ব'ললেন—তাঁর সাহায্যে প্রাচীন জিনিস, বিশেষতঃ মোষের চামড়ায় কাটা Wajang ওয়াইয়াং বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত পুতুল আমরা সংগ্রহ ক'রতে পারবো। পরে আমরা এই দোকান থেকে কতকগুলি পিতলের ঘণ্টা বা ঘড়ি আর অন্য তৈজস কিনি। এই মহিলাটী ব্রঞ্জে তৈরী একটা পুরাতন যবদ্বীপীয় শিবের মূর্ত্তি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের দিলেন। এ মূর্ত্তিটী এখন বিশ্বভারতী কলাভবনে আছে।

বিলাতের New Statesman পত্রিকায় মিস্-মেয়োর সমালোচনায় মিথ্যা ক'রে কবির সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হ'য়েছিল, তার প্রতিবাদ কবি বলিদ্বীপের মুণ্ডুক থেকে লিখে Manchester Guardian এ পাঠিয়ে দেন। সুরাবায়ায় এসে শোনা গেল, মিস্-মেয়োর বই আর ঐ সমালোচনা হলাণ্ডে বিশেষ ভাবে প্রচারের চেষ্টা হ'য়েছে। আর হলাণ্ড থেকে ঐ সব মিথ্যা কথা যবদ্বীপে ডচেদের মধ্যেও প্রচারিত হ'চ্ছে। দু চার জন ডচ বন্ধু ব'ললেন, Manchester Guardian এর জন্য লিখিত চিঠিখানি ইংরিজীতে আর ডচ অনুবাদে যবদ্বীপেও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঝাম্ব মূল ইংরিজি চিঠিখানি ছাপিয়ে দেবার ভার নিলেন, আর শ্রীযুক্ত দ্রেউএস্ এটির ডচ অনুবাদ ক'র্বেন। কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদক এই চিঠি প্রকাশ ক'রবেন, স্থির হ'ল।

সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বে মাইল কতক দূরে প্রাচীন নগরী Modjopahit মজপহিৎ-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। শ্রীযুক্ত Maclaine Pont মাকলেন্-পণ্ট নামে যবদ্বীপীয় প্রত্ন বিভাগের কর্ম্মচারী এক ডচ পণ্ডিত এখন এইখানে অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভিটা রীতিমত খুঁড়ে অনেক প্রাসাদ মন্দির আর ভাস্কর্য্যের আর অন্য শিল্পের নিদর্শন বা'র ক'রেছেন—এসব থেকে যবদ্বীপের হিন্দুযুগের শেষ দুই তিন শতকের নানা বস্তু লোকচক্ষের সামনে প্রকাশিত হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ আর পঞ্চদশ শতকে যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতা কতটা উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রেছিল, তা এই সব জিনিস থেকে বোঝা যায়। মজপহিতের কাছেই Trawoelan ত্রাবুলান গ্রামে শ্রীযুক্ত মাক্‌লেন পণ্ট থাকেন, তাঁর আপিস সেখানে। ত্রাবুলান আর মজপহিৎ যেতে পড়ে Modjokerto 'মজকর্ত্ত নামে একটী ছোটো শহর, এখানে একটী ছোটো মিউজিয়মে আগেকার কালে প্রাপ্ত অনেকগুলি মূর্ত্তি আর অন্য ভাস্কর্য্য রক্ষিত আছে। স্থির হ'য়েছিল, সুরেন বাবু, ধীরেন বাবু, বাকে, দ্রেউএস্ আর আমি সকলে মিলে মোটরে গিয়ে মজকর্ত্ত মিউজিয়ম দেখবো, তার পরে মজকর্ত্ত থেকে ত্রাবুলানে টেলিফোন ক'রে জান্‌বো শ্রীযুক্ত মাকলেন-পণ্ট ওখানে এখন আছেন কিনা, আর মজপহিতের ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখাবার ব্যবস্থা ক'র্তে পারবেন কি না। কবিকে অবশ্য এতটা পথ এই রোদ্দুরে নিয়ে যাওয়া হবে না।

শ্রীযুক্ত ঝাম্বের আনা মোটর ক'রে আমরা সাড়ে দশটায় যাত্রা ক'রলুম। এই অঞ্চলটা বিশেষ ভাবে উর্ব্বর, তাই লোকের বাস ও এখানে খুব। সমস্ত পথ ধ'রে লোকের ভীড় কখন ও কমে না। রঙীন সারং সাদা কোর্ত্তা প'রে যবদ্বীপীয় মেয়ে আর পুরুষের দল; কিন্তু বলির আর বাতাবিয়ার লোকেদের সঙ্গে তুলনা ক'রে এখানকার লোকেদের একটু ময়লা রঙের একটু কুশ্রী ব'লেই বোধ হ'ল। গোরুর গাড়ীর সারি, তাতে বস্তা-বন্দী হ'য়ে ধান চাল চ'লেছে, তরী-তরকারী চ'লেছে; শহর ছাড়িয়ে ক্রমাগত ক্ষেতের সারি, আর মাঝে মাঝে ঘন-বসতি পল্লী; রাস্তার ধারে খাবারের দোকান—পসারিনীর দল যুড়ি ক'রে ভাত তরকারী নিয়ে নানা রকম ফল নিয়ে ব'সেছে। 'কালি মাস' বা স্বর্ণনদী ব'লে একটী নদী রাস্তার ডান ধার দিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে খাল। ধুলো উড়িয়ে আমাদের গাড়ী চ'লেছে, আর চারিদিকে কড়া রোদ্দুর; হাওয়া না থাক্‌লে প্রাণ অস্থির হ'ত। সওয়া ঘণ্টা এই রকম ভাবে চ'লে আমরা মজকর্ত্ত-য় পঁউছালুম। দেশটা সবুজে ভরা। মজকর্ত্ত শহরটী খুব সুন্দর। বাড়ীগুলি একতালা। কাঠের বা ছেঁচা-বাঁশের তৈরী, অত্যন্ত হাল্কা ভাবে তৈরী; কিন্তু

প্রায় প্রত্যেক বাড়ির চারিদিকে একটু ক'রে বাগান থাকায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মিউজিয়ম বাড়ীর সামনে মোটর থাম্‌ল। ছোটো একতালা বাড়ী, ঘাসে ঢাকা একটুখানি হাতার ভিতরে। রাস্তার উপরে সদর দরজায় বা ফটকে দু একটী যবদ্বীপীয় মেয়ে ফুলের পসরা নিয়ে ব'সে আছে। আমাদের দেখে মালাই ভাষায় ফুল কিন্‌তে ব'ললে। মিউজিয়মের দরজায় ফুল! ভ্রেউএস বুঝিয়ে দিলেন—মিউজিয়মে ঢুকতেই একটি মূর্ত্তি আছে, সেটাকে এখনও স্থানীয় লোকেরা পূজা করে। ভ্রেউএস জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ব্যাপারটি আমাদের ব'লছেন, এমন সময় একটি চীনা স্ত্রীলোক, আর ছোটো শিশু সহিত একটী যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোক এল। এরা গোটাদুই ক'রে পয়সা দিতে, ফুলওয়ালী কিছু ফুল নিয়ে কলাপাতা জড়িয়ে এদের প্রত্যেককে দিলে, আর এক টুকরো ক'রে কাঠ দিলে। এদের সঙ্গে আমরাও মিউজিয়মের হাতার ভিতরে ঢুকলুম। মিউজিয়ম বাড়ীর দরজার গোড়ায় দেখি, একটি বৃহৎ পাথরের গরুড় মূর্ত্তি, ভগ্ন অবস্থায়, দেওয়ালের ধারে রাখা; মূর্ত্তিটীর সামনে একটি ধুহুচীতে সুগন্ধ ধূপকাঠ জ্ব'লছে, আর তার গায়ে আর আশে-পাশে ফুল ছড়ানো। মিউজিয়মের তত্ত্বাবধানে আছে এক বুড়ো যবদ্বীপীয়—নামে মাত্র মুসলমান। সে আমাদের সেলাম ক'রে দাঁড়াল, আর স্ত্রীলোক দুটিকে দেখে তাদের হাত থেকে ফুল নিলে, কাঠের টুক্‌রো দুটী নিলে। যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোকটী বুড়োকে কতকগুলি কি কথা ব'ললে—যেন কোন্ বিষয়ে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রতে হবে সে কথা ব'ললে। বুড়ো এই স্ত্রীলোকের দেওয়া ফুলগুলি পাতার দোনা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে মূর্ত্তিটীর গায়ে কোলে ছড়িয়ে দিলে, কাঠের টুকরোটী নিয়ে সামনের ধূপদান বা ধুহুচীতে ফেলে দিলে; বুঝলুম কাঠটি চন্দন বা অন্য কোনও সুগন্ধি কাঠ। বিড়-বিড় ক'রে কি মন্ত্র প'ড়তে লাগল। তার পরে কিছু ফুল ঠাকুরের গা থেকে তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দিলে, স্ত্রীলোকটী ভক্তির সঙ্গে সেগুলি দুহাতে ক'রে নিলে। তার পরে মূর্ত্তির পায়ের কাছে দুটী পয়সা রেখে (এ পয়সা বুড়ো সঙ্গে সঙ্গেই তুলে নিলে) আর বুড়োকে দুটি পয়সা দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মূর্ত্তিকে প্রণাম ক'রে সঙ্গের ছেলেটিকে দিয়ে প্রণাম করিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চ'লে গেল। চীনা স্ত্রীলোকটিও এইভাবে বুড়োর সাহায্যে পূজা সমাপন ক'রে চলে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলুম। ভ্রেউএস্ ব'ললেন, এরা এখনও মনে-প্রাণে হিন্দুই আছে, তবে সাবেক পূজা-পদ্ধতি ভুলে গিয়েছে,—নমাজও পড়ে, হজ্জেও যায়, আবার দেশে এইভাবে পূজোও করে—কি পূজো কাকে পূজো সে-সব কিছু জানে না। বুড়ো এদিকে আমাদের মিউজিয়ম্ দেখাবার জন্য তৈরী হ'ল। আমাদের দিকে প্রশ্নসূচক ভাবে তাকালে—জানবার উদ্দেশ্য, আমরাও প্রচলিত রীতিতে পূজো দেবো কিনা। বোধহয়, ডচ্ আর স্থানীয় ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে এই রকম পূজো ঠাকুরটী পেয়ে থাকে। আমি আমার ভাঙা মালাইয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ঠাকুরটি কে, এর নাম কি। সে ব'ললে, এর নাম 'জিঙ্গ' (Djinggo)। কথাটীর মানে কেউ ব'লতে পারলে না। নানাস্থানে এইরূপ ভাঙা ঠাকুরে এখনও মুসলমান যবদ্বীপীয়দের পূজা খেয়ে থাকেন। খাস সুবারায়া শহরে এইরূপ একটী ঠাকুর আছেন, তার কথা পরে ব'লবো। আমি তারপরে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, ফুল চড়ালে কি হয়। সে ব'ললে, 'বরকৎ' আর 'সালামৎ' অর্থাৎ সৌভাগ্য আর শান্তিসুখ বাড়ে, অসুখ-বিসুখ হয় না। অর্থাৎ পীরের দরগায় পূজো দিয়ে আমাদের দেশেও তথাকথিত মুসলমানেরা আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে-সব জিনিসের কামনা ক'রে থাকে, এখানকার নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা, পীরের গোরের মাটির ঢিবির বা ইটের স্তূপের বদলে, তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বারা পূজা কার্য্যে ব্যবহৃত একটি মূর্ত্তি জুটিয়ে নিয়ে তারই পূজো চালিয়ে আসছে। অথচ লোকে ভাবে—ধর্ম্মভাবের প্রেরণাটা ঠিক রইল, খালি অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠানের সাধন একটুখানি বদলানোতেই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন ঘ'টল, আর এতেই মানুষের সমগ্র অতীতের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিন্ন হ'ল।

মিউজিয়মে পূর্ব্ব-যবদ্বীপের কীর্ত্তিই বেশী। কতকগুলি বিখ্যাত মূর্ত্তি এখানে আছে। মজকর্ত্ত-য় প্রাপ্ত কতকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি এখন বাতাবিয়া মিউজিয়মে আছে—তার মধ্যে কুম্ভধারী নর ও নারীর দুটী মূর্ত্তি

সুন্দর লেগেছিল; এদের কাঁধের কলসী থেকে ফোয়ারার জল প'ড়ত। বিকটাকার গরুড়ের উপরে আসীন বিষ্ণুমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি রাজা এর্লঙ্গের; মৃত্যুর পর তাঁর ইষ্টদেবতা বিষ্ণুতে তাঁর আত্মা বিলীন হয়, তাই রাজাকেই বিষ্ণুরূপে দেখানো হ'য়েছে। অন্য নানা মূর্ত্তির মধ্যে একটী খোদিত চিত্র দেখালে—সীতা আর লবকুশের; যবদ্বীপের শেষ হিন্দুযুগের কীর্ত্তি এটি।—আমরা ছোটো মিউজিয়মটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম।

কুম্ভধারী নর
(মজকর্ত্ত নগরে প্রাপ্ত, বাতাবিয়ায় রক্ষিত)

তারপরে শ্রীযুক্ত মাকলেন-পন্ট্ ত্রাবুলান-এ আছেন কিনা জানবার জন্য আমরা মজকর্ত্ত-র টেলিফোন্-আফিসে গেলুম। ডচেরা টেলিফোনের প্রসার খুব ক'রেছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে মেয়েরা কাজ ক'রছে প্রায় সকলেই দেখলুম মেটে-ফিরিঙ্গি, মিশ্র

কুম্ভধারিণী নারী
(মজকর্ত্ত নগরে প্রাপ্ত, বাতাবিয়ায় রক্ষিত)

ডচ-যবদ্বীপীয়। ত্রাবুলানের সঙ্গে লাইনের যোগ ক'রে স্ত্রেউএস খবর পেলেন যে মাকলেন-পন্ট ত্রাবুলানে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। তিনি না থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে সব দেখা হ'য়ে উঠবে না,—অগত্যা এ যাত্রা মজ-পহিতের ধ্বংসাবশেষে দেখার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে হ'ল।

টেলিফোন-আফিসে ডচ আর মালাই ভাষায় নানা সরকারী ইস্তাহার ঝুলছে। জনসাধারণের বসবার জাগা আর এক্সচেঞ্জের ভিতরটা—এই দুইয়ের মাঝে একটী পিত্তলের

রেলিং আছে। সেই রেলিং-এ টাঙানো একটী ইস্তাহারের প্রতি নজর প'ড়ল—দেখি, তার তলায় পেন্সিলে কাঁচা

সীতা ও লব-কুশ
(মজকর্ত্ত সংগ্রহশালা)

হাতের বাঁকা অক্ষরে বাঙলায় লেখা—"আবদুল ছোবানকে টেলিফম করিতেছে নুর মহমাদ।" এই সুদূর পূর্ব্ব যবদ্বীপের একটী ছোট শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঙলা লেখা চোখে প'ড়ল; এখানেও বাঙালী ব্যাপারীরা তা হ'লে যাওয়া আসা করে। দেশে আমরা ক'জনই বা সে খবর রাখি? মনটা একটু বেশ খুশী হ'ল—আত্মীয় বা বন্ধু আব্‌দু-স্‌-সোব্‌হান্‌-কে কোনও খবর পাঠাতে এসে বঙ্গ-সন্তান নূর মোহম্মদ সময় কাটাবার জন্য টেলিফোন আফিসে এই যে কয়টী কথা বাঙলা হরফে লিখে রেখেছিল তা দেখে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে আমাদের মত লোক এসে তার এই লেখা দেখ্‌বে। সঙ্গীদের লেখাটী দেখালুম, আর আপিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—'কিলিং বা বাঙালী—অর্থাৎ মান্দ্রাজী বা উত্তর-ভারতীয় লোক—এ অঞ্চলে আছে কি না, আর কোথায় তারা থাকে, তারা সংখ্যায় কত।' উত্তর পেলুম—অনেক কিলিং আছে, মজপহিতে বাজারে থাকে তারা, সুরাবায়া থেকে আসে, 'কাইন' বা বিলিতি কাপড় ফেরী ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঘোরে। যে কাজটা বলিদ্বীপে আরব ব্যবসায়ীরা ক'রছে, এ-অঞ্চলে তা হ'লে বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীরা তার কিছুটা হাতে নিয়েছে। এ রকম দু একটী দেশবাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও খুশী হ'তুম।

যা হোক, সুরাবায়ায় ফিরলুম—প্রায় বেলা পৌনে দুটোর সময়ে।

চারটেয় শ্রীযুক্ত লোকুমল এসে কবিকে আর আমাদের তাঁর দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকান ঘরটী সেদিন তিনি খুব সাজিয়েছেন, ভালো ভালো গাল্‌চে, রেশমের কাপড়, ছাপা কাপড়, শাল,—সব দিয়ে চার দিক মুড়ে দিয়েছেন। কতকগুলি সিন্ধী হিন্দু আর গুজরাটী মুসলমান বেনিয়া নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। ফ্ল্যাশ-লাইট্‌ ফোটো নেওয়া হ'ল; আর চা আর ভারতীয় মিষ্টান্ন দেওয়া হ'ল। কবির আগমনে লোকুমল শেঠ একেবারে কৃতার্থ। তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিটাবে আর বিশ্বভারতীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি জানিয়ে তিনি একটী থ'লে ক'রে সওয়া শ' গিলডার আর খানদতক অতি সুন্দর যবদ্বীপের বিশিষ্ট শিল্প 'বাতিক' কাপড় কবির সাম্‌নে ধ'রে দিলেন। এখানকার অনুষ্ঠান চুকে যেতে, আর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ওয়াসিয়ামল কবিকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রলেন, ফিরতী পথে তাঁর দোকানেও কবিকে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে হবে। সেখানে পঁউছুতে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য একান্ন গিলডার দিলেন, আর কবির সামনে ভারতীয় কাজ একটি হাতির দাঁতের বাক্স আর কিছু 'বাতিক' কাপড়ও ভেট ক'রলেন।

সন্ধ্যেয় শ্রীযুক্ত সুখানের বৈঠকখানায় কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত যবদ্বীপীয় যুবকের সমাগম হ'ল। বৈঠক-

খানা ঘরটী চেয়ারে টেবিলে যবদ্বীপীয় টুকিটাকি শিল্প দ্রব্যে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে, ইউরোপীয় কেতায় সাজানো। এঁরা কবির সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা ক'রবেন, কবির কথা শুনবেন। সংখ্যায় এঁরা প্রায় ১৪।১৫ হবেন। ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী, বণিক, কাগজের সম্পাদক, সরকারী কর্ম্মচারী—অসহযোগ ক'রে সরকারী কাজ ছেড়ে দেওয়া—সব শ্রেণীর লোক ছিলেন। যদিও ইংরিজী-জানা লোক এদের মধ্যে ছিল, তবুও শ্রীযুক্ত বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন; কবি ইংরিজিতে যা ব'ললেন বাকে ডচ ভাষায় তা অনুবাদ ক'রে দিতে লাগলেন। এঁদের প্রশ্ন— প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মিল সম্ভব কিনা, আর কি উপায়ে তা সম্ভব হ'তে পারে। কবির উত্তরে যা ব'ললেন অতি সংক্ষেপে সে কথা হ'চ্ছে এই:— পার্থিব শক্তি আর ঐশ্বর্য্য নিয়ে এখন মারা-মারি কাড়াকাড়ি চ'লেছে, সে-দিক দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; যারা এই material দিকটা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল হবে না; কিন্তু মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনই যাদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তারা যদি এই intellectual আর spiritual দিক নিয়ে মিল করাবার চেষ্টা করেন তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরও সমাধান হ'তে পারবে। তার পরে এঁদের মধ্যে এই তর্ক উঠল, যতদিন পাশ্চাত্ত্য এসে সমস্ত material বিষয়ে প্রাচ্যকে exploit ক'রবে, ততদিন এই মিলের অন্তরায় যথেষ্ট; তবে হয় তো ভবিষ্যতের একটা বোঝা-পড়ার জন্য এই exploitation হ'চ্ছে একটা অবশ্যম্ভাবী stage বা সোপান। নানা কথায় প্রায় দু ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল—সাড়ে সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে নটা পর্য্যন্ত। এঁদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য আর সব বিষয়ে সচেতনতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত-বংশ-সুলভ সহজ সৌজন্য দেখে আমাদের খুবই সাধুবাদ দিতে হ'ল।

স্থানীয় ডচ্ সংবাদপত্র Indische Courant বা 'ভারতীয় বার্ত্তাবহ' পত্রের এক প্রতিনিধি এসে আমার কাছ থেকে আমাদের বলি-ভ্রমণ সম্বন্ধে, বিশ্বভারতী আর কবির আদর্শ, মিস্-মেয়োর বই, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অভিমত লিখে নিয়ে গেল।

রবিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর।—

ভোরে একটী প্রৌঢ় সিন্ধী ব্যবসায়ী এলেন, তাঁর স্ত্রী আর ছোটো একটা শিশুকে নিয়ে। এঁর নাম বালামল। লোকটীকে বেশ লাগ্‌ল। কবির কাছে নিজের কাহিনী ব'ললেন। বহু দিন ধ'রে এদেশে ব্যবসা ক'রছেন। পয়সা কড়ি কিছু ক'রেছিলেন, কিন্তু লোকসান হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হন, নানা পারিবারিক বিপদ আপদও মাথার উপর দিয়ে যায়। এমন কি মাঝে কাপড়ের বস্তা ঘাড়ে ক'রে দ্বারে দ্বারে ফেরি ক'রে বেড়াতে হ'য়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায় এখন আবার একটু গুছিয়ে নিয়েছেন। একটী পুত্র-সন্তান ও হ'য়েছে, তাইতে তার ভারী আনন্দ; শিশুটাকে এনেছেন—কবি তাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমাদের বলিদ্বীপের ভ্রমণের কথা শুনেছেন, সেখানে হিন্দু আছে জানেন। এদের মধ্যে শাস্ত্র-প্রচার হয় তাও চান। সুরাবায়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে Tosari তোসারি অঞ্চলের লোকেরা এখনও শ্রাদ্ধাদি নানা হিন্দু অনুষ্ঠান ক'রে থাকে; তাদের মধ্যে তিনি ঘুরে এসেছেন, সেখানেও আমাদের যাওয়া উচিত। বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর খুব সুখ্যাতি ক'রলেন। যবদ্বীপের লোকদের মধ্যে প্রাচীন আচার অনেক আছে, সে-বিষয়ে নানা কথা ব'ললেন। আমাদের বাসার কাছে একটা সাধারণের জন্য বাগান আছে, সেখানে একটা বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিটার নাম Djogdolok 'জগ্‌দলক্', এখনও যবদ্বীপীয়েরা এসে ফুল আর ধূপ দিয়ে এই মূর্ত্তির পূজো ক'রে যায়; স্থানটি মনোরম, বেশ ছায়া-শীতল,— অনেক সময়ে ফেরি ক'রে শ্রান্ত হ'লে ঐ খানে গিয়ে তিনি বিশ্রাম ক'রতেন। জায়গাটি গিয়ে দেখে আসতে আমাদের ব'ললেন। তার পরে তিনি বিদায় নিলেন।

আমরা এই দিন বিকালেই একটু ফুরসুৎ ক'রে এই 'জগ্‌দলক্' দেখে আসি। সাধারণ বাগান একটী, তার এক ধারে কতকগুলি গাছপালার মধ্যে একটু জায়গা বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। জমীটুকু ঘেরা। একটি উঁচু পীঠের উপরে আসীন মূর্ত্তিটী। প্রমাণ আকারের

বুদ্ধ মূর্ত্তি। সাম্‌নে আসন-পীঠের উপরে প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে তিন চার লাইন একটি লেখা আছে। মূর্ত্তিটার গলায় কতকগুলি ফুলের মালা, আর কোলে আর

সুরাবায়া নগরে পূজিত—অক্ষোভ্য বুদ্ধ মূর্ত্তি

পায়ের কাছে ফুল আর মালা প'ড়ে র'য়েছে। মূর্ত্তির সাম্‌নে একটি ধূপদানে অগুরু কাঠ আর ধুনো জ্ব'ল্‌ছে। আশে-পাশে ছোটো বড়ো নানা মূর্ত্তি, তার মধ্যে রাক্ষস মূর্ত্তি আছে; এগুলির পুজো হয় না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রতে ক'রতেই পুজো দিতে দুটী মেয়ে এল। একটি যবদ্বীপীয় পোষাকে, অন্যটি ইউরোপীয় পোষাকে। দেশী পোষাকে মেয়েটি জুতো খুলে মূর্ত্তির কাছে গেল, একজন আধাবয়সী যবদ্বীপীয় ব'সে ছিল, সে মেয়েটির হাত থেকে ফুল নিয়ে ঠাকুরে কোলে রাখলে, কিছু ফুল প্রসাদ-স্বরূপ তুলে নিয়ে তার হাতে দিলে; মন্ত্র-টন্ত্র পড়া হ'ল কিনা বুঝতে পারলুম না। সেবাইতের হাতে গুটিকতক পয়সা দিলে। পাশে একটা জলের কুণ্ড—জালার মত পাত্র, তা থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে এসে জুতো প'রে চ'লে গেল। সঙ্গে ইউরোপীয় পোষাকে যে মেয়েটি ছিল, সে জুতোও খুললে না, ভিতরে ঠাকুরের কাছেও গেল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। এই ভাবে পূজা সমাপন হ'ল।—এই বুদ্ধ মূর্ত্তিটী হ'চ্ছে অক্ষোভ্য বুদ্ধের, একটি খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের। পূর্ব্বপুরুষদের শৈব আর বৌদ্ধ ধর্ম্ম যবদ্বীপীয়েরা আর বাইরে বাইরে মানে না, কিন্তু তাদের পুরাতন ধর্ম্মের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে এখনও তারা একেবারে বর্জ্জন ক'রতে পারে নি।

বেলা দশটার সময়ে যবদ্বীপের Indonesische Studieclub-এ গিয়ে আমার বক্তৃতা দিতে হ'ল। ডাক্তার সুতম আর শ্রীযুক্ত সুয়ান আমায় নিয়ে গেলেন। ক্রেউএস ছিলেন। এই ক্লাবের বাড়ীটি বেশ, দেখে মনে হয় এর অবস্থা ভালো, কাজও ভালো চ'লছে। বক্তৃতার জন্য একটি বড়ো ঘর আছে। ঘরের দেয়ালে যবদ্বীপীয় নেতাদের ছবি, ছবির তলায় সরু তাল-জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে সাজানো। জন আশী লোক—অধিকাংশই যুবক আর ছোকরা; এদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা, মালাই,—চার শ্রেণীরই লোক আছে। ডচ খবরের কাগজের তরফ থেকে রিপোর্ট নেবার জন্য কতকগুলি প্রতিনিধিও এসেছেন; এঁরা ডচ। স্থানীয় কাগজে পরে আমার এই বক্তৃতার বেশ খুঁটিয়ে বিবরণ বেরিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ, আমাদের দেশের প্রাচীন আর আধুনিক শিক্ষার রীতি, বিশ্বভারতী,—এই সব কথা নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব'ললুম। খানিকটা ক'রে বলি, আর ক্রেউএস্ ডচে অনুবাদ ক'রে যান। তার পরে শ্রোতাদের কাছ থেকে ছ সাতটি প্রশ্ন হ'ল—ডচে আর মালাইয়ে। সবগুলিই আজকালকার ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সম্পর্কে। I. M. S. আর I. E. S.-এ যোগ্য ভারতীয়ের স্থান কতটুক, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠ্‌ল। অবস্থা দুই দেশেই প্রায় এক দেখে, শ্রোতাদের মধ্যে দু-চার জনের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ডাক্তার সুতম অতি চমৎকার ভাবে সভার কাজ

চালালেন। প্রায় সাড়ে বারোটাতে সভা ভাঙ্‌ল। তারপরে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কুলফী-বরফ খেতে খেতে এঁদের সঙ্গে খানিক গল্প করা গেল। শ্রীযুক্ত সুভম-র সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে ভারী আনন্দ হ'ল।

ডচ ডাক্তার Klaverweiden ক্লাফরভাইডন্‌-এর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল—ইনি বিশ্বভারতী কলাভবনের জন্য একটী মূল্যবান উপহার দিলেন—চমৎকার কাজকরা একটী সেকেলে কাঠের সিন্দুকে ক'রে অনেকগুলি Wajang 'ওয়াইয়াং' বা ছায়া নাট্যে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা আর খুব রঙচঙে আর সোনালী কাজকরা মূর্ত্তি।

ছুপুরে লোকুমলের ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাকে আর আমরা গেলুম, কবি বাসায় রইলেন। বাকে ধুতি আর পাঞ্জাবী প'রে যাওয়ায় সিন্ধীরা ভারী খুশী হ'ল। বাড়ীর নীচের তলায় দোকান, পিছনে গুদাম, উপরে মস্ত একটা হল-ঘরে দোকানের মালিক বা ম্যানেজার আর কর্ম্মচারীদের থাকার জায়গা। উপরেই খুব গালিচা বিছিয়ে আমাদের খাবার জায়গা হ'য়েছিল। এই থাকার জায়গার একটুখানি স্থান ঘিরে নিয়ে একটা ঠাকুর-ঘর ক'রেছে। প্রত্যেক বড়ো সিন্ধী দোকানে এই ঠাকুর-ঘর একটা ক'রে থাকে। ধর্ম্মকে এরা একেবারে বাদ দেয় নি। বাতাবিয়ায় দ্বিতীয়বার যখন যাই, তখন এই সিন্ধিদেরই আতিথ্য গ্রহণ করি, এদের সঙ্গে একত্র থাকি। এদের রীতিনীতি দেখবার আর এদের সুবিধা আর সমস্যা আলোচনা করবার একটু সুযোগ তখন হয়। সে সম্বন্ধে পরে ব'ল্‌বো। লোকুমল খুব যত্ন ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। লোকুমলের ওখানে একটী গুজরাটী মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁর বাড়ী প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ পালিটানায়। এখানে এঁর একটী ষ্টীল-ট্রাঙ্কের কারখানা আছে, তাতে কতকগুলি বাঙালী মুসলমান কারিগর কাজ করে। বাঙালী মুসলমান দর্জ্জি শ্যামদেশে বাঙ্কক-শহরে অনেক আছে জানতুম, অন্য ব্যবসায়ের বাঙালী কারিগর এতদূর পর্য্যন্তও এসে পৌঁছুবে, এটা একটা নোতুন খবর।

রাত্রে নটায় ছিল Kunstkring বা ডচদের সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা সভায় কবির বক্তৃতা। কবির সুরাবায়ার অবস্থানের সম্পর্কে এইটা একটী বড়ো ব্যাপার। স্থানীয় Kunstkring-এর বাড়ীটী অতি সুন্দর, অতি-আধুনিক ইউরোপীয় বাস্তুরীতি অনুসারে তৈরী। ডচ সমাজের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এসেছিলেন। সভার সম্পাদক কবিকে স্বাগত ক'রে এক অভিভাষণ দিলেন, আর কবির সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প'ড়লেন। কবির ব্যাখ্যান তার পরে হ'ল; বিষয় ছিল, What is Art? তাঁর বক্তৃতা অতি সুন্দর হ'য়েছিল। বক্তৃতার পরে, আমরা Kunstkring-এর বাগানে খানিক ব'সে, প্রায় সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরলুম। ক্লাবের সংলগ্ন বাগানে ব'সে কাফি শরবৎ বা বিয়ার পান করা আর খানিক রাত পর্য্যন্ত গল্প গুজব করা এখানকার ডচেদের মধ্যে একটা সামাজিক রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানকার পাট চুকল, কাল সকালে আমাদের সুরকর্ত্ত যাত্রা ক'রতে হবে।

(ক্রমশঃ)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আসল না নকল?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১)

মাস ছয়েক হইল শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ উক্ত শিরোনামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন।* আমায় একখণ্ড উপহার দিয়াছেন।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনায় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লেখক একস্থানে আমার নামে এক মত আরোপ করিয়াছেন, এবং অন্য একস্থানে আমার নাম না করিলেও আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর আমারও এমন প্রতিজ্ঞা নাই, একবার যে অনুমান করিয়াছি, তাহার নড় চড় হইতে পারে না।

সন ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিষ্ণুপুরে আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী প্রকাশ করেন। ইহার কবি আপনাকে বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।" পুথীর আবিষ্কারক ও সংস্কর্তা শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়েরও সেই মত।

উহাঁদের মতে আমরা এই পুথী-আবিষ্কারের পূর্বে আসল চণ্ডীদাস পাই নাই; এইটি আসল। প্রমাণ কি? (১) লিপিবিদ্যাবিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুথীর অক্ষরদৃষ্টে বলিয়াছেন, আবিষ্কৃত পুথী "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" (২) পুথীর ভাষা প্রাচীন, এত প্রাচীন যে উহার রচনার সময়ে আসামের পূর্ববঙ্গের মিথিলার রাঢ়ের ভাষার মধ্যে বর্তমান অপেক্ষা অত্যধিক সাদৃশ্য ছিল; (৩) উহার ভাবও এত প্রাচীন যে চৈতন্য-প্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবের সহিত মিল নাই। ১৩২৫ সালে সা-প-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় হেতু-বলে কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থকে খাঁটি চণ্ডীদাসের বলিয়াছেন। বসন্তরঞ্জনবাবু এই চণ্ডীদাসের দেশও দিয়াছেন, বীরভূমের নান্নুর গ্রামে।

শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বলিতেছেন, এই চণ্ডীদাস নকল। কারণ, (১) কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকৃষ্ণের ধামালী আছে। এই কুৎসিৎ ধামালী চৈতন্যপ্রভু কদাপি আস্বাদ করেন নাই। ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরুদ্ধ; (২) পুথী বিষ্ণুপুরে রচিত হইয়াছিল; (৩) দুই এক শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল; (৪) বিষ্ণুপুরের এক কবি নয়, হিন্দুস্থানী আসামী পূর্বঙ্গীয় কবিও ছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। অবশ্য এটা নানা স্থানের শব্দের একত্রাবস্থিতির কারণ-ব্যাখ্যা।

এই নূতন মতে সব নাস্তি হইয়া যাইতেছে। নাস্তিকের কথা না মানি, কিন্তু তিনি যে আস্তিকের উপকার করেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আস্তিককে নিজের প্রমাণ চিন্তা করিতে হয়, দৃঢ় করিতে হয়, দোষ সংশোধন করিতে হয়। যাঁহার সংশয় হয় না, তাঁহার জ্ঞানও হয় না। জিজ্ঞাসার পূর্বে সংশয়। সংশয়চ্ছেদ হইলে জ্ঞান। কিন্তু বিপদ্ এই, সংশয় দূর না হইলে আমরা কুপিত হই, সে কোপ গিয়া পড়ে যিনি সংশয়ের হেতু, তাঁহার উপর।

পদাবলীর চণ্ডীদাস আমাদের এত প্রিয় যে, তাঁহার কতখানি আমাদের মানস-সৃষ্টি, তাহা ভাবিবার অবকাশ পাই না। আজ যদি কেহ সুন্দরবনে এক ভগ্ন পাষাণ-মন্দির আবিষ্কার করেন, যাহার ভিতরে বাসলী-মূর্তি এবং দ্বারে "পদকর্ত্তা বড়ু চণ্ডীদাস পূজিতা" লেখা থাকে, তাহা হইলে হয়ত কেহ প্রস্তরফলকটি সমুদ্রে ফেলিয়া দিবেন, কেহ বা চাঁচিয়া ছুলিয়া নির্-অক্ষর

* কলিকাতা, ভবানীপুর, ১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, কালীতারা প্রেস-হইতে প্রকাশিত। "অধিকাংশ 'বিশ্ববাণী' হইতে পুনর্মুদ্রিত।" মূল্য লেখা নাই।

করিবেন। আমার আর এক রোগ আছে। আমি যখনই চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ি, কিম্বা কোনও পদ আমার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ মনে আসে, তখনই চণ্ডীদাসকে সমুখে দেখিতে পাই। "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"— মনে পড়ুক ; দেখি চণ্ডীদাস নূপুর-পায়ে দাঁড়াইয়া পদটি গাহিতেছেন। আমি শপথ করিতে পারি, তাহার বয়স ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, দোহারা চেহারা,— গৌরবর্ণ নয়, কৃষ্ণবর্ণও নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বরং একটু ফরসা। ছাতনায় কয়েকবার যাতায়াতের পর আর এক রোগ জন্মিয়াছে ; আমি দেখি, তিন দিকে ঝুপরি বন, সে বনের ধারে একখানা পাতা-ছাওয়া নীচু ছোট ঘর, নান্নুর মাঠে হাটের নিকটে, ছোটধুতি-পরা দুঃখী এক বড়ু গুন্-গুন করিতেছেন। আমি জানি, এই রকম রোগ অনেকের আছে। আমি কবি নই, চণ্ডীদাসের অতিশয় ভক্তও নই। কিন্তু মানস-সৃষ্টির অপূর্ব মহিমা বুঝিতে পারি। যাহাঁরা চণ্ডীদাসকে জপ-মালা করিয়াছেন, তাহাঁদের মানস-প্রতিমার যৎকিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে অতিশয় মনঃকষ্ট হইতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" বইখানা হঠাৎ দৈত্যের মতন আসিয়া আতঙ্ক জন্মাইয়া দিয়াছে। সে দৈত্য ধামালী হউক, ঝুমুর হউক, উঠিয়া যাইবে না। তাহাকে আসন দিতেই হইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে আসন কোথায় দিলে অপর সকল কৃতীর লাঘব হইবে না, সে চিন্তা অহেতুক নহে।

(২)

সন ১৩২৩ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হয়। তৎকালে উহার কবির কাল, দেশ ও চরিত সম্বন্ধে যে-সকল মত প্রচলিত ছিল, বসন্তরঞ্জনবাবু সে-সব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। সন ১৩২৬ সালের সা-প-পত্রিকায় আমি তিনেই সংশয় জানাইয়াছিলাম। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমি অতিরিক্ত সংশয়ী হইয়াছি। পুথীর গুরুত্ব ইহার কারণ। সংশয়ের মূলাধার প্রাপ্ত পুথীর অনুমিত কাল। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পুথীখানি চণ্ডীদাসের যৌবনকালে রচিত, এমন কি তাহার স্বহস্ত লিখিত ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের পূর্বে রচিত, এবং চৈতন্যপ্রভুর আস্বাদিত ; রাঢ় বঙ্গ মিথিলা প্রভৃতির ভাষার সাম্য ; ইত্যাদি অনুমান দাঁড়াইয়াছে। আমি রাখালবাবুর লিপিপ্রাজ্ঞতা অস্বীকার করি না। তাহার কথিত লিপিতত্ত্ব বুঝা কঠিন নহে। কঠিন, সঙ্গত উদাহরণ সংগ্রহ ও তত্ত্বের প্রয়োগ। আমরা প্রত্যক্ষেও ভুল করি, রাখাল-বাবুও ভুল করিয়াছেন। আদালতে কখন কখনও লিপিপ্রাজ্ঞ ডাকা হয় ; কিন্তু মকদ্দমার পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া কেবল তাহার কথায় ডিগ্রি ডিসমিস করা হয় না। তিনি মাত্র তিনটি উদাহরণ লইয়াছিলেন। সে তিন পুথীর লিপির দেশ জানান নাই। শেষে কিন্তু একটি পুথী "শূদ্রপদ্ধতি"র উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনখানির মধ্যে, এইখানি প্রাচীন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এখানি ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত। ১৩২৬ সালের সা-প-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মহামহো-পাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, "শূদ্রপদ্ধতি"র কাল বিক্রমাব্দে নয়, শকে ; ১৪৪২ বিক্রম সংবৎ নয়, ১৪৪২ শক ; অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। (পুথীর পাতাটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহির গোড়ায় ছাপা হইয়াছে। যে সে পড়িতে পারেন।) তিনি লিখিয়াছেন, "ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই।" কিন্তু তিনি রাখালবাবুর সহিত একমত, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথী ১৩০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। কারণ ৩ অঙ্কের যে আকার এই পুথীতে আছে, সে আকার ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে "আর দেখা যায় নাই।" কিন্তু একটি উদাহরণের উপর এত নির্ভর করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ এই আকার প্রায় নাগরী ৩ অঙ্কের তুল্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের আর এক পরীক্ষা, ৫ অঙ্কের আকার। বর্ত্তমান ৮ অঙ্কের মাথায় অর্দ্ধচন্দ্র দিলে যেমন দেখায়, তেমন। কিন্তু বিষ্ণুপুরে ১৫৭৯ শকে (১৬৫৭ খ্রীঃ) লিখিত পুথীতে এই আকার আছে।

যে পুথীতে তিন হাতের লেখা আছে ; কেহ প্রাচীন অক্ষর লিখিয়াছেন, কেহ তাহা শুদ্ধ করিয়াছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক অক্ষর লিখিয়াছেন ; স্থূল দৃষ্টিতে বুঝি একই কালের একই গ্রামের তিন জন লিপিকরের

লিপি ত্রিবিধ হইতে পারে। পুথীখানি দুভাঁজ তুলাট কাগজের দুই পিঠে লেখা। অধিকাংশ পাতার ভাঁজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও একখানি পাতা জোড়াই আছে। ইহার এক পিঠে প্রাচীন অক্ষর, অন্য পিঠে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অক্ষর দেখিয়াছি। পত্রাঙ্ক ঠিক আছে, প্রথম পিঠের লিখিত। পদের অনুবন্ধ দ্বিতীয় পিঠে চলিয়াছে। কেমন করিয়া বলি, একই সময়ের একই দেশের লিপি অবিকল এক হইয়া থাকে। ইদানী ছাপার অক্ষর আমাদের লিপির আদর্শ হইয়াছে। পূর্বকালে আদর্শ এক ছিল না; কয়েকটি অক্ষরের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইত। দেশভেদে ও লোকভেদে ভাষা-ভেদ ও অক্ষরের আকৃতি ভেদ হইত।

রাখালবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, কৃষ্ণকীর্তনের পুথীর প্রথম পাতা হইতে শেষ পাতা ১৩০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিপীকৃত হইয়াছিল! শকে ১২২২ হইতে ১২৭২ অব্দের মধ্যে। তিনজন লিপিকর একখানা পুথী দেখিয়া লিখিয়াছিলেন। অতএব আদর্শ পুথী আরও প্রাচীন বলিতে হইবে। ফলে দাঁড়াইতেছে, চণ্ডীদাসের জন্মশক ১২০০ অব্দে কিম্বা তৎপূর্বে ধরিতে হইবে।

ইহাতে আপত্তি কি? আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন, কিংবা চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপ্রভুর একশত বৎসর পূর্বে দেখিতে চান, তাঁহারা হতাশ হইবেন। এই দুই তর্ক অলীক বলিতে পারি, কিম্বা বলিতে পারি সে চণ্ডীদাস ইনি নহেন; কিন্তু কোন কোন পদের ভাষা ও কতকগুলি শব্দ বিভক্তি ও প্রত্যয় ভাষাতত্ত্ববিদের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। সেগুলি বাছিয়া নির্বাসিত করিবার উপায় নাই। লিপিকর সব এক শিকলে বাঁধিয়া দিয়াছেন। লিপি-প্রাজ্ঞের অভিমত মানিতে হইলে বলিতে হয়, ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাঢ় দেশে, বিষ্ণুপুরে, মুসলমানী শব্দ 'খন্দ,' 'বাকি,' 'মজুরি', 'মজুরিআ', চলিতেছিল। বাঙ্গলার ঐতিহাসিক এ কথায় সায় দিবেন কি? পূর্বরাঢ়ে নদীয়াতেও অসম্ভব।

আমার বিবেচনায়, আবিষ্কৃত পুথীর রচনা খাঁটি নয়, মিশাল। ইহাতে দুই তিন দেশের, দুই তিন কালের, দুই তিন কবির হাত আছে। যেমন বাল্মিকী রামায়ণ খাঁটি নয়, মিশাল; মনুসংহিতা খাঁটি নয় মিশাল বিদ্যাপতি খাঁটি নয় মিশাল; প্রাপ্ত কৃষ্ণকীর্তনও খাঁটি নয়, মিশাল। পাঁচমিশালের এক একটা দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিলে ফলে যেমন সত্য থাকে, মিথ্যাও থাকে, কৃষ্ণকীর্তনের বিচারে তেমন হইয়াছে। অর্থাৎ এক-দেশদর্শিতা। ইহার আদি অবশ্য প্রাচীন, ছয় শত সাত শত বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারেন; কারণ, জুখিবার উদাহরণ নাই। কিন্তু লব্ধ সংস্করণ এত প্রাচীন নয়। গীতের রচনাকাল, পরে সংস্করণকাল, পরে প্রাপ্ত পুথীর লিপিকাল এক হয় না।

দক্ষিণারঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন, সতীশবাবু ও আমি কৃষ্ণকীর্তনকে আধুনিক বলিয়াছি। আমার মত সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য নয়, মিথ্যাও নয়; কিন্তু যতদূর জানি, সতীশবাবুর মত সম্বন্ধে একটুও সত্য নয়। আরও কেহ কেহ আমার প্রতি এরূপ অবিচার করিয়াছেন। আমি মূল পুথী সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। এগার বার বৎসর পরে এখন কি মনে হয়, লিখিতেছি।

(৩)

ভাষা বিচারে দেশ ও কাল, দুইই দেখা কর্তব্য। নূতন আবিষ্কৃত পুথীর প্রাপ্তিস্থানের ভাষার সহিত পুথীর ভাষা প্রথমে তুলনা কর্তব্য। যথোচিত সাদৃশ্য না পাইলে অন্য স্থানের ভাষা দেখিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্তনের পুথী বিষ্ণুপুরে (নগরের পাঁচ ছয় মাইল উত্তরে) পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বকালে পশ্চিমরাঢ় নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল, এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে নদীর নিকটে ছোট ছোট জনপদ ছিল। বিষ্ণুপুর রাঢ়ের সীমান্তদেশ ছিল, ইহার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে এত বন ছিল যে, বহুকাল পর্যন্ত পুরের নাম বনবিষ্ণুপুর ছিল। পূর্ব হইতে মাইল দেড়েক উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদ পশ্চিমোত্তর হইতে পূর্বদক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। এখন এই স্রোত কানা হইয়া গিয়াছে, প্রধান স্রোত কানার উত্তরে দ্বীপ করিয়াছে। অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দে বিষ্ণুপুর মল্ল-রাজধানী হয়। বোধ হয় তখন হইতে স্থানটির নাম বিষ্ণুপুর

হইয়াছে ইহার অন্ত কোন নাম শোনা যায় নাই। ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দের রাজা বীর হাম্বীরের (১৫৮৭-১৬২০ খ্রীঃ) আজ্ঞায় শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের নিকট হইতে বৈষ্ণব গ্রন্থ লুণ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে বীর হাম্বীর ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন. শ্রীনিবাস আচার্যের মুখে তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হন এবং আচার্যের শিষ্য হন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এত অনুরক্ত হইলেন যে, কালাচাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, মদনমোহন বিগ্রহ ছলে বলে বিষ্ণুপুরে আনিলেন, বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিলেন, এবং বৃন্দাবনের অনুকরণে পুরাতন "বান্ধের" নাম যমুনা, কালিন্দী, নূতন খাতের নাম শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গ্রামের নাম দ্বারকা, গোকুল নগর, মথুরা, অবন্তিকা এবং বিষ্ণুপুরের নাম গুপ্ত বৃন্দাবন রাখিলেন। এই বৃন্দাবনে কোথাও তমালবন, কোথাও তালবন, কোথাও ভাণ্ডীর বন, এবং স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পুষ্প-উদ্যান নির্মিত হইল। এই বৃন্দাবনের উত্তরে দ্বারকা, নদীর পারে (বর্তমান দ্বীপে), অবন্তিকা ও মথুরা। মদনমোহনের সঙ্গে সে বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছে। এখন বাউলেরা একতারা বাজাইয়া গান করে, "আগে ছিল বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন। এখনেতে হল্য সে যে চাকুন্দার বন।"*

রাঢ়ের পশ্চিম সীমান্তদেশে, উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে বনবেষ্টিত হইয়া মল্লরাজ্য তিষ্ঠিয়া ছিল। এমন দেশে আচার ব্যবহার বহুকাল যাবৎ প্রায় একই প্রকার থাকে। পূর্বরাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে ভাষার পরিবর্তন হইতেছিল, ভিন্ন দেশের ভিন্ন কৃষ্টির প্রভাব-বর্জিত হইয়া বিষ্ণুপুর পুরাতন ভাষা এবং ভাষা প্রকাশক বানান ও অক্ষর রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। আদিতে মল্লবংশ বাগদী (এখানে নাম বাগতী) হউক, আর যাহাই হউক, রাজা হইলে ক্ষত্রিয় হইতে হয়, এবং ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় স্বীকার না করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারা যায় না, এই জ্ঞান জন্মিতে অধিক কাল লাগে না। রাজপ্রসাদলোভে পূর্বদিক্ বর্দ্ধমান জেলা হইতে ব্রাহ্মণ আসিতে লাগিলেন বিহার হইতে পুরী যাইবার পথে বিষ্ণুপুর. পড়িত। সে উত্তর দেশের লোকও আসিতে লাগিল। ওড়িষ্যার প্রভাবও পড়িয়াছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুর রাজ্যের মন্দির নির্মাণে ওড়িষ্যার রীতি স্পষ্ট আছে। বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, শক্তি-পূজা, তিনই চলিয়াছিল। চলিত কথায় বলে, যোজনান্তে ভাষা। (চারি ক্রোশে যোজন)। যোজনত্রয়ে যে ভাষা, তাহা এখনও ছাপা বইর দিনেও আছে। আরও আশ্চর্য, দুই চারিটা অক্ষরেও পুরাতন আকার দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা ও অক্ষর বিচারে দেশ উপেক্ষা করাতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথী প্রাচীন মনে হইয়াছে। এখন বিষ্ণুপুরের ও উহার পূর্বাঞ্চলের পুরাতন ভাষা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যোজনত্রয় পশ্চিমে ও উত্তরে এখনও আছে। যদি কেহ যোজনত্রয় উত্তরে এই বাঁকুড়া সহরের অশিক্ষিত লোকের ভাষায় তুলাট কাগজে মসীকালী দিয়া বই লিখিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া দেন, কেহ কেহ সেই পুথী দুই শত বৎসরের পুরাতন মনে করিবেন। আল্য, পাল্য; খালি, পালি (পাইলি); আঞা, খাঞা; কণ (কোণ), আল (ওলো); সসী, স্থন; ইত্যাদি পুরাতন ভাষার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। শব্দের দ্বিতীয় স্বর দীর্ঘ করা আর এক বিশেষ। যেমন, গভী, বুঝী। এমন শব্দ আছে, যাহা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারা যায় না।

যদি এই ইতিহাস সত্য হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরে রাশি রাশি পুথী পাওয়া আশ্চর্য নয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথী থাকিলে এইখানেই ছিল। ইহার পদের চন্দ্রবিন্দু ও ঞ কাটিয়া দিলে পুথীকে পাঁচ ছয় শত বৎসরের প্রাচীন মনে হইবে না। পুথীর কাগজ, কালী, পাটা এত পুরাতন বোধ হয় না। পুথী বার-বার খোলা ও পাতা তোলা হইয়াছে। নইলে কাগজের ভাঁজ ছিঁড়িত না, তথাপি মাঝখান এলাইয়া যায় নাই। পাঁচ ছয় শত বৎসর ডোর-বাঁধা পড়িয়া থাকিলে কাগজ জীর্ণ, কালী বিবর্ণ, পাটার (সালের নয়, কেলিকদম্বের) ভিতর পিঠের বর্ণ পুরাতন হইত। যে বিষ্ণুপুরে এক এক নূতন ধর্মমতের

* সন ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" "বিষ্ণুপুর বিবরণ", ও ১৯২১ ইং সালে প্রকাশিত অভয়পদ মল্লিক কৃত ইংরেজী "বিষ্ণুপুর রাজ"। উপরের কোন কোন কথা কিম্বদন্তীমূলক।

বঙ্গা বহিয়া গিয়াছিল, যে দেশে চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দ হইতে সঙ্গীতচর্চা রীতিমত চলিয়াছিল, যে দেশ ঝুমুরের, সে দেশে গানের পুথী ডোর-বাঁধা হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সমাদৃত না হইলে কেনই বা রক্ষিত হইয়াছিল, পুরাতন অক্ষরের প্রবেশ ঘটিয়াছিল? বসন্তবাবু লিখিয়াছেন, পুথীখানি ২৫০ বৎসর সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। বর্তমান পুথীর বয়সও এই। এই অনুমানের অন্য প্রমাণ আধুনিক কালের বিভক্তিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুর অন্ততঃ দশম শতাব্দ হইতে পশ্চিমরাঢ়ের রাজধানী ছিল। রাজধানীতে নানা দেশের লোক আসিয়া বাস করে, ভাষা অল্পাধিক মিশ্র হইয়া যায়। এই কারণে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় মিশ্রণ আছে। আর এক কারণ স্বাভাবিক ছিল। আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববিহার, পশ্চিমরাঢ়, ওড়িষ্যা, এই অনুনাসিকের মেখলায় ভাষার সাদৃশ্য ছিল। এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও পুথীর ভাষায় যে বিশেষ পাইতেছি, তাহা পুথীকে দেশান্তরী না করিয়া পুথীর গায়ন ও লিপিকরকে অন্যদেশীয় ভাবা আরও সহজ।

পুথীখানি বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছে। এইহেতু মনে করিয়াছি, বর্তমান পুথী সেখানে লিখিত হইয়াছিল। এই অনুমানের কয়েকটি হেতু দি-ই। এ বিষয়ে দক্ষিণা-রঞ্জনবাবু বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। (১) প্রথমে বাসলী নামেই "আসিনী"-নাম্নী গ্রামদেবীর দেশ মনে পড়াইতেছে। (২) "বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন"। এই নিরঞ্জন, রামাইর দেশের ধর্মরাজ মনে হয়। এখানে কবি দশ অবতারের পৌর্বাপর্য শোনেন নাই; শোনাইলে কংসবধের বর্তমান প্রসঙ্গ আসিতে পারিত না। শেষে বলিলে কবির দোষ হইত। "ধর্মপূজা বিধানে"র রামাইর গানেও এই কারণে বুদ্ধাবতার দশম গণ্য হইয়াছে। (২১৪ পৃঃ)। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত দশাবতার তাসে বুদ্ধ পঞ্চম অবতার, কৃষ্ণের নাম নাই, বলরামের আছে। কিন্তু রঘুনাথরাম অষ্টম অবতার হইয়াও প্রধান। অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্তনের দশাবতার-গণনা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে হইয়াছিল। (৩) 'বিষ্ণুপুরে স্থিতি'—এখানে 'বিষ্ণুলোক' মনে না আসিয়া 'বিষ্ণুপুর' এই নাম আসিল কেন? (একখানি জ্যোতিষের সংস্কৃত পুথীতে "মল্লেন্দ্রভূবিষ্ণুপুর-স্থিতিশ্চ" দেখিতেছি। মনে হয় যেন 'বিষ্ণুপুরস্থিতি' এক সাধারণ কথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।) (৪) 'লক্ষবে বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' ইহা ত কোন রাজার নিমি[illegible] বৃন্দাবন ও পুষ্পবাটিকা। (৫) উত্তর-রাঢ় কিম্বা পশ্চি[illegible] রাঢ়, এই দুই স্থানের মধ্যে পশ্চিম-রাঢ়েই ড় ঢ় বর্ণের ছড়া[illegible] ছড়ি দেখিতে পাই। (৬) এখনও বাঁকুড়া মানভূম জেল[illegible] ঝুমুর আছে। সে ঝুমুরে কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ 'দা[illegible] খণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' আছে। (৭) 'সতী', 'গতী', 'বুঝী[illegible]' 'সুনী', ইত্যাদির দীর্ঘস্বর এখনও আছে। ইত্যাদি।

বর্তমান পুথীর কাল সম্বন্ধে, (১) পুথীর অপেক্ষাকৃ[illegible] আধুনিক অক্ষরের যে কাল, সেই কাল ধরিতে হইবে ইহার অন্যথা করিলে রাম না জন্মিতে রামায়ণ লিখিতে হইবে। (২) দক্ষিণারঞ্জনবাবুর উদ্ধৃত 'শ্রীনিবাস', 'সাগর গোআলে', 'ভাগীরথীকূলে', সতীশবাবুর অন্য ব্যাখ্যা না পাইলে চৈতন্য-চরিতের উল্লেখ মনে করিতে হইবে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও স্মরণ করিতে হইবে। তিনি অবশ্য জানেন একটি দুইটি হেতু অগ্রাহ্য করিতে পারি, কিন্তু হেতুপরম্পরার সমবায় বলবান্ হইয়া থাকে।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর 'নালিতা' তর্ক সত্য হইলে বিষম কথা হইত। পুথীতে 'নালিচা' আছে, 'নালিতা' নাই (১৬৮ পৃঃ)। নালিচার চাষের আভাস নাই, ইহার সং নাম নাড়িক। নাড়ী, নালী একই। ইহার ডাঁটায় নালী আছে বলিয়া এই নাম। কেহ কেহ ইহাকেই প্রাচীনকালের মম্বাদি স্মৃতির কালশাক, শ্রাদ্ধশাক মনে করেন। ইহা তিক্ত বলিয়া সেব্য হইয়াছিল। তখনকার নাড়ী-তিক্ত নাম হইতে সংক্ষেপে নাড়িতা, নালিতা, হইয়াছে। ইহার জাতি, মিষ্ট পাটশাগ। তাহার নামও নাড়াক। নীরস কাঁকরা দেশে ইহার পাটের নিমিত্ত চাষ হইত না, এখনও হয় না। কিন্তু শাগের নিমিত্ত অল্পস্বল্প চাষ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই পাটশাগের গাছ হইতে পাট বাহির করিয়াছিলেন। 'বাইক' (বাঁক) নিমিত্ত 'চামড়' (চিমড়) কাঠ অবশ্য চাই। (কিন্তু আশ্চর্য সামান্য বাঁশ মনে হয় নাই। বিষ্ণুপুরের উত্তরে নীরস কাঁকরা দেশে বাঁশ তত সুলভ নয়।) দক্ষিণারঞ্জনবাবু যে-সকল শব্দ পূর্ববঙ্গীয় মনে করিয়াছেন, সে সকলের অধিকাংশ এখনও চলিত আছে

ওড়িয়াতেও আছে। বৃন্দাবনের গাছের নাম করিতে কবি নানা দেশের গাছের নাম তুলিয়াছেন। 'বাজী' অর্থে ফুটি (কাঁকুড়), বসন্তবাবু কোথায় পাইয়াছেন, লেখেন নাই। বিষ্ণুপুরে ফুটিকে বলে 'লগী'। দেখা যাইতেছে, ফলটির আকারে বাজীর সাদৃশ্য দেখিয়া নাম। লগীও কি সেইরূপ ? সুতরাং এই সকল নাম পাইয়া কবির দেশ অনুমান করা চলে না। তথাপি 'আঁব' যদি আম্র হয়, তাহা হইলে প্রাচীনত্ব ও একদেশীয়ত্ব থাকে কই ? দেখিতেছি বসন্তবাবু 'কালিনী মা' অর্থে ভুল করিয়াছেন। 'কালিনী' শব্দ সং, অর্থ বালকের নাভি-নাড়ী, বৈদ্যশাস্ত্রে নাম "অমরা'—(বৈজয়ন্তীকোশ)। কালিনী মা—যে মায়ের নাড়ীতে জন্ম, বিমাতা নয়। ঘনরামে (হরিশ্চন্দ্র পালা ২৪ পৃঃ, 'কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সহে কে ?')

(৪)

কৃষ্ণকীর্ত্তন-রচনার কালের পশ্চাৎসীমা দেখা গেল, পূর্ব্বসীমা কোথায় ? এ সম্বন্ধে পুথীর প্রাচীন অক্ষর পরীক্ষা, ভাষা পরীক্ষা, ও বিষয় পরীক্ষা আছে। (১) মূল পুথী এমন সময়ে লিখিত যে-সময়ে রাখালবাবুর নির্দ্দেশিত প্রাচীন অক্ষর সমুদায় নূতন আকার পায় নাই। অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের "শূদ্রপদ্ধতি"র পূর্ব্বে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরীক্ষায় নির্দ্দেশিত ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩ অঙ্কের প্রাচীন রূপের সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে। (২) পুথীর প্রাচীন ভাষার তুল্য উদাহরণ বাঙ্গলায় আর পাওয়া যায় না। অমরকোষের সর্বানন্দী টীকার বাঙ্গলা শব্দের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক শব্দ সে সময়ের কিম্বা কিছু পরের। অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের। বিদ্যাপতির সহিত তুলনা করিলে আরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল পুথী অমুক শতাব্দে রচিত, তাহা বলিবার উপায় নাই। মোটামুটি ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দে বলা চলে। (৩) শ্রীযুত সতীশ-চন্দ্র রায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন বিষয় পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, উহা চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বে লিখিত। কিন্তু কত পূর্ব্বে, বলিবার উপায় নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণকীর্ত্তনের (ও পদাবলীর) কয়েকটা লীলা প্রসঙ্গ আছে। নারদের দুর্দ্দশা, তিন দিন ব্যাপী স্থলে ও জলে রাস, মৃদঙ্গ ও মুরজাদি বাদন, রাধিকার খেদ, ইত্যাদি আছে। উক্ত পুরাণে রাধিকা নিত্য ষোড়শবর্ষীয়া বটে, কিন্তু কবি দ্বাদশবার্ষিকী কন্যার যৌবন-প্রাপ্তিও স্বীকার করিয়াছেন, দুই তিন স্থানে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এই পদও আছে। ইহার অর্থ কৃষ্ণ-চরিত কীর্ত্তন। এই পুরাণ পূর্ব্বরাঢ়ে ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দে বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছে। (১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষ")। এই পুরাণ পড়িলে মনে হয়, তখন ব্রাহ্মণে বিষ্ণুভক্ত হইতেন ও রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতেন। কিন্তু এই ভজনায় দুর্গাও তাঁহার অংশস্বরূপা মঙ্গল-চণ্ডিকার পূজা করিতে, তাঁহাদের নিকটে পশুবলি, এমন কি নরবলি দিতে বাধা হইত না। জয়দেবের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই পুরাণ হইতে গৃহীত। ইহাতেও মনে হয়, চৈতন্যপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বে রাঢ়দেশে শক্তিপূজা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রাধাকৃষ্ণধর্ম্ম চলিতেছিল। তদনুসারে চণ্ডীদাসও বাসলীপূজক ও রাধাকৃষ্ণভজক দুই-ই হইতে পারিয়াছিলেন। ভাগবত পুরাণও সমাদৃত হইত। দুই পুরাণেই দৈবকীর অষ্টমগর্ভ শ্রীকৃষ্ণের এবং নবমগর্ভ অম্বিকার জন্ম হয়। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে গৃহীত। কারণ ইহাতেই রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত জয়ন্তীযোগে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা আছে, অন্য দুই পুরাণে নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাস নাম থাকিলেও সে রাস ভাগবতের রাস নয়, মাত্র বিহার। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাস নামও নাই, বিহারটি আছে। ভাগবতের রাস কার্ত্তিক পূর্ণিমায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাস চৈত্র পূর্ণিমায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাস বসন্তকালে, কিন্তু দিবারাস বলিয়া পূর্ণিমার প্রয়োজন হয় নাই।

এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের পরে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বর্ত্তমান রূপ। ইহার বিশেষ প্রমাণ, রাধিকার মাতার নামে, এবং স্বামীর নামে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্বামীর নাম 'আইহন,' পুরাণে 'রায়াণ'। রাধাকৃষ্ণচরিত বাস্তবিক চন্দ্রসূর্য ঘটিত এক

রূপক। তদনুসারে 'আয়ন' নামই ঠিক।* ইহার উচ্চারণ আ-ইঅ-ন, পরে 'আইহন' হইয়াছে। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবেরা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া কিম্বা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে আইঅন দেখিয়া অভিমন্যু নাম কল্পনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন এই কল্পনার পূর্বে হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তে উত্তর-রাঢ়ের রীতিতে র আগম হইয়া 'রায়াণঃ গোপপ্রবরঃ' হইয়াছে। রাধিকার মাতা 'কৃত্তিকা', ইহাই ঠিক ছিল। কেহ এই নাম 'কীর্ত্তিদা' করিয়া ভুলাইতে গিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত 'কলাবতী' করিয়া আরও ঢাকিতে গিয়াছেন। (বস্তুতঃ সে সময়ে কৃত্তিকা নাম অসঙ্গত হইত।) কৃষ্ণকীর্তনে নাম পদ্মা, যে পদ্মা সাগরসম্ভবা। ব্রহ্মবৈবর্তে লক্ষ্মীর এক নাম পদ্মা। (এইহেতু লক্ষ্মীপ্রতিমার হাতে পদ্মফুল দেওয়া হয়। কিন্তু পদ্মটি নবনিধির প্রথম নিধির সংজ্ঞা, বাস্তবিক পদ্মফুল নয়।) ব্রহ্মবৈবর্তে রাধিকা অযোনিসম্ভবা। কৃষ্ণকীর্তনে নয়। ইহাতেও বুঝিতেছি কৃষ্ণকীর্ত্তন উক্ত পুরাণের পূর্বে লিখিত। রাধাকে চন্দ্রাবলী বলাতেও প্রাচীনতা পাইতেছি।

সন ১৩২৯ সালের সা-প-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় চণ্ডীদাসকে জয়দেবের পূর্বে মনে করিয়াছেন। অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু তাহার হেতু পর্যাপ্ত নয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলির ভাষায় ভিন স্তর আছে। এই ভাগের পর বুঝিতে পারিব, জয়দেব না চণ্ডীদাস, কে কার পদ লইয়াছেন।

(৫)

সন ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে শেষের মন্তব্য মন দিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু গোড়ার বাঁধনি পড়েন নাই। আমরা ছাতনায় চণ্ডীদাস খুঁজিয়াছি, কিন্তু তিনি আসল না নকল, সে বিচারে যাই নাই। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর মতে বিষ্ণুপুরের বা ছাতনার চণ্ডীদাস নকল, এবং তিনিই কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস। আমরা বলি, তথাস্তু। তিনি লিখিয়াছেন, "নান্নুরের বাসুলী সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। উহা সুন্দর প্রসন্নবদনা, চতুর্ভুজা। [বীণা পুস্তক জপমালা ধৃতা] বাগীশ্বরী মূর্তি বিদ্যাদেবী 'বজ্রেশ্বরী'। এই প্রত্যক্ষে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু তর্ক এই, বাগীশ্বরীকে চণ্ডী বলা চলে কি? বাসলী, মঙ্গলচণ্ডিকাও নহেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ইনি শ্বেত-চম্পকবর্ণাভা ঈষদ্‌হাস্যপ্রসন্নাস্যা ষোড়শবর্ষীয়া দেবী, প্রতি মঙ্গলবারে যোষিৎ-পূজিতা। উক্ত পুরাণে বাসলীর নাম নাই, তিনি গ্রামদেবীর মধ্যে গিয়া থাকিবেন। বাসলী প্রবিকটদশনা, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, খড়্গহস্তা। এই দুই দেবী যে পৃথক, তাহা চৈতন্যভাগবতে স্পষ্ট আছে। সেকালে কেহ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (যেমন মুকুন্দরামের) শ নিত, কেহ মনসা পূজা, কেহ বা বাসলী পূজা করিত। আমরা চণ্ডীদাস খুঁজিয়াছি, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া খুঁজিয়াছি। এই চণ্ডীদাসের নিমিত্ত বাসলী চাই, তাহার বটু চাই (ধর্মপূজা বিধানে 'বটু' দ্রষ্টব্য), বৈরাগিনীও চাই। 'পড়ুয়ার পুঢ়নের' অবতী-

* কথাটা এই। কার্তিক পূর্ণিমায় বিষুবান্ত ও নববর্ষারম্ভ হইত। এই উপলক্ষে পশ্চিম-ভারতে রাসনৃত্য উৎসব হইত। তখন সূর্য শ্রীকৃষ্ণ, রাধা বিশাখানক্ষত্রে, এবং চন্দ্র কৃত্তিকানক্ষত্রে থাকিত। বিষুব হইতে বর্ষারম্ভ ধরাতে পূর্বকালের অয়নান্ত দিনের গৌরব চলিয়া গেল, কবি অয়নকে নপুংসক কল্পনা করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অন্ততঃ তিন সংস্করণ হইয়াছে। এক সংস্করণের কালে চৈত্র পূর্ণিমায় এক বিষুব, আশ্বিন (কোজাগরী) পূর্ণিমায় অন্য বিষুব হইত। প্রথমটিতে শ্রীকৃষ্ণের রাস, দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত হইল। তদবধি বিষুব ৮ দিন পিছাইয়া গিয়াছে। ৮ দিনে ৫০০ বৎসর। বোধ হয়, চৈত্ররাস (বসন্ত রাস) ইহার পূর্বে ছিল না। বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দেখিলে কৃষ্ণকীর্তনের 'পদুমা' ও 'সাগরের কূল'-এর ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, তিন পুরাণই জানিতেন, কৃষ্ণ কে। গর্গ, সেটা ভালরূপে জানিতেন, কিন্তু নন্দ ব্যতীত আর কাহাকেও বলেন নাই। মনে হয় যেন চণ্ডীদাসও জানিতেন, নইলে 'সে কাহাঞি গেলা আকাশে' (৩৩২ পৃঃ) লিখিলেন কেন? এই সন্দেহ সত্য মানিলে 'সাগরের ঘরে', 'সাগর গোআলে', 'ভাগীরথী কূলে' (৩৪০ পৃঃ) অন্য অর্থ করা যাইতে পারে। আমরা জানি, আকাশের নাম সমুদ্র, সাগর ছিল। 'সাগর গোআলে', আকাশে 'গো' দেশে। এই 'গো' হইতে 'গোপ', গোপাল, গোপী, গো-লোক। ভাগীরথী মন্দাকিনী, স্বর্গঙ্গা। পদ্মা, লক্ষ্মীর জন্ম অবশ্য ভূলোকে নয়। আর এক কথা। অভিমন্যু নাম কতকাল হইয়াছে? বোধ হয়, অধিক কাল পূর্বে নয়। ব্রহ্মবৈবর্তে এই নাম নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ডের শেষে সংস্কৃত শ্লোকে অভিমন্যু নাম পাইতেছি। শ্লোকটি পদের শেষে গেল কেন? এই শ্লোক ও অপরাপর শ্লোক কি 'আদি' চণ্ডীদাসের? আমার বোধ হয়, চণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে জন্মখণ্ড ও কোন কোন লীলা লইয়াছেন। অনুসন্ধান কর্তব্য।

নগর চাই। (বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত), সালতড়া গ্রামে নিত্যা চাই, বিনোদ রায় চাই, ইত্যাদি। মুসলমান আক্রমণে কবির বিপত্তির কথা ১৩৮৭ শকের (১৪৬৪ খ্রীঃ) সংস্কৃত পুথীতে আছে। বিষ্ণুপুরে লিখিত একটা জ্যোতিষ পুথীর এক পাতায় পিঠে "রামী ১ চণ্ডীদাস ১," দুইখানা বইর নাম লেখা আছে। সে লেখা এক শত বৎসরের এদিকে বোধ হয় না। চণ্ডীদাস ও রামী লইয়া অনেক পদ বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গল্প দুই তিন শত বৎসর চলিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদাস প্রতিমার অঙ্গহানি না করিয়া যে-দেশে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, সে-দেশ চণ্ডীদাসের। মাস কয়েক হইল শ্রীযুত মতিলাল দাশ মাসিক "বসুমতী"র দুই সংখ্যায় আদি অকৃত্রিম চণ্ডীদাস ছাতনায় পাইয়াছেন। ইনি ও দক্ষিণারঞ্জন বাবু, দুইজনেই এখানে হাকিম ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন বাবু অধীর হইয়া বিষ্ণুপুরে কেবল চোয়াড় দেখিয়াছেন। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইবেন। যেমন তেমন নয়, কুলীন; বাঁড়ুজ্জা, চাটুজ্জা, মুখুজ্জা, যে কত জুটিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। এখানকার শুভঙ্করী আর্যা বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে মুখস্থ করা হইতেছে। চন্দনতরু অরণ্যে জন্মে, ধনীর বিলাস-উদ্যানে নয়। রক্তচন্দন তখনকার লোকের প্রিয় ছিল; ইহাতে হরি-চন্দনের সুরভি না থাকিলেও ইহার পাটল রঙ্গে তিলক হয়, দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান গুণ এই। ললাটে সেই তিলক ধারণ করিয়া কত কবি তরিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান বিবাদের মূল কারণ এই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস আসল না নকল, রামেন্দ্রসুন্দর এই আকারে প্রশ্ন তুলিয়া ভাল করেন নাই। কারণ 'আসল' বলিলে বুঝি উৎকৃষ্ট। কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয় ইত্যাদি কালানুসারে ভাগ করিলে বিবাদ হইত না। বাসলীর "বড়ু চণ্ডীদাস" এক বই বহু হইতে পারেন না। তিনিই আদি, কালে প্রথম। প্রথম কবি কদাচিৎ উত্তম হইয়া থাকেন। প্রায়ই পরবর্তী কবি তাঁহাকে হারাইয়া উপরে উঠেন, প্রথম অনাদরে পড়িয়া থাকেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীকাব্যের প্রথম কবি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কঙ্কণের দীপ্তিতে তাঁহার পথপ্রদর্শক ম্লান ও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসেও এইরূপ ঘটিয়াছে।

এখন পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে। দ্বিতীয় চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস। ইহার যে-কয়েকটা পদে 'আদি,' 'বড়ু' কিম্বা 'বাসলী' শব্দ আছে, সে কয়টা ছাড়িয়া দিলে প্রথম দ্বিতীয়ে প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া যায়। ইঁহাকে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" বলা চলে। এই কয়েকটা পদ ইঁহার রচিত হইতে পারে। গুরুর নাম লইয়াছেন, বিশেষণ লইতে বাধা কি? তৃতীয় চণ্ডীদাসকে "দীন চণ্ডীদাস" বলা চলে। এই তিনের মধ্যে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছেন। ইনি বড়ুর পদ পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়াই গণ্ডগোল বাড়িয়া গিয়াছে। উভয়ের পদের মধ্যে যে-কয়েকটায় ঐক্য আছে, সে-কয়েকটা "দ্বিজ" লইয়া থাকিতে পারেন, বাকি পদ তাঁহার রচিত। আর, যে সপ্তশতাধিক পদ তাঁহার নামে মুদ্রিত হইয়াছে, সে সবই যে তাঁহার রচিত, তাহাও বলিতে পারা যায় না। বড়ুর পদও সব রক্ষিত হয় নাই। রাধার বিরহের পর পুনর্মিলনের দুই চারিটা পদ অবশ্য ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তে পুনর্মিলনের পর কৃষ্ণচরিত শেষ হইয়াছে। আর, মুদ্রিত পদের যে সবই বড়ুর, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা মনে করেন, সমগ্র পুথী এককালে এক কবির রচিত, তাঁহারা অবশ্য এ কথা মানিবেন না। আমার আরও বোধ হয়, 'দ্বিজের' নিবাস বীরভূম-নান্নুরে কিম্বা কাটোআ অঞ্চলে ছিল, বাঁকুড়ায় নয়। কারণ "দ্বিজে"র পদ এ অঞ্চলে অধিক পাওয়া যায় নাই, সে দেশেই পাওয়া গিয়াছে। ভাষাতেও বাঁকুড়ার চিহ্ন পাওয়া যায় না। দুই চারিটায় আছে বটে, কিন্তু সে কয়টা বিষ্ণুপুরের পূর্বাঞ্চলে রচিত হইয়া থাকিবে। যাঁহারা চণ্ডীদাস-চর্চা করিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন। আমি শেষ ফল জানিলেই সন্তুষ্ট হইব।

মনীষা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

খ্যাতনামা সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সিবিলিয়ান হইবার পূর্ব্বে যে একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবক ছিলেন, একথা এখনকার অনেকে ভুলিয়া গেলেও আমরা ভুলি নাই, তাই রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই 'মনীষা' নামক নাটকখানি প্রকাশিত করায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করেন নাই, গুরুতর সরকারী কার্য্যের স্বল্পাবসরেও তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এই নাটকখানি পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ সালের অন্ন-বিপ্লবের ভিত্তিতে বিরচিত; সুতরাং এখানি যে সামাজিক নাটক, তাহা আর বলিতে হইবে না। কার্য্যোপলক্ষে দেশের নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থকার মহাশয় যে নানা 'টাইপের' লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই নাটকের 'গৌরীশঙ্কর' নামক সুন্দর চরিত্র-চিত্রনেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাটকখানি লিখিবার মহৎ উদ্দেশ্য ইহার প্রত্যেক চরিত্রেই সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার যে এতকাল পরে পুনরায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমসাময়িক আমরা আনন্দিত হইয়াছি; আশা হয় লব্ধাবসর গুপ্ত মহাশয় শেষজীবন সাহিত্য-সেবাতেই নিয়োজিত করিবেন। নাটকখানির অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি সুন্দর এবং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে; সুতরাং গুপ্ত মহাশয় এক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হইতে পারেন।

শ্রীজলধর সেন

অরুন্ধতী—শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত (মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকাসহ)। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়া প্রেস লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ২৲ টাকা।

অরুন্ধতীর জীবনী পুরাণ ইত্যাদি নানা পুস্তকে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। সেইগুলিকে একত্র করিয়া ও তাহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। অরুন্ধতীর জীবনী একটি আদর্শ জীবনী; লেখক স্থানে স্থানে কল্পনা-সাহায্যে এমন ভাবে চরিত্রটিকে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, উহা উহার মূল বর্ণনা হইতে পৃথক হয় নাই বরং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ লিখিত আছে। তবে অরুন্ধতীর মুখে স্থানে স্থানে যে কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাঠকের একটু বিরক্তি উৎপাদন করে। অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের গার্হস্থ্য জীবন হিন্দুর আদর্শ-স্বরূপ, সেই হিসাবে এইরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নহে। যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা না দিলেই পুস্তকখানির সৌন্দর্য্য অধিক রক্ষিত হইত।

আসামে মহাপ্লাবন—শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, মূল্য ১৲। পৃষ্ঠা ৭৫

পুস্তকখানিতে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে ১৯২৯ সালের বন্যায় আসামের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও পুস্তকের নাম হইতে মনে হয় যে ইহা প্লাবনের বিবরণী মাত্র, কিন্তু সত্যই তাহা নহে। ইহাকে আসামের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানিতে অনেক কথা জানিবার ও শিখিবার আছে। ছাপা, বাঁধাই মন্দ নহে। বন্যার কয়েকখানি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

অস্পৃশ্যের মর্ম্মবেদনা—শ্রীগুরুদাস রায় প্রণীত। প্রকাশক হিন্দুমিশন বাণী মন্দির, ৭নং বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য /১০।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার অস্পৃশ্যদের অবস্থা ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি সময়োপযোগীই হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

হিন্দুর মেয়ে—শ্রীগিরিবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী প্রণীত ও ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়াংশিত ২১০ পৃষ্ঠা, কাপড়ের মলাট, দাম দুই টাকা।

মানুষের মনে সংস্কারের মোহ বড়ই প্রবল। সংস্কার ও সত্যের মধ্যে প্রভেদটা অনেকে দেখিতে পান না। তাই সংস্কারের তাড়নায় জগতে এত অন্যায় কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে, আজও হইতেছে এবং চিরকাল হইবে।

গল্প, উপন্যাস বা কাব্যমাত্রেই রসসাহিত্য নয়। বিশেষ কোনো শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যাহা লেখা হয়, তাহা কাব্য বা উপন্যাস নামধারী হইলেই রসসাহিত্য হইয়া ওঠে না—উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ে ঐ শ্রেণীর রচনার স্থান নাই। এ কথা সত্য, দেশবিদেশের অনেক বড় লেখকের মধ্যেও সাহিত্যকে শিক্ষা বা আদর্শের বাহন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'; যেমন, ইব্‌সেন্, বার্নার্ড্-শ বা ফরাসী-লেখক ব্রিয়োঁর অনেক রচনা। শক্তিমান লেখকদের এই সকল রচনা রসসাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে না—জোরালো 'প্রপাগ্যাণ্ডা' হিসাবেই তাদের সার্থকতা।

'হিন্দুর মেয়ে'র লেখিকার রচনাশক্তি আছে, কিন্তু সংস্কারের মোহে আদর্শ প্রচারের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বইখানিকে তিনি মাটি করিয়াছেন। হিন্দুর মেয়ের ওকালতি করিতে গিয়া তিনি ভুলিয়া বসিয়াছেন যে উক্ত প্রাণীও মানবী—রক্তমাংসের জীব; সে জড়পদার্থ নয়। লেখিকার হাতে হিন্দুর মেয়ে সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রচ্ছদের ছবিতে দেখিলাম—পলবস্ত্রে বসিয়া একটি মেয়ে একজোড়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। মেয়েটি কে এবং শ্রীচরণযুগল কার বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিবাহের বাজারে এ গ্রন্থের কাটতি হওয়া সম্ভব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধি ও নিষেধ

ইহা করিবে, উহা করিবে না, এই দুইতে আমাদের জীবনের কাজ সমাপ্ত। দান করিবে, চুরি করিবে না,—একটা বিধি, অপরটা নিষেধ।

শৈশবকাল হইতে আমরা বিধি নিষেধ শিখিয়া থাকি। মাতা-পিতা ভাই-ভগিনীকে কর্ম করিতে দেখি, তাঁহারা কেমনে কি কর্ম করেন, দেখি। শিশু তাঁহাদের দেখা-দেখি সে কর্ম তেমনে করিতে শেখে। কিন্তু নিষেধে কর্মের অভাব বুঝায়, নিষেধ শিখিবার প্রত্যক্ষ উপায় নাই। মা বলেন, "দেখ ছুরি নিয়ে খেলা ক'র্‌তে নাই, হাত কেটে যাবে," "ধূলাবালি দিয়ে ঘরদোর নোংরা কর্‌তে নাই," "জলে ভিজ্‌তে নাই," ইত্যাদি "নাই" শুনিয়া করিবার কিছু থাকে না, শিশু বুঝিতে পারে না। "মারামারি করিবে না," মারামারির সময় না শিখাইলে শেখা হয় না। তথাপি সে কর্মে বিরতি অভ্যাস সহজে হয় না। কোনও কর্মে রতি জন্মিলে সে কর্ম শীঘ্র অভ্যাস হইয়া যায়। বিরতি অভ্যাস করিতে বহু যত্ন করিতে হয়।

অভ্যাসের এমনই গুণ, কর্ম করিবার সময় ভাবিতে চিন্তিতে হয় না, কলের মতন কর্ম হইয়া যায়। তখন সেটা সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, কর্মের আদ্য পাইলেই তাহার পরিপূর্ণ অন্ত আপনই চলিয়া আসে। এই যে সচ্ছন্দে লিখিয়া যাইতেছি, এটা সংস্কারের ফল।...

মনের ও দেহের এই শক্তি না থাকিলে, মানুষকে পশুর মতন থাকিতে হইত। প্রত্যেক কর্ম আদ্যন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে হইলে নূতন জ্ঞান উপার্জন, নূতন শক্তি-সঞ্চয়, কিছুই হইত না। প্রাচীনেরা কত দেখিয়া, ঠেকিয়া ভুগিয়া, কত জ্ঞান আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাহার অধিকারী হইয়া অল্প আয়াসে শিক্ষিত হইতেছি।

তাঁহারা আচার ও ব্যবহার, এই দুই ভাগে আমাদের কর্তব্য যাবতীয় কর্ম ভাগ করিয়া গিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে কর্তব্য, আচার; পরের সম্বন্ধে কর্তব্য, ব্যবহার। দেহ মন আত্মার কল্যাণকর আচার, সদাচার। সৎ, শিষ্টের আচার। ইহাই ধর্ম। যদি সকলেই সদাচারী হইত, তাহা হইলে পরস্পর ব্যবহার সৎ ও শিষ্ট হইতে পারিত। সকলে সদাচার-সম্পন্ন হয় না বলিয়া ব্যবহারে কলহ হয়, কখনও কখনও রাজদ্বারে যাইতে হয়।

"আচারঃ পরমো ধর্মঃ," এই বলিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্রকার ধর্মসংহিতা রচনা করিয়াছেন। কালে কালে দেশে দেশে আচারের প্রভেদ হয়, কিন্তু যে জাতির আদি এক, বেদশাস্ত্র যাহার মূল শাস্ত্র, আচারের প্রভেদ হইলে অবান্তরে হইবার কথা। কিন্তু কালের তুল্য বলবান্ আর কিছুই নাই, বেদের কালের আচার আর আজি-কালির আচারে অবান্তরে নয়, জাত্যন্তরে প্রভেদ ঘটিয়াছে। তথাপি বলি, হিন্দুধর্ম সনাতনধর্ম। কারণ পুথীতে ধর্মকে দোড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় নাই। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে। ইহার এক কারণ, আচারই-ধর্ম; আচারের পরিবর্তন হয়, হইলে সেই পরিবর্তিত আচারই ধর্ম। এই ধর্মেই জীবন যাত্রা। জীবন যাত্রার মধ্যে কি যে না পড়ে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

যখন বলি, ইনি হিন্দু, তিনি খৃষ্টান, তখন বুঝি একের আচার-ব্যবহার অন্যের তুল্য নয়। হিন্দু যিশু ভজনা করিলেও হিন্দু থাকিতে পারে, যদিও খৃষ্টান সমাজে থাকা কঠিন। মহম্মদকে এক মহাপুরুষ বলিতে হিন্দুর আপত্তি নাই, আল্লাহ্ খোদা নামে ভগবান্‌কে ডাকিতেও আপত্তি নাই। নাই বলিয়াই হিন্দু এত দেবদেবীর উপাসনা করিতে পারে। হিন্দুর ভগবান্ এক, তিনি সকলেরই ভগবান্।...

কথাটায় দ্বিরুক্তি করিবার নাই। কিন্তু আচারের ভেদ বিচার করিতে গেলে ফাঁপরে পড়িতে হয়। তখন মানিতে হয়, যে দেশের যে আচার পারম্পর্যক্রমে আগত, সে দেশের সেই ধর্ম। কেন না, "দেশ" ছাড়িয়া মানুষ থাকিতে পারে না, দেশের উপযোগী যে আচার তাহাও মানিতে হয়। ইংলণ্ডে বসিয়া বঙ্গের আচার রক্ষা করা চলে না। যথাযোগ্য পরিবর্তন করিতেই হয়। "দেশ" বলিতে ভারতবর্ষ, কি বঙ্গদেশ নয়, যেখানে যে বাস করে সেই তাহার দেশ।

কালাচার, ও দেশাচার ব্যতীত জাতির আচার, জাতির অন্তর্গত কুলাচার আছে। সর্বত্র বিধি নিষেধ, ইহা করিবে, উহা করিবে না। ভাগ্যে বিধি নিষেধ ছিল, কর্ম করিবার সময় ভাবিতে চিন্তিতে হয় না।

বিধি নিষেধের নাম শাস্ত্র। এক এক বিষয়ের এক এক শাস্ত্র। বিদ্যা মন্থন করিয়া জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া এক এক শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। গণিতবিদ্যার প্রয়োগভাগ, জীবন যাত্রার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিধি নিষেধ, একত্র করিয়া শুভঙ্করী আর্যা। এটি এক শাস্ত্র। যিনি যে বিষয়ে প্রাজ্ঞ, তিনি সে বিষয়ে শাস্ত্র প্রণয়নের অধিকারী। শুভঙ্করীর আর্যা-প্রণেতা কে ছিলেন, আমরা জানি না।...মণ-কষার আর্যাতে কেন "তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা"—যিনি বুঝিতে চান্, বুঝুন; শাস্ত্রকার শাস্ত্র লিখিয়াছেন, ভাষ্য লিখিতে বসেন নাই। বিধির ব্যাখ্যা জানা প্রথম বয়সে হয় না, হইতে পারে না। এই হেতু "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী," বোধ অপেক্ষা শাস্ত্রের আবৃত্তি গরিয়সী। নামতা মুখস্থ করিয়া রাখ, বোধ আপনি জন্মিবে। কিন্তু নামতার মূল বুঝিয়া রাখিলে, কার্য্যকালে সে বোধে কোন উপকার হইবে না, কাগজ পেনসিল খুঁজিতে হইবে।

যাবতীয় শাস্ত্রের প্রকৃতি এই।...

সর্ব্ব বিষয়ের শাস্ত্র লেখা নাই; অনেক শাস্ত্র মুখে মুখে চলিয়াছে, লোকে মুখে মুখে শিখিতেছে। এখানে একটা উদাহরণ দিই। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে "পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে" বাড়ী করিবে। অর্থাৎ বাস্তু-ভূমির পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী, পশ্চিম দিকে বাঁশ থাকিবে, আর দক্ষিণে যত পার ফাঁকা রাখিয়া উত্তরসীমা ঘেঁষিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

শাস্ত্র এই। কেন এই শাস্ত্র, শাস্ত্রকার জানেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, শাস্ত্র ঠিক অদ্যাপি এই বিধির দোষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, বরং গুণই দেখা গিয়াছে। যদি কেহ এই বিধি লঙ্ঘন করে, সে দুঃখ পাইবে, শাস্ত্রকারের দোষ হইবে না।...

সংস্কৃতে লেখা সকল বিধি নিষেধের হেতু বুঝিতে পারা যায় না। ইহার কারণ (১) হেতু-জিজ্ঞাসু তাঁহার স্বদেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে যান; (২) যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা তাঁহার জানা আছে তিনি তাহার সাহায্যে বুঝিতে যান; (৩) তিনি মনে করেন সকল শাস্ত্র এককালে একদেশে প্রণীত; অতএব একটার উক্তির সহিত অপরটার ঐক্য থাকিবে। সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি থাকিলেও আচার-রূপ কার্য্যের কারণ ব্যাখ্যা সোজা নয়।

দিক্‌বিচার দেখি। "দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভোজন করিতে নাই।" কেন নাই? যেহেতু দক্ষিণদিকে যমরাজ্য, দক্ষিণদিকের নামই যাম্যদিক। "দক্ষিণমুখে উনান পাতিতে নাই।" কেন? যেহেতু সেটা যে যাম্যদিক্, আর এই জন্যই ত দক্ষিণে চিতা কাটিতে হয়, প্রথমে দক্ষিণে অগ্নিযোগ করিতে হয়। বুঝিলাম কিন্তু তাহা হইলে দক্ষিণ শিয়রে শুইবার বিধি কেন? এখানে নিরুত্তর।...

কিন্তু এমনও হইতে পারে, দক্ষিণ দিকের বাতাস লক্ষ্য করিয়া তিনটি বিধির উৎপত্তি। দুই তিন মাস শীত ছাড়া দক্ষিণে বাতাস বহিতে থাকে, লোকে এই বাতাসই চায়; বলে "দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা।" দক্ষিণ দিকের বাতাসে যে ধুলা-বালি উড়িয়া আসে, দক্ষিণ মুখে ভোজনের দোষ এই। উনানের মুখ দক্ষিণ দিকে রাখিলে কাঠ ধু-ধু করিয়া জ্বলিতে থাকে, পাকের তাপের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারা যায় না। তবে যদি কেহ দক্ষিণ রুদ্ধ ঘরে পাক করে, তাহার অসুবিধা হইবে না। কিন্তু এমন রুদ্ধ-দ্বার গৃহে পাকশালা নির্ম্মিত হইত না। আরও মনে রাখিতে হইবে, পাকশালাতেই ভোজনস্থান থাকিত। দক্ষিণ শিয়রে শুইবার হেতুও তাই, মাথায় দক্ষিণের বাতাস লাগিবে, সুনিদ্রা হইবে। দক্ষিণ অভাবে পূর্ব্বশিয়রে। পূবো বাতাসও ভাল। দেশভেদে পশ্চিমা বাতাসও ভাল। কিন্তু শয়নের শিয়র সম্বন্ধে এই বিধি সে দেশে হয় নাই। শাস্ত্রে আছে, প্রবাসে এ বিচার নাই বরং পশ্চিম শিয়র ভাল।

আয়ুর্ব্বেদে বহু বিধি-নিষেধ আছে। কারণ জানিলেও কেহ তাহাতে সন্দেহ করে না। কারণ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র। সন্দেহ করিতে হইলে ভূয়োদর্শী বিচক্ষণ বিদ্বান্ কৃতবুদ্ধি করিতে পারেন, তুমি আমি ভুল ধরিতে পারি না। এইরূপ, মনুপ্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে আচার সম্বন্ধে বিধি নিষেধের অন্ত নাই। পুরাণেও কত উপদেশ আছে। সব উপদেশের হেতু বুঝিতে পারি না। কারণ কালান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, এবং দেশান্তরে বাস করিতেছি। এখানে এ প্রসঙ্গ তুলিব না। কিন্তু ভাবি, কালোপযোগী ও দেশোপযোগী না হইলে লোকে মানিত না, মানিতে পারিত না। আর ইহাও ঠিক, লোকের অকল্যাণ হউক, এই দুর্বুদ্ধিতে কোনও শাস্ত্র কোথাও প্রণীত হয় নাই।

বিদেশী আমাদের আচার বুঝিতে পারে না। মানুষকে দ্বিপদ-প্রাণীমাত্র জ্ঞান করিলে মনের টানের অভাবে তাহার অনুষ্ঠিত আচারের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।...

দেবদেবীর পূজায় এবং ব্রতে বিধি নিষেধের অন্ত নাই। এক পূজার সহিত আর এক পূজার, এক ব্রতের সহিত আর এক ব্রতের সাদৃশ্য আছে, নাইও। বস্তুতঃ সাদৃশ্য থাকিলে এত পূজা ও ব্রত আবশ্যক হইত না। কালে এক এক পূজা ও ব্রত আরব্ধ হইয়াছে, পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। বেদের কাল চলিয়া গেলে বৌদ্ধকাল আসিল। বৈদিক দেব দেবী নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের হাতে আরও রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। প্রত্যেকের ইতিহাস জানা নাই, এবং যে ইতিহাসে পূজা-প্রকরণ নাই সে ইতিহাসও ইতিহাস নয়। কিন্তু সেরূপ ইতিহাস কখনও উদ্ধার হইবে না। সামান্য দুই একটা উদাহরণ দিই। বিল্বদলে শিবপূজা, তুলসীপত্রে বিষ্ণুপূজা, তিলক (তিল নয়) ও দ্রোণ পুষ্পে সরস্বতী পূজা করিতে হয়। কেন হয়?—কে জানে। বাদ্য ব্যতীত কোন পূজার আরম্ভ ও শেষ হইতে পারে না, কিন্তু লক্ষ্মী পূজায় শঙ্খ ব্যতীত অন্য বাদ্য বাজাইতে নাই। এইরূপ বিধি-নিষেধের হেতু অনুসন্ধান সোজা হইবে না।

ব্রত সম্বন্ধেও এই কথা। একটা বচন আছে, ব্রতের মধ্যে একাদশী, এবং তপস্যার মধ্যে উপবাস শ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ উপবাসের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্রতের উপবাস আহার-লঙ্ঘন নয়। অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে উপবাসের দিন না কাটিলে উপবাসের ফল হয় না। একাদশীর উপবাসে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়; যদি না হয় তাহা হইলে সে উপবাসের পূর্ণফল হইল না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, একাদশী তিথিতেই কেন, এই উপবাস করিতে হইবে. অন্য এক তিথিতে করিলে দোষ কি?—কে জানে কিন্তু একটা তিথি ধরিতেই হইবে সে তিথি সম্বন্ধেও এই জিজ্ঞাস্য উঠিবে। হয়ত ইতিহাসের এক স্মরণীয় তিথি (দিন) একাদশী ছিল।

পূজা ও ব্রতের অনুষ্ঠানে বহু বহু বিধি পালন করিতে হয়। পালন করিতে গিয়াই মনে পড়ে, আজ বিশেষ দিন, আজ আমার সঙ্কল্প পূরণ করিতে যাইতেছি। এইরূপে মন উদ্‌যুক্ত হয়। বিধি-নিষেধ-হীন, অনুষ্ঠান-হীন পূজা ও ব্রতে ফল হয় না।...

চাতুর্মাস্য ব্রত ধরি। আষাঢ় মাসে হরিশয়ন একাদশীর পরদিন দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস, চাতুর্মাস্য। এই চাতুর্মাসে কৃত্য বলিয়া নাম, চাতুর্মাস্য ব্রত। পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসী এই চারিমাস, বর্ষা ও শরৎ, দুই ঋতু, এক স্থানে যাপন করিতেন, সচ্ছন্দ বন জাত ফলমূল ব্যতীত কৃষিজাত শস্য পাইতেন না। এই সন্ন্যাসী ব্রতের অনুকরণে গৃহীর চাতুর্মাস্য ব্রত। দুই তিন পুরাণে ইহার বিধান আছে। পড়িলেই বুঝি, নিত্য অভ্যাস বর্জন, এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহী সন্ন্যাসী ব্রত সম্যক্ পালন করিতে পারে না। কেহ গুড় (ইদানীং মিষ্টান্ন) কেহ প্রত্যহ অভ্যঙ্গের তৈল, কেহ নিত্যভোজ্য ঘৃত, কেহ তাম্বূল, কেহ লবণ, কেহ পক্ব অন্ন (যেমন ভাত), বর্জন করে, নিত্য প্রাতঃস্নান ও নখ কেশ ধারণ করে। সকলে চারিমাস পারে না। কেহ শ্রাবণ মাসে শাক (আনাজ), কেহ ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ, কার্ত্তিক মাসে আমিষ বর্জন করে। চারিমাস শ্বেত সীম ও রাজমাষ (বিরিকলাই), বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ নিষিদ্ধ। এইরূপ কাহারও মতে পটোল, বেগুন ও মধুর মাংসল ফল (কুমড়া, লাউ শসা) নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকার এক কথায় লিখিয়াছেন, রুচিকর তৎতৎকাল লভ্য ফল মূল বর্জন করিবে। ব্রতের ফল কি? লিখিত আছে, এই ব্রত করিলে নিরাধি (মানসিক দুঃখ-রহিত), নীরোগী, ওজস্বী ও বিষ্ণুভক্ত হইতে পারা যায়।...

এক পুরাণে আছে, দিনে দুইবার আহার করে মানুষে, চারিবার করে রাক্ষসে। ইহা সত্য, রাক্ষসের উক্ত শক্তি নাই। ব্রত ধারণে আনন্দ আছে, আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারি, এই জ্ঞান-জন্য আনন্দ। শ্রেয়ঃ-সাধন সংকল্প জাত আনন্দ। আর বাল্যকাল হইতে বালকবালিকারা ব্রত গ্রহণ করিলে সংযমী হইতে পারে। বই পড়িয়া ফলাফল-বোধ নয়, অভ্যাস দ্বারা আত্মসংযম সংস্কারে পরিণত করা চাই।

সদ্‌গোপ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৭ — শ্রীযোগেশচন্দ্র

ভ্রম-সংশোধন

মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর এই সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে ভুল থাকায় উহার অনেক স্থলে সংশোধন আবশ্যক; সেইগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি			
৮৪১	১	১	"বিয়ের রাতে বরযাত্রীরা"	স্থলে	"বিয়ের রাতে বর নিয়ে বরযাত্রীরা
৮৪২	১	১৫	"?"	স্থলে	";"
৮৪৩	১	১১	"to"	,,	"go"
৮৪৫	১	২২	"জমাব"	,,	"জানে"
,,	,,	২০	"তন্মন মোট"	,,	"তনমন মোটি
,,	,,	২৮	"চা খল"	,,	"চাখল"
,,	,,	২৯	"কোট"	,,	"কোট"
,,	,,	৩৪	'বংধা"। এই "গোরখ বংধা"ই হ'ল' স্থলে 'ধংধা" বাংলা দেশে এ		
,,	,,	৩৫	"গোলোক-ধাঁধাঁ"র পূর্ব্বে "হ'য়ে দাঁড়াল" এই দুইটি কথা বসিবে		
৮৪৬	২	১৬	"বাউল"	স্থলে	"বাউল"
,,	,,	৩০	"প্রশান্ত"	,,	"প্রশস্ত"
৮৪৮	১	৩২	"পড়ি"	,,	"পড়ে"
৮৪৯	২	২৩	"ডাক"	,,	"ত্রাক"
৮৫০	১	২৮	"আর হ'ল বাংলার কাহা"	,,	"আর বাংলার কাহা"
,,	২	২৯	"কথা সুর"	,,	"কথা আর সুর"
৮৫১	১	২৪	"বাংলার ভার জীবনে"	,,	"বাংলার ভাব-জীবনে"
,,	২	৩	"বিনাও বৈশিষ্ট্য"	,,	"বিনা বৈশিষ্ট্যও"
৮৫৩	২	১৯	"দেখেছে"	,,	"দেখে"
৮৫৪	১	১৬	"পও লোঁকা"	,,	"পত্তলোঁকা"
,,	১	১৮	"উপাব"	,,	"উসাব"
,,	২	১৮	"খৃষ্টাব্দে সুন্দরদাসের"	,,	"খ্রীষ্টাব্দে এই সুন্দরদাসের"
৮৫৫	১	১৭	"পথই"	,,	"পথই"
,,	,,	২৬	"এ সব" এই দুটি কথা বাদ দিতে হইবে		
,,	২	৭	"তাই"	,,	"তারই"
,,	,,	১৫	"ধরিছ"	,,	"ধারিছ্"
,,	,,	২৪	"পাছ"	,,	"পা'ছ্"
,,	,,	২৫	"করিছ"	,,	"করিছ্"
,,	,,	২৬	,,	,,	,,
,,	,,	৩২	"কাথা"	,,	"কথা"
৮৫৬	১	৬	"প্রেম যোগেতে"	,,	"সদা প্রেমেতে যোগ."
,,	২	৪	"ভুলিছ"	,,	"ভুলিছ্"
,,	২	১৪	"দুখ"	,,	"দুখ্"

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা আর ভাল লাগে না কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিন্-মাফিক্ কাজ, বদ্ধতা, একঘেয়েমি এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

শীলেদের আপিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপদানীর কাছে একটা স্কুলের মাষ্টারী লইয়া গেল। জায়গাটা না শহর, না পাড়াগাঁ গোছের—চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকান ঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়া ফেলা রাস্তার কালো ধূলা ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানী পৌঁছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের এক পাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্দ্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্দ্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোষ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আল্‌নায় খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তাপোষের নীচে অপুর টীনের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি করে জান্‌লে?

—সে কথার দরকার নেই। তারপর কল্‌কাতা ছেড়ে এখানে কি মনে করে?...বাস্! এমন জায়গায় মানুষে থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তা ছাড়া কল্‌কাতায় যেন আর ভাল লাগে না—দিনকতক এমন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাষ্টারীটা জুটে গেল, তাই এখানেই এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—পাশেই একটা বাকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান, রাত্রে তাহারই দোকানের অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক্ হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জ্জিত ছিল চিরদিন হয়তো—তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জ্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি? এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে না-কি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও ত সে অপুকে কস্মিন্‌কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সব-চেয়ে বুকে বাজিল যখন পর দিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরার দোকানের নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরণের হাস্যপরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাক্‌তে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি? গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিলেন, কি খাওয়ান্‌টাই খাওয়ালেন—উঃ! পরে খুসির সুরে বলিল—এখানে ওঁরা সব বলেচেন আমায় ধানের জমি দিয়ে বাস করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল্—ওঁরাই ঘর দোর বেঁধে দেবেন বলেচেন—আপাতত মাটির, মানে বিচুলির ছাউনি, এদেশে উলুখড় হয় না কি-না?

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনও। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পর দিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য এক দিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, সে যেন প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষ বোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া

ধরিবার কাঙালপণা কই অপুর প্রকৃতিতে ত ছিল না কখনও ?

*　　*　　*

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরের রোয়াকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যা বেলাতে সেটা এত অসহনীয় হইয়া ওঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্প-গুজব করিতে ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহনীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দ্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার, তা-ও সবাই তাহার অপরিচিত। বিভু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও ন'টা দশটা পর্য্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সাম্‌নেই মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দুবেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এই পুকুরেই কাচিতে নামে, রৌদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপমারা খয়েরী-রংএর বারো হাতি শাড়ী পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে-মেলানো অপুর রোয়াক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিবস্তির ও-পাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধান ক্ষেত, একটা পাটের গাঁটবন্দী কল। এক এক দিন রাত্রে ইটের পাজার ফাটলে ফাটলে রাঙা ও বেগুনী আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে নিবিয়া যায় আবার জ্বলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ী হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলাপুটুলী, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই ষ্টেশনে গিয়া থামে। একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণটি তেলেভাজা পরোটা ও তরকারী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটীন্। বৈচিত্র্যও নাই; বদলও নাই।

অপু কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে যায় যে কোনো মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনি সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চায় না সব সময়। যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার মত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলা ত অসম্ভব রূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সব্-আপিসের পিওন চিঠিপত্র ভরা শীল করা ডাক-ব্যাগ্‌টি ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, শীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি চরণবাবু ? চরণবাবু বলেন—হাঁ হাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইষ্টাম্পের হিসেবটা মিলিয়ে ফেলি—এই নিন্ কাঁচি।

পোষ্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন—মনিঅর্ডার সাতখানা ? দেখেচেন কাণ্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটাল্‌টা দেখুন না একবার দয়া করে—সাতান্ন টাকা ন' আনা ? তবেই হয়েচে—রইল্ পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রির গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি-অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই ? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোষ্টমাষ্টারের টহলদারী করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুল ছুটির পর পোষ্টাপিসে দৌড়ানো চাই-ই তার। তাহার সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলা। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানা ধরণের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ, নীল। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্ল্লভ ঘটনা বলিয়া চিরদিনই চিঠির, বিশেষ করিয়া খামের চিঠির প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক এক খানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সে-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত !

তাহার নিজের চিঠি কোনোদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু নানাধরণের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোষ্টকার্ডের চিঠি ডেড্-লেটার আপিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মত বহু ডাক মোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ৎ দেয় এ নামের কোনো লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা

সামনের মাঠে' ঘাসের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতূহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল।

শ্রীচরণকমলেষু,

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবত আপনি আমাদের নিকট কোনো পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমরা পত্র লিখি নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলিবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধ হয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিয়াছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল। আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা
কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখায় অপটুত্ব ও বানান ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয় কারণ পত্রখানা লেখা হইয়েছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামের কোনো লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় ত লিখিতে ভুলিয়াছে। অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো যোল বয়স বৎসর, ছোট্‌খাট গড়ন, ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ।...কোথায় সে তাহার মেজদাদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানবমনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকা-হৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য, কেন জগতে এভাবে ধূলায় অনাদরে গড়াগড়ি যায়, কেউ খোঁজে না, কেউ তা নিয়ে গর্ব্ব করে না?

বিশ্বস্তর স্যাকরার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্য্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সান্যাল লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ব্ব বাবু যে, এত রাত্রে কোথায়? কোথাও না, এই বিশু সেক্‌রার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দীঘড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলেন কি করে বলুন তো?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে পড়া কেমন বুঝতে পারচিনে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও স্বর নীচু করিয়া বলিল—ওখানে অত ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে ভাবচেন? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব। আপনি হচ্চেন ইস্কুলের মাষ্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেচে তা বোধ করি জানেন না?

—না? কি কথা?

—কি কথা তা আর বুঝতে পারচেন না মশাই? হুঁ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ও সব ছেড়ে দিন বুঝলেন? আরও একজন আপনার আগে ওই রকম ওদের খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুঁয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—মশাই টাকা শুষে শুষে তাকে একবার—ওদের ব্যবসাই ওই। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্চে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন আর ও মেয়ের এমন মোহই বা কি শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্ত্তার গতি ও বক্তব্য বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে—পটেশ্বরী?

—হাঁ হাঁ হাঁ, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

—কি করেচে বলচেন পটেশ্বরী?

—আমি আর কি বলচি কিছু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলচি। নতুন কথা কি আর কিছু বলচি কি? যাবেন না, ওসব, তাতে বিদেশী লোক সাবধান করে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভালো, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন, অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে

ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ।

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত দুটা জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখ্‌লে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেচে—আজ পনেরো দিন টাইফায়েড্, তা আমি কলের চাক্‌রী বজায় রাখ্‌ব, না রুগীর সেবা করব। আপনি দিন-মানটার জন্যে জনকতক ভলান্টিয়ার যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দু একদিন আপনি—

তেত্রিশ দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপু নিজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, অপু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্য্যন্ত বাহিরের দাওয়ায় একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এমনি বসিয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগী যায় যায় হইয়াছিল। দিঘ্‌ড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলান্টিয়ার দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপু দিঘ্‌ড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দুইটির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক তাপ ও হাত পা ঘসিতে ঘসিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরাইয়া আনে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দিঘ্‌ড়ী মহাশয় একদিন বলিলেন—আপনি আমার যা উপকারটা করেছেন মাষ্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বল্‌ব। আমার স্ত্রী বল্‌ছিল আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই এক মাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান্ না? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাক্‌বেন, খাবেন, কোনো অসুবিধে আপনার হতে পাবে না।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্পদিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনের মধ্যে দিয়া সে পরিচয়—কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপু পূর্ণ দীঘড়ীর স্ত্রীকে শুধু মাসিমা বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার পাঁচ টাকায় বেশী খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারের বিশু স্যাক্‌রা একদিন বলিয়াছিল—দীঘ্‌ড়ী বাড়ী টাকা রাখ্‌বেন না অমন ক'রে, ওরা অভাবী লোক, বিশেষ করে দীঘ্‌ড়ী-গিন্নী ভারী খেলোয়াড় লোক, বিদেশী লোক আপনি, আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার?

মেয়ে দুটিরও সঙ্গে সে মেশে বটে, বড় মেয়েটিরই নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চোদ্দ পনেরো হইবে, রং উজ্জল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনো দিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্দ্ধেক দিন বোধ হয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার ময়লা রুমাল-গুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাই-এর হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাজিয়া তাহার রুমালে জড়াইয়া রাখে, কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাতে দিয়ে ব্রতটা নেবো, মাষ্টার মশায়। এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিষ যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্য্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না এ ধরণের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিতও হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা ও বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানীর বাজার হইতে রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দিঘ্‌ড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা মা তো কখনও দেখিনি? বেচারীকে এরকম ভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক্, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর রাখব না।

ছুটির পরে অপু একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে—"On deputation to England!"

জানকী ভাল করিয়া এম্-এ, ও বি-টি পাশ করিবার পরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে মাষ্টারী করিতেছে এ-সংবাদ পূর্ব্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোনো খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-ই বা দিবে? দেখি দেখি—বা-রে! জানকী বিলাত গিয়াছে। বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত ইস্কুলের শিক্ষা-প্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ, জানকী যে জানকী সেও গেল বিলেত!

মনে পড়িল কলেজ জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরীব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে যাইতে যাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন! বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড় ধূলো, তাহার উপর আবার রাস্তায় কয়লার গুঁড়া দেওয়া—পথ-হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তি, ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলা তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ পথে চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ বস্তিগুলার দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে মানুষ কোন্ টানে, কিসের লোভে এ-ধরণের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে? জানে না, বেচারীরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্ম্মস্পৃহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্য্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই? বন-বনানীর শ্যামলতাকে ভালবাসে নাই? পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই?

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়াই সে ফিরিল।

অনেক দিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের গাছপালা ও বনের ফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড় খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দুএকজন মাষ্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে!

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাকরার আড্ডায় গেল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কতদিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম টিউজিয়ম এতদিন সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরাণো নর্ম্মাণ দুর্গ দু' একটা, পাশে পাশে জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যাধূসর আটলাণ্টিকের উদার বুকে অস্ত আকাশের রঙীন্ প্রতিচ্ছায়া কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে কি বনের ফুল? ইংল্যাণ্ডের বনফুল নাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পপি, ক্লিম্যাটিস্, ডেজী।

বিশু স্যাকরার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাঁবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাষ্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—হাঁ। আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ওপারে কুলিবস্তির আলো নিবিয়া যায়, নৈশ বায়ু শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটার আপ ট্রেন হেলিতে দুলিতে ঝক্ ঝক্ শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েণ্টস্‌ম্যান্ আঁধারে লণ্ঠন হাতে আসিয়া সিগন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাষ্টার বাবু, এখনও বসিয়ে আছে?

—কে ভজুয়া? হাঁ—সে এখনও বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা? কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা।

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—এখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলেদের বাড়ির চাকুরীজীবনে কিনিয়াছিল—এ-খানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখ পড়িল, অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংএর—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে প্রায় দেখা অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইএর পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটী কোটী দৃশ্য অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও ত এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ···কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ওই নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতায় মত জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও

তার বিভিন্ন গ্যাসগুলা প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া ওঠে, লাখে লাখে পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি খুসিতে দৈন্য ও ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ওই পোকার সব শেষ হয়ে গেল তেম্‌নি।

এই অবোধ জীবনের সঙ্গে, ওই বিশাল নক্ষত্র-জগতের, ঐ গ্রহ উল্কা, ধূমকেতু ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী গাদার ব্যাঙের ছাতার মত যাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাদের কিসের সম্পর্ক?

মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছে—অর্পণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ওই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ওই পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্ত্তনের প্রাণী কি নাই যাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ওই বইএর পাতায় বিচরণশীল প্রায় আনুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য?

হয় ত তাহাই সত্য, হয় ত মানুষের সকল কল্পনা সকল জ্ঞান বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ নয়—তাহা নিতান্তই এ পৃথিবীর মাটির, ··মাটির,···মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ওই পোকাটার জগতের মত। হয়ত তাহাই, কে বলিবে হাঁ কি, না?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায়?

গ্রামবাসীদিগের প্রতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেচি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার—অনেকেই হয়ত তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ-বিদেশ হ'তে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েচে ভিতর থেকে—এ রকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করিনি। তারা সুখে নেই।, সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানা রকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েচে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্ব্বত্র অধিকার ক'রে রয়েচে। আমার নিজের দেশের উপর কোন অভিমান আছে ব'লে এ-কথাটি বলচি মনে ক'রো না। বস্তুতঃ ইউরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করচে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ বলে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য্য দিয়েচে, ঐশ্বর্য্যের পন্থা বিস্তৃত ক'রে দিয়েচে। সব হয়েচে। কিন্তু দুঃখ পাপে। কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমতঃ চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই। আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেচি। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেচেন—এত বিদ্যা এত জ্ঞান এত শক্তি এত সম্পদ কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্ত্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কি স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনও বোধ হয় ভাল ক'রে কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি কিংবা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন্‌ আপন স্বভাব অনুসারে নানা রকম কারণ কল্পনা করচেন। আমিও এ-সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেচি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি-না জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস—এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেচি ঠিকমত। পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি

চে সে অতি বিপুল প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। এই সমস্ত যন্ত্রের বাহন জুগিয়েচে মানুষ। মানুষকে মানুষ সেই যন্ত্রের বাহন-রূপে তার অঙ্গ ক'রে তুলেচে, এমন হাজার হাজার বহু শত সহস্র। তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড় বড় শহর তৈরি করেচে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেচে, তার পরিধি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম উপগ্রামকে গ্রাস ক'রে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেচে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে—শহরে মানুষ কখনও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত হ'তে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই। কলিকাতা শহর যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্য্যন্ত জানিনে। মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে, সে তার সমাজ ধর্ম্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে ব'লে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারিদিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যপ্ত হয় তখন সে-সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকল রকম স্বার্থের অতীত যে আত্মীয় সম্বন্ধ, সেখানে মানুষ আর সমস্ত থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে, কিন্তু মানব আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়। বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেচেন—যাকে ওঁরা happiness বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়?

মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে—এ-কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েচে। কেন-না, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যবসা-ঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে—বাইরের ফল—এত তাতে মুনাফা হয়, এত রকম সুযোগ সুবিধা মানুষ পায় যে, মানুষের বলবার সাহস থাকে না—এটা সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি। যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেচে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেচে—তার এত অহঙ্কার! আর সে সঙ্গে এমন অনেক সুযোগ সুবিধা আছে যা বস্তুতঃ মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্য্যযোগে উদ্ভূত হয়েচে। এগুলিকে চরম লাভ ব'লে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে করে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েচে মানুষের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ, সে হ'ল মানব সম্বন্ধ। মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশী হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল তাদের আমার পিতৃস্থানীয় ব'লে জেনেচি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে। একথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সঙ্কীর্ণ হ'তে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে—মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্ব্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি ক'রে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মত দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে—এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে। এখানে চা'লের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখ-দুঃখের কি হিসেব আছে? প্রতিদিনের পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে। এতে টাকা হয় সুখও হয়, অনেক হয় কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়া মায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কি হয়েচে না হয়েচে! এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চ নীচের ভেদ ছিল না তা নয়, প্রভু ছিল, দাস ছিল, পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল, ধনী ছিল, নির্দ্ধন ছিল, কিন্তু সকলের সুখ-দুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজা-পার্ব্বণে আনন্দ উৎসবে—সকল সম্বন্ধে—প্রতিদিন তারা নানা রকমে মিলিত হয়েচে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেচে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে

আনন্দের অংশ গ্রহণ করেচে। উপর নীচ জ্ঞানী অজ্ঞানের মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।—আমি পল্লীর কথা, বলচি, কিন্তু মনে রেখো—পল্লীই তখন সব, শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না; কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত কত ধনী কত মানী আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার ক'রে বাস করেচে। সমস্ত জীবন হয় ত নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেচে। যা কিছু সম্পদ, তারা পল্লীতে এনেচে। সেই অর্থে টোল চলেচে পাঠশালা বসেচে, রাস্তাঘাট হয়েচে, অতিথিশালা, যাত্রা পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেচে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছিল তার কারণ—গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হ'তে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্ম্মকর্ম্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদীয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড় বড় হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই ক'রে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়?

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম, ভাল ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেচে। আমি তাকে অসম্মান করিনে, কিন্তু আমাদের খুব একটা বড় সম্পদ ছিল সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড় সম্পদ নাই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখ-শান্তি থাকতে পারে না। সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলচে—আমি ভোগ করব, আমি বড় হব, আমার নাম হবে, আমার মুনাফা হবে। যে তা করচে তার কত বড় সম্মান। তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এই রকম উপাসনা এমন ভাবে আমাদের দেশে দেখিনি। কিছু না—একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড় ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরুল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ী করে আসচে, গাড়ীর ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে ব'লে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহাত্মা যাঁকে বলি গান্ধী যদি আসেন দেশশুদ্ধ ক্ষেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড় করে স্বীকার করেচেন, আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। বাস, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশী আমরা কিছু বুঝি নে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান অনেক জ্ঞানী অনেক ধনী আছে, কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে—আত্মদানের ঐশ্বর্য্য। এ কি কম কথা। এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কি চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্ত্তন হয়ে এসেচে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েচি, কোনো রকম চাটুবাক্য বলতে চাইনে। গ্রামের যে মূর্ত্তি দেখেচি সে অতি কুৎসিৎ। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, ছলনা, বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকর্দ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারতে চায়। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েচে তা চক্ষে দেখেচি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে গ্রামে তা নেই, গ্রামের যেটা আপন জিনিষ ছিল তাও আজ সে হারিয়েচে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেচি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্ব্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করচ। আর একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা ক'রো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেচি। কেন-না, তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিৎ যতই যাচ্চে ধ্বসে, উপরের তলায় ফাটল ধরচে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশী দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তাহলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্ব্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েচে। আর সকল দেশ এগিয়ে চলেচে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে

নিজের শক্তি সম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তি-সমবায়ের সাধনা।

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার শ্রীনিকেতনের এই বক্তৃতার রিপোর্টটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং শেষের কতকগুলি বাক্য স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন।]

পুরুষস্য ভাগ্যং

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

সদানন্দ গাঙ্গুলী তাঁহার জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়া বড় মিত্রের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শীতকালের বাদলা একটা অস্বস্তির ব্যাপার। বড় মিত্র তাঁহার বালাপোষখানিকে ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া গুড়গুড়িতে ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, এমন সময়ে সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত দেহমনটা যেন তিক্ত হইয়া গেল।

সদানন্দ তাঁহার জলসিক্ত ছাতিটি দেওয়ালের পাশে রাখিয়া বিনা আহ্বানেই জাজিমের উপর বসিলেন। পাশেই সদ্যঃপ্রাপ্ত "বঙ্গবাসী"খানা পড়িয়া ছিল, সদানন্দ বলিলেন, "এই যে আজ কাগজ এসেছে দেখছি। বেরুলো না কি কিছু ?"

এ প্রশ্ন আজ তিনমাস যাবৎ বড় মিত্র শুনিয়া আসিতেছেন, কাজেই অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "না।"

কিন্তু সদানন্দ এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "কেন আজ তো হ'ল গিয়ে ২৫শে মাঘ। ওরা তো বলেছিল যে অগ্রহায়ণের শেষেই বেরুবে।"

বড় মিত্র গুড়গুড়িতে একটা টান দিয়া বলিলেন, "তা না বেরুলে আমি আর কি করব বল। আমার ঘরের কাজ তো নয় ? বেরুলে তুমিও জানতে পারবে, আমিও পারবো।"

সদানন্দ একটু শুষ্কভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, কলকাতায় গিয়ে ওদের আপিসে একবার খবর নিলে হয় না, বড়ো-দা ?"

বড় মিত্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা নিতে পার।" বলিয়া পাশের হাতবাক্স হইতে কিসের একখানি দলিল লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

সদানন্দ কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন, "তা হ'লে এখন উঠি, বড়ো-দা।"

বড়ো-দা এবারও সংক্ষিপ্তভাবেই বলিলেন, "আচ্ছা

কিন্তু গ্রহের ফের! সদানন্দ বড় মিত্রের বাড়ি হইতে অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বৃষ্টিটা খুব জোরে আসিল।

পাশেই ছিল পঞ্চানন বৈরাগীর দোকান। পঞ্চানন একখানি বিলাতী কম্বলে মাথা ও দেহ আবৃত করিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, এমন সময়ে সদানন্দকে দেখিয়া বলিল, "কোথায় গো, সদাই খুড়ো। এই বৃষ্টিমাথায় কোথায় চলেছ ? এস এস, কলকের একটা টান দিয়ে যাও।"

বৃষ্টির সঙ্গে এই সময়টা একটা জোর বাতাস আসিয়া হাড়ের ভিতরটা যেন কাঁপাইয়া তুলিল। এ অবস্থায় কলকের টান দিবার প্রলোভন সদানন্দ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পঞ্চাননের দোকানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দোরের কাছে একখানি ছেঁড়া থলিয়া পাতা ছিল, তাহাতে কর্দ্দমসিক্ত পা দুইখানি বেশ করিয়া মুছিয়া সদানন্দ একটি কেরাসিনের বাক্সের উপর বসিলেন। পঞ্চানন বলিল, "ওই কোণ থেকে পৈতেওয়ালা হুঁকোটা একেবারে নিয়ে বস্‌লে না কেন সদাই খুড়ো ? তার পর এই বাদলায় গিয়েছিলে কোথায় ? গরু খুঁজতে বুঝি ?"

হুঁকাটায় একটা টান দিয়া সদানন্দ বিলক্ষণ আরাম অনুভব করিলেন। নাকমুখ দিয়া ধূম্ররাশি নির্গত করিয়া বলিলেন, "না হে পাঁচু, গরু খুঁজতে নয়। গিয়েছিলাম একবার বড়ো মিত্তিরের ওখানে।"

"সকাল বেলায় বড়ো মিত্তিরের ওখানে ? কেন টাকা-কড়ি কিছু কর্জ্জ করছ না কি ?"

"না।"

বড় মিত্রের নিকট যে অন্য প্রয়োজনে কেহ যাইতে পারে, বিশেষতঃ এই দুর্য্যোগে—তাহা পঞ্চানন কল্পনা করিতে পারিল না। বলিল, "তবে ?"

কায় আরও একটা টান দিয়া সদানন্দ বলিলেন,

"তবে আগাগোড়া কথাটা তোমাকে ভেঙেই বলি, পাঁচু। এখন হয়েছে কি জান?—পুজোর সময় বকো মিত্তির একদিন বলে যে, 'সদাই-দা চিরকালটাই কেবল দুঃখকষ্ট করেই কাটালে, এইবার থোকথাক্ কিছু রোজগার করে নাও না।' আমি বল্লাম, 'কি রকম?' সে বল্লে, 'লটারীর টিকিট কিনবে? চার আনা ক'রে টিকিট। ফার্ষ্ট প্রাইজ পাও তো একেবারেই দশ হাজার টাকা। আর তা যদি নাও পাও তো হাজার টাকার প্রাইজ তো ফস্কাবে না। এই দেখ টিকিট। অগ্রাণ মাসের শেষাশেষি সমস্ত খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবে কে কি প্রাইজ পেলে।' তা বুঝ্লে পাঁচু, শুনে তো আমি চমকে গেলাম। ভাবলাম, সত্যিই তো দুঃখকষ্ট করেই চিরটা কাল কাটাচ্ছি, ভগবান যদি মুখ তুলে চান। আর তা নইলে যাচ্ছিলাম হাট কর্তে, হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন যে দেখে যাই বকো-দা'র পুকুরে মাছটাছ ধরানো হচ্ছে কি না। তা পাঁচু, মাছ-ধরা সেদিন হ'ল না বটে, কিন্তু এই কথাটা শুনে বুকের ভেতরটা এমন হাঁচোড়-পাঁচোড় করতে লাগ্লো যে, হাট করতে যাব বলে যে আধুলিটে ট্যাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, দিলাম সেইটে। বললাম, 'আচ্ছা বকো-দা, যদি দুখানা টিকিট কিনি, তা হ'লে দু-হাজার পাব তো?' বকো-দা হেসে বল্লে, 'কপালে থাকে তো বিশ হাজারও পেতে পার।"

পঞ্চানন অবাক্ হইয়া এই কাহিনী শুনিতেছিল। কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল, গুলের গামলা হইতে চিমটা দিয়া আর একটা অগ্নিখণ্ড লইয়া নূতন কলিকা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সদানন্দ বলিতে লাগিলেন, "তার পর বাবাজী অগ্রাণ ছেড়ে পৌষ মাসও কেটে গিয়ে আজ তো মাঘ মাসের শেষাশেষি হ'ল, কোন খবরই তো পেলাম না। বকো-দা'র কাছে কি শুক্রবারে 'বঙ্গবাসী' এলেই একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আজ তো ওর ভাবগতিক দেখে বোধ হ'ল যেন একটু রাসভারি ভাব। গতিক তো কিছু ভাল বুঝছি না। আমরা দুঃখী লোক, আমাদের একটা আধুলী যে একটা সোনার মোহরের চেয়েও বেশী।"

পঞ্চানন খুব বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু এও তো হতে পারে যে খবর তারা একেবারে বকো মিত্তিরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পর, বকো মিত্তির কি রকম ভদ্রের লোক তা জান তো? সে যদি দেখে থাকে যে তুমি সত্যি সত্যিই একটা মোটা টাকা পেয়েছ, তাহ'লে হিংসেয় পড়ে সে যদি সে কথা তোমাকে না ব'লে থাকে? তা ছাড়া, এমনও তো হওয়া অসম্ভব নয় যে টিকিট হারিয়ে গিয়েছে ব'লে, না হয় কিছু কমিশন বাদ দিয়ে, ও নিজেই সদানন্দ গাঙ্গুলী ব'লে সই ক'রে তাদের আপিস থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। জান তো ওকে, সেবার সেই যে মাদার মোল্লার খতের মোকর্দ্দমা?—বলি ভুলে গেছ না কি সে সব?"

সদানন্দের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। একথাটা তিনি একদিনের জন্যও কল্পনা করেন নাই! পঞ্চানন যাহা বলিয়াছে তাহা তো একবর্ণও মিথ্যা নয়। বঙ্কু মিত্রের দ্বারা তো ওরূপ কার্য্য আদৌ অসম্ভব নয়। মাদার মোল্লার খতের মোকর্দ্দমার একটা সহি জাল করার অপরাধ তো বঙ্কু মিত্রের নামে আর একটু হইলেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল, কেবল পয়সার জোরেই তো সেবার মোকর্দ্দমাটা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

পঞ্চানন কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বলিল, "অগ্রাণের শেষে খবর বেরুবার কথা ছিল তো? আচ্ছা, দাঁড়াও। মাঝে একবার বকো মিত্তির কলকাতায় গিয়েছিল না?"

সদানন্দের মাথাটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। সত্যই তো! প্রায় একমাস পূর্ব্বে বঙ্কু মিত্র একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন এ কথাটা তো মিথ্যা নয়! হাইকোর্টে না-কি একটা মোশন করাইবার ছিল, এ জন্যই তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলে। এই দারুণ শীতেও সদানন্দের কপালে ঘাম দেখ্ বলিলেন, "আর এক ছিলিম সাজো বাবাজী যেন ঘুরছে।"

পঞ্চানন বলিল, "ঘুরবেই তো। ঘোরবা। কথা, খুড়ো! টাকার শোক কি সোজা শোক? দাঁড়াও, আরও একটা প্রমাণ তোমাকে দেখাচ্ছি বলিয়া পঞ্চানন তাহার দৈনিক হিসাবের খাতাখানি বাহির করিয়া মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহের হিসাবের একটা পাতা খুলিয়া, কিছুক্ষণ তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই দেখ খুড়ো, এবার একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ!"

হুঁকাটি রাখিয়া সদানন্দ ঝুঁকিয়া পঞ্চাননের খাতাখানি দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চানন বলিল, "এই দেখ, বিতারিখ ৫ই মাঘ, সোমবার, নগদ বিক্রয় খাতে শ্রীবঙ্কুবিহারী মিত্র, ধুতি ১ জোড়া, শাড়ী ২ জোড়া, গামছা ১ খানা, একুনে ১১৸০ এগার টাকা বার আনা। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই এই যে মোটা দমকা খরচ, এ টাকা—বুঝলে খুড়ো. আমার তো নিশ্চয় মনে নিচ্ছে 'তোমারই মাথায় হাত বুলানো টাকা।"

সদানন্দের শরীরে যেন তড়িৎস্রোত বহিয়া গেল। তাঁহার নিজের পরণের কাপড়খানিতে ছুই তিন জায়গায় তালি দিতে হইয়াছে, স্ত্রীর পরিধানে একখানি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, আর তাঁহারই টাকা কি-না প্রতারণা করিয়া লইয়া বন্ধু মিত্র বার টাকার কাপড় কিনিল, আর তাহার উপর আজ তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কহিল না। এর প্রতিবিধান করিতেই হইবে।"

সদানন্দ বলিলেন, "তা হ'লে এখন কি করা যায় বল দিকি নি পাঁচু?"

পঞ্চানন বলিল, "আমার বুদ্ধি যদি নেও সদাই খুড়ো, তাহ'লে তুমি চলে যাও কলকাতায়। তোমার কাছে টিকিট দুখানা আছে তো? তাইতে তাদের ঠিকানাও আছে নিশ্চয়। সেই ঠিকানায় গিয়ে একেবারে পাকা খবর নিয়ে তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

সদানন্দ বলিলেন, "ত, তো বটে, বাবাজী। কিন্তু আমার অবস্থাটা জান তো? কলকাতা যাওয়া তো আমাদের মত লোকের মুখে ব'লেই অমনি হয় না। যাওয়া, আসার ট্রেণভাড়া, খোরাকী, এসব খরচ তো নিতান্ত সামান্য নয়। আমার তো ঘরে পাঁচ সিকেরও সংস্থান নেই।"

বৃষ্টিটা এই সময়ে বন্ধ হইয়া গিয়া ছিন্ন মেঘের অন্তরাল দিয়ে একটু একটু রৌদ্রের আভাস দেখা দিতেছিল। সে সময়ে পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আসিয়া বলিল, "হ্যা বাবা, বৃষ্টি তো ধরেছে। যাবে না?"

পঞ্চানন একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, যাবো বই কি। এই উঠি এইবার।"

সদানন্দ বলিলেন, "কোথায় যেতে হবে পাঁচু?"

পঞ্চানন বলিল, "একবার ভৈরবীতলার দিকে।"

গ্রামের এক প্রান্তে একটি ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে কোন্ প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত এক ভৈরবী-মূর্ত্তি গ্রাম্যদেবীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। গ্রামের সে অঞ্চলে কোনো লোকের বসতি নাই, কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সেদিকে কেহ যায় না। সদানন্দ একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভৈরবীতলায়? এই বৃষ্টিমাথায়? কেন হে?"

পঞ্চানন বলিল, "সে কি, শোনোনি কি, খুড়ো?"

"না। কি শুনব?"

একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া পঞ্চানন বলিল, "এ গাঁয়ের কোনো খোঁজই রাখ না। ওখানে মস্ত বড় এক সাধু এসেছেন যে কামিখ্যে থেকে। রাত দিন ধুনী জ্বলছে। মস্ত বড় মহাপুরুষ। আমার ছোটছেলেটা তো আজ আড়াই মাস ধরে রক্ত-আমাশায় ভুগ্‌ছিল। পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখে পেটেণ্ট ওষুধ তো আর বাকী রাখি নি। তার ওপর কোথায় কুর্চির ছাল, ঈশগুল, তাও খাইয়ে খাইয়ে তো নাড়ী ধুইয়ে দিয়েছিলাম একেবারে, শেষে বাবার কাছে গিয়ে যেমন বলা, একটু মুচ্‌কে হেসে ধুনো থেকে একটু ভস্ম তুলে বল্লেন, 'যা, জলের সঙ্গে গুলে খাওয়াগে যা।' বললে বিশ্বাস করবে না সদাই খুড়ো, ছেলেটা যেন মন্তরে ভাল হয়ে গেল।"

সদানন্দ অবাক হইয়া এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, স্বামিজী হাতটাত দেখ্‌তে জানেন?"

"জানেন না আবার?—ডুগ্‌ডুগিপুরের বিশ্বেসদের তিন পুরুষ ধরে কি রকম মামলা চল্‌ছিল জান তো—শেষে সেজকর্ত্তা এসে বাবার পা জড়িয়ে পড়লো। বাবা একখানি কবচ ক'রে দিলেন, ব্যস, অত দিনের মোকর্দ্দমাটা এক কথায় মিটে গেল।"

সদানন্দ গ্রামে বাস করিয়াও এতবড় ব্যাপারটা শোনেন নাই, ইহাতে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি যাচ্ছ তাঁর কাছে, তোমার কি কোনো—"

পঞ্চানন বলিল, "না খুড়ো, তবে আমার মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছি কি না। দুই এক জায়গা থেকে কথাও এসেছে, কিন্তু তারা মেয়ের ঠিকুজী চায়। তাই একখানা ঠিকুজী তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেব ব'লে এসেছিলাম।"

সদানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা পাঁচু, চল না কেন আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমি যদি হাতখানা একবার দেখাই, তাহ'লে কি কিছু নেবেন টেবেন না-কি?

রামচন্দ্র! এক পয়সাও নয়। সে রকম সাধু তিনি নন। তবে হাঁ, আলাদা হোমট্রোম করতে হ'লে আলাদা খরচ আছে তো।

"নিশ্চয়ই, তা আর নেই? তবে চল পাঁচু, একবার দেখিয়ে আসি হাতখানা। ভাগ্যিস আজ সকালবেলা তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

২

সদানন্দের কররেখা দেখিয়া সাধু জানাইলেন, "বড়ই মানসিক কষ্ট যাইতেছে। অর্থস্থানে শনিপ্রবল, এই বেলা একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং একটা শনি কবচ ধারণ করিলে গ্রহশান্তি হইতে পারে, নচেৎ কষ্ট শনির দ্বারা না হইতে পারে এমন অনিষ্ট নাই।"

সাধু আরও বলিলেন যে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন যদি করাইতেই হয় তাহা হইলে আর দেরি করিয়া লাভ নাই।

আগামী সপ্তাহে আর একজনের জন্ম একটা পূর্ণাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, সুতরাং গাঙ্গুলী মহাশয় যদি ঐ দিনেই তাঁহার কার্য্য করান তাহা হইলে ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া দশ টাকার মধ্যেই কার্য্য হইয়া যাইতে পারে। নতুবা পঁচিশ টাকার কমে শনিদেবতাকে প্রসন্ন করিবার কোনো উপায় নাই। আর কবচ যদি তামার মাদুলীতে ভরানো হয়, তাহা হইলে কবচের মূল্য এবং শোধন করিবার ব্যয় বাবদ পাঁচ টাকা দিলেই চলিবে।

সদানন্দ গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "গুপ্তশত্রু হইতে খুব সাবধান।"

পথে আসিতে আসিতে সদানন্দ বলিলেন, "কি করি বল তো পাঁচু। বড় যে ধোঁকায় পড়া গেল। অথচ সাধু যা বলেন তা তো একটাও মিথ্যে কথা নয়। আসবার সময় গুপ্তশত্রুর কথাটা শুনলে তো?"

পঞ্চানন বলিল, "শুনিনি আবার? শুনেই তো আমার গা'টা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।"

সদানন্দ বলিলেন, "এখন উপায় কি?"

পঞ্চানন বলিল, "বাবার কথায় যা বোধ হ'ল একটা শনি-কবচ আর ভাল একটা স্বস্ত্যয়ন করাতে পারলে ও লটারির টাকা তো তোমার সিন্দুকেই তোলা রয়েছে। আমি বলি, এক কাজ কর গে। কলকাতায় গিয়ে সন্ধান নিয়ে যদি দেখ যে সত্যি সত্যিই বন্ধু মিত্তির কিছু কারসাজি খেলেছে, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একেবারে ওর নামে এক নম্বর রুজু ক'রে দিয়ে এস। আর এদিকে এঁকে দিয়ে দৈব কার্য্যটাও এর মধ্যে সেরে ফেলানো যাক্।"

সদানন্দ বলিলেন, "আহা তা তো হ'ল, কিন্তু এ সবই তো পয়সার খেলা, পাঁচু। আমার অবস্থাটা—"

পঞ্চানন বলিল, "সেই কথাই তো বল্‌ছি। হাজার দু-হাজারের ব্যাপার যখন, তখন সামান্যতে এত পিছপাও হ'লে চল্‌বে কেন? মোটের উপর এই ধর গিয়ে কলকাতায় যাওয়া-আসার রাহাখরচ এ সব মোটের উপর দশ টাকা। কবচ আর শান্তি-স্বস্ত্যেনের খরচ সেও গোটা-পনের টাকা। এই হ'ল পঁচিশ টাকা, আর ঈশ্বর না করুন যদি একটা মামলাই বাধিয়ে দিতে হয়, তাহ'লে সেও ধর প্রায় গোটা-পঞ্চাশেক টাকা তো প্রথমেই লাগ্‌বে। সবসুদ্ধ প্রায় পঁচাত্তর টাকা। এই টাকাটা বরং ধার ক'রে ফেল। আর ধারই যদি করলে তখন আমার দোকানের আর সামান্য দশ-পনেরো টাকা বাকী রেখেও তো কোনো লাভ নেই। মোটের উপর ধরে নাও প্রায় শতাবধি টাকা। শুধু-হাতে অবশ্য কেউই ধার দেবে না, তা এক কাজ করলেই হয়, তোমার কুমীরখালীর জমি ক'বিঘে বরং একটা দলিল করে দিয়ে—"

সদানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। কুমীরখালীর পাঁচ বিঘা জমিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। সংসারের সারা বৎসরের খোরাকীর ধান উহা হইতেই উৎপন্ন হয়। ঘর-মেরামতের এবং বাড়ির গাভীটির আহারীয় বিচালীও ঐ ক্ষেত্র হইতেই আসে। কাজেই বলিলেন, "সে কি হয় পাঁচু, ঐটুকু জমিই যে আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

পঞ্চানন বাধা দিয়া বলিল, "আহা, ঐ পাঁচ বিঘে দিয়ে তুমি যে এক মাস পরে দশ হাজার টাকার মালিক হচ্ছ, সদাই খুড়ো। আমাদের এই খোস্তাগাড়ী গাঁখানাই যে তখন হবে তোমার জমীদারী।"

কথাটা শুনিতে অবশ্য বেশ ভাল লাগিল। কিন্তু মনের খটকা গেল না। বলিলেন, "কিন্তু পাঁচু, যদি কিছুই না পাই? লটারি বই তো নয়!"

পাঁচু বিজ্ঞের ন্যায় শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা কি হয়, সদাই খুড়ো? টাকা তোমাকে পেতেই হবে। তা নইলে যে শাস্তর মিথ্যে। বাবাঠাকুর কি আর মিথ্যে বলেন? এ কথা শুনলে তোমাকে হয়ত লোকে ভ্যাংচি দেবে, কিন্তু সাধুবাবা উঠে আসবার সময় কি বল্‌লেন তা মনে আছে তো?—'গুপ্তশত্রু সাবধান।' তুমি টাকা পাবে, বড়মানুষ হবে, এ কি আর গাঁয়ের লোক দেখে সহ্য করতে পারবে? হিংসেয় ফেটে মরবে যে! তা যাই হোক খুড়ো, আমার কিন্তু একশো টাকা দর রইল, ওর বেশী যে আর কেউ দেবে তা মনেও ক'রো না। আমি কেবল তোমার টানাটানির জন্যেই বল্‌ছি, তা নইলে বাড়ি থেকে অত দূরে জমী কিনে চাষ করানোর মত ঝকমারি কি আর আছে?"

৩

বাড়ি আসিয়া সদানন্দ ব্যাপারটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, লটারির একটি-না-একটি প্রাইজ নিশ্চয়ই তাঁহার নামে উঠিয়াছে। সেই টাকাটি যে বন্ধু মিত্র তাঁহার অজ্ঞাতে কোনো প্রকার ফন্দীবাজী করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। লটারি—ভাগ্যের খেলা—কিছু না পাইবার সম্ভাবনাই হয়ত বেশী—কিন্তু মনের মধ্যে সে কথাটা যতই তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে করা গেল না। বিশেষতঃ বন্ধু মিত্রের ব্যবহারটা যেন বড়ই সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অবশেষে সদানন্দ স্থির করিলেন, পঞ্চাননের কথাই ঠিক; ঐ বিষয়ে একটু ভাল করিয়া অনুসন্ধান করাই যাক্। কুমীরখাগীর জমি?—ভাগ্যে যদি থাকে—কিছু যদি সত্য সত্যই পাওয়া যায়—তখন অমন কত জমি হইবে। পাঁচু বলিতেছিল, খোস্তাগাড়ীর জমীদারী! হা হা—আশ্চর্য্যই বা কি?

কিন্তু যদি কিছু না-ই পাওয়া যায়?—না, না! সাধুবাবা যদি শনির কবজ দেন, তবে আর কি? পাওয়া নিশ্চয়ই যাইবে।

কিন্তু জমির দরটা যে পঞ্চানন নেহাৎ অল্প বলিতেছে। একশো টাকায় পাঁচ বিঘা জমি, তাও অমন ভাল জমি! আর একজনকে বলিয়া দেখা যাক্!

পাশের জমীটা ছিল এক মুসলমানের। পরদিন সদানন্দ জমি-বিক্রয়ের কথাটা তাহার কাছে পাড়িল। একটু দরদস্তুর করিবার পর সে ব্যক্তি দেড়শত টাকায় রাজি হইল। সাধুবাবাকে কবচ এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য দিবার পনেরো টাকা সেইদিনই সে ব্যক্তি জমির মূল্যের বায়না সদানন্দকে দিল। কথাটা অবশ্য পঞ্চানন টের পাইল না।

দুই দিন পরেই তাহাকে লইয়া সদানন্দ মহকুমায় যাইয়া দলিল লেখাপড়া করিয়া রেজেষ্ট্রি করিয়া দিলেন এবং টাকা লইয়া সেইদিনই সেখান হইতেই কলিকাতা রওনা হইলেন।

সে ব্যক্তি পরদিন আসিয়া মহাসমারোহে ঢোল বাজাইয়া জমির দখল লইল।

কথাটা তখন প্রকাশ হইল। পঞ্চানন তো এই ব্যাপার শুনিয়া রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। সদানন্দকে সম্মুখে পাইলে হয়ত কতকগুলি কটুকথা বলিত, কিন্তু তাহা না পারিয়া কি উপায়ে সদানন্দকে বেশ শিক্ষা দিতে পারা যায় তাহারই চিন্তায় তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তিটা মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল।

এমন সময়ে বঙ্কু মিত্র পঞ্চাননকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সদানন্দের জমি-বিক্রয়-ঘটিত ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

পঞ্চানন হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, "আরে মিত্তির মশাই, সদাই গাঙ্গুলীকে তো আমরা সবাই নিরীহ ভালমানুষ বলেই জান্‌তাম। কিন্তু ওর পেটে পেটে যে এত শয়তানী মতলব তা আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক কি করে জান্‌ব বলুন। আমার সঙ্গে সেদিন কি তর্কটাই না করলে। আমি বললাম, 'সদাই খুড়ো, মিত্তির মশাই এমন শিবতুল্য ব্যক্তি, তা হ'লে উনি তো তখনই বাড়ি বয়ে সেই খবর দিয়ে যেতেন, আর বল্‌তেন যে গাঙ্গুলী মশাই, সন্দেশ খাওয়াও।" তা মশাই কে-বা কার কথা শোনে? অবশেষে আমার হাত ধরে ব্রাহ্মণ মানুষ বল্‌লেন, পাঁচু, আমার কুমীরখাগীর জমিটে নিয়ে তুমি আমাকে একশো টাকা দাও। বক্কো মিত্তির যে কেমন ক'রে গাঁয়ে বাস ক'রে আমি একবার দেখে নেব। তাকে জেল খাটাব। আমি বল্‌লাম, "কেন, মিত্তির-মশাই কি দোষটা করলেন? চুরিও করেন নি, ডাকাতিও করেন নি যে তাকে জেল খাটাবে। ছিঃ ছিঃ, ও কথা ব'লো না সদাই খুড়ো, মিত্তির-মশাইয়ের মত দেবতুল্য লোকের সম্বন্ধে ও-কথা উচ্চারণ করলেও পাপ হয়। সদাই খুড়ো তখন চীৎকার ক'রে বল্‌লে, 'রেখে দাও ওসব কথা, পাঁচু। আলবৎ জেল খাটাব—' "

আর শুনিবার ধৈর্য্য বঙ্কু মিত্রের রহিল না। বলিলেন, "বটে, এতবড় হারামজাদা ওই সদা গাঙ্গুলী। দাঁড়াও, জেল খাটাচ্ছি আমি।" বলিয়া তাঁহার গোমস্তাকে বলিলেন, 'দেখ তো হে, সদা গাঙ্গুলীর ভিটের খাজনা কত দিনের বাকী?"

কড়চা হিসাবের পাতা উল্টাইয়া সে জানাইল যে, চৈত্র মাস গত হইলেই তিন বৎসর পূর্ণ হবে।

পঞ্চানন বলিল, "ও আর চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফেলে রেখে কাজ নেই, মিত্তির—মশাই। আপনি জুড়ে দিন এক নম্বর।"

বঙ্কু মিত্র বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেব। আজকের ডাকেই আমি আর্জ্জি সহ করে উকীলের কাছে পাঠাচ্ছি। নচ্ছার বামুন—খেতে পেতো না, আমি লটারীর টিকিট কিনিয়ে দিলাম, ভাবলাম যদি দু-দশ টাকা কপালে থাকে তো পাবে, তা নয়, বেটা কি না আমাকে জেলে দেবে? —জেলে? রোসো—জেল দেওয়াচ্ছি আমি! একটা ফৌজদারী দায়ের ক'রে দিতে পারলে তবে গায়ের জ্বালা যেত।"

পঞ্চাননেরও মাথার আগুনটা এইবার যেন একটু ঠাণ্ডা হইল। বাড়ি ফিরিবার পথে আপন মনে সে বলিতে লাগিল, "আমি দিলাম মতলব, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলাম সাধুবাবার কাছে, আর ঐ জমিটার উপর কতদিন থেকে আমার লোভ! বেটা বামুন কি-না আমাকেই দিলে ফাঁকি! রোসো, এর শোধ হাড়ে হাড়ে তুলব না?"

কলিকাতায় সদানন্দের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়

মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেয়ালদহে নামিয়া হঠাৎ মনে হইল যে, লটারির ব্যাপারে যদি টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলিকাতাবাসী আত্মীয়ের নিকট বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, অথবা যদি ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চান তাহা হইলেও ব্যাপারটা লইয়া একটা মস্ত আন্দোলন হইবে। সুতরাং অন্যত্র যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিছুদূর আসিতেই সম্মুখে দেখা গেল একখানি সাইবোর্ডে লেখা—

"পবিত্র হোটেল
হিন্দু ভদ্রলোকের আহার ও বাসস্থান।"

সদানন্দ সেইখানেই উঠিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

মনের একটা উত্তেজনার জন্যই হোক, অথবা মশা ও ছারপোকার দৌরাত্ম্যেই হউক, সদানন্দ সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সকালে উঠিয়াই ক্যাম্বিসের ব্যাগের ভিতর হইতে একখণ্ড রঙীন ছেঁড়া কাপড়ের টুকরায় বাঁধা লটারির টিকিটখানি খুলিলেন। ইংরেজী বেশী না জানিলেও মোটামুটি পড়িবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। টিকিটখানি অনেক ওলট্‌পালট্ করিয়াও যখন ঠিকানার সন্ধান মিলিল না, তখন হোটেলের এক বাবুকে দেখাইতে হইল।

লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন ঠিক কোন্ জায়গায় শয়ন করিয়া লোকে সচরাচর দেখিয়া থাকে তাহারই একটু ইঙ্গিত করিয়া বাবুটি জানাইলেন যে, টিকিটের পশ্চাতে যে বক্স নম্বর লেখা রহিয়াছে উহাই ঠিকানা।

ব্যাপারটা সদানন্দ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কোন্ রাস্তায়?"

লোকটি একটু হাসিয়া বলিল, "কোনো রাস্তায় নয়, মশাই। যারা নিজেদের ঠিকানা দিতে চায় না তারাই ঐ সব বক্স নম্বরের ঠিকানায় চিঠি আনায়। জেনারেল পোষ্ট আপিসে যান, সেখানে গেলেই জানতে পারবেন।"

সদানন্দের বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। স্নান ও আহার কোনোমতে শেষ করিয়া গেলেন জেনারেল পোষ্ট আপিসে। বৃহৎ বাড়িটির উপরে নীচে অনেকবার ঘুরিয়া অবশেষে ঠিক জায়গায় আসিয়া একজন বাবুকে টিকিটে উল্লিখিত নম্বরের বাক্সধারীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পোষ্ট আপিসের বাবুটি একখানি বৃহৎ খাতায় কি লিখিতেছিলেন, যথেষ্ট উচ্চৈঃস্বরে বলা সত্ত্বেও সদানন্দের স্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিনবার বলিবার পর বাবুটি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত গর্বিতভাবে জানাইলেন যে, ঠিকানা প্রকাশ করা আইনবিরুদ্ধ। কিছু বক্তব্য থাকিলে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই যথাস্থানে যাইয়া পৌঁছিবে এবং উত্তর দিবার হইলে যথাসময়ে উত্তর পাওয়াও অসম্ভব নয়।

সদানন্দের সর্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তবে কি ব্যাপারটা আগাগোড়াই মিথ্যা! বাবুটিকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মশাই, এ নম্বরের বাক্স সত্যি সত্যিই আছে তো?"

"আছে বই কি, নিশ্চয় আছে!"

"দয়া করে তাঁদের ঠিকানাটা—যদি একবার—আমি বড় বিপদে-"

"রুল নেই।"—বাবুটি বৃহৎ খিলানের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

সদানন্দ রাস্তায় আসিলেন। পৃথিবী ঘোরে?—হাঁ, ঘোরে বইকি! মিথ্যা কথা তো নয়?—এই যে ঘুরিতেছে! সরিষার ফুল?—হ্যাঁ, ঐ যে মনে হইতেছে, যেন সারা লালদীঘিটাই একটা মস্ত সর্ষপক্ষেত্র। জল-তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল লালদীঘির কালো জল অঞ্জলি পূরিয়া পান করেন। কিন্তু যদি পুলিসে ধরে?—না কাজ নাই।

এখন কোথায় যাওয়া যায়? পাঁচু বৈরাগীর কথাটা মনে হইল। একটা উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিলে হয় না? কিন্তু অচেনা জায়গায় আবার কোন্ জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িবেন? অবশেষে স্থির করিলেন সেই আত্মীয়ের বাড়িতেই যাওয়া যাক্। তাহার কাছে পরামর্শ লইয়া তার পর যাহা হয় করিলেই হইবে। আহা, প্রথমে সেইখানে গেলে বোধ হয় ভাল হইত। দুর্বুদ্ধি আর কি!

ঢং ঢং করিয়া ট্রাম ও হর্নের শব্দ করিয়া বাস চলিতেছে! পা দুইটা যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তা হউক, আর পয়সা নষ্ট করিয়া কাজ নাই, হাঁটিয়াই যাওয়া যাক্। দর্জিপাড়া—কতবার তো সেখানে গিয়াছেন। কত দূরই বা?—মাইল-দুয়েক?—এক ক্রোশ? সে তো কিছুই নয়!—বাড়ি হইতে কুমীরখাগীর মাঠই তো প্রায় দেড় ক্রোশ।

কুমীরখাগীর কথা মনে হইতেই বুকের ভিতর হইতে যেন একটা কান্নার বেগ উথলিয়া উঠিল। নিজের হাতে একি সর্বনাশ করিলাম? লটারীর টাকা?—সে তো জলের মাছ! যদি না পাই? বিশেষতঃ ব্যাপার যেরূপ দেখা যাইতেছে! তবে?—একি করিলাম? চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সদানন্দ চলিলেন।

চীৎপুর রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়টায় কিসের একটা ভিড় হইয়াছে। সদানন্দ ভিড়ের ভিতর উঁকি

মারিয়া দেখিলেন। একজন বাজীওয়ালা বাজী দেখাইতেছে। একটা টাকা মুঠার ভিতর লইয়া মুষ্টিটা বন্ধ করিয়া তাহাতে একটা কিসের হাড় ঠেকাইল, সঙ্গে সঙ্গেই হাতের মুঠাটা খুলিল। দেখা গেল, একটি টাকার বদলে চার টাকা হইয়াছে। সদানন্দ ভাবিলেন, 'আচ্ছা, ও লোকটা তো লটারিওয়ালার চেয়ে ভাল। ঐ হাড় একখানা পাওয়া যায় না?'

আরও অনেক বাজী হইল। একটা আস্ত ছোরা লোকটা নিজের মুখে পুরিয়া প্রায় সবখানিই গিলিয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য্য! গলাটা যদি কাটিয়া যাইত?

ভিড় ক্রমে পাতলা হইল। সদানন্দও ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইলেন। মনে তখনও জাগিতেছে যে, ঐ হাড় যদি একখানা পাওয়া যাইত! এক টাকাকে হাড় ঠেকাইয়া চার টাকা করা যাইত। কুমীরখাগীর জমী বিক্রয়ের দেড়-শ টাকার মধ্যে, রেজেষ্ট্রি খরচ, যে লোকটি কিনিয়াছে তাহার যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ সে তো তখনই দশ টাকা কাটিয়া লইয়াছে, সাধুকে স্বস্ত্যয়ন কবচের জন্ম সেদিন পনেরো টাকা জমির মূল্যের অগ্রিম বলিয়া দিয়াছিল, তাহাও রেজেষ্ট্রি আপিসে টাকা দিবার সময় কাটিয়া লইয়াছে। বাকী ছিল একশ' পঁচিশ টাকা। কলিকাতায় আসিবার খরচের জন্ম পাঁচটি টাকা বাহিরে রাখিয়া বাকী একশ' কুড়ি টাকার নোট একটি কোমরপেটিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। উঃ, ঐ একশ' কুড়ি টাকায় যদি হাড়খানা স্পর্শ করান যাইত তাহা হইলে চার এক শো কুড়িং কত হয়?—চারশ' আশী টাকা? হায় ভগবান!

অভ্যাসমত কোমরপেটিতে একবার হাত দিলেন। কিন্তু এ কি? কোমরটা যেন খালি খালি বোধ হইতেছে। এই তো একটু আগেই কোমরেই ছিল! লালদীঘিতেও একবার দেখিয়াছেন, তার পরে পথের মধ্যে আরও চার-পাঁচবার দেখিয়াছেন। তবে? ঐ বাজীওয়ালার হাড়ের কোন কারসাজি নয় তো? কিংবা কলিকাতার গাঁটকাটা?—কিন্তু তাহা হইলে একবার কি টেরও পাওয়া যাইত না?

সদানন্দ পাগলের মত আবার সেই মোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। সে বাজীওয়ালা চলিয়া গিয়াছে, ভিড়ও অন্তর্হিত হইয়াছে। সামনের রোয়াকে একটা লোক দেশ-নেতাদের ছবি বিক্রয় করিতেছে।

রাস্তার চারি পাশ খুঁজিয়া দেখা হইল। কিন্তু বৃথা—বৃথা! সদানন্দের চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। লটারির টাকা—বন্ধু মিত্র, পঞ্চানন, সংসারের একমাত্র অবলম্বন কুমীরখাগীর সেই ভূমিখণ্ড - খোস্তাগাড়ী গ্রামের জমীদারী লইবার কল্পনা, আর বাড়িতে ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিতা চিরদুঃখিনী স্ত্রী ও অপোগণ্ড দুইটি সন্তান!

থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এক জুতাওয়ালার দোকানের রোয়াকে সদানন্দ বসিয়া পড়িলেন। তার পরে সবই যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

৫

পাঁচ দিন পরে সদানন্দ বাড়ি ফিরিলেন। তখনও তাঁহার প্রবল জ্বর। এই কয়টা দিনেই তাঁহার বয়স যেন বিশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়াই আবার জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এমন-সব প্রলাপ বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল, যাহার কোন অর্থই তাঁহার স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন না।

গ্রামে একজন ধন্বন্তরি ডাক্তার ছিলেন, ছেলেটিকে তাঁহার কাছে পাঠানো হইল। তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন পয়সা আনিয়াছে কি-না। যখন শুনিলেন আনে নাই তখন বলিলেন, "বিনি পয়সায় ওষুধ হয় না। তোর মাকে বল্‌গে যা ধ'নে আর পলতার শাক সেদ্ধ করে খাইয়ে দিক্ জ্বর সেরে যাবে'খন।"

সকালবেলাটা একটু জ্বর কমিল। ঠিক সেই সময়েই বাকী খাজনার মোকর্দ্দমার সমন লইয়া আদালতের পেয়াদা আসিল। সমন জারি করিয়া, মুখে একবার সদানন্দকে জানাইয়া গেল যে, মোকর্দ্দমার দিন আগামী পরশু তারিখে।

অসুখের অজুহাতে সময় লইয়া মোকর্দ্দমার দিন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করার মূলে কতকগুলি টাকা খরচ; সুতরাং সে-কথা এখন কল্পনা করাও যায় না। সমন লইয়া মোকর্দ্দমায় হাজির না হওয়ার ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল। বন্ধু মিত্র জয়ী হইলেন।

আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু মিত্র পঞ্চাননকে ডাকাইয়া বলিলেন, "চলো দিকিনি পাচু, একবার সদার কাছে। একবার তাকে শুনিয়ে আসি যে, সাতদিনের মধ্যে ডিক্রীজারি করে তোমাকে ভিটেছাড়া না করি তো আমি কায়েৎবাচ্চাই নই।"

পঞ্চানন বলিল, "নিশ্চয়ই, চলুন, চলুন।"

কিন্তু কথাটা বলিবার সুযোগ হইল না। উভয়েই আসিয়া সদানন্দের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে আর আশা নাই। মাঝে মাঝে দুই-একটা অর্থহীন প্রলাপ তখনও শোনা যাইতেছে। পঞ্চানন নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, একটা কথা সে স্পষ্টই শুনিতে পাইল, "গুরুদেব সাবধান!"

কলিকাতার সত্যাগ্রহী মহিলাবৃন্দ

শ্রীমতী লীলাবতী কাপুর

কুমারী পুষ্পবতী

শ্রীমতী উজ্জাম বেন

শ্রীমতী চামেলী দেবী

শ্রীমতা মিথু বেন

শ্রীমতা বাচু বেন

কুমারী শ্রীমতী দেবী

কুমারী সরস্বতী দেবী

শ্রীমতী অমৃৎ বেন

শ্রীমতী যশোদা দেবী

শ্রীমতী মংলা বেন

অহিংস সংগ্রাম হইতে বিরতি

মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাট লর্ড আরুইনের যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার ফল জানা গিয়াছে। কতকগুলি সর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা থামাইয়া দিতে রাজী হইয়াছেন এবং বড়লাটও প্রায় সব অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করিতে এবং অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদিগকে খালাস দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উভয় পক্ষের সমুদয় সর্ত্ত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এইজন্য সবগুলির উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

উভয় পক্ষের সব সর্ত্তগুলি দেশের লোকদের সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, মনে হয় না। যতগুলি সর্ত্ত হইয়াছে, তাহাও যথেষ্ট মনে হইবে, বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করিবেন, মহাত্মাজীর আরও কিছু দাবি করা উচিত ছিল এবং তদনুসারে গবর্মেণ্টেরও আরও কিছু করিবার অঙ্গীকার করা উচিত ছিল।

আমরা গত এক বৎসরে সত্যাগ্রহ করিয়া বা না করিয়া অন্য অনেকের মত দুঃখ সহ্য করি নাই, স্বার্থত্যাগ করি নাই, ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হই নাই। সুতরাং যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিয়া দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, এইরূপ নেতৃবর্গ আপনাদের ও অন্য নির্যাতিত সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে যাহা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ থাকিতে পারে না। কিন্তু পত্রিকাসম্পাদকদিগকে সব বিষয় সম্বন্ধেই আবশ্যকমত মত প্রকাশ করিতে হয়। সেইজন্য আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা রফার কোন সর্ত্তের বিরুদ্ধে আন্তরিক বা বাহ্য বিদ্রোহ করিব না, অন্য কেহ করে, তাহাও ইচ্ছা করি না।

মোটের উপর যে-রকম রফা হইয়াছে, তাহা আমাদের ভাল লাগে নাই। কিন্তু আমাদের যে তাহা ভাল লাগে নাই, তাহা রফার দোষে না হইতে পারে; ভাল না-লাগাটা হয়ত আমাদেরই দোষ। সুতরাং ভাল লাগা না-লাগার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে কিছু বলিব। রাজনৈতিক চা'ল হিসাবে লর্ড আরুইনেরই জিত হইয়াছে মনে করি। তাহার কিছু কিছু কারণ পরে বুঝা যাইবে।

—

ফেডারেশ্যন ইত্যাদি

বড়লাটের বর্ণনাপত্রে বলা হইয়াছে, যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি সম্বন্ধে যতটুকু স্থির হইয়াছে, তাহার বিষয়ে আরও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করা হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত নক্সাটির সার অংশের কোন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিতে বা সাধন করিতে অধিকারী হইবেন কি? এই প্রশ্ন করিতেছি এইজন্য, যে, যাহা স্থির হইয়াছে, বড়লাটের মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার এসেন্স্যাল অর্থাৎ অত্যাবশ্যক সার অংশ :—

Federation is an essential part; so also are Indian responsibility and reservations or safe-guards in the interests of India for such matters, as for instance, defence, external affairs, the position of minorities, the financial credit of India and the discharge of obligations.

এখানে আমরা জানিতে চাই এসেন্স্যাল্ কথাটির মানে কি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে এগুলি থাকা চাই-ই, ইহার অর্থ কি এই? দেশী রাজ্যের রাজারা যদি শেষ পর্য্যন্ত জিদ ধরিয়াই বসিয়া থাকেন, যে, ফেডারেটেড্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারাই দেশী রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন, প্রজাদিগকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দিবেন না,

এবং তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রজাদের কোন আইন-সম্মত অধিকার ঘোষণা না করেন ও না মানেন, তাহা হইলেও কি দেশী রাজ্যসমূহ ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে ফেডারেটেড্ হইতেই হইবে? এসেন্স্যালের মানে কি তাই? আমরা ত মনে করি যে, যদিও সমগ্র ভারতের ফেডারেশুন খুবই বাঞ্ছনীয়, তথাপি ঐরূপ স্বেচ্ছাকারী রাজাদের রাজ্যের সহিত ফেডারেশ্যনের ব্যবস্থা না-করিয়াও শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষেরই ডোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তি বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশুন হউক বা না-হউক আমরা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকেরা স্বরাজ চাই, যদিও গণতান্ত্রিক ভাবে শাসিত দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশ্যান নিশ্চয়ই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি।

আমরা "external affairs, the position of minorities, the financial credit of India and the discharge of obligations" বিষয়গুলি সম্বন্ধে "ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার বা মঙ্গলের জন্য" ("In the interests of India") "reservations or safe-guards" একদিনের নিমিত্তও আবশ্যক মনে করি না। এইরূপ রিজার্ভেশ্যান্স ও সেফ্‌গার্ডস্ ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক মনে করি। তথাপি এইগুলিকে কি "ভারতের স্বার্থের জন্য" এসেন্স্যাল মনে করিতে হইবে? অর্থাৎ এগুলি যদি আমরা বাদ দিয়া স্বরাজ চাই, তাহা হইলে স্বরাজ পাইব না? ...

ডিফেন্স অর্থাৎ দেশরক্ষাও বড়লাটের হাতে রাখা এসেন্স্যাল বলা হইয়াছে। আমরা তাহা মনে করি না। কিন্তু ভারতীয় লোকদিগকে যুদ্ধে নেতৃত্ব করিবার অনুপযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া যদি আপাততঃ এই বিষয়টি বড়লাটের হাতে রাখা অত্যাবশ্যক মনে হয়, তাহাও নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য রাখিতে হইবে, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নহে।

—

পিকেটিং

গবর্মেণ্ট কিরূপ পিকেটিঙে আপত্তি করিবেন না, তৎসম্বন্ধে বড়লাটের ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে,—

Such picketing shall be unaggressive and it shall not involve coercion, intimidation, restraint, hostile demonstration, obstruction to the public or any offence under the ordinary law. If and when any of these methods is employed in any place the practice of picketing in that place will be suspended.

নিখিলভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সেক্রেটারী ডাক্তার সৈয়দ মামুদও ঐরূপ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে বলিতেছেন,—

If these conditions are not satisfied in any area, picketing is to be suspended there.

এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, পিকেটিং যেরূপ হইলে গবর্মেণ্ট আপত্তি করিবেন না, সেইরূপ হইতেছে কি না, তাহার বিচার কে করিবে? কোন্ পক্ষের কথা অনুসারে পিকেটিং চালাইতে দেওয়া বা বন্ধ করা হইবে?

এরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ বলিতেছি। পিকেটিং অর্ডিন্যান্স যতদিন বলবৎ ছিল ততদিন পিকেটিং "শান্তিপূর্ণ" হউক বা না-হউক, ম্যাজিষ্ট্রেটরা সাধারণতঃ পিকেটারদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। যখন পিকেটিং অর্ডিন্যান্স উঠিয়া গেল এবং তাহা অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে, তখন হইতেও কিন্তু বিস্তর পিকেটারকে জেলে পাঠান হইয়াছে এই বলিয়া যে, তাহারা ভয় দেখায়, বলপ্রয়োগ করে, সর্ব্বসাধারণের চলাফিরায় ব্যাঘাত জন্মায়, ইত্যাদি। এরূপ স্থলে পুলিসের সাক্ষ্যের উপরই ম্যাজিষ্ট্রেটরা নির্ভর করিয়াছেন। দোকানদাররা যদি বলিয়া থাকেন (এবং অনেক দোকানদারই এরূপ কথা বলিয়াছেন), যে, তাঁহাদিগকে পিকেটাররা বিরক্ত করে নাই, বা তাঁহাদের কোন ক্ষতি করে নাই, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অনেক পিকেটার অভিযুক্ত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। যাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন ইত্যাদির অভিযোগ মিথ্যা বলিয়াছেন।

সেইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস স্থির করিবেন, পিকেটিং বৈধ প্রণালী অনুসারে হইতেছে বা হইতেছে না? এবিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই, যে, অনেক জায়গাতেই পুলিসের কথা অনুসারে গবর্মেণ্ট বলিবেন, পিকেটিঙের

বিনা তদন্তে সেই সব জায়গায় পিকেটিং বন্ধ করাইয়া দিবেন? তাহা হইলে কংগ্রেস জানিয়া রাখুন, সকল জায়গা হইতেই বৈধ পিকেটিংও অচিরে লুপ্ত হইবে, এবং মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য এবং বিদেশী কাপড় সর্ব্বত্র অবাধে বিক্রী হইতে থাকিবে। আমরা ভয়প্রদর্শনাদি দ্বারা পিকেটিঙের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু বৈধ পিকেটিঙের প্রয়োজন আছে। অথচ কংগ্রেস পক্ষ হইতে গৃহীত সর্ত্ত অনুসারে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

রফা হইবার এবং বড়লাটের বর্ণনা-পত্র বাহির হইবার পরেও গত ২২শে ফাল্গুন কলিকাতার বড়বাজারে দুজন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীর বলা উচিত ছিল, "কোন জায়গায় পিকেটিং অবৈধ ভাবে হইতেছে বলিয়া বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাইলে আমরা সেখানে পিকেটিং বন্ধ করিব।" গবর্মেণ্টকেও এই সর্ত্ত মানিয়া লইতে বলা উচিত ছিল। তাহা না করায় দুইটি কুফলের কোন একটি হইবে। হয়, গবর্মেণ্ট (অর্থাৎ পুলিস) কোথাও অবৈধ পিকেটিং হইতেছে বলিলেই কংগ্রেসকে তৎক্ষণাৎ সেখানে পিকেটিং বন্ধ করিতে হইবে; নতুবা, গবর্মেণ্টের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, যে, গবর্মেণ্টের কথা অযথার্থ, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, ইত্যাদি। তাহাতে অশান্তি হইবে না কি? পুলিসের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী যেসব অত্যাচারের অভিযোগ বড়লাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত করিতে বড়লাট এই কারণ দেখাইয়া অসম্মত হইয়াছেন, যে, তাহা করিলে সরকারী ও বেসরকারী লোকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রত্যভিযোগে শান্তি পুনঃস্থাপনে ব্যাঘাত জন্মিবে। পিকেটিং ব্যাপারেও তর্কাতর্কির দ্বারা বৈধতা ও অবৈধতা নির্ণয় করিতে গেলেও কি উভয় পক্ষকে এইরূপ অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ করিতে হইবে না? তাহাতে কি দেশে শান্ত ভাব স্থাপনে ব্যাঘাত জন্মিবে না?

আর একটি কথা। কিরূপ পিকেটিং সরকার বাহাদুর চালাইতে দিবেন, তাহা বলিবার অধিকার অবশ্য সরকার বাহাদুরের ছিল। কিন্তু কংগ্রেস যখন পিকেটিঙের সর্ত্তগুলি মানিয়া লইলেন, তখন কি কংগ্রেস-পক্ষের বলা উচিত ছিল না, যে, এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বা অধিকাংশ স্থলে পিকেটিং এইরূপ বৈধই হইয়া আসিয়াছে এবং হওয়া উচিত বলিয়া আমরা সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিতেছি? তাহা না বলা কি প্রকারান্তরে এরূপ সন্দেহের কারণ দেওয়া হইল না যে, সাধারণতঃ বা অনেক স্থলে অবৈধ রকমের পিকেটিং হইয়া আসিতেছে? সেরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে কংগ্রেস তাহা এতদিন আপনা হইতেই কেন বন্ধ করেন নাই?

এই যে উভয় পক্ষে আপোষে রফা হইয়াছে, তাহাতে এক পক্ষের কথা অপর পক্ষ মানিয়া লইতেছেন না, বলিতেছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। যথা, বড়লাট বলিয়াছেন,—

> Mr. Gandhi has represented to the Government that according to his information and belief some at least of these sales [of immovable property] have been unlawful and unjust. The Government, on the information before them, cannot accept the contention.

অতএব, কংগ্রেস-পক্ষ অন্ততঃ এই কথা কি বলিতে পারিতেন না এবং তাহা বলা কি তাঁহাদের উচিত ছিল না, যে, তাঁহারা পিকেটিং সম্বন্ধে যে সর্ত্ত গ্রহণ করিতেছেন তাহার দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না, যে, তাঁহারা মানিয়া লইতেছেন যে, এ যাবৎ অবৈধ রকমের পিকেটিংই সর্ব্বত্র, অধিকাংশ স্থলে বা অধিক স্থলে হইয়াছে?

পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বা ঠিক্ উপরেই যাহা বলিলাম, তদ্রূপ কিছু না-বলায় পিকেটারদের আচরণ সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

আপোষে কোন প্রকার রফা বা নিষ্পত্তি হইলে উভয় পক্ষকেই রফা অনুসারে কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে মোটের উপর পরস্পরের অকপটতা ও সদাশয়তার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু রফার সর্ত্তগুলিতে কোন অস্পষ্টতা রাখা উচিত নয়। তাহাতে কিছু উহ্য থাকিলে পরে ঝগড়ার কারণ থাকিয়া যায়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, রফার সর্ত্ত অনুসারে কাজ ব্যক্তিগতভাবে

মহাত্মা গান্ধী বা লর্ড আরুউইন করিবেন না, অন্তেরা করিবে। তাহাদের জন্ম সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ চাই।

—

পুলিসের অত্যাচারের অভিযোগ

মহাত্মা গান্ধী পুলিসের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বড়লাটের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তদ্বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্তের বাঞ্ছনীয়তা প্রদর্শন করেন। তদন্ত করিতে বড়লাট রাজী হন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার বর্ণনাপত্রে আছে,—

Mr. Gandhi has drawn the attention of the Government to specific allegations against the conduct of the police and represented the desirability of a public enquiry into them. In the present circumstances the Government see great difficulty in this course and feel that it must inevitably lead to charges and counter-charges and so militate against the re-establishment of peace. Having regard to these considerations, Mr. Gandhi has agreed not to press the matter.

প্রকাশ্য তদন্ত করা যে গবর্মেণ্টের পক্ষে সোজা নয়, তাহা ত বুঝিতেই পারি। কিন্তু স্থায়ের অনুরোধে কঠিন কাজ করাই ত শ্রেষ্ঠ মানুষের ও শ্রেষ্ঠ গবর্মেণ্টের লক্ষণ। গবর্মেণ্ট তাহা না করায় এবং মহাত্মা গান্ধী তাহাতে সায় দেওয়ায়, পুলিসের সরকারী নিছক মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই বজায় রহিল। কোন কোন্ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বেআইনী ও অন্যায় হইয়াছে মহাত্মাজীর এই অভিযোগের সত্যতা যেমন গবর্মেণ্ট প্রকাশ্য বর্ণনাপত্রে অস্বীকার করিয়াছেন (পূর্ব্বে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি), মহাত্মাজীরও তেমনই প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস পক্ষের বক্তব্যে জানান উচিত ছিল, যে, তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক বড়লাটের নিকটে উপস্থাপিত পুলিসের অত্যাচার কাহিনীগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। অবশ্য, মহাত্মাজী এই অত্যাচারগুলি নিজে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিন্তু বড়লাট ও মহাত্মাজীর উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিক্রয় সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দাবি করিতে পারেন না। তিনি যদি সরকারী অধস্তন কর্ম্মচারীদের কথার উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মাজীর মত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কথার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাত্মাজী নিজের সহকর্ম্মীদের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুলিসের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ যে সত্য, তাহা অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন।

পুলিসের অত্যাচারের প্রকাশ্য তদন্ত করিলে উভয় পক্ষের অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ দ্বারা শান্তি পুনঃস্থাপনের ব্যাঘাত হইবে, এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, পিকেটিঙের বৈধতা অবৈধতা লইয়াও ঠিক্ ঐরূপ অভিযোগ প্রত্যভিযোগ দ্বারা শান্তিস্থাপনে ব্যাঘাত হইবে, অথচ পিকেটিঙের বৈধতা অবৈধতা কাহার কথা অনুসারে নির্ণীত হইবে, তাহার কোন নির্দ্দেশই নাই।

তদ্ভিন্ন কিরূপ শান্তি উভয় পক্ষ চাহিতেছেন, তাহাও বিচার্য্য।

মহাত্মা গান্ধী বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, তিনি গবর্মেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের প্রমাণ চান। অর্থাৎ তিনি বাহির অপেক্ষা অন্তরের অবস্থাটাই ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে চান। শান্তিও সেইরূপ ভিতরের শান্তি হওয়া আবশ্যক। যাহারা পুলিসের নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ করিয়াছে, যাহাদের আত্মীয়স্বজন অন্যায়ভাবে নিহত হইবার অভিযোগ হইয়াছে, যাহাদের ঘরবাড়ি, ধানের গোলা, ধানের ক্ষেত বা অন্য সম্পত্তি লুণ্ঠিত নষ্ট বা ভস্মীভূত হইবার অভিযোগ হইয়াছে, যাহারা অন্যায়রূপে প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে, যে-সকল নারী অপমানিতা হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে, তাঁহারা ও তাঁহাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা এবং স্বদেশবাসীরা বড়লাটের বর্ণনাপত্রে লিখিত তদন্ত না-করার কারণটি অবগত হইয়া মনে শান্তি অনুভব করিবে, আমাদের অনুমান এরূপ নহে। ঘায়ের উপরটা ঢাকিয়া গেলেই ঘা সারিয়া যায় না।

একটা খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল, যে, বড়লাট প্রকাশ্য তদন্ত না করিয়া বিভাগীয় তদন্ত (ডিপার্টমেণ্ট্যাল ইন্‌কোয়েরী) করিতে রাজী হইয়াছেন। বর্ণনাপত্রে কিন্তু ইহার কোন উল্লেখ নাই।

গবর্মেণ্ট প্রকাশ্য তদন্ত করিতে নারাজ হওয়ায়

লোকে মনে করিবে, যে, তদন্ত করিলে অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হইত বলিয়াই তদন্ত হইল না।

—

অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার

সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে-সব অর্ডিন্যান্স গবর্মেণ্ট জারি করিয়াছিলেন, তাহার যেগুলি এখনও বলবৎ আছে, গবর্মেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিলেন। এই কাজটি ভাল হইয়াছে, এবং এই প্রত্যাহার দ্বারা অল্প একটু স্বাধীনতা কোন কোন শ্রেণীর লোককে পুনঃপ্রদত্ত হইল। কিন্তু যেমন পিকেটিং অর্ডিন্যান্স উঠিয়া যাওয়ার পরেও সাধারণ আইনের অপব্যবহার দ্বারা অনেক স্থলে পিকেটাররা দণ্ডিত হইয়া আসিতেছে, তেমনি অন্য অর্ডিন্যান্সগুলি উঠিয়া গেলেও গবর্মেণ্টের নিগ্রহ ক্ষমতা কমিবে না। কেবল দুটি কাজ গবর্মেণ্ট করিতে পারিবেন না; (১) কোন বহি বা খবরের কাগজ আদি ছাপার জন্য জামীনের টাকা চাওয়া, এবং (২) জামীনের টাকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত করা। কিন্তু সম্পাদক, মুদ্রাকর, লেখক, প্রেসের অধিকারী প্রভৃতিকে জব্দ করিবার অন্য উপায় যেমন প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি হইবার আগে হইতে ছিল, এখনও তেমনি গবর্মেণ্টের থাকিবে।

—

আন্তরিক শান্তির একটি ব্যাঘাত

১৯৩১ সালের ১নং অর্ডিন্যান্স টেরারিষ্ট মুভমেণ্ট বা ভয়োৎপাদন প্রচেষ্টা দমন করিবার উদ্দেশ্যে জারি করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়। সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই বলিয়া এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা প্রত্যাহৃত না হওয়ায় দেশের লোকদের (আমরা বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কথাই বলিতেছি) মনে শান্তভাব পুনঃস্থাপিত হইবে না।

সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টা ঠিক্ এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে যাঁহারা কাহাকেও আঘাত করা বা করিবার চেষ্টা অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য ছিল মনে করা যায় না। তাঁহারা অনেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। অথচ হয়ত এই কারণেই তাঁহাদের কেহ মুক্তি পাইবেন না!

তাহা হইলেও, যাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বল প্রয়োগের একটা অভিযোগ বা নাম মাত্র বিচার হইয়াছে, তাঁহাদের মুক্তি না-হওয়া না-হয় মানিয়া লইলাম কিন্তু যাঁহাদের নামে কোন প্রকাশ্য নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ হয় নাই, কোন তথাকথিত বিচারও হয় নাই, সেই সব বন্দীকৃত যুবকদের কথা দেশের লোক ভুলিতে পারিবে না।

ইহাঁদের কথা গান্ধীজীর মনে ছিল কিনা, তিনি ইহাঁদের কথা বড়লাটকে বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না। ইহাঁদিগকে গবর্মেণ্ট (অর্থাৎ পুলিস) কার্য্যত বা উদ্দেশ্যতঃ টেরারিষ্ট (ভয়োৎপাদক) বলিয়া বন্দী করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোন প্রমাণ নাই ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃত সত্যাগ্রহীও থাকিতে পারেন।

এই অর্ডিন্যান্স যত দিন বলবৎ আছে, তত দিন সত্যাগ্রহী বা অন্যবিধ স্বদেশপ্রেমিক কোন কর্ম্মী নিরাপদ নহেন। এই কারণে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তির সময়ে এইরূপ দাবি করিলে অসঙ্গত হইত না, যে, এই অর্ডিন্যান্সটিও প্রত্যাহার করা হউক, কিম্বা তদনুসারে বন্দীকৃত যুবকদের প্রকাশ্য বিচার হউক। সেরূপ দাবি করা হইয়াছিল কিনা, জানি না।

—

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

বাজেয়াপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বা, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকিলে তাহার মূল্য মালিককে প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বড়লাটের বর্ণনাপত্রে অনেক কথা আছে। এরূপ কোন সম্পত্তি নিলামে বিক্রী হইয়া থাকিলে, কাগজে পড়িয়াছি অনেক সময়ই তাহার খুব কম মূল্য পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই কম মূল্যও পূর্ব্ব মালিককে গবর্মেণ্ট কেন দিতে রাজী হইতেছেন না, জানি না। সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে নানা লোকের নানা আইন-বহির্ভূত বা আইনানুযায়ী দণ্ড হইয়াছে। যাহাদের প্রাণ গিয়াছে, তাহাদিগকে বাঁচান অসম্ভব; যাহারা প্রহৃত ও জখম

হইয়াছে, তাহাদেরও যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; বেত্রদণ্ডেরও এখন আর কোন প্রতিকার নাই; যাঁহারা জেলে পুরা মিয়াদ খাটিয়া আগেই জেল হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারাও বর্ত্তমান রফা হইতে কোন সুবিধা পাইলেন না। যে-সব অহিংস সত্যাগ্রহী এখনও জেলে ছিলেন, কেবল তাঁহাদের কিছু সুবিধা হইল। যাঁহাদিগকে জরিমানা দিতে হইয়াছে,তাঁহাদের জরিমানার টাকাটা ফেরত দেওয়া অসাধ্য নহে। যে-সব প্রেসের বা সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর জামীন বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের জামীনের টাকাটাও ফেরত দেওয়া অসাধ্য নহে। যে-সব বাজেয়াপ্ত প্রেস নিলাম হয় নাই, সেগুলি মালিকদিগকে ফেরত দেওয়া উচিত। যেগুলি নিলাম হইয়া গিয়াছে তাহাদের নিলামলব্ধ টাকা মালিকদিগকে দেওয়া উচিত। এই সব বিষয়ের কোন উল্লেখ বড়লাটের বর্ণনাপত্রে দেখিলাম না।

—

লবণ আইন ভঙ্গ

লবণ আইন সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কেবল যে-সব জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থিতি বশতঃ লবণ প্রস্তুত হয় বা হইতে পারে, সেখানকার লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বা নিজ গ্রামে বিক্রীর নিমিত্ত লবণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের কোটি কোটি গরীব লোকদের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোকেরও বিনামূল্যে বা সস্তায় লবণপ্রাপ্তি ঘটিবে কিনা সন্দেহ।

গবর্মেণ্ট রাজস্বের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অজুহাতে লবণ আইনের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, বলিয়াছেন। কিন্তু লবণ-শুল্ক হইতে মোটামুটি সাত কোটি টাকা আদায় হয়। তাহা আদায় করিতে এবং "বে-আইনী" লবণ তৈরি বন্ধ করিতে মোটামুটি দুই কোটি টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ লবণ শুল্কের নিট আয় পাঁচ কোটি টাকা। ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা এবং যে-সব নূতন ট্যাক্স বসান হইতেছে তাহা হইতে এই পাঁচ কোটি টাকা পোষাইয়া লওয়া অসম্ভব ছিল না।

—

রফার প্রয়োজন

যে-যে সর্ত্তে রফা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিলাম। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে রফার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। রফা কখন কখন করিতে হয়। যখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেলী সুয়েজ খালের অংশ সকল খরিদ করেন, তখন অনেকে এই বলিয়া তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করেন, যে, তিনি কেন অপেক্ষা করিলেন না; কেন-না, ইংলণ্ড সর্ব্বদাই চরম উপায় স্বরূপ রণতরীসমূহের বলপ্রয়োগ দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিতেন। ডিস্রেলী উত্তর দেন,—

If the government of the world was a mere alternation between abstract right and overwhelming force; I agree there is a good deal in that observation; but that is not the way in which the world is governed. The world is governed by conciliation, compromise, influence, varied interests, the recognition of the rights of others, coupled with the assertion of one's own; and, in addition, a general conviction, resulting from explanation and good understanding, that it is for the interest of all parties that matters should be conducted in a satisfactory and peaceful manner."

রফা মাত্রই নিন্দনীয় বা অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু রফার মানে যখন এই, যে, উভয় পক্ষই কিছু ছাড়িয়া দিলেন ও পাইলেন; তখন দেখিতে হইবে উভয় পক্ষের ছাড়িয়া দেওয়া ও পাওয়া ন্যায্য ও তুল্যমূল্য হইল কি না।

—

লর্ড আরুইনের প্রশংসা

এই রফার পূর্ব্বাহ্নিক কথাবার্ত্তা এবং শেষ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরুইনের অসীম ধৈর্য্য, সৌজন্য এবং শ্রমশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। বড়লাটকে বা অন্য কোন লোককে তাঁহার ন্যায্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করা দূরে থাক, বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করাও অনুচিত। তাঁহার সহিত অপরিচিত আমাদের মত কোন ব্যক্তি সেরূপ চেষ্টা করিলেও গান্ধীজীর মত মানুষের মুখনিঃসৃত প্রশংসার মূল্য লোকের কাছে কমিবে না।

এই প্রশংসা হইতে কি শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমরা বলিব।

মানুষ খুব সদাশয় না হইলে বিপক্ষের অকপট প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিতে পারে না। অতএব এই প্রশংসা হইতে মহাত্মা গান্ধীর হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রমাণিত হইতেছে।

খুব সাধু এবং ভদ্র রাজপুরুষও রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে খুব বেশী সময় ও ধৈর্য্য ব্যয় এবং পরিশ্রম করেন না। বড়লাট যে তাহা করিয়াছিলেন এবং একটা নিষ্পত্তি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষকে খুশী করিয়া ঠাণ্ডা করিবার, শান্ত করিবার, ইংলণ্ডের খুব প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজনের স্বরূপ অনেকে হয়ত জানেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা ফেব্রুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের "Indian Freedom and World Politics" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলে কিছু আভাস পাইবেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক সঙ্কট অবস্থার কথা সুবিদিত।

আমাদের পূরা দাবি অনুযায়ী অধিকার না পাইয়া কেবল অঙ্গীকার ও মিষ্ট কথায় যাহাতে আমাদের প্রতিনিধিরা বা আমরা খুশী হইয়া না যাই, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে আমাদিগকে অল্প কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে।

—

রফা ও আসল কাজ

বর্ত্তমান রফা সামনের একটা বড় কাজ উপলক্ষ্যে হইয়াছে। সুতরাং এই রফাটা যদি আমাদের কাহারও কাহারও সর্ব্বাংশে মনঃপূত নাও হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দিয়া যাহাতে পূর্ণস্বরাজ দেশের জন্য পাইতে পারেন, সেই চেষ্টাই এখন সকলকে করিতে হইবে। আমাদের সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা মহাত্মাজীর সম্মতিকে মানিয়া চলিব। আগেকার বৈঠকে কংগ্রেস কোন কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তাহাতে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহার কিছুই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে কংগ্রেস বাধ্য নহেন, এবং সম্ভবতঃ লইবেনও না।

—

উমা দেবী

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, অকালে, উমা দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাংলা দেশের সাহিত্যের ক্ষতি হইল। তাঁহার পিতা পরলোকগত অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন দর্শন-শাস্ত্রে যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি সাহিত্যরসিকও ছিলেন। অধিকন্তু তিনি নির্ম্মল চরিত্র ও সৌজন্যের জন্য সুবিদিত ছিলেন। কল্যাণীয়া উমা তাঁহার পিতার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন।

তিনি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখা কেবল দুটি বহি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "বাতায়ন" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

> তোমার "ছায়াছবি"গুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তা'র কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ভাবুকতার কবিতা অনেক সময়ে রঙ্গীন মেঘের মতো; তা'র মধ্যে যদি বা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, সে সুনির্দ্দিষ্ট নয়; বাষ্পরেখায় রূপ যদিবা আঁকা পড়ে, মনে হ'তে থাকে এর ধ্রুবত্ব নেই। কিন্তু যে জিনিষকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোট ছোট কবিতায় তা'কেই সহজ ক'রে দেখিয়েছ; এই মনে ক'রে তৃপ্তি হয়, এগুলি প্রত্যক্ষ বিষয়। হৃদয়ের উড়ো হাওয়ায় যে-সকল বেদনায় খেয়াল ভেসে বেড়ায়, তা'কে পাঠকের মনে অনুভাবিত করা, সে আর এক জিনিষ। সেখানে প্রায় দেখা যায় ঠিক সুরটি লাগে না অত্যুক্তি এসে পড়ে, সর্ব্বদা কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্যরীতি জমাট বেঁধে ভাবের আন্তরিক লঘুতা ঢাকা দেয়, এক রকম প্রথাসম্মত চলনসই জিনিষ দাঁড়িয়ে যায়, তা'র চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই "ছায়াছবি"র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন-দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তোমার ঘরের কাছে মজুররা কাজ করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার উপর কারো চোখ পড়ে না; তোমার দৃষ্টিতে তা'রা উপেক্ষিত হয়নি, তোমার রচনায় তারা সমাদর পেয়েছে,—এইটি আমার ভালো লাগল।
>
> "ছায়াছবি" নামটি সঙ্গত হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। এই লেখাগুলিতে ছায়ার অস্পষ্টতা নেই।—
>
> মনে এই আশা রইলো, তোমার বাতায়নের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যের বাইরেও তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে, এবং তোমার অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের সকল দিক্ থেকেই প্রত্যক্ষ-দেখা ছবিগুলিকে সংগ্রহ ক'রে এমনি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় তোমার কবিতায় তাদের সজ্জিত ক'রে তুলবে।

কবির এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেকের এই আশা ফলবতী হইল না। এখন কেবল সান্ত্বনা এই,

"যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
* * *
জানি গো জানি তাও
হয় নি হারা।"

উমা দেবী কোন কোন মাসিক কাগজেও লিখিতেন। "বিচিত্রা"য় তাঁহার "কাজলী" নামক উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল,

উমা দেবী

"প্রবাসী"তে তাঁহার "ছায়াছবি"গুলি পড়িয়া আমাদের পাঠকেরা প্রীত হইয়াছেন।

উমা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্ব্বচন পঠিত হইয়াছিল,—

"বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে গান যদি অকালে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, তবে তার অন্তঃপ্রবাহ শ্রোতার মনে নীরবে সমাপ্তির মুখে চলতে থাকে। উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি ক'রে অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অন্তরতর গতি লাভ করেছে। সংসারে স্নেহ দেবার এবং স্নেহ পাবার ইচ্ছা তা'র জীবনের সব চেয়ে একান্ত ছিল। ফুল যেমন আলো চায় এবং গন্ধ দেয়, সে তা'র অল্পায়ু জীবলীলায় তেমনি ক'রেই প্রীতি দিয়েছে এবং নিয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার অবসান হ'ল, এখন একথা মনে ক'রে যেন বিলাপ না-করি। জীবিতকালেই সে অনুভব ক'রেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম ক'রেছে ; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে; তা'র আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা ক'রে আছে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্মৃতির অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে এই মুহূর্ত্তেই তা'র হৃদয় স্নিগ্ধ হ'ল। তা'র আত্মা শান্তি লাভ করুক, তৃপ্তিলাভ করুক, মর্ত্ত্যজীবনের সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করুক, এই কামনা করি।"

হিন্দু শিক্ষায় অনগ্রসর

অনেকের ধারণা আছে, হিন্দুরা বিদেশের সভ্য-জাতিদের তুলনায় শিক্ষায় অনগ্রসর হইলেও ভারতবর্ষে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তুলনায় অগ্রসর। ১৯২৮-২৯ সালের সমগ্র ভারতবর্ষের যে শিক্ষা রিপোর্ট গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিলে এই ধারণা দূর হইবে। ঐ রিপোর্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে নীচের তালিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়	সমগ্র লোকসমষ্টির শতকরা কতজন শিক্ষালয়ে পড়ে।
ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী	১৮.৫
ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান	১৩.৭
হিন্দু	৪.৭
মুসলমান	৫.২
বৌদ্ধ	৫.৪
পার্সী	২২.৭
শিখ	৭.১
অন্যান্য	২ ১

হিন্দুদের কয়েকটি "উচ্চ" জাতির মধ্যে শিক্ষালয়ে ছাত্র খুব বেশী বটে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের তুলনায় এই "উচ্চ" জাতির লোকদের সংখ্যা কম। অন্য হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুরা শিক্ষায় অনগ্রসর। সেইজন্য, এই সব "নিম্ন" শ্রেণীর শিক্ষায় খুব মন দেওয়া দরকার।

লোকসংখ্যায় সমগ্র ভারতে হিন্দুর নীচেই মুসলমান। সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিলে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে এখন শিক্ষায় বেশী মন দিতেছে। তাহাও কিন্তু বাস্তবিক বেশী নয়। অতএব, হিন্দুদের মত মুসলমানদিগকেও শিক্ষায় মন দিতে হইবে।

বাংলা দেশ শিক্ষায় অনগ্রসর

হিন্দুরা শিক্ষায় অগ্রসর, এটি যেমন ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর ধারণা, বাঙালীরা শিক্ষায় অগ্রসর, ইহাও তেমনি মিথ্যা ও অনিষ্টকর ধারণা। তাহাও ভারতবর্ষের ১৯২৮-২৯ সালের শিক্ষা-রিপোর্ট হইতে দেখাইতেছি। নীচের তালিকায় কোন্ প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা কতজন শিক্ষালয়ে পড়ে, তাহা দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ	সমগ্র অধিবাসীর শতকরা কতজন শিক্ষালয়ে পড়ে
মান্দ্রাজ	৬.২
বোম্বাই	৬.২
বাংলা	৫.৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৩.২
পঞ্জাব	৬.০
ব্রহ্মদেশ	৫.১
বিহার-উৎকল	৩.৩
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩.০
আসাম	৪.০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩.৪
কুর্গ	৬.৭
দিল্লী	৬.৭
আজমের-মেরোয়ারা	৩.৬
বালুচিস্থান	২.০
বাঙ্গালোর	১২.৪
অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল	৮.৪

বাংলা দেশে শিক্ষার ব্যয়

বাংলা দেশে যে আশানুরূপ শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার একটি কারণ এই প্রদেশে গবন্মেণ্ট অন্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষার জন্য ব্যয় কম করেন। কোন্ প্রদেশের মোট শিক্ষাব্যয়ের শতকরা কত অংশ গবন্মেণ্ট দেন, এবং শতকরা কত অংশ ছাত্রেরা বেতন রূপে দেয়, নীচের তালিকায় কয়েকটি প্রদেশের ক্ষেত্রে তাহার হিসাব দিতেছি।

প্রদেশ	গবন্মেণ্ট শতকরা কত দেন	ছাত্রেরা কত দেয়
মান্দ্রাজ	৫০.৬	১৭.০
বোম্বাই	৪৯.৬	১৮.৩
বাংলা	৩৫.২	৪১.১
আগ্রা-অযোধ্যা	৫৫.৭	১৫.০
পঞ্জাব	৫৬.০	২০.০
ব্রহ্মদেশ	৪৯.৫	১৮.৬
বিহার-উড়িষ্যা	৩৫.৫	২১.৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫৮.২	১২.৫
আসাম	৫৮.৮	১৬.৩
উ.-প. সীমান্তপ্রদেশ	৬৬.২	৮.৮

এই তালিকা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, গবন্মেণ্ট বাংলা দেশে শিক্ষাব্যয়ের সকলের চেয়ে কম অংশ বহন করেন, এবং বাঙালী ছাত্রেরা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শিক্ষাব্যয়ের বেশী অংশ বহন করে।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের জন্য ইংরেজ রাজত্ব অংশতঃ দায়ী কিনা এবং দায়ী হইলে কি পরিমাণে দায়ী, এই অনুসন্ধান চাপা দিবার জন্য ইংরেজরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত ও অত্যন্ত বেশী বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের চেয়ে শতকরা অনেক বেশী লোক বাড়িয়াছে এবং ভারতবর্ষ অপেক্ষা ঐ সব দেশ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে অধিকতর সমৃদ্ধ নহে। অথচ তাহারা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র নহে। কয়েকটি দেশে ১৮৭০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরে শতকরা কত লোক বাড়িয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

দেশ	১৮৭০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত শতকরা লোকবৃদ্ধি
ভারতবর্ষ	১৮.৯
ইংলণ্ড	৫৮.০
জার্ম্মেনী	৫৯.০
রুশিয়া	৭৩.৯
সমগ্র ইউরোপের গড়	৪৫.৪

এই তালিকা শ্রীযুক্ত ব্রিজনারায়ণের "Population Problem of India" হইতে গৃহীত।

—

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ এক জন কৃতী শিক্ষাদাতা হারাইল। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

হইয়া নিজের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিক উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেন, এবং শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হন। কুমিল্লার কলেজের ক্রমোন্নতি তাঁহার জীবনেতিহাসের সহিত জড়িত এবং এই উন্নতি অনেক অংশে তাঁহার চেষ্টা ও শিক্ষানৈপুণ্যের ফল। আমরা একবার মাত্র কুমিল্লা গিয়াছিলাম। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও তাঁহার সৌজন্য চিরকাল মনে থাকিবে। আমেরিকা-প্রবাসী অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ বসু পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুজ সহোদর।

—

ডক্টর বনওয়ারীলাল চৌধুরী

পরলোকগত ডক্টর বনওয়ারীলাল চৌধুরী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সী ছিলেন। তিনি প্রাণিবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা দ্বারা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রাণিবিদ্যা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেন্সান লইয়া নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ধনশালিতা দুই-ই ছিল। এইজন্য তাঁহার বিনয়নম্রতা সমধিক সুশোভন প্রতীত হইত। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরাণী ও তিনি কলিকাতায় সঙ্গীত বিদ্যালয় দ্বারা বাঙালী সমাজে সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন।

—

বঙ্গের বাজেট্

১৯৩১-৩২ সালে সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারী আয়ব্যয় কিরূপ হইবে, তাহার এক একটা আনুমানিক হিসাব রাজস্ব মন্ত্রীরা ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে দেখাইতেছেন। সর্ব্বত্রই এক কথা—আয়ে ঘাট্তি পড়িবে। ভারতীয় এবং প্রাদেশিক বাজেটগুলিতে, আয় কেন কম হইবে তাহার একটি প্রধান কারণ বলা হইতেছে সত্যাগ্রহ বা অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা। তাহা বলিয়া রাজপুরুষেরা যে দোষটা গবন্মে´ণ্টের ঘাড়েই চাপাইতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন কি? এখন গবন্মে´ণ্ট ভারতীয়দিগকে যতটুকু রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে চাহিতেছেন, তাহাতে এখন তাহারা সন্তুষ্ট হইতেছে না; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বরাজের দাবি করা হইয়াছিল, তখন এতটুকু দিলেও সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইত না। তখন ভারতবর্ষের লোকদিগকে শক্তিহীন ও হেয় জ্ঞান করায় এবং তাহাদের দাবি সেইজন্য উপেক্ষণীয় বিবেচিত হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হয়। সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টার উৎপত্তির ইহাই কারণ। অতএব সত্যাগ্রহের জন্য যদি রাজস্বের হ্রাস হইয়া থাকে, তাহার জন্য গবন্মে´ণ্টই দায়ী।

বাংলা দেশের বাজেটে, ভারতের ও অন্যান্য প্রদেশের বাজেটের মত, ঘাটতি পড়িবে। আয় কমিলে গবন্মে´ণ্ট-সমূহ তিন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন; ব্যয়-সংক্ষেপ, নূতন ট্যাক্স দ্বারা আয়বৃদ্ধি, এবং ঋণগ্রহণ

ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইল মোটা বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইতে হয়; কিন্তু তাহা কোথাও করা হইতেছে না। পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছায় কম বেতন লউন। ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

খবরের কাগজে দেখা যায় নিউজীল্যাণ্ডের ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনার‍্যাল লর্ড ব্লেডিস্লো তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফর্ব্‌সকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেখেন, যে, তিনি তথাকার পার্লেমেণ্টের সভ্য ও সিবিলিয়ানদের মত নিজের বেতনের শতকরা দশ ভাগ কমাইয়া লইতে রাজী আছেন। নিউজীল্যাণ্ডের সরকারী রাজস্বের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী গবর্ণর-জেনার‍্যালের প্রস্তাব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বিদেশী কর্ম্মচারীরা খুব উচ্চ হারে বেতন পাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কেহ এরূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। বরং বঙ্গের বাজেট হইতে বিপরীত রকমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যথা—

বঙ্গের ১৯২৯-৩০ সালের বাজেটে লাট সাহেবের কর্ম্মচারীদের এবং গার্হস্থ্য ভৃত্যাদির বেতন প্রভৃতি বাবদে ৫,৭৮,০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ অপেক্ষা ১৯৩১-৩২ দুর্ব্বৎসর হইবার সম্ভাবনা আছে। অথচ এই বৎসরের জন্য বাজেটে উক্ত বাবদে ৬,১২,০০০ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে অর্থাৎ এই বাবদে ১৯২৯-৩০ সাল অপেক্ষা ১৯৩১-৩২ সালে ৩৪,০০০ টাকা বেশী খরচ হইবে। ১৯২৯-৩০ সালে লাট সাহেবের ভ্রমণব্যয় ১,০০,৩৮২ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে এই বাবদে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১,৩৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ এই দুর্ব্বৎসরেও লাট সাহেবের সফরে ১৯২৯-৩০ অপেক্ষা ৩৫,৬১৮ টাকা বেশী খরচ হইবে। লাট সাহেবের বাদ্যকর, দেহরক্ষী প্রভৃতি বাবদে অনেক ব্যয় হয়। এই সকল ব্যয়ের কোন হ্রাস হইবে না। কিন্তু এদিকে অর্থাভাবের অজুহাতে বেসরকারী কলেজ-সমূহের সরকারী অর্থ সাহায্য অপ্রদত্ত আছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাহার প্রার্থিত টাকা দেওয়া হয় নাই।

সমগ্র বঙ্গের ছাত্র-সম্মেলন

সমগ্র বঙ্গের ছাত্র-সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সংস্কৃতির (culture-এর) ক্ষেত্রে অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত সি. আর. রেড্‌ডীর কলিকাতায় শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য অন্ধ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়া ঐ কাজ অনেক দিন করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে

শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

নিগ্রহনীতি প্রবর্ত্তিত করেন এবং যাহা অনুসরণ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে পুলিসের গুলি ও লাঠি চালান অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ভাইস-চ্যান্সেলারের উচ্চ পদ পরিত্যাগ করেন। আমরা কাগজে পড়িয়া প্রীত হইলাম, যে, তিনি কলিকাতায় যথোচিত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতির কাজ করিবার জন্য শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজে

সুপরিচিত। সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে তিনি বোম্বাই শহরে বিশেষ দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেইদিনই বিচার করাইয়া তাঁহাকে নয় মাসের জন্য জেলে পাঠাইয়াছিলেন। ছাত্র-সম্মেলনের সভানেত্রী মনোনীত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার কারামুক্তি হয়। যে-দিন তাঁহার জেল হয়, সেই দিন সাংবাদিকদিগের কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে আমরা বোম্বাইয়ে ছিলাম। তাঁহার গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে বোম্বাইয়ে উত্তেজনা লক্ষিত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মারের সম্পাদক নটরাজন্‌ মহাশয়ের কন্যা কমলা দেবীর বন্ধু। তাঁহার বিচার দেখিয়া আসিয়া নটরাজন্‌-দুহিতা অশ্রুসজলচক্ষে যখন পিতাকে তাঁহার শাস্তির সংবাদ দিলেন,তখন সেই মুহূর্ত্তের বিষাদগাম্ভীর্য্য ও গৌরব আমরা অনুভব করিলাম। তাহার পর আজাদ্‌ ময়দানে সর্ব্বসাধারণের সভায় নটরাজন্‌ মহাশয় কমলাদেবীর কারাদণ্ডের উল্লেখ করিয়া গবর্মেণ্টের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

কমলা দেবী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কন্যা। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি চট্টোপাধ্যায় পদবী পাইয়াছেন। তিনি অধুনা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ নহে। নানা প্রদেশে নারীজাগৃতির কারণ ও ফল যে প্রাদেশিক ও সমগ্র ভারতীয় নানা নারীশিক্ষা কন্‌ফারেন্স প্রচেষ্টা, কমলাদেবী তাহার অন্যতমা অতি কর্ম্মিষ্ঠা নেত্রী। তাঁহার যেরূপ বাগ্মিতা আছে, কর্ম্ম ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ আছে। তিনি বিদুষী এবং তাঁহার স্বামীর ন্যায় অভিনয়ে তাঁহার দক্ষতা আছে।

আমরা আশা করি, বঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা শ্রীযুক্ত সি. আর. রেড্ডি এবং শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দ্বারা ও সংস্পর্শে আসিয়া উপকৃত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের সকল প্রদেশের অগ্রণীদিগকে সম্মান করিতে পারা সুশিক্ষার লক্ষণ।

মুসলমান বাঙালীদের শিক্ষা

যদিও অমুসলমান বাঙালীরা দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মহামারী ঝড় ভূমিকম্প প্রভৃতিতে বিপন্ন মুসলমান বাঙালীদিগকে তাহাদের স্বধর্ম্মীদের চেয়ে অধিক সাহায্য করিয়া আসিতেছে, এবং যদিও অমুসলমান বাঙালীদের স্থাপিত শিক্ষালয়-সমূহে মুসলমান বাঙালীরাও শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে, তথাপি মুসলমান বাঙালীদের অনেক নেতা অমুসলমান বাঙালীদিগকে তাঁহাদের অহিতকামী মনে করেন—অন্ততঃ হিতকামী মনে করেন না। আমরা যে মুসলমান বাঙালীদের হিতৈষী সেরূপ দাবি করিতেছি না। তাহার বিচার অন্যেরা করিবেন। কিন্তু নিজেদেরই হিতের এবং বাংলা দেশের কল্যাণ-সাধন ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য মুসলমান বাঙালাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি চাই, এই দাবি করিতেছি। আমাদের এই স্বার্থপরতা সত্য বলিয়া আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট মুসলমান বাঙালীরাও হয়ত স্বীকার করিতে পারেন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল হাসান সুহ্রাওয়ার্দী এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার। তিনি উহার গত কন্‌ভোকেশ্যান্‌ অর্থাৎ উপাধিদান সভায় মুসলমান বাঙালীদের শিক্ষায় অনগ্রসরতার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। আমাদের মনে হয়, মুসলমান বাঙালী-দের শিক্ষায় অনগ্রসরতার জন্য তাঁহারা নিজে—বিশেষতঃ তাঁহাদের সমাজের নেতা ও ধনী লোকেরা—প্রধানতঃ দায়ী। বাংলা দেশের সব শিক্ষালয়ের খবর আমরা রাখি না; কিন্তু মোটামুটি বলিতে পারি, কলেজগুলির মধ্যে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং বিদ্যাসাগর কলেজ এবং স্কুলগুলির মধ্যে কলিকাতার হিন্দু স্কুল এবং সম্ভবতঃ মফঃস্বলের দুই একটি স্কুল ছাড়া আর সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজে অমুসলমানদের পড়িবার যেরূপ অধিকার আছে, মুসলমানদেরও সেইরূপ আছে। তদ্ভিন্ন হিন্দুদের জন্য যেমন সরকারী একটি কলেজ ও একটি স্কুল আছে, তেমনি মুসলমানদের জন্যও একটি একটি সরকারী

কলেজ ও সরকারী স্কুল আছে। টাকার বরাদ্দ সবগুলির জন্য সমান না হইতে পারে; কিন্তু আমরা এখন কেবল পড়িবার সুযোগটার জন্য শিক্ষালয়ের কথাই বলিতেছি। মুসলমানদের মধ্যে অনেক গরীব লোক আছে। কিন্তু ধনীলোকও একান্ত বিরল নহে। হিন্দু ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অনেক স্কুল কলেজ ও বৃত্তি স্থাপন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একজন বহু লক্ষ ও বহু সহস্র টাকা দান করিয়াছেন, এবং প্রায় সকল স্থলেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্র এই সকল দান হইতে লাভবান হইবার অধিকারী। ধনী ও মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালীরা গরীবদের বিদ্যাশিক্ষার ও বিদ্যার সাহায্যের জন্য এ প্রকার দান আদি যাহা করিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য।

মোটের উপর ইহা সত্য, যে, বঙ্গের মুসলমানেরা সকলের জন্য অভিপ্রেত শিক্ষালয়-সকলের সুবিধাগ্রহণে তৎপরতা দেখান নাই, কেবল তাঁহাদের নিজেদের জন্য স্থাপিত শিক্ষালয়গুলির সুবিধাও পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন নাই। ধনী মুসলমানরা বিদ্যোৎসাহিতা সামান্যই দেখাইয়াছেন।

নিজেদের বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতা অপেক্ষা সরকারের অনুগ্রহে এবং সাম্প্রদায়িক লোকসংখ্যার জোরে চাকরি পাইবার আগ্রহও মুসলমান বাঙালীদিগকে বিদ্যালাভে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালীদের অনগ্রসরতার আর একটি কারণ, তাঁহাদের মক্তব মাদ্রাসার উপর ঝোঁক। তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্য ইস্লামীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার জন্য আরবী ফারসী শিখুন, ইহা আমরা চাই। কিন্তু আধুনিক লৌকিক শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। সেদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের যথেষ্ট দৃষ্টি নাই। মক্তব মাদ্রাসার প্রতি ঝোঁকে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমরা বলিলে মুসলমান বাঙালীরা বিশ্বাস না করিবার সম্ভাবনাই বেশী। সেই জন্য আমরা এ-বিষয়ে এমন একজন মুসলমান নেতার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিব, যাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সমবেত বেঙ্গল মুসলিম এডুকেশ্যন্যাল কন্‌ফারেন্সের নির্ব্বাচিত সভাপতি, গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য ডক্টর শফা'ত আহমদ খান্, এম্. এল্. সি। তিনি পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা এবং আজমের মুসলিম এডুকেশ্যন্যাল কন্‌ফারেন্সেরও সভাপতিত্ব করিয়াছেন। তাঁহার চট্টগ্রামের অভিভাষণে তিনি বলিতেছেন:—

A priori, I am in favour of the abolition of special institutions. I believe that they are a handicap to Muslims in their struggle for existence. Again, they are undoubtedly inefficient as compared with the ordinary board schools. They provide few opportunities for a thorough mastery of the elements of secular instruction. Again, it must be admitted that they do not fit in with the educational system, and are virtually a *cul-de-sac* for the majority of students. True, some of them can join the Islamia Intermediate Colleges, and, later on, the Dacca University, but if they take the ordinary subjects of the school curriculum they find themselves handicapped, and are outstripped by students who come from other institutions. Moreover, it must be admitted that they do not provide opportunities for free and unrestrained intercourse of Hindu and Muslim students. These are defects which are very serious indeed, and we should consider with great care whether some modification of the existing system is not possible.

I am aware of the fact that the system has taken root in Bengal; I admit that it has preserved our community from the blighting effects of illiteracy. We know that if special institutions of this nature had not existed, the position of Muslims in primary education would have been precisely the same as that occupied by them in secondary and University education. It is because they had special schools of their own that the entire Muslim community did not relapse into illiteracy. Again, it must be acknowledged that the reformed Madrassah scheme, which is in operation in the majority of these institutions, is an immense improvement on the old system, or rather, lack of system.

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে পাঠক দেখিবেন, ডক্টর শফা'ত আহমদ খান্ মক্তব ও মাদ্রাসাগুলির দ্বারা মুসলমান বাঙালীদের যে উপকারটুকু হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ বলিয়াছেন, "আমি বিশেষ (সাম্প্রদায়িক) শিক্ষালয় উঠাইয়া দিবার পক্ষে" ("I am in favour of the abolition of special institutions)।"

অতঃপর তিনি বলিতেছেন,—

While I am conscious of the value of the work which the Maktabs and Madrassahs are doing, and have done in Bengal, I am compelled to ask

possible. I am convinced that it is not only possible but necessary. We must consider these institution from the point of efficiency, and efficiency alone. Efficiency must be tested with reference to our capacity to hold our own in the public life of Bengal. Are we able to compete with other communities on a footing of equality? Will the education we are receiving in these Madrassahs enable us to establish our influence in the commercial, political and social life of Bengal?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর যে "না," তাহা সুবিদিত। প্রশ্নগুলির পরে ডক্টর খান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, তাঁহারও উত্তর "না।"

আর একটি কথা মুসলমান বাঙালীরা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। হিন্দু বাঙালীরা ইংরেজীর সাহায্যে লৌকিক শিক্ষা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও (অথবা হয়ত তাহা করেন বলিয়াই), তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যজ্ঞ এমন অন্ততঃ কয়েক জন ছিলেন ও আছেন যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও পৌঁছিয়াছে। মুসলমান বাঙালীরা হিন্দু বাঙালীদের চেয়ে ইংরেজী এবং ইংরেজীর সাহায্যে আধুনিক লৌকিক বিদ্যা কম শিখেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ইসলামীয় সাহিত্য ও বিদ্যায় পারদর্শী এমন লোক কি বেশী ছিলেন বা আছেন যাঁহাদের আরবী ও ফারসীর জ্ঞান বঙ্গের বাহিরে ও ভারতবর্ষের বাহিরে আদৃত?

—

ইস্লামীয় বিদ্যার চর্চ্চা

ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দী তাঁহার কন্‌ভোকেশুন্ অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্লামীয় বিদ্যাকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত এবং তজ্জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহার নূতন শৃঙ্খলাবিধান করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। তাহা করা আবশ্যক হইলে নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু নূতনতর ব্যবস্থার অভাবেই মুসলমান বাঙালীরা ইস্লামীয় বিদ্যার উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে পৌঁছিতেছে না, ইহা আগে সুপ্রমাণ হওয়া দরকার। বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও কিছু মুসলমান ছাত্র ত থাকা উচিত। কয়জন আছে, জানি না। তবে অন্য একটি খবরের বিষয় ডক্টর সুহ্রাওয়ার্দী চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। তাহা এই—

হায়দরাবাদের মুসলমান নৃপতি বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় বিদ্যার অনুশীলনের জন্য কয়েক বৎসর হইল এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই মূলধনের আয় হইতে ইসলামীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত একজন হাঙ্গেরীয় অধ্যাপক ডক্টর জুলিয়াস গার্মেনুসকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা আদি করেন। আরবীতেও করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মাত্র একজন মুসলমান শ্রোতা ও ছাত্র জুটিয়াছে এবং সেই ছাত্রটিও আসিয়াছে দিল্লীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নহে। ইংরেজী প্রবাদবাক্যে বলে, ঘোড়াকে জলের কাছে, কিম্বা জল ঘোড়ার কাছে, আনা যায়, কিন্তু ঘোড়ার প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে জলপান করান যায় না।

বিশ্বভারতীর লাইব্রেরীতে মিসর দেশের রাজা ফুয়াদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুনির্ব্বাচিত আরবী গ্রন্থসংগ্রহ আছে।

ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গ মুসলমান বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য এবং উচ্চতর ইস্লামীয় বিদ্যার চর্চ্চার জন্য বাহ্য বন্দোবস্ত যাহা করিতে চান, তাহা অবশ্যই করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বধর্ম্মীদের মনের মধ্যে বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা বাড়াইবার চেষ্টাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার আগেই করা দরকার।

—

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনের উৎসব

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। সেই উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার আয়োজন হইতেছে। এই জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত চিঠিখানি পাইয়াছি,—

যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের সহিত প্রীতিযুক্ত সজ্জনবর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ করিব, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

এই সময় বিশেষভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক, কর্ম্মী,

অথবা যাঁহারা যে কোনো ভাবে মনে মনে আশ্রমের সঙ্গে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা, এবং জন্মোৎসব সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

ইতি—১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ সন।

নিবেদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য — শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন — শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ঘোষ
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ.
শ্রীনেপালচন্দ্র রায় — শ্রীহেমবালা সেন
শ্রীআশা অধিকারী

যাঁহাদের উদ্দেশে এই চিঠি লিখিত হইয়াছে, আশা করি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট নিজ নিজ ঠিকানা পাঠাইয়া দিবেন। অন্য কিছু জানাইবার ও জানিবার প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহাকেই চিঠি লিখিলেই চলিবে।

পরে জানা গেল, কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে অবশ্য ২৫শে বৈশাখই হইবে। সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার জয়ন্তী উৎসব ১০ই শ্রাবণ রবিবার ২৬শে জুলাই হইবে।

২৫শে বৈশাখ অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। তখন শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং জলের দুষ্প্রাপ্যতাও ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য জয়ন্তী উৎসবের কমিটি ১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) হইবে স্থির করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে দুখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। একখানিতে বাংলা ও অন্যান্য কোন কোন ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। তৎসম্বন্ধে কমিটি, যে-সকল লেখকের নাম ও ঠিকানা জানেন, তাঁহাদিগকে নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন,—

রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা
শান্তিনিকেতন

সবিনয় নিবেদন—

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব সমাগতপ্রায়। আশ্রমবাসীদের ইচ্ছা, তাঁহার এই জয়ন্তী-উৎসবটি আশ্রমে ভালরূপে সম্পন্ন হয়। আমরা জানি, আপনি কবির একজন বিশিষ্ট অনুরাগী। আমাদের দেশে ও বিশ্বজগতে কবির দান সম্বন্ধে আপনি যে-কোনো দিক্ হইতে যদি কোনো লেখা এই উপলক্ষ্যে আমাদিগকে দেন, তবে আমরা অতিশয় অনুগৃহীত হইব। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে এই মহাকবির ভাব কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এই উপলক্ষে তাহার একটা সংগ্রহ করিতে আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। রচনা মাতৃভাষায় অথবা ইংরাজিতে—যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, আপনি লিখিতে পারেন। আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে লেখাটি "শ্রীযুক্তা আশা অধিকারী, শান্তিনিকেতন"—এই ঠিকানায় পৌঁছানো প্রয়োজন। ইতি—শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৭ সন।

ভবদীয়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য — শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন — শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ঘোষ
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়

অন্য একখানি বহিতে ইংরেজী ও অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি এবং বহুবর্ণে মুদ্রিত কয়েকখানি ছবি থাকিবে। সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক রম্যাঁ রলাঁ তাঁহার এতদ্বিষয়ক চিঠিতে "গোল্ডেন বুক অব্ ট্যাগোর" (Golden Book of Tagore) নাম দিয়া প্রস্তাবিত এই বহিটির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরোধ পত্রটি ফরাসী ভাষায় তাঁহারই লেখা; ইংরেজীটি তাহার অনুবাদ। তাঁহার রচিত একটি কাব্যাংশ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। বহিটি সম্বন্ধে অনেক লেখকের ও চিত্রশিল্পীর নিকট নিম্নমুদ্রিত অনুরোধ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। অনুরোধ-পত্রের পরিবর্ত্তে কাহাকেও কাহাকেও মৌখিক বা স্বতন্ত্র পত্র দ্বারা অনুরোধও করা হইয়াছে। কবিকে যাঁহারা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, এরূপ সমুদয় লেখক ও শিল্পীর নাম ও ঠিকানা কমিটির জানা না থাকায় হয়ত সকলের নিকট অনুরোধ-পত্রটি যায় নাই।

TAGORE BIRTHDAY CELEBRATION : 1931.
"Golden Book of Tagore."

On the 8th of May next Radindranath Tagore completes his seventieth year. This occasion ought to bring together his friends all over the world round him—friends whose lives have been lighted up, broadened, ennobled by his own life. He has been for us the living symbol of the Spirit, of Light and of Harmony—the great free bird which soars in the midst of tempests—the song of Eternity which Ariel strikes on his golden harp, rising above the sea of unloosened passions.

But his art has never remained indifferent to human misery and struggles. He is the "Great Sentinel." In tragic hours, he is the clear-eyed and bold watchman of his own people and of the world.

In the name of thousands whom his melodious voice has nourished with faith, hope and beauty, we invite his poet, artist, scholar and other friends to come forward and present to him on his

seventieth birthday a sheaf of their spiritual fruits and flowers. As a token of gratitude, therefore, everyone might offer him a twig from his own garden—a poem, an essay, a chapter of a book, a piece of scientific research, a drawing, a thought, etc.

For all that we are and we have created, have had their roots and branches bathed in that Great Ganges of Poetry and Love.

Jagadis Chunder Bose
Mohandas Karamchand Gandhi
Romain Rolland
Albert Einstein
Costis Palamas.

All contributions are to be sent to—
Mr. RAMANANDA CHATTERJEE,
SANTINIKETAN, BENGAL, INDIA.

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের "বিচার" পদ্ধতি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান শহর পেশাওয়ারে গত বৎসর যে ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা এরূপ, যে, তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিঠ্ঠলভাই পটেল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেসরকারী কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা প্রকাশিত হইবামাত্র সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু এই কাণ্ডটি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সাধারণ আইনের বহির্ভূত দেশ বলিয়াই যে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। কারণ, অমৃতসর প্রভৃতি অন্য কোন কোন সাধারণ আইন অনুসারে শাসিত অঞ্চলেও এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক না হইলে আমরা জানিতেই পারিতাম না, যে, ঐ প্রদেশে আইন নামে অভিহিত একটি অদ্ভুত জিনিষ আছে। ব্যাপারটি এই,—

হবীব নূর নামক এক ব্যক্তি একজন সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীকে গুলি করে, কিন্তু তাহাতে ইংরেজটি হত হয় নাই, গুরুতর আঘাতও পায় নাই। অবিলম্বে হবীব নূরের বিচার হয়। সে বলে, যে, সে ইংরেজটিকে বধ করিবার জন্য গুলি করিয়াছিল। বিচার আরম্ভ হইবার দিনই তাহার ফাঁসীর হুকুম হয়, এবং তাহার পর-দিনই তাহার ফাঁসী হয়। যদি ইংরেজটি মারা পড়িত তাহা হইলে হবীব নূরের দুইবার ফাঁসী হইত কি? অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপীল করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

এই ব্যাপারটি লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হয়। তাহাতে সরকার-পক্ষ পরাজিত হন। তর্কবিতর্ক হওয়ায় জানা গিয়াছে, যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯০১ সালে একটি "আইন" জারি হয়, যাহার বলে ধর্ম্মোন্মত্ত (fanatical) নরহত্যাকারী বা নরহত্যাপ্রয়াসীর এইরূপ সরাসরি বিচার ও ফাঁসী হইতে পারে। ১৯০১ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত চৌদ্দবার এই আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

এই নমুনা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কিরূপ কঠোরভাবে শাসিত হয়।

এই প্রদেশের লোকেরা চান, যে, সেখানে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভা যুক্ত অন্য সব প্রদেশের ন্যায় সাধারণ আইন ও বিচারপ্রণালী প্রচলিত হয়। ভারতীয় কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক এই দাবির বিরোধী নহে। সকলেই ইহার সমর্থন করিবে।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় (তাঁহারা তথাকার লোকসমষ্টির শতকরা ৯৫ জন) চান, যে, এই প্রদেশের জন্য একজন আলাদা গবর্ণর নিযুক্ত হন, একটি আলাদা ব্যবস্থাপক সভা হয়, ইত্যাদি। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সমুদয় কারণ এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক। একটা প্রধান কারণের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে।

এই প্রদেশে যে রাজস্ব আদায় হয়, ব্যয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। এই অতিরিক্ত টাকা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রাজস্ব হইতে দিতে হয়। এই প্রদেশে গবর্ণর নিযুক্ত হইলে ব্যবস্থাপক সভা হইলে এবং বড় বড় অন্য সব প্রদেশের ন্যায় অন্যান্য সব বন্দোবস্ত করিতে হইলে, খরচ আরও বাড়িয়া

যাইবে, এবং সেই অতিরিক্ত খরচও অন্য সব প্রদেশের রাজস্ব হইতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন, সব প্রদেশেই টাকার অভাবে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির উন্নতির যথেষ্ট আয়োজন করা সম্ভব হয় না বলিয়া গবর্মেণ্ট বলেন। এই কারণে অন্য সব প্রদেশকে আরও বঞ্চিত করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গবর্ণর নিয়োগাদি ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থার সমর্থন করা যায় না। এই প্রদেশে আইন, বিচারপ্রণালী, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি বাণিজ্য শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা অন্য সব প্রদেশের মত উৎকৃষ্ট হউক। তাহার জন্য যত ব্যয় হইতে পারে, তাহা ঐ প্রদেশ নিজের টাকায় করিতে না পারিলে অন্যান্য প্রদেশের রাজস্ব হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

ঐ প্রদেশে সরকারী আয় অপেক্ষা ব্যয় কত বেশী হয় তাহার একটা চারি বৎসরের হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায়। রিপোর্টটির নাম, "Report of the Special Committee appointed to investigate certain facts relevant to the economic and financial relations between British India and Indian States." তাহার ৫১ পৃষ্ঠা হইতে নীচের তালিকাটি সঙ্কলিত হইল। তাহাতে দৃষ্ট হইবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বৎসর	প্রাদেশিক রাজস্বের অতিরিক্ত ব্যয়
১৯২৭-২৮	২,০৬,০০,০০০ টাকা
১৯২৮-২৯	২,৩১,১২,০০০ "
১৯২৯-৩০	২,৫৫,০৫,০০০ "
১৯৩০-৩১	২,৭০,০৬,০০০ "
চারি বৎসরের মোট	৯,৬২,২৩,০০০ টাকা

বর্ত্তমান বন্দোবস্তেই চারি বৎসরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। ঐ প্রদেশে গবর্ণর নিয়োগাদি ব্যবস্থা করিলে আরও অনেক অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। তাহা ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশ হইতে লইবার কোন ন্যায্যতা দে যাইতেছে না—বিশেষতঃ সকলেরই যখন টাকা টানাটানি।

ভারতীয় বাজেট

১৯৩০-৩১ সালের ভারতীয় বাজেট করিবার স অনুমান করা হইয়াছিল, যে, ১৯৩১ সালের ৩১শে ম পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া ৮৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এখ রাজস্ব-সচিব দেখিতেছেন, যে, রাজস্ব-আদায় মোটে উপর ১৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা কম দাঁড়াইবে। তা হইলে ১৯৩০-৩১ সালের আয় ব্যয় খতাইয়া মোটে উপর ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইতেছে।

ইহা পূরাইয়া লইবার জন্য এবং যাহাতে আগাম ১৯৩১-৩২ সালে ব্যয় অপেক্ষা আয় কম না হয়, তাহা জন্য রাজস্ব-সচিব নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তা করিয়াছেন। ব্যয়-সংক্ষেপ যথেষ্ট করা হইয়াছে বলিয় আমরা মনে করি না। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই। যদি বাজেটের প্রত্যেক দফা পরীক্ষা করিয় দেখাইয়া দেওয়া যায়, যে, যথেষ্ট ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারিত এবং যদি বাজেটের অনেক বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হয়, তাহাতেও কোন লাভ নাই। কারণ, বড়লাট নিজের ইচ্ছা অনুসারে বরাদ্দ ঠিক পূর্ব্ববৎ করিয়া দিতে পারেন। বর্ত্তমান আইন ও রীতি এইরূপ। যদি ভবিষ্যতে আয়-ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার প্রভুত্ব জন্মে, তখন বাজেটের বিস্তারিত সমালোচনা সার্থক হইবে।

রাজস্ব-সচিব আয়বৃদ্ধির জন্য যে-যে ট্যাক্স বাড়াইবার বা নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি ঠিক্ হইয়াছে। মদ্যের উপর শুল্কবৃদ্ধি ঠিক্ হইয়াছে। শর্করার উপর শুল্কবৃদ্ধির দ্বারা যদি দেশী চিনি ও গুড়ের ব্যবসার সুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে। বিদেশী কাপড়ের উপর শতকরা পাঁচ শুল্কবৃদ্ধিও ভাল, কেরোসিনের উপর শুল্ক-বৃদ্ধির আমরা সমর্থন করি না; কারণ ইহা গরীব লোকেরাও বহু পরিমাণে ব্যবহার করে। মোটর

গাড়ী চালাইবার পেট্রলের উপর শুল্কবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন স্থলে করা যায়; কারণ সাধারণতঃ সম্পত্তিপন্ন লোকেরা ও ব্যবসাদারেরা নানাবিধ মোটর যান ব্যবহার করে। ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স্ বা আয়ের উপর কর বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এখন যেমন বার্ষিক দু' হাজার টাকা কম আয়ের উপর ট্যাক্স লওয়া হয় না, ভবিষ্যতেও সেই ব্যবস্থা রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা সুবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু ট্যাক্সের হার বাড়ান হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, যে-সব নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী ব্যক্তিকে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স দিতে হয়, কিছুকালের জন্য ট্যাক্স-বৃদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক না হইতে পারে; কারণ তাঁহাদের বেতন কমে নাই। এবং অনেক জিনিষপত্রের দাম কমিয়াছে। কিন্তু যে-সকল ব্যবসাদারকে এই ট্যাক্স দিতে হয়, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে। কারণ, প্রায় সব ব্যবসাতেই মন্দা পড়িয়াছে।

—

গবর্ন্মেণ্টের অমিতব্যয়িতা

কোন বৎসর রাজস্ব-আদায় কম হইলেই গবর্ন্মেণ্ট নূতন ট্যাক্স বসান কিম্বা পুরাতন ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করেন। কিন্তু যখন হাতে টাকা থাকে, তখন মিতব্যয়িতার দ্বারা সঞ্চয় করিবার দিকে রাজপুরুষদের দৃষ্টি থাকে না। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ তাহার একটি। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার কোন ন্যায্য প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারি নাই। এই পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশের কোন হিত হইয়াছে বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু নূতন দিল্লী শহরে বড়লাটের প্রাসাদ ও অনেক সরকারী আপিস আদালতের বাড়ি এবং নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১৫ (পনর) কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। নক্সা আদি করিবার জন্যই দুজন ইংরেজ শিল্পী চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। নূতন দিল্লীর "গৃহ প্রবেশ" অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকার বাহাদুর সেদিন আতসবাজীতেই কুড়ি হাজার টাকা ফুঁকিয়া দিয়াছেন।

রেলওয়ে বাজেট

অন্যান্য বাজেটের মত রেলওয়ে বাজেটেও এবার কয়েক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। রেলওয়ে বাজেটে ঘাটতি পড়া এই প্রথম। ব্যবস্থাপক সভার অনেক বেসরকারী সভ্যের মতে রেলওয়ে বোর্ড অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। এইজন্য রেলওয়ে বোর্ডের বরাদ্দে এক লক্ষ পনর হাজার টাকা কমাইবার একটি প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বি. দাস উপস্থিত করেন। তাহাতে বেসরকারী দলের পরাজয় হয়। কিন্তু তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজুর ঐরূপ একটি প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে গৃহীত হয়।

—

জেলের বরাদ্দ না-মঞ্জুর

বাংলার ব্যবস্থাপক সভা উহার শাসন-পরিষদের সভ্য স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের একটা দাবি না-মঞ্জুর করিয়াছেন। জেলসমূহের ভার তাঁহার উপর আছে। তিনি বঙ্গে নূতন জেল ও উপ-জেল নির্ম্মাণের জন্য টাকা চাহিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশ সভ্যের মতে তাহা না-মঞ্জুর করেন। এই কারণ দেখাইয়া তাহা করা হয়, যে, জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। উক্ত সভার ন্যাশন্যালিষ্ট দলের নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, যে-সকল সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের পূর্ব্বেই পুলিস তাহাদিগকে প্রহার করে।

—

আকাশযানের ডাক

আগে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে ডাক আসিত জাহাজে। কিছু দিন হইতে আর একটি ডাক আসিতেছে দিল্লী পর্য্যন্ত আকাশযান দ্বারা। উহা কেন দিল্লী ছাড়াইয়া কলিকাতা ও রেঙ্গুন পর্য্যন্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে না, সে বিষয়ে বিলাতী পার্লেমেণ্টে প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। ভারতসচিব মিঃ বেন তাহার কিছু কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, যে, এই (খ্রীষ্টীয়) বৎসরের শেষ নাগাদ আকাশযানে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিলাতী ডাক

চলিবে। স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, যে, ফ্রেঞ্চ ওলন্দাজ আকাশযানগুলি ভারতবর্ষের উপর দিয়া ভারতবর্ষ লঙ্ঘন করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রিটিশ আকাশযান-সমূহ তাহা করিতেছে না। তাহার কারণ এই, যে, ইংরেজেরা পৃথিবীতে সব জাতির চেয়ে "এফিশিয়েন্ট", এবং ওলন্দাজদের অধিকৃত যবদ্বীপে এবং ফরাসীদের অধিকৃত আনাম-কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপের নিকটবর্ত্তী।

—

পারস্যে আকাশযান

"এফিশিয়েন্ট" ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের সব দিকে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে জাপান বাদে এশিয়ার আর কোথাও না-কি তেমন আশ্চর্য্য উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ইংরেজদের সম্পাদিত ইণ্টার-ন্যাশন্যাল রিভিউ অব্ মিশ্যন্স নামক প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় ত্রৈমাসিকের জানুয়ারী সংখ্যার ৮৫ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি, পারস্যে

"Aeroplanes carry passengers and mails between the most important cities, and the Persian Air mail links up at Bushire with the Imperial Airways. A letter posted in London may be delivered in Isfahan in five days."

তাৎপর্য্য। "পারস্যে প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে এরোপ্লেনে যাত্রী ও ডাক বহন করে। পারস্যের আকাশ-ডাক বুশায়ারে ব্রিটিশ ইম্পীরিয়াল আকাশ-মার্গের সহিত সংযুক্ত। লণ্ডনের চিঠি পাঁচ দিনে ইসফাহানে পৌঁছে।"

—

শ্যামদেশের কথা

উপর্যুক্ত ত্রৈমাসিক কাগজের ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি,

"Among the nations of the East today Siam alone is a land of peace and quiet, free from all foreign intervention and on terms of utmost friendship with the nations of the West."

তাৎপর্য্য। "প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমানে কেবল শ্যামই শান্তি ও নিরুপদ্রবতার দেশ। ইহার সকল ব্যাপার বিদেশীদের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত, এবং ইহার সহিত সমুদয় পাশ্চাত্য জাতির খুব বন্ধুত্ব আছে।"

বলা বাহুল্য, এই দেশের উপর ইংরেজ বা অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতি কখনও রাজত্ব করে নাই।

এই দেশটিতে কেবল যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা নয়; এখানে নানা দিকে উন্নতিও হইতেছে। ইহার বর্ত্তমান রাজার নাম প্রজাধিপক, তাঁহার পূর্ব্বে রাজা ছিলেন ষষ্ঠ রাম, তাঁহার পূর্ব্বে চুলালঙ্করণ (চূড়ালঙ্করণ)। পূর্ব্বোক্ত পত্রিকাতে আছে:—

"The reign of King Chulalongkorn was conspicuous not only because of its length, which was forty-two years, but because of the marked advance made in his country during that period. one of King Chulalongkorn's first acts as King was to re-affirm this decree (of religious liberty). A second signal act of his was to free the slaves. Slavery is illegal in Siam to-day.

"Other notable steps were taken along progressive lines. The literacy of the country also was greatly increased. The whole country was unified and consolidated and its resources conserved. Railroad lines were planned and bulit."

শ্যামে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা, দাসদের মুক্তি, শিক্ষার বিস্তার, সমগ্র দেশের একত্বসাধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, রেলওয়ে-নির্ম্মাণ প্রভৃতির কথা উপরে ইংরেজী কথাগুলিতে আছে। নানা দিকে উন্নতি রাজা চূড়ালঙ্করণের পরেও চলিয়া আসিতেছে।

—

ভারত সরকারের আফগানিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দান

"অমৃতবাজার পত্রিকা" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারত গবর্মেণ্ট আফগানিস্থানের রাজাকে দশ হাজার রাইফ্‌ল্ বন্দুক, এক লক্ষ সত্তর হাজার পাউণ্ড অর্থ (বাইশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয় শত সাতষট্টি টাকা) এবং পঞ্চাশ লক্ষবার বন্দুক ছুঁড়িবার মত বারুদ ও গুলি কেন দিতেছেন? আফগানিস্থানের কি অন্তর্বিপদ না বহির্বিপদের আশঙ্কা ঘটিয়াছে? সর্ব্বসাধারণে যত দূর জানে, আফগানিস্থানের প্রতিবেশী পারস্য, চীন, সোভিয়েট রুশিয়া, বা তিব্বতে আফগানিস্থান অভিমুখে ফৌজের কুচ হয় নাই। যদি নাদির খাঁর প্রজারাই অশান্ত হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহাকে সাহায্য করিবার কারণ হইতে পারে। কিন্তু আমানুল্লার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ হইয়াছিল, তখন ভারত গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দেন নাই কেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

—

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় মহিলা কলেজ

বড়লাটের পত্নী লেডী আরুইন দিল্লীতে একটি নূতন কেন্দ্রীয় মহিলা কলেজের জন্ত তের লক্ষ টাকা চাহিয়া একটি অনুরোধ-পত্র বাহির করিয়াছেন। এই কলেজে শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে গবেষণা হইবে, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষা-প্রণালী শিখাইয়া তাঁহাদের কাজের জন্ত প্রস্তুত করা হইবে, এবং গবেষণা ও কার্য্যতঃ শিক্ষাদান-প্রণালী শিখাইবার নিমিত্ত কলেজের সঙ্গে একটি বালিকা-বিদ্যালয় থাকিবে।

এই উদ্দেশ্যগুলি ভাল। আমরা চাই, দেশী লোকদের দ্বারা সমগ্র ভারতে এইরূপ একটি নয়, প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃ এইরূপ একটি করিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। আমরা জানি, আমাদের দেশের অনেক ধনী লোক সদনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া টাকা দেন না, বড় কোন রাজপুরুষ বা তাঁহার পত্নীকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে টাকা দেন; দেশী লোকে মহিলা কলেজের জন্ত টাকা চাহিলে তাঁহারা অনেকে কিছুই দিবেন না। তথাপি আমরা সেই ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাকাইয়া থাকিব, যখন বিদেশী কোন নামের মোহ সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার ও বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত আবশ্যক হইবে না। বিদেশী নামের জাদুতে আমাদের জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অধিকন্ত, বিদেশীর প্রভাবে যে-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত হয়, তাহাতে দেশী লোকদের যোগ্যতার সমুচিত আদর ত হয়ই না, তদ্দ্বারা দেশী লোকদের শক্তির বিকাশ পরোক্ষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯৩১-এর সেন্সাস

বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের সেন্সস্ যে-ভাবে লওয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। ইহার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীরা অভিযোগের উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় অন্ততঃ কতকগুলি অভিযোগ সত্য। সেই জন্য এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমি জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে একটি লোক আমার ভবানীপুরের বাসায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমার বাড়িতে চাকরবাকর-সমেত কত লোক থাকে। তিনি কেবল সংখ্যাটি লইয়াই চলিয়া গেলেন। কাহারও বয়স, জাতি (স্ত্রী বা পুরুষ), ধর্ম, লিখনপঠনক্ষমতা, মাতৃভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, এবং কোন ফারম পূরণ করিতেও দেন নাই। তাহার পর কেহ ঐ বাসায় আসিয়া ঐরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন কিনা, জানি না।

এখানে শান্তিনিকেতনেও কোন কর্ম্মচারী আমার বয়স, ধর্ম্ম, ভাষাজ্ঞান, পেশা, ইত্যাদি কোন খবর লইতে আসে নাই। আমার এখানে অস্তিত্বও সম্ভবতঃ তাঁহার অবিদিত।

১৯০১ সালের সেন্সসের সময় আমি এলাহাবাদে চাকরি করিতাম। একটি ভদ্রলোক আমার বাসায় ফারম পূরণ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার চট্টোপাধ্যায় পদবী আছে এবং আমি নিতান্ত নিরীহ লোক দেখিয়া তিনি কোন মতেই আমাকে জাতিতে ব্রাহ্মণ না লিখিয়া ছাড়িবেন না; আমিও বলিতে লাগিলাম, আমি কোন জা'ত মানি না। শেষে তাঁহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া আমি ফারমটি লইয়া জা'তের (Casteএর.) ঘরে পরিষ্কার অক্ষরে "No Caste" লিখিয়া দিলাম। তখন তিনি নিবৃত্ত হইলেন। সংখ্যাদিগণনকারী এরূপ কর্ম্মচারী এখনও থাকিতে পারেন।

মুসলমান বাঙালীদের বংশ-পরিচয়

মুসলমান বাঙালীদের বংশ-পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে মার্চ্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় একজন লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ইংরেজ লেখকদিগের গ্রন্থ হইতে যে-সকল মত ও তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে, অধিকাংশ মুসলমান বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষ অন্ত বাঙালীদের মত এই দেশেরই মানুষ ছিলেন. *Tiranli*

মানুষ ছিলেন না। বিশেষ কোন দেশের মানুষ হওয়া লজ্জার বিষয় নহে—ভারতবর্ষের মানুষ হওয়াও লজ্জার বিষয় নহে। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান কালের মানুষদের অগৌরব ও গৌরবের কারণগুলি বিবেচনা করিলে ভারতীয়দিগকে অন্য কোন দেশের মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হইবে না।

মুসলমান বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে যাইতে হইয়াছিল, ইহা বরং হিন্দুসমাজের পক্ষেই অগৌরবের বিষয়। সামাজিক অবজ্ঞা ও উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক হিন্দু অতীত যুগে মুসলমান হইয়া থাকিবেন। ইহা তাৎকালিক হিন্দুসমাজের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। কেহ কেহ ধন-মান উচ্চপদের প্রলোভনেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ইহাও নিন্দনীয়। অনেকে প্রাণভয়ে বা অন্য কোন বিপদের ভয়েও মুসলমান হইয়া থাকিবে। ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজের নিজের লোকদিগকে সাহসী করিবার এবং রক্ষা করিবার ক্ষমতার অভাব সূচিত হয়। ধর্ম্মের আকর্ষণেও কেহ কেহ মুসলমান হইয়া থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশের অভাব নাই। হিন্দুসমাজের নেতারা এই সকল উপদেশকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বরাবর দিয়া আসিলে এবং তৎসমুদয়ের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিলে কোন হিন্দুকেই ধর্ম্মের জন্য হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় লইতে হইত না।

মুসলমান বাঙালী সমাজের একটি ক্রটি বরাবর হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা এই, যে, বঙ্গে যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহাদের সাধারণ শিক্ষার এবং উচ্চাঙ্গের ইসলামীয় শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা কোন সময়েই করা হয় নাই।

—

শান্তিনিকেতনে গান্ধী পুণ্যাহ

মহাত্মা গান্ধী অনেক বৎসর পূর্ব্বে কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন এখানকার ছাত্রদিগকে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে তিনি বলেন। তাঁহার এখানে অবস্থিতির সশ্রদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ছাত্র ও ছাত্রীরা বৎসরে একটি দিন বিশেষ ভাবে যাপন করেন। এবার ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সেই দিন পড়িয়াছিল। এই দিন আশ্রমের সমুদয় ভৃত্য ছুটি পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের সমুদয় কাজ নিজে করে। মেথরের কাজও ছাত্রেরা করে। রন্ধন পরিবেশণ প্রভৃতি কাজও তাহারা করে। আশ্রমে অনেক দেশের, প্রদেশের, ধর্ম্মের ও জাতির ছোট বড় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ একত্র ভোজন করিয়া থাকেন—শুধু গান্ধী দিবসে নহে অন্য সময়েও। এখন এখানে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক ছাড়া আমেরিকা, জাপান, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, হাঙ্গেরী, ডেন্মার্ক ও হল্যাণ্ডের লোক আছেন। হিন্দু ছাড়া এখানে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, পারসী ও মুসলমান আছেন। যেখানে ছাত্রীরা থাকেন তাহার নাম শ্রীভবন। সেখানে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একটি বিবাহিতা মুসলমান বালিকা আছেন এবং একটি পারসী, একটি সিংহলী ও একটি জাপানী মেয়ে আছেন।

—

সেন্সসে নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা

ভারতবর্ষে সেন্সসের সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকের সংখ্যা গণনা করা হয়। তাহা হইতে এই ধারণা হইতে পারে, যে, যে-সব দেশে লোকসংখ্যা গণিত হয় সর্ব্বত্র কোন্ ধর্ম্মের কত লোক তাহা গণনা করা হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। আগামী ২৬শে এপ্রিল গ্রেট ব্রিটেনের লোকসংখ্যা গণিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে যে ফারম্ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম লিখিবার কোন ঘর নাই। বস্তুতঃ, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটেনের কোন ধর্ম্মবিষয়ক সেন্সস গৃহীত হয় নাই। ধর্ম্মবিষয়ক সেন্সস যে বিলাতে হওয়া উচিত, নানা কারণে তাহার আলোচনা এখন সে দেশে হইতেছে। একটা কারণ, সে দেশে অনেকে বলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এবং মোটের উপর ধর্ম্ম জিনিষটির প্রভাব তথায় কমিয়া গিয়াছে এবং লোকে ধর্ম্মের প্রয়োজনই স্বীকার করে না। ধর্ম্মবিষয়ক সেন্সস লইলে

বুঝা যায় এরূপ উক্তি কি পরিমাণে সত্য বা মিথ্যা। যাঁহারা কোন ধর্ম্মই মানে না এবং তাহা বলিবার সাহস রাখে, তাহারা সেন্সসের ফারমে তাহা লিখিয়াই দিতে পারে। যাহারা বাস্তবিক অন্তরের সহিত বিশেষ কোন ধর্ম্মে, যেমন ধরুন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে, বিশ্বাস করে না, তাহারা যদি আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া লেখায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে তাহারা ধর্ম্মের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অবশ্য, বিলাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নামক বিভীষিকা নাই ও তাহার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকের সংখ্যা গুণিবার দরকার নাই, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সেখানেও আছে।

সভ্য দেশসমূহের মধ্যে আরও কয়েকটি দেশে ধর্ম্মের সেন্সস লওয়া হয় না। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ তাহার মধ্যে একটি। তথাকার কোন কোন খবরের কাগজ এরূপ সেন্সস মধ্যে মধ্যে লইয়া থাকে। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স, বেলজিয়মে ও স্পেনে ধর্ম্মের সেন্সস লওয়া হয় না।

—

ভারতীয় ফৌজের ছোট বড় নায়কত্ব

অনেক বৎসর হইতে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট, ভারতীয় সৈন্যদলের ছোট বড় নায়কত্বের যে-সব কাজে ইংরেজেরা নিযুক্ত হয়, তাহাতে ক্রমশঃ কেবল ভারতীয় লোকদিগকেই নিযুক্ত করিবেন বলিয়া আসিতেছেন। গোলটেবিল বৈঠকেও এইরূপ একটা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ যাহা হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই অঙ্গীকারটা যে কথার কথা মাত্র, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোনো কাজে এক জাতির বদলে যদি শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র অন্য এক জাতির লোকের নিয়োগ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে নূতন নিয়োগের বেলায় প্রথমোক্ত জাতির লোক অপেক্ষা শেষোক্ত জাতির লোকই খুব বেশী করিয়া লওয়া দরকার। অর্থাৎ যদি ইংরেজের বদলে ভারতীয় লইতে হয়, তাহা হইলে নূতন যত লোক প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইবে, তাহার মধ্যে ইংরেজের চেয়ে ভারতীয় ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হওয়া চাই, এবং বছর কয়েক পরে ইংরেজের নিয়োগ একেবারে বন্ধ করা চাই। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলের কর্ম্মচারী নিয়োগে কি দেখিতে পাই?

রাষ্ট্রপরিষদে (কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে) সেদিন সৈয়িদ হুসেন ইমামের একটি প্রশ্নের উত্তরে, প্রধান সেনাপতি যাহা বলেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৫ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈনিক বিভাগে নেতৃত্ব পদে যত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে চারি শত একানব্বই জন ইংরেজ এবং কেবল সাতান্ন জন ভারতীয় অর্থাৎ প্রতি নয় জন ইংরেজে একজন ভারতীয় অপেক্ষা সামান্য বেশী! এ ভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া ভারতীয় নিয়োগ করিলেও ইংরেজদের সংখ্যাই বরাবর বেশী থাকিয়া যাইবে।

—

জেলে প্রায়োপবেশন

শ্রীযুক্ত শান্তিশেখরেশ্বর রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জেলে বন্দীদের মধ্যে প্রায়োপবেশন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বলেন, জেলে কয়েদীরা দলবদ্ধভাবে থাকে, সুতরাং কতগুলি লোক যে কবে খাইল না, তাহা বলা কঠিন। তথাপি তিনি প্রায়োপবেশন ৫১৩ বার ঘটিয়াছে বা ৫১৩ জন কোন-না-কোন সময়ে করিয়াছে, বলেন। খেয়ালের বশে, সখ করিয়া বা রাগ করিয়া কম লোকেই আহার ত্যাগ করে। সুতরাং প্রায়োপবেশনের ৫১৩টি দৃষ্টান্ত বাংলা দেশের জেলে পাওয়া গিয়া থাকিলে জেলের পরিচালন কি ভাবে হয়, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না।

—

জেলে মশারি

জেলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে মশারি দেওয়া হয়, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে দেওয়া হয় না। তাহাদিগকেও দেওয়া উচিত। মশারির প্রয়োজন দুটি—মশকদংশনরূপ নিদ্রার ব্যাঘাত দূরীকরণ, এবং ম্যালেরিয়ার মশকদংশনরূপ কারণ দূরীকরণ। জেল-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই দুটি প্রয়োজন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের বেলায় স্বীকার করেন, তাহা

হইলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের বেলাতেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহারাও মানুষ। কিন্তু যদি উভয় প্রয়োজন বা কোন একটি প্রয়োজন তৃতীয় শ্রেণীর বেলায় অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলাতেও অস্বীকার করা উচিত। এই শ্রেণী-বিভাগটাই আমরা পছন্দ করি না—বিশেষতঃ যখন উহা বিচারকেরা অনেক সময় খামখেয়ালীভাবে করেন।

—

শারদা আইন ও বালিকাদের শিক্ষা

বাংলা দেশের ১৯২৯-৩০ সালের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টের কিয়দংশ যাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিয়া প্রীত হইলাম, যে, উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় সকলে ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে। ইহার দুটি কারণ বলা হইয়াছে। প্রথম, নূতন নয়টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে; দ্বিতীয়, বাল্যবিবাহনিরোধক শারদা আইন পাস্ হওয়ায় অনেক বালিকা আগেকার চেয়ে বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিতেছে, সুতরাং আগেকার চেয়ে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িবার সময় ও সুযোগ পাইতেছে। ইহা বালিকাদের পক্ষে ও দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

—

ভারতীয়দের দেশশাসনের যোগ্যতা

যাঁহারা ভারতীয়দিগকে নিজেদের দেশশাসন করিবার অধিকার দিতে চান না, তাঁহারা বলেন, তাহাদের এ-বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং তাহারা এই কাজ হঠাৎ করিতে পারিবে না। কিন্তু পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশ সকলের যে-সব লোক বড় রাজনীতিজ্ঞ হন, তাঁহারাও ত বহুজন্ম ধরিয়া জাতিস্মর হইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন না, নিজের নিজের জীবিত কালের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আমরাও সুযোগ পাইলেই তাহা করিতে পারি।

আর একটা যুক্তিও ভারতীয় স্বরাজের বিরোধীরা উপস্থিত করেন, তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষ কোন এক প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিলেও স্বশ্রেণীস্থ অন্য লোকদের তদ্রূপ অভিজ্ঞতার সুবিধা সংসর্গ দ্বারা পাইয়া থাকেন; ভারতীয়েরা তাহাও পায় না। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনভার হঠাৎ ভারতীয়দের হাতে যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু ইংলণ্ডের আধুনিক ইতিহাসেই এই যুক্তির খণ্ডন রহিয়াছে, এবং তাহা ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য মিঃ উইলফ্রেড ওয়েলক্ ফেব্রুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ভারতীয় পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The existence of a Labour Government in Great Britain is not without significance for modern India. That this country should be governed by a set of ministers who, with one or two exceptions never held office prior to 1924, and yet the land remain quiet and the people peaceful and satisfied is a powerful argument for sudden change.

"Not many years ago Mr. Winston Churchil stated, with considerable Press approbation, tha Labour was not fit to govern. Within a very short time of that statement being made, the firs Labour Government was formed...."

তাৎপর্য্য। "গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক গবর্ন্মেণ্ট থাকা আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে অর্থহীন নহে। এই দেশ (বিলাত) যে একদল মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত হইতেছে যাহাদের মধ্যে দু-এক জন ছাড়া ১৯২৪-এর আগে কেহ সরকারী কাজ করে নাই এবং তথাপি দেশ নিরুপদ্রব এবং লোকেরা শান্ত ও সন্তুষ্ট রহিয়াছে, ইহা শাসন-প্রণালীর ও শাসকদলের হঠাৎ পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে একটি প্রবল যুক্তি। বেশী দিনের কথা নয়, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল এই বলিয়া খবরের কাগজ মহলে অনেকটা অনুমোদন পাইয়াছিলেন, যে, শ্রমিকদল দেশশাসন করিবার যোগ্য নহে। এই মত প্রকাশের অল্পকাল পরেই প্রথম শ্রমিক গবর্ন্মেণ্ট গঠিত হয়।"

শ্রমিক মন্ত্রীদের যেমন ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না, তেমনই শ্রেণীগতভাবেও খনি কারখানা এবং মিল সকলে মজুরী করিতে অভ্যস্ত শ্রমিকদলের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা সামান্যই ছিল অথচ তাহারা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইতেছে

সুতরাং শিক্ষিত ভারতবাসীরাও তাহা চালাইতে পারিবে। এই কথা মিঃ ওয়েলক্ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে বলিয়াছেন।

"Now obviously, if the British Parliamentary Labour Party, the great majority of whose members have been wage-earners, and brought up in the hard school of heavy toil in mine, workshop and factory,…could suddenly take over the reins of Government, it may not be too much to suggest that educated Indians, who have watched the working of the political machine which we have controlled in India, and have to some extent participated in the work of administration, might be able to take over the reins of Government with almost equal suddenness."

যাহাকে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলা হয় তাহা নামতঃ বহুকাল হইতে বিলাতে প্রচলিত থাকিলেও তথায় ভারতবর্ষের উচ্চজাতিদের মত একটি শাসকজাতি বরাবর ছিল, জনসাধারণ ও শ্রমিকেরা তাহার অন্তর্গত ছিল না; সুতরাং শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা কমই ছিল; অথচ তাহারা হঠাৎ রাষ্ট্রীয় কার্য্যের ভার পাইয়া কয়েক বৎসর হইতে অন্য সব রাজনৈতিক দলের মতই দেশের কাজ চালাইতেছে। নীচের অনুচ্ছেদে ওয়েলক্ মহাশয় এই কথাই বলিতেছেন,—

"Notwithstanding that what is known as democratic government has long been in existence in this country, until quite recent years the task of governing has been relegated to a comparatively small number of families. Our political history has created certain traditions which, with the necessary press support, sufficed to place political power into a limited number of hands. That tradition was never quite broken down until the emergence of the Labour Party. According to it, Eton and Harrow, supported by the Universities of Oxford and Cambridge, were divinely ordained to provide this country with its rulers. Thus for generations we had a ruling class in this country which came as near to an Indian caste as anything outside India is ever likely to be."

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও মজুর গবর্মেণ্ট

অতঃপর মিঃ ওয়েলক্ বলিতেছেন, যে, বিলাতের সব বড় ঘরানা মনে করিতেন এবং এখনও করেন, মজুর শ্রেণীর লোকেরা কখনই দেশের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইতে পারিবে না, তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিশ্বাস করেন, যে, বিদেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কাজ চালান মজুরদের পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব হইবে। অথচ যে মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন এখন বিলাতের মন্ত্রীসভায় পররাষ্ট্র সচিব, তিনি মজুর-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, লোহা ঢালাইয়ের একটি দোকানে কাজ করিতেন এবং তাঁহার কেতাবী শিক্ষা প্রাথমিক স্কুলেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র খুব কৃতী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত।

গোলটেবিল বৈঠকে এইরূপ প্রস্তাব হইয়া গিয়াছে, যে, ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রবিষয়ক সমুদয় ব্যাপার কোন ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে যাইবে না, বড়লাটের হাতে "রক্ষিত" (reserved) থাকিবে। তাহার মানে এই, যে, বিলাতের মজুরের ছেলে প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষা এবং লোহা ঢালাইয়ের দোকানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পৃথিবীর অন্যতম সুদক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইতে পারেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইতে পারেন না!

মিঃ ওয়েলকের কথাগুলি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Perhaps they (the old school of politicians, and particularly the Tory Party) got the worst shock of all when they realized that the coming of a Labour Government would ultimately mean that foreign affairs would be controlled by working men. That really was too much. It was bad enough to have working men in charge of finance, of the health services, and of the police—but to take charge of the country's relations with foreign Powers was unthinkable. With them it was an article of faith that Britain's affairs abroad must lie in the hands of gentlemen. It is assumed that Britain's dignity cannot possibly be maintained by any other than an Eton accent.

"The Foreign Office is the last stronghold of the old political school. To the unspeakable dismay of the Victorian politicians, this final fortress is falling under the fire of democracy. The fiercest fights in the House of Commons during the last twelve months have been over foreign policy. The Tory Party simply cannot accustom itself to the idea that a Labour Government dare attempt to control foreign policy without the aid and advice of the old gang. In every one of their attacks upon the Government they have assumed that the present Foreign Secretary could never dream of determining British policy without the consent of the Tory Party. To have to submit to the dismissal of Lord Lloyd in Egypt, the resumption of diplomatic relations with Russia, the Three Power Naval Agreement, and new arbitration machinery of the League of Nations, is a task which is proving most difficult to them, for these policies

will have considerable effect upon the future of this country and indeed of the whole world."

—

বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলন ও গান্ধী-আরুইন রফা

বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলন একটি প্রস্তাবে গান্ধী-আরুইন রফা আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া এবং তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম। ঐ রফা যাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা বলা অনুচিত ত নহেই, বরং কর্ত্তব্যই বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য, যে, উহা আশানুরূপ না হইলেও উহা আমরা মানিয়া চলিব। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ হওয়ায় আমরা আজ (২৭শে ফাল্গুন) মফঃস্বলে প্রাপ্ত-দৈনিক কাগজে পড়িয়া প্রীত হইলাম, যে, বঙ্গীয় ছাত্র সম্মেলন শেষ দিনের অধিবেশনে নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন,—

"This Conference requests the students all over Bengal to lend their full support to Mahatma Gandhi and the Congress in their efforts to secure Purna Swaraj for the country and requests them in this connection to secure the release of all detenus and political prisoners and the commutation of sentences of death passed on accused persons, including Dinesh Gupta, Ramkrishna Biswas, Bhagat Singh, Rajguru and Sukdev."

অহিংস সত্যাগ্রহী কয়েদীরা যেমন খালাস পাইয়াছেন, রাজনৈতিক কারণে বন্দী অন্যেরাও কোন প্রকার বল-প্রয়োগের অভিযোগে দণ্ডিত হইলেও যাহাতে খালাস পান, ফাঁসীর হুকুম যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের বদলে অরি কোন দণ্ড হয়, বিনা বিচারে আবদ্ধ লোকেরা খালাস পান, ইহা আমরাও চাই। খুব সম্ভব, মহাত্মাজীও বড়লাটকে এই সকল লোকের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি এবং অন্যদের মুক্তির মধ্যে যে একটি প্রভেদ আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

উভয়পক্ষের রফা মোটামুটি এই—কংগ্রেস সকল প্রকারের অহিংস আইন লঙ্ঘন বন্ধ করিবেন, সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদিগকে খালাস দিবেন এবং অন্ত কোন কোন কাজ করিবেন। যাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা হিং (হননেচ্ছায়) অভিযোগে বা সন্দেহে দণ্ডিত হইয়াছে তাঁহাদের মুক্তির জন্যও উভয়পক্ষের একটি বুঝাপ চাই। মহাত্মা গান্ধী যেমন কংগ্রেসের পক্ষ হই বড়লাটকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিয়াছেন, যে, অহি সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইবে এবং বড়লাট তাহা এ করিয়াছেন, সেইরূপ অন্য কেহ বলপ্রয়োগ ও হিং নীতির সমর্থকদলের পক্ষ হইতে বড়লাটকে প্রতিশ্রু দিতে পারেন কি, যে, ঐ নীতির অনুসরণ হইবে? স্বাধীনতালাভার্থ অহিংস প্রচেষ্টার সম কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তি বাড়াইয়া যদি মহা গান্ধীর পক্ষে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব হয়, ত হইলে তিনি তাহা অবিলম্বেই দিবেন বলিয়া অনুম করি। কিন্তু তিনি বলপ্রয়োগবাদীদের নেতা নহে বলিয়া সম্ভবতঃ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না বলপ্রয়োগবাদীদের যদি কোন সর্ব্বোচ্চ নে থাকেন, তাঁহার পক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিশ্র দিবার বাধা ও দুঃসাধ্যতা আমরা অনুভব করিতেছি কিন্তু তাঁহারাও আশা করি আমাদের অবলম্বি যুক্তিমার্গের ন্যায্যতা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

গান্ধী-আরুইন রফা প্রকাশিত হইবার পর গান্ধী নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছেন মনে করিবার কোন হেতু নাই খুব সম্ভব, রাজনৈতিক কারণে যে-সব শ্রেণীর লো ক্ষতিগ্রস্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিষয়ই তিনি ভাবিতেছেন এবং বড়লাটের সহি এখনও হয়ত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতে পা রাজনৈতিক কারণে স্কুল কলেজ হইতে তাড়িত ছাত্র জন্য চেষ্টা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হইবে।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে, বিনা নি অভিযোগে ও বিনা বিচারে বঙ্গে ও অন্যত্র যাঁহা স্বাধীনতা হৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মুক্তি দাবি করি একটি প্রস্তাব নিশ্চয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হও উচিত।